বিচিত্রা

সচিত্র মাসিক পত্র

(৭ম বর্ষ, প্রথম খণ্ড)

(শ্রাবণ ১৩৪০—পৌষ ১৩৪০)

সম্পাদক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচালক

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র এম্-এ, ডি-লিট্

কলিকাতা

২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

বার্ষিক মূল্য—৬৷৷০

বিষয়-সূচী

(শ্রাবণ ১৩৪০—পৌষ ১৩৪০)

থ

চিত্র-সূচী

(কেবল পূর্ণ পৃষ্ঠ)



পথচারী

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৪০

শিল্পী—নিকোলাস রোরিক

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৪০ | ১ম সংখ্যা

দুই বোন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

তুমি লিখেচ তোমার বান্ধবী আমার কল্পিত "দুইবোন"-এর ভাগ্যবিভ্রাটের যত দোষ চাপিয়েচেন শশাঙ্কের ঘাড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে দোষটা প্রকৃতি মায়াবিনীর। মানুষের চলবার বাঁধা রাস্তায় সেই নিষ্ঠুর চোরা-ফাঁদ পেতে রাখে, অসন্দিগ্ধমনে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পথিক এমন জায়গায় পা ফেলে যেখানটাতে ঢাকা গর্ত্ত। শশাঙ্কের সংসারযাত্রার রাস্তাটা দেখ্‌তে ছিল মজ্‌বুৎ কিন্তু শশাঙ্কের চলনের পক্ষে ছিল পিছল। হতভাগা ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বার পূর্ব্বে সে কথাটা তার আপনার কাছেও যথেষ্ট গোচর হয়নি। দিনগুলো চল্‌ছিল ভালোই, কিন্তু যে-সাঁকো বেয়ে চল্‌ছিল তার বাঁধনে ছিল ফাঁক; কেননা শশাঙ্কে শর্ম্মিলায় ভিতরে ভিতরে জোড় মেলেনি অথচ ফাঁটলটা উপর থেকে ধরা পড়েনি চোখে। হঠাৎ বাইরে থেকে মড়মড় করে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি ওরা কেউ জানতে পেরেছিল? যখন জানা গেছে তখন তো কপাল ভেঙেচে। পরামর্শদাতা বল্‌বে ফাটা কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভালোমানুষের মতো সেই সাবেক রাস্তায় উছোট খেতে খেতে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে চলা কর্ত্তব্য। শশাঙ্ক সেই ভাবেই চলত। কিন্তু শর্ম্মিলা বলে বসল তেমন চলায় কোনো পক্ষেই সুখ নেই। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আপন বিশেষ প্ল্যান অনুসারে ভাগ্যকে সংশোধন করবার প্রস্তাব জানালে। কিন্তু ভাগ্যলিপির উপরে কলম চালানো এত সহজ নয়। সে কথাটা বুঝেছিল উর্ম্মিমালা। ভূমিকাম্পনিক কেন্দ্রের উপরে কাঁচা মালমসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় আশ্রয় নিতে সে নারাজ। তাই সে দিলে দৌড়। তারপরে কী ঘটল তা কে বলবে? কালক্রমে উপরকার কাটার দাগটা হয়তো মিলিয়ে গেল কিন্তু মাঝে মাঝে নাড়া খেয়ে ভিতরকার ছেঁড়া স্নায়ুর ব্যথাটা কি আজো টন্‌টনিয়ে ওঠে না? ব্যথা যারা পায় তাদেরই উপরে আমরা জজিয়তি করি কিন্তু ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি সব

সময়ে তারাই নিজে? বজ্রাঘাতে মোলো মানুষটা, তুমি বল্‌লে কিনা পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইচ্ছারই প্রমাণ হয়, দোষের প্রমাণ হয়না।

তুমি লিখেচ তোমার বান্ধবী আমার গল্পটার সব ক'টি পাত্রের পরেই বিমুখ। সংখ্যা অতি অল্প, তিনটি মাত্র প্রাণী—তবু তারা একজনো তাঁর মনের মতো নয়। তা নিয়ে দুঃখিত হবার কারণ নেই। কেননা অভিব্যক্তিতত্ত্বের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন প্রণালী সাহিত্যে এবং সমাজে একই নয়। সমাজে যাদের আমরা বন্ধুর কোঠায় গণ্য করিনে সাহিত্যে তারা সমাদর পেয়েচে এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। আদর্শ মানবচরিত্রের মাপে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতাবিচার বাংলা দেশের সমালোচকশ্রেণীছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। মনে আছে এমন তর্ক একদা প্রায়ই শোনা যেত যে আদর্শ সতী নারী হিসাবে ভ্রমর এবং সূর্য্যমুখীর চরিত্রে আধরতি পরিমাণে শ্রেষ্ঠতার তারতম্য কোন্ কথা কোন্ ভঙ্গীটুকু নিয়ে। অল্প বয়স সত্ত্বেও মনে আক্ষেপ হোতো যে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং ইত্যাদি। সাহিত্য যে শ্রেয়স্তত্ত্বের নিখুঁৎ ছাঁচে ঢালাই করা পুতুল গড়বার কারখানা নয় একথাও কি বোঝাতে হবে? ম্যাকবেথ নাটকে দুটিমাত্র প্রধান পাত্র, ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ। বলা বাহুল্য দুজনের কাউকেই সুকুমারমতি পাঠকদের চরিত্রগঠনযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা চলবে না। এণ্টনি এণ্ড ক্লিয়োপ্যাট্রা শেকসপীয়রের প্রধান নাটকদের মধ্যে অন্যতম কিন্তু ক্লিয়োপাট্রা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে স্থান পাবার অধিকারিণী হলেও তাকে সাধ্বীর আদর্শ বলা চল্‌বেনা আর এণ্টনি আপন চরিত্রের অনিন্দ্য আদর্শে আধুনিক উচ্চদরের বাংলা নভেলের নায়কদের সমশ্রেণীভুক্ত নয় একথা মানতেই হবে। তথাপি এও না মেনে চলবে না যে শেক্‌সপীয়রের নাটকটি উঁচুদরের বাংলা নভেলের চেয়ে অন্ততঃ কোনো অংশে হীন নয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রকে তুচ্ছ করতে পারিনে, কিন্তু মহত্ত্বে তাঁর ন্যূনতা ছিল। কারই বা না ছিল? স্বয়ম্বর সভার ব্যাপারে ভীষ্মই কি ক্ষমার যোগ্য? এমন কি কবির প্রিয়পাত্র পাণ্ডবদের আচরণে কলঙ্ক খুঁজে বের করবার জন্যে অধিক তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আধুনিক বাংলাদেশে বেদব্যাস জন্মান নি সে তাঁর পুণ্যফলে।

অপরপক্ষ থেকে তর্ক করতে পারেন যে সাহিত্যে সমাজ ধর্ম্ম ও শাশ্বতধর্ম্মের ত্রুটি দেখা দেয় তার শোকাবহ পরিণাম প্রমাণ করবার জন্যেই। অর্থাৎ এইটুকু দেখাবার জন্যে যে স্খলনের পথ আরামের পথ নয়। কিন্তু দেখতে পাই আজকাল তাতেও ভালোমানুষ লোকের ক্ষোভশান্তি হয় না। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সন্দীপ বা বিমলা গৌরবজনক সিদ্ধিলাভ করেনি কিন্তু তবু লেখক সেদিন সমালোচকের দরবারে দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলেন না। তারস্বরে ফরমাস এই যে যেমন করেই হোক শ্রেষ্ঠ আদর্শ রচনা করতেই হবে। ছেলেমানুষী আব্‌দার একেই বলে, যে চায় লালায়িত রসনা দিয়ে কেবলি চিনির পুতুল লেহন করতে।

দুইবোন গল্পটা সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যাখ্যা কিছু শুনতে চেয়েচ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দিয়েচি। সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউবা মা, কেউবা প্রিয়া কেউবা দুইয়ের মিশোল। বাংলাদেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্তই মাতৃ অঙ্কের আবহাওয়ায়

সুরক্ষিত। অরা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে। বিবাহে যাবার আগে বর বলে যায়, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্চি। অর্থাৎ স্ত্রী আসে মায়ের পরিশিষ্ট হয়ে—Alma Mater-এর পোষ্ট্ গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর মতোই। ছেলে মায়ের কাছ থেকে আশৈশব যে সকল সেবায় অভ্যস্ত, বধূ এসে তারি অনুবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়। অল্প স্ত্রীই এমন সুযোগ পায় যাতে, নিজের স্বতন্ত্র রীতিতেই স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নূতন করে তোলে।

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুষঙ্গ। তারা জানে স্ত্রী যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়। নইলে তাকে লালনরসলালায়িত, শিশুগিরি করতে হয়। মায়ের দাসীকে নিয়ে থাকার মতো এমন দৌর্ব্বল্য পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই।

শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্যস্নেহসতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় উর্ম্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটল। অপরপক্ষে অতিনির্ভরলোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণ যাত্রার মোটর রথের শোফার। তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীত জাতীয় মেয়েও নিশ্চয় আছে যারা অতিলালনঅসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব প্রতিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে উর্ম্মি সেই জাতের।' সুরুতেই চালককে নিয়ে গুরুকে নিয়ে তার প্রাণ হাঁফিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে সে এমন পুরুষকে পেলে যার চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই। যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই—যে তার যথার্থ জুড়ি।

ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হ'য়ে উঠল। এই হচ্চে ব্যাপারটা।

উপসংহারে বলে রাখি, সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে, প্রিয়া আছে। কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ, কোন্‌টা এগিয়ে আছে কোন্‌টা পিছিয়ে তাই নিয়েই তাদের স্বাতন্ত্র্য। ২৭ মার্চ্চ ১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাহাত্তরে

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিঠাকুরদা'র করকমলে—

'আঁটো অর্গল বুদ্ধির দ্বারে,—বুদ্ধি মোদের শোনো—
বয়স এবার যে-ঘরে এসেছে—ভরসা নেই যে কোনো!
আশি কালের ওগো ঠাকুর্দ্দা! চিরযৌবন চোরা!—
রূপোলী চুলেতে ফুলের মুকুট পরাতে এসেচি মোরা।
চির নবাগত—চির চেনা তুমি; গত অনাগত কাল—
তোমারি সৃজনে পড়ে গেছে ধরা।—নব তারুণ্য জাল
রচিয়া চলেছো আনন্দরসে—ওগো রহস্যময়!
সকল কালের কালজয়ী কবি! গাহি তাই তব জয়।
নিতি নব-নব অফুরাণ দান—আঁচল ভরিয়া পাই—
মরম-জীয়ানো পরম অমৃতে তৃপ্তির সীমা নাই!

ভ্রমরকৃষ্ণ কেশীদের তুমি করেছো গর্ব্ব নাশ ঃ
দর্প তাদের চূর্ণ করেছে তব শ্বেত কেশ-কাশ।
দুধ্-ধব্-ধবে দাড়ি দেখে দাদু হিংসাতে জ্বলে বুক,—
সাধ হয় মনে আজই হই বুড়ো—পাই যদি একমুখ
তোমার মতন শ্মশ্রুগুম্ফ—চামেলি-চিকন-চুল—
রেশমের চেয়ে কোমল উজল—শাদা যেন যুঁইফুল!
চেয়ে তোমাপানে মনে হয় যেন তপোধন বাল্মিকী—
নব জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালেন এসে প্রথম কবিতা লিখি,
নয়ানে এখনো রয়েচে জড়ানো ক্রৌঞ্চ-বেদনা ছবি—
প্রথম-ছন্দ-সৃষ্টি-পুলকে চঞ্চল আদি কবি!

আজকে হঠাৎ বৈশাখী ভোরে তোমার কুটীর দ্বারে
বাহাত্তরের রথ এলো দেখে ভয়ে মরি একেবারে!
বেয়াড়া ও বুড়ো বাহাত্তুরেটা বন্ধুর বেশে এসে—
বুদ্ধি ভাঁড়ারে সিঁদ কেটে ফেরে চুপি চুপি সারা দেশে।

একেই আমরা ওর উৎপাতে জড়োসড়ো বারোমাস
তোমার ঘরে ও ঢোকে যদি এসে—তবেই সর্ব্বনাশ!
জমা আছে কবি তোমার কাছে যে আমাদের মূলধন—
ভাণ্ডারে তব চির-সঞ্চিত নিখিলের যৌবন!
কবিতার কশা কশাও সজোরে বাহাত্তরের পিঠে
পিঠ্-টান দিয়ে পালাক্ সে দূরে নিয়ে তার জরা-কীটে!

তিয়াত্তরেতে ত্রাস নেই কিছু, চুয়াত্তরে না ভয়,—
বাহাত্তুরেটা কাছে ঘেঁসে এলে বিশেষ শঙ্কা হয়।
দিওনা গো দাদু আমল আদপে তোমার দুয়ারে ওকে—
থেকো সাবধানে,—রেখো চোখে চোখে,—গোপনে যেন না ঢোকে!
আশীর বাঁশীটি বাজাবে আবার যেদিন সবার দ্বারে
পূব্-সাগরের ঢেউ দেবে দোলা পশ্চিম-পারাবারে।
অনাগত দিনে মুক্তবেণীতে মুক্তির জয়-গাথা—
তুমিই গাহিবে হে অমর কবি! ওগো চির ভয়ত্রাতা!
মহামানবের তীর্থে শুনিব অশ্রুত তব গান,—
স্বাস্থ্য সতেজ শতায়ু তোমারে বিধাতা করুন দান।

শিলঙ্
২৫ বৈশাখ ১৩৪০

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী



* আশারে-ইম্‌রাউল্‌ কায়েস্‌

২য় কিস্তি

শ্রীযুক্ত কাদের নওয়াজ এম্‌-এ, বি-টি

(আরব কবি ইম্‌রাউল্‌ ক্বায়েসের কবিতানুবাদ করার মত শক্ত কাজে হাত দিয়েছি আমি, বন্ধুদের অনুরোধে। তবে এক কথা—কবিতানুবাদে যদি অশ্লীলতা থাকে কিছু, সেজন্য আমি দুঃখিত নই কিন্তু, অবশ্য একথাও সত্যি এবং খুবই সত্যি যে কবিত্বও আছে "ইম্‌রাউলের" কবিতায় অসাধারণ। এই দুদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি' সাহিত্য-রসিকদের। ২য় কিস্তিতে 'বিচিত্রা'য় ক'টি উৎকৃষ্ট কবিতার অনুবাদ যাচ্ছে। আর এক কিস্তি হ'লেই শেষ হয়ে যাবে বোধ হয় সব অনুবাদ। তখন সুধী সমাজ সহজেই খতিয়ে দেখ্‌তে পার্‌বেন হিসাব ক'রে কবিত্বের ভাগ বেশী না সেরেফ্‌ "তারুণ্যই" বেশী এই কবিতাগুলিতে।)—লেখক

(১৭)

এ কবিতাটিতে কবি তাঁর প্রিয়তমা "ওনায়্‌জা"র উদ্দেশে ব'ল্‌চেন—

একদা সেই হৃদয়রাণী
সৈকতে হায় শপথ করি উপেক্ষা মোর ক'র্‌ল বাণী

(১৮)

হে ফতেমা (১) পরাণ প্রিয়ে
কটাক্ষ আর ভঙ্গী তোমার একটুখানিক্‌ দাও কমিয়ে,
একান্ত হায় আমার থেকে,
ছাড়াছাড়ি চাও যদি আজ সেই দিকেতেই দৃষ্টি রেখে,
দাও এ ব্যাপার সাঙ্গ করি'
ভালোয়্‌ ভালোয়্‌ হে সুন্দরি!

(১৯)

আদেশ তব করছি পালন
দিবস-যামী,
প্রেম যদি না পাই গো তোমার
ম'র্‌ব আমি।
তাই বুঝি আজ দেখ্‌ছি হৃদে
আমায় স্মরি,
গর্ব্ব এতই পোষণ কর
হে সুন্দরি!

(২০)

হায়গো বে-দিল্‌ (২) সুন্দরী মোর
এখন থেকে মোর ব্যবহার খারাপ লাগে যদিই বা তোর;
চুরি করা আমারি মন—
কৃপা করি ফিরিয়ে দিলেই ছাড়াছাড়ি ঘট্‌বে তখন।

(২১)

ছলা-কলার কান্না তোমার
জানি প্রিয়ে কারণটি তার;
দারুণ তব বিচ্ছেদে মোর দগ্ধ ক্ষত এই যে পরাণ,
তারেই তুমি বিঁধ্‌তে চাহ হানি তোমার কটাক্ষবাণ।

(২২)

রূপ্‌ কুমারী সুন্দরী দল
যাদের তাঁবুর কাছটি দিয়েও হয়নি কভু লোক-চলাচল্‌
অবাধে রোজ্‌ তাদের সনে
ব্যঙ্গ করি' বহুক্ষণই ল'ভেছিলাম রভস মনে।

(১) ফতেমা—কবিপ্রিয়া "ওনায়্‌জা"র আর একটি নাম।

(২) বেদিল্‌—হৃদয়হীনা

* আশার—কবিতাবলী

(২৩)

পরীর মতই রূপসী সব—
যাদের শিবির প্রহরীদের চীৎকারেতে নিত্য স-রব্ ;
দেখ্‌লে সেথা আমায় তারা
অনায়াসেই কাটবে জানি খর তাদের অসির দ্বারা
তবু দিয়ে চক্ষে ধুলা
গেছি আমি মোর প্রেয়সীর কাছেই ওগো রাত্রি বেলা।

(২৪)

গিয়েই দেখি দিল্ পিয়ারী—
পরি সেরেফ্ রাতের বসন আর সকলি' বসন ছাড়ি
দাঁড়িয়ে আছে পর্দা-পাশে
আমারি যে আসার আশে।

পরের কবিতায় কবি বল্‌তে চান্ যে তিনি প্রিয়ার সাথে অভিসারে চ'লেছেন। প্রিয়ার উত্তরীয় লুটিয়ে চ'লেছে পথের ধুলায়। সেই চাদরটি মুছে দিয়ে চ'লেছে কবি ও কবি-প্রিয়ার পদ-চিহ্ন, পাছে টের পায় কেউ তাঁরা কোন্ পথে গিয়েছেন।

(২৫)

তক্ষুণি মোর পিয়ার সাথে—
বেরিয়ে এলাম ঘরের থেকে তারায় ঘেরা সেই সে রাতে ;
চ'ল্লে মোরা পথের ধুলায়,
মুছ্‌ল পদ-চিহ্ন পীতম্ লুটানো তার উত্তরী' যায়।
দেখ্‌নু চেয়ে উত্তরী 'পর
উটের পিঠের পালানগুলার চিত্র আঁকা রয় মনোহর।

(২৬)

এইরূপে এক বালুচরে,
লোকালয়ের পেরিয়ে সীমা এলাম দোঁহে বিহার তরে।

(২৭)

তারপরে সেই বালুপরি
যেম্‌নি ব'সে টান্ দিয়েছি পিয়ার দু'টি জুল্‌ফী ধরি'
অম্‌নি পিয়া আমার কোলে,
সোহাগ ভরে প'ড়্‌ল্ ঢ'লে।

পরের কবিতাটিতে কবি তাঁর কবি-প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করচেন। আরবী অভিজ্ঞেরা কবিতাটির ছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌বেন যথা—মফ্‌তা আলুন মফ্‌তা আলুন ইত্যাদি—

(২৮)

ব'ল্‌ব কি আর,
তন্বী পিয়ার
বর্ণ উজল,
কাঁকাল্ ক্ষীণ,
আর্শি সম
স্বচ্ছতম
বুকটি উজল
রাত্রিদিন।
মাংসে ফুলি'
পেট্‌টি ঝুলি'
হয়না শিথিল্
রয় নবীন।

(২৯)

এই কবিতাটিতে কবি তাঁর কবি-প্রিয়ার দেহের বর্ণের বিষয়ই বর্ণনা ক'র্‌চেন, পাশ্চাত্য কবি শেলির মত "Complezion brilliant in pink and white" বলেন নি, তিনি বল্‌চেন—

(ছন্দটি লক্ষ্য করুন—"মফ্‌তা আলুন্ মফ্‌তা আলুন"।)

ব'ল্‌ব কি আর
রঙের বাহার
মোর সে পিয়ার।
নির্ম্মল জল
তার ভিতরেই
রয় গো যেমন
মুক্তা অমল
তেম্‌নি ধবল্
রংটি উজল্
মোর সে পিয়ার।

আর সেই শ্বেত্‌
বর্ণ মাঝে
হরিৎ আভাই
ঈষৎ রাজে
হয় নাক' তুল্‌
সেই সুষমার—
মোর সে পিয়ার।

(৩০)

অভিমানের ভরে পীতম্‌
কখনও মোর দিক্‌টা হতে
লয় ফিরিয়ে মুখটি তাহার
কিন্তু আমার নয়ন পথে—
পড়ে তাহার লাল-গোলাপী
গালের খানিক অংশটি যে
তারপরে সে মোর পানেতেই
আবেগ ভরে তাকায় নিজে।
ঠিক্‌ মনে হয় "ওজ্‌রা" দেশের
হরিণী তার শাবক পানে
চাইছে করুণ দৃষ্টি মেলি'
মমতাময় আকুল প্রাণে।

(৩১)

শ্বেত হরিণীর গ্রীবার মতই মোর প্রেয়সীর সুঠাম গ্রীবা,
ঊর্দ্ধে তুলি' সেই গ্রীবা সে ছড়ায় রূপের দিব্য বিভা ;
শ্বেত হরিণীর গ্রীবার চেয়েও ঢের বেশী সেই গ্রীবার শোভা,
নয় অযথা দীর্ঘ যে তায়, রয় আভরণ মানস-লোভা।

(৩২)

কবি এস্থলে কবি-প্রিয়ার চুলের শোভা বর্ণনা ক'রচেন। পাশ্চাত্য কবির মত "Hair like a poet's dream" বলেননি'—

সাপের মতই বক্র এবং কোয়েল কালো দীর্ঘ অলক্‌
ছড়িয়ে পিঠে, প্রেমিকগণে দেখায় পিয়া রূপের ঝলক্‌।

(৩৩)

এই কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়ার চুল্‌ বাঁধার বিষয় বর্ণনা ক'রচেন—

তিন্‌ রকমেই চিকুর তাহার,
বদ্ধ রহে মোর সে পিয়ার।
উঁচু করি' কবরীতে,
রয় বাঁধা কেশ দিল্‌ হরিতে ;
কখনও বা মুক্ত চিকুর
লুটায় পিঠে অবিরত ;
কভু আবার বিউনি করি'
রয় বাঁধা কেশ বেণীর মত।
এইরূপে তার কবরীখান্‌
ঢেকে আছে বেণী এবং আলুলিত কুন্তল্‌ দাম।

(৩৪)

এস্থলে কবি তাঁর প্রিয়ার আঙুলের শোভা বর্ণনা ক'রচেন—

কোমল-কচি আঙুল দিয়ে—
তাহার যত দ্রব্য পীতম্‌ পরশ করে নিতুই গিয়ে,
দীর্ঘ তাহার আঙুল সকল
"জাবি" (৩) দেশের "আসার্‌" (৪) কীটের মতই
কোমল শুভ্র ধবল
আর সেই শ্বেত আঙুলগুলি
"আসার্‌" কীটের মাথার মতই একটু লোহিত ডালিম্‌ ফুলী ;
অথবা সব অঙ্গুলি তার
(৫) "এসীল্‌" গাছের দাঁতন্‌ সমই সুন্দর ও সরল আকার।

(৩) জাবি—একটি দেশের নাম। (৪) আসার—এক প্রকার কীট, তার দেহ কোমল ও শ্বেত কিন্তু মাথাটি রক্তবর্ণ। (৫) এক প্রকার সরল রেখার মত গাছ, নাম—"এসীল্‌"

কাদের নওয়াজ

"স্নেহ ভালবাসা"

শ্রীনলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নামজাদা ডাক্তার সে। অস্ত্রচিকিৎসায় তার নৈপুণ্য অসাধারণ।

মানুষের মনের উপর দেহের প্রভাব কি ভাবে এবং কতখানি পড়ে তারই অনুসন্ধান করা হচ্ছে তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

অনেক দুরারোগ্য স্নায়বিক ব্যাধি সে সারিয়েছে স্নায়ুর ওপর অস্ত্রোপচার কোরে।

বিশেষ বিশেষ স্নায়ুর ওপর ছুরি চালিয়ে স্নায়ু কেটে ছোটো কোরে এবং কখন' বা কেটে বাদ দিয়ে সে সারিয়েছে অনেক ভূতের-ভয়-পাওয়া মন, বজ্রাঘাতের আওয়াজে ভয় পাওয়া মন।

ক্রমে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে এই দেহই মনকে চালিত করে। মনের সকল প্রকার গতির নিয়ন্তা হচ্ছে দেহের স্নায়ু। দেহের বিভিন্ন স্নায়ুর গতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে মনের বিভিন্ন গতি বা বিকাশের তারতম্য। মনের অন্যান্য গতি বা বিকাশের মতন, 'স্নেহ ভালবাসা' হচ্ছে মনের একটি গতি বা বিকাশ এবং তারও জন্মদাতা এবং নিয়ন্তা হচ্ছে দেহের স্নায়ু বিশেষ। 'স্নেহ ভালবাসা' মনের একপ্রকার ব্যাধি বা বিকাশ এবং তাকে সারান যায় দেহের বিশেষ স্নায়ুর ওপর বিশেষ ভাবে অস্ত্রোপচার ক'রে।

কিন্তু শরীরের কোন্ স্নায়ুর সঙ্গে 'স্নেহ ভালবাসা' জড়িয়ে আছে?—মানুষের দেহ চিরে চিরে ডাক্তার দিনরাত তার সন্ধান করতে চায়। কিন্তু জীবিত দেহ সে পায় না। কারণ, ডাক্তারের কাছে স্নায়বিক রোগ সারাতে যারা আসে তাদের মধ্যে এমন কেউ আসেনা যারা মানতে রাজি হয় যে 'স্নেহ ভালবাসা' একটি স্নায়বিক বিকাশ বা রোগ বিশেষ এবং উপযুক্ত অস্ত্রচিকিৎসায় তা সারান যায়।

কিন্তু ডাক্তার?—ডাক্তারের দেহ চাই তার সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করতে। জীবিত দেহ না পাওয়া যায়,—মৃতদেহ!—মৃতদেহের তো অভাব নেই!

অর্থ এবং প্রতিষ্ঠা দুই ডাক্তারের আছে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। কাজেই তার পরীক্ষার জন্যে মৃতদেহের কোনই অভাব হয় না। সরকারী শবাগার (Morgue) থেকে সে মড়া নিয়ে আসে এবং মৃতদেহ তন্নতন্ন কোরে চিরে দেখে 'স্নেহ ভালবাসা' দেহের কোন্ স্নায়ুর সঙ্গে কি ভাবে জড়িয়ে আছে।

কিন্তু শবাগার থেকে যে সব মড়া পাওয়া যায় সেগুলো প্রায়ই হয় পচ্ ধরা। তা থেকে প্রাণবায়ু অনেক আগেই বার হ'য়ে গেছে। তা দিয়ে ডাক্তারের পরীক্ষা কার্য্য ভালো চলে না…

ডাক্তারের টাট্‌কা মড়া চাই। হাওয়া লেগে যে সব মড়া পচ্ ধ'রতে আরম্ভ করেনি এমন মড়া চাই।—সদ্য সমাহিত কবর থেকে তুলে আনা টাট্‌কা মড়া।

শয়তান যোগায় তাকে মৃতদেহ। ডাক্তার কারুর সঙ্গে মেশেনা—এক শুধু তার শয়তানটি ছাড়া। সে হচ্ছে সহরের নামজাদা বদমাইসদের সর্দ্দার। শয়তান নামটি তার উপযুক্ত শিষ্যেরা তাকে আদর কোরে দিয়েছে এবং সেই নামেই সে সবার কাছে পরিচিত। কবর থেকে মড়া তুলে এনে সে ডাক্তারকে যোগায়। মোটা একটি থোলের কোরে কবর থেকে মড়া বহন করে এনে ডাক্তারের শবচ্ছেদের টেবিলের কাছে থোলেটি ফেলে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে সে বসে এবং ব'সে ডাক্তারের বোতল থেকে খুব কড়া মদ জল না মিশিয়ে সে খেতে থাকে। ডাক্তার থোলে থেকে মৃতদেহটি তুলে ঠিক কোরে টেবিলে শোয়াতে শোয়াতে তার সঙ্গে নিজের গবেষণা সম্বন্ধে কথা বলতে থাকে।

শয়তান ডাক্তারের কথা বড় কিছু বোঝে না। শুধু ডাক্তারের বোতোল থেকে মদ খাবার মাঝে মাঝে—হুঁ, হুঁ,—কোরে এমন ভাব দেখায় যেন সে কত বুঝ্‌ছে। ডাক্তার তার গবেষণা সম্বন্ধে কথা শোনবার বিশ্বাসযোগ্য শ্রোতা পেয়ে কথা বলার আনন্দে বিভোর হ'য়ে ওঠে। শ্রোতা শুন্‌ছে কি বুঝ্‌ছে সেদিকে তখন তার লক্ষ্য মোটেই থাকে না,—শ্রোতা এখন কথা বলার উপলক্ষ্য মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। তারপর ডাক্তার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে মড়া চির্‌তে আরম্ভ করে। শয়তান তখন আস্তে আস্তে উঠে যায়।

'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ু সে মানুষের দেহ খুঁজে বার কর্‌বেই। কবর থেকে তুলে আনা মড়া চিরে চিরে ডাক্তার 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ু খোঁজে। কিন্তু কবর থেকে তুলে আনা দেহ বড়ই ঠাণ্ডা—একেবারে উত্তাপহীন। তন্দ্রায় ডাক্তার স্বপ্ন দেখে যেন ডাক্তারের চোখ দুটো উল্কার মত' আগুন ছড়াতে ছড়াতে ছুরি হাতে কোরে কবর থেকে তুলে আনা দেহের ভেতর 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ুর সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার আগুন-মাখা চোখ আর নিষ্ঠুর ছুরির ভয়ে 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ুগুলি যেন আতঙ্কে শিউরে উঠে দেহের অন্যান্য অসংখ্য স্নায়ুর ভেতর মুখ লুকোচ্ছে। ডাক্তার রেগে সেগুলোকে মুঠোর মধ্যে ধরে টেনে তোলে। মুঠোর মধ্যে আসে দেহের অন্যান্য অসংখ্য স্নায়ু—ঠাণ্ডা দেহের মত' ঠাণ্ডা, হিম, অসাড়!—তার মধ্যে 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ু চিনে বার করা যায় না। রেগে ডাক্তার মৃতদেহের গলাটিপে ধরে। শবদেহ যদি একটু কম ঠাণ্ডা হ'ত!—দেহের উত্তাপের ক্ষীণ রেশ যদি একটুও থাক্‌ত! আচ্ছা, টাট্‌কা মড়া পাওয়া যায় না?—এই দুএক ঘণ্টার মধ্যেই যার দেহ ছেড়ে প্রাণ চলে গেছে কিন্তু দেহ ছেড়ে দেহের উত্তাপ একেবারে চলে যায় নি?…এই যে শয়তান? আজ এতো দেরী?

শয়তান তার মোটা ভারী থোলেটি ধড়াস কোরে ডাক্তারের টেবিলের কাছে ফেলে তারপর দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে, ডাক্তারের বোতল থেকে কড়া মদ বোতলে মুখ দিয়ে গেল্‌বার মাঝে মাঝে বলে "টাট্‌কা কবর। গোর দিয়ে যে-যার বাড়ী চোলে গেল। বুড়ী মা-টা আর ওঠে না। রাত বাড়্‌তে লাগ্‌ল। বুড়ীর ওঠ্‌বার নাম নেই। হাঁটু গেড়ে বোসে। চোখে এক ফোঁটাও জল নেই,—যেন পাষাণ মূর্তি। ভাবলুম দিই বুড়ীটাকে ছেলের সঙ্গে কবরে শুইয়ে। অনেক রাতে উঠল। তারপরে এই কবর ঘেঁটে…

"যাক্, তোমাকে আর কবর ঘাঁট্‌তে হবে না শয়তান। কবর থেকে আনা দেহ বড্ডই হিম, বড্ডই ঠাণ্ডা। তাতে 'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ুর কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় না। আরও টাট্‌কা দেহ চাই। যে-দেহের স্নায়ুর গা থেকে শিরা উপশিরা রক্ত চলাচলের গতির উত্তাপ একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়নি।...স্বাভাবিকভাবে মরণে, 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ুগুলো দেহ ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ঠাণ্ডা হবার সময় পায়। কিন্তু যে দেহ থেকে প্রাণ অকস্মাৎ চলে গেছে,—আচ্‌মকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে—অথচ 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ুগুলো ঠাণ্ডা হবার সময় পায়নি,—এমন দেহ, এমন দেহ চাই—বুঝলে?"

ডাক্তারের কথার মানের মারপ্যাচ খুব ভালো করে না-বুঝলেও ডাক্তারের কথার উদ্দেশ্য আর ডাক্তারের টাকা শয়তান বেশ ভাল করেই বোঝে। তার লোহার মতো শক্ত হাতের ডাণ্ডার ঘায়ে মানুষ মেরে তার মোটা থোলেয় পুরে দেহটি ডাক্তারের টেবিলের কাছে ফেলে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে ব'সে ডাক্তারের বোতলের মুখে মুখ লাগিয়ে সে মদ খায়। আজকাল যেন একটু বেশীই খায়। থোলেটি ডাক্তারের টেবিলের কাছে ফেলবার সময় আজকাল যেন তার হাতও একটু কাঁপে। তার এ দুর্বলতা টুকু ডাক্তার লক্ষ্য করে। ডাক্তার কিন্তু—স্থির, অচঞ্চল! ডাক্তার তার নিয়মিত মদের মাত্রা একটুও বাড়ায় না। সদ্যমারা রক্তমাখা মড়া চেরবার সময় ডাক্তারের হাত একটুও কাঁপে না। ডাক্তার যেন পুরাকালের কোন্ নিষ্ঠুর সাধক।—'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ু খুঁজে বার করাই তার সাধনা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের রক্তে স্নান কোরেও সে মানুষের দেহের 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ু খুঁজে বার করবে! ছুরি হাতে দিনের পর দিন সদ্যমারা রক্তমাখা দেহ চিরে চিরে ডাক্তার পাগলের মতো খোঁজে 'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ু……

পেয়েছে—পেয়েছে—'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ুর সাড়া

সে এবার পেয়েছে!—ডাক্তারের নিষ্ঠুর ছুরির আঘাতে মৃতদেহ যেন ব্যথিত হ'য়ে তার দেহের 'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ুর সন্ধান ডাক্তারকে দিয়েছে···

থোলে কাঁধে ফেলে শয়তান ঘরে ঢোকে।

—"পেয়েছি, পেয়েছি!" যুগব্যাপী তপস্যায় সিদ্ধকাম যোগীর মত' বিস্ময়পুলকে ডাক্তার ব'লে ওঠে—"পেয়েছি, পেয়েছি!"

তারপর ছুটে গিয়ে শয়তানের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে "পেয়েছি, পেয়েছি—'স্নেহ ভালবাসার', স্নায়ুর সাড়া এবার আমি পেয়েছি!

—মানুষের মাথার খুলীর নীচে কিম্বা বুকের স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে সে লুকিয়ে আছে!···কিন্তু কোথায়? খুলীর নীচে, না বুকের তলে?···বড্ড বেশী রক্তক্ষয় হয়, তোমার আনা এ-দেহগুলো থেকে, তাই ঠিক ধর্‌তে পাচ্চিনে কোথায়?—কোথায় লুকিয়ে আছে 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ু—খুলীর নীচে, না বুকের তলে।···পাবো, পাবো, হাঁ, এবার আমি ঠিক সন্ধান পাবো,—এবার তুমি মৃতদেহ এনো রক্তপাত না-কোরে—আন্‌বে রক্তেভরা টাট্‌কা তাজা দেহ—গলায় ফাঁস আট্‌কে মেরে—বুঝ্‌লে?"

তারপর শয়তান চলে যায়। আসে থোলেয় ভরে গলায় ফাঁস আট্‌কে মারা টাট্‌কা তাজা দেহ নিয়ে। তারপর কাঁধের থোলেটি ডাক্তারের টেবিলের কাছে ফেলে। ফেলবার সময় এবার তার হাত যেন একটু বেশী কাঁপে। ডাক্তার তা লক্ষ্য করে।

হঠাৎ তার হাত চেপে ধ'রে ডাক্তার চেঁচিয়ে ওঠে—শয়তান! আমি কি নিষ্ঠুর? না, না—, আমি মরমী!—আমি দরদী! ব্যথায় আমার বুকভরা—না-জানার ব্যথায়, 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুর সন্ধান না-জানার ব্যথায়!...না জেনেই তো আমরা নিষ্ঠুর হই। বসন্ত রোগের চিকিৎসা জান্‌বার আগে কতো অসংখ্য প্রাণ আমরা মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছি। ক্লোরোফর্ম্মের সন্ধান জান্‌বার আগে অস্ত্রোপচারের অভাবে কতো অসংখ্য প্রাণ আমরা নষ্ট করেছি। আমি জান্‌তে চাই, আমি জান্‌তে চাই 'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ু কোথায় আছে!......দেশজয়ের নামে, মুষ্টিমেয় মানুষের সুবিধার নামে লোকে লক্ষলক্ষ প্রাণ পশুর মত হ'ত্যা করে—হত্যা ক'রে বাহোবা পায়। আর আমি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ু জানার যজ্ঞবেদীতলে দুচারটে প্রাণ যদি বলি দিই—তবে কি আমি নিষ্ঠুর?···'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুর সন্ধান জান্‌লে শাস্তির সময় আমরা স্নেহহীন ভাইয়ের শরীরে, মমতাহীন ধনীর অঙ্গে, নির্দ্দয় খুনীর দেহে 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ু সতেজ করে দিয়ে লোকালয় শান্তিময় কোরে তুল্‌তে পার্‌ব। চাও তো যুদ্ধের সময় দেশের লোকের 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ু কিছুকালের জন্যে শক্তিহীন কোরে দিতে পার। তাহোলে মা ছেলে, স্বামী-স্ত্রী যুদ্ধে বিদায় নিতে কোনো ব্যথা পাবে না। শত্রুপক্ষের শিশু, রুগ্ন, অসহায়দের হত্যা কর্‌তে কোথাও বাধ্‌বে না···কিন্তু জানা চাই, আগে জানা চাই 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুর সন্ধান, স্নেহভালবাসার কারণ—তবেই তো আমরা নিষ্ঠুরতার কারণ জান্‌তে পারব, পৃথিবীব্যাপী অকারণ নিষ্ঠুরতা দূর কোর্‌তে পার্‌ব! আমরাই তো এই অজানা সৃষ্টিরহস্যের পরদার পর পরদা ছিঁড়ে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকা সার্থক কোরে তুলি,—নইলে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় কি?···আমি এ রহস্য খুঁজে বার করব—বার করব কোথায় লুকিয়ে আছে 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ু,—খুলীর নীচে, না বুকের তলে—আমি জান্‌ব, আমি জান্‌ব!... আমার এই জানায়-যুদ্ধের তারিফ পৃথিবীর আর কেউ না-করুক, তুমি অন্ততঃ করবে শয়তান!"

তারিফ করুক আর না-করুক, সে কিন্তু ডাক্তারকে মৃতদেহ ঠিক যোগায়—টাট্‌কা, তাজা, গলায় ফাঁস আট্‌কে মারা দেহ। তাজা দেহের রক্তে স্নান কোরে কোরে ডাক্তারের ছুরি যেন ক্লান্ত হোয়ে ওঠে—ডাক্তারের কিন্তু ক্লান্তি নেই! ডাক্তার দেহ চেয়ে আর চেয়ে। বুকের তলে আর খুলীর নীচে ছুরি চালাবার সময় ডাক্তারের হাতে যেন কিসের ঠাণ্ডা পরশ লাগে! এ্যাঁ, ঠাণ্ডা পরশ! এ যে 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুর পরশ—তাই ঠাণ্ডা! ধরবে, এবার ডাক্তার ঠিক ধর্‌বে। ধর্‌তে যায় কিন্তু ঠিক ধর্‌তে পারে না। বুকের স্নায়ুগুলোকে যখন চেপে ধরে, ঠাণ্ডা

পরশটি যেন মাথার খুলীর নীচে চ'লে যায়। মাথার খুলীর নীচের স্নায়ুগুলোকে যখন চেপে ধরে, 'ঠাণ্ডা পরশটি যেন বুকের তলে সরে যায়। বুক আর খুলীর নীচের স্নায়ুগুলোকে যখন ডাক্তার এক সঙ্গে দুহাতে চেপে ধরে, ঠাণ্ডা পরশটির সাড়া' তখন বড়ই ক্ষীণ হয়ে আসে। আর একটু সতেজ, ঠাণ্ডা পরশটি আর একটু জোরালো, দেহের 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুগুলো আর একটু উদ্দাম, দেহটি যদি যৌবনভরা হোতো!—

শয়তানের ডাক পড়ে। ডাক্তারের সামনে এসে সে দাঁড়ায়।

—"কম বয়সের দেহ, সংসারের ঘা খেয়ে যে-দেহের 'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুগুলো 'ক্ষীণ হোয়ে যায়নি,—উদ্দাম যৌবনভরা টাট্‌কা তাজা দেহ চাই বুঝলে?"—

শয়তান চলে যায়।

'স্নেহভালবাসা'র স্নায়ুর ঠাণ্ডা পরশ আজ তার হাতে এসে লেগেছে! পাবে, পাবে, 'স্নেহভালবাসার' স্নায়ুর সন্ধান আজ সে পাবে! আজ ডাক্তার সিদ্ধকাম হবে। জগতে আজ নবযুগ আস্‌বে। জগতের কতো লোক তার জান্‌লার নীচে ভিড় কোরে দাঁড়াবে নবযুগের অগ্রদূতকে অভিনন্দিত করতে!

অনেকদিন পরে ডাক্তার আজ তার ঘরের রুদ্ধ বাতায়ন মুক্ত কোরে দিলে। ক্ষণতরে ডাক্তার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আকাশে তারার চোখ ছলছল্ করতে লাগ্‌ল। আকাশের গায়ে জড়ান নীল আঁচলের ঠাণ্ডা হাওয়া ডাক্তারের সারাদেহে 'স্নেহ ভালবাসা'র পরশ বুলাতে লাগ্‌ল!

আজ ডাক্তার সিদ্ধকাম হবে। পাবে, পাবে, 'স্নেহ-ভালবাসা'র স্নায়ুর সন্ধান আজ সে পাবে!…

কিন্তু শয়তান?—সে এখনও আস্‌ছে না কেন'?

ঐ যে আস্‌ছে!

কাঁধে থোলে।

উঃ, কী জোরে হাঁট্‌চে সে!

ডান হাতে ছুরি ধোরে টেবিলের ধারে ডাক্তার শয়তানের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল। অসহনীয় পুলকে তার সারাদেহ কাঁপ্‌চে। আজ সে 'স্নেহ ভালবাসা'র স্নায়ুর সন্ধান পাবে!

আজ শয়তানও যেন ডাক্তারের উৎকণ্ঠায় যোগ দিয়েছে, তাই সে-আজ' নিজের হাতে যৌবনভরা টাট্‌কা তাজা দেহটিকে থোলে থেকে বার ক'রে ডাক্তারের টেবিলের ওপর শুইয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের হাতের ছুরি দেহটিকে চিরে চিরে চল্‌তে লাগ্‌লো…

একটা চাপা গোঙানি!

দেহটা যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল!

টেবিলে-শোয়ানো দেহের হাতটা যেন ডাক্তারের ছুরি-ধরা হাতে এসে ঠেক্‌ল'—হিম, ঠাণ্ডা পরশ!

চমকে উঠে ডাক্তার টেবিলে-শোয়ান দেহটার পানে তাকালে। তারপর ঝুঁকে পোড়ে টেবিলে-শোয়ান দেহটার মুখের পানে ভালো কোরে তাকালে। তারপর ছোটো একটি মুহূর্ত্ত পার হ'তে না হ'তেই ডাক্তার ছিলেকাটা ধনুকের মত' সোজা হোয়ে দাঁড়াল। ছোটো একটি মুহূর্ত্ত!—কিন্তু সেই ছোটো মুহূর্ত্তটুকুর মধ্যে ডাক্তারের মনে হোলো কে যেন তার শরীরের সমস্ত শিরা, উপশিরা, হাড়, মাংস, স্নায়ুগুলোকে দুমড়ে, মুচ্‌ড়ে, পাকিয়ে তাকে পৃথিবী পার কোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—লক্ষ লক্ষ গ্রহ উপগ্রহের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে যন্ত্রণায় ব্যথায় অসাড় হ'য়ে তার সারা দেহ যেন পাষাণ হ'য়ে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ান শয়তানের অট্টহাসির আওয়াজে ঘর যেন ফেটে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

কী অমানুষিক সে হাসি!

ডান হাতে ছুরির হাতল আর বাঁহাতে ছুরির ফলা মুঠো কোরে ধরে পাষাণ মূর্ত্তির মতো ডাক্তার দাঁড়িয়ে—স্থির, অচঞ্চল! শুধু তার আঙ্গুল কেটে টস্‌টস্ কোরে ঝরা রক্ত জানিয়ে দিচ্ছিল যে সে মানুষ!

শয়তান তার পৈশাচিক হাসির মাঝে মাঝে দম টেনে টেনে বল্‌তে লাগ্‌ল—গলায়-ফাঁস-আটকে-মারা ছেলেটাকে থোলেয় পুরবার সময় একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এলো।

ছেলেটার মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম সে আমার ছেলে! তখন তোমার ছেলের কথা মনে পড়্‌ল। আমার ছেলেটাকে সেখানে ফেলে দিলুম—তখনও তার গোঁঙানির আওয়াজ থামেনি। তারপর তোমার ছেলেকে গলা টিপে আনলুম থোলেয় ভোরে—উদ্দাম যৌবনভঁরা টাট্‌কা তাজা জীবিত দেহ ডাক্তার—ঐ যে ঐ টেবিলে শুয়ে হাঃ হাঃ হাঃ—

কী নিষ্ঠুর সে হাসি!

ডাক্তার স্থির অচঞ্চল! শুধু তার বাঁহাতের আঙুলগুলো মুঠোর চাপে কেটে ছুরির ফলার গায়ে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল। ডাক্তার তা টেরও পেলে না!

—"হাঃ, হাঃ, হাঃ 'স্নেহ ভালবাসার' স্নায়ু মাথার খুলীর নীচে নেই ডাক্তার" বোলে শয়তান তার লোহার মতো শক্ত হাতের লোহার ডাণ্ডা মেরে ডাক্তারের মাথার খুলী চুফাঁক কোরে দিলে। ডাক্তারের দেহ একবার দুলে উঠ্‌ল—সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের হাতের ছুরি শয়তানের বুকে আমূল সেঁধিয়ে গেল।

—"ঠিক্ ডাক্তার ঠিক্—'স্নেহভালবাসার' স্নায়ু বুকের তলেও নেই……'স্নেহভালবাসার স্নায়ু' মানুষের শরীরে কোথাও নেই ডাক্তার হাঃ হাঃ হাঃ…

শয়তানের হাসি আর থামে না।.

শয়তানের সেই অট্টহাসি ডাক্তারের চারিপাশে বাতাসের গায়ে আছাড় খেতে লাগ্‌ল।

কী করুণ সে হাসি!

পৃথিবীর সমস্ত কান্না যেন সে অট্টহাসির ভিতর দিয়ে ঝ'রে পড়ে মরণের কোলে-শোওয়া পুত্রহন্তা স্নেহাতুর দুটি পিতার বুকে 'স্নেহ ভালবাসার' পরশ বুলাতে লাগ্‌ল!

নলিনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশ আন্দোলনে

(**Arthur Symons**)

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

কাশের চামর কাঁপে, ওঠে দীর্ঘশ্বাস,
ধূসর সরসী আর শ্যাম তট হতে,
দীর্ঘ তৃণ আন্দোলিয়া সমুদ্র বাতাস,
তুলিছে হুতাশ শৈলে, দূর সিন্ধু পথে॥
কাশের চামর কাঁপে, বিলাপ বেদনা,
অনেক দিবস বাহি, বহু রাত্রি ধরে',
মরাল মানস গামী, চলেছে উন্মনা,
নীলকণ্ঠ আর্ত্ত গাহি, ওঠে আর পড়ে॥
কাশের চামর শ্বসি ওঠে বার বার,
তপ্ত মধ্য দিনে আর স্নিগ্ধ গোধূলিতে,
সে কোন্ কল্পিত স্বপ্ন আজিকে আবার,
জাগিয়া ব্যাকুল হৃদে, কি চাহে বলিতে?
কাশের চামর কহে শ্রান্ত মরমরে,
হায় ব্যর্থ জীবনের বিফল স্বপন,
লুপ্ত শান্তি, স্মৃতি যার পড়েছিল ঝরে',
এ বুকে ফিরিতে সে কি করিছে রোদন?

বরোদার গ্রন্থাগার

শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্য (Native State) সমূহের মধ্যে বড়োদা যে একটি প্রধান উন্নতিশীল রাজ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বরোদাতে মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের মত বিশ্ব-বিদ্যালয় না থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারে এই রাজ্য অগ্রগণ্য। বস্তুতঃ, শিক্ষা যে সকল উন্নতির মূল ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া গাইকোয়ার বাহাদুর তাঁহার প্রজাদিগের শিক্ষার জন্য যে-সব অভিনব ও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতের আদর্শস্থল। তাঁহার অনুসৃত নীতির ফলে বড়োদা হইতে নিরক্ষরতা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে এবং শিক্ষার দ্রুত প্রচার হইতেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৩ খৃঃ) তিনি নিজ রাজ্যের একটি জিলাতে আবশ্যক শিক্ষার (Cmopulsory education) প্রবর্ত্তন করেন এবং পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৯০৭ খৃঃ) বড়োদার সর্ব্বত্র ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে বরোদার আর এক বিশেষত্ব উহার গ্রন্থাগার বিভাগ ও তাহার অধীন গ্রন্থাগার সমূহ। এই দুই বিষয়েই গাইকোয়ার বাহাদুর সমগ্র ভারতের পথ-প্রদর্শক।

শিক্ষা-প্রচারে গ্রন্থাগারের স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে বেশী লেখা বাহুল্য। বর্ত্তমান জগতে গ্রন্থাগার কেবল সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির অবসরক্ষেপণ ও চিত্তবিনোদনের স্থান নহে; ইহা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ভাল লাইব্রেরীকে আমরা বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইলে আমাদের জ্ঞান পূর্ণতর করিতে হইলে ভাল লাইব্রেরীর সাহায্য না নিলে চলে না। আবার যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ পান নাই বা ঐ শিক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই তাঁহারাও লাইব্রেরীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর জ্ঞানলাভ ও মানসিক উন্নতি বিধান করিতে পারেন। এস্থানে ধনী দরিদ্র, উচ্চশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত, ডিগ্রিধারী ও ডিগ্রিহীন সকলেরই সমান অধিকার। পাব্লিক লাইব্রেরী সকলের সম্মুখে নির্ব্বিচারে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া ধরে। বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী গিবন্, জনসন্ প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ না করিয়াও গ্রন্থালয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। স্কুল কলেজের শিক্ষায় বহুদূর অগ্রসর না হইয়াও গ্রন্থালয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিয়া দেশে গণ্যমান্য হইয়াছেন, এরূপ লোকের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও একেবারে বিরল নহে। সুতরাং লাইব্রেরী স্থাপন লোকশিক্ষার ও জ্ঞান বিবর্দ্ধনের প্রকৃষ্ট উপায়। গাইকোয়াড় বাহাদুর বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবর্গ নিজ নিজ রাজ্যে লাইব্রেরী স্থাপন করিতেছেন; ব্রিটিশ ভারতেও স্থানে স্থানে লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিতেছে এবং লাইব্রেরী আন্দোলন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাইকোয়াড় বাহাদুর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্যে আবশ্যক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার সংকল্প ছিল যে এই উপায়ে প্রজাদের অজ্ঞতা দূর করিবেন; কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে কেবল প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করিলেই নিরক্ষরতা দূর ও শিক্ষার প্রচার হইবে না। স্কুল ছাড়িবার পরও বিদ্যার্থীদের লেখাপড়া করিবার সুবিধা থাকা দরকার; নতুবা তাহারা অধীত বিষয় ভুলিয়া যায়, তাহাদের শিখিবার ইচ্ছা শিথিল হইয়া যায় এবং ফলে তাহাদের জ্ঞান প্রসার লাভ করিতে পারে না। এইরূপে শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ না হইয়া যায়, সেই

উদ্দেশ্যে গাইকোয়ার বাহাদুর রাজ্যের সর্ব্বত্র লাইব্রেরী স্থাপনের সংকল্প করেন।

১৯১০ খৃঃ বড়োদারাজ আমেরিকায় ভ্রমণ করিতে যান। লাইব্রেরী স্থাপনে ও লাইব্রেরী পরিচালনায় আমেরিকা সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানীয়। তথাকার লাইব্রেরী সমূহের ব্যবস্থা দেখিয়া এবং তাহাদের অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সংকল্প দৃঢ় হয়। ঐ বৎসরই তিনি লাইব্রেরী পরিচালনায় অভিজ্ঞ মিঃ বর্ডেন নামক জনৈক আমেরিকাবাসীকে তাঁহার রাজ্যের লাইব্রেরী বিভাগের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত করেন। বরোদারাজ্যে ১৮৬৫ খৃঃ প্রথম পাব্‌লিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়, এবং ১৮৭৭ খৃঃ প্রথম সরকারী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯১০ সন হইতেই ব্যাপকভাবে লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

মিঃ বর্ডেন তিন বৎসর বরোদাতে থাকিয়া লাইব্রেরী বিভাগস্থাপন ও লাইব্রেরী পরিচালনার সুব্যবস্থা করেন। তাহার পর মিঃ জে, এস্ কুডালকর (J. S. Kudalkar M. A. LL. B.) মহাশয় লাইব্রেরী বিভাগের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন, এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার লাইব্রেরী ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে যান। দুঃখের বিষয় ১৯২১ সনে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর বর্ত্তমান অধ্যক্ষ (Curator) মিঃ নিউটন মোহন দত্ত F. L. A. কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইনি লাইব্রেরী পরিচালনায় বিশেষ পারদর্শী।

বরোদা রাজসরকারের গ্রন্থাগার বিভাগ (Library Department) নামে একটী বিশেষ বিভাগ আছে। ইহা Commissioner of Education (বিদ্যাধিকারী)-এর অধীনে বরোদা সরকারের ব্যয়ে পরিচালিত হয়। এই বিভাগে স্ত্রী পুরুষ, উচ্চনীচ, সাক্ষর নিরক্ষর, বয়স্ক ও শিশু প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বিনা পয়সায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ ব্যাপকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে খুব অল্প স্থানেই আছে।

বরোদা রাজ্যের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা (১৯৩১ সনের সেন্সস্ অনুসারে) ২,৪৪৩,০০৭, লোকসংখ্যা হিসাবে বরোদারাজ্য বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার প্রায় অনুরূপ। ফরিদপুর জিলার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ২,৩৫৫,৯৪৩ জন। কিন্তু বরোদারাজ্যে ৭৭৫টি সরকারী ও সরকারী সাহায্যে পরিচালিত লাইব্রেরী আছে। সম্প্রতি বরোদা সরকার হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে-প্রতিবৎসর ১০০ গ্রাম্য লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া আগামী ৫ বৎসরে সমগ্র বরোদারাজ্যে আর ও ৫০০ লাইব্রেরী স্থাপন করিতে হইবে।

বরোদা সহরে সরকারের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Central Library) ও সংস্কৃত লাইব্রেরী (Oriental Institute) আছে। এতদ্ব্যতীত সরকারী সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ও লাইব্রেরী বিভাগের অধীনে পরিচালিত সমগ্র বরোদাতে ৭৭০টি গ্রন্থালয় আছে। বরোদা রাজ্যের ৪৫টি সহরের প্রত্যেক সহরেই একটি করিয়া এবং ৭২৮টি গ্রামে গ্রন্থাগার আছে। উক্ত লাইব্রেরী সমূহের পাঠাগার (Reading Room) ব্যতীত আরও প্রায় ২০০টি পৃথক্ পাঠাগার আছে। বে-সরকারী লাইব্রেরীও কোন কোন স্থানে আছে।

বরোদা লাইব্রেরী বিভাগের কার্য্য মোটামুটি এই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) বরোদা সহরের লাইব্রেরী:—(ক) সেন্ট্রাল লাইব্রেরী ও তাহার অন্তর্ভুক্ত শিশুবিভাগ (খ) মহিলা লাইব্রেরী (গ) সংস্কৃত লাইব্রেরী।

(২) মফঃস্বল বিভাগ:—ইহার অধীন অন্যান্য সহর ও গ্রামের লাইব্রেরী।

(৩) ভ্রাম্যমাণ্ লাইব্রেরী (Travelling Library)

(৪) চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাবিভাগ (Visual Instruction Branch).

(১) বরোদা সহরের লাইব্রেরী

সেন্ট্রাল লাইব্রেরী বরোদা সহরের ও বরোদা রাজ্যের প্রধান লাইব্রেরী। ইহা ইং ১৯১০ সনে স্থাপিত হয়। গাইকোয়ার বাহাদুর প্রদত্ত তাঁহার নিজের লাইব্রেরীর ২০,০০০ পুস্তক লইয়া এই লাইব্রেরীর কার্য্য আরম্ভ হয়। এই লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা বর্ত্তমানে একলক্ষ বিশ

হাজারের উপর। এবং এই লাইব্রেরী হইতে ১৯৩০ সনে একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারের উপর বহি বিলি করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের লাইব্রেরী বই সমূহের মধ্যে এই লাইব্রেরীর বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক পাঠক পড়িয়া থাকে। লাইব্রেরীতে ইংরাজী, গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার পুস্তক রাখা হয়। গুজরাটী ভাষার পুস্তকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; কারণ বরোদার অধিবাসীদের শতকরা ৮৮জনের মাতৃভাষা গুজরাটী এবং গুজরাটীতে প্রকাশিত সমস্ত বই এই লাইব্রেরীতে রাখিবার নিয়ম আছে।

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর সাধারণ বিভাগের দুইটি শাখা আছে:—(১) লেনদেন বিভাগ (Lending Section), (২) পরামর্শ বিভাগ (Reference Section)।

লেনদেন বিভাগ (Lending Section):—এই বিভাগ রবিবার, সরকারী ছুটীর দিন ও বুধবার সকাল ব্যতীত প্রত্যহ সকাল বিকাল খোলা থাকে। বরোদা সহরের সকল অধিবাসীই এই লাইব্রেরীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। গ্রাহকদের কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না। বরোদার সরকারী কর্ম্মচারী পেন্সনভোগী ও দুই বৎসরের পুরাতন ব্যবহারাজীব প্রভৃতি কয়েকশ্রেণীর গ্রাহকের কোনরূপ টাকা জমা (deposit) দিতে হয়না। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকেরা উপরি-উক্তশ্রেণীর কাহাকেও জামিন রাখিয়া কিম্বা ১৫৲ টাকা জমা দিয়া বই পড়িতে পারেন। গ্রাহক-শ্রেণী হইতে নাম তুলিয়া নিলে ঐ টাকা ফেরত দেওয়া হয়। সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে "Open Access System" প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে গ্রাহকগণ নিজের ইচ্ছামত শেল্ফ্ হইতে দেখিয়া শুনিয়া পুস্তক বাছাই করিয়া নিতে পারেন। ইচ্ছামত দেখিয়া পছন্দ করিবার সুবিধা থাকিলে পাঠকের অনুসন্ধিৎসা ও পাঠেচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ক্রমশঃ এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুশৃঙ্খলার সহিত পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ গ্রন্থাগারিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থালয়ে সচরাচর পুস্তকবিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়না। অনেক লাইব্রেরীতেই পুস্তকের মোটামুটি অল্প কয়েকটী বিভাগ থাকে; এবং লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ পুস্তক সংগ্রহ করা হইলে উপরি-উক্ত কয়েকটি বিভাগ অনুসারে পুস্তকের ক্রমিক নম্বর দিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রথা বিজ্ঞান-সম্মত নহে। প্রথমতঃ বিষয় বিভাগ ও তৎপরে শ্রেণীবিভাগ করিয়া পুস্তকের নম্বর দেওয়া দরকার। আমেরিকার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরী ব্যবস্থাপক Dr. Melvil Dewey প্রবর্ত্তিত জগদ্বিখ্যাত দশমিক শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি (Decimal Classification Scheme) অনুসারে সুশৃঙ্খলার সহিত পুস্তক বিভাগ করা যাইতে পারে। (সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে; ইঁহার মৃত্যুতে গ্রন্থালয়-জগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে) মিঃ বর্ডেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এক অভিনব পদ্ধতি অনুসারে বরোদার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। কাটারের (Cutter) "Expansive" ও ডিউই-র "Decimal classification"—এই দুই ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে পুস্তক সমূহের মোটামুটি ২৬টি বিভাগ করা হইয়াছে। এক একটি বিভাগ এক একটি ইংরাজী বর্ণমালা দ্বারা সূচিত হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগের উপবিভাগ আছে।

পরামর্শ বিভাগ—(Reference Section)

এই বিভাগটিও বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। এই বিভাগের পাঠাগারে বসিয়া যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছামত লাইব্রেরীর যে কোন বই পড়িতে পারেন। এই বিভাগে নানারূপ প্রয়োজনীয় সাময়িক পত্রিকা ও reference বহি রাখা হয়। এই বিভাগটি সাংবাদিক ও গবেষণাকারীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির নির্ঘণ্ট (index) পূর্ণ বহি রাখা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (library science), প্রমাণপঞ্জী (Bibliography) পুস্তক-বিভাগ ও তালিকা প্রস্তুত (classification and cataloguing) সম্বন্ধে বহু মূল্যবান পুস্তকে এই বিভাগ পূর্ণ।

ইহা ব্যতীত, এই বিভাগ হইতে নানারূপ প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিভাগের কার্য্য কেবল বরোদারাজ্যে নিবদ্ধ নহে। ভারতের নানাস্থান হইতে, এমন কি ইয়োরোপ ও আমেরিকার কোন

কোন স্থানের অনুসন্ধিৎসুগণ ডাকযোগে এই স্থান হইতে নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করেন।

লাইব্রেরী মিউজিয়ম :—কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের (Central Library) অন্তর্ভুক্ত একটি লাইব্রেরী মিউজিয়ম আছে। ইহাতে কতগুলি কৌতূহলোদ্দীপক প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ জগতের বিখ্যাত লাইব্রেরী সমূহের ফটো, গুজরাটী কবিদের প্রতিকৃতি প্রভৃতি রাখা হইয়াছে।

শিশুবিভাগ :—সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত এই বিভাগটি বরোদার বিশেষত্ব। এই বিভাগ ইং ১৯১৩ সনে স্থাপিত হয় এবং একজন মারাঠী মহিলার তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত। লাইব্রেরীর সাধারণ বিভাগে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের উপযোগী ৩০০০ পুস্তক আছে। ইহা ব্যতীত কেবল খুব অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের পড়িবার ও খেলিবার জন্য একটি পৃথক ঘর আছে। এইস্থানে শিশুদের উপযোগী বই রাখা হয় এবং নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক ও চিত্রের সাহায্যে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই ঘরটি বেশ প্রশস্ত এবং ইহাতে আলো ও বাতাস যাইবার সুব্যবস্থা আছে; ইহার দেওয়াল নানারূপ সুন্দর চিত্রে পূর্ণ। এইখানে শিশুদের চিত্তাকর্ষক নানারূপ খেলিবার সরঞ্জাম (indoor games) আছে। লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে স্কুলের ছেলেদের এখানে আহ্বান করিয়া আনেন এবং নানারূপ শিক্ষাপ্রদ গল্প শুনাইবার ও বায়স্কোপের ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। এই বিভাগে প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৭০ জন শিশু যোগদান করিয়া থাকে।

মহিলা লাইব্রেরী :—

মহিলাদের জন্য একটি পৃথক্ লাইব্রেরী আছে। একটি গুজরাটী মহিলার হস্তে ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে। ইহা ব্যতীত মহিলাগণ সাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তকও পড়িতে পারেন।

এই গ্রন্থালয়ের লাইব্রেরীয়ান মাঝে মাঝে মহিলাদের ক্লাবে গমন করিয়া পাঠের জন্য পুস্তকাদি বিলি করিয়া থাকেন।

পাঠাগার (Reading Room) :—

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত একটি পাঠাগার আছে। এই স্থানে প্রায় শতাবধি সংবাদপত্র ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। ইহা বৎসরের প্রত্যেক দিন ১২ ঘণ্টা করিয়া খোলা থাকে।

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর নিজস্ব পুস্তক বাঁধাই বিভাগ আছে।

সংস্কৃত লাইব্রেরী (Oriental Institute)

বরোদা সহরের আর একটি দর্শনীয় স্থান ও গৌরবের বিষয় ইহার সংস্কৃত লাইব্রেরী (Oriental Institute) ইহা ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ পুঁথি সংগ্রহালয়। প্রথমতঃ ইহা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত বিভাগ নামে পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানানুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাপূর্ণ অনেক প্রাচীন পুঁথি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সব অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবার ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত গাইকোয়ার বাহাদুর এই বিভাগের সৃষ্টি করেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান গ্রন্থমালার (Gaekwar's Oriental Series) সৃষ্টি হয়। এই বিভাগের জন্য অনেক সংস্কৃত গ্রন্থও সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই বিভাগ হইতে প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও অন্যান্য ভাষার মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ ছাপিবারও ব্যবস্থা করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য বরোদার রাজসরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। বরোদাসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সাত বৎসর ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া ১০,০০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থশালার দ্রুত বিস্তৃতি লক্ষ্য করিয়া এবং ইহার কার্য্যের সুবিধার জন্য ১৯২৭ সনে এই সংস্কৃত লাইব্রেরীটি সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী হইতে পৃথক করিয়া ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট নামক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এই স্থানে এখন ২১,০০০ পুঁথি ও

মুদ্রিত পুস্তক আছে। সংগৃহীত পুঁথিসমূহের তালিকাও ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতেছে। Gaekwar's Oriental Seriesএ এই পর্য্যন্ত ৪৩খানা গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে; এবং আরও অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই গ্রন্থাবলী ভারতে ও ভারতের বাহিরে আদৃত হইয়াছে। এই বিভাগটি একজন অধ্যক্ষের (Director) অধীনে পরিচালিত হয় এবং গ্রন্থসমূহ তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য পি, এইচ, ডি, বর্ত্তমানে ইহার অধ্যক্ষ।

২। মফঃস্বল বিভাগ ;—

বরোদা সহরের গ্রন্থালয় সমূহ ব্যতীত অন্যান্য সহরের ও গ্রামের লাইব্রেরী এই বিভাগের অধীন। বরোদাসরকারের আর্থিক আনুকূল্যেই এই বিভাগের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ইহার অধীন লাইব্রেরীসমূহ বরোদাসরকারের সাহায্যে পরিচালিত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ স্থাপিত হয় এবং লাইব্রেরী বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ (Assistant Curator) মহাশয় এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করেন। সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর পুস্তক ব্যবহার করিবার সুযোগ সাধারণতঃ বরোদা সহরের অধিবাসীরাই পাইয়া থাকেন। কিন্তু সমগ্র বরোদারাজ্যের লোকসংখ্যার শতকরা ৮০জন গ্রামে বাস করিয়া থাকে; সুতরাং লাইব্রেরীর সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার করিতে হইলে মফঃস্বলের সহরে সহরে এবং গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে বরোদার সর্ব্বত্র সরকারী সাহায্যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত লাইব্রেরী হইতে বই পড়িতে কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না।

মফঃস্বলের লাইব্রেরী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—যথা, (১) জিলার প্রধান সহরের লাইব্রেরী (২) অন্যান্য সহরের লাইব্রেরী (৩) গ্রাম্য লাইব্রেরী। এই সমস্ত লাইব্রেরী পরিচালনার ব্যবস্থা বিচিত্র। উক্ত লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে কেবল বাৎসরিক খরচের এক তৃতীয়াংশ অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়; বাকী দুই তৃতীয়াংশ অর্থ বরোদাসরকার ও জিলাবোর্ড সমপরিমাণে দিয়া থাকেন। উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর লাইব্রেরী বৎসরে শ্রেণীবিভাগ অনুসারে যথাক্রমে ৭০০,৩০০ ও ১০০ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই বরোদাসরকারের লাইব্রেরী বিভাগ ও জিলাবোর্ড, প্রত্যেকে উক্ত লাইব্রেরী সমূহে সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি সমূহও সময়ে সময়ে লাইব্রেরীতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রামে কোন নূতন লাইব্রেরী স্থাপন করিবার সময় লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ লাইব্রেরী বিভাগের হস্তে ২৫৲ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে উক্ত বিভাগ হইতে ১০০৲ মূল্যের গুজরাটী পুস্তক পাইতে পারেন। কোন গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপনের উপযোগী অর্থ সংগ্রহ না হইলে একটি পাঠ-গৃহ (Reading room) স্থাপিত হইয়া থাকে; এই জন্য বরোদাসরকার ও জিলা বোর্ড সাহায্য করিয়া থাকে।

কোন স্থানের অধিবাসীগণ লাইব্রেরী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে কেবল ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। বাকী দুই তৃতীয়াংশ অর্থ বরোদা সরকার ও জিলা বোর্ড দিয়া থাকে। এইরূপ অর্থ সাহায্যের ফলে বরোদারাজ্যের প্রায় একশতটি লাইব্রেরীর নিজস্ব সুদৃশ্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। লাইব্রেরী গৃহগুলি অনেক স্থানেই দ্বিতল অট্টালিকা।

এই সব লাইব্রেরী পরিচালনার নিমিত্ত লাইব্রেরী বিভাগ কতগুলি নিয়ম গঠন করিয়াছেন। সেই নিয়মানুসারে স্থানীয় লোকদের একটি কমিটী লাইব্রেরীর কার্য্য পরিচালনা করে। গ্রাম্য লাইব্রেরীর জন্য কোন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয় না; সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য উৎসাহী লোক এই লাইব্রেরীর ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। লাইব্রেরী বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় মাঝে মাঝে মফঃস্বলের লাইব্রেরীর পরিচালকদের একত্র আহ্বান করিয়া লাইব্রেরীর অভাব অভিযোগ ও সুপরিচালনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন।

লাইব্রেরী আন্দোলন বিস্তারের জন্য বরোদার তালুক সমূহে লাইব্রেরী সমিতি (Library Association) গঠিত হইয়াছে। সমগ্র বরোদা রাজ্য ব্যাপিয়া বরোদা লাইব্রেরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লাইব্রেরীয়ান ও

লাইব্রেরী কর্ম্মীদের লইয়া একটি লাইব্রেরী কো-অপারেটিভ সোসাইটী (পুস্তকালয় সহায়ক সহকারী মণ্ডল) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি ইহার অন্তর্ভুক্ত লাইব্রেরী সমূহের জন্য পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা, আসবাব ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এই সমিতি হইতে বরোদা লাইব্রেরী য়্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র গুজরাটী পত্রিকা "পুস্তকালয়" প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সমিতি হইতে গুজরাটী ভাষায় নানারকম পুস্তকও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(৩) ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী (Travelling Library)

বরোদার রাজসরকার প্রজাদের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ও লাইব্রেরী আন্দোলনের বহুল প্রচারের জন্য যে সব অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী তাহাদের অন্যতম। আমেরিকার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া গাইকোয়ার বাহাদুর ১৯১১ খৃষ্টাব্দে নিজ রাজ্যে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। যে সব গ্রামে লাইব্রেরী নাই সেই সব স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞানপ্রচারই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কতগুলি মজবুত ছোট কাঠের বাক্সে কতগুলি বই বোঝাই করিয়া জনসাধারণের পাঠের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠান হইয়া থাকে। কোন গ্রামের লোকদের এক বাক্স বই পড়া হইলে আর এক বাক্স নূতন বই পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী নামে পরিচিত।

বই রাখিবার বাক্সগুলি আকারের তারতম্য অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত। আকার অনুসারে ঐ বাক্সগুলিতে ১৫, ২০ বা ৩০খানি বই রাখা যাইতে পারে। এই বাক্সগুলিতে বইর সঙ্গে সঙ্গে ১খানা গ্রাহক বহি, ১খানা suggestion বহি ও কতগুলি বিজ্ঞাপন থাকে। এই বাক্সগুলি সাধারণতঃ রেলেও চাবি ডাকে পাঠান হইয়া থাকে। বরোদা লাইব্রেরী বিভাগে এইরূপ সাড়ে চারিশত বাক্স আছে এবং এই বিভাগে প্রায় বিশহাজার বই আছে। ঐ সব বাক্সে দুই রকমে বই সাজান হইয়া থাকে। কতগুলি বাক্সে কেবল কোন এক বিষয়ের পুস্তক থাকে। কোন বাক্সে হয়ত কেবল জীবনী, অথবা কোন বাক্সে হয়ত কেবল ইতিহাসের বই রাখা হয়। আবার কোন বাক্সে কেবল মহিলাদের বা শিশুদের উপযোগী বই রাখা হয়। এই সব বই বরাবর নির্দ্দিষ্ট এক বাক্সে রাখা হয়। এইগুলি "fixed sets" নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অবস্থায় সাজান বইগুলিকে "elastic sets" বলা হয়। ইহার এক এক প্রস্থে নানা বিষয়ের বই থাকে এবং বইগুলি গ্রাম হইতে ফেরত আসিলে পুনরায় আলমারিতে তুলিয়া রাখা হয়। এই সব বাক্সে সময় সময় ঘরে বসিয়া খেলিবার সরঞ্জাম ও শিক্ষাপ্রদ ছবি গ্রামে গ্রামে পাঠান হইয়া থাকে। এই সব বাক্স ব্যবহার করিতে কোনরূপ চাঁদা দিতে হয় না। বাক্সগুলি গ্রামে পাঠাইবার ও পুনরায় গ্রাম হইতে সদরে ফেরত পাঠাইবার রেলমাশুল পর্য্যন্ত লাইব্রেরী বিভাগ বহন করিয়া থাকে।

এই বিভাগের জন্য বরোদা সরকার বৎসরে প্রায় ৩০০০৲ ব্যয় করিয়া থাকে।

এই বিভাগের জন্য একজন স্বতন্ত্র সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ও কয়েকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। সাধারণতঃ কোন স্থানীয় শিক্ষক অথবা এই কার্য্যে উৎসাহী অন্য কোন লোক এই সব লাইব্রেরির ভার গ্রহণ করেন এবং লাইব্রেরী বিভাগের নিয়মানুসারে উহার কার্য্য পরিচালনা করেন। এক এক স্থানে এক একটি বাক্স তিনমাস—অথবা, প্রয়োজন হইলে তদপেক্ষা বেশী সময় রাখা যাইতে পারে।

(৪) চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা বিভাগ (Visual Institution Branch)

গাইকোয়ার বাহাদুর কেবল সাক্ষর নরনারীর শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বরোদায় শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইলেও অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ও জ্ঞানহীন। বরোদাসরকার তাহাদের শিক্ষার জন্য চিত্রের সাহায্যে নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশের অবস্থা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ চিত্র দেখাইয়া তাহা সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিলে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসাধারণও তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

বিভাগ বরোদারাজ্যের সর্ব্বত্র বিনামূল্যে নানারূপ ছবি দেখাইয়া থাকে এবং অগণিত স্ত্রীপুরুষ এই সব ছবি দেখিয়া শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

এই বিভাগে কতগুলি বায়স্কোপের ছবি দেখাইবার যন্ত্র ও Radioptican (ইহার সাহায্যে পোষ্টকার্ডের আকারের ছবি বৃহদাকারে পর্দ্দার উপর দেখান হয়) আছে। Magic lantern ও Stereograph এর সাহায্যে ছবি দেখাইবারও ব্যবস্থা আছে। এই বিভাগ ব্রিটিশ ভারতে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে ছবি দেখাইবার জন্য মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই বিভাগের জন্য বরোদা সরকারের ন্যূনাধিক ৫০০০৲ ব্যয় হইয়া থাকে।

বরোদার লাইব্রেরী বিভাগের ইহাই মোটামুটি বিবরণ। শেষে, বরোদায় লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে এবং বরোদা সরকার ভারতের অন্যত্র লাইব্রেরী আন্দোলন বিস্তারে কিরূপ সাহায্য করিয়া থাকেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণতঃ মনে করেন যে, লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য করিতে কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই; লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য কেবল পুস্তক সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যে কোন সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্ত লোকই এই কাজ করিতে পারেন।

কিন্তু এই ধারণা অমূলক। লাইব্রেরীয়ানের কর্ত্তব্য অতি দায়িত্বপূর্ণ এবং তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর লোক-শিক্ষক।

কিন্তু পূর্ব্বে এদেশে লাইব্রেরীয়ানদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এবং লাইব্রেরী বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বর্ডেন সাহেব বরোদাতে একটি লাইব্রেরী ক্লাস খুলিয়াছিলেন এবং দেশীয় লাইব্রেরীয়ানদিগকে ঐ ক্লাসে যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম লোকই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। বর্ত্তমান অধ্যক্ষও লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ভারতের নানা স্থান হইতে লাইব্রেরীয়ানগণ তথায় শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন।

বরোদার লাইব্রেরী বিভাগ বরোদার বাহিরে ভারতের অন্যত্রও লাইব্রেরী আন্দোলন বিস্তারে সাহায্য করিয়া থাকে। কোন লাইব্রেরী কনফারেন্স ও লাইব্রেরী প্রদর্শনীতে যোগ দিবার আহ্বান আসিলে কিউরেটার মহোদয় ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণ সানন্দে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এইরূপে তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে গমন করিয়াছেন। ১৯২৮ সনে কলিকাতাতে যে নিখিল ভারত লাইব্রেরী সম্মিলন সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে বরোদা বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গত বৎসর কলিকাতাতে বঙ্গদেশীয় লাইব্রেরী সমূহের কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল। বরোদার কিউরেটার মহোদয় সেই কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং একজিবিশনে প্রদর্শনের জন্য অনেক পুস্তক, ছবি, চার্ট প্রভৃতি নিয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বয়ং যত্নসহকারে সেই সব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

নক্ষত্রলাল সেন



অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রেল ষ্টেশনের প্রায় দশ মাইল উত্তরে কাঁসাই নদীর অপর পারে পীরনগর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে এ অঞ্চলের জমিদার রায় চৌধুরীদের দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে বাগান পুষ্করিণী, দক্ষিণদিকে বারখণ্ড, তার পশ্চিম দিকে বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ; সদর দেউড়ির দুই দিকে পাইক বরকন্দাজদের মহল। বহির্বাটির সুবৃহৎ তোরণের উপর পাকা নহবৎখানা। দেখলে বেশ বোঝা যায়, জমিদাররা যখন গ্রামে বাস করতেন বিশেষ সমারোহের সঙ্গেই করতেন। কলিকাতায় বাড়ি নির্ম্মাণ হওয়ার পর থেকে বিশ পঁচিশ বৎসর গ্রামের বসবাস প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। নিতান্ত ক্রিয়াকর্ম্ম কিম্বা আদায়-পত্রের সময়ে বর্ত্তমান বারোআনী সরিক জহরলাল রায় চৌধুরী গ্রামের বাটিতে পদার্পণ করেন—কিন্তু সে মাত্র দু-দশ দিনের জন্য। গৃহিণী মমতাময়ী সপুত্র-কন্যা কোনোবার সঙ্গে আসেন, কোনোবার আসেন না। পিরনগরে দশ দিনের বাস কলিকাতার দশদিনের আয়ু হরণ করে ব'লে তাঁর মনের বিশ্বাস। পীরনগরের ম্যালেরিয়া-দূষিত খোলা হাওয়া কলিকাতার কলের জলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাভব স্বীকার করেছে।

এবারকার দেশে আসা জহরলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষে ঘটেছিল। মমতাময়ীর একান্ত ইচ্ছা ছিল কলিকাতার ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, মোটার কার, কলের জল ইত্যাদির মধ্যে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করেন, কিন্তু জহরলাল তাঁর গ্রামবাসী জ্ঞাতি কুটুম্ব এমন কি নায়েব গোমস্তা প্রজামণ্ডলীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া, দেশের বাড়ির সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁর নিজ বিবাহের যে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আনন্দের নিশ্চিন্ত-অলস মূর্ত্তি স্মরণ করে পুত্রের বিবাহ উৎসব কলিকাতার দশ কাঠার উপর অবস্থিত বাড়ির মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় নিঃশেষিত করবার কল্পনা তাঁর নিজের কাছেও ভাল লাগে নি। যেখানে কাজের কল চালাতেই সকলে দিবারাত্র ব্যস্ত, সেখানে উৎসবের বাঁশি বাজায়ই বা কে, আর শোনেই বা কে? পীরনগরের বাড়ি থেকে বিবাহের কথায় মমতাময়ী সম্মত হয়েছিলেন এই সর্ত্তে যে, পীরনগরের উৎসব শেষ হবার পর কলিকাতার গৃহে এসে যথোপযুক্ত ভাবে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বধূ পিত্রালয়ে যাবে; তার আগে নয়। সন্ধির প্রলোভনে জহরলাল পত্নীর এই সর্ত্তে সম্মতি দিয়েছিলেন।

বিবাহের পর কয়েকদিন ধ'রে অবিশ্রান্ত যাত্রা, থিয়েটার ম্যাজিক, বায়োস্কোপ, আতসবাজি, ইত্যাদি চলেছে। ভোজের ত কথাই নেই, চার পাঁচ দিন গ্রামবাসীদের গৃহে হাঁড়ি চড়ে নি। দূরদেশ থেকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া, পাইক বরকন্দাজদের ছুটোছুটি, চাকর চাকরাণীদের হাঁক-ডাক, আমলা প্রজাদের বিধি-ব্যবস্থা—সমস্ত মিলে গ্রামটা যেন আনন্দের যজ্ঞশালায় পরিণত হয়েচে। মানভূম থেকে একজন জমিদার দুটি হাতী নিয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন, বিদায় কালে একটিকে রেখে গেছেন, কাজের বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতের যাওয়া আসার ব্যাপারে যদি কোনো কাজে লাগে। সেই হাতী জমিদার বাড়ির উত্তর-পশ্চিম

কোণে বড় একটা বটগাছের তলায় শিকল দিয়ে বাঁধা; সর্ব্বক্ষণ তার চতুর্দ্দিকে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে আছে, আর সে মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তার ছোট ছোট চোখের অকৌতূহলী দৃষ্টি তাদের উপর ফেলে সমস্ত দিন একমনে অবিশ্রাম ডালপালা চিবিয়ে চলেছে। উৎসবের উপকরণ-তালিকায় এই হাতীটির স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়, বিশেষতঃ সকাল বিকালে মাহুতের প্ররোচনায় সে যখন নানাবিধ কৌশল কসরৎ দেখায়।

উৎসব আনন্দ হয়ত আরো কয়েকদিন এই ভাবেই চল্‌ত। কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে। দু-তিন ঘণ্টার আগু-পিছু পাশাপাশি দু বাড়িতে একেবারে দুজনে ঐ রোগে আক্রান্ত হ'ল, এবং মৃত্যুও হ'ল তাদের অল্পক্ষণের মধ্যে দু তিন ঘণ্টারই আগু-পিছু। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা নিবিড় আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল,—উৎসবের স্রোতে ভাঁটা দেখা দিলে।

একবাড়ি লোক নিয়ে এরূপ অবস্থায় কি করা উচিৎ, জহরলাল তাই মনে মনে চিন্তা করছিলেন এমন সময় সন্ধ্যার পর যখন খবর পাওয়া গেল যে, দু-চার বার ভেদবমির পরই একঘণ্টার মধ্যে কেদার চাটুয্যের নাড়ী ব'সে গেছে, তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, অন্দরে এসে কথাটা মমতাময়ীকে জানালেন।

মমতাময়ী জহরলালের কথা শুনে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বল্‌লেন, "সকাল থেকে এই কথা শুনে তুমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত রয়েছ? তখন বলেছিলাম এমন বিদেশে বিভুঁয়ে কাজকর্ম্ম কোরো না,—শুন্‌লে না ত! গরিবের কথা বাসি হ'লে তবে মিষ্টি হয়! এখন চল, আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যাক্।"

জহরলাল মৃদু হেসে বল্‌লেন, "তোমার মতো গরিবের কথা বাসি না হ'লেও মিষ্টি লাগে।—কিন্তু তা ব'লেও আজ রাত্রে বেরিয়ে পড়া যায় না।"

"কেন যায় না? গাড়ি ত' রাত দুটোয়, এখন ত সবে সন্ধ্যে। সাত ঘণ্টায় পাঁচ কোশ রাস্তা যাওয়া যায় না?"

জহরলাল মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "পাঁচ কোশ নয় মমো, পঁচিশ কোশ। মধ্যে কাঁসাই নদী আছে সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। লোকে কথায় বলে একা নদী বিশ কোশ। তা ছাড়া, পাল্কী বেয়ারাদের খবর দেওয়া নেই।"

"খবর দেওয়া নেই তা জানি,—খবর দাও।"

"খবর দিলেই কি এত রাত্রে তারা যেতে রাজি হবে?"

দৃপ্তস্বরে মমতাময়ী বল্‌লেন, "তা যদি না হয় তা হ'লে কিসের জমিদার তুমি?"

জহরলালের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল; মমতাময়ীর কলিকাতা-প্রীতিকে ঈষৎ আঘাত দেবার অভিপ্রায়ে বল্‌লেন, "কলকাতায় থাক্‌লে কি আর জমিদার আগেকার মতো কেউটে সাপ থাকে?—ঢোঁড়া সাপ হয়ে যায়। তার না থাকে বিষ, না থাকে চক্কোর।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার নায়েবকে ডেকে হুকুম দাও,—সে ত' আর কলকাতায় থাকে না।"

জহরলালের মুখে আবার হাসি দেখা দিল; বল্‌লেন, "শুধু নায়েবকে হুকুম দিলেই হবে না, সময়ের স্রোতকে এই সাতটার সময়ে আট্‌কে ফেলবার জন্যে বিধাতা-পুরুষকেও হুকুম দিতে হবে। সাত ঘণ্টা থেকে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে এক ঘণ্টা খরচ হলেও ঝাড়গ্রামে গিয়ে ট্রেন ফেল ক'রে বারো ঘণ্টা ব'সে থাক্‌তে হবে। তা'তে যদি রাজি থাক ত চলো, আপত্তি নেই। কিন্তু বেশি রাত্রে ষ্টেশনের পথ একেবারে নিরাপদ নয়, মাঝে মাঝে রাহাজানির কথা শোনা যাচ্ছে।"

এই শেষোক্ত কারণটাই মমতাময়ীর মনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল হ'ল। একটু চিন্তা ক'রে বল্‌লেন, "আচ্ছা, তা হ'লে কাল সকালে যাতে আমরা বেলা সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারি তার ব্যবস্থা এখন থেকে কর। কাল আর রাত্রের গাড়ি নয়, কাল বিকেলের গাড়িতে যাওয়া ঠিক রইল।"

জহরলাল বল্‌লেন, "ব্যবস্থা করবার দিক থেকে ধরলে আজ রাত্রে যাওয়া আর কাল সকালে যাওয়ার বিরুদ্ধে একই রকম আপত্তি দাঁড়ায়। সকালে গিয়ে আর দরকার নেই—কাল সকালে উঠে যাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলে বিকেলের দিকে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে পড়লেই হবে।" তারপর উৎকর্ণ হয়ে কি শোনবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন, "কে কাঁদে

না! তবে এর মধ্যেই কেদার খুড়োর শেষ হয়ে গেল না-কি?"

আশঙ্কাটা যে অমূলক নয় তা একটু পরেই সঠিক জানা গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আবার নূতন ক'রে আতঙ্কের একটা ঘন ছায়া বিস্তার করলে। যাওয়ার ব্যবস্থার কথা পরদিন প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা না ক'রে অবিলম্বে আরম্ভ হয়ে গেল। শুভদিন দেখ্‌তে গিয়ে দেখা গেল যে, পরদিন বৈকালের গাড়িতে রওনা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় পৌঁছে গৃহ-প্রবেশের সময়টা জ্যোতিষের মতে অত্যন্ত অশুভ সময় পড়ে,—শুভ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হ'লে রাত্রি একটার পূর্ব্বে তার সাক্ষাত পাওয়া যাবে না; কিন্তু রাত্রের গাড়িতে রওনা হ'লে তার পরদিন সকালে গৃহ-প্রবেশের সময়ে একেবারে অমৃত যোগ!

বহুদিন থেকে বহুবার যারা কলিকাতার বাড়িতে যাতায়াত করছে তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে অশুভক্ষণে প্রবেশ করলে তাকে যে গৃহদেবতা কখনই ক্ষমা করবেন না, তদ্বিষয়ে মমতাময়ীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সুতরাং স্থির হ'ল, পরদিন সকালে মমতাময়ী তাঁর ছোট পুত্র কন্যাদের নিয়ে কলিকাতা রওনা হবেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে পুত্র এবং পুত্রবধূকে গৃহে বরণ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন; বৈকালে জহরলাল, প্রিয়লাল এবং নববধূ সন্ধ্যা রওনা হবেন। পাঁচখানা পাল্কী, আটখানা গোরুর গাড়ি এবং কয়েকটা ডুলির ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। তা ছাড়া, হাতী ত' আছেই। সমাগত আত্মীয় কুটুম্বগণকেও পরদিনই নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করবার ভার নায়েবের উপর পড়ল।

রাত্রি তখন এগারোটা। সন্ধ্যা প্রিয়লালের ঘরে পালঙ্কের উপর শুয়ে ছিল, প্রিয়লাল নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যার পাশে বসে তার একখানা হাত নিজ হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

পদশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের আগমন বুঝ্‌তে পেরেছিল, প্রিয়লাল হাত ধরাতে সে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বস্‌ল, হাতখানা কিন্তু প্রিয়লালের অধিকারেই রয়ে গেল।

প্রিয়লাল একটু অবনত হ'য়ে ভাল ক'রে সন্ধ্যার মুখখানা দেখ্‌বার চেষ্টা ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাক্‌লে, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা একবার মুহূর্ত্তের জন্য প্রিয়লালের প্রতি চকিত দৃষ্টি স্থাপন করে পুনরায় মুখ নত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে, "কি?"

ঈষৎ হাসিমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "কি জানি কি! কি মনে হয় জানো সন্ধ্যা? মনে হয় তুমি ঊষা ত নওই, সন্ধ্যাও নও,—তুমি গভীর রজনী। সত্যি, এ কয়েকদিনে তোমাকে একটুও বুঝ্‌তে পারলাম না। পাঁচজনের মধ্যে দেখ্‌লে বোধ হয় চিন্‌তেও পারিনে। আচ্ছা, চাও ত' একবার ভাল ক'রে আমার দিকে।" প্রিয়লাল সযত্নে সন্ধ্যার মুখখানি ধ'রে নিজের দিকে ফিরিয়ে দেখ্‌লে।

সে মুখে সন্ধ্যার মতই অনির্ব্বচনীয় স্তিমিত শোভা। এই সুন্দর মুখের জোরেই এত বড় জমিদার গৃহে তার প্রবেশ। সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "আচ্ছা, মুখখানি মনের মধ্যে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা করব। কিন্তু তোমাকে আরও একটা সহজ উপায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" পকেট থেকে একটা আংটি বের ক'রে বল্‌লে। "এটা প্লাটিনমের আংটি। এটা চোখের কাছে আলোর বিরুদ্ধে ধরলে এর মধ্যে একজনের সন্ধান পাবে। তাতে খুশী হবে কি-না তা অবশ্য বল্‌তে পারিনে।" ব'লে সন্ধ্যার আঙুলে প্রিয়নাথ আংটিটি পরিয়ে দিলে।

সন্ধ্যা আঙুল থেকে আংটিটি খুলে নিয়ে চোখের নিকট আলোর বিরুদ্ধে ধ'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সহসা এক সময়ে আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। তারপর সযত্নে সেটি আবার ধীরে ধীরে আঙুলে পরিয়ে নিলে।

"খুসি হয়েচ?"

সন্ধ্যা উত্তর না দিয়ে শুধু প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। প্রিয়লাল দেখ্‌লে সে দৃষ্টির মধ্যে খুসি মূর্ত্তি ধারণ করে হাস্‌চে।

"সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা বল্‌লে, "কি?"

"কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার আঙুলে অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে?"

"আছে।"

"আমিও তোমার আঙুলে সেই রকম অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিলাম।—কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলে যাব না সন্ধ্যা, এ নিশ্চয় জেনো।"

সন্ধ্যা তার ভীতিকাতর দৃষ্টি প্রিয়লালের প্রতি স্থাপিত ক'রে বললে, "তবুও ও-সব কথা বলতে নেই।"

"আমাদের মধ্যে ত' কোনো দুর্ব্বাসা মুনিরই শাপ নেই সন্ধ্যা,—তবে তোমার অত ভয় কেন?" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



পেশোয়া রাজত্বের অবসান

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ

ভারতবর্ষের যে ইতিহাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার মধ্যে শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও খুব সামান্য স্থান অধিকার করে আছেন। সাধারণতঃ আমাদের কাছে মারাঠা রাজাদের ভিতর ছত্রপতি শিবাজী, এবং পেশোয়াদের মধ্যে প্রথম বাজীরাওই পরিচিত। দ্বিতীয় বাজীরাও যখন পেশোয়া ছিলেন, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের লজ্জা এবং কলঙ্কের কাহিনী, এবং বাজীরাওয়ের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তাহলেও, নিজের রাজত্বকালের শেষভাগ তিনি অল্পক্ষণের জন্য উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন, সেইজন্য এবং শেষ হিন্দুসম্রাট বলে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের অধঃপতনের ইতিহাস অনুসরণ করা যেতে পারে।

মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে যিনি ইংরেজদের ডেকে এনে বিখ্যাত হয়েছেন, সেই রঘুনাথরাও ছিলেন বাজীরাওয়ের পিতা। জীবনে বহুকাল বিদেশীর সাহায্যে পেশোয়ার গদী অধিকার করবার চেষ্টা করলেও রঘুনাথ কখনও সফল হতে পারেন নি; নিজের রাজ্যের উপর লোভ এবং ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রী পুত্রকে উত্তরাধিকারের সূত্রে সমর্পণ করে গিয়েছিলেন। রঘুনাথের যে ইচ্ছা সফল হতে পারে নি, বাজীরাওয়ের সে আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়েছিল। রঘুনাথ দেখলে হয়তো খুসী হতেন যে তাঁকে বঞ্চিত করে যাঁকে পেশোয়ার গদীতে বসানো হয়েছিল, তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও যৌবন আরম্ভের পূর্ব্বেই মারা যান [১৭৯৫ সাল] এবং তাঁর অকালমৃত্যুর পর রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়ার গদী লাভ করেছিলেন। এর পরের ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বাজীরাওয়ের কি করে নানা ফাড়নবিশ, সিন্ধিয়া, সরজিরাওঘাটগে, হোলকার প্রভৃতির হাতে পালাক্রমে রাজ্যলাভ এবং রাজ্যনাশ হয়েছিল, সে কথা বিস্তারিত করে বলবার প্রয়োজন নেই। অবশেষে ১৮০২ সালে তিনি হোলকারের আশ্রয় ত্যাগ করে ইংরেজের শরণাপন্ন হলেন। বেসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে ইংরেজের কৃপায় যখন বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন কয়েক বৎসর তিনি বিনা উপদ্রবে রাজ্যভোগ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পারিপার্শ্বিকের গেল পরিবর্ত্তন হয়ে, এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রবন্ধের যে সময় আরম্ভ, বহু নতুন লোক রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরিচিত রাষ্ট্রীয় নেতা মহারাষ্ট্রকে পরিচালনা করতেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশবৎসরের ভিতরে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই সময় বাজীরাও নিজেই তাঁর রাজত্বের মধ্যে নামে এবং প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠলেন—রাজকার্য্যে তাঁকে যারা সাহায্য করতেন তাঁরা অনেকেই নিম্ন অবস্থা থেকে বড় হয়ে উঠেছিলেন, পূর্ব্বেকার রাজনৈতিকদের মতন বড় বংশে জন্মগ্রহণ করেন নি। এই সময়কার পেশোয়ার মণ্ডলীর মধ্যে বাপু গোক্‌লে এবং ত্রিম্বকজীর নাম করা যেতে পারে;- বাপু গোক্‌লে মারাঠাদের মধ্যে শেষ বড় সেনাপতি, এবং ত্রিম্বকজী প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীর কাজ করতেন।

বাজীরাওয়ের অধঃপতনের কাহিনী কোন সময় থেকে আরম্ভ করা যেতে পারে? অবশ্য এক হিসাবে যাঁর কখনও অভ্যুদয় হয়নি তাঁর পতনও অসম্ভব। জীবনের প্রথমে বাজীরাও অন্যান্য মারাঠা রাজন্যবর্গ এবং ইংরেজ সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করে পেশোয়ার আসনে স্থায়ী হবার আশা করেছিলেন। রাজনীতিতে এই সব অনুগ্রহ "বালির বাঁধ" এবং তা ভেঙে যেতে বেশী সময় লাগেনা,—আর ইংরেজ সরকার এদেশে মিত্রতা বিতরণ করতে আসেন নি।

যে মুহূর্তে বোঝা গেল যে বাজীরাও দেশের রাজনীতিতে ইংরেজকে আর অগ্রসর হতে দিতে অনিচ্ছুক, সেই মুহূর্তে এই তাসের ঘর ভেঙে গেল, এবং বাজীরাওয়ের অধঃপতন অথবা অন্যভাষায় তাঁর চেষ্টা সুরু হল। একটি মারাঠা গাথায় আছে—"গঙ্গাধরশাস্ত্র্যাচেবরুন রাজ্যাচা নাশ ঝালা"[১] অর্থাৎ গঙ্গাধরশাস্ত্রীর জন্য রাজ্যের সর্ব্বনাশ হল। গাইকোয়াড়ের দেওয়ান এই গঙ্গাধরশাস্ত্রীর মৃত্যু অথবা তাঁর হত্যার সময় থেকে বাজীরাওয়ের অধঃপতন বিবৃত করা যেতে পারে। কিন্তু তার পূর্ব্বে বড়োদার সমসাময়িক ইতিহাস স্মরণ করা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সে দেশ তখন জরাগ্রস্ত। মোগলসাম্রাজ্যের শ্রী অবশিষ্ট নেই, অথচ মোগলরাজত্ব সুলভ অপব্যয়ের ফলে দেশের সর্ব্বত্র দারিদ্র্য পরিস্ফুট। এক জীর্ণ সাম্রাজ্যের রাজচ্ছত্র থেকে মুক্তিলাভ করে, বহু দুর্ব্বল ক্ষুদ্র রাজত্বের যে সাধারণ পরিণাম তাই প্রত্যেক প্রদেশে ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজেরা বড়োদা রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন, সে হচ্চে মহাজনবৃত্তি, কয়েকটি গ্রামের বিনিময়ে তাঁরা গাইকোয়াড়কে প্রত্যেক বৎসর পরিমিত অর্থসাহায্য করতেন। এই প্রথার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন, এই সাহায্য গ্রহণ করা যেমন সহজ পরিত্যাগ করা তেমন নয়, এবং আর সব রাজাদের মতন গাইকোয়াড এই ব্যূহে প্রবেশের বিদ্যা শিখেছিলেন, বেরিয়ে আসবার উপায় শিক্ষা করেন নি। এর যা অবশ্যম্ভাবী ফল ক্রমে তাই দেখা দিল, এবং বড়োদাতে ইংরেজ কোম্পানী ক্রমশঃ মহাজনী ব্যবসা পরিত্যাগ করে রাজনীতির ব্যবসা আরম্ভ করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে বড়োদাতে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজই ছিলেন রাজা। ছোট ছোট রাজ্যে ইংরেজ কোম্পানী যে অনুরোধ করতেন, তাই তাদের কাছে ছিল আদেশ কিন্তু গাইকোয়াড়ের বেলায় এই সৌজন্যও ইংরেজ পরিত্যাগ করলেন, এবং স্পষ্টভাবে আদেশ করতেও দ্বিধা করেন নি। এই সময়কার যে সব সরকারী কাগজপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার একটিতে পাওয়া যায়—"বোম্বাই সরকারের এই ইচ্ছা যে বড়োদা-রাজ্যের দেওয়ানের কাজ কেবলমাত্র রাওজী আপাজীর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে······যদি গাইকোয়াড় কিম্বা আর কেউ রাওজী আপাজীর নামে মিথ্যা দোষ আরোপ করেন তাহলে কোম্পানী স্বয়ং এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে যথাকর্ত্তব্য স্থির করবেন[২]······বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের যে পত্রাংশ উপরে দেওয়া হল তা থেকে বড়োদা এবং গাইকোয়াড়ের অসহায় অবস্থা টের পাওয়া যাবে। এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮০২ সালের জুনমাসে। তখন থেকে আরম্ভ করে ১৮১৪ অর্থাৎ বারো বৎসর পর্য্যন্ত বড়োদার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়নি। রাওজি আপাজি ১৮০৩ সালে মারা যান, এবং তার মৃত্যুর পর ইংরেজের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর পুত্র সীতারামকে দেওয়ানের কাজ দেওয়া হল। এই চাকুরি গাইকোয়াড় স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন মনে হয় না, দিয়েছিলেন ভয়ে, কারণ যে আদেশপত্রে সীতারামকে এই কাজ দেওয়া হচ্চে, তারই এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে সীতারামের প্রধান কাজ হবে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করে চলে যেমন তাঁর পিতা করেছিলেন[৩]। যে কাজের ভার সীতারামকে দেওয়া হয়েছিল তিনি তার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন, তার উপরে ইংরেজ সঙ্গে মিত্রতাও যে স্থায়ী হবে, এরকম মনে হল না। এই সময় গঙ্গাধরশাস্ত্রী পটবর্দ্ধন নামে একজন ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ ইংরেজের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠছিলেন; এবং সীতারামের বুঝতে দেরী হ'লনা যে যে কাজ তিনি পিতার মৃত্যুর পরে বিনা আয়াসে লাভ করেছিলেন, সে কাজ তাঁর হাত থেকে অল্পদিনেই স্খলিত হয়ে পড়বে।

বড়োদায় যখন এই অবস্থা তখন পেশোয়ারের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। তার কারণ মোটের উপর এই। আমেদাবাদ এবং তার চারদিকের কিছু জায়গা পেশোয়া গাইকোয়াড়ের কাছে পত্তন দিয়েছিলেন। এই পত্তনের কাল অল্পদিন পূর্ব্বে শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং গাইকোয়াড়ের

(১) ঐতিহাসিক পোবাড়ে—কেলকর

(2) Historical Records of Baroda—Gupte

(3) ,, ,,

ইচ্ছা ছিল যে আবার এই পত্তন তাঁকেই দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৭৫১ সালে গাইকোয়াড় পেশোয়াকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকার করেন যদিও তার অধিকাংশই পেশোয়া কখনও পাননি, এবং এই সময় অর্থাৎ ১৮১৪ সালে পেশোয়ার দাবী মোটের উপর এক কোটি টাকার বেশী ছিল। এই দ্বিতীয় দাবীর কিছু অংশ তিনি ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন, এবং বোধ হয় চল্লিশ লক্ষ টাকাতেই এই দাবী মিটিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু গাইকোয়াড় অত সহজে রাজী হতে চাননি, এবং তিনিও নিজের দাবী উপস্থিত করলেন। প্রথমতঃ বাজীরাওয়ের পিতা রঘুনাথ গুজরাট উপকূলের ব্রোচ সহরে কিছুকাল অধিকার করেছিলেন এবং পরে ইংরেজদের দান করেন। গাইকোয়াড়ের মতে ব্রোচ সহরে পেশোয়ার কোনও দাবী ছিলনা, এবং সেজন্য বড়োদাকে ক্ষতিপূরণ করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ গাইকোয়াড়কে একবার পেশোয়ার অনুরোধে আবা শেলুকর বলে একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তিনি তার জন্যেও কিছু টাকা দাবী করলেন। এইখানে মনে রাখা দরকার যে আমেদাবাদের পত্তনিতে ইংরেজের স্বার্থ ছিল। ১৭৮০ সালে ইংরেজেরা গাইকোয়াড়ের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন যে ভবিষ্যতে যদি বড়োদা এবং পুণাতে কখনও যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহলে বড়োদার কাছে পত্তন পেশোয়ার রাজ্যাংশ তারা অধিকার করবেন,[৪] এবং আমেদাবাদের এই পত্তন পুনর্ব্বার না হলে, এই সন্ধিপত্রের কোনও অর্থ থাকে না। যা হোক, এই বিরোধ মীমাংসা করবার জন্য গাইকোয়াড়ের নবনিযুক্ত দেওয়ান গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণায় এলেন। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে সাধারণতঃ যেরকম নিরীহ ব্রাহ্মণ বলে বর্ণনা করা হয় তাতে সত্যরক্ষা হয় না। তাঁর ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু তিনি নিরীহ ছিলেন না। অতি অল্পদিনের মধ্যে দরিদ্র অবস্থা থেকে বিদেশীর কৃপায় বড় হতে গেলে তখনকার ভারতবর্ষে যে বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন গঙ্গাধর শাস্ত্রীর তার অভাব ছিল না। কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণের সংখ্যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে কম নয়, এবং গঙ্গাধর সহজেই এই দলে স্থান পেতে পারেন। পূর্ব্বেকার বড়োদার দেওয়ান সীতারামকেই ইংরেজেরা "Dewan of our choice"[৫] বলেছিলেন, কিন্তু গঙ্গাধরের গুণপনার পরিচয় পাওয়া মাত্র তাঁরা পছন্দ বদলাতে দেরী করলেন না, এবং বোম্বাই সরকার এবং সুপ্রীম গভর্ণমেণ্ট উভয়েই স্থির করলেন যে দেশী রাজ্যে ইংরেজের ক্ষমতা বাড়াবার পক্ষে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর তুলনা মেলে না, এবং তাঁর কাজ "Found to be of the greatest value"[৬]

গঙ্গাধর শাস্ত্রী পুণায় উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়োদার দরবারে চক্রান্ত সুরু হল। ইংরেজের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গেই সেখানে দুটি দল দেখা দিয়েছিল। একদলের কর্ত্তা গঙ্গাধর অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ এবং অন্যদলের নেতারা রাজপরিবারের লোক। এই দলের মধ্যে রাণী তখতাবাই, রাণী গহিনাবাই, গোবিন্দরাও বন্ধুজী এবং ভগবন্তরাওয়ের নাম করা যেতে পারে। ইংরেজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে সীতারাম বোম্বাই সরকারের কাছে লোক পাঠালেন তাঁর প্রতিপত্তি পুনরায় লাভ করবার জন্যে, কিন্তু গঙ্গাধর শাস্ত্রীর বুদ্ধির কাছে তিনি ছিলেন শিশু। বিলুপ্ত ক্ষমতা উদ্ধারের আশা নেই দেখে সীতারাম রাজসভার চক্রান্তে যোগ দিলেন এবং অচিরেই অন্যতম নেতা হয়ে উঠলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্যের কিছু তফাৎ ছিল। যাঁরা রাজনৈতিক কারণে চক্রান্ত সুরু করেছিলেন তাঁরা গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে দেখতে পারতেন না এই জন্যে যে তিনি ছিলেন ইংরেজের হাতের পুতুল এবং তাঁর দ্বারাই ইংরেজ ক্রমশঃ বড়োদায় নিজের আধিপত্য বিস্তার করছিলেন। কিন্তু সীতারামের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যা তাঁর কাছে রাজনৈতিক ফললাভ করবার উপায় নয়, চরম লক্ষ্য। যেদিন গঙ্গাধর শাস্ত্রী বড়োদার বাইরে পদার্পণ করলেন, সেদিন থেকেই রাজসভায় তাঁর মৃত্যু-কল্পনা আরম্ভ হল। ভগবন্তরাও নামে রাজপরিবারের একজন লোক এবং গোবিন্দরাও বলে তাঁর এক অনুচর পুণায় এসে গঙ্গাধরের উপর নজর রাখতে আরম্ভ

(৪) British Government and native states—Sutherland.

(৫) History of Political—Military Transaction—Prinsep

(৬) Baroda state Malet

করলেন। বড়োদা দরবার এবং এঁদের মধ্যে গোপনীয় চিঠি চলতে লাগল এমন প্রমাণও পাওয়া যায়।[৬]

যাই হোক, গঙ্গাধর শাস্ত্রী আশা করেছিলেন যে পুণার সঙ্গে মীমাংসা প্রকৃতপক্ষে কঠিন হবে না, এবং তার ফলে বড়োদায় তাঁর আসন যেমন স্থায়ী হবে তেমন হবে তাঁর প্রতিপত্তি ইংরেজের কাছে। মীমাংসা হয় তো কঠিন হত না যদি পেশোয়া রাজী থাকতেন। কিন্তু আমেদাবাদের সাময়িক অধিকার বাজীরাও পূর্ব্বেই ত্রিম্বকজীকে দান করেছেন, এবং পঞ্চাশ বছরের বেশী যে হিসাব মেটানো হয়নি, তা ইচ্ছা থাকলেও সহজে হয় না। আর পেশোয়ার সঙ্গে গঙ্গাধরের আর যাই হোক প্রীতির সম্বন্ধ ছিলনা। এই ব্যাপারে ইংরেজদেরই বেশী উৎসাহ ছিল, এবং তাঁরাই প্রয়োজন হলে গঙ্গাধরকে রক্ষা করবার ভারও নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যখন দেখলেন যে এক বৎসরেও এই মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্চেনা তখন গঙ্গাধর শাস্ত্রীকে ফিরে যেতে আদেশ করলেন। এমন সময় সহসা অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বাজীরাও এবং ত্রিম্বকজীর সঙ্গে, মনে হল, গঙ্গাধরের আন্তরিকতার সূত্রপাত হয়েছে, এবং গঙ্গাধর আশা করতে লাগলেন যে পুণার প্রধান মন্ত্রীর পদ, যাতে সদাশিব মানকেশ্বর অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে কাজ তাঁকেই দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, পেশোয়ার এক আত্মীয়ার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিবাহের আয়োজন চলতে লাগল। গঙ্গাধর শাস্ত্রীর জীবনে সব চাইতে বড় নেশা ছিল ক্ষমতার। গাইকোয়াড়ের রাজত্বে ক্ষমতার শৃঙ্গে উঠতে তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। কিন্তু কোথায় চিরদরিদ্র বড়োদা এবং কোথায় পেশোয়ার রাজ্য। যে মুহূর্ত্তে তাঁর মনে দুর্নিবার লোভ দেখা দিল সেইক্ষণেই পূর্ব্বেকার প্রভুর উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতা গেল কেটে, এবং ইংরেজের সঙ্গে বন্ধন শিথিল হল। তিনি পেশোয়ার সঙ্গে বড়োদার এক নতুন চুক্তির প্রস্তাব করলেন যা বাজীরাওয়ের পক্ষে যেমন সুবিধাজনক, গাইকোয়াড়ের স্বার্থের পক্ষে তেমনই প্রতিকূল[৭]। গাইকোয়াড় এই প্রস্তাবের কোন জবাব দিলেন না। বাধা যে বরোদা থেকে আসতে পারে এ কথা গঙ্গাধর কখনও ভাবেন নি। গাইকোয়াড় অসন্তুষ্ট হবেন ভয়ে গঙ্গাধর বিয়ে ভেঙে দিলেন, কিন্তু ফিরে যেতেও সাহস করলেন না। গঙ্গাধর বিফল হলেন, এবং তাঁর এই বিফলতা তাঁর সমস্ত সফলতার চাইতে তাঁকে বেশী প্রসিদ্ধ করেছে। ইতিহাস থেকে তিনি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন শেষ জীবনের নিষ্ফল রাজনৈতিক চেষ্টার মধ্যে। কিন্তু এই সময় এমন ঘটনা ঘটল যা কেবল মাত্র তার নাম বাঁচিয়ে রাখল তা নয়, মারাঠার ক্ষমতার পরিসমাপ্তির ইতিহাসে তাঁকে প্রধান চরিত্রদের মধ্যে স্থান দিয়ে গেল।

অল্পদিন পরে পেশোয়া তীর্থদর্শনে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে গেলেন গঙ্গাধর শাস্ত্রী। পণ্ঢরপুরে বিঠোবার মন্দির, সেখানে একদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীর নিমন্ত্রণ হ'ল। সেদিন দিনের বেলায় গঙ্গাধর পেশোয়ার সঙ্গে ছিলেন, এবং আবার রাত্রিতে মন্দিরে যেতে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বারম্বার ত্রিম্বকজী অনুরোধ করায় যাত্রা করলেন। মন্দিরের কাছে জনতার মধ্যে গাইকোয়াড়ের লোক শাস্ত্রীর উপর নজর রাখছিল। মন্দির থেকে ফিরবার সময় রাত্রিতে নির্জ্জন রাস্তায় গঙ্গাধর আক্রান্ত হয়ে নিহত হলেন। গঙ্গাধরের অনুচরেরা পরদিন ত্রিম্বকজীর কাছে হত্যাকারীর শাস্তির জন্য আবেদন করলেন এবং প্রার্থনা নিষ্ফল হবে দেখে বড়োদায় ফিরে গেলেন। [জুলাই ১৮১৫]

এই ঘটনা যখন হয়, তখন পুণার ইংরেজ রেসিডেণ্ট ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টন ইলোরায় ছিলেন। তিনি খবর পেয়ে পুণায় ফিরে এসে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন এবং ত্রিম্বকজীকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। এলফিনষ্টনের ধারণা ছিল যে পেশোয়াও এই ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁকে শাস্তি দেওয়ার সুবিধা নেই বলে কেবলমাত্র ত্রিম্বকজীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা সঙ্গত মনে করলেন।

এখানে গঙ্গাধরশাস্ত্রীর মৃত্যুর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে প্রচলিত মতের কিছু অমিল হবে। প্রায় সব লেখকই এই বিষয়ে এলফিনষ্টন এবং গ্রাণ্টডাফের উপর নির্ভর করেছেন, এবং এই ব্যাপারে মোটামুটি এই দুই লেখকেরই একমত। এই সব লেখকদের ইতিহাসে, নিরীহ ব্রাহ্মণ গঙ্গাধরের কি ক'রে বিদেশে অসহায় অবস্থায়

(৭) The Rulers of Baroda—Anonymous.

পেশোয়া এবং ত্রিম্বকজীর হাতে মৃত্যু হল তার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এলফিনষ্টন এবং গ্রাণ্টডাফ কেউই বড়োদার রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যার যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে সে কথা খুলে বলেন নি। তার ফলে এই হত্যার প্রধান নায়কেরা কখনও সাধারণের কাছে পরিচিত হন নি, এবং যারা এই হত্যার সঙ্গে অল্প সংশ্লিষ্ট তাঁরাই প্রধান হয়ে উঠেছেন। এলফিনষ্টন্ বলেছেন যে পেশোয়া এবং গঙ্গাধরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল না, পণ্ঢরপুর যাওয়ার সময় পেশোয়া গঙ্গাধরকে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং হত্যার সময় ত্রিম্বকজী গঙ্গাধরকে মন্দিরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন—এ সমস্তই পুণা দরবারের চক্রান্ত নির্দ্দেশ করে। বিশেষতঃ তাঁর মতে পেশোয়া-পরিবারের সঙ্গে গঙ্গাধর শাস্ত্রীর পুত্রের যে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল, তাই ভেঙে যাওয়ায়ই পেশোয়ার ক্রোধ এবং গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যার অন্যতম কারণ[৮]। কিন্তু গ্রাণ্টডাফ স্বীকার করেছেন যে এই বিয়ের আয়োজন ভেঙে যাওয়ার পরে বাজীরাও এবং শাস্ত্রীর মধ্যে কোনও রকম মনোমালিন্যের প্রমাণ পাওয়া যায়নি, এবং সেজন্য এই অনুমান করা সঙ্গত হবে না।

অন্যদিক দিয়ে বিচার করে দেখলেও পেশোয়া যে এই অপরাধে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, তা বোঝা যায়। এ কথা তিনি জানতেন যে শাস্ত্রী নিরাপদে ফিরে না গেলে ইংরেজের কাছে তিনি দায়ী হবেন। শাস্ত্রীর হত্যায় তাঁর রাজনৈতিক সুবিধা কিছুমাত্র ছিলনা বরঞ্চ বিপদ ছিল অনেক বেশী। আর এলফিনষ্টনের বিবরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে গেলে, এ কথা ধরে নিতে হয় যে এই হত্যার সময় বাজীরাও নিজের অপরাধের অকাট্য সব প্রমাণ স্বেচ্ছায় রেখে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে, শাস্ত্রীর মৃত্যুতে যাদের লাভ হতে পারত, তাঁরা বড়োদার রাজনৈতিক নেতা। তাঁরা জানতেন যে শাস্ত্রীর যদি পুণায় মৃত্যু হয় তবে দোষ তাঁদের স্পর্শ করবে না অথচ সুবিধা হতে পারে। বড়োদা থেকে পুণায় যে সব অনুচর এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে বড়োদা-দরবারের যে পত্র ব্যবহার হয়েচে, ঘটনা এরকম না হলে সে সব অর্থহীন হয়। একজন মারাঠী লেখক প্রশ্ন করেছেন যে শাস্ত্রী যতদিন পুণায় ছিলেন ততদিন তাঁর জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করাও ইংরেজ প্রয়োজন মনে করেন নি, যদিও তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বোম্বাই সরকার দায়ী। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁর মৃত্যু হ'ল সেই সময় থেকেই তাঁরা অতিরিক্ত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন, এর কারণ কী? এবং কী জন্যে তাঁর জীবিত অবস্থায় ইংরেজ সরকার তাঁর রক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা করেন নি? এই গ্রন্থের লেখক আরো বলেছেন যে, যে সূত্রের উপর নির্ভর করে পেশোয়ার অপরাধ রচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং নির্ভরযোগ্য নয়; প্রকৃতপক্ষে ইংরেজেরা কেবলমাত্র তর্কের দ্বারা অপরাধী নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং তর্কের খাতিরে একথাও বলা চলে যে শাস্ত্রীর হত্যা ব্যাপারে ইংরেজেরা সমান দোষী।[৯] সরদেশাইও বলেছেন যে এই খুন বড়োদা থেকে করানো হয়েছিল,—পেশোয়া হয়তো আগে থেকে কিছু জানতেন কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেন নি।[১০] পেশোয়া যে শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা জানতেন একথা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু প্রকৃত ঘটনায় তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদেশী ইতিহাস-কারেরা কেবলমাত্র অস্পষ্ট অনুমান এবং অল্প সন্দেহের উপর ভিত্তি করে সত্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। বড়োদার কোনও ইতিহাসে এই সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে, এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"The part played by the Baroda Court in the assassination of the Shastri had been elsewhere overlooked or understated. This in a measure is owing to the exclusive attention paid to the writings of Mr. Elphinstone, whose assistant Mr. Grant Duff was."[১১]

(৮) Official writings of Mountstuart Elphinstone.

(৯) চুকলেলা ইতিহাস

(১০) মরাঠী রিয়াসত

(১১) The Rulers of Baroda—Anonymous

কিন্তু এই ঘটনার ফল দেখলে বোঝা যাবে যে এতে বড়োদার বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। সীতারামের দেওয়ানগিরি জুটল না, এবং ইংরেজের প্রতিপত্তিও কমল না একটুও। পেশোয়ার হল সব চাইতে ক্ষতি। এই ব্যাপারে জবাবদিহি করতে গিয়ে ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্য বাড়ল এবং ফলে লাভ করলেন ইংরেজেরা। কিন্তু এই ঘটনা না ঘটলেও ইংরেজের পেশোয়ার কাজে হস্তক্ষেপের জন্য সুযোগের অভাব হত না। পূর্ব থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ মহারাষ্ট্রের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন এবং এক উপায়ে না হক অন্য উপায়ে তাঁরা পেশোয়ার ক্ষমতাকে বাধা দিতে চেষ্টা করতেন। প্রথম মারাঠা যুদ্ধেরও বহু পূর্ব্বে ইংরেজেরা—পেশোয়ার শক্তির দুর্ব্বলতা কোথায় জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। প্রথম বাজীরাওয়ের রাজত্বকালে বোম্বাই থেকে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম গর্ডনকে লেখা একখানা চিঠি আছে, এতে পাওয়া যায় ক্যাপ্টেন গর্ডনকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তিনি যেন খোঁজ করেন পুণা দরবারে কারা পেশোয়ার শত্রু, এবং তাঁদের উপরে নির্ভর করা চলে কিনা[১২]। ১৭৬৭ সালে টমাস মস্‌টিনকে লেখা আর একখানা চিঠিতে আছে যে মারাঠার শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হচ্ছে, এই ঘটনা ইংরেজের চোখ এড়ায় নি এবং তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়েছে[১৩]। কাজেই শাস্ত্রীর মৃত্যুর সুযোগে পেশোয়ার রাজ্যশাসনে হস্তক্ষেপ করবার প্রলোভন ইংরেজের পরিত্যাগ করা কঠিন হল, এবং বিলম্ব না করে তাঁরা সত্য অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করলেন। সত্য-নির্দ্ধারণের ভার তাঁরা গ্রহণ করতে পারতেন, কেন না গঙ্গাধরশাস্ত্রীর প্রত্যাবর্ত্তনের দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা ঠিক নয় যে অপরাধীকে শাস্তি দেবার তাঁদের কোনও অধিকার ছিল[১৪]। গঙ্গাধর শাস্ত্রী ইংরেজের প্রজা ছিলেন না এবং ত্রিম্বকজী পেশোয়ার মন্ত্রী ছিলেন। ইংরেজ রেসিডেণ্ট এঁকে কী ক্ষমতা অনুসারে শাস্তি দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন বলা কঠিন। কোনও সন্ধিপত্রে এই ক্ষমতা পেশোয়া তাঁকে অর্পণ করেন নি। কিন্তু পেশোয়া যে কোনও আপত্তি করেন নি তার কারণ এই যে তিনি জানতেন যে ইংরেজের অধিকার না থাক ক্ষমতা আছে এবং সে শক্তি সন্ধিপত্রে প্রদত্ত ক্ষমতার চাইতে অনেক বেশী।

গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যার প্রায় দুমাস পরে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে এলফিনষ্টন বাজীরাওকে জানালেন যে তাঁরা অনুসন্ধান করে ত্রিম্বকজীকে অপরাধী স্থির করেছেন, তবে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তাঁদের ইচ্ছা নয়, তার বদলে আজীবন বন্দী করে রাখা হবে। পেশোয়া প্রথমে মনে করলেন যে তিনি এবং ত্রিম্বকজী পুণা থেকে পলায়ন করে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব সুবিধা মনে না হওয়াতে ভাবলেন যে ইংরেজকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হবে না। পেশোয়া ত্রিম্বকজীকে বন্দী করে বসন্তগড়ে পাঠিয়ে দিলেন এবং রটনা করলেন যে তিনি এই দুর্গে আজীবন বন্দী থাকবেন। বলা বাহুল্য, এলফিনষ্টন এত সহজে ভোলেন নি। তিনি লিখ্‌লেন যে বসন্তগড়ে ত্রিম্বককে পাঠিয়ে দেওয়াতেই পেশোয়ার কর্ত্তব্য শেষ হয়নি। ত্রিম্বকজী যদি পলায়ন করেন, কিম্বা কখনও যদি তাঁর সন্দেহজনক আচরণ দেখা যায়, তা হলে পেশোয়াকেই জবাবদিহি করতে হবে। ফাঁকি ধরা পড়েছে জেনে পেশোয়া ভীত হলেন, এবং রেসিডেণ্টের সন্দেহ দূর করবার জন্য সদাশিব মানকেশ্বর নামে তাঁর এক মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু মিথ্যাভাষণ এবং মিনতিতে যাকে ভোলানো যায় সে লোক এলফিনষ্টন ছিলেন না, কাজেই সদাশিবকে দিয়ে কাজ হল না। বাজীরাও অবশেষে মারাঠা সর্দ্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কিন্তু ত্রিম্বকজীর বন্দী হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই দেখে অগত্যা তাই স্থির হল। ১১ই সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন হিক্ নামে একজন ইংরেজ সেনাপতি বসন্তগড় যাত্রা করলেন এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর ত্রিম্বকজীকে ইংরেজরা বন্দী করলেন। সেখান থেকে তাঁকে বোম্বাইয়ের কাছে ঠানার কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হল।

ইংরেজ রেসিডেণ্ট এলফিনষ্টন বলেছিলেন যে তাঁদের

(১২) Selection from State Papers—Forrest.
(১৩) ঐ
(১৪) The last of the Peshwas—Modern Review 1922.

সঙ্গে পেশোয়ার যে বিরোধ চলেছে, তার একমাত্র কারণ ত্রিম্বকজী, এবং ত্রিম্বকজীকে পরিত্যাগ করলেই ইংরেজের মিত্রতা লাভ করা সহজ হবে। ত্রিম্বকজীকে অবশ্য পরিত্যাগ করতে হল কিন্তু ইংরেজের বন্ধুত্বলাভ সম্ভব হল না। কারণ যেখানে সর্ব্বদা অবিশ্বাস সেখানে বিরোধের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হতে দেরী হয় না। আর পেশোয়াও প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের প্রীতিলাভের জন্য খুব উৎসুক ছিলেন না। যেদিন মাধবরাওয়ের পরিত্যক্ত সিংহাসনে ইংরেজের অস্ত্রকে আশ্রয় করে পেশোয়া অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যেদিন মহারাষ্ট্রের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লেগেছিল। তারপর যখন মারাঠা সর্দ্দারেরা ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির নামে নতুন বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিলেন, তখন থেকে দক্ষিণ এবং মধ্য-ভারতবর্ষকে আশ্রয় করে অশান্তি ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শাস্ত্রীর মৃত্যুর সময় [জুলাই ১৮১৫] পেশোয়া বাজীরাও দেশ থেকে বিদেশীকে দূর করবার জন্য জল্পনা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা তিনি ইংরেজের দৃষ্টি থেকে গোপনে করতে পারেন নি। গভর্ণরজেনারেল লর্ড হেষ্টিংস তাঁর ১৮১৭ সালের ২০শে মার্চ্চ এবং ১৯শে এপ্রিল তারিখের ডায়েরীতে লিখেছিলেন যে পেশোয়া গত বৎসরের শেষ ভাগ থেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আরম্ভ করেছেন। যে সন্ধিপত্রের উপর নির্ভর করে তাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়েছে, তাঁর আচরণ সেই প্রতিজ্ঞা পত্রের অনুকূল নয়, এবং নাগপুরের রাজা, সিন্ধিয়া, হোলকার এবং গাইকোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পত্র ব্যবহার চলেছে। এঁরা ছাড়া আমীর খাঁ পিণ্ডারী এবং হায়দারাবাদের নিজামের সঙ্গে তাঁর সন্দেহজনক আচরণ দেখতে পাওয়া গিয়াছে [১৫] এবং রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্য এবং পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংয়ের অধীনে শিখদের উত্তেজিত করতেও তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।[১৬] ইংরেজেরা এই খবর পেয়ে পেশোয়াকে সাবধান করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ফল হয়নি এবং বাজীরাও এই সব সংবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। ইতিমধ্যে নতুন গোলোযোগের সূত্রপাত হল। ত্রিম্বকজীকে ঠানার কেল্লায় বন্দী করে নিয়ে যাবার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে কেবলমাত্র ইংরেজ প্রহরীর হাতে হাতে তাঁকে রাখা হয়েছিল। প্রায় এক বৎসর পরে [১২ই সেপ্টেম্বর ১৮১৬] একদিন সন্ধ্যার সময় একজন মারাঠার সাহায্যে তিনি পলায়ন করলেন এবং পুণার কাছে পর্ব্বতে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে তাঁর পেশোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কঠিন হল না। ত্রিম্বকজী কিছুকাল চুপ করেছিলেন তারপর পেশোয়ার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে দল গঠন করে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতে লাগলেন। ১৮১৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রেসিডেণ্ট পেশোয়াকে লিখলেন যে মহারাষ্ট্রের কোনও কোনও অংশে যে বিদ্রোহ দেখা যাচ্চে তা এখনই দমন করা কর্ত্তব্য। পেশোয়া জানালেন যে কোনও বিদ্রোহের কথা তিনি জানেন না. এবং যদি রেসিডেণ্ট সত্যই বিদ্রোহের কথা বিশ্বাস করে থাকেন তাহলে ইংরেজ সৈন্য দিয়ে তাঁদের দমন করতে পারেন। মার্চ্চমাস থেকে এই সব পত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগল, এবং যে মনোভাবকে পেশোয়া এবং ইংরেজ সযত্নে গোপন করে রেখেছিলেন, সে মনোভাব ক্রমশঃ প্রকাশ হতে লাগল। ২রা মার্চ্চ তারিখের একখানা চিঠিতে রেসিডেণ্ট লিখলেন যে খবর পাওয়া গিয়েছে যে ত্রিম্বকজী মহাদেব পর্ব্বতে ছিলেন এবং হয়তো এখনও আছেন; এবং এই ঘটনা থেকে আর যাই অনুমান করা যাকনা কেন, তাই পেশোয়ার পক্ষে অনুকূল হবে না, কাজেই পেশোয়া যেন এ বিষয়ে তাঁর যা বলবার আছে জানান। ৭ই মার্চ্চ তারিখে রেসিডেণ্ট পুনর্ব্বার লিখলেন যে পেশোয়া যে কাজ আরম্ভ করেছেন তার পরিণাম ভেবে দেখা উচিত। ত্রিম্বকজী এবং তার দলকে প্রশ্রয় দেওয়া মানেই ইংরেজের সঙ্গে শত্রুতা করা, এবং পেশোয়া কি মনে করেন এর পরেও ইংরেজ নিষ্ক্রিয় থাকবে? এই সব চিঠির ফলে পেশোয়া সেনাপতি বাপু গোক্‌লেকে একদল সৈন্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বাপু গোক্‌লে ফিরে এসে জানালেন যে কোনও বিদ্রোহের অস্তিত্ব নেই, এবং এ সমস্ত কথা রটনামাত্র। কিন্তু এলফিনষ্টনকে এ ছলনায় ভোলানো সহজ হল না। তিনি

(১৫) Private Journal of the Marquess of Hastings
(১৬) Thirty years in India—Bevan

খবর পেয়েছিলেন পুণা থেকে পনেরো মাইল দূরে ফুলশহর গ্রামে পেশোয়া গোপনে ত্রিম্বকজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ১১ই মার্চ্চ তিনি গভর্ণরজেনারেল হেষ্টিংসের কাছে এই সমস্ত খবর জানালেন এবং লিখলেন যে পেশোয়া এই বিদ্রোহের কথা কখনও শুনতে চান না, এবং যদি বা তাঁকে জানানো গেল, তাহলে তাঁর কর্ম্মচারীরা বলে যে এই খবর, যা আর সবাই জানে, তা তারা পূর্ব্বে কখনও শোনেনি, এবং এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁর সেনাপতি বিদ্রোহীদের মধ্যে থেকেও তাদের কথা অস্বীকার করে। রেসিডেন্ট আরও জানালেন যে যশোবন্ত রাও জিবাজী নামে একজন দস্যুর সঙ্গে পেশোয়া পত্র ব্যবহার করেছেন, এবং প্রাচীন দুর্গ সংস্কারেও তাঁর উৎসাহ দেখা যাচ্চে।

এপ্রিল মাসে ঘটনার গতির পরিবর্ত্তন হল না। বরং যে স্রোত মন্থর ছিল সে হল দ্রুত; এবং উভয় পক্ষে পত্র-ব্যবহারের বদলে অস্ত্র ব্যবহারের আয়োজন সুরু হল। পিণ্ডারীদের দমন করবার নাম করে পেশোয়া খুব বড় ফৌজ সংগ্রহ করেছিলেন, এইবার তাকে কাজে লাগাবার সময় এল। সেনাবাহিনীর সংগঠন হল, দুর্গের সংস্কার হল, মুক্তহস্তে রসদ এবং গোলাবারুদ বিতরণ আরম্ভ হল কামানের জন্য বয়েলের গাড়ী সংগ্রহ হল। পেশোয়া রায়গড়ের কেল্লাতে ধনসম্পত্তি পাঠাতে আরম্ভ করলেন। এদিকে খান্দেশে গদাজি ডাংলে নামে ত্রিম্বকের একজন আত্মীয় একদল সৈন্য নিয়ে পেশোয়ার সাহায্যে আসছিলেন। পথে কর্ণেল ডেভিস আর পেডলার তাঁকে আক্রমণ করে পরাস্ত করলেন। এই সব কারণে রেসিডেন্ট পুণায় ইংরেজ ফৌজের সংখ্যা বাড়াতে আরম্ভ করলেন এবং ২৬শে এপ্রিল কর্ণেল স্মিথের অধীনে একদল সৈন্য পুণায় এসে শহরের ধারে খড়কী গ্রামে শিবির স্থাপন করল।

৬ই মে তারিখে এলফিনষ্টন শান্তিস্থাপনের শেষ চেষ্টায় পেশোয়ার সঙ্গে দেখা করলেন। বাজীরাও যুদ্ধের আয়োজনের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন এবং জানালেন যে তিনি ইংরেজের শক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তাঁর যুদ্ধের কল্পনা করাও অসম্ভব এবং যাদের অনুগ্রহে তিনি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাদের সঙ্গে শত্রুতা পাপ। ত্রিম্বকজীকে ইংরেজরা বন্দী করবার পর তিনি কখনও দেখেন নি এবং প্রয়োজন হলে এই কথা তিনি গঙ্গাজল হাতে শপথ করে বলতে পারেন। এলফিনষ্টন এ কথার এক বর্ণও বিশ্বাস করেন নি। পরের দিন অর্থাৎ ৭ই মে তিনি পেশোয়াকে লিখলেন যে একমাসের মধ্যে ত্রিম্বকজীকে ইংরেজের কাছে বন্দী করে দেওয়া চাই, এবং তার জন্য অবিলম্বে তাঁর তিনটি দুর্গ সিংহগড়, রায়গড় এবং পুরন্দর জামীন দিতে হবে, এবং এ বিষয়ে ত্রুটি হলে যুদ্ধ আরম্ভ হতে বিলম্ব হবে না। সেই রাত্রে পেশোয়ার দূত প্রভাকর পণ্ডিত রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে চারদিনের সময় প্রার্থনা করলেন, কিন্তু এলফিনষ্টন একথায় কর্ণপাতও করলেন না। পেশোয়া প্রথমে এই সব ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ১৩ই মে পুণা পরিত্যাগ করে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন। এইজন্য ১৭ই মে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অর্থবিতরণ করা হল। কিন্তু তিনদিনের মধ্যে তাঁর মত গেল পরিবর্ত্তিত হয়ে। শেষ সময়ে পেশোয়া সাহস হারালেন, এবং ২০শে মে এলফিনষ্টনকে জানালেন যে তিনি তার কথা অনুসারে কাজ করতে রাজী আছেন। ত্রিম্বকজীকে পরিত্যাগ করতে হল এবং রেসিডেন্টের আদেশে তাঁকে ধরে দেবার জন্য আদেশপত্র প্রচারিত হল। ইংরেজের হাতে যে অপমান বাকী ছিল এই পত্রে তা পূর্ণ হয়েছে। যে ত্রিম্বকজীর জন্যে এতদিন ধরে বিরোধ এবং যার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে আপত্তি ছিল না, পেশোয়া অবশেষে তাঁকে ধরে দেবার জন্য পুরস্কার অঙ্গীকার করলেন। এই পত্রে পেশোয়া ঘোষণা করলেন যে, "যে কেউ ত্রিম্বকজীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় সরকারের কাছে এনে দিতে পারবে তাকে দু'লাখ টাকা বকশিষ এবং একহাজার টাকা আয়ের গ্রাম ইনাম দেওয়া হবে·········এবং যদি কেউ ত্রিম্বকজীর প্রকৃত সংবাদ দিতে পারেন যাতে তাকে বন্দী করা চলবে তাহলে তাঁকে পাঁচহাজার টাকা এবং এক চাহুর [১২০ বর্গ ফুট] জমি দেওয়া হবে"[১৭]। ইতিমধ্যে গভর্ণর জেনারেলের কাছ থেকে নতুন সন্ধিপত্রের সর্ত্ত রেসিডেন্ট পেয়েছিলেন, সেই অনুসারে

(১৭) ইতিহাস সংগ্রহ

১৩ই জুন ১৮১৭, পেশোয়া নতুন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এই সন্ধিপত্রে (ক) পেশোয়াকে স্বীকার করতে হল যে ত্রিম্বকজী গঙ্গাধর শাস্ত্রীর হত্যার অপরাধে দোষী; এবং প্রতিশ্রুতি দিতে হল যে ত্রিম্বকজীকে বন্দী করে তিনি ইংরেজের হাতে সমর্পণ করবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিম্বকজীর পরিবারের সবাইকে জামীনস্বরূপে বন্দী করে রাখা হবে। (খ) পেশোয়া অন্য রাজাদের সঙ্গে কোনও রকম পত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। তাঁদের কাছে দূত প্রেরণ করা, কিম্বা তাঁদের দূত পুণায় আমন্ত্রণ করা বন্ধ করতে হবে। নর্ম্মদা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর বাইরে তাঁর কোনও রকম অধিকার থাকবে না। (গ) গাইকোয়াড়ের উপর ভবিষ্যতে তাঁর কোনও দাবী চলবে না। এবং বার্ষিক চারলক্ষ টাকায় তাঁর সমস্ত দাবী মিটিয়ে ফেলতে হবে। বার্ষিক সাড়ে চারলক্ষ টাকায় গাইকোয়াড়কে আমেদাবাদ পত্তন দিতে তিনি বাধ্য থাকবেন। (ঘ) সেনাবাহিনীর ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরেজদের দিতে হবে।

এছাড়া অন্য সমস্ত সর্ত্ত এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে কয়েকটা দেওয়া হল তাতেই পেশোয়ার অসহায় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধিপত্রে নতুন সর্ত্তও বিশেষ নেই। একমাত্র ত্রিম্বকজীর ব্যাপার ছাড়া বাকি অংশ পুরাণো, কেবলমাত্র সামান্য পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ১৮০২ সালের ডিসেম্বর মাসের যে সন্ধিপত্র [বেসিনের সন্ধি] স্বাক্ষর করে বাজীরাও ইংরেজের কৃপায় রাজ্যলাভ করেছিলেন, এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে তারই পুনরাবৃত্তি। কাজেই উপলক্ষ্য নতুন হলেও এই সন্ধিপত্র সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই। পেশোয়ার যদি ধারণা হয়ে থাকে যে এই সন্ধির ফলে তাঁর সমস্ত আশা ভরসা ডুবে গিয়েছে, তা হলে মনে রাখতে হবে, যে এ তাঁর "স্বখাত সলিল" এবং তার জন্য দুঃখ করা চলে না। এই পুণার সন্ধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে it conferred great political and militray advantages,[১৮] তাহলেও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে বেসিনের সন্ধির [১৮০২] চাইতে এর সর্ত্ত একপদও অগ্রসর হয়নি। এর একমাত্র উপযোগীতা হচ্ছে এই যে এই সন্ধিপত্র অনুসারে পেশোয়ার হাত থেকে সেনাবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। লর্ড হেষ্টিংসের ভাষায় "What we imposed was only a fulfilment of an article in the treaty of Bassein, by which he was obliged to keep for us an auxiliary force of 5000 horse...we now required that districts yielding revenue to the required amount should be put into our hands for the lery and maintenance of the cavalry in question...This force though it would be the Peshwa's for every purpose of service while friendship existed between us, would go into our scale [since we were the paymasters) should his Highness venture to break with us."[১৯] এবং এ কথাও অবশ্য সত্য নয় যে এই সন্ধিপত্রের ফলে "The Maratha confedracy was finally destroyed,[২০] কেননা তাহলে ১৮১৮ সালের মারাঠা যুদ্ধের কোনও প্রয়োজন থাকত না। এই সন্ধি সম্বন্ধে এই কথা কেবল বলা চলে যে এই সন্ধিপত্র পেশোয়া এবং ইংরেজের বিরোধের মাঝে একটি অল্পস্থায়ী গণ্ডী সৃষ্টি করেছিল। যে ঘটনার স্রোতের অবশ্যম্ভাবী ফল বাজীরাওয়ের রাজ্যচ্যুতি এবং নির্ব্বাসন, এই সন্ধি তার গতিকে অল্পক্ষণের জন্য বিরাম দান করেছিল। কিন্তু এতে ইংরেজের কোনও প্রকৃত লাভ হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়। ইংরেজেরা রাজ্যশাসন করতে কম উৎসুক ছিলেন না, কিন্তু তাই বলে পেশোয়ার নামকে লুপ্ত করবার ইচ্ছা তখনও তাঁদের হয়নি, এবং বোধ করি যে সাহসেরও অভাব ছিল। ভবিষ্যতে যদি নতুন বিরোধ উপস্থিত না হত তাহ'লে পেশোয়া হয়তো আজ অন্যান্য রাজাদের মতন রাজ্যশাসন না হোক, রাজ্যভোগ করতেন। কিন্তু পুণার সন্ধি, বিরোধের অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করেনি, কিছুকালের জন্য আবৃত করেছিল। পেশোয়া কিছুদিন চুপ করেছিলেন, তার অর্থ যে তিনি পূর্ব্ব অপমান বিস্মৃত হয়েছেন, এ নয়। তিনি কেবল পুনর্ব্বার আঘাতের সুযোগ অন্বেষণ করছিলেন। অল্পদিন পরেই পেশোয়া মনে করলেন তাঁর যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় হয়েছে,—এবং তার ফলে মারাঠা ইতিহাসে শেষ পরিচ্ছেদের সূচনা হল। পূর্ব্বে বিবৃত ঘটনাবলী সেই অধ্যায়ের প্রস্তাবনা মাত্র।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

(১৮) Lord Hastings and the Indian States—Mehta

(১৯) Reply to a congratulatory address of the British Inhabitants of Calcutta, July 1818

(২০) Lord Hastings and the Indian States—Mehta

স্বপ্ন, বাস্তব, স্মৃতি

শ্রীলীলাময় রায়

৯

ডেস্‌ডিমনা যেমন ওথেলোর মুখে তাঁর বিচিত্র জীবন কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে কখন এক সময় তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন বাদলও তেমনি সুধীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুন্‌তে শুন্‌তে তার প্রতি অনুকূল হল। ভারত সম্বন্ধে তার অনুসন্ধিৎসা কিপ্‌লিংএর চেয়েও কম ছিল, কিন্তু কাহিনী শুন্‌তে সে ভালবাস্‌ত ঠিক ছোট ছেলের মত। মাতৃবিয়োগের পর এই একটি দিকে তার বৃদ্ধি হয়নি, সে শিশু থেকে গেছে। কারু কারু মাথার চুল পাক্‌লেও ভুরুর চুল থাকে কাঁচা।

বাদল বলে, "আমি ত পারতুম না। ক জন পারে। অন্ধকার রাত্রে অচেনা গ্রামের পথে বিদ্যুতের আলোয় সাম্‌নের জিনিষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আট দশ মাইল হাঁটা! শ্রীরতন একমাত্র সহচর। পোড়ো বাড়ীতে ফুটা ছাতের নীচে ছাতা খুলে রেখে শোওয়া। পাশের ঘরে মেয়ে লোকের কাঁকন কেঁপে উঠ্‌ছে থেকে থেকে। বাইরে জন মনুষ্য নেই। দূরে মক্‌ মক্‌ করছে ব্যাং আর ঝিঁঝিঁ ডাকছে ঝিঁ—ই ঝিঁ—ই। ওঃ! আপনার বর্ণিত অবস্থান যেন কল্পনেত্রে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সুধীন্‌ বাবু।"

সুধী বলে, "চরের গল্পটা যদি শুন্‌তেন!"

বাদল বলে, "নিশ্চয়। এখনি।"

সুধী বলে, "চরে গিয়ে দেখ্‌লুম নদী যার চতুর্দ্দিকে তাতে পানীয় জল নেই, কুয়া খুঁড়্‌লে ধ্বসে যায়। মেয়েরা যায় অনেকটা পথ বালুর উপর দিয়ে হেঁটে কলসী ভরে জল আন্‌তে, কিন্তু জলও তাদের ছল্‌তে চায় রোজ শুকাতে শুকাতে হটতে হটতে। চরের মানুষ হাস্‌তে হাস্‌তে বলে, চরে থাক্বার অনেক সুখ। ভাদ্রে ভাসি জ্যৈষ্ঠে পুড়ি, শীতে আগুন করবার জাল পাইনে! একটা বড় গাছ নেই যার ছায়ায় বসে রৌদ্র থেকে নিস্তার মেলে। বানের ভয়ে লোকে মাচানের উপর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে শোয়। গোরুগুলোকে চর থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু হিসাবের ভুলে বান যদি আগে এসে পড়ে তবে মাচান শুদ্ধ মানুষ গোরু বাছুর সমেত ভাসমান। বান ছাড়্‌লে জ্যান্ত যদি থাকে তবে বাড়ী ফিরে এসে দেখে জমিই নেই, তার বাড়ী।"

বাদল বলে, "য়্যাঁ!"

সুধী বলে, "জমিটুকু নদী চেটে খেয়েছে। তবে নদীর দয়ার শরীর। এক জায়গায় খায়, আরেক জায়গায় ফেলে। যেখানে খেয়েছিল আবার হয়ত সেইখানেই পরের বছর সুদে আসলে ফেরৎ দেয়। নদীকে চরের লোক প্রাণহীন মনে কর্‌তে পারে না, তাদেরই মত সে প্রাণীই। তার অশেষ রকম রঙ্গ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যারা বংশানুক্রমে চরে ঘর করেছে তাদের কাছে সে ত দেবতা। নদীর কথা ওদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরা মন খুলে রসিকতা করবে। কিন্তু পাড়ুন দেখি জমিদারের কথা। অমনি ওদের নালিশ সুরু। যে জমির উপর পাঁচ বছর আগে আপনার বাড়ী ছিল সে জমিও নেই সে বাড়ীও নেই, কিন্তু খাতায় লেখা আছে আপনি ঐ জমির প্রজা।"

"কি অন্যায়!" বাদল ক্ষেপে যায়।

সুধী হেসে বলে, "ক্রোধের দ্বারা কোনো অন্যায়ের প্রতীকার হতে পারে না, বাদল বাবু। আর অন্যায় কি এই একটা না অন্যায় কেবল জমিদারেই করে!"

"হতভাগারা মামলা করে না কেন?"

"মামলা বুঝি নিখরচায় হয়?"

"হুঁ।" বাদল ভেবে বল্ল, "গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন কর্‌লেই পারে।"

"করে না আবার। লাখে লাখে স্বনামী ও বেনামী আবেদন পড়ে লাট দরবারে, জেলা হাকিমের কাছে।

কিন্তু ওঁদের কি সময় আছে? আর আইন যেখানে বিরূপ সেখানে ওঁরাই বা কি করতে পারেন!"

বাদল কিছুমাত্র চিন্তিত না হয়ে বল্লে, "সেইজন্য ত ডেমক্রেসীর আবশ্যকতা। ভোট যখন অত্যাচারিতদের হাতে আস্‌বে তাদের প্রতিনিধিরা আইন সভায় গিয়ে আইন বদলে দেবে।"

"কিন্তু আইন সভায় ত শুধু এক পক্ষের প্রতিনিধি যাবে না, অপর পক্ষেরও। আর অপর পক্ষের প্রতিনিধিরা যে এ পক্ষের প্রতিনিধিদের আদৌ যেতে দেবে তাই বা ধরে নেব কেন? ফন্দী ফিকির ঘুষ ইত্যাদি প্রবলেরই অস্ত্র; এ ক্ষেত্রে প্রবল হচ্ছে সেই যার মগজে বুদ্ধি পকেটে টাকা।"

"না, না। ডেমক্রেসী শেষ পর্য্যন্ত এত কাঁচা থাক্‌বে না, সুধীন্ বাবু। দুর্ব্বলরাও প্রবল হবে, যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, যদি একাগ্র হয়, যদি রাজনীতি বোঝে।"

"অর্থাৎ যদি তিনশ পঁয়ষট্টি দিন চব্বিশ ঘণ্টা বক্তৃতা শোনে, চাঁদা দেয়, সমিতি করে, কার্য্যনির্ব্বাহক হয়, ক্যান্‌ভাস করে, নিজে দাঁড়ায়, অন্যকে দাঁড় করায়, হেরে গেলে আবার কোমর বাঁধে, জিৎলে আবার বক্তৃতা শোনে, লবিতে যায়, হাঁ কিম্বা না জানায়। দলগত পাশার দান যদি সুবিধামত পড়ে তবে প্রতিপক্ষ শাসিয়ে যায়, সোয়াস্তি নেই, যদি না পড়ে তবে ত His Majesty's opposition হয়ে পরম কৃতার্থতা! এই আপনার ডেমক্রেসী। এর বহ্বারম্ভ লঘু ক্রিয়া। ফল যা হয় তা দু দিনেই পচে। তবু নতুন ফলের জন্য হৈ হৈ রৈ রৈ করে আরো তিন শ পঁয়ষট্টি দিন কাটে।"

"এই ত চাই। Eternal vigilance is the price of Liberty—of Justice—of Progress."

"রক্ষে করুন, বাদল বাবু! এ দেশের গরীবও সকলের চেয়ে বড় বলে জেনেছে আত্মার মুক্তিকে; অধ্যাত্ম চর্চ্চার পরে রাজনীতি চর্চ্চার সময় করতে পারে নি। এদের রক্ষণের ভার চিরকাল রাজার উপর ছিল; শক্তিকে সমাজ রাজার উপর ন্যস্ত করেছিল প্রজাকে দিতে মুক্তির অবকাশ। আজ যদি রাজা নিজের কাজে ইস্তফা দেন, যদি অন্যায়ের প্রতীকার না করেন, যদি রাজার আমলারা যে ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা এর সুরাহা না হয়, তবে আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাই না হয় রাজা হল, এবং তাতে তার সাংসারিক খেদও ঘুচ্‌ল, কিন্তু তার আত্মার মুক্তি কি সপ্তাহে একদিন গির্জ্জায় বসে উপদেশ শুন্‌লে হবে?"

বাদল এর উত্তরে বল্ল, "আত্মা মানি বটে," কিন্তু তার মুক্তির কথা কোনোদিন ভাবিনি। আর ও জিনিষ যে সকলের বড় তা বিচারসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে, সুধীন বাবু। আপনি যে ডেমক্রেসীর বিরুদ্ধে খেলো যুক্তি না দিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গ তুললেন এর জন্য আপনাকে অভিনন্দন করতে অনুমতি দিন।"

১০

বাদলের আগ্রহাতিশয্যে পাটনায় সুধী তার সহপাঠী হল। সঙ্গীমাত্রহীন ভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে সুধীর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। আশ্রম উঠে গেছে জেল্-এ। বিদ্যাপীঠ একেবারেই উঠে গেছে। লছমনদাস এখন লছমন ঝোলায়। সে ভেবেছিল রামজির অবতার নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, কারাগার থেকে অনায়াসেই অন্তর্হিত হতে পারেন। তার কোনো লক্ষণ না দেখে গান্ধীর উপর তার অবিশ্বাস জাত হল। কাজেই সে স্বরাজের অর্থাৎ রামরাজ্যের ভাবনা বিসর্জ্জন করল।

নাছোড়বান্দা চিন্তার দল রাত্রে বাদলকে ঘুমতে দেয় না। সুধীর কাছে সে রোজ আক্ষেপ জানায়, নালিশ করে, কিন্তু সুধীর পরামর্শ শোনে না—ঘুমতে যাবার আগে মনের মন্দির থেকে প্রত্যেক চিন্তাকে বহিষ্কৃত করে না, দেব মন্দিরে যেমন দর্শন প্রার্থীমাত্রকে করে।

বলে, "কাল রাত্রে ঘড়িতে যতবার যতটা বাজ্‌ল সমস্ত শুনেছি। ঘুম কিন্তু কিছুতেই আসে না। শুয়ে শুয়ে এত বিশ্রী লাগ্‌ল যে ভাব্‌লুম গলায় দড়ি দিলে কেমন হয়। উঠে বস্‌তেই ও ভাবনা দৌড় দিয়ে পালাল। বাতি জালিয়ে অঙ্ক কষ্‌লুম, যাতে মাথাটা পরিষ্কার হয়। তখন মনে হল, আমার জীবনের উপর কি আমার অধিকার! আমাকে এরা ডেকে এনেছে বিংশ শতাব্দীর বিবর্ত্তনের নায়ক হতে। আমি গেলে এদের কি দশা হবে!"

সুধী জিজ্ঞাসা করে, "কাদের কথা বলছ ?",

"মানব জাতির। পৃথিবী শুদ্ধ মানুষের। এরা একদা পশুর সঙ্গে পশু ছিল। কোন নামহীন বাদল এদের শেখাল কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়। অন্য এক বাদল জংলা ঘাসের বীজ বুনে শস্য উৎপাদন করে এদের খাওয়াল। কোনো বাদল গোরুকে ধরে এনে চাষের কাজে বাহাল করল। কোনো বাদল ভেড়ার লোম কেটে নিয়ে শীত নিবারক পোষাক তৈরি করল। কোনো বাদল ঘোড়ার পিঠে চড়ে দেশ দেখতে চল্ল। কোনো বাদল ঘর বেঁধে রৌদ্র জল এড়াল। কে একজন বাদল অর্থহীন শব্দকে এমন করে সাজিয়ে উচ্চারণ করল যে সকলে বুঝল কি ওর অর্থ।

যুগের পর যুগ সুদীর্ঘ অধ্যবসায়ের দ্বারা বাদলরাই পশুকে মানুষ, মানুষকে সভ্য, সভ্য মানুষকে যন্ত্রবিধাতা করেছে। বিংশ শতাব্দীর বাদল বিশ্বমানবের বিবর্ত্তনকে কোন দিকে আগ বাড়িয়ে দেবে জানে না; শুধু জানে যে মানব সংসারে তাকে বিনা সর্ত্তে আনা হয়নি; মস্ত একটা দায়িত্ব নিয়ে তার আসা। ভারত গবর্ণমেণ্ট যেমন বাইরে থেকে এক্সপার্ট আনিয়ে থাকেন মানব সংসারে বাদলরা তেমনিতর এক্সপার্ট। আমি কিসের এক্সপার্ট তা আজও জানলুম না, সুধীদা; তবু আমার কেবলমাত্র বেঁচে থাকাটারও নিশ্চয় কোনো catalytic effect আছে।"

এর উত্তরে সুধী কি বলতে পারে? বাদলের মাথায় জবাকুসুম মালিশ করে দেয়। আশীর্ব্বাদ করে "সুনিদ্রা হোক্।"

সুনিদ্রা হয় না। সুধীকে শুনতে হয়, "সকলেই একে একে ঘুমে অচেতন হল, আমি কিন্তু বার বার পাশ ফিরতে লেগেছি। ঈর্ষায় ভাবলুম চীৎকার করে ওদের জাগিয়ে তুলি। কিন্তু ওরা ত বাদল নয়, ওদের কিসের দায়, ওরা কেন আমার সঙ্গে জাগরূক থাকবে? অনিদ্রা মানুষকে এত দুর্ব্বল করে! দুর্ব্বলের সৃষ্টি ভগবান। সেই ভগবানকে ডেকে বল্লুম, আজকের মত ঘুম দাও, কাল দেখা যাবে তোমাকে মানি কি না মানি।"

সুধী হেসে উঠল। নিজের রসিকতায় প্রীত হয়ে বাদলও। বাদল বল্ল, "এক শিশি য়্যাস্পিরিন কিনে এনে বালিশের নীচে রাখব। নইলে ঘোর ভগবদ্ভক্ত হয়ে হয়ত স্বর্গেই চলে যাব।"

সুধী তাকে য়্যাস্পিরিন খেতে নিষেধ করল। বল্ল, "ভগবানের কাছে অনেকে অনেক কিছু চায়, কিন্তু ঘুম চাইবার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। যদি চাইতেই হয় কোনো জিনিষ, তবে ঘুম না চেয়ে মুক্তি চেয়ো, দায়িত্ব থেকে মুক্তি, দাম্ভিকতা থেকে মুক্তি। বোলো, বিশ্বের ভাবনা বিশ্বস্রষ্টার নিজের ও একার। আমি আর অনধিকার চর্চ্চা করব না।"

বাদল রেগে বল্ল, "ভগবান না হাতী। আমি মানব ভগবান! প্রার্থনা করব ভগবানকে! শরীর যতই দুর্ব্বল হোক না কেন, মন আমার সতেজ, প্রাণ আমার প্রবল, আত্মা আমার স্বয়ম্ভব। বাইরের কোনো শক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা আমার দ্বারা নৈব নৈব চ। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারছিনে, সুধীদা। মানব আর মানবীর মধ্য থেকে যা আসে তা ত মানবশিশুর দেহ-মন-প্রাণ। বায়োলজিতে তার তথ্যাদি আছে। কিন্তু আত্মা তার মধ্যে কখন আবির্ভূত হয় ও কোথা থেকে? আত্মা তাকে আপনার বলে স্বীকার করে কি কারণে? কেন তার সঙ্গে অভিন্ন হয় তার জীবনান্তকাল অবধি?"

সুধী কতক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বল্ল, "এর উত্তর কেউ কারুকে দিতে পারে না, বাদল। নিজের কাছে বহু সাধনায় মেলে। ধর্ম্মগ্রন্থে এর দিগ্‌দর্শন আছে। কিন্তু তাতে তোমার সন্তোষ হবে না। আমারও হয় না। নিজের উপলব্ধিই আসল। অপরাপরদের উপলব্ধির সঙ্গে তাকে তুলনা করবার জন্য শাস্ত্র পাঠ করি। মিল দেখলে আনন্দ পাই, না দেখলে অন্তরের দিকে চোখ ফিরাই। শঙ্কর ভাষ্য অগ্রাহ্য করে আমার আপন ভাষ্য রচনা করি। আমার অপরোক্ষ অনুভূতি আমার আদিম প্রমাণ; গীতা উপনিষদ্ আমার মধ্যবর্ত্তী প্রমাণ; আমার স্বকীয় ভাষ্য আমার অন্তিম প্রমাণ।"—সুধী অন্তরের অতলে তলিয়ে গেল ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাদলের কথা কানে তুল্ল না। হঠাৎ অবহিত হয়ে বল্ল, "কি বলছিলে?"

বাদল পুনর্ব্বার বল্ল, "আমার আদিম, মধ্যবর্ত্তী ও অন্তিম প্রমাণ—আমার একমাত্র প্রমাণ—আমার বুদ্ধি। যাকে আমি প্রাণপণ চিন্তা করেও বুঝ্‌তে পারিনে তাকে আমি অস্বীকার করি। যেমন ভগবানকে। যাকে কতক বুঝি কতক বুঝিনে তাকে অবসর সময়ে পূরা বুঝ্‌ব বলে আপাতত স্বীকার করে নিই ও পরে রোমন্থন করি। যেমন দেহ-মন-প্রাণ থেকে বিচ্ছেদ্য আত্মা।"

১১

একদিন হরিহর ক্ষেত্র মেলা দেখ্‌তে পদব্রজে সোনপুর যাওয়া হয়েছিল। গঙ্গার একটি অংশ পার হয়ে চরের উপর দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে সুরুতে বাদল বল্ল, "তুমি চোখ বুজে পাঁচ মিনিট কি পাঁচ ঘণ্টা বস্‌লে, তারপর অম্লান বদনে ঘোষণা কর্‌লে, জানামি অহং তং পুরুষং মহান্তং—সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌ছি, মাফ কর। ডাক্তারীর বেলা তুমি যদি এরকম করতে তোমাকে বল্‌তুম হাতুড়ে। কিন্তু যেহেতু এটা ডাক্তারী নয়, মেটাফিজিক্‌স্‌, সেহেতু তোমার উপলব্ধি অর্থাৎ guess work আমার জিজ্ঞাসা-ব্যাধি নিরাময় কর্‌বে! অবশ্য তুমি যদি তোমার জম্বুদ্বীপের ভূগোলকে তোমার সোনপুর যাত্রার মধ্যবর্ত্তী প্রমাণ বলে গণ্য কর ও তার স্বকৃত ভাষ্যকে অন্তিম প্রমাণ বলে, তবে তোমার সঙ্গে তর্ক করে ফুস্‌ফুসের রোগ ডেকে আন্‌ব না।"

সুধী বল্ল, "তোমার ফুস্‌ফুস্‌ অফাট্য হোক্‌। কিন্তু অত বড় একটা অপবাদ আমাকে দিলে, বাদল? আমি হাতুড়ে? সেবার যে তোমার ফোঁড়া হয়েছিল, ডাক্তারের নজরে পড়্‌লে বর্‌ফির মত কাট্‌ত। আমি ওটাকে পুঁই-পাতা আর গরম ঘি দিয়ে সারালুম। মনে পড়ে?··· থাক্‌, থাক্‌, কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। পাগ্‌ল!"

"আমি যখন অম্লানবদনে বলি," সুধী চল্‌তে চল্‌তে বল্‌তে থাক্‌ল, "যে, বাদল আমার বন্ধু তখন আমি কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে হিসাব করে দেখিনে কতবার তুমি আমার ক উপকার করেছ, তোমার সান্নিধ্য আমাকে কয় মণ জনের আনন্দ দিয়েছে, তোমার ব্যবহার আমার কয় গজ ইঞ্চি ভাল লেগেছে। আমি অনুভব করি তোমার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ।, তাই ঘোষণা করি বাদল আমার বন্ধু, আমার ভাই।"

বাদল বাধা দিয়ে বল্ল, "কিন্তু এর জন্য তোমাকে শাস্ত্র উল্টাতে হয় কি?"

সুধী বল্ল, "আমাকে বল্‌তে দাও। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুতা আর ভগবানের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গুরুতায় সমান নয়। পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার সম্বন্ধ এতই দায়িত্বপূর্ণ যে বালিকা বধূর মত পদে পদে গুরুজনের পরামর্শ নিতে হয়। কিন্তু দায়িত্বটা ত গুরুজনের নয়, বধূর নিজের। আর দায়িত্বই কি সব কথা? মাধুর্য্য কি কিছুই নয়? মাধুর্য্যের ক্ষেত্রে গুরুজন যে বাইরের লোক। বধূর অন্তরঙ্গ সখীরাও পর। বধূ একাকিনী। নিজেই নিজের একমাত্র প্রমাণ!"

"তবে?" বাদল তুড়ি দিয়ে বল্ল, "ঘুরে ফিরে পৌছতে হল আমারই দরজায়!"

"ভাল করে শোনই না।" সুধী কৌতুক-ধমক সহকারে বল্ল, "বধূ ত সত্যি আর একলা নয়। ওর স্বামী রয়েছে শয্যায়। ও যাকে অনুভব করে সে যে ওর অর্দ্ধাঙ্গ। না, পরম মুহূর্ত্তে সে যে ওর থেকে অভিন্ন। তাই তখন প্রমাণের প্রশ্নই ওঠে না। অপরোক্ষ অনুভূতির এইখানে শ্রেষ্ঠতা। ঐ আকাশ এই আমি—দৃশ্য ও দর্শক—পরস্পরের মধ্যে তন্ময় হলে পরে প্রমাণ হয় নিষ্প্রয়োজন।"

"তোমার অর্দ্ধেক কথা আমি বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করতে পার্‌লুম না, সুতরাং গ্রহণের প্রবণতা সত্ত্বেও আদৌ গ্রহণ কর্‌লুম না, সুধীদা। যদি বিষয় ভ্রষ্ট হবার অনুমতি দাও তবে বাল্যবিবাহের তীব্র নিন্দা করে একবার রসনাবিনোদন করি।"

সুধী হাত যোড় কর্‌ল। বল্ল, "আমি বালিকাও নই, বধূও নেই, বালিকাকে বধূ কর্‌বার জন্য ব্যগ্রও হইনি, যারা করে তাদের প্রশংসাও করিনে, তবে কেন আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করবে? এটা ডিবেটিং ক্লাব্‌ও নয়।"

"বাদল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে এক জায়গায় পা ছড়িয়ে দিল। সুধী একটু ফাঁকে বস্‌ল। বল্ল, "তুমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্মণ।"

"কি!" বাদল চম্‌কে ওঠে সুধীর দিকে কটমট করে তাকাল। সুধী আত্মস্থ ভাবে বল্ল, "তুমি বৌদ্ধ—তুমি ভারতবর্ষের সেই পুত্র যে বুদ্ধির মার্গ ধরে একাকী পথ চল্ল, পথের শেষে পেল আপনার নির্ব্বাণ। পরমাত্মা আছেন কি নেই অন্বেষণও করল না। আর আমি ব্রাহ্মণ—আমি ভারতবর্ষের অপর পুত্র, আমার মার্গ অন্তর্দীপ্তির। আমি সকলের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে বদ্ধ হলুম। যিনি সকলকে নিয়ে ও সকলের উর্দ্ধে তাঁর সঙ্গে চির সম্বন্ধ যেই পাতালুম অমনি হল আমার মুক্তি।"

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বল্ল, "বেশ, আমি বৌদ্ধ। আমি মানিনে তোমার বর্ণাশ্রম, মানিনে তোমার বেদবেদান্ত, মানিনে শ্রুতি, মানিনে স্মৃতি, মানিনে তোমাদের সৃষ্ট ভগবানের তেত্রিশ কোটী মূর্ত্তি, দশ অবতার, অষ্টাদশ পুরাণ, যাগযজ্ঞ, বলিদান। ভারতবর্ষ তাঁর যে পুত্রকে ত্যজ্যপুত্র করেছিলেন, সেই একদিন বহির্ভারতে গিয়ে দিগ্বিজয়ী হয়েছিল, গড়েছিল উপনিবেশ। তাঁর অভিশাপে ভারত লাভ করলেন মুসলমানের পদাঘাত।" বাদল ফিরে দাঁড়িয়ে বল্ল, "কিন্তু সোনপুর মেলায় বৌদ্ধের স্থান কোথায়? যাও তুমি একাকী ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ।"

সুধীও রাগ করতে জানে। বল্ল, "যাও তবে তুমি একলা পাঁচ মাইল হেঁটে। রাস্তায় লোক কমে এসেছে। পড়বে বাটপাড়ের হাতে।"

কথাটা বাদলের হৃদয়ঙ্গম হয়ে মুখমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করল। বাদল চুপ করে থাকল সুধীর পক্ষ থেকে অনুনয়ের প্রত্যাশায়। সুধী মনে মনে হাসল। বল্ল, "ভারতবর্ষ যে পরাজিত হলেন তার মূল কারণ বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধ, একদিকে দেবদ্বিজ ও অপরদিকে সবার উপরে মানুষ বড়। আরো তলিয়ে দেখ্‌লে, ছন্দোবদ্ধ সমাজের সহিত সত্ত্ব-স্বাতন্ত্র্যের সংঘর্ষ জনিত তালকর্ত্তন। আরো তলিয়ে দেখ্‌লে, দেশকাল পাত্রোচিতের সঙ্গে দেশকাল-পাত্রাতীতের অসামঞ্জস্য। অতল পর্য্যন্ত গেলে, একই আত্মার অন্তর্বিগ্রহ—অন্তর্দীপ্তি বনাম বুদ্ধি। এস বাদল, আমরা সন্ধির সন্ধান করি। তোমার সর্ত্ত কি কি?"

বাদল উৎফুল্ল হয়ে ওঠে দাঁড়াল। বল্ল, "রোস। ভাব্‌তে দাও।" ভেবে বল্ল, "বাদীপক্ষের উকীল আসামী-পক্ষের বক্তৃতা আরম্ভ হবার আগে সেই বক্তৃতার একটা কল্পিত প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করেন ও সেটাকে তাসের কেল্লার মত ধরাশায়ী করে আদালতের মনে ধাঁধা লাগিয়ে দেন। আমার প্রথম সর্ত্ত এই যে তুমি আমাকে আমার কথা আমার মত করে বল্‌তে দেবে ও তার কোনোরূপ অপব্যাখ্যা করবে না। রাগ কোরো না, সুধীদা। তোমার ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের 'নির্ব্বাণ' 'শূন্য' ইত্যাদি শব্দগুলির কদর্থ করেছিল, পরমাত্মা সম্বন্ধে যারা নাস্তিকও নয় আস্তিকও নয় তাদেরকে নাস্তিক্যের দাগে দাগী করেছিল এবং কতগুলা কাল্পনিক premiseকে খণ্ডন করে বৌদ্ধ মতবাদকে পরাস্ত করল বলে ঢাক পিটিয়েছিল।"

সুধী বাধা দিয়ে বল্ল, "শঙ্কর প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-ত্যাগীকে আমি ব্রাহ্মণ বলিনে। তাঁরা আমাদের স্বরাজীদের মত বর্ণচোরা ছিলেন।"

বাদল ওকথা কানে তুল্ল না। নিজের বক্তব্য শেষ করল। "সন্ধি বল্‌তে যদি এক তরফা একটা ব্যাপার বোঝায় তবে তেমন সন্ধিপত্রে আমি সই করব না, সুধীদা।"

সুধী গম্ভীর হয়ে বল্ল, "বেশ ত। তুমি তোমার পক্ষের মামলা যেমন খুসী সাজিয়ে গুছিয়ে বল।"

২২

"আমার মার্গকে," বাদল গলা পরিষ্কার করে বল্ল, "বুদ্ধি মার্গ আখ্যা দিয়ে মোটের উপর তুমি বেঠিক্ করনি। কিন্তু আমার বুদ্ধি বৈয়াকরণিকের নয়, বিচারকের। ভাষান্তরে, Scholastic নয়, humanistic। আমি মানবের প্রতিভূ হিসাবে বিশ্বতথ্য পর্য্যবেক্ষণ করি; তথ্যের তলে কোন্ তত্ত্ব ক্রিয়াপর তার সম্বন্ধে একটা আপাত সিদ্ধান্ত খাড়া করি। সেই আপাত সিদ্ধান্তের দীর্ঘকাল পরীক্ষা চলে। পরীক্ষাফলে তার হয়ত আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেইখানে আমি থামিনে। গোড়া থেকেই আমি মানব প্রতিভূ। শেষ পর্য্যন্ত আমি তাই। আমার বিশ্বচর্চ্চা আমার মনোবিলাসের জন্য নয়। আমার principalএর জন্য—মানব মহাজাতির জন্য। যেদিন জানব যে আমি মানব

কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত, কিম্বা আমি মানবই নই, আমি শুদ্ধমাত্র আমি, a free and unattached, entity সেদিন আমি বুদ্ধিমার্গ পরিত্যাগ করব। বিশুদ্ধ বিশ্বচর্চ্চা আমার পক্ষে পরচর্চ্চার মত পরিহার্য্য। আর বুদ্ধিমার্গেরও এমন কোনো সম্মোহন নেই যে আমাকে পথের নেশায় পথ চলাবে।"

সুধী মন দিয়ে শুনছিল। বল্ল, "বলে যাও।"

"তারপর" বাদল একটানা বলে চল্ল, "আমাকে তুমি বৌদ্ধ বলে বুদ্ধের সঙ্গে উপমেয় করেছ। দুটি বিষয়ে এ উপমা ন্যায্য। প্রথমত আমি মানবের জন্য সাধনায় রত, আমারও সাধ্য মানবহিত। দ্বিতীয়ত আমারও মার্গ বুদ্ধিমার্গ, মানবের এভোল্যুশন ঐ মার্গ ধরে হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধকে সাধনার প্রেরণা দিয়েছিল মানবের দুঃখ। আমাকে প্রবর্ত্তনা দিয়েছে মানবের বিবর্ত্তন। মানুষ যদি ধাপে ধাপে তার বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছে থাকে তবে সাম্‌নের ধাপে কার হাত ধরে উঠ্‌বে? এই বাদলের। বিবর্ত্তন যে স্বতঃসম্ভব অর্থাৎ automatic তা আমি বিশ্বাস করিনে। গণমানব চিরকাল বাদলগণের দ্বারা নীয়মান হয়ে এসেছে ও হতে থাক্‌বে। তারপর সিদ্ধার্থের সিদ্ধি ও বাদলের সিদ্ধি এক নয়। তিনি পেলেন ও দিলেন নির্ব্বাণের সন্ধান। নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ ভাবাত্মকই হোক আর অভাবাত্মকই হোক নির্ব্বাণের পরে আর কিছু নেই। নির্ব্বাণই চরম। আমি কিন্তু কোথাও দাঁড়ি টান্‌বার কথা মনে আন্‌তে পারিনে। আমার সিদ্ধি হচ্ছে বৃদ্ধিতে। বৃদ্ধির সম্ভাবনা অনন্ত। আমার মত বাদলদের সাধনা ও সিদ্ধি পৌনঃপুনিক।"

বাদল শেষ কর্‌লে সুধী রঙ্গ করে বল্ল, "ঐ দেখ, মানবজাতির প্রায় সকলেই সমুপস্থিত। প্রতিভূকে চিন্‌তে পারে কে না দেখা যাক্‌।"

অত বড় মেলা নাকি এক রাশিয়ার Nijni Novgorod এ বসে। কেবল মানবজাতি কেন গৃহপালিত ও অরণ্যজাত প্রায় সকল জাতির অধিকাংশ সভ্যই সমবেত।

সুধী বল্ল, "ভাল করে আমার হাতটা ধরে থাক। একবার সঙ্গছাড়া হলে এক সপ্তাহ খোঁজ করতে হবে।"

জন্তুদের বন্ধু একমাত্র নন্তুবাবুই নন, বাদল বাবুও। একেবারে ছেলেমানুষের মত তার পশু সম্বন্ধীয় কৌতূহল। হাতী কেমন করে খায় ও কি খায় সেটা নিরীক্ষণ করতে ঘণ্টাখানেক হস্তীসভায় কাট্‌ল। তারপর তার সখ হল পাখী কিন্‌বে। ময়না চন্দনা বুল্‌বুল্‌ ইত্যাদি নাম ধাম গণ গোত্র আকৃতি প্রকৃতি কিছুই যখন তার মনঃপূত হল না তখন দোকানদার দিল তাকে এক শালিকছানা গছিয়ে। বল্ল, "এ খুব পোষ মান্‌বে, বাবুজি। কথাও বল্‌বে যদি তালিম দেন। দেখুন ভুল্‌বেন না যেন একে জ্যান্ত ফড়িং খাওয়াতে।" এই বলে সে শালিকছানার সঙ্গে এক ঝাঁক আস্ত ফড়িং ফাউ দিল। দাম যা হাঁকল তাতে সুধীর চক্ষু স্থির, কিন্তু বাদল সাহ্লাদে বল্ল, "লোকটা বোকাসোকা গোছের। নইলে মোটে একটি টাকা নিয়ে এই রত্ন বিলিয়ে দেয়!"

"লোকটা", সুধী পরিহাস করে বল্ল, "চালাক যে নয় তা মান্‌ছি। চালাক হলে বল্‌ত, এই পাখী খাঁটি বিলিতী নাইটিঙ্গেলের নাতি। এর দাম পুরা একটি পাউণ্ড, কিন্তু গুদাম খালি কর্‌বার জন্য নয় টাকা পনের আনায় বিতরণ কর্‌ছি। আর তুমিও দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে গদ্‌গদভাবে রেজ্‌কি ছেড়ে দিতে।

পাখীটার জন্য একটা খাঁচা কিন্‌তে হল। খাঁচাটা বইবার জন্য একটা কুলী কর্‌তে হল। সেই অমূল্য নিধি নিয়ে পাছে সে বেটা ফেরার হয় এইজন্য তাকে নজরবন্দী রাখ্‌বার ভার বাদল স্বয়ং নিল। বাদলের মুখে অন্য কথা নেই—"পাখীটার ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। নইলে এতবার খাঁচার শিকে ঠোকর মারে কেন।" কিম্বা "দাঁড়া। দাঁড়া। পাখীটা যে মুখ থুব্‌ড়ে মর্‌ল।" কিম্বা সুধীদা, এ পাখী মায়ের দুধ না খেতে পেলে রোগা হয়ে যাবে না ত? এর মা-কে এখন পাই কোথায়!" সুধীর পক্ষে অট্টহাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়।

পক্ষিসন্তানের মন্দভাগ্যের ভাবনা বাদলকে বিমনা করায় সে দিন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের সন্ধি স্থাপিত হল না, সুধী ও প্রসঙ্গ চেপে গেল। পরে যখন একদিন পাখীটি অকালে দেহত্যাগ করল বাদল সুধীকে বল্ল, "এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই

যে বেঁচে থাকলে ঐ পাখী শালিক জাতির এভল্যুশন কোন দিকে এগিয়ে দিতে পারত।"

সুধী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্ল, "এবং প্রশ্ন হচ্ছে আরো যে, ঐ পাখীর মৃত্যুকালে ১৯৩১ সালের সেন্‌সাসে ফড়িং সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়্‌বে।"

বাদল রাগ করে বল্লে, "যাও। তোমার সঙ্গে আড়ি।"

সুধী বল্ল, "তা হলে সন্ধি কোনোকালে হবে না? ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ চির শত্রু?"

"তাই ত," বাদলের মনে পড়ে গেল, "সে দিনকার মামলায় আপোষের কথা উঠেছিল। আমার সর্ত্ত কি কি জানতে চাও? আমার প্রথম সর্ত্ত ত জানিয়েছি। দ্বিতীয় সর্ত্ত এই যে, আমাকে জড়বাদী বল্‌তে পারবে না। আমি আত্মা মানি, যদি চ পরমাত্মা সম্বন্ধে কিন্তু জানি নে। ঐ পাখীটার আত্মা আমার কাছে পরমাত্মার চেয়ে সত্য, কারণ পাখী ও মানুষ বিবর্ত্তনের পথ বেয়ে এক সঙ্গে অনেক খানি এসেছে, তারপর ওরা ধর্‌ল একটি শাখা পথ, আমরা ও অপরাপর পশুরা ধর্‌লুম অন্য শাখা পথ।"

সুধী হেসে বাধা দিয়ে বল্ল, "অপরাপর পশুদের মধ্যে আমি নেই কিন্তু।"

বাদল কর্ণপাত কর্‌ল না। বলে চল্ল, "যাক্ আত্মা যে মানি এখানে ত তোমার সঙ্গে মিল। সন্ধি এর দ্বারা কতখানি সুগম হল ভেবে দেখ।"

সুধী বল্ল, "আত্মা বল্‌তে তুমি যা বোঝ আমি হয় ত ঠিক্ সেই জিনিষ বুঝিনে। পরমাত্মার থেকে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার অস্তিত্ব যে কেমনতর তা আমি অনুমান কর্‌তে পারিনে, অনুভব কর্‌তে ত পারিইনে। পৃথিবী ছাড়া কাশী আছে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কে যেন অমন যুক্তি দিয়েছিল।"

বাদল মাথায় হাত দিয়ে গঙ্গার বাঁধের উপর বসে পড়্‌ল। বল্ল, "তা হলে সন্ধির প্রতিষ্ঠাভূমি থাকে না, তুমি আকাশে আমি জলে। আমাকে ছেড়ে খ্রীষ্টান মুসলমানের কাছে যাও, সর্ত্তে বন্‌বে।"

১৩

"আমার আত্মা," সুধী বাদলের পাশে আসীন হয়ে গঙ্গার কূল ধরে চল্‌তে থাকা গুন টানা নৌকার পিছন পিছন উঠ্‌তে থাকা ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বল্ল, "নদী জলের ঢেউ। নদীজল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।"

"আর আমার আত্মা" বাদল নিজের মনের ভিতর অনুসন্ধান করে বল্ল, "বিশুদ্ধ ঢেউ। জলের নয়, বায়ুর নয়, ঈথরের নয়, বিদ্যুতের নয়, কোনো প্রকার জড়বস্তুর নয়। এক, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভব, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পর-সম্বন্ধ-বিহীন।"

"কিন্তু," সুধী বল্ল, "পরমাত্মা ত আমার আত্মার পর নন্। তার থেকে অভিন্ন। অথচ দৃশ্যত ভিন্ন। নদীজল ও নদীজলের ঢেউ যেমন একই জিনিষ, অথচ ধর্‌তে গেলে দুই।"

বাদল এর উত্তরে বল্ল, "এর নাম sophistry। সোজা-সুজি বল, এক না দুই।"

সুধী তবু বল্ল, "এক অথচ দুই।"

বাদল ভেঙ্গিয়ে বল্ল, "মাথা অথচ মুণ্ডু।"

বাদল যে তাকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না এর জন্য সুধী দুঃখিত হল। কিন্তু এমন ত হতে পারে যে সুধীও বাদলকে বুঝ্‌তে পার্‌ছে না। সুধী বাদলের পদতল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে বাদলের দৃষ্টিতে আত্মরূপ অবলোকন কর্‌ল। তারপর বলে উঠ্‌ল, "তোমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি কর্‌লুম।"

বাদল বিদ্রূপের সুরে বল্ল, "বটেক্।"—বিদ্রূপকালে ওর মুখে 'বটে' হয় 'বটেক্'।

সুধী তার বিদ্রূপ গায়ে মাখ্‌ল না। বলে গেল, "নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আত্মা যেন একটি স্বাধীন নক্ষত্র, স্বীয় গতিবেগে দীপ্যমান। চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, অন্ধকারপূর্ণ ব্যবধানে অন্য যে সকল নক্ষত্র দীপ্যমান তাঁরাই কতকটা নিকট আত্মীয়ের মত। নিজেকে অখণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন খণ্ড বলে বিশ্বাস হয় না।"

বাদল তখন সহজ সুরে বল্ল, "হয়েছে। কিন্তু উপমা বাদ দিয়ে কথা বল্‌তে পার না? অলঙ্কারভূষিত বাক্য অলঙ্কারেরই বাহন, সত্যের নয়।"

সুধী বল্ল, "কিন্তু সত্য যে সালঙ্কারা কন্যা।"

বাদল উষ্মার সহিত বল্ল, "তোমার সঙ্গে সন্ধি নৈব নৈব চ। আমার সত্য সালঙ্কারা কন্যা নয়, নীরস নীরেট নির্ব্বর্ণ। আমার সত্য ক্লীব লিঙ্গ।"

সুধী বেচারা করে কি! পুনর্ব্বার বাদলের স্থানে নিজেকে নিবেশ করল। বাদলের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকরণ করল। বল্ল, "তাই ত।"

বাদল সগর্ব্বে বল্ল, "কেমন?"

সুধী সবিনয়ে বল্ল, "নির্গুণ ঋজু প্রসাদশূন্য।"

"ঠিক্ বলেছ। প্রসাদশূন্য।" যেন বাক্যযোগে সুধীর পিঠ চাপ্‌ড়ে দিল।

এর পরে আর আলাপ জমে না। গঙ্গার ধারে বসে সুধী দেখ্‌তে থাকে নদীজলে প্রতিফলিত অস্তাকাশ। মেঘগুলি যেন বহুরূপী—এই গৈরিক ত এই স্বর্দ্ধা, এই লোহিত ত এই পাটল। কখন এক সময় তারা ছায়ার মত কাল হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তারপর যখন তারা আকাশ পারাপার করে তখন মনে হয় তারা যেন অন্ধকারের নিশ্বাস বায়ু।

সুধী বাদলকে ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে, "কি ভাব্‌ছ? চল, যাই।"

বাদল স্বপ্নোত্থিতের মত বলে, "গেল, গেল, হারিয়ে গেল চিন্তাটা। আর কি তার সন্ধান পাব?" এই বলে মাথার চুল ছিঁড়্‌তে থাকে।

"সন্ধিপত্র লেখা হয়েছে," সুধী ঘোষণা করে, "এবার কেবল তোমার আর আমার স্বাক্ষর করা বাকী।"

"সত্যি?" বাদল খুসী হয়ে যায়, "কি কি সর্ত্ত?"

"মোটে একটি।" সুধী মৃদু হাসে।

"মোটে একটি!" বাদল নিরাশ হয়। "আমাকে ত জান্‌তে দিলে আমার তিনটি সর্ত্তেই তুমি এক এক করে একমত। মানববুদ্ধি, স্বাধীন আত্মা ও নিরলঙ্কার সত্য।"

"না।" সুধী দৃঢ় কোমল ভাবে বল্ল, "নিজের উপর জুলুম না করে তোমার ও-সব সর্ত্তে রাজি হওয়া যায় না। আমাদের পরিভাষা হয় ত এক, কিন্তু মার্গ অনুসারে অর্থবোধ বিভিন্ন। সন্ধি হতে পারে একটি ক্ষেত্রে—স্বমার্গ নিষ্ঠায়। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান যে কত বড় বন্ধু হতে পারে তা আমার শোনা কথা নয়, চোখে দেখা। ব্রাহ্মণ বৌদ্ধে নিশ্চয়ই অমনি সৌহার্দ্দ্য ছিল। ভারতবর্ষের পরাভবের মূল কারণ আমি ঠিক্ আঁচ্‌তে পারিনি। আবার চেষ্টা করব।"

সুধীদা একমত হয়েও হল না, বাক্য প্রত্যাহার করল প্রকারান্তরে। এতে বাদল ক্ষুণ্ণ হল। বল্ল, "মার্গ ত সব মানুষের একই। আর আমি সেই মার্গের অধিনায়ক। তুমি renegade হতে চাও ত আমরা তোমার উপর জুলুম করব না। কিন্তু মার্গ কখনো দুই হতে পারে না, সুধীদা।"

তারার ভারে আকাশ যেন ঝুঁকে পড়্‌ল, ফলভারাবনত শাখার মত। সুধীর মনে হতে লাগ্‌ল হাত বাড়িয়ে দিলে নাগাল পাওয়া যায়। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে সে বল্ল, "মানবজাতি কোনোদিন সরল রেখার মত কালের খাতার পাতায় টানা হয়নি। কোনো একজন মানুষ কোনোদিন সর্ব্ব মানবের সর্ব্বময় নেতা হতে পারেন নি। তুমি আগে বাদল, তারপরে মানুষ। আগে খাঁটি বাদল হও, তার ফলে যদি মানুষের সভায় অগ্রাসন লাভ কর তবে সেটা হবে তোমার বৃহৎ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। নেতৃত্ব তোমার লক্ষ্য নয়, তোমার লক্ষ্য বেধের পুরস্কার। তোমার লক্ষ্য স্বপ্রকৃতির সীমার মধ্যে থেকে সত্যকে পাওয়া ও সত্য হওয়া। আমারও লক্ষ্য তাই। তবে আমার পুরস্কার মানুষের হাতে নেই, আমার পুরস্কার হাতে হাতে।" এই বলে সুধী বিশ্ব-সৌন্দর্য্য ধ্যান করল।

তার ধ্যানের ছোঁওয়া বাদলের মনে লাগ্‌ল। সে অনুতপ্তভাবে বল্ল, "তোমার কথা শিরোধার্য্য করব, সুধীদা। বাদল হিসাবে খাঁটি হব। মানুষ যদি আমাকে অস্বীকারও করে তবু আমি মানবের দায়িত্ব বাদলের মত বহন করব।"

সুধী সহাস্যে বল্ল, "আমার দায়িত্বটাও?"

বাদল সভয়ে বল্ল, "তোমার দায়িত্ব কিসের?"

"সৌন্দর্য্য উপাসনার। ছন্দ বর প্রার্থনার।"

"হেঁয়ালি রেখে সোজা কথায় বল।"

"আমার উপলব্ধির ভাষাই ভঙ্গীময়।"

"তবে আমি তোমার দায়িত্ব নেব না।"

"নেবে না ত? তা হলে যা তুমি বহন করবে তা মানব সকলের নয়, ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সম্প্রদায়ের। এই কথাটি মনে রেখ যে একজনকেও যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে কোটীজন ফিরে চলে।"

একটি শিকার হাত ছাড়া হলে মিশনারীর যেরূপ সন্তাপ উপস্থিত হয় বাদলেরও হল সেইরূপ। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্ল, "আচ্ছা।"

"তার মানে," সুধী সকৌতুকে বল্ল, "সেই একজন বা এক কোটীজন renegade নয়। তাদের মার্গই স্বতন্ত্র। তোমার মার্গ ইন্‌টেলেক্‌টের। আমার মার্গ ইন্‌টুইশনের। এখন কেবল স্ব স্ব মার্গে নিষ্ঠাপর থাক্‌তে হবে। এরই নাম সন্ধি।"

"তথাস্তু।"—বলে বাদল সুধীর ডান হাতটাতে ডানহাত মিলাল।

লীলাময় রায়

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

১০

কলেজ খোলবার আগেই আমরা কলকাতা চ'লে গেলাম। আমি আমার সেই আগের মেসেই রইলাম। সুরেশ কিন্তু ইডেন হোষ্টেলে গেল। সেখানে খাওয়া দাওয়া ভাল ব'লে কাকা তাকে সেইখানেই থাকতে বললেন। তার এত বড় অসুখটা গেল কি না। আর সে নিজে সন্ন্যাসী-দের উপর এত চ'টে গেছে যে কোন রকম কৃচ্ছ্রসাধনে অনিচ্ছুক। বললে, "আমি মুনি ঋষির মধ্যে একজনকে ভক্তি করি। তিনি আমার মনের মত কথা বলে গেছেন।

ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

পেট ভ'রে দুবেলা আহার না করলে বুঝব কি ক'রে?"

আলাদা ক্লাসে পড়া, আলাদা জায়গায় থাকার ফলে এবার দুজনের দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হত না। সুরেশের মত মিশুক ছেলে, তার নূতন বন্ধু জুটতে সময় লাগে না। মাঝে মাঝে এক একদিন ঝড়ের মত এসে আমার ঘরে ঢুকে বন্ধু-বান্ধবের গল্প ক'রে যেত। চার্ব্বাক ঋষির শিষ্য হয়ে তার মন বেশ হালকা হয়ে গেছে। বেশ প্রসাধনের উন্নতিও খুব দ্রুতই হচ্ছে। ধনী বন্ধুদের বাড়ী যাওয়া আসা আছে। তার শান্তিপুরে ঢাকাই ধুতি, আদ্দির পিরান, পাম্প জুতো, এ সব না করালে চলে কি করে? বন্ধুদের বড় বড় বাড়ীর ঝাড় লণ্ঠন, রঙ্গীন কাগজ-মোড়া দেওয়াল, শ্বেত পাথরের মেজে সৌখীন কৌচ কেদারার কত গল্প করত। ক্রিকেট ফুটবল সে এখন ছেড়ে দিয়েছে। নূতন ধরেছে বিলিয়ার্ড আর টেনিস। দুটোরই একটা সামাজিক কদর আছে কিনা। আমাকে টানাটানি করে কিন্তু আমি নানা ওজর আপত্তি ক'রে এ পর্য্যন্ত এড়িয়েছি। আমার পরীক্ষা আসছে একটা নূতন খেলা দেখবার সময় নেই। তাছাড়া টেনিস খেলবার সরঞ্জামের অনেক দাম, সে পয়সা আমি পাব কোথায়? আমি শরীরের খাতিরে শনিবার রবিবার কলেজের ক্লাবে মেসের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে যেতাম। অন্যদিন দুবেলা গোলদীঘির চক্কর দিতাম। খুব জোর পড়ছিলাম যাতে এবার ভাল পাশ করতে পারি। যত শীঘ্র পড়া শেষ হয় ভাল। বাবা আর আগের মত খাটতে পারছিলেন না, তাই পয়সার একটু অনটন হত। সেইটে পোষাবার জন্য একটা মাষ্টারী করতে হত। সুরেশের হোষ্টেলে এক আধবার গেছলাম। কিন্তু তার ঘরে এমন আড্ডা বসত, আর সেখানে তাসখেলা থিয়েটারের গল্প এত হত, যে আমি জুত করতে পারতাম না। এই রকমে আমাদের দুই বন্ধুর মাঝে ইদানীং অন্তর অনেকটা বেড়ে গেছল। অবশ্য এতে আমার সত্যি চিন্তার কারণ কিছু ছিল না, কেন না সুরেশ মিথ্যা কথা কাকে বলে জানত না। দেখা হলেই, কি করছে না করছে অকপটে সব বলে যেত, আর নানা বিষয়ে ছেলেবেলার মত জিজ্ঞাসা করত, "কি করি বল্ত, ভাই নরেশদা?" পড়াশুনো বিশেষ করছে না আর থিয়েটার দেখা একটু বেশী রকম হচ্ছে, এটা বুঝতে পারতাম। সে কথা তাকে বলতামও যখন দেখা হত। সেও বলে যেত "এইবার সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পড়তে লেগে যাব।" কিন্তু এত কালে ভদ্রে দেখা হত যে আমার উপদেশের বিশেষ ফল হচ্ছিল না।

এই রকম ভালয় মন্দে বছরটা কেটে গেল। সুরেশ পরীক্ষা দিয়ে উপর ক্লাসে উঠল। আমি বি-এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস হয়ে সাহিত্যে সোনার পদক পেলাম। নুরপুরে কাকা কাকীমা সুরেশ সম্বন্ধে আমায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

কাকা বললেন, "অত্যন্ত বাবু হয়েছে। ওর কি আর পড়াশুনো হবে! চরিত্র ঠিক রাখতে পারলে হয়।"

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম, "কাকা সুরেশ যতই বাবু হোক, ওর চরিত্র দোষ কিছুতেই হতে পারে না। ওর মন সরল। কখনও আমার কাছে কিছু লুকোয় না।"

কাকা বললেন, "তুমি নজর রেখো, বাবা। বড় হালকা প্রকৃতি, কখন কোন দিকে যায় তার কিছু ঠিক নেই।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাকা। ও আমার ছোট ভাই। আমি ওকে কিছুতেই চোখের আড় করব না। তবে আপনার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আপনি দেখবেন ও পাস হবেই।"

আমার মন নানা কারণে বড় খারাপ ছিল। কয়েক মাস থেকে বাবার শরীর মোটে ভাল যাচ্ছে না। সব দিন কাছারী বেরোতে পারেন না। এবার এসে দেখছি যেন বড় বুড়ো হয়ে পড়েছেন। কাকাও একদিন বলছিলেন একথা। আমায় সাবধান করে দিলেন যেন বাবাকে বেশী খাটতে না দিই।

আমি বললাম, "কাকা, আমি ত এখানে থাকিনা। যা দরকার আপনিই বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি যাতে শীগ্‌গীর নিজে রোজগার করতে পারি। তাহলেই বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন। আমার জন্য, সরলার জন্য, উনি বড় বেশী ভাবেন।"

"না বাবা, তোমার জন্য ওঁর ভাবনা নেই। উনি কেবলই বলেন যে ভগবানের কৃপায় তোমার যথেষ্ট কর্ত্তব্য বোধ হয়েছে। ভাবনা রমেশের জন্য। ওঁর কেমন একটা মনে মনে ভয় হয়েছে যে রমেশ দুর্ব্বলচিত্ত, বিপদে পড়তে পারে।"

"কেন, এ রকম মনে করার কি কিছু কারণ আছে?"

"কিছু না। মানুষের মনে যেমন এক একটা অকারণ ভয় এসে ঢোকে, এ তাই।"

সত্যি কিন্তু তা নয়। ভয়ের কারণ একটু ছিল। হয়ত কর্ত্তারা জানতেন না। রমেশ ত এই সবে কমাস বিলেত গেছে। এরই মধ্যে সে সরলাকে নিয়মিত চিঠি লেখা বন্ধ করেছে। মাসে দুখানার বেশী পত্র আসে না। আমায় বার দুই পত্র লিখেছে। বিলেতের সাহেব মেমদের সমাজ, তাদের ঘর বাড়ী, আসবাব পত্র, খাওয়া দাওয়া, আদব কায়দা এ সব তাকে কি রকম মোহিত করেছে দুবারই সে এই কথা লিখেছে। এ চিঠির কথা বাবা মাকে বলি নেই। এক পত্রে এই রকম উচ্ছ্বাস ছিল,

"ভাই, এই দেশ ছেড়ে তোদের দেশে ফিরে যেতে হবে মনে পড়লেও কান্না পায়।"

এক কথায়, সে বিলেতে মশগুল হয়ে আছে। সরলার জন্য আমার বড়ই ভাবনা হত। সুরেশকে কিছু বলা মিছে। তাকে আমি রমেশের চিঠি দেখিয়েছিলাম। সে চেঁচিয়ে উঠল,

"নরেশদা, তুই ভাবিস্ না। দরকার হয়, আমি বিলেত গিয়ে ছোকরাকে জুতো পেটা ক'রে কান ধ'রে ফিরিয়ে আনব।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "একটু আস্তে কথা বল্, সুরেশ। তোর মোটে আক্কেল নেই। মা শুনতে পেলে অনর্থ হবে।"

এ লোকের সঙ্গে আর পরামর্শ কি ক'রে চলবে? একা একা সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। সরলাকে একদিন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁরে, রমেশ তোকে কি লেখে?"

সে মুখখানি বিষণ্ণ ক'রে বললে,

"আমাদের কথা কখন কিছু খোঁজ করে না। নানা মেম সাহেবের কথা লেখে। তারা কি সুন্দর কাপড় পরে, কেমন কথাবার্ত্তা কইতে জানে, তাদের সঙ্গে গল্প-গুজব ক'রে কত আনন্দ পাওয়া যায়, আমাদের সঙ্গে তাদের কত তফাৎ, এই সব কথাতেই চিঠি ভরা।"

"তুই কি উত্তর দিস্?"

"আমারও নুরপুরের খবর কিছু দিতে লজ্জা করে তাই দিই না। যখন জানতে চায় না, কেন দেব? একবার বড় রাগ হয়েছিল তাই লিখেছিলাম যে তোমার যদি মেম সাহেবদের এত ভাল লাগে ত সেইখানেই একটা বিয়ে কর না, আমাদের কোন রকমে দিন কেটে যাবে।"

"না ভাই, ও সব লিখিস্ না। সে ত পৃথিবীর কিছু কখনও চোখ খুলে দেখে নেই, কেবল একজামীনই দিয়েছে। নূতন দেশে গিয়ে পাঁচ রকম চটকদার জিনিস দেখে শুনে

চোখ দুটো একটু ঝলসেছে। তুই তোর পড়াশুনোর কথা তাকে সব জানাস্।"

"সে আমার বড় লজ্জা করবে, দাদা। কিই বা পড়ি আমি? ও বিলেতে কত বিদুষী দেখছে।"

"বিদুষী না ঢেঁকী! তাদের নিজের ভাষা ইংরেজী তাই তারা সেটা জানে। রঙ বেরঙের কাপড় পরার সঙ্গে বিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। তুই খুব ক'রে লেখা পড়া কর দেখিনি। তোকে দেখে আবার তার চটক লেগে যাবে। "নিয়মিত চিঠি লিখিস ত?"

"আমি প্রতি হপ্তায় চিঠি লিখি। কিন্তু জবাব সব চিঠির পাই না। তোমার ভয় নেই, দাদা। আমি রাগা-রাগি করব না। দরকার হলেই তোমার পরামর্শ চাইব।"

লেখা পড়া কাজ কর্ম্ম নিয়ে সরলা সারাদিন ব্যস্ত থাকত। পড়াশুনোয় অনেক এগিয়ে গেছে, বাঙ্গলা বই সবই পড়ে। ইংরেজী বড় বড় বই পড়তে চেষ্টা করে আমরা এলে বুঝিয়ে নেয়। কিন্তু তার ছেলে মানুষ ভাবটা বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। ফুর্ত্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে, কেমন যেন গম্ভীর হয়ে থাকে। মা রমেশের কথা কিছু না জানলেও সরলার ভাব গতিক দেখতেন ত।

একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"হ্যাঁ নরেশ, জামাই চিঠিপত্র লেখে তোকে? কেমন আছে, কেমন পড়াশুনো করছে, কি বলে? মেয়েটা দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।"

আমি তাড়াতাড়ি হেসে উত্তর দিলাম, "তোমার মেয়ের বোধ হয় মন কেমন করে, মা। তুমি একটুও ভেবো না। জামাই তোমার জলপানি পাওয়া ভাল ছেলে, জান ত? এই দেখ না, পাস ক'রে ফিরে এল ব'লে। সরলা ব্যারিষ্টার সাহেবের মেম হবে বলে কি রকম জোরে লেখাপড়া করছে, দেখছ ত? এত পড়ার চাড় আগে ত দেখি নেই।" মাও খুব হাসতে লাগলেন। যাই হোক, রমেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল। একেবারে hot-house plant, কাঁচের ঘরে বড় হওয়া গাছ, ও কি প্রতিকূল ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে? কিন্তু আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? এত মেরুদণ্ডের অভাব কেন? বড় লোকের ঘরে বেড়াতে গিয়ে মানুষ কি নিজের মার ঘর ভুলে যায়? যে যায়, সে ত মানুষ নয়। না আবার আমার সেই দেমাক। আমার মেরুদণ্ডের জোর কতটা আছে তার পরীক্ষা ত হয় নেই আজও। তবে অন্যের কথা নিয়ে এত জল্পনা করার কি দরকার?

সেই মেলে সুরেশের এক চিঠি এল। রমেশ লিখেছে, ইংরেজীতে অবশ্য,

"সুরেশ, তোমার মত ছেলে ঐ দেশে পচবে এ আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমি কাকাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চ'লে এস। * * * হয়ত শুনব যে তোমার একটি তের বছরের সাজান পুতুলের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে, এইবার খেলাঘর পাতবে। না সুরেশ, তোমার মত তেজী ছেলের এ রকম ভাবে নিজেকে বলি দেওয়া উচিত নয়। যদি যথার্থ স্ত্রীলোক দেখতে চাও ত এদেশে এস। এদের জীবনই যথার্থ জীবন। আমাদের ত শুধু বেঁচে থাকা। * * দাদার কথা ছেড়ে দাও। তার বাড়ীর কর্ত্তা (pater familias) হবার জন্যই জন্ম। প্রেম কি, তা সে কোন দিন জানবে না।"

সুরেশ চিঠি প'ড়ে আগুন হয়ে গেল, "হতভাগা! সরলাকে সাজান পুতুল বলেছে। আস্পর্দ্ধা দেখ। আমি এমন ঠুকে দেব এই মেলে যে দেখবে। কিন্তু ভাই, বিলেত আমার যেতে বড় ইচ্ছা করে। তুমি বাবাকে ব'লে এটা ক'রে দাও না, নরেশ দা।"

"খবরদার, এখন ও-কথা মুখে আনিস্ না। কাকা ভয়ানক রাগ করবেন। বি-এ পাস কর, তারপর বলব।"

কলকাতা যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে একদিন খরচ পত্রের কথা হল। বাবা বললেন,

"নরেশ, আমার অবস্থা ত দেখছিস! আর বেশী দিন কাজকর্ম্ম করতে পারব ব'লে ত মনে হয় না। তোকে বেশী পয়সা পাঠাতেও পারি না। হয় ত তোর কত কষ্ট হয় পয়সার অভাবে।"

"না বাবা, তুমি ভেবো না আমার জন্য। আমার হাতে কিছু টাকা আছে। মাষ্টারী দুই একটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাইতে আমার খুব চলে যাবে। দরকার হলেই

তোমার কাছে টাকা চেয়ে নেব কিন্তু তুমি নিজেকে একটু দেখো শুনো। বেশী খাটুনি আর সহ্য হবে না।"

"নিশ্চয় দেখব শুনব। নইলে ভগবানের চরণে যে দোষী হব, বাবা। আর তুই ত বড় হয়েছিস্। তোর হাতে এখন সব ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারব শীঘ্রই। যখন ওপারের ডাক আসবে, যেন হাসি মুখে চলে যেতে পারি।"

১১

আবার কলকাতা। সুরেশ তার হোষ্টেলে গেল। আমি কাকার কাছে কথা দিয়ে এসেছি যে তার উপর নজর রাখব। তাই হোষ্টেলের কাছে এক মেসে ঘর নিলাম। পারিবারিক অবস্থা সব ভেবে চিন্তে এম-এ পড়ার ইচ্ছা ছেড়ে দিতে হল। কোমর বেঁধে আইন নিয়ে পড়লাম। এক বছর আইনের ক্লাসে যাওয়া এর আগেই হয়ে গেছে। আর দুবছর ক্লাস করলেই আইনের পরীক্ষা দিয়ে উকীল হতে পারব। খুঁজে খুঁজে দুটো মাষ্টারী জোগাড় করলাম। একটা সাধারণ রকমের আর একটা বড় মজার চাকরী। মাইনেও বেশী পাওয়ার সম্ভাবনা। দূর পাড়া গাঁয়ের এক জমীদার বাবু, নাম রাজা রত্নেন্দুনারায়ণ, কলকাতায় এসে বাড়ী নিয়ে রয়েছেন চিকিৎসার জন্য। তিনি বুড়ো মানুষ, বাত-রোগে ভুগছেন। তাঁর সন্তান নেই, এক ভাইপোকে পুষ্যি নিয়েছেন। ছেলেটি ষোল বছরের, কিন্তু বিদ্যা বেলা ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীপর্য্যন্ত। রাজা বাবু আমাকে বললেন,

"দেখুন নরেশ বাবু, আমার যে রকম শরীর গেলেই হয়। কিন্তু তখন এ হতভাগা করবে কি? প্রায় এক বছর হল ইস্কুল যাওয়া বন্ধ হয়েছে। অত বড় ছেলে, ঘুড়ী উড়িয়ে মারবেল খেলে দিন কাটায়। আমাদের ছেলে বেলায়, লেখা-পড়া না করলেও ঘোড়ায় চ'ড়ে শিকার খেলে সময় কাটত। তাতে অন্ততঃ শরীরটা বেশ গড়ে উঠেছিল। এদের সে সব ল্যাঠাও নেই, গরীবের ছেলের মত এগ্‌জামীন পাস করাও নেই। আজকালকার দিনে ইংরেজীটা নিদেন বলতে পারা চাই। কি বলেন?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ। আমার মতে লেখাপড়া সকলেরই জানা চাই।"

"আমারও তাই মত। নইলে নায়েবে উকীলে মিলে সব খেয়ে নেবে। তবে এ ছোকরার আর পাসটাস করার বয়স নেই। আপনি ওকে নিয়ে বিকেলে তিন ঘণ্টা কাটাবেন। ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কইবেন আর এখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। কখন বা পেলিটি কি উইলসন হোটেলে চাটা খাইয়ে আনবেন। তাহলে ইংরেজী কায়দাটাও শেখা হবে। বড় হয়ে মেজিষ্ট্রেট পুলিস সাহেবের সঙ্গে চা খেতে হবে ত।"

আমার বড় বিরক্ত মনে হল। একবার ভাবলাম,

"দূর হোক গে! শেষ মোসাহেবের চাকরী নেব?"

উত্তর দিচ্ছি না দেখে রাজা বললেন, "মাইনে আমি পঁচাত্তর টাকা দেব। তাহলেই হবে ত? আর গোটা দুই সুট পোষাকও আমি করিয়ে দেব। সেন মহাশয় আপনার এত তারিফ করলেন যে আমার বড় ইচ্ছা আপনি ছেলেটার ভার লেন। না জেনে শুনে যার তার হাতে ঐ রকমের ছেলেকে ত আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।"

আমি বললাম, "মাইনে যা বলছেন তার বেশী আমি আশা করি না। তবে আমায় একদিন সময় দিন। আমি আসছে বছর বি-এল পরীক্ষা দেব, তাই সময় ক'রে উঠতে পারব কি না এইটে একটু ভেবে দেখতে চাই। যদি সম্ভব হয় ত কুমারের ভার আমি নিশ্চয় নেব।" বলা বাহুল্য সেন মহাশয় এ চাকরীর বন্দোবস্ত করেছেন। রাজা মহাশয় তাঁর দেশের লোক ও বাল্য সুহৃদ্।

বাসায় ফিরে দেখি সুরেশ বসে রয়েছে। আমায় দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল, বললে,

"ভাই নরেশ দা, তুই ভয় পাস্ না। বাবার তার পেলাম, তোকে আজ রাত্রের মেলেই সুরপুর যেতে হবে।"

আমার বড় ভয় হল। কেন হঠাৎ এ রকম ডাক এল? জিজ্ঞাসা করলাম,

"কেন সুরেশ? কিছু জানিস্ কেন! আমি ত কালই বাবার চিঠি পেয়েছি।"

"না ভাই, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তুই এখন থেকে ঘেবড়ে যাস্ না। আমি যাব তোর সঙ্গে?"

"না সুরেশ, তোর পরীক্ষা এ বছর, তুই পড়। আমি

মন শক্ত করেছি। আমায় রাত্রের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসিস্, তাহলেই হল।"

তারপর সুরেশকে জমীদার বাড়ীর চাকরীর কথা বললাম। সে লাফিয়ে উঠল, "নিশ্চয় নিবি। মাসে পঁচাত্তর টাকা মাইনে কি সহজ! তা ছাড়া তোর শরীরের পক্ষেও ভাল দিনরাত লেখাপড়া করিস্, এতে নিয়মিত দুঘণ্টা গাড়ী ক'রে বেড়ান হবে। মনটাও ভাল থাকবে। তবে ঐ রকম একটা উল্লুকের সঙ্গে রোজ তিন ঘণ্টা কাটানও যে বড় জ্বালাতন, তা কি করবি? টাকার যখন দরকার, তখন ও চাকরী নেওয়াই ভাল। তুই নুরপুর চ'লে যা, দাদা, আমি কাল সকাল জমীদার বাড়ী গিয়ে চাকরী পাকা করে আসব। ছেলেটাকে দেখেছিস্?"

"হ্যাঁ দেখেছি। চালকুমড়োর মত গড়ন। তবে ঠাণ্ডা প্রকৃতির অমায়িক ছেলে ব'লে মনে হয়। নামটি বেশ, কুমার শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ রায়।"

সন্ধ্যাবেলা সুরেশ আমায় রেলে তুলে দিয়ে এল। সারা পথটা যে কি ক'রে কাটল কি বলব। বাড়ী পৌঁছে দেখি বৈঠকখানায় ডাক্তারকাকা ব'সে রয়েছেন। আমাকে দেখে একবার দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন, তারপর ব্যস্ত হয়ে উঠে আমার বুকে চেপে ধ'রে বললেন,

"দাদার বড় অসুখ, বাবা। তাই তোকে আনালাম। খুব মনে জোর করতে চেষ্টা কর। আয়, তাঁর কাছে যাই।"

ভেতর বাড়ী গিয়ে দেখলাম বাবা চোখ বুজে পড়ে রয়েছেন। সরলা কানের কাছে মুখ রেখে হরিনাম শোনাচ্ছে। আগের দিন পক্ষাঘাত হয়েছে। জীবনের কোন আশা নেই। আমি ঘরে যেতেই সরলা কানের কাছে বললে,

"বাবা, দাদা এয়েছে। একবার চেয়ে দেখ।"

চোখ খুলে এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে তাকালেন। তার পর ধীরে ধীরে আকাশ পানে চোখ ফেরালেন। মুখে মৃদু হাসি। তাঁর চিরদিনের আরাধ্য দেবতা তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। আমরা পায়ের ধূলো নিলাম। কাকা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, বৌদি, ছেলেদের নিয়ে এস।" মা আস্তে আস্তে উঠে আমাদের জড়িয়ে ধ'রে বাহিরে এলেন।

দুদিন পরে ডাক্তার কাকা আমায় ডেকে পাঠালেন। বললেন,

"নরেশ তোকে এখন খুব শক্ত হতে হবে। মাকে ছেড়ে এখন কলকাতায় যেতে পারবি ত?"

"হ্যাঁ কাকা, আপনার কাছে ওঁরা রইলেন। আমার ভাবনার কিছু নেই। আমি মনে জোর করে যত শীঘ্র পারি পরীক্ষাটা পাস হয়ে নিই।"

"এই ত দাদার ছেলের উপযুক্ত কথা। তোর কাকীমা পাশের বাড়ীতেই রইলেন। সর্ব্বদা তোর মার ও সরলার কাছে কাছে থাকবেন। এখানকার ঘরকন্না যেমন আছে তেমনি থাক তুই পাস হওয়া পর্য্যন্ত। দাদার বিষয় কর্ম্মের সমস্ত হিসেবই আছে আমার কাছে। একবার দেখে যাস্। আর যা আছে তাতে এখানকার খরচ ঠিক চ'লে যাবে।"

হিসেব দেখলাম। অল্প কিছু জোত জমা আছে, কিন্তু সম্পত্তির অধিকাংশই কোম্পানীর কাগজ। আয় মাসিক প্রায় আশী টাকা। মা বললেন যে অত টাকা তাঁর দরকার হবে না। আমি বললাম,

"তুমি যা পার ঐ থেকে জমিও। আমি সরলার মাষ্টারের মাইনে ও কেতাবের খরচ পাঠাব।" মা ও ডাক্তার কাকার হুকুমে আমি দিন পাঁচ সাত বাদ কলকাতায় ফিরে গেলাম। পূজার ছুটীতে এসে শ্রাদ্ধ শান্তি করব এই ঠিক হল।

কলকাতায় পৌঁছে সেই জমীদারের ছেলের কাজ নিলাম। সুরেশ আমায় খুব বকলে, ইতস্ততঃ করতে দিলে না।

"নরেশ দা, তোমার এখন টাকার কত রকম দরকার। এ চাকরী নিলে তোমার দুটো মাষ্টারী মিলে একশো টাকা আয় হবে। তোমার কলকাতার খরচ দিয়ে ষাট টাকা ক'রে থাকবে। তার থেকে সরলার লেখাপড়ার টাকা দিয়েও মাসে অন্ততঃ তিরিশ টাকা জমবে। এ কি ফেলে দেওয়ার জিনিস?"

"এ সব কি আমি বুঝি না, সুরেশ? তবু, বড় লোকের ছেলের মোসাহেব হতে বলিস?"

"মোসাহেব মোসাহেব করছ কেন? তুমি হবে তার মাষ্টার, গুরু। এ দুটো কি এক হল? আর বড়লোক

লেই তাকে দূরে ঠেলে রাখতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই। তোমার সম্মান বাঁচান না বাঁচান তোমার হাতে। তবে ঘৃণা করে কাউকে দূরে দূরে রাখা পাপ। নরেশদা, কত হাজার বার তুমি আমায় বলেছ, বুঝিয়েছ যে, অহঙ্কার বড় ভয়ানক জিনিস। আর আজ তুমি সেই অহঙ্কারকে মনে আসতে দিচ্ছ?"

"ভাই ঘাট হয়েছে, আর গালাগালি দিস না। আমি শরদিন্দুকে পড়াব।"

"তুমিও ভাই, আমায় মাপ ক'র। আমার শত দোষ ক্ষমা ক'রে তুমি আমায় ছোট ভাই ব'লে বুকে ক'রে রেখেছ, আর আমি তোমায় লম্বা লম্বা কথা শোনালাম। আসল কথা, তোমাদের পয়সার কষ্ট হবে এটা আমার অসহ্য।"

"না রে সুরেশ। তোর কোন দোষ হয় নেই। যখনই দেখবি আমি জাঁক করছি আমায় তখনই বকিস্। তাতে আমার মঙ্গল হবে।"

পূজার ছুটীতে দিন কয়েকের জন্য সুরপুর গিয়ে ক্রিয়াকর্ম করে এলাম। সুরেশের পরীক্ষা কাছে, তাই বেশী দিন সেখানে রইলাম না। সুরেশ মাকে দেখে গলা জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলে, বললে,

"জ্যাঠাই মা, তোমার দুই ছেলে, ভাবনা কি? আমরা তোমায় মাথায় ক'রে রাখব।"

সরলা আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। দিবারাত্র মার কাছে কাছে থাকে। সমবয়স্কাদের সঙ্গে খেলাধূলো, গল্পগুজব এক রকম ছেড়ে দিয়েছে। আমরা চ'লে আসবার আগে আমাকে চুপি চুপি বললে,

"দাদা, মা বেশী দিন থাকবেন ব'লে মনে হয় না। কিছুতেই পেট ভরে দুটো ভাত খাওয়াতে পারি না। সন্ধ্যা বেলায় ফলাহার সেও নাম মাত্র। তোমায় আমি লিখলেই তুমি মার কাছে এসো।"

খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলে। তারপর সামলে নিয়ে আবার বললে,

"তোমার শিগগীর পাস হওয়া কত দরকার তা আমি জানি। তুমি ভেবো না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। না পারলে তোমায় ডাকব।"

আমি সরলার মাথায় হাত রেখে বললাম,

"ভগবান তোকে বল দেবেন, বোন। আমি যত শীঘ্র পারি পাস করে তোদের কলকাতায় নিয়ে যাব। আর তোদের ছেড়ে থাকতে পারছি না।" (ক্রমশঃ)

চারুচন্দ্র দত্ত

নলীয়া গ্রামের হরি ঠাকুরের তমাল গাছ

শ্রীজসীম উদ্‌দীন

হরি ঠাকুরের বাড়ীর সামনে তমালের গাছ মেলিয়া চিকন পাতা
কতকাল হেথা দাঁড়ায়ে রয়েছে রোদ বৃষ্টিতে ধরিয়া শ্যামল ছাতা।
ডালে আর ডালে পাতায় পাতায় মায়া মমতায় করি সদা জড়াজড়ি
রৌদ্রে বাতাসে হাসিছে খেলিছে হেলিছে দুলিছে এ ওর গায়েতে পড়ি
টোনা আর টুনি ডাল ধরে নাচে, হলদে পাখিটি পাতায় মুছিতে ডানা
এখানে ওখানে হলুদে শ্যামলে রঙের রঙের ছবি আঁকিতেছে নানা।

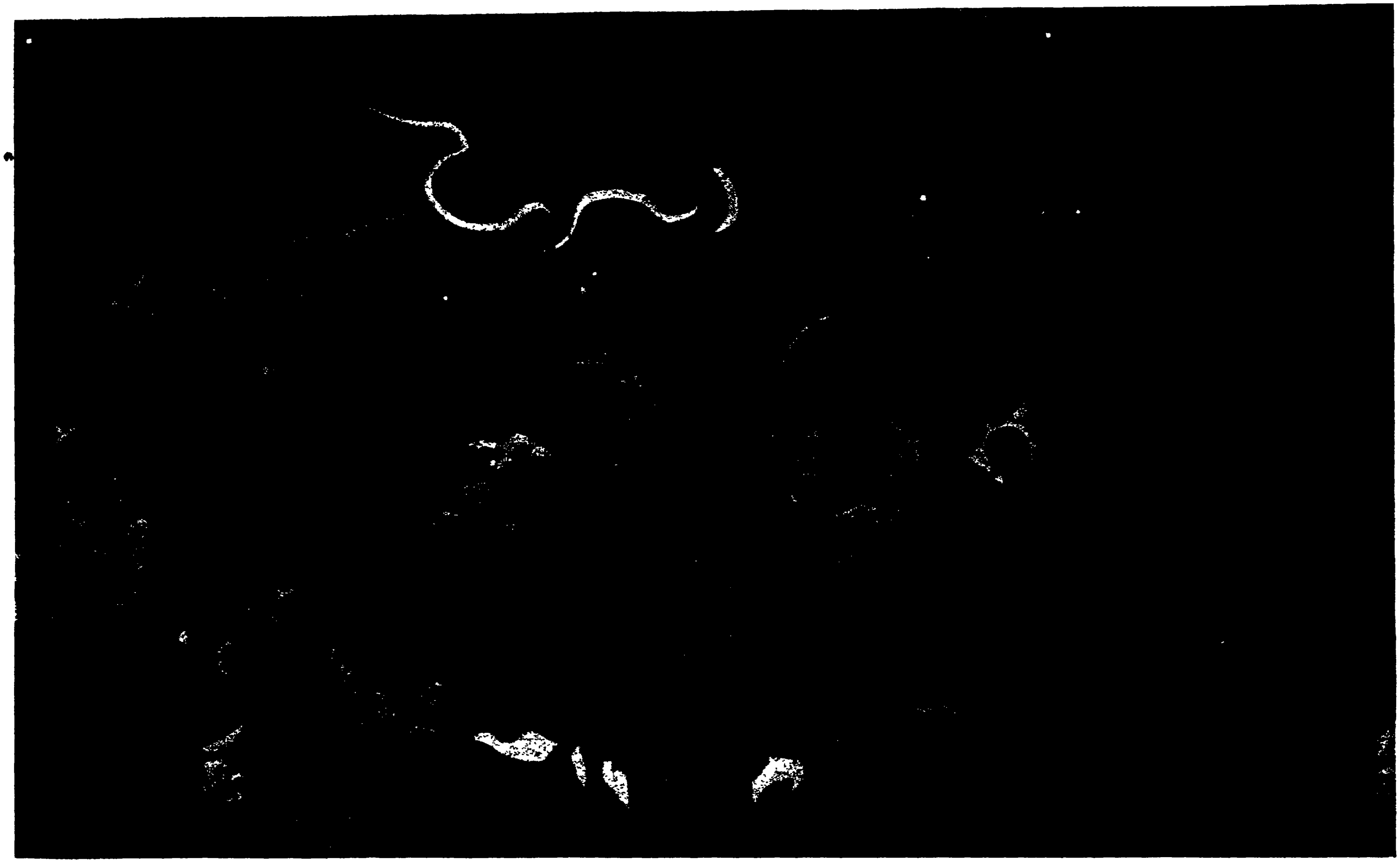
হরি ঠাকুরের বাড়ীর সামনে তমালের গাছ দাঁড়ায়ে পুকুর পাড়ে,
পাতার জালেতে বাতাস ধরিয়া ডাল এলাইয়া পুকুরের জল নাড়ে।
অনেক কালের পুরান পুকুর, শ্যাওলা পানার সরু সরু পথ ধ'রে,
ডাহুক ডাহুকী পারাপার হয় অলস চরণ মেলিয়া তাহার পরে।
বাঁধা ঘাটখানি ভাঙিয়া প'ড়েছে, ফাটলে ফাটলে গজায়েছে বুনো ঘাস
পল্লীবধূর কলস চুয়ান কালো জলে তারা স্নান করে বারোমাস।

পুকুরখানির চারিধার ঘিরি আম জাম আর কাঁঠালের ঘন বন
বুনো পাখীদের করুণ ভাষায় সারা দিনরাত করিতেছে ক্রন্দন।
সামনে তাহার তমালের গাছ আদ্যিকালের মহা তাপসীর মত
ডালে ডালে আর পাতায় পাতায় জমায়ে রেখেছে শত বরষের ক্ষত।

শুনিয়াছি কোন বৃন্দাবনেতে এমনি সে কোন তমাল তরুর তলে
ব্রজের দুলাল বাঁশী বাজাইয়া রাধারে তাহার ভুলাইত নানা ছলে।
যমুনার জলে কলস বুড়ায়ে বালিকা সে রাধা ফিরিতে গোপের ঘরে
তমালের ডালে আঁচল তাহার জড়ায়ে পড়িত মিছেমিছি নাকি ক'রে!

হরি ঠাকুরের তমালের গাছ বাঙালীর ঘরে স্নেহ ভালবাসা পেয়ে
ভুলিয়াছে তার গোঠের রাখাল ভুলিয়াছে তার গোপের কিশোরী মেয়ে
শোনে না সে আর মোহন মুরলী শোনে না রাধার কাঁকনের রিনিঝিনি
হয় না হেথায় গোয়ালার হাটে দধির ছলেতে প্রাণ লয়ে বিকি কিনি।
অনেক কালের বৃদ্ধ তমাল স্থবিরের মত দাঁড়ায়ে দীঘির তীরে
আশীর্ব্বাদের দোলাইছে ছায়া শীতল বায়ুরে শ্যামল পাতায় ঘিরে।

বন্ধ্যা নারীরা চরণে ইহার মাথা ঠুকে ঠুকে চাহে সন্তান বর
ব্রতীরা ইহারে সিঁদুরে রাঙায় মাটিতে বিছায়ে ভকতের অন্তর।
শাখায় শাখায় প্রদীপ বাঁধিয়া বিরহিণী মাতা পরবাসী ছেলে তরে
প্রতি সন্ধ্যায় হরষিত মনে ইহার আশীষ যায় যে আঁচলে ভ'রে।
গাঁয়ের মধ্যে বৃদ্ধ ঠাকুর সবার কামনা শুনিছে নীরব হয়ে
হাসিছে কাঁদিছে গ্রামবাসীদের ছোট ছোট সুখ ছোট ছোট দুখ লয়ে।



সান্ত্বনা

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৪০

শিল্পী—নিকোলাস রোরিক

চিত্রশিল্পী রোরিক

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম-এ

জগতের সৌভাগ্য—মাঝে মাঝে এমন এক একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যাঁদের লক্ষ কোটী জন সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলবার জো নেই। আপন স্বাতন্ত্র্য, আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁরা জগতে বাস করেও জগত হতে বিচ্ছিন্ন থাকেন। কোনো অদৃশ্য মহাশক্তি যেন তাঁদের তৃতীয় জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত করে দেয়, যা দিয়ে তাঁরা দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে শাশ্বত চিরন্তনের দেখা পান।

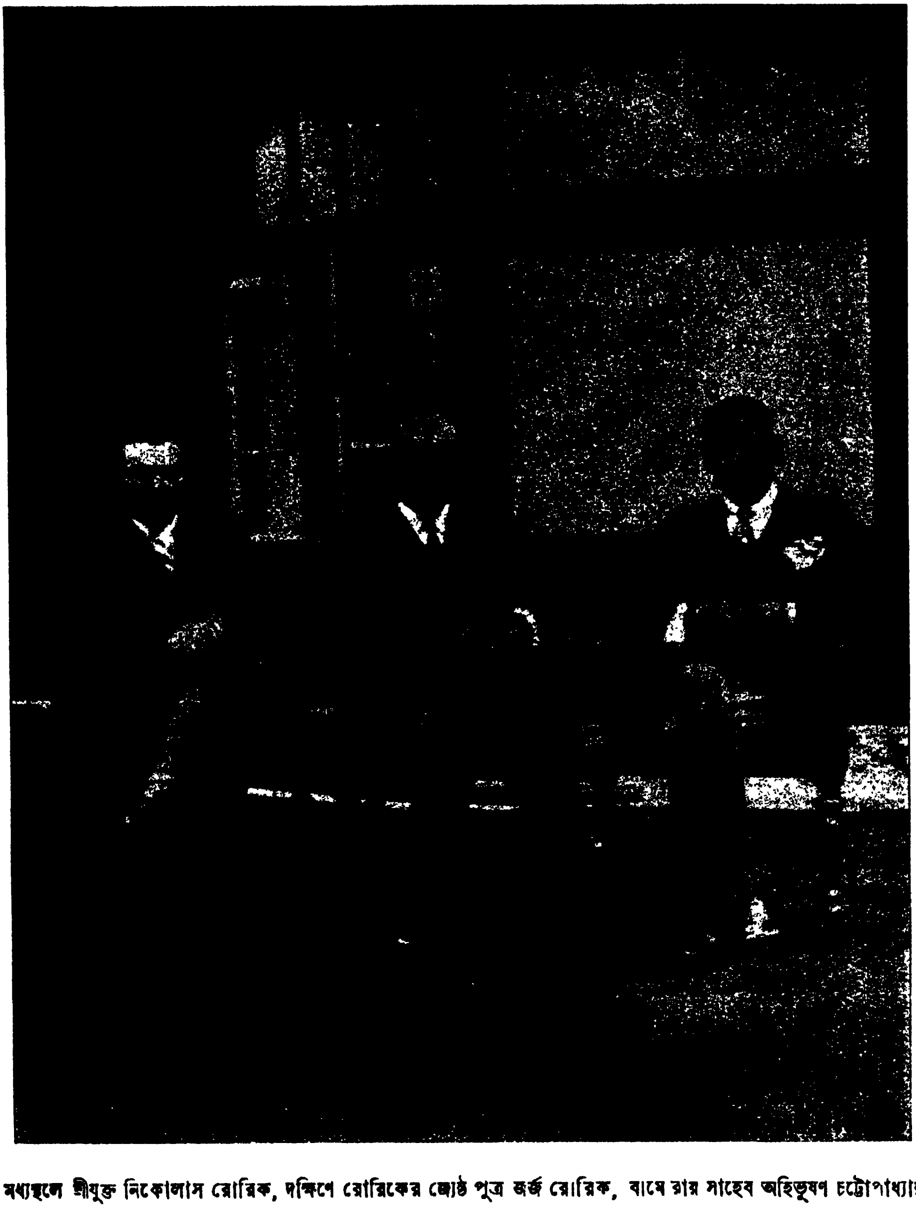
এমনি একজন ক্ষণ-জন্মা, অসাধারণ পুরুষ নিকোলাস রোরিক। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি সকল কলার উৎসমুখের সন্ধান পেয়েছেন, তাই তাঁর প্রতিভা কেবল চিত্রশিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—সৌন্দর্য্যের প্রকাশে সকল প্রকার শিল্পকলার তুল্য প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন। বিভিন্নতার মাঝে যে মহান ঐক্য চিরবিরাজমান, এই সত্যদ্রষ্টা ঋষি তারই সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাই তিনি শুধু চিত্রশিল্পী নন,—তিনি কবি, তিনি স্থপতি, তিনি শিল্পশিক্ষক, তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক, তিনি দ্রষ্টা। হয়তো তাঁর নিজেরই অগোচরে, অনাগত ভাবী কাল তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আপন ছায়া ফেলে। তাঁর "সর্পের ক্রন্দন" (Cry of the Serpent), "পাণ্ডুর শিখা" (The Lurid glare), "মানবের কর্ম্ম" (Human Deeds), "শেষ স্বর্গদূত" (Last Angel) প্রভৃতি মহাযুদ্ধের বহু আগে আঁকা ছবিগুলোতে একটা আসন্ন বিপদের করাল সঙ্কেত নির্ভুলভাবে ফুটে উঠেছে।



নিকোলাস্ রোরিক

Portrait by Mr. Svetoslav Roerich (Son of N. Roerich)

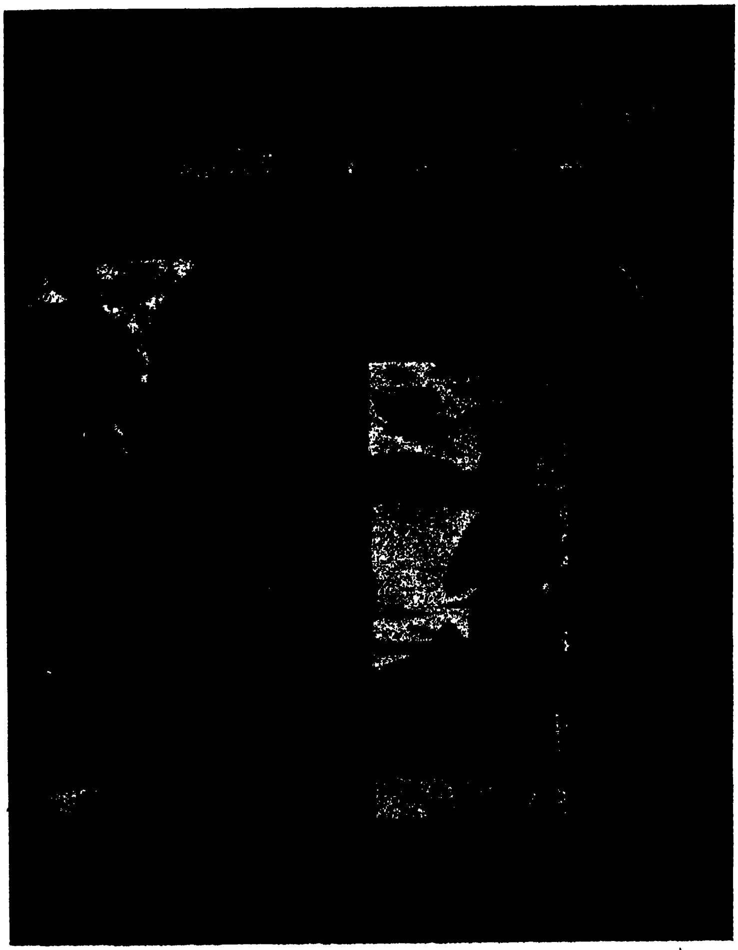
১৮৭৪ সালে তিনি রাশিয়ার অন্তর্গত লেনিনগ্রাড (তখনকার সেণ্ট পিটার্সবার্গ) সহরে এক স্ক্যাণ্ডিনেভিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ছিলেন, অতএব পুত্রকেও তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পাঠালেন। কিন্তু দেবী বীণাপাণির মধুর বীণাঝঙ্কার যাঁর কানে প্রবেশ করেছে—নীরস ব্যবহারশাস্ত্র কি তাঁকে ধরে রাখতে পারে? তাঁর প্রথম ছবি "দূত" (The messenger) এঁকে তিনি



মধ্যস্থলে শ্রীযুক্ত নিকোলাস রোরিক, দক্ষিণে রোরিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র জর্জ রোরিক, বামে রায় সাহেব অহিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
এ প্রবন্ধের সমস্ত ছবিগুলি অহিভূষণ বাবুর সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং তিনিই
অনুগ্রহ করিয়া ছবিগুলি প্রকাশের অনুমতি জানাইয়া দিয়াছেন।

Academy of Art এর ডিপ্লোমা পেলেন। তাঁর সেই ছবিখানি মস্কো ম্যুজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ কিনে নিলেন। "দূত" ছবির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে সুদূর অতীত হ'তে অবিনশ্বর ঐশ্বর্য্য সম্ভারের বোঝা নিয়ে নৌকা বয়ে চলেছে কূলহারা কাল-সাগরের বুকের ওপর দিয়ে। ছবিখানি প্রথম দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী"র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাশিয়ায় পড়া সাঙ্গ করে তিনি প্যারিসে গিয়ে M. Cormon এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে আবার রাশিয়ায় ফিরে তিনি Mir Iscusstva বা "কলাজগত"—নামক বিদ্রোহী শিল্পীদলের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তারপর হতে শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন।



দূত—The Messenger

আমেরিকায় "রোরিক ম্যুজিয়াম" নামে তাঁর শিল্পকলার এক প্রদর্শনী খোলা হয়েছে। এ সৌভাগ্য তাঁর পূর্ব্বে আর কোনো শিল্পীর ভাগ্যে ঘটেনি। রাশিয়া তো তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভার লীলাক্ষেত্র বল্লেই হয়—ষ্টেশনে, গীর্জ্জায়, প্রেক্ষাগৃহে, ম্যুজিয়ামে, সর্ব্বত্র রোরিক প্রতিভার ছাপ। রাশিয়া ও আমেরিকা ছাড়াও রোম, প্যারিস, ভিয়েনা, প্রাগ, ভিনিস, মিলান, ব্রুসেল্‌স্‌, ষ্টক হল্‌ম, কোপেন হেগেন প্রভৃতি ইয়োরোপের বহুস্থানে রোরিকের আঁকা ছবি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া আমেরিকায় The Master Institute of United Arts; Corona Mundi Inc, International Art Center আর ভারতবর্ষে পাঞ্জাব অঞ্চলের নাগগার-কুলু নামক স্থানে Urusvati Himalayan Research Institute তাঁরই ঐকান্তিক উদ্যমে স্থাপিত হয়েছে। তাঁর মতে কলাচর্চ্চা অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের সামগ্রী নয়;—মানবজীবনের পরম প্রয়োজনীয় বস্তুসকলের অন্যতম, জীবন ধারণের অপরিবর্জ্জনীয় উপাদান। শিল্পকলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি; সৌন্দর্য্য দিয়ে আমরা জয় করি, সৌন্দর্য্যের মাঝে আমরা মিলিত হই, সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি—এই হচ্ছে রোরিকের মত।



রোরিক ম্যুজিয়ম—নিউ ইয়র্ক

চল্‌তে বাধ্য করা হবে না। এইজন্য রোরিকের ছবি আঁকবার রীতি রোরিকের নিজস্ব; তার মধ্যে এমন একটা স্বকীয়তা আছে যা ভুল করবার নয়।

রোরিকের একটা নিজস্ব স্বপ্ন-জগত আছে। তাকে তিনি অতি স্পষ্ট ভাবে দেখতে পান, অতি নিবিড় করে অনুভব করেন। তাঁর চিত্র তাঁর সেই স্বপ্ন-জগতের অনবদ্য প্রকাশ। বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁর সেই স্বপ্ন-জগতের খুব বেশী মিল নেই, তাই সাধারণ লোকে তাঁর চিত্রের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। তবু সেই স্বপ্নের মায়া তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই অপরূপ রঙ ও রেখার রাজ্যের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জীবনের যত বিস্মৃত স্বপ্ন, অপূর্ণ আশা, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা তার মনে পড়তে থাকে। কবে—কোন ভুলে-যাওয়া অতীতে—সে যেন এই স্বপ্নরাজ্যে বাস করে এসেছে; ঐ রহস্যময় পর্ব্বতচূড়া, মানবাকৃতি মেঘ, অস্পষ্ট দিগন্ত-রেখা একদিন যেন তার অতি-পরিচিত ছিল। রুষ-সৈন্যেরা গত যুদ্ধের সময় সমর-ক্ষেত্র থেকে রোরিককে লিখে পাঠিয়েছিল যে সেখানে তারা তাঁর আঁকা আগুনের আভা, পাহাড়ের চূড়া, আকাশ, মেঘ সব কিছুর সাক্ষাৎ পেয়েছে। "রোরিকের রঙ," "রোরিকের মেঘ," "রোরিকের পাহাড়" এখন রাশিয়ায় লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। এর থেকেই

এই কারণেই আমরা রোরিকের চিত্রের মধ্যে এমন একটা দেশ ও কালের অতীত বিশ্বজনীনতা দেখতে পাই যা যুগে যুগে সকল দেশের কলা-রসিককে তৃপ্তিদান করবে। রোরিক শিল্প-চর্চ্চার সময় কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলবার পক্ষপাতী নন। তিনি চান প্রত্যেক শিল্পী নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আপন আপন কল্পনাকে রূপ দেবে—তার জন্য তাঁদের কোনো রকম আইনকানুনের বন্ধন মেনে



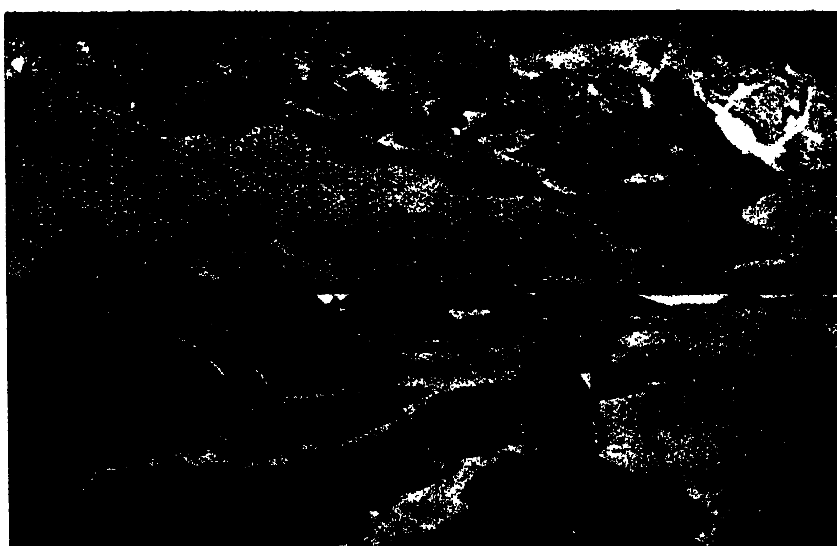
Pskov

বোঝা যায় তাঁর চিত্র সাধারণ লোকের মনেও কী অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে।



আমরা ভয় করি না—And we do not fear

কী গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অনায়াস শক্তিমত্তার সঙ্গে রোরিক তুলি ধরেন, তা তাঁর ছবির দিকে চাইলেই বোঝা যায়। তাঁর আঁকা দিগন্তের মধ্যে যে সুদূরতার আভাষ আছে, তাঁর প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রের মধ্যে যে চিরন্তন রূপটি আছে তা ফুটিয়ে তোলা কোনো ন্যূনতর শক্তির পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু তাঁর রেখা ও রঙের সার্থক সংযোজনার মধ্যে কোথাও এতটুকু অনাবশ্যক বাহুল্য দেখা যায় না। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তার অধিক একটি রেখা বা রঙের আঁচড় কোথাও নেই। ক্ষমতা কত বিরাট হলে এতটা সংযম সম্ভব!



আদেশ—The Command

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপরূপ সমন্বয় হয়েছে রোরিকের চিত্রে। প্রাচ্যের কল্পনা, প্রাচ্যের ধ্যান, প্রাচ্যের আলো ও রঙের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের ব্যস্ত গতিবেগ, বাস্তবতা ও কর্ম্ম-কুশলতার কল্যাণময় মিলন হয়েছে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। রাশিয়ার চিরতুষারাবৃত, বর্ণবৈচিত্র্যহীন, শুভ্র সৌন্দর্য্য তাঁর ছবিতে যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি সুন্দর ফুটেছে নির্ম্মল নীল আকাশের নীচে গাঢ়নীল পাহাড়ের শ্রেণী যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত স্তরে স্তরে সুদূর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। মানুষকে রোরিক কখনো বিশ্ব-প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। প্রকৃতির বিশালতার মাঝে মানুষকে তিনি সর্ব্বসময়ে তার যথার্থ স্থানটি দিয়েছেন। তার সকল সৃষ্টির মধ্যে আছে জীবনের স্পন্দন—মানুষের মধ্যে, পাহাড়ের মধ্যে, মেঘের মধ্যে, এমন কি লুক্কায়িত

গুপ্তধনের মধ্যেও। প্রকৃতি তাঁর কাছে একটা জড় পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীমাত্র নয়, তার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য আছে, দুর্ব্বার গতি বেগ আছে।



জলপ্রপাত

রোরিকের চিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"When I tried to find words to describe to myself what were the ideas which your pictures suggested, I failed. It was because the language of words can only express a particular aspect of truth and the language of pictures finds its domain in truth where words have no access...... When a picture is great we should not be able to say what it is, and yet we should see it and know." অর্থাৎ "রোরিকের ছবি বর্ণনা করবার ভাষা আমি খুঁজে পাইনে, কারণ ভাষা দিয়ে সত্যের একটি দিকমাত্র প্রকাশ করা চলে; এবং ছবির ভাষা সত্যের যে দিকটি প্রকাশ করে সেখানে বাক্যের প্রবেশাধিকার নেই,······যা সত্যকার বড় ছবি সে সম্বন্ধে আমরা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারি না সেটা কী প্রকাশ করতে চায়, তবু অন্তরের মধ্যে আমরা তার সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করি।" রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় "বাক্য যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানেই গানের আরম্ভ।" রোরিকের চিত্রের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় আবেদন আছে তাই আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। গান থেমে গেলেও তার সুরের রেশ যেমন আমাদের মনে গুঞ্জন করে ফেরে; কবিতা শেষ হয়ে গেলেও তার ব্যঞ্জনা যেমন আমাদের কানে বাজতে থাকে, তেম্নি রোরিকের ছবি দেখা শেষ হয়ে গেলেও আমরা খানিকক্ষণ যেন কোন্ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব কল্পলোকে বিচরণ করতে থাকি। সার্থক শিল্পসৃষ্টির লক্ষণই এই; ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি ঘটে না, মন সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠে তার অন্তর্নিহিত গভীরতর রস আস্বাদন করতে থাকে।

তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি ছবি নিয়ে আলোচনা করে দেখা

যাক। "মেঘ" (clouds) ছবিটার দিকে চেয়ে চেয়ে যেন আশ মিটতে চায় না, মনে হয় দিনের পর দিন এই ছবিটার দিকে চেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। গ্রীষ্মের দুঃসহ দাবদাহের অবসানে রৌদ্রদগ্ধ আকাশে যখন নিবিড় কালো মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ঘনিয়ে উঠতে থাকে, তখন সেই নবীন মেঘস্তরের মধ্যে যে আশা আনন্দের বার্ত্তা ভেসে আসে তা অবিকল ধরা পড়েছে এই ছবিটিতে। তৃষিত, শুষ্ক পৃথিবী অধীর প্রতীক্ষায় চেয়ে রয়েছে এই শ্যামস্নিগ্ধ মেঘস্তূপের দিকে। ছবিটার দিকে চেয়ে বাদল বাতাসের শীতস্পর্শ টুকুও যেন আমরা অনুভব করতে পারি।

"আজ্ঞা" (The command) ছবিটাতে একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের ওপর একজন লোক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্তীর্ণ, অসমতল প্রান্তর তার সম্মুখে প্রসারিত। আকাশের মেঘ হতে সুরু করে পাহাড়ের চূড়া ও তার ওপরের গাছপালাগুলো অবধি যেন কী এক মহা-আদেশের জন্যে শ্বাসরুদ্ধ করে প্রতীক্ষা করছে। কে এই বিরাট শক্তিশালী আজ্ঞাকারী? এই কি Shakespeare-এর Tempest নাটকের Prospero? না, যে স্পর্দ্ধিত মানব প্রকৃতিকে বশ্যতাস্বীকার করাবার আশা রাখে, এ তারই প্রতিরূপ?



অজ্ঞাত গায়ক—The Unknown Singer

"অজানা গায়ক" (The Unknown Singer) ছবিখানি রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত সুন্দর। ক্ষীণ কুহেলির অবগুণ্ঠনে ঢাকা শিলাময় নদীর ওপর দিয়ে নৌকা বেয়ে চলেছে একক যাত্রী কোন্ নিরুদ্দেশের পথে। বুঝি একে দেখেই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—



অসীমের পথে—Endless Tracks

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

কিন্তু গায়কের কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ধীর, আত্মসমাহিত সে—

"ভরা পালে চলে যায় কোনো দিকে নাহি চায়
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে।"

ছবিটির মধ্যে যেটুকু অজানা, যেটুকু রহস্যাচ্ছন্ন সেইটুকুই আমাদের মনকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে।

"অনুতাপ" (Repentance) ছবিখানি যেন শোকের প্রতিমূর্ত্তি। শুচিশুভ্র, পবিত্র দেবমন্দিরটির সম্মুখে দণ্ডায়মান হাতে তার লৌহশলাকাযুক্ত যষ্টি; পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। সাথীরা হয়তো এগিয়ে গেছে হয়তো বা পড়েছে পেছিয়ে। হয়তো লক্ষ্যে পৌছুবার পূর্ব্বেই আঁধার ঘন হয়ে নামবে। তবু, "ভাবনা করা চলবে না।" এ যেন বিশ্ব-মানবের প্রতীক আপ্রাণ বলে লক্ষ্যে পৌছুবার দুরূহ সাধনা করছে। বুকে অসীম আশা, অঙ্গে অদম্য গতির প্রেরণা; "আগে চল্, আগে চল্ ভাই।" অসীমের পানে মানবযাত্রীর চিরন্তন এগিয়ে চলা অতি সুন্দর ফুটে উঠেছে এই চিত্রটিতে।



যিনি রক্ষা করেন—The One Who Safeguards

কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত, অনুতপ্ত পাপীটিকে দেখলে মনে হয় সুতীব্র অনুশোচনার আগুনে পুড়ে সে খাঁটি সোনার মত নির্ম্মল, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জগতের অন্য কোনো শাস্তির ক্ষমতা ছিলনা তাকে এরকম পাপমুক্ত, নিষ্কলঙ্ক করে দেয়। কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী, নতমস্তক মনুষ্যটির ওপর অম্লান জ্যোৎস্নার ধারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত অজস্রধারে ঝরে পড়ছে।

"অসীমের পথে" (Endless Tracks) ছবিখানিতে একটি মানুষ তুষারাবৃত, বন্ধুর পথে অতিকষ্টে এগিয়ে চলেছে।

The Knight of the morning চিত্রটিতে মেঘের মধ্যে দুটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। রাত্রি ও প্রভাতের শুভ সন্ধিক্ষণে মুহূর্ত্তের জন্য রাত্রির সুদৃঢ় বাহুপাশে বাঁধা পড়েছে জ্যোতির্ম্ময়ী ঊষা। বিদায়ক্ষণের এই নিবিড় মুহূর্ত্তটি দেখবার জন্যে কোনো প্রাণী জেগে ছিল না, শুধু চির-মৌন বিশ্ব-প্রকৃতি রয়ে গেল এই ক্ষণিক মিলনের নির্ব্বাক সাক্ষী। আর শিল্পী তাঁর ধ্যাননেত্রে সেই মহান দৃশ্য দেখে তাকে চিরতরে বেঁধে-ফেল্লেন রেখার বন্ধনে।

"জ্যোৎস্নার গান" (The song of the moon) ছবিটিতে একটি জনহীন পুরীর ওপর পূর্ণচন্দ্রের বিমল আলোর ধারা ঝরে পড়ছে। পুরীর স্তম্ভগুলো চাঁদের আবছা আলোয় গভীর রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কালো মেঘের টুকরোটা জ্যোৎস্না পান করে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। নিশুতি রাতের এ বিরাট সৌন্দর্য্য দেখবার জন্যে কেউ জেগে নেই। চিরদিনের পরিচিত জগত জ্যোৎস্নার মায়াকাঠির ছোঁয়ায় হঠাৎ যেন কোন্ রূপকথার রাজ্যে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। তারকা পরিবেষ্টিত পূর্ণিমার চাঁদ নীল আকাশে বসে যে সুরের বন্যা বইয়ে দেয় তা শোনবার কান হয়তো সকলের থাকে না, কিন্তু এই কবি-চিত্রকরটির তা আছে, এবং এর যথার্থ রূপটি সকলকে চিনিয়ে দেবার ক্ষমতাও তিনি রাখেন।



উদয় স্বপ্ন—Dream of the Orient

"প্রাচ্যের স্বপ্ন" (Dream of the Orient) ছবিখানিতে ধ্যানমৌন, আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন প্রাচ্য সভ্যতা রূপ পেয়েছে। সংসারের সকল কর্ম্মকোলাহল হতে দূরে প্রশান্ত আবেষ্টনীর মাঝে বসে ধ্যানী প্রাচী সমাধিমগ্ন। প্রাত্যহিক তুচ্ছতা, হীন হিংসাদ্বেষ, ক্ষুদ্র হানাহানির বহু উর্দ্ধে সে; জীবনে একটিমাত্র লক্ষ্য তার—"আত্মানং বিদ্ধি।" এমনি বহুযুগব্যাপী সাধনা হতে জেগে উঠে বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন তাঁর অহিংসার বাণী, ঋষিরা বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছিলেন "সোঽহম্।" "তত্ত্বমসি।"

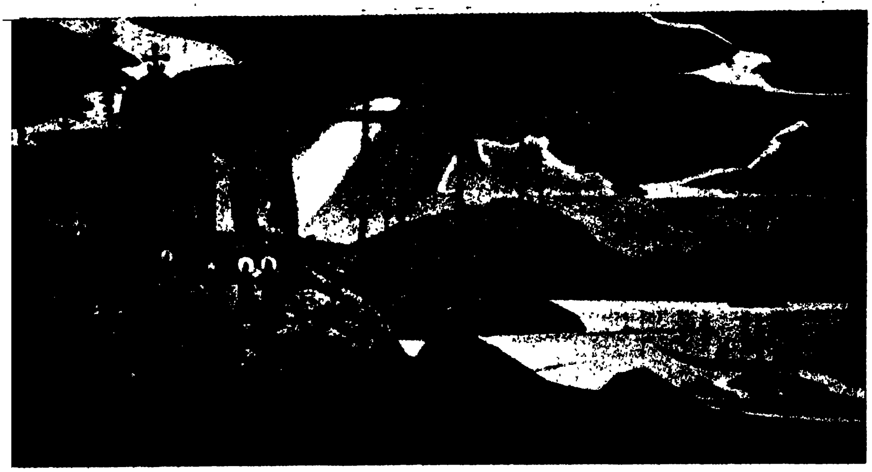
"প্রভাতের সুর" (Song of the morning) চিত্রটিতে সদ্য নিদ্রোত্থিত তরুণী শিথিল বাস সম্বৃত করতে করতে গৃহের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আদরের—হরিণ সোহাগের দাবী জানিয়ে কাছে ছুটে এসেছে। পেলব



Knight of the Morning

তনু লীলায়িত করে তরুণী অনুপম গ্রীবাভঙ্গী সহকারে স্নেহপূর্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। গৃহের ছাতে একটি ময়ূর

বসে—আকাশের মেঘ তার মনেও সাড়া জাগিয়েছে। চারিদিকে জীবনের হিল্লোল, অপরূপ পুলক-প্রবাহ। নিদ্রাতৃপ্ত জগতের



সাধু অতিথি—Saintly Guests

প্রাণে সকালের আলো যে জীবনের সাড়া আনে, অকারণেই মনের মাঝে যে আনন্দের সুর গুঞ্জন করে ফেরে তা এই মায়াবী শিল্পী নিপুণ তুলিকাপাতে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এই রেখার ছন্দ জগতের যে কোনো শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

অজ্ঞ জনসাধারণ—চিত্রের যারা কিছুই বোঝে না, আর বোধের অতীত সকল কিছুকে যারা বিষ-দৃষ্টিতে দেখে—তারাও রোরিকের মায়াসৃষ্টির সামনে মাথানত করে। কিন্তু রোরিকের শ্রেষ্ঠত্ব সেইখানেই যেখানে তিনি অতি পরিচিতের মাঝে চির-অজানার সাক্ষাৎ পান আর চিত্রের মধ্যে তাকেই সঠিক রূপটি দান করেন। যা থাকে আমাদের মগ্ন-চৈতন্যে অস্ফুট অনুভূতির রূপে, তাকেই তিনি দিনের আলোয় সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ করেন। রোরিকের



উত্তর তিব্বতের চান্‌টাঙ্ -Chantang in North Tibet

যে ছবিগুলোর বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবে আমাদের পরিচয় ঘটেনি, সেগুলোর মধ্যেও আমরা একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ অনুভব করি। সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও মনে হয় তাদের মধ্যে



উষা-গীতি—Song of the Morning

এমন একটা গভীর মোহ আছে যা কিছুতেই এড়ানো যায় না। তার Messiah series এর চিত্রগুলো এই শ্রেণীর।

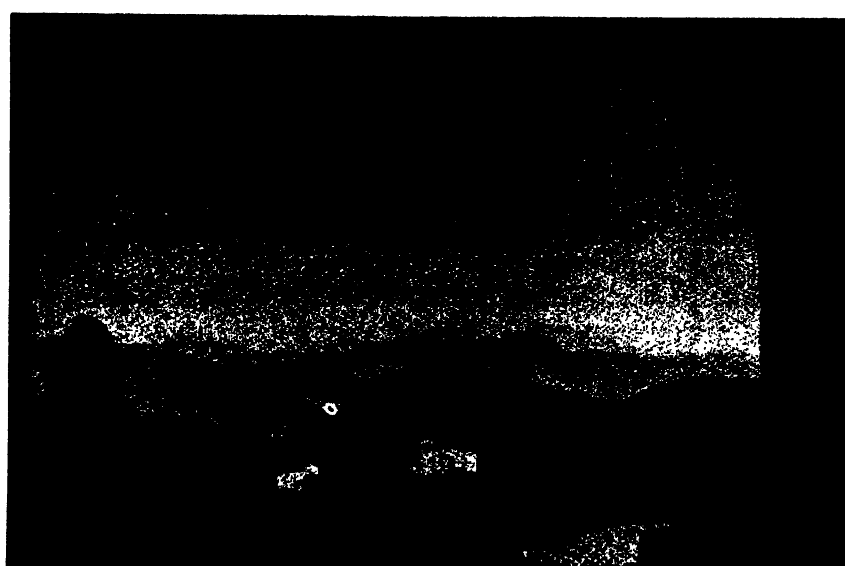
এই সমর-ঋণ, অর্থ-নৈতিক সঙ্কট ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার দিনেও রোরিক আশা করেন পৃথিবীর প্রকৃত মিলনের পথ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি—জাতিসঙ্ঘ বা আন্তর্জ্জাতিক মিলন-বৈঠক নয়। যন্ত্র সভ্যতাকে তিনি ঘৃণা করেন। লৌহ দানব পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, এ কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। কলা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, জ্ঞান সম্পদ ও কৃষ্টি-



The Shore near Ledenetz

বিনিময় দ্বারাই বিভিন্ন জাতি মিলিত হতে পারে। সত্যকার শিল্পকলা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে আনন্দ দান করে। শুধু যে ম্যুজিয়মে, রঙ্গমঞ্চে বা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিল্পকলার স্থান তা নয়, তিনি চান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তার অবিচ্ছিন্ন সাহচর্য্য। "কারাকক্ষ-গুলিও সুন্দর সুন্দর ছবিদ্বারা সুশোভিত করে তোলো, তাহলে কারা-যন্ত্রণাও আর ক্লেশকর বলে বোধ হবে না।"—এই তাঁর মত।

দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণতার বহু উর্দ্ধে রোরিক। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি বিশ্বের গৌরব, তাঁর চিত্রসম্ভার বিশ্বের সম্পত্তি। এ পর্য্যন্ত তিনি প্রায় দু'হাজার ছবি এঁকেছেন। সেগুলো এক একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। প্রত্যেক দেশের উচিত তাঁর ছবি সংগ্রহ করে রাখা, যেহেতু কোনো ছবির নিগূঢ় ভাবটুকু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিশ্বের চিত্রশিল্প-সম্পদকে এই নিরলস সত্যসুন্দরের পূজারী সমৃদ্ধ, পরিপুষ্ট করে তুলেছেন। তাই জগতের সকল জাতি আজ তাঁর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছে। সত্য বলতে কি, এক রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কোনো শিল্পীই বোধ হয় জীবিতকালে



Terra Slavonica

৬১



আমরা মাছ ধরেই চলেছি—And We Continue Fishing

এত সম্মান লাভ করেন নি। নিউ ইয়র্কে নিকোলাস রোরিকের নামে অতি বৃহৎ কলা-ভবন (রোরিক মুাজিয়ম) স্থাপিত ক'রে আমেরিকাবাসিগণ রোরিকের প্রতি যে অসাধারণ সম্মান প্রদর্শন করেছেন অন্য কোনো চিত্রশিল্পীর জীবদ্দশায় তেমন সম্মান লাভ কখনো হয়েচে ব'লে মনে হয় না।

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য

দিনান্তে

সুফী মোতাহার হোসেন

কুলায় প্রত্যাশী এক দীর্ঘপক্ষ পাখীর মতন
দিগন্ত-প্রসারি দুটি ঘনচ্ছায় ব্যাকুল পাখায়
পশ্চিম সাগর পারে দিন যবে ধীরে চলি যায়
মৌন মূক বেদনায় সকরুণ করিয়া গগন ;—
যবে তারে সন্ধ্যাবধূ স্মিতহাস্যে টানিয়া গুণ্ঠন,
বাসর-প্রদীপগুলি জ্বালি দিয়া তারায় তারায়,
গোপনে বরণ করে, ঢাকে তারে গভীর মায়ায় ;—
দিনান্তে পথিক এক আঁখি ভরি নেহারে স্বপন :

অমনি দিনান্ত যবে গাঢ়চ্ছায়ে ঘনাবে জীবনে
সকরুণ, সুগম্ভীর ; দিনান্তের যাত্রা-সহচরী
বধূ কি আসিবে তার ? সুগভীর স্নিগ্ধ মমতায়
অমনি সুন্দর করে সন্ধ্যাদীপ জ্বালায়ে যতনে
বরণের ডালাখানি কম্প্রহস্তে তুলিবে কি ধরি ?
গভীর আশ্বাস বাণী কহিবে কি অস্ফুট ভাষায় ?

অয়ি সন্ধ্যা মায়াবিনী

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অয়ি সন্ধ্যা মায়াবিনী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও—
পরিশ্রান্ত আঁখিপাতে তুমি যেন সুখময় নিদ্রার আবেশ,
তুমি যেন কোন্ ক্লান্ত প্রিয়ের প্রেয়সী,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
যবে তুমি তব কৃষ্ণ অঞ্চল-ছায়ায়,
এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল ওই নীল নভোপারাবার
ধীরে ধীরে ঢাকি' যাও আঁকি' যাও—
হে কৃষ্ণ-অঞ্চলা মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও সাথে নাও
হে রহস্যময়ী—
ক্লান্ত আজি হৃদয়ের দোলা,
প্রাণে আজি স্বপ্নহীন বৃত্তিহীন তৃপ্তিহীন ছায়া,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
লাজ-রক্ত মুখে যবে রবি ঢলে পশ্চিম-অচলে,
ভাবে বুঝি বৃথা কাজে কাটায়েছে সারাদিন বৃথা
খেলা খেলি';
তুমি ধীর পাদক্ষেপে মন্থর গমনে,
মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো,
বিছাইয়া কৃষ্ণাঞ্চল অচঞ্চল মনে
ধীরে ধীরে তরঙ্গিত সিন্ধুপর দিয়া
নাহি জানি চলি' যাও কার পানে কাহার উদ্দেশে;
কিন্তু জানি শুধু মোর অশান্ত হৃদয়
তুমি দলি' যাও ছলি' যাও,
হে রহস্যময়ী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও অয়ি সন্ধ্যা অয়ি যাদুকরী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
গাভীদল গোষ্ঠ হ'তে ফিরে গেছে আপন গোহালে,
শিশুরা ফিরেছে সব খেলা শেষে পাখী সম আপন
আপন কুলায়,
নূপুর রণণা তুলি কণ্ঠ-কাকলীতে
রঙ্গিনীরা ফিরে গেছে নদী-তীর হ'তে
আর্দ্র বাসে কক্ষে ল'য়ে বারি;—
বনতলে অন্ধকার নামে আসি' বাদুড়ের পাখার
ঝাপটে,
ঝিঁ ঝিঁ দলে বেত্র বনে ক্ষুর সম সুর দিয়া বাতাসেরে
করিছে চৌচির,
জোনাকিরা দীপ জ্বালি' খুঁজি' ফেরে বুঝি কোন্
রত্নের সন্ধান,
তীর নীর ঘাট বাট অরণ্য প্রান্তর ধীরে এক হ'য়ে
আসে
যাদুকরী তব যাদু দৃষ্টির শাসনে,—
সেই সঙ্গে মোর যেন প্রাণের স্পন্দনে
মোর যেন আকুল ক্রন্দনে
ধীরে ধীরে সুষুপ্তির রাগিণী বুলাও,
অয়ি সন্ধ্যা যাদুকরী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও সাথে নাও অয়ি শান্তিময়ী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
দিবা হ'ল অবসান বুকে ল'য়ে হায় বুঝি কত দীর্ঘশ্বাস,
কত না আকাঙ্ক্ষারাশি দিবসের অশ্রুসিক্ত রহিল নিষ্ফল,

কত না সঙ্গীত নাহি হ'ল অবসান,
কত প্রেম-কথা নাহি হ'ল পরিস্ফুট কত ভগ্ন প্রাণে
কত না ব্যথার রাশি রহিল ব্যথায় ;—
অয়ি সন্ধ্যা শর্ব্বরীর কৃষ্ণ বুকে ঢাকি'
পারিবে কি ভুলাইতে মানব-হিয়ার ঐ নিষ্ফলতা রাশি
নাহি জানি—কিন্তু জানি তুমি মোর সকল বন্ধনে
সান্ত্বনা বিনাও,
অয়ি সন্ধ্যা শান্তিময়ী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
মোরে সাথে নাও সাথে নাও অয়ি সন্ধ্যারাণী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
ভুল-ভ্রান্তি-মোহময় খেলা-ধূলা বহু হ'য়ে গেছে
দিবসের দীপ্ত রুদ্র নয়ন সম্মুখে ;—
কত পুণ্য কত পাপ হৃদয়ের পাশে আজি করিছে ক্রন্দন
বন্ধনেরে আঁকড়িয়া ধরি',
কত ভালবাসাবাসি কত মান-অভিমান বিরহ-মিলন
কত সখ্য কত মৈত্রী কত কত স্নেহের কাহিনী
জীবনের লক্ষ স্মৃতি লক্ষ কোলাহল
সঞ্চয়ের ভারে আজি পরাণেরে করিছে পীড়িত :—
শ্যামাস্তীর্ণ ধরণীর দীপ্ত দেহখানি
লুটি নিয়া চলিয়াছ কোথা মায়াবিনী!
স্তব্ধ করি' তরুশাখে বিহঙ্গ কাকলী
মৌন করি' জগতের যত কোলাহল
একা একা দিগন্তেতে কোথা ভেসে যাও
অয়ি সন্ধ্যারাণী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও সাথে নাও হে গাম্ভীর্য্যময়ী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
আমিও তোমার মাঝে মৌন হয়ে র'ব
ওই নীল তারা-ঘেরা স্বপ্ন-দেখা আকাশের মতো
মৃদুতম করি' মোর প্রাণের স্পন্দন,
স্মৃতি মাঝে না রাখিব সূক্ষ্মতম বিলাপের রেখা
আক্ষেপের লেশ—
অতীত অতীত হোক্—নিঃশেষ অতীত!
তুমি শুধু ধীরে ধীরে, তুমি শুধু মোহময় সুরে
মোর আঁখিপাতে মোর প্রাণের স্পন্দনে
মোর ধমনীতে মোর শোণিত ধারায়
ভবিষ্যের স্বপ্ন আঁকো,—
নব ভবিষ্যের শুধু গুঞ্জন শুনাও
হে গাম্ভীর্য্যময়ী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

অয়ি সন্ধ্যা কুহকিনী মোরে সাথে নাও সাথে নাও,
ভবিষ্যের মাতা তুমি, ধাত্রী তুমি অয়ি নবীন উষার
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
তব গর্ভে জাগিতেছে নব শৈশবের নব হাসির সঙ্গীত
তোমারি আঁধার বুকে সঞ্চি' ওঠে ধীরে ধীরে স্তন্য
ক্ষীর সম
প্রাণ-গড়া নির্ঝরিণী
সারা নিশা তারা-ঘেরা আকাশের সুরে
কোন্ নব সৃজনের যুক্তি চলে তারায় তারায়
বার্ত্তা তার ফেরে গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে
ঋষি-কণ্ঠে মন্ত্রসম,
তারি মাঝে পাতিয়া আসন
জরাময় অতীতের জীর্ণ স্মৃতি হ'তে
নিঃশেষে কাড়িয়া মোরে
মোর কানে মোর প্রাণে, আবেগ চঞ্চল
নব সৃজনের শুধু কাহিনী শুনাও
ভবিষ্যের মতো অয়ি সন্ধ্যা-কুহকিনী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাঘের বাচ্ছা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনা গ্রাম হইতে প্রায় সাত-আট ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উপত্যকা হইতে বহু উর্দ্ধে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া দুইজন সওয়ার নিম্নাভিমুখে অবতরণ করিতেছিল। চারিদিকেই উচ্চনীচ ছোটবড় পাহাড়ের শ্রেণী,—যেন কতকগুলো অতিকায় কুম্ভীর পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া তাল পাকাইয়া এই হেমন্ত অপরাহ্নের সোনালী রৌদ্রে শুইয়া আছে। তাহারি মধ্যে পিপীলিকার মত দুইটি প্রাণী সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ক্রমশঃ দীর্ঘায়মান ছায়া সম্মুখে ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

এখান হইতে উপত্যকা দৃষ্টিগোচর নয়, পথেরও কোনো চিহ্ন কোথাও বিদ্যমান নাই। চতুর্দ্দিকে কেবল উলঙ্গ কর্কশ পাহাড়, মাঝে মাঝে দুই একটা খর্ব্বাকৃতি কইকগুল্ম। এই সকল চিহ্ন ছাড়া পথিককে বহুদূরস্থ জনপদে পরিচালিত করিবার কোনো নিদর্শন নাই,—অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ স্থানে দিকভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক।

অশ্বারোহী দুইজন যে পথ দিয়া নামিতেছিল তাহাকে পথ বলা চলে না, বর্ষার জল চূড়া হইতে নামিবার সময় পর্ব্বতগাত্রে যে উপলপিচ্ছিল প্রণালী রচনা করে এ সেইরূপ একটি প্রণালী, পাহাড়ের শীর্ষ হইতে প্রায় ঋজুরেখায় পাদমূল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

সওয়ার দুইজন ঘোড়ার বল্গা ছাড়িয়া দিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল, খর্ব্বদেহ রোমশ পাহাড়ী ঘোড়া স্বেচ্ছামত সেই ঢালু বিপজ্জনক পথে সাবধানে অবতরণ করিতেছিল। এই স্থানে পথ এত বেশী ঢালু যে একবার অশ্বের পদস্খলন হইলে আরোহীর মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু সেদিকে আরোহীদের দৃষ্টি নাই।

আরোহীদের মধ্যে একজন প্রাচীন বয়স্ক; মাথার চুল ও গোঁফ পাকা, বর্ণ এত বয়সেও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়। কপালের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্বেত-চন্দনের দুইটি রেখা বোধ করি জরাজনিত ললাট রেখাকে ঢাকিয়া দিয়াছে। মস্তকে শুভ্র কার্পাসবস্ত্রের উষ্ণীষ; দেহে তুলট্ আঙ্ রাখার ফাঁকে বামস্কন্ধের উপর উপবীতের একাংশ দেখা যাইতেছে। চোখেমুখে একটি দৃঢ় অচঞ্চল বুদ্ধির প্রভা। দেখিলেই বুঝা যায় ইনি একজন শাস্ত্রাধ্যায়ী অভিজাত বংশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার হস্তে কোনো অস্ত্র নাই, কিন্তু যেরূপ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্তার সহিত অবতরণশীল অশ্ব পৃষ্ঠে অটল হইয়া বসিয়া আছেন তাহাতে মনে হয় কেবল ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়াই ইনি জীবন অতিবাহিত করেন নাই।

দ্বিতীয় আরোহীটি ইঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বয়স বোধকরি ষোল বৎসরও অতিক্রম করে নাই; দেহের বর্ণ শ্যাম কিন্তু মুখের গঠন অতিশয় ধারালো। মৃদঙ্গ সদৃশ মুখের মধ্যস্থলে শ্যেনচঞ্চুর মত নাসিকা এই অল্প বয়সেই তাহার মুখে শিকারীর মত একটা শাণিত তীব্রতা আনিয়া দিয়াছে। চক্ষুদুটি বড় বড়, চক্ষুতারকা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ; বালকসুলভ চঞ্চলতা সত্ত্বেও দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী। ওষ্ঠের উপর ও চিবুকের নিম্নে ঈষন্মাত্র রোমরেখা দেখা দিয়াছে, তাহাও বর্ণের মলিনতার জন্য স্পষ্ট প্রতীয়মান নয়। ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারিত। সহসা এই বালকের মুখ দেখিলে একটা অপূর্ব্ব বিভ্রম জন্মে, মনে হয় যেন একখানা তীক্ষ্ণধার বাঁকা কৃপাণ সূর্য্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

মুখ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া দেহের প্রতি চাহিলে কিন্তু আরো চমক লাগে। মুখের মত দেহের সৌষ্ঠব নাই, প্রস্থের তুলনায় দৈর্ঘ্যে দেহ অত্যন্ত খর্ব্ব। প্রথমেই মনে হয়, অতিশয় বলশালী। কটি হইতে পায়ের শুঁড়তোলা নাগরা

জুতা পর্য্যন্ত প্রাণসার অথচ ক্ষীণ, মৃগচরণের মত যেন অতি দ্রুত দৌড়িবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কটি হইতে ঊর্দ্ধে দেহ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া বক্ষস্থল এরূপ বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে যে বিস্মিত হইতে হয়। আরো অদ্ভুত তাহার দুই বাহু; আজানুলম্বিত বলিলেও যথেষ্ট হয়না, সন্দেহ হয় ঘোড়ার পিঠে বসিয়া হাত বাড়াইলে মাটি হইতে উপলখণ্ড তুলিয়া লইতে পারে। তাহার উপর যেমন সুপুষ্ট তেমনি পেশীবহুল; দুই বাহু দিয়া কাহাকেও সবলে জড়াইয়া ধরিলে তাহার পঞ্জর ভাঙিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

এই বালক হাসিতে হাসিতে চতুর্দ্দিকে চঞ্চল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নামিতেছিল। ঘোড়ার রেকাব নাই, লাল রেশমের জরিমোড়া মোটা লাগামও ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ কম্বলের জিনের উপর এমন ভাবে বসিয়া আছে যেন সে আর ঘোড়া পৃথক নয়—কোনো ক্রমেই তাহাদের বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না। বামহস্তে আগাগোড়া লোহার ভারী বল্লমটা এম্‌নি অবহেলা ভরে ধরিয়া আছে যেন পাগড়ীর উপর খেলাচ্ছলে রোপিত শুকপুচ্ছটার চেয়েও সেটা হাল্কা।

ঘোড়া দুইটি পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আর একটা পাহাড় আরম্ভ হইয়াছে এবার সেইটাতে চড়িতে হইবে। সূর্য্য পিছনের উচ্চ পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করিল, শীঘ্রই তাহার আড়ালে ঢাকা পড়িবে।

বালক চতুর্দ্দিকে চাহিয়া যেন প্রাণশক্তির আতিশয্য বশতঃই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, তারপর বলিল,—'দাদো, প্রতিধ্বনি শুনবে? হোয়া হো হো হো হো! চুপ! এইবার শোনো।'

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তিনদিক হইতে ভৌতিক শব্দ ফিরিয়া আসিল—হোয়া! হো হো হো!

বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর দিকের একটা উচ্চ তশৃঙ্গ দেখাইয়া বলিল,—'ঐটে সব চেয়ে দূরে! আওয়াজ রে আসতে কত দেরী হল দেখলে? চোখে দেখে কিন্তু াঝা যায়না কোন্‌টা কাছে কোন্‌টা দূরে। অন্ধকার রাত্রে পথ হারিয়ে গেলে প্রতিধ্বনি ভারি কাজে লাগে—না দাদো?

বৃদ্ধ মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন,—'তা লাগে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে এরকম যায়গায় পথ হারিয়ে যাবার তোমার কোনো সম্ভাবনা আছে কি?'

বালক বলিল,—'তা নেই। তুমি আমার চোখ বেঁধে দাও, দেখ আমি ঠিক পুনায় ফিরে যেতে পারব।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—'সে আমি জানি। লেখাপড়ার দিকে তোমার একেবারে মন নেই, কেবল দিবারাত্রি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পেলেই ভাল থাকো। তোমার বাবা যখন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন তখন যে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব তা জানি না।'

বালকের মুখে একটা দুষ্টামির হাসি খেলিয়া গেল, সে বৃদ্ধের দিকে আড়চোখে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—'আচ্ছা দাদো, 'আলিফ্' ভাল না 'অ' ভাল? বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লেখা সুবিধে না ডান দিক থেকে বাঁ দিকে?'

বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'সে তুমি বুঝতে পারবে না। ষোলো বছর বয়স হল এখনো নিজের নাম সহি করতে শিখলে না। তোমার লেখাপড়ার চেষ্টা করাই বৃথা! —কিন্তু শিকারের দিকেও ত তোমার মন নেই দেখ্‌তে পাই। আজ সারাদিন ঘুরে একটা খরগোসও মারতে পারলে না।'

বালক আক্ষেপে হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিল,—'খরগোস আমি মারতে পারি না, আমার ভারি মায়া হয়। ঐটুকু জানোয়ার, তার ওপর হিংসার লেশ তার শরীরে নেই—খালি প্রাণপণে পালাতে জানে!'

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে কোন জানোয়ার মারতে চাও শুনি—বাঘ?'

উৎসাহপ্রদীপ্ত চক্ষে কিশোর বলিল,—'হাঁ বাঘ। এ পাহাড়ে বাঘ পাওয়া যায় না দাদো?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'না। শুনেছি আরো দক্ষিণে পাহাড়ের গুহায় বাঘ আছে। কিন্তু তুমি বাঘ মারবে কি করে?'

কিশোর বলিল,—'কেন, এই বল্লম দিয়ে মারব। মাটিতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে মারব।'

'ভয় করবে না ?'

'ভয় !' বালকের উচ্চহাস্য আবার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল—'আচ্ছা দাদো, ভয় জিনিষটা কি আমাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারো। সকলের মুখেই ওই কথাটা শুনতে পাই কিন্তু ওটা যে কি পদার্থ তা বুঝ্‌তে পারি না। ভয় কি ক্ষুধার মত একটা প্রবৃত্তি ?'

দাদো বলিলেন,—'ভয় কি তা বুঝতে পারবে যেদিন প্রথম যুদ্ধে নামবে, যেদিন হাতিয়ারবন্দ্‌ শত্রুকে সামনে দেখতে পাবে।'

বালক কি একটা বলিতে গেল কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দাদো বলিলেন,—'আমি বড় বড় বীরের মুখে শুনেছি যে তাঁরাও প্রথমে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ভয় পেয়েছেন। এতে লজ্জার বিষয় কিছু নেই; সেই ভয়কে জয় করাই প্রকৃত বীরত্ব।'

সূর্য্য গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন-ভূমির উপর একটা ছায়ার সূক্ষ্ম যবনিকা পড়িয়া গেল। শুধু ঊর্দ্ধে নগ্ন গিরিকূট এবং আরো ঊর্দ্ধে নীল আকাশে একখণ্ড মেঘ সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

দাদো নিজের অশ্ব সম্মুখে চালিত করিয়া কহিলেন,—'আর দেরী নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখনো দুটো পাহাড় পার হতে বাকী। পুনা পৌছতে রাত হ'য়ে যাবে।'

বালক তাঁহার অনুগামী হইয়া বলিল,—'তা হলেই বা, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে ঠিক নিয়ে যাব।'

দাদো বলিলেন,—'রাত্রে এসব পাহাড়-পর্ব্বত নিরাপদ নয়। শোনোনি, এদিকের গাঁয়ে-বস্তিতে আজকাল প্রায়ই লুঠ-তরাজ হচ্চে ?'

বালক ভারি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল,—'তাই নাকি ? কৈ আমি ত শুনিনি। কারা লুঠ-তরাজ করছে ?'

দাদো বলিলেন,—'তা কেউ জানেনা বোধহয় এই দিকের বুনো পাহাড়ী মাওলীরা ডাকাতি করছে। বিজাপুর এলাকার তিনটে বড় বড় গ্রাম গত চারমাসের মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে। শুনতে পাই তাদের সর্দ্দার একজন ছোকরা, লোহার সাঁজোয়া আর মুখোশ পরে ঘোড়ায় চড়ে লুঠেরাগুলোকে ডাকাতি করতে নিয়ে যায়। ছোঁড়াটা নাকি ভয়ঙ্কর কালো বেঁটে আর জোয়ান।'

বালক তাহার হাতের বল্লমটা খেলাচ্ছলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল,—'তাই নাকি ? তুমি এত কথা কোথা থেকে জানলে দাদো ?'

দাদো পাহাড়ে ঘোড়া চড়াইতে চড়াইতে বলিলেন,—'ও অঞ্চলের দেশমুখ্‌রা দরবারে নালিশ করতে এসেছিল। তাদের বিশ্বাস ডাকাতের সর্দ্দার পুনার লোক।'

দাদোর পশ্চাতে বালকও পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমরা দরবার থেকে কি ব্যবস্থা করলে ?'

দাদো বলিলেন,—'কিছু করা হয়নি। দেশমুখদের তোমার বাবার কাছে বিজাপুরে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

বালক পশ্চাতে থাকিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল, দাদো তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না।

পাহাড়ের পিঠের উপর উঠিয়া দুইজনে ক্ষণকাল পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। এখানে আবার সূর্য্যকিরণ আসিয়া বালকের বল্লমের ফলায় যেন আগুন ধরাইয়া দিল।

সম্মুখের পাহাড়তলীতে তখন ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে, নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বালক বলিল,—'আচ্ছা দাদো এখন যদি আমাদের ডাকাতে আক্রমণ করে তুমি কি কর ?'

দাদো ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'কি আর করি! তাদের সঙ্গে লড়াই করি।'

'তারা যদি পঞ্চাশজন হয় ?"

'তা হলেও লড়ি।'

বালক বলিল,—'কিন্তু সে যে ভারী বোকামি হবে দাদো। পঞ্চাশজনের সঙ্গে লড়াই করে তুমি পারবে কেন ?'

দাদা বলিলেন,—'তাতে কি! নাহয় লড়াই করতে করতে মরব।'

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল,—'কিন্তু এরকম মরে লাভ কি দাদো ?' তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল,—'আমি কিন্তু

লড়ি না, তীরের মত এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবেনা।

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন,—'ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি দুষমনের সামনে থেকে পালাবে? এই না, বলছিলে, ভয় কাকে বলে জানো না।'

বালক বলিল,—'ভয়! পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কি? পালাবো কারণ পালালেই আমার সুবিধা হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই তাহলে ত ডাকাতদের জিৎ হল।'

দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'না না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর কাপুরুষতা। যে বীর সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোনোনি?'

বালক বলিল,—'রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যতবড় বীর তিনি ততবড় বোকা।'

দাদো খোঁচা দিয়া বলিলেন,—'তুমিও ত রাজপুত! মায়ের দিক থেকে তোমার গায়েও ত যদুবংশের রক্ত আছে।'

বালক সবেগে শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিল,—'না আমি রাজপুত হতে চাই না, আমি মারাঠী।' বালকের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—'আচ্ছা দাদো, তোমার কাছে ত বড় বড় যুদ্ধের গল্প শুনেছি কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। সম্মুখ করবার মানে কি?'

দাদো সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে বলিলেন,—'সম্মুখ যুদ্ধ মানে সামনা সামনি শক্তি পরীক্ষা। যার শক্তি বেশী সেই জিতবে।'

'আর যার শক্তি কম সে যদি চালাকি করে জিতে যায়।'

'সে ত আর ধর্ম্মযুদ্ধ হল না।'

'নাইবা হল! যুদ্ধে হার জিতই ত আসল—ধর্ম্মযুদ্ধ হল কি না তা দেখে লাভ কি?'

দাদো অনেকক্ষণ বালকের জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বিড় বিড় করিয়া বলিলেন,—'বাপের স্বভাব ষোলো আনা পেয়েছে, তেমনি ধূর্ত্ত আর হুঁসিয়ার—সর্ব্বদাই লাভ লোকসানের দিকে নজর। আর শুধু বাপ কেন, বংশটাই ধূর্ত্ত! মালোজী ভোঁসলে যদি চালাকি করে যদুবংশের মেয়ে ঘরে না আনতে পারত তাহলে ভোঁসলে বংশকে চিনত কে? আর শাহুই বা এতবড় জায়গীরদার হত কোথা থেকে?'

পলকের মধ্যে বালকের সংশয় প্রশ্নপূর্ণ মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল। বালকোচিত কৌতূহলে দাদোর নিকটে সরিয়া গিয়া সানুনয়কণ্ঠে বলিল,—'দাদো, তুমি যে আমার মা'র বিয়ের গল্প বলবে বলেছিলে, কৈ বললে না? বল না, দাদো, কি করে ঠাকুর্দ্দা যদুবংশী মেয়ে ঘরে আনলেন।'

এই সময় নিম্নের ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষান্ধকার হইতে গাভীর হাম্বারব ভাসিয়া আসিল। বালক সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—'ঐ শোনো দেওরামের গরু ঘরে ফিরে এল। চল চল দাদো, আর দেরী নয়; সমস্তদিন ঘুরে ঘুরে ভারি ক্ষিদে পেয়ে গেছে—এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করিনি। দেওরামের মেয়ে মুন্নার সঙ্গে সেই যে সকালবেলা তেঁতুলবনের ধারে দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল ফেরবার সময় তাজা দুধ খাওয়াবে। জয় ভবানী।'

বালক দুই পা দিয়া ঘোড়ার পেট চাপিয়া ধরিতেই ঘোড়া লাফাইয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হইল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পার্ব্বত্য হরিণের মত পাথর হইতে পাথরের উপর ধাপে ধাপে লাফাইয়া পড়িয়া বিদ্যুদ্বেগে নীচের দিকে অদৃশ্য হইল।

দাদো বালকের উচ্চকণ্ঠস্বর দূর হইতে শুনিতে পাইলেন,—'চলে এস দাদো, দেওরামের ঘর ঝর্ণাতলার টালের উত্তর দিকে কুলগাছের জঙ্গলের মধ্যে; যদি খুঁজে না পাও হাঁক দিও—মুন্না এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ পর্ব্বত অবতরণ করিয়া বদরীবনের মধ্যে যখন দেওরামের কুটীর অঙ্গনে পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন একটি বারো-তেরো বছরের মাওলী চাষার মেয়ে একটা ক্ষুদ্রকায় গাভীকে দোহনের চেষ্টা করিতেছে এবং বালক ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে সেই দৃশ্য দেখিতেছে। গাভীটা বোধ হয় অপরিচিত ব্যক্তি ও ঘোড়া দেখিয়া ভয়

পাইয়াছে তাই কিছুতেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দুগ্ধ দোহন করিতে দিতেছে না, চেষ্টা করিবামাত্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি বিব্রত হইয়া বলিল,—'তুমি ওর শিংদুটা একবার ধর না, নইলে বজ্জাত গরু কিছুতেই দুইতে দেবেনা।'

বালক গরুর শিং ধরিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া তামাসা করিয়া বলিল,—'তুই কেমন মাওলার মেয়ে—গাই দুইতে জানিস না? দাঁড়া, বিশুয়াকে বলে দেব সে আর তোকে বিয়ে করবে না।'

ক্ষুব্ধ লজ্জায় মুন্না এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল,—'তোমার ঘোড়া দেখেই ত আজ ও অমন করছে নইলে আমিই ত রোজ দুই।'

বালক মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া বলিল,—'হ্যাঁ দুই! আর বড়াই করতে হবে না। দে আমায় ঘটি আমি দুয়ে দিচ্ছি।'

মুন্না বলিল,—'তুমি পারবে না। আমি আর বাবা ছাড়া কেউ ওকে দুইতে পারে না। তোমাকে ও এখনি ফেলে দেবে।'

বালকের আত্মাভিমানে ভীষণ আঘাত লাগিল, সে তর্জ্জন করিয়া বলিল,—'কি! ফেলে দেবে! দেখি ত কেমন তোর গরু। দে ঘটি।'

মুন্নার হাত হইতে জোর করিয়া ঘটি কাড়িয়া লইয়া বালক দুগ্ধ দোহন করিতে বসিল। গরুটা ঘাড় বাঁকাইয়া একবার দোহনকারীকে দেখিয়া লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বালকও ছাড়িবার পাত্র নয়, ঘটি লইয়া মুখে নানাপ্রকার প্রীতিসূচক শব্দ করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে কি মনে করিয়া গাভীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন বালক সন্তর্পণে তাহার দেহে হাত বুলাইয়া দিয়া গাভীর পশ্চাদ্দিকে বসিয়া দুই জানুর মধ্যে ভাণ্ডটি ধরিয়া যেমনি গাভীর উধসের দিকে হাত বাড়াইয়াছে অমনি গাভী এক চরণ তুলিয়া তাহাকে এরূপ সবেগে পদাঘাত করিল যে বালক ভাণ্ড সমেত চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

মুন্না কলকণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। গাভীটা যেন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রোমন্থন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দাদো অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বালকের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'লেগেছে নাকি?'

বালক অঙ্গের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'গরু নয়—ঘোড়া। গরু কখনো অমন চাট ছোঁড়ে? নে মুন্না তোর ঘটি, আমি ঘোড়ার দুধ খেতে চাই না। বাড়ী চল্লুম।'

বালক অশ্বপৃষ্ঠে উঠিতে যায় দেখিয়া মুন্না মিনতি করিয়া বলিল,—'আর একটু দাঁড়াও না, বাবা এল বলে। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে বলছিলে—ঘরে বাজ্‌রার রুটি আছে এনে দেব?'

বালক বলিল,—'না তোর রুটি দুধ কিছু খেতে চাইনা। আমি চল্লুম।'

এমন সময় কুটির পশ্চাতের ঘন ঝোপের ভিতর হইতে দুইটি লোক বাহির হইয়া আসিল। একজন খর্ব্বকায় বৃষস্কন্ধ মধ্যবয়স্ক লোক, অপরটি পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের দৃঢ় শরীর যুবা। হাতের বল্লম কুটীরের গায়ে হেলাইয়া রাখিয়া মধ্যবয়সী লোকটি দ্রুতপদে আসিয়া বালকের ঘোড়ার রাশ ধরিল। বালক তখন ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিয়াছে, লোকটি সানুনয় নিম্নকণ্ঠে বলিল,—'রাজা, ঘোড়া থেকে নামো, দুধ না খেয়ে যেতে পাবে না।'

যুবকটিও এতক্ষণে সসম্ভ্রম হাস্যোদ্ভাসিত মুখে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বালক একলম্ফে ঘোড়া হইতে নামিয়া দৌড়িয়া গিয়া মুন্নার চুলের মুঠি ধরিল, তাহাকে চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে যুবকের সম্মুখে লইয়া গিয়া প্রায় তাহার বুকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—'এই নে বিশুয়া, এটাকে তুই ঘরে নিয়ে যা, তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিলুম। যদি বজ্জাতি করে, খুব পিটুবি। আর ওই হতভাগা গরুটাকেও তুই নিয়ে যা, ওটা হল তোর বিয়ের যৌতুক।'

মুন্না বালকের হাত ছাড়াইয়া কুটীরের ভিতর পলাইয়া গেল। বিশুয়া হাসিতে হাসিতে হেঁট হইয়া বালকের পদস্পর্শ করিয়া বলিল,—'তুমি যখন দিলে রাজা তখন আর আমার ভাবনা কি! এবার ঘোড়ার পিঠে তুলে ওকে ঘরে নিয়ে যাব। কি বল দেওরাম?'

দেওরাম গম্ভীর ভাবে একটু হাসিয়া বলিল,—'তা যাস্। রাজা যখন তোর হাতে মুন্নাকে দিয়েই দিয়েছে তখন আর আমি কি বলব ? আর, আমি মুন্নার মন জানি, সেও তোকেই বিয়ে করতে চায়।'

এই সময় মুন্নার হাসিমুখ কুটীরের ভিতর হইতে পলকের জন্য দেখা গেল। সে সশব্দে কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

দেওরাম ভূপতিত ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দুগ্ধ দোহনে প্রবৃত্ত হইল। গাভীটা এবার আর কোনো আপত্তি করিল না।

বৃদ্ধ দাদো এতক্ষণ অদূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তাঁহার মুখে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল। এই নির্জ্জন বনের মধ্যে একটিমাত্র কুটীর তাহার অধিবাসী এই ভীমকায় দেওরাম। ইহারা কে এবং বালকের সহিত ইহাদের পরিচয় হইল কিরূপে ?

তিনি অগ্রসর হইয়া বিশুয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এঁকে চিন্‌লে কি করে ?'

নিমেষের জন্য বিশুয়া ও বালকের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। বিশুয়ার মুখ ভাবলেশ হীন হইয়া গেল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, 'দরবারে ওঁকে দেখেছি, উনি জাগীরদারের ছেলে।'

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,—'তোমরা ওঁকে রাজা বলে ডাকছ কেন ?'

বিশুয়া কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাইল না ; দুগ্ধদোহন করিতে করিতে দেওরাম জবাব দিল,—'জাগীরদারের ছেলে, উনিই একদিন মালিক হবেন তাই রাজা বলে ডাকি।'

দাদো উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন,—'ইনি জায়গীরদারের মেজো ছেলে তাও জান না ? সে যাক—' বালকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিন্তু তুমি এদের চিনলে কি করে জিজ্ঞাসা করি ?'

বালক অত্যন্ত সরলভাবে উত্তর করিল,—'শিকার করতে এসে এদের সঙ্গে ভাব হয়েছে দাদো। তুমি ত আর প্রত্যেক-বার আমার সঙ্গে আসো না তাই জানো না। কতবার শিকার করে ফেরবার মুখে দেওরামের জোয়ারী রুটি খেয়েছি—দেওরাম আমাকে ভারি যত্ন করে।'

দাদো বালকের ছলনাহীন মুখের দিকে কিয়ৎকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া শুধু কহিলেন,—'হুঁ।' মনে মনে ভাবিলেন,—তোমার গতিবিধির উপর এখন হইতে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ব্যাপার ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

ধারোষ্ণ দুগ্ধের পাত্র আনিয়া দেওরাম বালকের হাতে দিল। বালক জিজ্ঞাসা করিল,—'দাদো, তুমি খাবে না ?'

দাদো কহিলেন,—'না তুমি খাও। আমার এখনো আহ্নিক বাকী।'

দুগ্ধপাত্র দুই হস্তে ধরিয়া বালক অদূরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। দেওরামও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া, পাশে গিয়া দাঁড়াইল। এক চুমুক দুগ্ধ পান করিয়া বালক অন্য মনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিল,—'পরশু অমাবস্যা।'

দেওরামও অলসভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—'হাঁ। লোক সব তৈরী আছে। কোথায় থাকতে হবে ?'

'রাক্ষসমুখো গুহার মধ্যে। আমি দেড় পহর রাত্রে আস্‌ব। পঁচিশ জনের বেশী লোক যেন না হয়।'

'বেশ। এবার কোনদিকে যাওয়া হবে ?'

'উত্তর দিকে। দক্ষিণে আর নয়, সেদিকে বড় হৈ চৈ হয়েছে। দরবার পর্য্যন্ত খবর গেছে।'

দাদো তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন দেখিয়া দেওরাম প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল,—'আচ্ছা। হরিণ কিন্তু এ দিকে পাওয়া যায় না।'

বালক বাকী দুগ্ধটুকু নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে বলিল,—'আজ তা হলে চল্লুম দেওরাম। মুন্নার বিয়ের দিন আমাকে খবর দিও—আমি দাদোকে নিয়ে আসব। দাদো একজন ভারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জানো ত ? উনিই মুন্নার বিয়ে দেবেন।'

ঘোড়ার পিঠে একলাফে উঠিয়া বালক বলিল,—'আর যদি হরিণছানা পাও, পুনায় নিয়ে যেও। আর দেরী করব না, রাত হয়ে এল। দাদোর আবার ভারি ডাকাতের ভয়।'

বিশুয়া ও দেওরাম দাঁড়াইয়া রহিল, অশ্বারোহী দুইজনে

বদরীকানন পার হইয়া ঝর্ণার সঙ্কিত অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয়ের পাশ দিয়া আবার পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। এইটি শেষ পাহাড়—ইহার পরই উপত্যকা। কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না, দুইজনেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন। এদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে। ঘোড়া দুটি সতর্কভাবে পর্ব্বতগাত্র আহোরণ করিতেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া বালক দাদোর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল দাদো তাহারই মুখের প্রতি সন্দেহাকুল চক্ষে চাহিয়া আছেন। বালক অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তারপর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল,—'কি দেখছ দাদো? এবার আমার মা'র বিয়ের গল্প বল।'

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আপনার মনে বলিলেন,—'বংশের ধারা বদলান যায় না; বাঘের বাচ্ছা বাঘই হয়, শৃগাল হয় না—ঈশ্বরের এই বিধান। কে জানে, হয় ত এর মধ্যে মঙ্গলেরই বীজ নিহিত আছে।'

বালক তাঁহাকে দীর্ঘকাল চিন্তা করিবার অবকাশ না দিয়া পুনশ্চ কহিল,—'বল না দাদো!'

দাদো আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'গল্প অতি সামান্যই। কিন্তু তোমার ঠাকুর্দ্দা মালোজী ভোঁসলে যে কি রকম চতুর লোক ছিলেন, এই গল্প থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।'

'তোমার মাতুলবংশের মত এতবড় বিখ্যাত যশস্বী বংশ দাক্ষিণাত্যে খুব অল্পই আছে। আজ থেকে নয় চারশ' বছর আগে আলাউদ্দিন খিলিজির আমল থেকে দেবগিরির যদু-বংশের নাম দাক্ষিণাত্যের পাথরে পাথরে তলোয়ার দিয়ে খোদাই হয়ে আসছে।'

'অতীতের কোন যুগে এই যদুবংশ রাজপুতানা থেকে এসে দেওগিরিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কাহিনী লুপ্ত হয়ে গেছে। দেওগিরির রাজ্যও আর নেই। কিন্তু বীরত্বে ধর্ম্মনিষ্ঠায় মহানুভবতায় এই বংশ আজ পর্য্যন্ত হিন্দু-মাত্রেরই আদর্শ হয়ে আছে।'

'এ হেন বংশে তোমার দাদামশায় লখুজী যদুরাও একজন পরাক্রমশালী মহাতেজস্বী পুরুষ ছিলেন। দশ হাজার সিপাহী নিত্য তাঁর রুটি খেত। বিজাপুর গোলকুণ্ডা তাকে যমের মত ভয় করত, আমেদনগর রাজ্যের তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। মালিক অম্বর যদি তাঁর সঙ্গে কপটাচারিতা না করত—কিন্তু সে অন্য কথা। এখন আসল গল্পটা বলি।'

'সে আজ বহুদিনের ঘটনা, তখন আমার বয়স দশ এগারো বছরের বেশী নয়। কিন্তু সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী, রাজপুতদের একটা মস্ত উৎসবের দিন। দাক্ষিণাত্যে দোল-পূর্ণিমার দিন আবীর খেলার প্রথা এই যদুবংশই প্রচার করেছিলেন। সেদিন দেশের সমস্ত গণ্যমান্য লোক, এমন কি বিজাপুর গোলকুণ্ডা আমেদনগর দরবারের বড় বড় হিন্দু আমীর-ওমরা এসে লখুজীর কেল্লার মত বিশাল ইমারতে জমা হতেন। সমস্ত রাত্রিদিন ব্যাপী উৎসব চলত, ফাগ্ রঙ্ এবং সুরার স্রোত বয়ে যেত।'

'সেবার লখুজীর প্রকাণ্ড প্রাসাদের দরবার ঘরে মজলিস বসেছে। মেঝের উপর পার্শী গালিচা পাতা, তার উপর অনেকে বসেছেন; দরবার লোকে লোকারণ্য। সিপাহী থেকে সর্দ্দার পর্য্যন্ত সকলের অবাধ যাতায়াত। সামান্য সৈনিক পাঁচহাজারী সর্দ্দারের মুখে আবীর মাখিয়ে দিচ্ছে, মনসবদার সিপাহীকে মাটিতে ফেলে তার মুখে মদ ঢেলে দিচ্ছে। হাসির হর্‌রা ছুটছে! ছোট বড় উচ্চনীচ কোনো প্রভেদ নেই, এই একদিনের জন্য সকলে সমান। সবাই আমোদে মত্ত।'

'সভার মাঝখানে মস্তবড় একটা চাঁদির থালায় আবীর স্তূপীকৃত রয়েছে, সেই থালা ঘিরে প্রধান প্রধান অতিথিরা বসেছেন। পানদান গুলাবপাশ আতরদান চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে।—স্বয়ং লখুজী এখানে আসীন; তোমার ঠাকুর্দ্দা মালোজীও আছেন। মালোজী তখন লখুজীর অনুগৃহীত একজন সামান্য সর্দ্দার মাত্র। কিন্তু তাঁর কুটবুদ্ধি ও রণনৈপুণ্যের জন্য লখুজী তাঁকে ভারি স্নেহ করতেন। তাই মালোজীও সাহস করে এই সভায় এসে বসেছেন। সকলের মুখেই আবীরের প্রলেপ, দেহের বস্ত্র এবং মিরজাই রঙে রক্তবর্ণ, চক্ষু ঢুলুঢুলু। এখানে গানের মজলিস বসেছে;

আরো অনেক লোক চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনছে এবং মজা দেখছে।'

'গান গাইছেন আমেদনগরের একজন বুড়ো ওমরা—তাঁর নাম ভুলে গেছি। মস্ত ওস্তাদ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল।' গড়গড়া টান্‌তে টান্‌তে হঠাৎ তিনি বসন্তরাগের এক তান মারলেন - সুরের ধমকে পাকা গোঁফ থেকে একরাশ আবীর উড়ে গেল। তোমার ঠাকুর্দ্দা মালোজী সারঙ্গী কোলে করে ওস্তাদের পিছনে বসে ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ করলেন। লখুজী নিজে মৃদং বাজাতে লাগলেন।

'গান থামলে প্রশংসাধ্বনির একটা ঝড় বয়ে গেল, লখুজী পাখোয়াজ ফেলে প্রায় এক তোলা অম্বুরী আতর পলিত কেশ গায়কের গোঁফে মাখিয়ে দিয়ে দাড়ি ধরে নেড়ে দিয়ে বল্লেন,—'কৎল্ কিয়া বিবি! আর একটা ফর্ম্মাও।'

'বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হেসে চোখ ঠেরে আবার গান ধরলেন,—'চোলিমে ছিপাউ কৈসে যোবনা মোরি।'

'বিরাট হাসির একটা হল্লা পড়ে গেল। লখুজী ওস্তাদকে কোলে তুলে নিয়ে নৃত্য সুর করে দিলেন।--কি আনন্দের দিনই গিয়েছে; এখন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়।'

দাদো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ঘোড়া দুইটি ইতিমধ্যে পর্ব্বত পার হইয়া উপত্যকায় নামিয়া আসিয়াছে কিন্তু পথ এখনো শিলা-সঙ্কুল। আশে-পাশে মাটি কাটিয়া বড় বড় খাদ রচনা করিয়াছে। শুষ্ক পয়ঃ প্রণালীর মত এই খাদগুলি অন্ধকারে বড়ই বিপজ্জনক, ঘোড়া একবার পা ফস্কাইয়া উহার মধ্যে পড়িলে কোথায় অন্তর্হিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে দিবার দীপ্তীও সম্পূর্ণ নিভিয়া গিয়াছে, কেবল সম্মুখে বহুদূরে পুনার দীপগুলি মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

বালক একাগ্রমনে গল্প শুনিতেছিল, দাদো থামিতেই সাগ্রহে গলা বাড়াইয়া বলিল, 'তারপর?'

দাদো বলিলেন,—হুঁসিয়ার হয়ে পথ চল, রাস্তা বড় খারাপ। তারপর গল্প আরম্ভ করিলেন,—'দু'টি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে এই দরবার ঘরের চারিদিকে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, দু'জনেরই লাল বেনারসী চেলীর জোড় পরা, কানে কুণ্ডল হাতে বালা গলায় হার। ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর আর মেয়েটির তিন।

'এদের দিকে কারো দৃষ্টি ছিল না, এরা নিজের মনে ঘরময় খেলে বেড়াচ্ছিল। কখন এক সময় মেয়েটি দূর থেকে ছেলেটিকে দেখ্‌তে পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল, গম্ভীর মুখে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আধো আধো ভাষায় প্রশ্ন করলে,—'তুমি কে?'

'ছেলেটিও মেয়েটির দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বললে,—'আমি শাহু। আমি তীর ছুঁড়তে পাড়ি। তুমি কে?"

'মেয়েটির দুই চক্ষু সম্ভ্রমে ভরে উঠ্‌ল, সে ফুলের মত ঠোঁট দুটি খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললে,—'আমি দিদা।' তারপর একটু ভেবে আবার বললে,—'আমার বাবাও তীর ছুঁড়তে পারে।'

'অতঃপর এই বীর এবং বীরকন্যার মধ্যে ভাব হতে বেশী দেরী হল না। শাহু গিয়া মেয়েটির গলা জড়িয়ে নিলে, মেয়েটিও শাহুর কোমর জড়িয়ে ধরলে। এইভাবে তারা অনেকক্ষণ দরবার-ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। তাদের মধ্যে চুপিচুপি কি কথা হল তারাই জানে। খুব সম্ভব শাহু তার অসামান্য সৌর্য্য বীর্য্যের কথা খুব ফলাও করে ব্যাখ্যা করে মেয়েটির ছোট্ট প্রাণটুকু জয় করে নিচ্ছিল। আর মেয়েটিও বোধ হয় নিঃসংশয় সহানুভূতি এবং প্রশংসা দ্বারা শাহুর বীর-হৃদয় সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলছিল।

'এদিকে গানের মজলিশ তখন ঢিলে হয়ে এসেছে; বৃদ্ধ গায়ক তিন পাত্র গুলাবী সরবত খেয়ে কিংখাপের তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে হাঁপাচ্ছেন,—এমন সময় এই দুটি ছেলেমেয়ে গলা-জড়াজড়ি করে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এতগুলো লোক চারিপাশে বসে আছে কিন্তু সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই, নিজেদের কথাতেই তারা মশ্‌গুল। বৈঠকে যাঁরা বসেছিলেন সকলের মুগ্ধদৃষ্টি এক সঙ্গে তাদের উপর গিয়ে পড়ল। এ কি অপূর্ব্ব আবির্ভাব! আজ দোলের দিনে সত্যই কি বৃন্দাবন লীলা তাঁদের চোখের সাম্‌নে অভিনীত হচ্ছে? সকলে চোখ মুছে দেখলেন,—তাইত! ছেলেটির বর্ণ নবজলধরশ্যাম আর মেয়েটি বিদ্যুল্লতার মত গৌরী!

'মেয়েটির হঠাৎ কি খেয়াল হল, সে আতর দানে তার ছোট্ট চাঁপার কলির মত আঙুল ডুবিয়ে শাহুর নাকের নিচে আঙুলটি বুলিয়ে দিলে। শাহুও আদর-আপ্যায়নে কম যাবার পাত্র নয়, সে চাঁদির থালা থেকে এক মুঠি আবীর তুলে নিয়ে সযত্নে মেয়েটির মুখে কপালে মাখিয়ে দিলে।'

'সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলেন,—'রাধা-গোবিন্দজী কি জয়!'

'লখুজী আর মলোজী ছাড়া আর কেউ জানতেন না এ ছেলেমেয়ে দুটি কে? লখুজী উচ্চহাস্য করে উঠলেন, তারপর দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের কোলে বসিয়ে বললেন,—রাধাগোবিন্দজী নয়, এরা আমার মেয়ে আর মালোজীর ছেলে। বন্ধুগণ, এদুটির বিয়ে হলে কেমন মানায় বলুন ত?'

'লখুজী পরিহাসচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন, তাছাড়া গুলাবী সরবতের নেশাও অল্পবিস্তর ছিল। তাঁর কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন; কিন্তু মলোজী ভোললে তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে করজোড়ে সকলকে বললেন,—'মহাশয়গণ, আপনারা সাক্ষী থাকুন, লখুজী তাঁর কন্যাকে আমার পুত্রের সঙ্গে বাগ্‌দত্ত করলেন।'

'সকলে অবাক হয়ে রইলেন, লখুজীর নেশা ছুটে গেল। তাঁর মুখ আবীর প্রলেপের ভিতর থেকে ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তাঁর মেয়েকে—দেবগিরির রাজবংশের মেয়েকে যে মালোজীর মত একজন সামান্য প্রাণী নিজের পুত্রবধূ করবার স্পর্দ্ধা করতে পারে এ তাঁর কল্পনারও অতীত। কিন্তু তবু কথাটা যে তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়ে গেছে একথাও অস্বীকার করা চলে না। মালোজীর দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে লখুজী বললেন,—'মালোজী, তুমি পাগলের মত কথা বলছ। আমার মেয়ে রাজার ঘরে পড়বে।'

'মালোজী পূর্ব্ববৎ জোড়করে বললেন,—'আমার ছেলে আপনার মেয়ের মুখে আবীর দিয়েছে, আপনার মেয়ে আমার ছেলের মুখে আতর দিয়েছে, তারপর আপনি তাদের কোলে নিয়ে যা বলেছেন তা উপস্থিত সকলেই শুনেছেন। ধর্ম্মতঃ আপনার মেয়ে আমার ছেলের বাগ্‌দত্তা। এখন যদি আপনি সে কথা প্রত্যাহার করতে চান, করুন, আমার আপত্তি নেই।'

'ক্রোধে লখুজী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু তাদের মনোভাব বুঝতেও বিলম্ব হল না সকলেই নীরবে মালোজীর কথায় সমর্থন করছেন। লখুজী নিজের মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে ঝড়ের মত অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

'মালোজীও ছেলে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে লখুজীর মেয়ে প্রকাশ্য দরবারে মালোজীর ছেলের বাগ্‌দত্তা হয়েছে। কথাটা অবশ্য বেশী দিন চাপা থাকত না, প্রকাশ হয়ে পড়তই; কিন্তু এমনি তোমার ঠাকুর্দ্দার উদ্যম আর তৎপরতা যে সপ্তাহ মধ্যে মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র এই সুসংবাদ প্রচার হয়ে পড়ল, জনপ্রাণীরও জানতে বাকী রইল না।

'লখুজী নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে লাগলেন। মালোজীর সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়ে গেল, এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন মালোজীর মত ধড়িবাজ অকৃতজ্ঞ লোককে আর তিনি কোনো সাহায্য করবেন না, বরং তার যাতে অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টাই করবেন।

'তাঁর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রইল না। যতই বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল ততই তিনি বুঝতে পারলেন চতুর মালোজী তাঁকে কি বিষম ফাঁদে ফেলেছে। তিনি বুঝলেন অন্যত্র মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে সুখী হবে না, যত তার বয়স বাড়ছে শাহু ছাড়া আর কেউ যে তার স্বামী হতে পারে না এ ধারণা তার মনে ততই দৃঢ় হচ্ছে। তাছাড়া অন্যের বাগ্‌দত্তা মেয়ে কেউ জেনে শুনে বিয়ে করতে চায় না; দু'চারটে ঘরানা ঘরে সম্বন্ধ করতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে লখুজীকে ফিরে আসতে হল। শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেখলেন শাহু ছাড়া জিজার গতি নেই।

'এইভাবে নয় দশ বছর কেটে গেছে। মালোজী কপালের জোরে এবং বুদ্ধিবলে খুব উন্নতি করেছেন, বিষয়-সম্পত্তিও হয়েছে। লখুজীর বিদ্বেষ ও অনিচ্ছা ক্রমেই কমে

আসতে লাগল। তারপর একদিন মালোজীকে নিজের বাড়ীতে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন,—'ভাই' আমারই ভুল। জিজাকে তুমি তোমার ছেলের জন্যে নিয়ে যাও।'

'ব্যাস্, আর কি! এইখানেই গল্প শেষ। মালোজীর মত্‌লব সিদ্ধ হল, মহা ধুমধাম করে তোমার বাপের সঙ্গে তোমার মা'র বিয়ে হয়ে গেল। তখন তোমার মা'র বয়স তেরো বছর আর শাহুর পনেরো। বিয়ের রাত্রে তোমার মা'র গর্ব্বোজ্জ্বল হাসিভরা মুখ আমার আজও মনে আছে।'

'তবে একথা ঠিক যে জন্মান্তরের সম্বন্ধ না হলে এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এতবড় সামাজিক পার্থক্য লঙ্ঘন করে এ বিয়ে কখনই হতে পারত না। তোমার মা-বাবা পূর্ব্বজন্মেও স্বামী-স্ত্রী ছিলেন।'

বৃদ্ধ দাদো মৌন হইলেন। কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না, দুইজনে নীরবে চলিলেন। অন্ধকার তখন বেশ গাঢ় হইয়াছে, পাশের লোকও স্পষ্ট দেখা যায় না। দাদো লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন বালক দুই কর যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া বারম্বার কাহার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছে। দাদো কথা কহিলেন না, অপূর্ব্ব আবেগভাবে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বালক বলিল,—'কি সুন্দর গল্প! আমার মা'র মত এমন মা এ পৃথিবীতে আর কারো নেই—না দাদো?'

দাদো সংযতকণ্ঠে বলিলেন,—'না। তোমার মায়ের মত এমন অসামান্যা নারী আর কোথাও নেই। সেই তিন বছর বয়স থেকে আজ পর্য্যন্ত দেখে আসছি, এমনটি আর দেখিনে।'

পূর্ণ হৃদয় লইয়া দুইজনে নীরব রহিলেন। ক্রমে পুনার আলোক নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, পথ সমতল ও অনুদ্ঘাত হইল। অশ্বদ্বয় আশু গৃহে পৌঁছিবার আশায় দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল।

পুনা পৌঁছিতে যখন পাদক্রোশ মাত্র বাকী আছে তখন কে একজন সম্মুখের অন্ধকার হইতে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—'হো শিব্বা হো! হো দাদো জী!'

বালক শিব্বা চমকিয়া উঠিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'তানা! তানা!' তারপর তীরবেগে সম্মুখে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অন্ধকারে তানাজী মালেশ্বর ঘোড়ার উপর বসিয়া ছিল, শিব্বা প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল।

তানাজী তিরস্কারের সুরে বলিল,—'আজ কি আর বাড়ী ফিরতে হবে না? কোথায় ছিলে এতক্ষণ? মা কত ভাবছেন, শেষে আর থাকতে না পেরে আমাকে পাঠালেন।'

শিব্বা ঘোড়ার উপর হইতেই তানাজীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'মা কোথায় রে তানা?'

তানাজী বলিল,—'কোথায় আবার—বাড়ীতে! দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে পথের পানে চেয়ে আছেন। তোমার এত দেরী হল কেন?' গলা খাটো করিয়া বলিল,—'দেওরামের সঙ্গে দেখা হল নাকি? ওদিকের কি খবর? কবে?'

শিব্বা অন্যমনস্কভাবে বলিল,—'খবর ভাল। অমাবস্যার রাত্রে সব ঠিক হয়েছে।—চল্ তানা, শিগ্‌গির বাড়ী যাই। মাকে সমস্তদিন দেখিনি—ভারি মন-কেমন করছে।'

দুই কিশোর বন্ধু তখন নীড়-প্রতিগামী পাখীর মত দ্রুতবেগে গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃদ্ধ দাদোজী কোণ্ডু বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ব্বাসিত

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

অনেকদিন পরে আজ ভোরবেলা প্রায় চারটের সময় বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়েছিলাম অনেকদিন আগেকার আমাকে খুঁজতে। জানি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করবে, এতকাল পরে অকস্মাৎ সেই অতীতের তোমার জন্য ব্যাকুলতাই বা কেন আর তাকে খুঁজতে ছোট বেলাকার পাড়াগাঁয়ে গেলে না, পাঠশালায় গেলে না, বাল্যবন্ধু আমরা আছি আমাদের কাছে এলে না, একেবারে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে হাজির হ'লে, ব্যাপারখানা কি!

আমি মানসকর্ণে শুনতে পাচ্চি মনস্তত্ত্বের এম্-এ আমাদের মনীষী একথা শুনে অবাক হয়ে বলে যাচ্চে, মৈত্রেয়ী তোমার এই যে অতীতের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা, অতীতের নিজকে সন্ধান এটা তো ঠিক সুস্থ মনের পরিচয় নয়! বর্ত্তমান যার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে সে-ই অতীতের স্বর্গ-সন্ধান করতে ছুটে যায় ওটা বয়স্ক মনের লক্ষণ নয়, ওটা একটা মনের infantile শৈশব অবস্থা জানায়। এত পড়াশুনা আলোচনা, মনকে এতখানি modernise (আধুনিক) ক'রে তোলার পর তুমি অকস্মাৎ এ কি করচ। বুড়ো বয়সে একেই তো ভীমরতি, second childhood বলে যাকে! যদি Futurist হয়ে উঠতে, বর্ত্তমানের ওপর যদি ভাবীকালের মর্ম্মরসৌধ রচনা করতে সেটা সইতে পারা যেত, কিন্তু মন তার অপরিণত শৈশবে যে-পথ হেঁটে চলে এসেচে, যে-সব রূপকথা আর ধর্ম্ম সংস্কারের মায়াময় স্বপ্নকুঞ্জে বিচরণ করে এসেচে, আজ grown up মৈত্রেয়ী সেইখানে প্রজাপতি ধরবার জন্যে ছুটে চলেচে, আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি? মৈত্রেয়ী তোমার caseটা ডাঃ গিরীন বাবুর হাতে দেওয়া উচিত।

আর সমরদা তুমিই কি আমার ভোরবেলাকার দুষ্কর্ম্মের কথা শুনে স্থির হয়ে আছ! আমি তোমার shocked চেহারাটা কি রকম হয়েচে দেখতে, তা ওই আমার টেবিলের ওপরকার আমাদের group ফটোতে তোমার মুখচ্ছবির পানে চেয়ে যেন বেশ সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্চি। তোমার টেবিলেও আমাদের groupটা বিরাজ করচে হয়ত, না? আর আমার ওই কম্যুনিষ্ট চেহারার পানে চেয়ে তুমি হয়ত ভেবেই পাচ্চ না এতখানি অধঃপতন আমার হ'ল কেমন ক'রে? আমাকে দলদ্রোহিণী মনে ক'রে হয়ত তুমি ক্রোধে লাল হয়ে উঠচ, যেমন গোর্কির মুখে ভগবানের কথা শুনে লেনিনের হয়েছিল! (আমাদের groupএর লেনিন সমর দা!)

তোমার রাগটা আমার বুঝতে বেশী দেরী হয় না, কারণ আমি জানি আমাকে বোঝার পথে তোমার কতকগুলো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রয়েচে। মনীষীও আমায় বুঝবে না, কারণ মনীষী নিজের মন দিয়ে আজও ভাবতে শেখেনি' পরের মত দিয়েও নিজকে এবং অপরকে বোঝার চেষ্টা করে। তুমি অত্যন্ত বেশি নিজের মন দিয়েই সব বোঝ আর ও পরের মন দিয়ে সব বোঝার আশা করে, ফলে তোমরা কেউই অন্যকে বুঝতে পার না।

তুমি ছোট বেলা থেকেই মন্দির কাকে বলে জান না, পূজা কাকে বলে জান না, দেবতার সান্নিধ্য যে মানুষের মনকে কী অপরূপ অনুভূতির মাঝে ডুবিয়ে দেয়—(হায়রে, সুন্দর লোভন অনুভূতি!)—তা কিছুই জান না। তোমার ছোট বেলাকার পারিপার্শ্বিক সমাজ, শিক্ষাদীক্ষা সেই সমস্ত থেকে তোমায় বঞ্চিত করেচে। 'বঞ্চিত' বলাতে তুমি হয়ত হো-হো করে হেসে উঠবে। জানি আমি পরবর্ত্তী জীবনের পড়াশোনা এবং বর্ত্তমান জগতের বলশেভিকদর্শন তোমার মনে ধর্ম্ম আর আফিম সমার্থবাচক করে রেখেচে। তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে বঞ্চিতই বলব। হয়ত আমিও আবার তোমায় বাল্যকালের জগতের যে সুন্দর অনুভূতি

তা থেকে বঞ্চিত। এ তো অনিবার্য্য বঞ্চনা। তাই সেই বঞ্চিত বলে আমি তোমায় করুণা করতে বসিনি' কিন্তু তুমি হয়ত আমায় করুণাই করবে আমার জীবন সেই ছোট বেলাকার কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিল ব'লে! ওইখানেই তোমার ভুল সমর দা!

আর মনীষীরও ভুল বড় কম নয়। আমাদের মন যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েই চলে এটা সে মনে করে বটে কিন্তু ওটা কি সত্য সব সময়? কালকের আমির চেয়ে আজকের আমি বেশি উন্নত, বেশি জ্ঞানী এটা যে ভুল কথা এ বুঝতে কি বড় বড় বই পড়ার দরকার করে? ব্যক্তির জীবনেও যেমন একথা খাটে না, জাতির জীবনেও না। তাই অতীতের দিকে যাওয়া যে সব সময়ই পিছু হাঁটা তা মনে করবার কোনো কারণই নেই! তারপর আমরা প্রত্যেকে যে আমিটাকে নিয়ে এত লম্ফ ঝম্প করি সেই আমিটাই কি একটি অখণ্ড আমি? একজন মডার্ণ মনীষী লেখকের মুখের উক্তি পড়ছিলাম কাল, তিনি বলচেন, Men do not want to admit that they are what in fact they are—each one a colony of separate individuals, of whom now one and now another consciously lives the life that animates the whole organism and directs its destinies. কত সত্য ওই Aldous Huxbyর কথাগুলো! তাইতো মনীষার কথা মানতে পারিনে যে আগেকার আমিটা আজকের আমার চাইতে অপরিণত। কে বলতে পারে!

যাক্‌গে ও কথা। তবে জেনে হয়ত আশ্বস্ত হতে পার যে আমি সেই আমাকে খুঁজে পেলাম না! তাকে আর পাব এমন আশাও আর জাগল না। দেবতাকে আর এ জীবনে কখনো বোধ হয় নিকটে পাব না!

প্রলাপ বকচি, না? আচ্ছা সমরদা তোমরা দেবতার নামে, পূজার নামে, মন্দিরের নামে অতখানি বিরূপ কেন হয়ে ওঠ বলতে পার? তোমরা যখন মন্দিরযাত্রীদের পানে অজ্ঞানান্ধ মূর্খ ব'লে মনে মনে হাস তখন আমার গত বছরের তোমাদের দেশের জন্য জেলখাটার কথা মনে পড়ে। লিলি সান্যাল সে বছর তোমাদের প্রাণে কী দেশভক্তিই ধরিয়ে দিলে, তার চোখের ইসারায় তোমরা দলে দলে জেলে গেলে। মনে পড়ে সে কথাটা, সে নিয়ে এখন তোমাদের অনেকেরই লজ্জার অন্ত নেই! কিন্তু লজ্জার তো কিছুই নেই! লিলি ছিল একটা সুন্দর প্রতীক, তোমাদের কল্পনায় সে হয়ে উঠেছিল শক্তিময়ী দেশভক্তির প্রতিমা, সেখানে তোমরা সবাই তোমাদের পূজা নিবেদন করেছিলে। কিন্তু পূজা কি সেখানে কেউ গ্রহণ করেছিল? কে গ্রহণ করেছিল বলতো—লিলি সান্যাল, দেশাত্মা? সবই কি কল্পনাকে চরিতার্থ করা নয়? তাহ'লে যারা মন্দিরে তাদের অন্তরের একটি কোনো পিপাসাকে চরিতার্থ করতে যায় তাদের পানে চেয়েই হাসির কোন্ প্রয়োজন বল তো? তোমাদের ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে, তখন ভালোবাসায় মাতোয়ারা হয়ে নিজেকে নিবেদন ক'রে দাও, কোথায়? মাটির মানুষের কাছেই নয় কি? যতক্ষণ ভালোবাসার ঘোর থাকে ততক্ষণ সেই মাটির মূর্ত্তিকে ঘিরে থাকে অমর লোকের মহিমা! ওই মন্দির, শঙ্খ, ঘণ্টা, মূর্ত্তি, ফুল জল এ সব যে একটা স্থূল ব্যাপার এ কে না জানে। তবু এই কি সব? ছবির মাঝে যদি তুমি শুধু কতকগুলো বর্ণ সংগ্রহ মাত্রই দেখতে পাও তাহলে কি তোমার ছবি দেখা হ'ল? তেমনি রূপদৃষ্টি যে চাই সর্ব্বত্রই। তোমার দেশভক্তি, মানবপ্রেম, ইত্যাদি যত কিছু ব্যাপার সর্ব্বত্রই চাই রূপদৃষ্টি। সেইটুকু বাদ দিয়ে কোনো কিছুরই অর্থ থাকে না। দেশ বলতে যদি শুধু নদী, পাহাড় হ'ত, কিম্বা যদি শুধু ভৌগোলিক সীমার কতকগুলো মানুষ-সমষ্টিই হ'ত তাহলে দেশপ্রেমের অর্থ করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত নাকি? তেমনি আবার সেই রূপটি একটা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মানস abstractionও যে নয় তাও কে না জানে! ফলতঃ সর্ব্বত্রই মানুষ তার কল্পনাকে প্রতীক দিয়েই ইন্দ্রিয়ের বিষয় করেচে। তা না করে তার চেতনার তৃপ্তি নেই। অথচ ধর্ম্ম বোধের ক্ষেত্রেই আজ এই ব্রতাচার হয়েছে একেবারে অগ্রাহ্য!

কিন্তু এসব আমি কেনই বা বকচি সমরদা! আমি বলতে বসেছিলাম আমার একটা ব্যথার কথা। অথচ বলতে বসে দেখি আমার কথা বলবার লোকই নেই! কেন

আমি আজ বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে মালা চড়িয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে এলাম সে কথাটি বুঝিয়ে বলবার শক্তিই যেন আমার নেই! তুমি হৃদয়হীন নও সমরদা, কিন্তু তুমি সহৃদয় বোদ্ধা নও; তুমি তোমার মনের জানলা দিয়েই শুধু সব দেখতে শিখেচ, আমার মনের জানলা দিয়ে তাকাবার শক্তি যে তোমার নেই! ভালো কথা, তোমাদের গুরুস্থানীয় বার্ট্রাণ্ড রাসেল দেখলাম সম্প্রতি জীবনে ধর্ম্মের যে উপলব্ধি, সেই mysticismকে অস্বীকার করেন নি। তুমি কি বল?

ছোট বেলাকার সমস্ত ইতিহাস যদি পথের পাঁচালীর মত ক'রে বলবার সময় আর শক্তি থাকত, আর তোমাকে যদি সেই ইতিহাসটি শোনাতে পারতাম তাহ'লে আমি হয়ত তোমাকে বোঝাতে পারতাম যে ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম ভালোবাসা শ্রদ্ধার মত দেবপূজার কামনাটিও আমাদের প্রকৃতির মাঝে একটি কত বড় সত্য। তোমার এডিথ্ মিত্রকে ভালোবাসার মধ্যে যেমন একটি অপরিমেয়তা অনুভব করচ এবং সেই ভালোবাসা যেমন তোমার দৃষ্টিকে একটি অভিনব জগতে নিয়ে গেছে, তেমনি ছোট বেলাকার আমার সেই দেবপূজার মধ্যেও ছিল আনন্দের একটি অপরিমেয়তা, আর সেই পূজারতির জগৎও ছিল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ—সে জগৎ তোমার ভালোবাসার জগৎ থেকে কম সুন্দর নয়, কম লোভনীয়ও নয়।

তোমার group ফটোর মধ্যে আমিও একজন কম্যুনিষ্ট, কিন্তু তার বাইরেও যে আমি রয়েচি সে কথা ভোলা যে আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। "No man is by nature exclusively domiciled in one universe. All lives—even the lives of the men and women who have the most strongly marked congenital tendencies—are passed under at least two flags and generally many more." তাই তোমরা না জানলেও জীবনের অনেক মুহূর্ত্তেই আমি ছোট বেলাকার সেই মন্দির পথ যাত্রী আমিটির জন্য কাতর হয়ে ঘুরে বেড়াই। জীবনে যদি সাহিত্য শিল্পকলাসঙ্গীত ভালোবাসা এদের স্থান থাকে তাহ'লে সেখানে আমার সেই দেবপূজারই বা স্থান থাকবে না কেন আমি ভেবে পাইনে। ভোর বেলাকার সেই গঙ্গাস্নান, তারপর মন্দিরে ভক্তিব্যাকুল প্রণতি ও প্রদক্ষিণ, অগণিত ভক্তের স্তবমুখরিত মন্দিরপ্রাঙ্গণ, অন্তরের সেই একাগ্র আত্মনিবেদনের শান্ত মাধুর্য্য এই সব মিলে একদিন আমার জীবনকে সুন্দর ক'রেছিল। তারপর শুষ্কবিচার বিতর্কের পথ ধরে আজ আমি যেখানে উপনীত সেখানে চতুর্দ্দিকে সংশয়ের উষ্ণধূলিবাত্যায় দৃষ্টি প্রপীড়িত, কোথায় শ্যামল সৌন্দর্য্যের আভাসমাত্রও নেই। আছে শুধু একটি দীর্ঘ কঠোর তপ্ত মরুপথ যা দিগন্তে বিলীন। তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে সেই মন্দির পথের উদ্দেশে। কিন্তু কোথায় যেন আমি হারিয়ে গেছি। তাই আজ ভোর বেলা বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে কোথাও বিশ্বনাথকে দেখতে পেলাম না, কোথাও আমার অন্তর সেই ছোটবেলাকার মত ভক্তিনত হয়ে লুটিয়ে পড়ল না, কোনোদিকে তাকিয়ে চোখে আমার ব্যাকুল অশ্রু উদ্গত হ'ল না, কোথাও সেই পরিচিত পরম দেবতাকে দেখে চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠল না। কে যেন বললে,

Too late, too late, ye may not enter now.

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়



বৈষম্য

শ্রীলীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়

"এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর"—মেয়েটি ছোট অর্গ্যানটির কাছে টুলে বসিয়া অর্গ্যান বাজাইয়া আপন মনে গাহিতেছিল। ছোট একটি বাগান-ঘেরা বাংলো, অল্পই তার আসবাবপত্র, তবে খুব পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্তভাবে সাজানো। দেখিলেই মনে হয়—দু'খানি কল্যাণ কর-পরশে এগুলি এত সুন্দর!

রেলওয়ের ডাক্তার অবনী বোসের স্ত্রী ইন্দিরা; ডাক্তারটি রেলের হইলেও সৌখীন। স্ত্রী ইন্দিরা সালিখার মেয়ে। কলিকাতার নিকটে বাস বলিয়াই বোধ হয় সেও বেশ একটু শিক্ষিতা ও সুরুচিসম্পন্না। ইন্দিরাই এই ছোট সংসারটির কর্ত্রী, কিন্তু কর্ত্রী বলিলে তাহাকে মোটেই মানায় না। তার বয়স বছর আঠারো হইলেও যেমন চতুর্দ্দশ বলিয়া ভ্রম হইত, মনেও সে তেমনি শিশু। বাসার দাসী চাকরেও তাই বুঝি তাহাকে 'মাইজি' সম্বোধন না করিয়া 'বহুজি'ই বলিত।

আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ। এবার সে পূজায় মায়ের কাছে যায় নাই,—গিরিডীর এই বাসা-বাড়ীতেই ছিল স্বামীর শরীর সুস্থ ছিল না বলিয়া। শ্বশুরবাড়ীতে তাহার বিশেষ কেহ ছিলনা; তা নাই থাকুন, এক স্বামী অবনীর আদরেই সে বেশ সুখী। স্বামী অবনী একটু সাদাসিধা মানুষ, ইন্দিরার ভাবুক মন ইহাতেই যা' একটু ব্যথা বোধ করে।

আজ সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে আকাশে একটু মেঘের ঘনিমা দেখা যাইতেছিল। এখন এই আশ্বিনের শুক্লা সন্ধ্যাটিকে ব্যথায় ভরিয়া সেই মেঘ ধারায়-ধারায় ধরণীর বুকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। মেয়েটির আশ্রয়-হারা ভাবুক মন এরই ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল বুঝি—তাই সে আকুলভাবে গাহিতেছিল "এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।"

গানটি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বারে-বারে তার মধুর কণ্ঠে গীত হইতেছিল। ক্রমে স্বর নামিতে লাগিল, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যেন একটি মৃদু গুঞ্জন ঘরে রাখিয়া থামিয়া গেল। তারপর অশ্রুসিক্ত মুখখানি অর্গ্যানটির উপর দুই হাতে ঢাকিয়া সে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তার এই রোদন বাদলধারায় কবির বাণীতে কি রূপ পাইয়াছে? কে জানে অন্তরে তার কিসের এ অব্যক্ত দুঃখ, যা' হয়ত' বোঝান যায় না—নিজেও ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, তবুও সে থাকে ইহাও সত্য।

নারীর বুকে কোন্ বিরহী যক্ষপ্রিয়া কাঁদিতে চায় এমনি করিয়া কোন্ অজানা অভিমানে, নিবিড় মিলনের মধ্যে বিরহের ব্যবধান রচনা করিয়া তুলে, নিজে কাঁদে প্রিয়কেও কাঁদায়। তার বুকের এই চিরন্তন অশ্রুধারাতেই সে অহরহ প্রেমের নূতন অভিষেক করিয়া লয়।

হঠাৎ দুইহাতে তার মাথাটি তুলিয়া ধরিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে কেহ বলিল, "একি ইন্দু, তুমি কাঁদছ? কেন কাঁদছ..."

ইন্দু চকিতে চাহিয়া দেখিল স্বামী। তারপর দুই বাহু দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সে আরও কাঁদিতে লাগিল।

নিরুপায় অবনী শুধু তাকে একহাতে সস্নেহে ধরিয়া অন্য হাতে তার মাথার সুবিন্যস্ত চুলগুলি বিশৃঙ্খল করিয়া দিতে লাগিল। ভাষার কারুকার্য্য তার জানা নাই, কিছু যে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতে হয় তাহা সে জানে, কিন্তু কী সে কথা তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া-কাঁদিয়া ইন্দু আপনি শান্ত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। ওয়ালল্যাম্পের উজ্জ্বলালোক তাহার অশ্রুসিক্ত গৌরবর্ণ সুন্দর মুখে পড়িয়া, লাল দুল দুটিতে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইল। অবনী মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। ইন্দু বর্ষণমুখর আকাশে একটুকরা রৌদ্রের মত হাসিয়া বলিল, "কি দেখছ, যাও তুমি ভারী।"—

অবনী এই কথায় সম্বিৎ পাইয়া তার দু'খানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কেন কাঁদলে ইন্দু, বেশ ত' গাইছিলে। আমি কতক্ষণ এসেছি। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম। আপন মনে যখন গাও—তখন ভারী ভালো লাগে।"

"চোর কোথাকার, লুকিয়ে-লুকিয়ে গান শোনা। আমার একা ভালো লাগছিল না—তাই ত' কাঁদলুম, তুমি বুঝি কাছে আসতে পারো নি? ওমা অমনি করে' লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলে? যদি ঝি কি ঠাকুর এদিকে আসত?"

তারপর কথায়-কথায় উঠিল—এই গান শুনার পুরস্কার তার চাই এবং সেটা তাহাকে কোথাও বেড়াইয়া আনা। আগ্রা দিল্লী সে বহুবার গিয়াছে বৃন্দাবন মথুরাও তাই; তার দেশভ্রমণ-প্রীতির জন্য আর রেলওয়ের পাশের কল্যাণে তার তিন চার বছরের বিবাহিত জীবনে সে বহুস্থান দেখিয়াছে, এবার সে নবদ্বীপে রাসযাত্রা দেখিতে চায়।

অবনী হাসিয়া বলিল, "ভক্তির ত' ধার ধারো না, ঠাকুর-দেবতায়ও বিশ্বাস নেই, লোভ ত' দেখি ঠাকুর দেখার ওপরেই ষোল আনা।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে ইন্দু বলিল, "তোমায় ত' আমি অনেক বার বলেছি—কৃষ্ণকে আমি ভালোবাসি; তাঁর চরিত-কথা, তাঁর ছবি, তাঁর রূপ আমার বড় ভালো লাগে, ঠাকুর বলে' নয়—এমনি আমার তোমার মত মানুষ বলে'ই; তাঁকে যেন আমি চোখ বুজে সজীব দেখতে পাই।"

অবনী এ কথায় উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সে শ্যামবর্ণের দীর্ঘকায় সুপুরুষ ছেলে, গৌরবর্ণ ইন্দিরার বিবাহ-বাসরে "রাধা-কৃষ্ণ" মিলিয়াছে এ কথা তাহারা দুইজনে বারে-বারেই শুনিয়াছিল।

তারপর ইন্দিরার পনের কুড়িদিন ধরিয়া সে কী জল্পনা-কল্পনা! সেখানে কি দেখিবে, কত সুন্দর সে প্রেমের ক্ষেত্র, আর কী মধুময় এই প্রেমের উৎসব! সে শুনিয়াছে মাত্র নবদ্বীপে রাসে মহা ধুম হয়, আর কিছুই জানে না কি হয়। সহস্রবার স্বামীকে প্রশ্ন করে। স্বামীও উত্তর দিতে পারে না। সে দিবারাত্র কল্পনার রঙীন জাল বয়ন করিতে থাকে।

সাতদিনের অবসর অবনী পাইল। কথা হইল ফিরিবার মুখে একদিন ইন্দু মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবে। আর নবদ্বীপে হোটেল বা ধর্ম্মশালা নিশ্চয়ই মিলিবে, না মিলে ষ্টেশনের বিশ্রাম কক্ষ ত আছে। তাহারা এমনি করিয়াই আশ্রয় লয়, পরিচিত আশ্রয়ে যায় না—মিলনের মধুরতা অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্যই বুঝি।

তারপর ছুটীর সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দুর কাজের আর বিশ্রাম রহিল না। সহস্র খুটিনাটি জিনিষ তাহাকে ত্রুটিশূন্যভাবে গোছাইয়া লইতে হইবে, পাছে বিদেশে স্বামীর অসুবিধা হয়।

তারপর একদিন রাত্রের ট্রেনে তারা ছুটিতে রওনা হইল, সঙ্গে রহিল আরদালি রামজীবন। পরদিন বেলা এগারোটার সময়ে নবদ্বীপ ষ্টেশনে তাহারা নামিল। সমস্ত পথ ইন্দু একটিও কথা বলে নাই—চোখে তার যেন স্বপ্নময় ভাব। সে যেন এ মরজগতের কেহ নয়, স্বয়ং অভিসারিকা শ্রীরাধা। পরিধানে তার ঘোর নীল রঙের রেশমের শাড়ী, সেই রঙেরই জামা না পরিয়া ঘোর লাল রঙের ছোট জামা তার গায়ে। সুন্দর সেই চরণদুটিতে লাল রঙের চির পরিচিত নাগ্‌রা সে পরে নাই, পরিয়াছিল সে যত্ন করিয়া আল্‌তা। কপালের উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু—সেও তেমনি রহিয়াছে। সারারাত্রি সে যে শয়ন করে নাই—তাই কিছুই তার শ্রীহীন হয় নাই; সামান্য দু'একখানি অলঙ্কারেই তাহাকে অপরূপ দেখাইতেছিল।

অবনী ষ্টেশনে নামিয়া, সকলের ইন্দুর প্রতি সতৃষ্ণদৃষ্টি দেখিয়া একটু হাসিল। ইন্দুর ত' চেতনা নাই বলিলেই হয়, সে শুধু অবনীর হস্তধৃত পুতুলের মত স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী চলিয়াছে।

টিকিট-কালেক্টারকে পাশ দেখাইয়া অবনী তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কোনও হোটেল আছে কিনা! উত্তরে সেই ভদ্রলোক ইন্দুর প্রতি চাহিয়া বলিল, "না মশাই, এখানে হোটেল-ফোটেল নেই, তবে ছুটি প্রসাদ যে কোনও ঠাকুরবাড়ীতে মেলে। আর এই যে কুকারও সঙ্গে রয়েছে—তবে আর কি, আর—"

অবনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

তারপর ইন্দুকে একটু নাড়া দিয়া বলিল, "ইন্দু, এখানে হোটেল নেই, শুনছ ? এইখানেই ব্যবস্থা করি ?"

ইন্দুর যেন চমক ভাঙ্গিল, বলিল, "না না—চলো আগে ঠাকুর দেখব।"

অবনী বলিল, "সে হবে'খন, তুমি এতটা বেলা পর্য্যন্ত কিছু খাওনি, আগে মুখ ধুয়ে..."

ইন্দু স্বামীর হাতখানি ব্যাকুলভাবে দুই হাতে ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "ওগো না—না, আমি আগে ঠাকুর দেখব, রাসের ঠাকুর না দেখে"

সেই চেকারবাবু তখনও কাছেই ছিল, সে তখন বলিয়া উঠিল, "বেশ তো দেখিয়ে আনুন না, এই তো কাছেই পাড়ার তিন চারখানা ঠাকুর, ওই বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

ইন্দু উন্মুখ হইয়া উঠিল, "চলো—আগে চলো না।"

তাহাকে অদৃষ্টসূত্র এমনি করিয়া টানিতেছিল যে সে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারে না।

অবনী একটা কুলিকে কিছু পয়সা দিবে স্বীকার করিয়া পথ দেখাইতে সঙ্গে লইল; রামজীবন রহিল জিনিষপত্র লইয়া।

সামান্য পথ চলিতেই কতকগুলি চালাঘরের পাশে একটা উচ্চ মণ্ডব দেখা গেল। ইন্দু তখন পাগলের মত স্বামীর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু একি !

মণ্ডবের সম্মুখে কতকগুলি ইতরশ্রেণীর লোক সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া একটা কুৎসিৎ গান গাহিয়া-গাহিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নৃত্য-মণ্ডপের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড মহিষ কর্ত্তিত অবস্থায় পড়িয়া; বোধহয় এইমাত্র বলিদান ক্রিয়া সমাধা করিয়া সেই উষ্ণ রক্তধারা মাখিয়া তাহারা নাচিতেছে। মণ্ডপের মধ্যে ভীষণ-দশনা বোধহয় ছয় হাত উচ্চ এক কালীমূর্ত্তি—মণ্ডপের মঞ্চে লেখা "মহিষ-মর্দ্দিনী।"

কোথায় শ্যাম সমারোহে শ্যামসুন্দর ? কোথায় পুষ্পিত কুঞ্জবন ? কোথায় রাধা রাস-মোহিনী ? এই সুন্দর রাসোৎসবে একি বীভৎস পৈশাচিকতার সৃষ্টি ?

কে তুমি শক্তি-উপাসক, নিজের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এই মধুর তিনটি দিনের শ্যামসুন্দরের প্রেমের মহোৎসবকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া শক্তি-পূজার পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া দিয়া গিয়াছ ? ইহার বীভৎসতা আজ যে সীমা ছাড়াইয়া চলিয়াছে, কে ইহার গতিরোধ করিবে ?

ইন্দু বারেক-দুই ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া যেন স্বামীকে ধরিতে গেল, তার মুখ মৃতের মত ম্লান পাণ্ডুর, অবনী ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। কিন্তু তার পূর্ব্বেই সে আর্ত্তনাদ করিয়া সেই রক্তাক্ত মৃত্তিকার উপর সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া আছড়াইয়া পড়িল।

লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়



আধুনিক সাহিত্য

শ্রীআশীষ গুপ্ত

এক কথা-সাহিত্য ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে আমাদের দৈন্য অসাধারণ, অতএব আধুনিক সাহিত্যের আলোচনার সময় কথা-সাহিত্যের পরে বেশী ঝোঁক দেওয়া স্বাভাবিক। এই প্রবন্ধের প্রকৃতি সেই জন্যই হ'বে সীমাবদ্ধ।

আধুনিক বস্তুর প্রকৃত কোনও রূপ নেই, এর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যুগে যুগে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লায়, এই কথাটি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এক বছর আগে যা আধুনিক বলে' পরিগণিত হ'ত, আজ আর তা আধুনিক নয়, আবার আজ যা আধুনিক একবছর পরে তার সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদ্‌লে যাবে। সুতরাং এরকম স্বল্পপ্রাণ আধুনিকতাকে একমাত্র সম্বল করে' সাহিত্যক্ষেত্রে পাড়ি জমান অসম্ভব। মহৎ সাহিত্যের একটি চিরন্তন স্নিগ্ধ ধ্যানদৃষ্টি আছে, সে সাহিত্য নিত্যকালের সামগ্রী। আড়াই মিনিট তার জীবন নয়, সত্যকার সাহিত্য স্বল্পায়ু না, এবং তার রূপ তার রস বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক পরম উদারতার সহিত উভয় বাহু দু'দিকে প্রসারিত করে' দেয়, এক হাতে সে অতীতকে ধারণ করে এবং অন্য হাতে অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতম যোগস্থাপনার হেতু হয়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সেই জন্যই আধুনিক সাহিত্য নয়, এই দুই সাহিত্য ঋত্বিকের রচনা যুগসাহিত্যও নয়, ওঁদের সৃষ্টিকার্য্য নিত্যকালের সামগ্রী হ'য়ে গিয়েছে, সাল তারিখের সামান্য বন্ধন এড়িয়ে যেসব রচনা চিরকালের জন্য রসলোকে স্থানলাভ করল।

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে একদিন কলরব ছিল অত্যন্ত বেশী, হট্টগোলে সেদিন কান পাতা ছিল দায়, আজ সে কোলাহল অনেকটা শান্ত হ'য়ে এসেছে, সাহিত্যের এখন অতিশয় ঝিমিয়ে-পড়া অবস্থা, সমালোচনারও তাই। ভাতের ফেনা উপ্‌চে পড়ে' জল যেন হাঁড়ির তলায় এসে ঠেক্‌ল। এখন এ সাহিত্যের একটা হিসাব-নিকাশ সম্ভব।

রুচি ও নীতির তর্ক সাহিত্যের, বিশেষ করে' আধুনিক সাহিত্যের একটা বড় তর্ক। এর হেতু হচ্ছে এই যে, শিল্পের ক্ষেত্রে নীতির চেয়ে রুচির প্রশ্ন প্রধান এবং সেই জন্যই এ সম্বন্ধে কোলাহল কলরবেরও বিরাম নেই। কারণ সুনীতি কুনীতির একটা অল্পবিস্তর ধরাবাঁধা মাপকাঠি আছে, রুচির ক্ষেত্রে তা অবর্ত্তমান। একই ঘরের অতিশয় পরিকৃষ্ট সমাজের দুটি মেয়ের মধ্যে ফার্ণিচারে লাল পালিশ দেওয়া হ'বে কিংবা মেহগ্যানি এ নিয়ে মতভেদ হ'তে পারে, মতভেদ হ'তে পারে তারা ঝুম্‌কো দুল পর্‌বে, না স্বস্তিকা দুল তাই নিয়ে, কিন্তু সুনীতি কুনীতির স্থূল আদি তত্ত্বগুলো সম্বন্ধে তাদের দ্বিমত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। অতএব সাহিত্যক্ষেত্রে রুচিভেদের তর্ক শেষ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু থাক্‌বেই। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে শিল্পসৃষ্টির কাজে নীতি থাক্‌বে পিছিয়ে, রুচির আলোচনাই হ'য়ে উঠ্‌বে প্রধান আলোচনা। সকল রকমের নীতিধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে অক্ষুণ্ণ রেখেও অতিশয় কুরুচিপূর্ণ গল্প বাংলাদেশে অদ্যাবধি বস্তা বস্তা বেরিয়েছে এবং হিতোপদেশের সর্ব্ব সৎপরামর্শ পদে পদে অগ্রাহ্য করেও প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যেও বিরল নয়।

রুচির প্রশ্ন উঠ্‌লেই নির্ব্বাচনের প্রশ্ন আসে,—কোন্ জিনিষ সাহিত্যগঠনের অনুকূল একথা স্বতঃই মনে উদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিষয়বস্তু যত তুচ্ছ, যত নগণ্যই হ'ক না কেন প্রয়োজন হ'লে শিল্পের ক্ষেত্রে তাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে হ'বে।

বাগবাজার লাইব্রেরীর পঞ্চাশত্তম বর্ষোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্যের অভাবে কথা-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন যে বাধাগ্রস্ত হয়, একথা আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু তার সঙ্গে এ-ও সত্য যে ওস্তাদ শিল্পীর সৃষ্টিকার্য্য উপাদানের দৈন্যে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে না।. যিনি লিখ্‌তে জানেন তিনি একজন চালের গদির মালিককে নিয়েও যে মনোরম গল্প লিখ্‌তে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পটির নামোল্লেখ করব। এত সামান্য বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে' এমন অসামান্য রচনা যাঁর হাত দিয়ে বেরোয়, তিনি যে কতবড় আর্টিষ্ট সেকথা আমরা নিরন্তর বিস্মিতচিত্তে অনুভব করতে থাকি।

—সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি বলা হ'ল তার চেয়ে কেমন করে' সে কথা বলা হ'ল তা জানবার জন্যে আমাদের আগ্রহ ঢের বেশী। আখ্যানবস্তুর চেয়ে প্রকাশভঙ্গী সেইজন্যই অধিকতর প্রয়োজনীয়।

আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ এই যে, তাতে বৈচিত্র্য নেই,—শুধু কাহিনীর বৈচিত্র্য নয়, প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য নেই,—অথচ সাহিত্যসৃষ্টির কাজে উপাদানের জন্য যদি দশ নম্বর রাখি, তা'হলে প্রকাশ-নৈপুণ্যের জন্য নব্বইয়ের কম রাখ্‌লে কিছুতেই চল্‌বে না।—এই প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে "বিচিত্রা"য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে তিনি বলেছেন শিল্পসৃষ্টির কাজে হাতের যাদুটাই আসল কথা, উপাদানটা গৌণ। রাঁধ্‌তে জানলে নিরামিষ তরকারীও যে যথেষ্ট পরিমাণে মুখরোচক এইটেই ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য। কিন্তু এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সত্য নয়,—কারণ ভালো রাঁধুনী শুঁটকি মাছ দিয়েও হয় ত একটা খাদ্য বানিয়ে তুল্‌তে পারেন, কিন্তু রুই-কাৎলা পেলে যে তিনি তার চেয়েও ভালো রাঁধ্‌বেন, একথা ত বিনা প্রমাণে মেনে নেওয়ার মত স্বতঃসিদ্ধ।—অতএব সাহিত্যক্ষেত্রে উপাদানের প্রয়োজন একেবারে নেই একথা বলা মানেই একটুখানি বাড়িয়ে বলা। —তবে এ বিশ্বাসটুকু সকলেরই আছে যে পাকা রাঁধুনীকে বাজার থেকে সামগ্রী পছন্দ করে' আনতে দিলে তিনি পচা হাঁসের ডিম এবং বাসী মাছ কিনে আন্‌বেন না।—সাহিত্যে সুশ্রী কুশ্রী, ভালোমন্দের বাছাই যে চল্‌বেই, এ উক্তি ত রবীন্দ্রনাথের ওই রচনার মধ্যেই আছে।

বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের পর সাহিত্যিক যখন তাঁর প্রকাশ-নৈপুণ্যের সাহায্যে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, সামান্যকে অসামান্য করে' তুল্‌তে পারেন, তখনই আমরা তাকে একটি সম্পূর্ণ সামগ্রী বলে' গ্রহণ করি,—সে জিনিষকে আমরা খণ্ডখণ্ড করে' বিশ্লেষণ করতে পারি না, চাইও না। চারিদিককার সুসংযত বন্ধনে সে-বস্তু একটি সুশোভন পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে।

একথা যেন আমরা কোনদিন না ভুলি যে প্রগল্‌ভতা সাহিত্য নয়, সংযম এবং মাত্রাবোধ সাহিত্যস্বপ্নপুরীর গোপন রহস্যের চাবিকাঠি। শুধু লিখ্‌তে জানাই একমাত্র জানা নয়, থাম্‌তে জানাও বড় জানা।—এমনই করে' আখ্যানবস্তু, প্রকাশনৈপুণ্য, মাত্রাবোধ, বাক্‌সংযম এবং সুরুচি-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুভূতির একত্র মিলনের ফলেই সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব। এসবগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে দেখ্‌লে চলে না।—হাত পা চোখ মুখ নাক ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটি যদি নিখুঁত হয়, তাহ'লে যেমন আমরা একজন সম্পূর্ণ সুদর্শন মানবের সাক্ষাৎ লাভ করি, অথচ সে মানুষটি শুধু হাত, কিংবা শুধু পা নয়, এও প্রায় তেমনই।

কিন্তু শেষ অবধি রসবোধের ব্যাখ্যা চলে না। তাই আমরা জানি সাহিত্যের স্থান মস্তিষ্কে নয়, চিত্তে। মানব-মনের গভীরতম প্রদেশে এর স্থায়ী আসন। এবস্তু তর্ক করে' বোঝান যায় না, অতিশয় সবল যুক্তির সাহায্যে পরিস্ফুট করা চলে না, অন্তর দিয়ে একে লাভ করতে হয়। সে যে না করেছে তার পক্ষে কূট আলোচনার ভোঁতা নরুণের সহায়তায় একে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' বুঝ্‌বার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

সাহিত্য জাতির প্রাণধারার সংবাহক। সমাজ-জীবনের সহিত দেশের সাহিত্যের যদি সুনিবিড় যোগ না থাকে, তাহ'লে সে সব রচনা আর যা-ই হ'ক সাহিত্য পদবাচ্য নয়। শব্দের সঙ্গে অর্থের, দেশের মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার সঙ্গে দেশের লেখকের রচনার যে মূলীভূত সংযোগকে উপেক্ষা

করে' "সাহিত্য" পদটির সৃষ্টি, অসত্য উক্তির দ্বারা তা পদে পদে ক্ষুণ্ন হ'তে থাকে,—সমস্ত সামীপ্যবোধ, সকল সহানুভূতি দূরে যায়, এবং সর্ব্বমানবের তাচ্ছিল্যের মাঝে সে সাহিত্যের ঘটে অকালমৃত্যু।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষের এত বড় একটা মহাজাগরণের তুচ্ছতম স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত নেই। সাহিত্যভাদ্রবধূ অতিশয় সন্তর্পণে ভাশুরঠাকুরের ছায়াটি থেকেও যেন আত্মরক্ষা করেছেন। যাঁরা দেশে যখন দুঃখসহনের প্রতিযোগিতা চলছে, স্বার্থত্যাগের জন্য যখন দেশময় কাড়াকাড়ি, যুগ যুগ সঞ্চিত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে, পুঞ্জীভূত বেদনা এবং অসম্মানের গুরুভার অতিক্রম করে' যখন দেশব্যাপী আত্মচেতনার একটা বিপুল প্রয়াস, তখনকার আধুনিক সাহিত্য পদ্মভুক সাহিত্য, ললিতলবঙ্গলতা এবং মলয় শিহরণের সঙ্গে বড় জোর এর কারবার!—এতে দেশের কথা নেই, দেশের মানুষদের কথা নেই, কতগুলি কাল্পনিক জীবের এক বিশেষ ধরণের অতি-কাল্পনিক দুঃখের কাহিনী বাগ্‌বাহুল্যসহকারে সালঙ্কারে বর্ণনা করাই যেন এর চরম এবং পরম উদ্দেশ্য! ধনী হ'ক, দরিদ্র হ'ক, শিক্ষিত হ'ক, অশিক্ষিত হ'ক, চাষা হ'ক, অভিজাত হ'ক, ওই একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসারে আর যেন কারও কোনও দুঃখ নেই, অভিযোগ নেই, বল্‌বার কিছু নেই। প্রতি সমাজে কত অভাব, কত নালিশ, কত বিভিন্ন প্রকারের দুঃখ সুখের ইতিহাস, তারই মধ্যে কত অসামান্য গল্পের অপূর্ব্ব বিষয়বস্তু, আধুনিক সাহিত্য তার সন্ধান রাখে না!—এ সাহিত্য না দেশের, না সমাজের,—না ঘরের, না পরের। এ এক ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইন্‌, যা লেখককুলের স্বখাত সলিল হ'য়ে উঠ্‌ল।

ফোটোগ্রাফি যে আর্টের ক্ষেত্রে সাতিশয় নিন্দনীয় এবং অতি-বাস্তবতাও তাই, একথা বহুবার বহুজনে বলেছেন, অতএব যদিও কথাটা সত্য তত্রাচ তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু মিথ্যা বাস্তবতার দুর্জ্জয় মোহ যদি কোনও লেখকের মনে থাকে তাহ'লে এ উক্তিটা যত বেশীবার তাঁর কর্ণগোচর হয় ততই মঙ্গল।—কোন কোন লোকের স্বভাব আছে, সুস্পষ্ট মিথ্যাভাষণের সময়ও এই বলে' তাল ঠুকে বেড়ানো যে, সত্য কথা বল্‌ছি। তাঁরা নির্লজ্জ হ'তে পারেন, কিন্তু লজ্জাহীনতার দুঃসাহসটুকু থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করলে চল্‌বে না।—যদি ধরে' নেওয়া যায় আধুনিক সাহিত্যের কোনও স্থলে কোনদিন এ কলুষ মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবেশ করেছিল, তাহ'লে তর্কের খাতিরে বল্‌তে পারি, শিল্প ত কেবলমাত্র সত্যভাষণ নয়, গোটা গোটা সত্য কথা মোটা মোটা করে' বল্‌লেই ত সেটা সাহিত্য হ'য়ে ওঠে না।—ঠিক এই জন্যই সাহিত্যের মধ্যে সংস্কারক এবং দার্শনিকের সমস্যার প্রবেশ নিষেধ। অবশ্য যদি কাহিনীর মধ্যে সংস্কারক অথবা দার্শনিক চরিত্রের অবতারণা করা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মতামত নিয়ে আলোচনা চালাতে পারেন, কিন্তু লেখকের পক্ষে তাদের কারও দলগ্রহণ, একেবারে—নৈব নৈব চ।

—রাজনীতিক্ষেত্রে দলের লেবেল কপালে আঁটবার রীতি আছে, এ না হ'লে নাকি সেখানে চলে না,—ধর্ম্মব্যাপারেও যূথবদ্ধ হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি নেই, সেখানেও আছে শাক্ত, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, অঘোরপন্থী।—কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে মতামত হিসেবে কোনও স্কুল গঠন করা চলে না,—সাহিত্যিকদের একটিমাত্র সম্প্রদায় গঠিত হওয়া সম্ভব, সেটা হচ্ছে সাহিত্যিক দল, বিশেষণবিমুক্ত সাহিত্যিকসঙ্ঘ। তা যদি না হয়, শিল্পক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক যে নির্লিপ্ত দৃষ্টি তা থাক্‌বে না লেখকের, চরিত্রসৃষ্টি হ'বে অস্বাভাবিক, হ'বে নিজের মতামতের দ্বারা অনুরঞ্জিত। রচনাকার্য্যে লেখকের মন হওয়া উচিত স্বচ্ছ নির্ম্মল, তবেই তাতে মানবচরিত্রের নিখুঁত প্রতিবিম্ব ধরা পড়্‌বে, নইলে মন যদি থাকে ঘুলিয়ে, সব ধারণাই হ'বে মিথ্যে, কোনও কিছুর মূর্ত্তিই তাতে সঠিক প্রতিফলিত হ'বে না।—সেইজন্যই সাহিত্যিকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাঁর নিজের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাসগুলি রচনার সময় যে জামা তিনি গায়ে দিয়ে নেই, তেম্‌নিতর জামার পকেটে সযত্নে তুলে রাখা। ওগুলো তিনি তাঁর জীবনের কাজে সার্থক করবেন, সাহিত্যসৃষ্টিতে নয়।

রচনার সময় লেখকের দৃষ্টি থাক্‌বে তাঁর প্রস্তাবিত চরিত্রের

প্রতি, সৌন্দর্য্যবিকাশের প্রতি, নিজের মতামতের প্রতি নয়।—আধুনিক সাহিত্যে এই নির্লিপ্ততার আদর্শ বহুস্থানেই রক্ষিত হয়নি। আর তারই ফলে পাঠক বইয়ের মলাট দেখেই পূর্ব্ব হ'তে টের পেয়ে যান বইয়ের মধ্যে কি আছে, কতটুকু তার ভিতরে আশা করতে পারা যায়, তা তিনি প্রথম থেকেই জানেন,—প্রতি পৃষ্ঠায় নব নব বিস্ময়, নব নব আবিষ্কারের আনন্দ হ'তে পাঠক আরম্ভেই বঞ্চিত হ'ন, অথচ ওই বিস্ময়, ওই আনন্দের মধ্যে সাহিত্য পাঠের কত মাধুর্য্যই না লুক্কায়িত ছিল!—গল্প হ'য়ে উঠেছে ফর্ম্মিউলা-মাফিক, লেখকও হ'ল ষ্টীল ফ্রেমের ছাঁচে ঢালা!

একটা কথা কিছুতেই ভুললে চল্‌বে না, যে, সাহিত্যের কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট ঢং সাহিত্য নয়। যেমনতর তুরুচ্চার্য্য নামের লেখকের পুরু মলাটের বই আলমারী সাজিয়ে রাখ্‌লেই তদ্দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় না, তেমনই একটা বিশেষ pose অবলম্বন কর্‌লেই সেটা শিল্পকার্য্যের রূপ ধারণ করে না।—বস্তিকাহিনী সেই কারণেই সাহিত্য হ'ল না, যেহেতু ওটা একটা ভঙ্গিমা ছাড়া আর কিছু নয়,—ট্যাক্সিতে চড়ে' বস্তিভ্রমণের মতই সেটা অলীক,—অর্থের অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে কিছু অর্থসংগ্রহের চেষ্টার মতই সেটা বাজে। বস্তুতঃ বড় করে' না ভাব্‌তে পার্‌লে সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর নয়, আধুনিক সাহিত্যে তেমন করে' যাঁরা ভেবেছেন, তাঁরাই কেবল স্থায়ী কিছু কর্‌বার আশা অন্তরে পোষণ কর্‌তে পারেন, অপরে নয়।—ক্ষুদ্র চিত্ত ক্ষুদ্র সাহিত্যের মূল,—বড় করে' চাওয়ার মধ্যেই বড় করে' পাওয়ার গোপন কথাটি সংগুপ্ত আছে।

আধুনিক সাহিত্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় স্মার্ট নরনারীর বহুলতা। এসব চরিত্র সম্বন্ধে খুব সামান্য দুটি কথা বলা চল্‌তে পারে, প্রথমতঃ রসসৃষ্টির দিক থেকে এরা চরিত্র নয়, দ্বিতীয়তঃ এরা স্মার্ট নয়।

সাহিত্যের রসবিচারে আমরা সেই সব চরিত্রকে প্রাধান্য দিই যাদের মধ্যে একটা সুসঙ্গতি আছে, যারা লেখকের সংযত কল্পনার দৌলতে একটি সমগ্র মূর্ত্তি লাভ করেছে, স্রষ্টার উদ্দেশ্যানুরূপ যে চরিত্র কেবলমাত্র যে সকল ঘটনা লেখকের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে একান্ত অনুকূল সেই সকল ঘটনাকে আশ্রয় করে' গড়ে' উঠেছে। তাদের প্রতি কর্ম্মে, বাক্যে, আচার ব্যবহারে তারা যদি লেখকের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা না করতে পারে, যদি না নিজেদের কাজের দ্বারা নিজেরা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, তাহ'লে তাদের কাহিনী রসরচনা হ'ল না।

আধুনিক সাহিত্যের নড়্‌বড়ে গঠনের মধ্যে সুসামঞ্জস্যের অত্যধিক অভাব, সঙ্গতির স্বল্পতা, পদে পদে রসানুভূতি এবং সুরুচির দৈন্য দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে এই সাহিত্যান্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির কাজে কর্ম্মে আত্মপরিচয় দেবার সামর্থ্য নেই, লেখককে তাদের জন্য জবাবদিহি করে' মরতে হয়, বলতে হয়, অমুক লোকটি স্মার্ট, তমুক লোকটি পণ্ডিত ইত্যাদি। এসব ক্ষমতার পরিচয় নয়। কানের পাশে রিউডল্‌ফ্‌ ভ্যালেন্টিনো প্যাটার্ণের জুল্‌পী রাখা এক শ্রেণীর লোকের কাছে স্মার্টত্বের নিদর্শন, অথচ মাত্র সাতদিন জুল্‌পী না কামালেই এই ধরণের স্মার্টনেস্‌ অর্জ্জন করা যায়। এত সুলভ জুল্‌পী-সম্বল স্মার্টনেসে সন্তুষ্ট হওয়া শক্ত। এবং একটি মোটা চুরুট মুখে দিয়ে সেই নায়কটি যদি ড্রয়িংরুমে বসে' তরুণী নায়িকার সঙ্গে অশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে প্রেমচর্চ্চা করতে থাকেন তবে একটা স্মার্ট গল্প পড়া গেল, এই ভেবে উল্লাস প্রকাশ করা আরও কঠিন।

স্মার্ট নায়ক সৃষ্টি করতে হ'লে সাতদিন জুল্‌পী না কামানো, চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা এক তরুণকে গল্পের মধ্যে আমদানী করে' পাঠকসাধারণকে ডেকে বল্‌বার দরকার নেই, "স্মার্ট নায়ক দেখহ!" এবং নায়িকার হাতে মোটা জার্ম্মান অথবা ফরাসী বই ও মুখে বড় বড় গ্রীক ক্যোটেশ্যন প্রদান করবারও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। —প্রকৃত স্মার্টনেস্‌ পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাহায্যে, ঘাত প্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সহায়তায়, নায়কের বুদ্ধির দীপ্তি এবং আভ্যন্তরিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বিকশিত হ'বে, কারণ এই স্মার্টনেস্‌ই সত্যকার স্মার্টনেস্‌, এটা ঢিলে পায়জামা এবং অশুদ্ধ ইংরেজীর সাহায্যে লভ্য নয়, এ কেবল অভিজাত সংস্রব, চারিত্রিক শিক্ষা এবং তীক্ষ্ণ ধীশক্তির দ্বারাই সম্ভব।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্য আমাদের এমন একটা সংস্কার থেকে মুক্ত করেছে যার জন্ত এ সাহিত্যের কাছে আমরা অতিশয় ঋণী আছি। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও বাংলাদেশের গল্পের রীতি ছিল ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় দেখানো, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত লেখককে যে কত অস্বাভাবিক ঘটনারই সাহায্য নিতে হ'ত! —গল্পের শেষে সাধুলোকের জয় জয়কার এবং অসাধুলোকের পাপের গুরুতর শাস্তির কাহিনী পাঠ করে' মন যে নিরতিশয় পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌ত, সে কথা বলাই বাহুল্য। —আধুনিক সাহিত্যই এই লজ্জাকর প্রথার নাগপাশ থেকে আমাদের উদ্ধার করেছে। কারণ শিল্পস্থষ্টির দিক থেকে সাধু ব্যক্তির দুঃখভোগের যদি প্রয়োজন থাকে তাহ'লে নীতিধর্ম্মের অজুহাতে তার অন্তথাচরণ রসের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা। —ঠিক মনে পড়্‌ছে না শরৎচন্দ্র যেন কোথায় বলেছেন, যা হওয়া উচিত শুধু তাই নয়, যা আছে তাকে মানুষ সহজে অতিক্রম কর্‌তে পারে না। উক্তিটা অতিশয় সত্য।

—গল্পের এই সাধু পরিণতির হাত থেকে বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করার গৌরব আধুনিক সাহিত্যের। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার,—আখ্যায়িকার মধ্যে যে ভালো লোকের স্থান নেই, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই যে সব গল্পেই অতি-আয়াসসাধ্য নীতিসম্মত সমাপ্তির প্রয়োজন নেই, চিনিজিনিষটা যদিচ ভালো, তবুও মাছের ঝোলে তার প্রবেশ অনধিকার প্রবেশ।

—কিন্তু তাই বলে' এক সংস্কার থেকে মুক্ত হ'য়ে আমরা যেন আর এক সংস্কারের কবলে না পড়ি। অর্থাৎ এ ভুল ধারণা যেন আবার আমাদের পেয়ে না বসে যে নীতিসম্মত সমাপ্তি হ'লেই সে কাহিনী সুসাহিত্য হ'ল না। বস্তুতঃ এ বিষয়ে লেখকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হওয়া আবশ্যক। গল্পের স্বাভাবিক পরিণতির জন্ত যদি সাধু ব্যক্তির শাস্তি এবং অসাধুর পুরস্কার লাভ আবশ্যক হয়, তাহ'লে তাই হ'ক, আবার অন্তক্ষেত্রে যদি সজ্জনের পুরস্কৃত হওয়া এবং দুর্জ্জনের লাঞ্ছনা লাভের প্রয়োজন হয়, তাহ'লে সে সমাপ্তিকেও যেন না কোন প্রকার মোহের বশে লেখক জোর করে' ঠেকিয়ে রাখেন। —নোংরা কিছু না হ'লে জোরালো সাহিত্য হবে না, এবং স্ত্রীকে প্রহার না দিলে পৌরুষ অপ্রমাণিত থেকে যাবে এদুটো উক্তি একই ধরণের সত্য!

আধুনিক সাহিত্যের আর একটা গর্ব্বের বিষয় এর অপূর্ব্ব ভাষা। প্রাচীন বাংলার গাধাবোটের আকৃতি পরিহার করে, এ ভাষা ষ্টীমলঞ্চের গঠন প্রাপ্ত হ'য়েছে। মেদবর্জ্জিত বিস্ময়কর সুঠাম এর চেহারা। নিত্যব্যবহৃত তরবারির ন্যায় এর দীপ্তি। এমন তীক্ষ্ণ, সবল, উজ্জ্বল, ডিরেক্ট ভাষা যে কোনও দেশের সাহিত্যের পক্ষে গৌরবের সামগ্রী হ'তে পারত। —আমরা জানি বেশী টিপ্ কর্‌তে গিয়েই আধুনিক সাহিত্যের লক্ষ্য ফসকেছিল, কিন্তু এ জিনিষটা ক্রমেই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে যে মানব শিক্ষার গুরু দায়িত্ব আছে তার 'পরে। বৃহত্তর প্রাণ, শুভতর জগৎ, উন্নততর মানবসমাজ-এরই দিকে মানুষের মন হাত বাড়িয়ে আছে, উচ্চ হ'তে উচ্চতর জগতে তাকে নিয়ে যাওয়ার কাজ সাহিত্যিকের।

—এই অসামান্ত ভাষাকে বাহন করে' বাংলাসাহিত্য একদিন বিশ্বজয়ে বেরোবে, সেদিন সাহিত্যবোধ আর বিকৃত থাক্‌বে না, সাহিত্যধর্ম্মের অনুভূতি থাক্‌বে না অপরিচ্ছন্ন। সেই সত্যকার পরিবর্ত্তনের সুরটি ইতিমধ্যেই ধ্বনিত হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে, অতএব সর্ব্বকোলাহল অন্তে আমরা আশাশীল মনে এক পরমোজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করতে পারি।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

দিক্‌শূল

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

দশ বছর বয়স থেকে আমি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা প'ড়ে আসছি। আজ আমার বয়স পঁচিশ বছর। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী গভীর অধ্যয়নের ফলে আমি স্থির বুঝতে পেরেছি, যে বিধাতা পুরুষ বাঙ্গালীকে যখন তখন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে হুটহুট ক'রে বাড়ীর বাহিরে দৌড়তে নিষেধ করেছেন। এই ত অম্বুবাচী পড়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা, তিন দিন বাড়ীতে ব'সে আছি। এটা ত পাঁজি পড়েছি ব'লেই। নরেন নামে আমার এক বন্ধু আছে, জাতে পৈতা-ছেঁড়া বামুন, আমার পাঁজিকে বলে কিনা গুপ্তপ্রেস গঞ্জিকা! ভগবান্ তাকে গত বছর তেমনই শাস্তি দিয়েছেন। ছোকরা বি-এ পরীক্ষা দিতে গেল ত্র্যহস্পর্শের দিন। একেবারে দাঁড়িয়ে ফেল হল। তবু কি তার চৈতন্য হল? আমাকে বলতে লাগল, "মূর্খ! সবাই ত এই ত্র্যহস্পর্শের দিন পরীক্ষা দিতে গেছল। ক'জন ফেল মেরেছে?"

ওরকম ষ্টুপিডের সঙ্গে তর্ক ক'রে কি হবে? ওকে কি ক'রে বোঝাব যে যারা হিন্দু, তারা নিশ্চয়ই মাহেন্দ্রযোগ কি অমৃতযোগ দেখে যাত্রা করেছিল। যাত্রা করা মানে কি? গর্গ ব'লে গেছেন, "গৃহাৎ গৃহান্তরং।" সেটা ত সহজেই করা যেতে পারে। এক বেলা রান্না ঘরে কি ভাঁড়ার ঘরে ব'সে থাকলেই হল।

আমি নিজে কিন্তু ওরকম গোঁজামিলও কখন দিই না। আপন রাশির সঙ্গে মিলিয়ে সব গ্রহনক্ষত্রের স্থান দেখে তবে বাড়ী থেকে বের হই। ফলে অদৃষ্ট চিরদিন আমার উপর সুপ্রসন্ন। বি-এল পর্য্যন্ত সব পরীক্ষাগুলো ডঙ্কা বাজিয়ে পাশ হয়েছি। চাকরীর চেষ্টা করছি। চেষ্টা মানে কি ঐ উল্লুকদের মত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখা? তা নয়। রীতিমত স্বস্ত্যয়ন, গ্রহশান্তি করাচ্ছি। ষ্টুপিড নরেনটা এই নিয়ে আবার শাস্ত্র আওড়াতে আসে। বলে কি না,

"ভগবান্‌কে একমনে ডাক্, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। ওসব ভূতপ্রেতের খোসামোদ করিস্ কেন?"

ওরে মূর্খ, ভগবান্‌কে কি ডাকলেই হল? ডাকার অধিকার চাই। তোর অধিকার ত ঘেঁটু পূজা পর্য্যন্ত! যাকগে ও সব কথা। পাঠককে, আমার দুর্দ্দশার গল্পটা বলি এখন।

একদিন লোকমুখে শুনলাম যে হাইকোর্টে খুব ভাল এক চাকরী খালি আছে। দৈবজ্ঞের কাছে গিয়ে, ঠিক শুভ সময়টা জেনে নিয়ে, ছেড়ে দিলাম এক দরখাস্ত রেজিষ্ট্রারের নামে। দু দিন বাদ এক চিঠি পেলাম হাইকোর্ট থেকে। বুধবার দশটা বেজে পনের মিনিটের সময় দেখা করতে হবে বড় সাহেবের সঙ্গে। "মঙ্গল উষে বুধে পা, যেথা ইচ্ছা সেথা যা।" বুধবার সকালবেলায় যখন সাহেব সন্দর্শন হবে, তখন সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সুফল ফলবেই। খনার বচন কি মিথ্যা হয়?

আমি থাকতাম সাঁকারীটোলার মামার বাড়ীতে। মামা খুব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। পূজা, জপ, তপ, কত কি রোজ করতেন। মাথায় একটা ছোট টিকিও ছিল। আপিস যাওয়ার সময় পমেটম দিয়ে আঁচড়ে সেটাকে চুলের ভেতর বসিয়ে দিতেন। কিন্তু বাড়ীতে সেটা ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তীর মত পত্‌পত্ ক'রে উড়ত। মামা খুব রাশভারী লোক ছিলেন। মামাতো ভাই বোন, আমি, এমন কি মামী পর্য্যন্ত, আমরা সবাই তাঁর ভয়ে সর্ব্বদা তটস্থ থাকতাম। রোজ সকাল উঠে পাঁজি দেখে মামাবাবু ঠিক ক'রে দিতেন সেদিন কি কি রান্না হবে। আমরা নিজের মরজী মত বেড়াতে যেতে পেতাম না। মামা ঠিক ক'রে দিতেন কোন দিকে যাত্রা আছে, কোন দিকে নেই। খুব ছোট থাকতে এই সব বিধি নিষেধ বড় খারাপ লাগত। কিন্তু একটু বয়স

হতেই বুঝতে পারলাম যে হিন্দুধর্ম্মের মূলমন্ত্র পঞ্জিকামধ্যে নিহিত।

দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে আমি মামার বাড়ী থাকতে এসেছিলাম। আমার বাবা ভুবনমোহন গাঙ্গুলী হাইকোর্টে এটর্নী ছিলেন। বেশী দিন কাজ করেন নেই কিন্তু তারই মধ্যে বেশ নাম কিনেছিলেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবার শরীর ভেঙ্গে গেছল। তারপর একদিন তিনিও হঠাৎ গেলেন, হৃদ্‌রোগে। ঐ অল্পবয়সেই বাবা প্রায় বিশহাজার টাকা জমিয়েছিলেন। উইলে লিখে গেলেন যে সেই টাকার সুদে আমার লেখাপড়া চলবে, পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে আমি আসল টাকায় হাত দিতে পারব না, ততদিন পর্য্যন্ত আমি আমার মাতুলের আজ্ঞাধীন থাকব। সেই আদেশমত পনের বছর আমি সব রকমে মামাবাবুর আজ্ঞাধীন রয়েছি। বাবা ছিলেন প্রায় ব্রাহ্ম, আর আমি হয়েছি ঘোর সনাতনী। নরেনটা বলে, "সয়তানী।" তবে ওটার কথা কে গ্রাহ্য করে? আর জন্মে ও নিশ্চয় ব্যাসকাশীতে মরেছিল!

হাইকোর্টের চিঠি নিয়ে মামার কাছে গেলাম। তিনি নাকে চশমা এঁটে এক হিসাবের খাতা দেখছিলেন। আমায় দেখে বললেন,

"শশাঙ্ক, তোর টাকার হিসেব দেখছিলাম। আসলের প্রায় অর্দ্ধেক খরচ হয়ে গেছে। অত খরচ করিস্ না। একটু বুঝে সুঝে চলিস্। নইলে লোকে আমায় দুষবে যে!"

আমি টাকাকড়ির কি বুঝি? চুপ ক'রে রইলাম। মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর হাতে ওটা কি?" আমি চিঠিখানা তাঁকে দিলাম। তিনি প'ড়ে বললেন, "বাঃ, বেশ বেশ। ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে, বুঝলি? ওসব বড় সাহেবদের ভারী বিশ্রী মেজাজ। একবার পাঁজিখানা দে দেখি।"

খানিকক্ষণ পাঁজি উলটে গালে হাত দিয়ে বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হল, মামাবাবু?" তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "তোর যেমন কপাল! নইলে আর এই বয়সে পিতৃমাতৃহীন হস্! বুধবার দিন সকাল হতে দুপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি।"

"মামা, তাহলে কি হবে? হাইকোর্ট ত এখান থেকে সোজা পশ্চিম মুখে।"

"হবে আর কি ছাই? যাওয়া হবে না।"

"আচ্ছা, মামা, এক কাজ করলে হয় না? আজই শিবপুরে মাসীমার কাছে চলে যাই। বুধবার দিন সেখান থেকে পূর্ব্বমুখো হয়ে হাইকোর্টে আসব।"

"হ্যাঁ বাবা, তা হতে পারে। আজ দেখছি দিন খুব ভাল। মাহেন্দ্রযোগ দেখে মাসীর বাড়ী চ'লে যা।"

সেইমত কাজ করলাম। মাসীমার কাছে তে-রাত্রি বাস ক'রে, বুধবার সাড়ে আটটার সময় বের হলাম পূর্ব্বদিকে মুখ ক'রে। একেবারে গঙ্গারঘাটে এসে পানসীতে উঠে বসলাম নদী পার হওয়ার জন্য। মাঝ-গঙ্গায় পুলিশের এক ষ্টীমলঞ্চ এসে বিষম ধাক্কা মারলে আমাদের পানসীকে। পাঁজি দেখে বেরিয়েছিলাম ত! তাই নৌকা উলটে গেল না। কিন্তু, লঞ্চে ছিল এক প্রকাণ্ড লালমুখো সাহেব। সে "ড্যাম্ ইউ", ব'লে পানসীতে লাফিয়ে উঠে লেগে গেল আমাদের মারধর করতে। আমি বললাম, "স্যার, আমি মাঝি নই আমার কি দোষ?" কে শোনে কার কথা? "চুপ রও", ব'লে আমাকেই ধ'রে নিয়ে গেল থানায়। মাঝিদের ছেড়ে দিলে। থানাতে ভাগ্যিস্ এক বাঙ্গালী দারোগাবাবু ছিলেন। তাঁকে হাইকোর্টের চিঠিখানা দেখিয়ে, হাতে পায়ে ধ'রে, ছুটী পেলাম সাড়ে দশটার পর। পানসী ভাড়া ব'লে যে আটগণ্ডা পয়সা বের করেছিলাম, সেটা এক পাহারাওয়ালাকে বকশীশ দিয়ে এলাম।

হাইকোর্ট পৌঁছতে এগারটা বেজে গেল। ফটকের কাছে কে যেন ডাকলে, "দাদাবাবু!" ফিরে দেখি মামার চাকর, শিবু। সে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে চ'লে গেল। খুলে দেখি, মামা লিখেছেন,

"শশাঙ্ক, তোমার মত গণ্ডমূর্খ আর নেই। সেদিন আমার হাতে নূতন পাঁজির বদল গেল বছরের পাঁজিখানা দিলে। তাই দেখে তোমার যাত্রার ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। ঘটনাক্রমে আজ নূতন পাঁজি দেখতে দেখতে ভুল ধরা পড়ল। এখন আর উপায় কি? আজ পূর্ব্বে যাত্রা নাস্তি।

উপরন্তু ত্র্যহস্পর্শ। আজ সাহেবের সঙ্গে কিছুতেই দেখা কেরো না।

আশীর্ব্বাদক মামাবাবু।"

কিন্তু ফিরে যেতে মন চাইলে না। রেজিষ্ট্রারের আপিসে গেলাম। বড়বাবু মুখ খিচিয়ে উঠলেন, "সে কাজ আর একজনকে দেওয়া হয়েছে। তোমার জন্য কি চাকরী ব'সে থাকবে নাকি?" সিঁড়ি নামতে নামতে মনে এই খটকা লাগল, "আচ্ছা, আজ যদি ত্র্যহস্পর্শ ত অন্য লোকটা চাকরী পেলে কি ক'রে? বোধ হয় মুসলমান কি খৃষ্টান হবে।"

মাথা ঠাণ্ডা করব ব'লে ইডেন গার্ডেনে গিয়ে গঙ্গার ধারে এক বেঞ্চে বসলাম। ঘণ্টাখানেক বসার পর মনে পড়ল, আজ ভাত খাওয়া হয় নেই ত! উঠে পড়লাম। কিন্তু আজ অদৃষ্টে ভাত খাওয়া নেই। রাস্তা পার হচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে লাগল এক ভীষণ ধাক্কা। পড়ে গেলাম।

যখন চোখ খুললাম, দেখি যে এক অপরিচিত ঘরে শুয়ে আছি। আসবাব পত্র থেকে বুঝলাম সাহেব-বাড়ী। পাশে ব'সে এক পাগড়ী চাপকান পরা মুসলমান বেয়ারা ঢুলছে। উঠে বসতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মাথায় বড় যন্ত্রণা। লোকটা লাফিয়ে কাছে এসে আমায় ধ'রে শুইয়ে দিলে। বললে, "উঠতে যাবেন না, বাবু। চোট লাগবে। আমি মিসি সাহেবকে ডেকে আনি।"

মিসি সাহেব এলেন। আচ্ছা, একি হল? চিরদিন শিখে এসেছি যে এই মিসি নামধারী জীবদের মুখ দেখতে নেই, এদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অথচ একে দেখে এমন চোখ জুড়িয়ে গেল কেন? কি সুন্দর মুখ, কি চমৎকার চোখ, আবার কপালে একটি খয়েরের টিপ! সুন্দরী আমার শিয়রের কাছে এসে, একটি ছোট্ট চুড়িপরা হাত আমার কপালে রেখে বললেন, "কেমন আছেন? এইবার একটু দুধ খান, বরফে বসিয়ে খুব ঠাণ্ডা ক'রে রেখেছি।" কোন উত্তর দিলাম না। মুখে কথা জোগাল না। এমন চেহারাও কখন দেখি নেই, এমন মিঠে আওয়াজও কখন শুনি নেই। হঠাৎ ঝড়ের মত মাথার ভেতর এল, ঐ চুড়িপরা হাতখানিকে দুহাতে চেপে ধরি আর বলি, "দুধ চাইনা গো। কিছুই চাই না। তুমি আমার পাশে ব'সে একটি গান গাও।" ছি, ছি, পাগলের মত এ কি সব ভাবছি! সত্যি কেউ এসেছে, না স্বপন দেখছি? জোর ক'রে চোখ বুজে, জিব দাঁতে কামড়ে, শুয়ে প'ড়ে রইলাম। একটু পরে আবার শুনলাম সেই আওয়াজ, বুলবুলের গানের মত মিঠে, "মুখটা খুলুন দেখি। একটু দুধ খাইয়ে দিই।" ভরসা ক'রে চোখ চাইলাম। মানুষের ঠোঁট এমন সুন্দর হাসতে পারে কে জানত! সেই হাসির দিকে চেয়ে আমিও হাসলাম।

"আচ্ছা, তুমি—আপনি কে? কাদের বাড়ী আমি রয়েছি?"

"দুধটুকু খেয়ে ফেলুন, বলব।"

দুধ শেষ ক'রে বললাম, "এইবার বলুন।" মেয়েটি কাছে চেয়ারে ব'সে এলো চুল মাথায় জড়াতে জড়াতে উত্তর দিলে,

"এটা হচ্ছে ব্যারিষ্টার এন, কে, বানার্জী সাহেবের বাড়ী। আমি তাঁর মেয়ে, রমা। আপনি এখানে কি ক'রে এলেন, সে গল্পটা পরে বলব। এখন আর একটু বিশ্রাম করতে হবে।"

সব গল্পটা শোনবার জন্য অস্থির হয়েছিলাম। কিন্তু নার্সের হুকুম অমান্য না ক'রে পাস ফিরে শুলাম। বোধ হয় একটু ঘুমও হল। যখন বেলা প'ড়ে এসেছে, তখন সাহেবী কাপড় পরা দীর্ঘকায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। অমায়িক হাসি হেসে বললেন, "হ্যালো, গুড আফ্‌টারনুন, একটু ভাল বোধ হচ্ছে?" পেছনে রমা। চওড়া কালা পেড়ে শান্তিপুরে সাড়ী পরা, পায়ে ছোট্ট লাল টুকটুকে মখমলের চটি। একটু হেসে মুখটি লাল ক'রে চুপি চুপি সাহেবকে বললে, "বাবা, তুমি বল।" বানার্জী সাহেব তখন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন,

"আমার এই আদুরে মেয়েটা আজ গঙ্গার ধারে আপনাকে মোটারের ধাক্কা লাগিয়েছিল। বিনা লাইসেন্সে গাড়ী হাঁকাচ্ছিল, তাই পুলিশ আসবার আগেই আপনাকে তুলে নিয়ে বাড়ী পালিয়ে আসে। আপনার কাছে মাপ চাইছে।"

আমি হাত জোড় ক'রে বললাম, "আমার কাছে মাপ চাইবার কোন কারণ নেই। আমাকে নিয়ে নিজেই বিব্রত

হয়েছেন। রাস্তায় ফেলে রেখে আসেন নেই এই আমার মহাভাগ্য। ত্র্যহস্পর্শের দিন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, এই রকম একটা কিছু হওয়ারই কথা।"

রমা হেসে বললে, "ত্র্যহস্পর্শ ব'লে নিজের সাফাই আর কি করে গাই বলুন। কি রকম মোটার হাঁকাই তা ত জানেন না।"

"সে আপনি পুলিশের সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন, যদি কখনও ধরা পড়েন।"

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নামটি কি?" আমি উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীশশাঙ্ক মোহন গাঙ্গুলী। পিতার নাম ৺ভুবনমোহন গাঙ্গুলী।" সাহেব লাফিয়ে উঠলেন, "কে? ভুবন গাঙ্গুলী, যিনি এটর্নী ছিলেন? মাই ডিয়া বোয়, তুমি ভুবনের ছেলে! জান তিনি আমার কত বন্ধু ছিলেন? আমার প্রথম ব্রিফ তাঁর কাছ থেকেই পাই। You are most welcome here, lad. এ তোমারই বাড়ী ঘর ব'লে মনে কোরো।"

তিনি বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কলকাতায় কোথায় থাক?" "আজ্ঞে, মামার বাড়ী," ব'লে মামাবাবুর নাম ও ঠিকানা দিলাম।

বানার্জী সাহেব বেরিয়ে গেলে রমা কাছে এসে বসল। বললে, "শশাঙ্ক দাদা, তাহলে আমাকে মাপ করলেন ত?" "হ্যাঁ রমা, মাপ করব যদি আমার কাছে একটু বস।" "নিশ্চয় বসব, সে ত নার্সের কর্ত্তব্য। ভাগ্যিস্ আপনার হাড়গোড় ভাঙ্গে নেই। তাহলে আমি যে কি করতাম জানিনা। তখন যা ভয়টা হয়েছিল!"

সেইদিন সন্ধ্যা বেলাই মামাবাবু খবর পেয়ে আমায় দেখতে এলেন। একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি। আমি তখনও বিছানা ছাড়বার হুকুম পাই নেই। উঠে বসলাম। রমা কাছেই চৌকীতে বসেছিল। দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না। মামা বোধ হয় তাইতে আরও বিরক্ত হলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, "বাঁদরামি করতে গেলেই এই রকম ভুগতে হয়। আমার চিঠি পেয়েই চ'লে এলে না কেন? ধর্ম্মের সঙ্গে ইয়ারকী চলে না। সে কথা যাক গে। এঁদের বাড়ী খাওয়া দাওয়া চলছে ত?"

"ভাত এখনও খাই নেই। আর খেলেই বা কি? এঁরা ত ব্রাহ্মণ।" আমার বড় খারাপ লাগছিল রমার সামনে এই সব কথাবার্ত্তা।

মামা চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, মস্ত বড় কুলীন ব্রাহ্মণ! তা খুব খাও তুমি ওঁদের ভাত। কিন্তু গোবর না খেয়ে আবার আমার বাড়ী ঢুকতে যেও না। আমি এই বয়সে জাত দিতে পারব না।" ব'লে গর গর ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

রমা অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'শশাঙ্ক দা, সত্যি কিন্তু আমরা কুলীন বামুন। তুমি বাবুর্চ্চির ভাত নাই বা খেলে, আমি রেঁধে দেব। এখনও দু তিন দিন ত চলা ফেরা হবে না, ডাক্তার কড়া হুকুম দিয়ে গেছেন।"

"সে যা হোক হবে এখন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, রমা। রাঁধতেই বা যাবে কেন? আমি রুটী মাখন দুধ খেয়ে থাকব।"

"আচ্ছা দাদা, তোমার মা নেই, না? থাকলে মামা অমন ক'রে কথা কইতে পারতেন না।" রমার গলাটা একটু ভারী।

"না ভাই, মা নেই। অনেকদিন স্বর্গে গেছেন। তুমি মামার উপর বিরক্ত হয়ো না। ওঁর কথাবার্ত্তা একটু রূঢ়, কিন্তু অন্তরটা ভাল। তোমারও মা স্বর্গে গেছেন, না রমা?"

"না শশাঙ্কদা, মা আমার নেই। আমি যখন খুব ছোট তখনই গেছেন। আমার প্রায় মনে নেই।" আঁচল দিয়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে রমা আবার বললে, "আমাদের দুজনের মাঝে এই একটা বন্ধন হল, শশাঙ্কদা। দুজনেই মাতৃহীন।"

রমার বয়স বছর কুড়ি হবে। কিন্তু যখন মার কথা বলছিল, ছোট্ট মেয়েটীর মত দেখাচ্ছিল। আমি রমার হাত হাতে নিয়ে বললাম, "আজ থেকে আমরা দুটী বন্ধু, দুজনার দুঃখে দুঃখী।"

এমন সময় বানার্জী সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে ঘরে

এলেন। আমাকে বললেন, "শশাঙ্ক, তোমার মামা অত্যন্ত ছোটলোক, cad। বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে এসেছিলেন। আমাকে শাসিয়ে গেলেন যে তোমার প্রায়শ্চিত্তের খরচ দিতে হবে। আমি বললাম, দিতে হয় দেব কিন্তু আপনি দূর হয়ে যান আমার বাড়ী থেকে। একটু মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে কথা কইলেই ভাল হত। কিন্তু হঠাৎ রক্ত মাথায় চ'ড়ে গেল সামলাতে পারলাম না। এখন বড় লজ্জা হচ্ছে।"

আমি বললাম, "মশায়, এ সবই সেই ব্রাহ্মস্পর্শের ফল। আমার গ্রহের ফের। আপনি কি করবেন?"

ব্যারিষ্টার সাহেব পকেট থেকে একখানা ফোটো বের ক'রে আমার হাতে দিলেন, "দেখ দেখি, চিনতে পার কি না।" আমি উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে, এ ছবি আমাদের বাড়ীতেও আছে। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আপনি বুঝি? আপনাদের খুব আলাপ ছিল তাহলে।"

"আলাপ কি হে? তোমায় ত বলেছি ভুবন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তবে হঠাৎ চ'লে গেল। নইলে তোমার guardian আমাকে ক'রে যেত। কাল তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা আছে। আজ ঘুমিয়ে পড়। আয় রমা, আমরা খেতে যাই।"

পরদিন সকাল বেলা সাহেব আমার ঘরে ব'সেই চা টোষ্ট খেলেন, আমাকেও খাওয়ালেন। খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, "Look here, my boy, I am your uncle—আজ থেকে আমি তোমার নগেন কাকা। আচ্ছা, আমাকে বল দেখি, তোমার বাবা কি টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন? অন্য সম্পত্তি তাঁর ছিল না, আমার মনে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশ হাজার টাকা রেখে গেছলেন। তার অর্দ্ধেক খরচ হয়ে গেছে।"

"খরচ হয়ে গেছে! কি ক'রে খরচ হল?"

"তা ত জানি না, কাকা। মামা সেদিন বলছিলেন।"

"Don't be a fool, my boy—বোকার মত কথা কয়ো না। বিশ হাজার টাকার শতকরা ছ'টাকা সুদ পেলে মাসে একশ' টাকা আয় হয়। তোমার মাসিক খরচ পঞ্চাশের বেশী হতেই পারে না, যখন মামার বাড়ীতে থাক। বাকীটা নিশ্চয় জমেছে। তোমার মামা তোমার ভয় দেখিয়েছেন মাত্র। আজ আমি খোঁজ করব এখন। ভুবন উইল ক'রে গেছলেন ত?"

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন কাকা মামার কাছে গেলেন আগের দিনের ব্যবহারের জন্য মাপ চাইতে। মামাও বোধ হয় মনে মনে লজ্জিত ছিলেন। তাই তাঁকে খুব ভদ্রভাবে আদর অভ্যর্থনা করলেন। দুর্জনের প্রথমটা ভাল ভাবেই কথাবার্ত্তা চলল। কিন্তু যখন কাকা বললেন যে রেজিষ্ট্রী আপিসে বাবার উইলের নকল দেখে এসেছেন তখন মামা রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন, "আপনার কি সম্পর্ক সে উইলের সঙ্গে? আর শশাঙ্কেরই বা কি অধিকার কিছু বলবার?"

ব্যারিষ্টার সাহেব জবাব দিলেন, "একটু ভুল করছেন না কি? কাল বুধবার শশাঙ্ক ছাব্বিশ বছরে পড়েছে। সে এখন টাকার পূর্ণ মালিক। তার তরফেই আমি আপনাকে বলছি যে হিসাব ঠিক ক'রে রাখবেন। কাল এটর্নী মারফৎ যথারীতি নোটিশ দেওয়াব।"

"কি, সে হতভাগার এত বড় আস্পর্দ্ধা! তাকে দুধ ভাত খাইয়ে পনের বছর মানুষ করলাম কি এই জন্য?"

"না, সে বেচারা এখনও কিছুই জানে না। কিন্তু আমি ছাড়ব না। সে আমায় কাল যখন বললে যে তার সবে দশ হাজার টাকা আছে, আমার মনে সন্দেহ হল। তাই আপনার কাছে এলাম।"

"ব্যারিষ্টার বাবু কি তাহলে আমার ভাগনের টাকাটা হাতাবার চেষ্টায় আছেন না কি?"

নগেন কাকা আজ স্থির ক'রে গেছলেন যে রাগারাগি করবেন না। ধীরভাবে উত্তর দিলেন, "দেখি, আগে আপনার কবল থেকে ত উদ্ধার করি।" দিয়ে চলে এলেন।

রমা আমায় বলেছিল যে কাকা সাঁকারীটোলা গেছেন। তাই আমি একটু ব্যস্তই ছিলাম, কি হয় জানবার জন্য। সে রাত্রে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। পরদিন সকাল যা যা হয়েছিল বর্ণনা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বল? মোকদ্দমা জুড়ে দিই?" আমি তাঁর পায়ে ধ'রে বললাম, "মামার সঙ্গে ঝগড়া করব না, আমায় মাপ করুন।" রমা

সেইখানে বসেছিল। সেও বললে, "বাবা, ওঁর, যখন অত অনিচ্ছা, ছেড়ে দাও না টাকাটা।" ব্যারিষ্টার সাহেব কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললেন, "No my children, আমি ছাড়বার পাত্র নই। টাকা উদ্ধার করবই। তারপর শশাঙ্কের ইচ্ছা হয়, বিলিয়ে দেবে।"

আরও দুদিন কাটল। আমি এখন বারান্দায় উঠে বসবার অনুমতি পেয়েছি। রমা কাছে কাছে থাকে, কত যত্ন করে। ভাত রেঁধে দুদিন খাইয়েছে, কাকা আর কিছু বলেন না যে মামার সঙ্গে কি হচ্ছে। রমা আর আমি ব'সে ব'সে জটলা করি। একদিন রমা বললে, "টাকা পাও না পাও কি এসে যায়? পুরুষ মানুষ, লেখা-পড়া শিখেছ, নিজে রোজগার করবে। দেখ শশাঙ্কদা, তুমি এইখানে থাকলেই ত হয়, যতদিন না নিজের কাজ-কর্ম্মের একটা ব্যবস্থা হয়। কি বল?"

আমি বললাম, "টাকার জন্য আমিও ভাবি না, রমা। কিন্তু মামার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। দিক্‌শূলের হিসেব না ক'রে বেরিয়ে এইটি হল।"

"আচ্ছা শশাঙ্কদা, এই যে দিবারাত্রি ত্র্যহস্পর্শ দিক্‌শূলের কথা বলছ, একবার ভেবে দেখেছ কি, যে বুধবার থেকে তোমার কোন লাভ হয়েছে কি না, এতটুকুও লাভ?" বলতে বলতে কে জানে কেন রমার মুখটা অকারণ লাল হয়ে উঠল। একটা লাল পেড়ে গরদের শাড়ী প'রে ছিল, তার পাড়ের সঙ্গে মুখের রঙটা ঠিক মিলে গেল। কি সুন্দর! আমি মুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলাম, কিন্তু, অল্পবুদ্ধি আমি, বুঝলাম না কিছুই। রমা "আসছি," ব'লে উঠে ঘরের ভেতর গেল। আমি ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলাম, মামা কি সত্যি আমায় আর বাড়ী ঢুকতে দেবেন না?

একজন বেয়ারা এসে একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। খুলে দেখি, মামা লিখেছেন।

"শশাঙ্ক, তোমার বাপের গচ্ছিত কুড়ি হাজার টাকার চেক আজ তোমার কৌঁসিলীকে দিয়েছি। আইন অনুযায়ী রসিদ পাঠিয়ে দিও।

আমি আর তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। বেম্মোর ঘরজামাই হয়ে বেম্মোদের মাঝে বাস কোরো। হিঁদুর ঘরে তোমার আর স্থান নেই।

রক্তের দোষ যাবে কোথা? তোমার বাপ বেম্মো-ঘেঁষা ম্লেচ্ছ-প্রকৃতি মানুষ ছিল। তুমিও তাই হয়েছ।

আশীর্ব্বাদক মামা।"

চিঠিখানা বারবার পড়লাম। মামা তাহলে আমায় ত্যাগ করলেন! কোথায় থাকব? ব্রাহ্মের ঘর জামাই কথাটার মানে কি হল? হঠাৎ রমার সিঁদুরবরণ মুখখানি মনে পড়ল। ওঃ, কি মূর্খ আমি! আস্তে আস্তে উঠে দোরগোড়ায় গিয়ে ডাকলাম, "রমা!" সে তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে আমায় টানাটানি আরম্ভ করলে, "এ কি! আপনাকে ডাক্তার না ঘুরে বেড়াতে বারণ করেছে। চলুন, বসবেন চলুন।"

আমি তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা রমা, তুমি ত বললে না ত্র্যহস্পর্শে মোটার হাঁকাতে বেরিয়ে তোমার কি লাভ লোকসান হল।"

রমা আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইলে। আমার চোখে তার চোখে কি কথা হল জানি না। কিন্তু আবার তার মুখে সেই রক্তরাগ। আমি থাকতে পারলাম না। তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, "এখন থেকে যেন রোজ ত্র্যহস্পর্শ হয়।" রমা আমার কানে কানে বললে, "Amen."

পরদিন ব্যারিষ্টার সাহেব আমাকে তাঁর আপিস ঘরে ডেকে পাঠিয়ে বিশ হাজার টাকার চেক দিলেন। বললেন, "বাবাজী, কোন রকমে রফা ক'রে এই টাকা পেয়েছি। জানি তুমি টাকার জন্য মোকদ্দমা করবে না।"

"আজ্ঞে না, আমি মোকদ্দমা কিছুতেই করতাম না। মামা আজ আমায় একখানা চিঠি লিখেছেন। আর আমার মুখ দেখবেন না।"

সাহেব হেসে বললেন, "তা না দেখুন। তুমি ত আর জলে পড় নেই। রমা বলছিল তোমার সঙ্গে তার একটা কি বোঝাপড়া হয়েছে। ব্যাপারটা কি, বল ত।"

আমি উঠে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, "আপনি ছেলে ব'লে আমাকে গ্রহণ করুন।"

"Very happy indeed, my son. তোমাকে দেখে, excuse me, একটু বোকা ভাল মানুষ মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি, টাকার বিষয় না হোক, অন্য বিষয়ে, you know your business, নিজের কাজটি বেশ বোঝ। তা তোমার নসীব ভাল। রমা is a ripping girl, অতি চমৎকার মেয়ে।" ব'লে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। তারপর রমার ডাক পড়ল। সেও এসে বাপের পায়ের ধুলো নিলে।

পরের ঘটনাবলী খুব সোজা। হিন্দু মতে বিয়ে। হাইকোর্টে উকীল ব'লে নাম লেখান। বিলেত যাত্রা। দেড় বছর পরে ব্যারিষ্টার হয়ে প্রত্যাগমন। কথায় বলে, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লাভ। আমার তাই হল। অথচ সবটাই দিকশূল ও ত্র্যহস্পর্শের ফল।

চারুচন্দ্র দত্ত

প্রেমের অবসর

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

বনের তরু মর্ম্মরিয়া কহিছে আজি কি কথা,
নদীর কূলে জলের কলতান ?
মনের মাঝে নূপুর বাজে,
বুকের তটে ধরিছে না যে ;
কাজের পালা হ'ল কি সারা, তাই কি বেয়া-কুলতা ?
প্রাণের মূলে প্রিয়ের প্রেমগান ?
এসেছে আজি আকাশ পথে সুরের সীধু রে !
আকুল করে উতল হাওয়া বন্ধু-বিধুরে !
স্বপন দেখে বিভাবরী,
হাসিটি ঐ লুটায় মরি ;
দোদুল নীলনিচোলখানি অসীম সুদূরে !

২

ধরণী ভরি' ঝরিছে মরি রজত-রুচি চাঁদিনী
বকুলকুলে আকুল সারা পথ !
এ মধু দিনে হৃদয়-বীণে
বিরহ বাজে বঁধুয়া বিনে,
শূন্য মনে বল' কেমনে যাপিব আজি যামিনী,
কখন্ দ্বারে নামিবে জয়-রথ ?
নয়নজলে গেঁথেছি মালা বঁধুর লাগি রে !
বিছায়ে হৃদি আসনখানি বাসর জাগি রে !
মধুর তাঁরি নূপুর ধ্বনি
শোণিতে মোর উঠেছে রণি',
অধর সুধা-রভস-আশে পরশ মাগি রে !

৩

হৃদয়ে যত বাসনা শত পূরিল না তো জীবনে,
অনলতাপে মলিন ফুলদল !
পুড়েছে গেহ, গিয়েছে আশা,
বৃথাই শুধু যাওয়া ও আসা ;
কি ফল মিছে মায়ার পিছে বিফল অনুসরণে ?
গিয়েছে যদি যাক্ না এ সকল !
কেবলি দুটি অন্ন খুঁটি কাটিল এতদিন,
পরাণ পরে পড়িল নারে প্রিয়ের পদচীন্ !
সুন্দরেরি এ অঙ্গনে
যাচিনু চির অনৃত-ধনে ;
অমৃত-রস-সিন্ধু হ'ল বিন্দুতে বিলীন !

৪

কাজের বারে পাইনি যারে লভিনু তারে বিরলে।
দিনের সনে দুখের অবসান !
তিমিরতীরে সহসা ধীরে
আলোর ঝারি ঝরিল কিরে !
জ্যোতির চল কমলদল ঝলে অকূল অতলে,
শ্রবণে মম জলধি-জল-গান !
অলোক হ'তে আলোকরথে এ কার আবাহন ?
এ মরু বুকে অসহদুখে পীযূষ-পরশন ?
মিলেনি যাহা সুখ স্বপনে,
মরীচি রচি' কল্প-বনে,
(সেই) সাধনধনে গহন মনে করিনু দরশন !

বিনায়ক সান্যাল

রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা

শ্রীসাগরময় ঘোষ

মানুষের কর্ম্মের দুটি ক্ষেত্র আছে,—একটি প্রয়োজনের আর একটি লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের অভাব অভিযোগ থেকে; লীলার তাগিদ অন্তর্নিহিত ভাবের থেকে। এই প্রয়োজনের আসর সরগরম করবার জন্য নিঃস্ব জন সাধারণ কবিকে ডাক দিয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন "তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ করে থাকতে রাজি আছি, বীণাটি গলায় বেঁধে ঝাপ দিয়ে পড়ে মরতেও রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদর রাস্তায় গড়ের রাজ্যের দলে ডেকো না। কেননা, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তার গানের আসরের জন্য বায়না পেয়ে বসে আছি।"

প্রত্যেক মানুষের স্বধর্ম্ম বলে একটি সম্পদ আছে। তার সেই কৌটয় সেই ধর্ম্মের সম্পত্তি রক্ষা করে' সে পরিত্রাণ পায়। ইতিহাসে তাঁর নাম থাকে না, কিন্তু বিধাতা পুরুষের খাস-দরবারে তার নাম থেকে যায়। লোভে পড়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে' সে যদি পরধর্ম্মে ঢাক বাজাতে যায়, তবে হাটে বাজারে তার নাম হবে। কিন্তু তার অন্তর্য্যামীর দরবার থেকে তাঁর নাম খোওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ তার নিজের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন এই ভূমিকার মধ্যে, কেন তিনি জনসাধারণের ডাকে বাইরের অভাব মেটাবার জন্য সাড়া দেন নি। তিনি বলেছেন—

"কর্ত্তব্য নামক দশমুখ উচ্চারিত একটা শব্দের হুঙ্কারে মন অভিভূত হয়ে যায়, ভুলে যাই যে কর্ত্তব্য ব'লে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থ নেই—আমার কর্ত্তব্যই হচ্ছে আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। গাড়ীর চলাটা হ'চ্ছে একটা সাধারণ কর্ত্তব্য—কিন্তু ঘোরতর প্রয়োজনের সময়েও ঘোড়া যদি বলে আমি সারথির কর্ত্তব্য করবো, বা চাকা বলে ঘোড়ার কর্ত্তব্য করবো তবে সেই কর্ত্তব্যই ভয়াবহ হয়ে ওঠে। ডিমক্রিসির যুগে এই উড়ে-পড়া-পড়ে-পাওয়া কর্ত্তব্যের ভয়াবহতা চারিদিকে দেখতে পাই। মানবসংসার চল্‌বে, তার চলা চাই; কিন্তু তার চলার রথের নানা অঙ্গ;—কর্ম্মীরাও একরকম করে তাকে চালাচ্ছে, গুণীরাও একরকম করে চালাচ্ছে; উভয়ের স্বানুবর্ত্তিতাতেই পরস্পরের সহায়তা এবং সমগ্র রথের গতিবেগ—উভয়ের কর্ম্ম একাকার হয়ে গেলেই মোট কর্ম্মটাই পঙ্গু হয়ে যায়।"—রবীন্দ্রনাথকে যারা কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে কবিধর্ম্মকে বিকিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাববার জন্য ডেকেছিলেন তাদের কাছে কবির এই কৈফিয়ৎ যথেষ্ট। সাধারণ লোকেরা দোষারোপ করে থাকেন, বর্ত্তমানের স্বদেশী যজ্ঞে যোগদান না করার জন্য। অথচ ভারতের অন্যতম রাজনীতিজ্ঞ তিলক কবিকে বলেছিলেন—

"রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন—এর চেয়ে বড়ো কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করিনি।"

রবীন্দ্রনাথ কবি, তাই তাঁর সমস্ত কর্ম্ম প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে তাঁর আত্মবিকাশের ইচ্ছা, প্রকাশের প্রেরণা অন্তরের আনন্দবোধকে প্রকাশ করার ব্যাকুল আগ্রহ। তিনি বিচিত্রের দূত, চঞ্চলের লীলা সহচর। সাতাশ বৎসর আগে যখন স্বদেশী যজ্ঞের আগুন জ্বলেছিল রবীন্দ্রনাথ হোতা হয়ে গানে কবিতায় রচনায় দেশের বুকে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছিলেন, উন্মাদনার সুর বেজে উঠেছিল, কিন্তু এ সবের মূলে ছিল নিজেকে প্রকাশের আনন্দ।

ভারতবর্ষের রাজনীতি আলোচনার প্রধান কথা, ভারতবাসীর স্বাধীনতালাভ। এই স্বাধীনতার প্রকৃতি কি, কি উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করবে, এই সকল বিষয়ের বিচার

শান্তিনিকেতনে হাতে লেখা "৬ষ্ঠ সংখ্যা রবীন্দ্র-পরিচয়-পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত।

ও মীমাংসা ভারতীয় রাজনীতির বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত বিষয়ে যে সব চিন্তা জাতীয় সাহিত্যকে দান করেছেন তা' বর্ত্তমান রাজনীতির আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে তুলনা করে দেখ্‌লে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মূল্য উপলব্ধি করা যাবে।

এ সত্য আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ কোনও কাম্যবস্তু একমাত্র কামনার বলে লাভ করতে পারে না, যদি না তার পিছনে সাধনার বল থাকে, আর সাধনার অর্থ হচ্ছে বাধা অতিক্রম করবার ইচ্ছা, জ্ঞানশিক্ষা ও শক্তি। সিদ্ধিলাভের পক্ষে মানুষের বিবিধ বাধা আছে, এক বাইরের আর ভিতরের। এই বাইরের বাধাগুলিই বেশী করে আমাদের চোখে পড়ে কেননা চর্ম্মচক্ষুর সম্পর্কই হচ্ছে বহির্জ্জগতের সঙ্গে। অথচ একথা সম্পূর্ণ সত্য যে নিজের ভিতরকার বাধাই হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় বাধা এবং এই বাধা অতিক্রম না করতে পারলে মুক্তিলাভ করতে কেউ পারে না। কোনও ব্যক্তিও নয় কোন জাতিও নয়। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন যে দেশের শত্রু ইংরেজ নয় সে দেশের অন্ধকুসংস্কার যা' শত শত বৎসর ধরে' দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে। সুতরাং আমরা যদি জীবনে মুক্তপুরুষ হ'তে চাই, তা'হলে আমাদের মনকে মুক্ত করতে হবে, জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। যে জাতি গঠনের কথায় দেশ আজ মুখরিত, তার গোড়ার কথা এবং শেষ কথা হচ্ছে স্বজাতির মন গড়ে তোলা।

বাইরের অবস্থার বদল দরকার একথা অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব; কেননা আমরা বাহ্যজ্ঞানশূন্য নই। প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে মানুষ হয়ে ওঠা যে কতদুর কঠিন সে বিষয় আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। ম্যালেরিয়ার ভিতর বাস করে অনশনক্লিষ্ট লোকে কেবল মনের জোরে যে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে মনের এতাদৃশ অলৌকিক শক্তির উপরে আমাদের কোনও প্রকার ভরসা নেই। বাইরের অবস্থা যত অনুকূল হবে, দেহ ও মনে আমরা মানুষ হয়ে ওঠবার যে তত সুযোগ পায় এ প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যে দেশের মহা উপকার সাধন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল মাত্র কল-কারখানার সাহায্যে আমরা যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারব না; কল—তা বসনেরই হোক আর শাসনেরই হোক—মানুষ গড়তে পারে না, কল না মানুষই কল গড়ে। বাহিরের অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সে অবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ দেয় মাত্র, তার বেশী কিছু করতে পারে না। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আর না করা করতে পারা আর না পারা নির্ভর করে তার মন আর চরিত্রের প্রবৃত্তি ও শক্তির উপরে। মানুষের মন তার দেহের চাইতে বড় তার আত্মশক্তিই সব চাইতে বড় শক্তি, একথা যদি সত্য হয়, তা'হলে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু হচ্ছে মনের স্বরাজ্য এবং মন বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ও ভারতের হাজার হাজার বৎসরের লব্ধ জ্ঞান ও সাধনার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে। এই বিশ্বাস এই আশাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক কথা।

কোনো একটা দেশের অথবা জাতির প্রকৃত সম্পদ্, যা সর্ব্বকালে দেশকে সকলের চোখের সম্মুখে অমর করে ধরে রাখতে পারবে তা পলিটিক্‌স নয় তা' দেশের সাধনা বা জাতির মনঃপ্রকর্ষ (culture)। বর্ত্তমানের জাতিসমূহ মেটিরিয়ালিসম্ ও ইম্পিরিয়ালিসম্‌এর বোঝা কাঁধে করে ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে ডুব দিয়েছে লাভের আশায়, স্বার্থান্বেষণে। কিন্তু বাহ্যিক উন্নতির জন্য, দেশের অর্থবল লোকবল বাড়াবার জন্য তাদের যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, তার পিছনে মহৎ সাধনার ভিত্তি নেই। ভগ্নপ্রায় পিলসুজের উপর তুলে ধরা প্রদীপটাকে নিয়ে বড়াই করার চেষ্টা মিথ্যে। আত্মার শক্তি তরবারির শক্তির চাইতে বড়; সেই আত্মার শক্তিলাভ করেন তাঁরাই যাঁরা শুধু স্বার্থ খুঁজে ঘুরে না মরে' বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধনা করে এসেছেন আত্মোৎকর্ষের জন্য। এই জ্ঞানের ও মুক্তির সাধনা হতেই হীরার টুকরার উজ্জ্বল আভার মত ঠিকরে বেরোয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত। এই সম্পদই দেশের বড় সম্পদ, চিরকালের সম্পদ। চিরদিন দেশ এই সম্পদ নিয়েই জগতের সামনে গর্ব্বভরে দাঁড়াতে পারবে। রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতির প্রশ্ন ক্ষণিকের, আজকের কিম্বা কালকের

অথবা দশ বছরের। পলিটিক্‌সের ঝঞ্ঝা আজ আছে কাল নেই। আমরা রাজনীতির উদ্দাম স্রোতে উন্মাদ হয়ে সাঁতরে বেড়াই। দেশের চিত্তপ্রকর্ষগত ক্রমোন্নতির (Cultural development) দিকে আমাদের নজর নেই। একটি গ্রামবাসী সারাজীবন যদি শুধু প্রতিবেশীর সঙ্গে জমী নিয়ে মারামারি করেই কাটাল তবে তার অন্তরের দৈন্ত সে ঘোচাতে পারলে না। তেমনি একটা জাতি যদি তার সমস্ত শক্তি নিহিত করে শুধু দেশজয় আর অর্থজয়ের জন্য এবং তারি জন্য পরস্পর সংগ্রাম করে মরে, তবে সে জাতি জগতকে কি দিয়ে গেল যা যুগ যুগ ধরে মানুষ মুগ্ধ চোখে দেখবে এবং সে দান গ্রহণ করবে।

পুরাতন ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখি হাজার হাজার বছর আগের গ্রীসের 'কালচার' বা মনঃপ্রকর্ষ, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন আজও জগৎকে বিস্ময়ান্বিত করে রেখেছে। আজও সর্ব্বদেশের জ্ঞানপিপাসুরা গ্রীসের অফুরন্ত জ্ঞানের উৎস থেকে দুইহাতে জল পান করে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। তার পরেই মনে হয় রোমের কথা। কত দেশ তার তলোয়ারের জোরে জয় করেছে, আইন কানুন তৈরী করে, একদিন জগতের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ সেই রোমের পুরাতন ইতিহাস শুধু ঐতিহাসিকরাই পড়ে থাকেন; লোকের স্মৃতিপট হতে অনেকদিনই মুছে গেছে। যে জাতির মধ্যে পশুর ন্যায় ঘাতপ্রতিঘাতের প্রভাব দেখা দিয়েছে তখনই তার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তখন তার সমস্ত রচনার ভাঙ্গন ধরে, পরস্পরের মধ্যে অকারণ ঈর্ষা কলহ আলোড়িত হয়ে ওঠে। উদ্দাম রিপুর বল্গা খসিয়ে ফেলাকে মানুষ মনে করে পৌরুষ। এমনি করে কত প্রাচীন সভ্যতার জ্যোতিষ্ক আপন আলো নিবিয়ে অখ্যাতির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে। কত সভ্যতা এখনই রুদ্র সংঘাতে আপন চিতা জ্বালিয়ে আত্মহত্যার পথে চলেছে।

রোমের 'পলিটিকস্' তাঁবার ঘসামাজা পয়সার মতো একদিন চোখ ঝলসে দিয়েছিল, আজ সে ম্লান নিষ্প্রভ। সে শুধু exhibitionএর তাকে তুলে রাখা জিনিষের মত; লোকে এসে দেখবে আর তারিফ করবে কাজে লাগান চলবে না।

গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর বুকের উপর দিয়ে দুঃখ দারিদ্র্যের প্রবল বন্যা বয়ে চলেছে; আজ তাদের টুঁটি চেপে ধরেছে অন্যান্য দেশ, নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় নেই, লোহালক্কড় নিয়ে তারা জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করছে ক্ষতিপূরণের জন্য। তবুও এই দুর্দ্দিনেও জার্ম্মানের যুবকরা তাদের প্রাণকে, দেশের প্রাণকে নিঃশেষে ঢেলে দিতে পারেনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যে। দেশের লুপ্ত সম্পদকে পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় যুবকের দল নানাদিকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে; তারা প্রকৃতির মুক্ত ক্রোড়ে নেচে গেয়ে, শিশুর মত হেসে খেলে, প্রাণকে সজীব করে রেখেছে। গ্রামের পুরাতন গান, কবিতা, নৃত্যকে তারা আবার বাঁচিয়ে তুলেছে। আজও ওদেশের ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির টানে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, নদীর তীরে তীরে, শ্যামল বনানীর মাঝে ঘুরে বেড়ায়। জীবনকে তারা প্রকৃতির নির্ম্মল শোভায় তার রূপ রস গন্ধর মধ্য দিয়ে নৃত্যে গানে আনন্দ-হিল্লোলে উপলব্ধি করতে চায়। প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যন্ত্রদানবের ভ্রূকুটিকে আর ওরা ভয় করে না। সে মোহ ওদের ঘুচে গেছে। জার্ম্মানীর উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় আক্ষেপ করে বলেছেন যে আমাদের দেশে 'পলিটিক্‌স'এর জটিলতায় মধ্যে চাপা পড়ে গেছে আমাদের সাহিত্য, আর্ট, দেশের সরলসুন্দর জীবন। ভারতের বৈশিষ্ট্যকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের ধারকরা রাজনীতি নিয়ে প্রয়োগ করছি। রবীন্দ্রনাথের মতে, ভারতের জাতীয়তা ও পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ পরস্পর বিরোধী। পৃথিবীর খণ্ডবিখণ্ড জাতিসকল যে-সব জাতীয় স্বার্থের জন্য পৃথিবীর সকল জাতির সঙ্গে সমান অধিকারে এক হতে পারেনা, সেই সমস্ত সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থ প্রত্যেক জাতিকেই এযুগে ত্যাগ করতে হবে। জাতীয়তা-বাদ এযুগের আদর্শ নয়। এর থেকে বড় আদর্শ পৃথিবীর সব জাতির সব মানুষের জন্য ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমান অধিকারের সুযোগ প্রদান। কোন বিশেষ জাতির নয়, সমগ্র মানব জাতির উত্থান ও উৎকর্ষসাধনই এযুগের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথকে বারবার আমরা বলতে শুনেছি যে প্রাচীন ভারতের আদর্শকে আমরা ভুলতে

বলেছি। তিনি 'গোরা' বইয়ের এক জায়গায় পরেশবাবুর মুখে বলিয়েছেন—"যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁকে দেশের কাছে কিম্বা মানুষের কাছে খাটো কোরোনা, তাতে তোমারও মঙ্গল না, দেশেরও না।" সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ পলিটিক্যাল আন্দোলনকে দেশের মুক্তিদাতা বলে স্বীকার করেননি। বলেছেন পশ্চিমের ধার করা বস্তু, জলের ফেনা, জল নয়, মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু কবি যে স্বদেশী চাঞ্চল্যের কোথাও রাজনৈতিক আন্দোলনকে স্থান দেন নাই তার আরও বড় কারণ তাঁর ভাবের মধ্যে আছে। তিনি এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পলিটিক্যাল মিলন চাননি।

ভারতের এই আদর্শকে ও সেই সঙ্গে বিশ্বমানবের আদর্শকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে। তিনি বলেন যে মানুষ পৃথিবীতে দৈহিক জীবনের প্রতি নিমেষের দেনা পাওনার হিসাব মেলাতে আসেনি। এই কথাটি তিনি আরও স্পষ্ট ভাবে বলেছেন "শিশুতীর্থ" নাটিকাটির মধ্যে। তিনি বলেছেন—"মানুষ দ্বিজ, ব্যর্থ জন্মের বিকার থেকে পরিত্রাণের জন্য নূতন জন্মের সংস্কার তার চাই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপন জন্মে সমস্ত মানুষের জন্য নবজন্ম এনেছেন। তাঁরা মানুষকে দান করেছেন অমর জীবনের অর্ঘ্য। তার দ্বিতীয় জন্ম অমিতায়ু। এই জন্মের জীবনকে পরিপূর্ণতার আদর্শে বিচার করতে হয়,—জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে দেশকালের সীমা সে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই জীবনকে কোনো মানুষ তার ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে ধারণ করে' রাখতে পারে না, এইখানেই সকল মানুষের চিরজীবনে সে জীবিত। অমর জীবনের ফল ফলে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে, বিশ্বকর্ম্মে। মানুষ এর জন্য প্রাণ দিয়েচে, দুঃখ পেয়েচে, ভুলেচে নিজের স্বার্থ, প্রমাণ করেচে তার দ্বিজত্ব। লাভের লোভে, শক্তির দম্ভে, বুদ্ধির বিকারে যখন তার দ্বিজত্বকে আচ্ছন্ন করে, তখন তার পশুধর্ম্ম একেশ্বর হয়ে ওঠে।"

বর্ত্তমানে বাস্তব জগৎটাকে যারা শক্তির আয়ত্ত করতে চাচ্ছে—তার পিছনে তাদের উদ্দেশ্য রয়েছে কি উপায়ে নিজেদের দেশকে ধনে জনে মানে সকলকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। তারা তাদের প্রথম জীবনটাকেই শ্রেষ্ঠজীবন করে তুলতে চায়। যে জীবন কালের দ্বারা পরিমিত তাকেই তারা শেষবিন্দু পর্য্যন্ত উপভোগ করতে চায়—বাহ্যিক বিলাসিতায়, আমোদপ্রমোদে, বাহ্যিক দৈন্য থেকে তারা চায় নিজেদের বাঁচাতে, অন্তরের দীনতাকে তারা ধুয়ে ফেলতে পারেনি। Ulyssesএর ভাষায় তারা চায় "to drink life to the lees"। যে-জীবন নিয়ে তারা জন্মেছে তা' শেষ হবার আগেই তারা চায় তাকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে নিতে; মানুষের জ্ঞানের ও সাধনার যে দ্বিতীয় জন্ম, সে জন্মকে তারা বিশ্বাস করেনি,—যেখানেই এই অমর জীবনের দায়িত্ব মানুষ আলস্যে অজ্ঞানের প্রবৃত্তির অন্ধতায় দৈহিক জীবনের মোহাবেশে অস্বীকার করেছে, সেইখানেই দেখা দিয়েছে দৈন্য, দুঃখ, অপমান, জনসমুদ্রমন্থনের বিষোদ্গার। সেখানে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নির্জ্জীব, সেখানেই মানুষে মানুষে সম্বন্ধ হিংস্রতায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ভারতের আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের প্রভেদ। তিনি আরো বলেছেন যে ধর্ম্ম ও সামাজিকতার ভিতর দিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে পূর্ণতা সংঘটনই ছিল প্রাচীন সভ্যতার প্রধান কাজ। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য রাজনীতিকে আসন দান করতে সঙ্কোচ বোধ করেছেন।

আমরা আজকাল বণিক সভ্যতার আওতায় বেড়ে' উঠেছি একথা মিথ্যে নয়, অতিরঞ্জিতও নয়। অর্থের লালসা আমাদের বেড়েচে, কিন্তু সেদিক দিয়েও এ শিক্ষা আমাদের সবল সমর্থ করে গড়ে তুলতে পারেনি, তাই বর্ত্তমান ধনিকতন্ত্রবাদী দুনিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় জীবনযুদ্ধে আমাদের অক্ষমতা প্রতিদিন প্রকট হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানের ধনিকতন্ত্রবাদীদের অসামাজা সভ্যতাকে রবীন্দ্রনাথ সহ্য করতে পারেননি। বিদেশ ভ্রমণকালীন যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন তা'তে তিনি পাশ্চাত্য দেশীয়দের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ওদের দেশের সভ্যতার গলদ কোথায়। পাশ্চাত্যদেশে আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে হোটেল, আপিসের ধূলোয় ভরা অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় সামাজিক জীবনের কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত। আত্মপূজাই এদের একমাত্র পূজা; অর্থশক্তি

লাভের দিকে নজর রেখে এরা হাটের দরদস্তুর করতে থাকা। কারবার এদের শুধু ক্ষণভঙ্গুর বস্তু নিয়ে। এরা চায় টাকা দিয়ে মানুষের প্রাণ কিনতে, আর তা' শুষে নিয়ে ধুলোয় ফেলে দিতে। আপন প্রবৃত্তির আত্মঘাতী শক্তির তাড়নায়, এরা অবশেষে প্রতিবেশীর ঘরে দেয় অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে আর নিজেরা সেই আগুনেই পুড়ে ছাই হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের আইডিয়ালের ভিতর একটি ছিদ্র দেখা দিয়েছে এবং সেই ছিদ্র দিয়ে বিনাশ প্রবেশ করে' বড় আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ কোথায় তারা সত্যভ্রষ্ট হোলো এতদিনে সেটা ধরা পড়েছে। 'যাত্রী' বইয়ের একজায়গায় এই নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন; তিনি বলেছেন—"বড়কে গড়বার উপকরণ মানুষের ছোট, যেই চুরি করতে সুরু করে অমনি বিপদ ঘটায়। মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সঙ্কীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে থাকে তখনই কূল ভাঙ্গে, তখনি বিনাশের বন্যা দুর্দ্দাম হয়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্য হ'লে তা'তেই যত অশান্তির সৃষ্টি হয়।"

এই অল্প কথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষের সাধনা ও বিপুল প্রচেষ্টালব্ধ কোনো একটা বড় জিনিষ মানব-জাতির সমান ভাবে উপকার সাধন করতে পারে এবং তার সার্থকতাও সেইখানেই। স্বার্থবিবর্জ্জিত ফলাকাঙ্ক্ষাই মানুষের বড় ধর্ম্ম। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ যে বিজ্ঞানের হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন শুধু নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করেই। এই স্বার্থবিজড়িত প্রচেষ্টা যে সে-জাতির ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক সেইটিই বলেছেন আরেক জায়গায়।—

—"বিজ্ঞান যে-বিশুদ্ধ তপস্যার প্রবর্ত্তন করেছে সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মানুষের,—এই জন্যই মানুষকে সে দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন্য পীড়াকে মানবলোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অস্ত্র গড়চে; মানুষের অমরাবতী নির্ম্মাণের বিশ্বকর্ম্মা এই বিজ্ঞান। কিন্তু এই বিজ্ঞানই কুৰ্ম্মের রূপে যেখানে মানুষের ফল-কামনাকে অতিকায় করে তুললে সেখানেই সে হোলো যমের বাহন। এই পৃথিবীতে মানুষ যদি একবার মরে তবে সে এই জন্যেই মরবে,—সে সত্যকে জেনেছিল, কিন্তু সত্যের ব্যবহার জানেনি। সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবত্ব পায়নি। বর্ত্তমান যুগে মানুষের সেই দেবতার শক্তি দেখা দিয়েচে য়ুরোপে। কিন্তু সেই শক্তি কি মানুষকে মারবার জন্যেই দেখা দিল? গত য়ুরোপের যুদ্ধে এই প্রশ্নটাই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকাশ পেয়েচে। য়ুরোপের বাইরে সর্ব্বত্রই য়ুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেচে তার প্রমাণ আজ এশিয়া আফ্রিকা জুড়ে। য়ুরোপ আপন বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের মধ্যে আসেনি, এসেচে আপন কামনা নিয়ে। তাই এশিয়ার হৃদয়ের মধ্যে য়ুরোপের প্রকাশ অবরুদ্ধ। বিজ্ঞানের স্পর্দ্ধায়, শক্তির গর্ব্বে, অর্থের লোভে পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-যে চর্চ্চা বহুকাল থেকে য়ুরোপ করেছে, নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল যখন ফলল তখন আজ সে উদ্বিগ্ন।"

রবীন্দ্রনাথ কখনও চাননি যে ভারতবর্ষ এ হেন পাশ্চাত্য দেশের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়—উৎকৃষ্ট নকল হয় তাও তিনি চাননা। আমাদের দেশের লুপ্তপ্রায় সম্পদকে যদি আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারি তবে সে সম্পদ পৃথিবীর সকল দেশের সম্পদকে ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে। ভারতের সাধনা জ্ঞান একদিন সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আজও দেশদেশান্তরের সাহিত্যে ভাস্কর্য্যে তা' জীবিত রয়েছে। ভারত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার বিশ্বের কাছে খুলে দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে; ভারতবর্ষের সাধনার উত্তরদাক্ষিণ্যের বন্যা দেশে দেশে প্রবাহিত হয়েছে, নিঃশেষে সে সমস্ত সম্পদকে ঢেলে দিয়েছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে, —নিজের সঙ্কীর্ণ গুহায় একবিন্দুও জমিয়ে রাখেনি। যেখানে সকলের কল্যাণের জন্য জ্ঞান সাধনা তা' মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে কৃতার্থ করে। ভারতবর্ষের নিজকে জগতের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই সার্থকতা সেইখানেই তার বৈশিষ্ট্য।

সাগরময় ঘোষ

শঙ্কর ও সুতিলা

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

—"আমার বক্তব্যটা সাদাভাবায় বললে এই দাঁড়ায় যে আধুনিক শ্রেষ্ঠ-সাহিত্যের গতি একমাত্র বুদ্ধিমূলক হবার দিকে। আধুনিক সাহিত্যিক শুধু নিজে প্রখর বুদ্ধিশালী হবে তা নয়, তার সৃষ্টি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ যোগাবে আমাদের মস্তিষ্কের আহার ; মানুষের মন আর হৃদয়াবেগ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করার দিন চলে গেচে।"

"ঠাণ্ডাশালা"র বৈঠক আজ মাতিয়ে তুলেছিলেন কালিবাবু আর তাঁর নবাগত বন্ধু। এঁর পরিচয় তখনো আমরা বিশেষ কিছু পাইনি শুধু নাম ছাড়া। তবে জিতেনবাবুর কথাবার্ত্তা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি শুধু ভাবুক নন, সুপটুভাব-প্রকাশকও। তর্ক উঠেছিল, আধুনিক সাহিত্যের গতি কোনদিকে এই কথা নিয়ে। তর্কের মত্ততায় মানুষ যখন আত্মহারা হয়ে যায়, তখন প্রতিপক্ষের কথা শোনবার মত ধৈর্য্য এবং অবসর তার থাকে না। কালিবাবু নিজের বক্তব্যকে তাই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ক'রে তোলবার জন্তে একটুও না থেমে বলে যাচ্ছিলেন, "একদিক থেকে তোমাদের শরৎবাবুকে অতি পুরাতনী বলা যেতে পারে। কারণ শুধু হৃদয়াবেগ নিয়েই তাঁর কারবার। তাই য়ুরোপে শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" ছাড়া আর কিছুর আদর হল না। তারা দেখলে, এ ত' মান্ধাতার আমলের সাহিত্য-সৃষ্টি। জানো, ঠিক এই জন্তেই ইংলণ্ডের রসলিপ্সু সমাজে "হলকেনে"র সাহিত্যেরও কদর হয়নি ? শরৎচন্দ্র আর 'হল্‌কেন' একই স্তরের সাহিত্যিক।"

জিতেনবাবু তর্কের মূলসূত্রটা ধ'রে পুনরায় সুরু করলেন, "অনেক অবান্তর কথা অকারণে আপনি টেনে আনচেন কালিবাবু। আপনার বক্তব্যটা অনেক আগেই বুঝেছিলুম আর তার একই জবাব বারেবারে দিচ্চি। হতে পারে, আধুনিক সাহিত্যের গতি আজ প্রধানতঃ বুদ্ধিক্ষেত্রের দিকে কিন্তু সত্যিকার সাহিত্য শুধু বুদ্ধির সীমায় বদ্ধ থেকে কখন গড়ে উঠতে পারে না। মানুষের কল্পনা আর হৃদয়ই সকল সাহিত্যের আদি ভিত্তি। সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের প্রধান প্রয়োজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নয়, গভীর সহানুভূতি।"

—"আমি বলতে চাইচি আপনার ঐ কথাটাই আজ পুরোতন হয়ে গেচে। আজ মানুষ জীবনকে বুঝতে চাচ্চে বুদ্ধি দিয়ে। এ কথা ত' অস্বীকার করবেন না যে জন্মের পর জন্ম নিয়ে আমরা ক্রম-অভিব্যক্তির পথে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এই এগিয়ে যাওয়ার চিহ্ন কি জানেন, হৃদয়াবেগ আর instinctive impulse-কে চেপে মেরে আমাদের বুদ্ধির ক্রমবিকাশ।"

—"না, না, কূটতর্ক দিয়ে আমায় বোঝাতে পারবেন না কালিবাবু, কারণ জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে এ সত্য আমি পেয়েচি।" কয়েক মুহূর্ত্তের জন্তে জিতেনবাবু অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে রইলেন। বাইরে নৈশআকাশ বাদলের অজস্র মুখরতার মাঝে যেন ভেঙে পড়ছিল। বর্ষার সেই অন্ধকার রাত্রে এতক্ষণ আমাদের ভাববিলাসী মন গভীরতর কিছু পাবার আশায় ঘুরে মরছিল। তাই জিতেনবাবুর কথা শুনে আমরা সকলেই বিশেষ উদগ্রীব হয়ে উঠলুম। সকলের মন যেন এক সঙ্গে বলে উঠল, এই ত' চাই, আজকের দিনে জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতার গল্পছাড়া আর কিছু কি ভাল লাগে! জিতেনবাবু আস্তে আস্তে সুরু করলেন, "কারো সস্তা কৌতুক মেটাবার জন্তে সে গল্প না বলাই ভাল কিন্তু আপনারা আমার মনের এমন একটা তারে আঘাত করেচেন যে না-বলেও থাকতে পারচি না।" বলেই হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি একটু ইতস্ততঃ করলেন। ঠোঁট দুটি স্পষ্ট কেঁপে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি আবার সুরু করলেন :

"মনে হয়, যেন এইত' সেদিন সকাল। ব্যাঙ্কের নামে কি একখানা চিঠি লিখচি, এমন সময় শঙ্কর এসে হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, জিতুদা, পড়ে দেখ চিঠিখানা। মেয়েদের সবাই কি এক ছাঁচে গড়া? তা না হলে সুতিলার মত মেয়েও প্রেমে পড়ে যায়! আশ্চর্য্য!

আমি একটু বিস্মিত হয়েই চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলুম। কারণ, সুতিলা ছিল সত্যিই অসাধারণ মেয়ে। ওর মুখে-চোখে যেন প্রতিভার দীপ্তি খেলত। সুতিলা লিখেছিল, মানুষে চায় বুদ্ধি দিয়ে জীবনের সবকিছু বুঝতে, কিন্তু জানে না যে অন্তরে প্রজাপতির জাগরণের নিয়মকানুন আজও মানুষের ধরা-ছোঁয়ার অনেক দূরে। তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয়, বছরখানেক আগে,—কি যে যাদু ছিল তোমার চোখদুটিতে কে জানে! তারপরে যতই তুমি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেচ মেয়েদের পরে তোমার অদ্ভুত, নিষ্ঠুর মত, ততই বিষিয়ে উঠেচে মন, ব্যথিয়ে উঠেচে অন্তর। অবুঝ মন বুঝেও বোঝে না। তাই জীবনে চোখের জল সার ক'রেই দিলুম এবার পাড়ি,—কোথায়, কত দূরে, আশা করি তা' জানবার আগ্রহ ক্ষণিকের জন্যেও তোমার মনে জাগবে না।

চিঠিখানা পড়ে মনটা বিষাদে ভারী হয়ে উঠল। মনে হল, প্রজাপতির নিষ্ঠুর লীলাযজ্ঞে আর একটি অমূল্য আহুতি। অতীত ঘটনাগুলো একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। এতদিন সুতিলার যে-সব ছোটখাটো কথা এবং আচরণের কোন মানে খুঁজে পাইনি, আজ তাদের গূঢ় ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। শঙ্কর ও সুতিলা এম-এ ক্লাসে পড়ে, দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কামনার ধন। সুতিলা হয়েছিল বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম আর শঙ্কর ইংরাজী সাহিত্যে। বুদ্ধির সাধনার মধ্যে দিয়েই ওদের আলাপ জমে ওঠে। ভাবছিলুম, ওদের দুজনের সেই দিনের পর দিনের তন্ময়তা দেখে আমার মনে যে স্বপ্ন জেগে উঠত, আজ একি তার নিষ্ঠুর পরিণাম হল। চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। চৈতন্য হল শঙ্করের অট্টহাসির শব্দে। সে বলছিল, কি হে একেবারে কেঁদে ফেললে যে শোকে? যাই বল, আমার এতদিনের থিওরিটা কি আর মিথ্যে হবে? তোমায় বারবার বলিনি যে ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের আছে যেমন একটা বুদ্ধির দিক আর একটা হৃদয়াবেগের দিক তেমনি মানুষের সমষ্টিগতজীবনে পুরুষ হচ্ছে বুদ্ধির প্রতীক আর নারী হৃদয়াবেগের। বুদ্ধি যেমন হৃদয়াবেগকে এড়িয়ে চলে, পুরুষের তেমনি নারীকে এড়িয়ে চলা উচিৎ।

আমি একটু রুক্ষস্বরে বললুম, যাই বল, ওদের বাড়ীতে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। তোমার মনে কি মায়াদয়া কিছু নেই? একটা জীবন নষ্ট হতে যাচ্ছে আর তুমি পাষাণের মত হো-হো ক'রে হাসচো?

—আরে সবুর কর উতলা হচ্ছ কেন? সুতিলা যতই ভয় দেখাক, মেয়েরা অত সহজে জীবন নষ্ট হতে দেয় না। মেয়েদের আজও তুমি বুঝতে পারনি।

আমি বললুম, কিন্তু যাই বল শঙ্কর, সুতিলার ওপর এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয়, তাহলে বলব, সুতিলাকে তুমি একটুও চিনতে পারনি আজও। আমার কথাটা শুনে শঙ্কর একটু চুপ করে রইল। কি যেন ভেবে তারপর বললে, মনে প্রাণে ঠিক এই কথাই এতদিন বিশ্বাস করতুম জিতুদা। ওর অদ্ভুত বুদ্ধি দেখে মনে হত, জীবনে এই সব নাটুকে-পণার অন্ততঃ অনেক ওপরে ও।

গল্পটা খুলেই বলি। শঙ্করের বাপ ছিলেন যেমনি বড় জমীদার, তেমনি পরম বৈদান্তিক। শঙ্করের জন্মের কিছুক্ষণ পরেই পরপার থেকে ওর মায়ের ডাক আসে। তিনি ছিলেন নেহাৎ হাবা-গোবা, ভালমানুষ। তাই মনে হয়, শঙ্কর জীবনের সম্বলরূপে যা' কিছু পেয়েছিল, তা' সবই ওর বাপের তরফ থেকে। সেই ঐশ্বর্য্যের 'পরে নিরাসক্তি, জীবনের মূল রহস্যকে বুদ্ধি দিয়ে সন্ধান করবার তীব্র আগ্রহ, অতি-বুদ্ধিমত্তার জন্যে জীবনের 'পরে প্রচ্ছন্ন কৌতুক-ভরা দৃষ্টি, মনে অপরাজেয় তেজ,—সবই। শুধু প্রকৃতি নয়, বাইরের আকৃতি পর্য্যন্ত। কিন্তু একটি বিষয়ে ও আমার কাছ থেকে অনেক দূর সরে গেছল—জীবনের আদর্শে। ওর বাপ ছিলেন বড় দার্শনিক। কিন্তু ওর কাম্য ছিল, জগতের সব চেয়ে বড় সাহিত্যিক হওয়া।

মামা শঙ্করকে সত্যিই বড় ভাল বাসতেন। ছেলের গৌরবে বাপের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠত। কিন্তু ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখে যাবার অবসর তার ঘটল না। শঙ্কর যখন আই-এ পড়ে, মামার একদিন ইহলীলা শেষ হল। তারপর সব ভার পড়ল আমার এটর্নি বাবার ওপর। শঙ্কর ও আমি দুজনে বরাবর একসঙ্গে মানুষ হয়েচি, তাই একসঙ্গেই বাস করতে লাগলুম। আমি ওর চেয়ে কিছু বড় ছিলুম, তবু জীবনের কোন কথাই ও আমার কাছে গোপন করত না। আমি শিখি বাবার অফিসে কাজ আর শঙ্কর নিজের বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়ে দিন কাটায়। মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অদ্ভুত সব জল্পনা করে। অদ্ভুত মত এমন অসাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করত যে সাধারণ লোক নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। মেয়েদের ’পরে ওর ছিল তীব্র শ্লেষ। ও বলত, জীবনে নারীর কোন স্থান নেই। এই যে বিশ্বসভ্যতা, এই যে জাতিগত এবং ব্যক্তিগত বিপুল চেষ্টা,—এর মূল কাম্য হচ্চে সৃষ্টির আদি রহস্যের সন্ধান জানা। কিন্তু এই জ্ঞানের জন্যে চাই কঠোর সাধনার দ্বারা একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির ক্রম-অভিব্যক্তি। এই সাধনায় নারীর সংস্পর্শের কোন আবশ্যকতা নেই, বরং তা’ শুধু পরম অন্তরায়।

আমি হেসে বলতুম, তাহলে কি বলতে চাও, যৌনক্ষুধা ব’লে মানুষের জীবনে কিছু নেই?

—তোমার কথাটা ঠিক বুঝলুম না। সাধারণ লোককে স্মরণ করে তুমি যদি এ প্রশ্ন ক’রে থাক ত’ বলব, সাধারণ লোকের কথা ভাববার অবসর আমার নেই। আমি ভাবি শুধু তাঁদের কথা, যাঁরা মানুষের অনাগত কালের পথদ্রষ্টা। তাঁদের জীবনে যৌনক্ষুধাকে নির্ম্মূল না করলে ত’ চলে না। তা না হলে, ভাবাবেগ পদে-পদে এসে তাদের বুদ্ধিকে করবে আচ্ছন্ন। জীবনকে নিরাসক্তভাবে বুঝতেই দেবে না। নিরাসক্তির ভাব শুধু সাহিত্য-বিচারের জন্যেই একান্ত দরকারী নয়—জীবন-বিচারের জন্যেও।

শঙ্করের কথাটা যত অদ্ভুতই শোনাক না কেন, ওর মূল তত্ত্বটার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারতুম না। তবু তর্কের ছলে জবাব দিতুম, তাহলে সভ্যতার অভিব্যক্তির সাধনায় নারীর কি কোন স্থান নেই? এই কি তোমার ধারণা।

—হাঁ, এই আমার দৃঢ় ধারণা। আমার মনে হয়, নারীসৃষ্টির কোন দরকার-ই বিধাতার ছিল না।

—অদৃশ্য ভগবানের বিরুদ্ধে ত’ খুব জোরগলায় মত প্রকাশ করলে কিন্তু মেয়েরা যদি না থাকে ত’ সৃষ্টিলীলা আবহমানকাল চলবে কেমন ক’রে শুনি?

শঙ্কর জবাব দিত, সেই কথাই ত’ বলচি। সৃষ্টির লীলাকে বংশপরম্পরায় চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে নারী সৃষ্টির কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, নারী না থাকলেও চলতে পারত, যেমন চলে hermaphrodite প্রাণীদের ক্ষেত্রে।

সুতিলাদের বাড়ীতে সেদিন তর্ক হচ্ছিল। এতক্ষণ সুতিলা একমনে শুনছিল, কিন্তু আর চুপ ক’রে থাকতে পারলে না। বললে, আপনার মুখ থেকে এ কথা শুনব ব’লে আশা করিনি জিতুদা। শুধু সৃষ্টির গতিধারা বজায় রাখার জন্যে ভগবান মেয়েদের গড়েন নি। জানেন, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা যারা বলেছিল, তাদের মত সর্ব্বনাশ ভারতের আর কেউ করে নি!

মেয়েদের সম্বন্ধে এ আমার সত্যিকার মত নয়, এ কথা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় আমাকে বাধা দিয়ে শঙ্কর হেসে বললে, তারা ভারতের কিছু সর্ব্বনাশ করেছিল কিনা জানি না। কিন্তু একটা মস্ত বড় সত্যের সন্ধান দিয়েছিল,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের ঐ কথাটার মানে তুমি কি বুঝেচ জানি না সুতিলা কিন্তু আমার মনে হয়, ওরা বলতে চেয়েছিলেন মানুষের উচ্চতর সাধনার জীবনে নারীর কোন আবশ্যকতাই নেই, তবে যদি কিছু থাকে ত’ সাধারণ লোকের সাধারণ জীবনে অর্থাৎ পুত্রার্থে।

সুতিলার স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। সে উত্তেজিতভাবে জবাব দিলে, তাদের মত তুমিও ঠিক জীবনের স্বরূপটি ধরতে পারনি, তাই আগাগোড়া তোমার এই ভুল হচ্চে। জীবনের চরম কাম্য জানা নয়, হওয়া। যাঁরা এই সত্যটির সন্ধান পেয়েছিলেন, নারীকে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেন নি। জীবনের সঙ্গিনী করে নিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন,

নরনারীর এই আত্মস্থ হওয়ার পথে পরস্পরের দেহ ও আত্মা চায় পরস্পরের দেহ ও আত্মার সংস্পর্শ। তা না হলে হওয়ার পথে থাকে ফাঁকি। মেয়েদের অস্তিত্বের কোন দরকার নেই বলচ, কিন্তু জানো, দেশে দেশে, যুগে যুগে, এই মেয়েরাই পুরুষের বুকে জাগিয়েচে বড় কাজের প্রেরণা।

শঙ্কর হাসতে হাসতে শ্লেষের সুরে জবাব দিলে, হাঁ তাই বটে। কে একজন বিদেশী লেখক বলেচেন জগতে নারীর ইতিহাস এক অফুরন্ত সংপীড়নের কাহিনী—সবলের 'পরে অবলার সংপীড়ন।

সেদিন সুতিলা বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তাই আমি জোর ক'রে অন্য কথার অবতারণা ক'রে তর্কটাকে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলুম। কিন্তু যাবার সময় হঠাৎ এই তর্কের ধুঁয়া ধরে সুতিলা মুখ টিপে হেসে বললে, আচ্ছা শঙ্করদা, তুমি যে যেখানে সেখানে মেয়েদের সম্বন্ধে এমনি ক'রে তাচ্ছিল্য প্রকাশ কর, মেয়েদের বিরুদ্ধতা কি তুমি গ্রাহ্যই কর না ?

শঙ্কর বললে, না, মোটেই না।

—আচ্ছা, মেয়েদের কখন কি ভয়-ও কর না ?

শঙ্কর কথাটাকে ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে, কেন কিসের ভয় ?

—ধর ফাঁদের, তুমি বল মেয়েরা পুরুষের জন্যে শুধু ফাঁদ পাততেই জানে।

শঙ্কর হেসে বললে, কখন যে সে ভয় করি না, তা বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু তোমার কাছে আমার সে ভয় নেই।

—ছ্যাৎ! আমি কি তাই জিজ্ঞেস করচি? তুমি আজকাল বড় দুষ্টু হচ্চ। ব'লে সুতিলা একটু হাসলে। স্পষ্ট দেখলুম, মুখখানা তার লজ্জায় রক্তাভ হয়ে উঠেচে।

আর একদিন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হলে আমি বললুম, আশ্চর্য্য, মানুষের মন কি বিচিত্র ধাতু দিয়েই না তৈরি! সব বিষয়েই তোমাদের মতামতের এত নিবিড় মিল অথচ নরনারীর সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই তোমরা যেন মরীয়া হয়ে ওঠ।

শঙ্কর হেসে বললে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাস্তবিক সুতিলা অসাধারণ, জিতুদা। মাঝে-মাঝে আমি ভাবি, এত সব জটিল বিষয় এত সুন্দরভাবে ও ধারণা করে কেমন ক'রে? কিন্তু তবু ওর হৃদয়ের গোপন তলে যে আছে, সে-যে একান্তভাবেই নারী, তাই ওকে কিছুতেই আমার কথা বোঝাতে পারি না যে—

সুতিলা হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে রুখে উঠে বললে, থাক, থাক, মেয়েদের সম্বন্ধে আর তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জাহির করতে হবে না। কিন্তু, যাই ব'ল, একদিন এর জন্যে তোমায় জবাবদিহি করতেই হবে। মানুষের বিধাতার কাছে গোঁড়ামির প্রশ্রয় নেই। জীবনের এগিয়ে যাবার পথে তাই মানুষের যেদিন গোঁড়ামি ঘোচে, সেদিন তাকে নিঃসম্বল হয়ে দাম দিতে হয়।

"কিন্তু সেদিন কে জানত, শঙ্করের প্রায়শ্চিত্তের মূল্যস্বরূপে একদিন সুতিলা নিজেই জীবনের বেদীমূলে এমন নিঃসম্বল হয়ে নিজেকে বিসর্জ্জন দেবে!"

জিতেনবাবু একটু থেমে আবার সুরু করলেন, "আপনাদের কাছে সেই পুরানো কাহিনী বলতে গিয়ে এত কথা মনে পড়চে যে অন্তরের আবেগ চেপে রাখতে পারচি না। সুতিলাকে সত্যিই আমার খুব ভাল লাগত। বিশেষতঃ, ওরা ছিল আমার মার সম্পর্কে দূর আত্মীয়। ছেলে বয়সে ওদের বাড়ীতে খুবই যাওয়া আসা ছিল। তাই ওর এ ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পে আমি বড় মর্ম্মাহত হয়েছিলুম। সেদিনই ওদের বাড়ীতে খোঁজ করতে গেলুম। শুনলুম, ওরা সবাই দার্জ্জিলিং চলে গেচে। গ্রীষ্মের ছুটিটা দার্জ্জিলিং-এ কাটাবার কথাবার্ত্তা আগে থেকেই হচ্ছিল, তাই মনে আশা হল, এ শুধু শঙ্করকে দুদিনের ভয় দেখানো। যথাসময়ে সুতিলা আবার ফিরে আসবে। কিন্তু ওদের ছুটি যখন সত্যিসত্যিই ফুরুল, তখনো সুতিলা ফিরল না। এক বিধবা মা ছাড়া ওদের সংসারে আর কেউ ছিল না। কিছুদিন পরে শোনা গেল, ওরা কোলকাতার বাড়ীটা বিক্রি ক'রে ফেলেচে।

মনের মধ্যে দরদী মানুষটা ক্ষেপে উঠল। বাধ্য হয়ে অসময়ে দার্জ্জিলিং ঘুরে এলুম। প্রায় মাস দুই ধরে সে কি খোঁজাখুজি কিন্তু কিছুতেই সুতিলার সন্ধান মিলল না। শঙ্কর

একদিন কৌতুক ক'রে বললে, ব্যাপার কি জিতুদা ? তুমিও শেষে সুতিলার প্রেমে পড়লে নাকি ? না, এ শুধু অবসর সময়ে নিছক পরের ভাল করবার চেষ্টা ?

একান্ত অনিচ্ছায় জবাব দিলুম, যাই বল, একটা জীবন মিছামিছি তোমার জন্য নষ্ট হয়ে গেল !

সে হো-হো ক'রে হেসে উত্তর দিলে, অত ভাবচো কেন জিতুদা ? মেয়েরা যাই হোক,—তারা মেয়ে। একদিন শুনবে, সুতিলা কোথাও দিব্যি একঘর ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার ফেঁদেচে। এইত মেয়েদের জীবনের চরম কাম্য। এ ছাড়া ওরা আর কিছু ভাবতে পারে নাকি ?

মনে রাগ হল। রুক্ষ কণ্ঠে বললুম, কেন তুমি ইতিহাস পড়নি শঙ্কর ? জান নাকি, জগতের ইতিহাসে মেয়েরাও অনেক বড় কাজ করেচে, যা' পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন নয় ?

—অনেক কাজ করেচে স্বীকার করি। কিন্তু এর পিছনের গোপন ইতিহাস কি তোমার জানা নেই ? মেয়েরা কেউই পুরুষের মত স্বেচ্ছায় কখনও বড় কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেনি,—তারা করেচে জীবনের চরম কামনার ব্যর্থতার উগ্র প্রতিক্রিয়ায়। সুখের সংসার পাতবার আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল না, তা নয়, কিন্তু কোন না কোন পুরুষকে প্রেম নিবেদন ক'রে ভোলাবার চেষ্টায় সফল না হয়ে ক্ষোভ আর অভিমান বশে অন্য কাজে নিজেদের বলি দিয়েচে।"

প্রভাত সজোরে চীৎকার ক'রে ওঠে, "বাস্তবিক, এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই। অথচ এই মেয়েরাই চায় পুরুষের সঙ্গে জীবনে সমান-অধিকার !"

বিভু হেসে বলে, "তোমার আজ অত উত্তেজনা কেন প্রভাত ? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েচে নাকি ?"

জিতেনবাবু বলে যান, "তারপর কেটে গেল বছর পাঁচেক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটা উপাধি নিয়ে শঙ্কর সাহিত্য-সৃষ্টিতে মন দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই সমালোচনা এবং দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটা মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়ায় দেশবিদেশে তার জয়ঢাক বেজে উঠেছিল। কিন্তু এ ত ওর কাম্য নয়। ও চায়, জগতের অদ্বিতীয় সাহিত্যিক হতে—যার নাম অনাগত যুগ-যুগ ধরে অমর হয়ে থাকবে। কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর শঙ্কর দুখানা উপন্যাস ছাপালে, কিন্তু বাংলাদেশে তাদের মোটেই আদর হল না।

শঙ্কর সেদিন রাগে গোঁ-গোঁ করতে করতে এসে বললে, বাংলার সত্যিকার সাহিত্য-সৃষ্টির জমি দেখচি আজও তৈরি হয়নি। আস্থি-কালের মন নিয়ে এরা একালের সাহিত্য পড়তে চায়। তাই, যে-সাহিত্য বুদ্ধির খোরাক যোগায়, তা' এরা সহ্য করতে পারে না।

শেষে নিরুপায় হয়ে শঙ্কর যুরোপ ভ্রমণে বেরুল। দেশে দেশেও বক্তৃতা দিলে, সাহিত্যের চিরাচরিত গতি ফিরিয়ে দেবার দিন এসেচে আজ। মানুষ আজ ব্যস্ত বুদ্ধি-বিকাশের কঠোর সাধনায়,—বিশ্বের আদিরহস্যকে আজ সে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চায়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মধ্যে তার এই চেষ্টা স্পষ্টরূপে মূর্ত্তি পেয়েচে। মধ্যযুগ তাকে বুঝিয়েছিল, মানুষের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ। সৃষ্টির গোপন তত্ত্ব তা' দিয়ে উদ্ঘাটন করা যায় না। হৃদয় দিয়ে একে শুধু উপলব্ধি করতে হয়। এই আশাতেই তারা মঠ, আশ্রম স্থাপন করেছিল। কিন্তু মধ্যযুগের মূঢ়তা আজ আর মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। সে আজ তার বুদ্ধির সীমাকে সাধনার দ্বারা প্রসারিত করতে চায়। মানুষের সেই প্রসারিত বুদ্ধির উপযোগী সাহিত্য আজ সৃষ্টি করতে হবে। যে-সাহিত্যের মধ্যে শুধু ভাবরসের সম্ভোগ মেলে, সেই মধ্যযুগের সাহিত্য দিয়ে আর নতুন মানুষের সাহিত্যক্ষুধা মিটবে না।

যুরোপের চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল। প্রাক্-যুদ্ধের যুরোপ তখনো অতীতের স্বপ্নে-বিভোর। শঙ্করের কথা তার অন্তরে গিয়ে আঘাত করলে। কাগজে কাগজে তার প্রশংসা বেরুল। দেশেদেশে চিন্তানায়কেরা তাকে চিন্তাগুরু ব'লে অভিনন্দন জানালে। শেষে বছর দুই পরে শঙ্কর দেশে ফিরে এল। বললে, এবার ভবিষ্যতের সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করব। অন্ধ দেশ যদি আমাকে না চায়, জগৎ তবু আমাকে উপেক্ষা করবে না।

তিন বছরের অবিরাম সাধনার ফলে শেষে বেরুল একখানা উপন্যাস। দেশের চারধারে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নতুনের নেশায় ওর অনেকগুলো ভক্ত সাহিত্যিক জুটেছিল।

যদিও শঙ্করের আদর্শ সম্বন্ধে তাদের ধারণা কিছুই ছিল না, তবু ওর নাম নিয়ে তারা হৈ-চৈ ক'রে বেড়াত। তাদেরই চেষ্টায় কোলকাতা সহরে শঙ্করের এক বন্দনা-উৎসবের আয়োজন চলতে লাগল। পরাধীন দেশের সৌভাগ্য যে এত বড় সাহিত্যিক বাংলা দেশের জংলামাটিতে গজিয়েচে। এঁর বন্দনা মানে দেশ-মাতৃকার বন্দনা। এই কথা ভক্তের দল উঁচু গলায় প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগল। ফলে, সব দল সম্মিলিত হয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা করলে। শঙ্কর প্রথমে রাজী হয়নি। শেষে সুরেশ বাবু এসে হাজির হলেন। তিনি ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-বিচারক। এসে বললেন, বাংলাসাহিত্যকে আপনারা ক'রে তুললেন কি? আজ বয়েস আমার অনেক হল, তবু যে জীবনে বাংলাসাহিত্যের এই উন্নতি দেখে যেতে পারলুম,—এই কথাই একদিন চিত্রগুপ্তের কাছে গিয়ে বলতে পারব। জানেন, আপনার বই পড়ে যেমন একদিন বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলুম, ঠিক সেই রকম আর একখানা কবিতার বই-এর সন্ধান সেদিন পেয়েচি। এর নাম "জীবন-জ্যোৎস্না",—কোন নতুন, অনামা কবির জীবনের জয়গান জানিনা, কিন্তু বইখানা প্রকাশিত হয়েই সোরগোল তুলেচে।

একজনকে প্রশংসা করতে গিয়ে আর একজনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠার মত সমালোচকী কায়দা জানতুম, তাই শঙ্করকে বললুম, এর চেয়ে আর বেশী কি আশা কর তুমি? শঙ্কর আর অমত করতে পারলে না। সভায় তাকে যেতেই হল। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে যে ভয় করেছিলুম, তাই-ই ঘটল। সভায় শঙ্কর নিজেই লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিলে।"

"—আশ্চর্য্য, নিজের জয়ন্তী উৎসবে নিজেই লঙ্কাকাণ্ড বাধানো! জগতে এমন মানুষও থাকে?" দেবী আর চুপ করে থাকতে পারলে না।

জিতেনবাবু বলে যান, "হাঁ, সেদিন লঙ্কাকাণ্ড বাধল শুধু বাইরে নয়,—তার অন্তরেও। মানুষ ভাবে সবই বুঝি তার নিজের হাতে। কিন্তু একদিন কোথায় বসে কে যে তার বহুদিনের হিসাব নিমেষে নিষ্ঠুর ভাবে ওলট-পালট ক'রে দেয়, কেউ তার সন্ধান পায় না। উৎসবে ভক্ত এবং বন্ধুদের বক্তৃতার দাপট যখন কমল, তখন শঙ্কর ধীরে ধীরে উঠে বললে, এই উৎসবের খবর প্রথম যখন কানে গেল, তখন সত্যিই বড় ভয় পেয়ে গেছলুম। কিন্তু এখানে এসে যখন দেখলুম, এ আমার জয়ন্তী নয়, আমাকে নিমিত্তমাত্র ক'রে আপনারা আমার চেয়ে অনেক বড় আর একজনের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করচেন, তখন নিশ্চিন্ত হলুম। নিজের অদৃষ্টকে আমি ধন্যবাদ দিই যে আপনাদের কাছ থেকে বন্দনা পাবার মত বিড়ম্বনা আমার ঘটেনি। কারণ, আপনাদের সুচিন্তিত সুরসাল বক্তৃতা শুনে মনে হল আপনারা আজ যাকে বন্দনা জানালেন, সে আমি নই। আমারই নাম দেওয়া আপনাদের কল্পনা-বুদ্ধি ও সংস্কার-দিয়ে-তৈরী এক কাল্পনিক মূর্ত্তি,—যার সঙ্গে মত এবং চিন্তায় আমার কোন সাদৃশ্য নেই।"

"ঠাণ্ডাশালা"য় হাসির কলরব উঠল। শিশিরদা বললেন "আজকাল ব্যাপার যথার্থই তাই হচ্চে। এই ভক্তদের আমি খুব চিনি। এঁরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী, শরৎবন্দনা করেন, কিন্তু ওঁদের সাহিত্য বুঝেন না একটুও।"

—"সত্যি কথা শিশিরদা। আপনি এঁদের খুব চেনেন। তা না হলে আপনার অমন সুন্দর প্রবন্ধটা কিনা 'রবীন্দ্র জয়ন্তী'তে পড়তে দিলে না?" দেবীর টিট্‌কিরীর জন্যে আবার চাপাহাসির রোল উঠল। কিন্তু জিতেনবাবু এ বিষয়ে কোন ঔৎসুক্য না দেখিয়ে আপন মনে বলে চললেন,

"শঙ্করের সেই বক্তৃতার সময় উপস্থিত লোকদের চক্ষু থেকে যখন বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার অগ্নি বর্ষণ হচ্ছিল, তখন ওর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল,—দূরে সভার পাশের দিকে অন্ধকার এক কোণে দুটি করুণ, মমতাভরা চোখের পরে। মুহূর্ত্তের মধ্যেই শঙ্কর তাকে চিনলে। সভা শেষে চারিদিকে যখন উঠল হট্টগোল আর একটানা ছি-ছি, শঙ্কর কোন দিকে মন না দিয়ে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল সেই চোখ দুটির সন্ধানে। তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছিল ব্যগ্রতার রেখা।

ট্যাক্সির মধ্যে বসে শঙ্কর ডাকলে, সুতিলা, জীবনে সকলেরই ভুল হয়।

আবেগে কথা তার শেষ করতে না পেরে সে একদৃষ্টে সুতিলার দিকে চেয়ে রইল। এই কয় বছরে ওর কি

পরিবর্ত্তনই না হয়ে গেচে। দেহে রূপ আর ধরে না। যৌবনের চঞ্চলতার পরিবর্ত্তে এসেচে কমনীয়তা, মুখে-চোখে একটা স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, গাঢ় দীপ্তি। অন্তরের দুর্জ্জয় আবেগে কাঁপা গলায় শঙ্কর বললে, তোমার কাছে মাপ চাইব, সে অধিকারও ত আমার নেই।

এতক্ষণ সুতিলা বিহ্বল, আচ্ছন্নের মত নতমুখে বসেছিল। হয়ত তার বুকের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল। জীবনে এর চেয়ে আশাতীত, এর চেয়ে অপ্রত্যাশিত আর কিছু কখন যে ঘটেনি! মুখ না তুলেই সুতিলা ধীরে ধীরে শঙ্করের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। দুজনের অন্তরে তড়িতের শিহরণ খেলে গেল। সেই আধো অন্ধকারেই শঙ্কর দেখতে পেলে সুতিলার সজল চক্ষু থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়চে। সে সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে বললে, এতদিন কি ক'রে যে তোমায় ভুলেছিলুম, তা নিজেই নিজেকে বারবার জিজ্ঞেস করেচি। সুরেশবাবুর মুখে আজ প্রথম তোমার খবর পেলুম। ইতিমধ্যে তোমার স্কুলের প্রশংসা কাগজে কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু আজ পাঁচ বছর দেশের কোন খবরই আমি রাখিনি। কিন্তু তোমার এই কাজের মধ্যে নয়। তোমার সত্যিকার পরিচয় পেলুম তোমার 'জীবন জ্যোৎস্না'র পাতায় পাতায়। পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, রাত্তিরে যখন ছিলুম ঘুমিয়ে, আমার মনের গোপন চিন্তাগুলো কে যেন লুকিয়ে এসে চুরি ক'রে নিয়ে শেষে দিনের আলোয় প্রকাশ করে দিয়েচে। তারপর আজ সকালে যখন শুনলুম, এ তোমার লেখা, মনের মধ্যে কি যেন একটা কথা হঠাৎ জেগে উঠল। অবাক হয়ে গেলুম, এতদিন কোথায় ছিল লুকিয়ে এই কামনা!

একটু থেমে একটা শুকনো হাসি হেসে ও বলে, আশ্চর্য্য এই মানুষের মন! যেদিন তোমার মর্ম্মান্তিক চিঠি পেলুম, তারপর কতদিন নিজের মনের অন্ধকার কোণে কোণে খুঁজে বেড়িয়েচি, তোমাকে সত্যি ভালবাসি কিনা। কিন্তু বারবার একই জবাব মিলেচে—না। সাহিত্য-সাধনার উন্মাদনায় তখন মন ছিল পূর্ণ। কিন্তু, জানো সুতিলা, আজ মন বলচে, একান্ত ক'রে শুধু তোমাকেই চাই?

সুতিলার বুকের কাঁপন যেন আর থামতে চায় না। সে অস্ফুটস্বরে বললে, ছিঃ, সমস্ত জগৎ আজ কত আশায় না তোমার দিকে চেয়ে আছে! অন্যদিকে মনকে বিক্ষিপ্ত হতে দেবার এই কি সময়?

শঙ্কর উত্তেজিত হয়ে বললে, থাক আমার সাহিত্য-সাধনা, থাক জগতের মুগ্ধদৃষ্টি। আজ যে নিজেকেই একান্তভাবে হারিয়ে ফেলেচি, তিলা। তারপর হঠাৎ সুলিতাকে সজোরে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললে, তবে কি তোমার মনের মধ্যে আমার আর কোন অধিকার নেই?

সুতিলা বললে, ছিঃ, এমন কথা বলতে পারলে তুমি? আজ কেমন ক'রে তোমায় বোঝাবো আমার সে সব ব্যথার কথা। জীবনে আঘাত তুমি কখন পাওনি, তাই আঘাতের বেদনা কি, তা তুমি বুঝবে না। যেদিন নিষ্ঠুরের মত হেসে চলে গেলে, তিরস্কার ক'রে ব'লে গেলে, তোমার মনেও শেষে এই ছিল সুতিলা। তারপর দুদিন কিভাবে যে আমার কেটেছিল, সে কথা এক অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু থাক সে কথা। তোমার সাধনার পথে আজ যদি আবার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াই, তাহলে যে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না!

সেদিন রাতে শঙ্কর বাড়ী ফিরলে সব কথা তার মুখে শুনে বিস্মিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলুম। বুকভরা আশা নিয়ে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। নানাচিন্তা অন্তরকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। বিধাতার বিধান,—বিচিত্রতার গতি। বেদনার উপকরণ দিয়েই তৈরী হয় জীবনের জয়যাত্রার পথ, —বিচ্ছেদের ব্যথা দিয়ে মিলনের সেতু। যুগযুগ ধরে নটরাজের চলেচে এই লুকোচুরী খেলা। ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে তিনটা বাজল। ঠিক করলুম, সকালে উঠেই শঙ্করকে নিয়ে সুতিলার সঙ্গে দেখা করতে যাব। কল্পনায় তার হাসিমাথা মুখখানা ভেসে উঠল। তাকে উদ্দেশ ক'রে বললুম, দুষ্টু মেয়ে, তাকি হয়? এতবড় অন্যায়ের প্রশ্রয় কি বিধাতার কাছে মেলে? কেমন, ফিরে আসতে হল ত'? তবু ভাল, সময়ে তোরা ফিরে এসেছিস। তা না হলে—। অতীতের সব কথা মনে পড়ে বুকখানা ভারী হয়ে উঠল। কিন্তু সকালে উঠে শঙ্করকে আর পাওয়া গেল না। মানুষের

অন্তরে প্রজাপতি যখন জাগেন, তখন প্রণিতাবেই সে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে বটে। তা-ই ভাল শঙ্কর, আজ, আজ তোমাদের মিলনের মধ্যে আমি থাক্‌লে হয়ত শুধু সঙ্কোচ সৃষ্টি করতুম।

সন্ধ্যার দিকে শঙ্কর যখন বাড়ী ফিরে এল, আমি বললুম, ফিরে শঙ্কর, সুতিলাকে নিয়ে এলিনা?

ও সজোরে আমার হাতটা চেপে ধ'রে বললে আজকের মত আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস কোরো না জিতুদা। আজ আমায় একলা থাকতে দাও।

এতক্ষণ ওর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়েনি। চেয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। ওর সমস্ত চেহারাটা এক রাত্রের মধ্যে কি যেন এক রকম হয়ে গেচে। অপরিসীম বেদনায় আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আজ সকাল থেকে ঠিক এই ভয়েই মনটা মাঝেমাঝে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। একটু রুক্ষস্বরে বললুম, তুমি যত বড় সাহিত্যিকই হয়ে থাক শঙ্কর, আজও নিজেকে চিন্তে পারনি। প্রেমকে যারা বুদ্ধি দিয়ে মাপতে চায়, জগতে তাদের মত দুর্ভাগা আর কেউ নেই। এই কথা ব'লে পাশ ফিরে শুলুম। মনে আশা হল, আজ না হয় কাল, একদিন প্রকৃতির জয় হবেই। ওর মনের এই দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। কিন্তু পরের দিন সকালেও আবার ওকে পাওয়া গেল না। তখন একটু চিন্তিত হলুম। স্থির করলুম, নিজেই একবার সুতিলার সঙ্গে দেখা করি। সান্ত্বনার উৎস একমাত্র ওর কাছেই আজ মিলতে পারে।

যে বাড়ীতে এসে পৌঁছুলুম, তা' ওর দূরসম্পর্কের এক বোনের বাড়ী। মেয়েটি বোধহয় সব জানত। আমায় দেখে বললে, ভেতরে আসুন। আপনি কি জিতেনবাবু?

আমি পরিচয় দিয়ে বললুম, হাঁ, কিন্তু আপনি আমায় চিনলেন কি ক'রে? সুতিলা কোথায়? তার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।

উত্তর এল, ওঁদের বাড়ীতেই আমাকে দেখেচেন কিন্তু আপনার মনে নেই। দিদিমণি ত' কালকের গাড়ীতেই দার্জ্জিলিং চলে গেছেন।

হতাশায় আমার মুখটা হয়ত ম্লান হয়ে গেছল। আমি অস্ফুটস্বরে বললুম, এঃ, একটা দিনও সুতিলা আমায় সময় দিলে না।

—আপনার কি বিশেষ কিছু দরকার ছিল? দিদিমণি কেন যে হঠাৎ কোলকাতা থেকে চলে গেলেন, তাত' বুঝতে পারলুম না। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে যখন ওঁরা দার্জ্জিলিং চলে যান,—সে প্রায় একযুগের কথা। তারপর এই প্রথম আজ চারদিন হ'ল কোলকাতায় এসেছিলেন। আসতে কি চান? আজ দশ বছর ধরে আশ্রমের কাজে দিনরাত খেটে খেটে ওঁর শরীর ত' একেবারে ভেঙে পড়েছিল।

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, সুতিলা কি এখন কোন আশ্রমে থাকে? ওর বাবা ত' বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি ত' যথেষ্ট টাকাকড়ি রেখে যান।

—হাঁ, সেই টাকা দিয়েই দিদিমণি এখান থেকে চলে যাবার পর পাহাড়ী জাতের মধ্যে কাজ সুরু করে দেন। তিনি বলতেন, সব কাজের সেরা মানুষকে বিদ্যাদান। তার অন্ধতা ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ ওঁদের আশ্রমের পরিচালনায় দুটো ছোট ছেলেদের আর চারটে মেয়েদের স্কুল চলচে। ক্রমাগত এই হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে প্রায় মাসছয়েক আগে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কত সাধ্যসাধনা করলুম কোলকাতায় থেকে চিকিৎসা করবার জন্যে কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে আশ্রমের অন্যান্য সেবিকাদের পীড়াপীড়িতে দার্জ্জিলিং-এতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। এখন একটু সামলে নিয়েচেন। হঠাৎ দিন বার আগে একখানা চিঠি পেলুম। আশ্রমের সম্পাদিকা লিখেচেন, দিদিমণি আমার স্বামীর চিকিৎসায় কিছুদিন থাকতে চান। সব ব্যবস্থাই হয়ে গেল। তারপর পরশুদিন রাতে কোথায় গেছলেন জানিনা, অনেক রাতে বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু সকালে উঠেই বললেন, আজই ফিরে যাব। আমার স্বামী ত' নাছোড়বান্দা, কিন্তু দিদিমণি কারো কথা শুনলেন না। হয়ত, আশ্রম থেকে কোন জরুরী খবর এসেছিল।

সব কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। নিঃসহায় রমণীর এত বড় আত্মদানের কাহিনী শুনে একান্ত করুণায় হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। শঙ্করের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে

উঠলুম। কিন্তু তবু সুতিলাকে মনে-মনে ক্ষমা করতে পারলুম না। স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্য্যের মত ভোগ করা যায় জানি, কিন্তু কি দরকার ছিল এই পরম দুঃখকে বরণ করে নেবার! না-পাওয়ার ব্যথাকে উপভোগ করার জন্যে কেন এই নিরর্থক আত্মদান! মনে সংশয় এল, এ ত' আত্মদান নয়, এ শুধু আত্ম-নিপীড়ন।

বাড়ী ফিরতেই দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে। বললুম, আশ্চর্য্য! ভগবান তোমাদের এক ধাতু দিয়ে একই ছাঁচে গড়েছিলেন, তা না হলে সুতিলাও কখনো দার্জ্জিলিং পালিয়ে যায়?

ও বললে, থাক, থাক, সুতিলার সম্বন্ধে আমি আর একটুও উৎসুক নই। এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাটাই সব চেয়ে বড় হল, আর সারাজীবন যা' ক'রে এলুম তা কিছুই নয়? তারপর একটা শুক্‌নো হাসি হেসে বললে, উঃ, সে কটা দিন কি ভাবেই না কেটেচে। কারো কাছে প্রেম নিবেদন করব—এ যে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। সমস্ত রাত্তির ধ'রে মনে মনে আলোচনা করলুম, কি চাই—যশ না প্রেম। সাহিত্যে অমরতা না গার্হস্থ্যজীবনে শান্তি? নিজেই অবাক হয়ে গেলুম, এ প্রশ্ন আজ ওঠে কেমন করে? আজ যৌবন ত' এসে পৌচেছে শেষ সীমায়। যখন ছিল যৌবন, ছিল মনে রঙের স্বপ্ন, তখন যে প্রশ্নটাকে মনে প্রাণে সকল চিন্তা সকল কাজ থেকে ছেঁটে ফেলে দিয়েছিলুম, আজ সেই প্রশ্নই হঠাৎ কেমন করে ফেললে মনকে ঘিরে! এ আজ কিসের উন্মাদনা! মস্ত মনকে বোঝালুম, আজ যাকেই হোক একজনকে বিদায় দিতে হবে। এদের মধ্যে দুয়ের মিলন একসঙ্গে হয় না,—জীবনে যাঁরা তা' করতে গেচেন, তাঁদের একূল ওকূল দুকূলই গেছে।···কিন্তু আমার জীবনের সার্থকতার জন্যে সুতিলার সংস্পর্শ কি একান্তই দরকারী? কোন দিক থেকে তা' আমায় দেবে শক্তি, দেবে পরিপূর্ণতা? শেষে মন বুঝল, নেশা গেল কেটে। অনেক ভেবে সাহিত্যকেই বেছে নিলুম জীবনের চরম কাম্য ব'লে। আজ জীবনে চাই অমরতা, চাই সাহিত্যদরবারে চির-প্রতিষ্ঠা,—এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নেই।

এই অসাধারণ মানুষটিকে নিয়ে এই সাধারণ প্রশ্নের মীমাংসা কেমন ক'রে করব ভাবচি, এমন সময় এল সুতিলার কাছ থেকে চিঠি। অজানা সংবাদের ঔৎসুক্যে দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ অন্তরে পড়তে লাগলুম:

অনেকদিন পরে আপনাকে আজ চিঠি লিখচি। না লিখলেও চলত, কিন্তু তবু লিখতে হল। শুনলুম, সেদিন এসেছিলেন আপনি আমার খোঁজে, দেখা হয়নি ব'লে মনে মনে নিশ্চয়ই অভিশাপ দিয়েচেন। দিন, আপনার অভিশাপই যেন হতভাগীর জীবনে সত্যি হয়!

কিন্তু কি করব? জীবনে এমনিই হয়। যে মুহূর্ত্তটি আসার জন্যে মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে,—যেদিন তা' আসে, সেদিন সে বিস্ময়ে দেখতে পায়, আজও তার তৈরী হওয়া হয়নি। আমার জীবনে সেই মুহূর্ত্তটি এত অপ্রত্যাশিত ভাবে এল যে তাকে শান্ত মনে গ্রহণ করতে পারলুম না। এতদিন মনে কেবলই ভয় হত, পাছে-বা না পাই। কিন্তু যেদিন ও ধরা দিলে, সেদিন অকস্মাৎ বুক দুর-দুর ক'রে কেঁপে উঠল, মনে ভয় হল, পাছে-বা হারাই। সে কাঁপন যেন আর থামতে চায় না। বুকের মধ্যে যখন ও টেনে নিলে আমাকে (লজ্জায় কোন কথা আপনার কাছে গোপন করার মত আজ আমার অবস্থা নয়), ক্ষণেকের জন্যে আত্মবিস্মৃত হলুম। সর্ব্বশরীর আনন্দে নেচে উঠল। পরক্ষণেই মনে হল, এই যে মত্তা, এত' ওর শান্ত প্রকৃতি নয়—এ যেন আর কেউ। মনে পড়ে আপনার, একদিন কথায় কথায় আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'অন্য কোন মেয়ের কথা না হয় ছেড়ে দিই, কিন্তু তোমার মাকেও কি কখন ভালবাসনি?' ও একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিয়েছিল, 'মার কথা জিজ্ঞেস করা মিথ্যে। কারণ মাকে জীবনে কখন দেখবার অবসর ঘটেনি। আর বাবার কাছ থেকে জীবনে এমন সান্নিধ্য পেয়েছিলুম যে মার অভাব কখন অনুভব করতে পারিনি।' আমি বলেছিলুম, 'তবু, তাঁর স্মৃতিকেও কি ভালবাসতে পারনি?' ও হেসে শ্লেষ করেছিল, 'হাঁ, এই বলে যে বাবার যৌবনের সব নিষ্ফলতার কারণ ছিল একমাত্র মা।'

ওর বুকের ওপর শুয়ে শুয়ে মনে হল, আজকের আবেগ যেদিন ওর অন্তরে শান্ত হয়ে আসবে, হয়ত

সাহিত্য-সাধনায় আশার মত সিদ্ধি পাবে না, সেদিন যদি ওর পাষাণ মনে জেগে ওঠে আমার সম্বন্ধে ঠিক এই ধারণা, —সেদিন নিজেকে ঠেকাব কি দিয়ে? সেদিন বেঁচে থাকবার শক্তি পাব কোথায়? নির্ভয় হতে পারলুম না।

সমস্ত রাত্রি ধ'রে কত কথাই ভাবলুম! শেষে মন বললে, তুমি ত' কখনই ওকে পাওয়ার মত পাবে না। আজো ঠিক ও তেমনটি আছে, যেমনটি আগে ছিল। ওর চিত্তের কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি। ওর এই নেশার ঘোর যখন ভাঙ্‌বে, তখন দেখবে কি? শরতের দুপুর-রাতে আকাশে যখন উঠবে চাঁদ, ভোর হয়েচে মনে ক'রে পাখীরা যখন করবে কলরব, তখন ওকে কি পাবে তোমার পাশে? ও তখন বাগানের পূবদিকের মাধবীতলায় বসে হয়ত ধ্যান করবে ওর সাহিত্য-দেবীর। মেয়েদের জীবনে এর চেয়ে ব্যথা—এর চেয়ে অপমান আর কিছুতে নেই। হয়ত আপনি ভাবচেন, এ আমার আবেগের কথা, কিন্তু কেমন ক'রে বোঝাবো আপনাকে মেয়েমনের গোপন কথা। অল্পে যে আমাদের তৃপ্তি নেই। যত পাই, ততই না পাওয়ার ব্যথা তীব্র হয়ে ওঠে। মেয়েদের ভালবাসা চায় সমস্ত মানুষটিকে। তাই দয়িতের অন্তরের অল্প একটু অন্ধকার কোণে আসন পেয়ে সুখী হতে পারে না।

স্থির করলুম, ওর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আর পেয়ে যদি হারাতেই হয়, তার চেয়ে না-পাওয়াই ভাল। পরের দিন সকালে দেখা করবার কথা ছিল। দেখা না ক'রে সেইদিনই কোলকাতা ছেড়ে যাবার ঠিক করলুম।

কিন্তু যাবার সময় এল বাধা। ওর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম। লিখেচে, কালকের ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মত ভুলে যেও। জীবনের পথে একমাত্র আরাধ্য ব'লে সাহিত্যকেই বেছে নিলুম শেষবারের মত। আর আমাদের দেখা না হওয়াই ভাল। কারণ, মেয়েদের ফাঁদকে এবার সত্যিই ভয় করতে শিখেচি।

চিঠিখানা পড়ে সব সঙ্কল্প ছিন্ন হয়ে গেল। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সারাজীবন আমি মরব জ্বলে, আর ও খ্যাতি নিয়ে থাকবে অমর হয়ে! আমরা শুধু ফাঁদ পাতি? ভাবলুম, কোলকাতা ছাড়া হবে না—শেষবারের মত একবার চেষ্টা করব।' এবার সত্যিই ফাঁদ পেতে দেখব। আমিও ডুবব, ওকেও ডোবাব। জানিয়ে দেব, মেয়েরা সত্যি যেদিন ফাঁদ পাতে, সেদিন রূঢ় দম্ভ আর মিথ্যা বৈরাগ্য কিছুই পুরুষকে বাঁচাতে পারে না। মাথার মধ্যে শিরাগুলো নেচে উঠল।

সে এক ভীষণ মুহূর্ত্ত। নিজেকে কিছুতেই আর শান্ত করতে পারি না। প্রীতি এসে বললে, তোমার কি অসুখ বাড়লো দিদি? লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। বুঝলুম, অন্তরের দ্বন্দ্ব মুখের রেখা থেকে গোপন করতে পারিনি। তাকে যাহোক একটা উত্তর দিয়ে জোর ক'রে ট্রেনের কামরায় এসে উঠলুম।

কিন্তু আজ আর ভয় নেই। আমার কাজের মধ্যে এসে শেষে চৈতন্য ফিরে পেলুম। মনে ধিক্কার এল, আমার রক্ত দিয়ে গড়া স্কুল আর আশ্রমের কথা ভুলে গিয়ে কোথায় আমি ডুবে মরছিলুম! অন্য চিন্তা এসে আমাকে এত বিক্ষিপ্ত ক'রে ফেলেছিল কেমন করে। বাংলামায়ের বুকে এই আশ্রমের আদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে আর কি বড় সার্থকতা আমার কাম্য হতে পারে! কিন্তু অন্তরের অভিমানী নারী তবু থামে না। বলে, তুমি শুধু বুক পেতে সহ্য করবে? কিছু প্রত্যাশা না ক'রে শুধু দিয়েই কি তৃপ্তি মিলবে? জানি, সে গর্ব্ব আজ আমার ভেঙে গেচে। শুধু দিয়ে মেয়েরা শান্ত হতে পারে না, তারা চায় প্রতিদান। শুধু স্বপ্নের কারবার ক'রে—শুধু ছায়া নিয়ে তারা তৃপ্ত হতে পারে না, চায় বাস্তব। কিন্তু ভাবি, আমার এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেয়ে আর কি বাস্তব থাকতে পারে? এর মূলে রয়েচে কে?

চিঠিখানা পড়তে পড়তে দুই চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ ত' শুধু চিঠি নয়, এযে নানা দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ অন্তরের গোপন ইতিহাস।

এমনি ক'রে প্রায় মাসখানেক কেটে গেচে। এমন সময় একদিন শঙ্করের সব স্বপ্ন ঘুচিয়ে দিয়ে এল এক দুঃসংবাদ। জার্ম্মেনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক ওর নতুন বইখানা বিশ্লেষণ করে লিখেচেন, এই অসাধারণ ব্যক্তিটি যেদিন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর নতুন বাণী আমাদের শুনিয়ে গেছলেন, তারপরে

আমরা আকুল প্রতীক্ষায় চেয়েছিলুম তাঁর সাহিত্য সাধনার ফলের দিকে। কিন্তু এই বইখানি পড়ে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েচি। তিনি চিন্তাগুরু বটে, কিন্তু সাহিত্যগুরু কিছুতেই নন। তাঁর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং জীবনের 'পরে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে যে তীক্ষ্ণ প্রতিভা, অতুল পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম কল্পনার পরিচয় পাওয়া গেছে, তা দেখে বিস্মিত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে এই বইখানিতে সাহিত্য-রসের খুবই অভাব।

"দেশের চারিদিকে আর একবার হৈ চৈ পড়ল। শঙ্করের বইগুলো যে সাহিত্য-হিসাবে নেহাৎ কিছু নয়, তা এর পূর্ব্বে অনেকেই টের পেয়েছিলেন—এই কথাই নানাভাবে নিত্য নানা কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল। যেদিন জর্ম্মান-সমালোচকের লেখাটি শঙ্কর পড়লে সেদিন ও কোন কথা বললে না। সমস্ত দিন দরজা বন্ধ ক'রে পড়ার ঘরে কাটিয়ে দিলে। বারবার ডাকাডাকি করাতেও জবাব পাওয়া গেল না। বুঝলুম, মনে খুবই আঘাত বেজেচে। তা না হলে একলা ঘরের ভিতর না ব'সে থেকে রূঢ় ভাষায় গালাগালি সুরু করত। ওর ধরণই এই রকম। যখন সত্যি ও আঘাত পায়, তখন একেবারে চুপ ক'রে যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে গভীর আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক, কেন না, এই বিশ্ববিশ্রুত জর্ম্মান পণ্ডিতই য়ুরোপে ওর প্রধান ভক্ত ছিল।"

বিষ্ণু সাহিত্যিক। তাই সাহিত্য-সাধনার বিফলতার 'পরে তারই সব চেয়ে বেশী দরদ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বললে, "তারপর?"

একটু থেমে জিতেনবাবু আবার সুরু করলেন, "লোকে বলে জীবনে আকস্মিকের স্থান নেই। ও শুধু হাল্‌কা সাহিত্যিকের বাজে কল্পনা। কিন্তু মনে হয়, আমাদের জীবন আকস্মিকে ভরা। জীবনে যত কিছু মাহেন্দ্রক্ষণ আসে,—সবই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। আপনারা কি সত্যি ব'লে ধারণা করতে পারেন যে পরের দিন সকালে সুস্মিতার বোনের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলুম। তাতে লেখা ছিল, দিদিমণি দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাগত। যদি সম্ভব হয়, একবার আসবেন।

নীল আকাশের কোণ থেকে অকস্মাৎ অকারণে যেন বজ্রপাত হল। মুহূর্ত্তের মধ্যে চারিদিক ঝাপসা হয়ে এল। পায়ের নীচে মাটি কাঁপতে লাগল। শিথিল অঙ্গ একটা আরাম কেদারায় এলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলুম।

শঙ্কর চিঠিখানা প'ড়ে বিশেষ কিছু বললে না। দেখলুম, তার চোখ দুটি ছলছল করচে। শরীরটা অস্বাভাবিক ভাবে দৃঢ় হয়ে গেচে। হয়ত, ও বিশেষ জোর করেই মনের আবেগকে চাপতে চেষ্টা করছিল। আঘাতের প্রথম মুহূর্ত্তটা কেটে গেলে ও শান্ত, নির্ব্বিকারের মত বললে, আজই যাবার ব্যবস্থা কর জিতুদা। তার অস্বাভাবিক, কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির মত আমার বুকে গিয়ে বিঁধল। একটু থেমে ধীরে ধীরে বললে, জীবনের খেয়ালগুলোকে বুঝে ওঠা মানুষের পক্ষে দেখচি দুঃসাধ্য। জানো, কাল থেকে অনেক ভেবে চিন্তে যখন ঠিক করলুম, এবার সাহিত্য-সাধনা থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেব, এতদিন শুধু ভুল পথে ঘুরে মরেচি। একাজ আমার নয়। এবার বেছে নেব অন্য পথ। তখন কার কথা আমার প্রথম মনে পড়ল?—এই সুস্মিতার। ভাবলুম, এবার তার আশ্রমেই নেব আশ্রয়। তার কাজের মধ্যেই দেব নিজেকে বিলিয়ে। কিন্তু কে জানত, আজ সকালেই আসবে এই খবর!

রোগীর কাছে যখন এসে পৌঁছলুম, সে এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত। সমস্ত রাত বার বার রক্তবমনের পর তখন সবে মাত্র সুস্মিতার একটু তন্দ্রা এসেছিল। শঙ্কর ধীরে ধীরে নিঃশব্দপদে গিয়ে রোগীর শিয়রে বসল। তার মুখে চোখে একটা শান্ত, অচঞ্চল ভাব। মনের মধ্যে যেন ওর আর কোন উদ্বেগ নেই। সুস্মিতার শীর্ণ, ফ্যাকাশে মুখের ওপর থেকে রুক্ষ চুলগুলি ও অতি-সন্তর্পণে সরিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সুস্মিতার দৃষ্টি প্রথমেই পড়ল ওর দিকে। একটু চমকে উঠে সুস্মিতা খানিকক্ষণ বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইল, যেন বিশ্বাস করতে পারচে না। তারপর কাঁপা গলায় বললে, তুমি এসেচ? তার গাঢ়, করুণ চোখ দুটি অশ্রুভারে ঝাপসা হয়ে

এসেছিল। শঙ্করের হাতখানা ধীরে ধীরে বুকের ওপর তুলে নিয়ে যেন আরো কিছু বলতে চাইলে কিন্তু আমাদের দেখে চুপ ক'রে গেল।

তারপর চলল মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম। একদিন যার প্রেমকে শঙ্কর হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, আজ তাকে সেবা আর শুশ্রূষা দিয়ে যক্ষ্মার নিদারুণ কবল থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে সুরু হল প্রাণপণ চেষ্টা। সাহিত্য-সাধনা, যশলিপ্সা,—ইহজীবনের সব আকাঙ্ক্ষা ঘুচে গেল। বুদ্ধির সূর্য্যকে ঢাকা দিয়ে ওর মনের মেরুতে নেমে এসেচে আজ কাজল মেঘের মমতা।

দুদিন রোগের অবস্থা খুবই ভাল গেল। মনে আশা হল, হয়ত এ যাত্রায় শেষমুহূর্ত্তির হাত থেকে সুতিলা রক্ষা পেলে। সেদিন সন্ধ্যার সময় একলা বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। সুতিলা অস্ফুটে 'উঃ' ব'লে পাশ ফিরে শুল। আমি বালিশটা মাথার কাছে টেনে দিয়ে বললুম, এখন কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে দিদি?

একটু স্থির থেকে সুতিলা আস্তে আস্তে জবাব দিলে, না দাদা। তারপর একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, জীবনে ওকে সুখী করতে পারলুম না, একথা ভাবলে মরণে আমার সুখ নেই!

এরকম উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। বললুম, জীবনভোর এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালি কেন বোন? কেন জোর ক'রে এসে বললি না, এ যে তোর অধিকার?

—বললেই কি ও শুনত?

—হাঁ বোন, আজ মনে হয়, তুমি জোর ক'রে বললে শঙ্কু না শুনে পারত না।

সুতিলা চোখবুজে শুয়ে রইল। আর কোন জবাব দিলে না। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে, মুখে তার চিন্তার রেখা দেখা দিলে। তারপর চোখ খুলে একটু মলিন হেসে তার দুটি শীর্ণ হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে হয়ত প্রিয়তমের একান্ত সান্নিধ্য সুতিলার অন্তরে জাগিয়ে তুলেছিল কামনা। অদৃষ্টের এর চেয়ে নিদারুণ ব্যঙ্গ আর কি হতে পারে? যার 'পরে অভিমান ক'রে সে নিজের জীবনকে একদিন হেলায় তিলে তিলে নষ্ট করেছিল, সেই প্রিয়তম আজ মৃত্যুর তীরে এসেচে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আজ সেই তিলে-তিলে নষ্ট-করা জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্যে হয়ত সুতিলার চিত্তে ব্যাকুল আগ্রহ জেগে উঠেছিল। কিন্তু ফল কিছুই মিলিল না। নদীতীরের তলা একেবারে ক্ষয়ে এসেছিল, শেষে মুহূর্ত্তে শঙ্করের কোলে মাথা রেখে-সে মৃত্যুর অতল অন্ধকারে একেবারে তলিয়ে গেল।

শোকে যার চোখের জল পড়ে, সে-ই শোকের বেদনা ভুলতে পারে সহজে। সুতিলার মরণের পর শঙ্করের শান্ত, গম্ভীর ভাব দেখে মনে হল, শোকের আঘাত হয়ত ওর মনে বিশেষ দাগ রেখে যায়নি। চোখের জল ওর পড়ল না। কোলকাতায় ফিরে এসে বললে, জিতুদা জমীদারীর কাজ একাই তুমি সব দেখ, এবার থেকে আমায় কিছু ভাগ দিতে হবে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মনে-মনে বললুম, পুরুষের মন এমনিই বুঝিবা পাষাণ! কিন্তু কিছু-দিন পরে বৃন্দাবন যাবার নাম ক'রে যখন ও বেরিয়ে পড়ল, তখন আমার মনে সন্দেহ এল। আমি-ও ওর সঙ্গে যাত্রা করলুম। বৃন্দাবনে এসে কিছুদিন শঙ্কর চারধারে ঘুরে বেড়াল। তারপর হঠাৎ ওর মতলব গেল বদলে, আবার পড়াশোনা আরম্ভ করলে। কিন্তু তাতেও মন বসল না। শেষে বেরিয়ে পড়ল সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবার জন্যে। সে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ওর জীবনের ওপর দিয়ে যেন বহে গেচে এক বিপুল বন্যা। জীবন-মরণ,—ইহকাল পরকাল, সবই যেন তারই সঙ্গে ভেসে গেচে। উদ্দেশ্যবিহীন জীবন যেন ভরপুর হয়ে আছে একমাত্র উদ্দেশ্যে। চোখে ওর ম্লান উদাস দৃষ্টি, মুখে নিদারুণ ব্যথার রেখা। তারই মধ্যে ফুটে উঠেচে একটা আগ্রহের তীক্ষ্ণতা,—একটা প্রশ্নের প্রহেলিকা—কোথায়, কতদূরে?

একদিন ওকে বললুম, শান্তির আশায় এমনিভাবে দিকে-দিকে ঘুরে বেড়ালে কি হবে ভাই? শান্তির উৎস ত' আছে তোমার নিজের মধ্যেই।

ও ম্লান হাসি হেসে বললে, শান্তি আর চাই না জিতুদা। তিলা একদিন আমার কাছে ধরা দিয়েছিল, আমি কিন্তু সে দিন ধরা দিতে পারিনি। আজ আমি যখন ধরা দিলুম, ও আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাল। তবু দেশে দেশে ওর সন্ধানে

আমি ঘুরব। মরণের পর যদি সম্ভব হয়, ওরফিউসের মত আমিও তিলার খোঁজ ক'রে বেড়াব।

পুঁথির মধ্যে যাকে জানতুম গল্পমাত্র ব'লে, তাকে জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে সত্যি ব'লে বিশ্বাস করে—এ কেমনতর মানুষ? এর আজ হল কি? মনে হল, এই অদ্ভুত লোকগুলো জীবনের পথে কোথাও এসে যেন থামতে চায় না। 'কেন এবং কোথায়'—তাদের এ প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই। জীবনে এক জায়গায় এসে পৌঁছান যায়, যেখানে মানুষের বুদ্ধির গণ্ডি দিয়ে এই চিরন্তন প্রশ্নের আর মীমাংসা মেলে না। এ কথা যেন এদের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। তাই আমরা যাকে ভাবি অসম্ভব, এরা তা-ই সম্ভব ব'লে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারে। কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলুম, কিন্তু সুতিলার যদি কোন অস্তিত্বই না থাকে? ওরফিউস জানত যে তার প্রিয়া রয়েচে যমরাজের রাজধানীতে। কিন্তু তুমি ত' সুতিলার কোন সন্ধানই জাননা?

ওর চোখ ছল-ছল করে এল। মৃদুকণ্ঠে বললে, না-না তা কি হয়? কোথাও না কোথাও, কোন না কোন আকারে আছে বই কি ওর অস্তিত্ব। ব্রহ্মাণ্ডে ধ্বংস ত' কিছুরই হতে পারে না।

এই দুরাশার সন্ধানে ও ভারতবর্ষ ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিলে। শ্যাম, জাভা, সুমাত্রা,—শেষে পৌঁছল চীনে। ক্যান্টনসহরে এল ওর জীবনের আরো একটা সন্ধিক্ষণ। এখানে এক বৌদ্ধ সাধুর সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এই সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্য এবং সহজ সারল্য ওকে মুগ্ধ করলে। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনায় মত্ত হয়ে এখানে কিছুদিন বাস করতে লাগল। একদিন এই সন্ন্যাসীই কথায় কথায় বললেন, যাঁর সন্ধান তুমি করচ, তাঁকে ত অনায়াসেই তুমি পেতে পার। লেখনা কেন তোমার আত্মজীবনী। লিখতে লিখতে তোমার কল্পনার রথে স্মৃতির পথ দিয়ে এসে হাজির হবেন তিনি তোমারই একান্ত সান্নিধ্যে।

প্রথম দিন কিন্তু শঙ্কর কিছু বললে না। শেষে দেখা গেল, সত্যিই একদিন কাজে লেগে গেচে। বললে, আত্ম-জীবনী নয়, লোকে যাই বলুক, মনে-প্রাণে আমি সাহিত্যসেবী। তাই, সাহিত্য-সাধনা দিয়েই জীবনের শেষ কামনা পরিস্ফুট ক'রে তুলব। আমার জীবনের ঘটনার 'পরে ভিত্তি ক'রে লিখব এবার শেষ উপন্যাস। এই সাহিত্য-সাধনার মধ্যে দিয়েই জাগিয়ে তুলব সুতিলাকে।

আবার সুরু হল, নির্জ্জন, নিরালা ঘরে বসে প্রাণপন চেষ্টা। দিনের পর দিন সুকঠোর পরিশ্রমে লেখা হল তার শেষ উপন্যাস। জীবনের দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনৈক্য,—জীবনের দ্বন্দ্ব, পরাজয়, অবসাদ তার ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠল। বইখানা শেষ হলে আমরা প্রকাশ করার প্রস্তাব করলুম। কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হল না। বললে, এ ত' লোকের জন্যে লিখিনি। যাকে শোনাবার জন্যে লিখতুম, আজ ছ-মাস তারই একান্ত কাছে থেকে যে আনন্দ, যে অনুভূতি আমি পেয়েচি, সে ত' অপরের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

শেষে গোপনে বইখানার একটা অনুলিপি ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলুম। বইখানার লেখার পর ওর মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল। এই ছ'মাসের প্রসন্নতা যেন ক্রমশঃই নিবে আসছিল। ওর আচার ব্যবহারে আবার অধৈর্য্য ও অস্বস্তির ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। মনে হল ওর প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে গেচে। ও যেন একটা শুক্‌নো ফোয়ারা। এমনিভাবে আরো মাসচারেক কেটে গেল। শেষে এক দিন এল দেশে ফিরে যাবার প্রস্তাব। শঙ্করের অবসন্ন, দুর্ব্বল দেহ দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়ছিল। একদিন সে হেসে বললে, দিনত' ঘনিয়ে এসেচে। মৃত্যুর আগে একবার শেষবারের মত দার্জ্জিলিং-এ নিয়ে চল।

মনে মনে এই শুভ প্রস্তাবেরই অপেক্ষা করছিলুম। অবিলম্বে দেশের দিকে যাত্রা করা গেল। ও যাই বলুক, মনে মনে আশা হল, দেশের পরিচিত জলহাওয়ায় আবার ও সুস্থ হ'য়ে উঠবে। অন্ততঃ, সুতিলার আরব্ধ কাজের আবহাওয়ায় এসে সুতিলার আত্মার সান্নিধ্য ফিরে পাবে। তাতে-ও কি ওর চিত্তে শান্তি ফিরে আসবে না?—প্রাণশক্তির উৎসের মধ্যে সজীবতা জেগে উঠবে না?

কোলকাতায় আমাদের জাহাজ যখন পৌঁছল, তখন সবেমাত্র সকাল হয়েচে। দেখা গেল সেই প্রত্যুষেই জেটি থেকে আরম্ভ ক'রে সামনের পথঘাট চারিদিকে অসংখ্য মানুষ। মনে হল, জাতির হয়ত কোন গণ্যমান্য অতিথি আজ কোলকাতা ছেড়ে যাবেন। কিছুক্ষণ পরে সুরেশবাবুর সঙ্গে একদল ভদ্রলোক এসে আমাকে পাকড়াও করলেন। তাঁদের মুখে সব কথা শুনলুম। শঙ্কর নিরালা কেবিনে ব'সে ব্যাকুল দৃষ্টিতে মাতৃভূমির দিকে চেয়েছিল। গিয়ে বললুম, শঙ্কর, আজ তোমার সাহিত্যসাধনা সফল হয়েচে। এ জনারণ্য তারই পরিচয়। শঙ্কর আমার মুখের দিকে একবার বিরক্তভরে চাইলে। বোধ হল, ও সবই বুঝতে পেরেচে। তারপর শূন্যদৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে রইল,—স্থির, শান্ত অপলক সে দৃষ্টি! মনে হল, তার চোখের সামনে অশরীরী সুতিলা এসে হাজির হয়েচে!"

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুনী

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

পড়েছে আমারে মনে ?
এতদিন পরে দেখা দিতে সখা
আসিলে কি ফাল্গুনে।
রবির কিরণে আকাশ ঝলিছে,
বন মর্ম্মরি বাতাস চলিছে,
মুখর হয়েচে মাধবীর লতা
মধুপের গুঞ্জনে।
আজি পড়েছে আমারে মনে ?

বৈশাখে যবে জ্বলিত অনল
দহিয়া গিয়াছে অঙ্গ।
কোথা ছিলে সখা পাসরি আমারে
কেন দিলেনাক সঙ্গ।
দাহনে মরম ছিল ভয়াকুল,
পিপাসায় প্রাণ হয়েছে আকুল,
নয়ন চেয়েছে তব আঁখি-পাত
মুখপরে ক্ষণে ক্ষণে।
তখন পড়েনি মনে ॥

আকাশে ঘনায়ে বরষার মেঘ
এসেছে অসিতবরণী।
চেয়ে অপলকে দামিনী ঝলকে
শিহরি উঠেছে ধরণী।
গুমরি উঠেছে মেঘের মাদলে
গভীর নিশীথে সে ভরা বাদলে
অস্ফুট নাম তোমারই বন্ধু
আমার হৃদয় কোণে।
তখনও পড়ে নি মনে।

উত্তর হতে বহিয়াছে বায়ু
কাঁপন লেগেছে গায়।
তোমারে স্মরিয়া বার বার মন
করিয়াছে হায় হায়।
হিমের মরণ আঁচলের তলে,
রসময়ী ধরা পড়িয়াছে ঢলে,
মরণ-লগ্নে পাতি তব তরে
হৃদি শতদলাসনে।
তখনও পড়ে নি মনে।

আমার খেলা ত শেষ হয়ে গেল
ঘুরেছে কালের চাকা।
চেয়েছিনু যবে এলে না বন্ধু
দিলে না, দিলে না দেখা।
এখন বিদায় প্রহর বেলায়,
অপরিচিতের সাজান মেলায়,
এলে হে নিঠুর কাঁদাতে আমারে,
এলে আজি এতদিনে।
এখন পড়িল মনে ?

পুস্তক পরিচয়

মেজদার ডায়েরীঃ—শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, দাম দেড় টাকা।

বাঙলা সাহিত্যের কোনো স্বনামখ্যাত সাহিত্যিকের একখানি বিশেষ বইয়ের কাটতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শুনেছিলাম যে বইখানি ভালো তাতে সন্দেহ নেই, তবে বাজারে বইখানির কাটতি নেই বললেই চলে; তার তুলনায় যে-কোনো অতি মামুলি প্রেমের গল্পের বইয়ের কাটতি ঢের বেশী। এই কারণেই বাঙলা দেশে গল্পের বইয়ের প্রকাশক জোটে, কিন্তু কোনো রকম আলোচনা মূলক বই চলে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থকারকে নিজের পয়সায় ছাপিয়ে কোনো নামী প্রকাশকের নাম সংযুক্ত করে দিতে হয়। এই যে পাঠক শ্রেণীর রুচির অবস্থা এটা কোনো দেশেরই সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক হ'তে পারে না।

এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি রস-সাহিত্যকে সাহিত্যের নিম্নস্তরে নামিয়ে, প্রত্নতত্ত্ব এবং গবেষণাকে তার জায়গায় বসাবার হাস্যকর প্রস্তাব করচি। এ কথা সবাই জানেন যে রস-সাহিত্যই মানুষের মনকে সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেয়। রস-সাহিত্য বলতে কাব্য গল্প উপন্যাস ছোট গল্প, নাটক ইত্যাদিই বোঝা যায়। কিন্তু এ কথাও কি অস্বীকার করা চলে যে ভাবুকতা, চিন্তার গভীরতা, জীবনকে নবনব ভাবে দেখা এগুলোও সাহিত্যের মূল্য বাড়াতে কম সাহায্য করে না? গল্পসাহিত্যে, বিশেষতঃ উপন্যাসে, কাব্যে তাই রচয়িতার ভাব সম্পদ্ যত বেশী হয়, জীবন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি যত গভীর হয়, জ্ঞানের পরিধি যত বিস্তীর্ণ হয় উপন্যাস এবং কাব্যের মর্য্যাদাও তাতে অনেকখানিই বৃদ্ধি পায়।

জীবনকে আমরা যত বৃহৎ ক'রে পাই ততই তার অর্থও বিশাল এবং গভীর হয়ে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়। তাই মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলো চিরন্তন এবং পুরাতন হলেও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবের সমবায়ে, বহুতর চিন্তা এবং নবতর দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিচিত্রতার সঙ্গে চিরবিচিত্র হয়ে প্রকাশ পাচ্চে। কবি ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে তাই আমরা সেই একই হৃদয়-বৃত্তির নবনব আস্বাদন পাই। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ওই স্বাদ-বৈচিত্র্যের মূলে আছে নবনব দৃষ্টির বৈচিত্র্য, জীবন-দর্শনের নূতন নূতন প্রকাশ।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে সাহিত্যের কাজ কেবল হৃদয়ের অনুভব নয়, মনীষা এবং ভাবুকতার সঙ্গেও সাহিত্যের নিবিড় যোগ রয়েচে। তারপর, সাহিত্যের কাজ যে শুধু রসের দ্বারা চিত্তকে পরিপ্লুত করা তাই নয়, সাহিত্যের কাজ মানুষের চিন্তাকে জাগ্রত করাও বটে। যে-জাতি যত বলিষ্ঠ যত শক্তিশালী, তার চিন্তা করবার শক্তিও তত প্রখর এবং বিচিত্র। যে-জাতির মধ্যে চিন্তার দৌর্ব্বল্য ভাবের দৈন্য ভাবুকতার স্বল্পতা, মানসিক আলস্য এবং অবসাদই যে সে জাতিকে আক্রমণ করেচে তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

বাংলাসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা এদিক দিয়ে দেখতে গেলে খুব যে আশাজনক তা মনে হয় না। বাঙালী পাঠক অত্যন্ত বেশী মানসিক আলস্য এবং অবসাদগ্রস্ত বলে মনে হয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে যেমন চিন্তাশীল লেখকের অভাব, তেমনি পাঠকেরও চিন্তাশীলতার প্রতি ঔদাসীন্য অগাধ! এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চিন্তামূলক লেখার মূল্য এবং সমাদর নেই বললেই চলে। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকও তাই অতি তুচ্ছ গল্পেরও যে-মূল্য দেন, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকে তার ভগ্নাংশও দিতে প্রস্তুত নন। যাঁরা তৎসত্ত্বেও চিন্তা করেন এবং সেই চিন্তা অন্যের সমুখে উপস্থিত করতে চান তাঁদের জন্য কোনো আগ্রহ নেই: তাঁদের লেখা কাগজে ছাপা হলেই যথেষ্ট, সে জন্য লেখককে কৃতজ্ঞ হতে

হয়। আর যদি লেখকের বই ছাপানোর দুর্বুদ্ধি ঘটে তা হলে প্রকাশক যদি তাঁর নামটি ধার দেন তা হ'লেই লেখক ধন্য।

বঙ্কিম-যুগে চিন্তাশীল লেখকের এমন অনাদর এবং অসম্মান ছিল না। বান্ধব বঙ্গদর্শনের পাতা উল্টিয়ে গেলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকালকার মাসিক পত্রকেও চক্ষু লজ্জার খাতিরে প্রবন্ধ ইত্যাদি দিতে হয়, কিন্তু সেটা একটা যেন জীর্ণ কৌলিক রীতিরক্ষা করা, যার মূল্য এবং মর্য্যাদা কিছুই নেই। এই কারণেই, অর্থাৎ সত্যকার আদরসম্মান নেই বলেই, আলোচনা সাহিত্যের আজ অত্যন্ত অবনতি। গভীরভাবে ভাবতে, চিন্তা করতে, সমালোচনা করতে, আত্মপরীক্ষা করতে আমরা অত্যন্ত বিমুখ। অথচ এ অবস্থা কাম্য নয়, মানসিক স্বাস্থ্যেরও অনুকূল নয়। যে ছেলে কেবলি পিঠে সন্দেশ খাবার জন্য লালায়িত, ডাল ভাতের দিকে যার রুচি নেই, যে দুধে প্রচুর চিনি দিয়ে দুধের মর্য্যাদা দিতে চায়, তার সুস্থতা সম্বন্ধে অচিরেই সন্দেহ দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিণত হবে।

জাতির উন্নতি, সাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করে কৃষ্টির 'culture'এর উপর। যে-জাতির মনের ওপর চিন্তার কর্ষণ চলে না, সে-জাতির মন অনুর্ব্বর জমির মতই বন্ধ্যা হয়ে থাকে। এই কারণেই জাতিকে ভাবতে শেখানো, অথবা জাতির পক্ষে ভাবতে শেখাটা অত্যন্ত আবশ্যক। বাংলা দেশের বর্ত্তমান সাহিত্য কি বাঙালী যুবকে কোনো গভীরভাবে আদর্শে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবার সাহায্য করচে ?

এর উত্তর দিতে কণ্ঠ দ্বিধা ভরে জড়তাগ্রস্ত হয়ে আসে! তবু একেবারে নিরাশ হ'তে পারিনে যখন এর মাঝেও দু একজন ভাবুক এবং চিন্তাশীল লেখকের দেখা পাই। বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা প্রবীণ চিন্তাশীল তাঁদের কথা সবাই জানেন, যদিচ তাঁদেরও যে কতখানি সমাদর আমরা করি তা অন্তর্যামী আর তাঁদের লেখার প্রকাশকই জানেন!

হালে একখানি বই হাতে পড়ায়, ওপরের কথাগুলো মনকে আবার নাড়া দিয়ে গেল। গ্রন্থকার আধুনিক হ'লেও বাংলার তথা-কথিত আধুনিক সাহিত্যিকদের দল থেকে নিজকে বিচ্ছিন্ন করেচেন স্পষ্ট কণ্ঠে, দ্বিধাহীন জোরের সঙ্গে। তার কারণ তিনি আধুনিকতা গর্ব্বীদের মাঝে দেখেচেন কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতা, সাহসের অভাব, সত্য নিষ্ঠার অভাব। তাঁর এই উক্তি যে কত সত্য তা তথ্যাভিজ্ঞ পাঠকদের অজ্ঞাত নেই। যা হোক গলিত আধুনিকতার ঘৃণ্য রূপকে বাদ দিলেও, আধুনিকতা ব'লে একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর (এবং জীবনযাপন ভঙ্গীরও) আবির্ভাব হয়েচে। আধুনিকতার সেই আদর্শ রূপটি প্রতিযুগের অগ্রগামী মনেরই আদরের এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তু। 'মেজদার ডায়েরী'তে আমরা সেই আদর্শবাদী একটি সুস্থ মনের আত্মপ্রকাশ পেয়ে তাকে সোল্লাসে অভিবাদন জানাতে অগ্রসর হয়েচি। আধুনিকতার আদর্শরূপটি কি তা নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়: শুধু বলতে চাই সেই আদর্শটি কি রকম আকাঙ্ক্ষিত এবং সুন্দর যদি তা জানতে ইচ্ছা হয়, তা হলে বন্ধু পাঠককে একবার 'মেজদার ডায়েরী' পড়তে অনুরোধ করি।

যদিচ এ বইখানিকে ভাবুকতার কাব্য বলতে আমার সঙ্কোচ নেই, তবু এ কথাও স্পষ্ট করেই জানানো দরকার যে এ নানা বিষয় নিয়ে—জীবন, সমাজ, আর্ট—নিয়ে একখানি চমৎকার অলোচনা। ডায়েরীর ছলে প্রবোধবাবু সুন্দর সরস ভাষায়, এবং একটি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তাঁর অন্তরের কতকগুলো কথাকে আমাদের নিকট উপস্থিত করেচেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গীর মাঝে জোরের অভাব নেই কোথাও, যা বলেচেন তা এত স্পষ্ট করে বলেচেন যে হয়ত তাঁকে দলচ্যুত হ'তে হবে, কিন্তু তাঁর সেই বলাটি হয়েচে এমনি আন্তরিক এবং দরদ-ভরা যে, কোনো মানুষই তাঁকে শত্রু মনে ক'রে সুখী হ'তে পারবে না। তাঁর কথার ভেতর বর্ত্তমানকালের ভুল ত্রুটি দুর্ব্বলতার প্রতি এমন একটি বেদনা প্রকাশ পেয়েচে যাকে কোনো সত্যনিষ্ঠ মানুষই অসম্মান করতে পারে না।

মেজদা যে কবি তার প্রমাণ আছে বইয়ের সর্ব্বত্র। তবু আলোচনায় পাছে আমাদের চিন্তাবিমুখ, স্বল্প-ভাবনা-ক্লান্ত মন শ্রান্ত হয়ে পড়ে সেই ভেবে ডায়েরীর মাঝে মাঝে কয়েকটি কথিকা গেঁথে দিয়েচেন। আমার কিন্তু মনে হয় মেজদার আরো খাতা আছে যাতে আরো অনেক এমনি ধরণের কথিকা পাওয়া যাবে। সেইগুলোর সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র

ভাবে দিলেই সুবিচার হ'ত। যা হোক মেজদার ডায়েরীতেও যে-তু একখানি পাওয়া গেল সেও আনন্দের কথা।

আমি কিন্তু বইখানির আলোচনাকেই প্রধান মনে করি আর তিনি বাঙলার পাঠকসমাজের সমুখে এমন সুন্দর ক'রে কথা বলতে অগ্রসর হয়েচেন তাতেও আনন্দিত হয়েচি। যদি বাঙলাদেশের গ্রন্থকারগুলি এবং বাংলার পাঠকবর্গ এই বইখানির সমুচিত সমাদর না করেন তা হ'লে তাতে ক'রে গ্রন্থকারের অগৌরব কিছুই হবে না; বঙ্গসরস্বতী শুধু বাঙালীর ম্রিয়মাণ মনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

বেণুবন—শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী প্রণীত। আর্য্য-সাহিত্য-ভবন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত বেনোয়ারী বাবু একজন প্রবীণ কবি। তিনি বহুকাল যাবৎ বাংলাসাহিত্যের সেবা করছেন। বঙ্কিম চন্দ্রের যুগেও তিনি "প্রচারের গোপন লেখক" ছিলেন। তাঁর রচিত "পোলাও" এবং "খিচুড়ি" অনেকের কাছেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। "বেণুবন" তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। "পোলাও" এবং "খিচুড়ি" যাদের ভালো লেগেছিল "বেণুবন"ও তাদের তৃপ্তি দেবে আশা করা যায়।

এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন সুবিখ্যাত দার্শনিক ও কাব্যরসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়। এই ভূমিকাটিতে তিনি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দররূপে কাব্য-রসতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। তৎপরে তিনি এই পুস্তক-খানি সম্বন্ধে লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী সুধীসমাজে সুপরিচিত, তাঁহাকে পরিচিত করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। তাঁহার জীবনে যে মঞ্জরীটি ফুটেছে, তারি কি গন্ধ, সেটি যুঁই, কি বেলা, কি চামেলী, কি একটি নূতন ফুল, সে বিচার আগে থেকে ক'রে দিয়ে কবির কাব্যকে খাট করবার গুরুপাপ আমি স্কন্ধে নিতে চাই না। সেটিতে দরদী পাঠকের চিত্তে যে গন্ধটুকু ছড়িয়ে পড়্‌বে, সেইখানেই এই কাব্যের যথার্থ পরিচয়।" এই উক্তির পর এই কাব্যের সমালোচনা করার স্পর্দ্ধা আমাদেরও নেই। সুতরাং বইখানির একটু পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হব।

বইখানি প্রকাশের ভার নিয়েছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকার পরেই প্রকাশকের নিবেদন। মূল গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত—মঞ্জরী, পুরাতনী ও সাহিত্যিকা। "মঞ্জরী"তে নানা বিষয়ে রচিত কতগুলি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। কবিতাগুলি ভাষা, ভাব, ছন্দ এবং বিশেষভাবে অকৃত্রিম সরলতায় বিগত শতাব্দীর কাব্য ও কাব্যরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "পুরাতনী"-তে কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তৎকালীন মনীষীদের উপর রচিত কয়েকটি কবিতা আছে। তাঁদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাসও এই কবিতাগুলির মধ্যে আছে। "সাহিত্যিকা"-তে তিনি তৎকালীন ও আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গ, কৌতুক ও সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকেই হয়তো এক মত হ'তে পারবেন না। কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁর ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ভঙ্গীটি উপভোগ্য হয়েছে। আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে তাঁর অভিমত কি, তা তাঁর একটি উক্তি থেকেই বোঝা যাবে। সেটি হচ্ছে এই—

দীঘল্ শব্দ আর ছন্দের ঝঙ্কার,
তাই আজ হইয়াছে কবিতার প্রাণ।

* * *

কাব্যের গতিটি ধরি পিছু পিছু তার
রস যদি নাহি ছুটে রসিকার বেশে,
তবে সে কাব্যের তনু কঙ্কালের স্তূপ।

এই উক্তি থেকেই তাঁর কাব্যের আদর্শটি কি, তারও একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

প্রবোধচন্দ্র সেন

বিরহ-শতক—শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল্ প্রণীত। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার; ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় অল্পদিনের মধ্যেই ছোট গল্প ও কবিতা লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে বেশ নাম করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মাসিক বসুমতীতে যে গল্পগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা ভাষার সম্পদে ও গল্পের সুকৌশল বিনাশ-ভঙ্গীতে অনবদ্য রূপসমলঙ্কৃত হইয়াছিল। এখানি তাঁহার কবিতার বই। ইহাতে ১০০টি ছোট ছোট stanzaয় কবি তাঁহার পিপাসিত বিরহবিধুর মনের বিবিধ ও বিচিত্র প্রেমের খেলার আল্পনা আঁকিয়াছেন। প্রিয়াকে একান্ত নিকটে পাইয়াও কবি কিসের যেন এক ব্যবধান ও শূন্যতা নিয়ত অনুভব করিতেছেন অথচ বিশ্বের চারিদিকেই প্রেমের রাসলীলা চলিতেছে;—এই দ্বিবিধ কল্পনার মাধুরী সমন্বয়ে তাঁহার হৃদয়ে যে বিরহ-শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই ছবি তিনি আঁকিয়াছেন। এই চিত্রগুলির পরতে পরতে সূক্ষ্ম অনুভব শক্তির পরিচয় পরিস্ফুট। কারণ কবির ক্ষুধা শুধু দেহের নহে; ইহা ইন্দ্রিয়াতীত তৃষা। লেখকের ভাব ও কল্পনা বেশ অবাধ গতিই লাভ করিয়াছে; কিন্তু কবিতার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে সুরসামঞ্জস্যহীন ছন্দগুলি। এই এক দোষেই কবিতার মাধুর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে, নচেৎ ভাবের মৌলিকতায়, কল্পনার বিচিত্র লীলাসম্ভারে ও প্রেমসমাহিত মনোবৃত্তির স্ফুরণ কৌশলে কবিতাগুলি পাঠকের মনে নিশ্চয় প্রচুর আনন্দ দান করিবে। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মেঘদূতের অনেক স্থল মনে পড়িয়া যায়।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাশ

পথধূলি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি-এ, ৯৫-৩সি হাজরা রোড, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'পথধূলি'র গীতি কবিতাগুলিতে ভাবের ঘনঘটা ও অলঙ্কারের অতি-প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া বিশেষ ভাল লাগিল। তবে ইহার কোনও কোনও কবিতায় ভাষার দৈন্য ও ভাবের বৈচিত্র্যহীনতা এবং পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হইল। প্রতি চরণে একই কথা বারবার প্রতিধ্বনি প্রীতিদায়ক নহে। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা মনোজ্ঞ ও কবিজনোচিত।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

স্মৃতিরেখা—শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীগোবিন্দ প্রেস, ১১ ভীম ঘোষ বাই লেন কলিকাতা। ২৪৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—দেড় টাকা।

এই উপন্যাসখানি পাঠ ক'রে আমরা মোটের উপর আনন্দ লাভ করেছি। বইখানি সম্ভবত লেখকের প্রথম রচনা—অন্ততঃ প্রথম যুগের রচনা—কারণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী সাধনার ফলে রচনাভঙ্গীর মধ্যে যে অবিচল প্রসাদগুণ প্রকাশ পায় এ বইখানির স্থানে স্থানে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা বললেও অন্যায় হয় না যে, বইখানির মধ্যে লেখকের উপন্যাস লেখবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্লট অতি-মাত্রায় জটিল এবং চমকপ্রদ হওয়া উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচনার পক্ষে বিঘ্নদায়ক। আলোচ্য উপন্যাসখানির প্লট সম্বন্ধে সে অভিযোগ একটু করা যেতে পারে। একথা সত্য যে, গল্পের গরু গাছে চড়ে,—কিন্তু সে গাছও গল্পেরই গাছ হওয়া চাই। আরব্যোপন্যাসের গরু এবং স্মৃতিরেখার গরু এক জাতীয় গরু হ'লে চলবে না। তা'তে অসঙ্গতি দোষ ঘটবে। বইখানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং মনোরম, এবং কথোপকথনের অংশগুলি চিত্তাকর্ষক এবং কৌতুক-রসাত্মক। ছাপা বাঁধাই ভাল।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

খিচুড়ী

শ্রীরামেন্দু দত্ত

শ্রাবণের ধারে ঝরে বারি-ধারা
মেঘ্‌লা আকাশ মাঝে
অজানা সুখের শিহরণ তুলে
গুরু গুরু ধ্বনি বাজে!

* * *

বিছানায় ব'সে চাদর জড়ায়ে
পা দু'টি ছড়ায়ে দিয়ে
সবে ঘুম ভেঙে বসেছি, কাগজ,
চায়ের পেয়ালা, নিয়ে!
সুমুখে পড়িয়া রূপসীর মত
জরীতে জড়ানো নল—
গড়্‌গড়া হ'তে গয়ার তামাক
গান গাহে অবিরল!
মৌতাত জ'মে আসিতেছে ঐ
বাদল মেঘেরি মত—
এ হেন সময় গলায় চা লেগে
ক'রে দিল বিব্রত!

* * * *

বধূ ছিল মোর সমুখে দাঁড়ায়ে—
করিয়া উঠিল 'আহা'!
কোলের ছেলে যে মাটিতে গড়ালো
দেখে দেখিল না তাহা—
আমি বলিলাম, "শোনো লো প্রেয়সী
বিষম লেগেছে যবে,
মোর নাম কেহ করিতেছে আজ
হয় ত এমনি হবে,
তা হ'লে ত আর বিলম্ব নয়,
কাগজ কলম এনে
কবিতার ছক্ কাটিয়া তাহারে
বাহির করিব টেনে।"
বধূ বলিলেন, "তোমারো যেমন,
কে আবার নাম নেবে?
হয় ত গোয়ালা, পাওনাটা যা'র
আজ ব'লেছিলে দেবে।"
"হয় ত হবেও" সুধু এই ব'লে
চুপ ক'রে থেকে থেকে
লুকায়ে এলাম বাহিরের ঘরে
তামাক, পেয়ালা, রেখে।
প্রেয়সী আমার নবাগতা কি না,
আমার কথায় তাই
ঈষৎ চ্যাপ্টা নাকটিরে তাঁর
কিছু সিঁট্‌কানো চাই।
'খ্যাঁদা' বলি ব'লে মোর প্রতি তিনি
সদয় ছিলেন অতি—
সদয় যেমতি সম্পাদকেরা
নবীন কবির প্রতি!

* * * *

তার পর হায় একি অঘটন,
স্মৃতি আলোড়িয়া দেখি
এমনি বাদলে যে গিয়েছে চ'লে
তারে মনে পড়ে, এ কি!

বালিকার বেশে হেসে হেসে হেসে
কিশোরে করিল জয়,
আজি সেই প্রিয়া হৃদয় জুড়িয়া
এসেছে ভুবন-ময় !
সে ঐ এসেছে তরু-পল্লবে,
সবুজ তৃণের দলে,
টুপ্ টুপ্ টুপ্ তারি আঁখি-নীর
জলের ফোঁটায় গলে !
ভিজে বাতাসের হু-হু নিশ্বাসে
বুক ভাঙা তার শ্বাস
এলো-মেলো কালো বরষার মেঘ
এনে দিলো এক রাশ !
সে মেঘে আঁধার বাহির-আকাশ,
হৃদয়-আকাশো ভরা—
সে মেঘে বিজলী-বেদন চমকে,
কাঁদিছে বসুন্ধরা !
সেই সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী
কখন গোষ্ঠে এসে
এই সাধারণ রাখাল-বালকে
গিয়েছিল ভালোবেসে !
জটিলা কুটিলা, সে ত ছিল ভালো,
এ কলিকালের গুণে
সে রাধা-রাখালে না হোলো মিলন,
তোমরা রাখিয়ো শুনে ॥
আর শুনে রেখো, আয়ান ঘোষেরা
চালাক হয়েছে অতি—
শ্যামা-রূপে শ্যামে দেখিতে পায় না
রাধাও হয় না সতী !
নিশ্চয় আজ এই বরষায়
আন্‌মনে জানালায়—
কলির রাধিকা এ শ্যাম-রায়ের
নাম করিয়াছে হায় !
তাই লাগিয়াছে 'বিষম' আমার
চা-ও পড়িয়াছে ভূমে
তপ্ত অশ্রু তেমনি তাহারো
শীতল কপোল চুমে !

* * * *

এইটুকু লেখা করিয়াছি শেষ,
ঘাড়ের উপরে দেখি
দু'টি জ্বলন্ত আঁখি জ্বলিতেছে,
প্রিয়া আসিয়াছে, একি !
আসিয়াছে, আর পড়িয়াছে সব !
জানিতে পারিনি হায়—
এখন কি ক'রে এ বিপদ আর
বলো সাম্‌লানো যায় !
বাদলের দিনে কোথা ভেবেছিনু
খিচুড়ী খাইব সুখে
আচ্ছা খিচুড়ী পাকায়েছি আমি—
দিতে পারিলে ত মুখে ?

রামেন্দু দত্ত

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতীয় নৌবহর সৃষ্টির চেষ্টা

আইন-পরিষদের আগামী সেপ্টেম্বর অধিবেশনে অথবা নভেম্বরের প্রত্যাশিত বিশেষ অধিবেশনে, অবস্থা অনুকূল বুঝিলে, ভারত সরকার, ভারতীয় নৌবহর সৃষ্টির জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিষয়ে একটি সরকারি পাণ্ডুলিপি আইন-পরিষদে উত্থাপিত হয়, কিন্তু, কর্ত্তৃত্বের কোনও ব্যবস্থা আইন পরিষদের হাতে না থাকায় ইহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে, ইহার সেই সকল ত্রুটি সংশোধিত করিয়া, যাহাতে জনমতের সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ আকারে ইহাকে উত্থাপিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রত্যেক স্বাধীন দেশের রাজ-সরকারেরই আছে। ভারতবর্ষ যদি কোনও দিন সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়, তাহা হইলে এই দায়িত্ব আমাদিগকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও যদি ভারতবর্ষ স্বরাজ পায়, তাহা হইলেও এই দায়িত্ব অনেকটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের উপর পড়িবে। বিপদের সময় যেমন ব্রিটীশ সরকারের নিকট হইতে আমরা সাহায্য পাইতে পারিব, তেমনই সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের বিপদের সময় আমাদিগকেও সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অন্য কোনও দেশের সহিত শত্রুতা বা যুদ্ধ, শুধুমাত্র আমাদের কার্য্য অথবা ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না, অথচ তাহার ফলভোগ সম্পূর্ণরূপেই করিতে হইবে। সাম্রাজ্যের দুর্ব্বল অংশকে আক্রমণ করিবার লোভ সব সময়েই শত্রুপক্ষের থাকিবে। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের আক্রমণযোগ্য সীমান্তরেখা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। কাজেই আমাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা যদি পূর্ণরূপে না থাকে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে শত্রুকবলিত হইতে হইবে।

আমাদের স্থলসৈন্যের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত (সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে) আছে। ইহাকে সম্ভবমত দ্রুতগতিতে সৈন্যে ও সেনাপত্যে ভারতীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যোগ্যতায় ও আধুনিক সমরশিক্ষা ও সজ্জায় যাহাতে ইহারা পৃথিবীর সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী দেশসমূহের সমকক্ষ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আমাদের স্বরাজ লাভের পথে যে-সকল সমস্যা বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা ও এ-বিষয়ে ভারতবাসীদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়, তাহার মধ্যে অন্যতম।

বর্ত্তমানে আমরা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের নৌবহর ও বায়ু বহরের আশ্রয়ে আছি। ভারতবর্ষের ন্যায় দীর্ঘ উপকূল-রেখাবিশিষ্ট দেশের পক্ষে নৌবহরের এবং সাধারণভাবে সকল দেশের পক্ষেই সুসজ্জিত ও শক্তিশালী আকাশবাহিনীর আবশ্যকতা অপরিহার্য্য।

ভারতবর্ষে নৌবহর সৃষ্টির চেষ্টা এবং ভারতীয়দের নৌযুদ্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইহার পূর্ব্বেই আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। এখনও যাহাতে আবশ্যকানুযায়ী ও সম্ভবানুযায়ী দ্রুতগতিতে এই কার্য্য অগ্রসর হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় কাল-বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

আমাদের জাতীয় জীবনে নৌবাহিনী ও আকাশবাহিনী সৃষ্টির পরোক্ষ ফল

শিখ, গুর্খা, পাঠান বা রাজপুত প্রভৃতি যে-সকল জাতিকে সামরিক বলা হয়, নৌযুদ্ধে তাহাদের কোনও

প্রকার কৃতিত্ব অভিজ্ঞতা বা পৈতৃক সংস্কার নাই। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী, নদীবহুল স্থানের অধিবাসীদিগেরই নৌযুদ্ধে দক্ষ ও সাহসী হইবার সম্ভাবনা অধিক। অতীত ইতিহাসেও ইঁহাদের এই প্রকার কৃতিত্বের প্রমাণ আছে। ইঁহারা, বর্ত্তমানে সামরিক বলিয়া পরিচিত জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত নহেন। দেশ-রক্ষার আংশিক ভার ইঁহাদের উপর পড়িলে, এবং নিজ ক্ষেত্রে অন্যদের অপেক্ষা অধিকতর পটুত্ব দেখাইতে পারিলে, ইঁহাদের বর্ত্তমান লজ্জা এবং কাপুরুষতার গ্লানি ঘুচিবে।

জাহাজ-নির্ম্মাণ এ-দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিয়া তাহাদের দ্বারা সম্ভবমত এ দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করিলে এবং এদেশীয়দিগকে উচ্চ বেতনের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা ও সুযোগ রাখিলে, অনেক লোকের জীবিকার সংস্থান হইবে ও গুণী ও যোগ্য লোকেরা এদিকে আকৃষ্ট হইবে।

আকাশবাহিনী সম্বন্ধেও এই সকল কথা প্রযোজ্য হইতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধে আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণের জন্য ইহার ব্যবহার অত্যাবশ্যক ও বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার ব্যবহার ভারতবর্ষে এবং কতকপরিমাণে সমগ্র জগতে সম্পূর্ণ নূতন। ইহার সহিতও প্রাচীন সমরপ্রথার কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া আকাশবাহিনী সম্পর্কে কোনও বিশেষ জাতির বা প্রদেশের লোকের কোনও পৈতৃক দাবী নাই। এ পর্য্যন্ত সাধারণ বায়ুপোত চালনায় যে সকল ভারতবাসী দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বেশীর ভাগ লোক সামরিক জাতির লোক নহেন।

দাক্ষিণাত্য-বণিক-সম্মিলনের সভাপতিরূপে ডাঃ মুঞ্জে, দেশরক্ষায় ভারতীয় যুবকদের বায়ুপোত পরিচালনা শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলিয়াছেন।

বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে পারদর্শিতায় যে অন্য কাহারও অপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এখানে বায়ুপোত-চালন-বিদ্যা উৎকর্ষে অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই, এখানে লব্ধ প্রশংসার প্রকৃত মূল্য অধিক না থাকিতে পারে। কাজেই, বিদেশে এ বিষয়ে একজন বাঙ্গালীর কৃতিত্বের সংবাদে সকলেই আশান্বিত হইবেন।

হিন্দুস্থান ছাত্রসমিতির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অধ্যাপক এস, সি, সেন, এম-এস-সি, এ-এফ-আর, এসি-এস (লণ্ডন), মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক উচ্চবিদ্যার চর্চ্চা ব্যতীত, বার্লিন ও মিউনিকের জার্ম্মনি-এয়ার-সার্ভিসের কর্ম্মশালা ও বায়ুপোত বন্দরে দেড়বৎসর যাবৎ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করিয়াছেন,—এই সুযোগ এ পর্য্যন্ত অন্য কোন ভারতবাসী পান নাই। তিনি বর্ত্তমানে লণ্ডনের ক্রয়ডন এয়ার-ড্রোমে শিক্ষালাভের জন্য গিয়াছেন, এবং ইম্পিরিয়াল এয়ার-ওয়েজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আবশ্যকীয় সুবিধা পাইয়াছেন।

কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে

ভারতবর্ষ সকল দেশের সহিত মৈত্রী চাহে। কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিতে, কাহাকেও অধীন বা পদানত রাখিবার কার্য্যে সাহায্য করিতে, কাহারও কোনও প্রকার অধিকার খর্ব্ব করিতে বা অন্য প্রকারে শক্তির অপব্যবহার করিতে, ভারতবর্ষ সামরিক সজ্জা রাখিতে চাহে না। আত্মরক্ষার জন্য যাহাতে পরমুখাপেক্ষী হইতে না হয়, অথবা অক্ষমতার জন্য কোনও প্রকার দুঃখভোগ করিতে না হয়, এইজন্য আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত ন্যূনতম আয়োজন মাত্র রাখিতে চায়।

অমাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য ও জাতিগঠনমূলক অর্থসাপেক্ষ অন্যান্য এত কাজ রহিয়াছে যে ইচ্ছা করিলেই ভারতবর্ষ প্রয়োজনাতিরিক্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম করিতে পারিত না।

কিন্তু, অতীতে দেখা গিয়াছে, ভারতের অমত সত্ত্বেও ভারতের বাহিরে ভারতীয় সেনার ব্যবহার হইয়াছে। ১৮৮২ সালে মিশরে, বক্সার বিদ্রোহের সময় এবং পরে ১৯২৭ সালে চীনে, দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে, ১৯১৪ সালের পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে এবং আরও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইহার অনেক ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের তীব্র আপত্তি ছিল, কারণ ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোনও কোনও জাতির

বিরুদ্ধে আমাদের সেনাদলকে লড়িতে হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাজেই, প্রস্তাবিত নৌবিভাগের কর্তৃত্ব যাহাতে আইন সভার হাতে থাকে এবং সেনাবিভাগের কর্তৃত্বও যাহাতে আইন সভার হাতে আসে, তাহার ব্যবস্থা না হইলে, ভারতীয়দের পক্ষে ইহার উপযোগিতার অনেকাংশই নষ্ট হইয়া যাইবে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান সমিতির দুইটি পরামর্শ

ইঁহারা স্কুলের শিক্ষা ও পরীক্ষায় সর্ব্বত্র দেশীয় ভাষা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়াছেন। শিক্ষার প্রথম ও মধ্যাবস্থায় মাতৃভাষার উপযোগিতার কথা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইতেছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথম হইতে এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু, আজও তাঁহারা ইহার প্রবর্ত্তনে সমর্থ হইলেন না। বাংলা সরকারের এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে অত্যধিক বিলম্ব দেশের শিক্ষার পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইতেছে।

বি-এ, এবং এম-এ, পরীক্ষায় আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে নির্ব্বাচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ইঁহারা পরামর্শ দিয়াছেন। এই পরামর্শ বিশেষ দূরদৃষ্টি এবং সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান ও ঐক্যসাধনের ইহা বিশেষ সাহায্য করিবে। আমাদের শিক্ষার জগতে এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন সর্ব্বব্যাপী ইংরাজী শিক্ষার অপব্যয় হইতে আমরা রক্ষা পাইব। তখন একটি সাধারণ ভাষার সাহায্যে যতটা না হউক, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার-চর্চ্চার দ্বারাই সমগ্র দেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হইবে। এখনও, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার পক্ষে, বক্তৃতামঞ্চ এবং সংবাদপত্রের অন্তরালে যেখানে দেশের সত্য প্রাণধারা প্রবাহিত সেখানে আসিয়া মিলিত হইবার পক্ষে, ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। ভারতবর্ষের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই এসকল কথা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে।

আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য-শিক্ষণীয়তা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য শিক্ষণীয় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে কোনও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে (অনেকগুলির মধ্যে নির্ব্বাচ্য) প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, ছেলেদের পক্ষে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে। এই পর্য্যন্ত তাহারা সংস্কৃত যেটুকু শিক্ষা করে তাহা অতিশয় সামান্য। পরে সংস্কৃত না পড়িলে, এইটুকু মাত্র জ্ঞান জীবনে কোনও প্রকার কাজেই আসে না। অথচ এই সময়ে কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখিলে, প্রয়োজন মত সেটুকু কাজে লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে বলিয়াই, ছেলেরা ইহা অধিকতর আগ্রহের সহিত শিখিবে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা

পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠার নিন্দা করিয়াও, শিখ এবং মুসলমানেরা, নির্ব্বাচনে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন না বলিয়া বার বৎসরের জন্য, মুস্‌লিম গ্রাজুয়েটদের জন্য ১০টি, শিখ গ্রাজুয়েটদের জন্য ৫টি এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রাজুয়েটদের জন্য ১০টি সদস্যপদ রক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা কোনও ক্ষেত্রেই শুভ ফলদায়ক নহে। ইহা ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করে এবং তাহা জাগাইয়া রাখে। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিরা স্বভাবতঃই নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখেন,—এমন কি, তাহা ন্যায়ধর্ম্ম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী হইলেও। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে যোগ্যতার সার্ব্বজনীন প্রতিযোগিতা থাকে না বলিয়া, পশ্চাদ্বর্ত্তী সম্প্রদায়ের যোগ্যতা লাভের প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা কমিয়া যায় এবং ইহা তাঁহাদের প্রগতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। অন্যদিকেও যোগ্যতার উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পুরস্কার না থাকায়, অগ্রবর্ত্তী সম্প্রদায়ের মধ্যেও যোগ্যতা লাভের ও রক্ষার জন্য চেষ্টা কমিয়া যায়। নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভের জন্য যাঁহাদের শুধুমাত্র নিজ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে, তাঁহারা অবিরত ইহাকে শান দিতে থাকিবেন এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণ



বিচিত্রা

শ্রাবণ, ১৩৪০

জগন্মাতা

শিল্পী—নিকোলাস রোরিক

সাম্প্রদায়িক কার্য্যকে যোগ্যতার নিদর্শন বলিয়া প্রচার করিবেন। কাজেই, ইহা কোনও সম্প্রদায়েরই হিত করিতে পারিবে না এবং সকল সম্প্রদায়েরই ক্ষতির কারণ হইবে। শুধু তাহাই নহে, ইহার অনিষ্টকারিতা কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকিবে না। তাহা সমগ্র জাতীয় চিত্তকে কলুষিত করিয়া বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে।

সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতা ক্ষতিকর এবং অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু, রাষ্ট্রে তবুও সাম্প্রদায়িকতাবাদের একটা কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যখন কোনও সম্প্রদায়ের মনে দেশের অন্যলোকদের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতার উপর যথেষ্ট আস্থা না থাকে, তখন রক্ষাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁহারা এই জন্য আশ্রয় চাহিতে পারেন যে, অপরপক্ষের হাতে ক্ষমতা গেলে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থ ও প্রগতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা যদি কোনও সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নানাদিক দিয়া তাঁহাদের ক্ষতি হইতে পারে, স্থায়ী স্বার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি নষ্ট হইতে পারে।

আবার এমনও হইতে পারে যে, কোনও সম্প্রদায়ের মনে এরূপ দুরভিসন্ধি আছে যে, সাম্প্রদায়িকতার সাহায্যে তাঁহারা দেশের অন্যান্য লোকের উপর এমন কতকগুলি সুবিধা লইতে পারিবেন, যাহা অন্যপ্রকারে সম্ভব হইবে না। এবং সেই জন্যই তাঁহারা রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন।

রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের যে কয়টি সম্ভবযোগ্য কারণের কথা বলা হইল, তাহার ভিত্তি কতকগুলি ধরিয়া লওয়া জিনিষের উপর। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কোনটিই প্রযোজ্য নহে।

কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার সমর্থনে আপাত যুক্তিযুক্ত কোনও সম্ভবযোগ্য কারণও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের হাতেও যদি কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব পড়ে এবং তাঁহারা নিজ স্বার্থ দেখিতে ও অপর সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহা হইলেও, তাঁহাদের তাহা করিবার সুযোগ কোথায়? জনমত এবং রাষ্ট্রবিধি উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা কোনও সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে প্রবেশে বা শিক্ষাগ্রহণে বাধাদান করিতে পারেন না, অথবা নিজ সম্প্রদায়ের ছেলেদের কোনও প্রকার অন্যায় সুযোগও দান করিতে পারেন না। ইচ্ছা করিলেই কোনও শিক্ষক কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ছাত্রকে কম বা বেশী শিখাইতে পারেন না অথবা কোনও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় কোনও ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচালিত হইতে পারে না। একমাত্র হয়ত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কর্ম্মচারী নিয়োগে কিছু পক্ষপাতিত্বের স্থান থাকিতেও পারে। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকায়, তাহাও সম্ভব হইবে না,—কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া কাহারও গুণ বা যোগ্যতা অনাদৃত থাকিতে পারিবে না। কাজেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা করিয়া কাহারও কোনও প্রকার লাভ হইবে না; বরং অতিরিক্ত ক্ষতি এই হইবে যে, একমাত্র শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহা দূর হইতে পারিত, এখানেও তাহাকে টানিয়া আনিয়া জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহাদের কর্তৃত্ব থাকা উচিত

বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবিকপক্ষে কাহাদের? দেশের সর্ব্বসাধারণের, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহাদের স্বার্থ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, যাঁহারা শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত আছেন, এবং যাঁহাদের পুত্রকন্যা ও আত্মীয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের? দেশের জনসমষ্টির মধ্যে কোনও একটি সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাধিক্য আছে বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে থাকা উচিত, অথবা যাঁহাদের চেষ্টা, উদ্যম ও উৎসাহে, এবং যাঁহাদের অর্থে, আত্মত্যাগে ও বিদ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেই শিক্ষিত সাধারণের

হাতে ইহার পরিচালন ভার থাকা উচিত, তাহাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কাহাদের প্রতিনিধি থাকা উচিত, সে সম্বন্ধে পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ঐ প্রদেশের ২৬ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিশেষজ্ঞ যে বিবৃতি দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন:— "আমাদের ধারণানুসারে যথাযথভাবে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজ, বিশেষ করিয়া ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকদিগের, (৩) রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদিগের, (৪) অনুমোদিত উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদিগের, (৫) অনুমোদিত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষদের, (৬) এবং সিনেট কর্তৃক নির্ব্বাচিত, বিভিন্ন-ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয় জন-নেতাদের মধ্য দিয়া জনসাধারণের, উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকা উচিত।

আমাদের বিবেচনায় এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-বর্জ্জিত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতিতে হওয়া উচিত এবং ইহা এমনভাবে ব্যবস্থিত হওয়া উচিত, যাহাতে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি না হইতে পারে।"

ইঁহাদের এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত ও সত্য হইলেও এই স্বাভাবিক যুক্তিগুলি, যে কারণেই হউক, অনুসন্ধান সমিতিকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীযুক্ত কল্যাণ কুমার বসু "কেম্ব্রিজ ল' ট্রাইপস্" পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই কৃতিত্বের অধিকারী হইলেন।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ডাঃ কুমারী মৈত্রেয়ী বসু এম-বি, (ক্যাল) এম-ডি, (মিউনিক), ১৮ মাস জার্ম্মানিতে অবস্থান করিয়া, চিকিৎসা বিদ্যায় মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি শিশুরোগে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে পূর্ব্বে কেহ এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

ডয়েশ একাডেমির ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউটের বৃত্তিপ্রাপ্ত যে তিনজন ভারতীয় ছাত্র গত বর্ষার্দ্ধে ডক্টরেট পাইয়াছেন, তাঁহারা তিন জনেই বাঙ্গালী। পূর্ব্বোক্ত কুমারী বসু ব্যতীত অপর দুইজন হইতেছেন, (১) শ্রীযুক্ত জে সি গুপ্ত ও (২) শ্রীযুক্ত বি এম সেন।

বিভিন্ন জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য যে ৬ জন ভারতীয় বিদ্যার্থী উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ৩ জন বাঙ্গালী। ইঁহারা হইতেছেন, শ্রীযুক্ত বি কে পালিত, শ্রীযুক্ত এইচ-ডি মুখার্জ্জী ও শ্রীযুক্ত এস-এন সান্যাল। এই প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিভোগী জার্ম্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যে ১০ জন ছাত্র, তাঁহাদের পাঠ শেষ করিবার জন্য আগামী গ্রীষ্মার্দ্ধে আরও সাহায্য পাইবেন বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ৫ জন বাঙ্গালী। ইঁহারা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত আর কে দত্তরায়, শ্রীযুক্ত এম-কে মজুমদার, শ্রীযুক্ত কে-দত্ত, শ্রীযুক্ত এ-কে ভট্ট।

বঙ্গীয়-জার্ম্মান-বিদ্যাসংসদ

জগতের অন্যান্য অংশের সহিত ভারতবর্ষের ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, জগতের অন্যান্য অংশের লোকের সহিত আমাদের মানসিক যোগাযোগের পক্ষে অনেকদিন ধরিয়া বিঘ্নস্বরূপ ছিল। বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়া যে সংযোগ-সেতু গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া যাহাতে আমরা বিভিন্নদেশের শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ ও বিশেষ বিদ্যার সহিত যুক্ত হইতে পারি, তাহার জন্য বিশেষভাবে আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এবিষয়ে ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং বাঙ্গালী হিসাবেও রহিয়াছে। কোনও একজন আধুনিক বিখ্যাত ইংরাজ ভ্রমণকারী, তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পুস্তকে বলিয়াছেন যে, বাংলাদেশে ভারতবর্ষের রূপ-সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে বাংলার বিভিন্নতা অতিশয় সুস্পষ্ট। বিশেষ করিয়া বাংলার সাহিত্য, চিত্রশিল্প এবং নব জাতীয়তাবোধের মধ্য দিয়া যে নূতন চিন্তাধারা, রসোপলব্ধি এবং অন্য সকল দিক দিয়া নবতন কৃষ্টি

গড়িয়া উঠিতেছে, বহির্জগতে তাহার পরিচয় দিবার এবং বিশ্বমানবের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিবার দায়িত্ব সকল বাঙ্গালীরই আছে। এই উদ্দেশ্যমূলক ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকার চেষ্টাই প্রশংসা ও সমর্থনযোগ্য।

জার্ম্মানির প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং জার্ম্মান কলা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য বঙ্গীয় জার্ম্মান বিদ্যাসংসদের প্রতিষ্ঠা, জার্ম্মানির সহিত আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান কৃষ্টিগত সম্পর্ককে দৃঢ়তর করিবে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এই নবগঠিত সংসদের সভাপতি ও অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী (Life and experience of a Bengali Chemist) প্রকাশিত হইবার অল্পদিনের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। বিলাত ও আমেরিকার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি অনেক অভিজাত এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পত্রিকায় বইখানির এবং লেখকের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। সমসাময়িক ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, সুচিন্তিত নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে, সুগভীর পাণ্ডিত্যে এবং লিখনভঙ্গীর অপূর্ব্ব পটুত্বে, লেখক সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনীর পরে এমন ভাল বই আর লেখা হয় নাই, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। বিদেশে বাঙ্গালীর মর্য্যাদা যাঁহারা বাড়াইয়াছেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার এই নূতন পুস্তকখানা তাঁহার ও বাঙ্গালী জাতির খ্যাতি আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। তাঁহার নানা বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে যদিও বারবার ইহার অনেক কথাই বলিয়াছেন, তাহা হইলেও পুস্তকখানির একটা বাংলা সংস্করণে দেশের ও সাহিত্যের উপকার হইবে।

বাংলার বাহিরে পাটের চাষ

পাটের বাজারদর পড়িয়া যাওয়া, বাংলার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির অন্যতম কারণ। পাট বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ ফসল; ইহা অনেকটা এই প্রদেশের একচেটিয়া বলিয়া অর্থাগমের একটা নিশ্চিত পথ ছিল। পাটের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন কোনও জিনিসের আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু, নানাকারণে ইহা আজও সফল হয় নাই, অবশ্য ভবিষ্যতে হইতে পারে।

বর্ত্তমানে, রবারের বাজারদর পড়িয়া যাওয়ায় সিংহলের নিম্নভূমির রবারক্ষেত্রসমূহে পাট চাষের চেষ্টা চলিতেছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করিতেছেন, এখানকার ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া পাট চাষের উপযোগী।

পাটের চাষ অন্যত্র সম্ভব হইলেও, তাহার পরিমাণ খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। নূতন নূতন কাজে যাহাতে পাটের ব্যবহার হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া চাষ ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, বাহিরের কোনও প্রকারের প্রয়াস যাহাতে আমাদের ক্ষতি না করিতে পারে, তাহার জন্য সময় থাকিতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সময়মত তৎপর না হওয়ায়, অর্থাগমের অনেক নিশ্চিত উপায়, বাঙ্গালীদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় ভাষা

১৯৩৫ সাল হইতে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ছাত্রদেরও বার্ম্মিজ ভাষায় বার্ম্মিজ ছেলেদের সহিত পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিজ প্রদেশের ভাষাকে প্রাধান্য দিবার এবং পুষ্ট করিবার অধিকার ও দায়িত্ব আছে। কিন্তু, বর্ত্তমানে কোনও প্রদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ই (ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) প্রাদেশিক ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় শিক্ষাদান করিতে পারেন না বলিয়া, এই অধিকার পূর্ণভাবে পরিচালিত করিতে পারেন না। অবশ্য বিদেশী ছেলেদের নিকট নিজ প্রদেশের ভাষার কিছু পরিমাণ জ্ঞান প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ই আশা করিতে পারেন এবং সেজন্য প্রত্যেক বিদেশী ছাত্রের জন্য একটা পরীক্ষার ব্যবস্থাও নির্দ্ধারিত করিতে পারেন।

বর্ম্মায় খাঁটি বার্ম্মিজদের সংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ এবং ভারতীয় ও বর্ম্মা-ভারতীয়দের মিলিত সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ।

এরূপ অবস্থায় ভারতীয় ভাষাগুলি অধ্যয়নের ব্যবস্থা না রাখা, এবং ভারতীয় ছাত্রদিগকে বার্ম্মিজভাষার কঠিন পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ন্যায় সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। অন্ততঃ ভারতের যে সকল প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশীয় ভাষারূপে বার্ম্মিজ পড়িবার ও উহাতে পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে, সেই সকল প্রদেশের ভাষাকে অনুরূপ সুবিধা দেওয়া সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য ছিল। আজ যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা ব্যতীত অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষা পড়াইবার ব্যবস্থা না রাখেন এবং অবাঙ্গালী ছেলেদেরও, বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত বাংলাভাষার পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন, অথবা, বার্ম্মিজ ছেলেদিগকে, বার্ম্মিজ ব্যতীত অন্য যে কোনও ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা পড়িতে বাধ্য করেন, তাহা হইলে একই প্রকার অসঙ্গত ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য সঙ্গতভাবেই কিছু পরিমাণ বাংলার জ্ঞান, তাঁহারা অবাঙ্গালী ছেলেদের নিকট আশা করিতে পারেন এবং সেজন্য একটা সহজ পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখিতে পারেন।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ব্যবস্থার পশ্চাতে ভারত বিদ্বেষ এবং ভারতীয়দিগকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, তাহা আরও অনেক অধিক শোচনীয়।

ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়ের সন্ধিক্ষণে এরূপ ব্যবস্থা রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষ গর্হিত হইয়াছে।

কৃষি ও বাঙ্গালী হিন্দু

বাংলার সর্ব্বপ্রধান সম্পদ কৃষি। বাঙ্গালীর শিক্ষা, সভ্যতা, স্বাস্থ্য, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। কিন্তু, ভূমির উর্ব্বরতা ও কৃষির অন্যবিধ সুবিধা বাংলার সর্ব্বাংশে সমান নহে এবং সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত নহে।

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের নদীগুলি মরিয়া যাওয়ায় জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া গিয়াছে এবং ম্যালেরিয়া ও দারিদ্র্য কৃষককুলকে (এবং অন্য সকলকেও) ভগ্নস্বাস্থ্য ও নিরুদ্যম করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিম ও মধ্যবাংলা হিন্দুপ্রধান; কাজেই এখানকার কৃষি ও স্বাস্থ্যের দুরবস্থা, হিন্দুসমাজের কর্ম্মশক্তি ও আর্থিক সঙ্গতিকে বিশেষভাবে নষ্ট করিয়াছে। বাংলার বর্ত্তমান সভ্যতা ও কৃষ্টি বাঙ্গালী হিন্দুদের দ্বারা গঠিত ও পুষ্ট। কাজেই তাহার প্রাণশক্তি ইহার জন্য যে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ওদিকে পূর্ব্ব-বঙ্গের চিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। প্লাবন এ অঞ্চলের ভূমিকে উর্ব্বরতা ও অধিবাসীকে স্বাস্থ্য দান করিয়াছে। এখানকার জনসংখ্যার বৃদ্ধি বিস্ময়কর। কিন্তু, এখানে হিন্দুর বাস মাত্র শতকরা ৩১—২৫ এবং এখানেও হিন্দুর বৃদ্ধি আশানুরূপ নহে।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, ৫০ বৎসর পরে প্রতি একজন উচ্চবর্ণের হিন্দুর স্থানে, সমগ্র প্রদেশে ৬ জন মুসলমান, একজন মাহিষ্য, একজন নমঃশূদ্র ও একজন রাজবংশী হইবে। যাঁহারা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পূর্ণবয়স্ক মেয়েদের সন্তরণ শিক্ষার সুযোগ

ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েসনের চেষ্টায় হেদুয়ায় সকাল ৫-৩০ হইতে ৬-৩০ পর্য্যন্ত, পূর্ণবয়স্ক মেয়েদের সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়াকৌতুক এবং সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃই উদাসীন। তাহা হইলেও, এদিক দিয়া বর্ত্তমানে কিছু কিছু চেষ্টা যে চলিতেছে, প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইলেও, তাহা আশা ও আনন্দের কথা।

এই সময়ে যাহাতে পুরুষেরা এখানে প্রবেশ করিতে না পারেন এবং মেয়েরা কোনওপ্রকারে পুরুষদের দৃষ্টিপাতে পতিত না হন, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় এই ব্যবস্থা ভাল এবং সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে। আমাদের যখন নিতান্ত অসহায় অবস্থা

এবং মেয়েদের প্রতি গুণ্ডামির বিরুদ্ধে যখন সমাজের নৈতিক শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ নহে, তখন মেয়েদের সর্ব্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

সন্তরণে যে প্রকার অবস্থায় পরস্পরের শারীরিক সান্নিধ্যে আসিতে হয়, তাহাতে পুরুষও মেয়েদের একত্র সন্তরণ হয়ত অবাঞ্ছনীয় হইতে পারে এবং পরস্পরের কার্য্যের পক্ষেও অসুবিধা ও সঙ্কোচ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু, পুরুষদের যে-সকল ক্রীড়াদি দেখিতে মেয়েদের পক্ষে কোনও বাধা নাই, মেয়েদের সেই সকল ক্রীড়াদি দেখিবার পক্ষে, পুরুষদের বাধা থাকিবার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, আমাদের পুরুষদের, মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমবোধ বিশেষ প্রখর নহে, ও সাধারণ ভদ্রতাবুদ্ধিও তাদৃশ মার্জ্জিত নহে। এইজন্য, এমন হইতে পারে যে, তাঁহারা নানাপ্রকার অসভ্যতার (গুণ্ডামি ব্যতীত) পরিচয় দিতে পারেন, মেয়েদের দেখিবার (ক্রীড়াকৌতুক দেখিবার জন্য নহে) জন্য অযথা ঔৎসুক্য দেখাইতে পারেন এবং আরও অন্যপ্রকারে অসুবিধার সৃষ্টি করিতে পারেন। এই সকল কারণে হয়ত বর্ত্তমানে, এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু, একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ইহা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা বা স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে, দেশের পুরুষদের চরিত্রের উপর ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ কটাক্ষ। এই প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন যাহাতে শীঘ্র অন্তর্হিত হয়, এবং সমস্ত সাধারণ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মেয়েদের সম্পর্ক সহজ ও ভদ্রতাসঙ্গত হয়, দেশের লোকের মধ্যে সেইপ্রকার মনোভাব সৃষ্টির জন্য সকলেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

আসামের নাম পরিবর্ত্তন

"অমৃত বাজারে'র শ্রীহট্টস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ যে, আসামের নাম পরিবর্ত্তনের জন্য আসাম কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব পেশ হইয়াছে। আসামের বর্ত্তমান নাম বাস্তবিকপক্ষে ভ্রমোৎপাদক। আসামের ১২টি জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলা মাত্র প্রকৃত আসাম প্রদেশের। ইহার ৮৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪০ লক্ষের উপর বাঙ্গালী, আসামীর সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক। বর্ত্তমান আসাম ভূভাগ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলার উত্তর সীমান্ত প্রদেশ ছিল। এখন ইহাকে প্রস্তাবিত উত্তরপূর্ব্ব বাংলা ও আসাম নাম প্রদান করিলে বর্ত্তমানের ভুল অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারিবে।

আসামের অধিকাংশ ভৌগলিক বাংলার অংশ এবং ভাষা ও জাতির দিক দিয়াও ইহা বাংলা হইতে অভিন্ন।

আসামে বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সম্প্রদায়; ইঁহাদের সংখ্যা আসামীদের দ্বিগুণ। আরও অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালীরা এখানে যাইয়া বাস করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। কারণ, বাংলার প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে পাঁচকোটি লোকের বাস, আর এখানে ৬০-৭০ হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে মাত্র পৌনে এক কোটি লোকের বাস। ইহার প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও অনায়ত্ত এবং জীবনসংগ্রাম এখানে অপেক্ষাকৃত সহজ।

খাঁটি আসামীরাও অনেকাংশে বাঙ্গালীদের ন্যায়। আসামী ভাষা বাংলারই একটি বিভাষা এবং ইহা বাংলা অক্ষরেই লেখা হয়। এরূপ অবস্থায় ইহার সহিত বাংলার নাম যোগ করিলে, বাংলার প্রতি এবং সেখানকার বাঙ্গালীদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে, তাঁর মৃত্যু তিথিতে আমরা শ্রদ্ধাভরে এবং সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করি। আজ বাংলা কবিতার মধ্যে যে ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্য দেখিতে পাইতেছি, বাংলা কবিতাকে সেই মুক্তির পথে আহ্বান করিবার জন্য সেদিন যে-দুঃসাহসের প্রয়োজন হইয়াছিল, মাইকেল অপেক্ষা কম প্রতিভার লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইত। তাঁহার কাব্যের মূল্য, বাংলাভাষায় প্রথম প্রয়াস বলিয়া নয়, শক্তি ও উৎকর্ষের বলে বাঙ্গালীর নিকট চিরদিন অক্ষুণ্ন থাকিবে। কিন্তু, শুধু এদিক দিয়া নয়, অন্যদিক দিয়াও বাংলাসাহিত্যে তাঁহার দানের মূল্য অপরিমেয়। প্রাচীন ও আধুনিক নানা ইউরোপীয় ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ও

রচনাশক্তি অসাধারণ ছিল; কিন্তু, তিনি নিজ ব্যর্থতা দিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে যাওয়া নিতান্তই মূঢ়তা। সাহিত্য রচনার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীকে যে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, বঙ্কিমেরও পূর্ব্বে তিনিই একথা বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তীকালে "একদিন কথাপ্রসঙ্গে·· মধুসূদন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাঙ্গালী যতই ভাল ইংরাজী লিখুন না কেন, সাহেবেরা সহজে স্বীকার করিতে চাহিবে না।" শেষে বলেন "England does not want a Black Macaulay or a Black Shakespeare." তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, "রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা লিখিলে ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইত।"

(মধুস্মৃতি)

তাঁহার এই আদর্শ ও উপদেশ তদানীন্তন বাঙ্গালী লেখকদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান মাতৃভাষা-প্রীতির মূলে ইহার প্রভাব অবহেলা করিবার মত নয়।

সুশীলকুমার বসু

বর্ষা-মগ্ন

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

ঝর ঝর ঝর ঝর অবিরাম ঝরে ধারা-জল,
নিষ্কম্প বৃক্ষের শিরে, পরিতৃপ্ত গৃহছাদে ঝরে জল, ঝরে অবিরল।
ঝরে জল বরষা-আসার,—
ভেঙে প'ড়ে ঝ'রে যেতে চায় আজ হৃদয় আমার,—
এ হৃদয় ব্যথা-বারি-ভরা
এ হৃদয় তীব্রতম সুকঠোর বজ্র-শোক-ধরা,
এ হৃদয় দুঃখ-অগ্নি-দহন-বিধুর,
এ হৃদয় পিষ্ট যাহা পৃথিবীর আঘাতে নিঠুর,
এ হৃদয় বেদনার বাষ্পভরা মেঘ,
এ হৃদয় সংবরিতে নারি' আর আপনার দুঃখের আবেগ,
ভেঙে যাক্ ঝ'রে যাক্, বিন্দু বিন্দু হ'য়ে মিশে যাক্
ধরার ধূলির সাথে, অন্তহীন প্রান্তরের ঔদার্য্যে মিশাক।
মিশুক্ সে মিশে যাক্ মৃত্তিকার স্তরে স্তরে স্তরে,
যেমন বাদল-জল মিশে যায় মৃত্তিকা-অন্তরে;
মৃত্তিকার শৈত্য মাঝে মিশে গিয়ে এ বিদগ্ধ হিয়া
জুড়াক্ সকল জ্বালা, শান্তি-কন্ত লউক সে পিয়া।
নবানন্দে তৃণ যেথা তোলে মাথা অদম্য জীবনে
রসবিন্দু দিয়ে সেথা বেঁচে থাক্ নব হরষণে।

তালবৃক্ষ-শিরা-মাঝে রস রূপে উঠি'
দুর্দ্দান্ত সগর্ব্ব শিরে রহুক্ সে শূন্যতল লুটি'।
অথবা অশ্বত্থ মাঝে মিশে গিয়ে তারি স্নিগ্ধ সবুজ পল্লবে
বিরাজি' জুড়ায়ে দিক্ শত শত পথিক-বল্লভে।
এমনি হৃদয় মোর তাপদুঃখময়
বরষার ধারা সাথে মাগিতেছে তরল বিলয়,
মাগিতেছে শীতল শরণ,
মাগিতেছে ব্যথা হরা মধুর মরণ।

*

আয় আয় বৃষ্টিধারা, ঘিরে আয়, নেচে নেচে আয়,
এ দেহ জুড়ায়ে যায়, তোরি স্পর্শে অন্তর জুড়ায়।
তোরি সাথে সখ্য মোর আজি দৃঢ়তর,
তোরি সাথে আজি তাই ঝরি' ঝর ঝর,
মিশায়ে রহিব আমি অন্তহীন ভুবন-অঙ্গনে—
তৃণে, নদীস্রোত মাঝে, গহন কাননে,
ঝরণা-ঝরণে আর জলাশয়ে, কূপে,
নিখিল এ বসুধার সকল সচল আর অচল স্বরূপে।
ক্ষুদ্র দুঃখ, ক্ষুদ্র ব্যথা ভেঙে গিয়ে বিশাল নিখিলে
হারায়ে যাইবে আর যাবে সেথা মিলে।
আর আমি র'ব নাকো দুঃখ-ক্রীড়নক,
বিপুল ভুবনে পাব বিপুল পুলক॥

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বিতর্কিকা

১। বলাকার ছন্দ

শ্রীবিভাস নাগ

যুক্তকছন্দ বা free verse নিয়ে অমূল্যবাবু একটি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রতিপংক্তিতে নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যা না দিয়ে অক্ষরবৃত্তছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলাকার যুগে এক ভিন্নমূর্ত্তি দিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রের মতে তা-ই মুক্তক-ছন্দ। অমূল্যবাবু সে কথা মান্‌তে চান না, তিনি পাঠকের সহজ ছন্দবুদ্ধিকে যতি এবং ছেদের আবর্ত্তে ফেলে বিভ্রান্ত করে দিতে উদ্যত হয়েছেন। বলাকার সেই অভিনব ছন্দ নাকি মুক্তক বা free verse নয়! তিনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন এসব ছন্দ অমিতাক্ষর ছন্দেরই শ্রেণী-বিশেষ—অর্থাৎ অমিতাক্ষরের এক একটি চরণ ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পংক্তি করা হয়েছে। এও তিনি দেখিয়েছেন যে সে ছন্দের পংক্তিগুলোতে অক্ষরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী ছয়, আট বা দশ মাত্রার পর্ব্ব ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর মত অনুমোদন করবার জন্য একটি কবিতার যে স্তবকথগুটুকুর প্রয়োজন ছিল ঠিক ততটুকু স্তবক তিনি উদ্ধৃত করেছেন। সেই কবিতারই অন্যান্য পংক্তিতে তাঁর মত অব্যাহত থাকে না। মনে হয়, বলাকার ছন্দসম্বন্ধে অমূল্যবাবুর মতবিরোধ অত্যন্ত কষ্টকল্পনাপ্রসূত।

বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে আমরা 'বিতর্কিকা' নামে একটি আলোচনা বিভাগ খুলিলাম। প্রতিম'সে এই বিভাগে সাহিত্য, সমাজ এবং অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্গত প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহের আলোচনা হইবে। এই আলোচনা বিভাগে যোগদান করিবার জন্য আমরা পাঠক সাধারণকে আহ্বান করিতেছি। কোন আলোচনায় নূতন এবং প্রয়োজনীয় কথা থাকিলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব। কিন্তু আলোচনা বিভাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। সুতরাং বিশেষ কিছু নূতন কথা না বলিয়া একই কথার পুনরাবৃত্তি থাকিলে সকলের রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে না। বিঃ সঃ

Catalectic foot বা অপূর্ণপর্ব্ব ব্যবহার করে' ছন্দে যেমন বৈচিত্র্য আনা হয় অমূল্যবাবুর মতে তথাকথিত মুক্তকছন্দের মূলতত্ত্বটি তা-ই। এ মত অনুমোদনের জন্য তিনি বলাকার 'সাজাহান' কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করেছেন অথচ ঠিক তার পরের পংক্তিগুলো উদ্ধৃত করে' দেখান যায় কবিতাটি খাঁটি free verse।

হায় ওরে মানব হৃদয় '	= ১০	মাত্রা
বারবার	= ৪	,,
কারো পানে ফিরে চাহিবার	= ১০	,,
নাহি যে সময়	= ৬	,,
নাই নাই।	= ৪	,,
জীবনের খরস্রোতে । ভাসিছ সদাই	= ৮ + ৬	,,
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;	= ৮	,,

আমরা দেখ্‌চি চার, ছয়, আট, দশ মাত্রার পর্ব্ব এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে। পর্ব্বের ঠিক এরূপ অনির্দ্দিষ্ট মাত্রা দেয়াতে যদি গিরিশচন্দ্রের ছন্দ মুক্তক হ'তে পারে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ কি অপরাধ কর্‌ল? তাছাড়া, অমূল্যবাবুর নিয়মান্তর অনুসারেও ত অমিতাক্ষরের চরণে এ পংক্তিগুলোকে সাজান চলেনা,—সাজালে এক অসম্ভব মূর্ত্তি ধারণ করে।—

হায় ওরে মানব হৃদয় * বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার * নাহি যে স
ময় * নাই নাই। * ইত্যাদি।

'সাজাহান' কবিতার কয়েকটা পংক্তির পর্ব্বসমাবেশে সামঞ্জস্য দেখে' কবিতার ছন্দপ্রকৃতিকে অসমপর্ব্ব অথচ অনুরূপঅনুচ্ছেদসম্পন্ন কোন কবিতার ছন্দের সঙ্গে তুলনা

করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। সেচ্ছাবিহারী এবং ভাবতরঙ্গের অনুসারী ছন্দ যদি free verse হয় তবে যে ক'টি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তা free verse হবেই।

অমূল্যবাবুর কষ্টকল্পনার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বলাকার 'বিচার' কবিতায় তিনি মিতাক্ষর স্তবকের লক্ষণ দেখাবার জন্য তার দুটি শব্দকে বন্ধনীর ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এবং তাদেরকে আখ্যা দিয়েছেন পর্ব্ববহির্ভূত 'অতিরিক্ত শব্দ'। 'হে সুন্দর' শব্দ দুটিকে রবীন্দ্রনাথ এম্নি করে একঘরে করতে চাইবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

২১। 'তুই' 'তুমি' 'আপনি'

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কোনো ব্যক্তিকে সম্বোধন করবার সময়ে আমরা বাঙলা ভাষায় স্থান এবং পাত্র বিচারে 'তুই' 'তুমি' এবং 'আপনি' এই তিনটি সম্বোধনের যে-কোনো একটির আশ্রয় গ্রহণ করি এবং তৎসংলগ্ন ক্রিয়াপদেও একটি অনুরূপ পার্থক্যের স্পর্শ লাগিয়ে দিই। যেমন,—তুই আয়, তুমি এস, আপনি আসুন। এখন, তর্ক হচ্চে এই যে, বিচার-বিবেচনার ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই তিনটি সম্বোধনের মধ্যে একটিকে নির্ব্বাচিত ক'রে ব্যবহার করার প্রথা বাঞ্ছনীয় কি-না, এবং যদি বাঞ্ছনীয় না হয় তা হ'লে উক্ত তিনটি সম্বোধনের মধ্যে কোন সম্বোধনটি নির্ব্বিচারে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা উচিৎ।

আমার মতে, স্থান এবং পাত্রের বিচারে তিনটি সম্বোধন ব্যবহারের প্রথা অবাঞ্ছনীয়,—এবং সকল ক্ষেত্রে একই সম্বোধন ব্যবহারের জন্য দুই প্রত্যন্তবর্ত্তী 'তুই' এবং 'আপনি'কে বর্জ্জন ক'রে মধ্যবর্ত্তী 'তুমি'কে অবলম্বন করাই ভাল।

অপরকে সম্বোধন করবার জন্য বিভিন্ন মর্য্যাদাবাচক একাধিক শব্দের ব্যবহার অবাঞ্ছনীয়—আমার এ মন্তব্যের সপক্ষে আছে যুক্তি, বিপক্ষে আছে সংস্কার, অর্থাৎ Sentiment। আমার প্রধান যুক্তি হচ্চে, সম্বোধনের জন্য একটি মাত্র শব্দের ব্যবহার থাকলে অপরিচিত ব্যক্তিকে প্রথম সম্বোধনকালে নির্ব্বাচনের সমস্যা নিয়ে বিড়ম্বিত হ'তে হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গত নির্ব্বাচনের ফলে সম্বোধিত ব্যক্তির মনে যে বিহ্বলতা গ্লানি অথবা অপমান-বোধ উৎপাদিত করি—তা হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। বৈঠকখানায় কাজ করতে করতে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি দরজার কাছে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে,—পরিধানে পরিচ্ছন্ন ধুতি, দেহে সদ্য-ধৌত ছিটের শার্ট, পায়ে কালো রঙের বার্ণিস করা পাম্প্ শু এবং মাথায় হাল ফ্যাশনে ছাঁটা বারো-আনা চার-আনা চুলের মধ্যে সযত্ন-রচিত টেরি। ব্যস্ত হয়ে বলি, "ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন!" অপরিচিত ব্যক্তির মুখে বিহ্বলতার গ্লানি ফুটে ওঠে, কুণ্ঠিত স্বরে সে বলে, "আজ্ঞে, আপনাদের চাকর রাস্তা থেকে আমাকে পাঠিয়ে দিলে। কে চুল ছাঁটবেন।" 'আপনি' সম্বোধনের অপ-প্রয়োগে বিরক্ত হয়ে উঠি। নাপিতের ক্ষৌর দ্রব্যের বাক্সটি দৃষ্টি-গোচর না হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা! টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে গম্ভীর মুখে হাঁকি, "ওরে খোকা, পরামাণিক এসেছে। তোর দাদাদের খবর দে।" আধ ঘণ্টা পরেই 'তুমি—আপনি' প্রয়োগের আর এক রকমের ভুল হয়। পদ শব্দে চেয়ে দেখি একটি লোক ঘরে ঢুকেছে, মলিন বসন, পায়ে অর্দ্ধছিন্ন জুতা, মাথার চুল রুক্ষ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকিয়ে বলি, "কি চাও?" লোকটি একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলে, "শ্যামবাজারের দিকে কাজ ছিল, এসেছিলাম, বঙ্কিম আপনাকে একখানা চিঠি দিতে দিয়েছে।" তেমনি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলি, "কে বঙ্কিম?" লোকটি একটু বিস্মিত হয়ে বলে, "১৭নং ঈশ্বর দত্ত লেনের বঙ্কিম সেন।"

শুনে লাফিয়ে উঠে বলি, "তাই বল !— আমাদের বঙ্কিমবাবু ?" লোকটি মৃদু হেসে বলে, "কিন্তু আমাদের বঙ্কিমবাবু ত নয়, আমাদের বঙ্কিমই।" মনের মধ্যে তীব্র সন্দেহ দেখা দেয়, সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে না কি ?" লোকটি ইতস্ততঃ ক'রে বলে, "একটু আছে। বঙ্কিম আমার ছোটো ভাই।" শুনে লজ্জায় কুণ্ঠায় বিমূঢ় হয়ে যাই এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'আপনি' সম্বোধনের ধারা বর্ষণ করতে থাকি। কিন্তু তখন তীর ছোঁড়া হয়ে গেছে, তখন আর ধনুক সামলে লাভ কি ? পশ্চাৎ-উচ্চারিত 'আপনি' শব্দের প্রলেপ লোকটির কোনো উপকারই করে না, 'তুমি' সম্বোধনের কাঁটাটাই মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে।

উপরের দৃষ্টান্ত দুটি নির্ব্বাচন-প্রমাদের দৃষ্টান্ত; এ তত অসঙ্গত এবং নির্ম্মম নয়, হীনতা এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য স্বেচ্ছাকৃত 'তুমি' এবং 'তুই' সম্বোধনের প্রয়োগ যত ;—অর্থাৎ যখন কোনো ব্যক্তির অবস্থা অথবা পেশার হীনতা স্মরণ অথবা কল্পনা ক'রে তাকে 'আপনি' সম্বোধনের মর্য্যাদা দান করতে অস্বীকৃত হই। যখন ডাকঘরের পিয়নকে, ট্রামের কন্ডাক্টার ইনেস্পেক্টারকে, পথের কনেষ্টবলকে তুমি বলি; যখন মুটে মজুর মেথর প্রভৃতিকে তুই বলি। অথচ এ কথা আমরা বেশ জানি যে, সেই পিয়ন, কন্ডাকটার, ইনেস্পেক্টার, কনেষ্টবলের মধ্যে এমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ অনেক আছে যারা মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি করলে (ব্রাহ্মণ কায়স্থ না হ'লেও) খুসী হয়ে তাদের আপনি বলতাম। শুনেছি কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর অধীনে এমন একজন কার্য্যদক্ষ ইনেস্পেক্টর আছেন যাঁর বর্ত্তমান বেতন মাসিক আড়াই শ' টাকা, অথচ তাঁকে আমরা সম্বোধন করি তুমি বলে। কোন্ অপরাধে, সে-টা গবেষণার যোগ্য। বড় ভাই চাল ডাল নুন তেল ঘির মুদিখানার দোকান করলে তাকে আমরা বলি তুমি, ছোট ভাই জার্ম্মাণ আর জাপানী জিনিষ নিয়ে মণিহারী দোকান করলে তাকে বলি আপনি। এ আচরণ-প্রভেদের তত্ত্বও কম কৌতুকাবহ নয়।

তুমি শব্দের প্রয়োগের দ্বারা কতকগুলি পেশাতে আমরা এমন একটা হীনতার ছাপ মেরে দিয়েছি যার জন্যে ভদ্র-সন্তানেরা সহজে সে-সকল পেশা অবলম্বন করতে চায় না। ট্রামের কন্ডাকটারগিরি, ডাকঘরের পিয়নগিরি প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত।

অনাত্মীয় ব্যক্তির প্রতি তুমি এবং তুই প্রয়োগের দ্বারা তার হীনতারই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। রাস্তার মুটেকে যখন বলি, 'ক পয়সা নিবি বল ?' তখন তার প্রতি নিশ্চয়ই সোহাগ দেখাইনে, এবং মুদিকে যখন বলি, 'ওহে চালটা এবার অত মোটা দিয়েছ কেন ?' তখনও তার প্রতি বন্ধুত্বের আরোপ করিনে, কারণ উত্তরে সে যদি বলে, 'আচ্ছা এবার তোমাকে আর একটা চাল দেবো, খেয়ে দেখো ভাল হবে।' তা হ'লে মনে মনে চটি, এবং সম্ভবত দোকান বদলাই।

অনেকগুলি জাতির প্রতি আমরা সচেতনায় জবরদস্তি তুই এবং তুমি শব্দ প্রয়োগ করে থাকি। যথা, দুলে, বাগ্দী, ধোপা, নাপিত, জেলে, শুঁড়ী প্রভৃতি। কিন্তু শুঁড়ী যদি বিলাতী মদের দোকান ক'রে মূল্যবান পোষাক প'রে টেরি ফিরিয়ে বসে তা হ'লে তাকে আপনি বলি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো অনাত্মীয় ব্যক্তিকে আমরা যখন তুমি অথবা তুই শব্দের দ্বারা অভিহিত করি তখন তার মধ্যে জাতি, পেশা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ক একটা হীনতার প্রকাশ থাকে। এই অবজ্ঞাপ্রসূত তুই তুমির সহিত পরমাত্মীয়ের প্রতি প্রযুক্ত তুই তুমির কোন আত্মীয়তা নেই,—এ দুয়ের জাত আলাদা। কাঁচি যখন চুল ছাঁটে তখন তার এক ব্যবহার, আর যখন কান কাটে তখন তার আর-এক ব্যবহার; কাঁচি ব'লেই এ দুই ব্যবহার এক নয়।

আমার প্রস্তাব এই যে,—কাঁচি দিয়ে কানকাটার প্রথা বন্ধ ক'রে দিই,—আপনি শব্দের প্রয়োগ যতদিন বর্ত্তমান থাকবে ততদিন অনাত্মীয় ব্যক্তির প্রতি তুই তুমি শব্দ প্রয়োগ করব না। অযথা লোকের মনে গ্লানি সঞ্চার ক'রে লাভ কি ? বিশেষত যখন সে গ্লানি শ্রেয়-হেয়র বিচার থেকে উদ্ভূত। আমি জানি তুই তুমির প্রয়োগে অনাত্মীয় ব্যক্তিরা কষ্ট পায়; কেউ জন্মাবধি সহনের দুর্ব্বলতায় নীরবে সহ্য করে, কেউ প্রতিবাদ করে, কেউ আবার কলহও করে। আমার মনে আছে ট্রামে একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কণ্ডাক্টারের বচসা উপস্থিত হলে প্যাসেঞ্জারটি কণ্ডাক্টারকে অবিরত তুম্

তুম্ ক'রে সম্বোধন করছিল, সহসা এক সময়ে যখন কণ্ডাক্টারও প্যাসেঞ্জারটিকে তুম্ তুম্ বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করলে তখন উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম হয়েছিল। আজ-কালকার সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার দিনে আমরা যখন মানুষের সহিত মানুষের সমস্ত অসঙ্গত ভেদগুলি বিলুপ্ত করতে উদ্যত হয়েচি তখন ভাষার মধ্যে সম্বোধনের এই রূঢ়তাটুকু রেখে লাভ কি? সম্বোধনের রূঢ়তা অন্যবিধ প্রভেদ আচরণের চেয়ে অনেক প্রবল এবং সোজাসুজিভাবে আঘাত দেয়। একজন অশিক্ষিত লোককে যখন বলি, "বাপু এ সভায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের স্থান সম্মুখ দিকে করা হয়েচে—তোমাদের স্থান পিছনে,—পিছনে গিয়ে বোসো।' তখন তাকে আঘাত দিই বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত দিই যখন বলি, 'ওহে মূর্খ, তোমাদের আসন পিছন দিকে, ও-দিকে গিয়ে বোসো।'

তিনটি সম্বোধন-শব্দ স্থলে একটি শব্দ ব্যবহৃত হওয়া আরম্ভ হলে কিছুদিন একটু সঙ্কোচে অসুবিধায় কাটতে পারে, কিন্তু সে নিতান্তই অল্প দিনের জন্য, দেখতে দেখতে নিত্য ব্যবহারের ফলে একটী সম্বোধন-শব্দের সর্ব্বত্র প্রয়োগ অভ্যস্ত হয়ে আসবে। একটী সম্বোধন-শব্দ যে বিনা অসুবিধায় সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হতে পারে তার প্রমাণ ইংরাজি ভাষার you। ইংরাজেরা একাধিক শব্দের মোহ থেকে বহুদিন মুক্তি লাভ করেছে এবং তার জন্য কোনো রকম অসুবিধা বোধ করে ব'লে মনে হয় না। তার প্রমাণ, আমরা বাঙলা ভাষায় যে-দুই ব্যক্তির একজনকে 'তুমি' এবং অপর জনকে 'আপনি' বলি, ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন কালে সে দুই ব্যক্তিকে একই you শব্দ দ্বারা অভিহিত করি অথচ কোনো অসঙ্গতি বোধ করিনে। ইংরাজি ভাষার এই দৃষ্টান্তকে নাকচ করবার অভিপ্রায়ে কেউ যদি বলেন যে, আমাদের দেশের অন্যান্য ভাষায়, এমন কি ইয়োরোপের ফরাসী প্রভৃতি ভাষায়, তুই, তুমি এবং আপনির অনুরূপ শব্দের প্রচলন আছে,—তা হলে আমি বলব সেটা যুক্তি হবে না, সেটা হবে fallacy। জগতের বেশির ভাগ লোক মিথ্যা বলছে অতএব আমরা সত্য বলব না—এটা যুক্তি নয়, অন্ততঃ সদ্যুক্তি নয়। যুক্তির একটা কঙ্কাল খাড়া করবার উদ্দেশ্যে কেউ যদি এমন কথা বলেন যে, তুই তুমি আপনি ব্যবহারের মধ্যে যদি সত্যিকার তেমন কিছু অসুবিধা বা অন্যায় থাকৃত তা হ'লে ফরাসী জাতির মত এমন একটা জাতি কখনই এতদিন ধ'রে সে অসুবিধা ভোগ করত না, তা হ'লে আমি বলব সেটা হবে আমাদের inferiority complex-এর একটা দৃষ্টান্ত। ফরাসী জাতির মত জাতি যখন...তখন কোন্ ছার আমরা... ইত্যাদি।

'তুমি-আপনি'র প্রচলন লুপ্ত হ'লে বাঙলা ভাষার ঔপন্যাসিকেরা অবশ্য একটা খুব উপকারী অস্ত্র হারাবেন; কারণ, প্রণয়ের ক্রমবিবর্ত্তনের গতি-পথে নায়ক নায়িকারা সহসা যেখানে 'আপনি-আপনি' ত্যাগ ক'রে 'তুমি-তুমি' বলতে আরম্ভ করে সে একটা মস্ত বড় land-mark। কিন্তু একটা কোনো ভাল কাজ করতে হ'লে কিছু-না-কিছু আত্মোৎসর্গ করতেই হয়,—বাঙলার ঔপন্যাসিকেরাই না হয় সেটা করবেন।

সর্ব্বত্র ব্যবহারের জন্য একটি মাত্র সম্বোধন-শব্দের প্রচলন যদি আমরা মনোনীত করি তাহ'লে পরবর্ত্তী প্রশ্নের মীমাংসা খুব সহজে নিষ্পন্ন হয়,—অর্থাৎ, 'তুই তুমি আপনি'র মধ্যে কোন্ শব্দটি আমরা নির্ব্বাচিত করব।

আমার মতে যেটিকেই ইচ্ছে গ্রহণ করতে পারা যায়—কিন্তু 'তুমি' শব্দটিকে গ্রহণ করলেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি সুবিধা হয়। তুমি শব্দের বিস্তার (range) খুব বেশি, এত বেশি যে, আমি যে-প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেচি তার অনেকখানি অংশ ইতিমধ্যেই এই শব্দটির দ্বারা পালিত হচ্চে। ভগবানকে আমরা বলি তুমি, দেশের মহৎ ও বরণীয় লোকদের অভিনন্দন-পত্রে সম্বোধন করি তুমি ব'লে, বাপ-মা-স্বামীকে বলি তুমি, আবার চাকর চাকরাণী মুটে মজুরদের বলি তুমি। তুমি সম্বোধনে ভগবান অপ্রসন্ন হন কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু 'তনয়ে তারো তারিণী' গানটি গাইবার সময়ে যদি গাই 'তনয়ে তারুন তারিণী' তা হ'লে রসভঙ্গ হয় একথা নিশ্চয় বলতে পারি। আমার উড়িয়া চাকর আমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করে, তার মধ্যে আমি কোনো দিন

কোনো অসম্মানের সন্ধান পাই নি; আমিও তাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করি, তার মধ্যেও সে এমন কিছু শ্রদ্ধা অর্ঘের নিবেদন পায় না;—অথচ কাজ চলে। অনেক গ্রাম্য লোক তাদের জমিদারকে তুমি ব'লে সম্বোধন করে—অথচ জমিদার তার দ্বারা অপমানিত বোধ করে না। সাঁওতালরা ভদ্রলোকদের তুই বলে সম্বোধন করে কিন্তু তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো অসম্মান করবার অভিপ্রায় থাকে না।

বাপ-মা-স্বামীকে (এবং ভগবানকেও) যখন তুমি বলছি এবং বলতে পারি তখন আর কা'কে বলতে বাধবে? গুরু এবং মনিবকে? আমার মনে হয় বাধা অনুচিত। 'গুরুদেব, তুমি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ কর!'—একথা বললে গুরুদেব যদি শ্রদ্ধা গ্রহণ না করেন তাহ'লে উচ্চ আদালতে আপীল করব। বলব, "ভগবান, গুরুদেবকে সুমতি প্রদান কর।"

'তুই' শব্দের প্রয়োগ বাঙলা ভাষায় যদি থাকে ত থাকুক —কিন্তু সে থাকবে আত্মীয়তার অন্তঃপুরে; অনাত্মীয়তার বহির্জগতে থাকবে একটি মাত্র সম্বোধন,—তা সে 'তুই'ই হোক, কিম্বা 'তুমি'ই হোক, কিম্বা 'আপনি'ই হোক; তবে 'তুমি' হলেই ভাল।

এ প্রসঙ্গে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনোযোগ কামনা করি।

গাহি গান মানুষের

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

গান গাহি মানুষের—গাহি আমি তাহাদেরি গান
যারা এসেছিল আগে, নক্ষত্রের আলোকের মতো
নিভে গেছে দীপ্তি হা'নি পৃথিবীর ঝঞ্ঝায় প্রহত।
গাহি গান তাহাদেরো যারা আজ মূর্ত্ত বর্ত্তমান,
উল্কার পিণ্ডের মতো যাহাদের স্পন্দমান প্রাণ
বিচ্ছুরিয়া বিস্ফারিয়া দিগ্বিদিকে ঝরিছে নিয়ত।
গান গাহি তাহাদেরো দূরে যারা আজো অনাগত,
গর্ভের ভ্রূণের মতো গুপ্ত যারা তবু জ্যোতিষ্মান।
বিশ্বের বিপুল দেহ—ছন্দে ছন্দে যৌবনের দোলা,
জীবন তনুর লীলা বাসনার বিক্ষোভে মুখর,
তারি বুকে মূর্ত্তি গড়ে প্রতিদিন মনের ভাস্কর,
খেয়ালী দুর্দ্দান্ত মন—কভু স্বস্থ, কভু আত্মভোলা।
দেহ মন এই দিয়ে ভরিয়াছি সঙ্গীতের ঝোলা,
নিখিল বিশ্বের যাহা চির সত্য শাশ্বত সুন্দর।

নানা কথা

দেশবন্ধু স্মৃতি সৌধ

দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁর চিতার উপর যে স্মৃতিসৌধ রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়,—অর্থাভাবে এতদিন পর্য্যন্ত তার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় নি, এটা দুঃখের বিষয়। যাহোক এতদিন পরে কলিকাতার বর্ত্তমান জনপ্রিয় মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর চেষ্টায় যে সেকাজ আরম্ভ হ'য়েছে, এর জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। অবশ্য একথা ঠিক যে দেশবন্ধুর স্মৃতি তিনি নিজেই রেখে গিয়েছেন তাঁর কর্ম্মের মধ্যে,—তথাপি তাঁর স্মৃতিকে যথাযোগ্য পূজা করতে না পারাটা আমাদের জাতীয় চেতনার পক্ষে গ্লানিজনক। এই গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমরা আমাদের মেয়রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শরৎচন্দ্র

পাঠকবর্গ এই সংখ্যায় "বিপ্রদাস" না পেয়ে নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। অসুস্থতার জন্য একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র এমাসে "বিপ্রদাস" লিখে উঠ্‌তে পারেন নি। "বিচিত্রা"র পাঠকবর্গের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই স্নেহ-দৃষ্টির জন্য আমরা তাঁর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমরা একান্তমনে প্রার্থনা করি,—তিনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠুন। "বিপ্রদাস",—না-হয় আমরা একমাস না-ই পড়লাম।

আশা করি আগামী মাস থেকে "বিপ্রদাস" আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'বে।

Art Rebel Centre.

গত মাসে আমরা Art Rebel Centre কর্তৃক অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীর উল্লেখ করেছিলাম, সে কথা বোধ করি' পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। বাঙলা দেশের কয়েকজন তরুণ শিল্পী উক্ত নামে একটি শিল্পী-সঙ্ঘ গঠিত ক'রে গত বৈশাখ মাসে একটি চিত্রপ্রদর্শনী খোলেন। প্রদর্শনীতে কয়েকজন শক্তিশালী শিল্পীর পরিচয় লাভ ক'রে আমরা অতিশয় আনন্দিত হই। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অঙ্কিত কতকগুলি ছবির প্রতিলিপি



অবগুণ্ঠনের মধ্যে শিল্পী—শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়

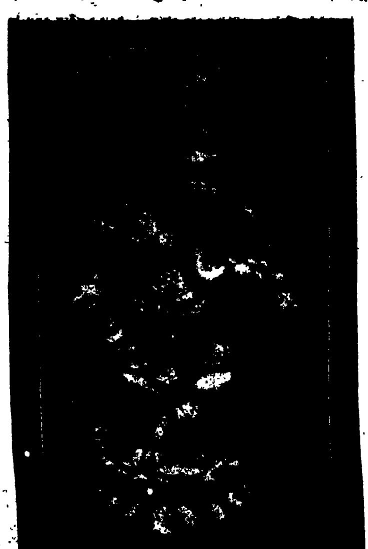
প্রকাশিত করলাম। গত মাসে উক্ত সঙ্ঘের শিল্পী শ্রীকেশবচন্দ্র খাঁর অঙ্কিত 'গ্রামের মায়া' নামক একটি Pen and Ink ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত করেছিলাম। আগামী সংখ্যায় শ্রীখগেন্দ্র রায় নামক অপর একজন শিল্পীর অঙ্কিত 'আবার এসেছে আষাঢ়' নামক একখানি রঙিন ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত করব।

চিত্রাঙ্কন বিষয়ে পুরাতন শিল্পীগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিল্প-প্রণালীর ভাবধারা (tradition) অনুসরণ করবার



ঝড়ের পরে শিল্পী—শ্রীদিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একটা প্রবল মত প্রচলিত আছে। শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅবনী সেন, শ্রীগোবর্দ্ধন আশ, শ্রীঅন্নদা দে, শ্রীদিগীন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজন তরুণ শিল্পী এই মতকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে প্রস্তুত নহেন। তাঁদের মতে



গণেশ (প্যাষ্টার মূর্ত্তি) শিল্পী—শ্রীহরিধন দত্ত

অতীতকে একেবারে অস্বীকার না করলেও বর্ত্তমানকে তাহার সহিত দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখা উচিত নয়। বর্ত্তমানের শিল্পধারাকে অতীতের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়ে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের শিল্প-সমিতির উদ্দেশ্য তাঁদের চিত্র-সূচী পুস্তকের ভূমিকা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। "Our aim is to create an art that is strong, bold, virile and antisentmental, fearless in its desire for new adventures, a powerful advance-guard, which alone can save Art in India now threatened by traditional conservatism and the habitnal indifference of the public. This, our art, will be an exciting stimulant, a powerful incentive for



পথিক জন শিল্পী—শ্রীবারীন্দ্র নাগ

creative genius,who alone can deliver art in India from its present throes."

যেখানে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য এবং শক্তির জন্য এমন প্রবল কামনা-প্রকাশ সেখানে কে না বলবে 'তথাস্তু'! আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নবীন সঙ্ঘের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

উদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা দেখে বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়েছে। উদয়শঙ্কর বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের গৌরব।



পরিব্রাজক শিল্পী—শ্রীঅন্নদাচরণ দে

প্রাচীন ভারতের নৃত্য-রীতির ধারাকে আধুনিক জগতের কলা-কৌশলের প্রয়োগে পুনঃ সঞ্জীবিত করে উদয়শঙ্কর যে-রসের সৃষ্টি করেছেন,—তার তুলনা নেই। অসাধারণ সুগঠিত তাঁর দেহ, প্রতিটি অঙ্গচালনা যেমন সুষ্ঠু, তেমনি লীলায়িত ও ভাবদ্যোতক। প্রত্যেকটি চঞ্চল অঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও অন্তর্নিহিত ছন্দের সাহায্যে অনুক্ষণই আত্মার গোপন অভিপ্রায়টি প্রকাশের জন্য ব্যাকুল। সৃষ্টির বেদনা ও অন্তর্নিহিত শক্তি, স্রষ্টার তন্ময়তা ও উল্লাস, জীবনের বিচিত্র ধারার মুক অভিব্যক্তি যেন সমস্ত দেহটাকে এক অশ্রুত ভাষায় মুখর করে তুলেছে।

তিমিরবরণের যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে এই নৃত্যের অনন্য-সাধারণ সজ্জিত নৃত্যরসকে শতধারায় উচ্ছলিত করে দর্শককে অপূর্ব্ব আনন্দে বিহ্বল করে। আমরা যেন কোন্ এক স্বপনলোকে উত্তীর্ণ হই, যেখানকার অনুভূতি এই কঠিন বাস্তবলোকের মতই সুস্পষ্ট, তাই সেটা স্বপনলোক হ'লেও রিয়ালিটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

শ্রেণীনৃত্যও অপরূপ। নৃত্য-চঞ্চল একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিপূর্ণ জানাজানি। প্রত্যেকের নৃত্য পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ সুসঙ্গতির ছন্দে শুধু একটিই ভাব প্রকাশ করছে। যুদ্ধ-যাত্রার নাচ কোনোদিন ভোল্‌বার নয়। অন্তর্নিহিত ভাবটি সাধারণ, কিন্তু তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পরিস্কার সুচিন্তিত,—আর প্রত্যেকটি অঙ্গের চালনা, চোখের চাহনি তা' নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে।

নৃত্য-কলা অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের আত্ম-প্রকাশের একটি প্রধান উপায়। উদয়শঙ্করের নৃত্যের ভিতর দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্তের একটা নিবিড় যোগ-সাধন হ'য়েছে। আমরা এই তরুণ মেধাবী শিল্পীকে আমাদের অন্তরের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।



শিলং-এর পথে শিল্পী—শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

সার কেদারনাথ দাস

এবার সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে যে সকল 'সম্মান' বর্ষিত হ'য়েছে তার মধ্যে ডাক্তার কেদার নাথ দাসের

নাইট্ উপাধি প্রাপ্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সম্মান সার কেদারের বহু আগেই প্রাপ্য ছিল। তাঁর ন্যায় সুদক্ষ চিকিৎসক যে-কোনো দেশেই বিরল।

অগাধ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সার কেদারের মধ্যে আছে এমন একটা বিনয় ও অমায়িকতা যে ক্ষণিকের পরিচয়েও লোকে মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। সম্প্রতি তাঁর খুব গুরুতর পীড়া হ'য়েছিল। এখন অনেকটা সুস্থ আছেন। তাঁর জীবন রক্ষার জন্য ভগবানের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। সার কেদার দীর্ঘজীবি হৌন এই প্রার্থনা করে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বোধনা সমিতি

সকল সমাজেই যে-সব শিশু স্বাভাবিক অপেক্ষা দুর্ব্বল চিত্তবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে তাদের লালনপালন ও শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমাদের দেশে এতদিন



বার্দ্ধক্য (Study) শিল্পী—শ্রীঅবনী সেন

পর্য্যন্ত এই রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৩২ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবার জন্য বোধনা সমিতি নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়



চিড়িয়াখানার পাখী দেখে — শিল্পী—শ্রীঅবনী সেন

এম্-বি-এল। এজন্য তাঁর নিকট বাংলাদেশ চির-কৃতজ্ঞ থাক্‌বে।

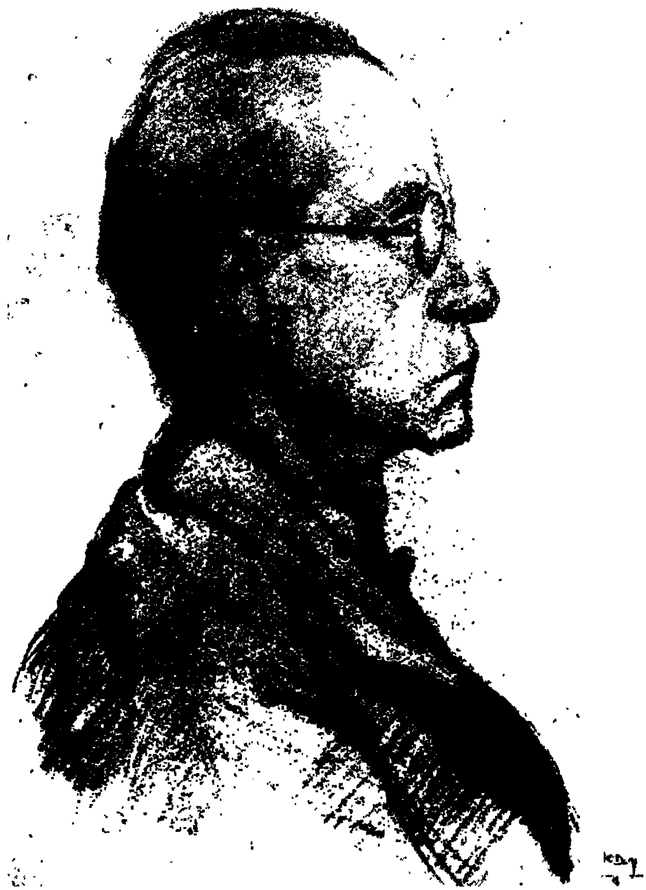
প্রথম বৎসরেই বোধনা-সমিতি তার কাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ, কলিকাতা থেকে ৯৬ মাইল দূরে বি-এন-আর লাইনের ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনে তথাকার মহানুভব রাজার সদাশয়তায় ২৫০ বিঘা জমি পাওয়া গিয়েছে বিনা মূল্যে। সেইখানে আপাততঃ দুর্ব্বলচিত্ত বালকবালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম খোলা হ'য়েছে বর্ত্তমান জুলাই মাস থেকে। এখন দুটি গৃহ নির্ম্মিত হ'য়েছে একটি বালকদের জন্য অপরটি বালিকাদের জন্য। আশ্রমের ভার নিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা চৌধুরী। তিনি সম্প্রতি বিলাত থেকে এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে এসেছেন।

বোধনা-সমিতির দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত

হ'বে ব'লে আমাদের আশা ও বিশ্বাস। পাঠকগণ ইচ্ছা করলে ৬।৫, বিজয় মুখার্জ্জি লেন ভবানীপুর, কলিকাতা,— এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য অবগত হ'তে পারেন। আমরা এই সমিতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

ইতালীতে ভারতীয় সঙ্ঘ

সম্প্রতি রোমে ভারতীয় প্রবাসীদের চেষ্টায় *Hindusthan Association of Italy and India Bureau*— এই নাম দিয়ে একটি ভারতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্যক পরিচয় সাধনের জন্য এই ধরণের সঙ্ঘ যত বেশি স্থাপিত হয় ততই মঙ্গল। এই সঙ্ঘের উদ্বোধনের সময় গৃহীত দুটি ফটোগ্রাফ আমরা প্রকাশ করলাম।



ষ্টাডি শিল্পী—অন্নদাচরণ দে

রায় সাহেব জগদানন্দ রায়

গত ১১ই আষাঢ় রবিবার শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপক জগদানন্দ রায় সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ষাট্‌ বৎসর। পঁচিশবৎসর কাল তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজ করেছেন কিন্তু অধ্যাপনাতেই তাঁর কর্ম্মের অবসান হয়নি। যাঁদের ঐকান্তিক ও

আন্তরিক নিষ্ঠায় ও আগ্রহে আজ শান্তিনিকেতন একটি আদর্শ শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হ'য়েছে তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন সুরসিক—অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয়। এ ছাড়াও শিশুসাহিত্যে তিনি যে অমূল্য সম্পদ্ দান করে গিয়েছেন তার জন্য তিনি সকল বাঙালীরই চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। শিশুসাহিত্যে বড় বড় জটিল সমস্যার সহজ আলোচনা তিনিই প্রথম করেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আবিষ্কারে ও বিজ্ঞানের নানাস্তরের জটিল তথ্যগুলিকে সহজ, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বাংলাভাষায় শিশুসাহিত্যের একটা মস্ত বড় অভাব তিনি পূরণ করে গিয়েছেন। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্যে যে আজ বিজ্ঞান জানবার বা প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করবার একটা আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা যায় তার জন্য তিনিই অনেকটা দায়ী। জীবনে অন্য কোন কাজ না করলেও তাঁর লিখিত পুস্তক 'গাছপালা' 'বিদ্যুৎ' 'বৈজ্ঞানিকী' 'গ্রহনক্ষত্র' 'পোকামাকড়' ইত্যাদির মধ্যেই তিনি বাংলাদেশে অমর হয়ে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের আজ যে ক্ষতি হলো তা আর পূরণ হবার নয়।

আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক সমবেদনা নিবেদন করি।

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী

বিগত ১লা আষাঢ় থেকে ৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত কয়েকদিন ধরে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছিল। পঞ্চাশ বৎসর ধরে যে প্রতিষ্ঠান টি'কে থাকতে পারে তার মধ্যে প্রাণশক্তি আছে নিঃসন্দেহ। এই প্রাণশক্তিই মানুষের সভ্যতাকে কালের রথচক্রের নিষ্পেষণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

বাগবাজার লাইব্রেরী তার এই দীর্ঘ জীবনের জন্য যাঁর নিকট ঋণী তিনি হ'চ্চেন ইহার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়। পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উপলক্ষে সভ্যগণ কর্ত্তৃক একদিন তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা



ইতালীয় ভারতীয় সঙ্ঘের কর্ম্মসচিব নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা করছেন।

হ'য়েছিল। রায় বাহাদুর শুধুই যে এই পঞ্চাশ বৎসর ধরে গ্রন্থালয়টিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা নয়,—তাঁর প্রাণশক্তি গ্রন্থালয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। আমরা এই গ্রন্থালয়ের উত্তরোত্তর আরো উন্নতি কামনা করি। ইহার আদর্শ দেশের অন্যান্য ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির অনুকরণীয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরান্স সোসাইটি লিঃ

আমরা উক্ত ইন্‌সিওরান্স সোসাইটির বিবরণী পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম। বিবরণী হ'তে জানা গেল যে, গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৩২-৩৩ সালে সোসাইটি মোটের উপর দুই কোটির অধিক টাকার কার্য্য সম্পন্ন করেছেন। ১৯২৭-২৮ সালে সোসাইটি মোটের উপর ৬৯-৫ লক্ষ টাকার কাজ করেন। ১৯৩০-৩১ ও ১৯৩১-৩২ এই দুই সালে সোসাইটি যথাক্রমে ১১৫ লক্ষ এবং ১৪২ লক্ষ টাকার কাজ করেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটি নূতন ভারতীয় ইনসিওরান্স ব্যবসায়ে এরূপ দ্রুত উন্নতি বিশেষ গৌরবের কথা ব'লে আমরা মনে করি, এবং এ জন্য সোসাইটির বিচক্ষণ জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিচিত্রার নূতন প্রচ্ছদপট

এবারকার বিচিত্রার নূতন মনোরম প্রচ্ছদপটটি অঙ্কিত করেছেন তরুণ শিল্পী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু। Commercial artist রূপে শৈলেন্দ্রবাবু অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ কৃতিত্ব এবং খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তাঁকে দিয়ে এ পর্য্যন্ত আমরা যতগুলি কাজ করিয়েছি সবগুলিতেই বিশেষভাবে সন্তোষ লাভ করেছি। বিচিত্রা নিকেতন হ'তে প্রকাশিত 'ভেকরাজকুমার' বইখানির প্রচ্ছদ চিত্রের নূতনত্ব এবং সৌন্দর্য্য দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন। সে প্রচ্ছদ চিত্রটিও শৈলেনবাবুর দ্বারা অঙ্কিত। এই তরুণ শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।



ইতালীতে ভারতীয় সঙ্ঘ
পিছনের সারি—শ্রীযুক্ত ডি-এন্-দুবাস, অমিয়নাথ সরকার, গিরিজা মুখোপাধ্যায়, ধীরেন দাস।
উপবিষ্ট—(১) শ্রীমতী সীতা দেবী, মিসেস্ দাস, ডাঃ তারকনাথ দাস। (২) নৃপেন মিত্র, অমৃত রায়, মিসেস্ দাসের একজন আত্মীয়া।

Ebited dy Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at The S:eekrishna Printing Works



রাগোৎপত্তি

বিচিত্রা
ভাদ্র, ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ১ম খণ্ড	ভাদ্র, ১৩৪০	২য় সংখ্যা

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে ; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষায় বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল ; দুঃখীর আশ্রয় বাসা
নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দ্দাম দুরাশা হোমানলে
আহুতি ইন্ধন জোগাইতে ; নিঃসঙ্কোচ গর্ব্ব বলে
আত্মতৃপ্তি ধর্ম্ম হতে বড়ো ; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায় ; সিদ্ধির স্পর্দ্ধার তরে
দীনের সর্ব্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি পরে
জয় যাত্রাপথে,—দেখি' ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মজাতি-মাংস লুব্ধ মানুষের প্রাণ-নিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা,—চিত্ত মম
নিষ্কৃতি সন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গম সম,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাজে শৃঙ্খল-বন্ধন অপমান
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি সমান

চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্ত্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া, বিসর্জ্জিয়া সর্ব্ব আপনার
বর্ত্তমান কাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা বন্দীশালা হ'তে।—ভগবান্ বুদ্ধ তুমি,
নির্দ্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস
তোমারি করুণা-বিত্তে ভরুক্ তাদের সর্ব্বনাশ,
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।—আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্ব্বলের মুক্তি রুধি', বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি', প্রমাদ-বিহ্বল অহঙ্কারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি ; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক্ নিঃশেষ অবসান॥

২৯ জুলাই
১৯৩৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা পাঠ

শ্রীনবেন্দু বসু এম-এ

সাধারণ পাঠকের দিক থেকে কবিতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। কবিগুরুর একটি সুপরিচিত কবিতার প্রথম চরণটি এখানে তুলে দিই—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে—
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

প্রথমে পড়েই দেখা গেল পদটিতে বঙ্গদেশের শরৎকালের রূপের মধ্যে মাতৃরূপের বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে। রাত্রির পর শারদ উষার উজ্জ্বল আলোয় একটু যেন বিস্ময়ের সঙ্গে কবি সে মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পেলেন। "আজি" কথাটিতে এই বিস্ময়ের ভাব ফুটলো। অর্থাৎ গতরাত্রে যেন এ দৃশ্যের জন্যে কবি প্রস্তুত ছিলেন না; আজ যেন সহসা দেখেছেন। ইংরাজী কাব্যবিচারে কাব্যের একটি পরিভাষা দেওয়া হয়ে থাকে বিস্ময়ের আবির্ভাব বা renascence of wonder। এখানে সে পরিভাষা যেন বর্ণে বর্ণে খাটে। মূর্ত্তি দর্শনের পর অঙ্গশোভার দিকে দৃষ্টি পড়লো। তৃতীয় আর চতুর্থ ছত্রে সে শোভার বর্ণনা। তারপর এমন কতকগুলি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে যেগুলি মাতৃহৃদয়ের প্রধান ধর্ম্ম সন্তানের প্রতি ভালবাসার পূর্ণতা, সীমাহীনতা আর বাধাহীনতাকে প্রকাশ করে। এ দৃশ্যগুলি যথাক্রমে নদীতে জলের উচ্ছল সম্পূর্ণতা, মাঠে ধানের প্রচুরতা আর কাননে পাখীর গানের স্রোত। পাঠক লক্ষ্য করবেন কবির চেতনা শারদ শোভার নানা বিকাশের মধ্যে থেকে কেমন অবলীলাক্রমে, কোন্ স্বাভাবিক নির্ব্বাচন শক্তির বশে, সেই লক্ষণগুলি বেছে নিয়েছে যেগুলি বিশেষভাবে মাতৃরূপকে পরিস্ফুট করে। শরৎকালের দৃশ্যে বর্ণনীয় বিষয় আরো অনেক আছে কিন্তু এখানে সেগুলির উল্লেখ অবান্তর হ'ত কেননা তাতে ছবির ঐক্য বাধা পেত। এই থেকে আমরা প্রকৃতি আর শিল্পের প্রভেদ অনেকটা বুঝতে পারছি। শিল্পীর ক্রিয়ার পেছনে থাকে একটি উদ্দেশ্যচালিত সজীব মন। অতএব তার কাজের প্রকাশ প্রকৃতির অবিন্যস্ত বস্তুশ্রীর মতন নয়; শিল্পী একটা আকার মত গড়ে। সৃষ্ট রূপের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য আর ঐক্য আনবার জন্যে সে কেবল কাটছাঁট আর নির্ব্বাচন করতে থাকে। অবশ্য অনেক সময়ে কোন বিশেষ শিল্প রচনা দেখে আমরা বলি খুব স্বাভাবিক হয়েছে আর অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে বলি ছবির মতন। তার অর্থই এই যে যেখানে ইচ্ছা করেই স্বাভাবিক শ্রীর অবতারণা করা হয়েছে, অর্থাৎ যতক্ষণ সৃষ্ট রূপের পেছনে একটি সক্রিয় মনের পরিচয় আছে, ততক্ষণ স্বভাবের অনুরূপ হয়েও সে সৃষ্টি শিল্পসৃষ্টি। আর দৈবে যখন এমন ঘটে যে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কোন অবান্তর অংশ চোখে পড়ে না আর সব মিলে একটি অখণ্ড রূপের সৃষ্টি হয় তখন বলি ছবির মতন। শিল্প আর প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে এই পর্য্যন্ত। আলোচ্য পদটির শেষভাগে মাতৃরূপের পূর্ণ বিকাশ বর্ণিত হয়। প্রথমে যাঁর মূর্ত্তি দেখা গেল পরে তিনিই চোখের সামনে দাঁড়ালেন।

কবিতা আর অন্যান্য শিল্পের মূলধর্ম্ম হ'ল এই রূপরচনা। আমার ইন্দ্রিয়গোচর একটি অনুভূতি হয় বা কল্পনায় কোন ভাবের উদয় হয়। আমার অন্তর সে অনুভূতি বা ভাবের

প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন সে অনুভূতি বা ভাবটুকুতেই আমার তৃপ্তি হয় না, তাকে নিজস্বরূপে সাজিয়ে দেখবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার উৎপত্তি মানুষের স্বাভাবিক সৃষ্টি প্রেরণায়, নিজেকে নিজের বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের নিজস্বকে উপলব্ধি করবার প্রবণতায়। কেন এ প্রবণতা সেটা দর্শনশাস্ত্রের বিচার; ততদূর যাবার আমাদের প্রয়োজন নেই। ফলকথা, কবি তার ইচ্ছাশক্তি, কল্পনা বা সৃষ্টি প্রেরণালব্ধ শক্তির সাহায্যে তার অনুভূতি বা ভাবকে আঙ্গিক রূপ দিয়ে গড়ে। আর স্বভাবতঃই যে ধরণে সে অনুভূতি বা ভাবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে রূপে সেই ধরণটিই ফুটে ওঠে। ভাবের রূপ গড়াই হ'ল শিল্পীর কাজ। Imagination তাই বা image গড়ে, অবশ্য অনেক রচনা দেখি যাতে রূপের ব্যঞ্জনাই প্রধান কিম্বা মনে হয় কেবল চিন্তার কচকচি, কোন বিশেষ রূপ ফুটলো না। কিন্তু 'রূপ' কথাটির আরো বিশদ সংজ্ঞা নিরূপণ আর ভাব আর রূপের সম্বন্ধ বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করবার প্রয়াস পাব।

যদিও ভাবের রূপগ্রহণের দ্বারা শিল্পের সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে রূপগ্রহণে সময়ের ব্যবধান নেই। অকষ্টকল্পিত কবিতায় ভাব একেবারে রূপে ফুটেই আত্মপ্রকাশ করে। দু'য়ে মিলে একটি সম্পূর্ণ ছবি কবির মনে সরাসরি প্রতিভাত হয়। প্রকৃত শিল্পরচনার স্বরূপগত লক্ষণই হ'ল তার স্বতঃস্ফূর্ত্ততা আর সেই কারণে তার অনিবার্য্যতা। সে রচনা যে সহজ প্রাণের সহজ উৎসার তার কষ্টিপাথরই তাই। শিল্পের বাণীর এই অনিবার্য্যতাই তাকে দেবতার বাণীর তুল্য আসন দেয়, কেননা সে হিসাব নিকাশ করা যুক্তির কথা নয়, সে স্বাভাবিক উপলব্ধ ভাবের মর্ম্মস্পর্শী প্রকাশ, সে অপরিবর্ত্তনীয়, সে চরম। আমরা এই থেকে দেখতে পাচ্ছি যে কবির মনে প্রথম থেকেই যে রূপান্বিত ভাব বা ভাবরূপ জাগলো তাকে নিয়ে আর কাটাছেঁড়া করা চলে না। হয়ত একটু ঘসামাজা করা যেতে পারে কিন্তু জোড়াতোড়া দিতে গেলে সে অনেক সময়ে বেঁকে বসে; তার প্রকৃতি আর রূপ যায় বদলে। ভাব আর রূপের সন্নিবেশ একীভূত হয় না। ঢেলে সাজবার জিনিষ কাব্য নয়। তা করতে গেলে রূপ হয় ভাবের গায়ে আঁট হয়, নয় আলগা হয়ে বসে। আমরা আগাগোড়া দেখতে পাব যে শুধু ভাবরূপের উদয়ে নয় কাব্যের গঠনের সকল অংশেও এই স্বতঃস্ফূর্ত্ততা বা অনিবার্য্যতার লক্ষণ বিরাজ করছে। আমরা এইবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে অগ্রসর হই।

একটা কথা আছে যে কোন ভাষা ভাল করে' শিখতে হ'লে সে ভাষার কাব্য পাঠ করতে হয়। এ কথার অর্থ এই যে কাব্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত বলেই তার যেখানে যে কথাগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সেগুলির প্রয়োগ একেবারে চরম। সমান অর্থসূচক অন্য কোন কথা সেখানে দিলেও ভাবরূপের তারতম্য ঘটবে। তেমনি কথাগুলির পারম্পর্য্যও যদি বদল করা যায় তাহ'লেও ভাবরূপের খণ্ডিত হবার সম্ভাবনা। এই আলোচনাকে ভাষার ব্যবহার আর বিন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা বলছি, অর্থাৎ যেখানে আর যে ভাবে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা অনিবার্য্য আর তাতে যে কোন পরিবর্ত্তন অপ্রাসঙ্গিক।

কথার বিন্যাস সম্বন্ধে আগে বলি। উদ্ধৃত চরণটিতে বিশেষ করে' রূপবর্ণনা মূলক এই কথাগুলি আছে—"মধুর মুরতি" আর "শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে"। ধরা যাক কথাগুলি যদি এইভাবে সাজান হ'ত—

আজি কি তোমার অমল অঙ্গ
ঝলিছে শ্যামল শোভাতে
হে মাতঃ তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।

অনুপ্রাসের কসরতে অবশ্য আমার পদটি মূল পদকে পরাস্ত করে, কিন্তু পরাজিত হয় "মধুর মুরতি" কথা দুটিকে "অমল অঙ্গের" পরে ব্যবহার করাতে। "মুরতি" আর "অঙ্গ" এক নয়। মুখটা অঙ্গ কিন্তু মুখের একটা ভাবছবিই "মুরতি," আর প্রথম দৃষ্টিতে সেইটেই আগে মনোযোগ আকর্ষণ করে; আঙ্গিক খুঁটিনাটি পরে চোখে পড়ে। তাই বলবার বেলাতেও মুরতির কথাই আগে। অনুভূতির ক্রম অনুযায়ীই বর্ণনার ক্রম আপনা হ'তে নির্দ্ধারিত হয়।

কথার ব্যবহারের দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলি বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাক। কবিতায় বিশেষণগুলি অত্যন্ত

প্রয়োজনীয়। রূপ ফোটাবার এরা প্রধান সহায়। এখন মনে করা যাক যদি বলা যেত—

আজি কি তোমার শ্যামল মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।

বৈজ্ঞানিক অর্থ হয়ত "শ্যামল মূরতি" বললে ভালই হ'ত কেননা শরতে প্রকৃতির রূপ শ্যামল। কিন্তু সে অর্থে ভাবের ঐক্য রক্ষা হ'ত না। কেননা শরৎ প্রকৃতির চোখে দেখা শ্যামল রূপ বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য নয়। তিনি চান মাতৃমুখের ভাব বর্ণনা করতে। কাজেই ভাবকে "শ্যামল" বলে' বর্ণনা করার ততটা তাৎপর্য্য নেই যতটা "মধুর" বলে' করায়। ভাবসূচক অর্থ ভাবব্যঞ্জক কথাতেই বেশী স্পষ্ট হবে, রঙসূচক কথায় ততটা নয়। যদিও বিশেষ বিশেষ রঙ বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক, আর সে হিসাবে "শ্যামল" কথা দিয়ে কোমলতা আর মাধুর্য্যের আভাস দেওয়া যায়, কিন্তু এখানে অলঙ্কারের ব্যবহার না করে' স্পষ্ট বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

মূর্ত্তির পর অঙ্গবর্ণনামূলক কথাগুলি ধরি। "শ্যামল অঙ্গ" আর "অমল শোভা" না বলে' যদি "অমল অঙ্গ" আর "শ্যামল শোভা" বলতুম তা হ'লেও রসরূপের ব্যতিক্রম হ'ত, কেননা "শ্যামল" একটা রঙের পরিচায়ক, আর বর্ণনার বিষয় এই যে শ্যামল বর্ণসম্পন্ন যে অঙ্গ পরিষ্কৃতি আর উজ্জ্বলতার দিক থেকে তাই অমল। "শ্যামল অঙ্গ"ই "মধুর মূরতি"র সৃষ্টি করেছে আর তার অমলতা সে মূরতির প্রকাশকে মধুরতর করেছে। অতএব এখানে অমলতা শ্যামলতার একটা গুণ। তাই "শ্যামল"ই এখানে প্রধান কথা আর তার উল্লেখ আগে।

কথার আর এক রকম ব্যবহারের নিদর্শন দেবো। কবিতায় আছে "শারদ প্রভাতে," "শরৎকালের প্রভাতে"। এখন যদি "প্রভাতে" কথার স্থানে "সকালে" কথাটি ব্যবহার করি তাহ'লে কবিতার কোন পরিবর্ত্তন হয় কি? "সকালে" কথায় যে "ল" আছে তার অলস মন্থর গতিতে লুটিয়ে চলা অভ্যাস। অপর পক্ষে "প্রভাতে"র "র" আর "ত" এর গতি স্বভাবতঃ একটু ক্ষিপ্র, আর আমরা পূর্ব্বে যে সহসা অভিজ্ঞতার কথা বলেছি সেই অতর্কিতের ভাব একটু ক্ষিপ্র উচ্চারণযুক্ত কথার দ্রুততর গতিতেই যেন ভাল ফোটে। শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে "সকাল" হয় একটু বেলায়; আর "রাতের শেষে" "প্রথম সকালে"ই হ'ল প্রভাত; আর প্রথম সকালে যা দেখি তাই সহসা দেখা, তাই বিস্ময়ের দেখা।

আর একটি কথা "কানন সভাতে।" "কানন" না বলে' "বনানী" বা "বিপিন" বলে' যদি গোঁজামিল দেওয়া যেত তাহ'লে "কানন" এ যে কোয়েলের কাকলী শুনতে পাই তা তেমন ফুটতো না। "বনানী"তে বড় বেশী শুনি একটা ভ্রমরের গুঞ্জন। খোলামুখে উচ্চারিত কাননের ফাঁকে কোয়েল দোয়েলের উল্লাসের সুর ছড়ায় ভাল। বন্ধ ঠোঁটের বনের মধ্যে সে সুর যেন একটু আটকে যায়।

কথা ব্যবহারের এই দ্বিতীয় ধরণের দৃষ্টান্ত থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে একটা বিশেষ আবেষ্টনের মধ্যে পড়লে কথার তথ্যপূর্ণ অর্থ ছাড়া সাঙ্কেতিক মূল্য কত বেড়ে যায়। এর ফলে কবিতার রূপ আরো স্পষ্ট আকার লাভ করে। এই আর একটা কারণ যে জন্যে বলা যেতে পারে যে কাব্য পাঠ করলে ভাষাজ্ঞান সচেতন হয়।

এইবার ছন্দের কথা। কবিতার প্রথম চারটি ছত্র যদি এইভাবে লেখা হ'ত—"হে মাতঃ বঙ্গ! আজি শারদ প্রভাতে তোমার কি মধুর মূরতি হেরিনু। শ্যামল অঙ্গ অমল শোভাতে ঝলিছে।" এ হ'ত আমাদের দৈনিক খাওয়া পরার ভাষা; কাটাছাঁটা এর অর্থ। যতটা বলা হয়েছে ততটাই এর বক্তব্য। কিন্তু যখন ছন্দে আবৃত্তি করি—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে

তখন না বলে' দিলেও অনুভব করা যায় যে যদিও দুবারে একই শব্দসমষ্টি উচ্চারিত হয়েছে কিন্তু দুটো প্রকাশভঙ্গীতে যেন অর্থের একটু প্রভেদ হ'ল। ছন্দে আবৃত্তির বেলায় যেন কথার অর্থ ছাড়া আরো বেশী কিছুর একটা নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। সে বেশীটা কি তা আমাকে স্বয়ং কবিগুরুর কথায় বলতে হবে কেননা তাঁর চেয়ে বিশদ ক'রে বলবার ক্ষমতা আমার নেই।

"শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশী প্রকাশ করে। সেই বেশীটুকু যে কি তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ সে জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয় * * * * * এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয় হৃদয়ে।

'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'। ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। এটুকু বলবার জন্যে কথাকে বেশী নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে, অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে জায়গা দেখাশোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশী আদায় করে' নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম্মসঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে * * * *।

শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হ'ল তাই। সেইজন্যে কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠতে লাগল। একটি কথা ছাপার অক্ষরে যদিও ভালমানুষের মত দাঁড়িয়ে থাকবার ভান করে কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোন দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ * * * *।

আমরা ভাষায় বলে' থাকি কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তারবাঁধা সেতার। কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে"—(সবুজ পত্র চৈত্র ১৩২৪)

ছন্দের প্রকৃতি আর আবশ্যকতা বুঝলুম। এখন আলোচ্য কবিতাটির ছন্দরূপ লক্ষ্য করি। শ্রীযুত প্রবোধ সেনের নামকরণ অনুসারে কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অর্থাৎ কবিতার ছত্রগুলিতে অক্ষরসংখ্যা সমান নয় কিন্তু মাত্রার সংখ্যা সমান। একমাত্রা হ'ল একটি লঘু স্বর উচ্চারণের কাল। এ সম্বন্ধে আরো বিস্তৃতভাবে জানবার জন্যে আমি পাঠককে প্রবোধবাবুর ছন্দসম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়তে অনুরোধ করি। এখানে এইটুকুই বলবো যে উচ্চারণের কালের দিক থেকে উদ্ধৃত পদটির ১ম, ৩য়, ৫ম থেকে ৭ম আর ৯ম ছত্র, আর অন্যদিকে ২য়, ৪র্থ, ৮ম আর ১০ম ছত্র সমান মাত্রার। এই মাত্রা পর্য্যায় ছাড়া ছন্দের আর একটি অংশ আছে যতি, অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণের প্রবাহ ক্ষণেকের জন্যে থামে। এর ফলে সঙ্গীতে তালের মতন কাব্যের ছন্দও দ্রুত কিম্বা মন্থর হয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট বেগ গ্রহণ করে। এক কথায় যতি দিয়ে কাব্যে লয় নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান কবিতায় ছয় মাত্রার পর পর যতি পড়ে। প্রবোধবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে এই ছয়মাত্রার ছেদের মধ্যে তিনমাত্রা অন্তর একটি অল্পকাল স্থায়ী বা ঈষৎ যতিও পাওয়া যায়।

এখন রসসৃষ্টির দিক থেকে এই ছন্দশৃঙ্খলার কি প্রভাব হয়েছে তাই একটু দেখবার চেষ্টা করবো। আমরা দেখতে পাব যে ছন্দটি কবিতার ভাবরূপ বা মূল সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। সন্তানের মাতৃবন্দনার ভাব কি? চপল নয় অথচ গুরুগম্ভীরও নয়। তাতে স্নেহপ্রার্থীর সহাস প্রসন্নতা আছে অথচ ভক্তি, শ্রদ্ধা, আর সম্মানের গাম্ভীর্য্য আছে। এই লঘু গুরু মিশ্রিত সুরটি বর্ত্তমান ছন্দে সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ছন্দটিকে যদি একটু নাচুনে করে দিই—

আজ কি তোমার মূর্ত্তি মধুর
পড়ছে চোখে শারদ প্রাতে
বঙ্গমাতার অঙ্গ শ্যামল
ঝল্‌ছে অমল আলোকপাতে ? •

উচ্চারণ করলেই বোঝা যাবে যে প্রথম ছন্দটিই মাতৃ-বন্দনার বেশী উপযোগী। দ্বিতীয়টিতে শ্যালিকা সম্ভাষণ চলতে পারে। এইবার ছন্দটিকে একটু বেশী গম্ভীর করা যাক—

হে মাতঃ বঙ্গ আজি শারদ প্রভাতে
মধুর মূরতি কিবা নেহারিনু তব—
অমল শোভায় ঝলে শ্যামল বরাঙ্গ !

হাসতে জানে না এইরকম গম্ভীর ছেলের এই মেঘনাদ বধ করা সুরে কি মা'র হৃদয় বেশী স্পর্শ করে, না পূর্ব্বোক্ত হাসিখুসি মাখা অথচ প্রকৃত স্নেহভক্তি ভরা সুরে ?

আর একটা কথা। "আজি কি তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে" আর পরবর্ত্তী "হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে" এই দুটি ছত্রই সমান মাত্রার, দুয়েতেই ছয়মাত্রা অন্তর দীর্ঘ যতি আর তিনমাত্রা অন্তর ঈষৎ যতি। কিন্তু তবু দুটির উচ্চারণে কানে একটু প্রভেদ ধরা পড়ে না কি ? প্রথম ছত্রটিতে বেশীভাগ লঘু স্বরের মাত্রা হওয়ায় কবিতার প্রবাহ বা ঢেউয়ের প্রসারগুলি যেন একটু বড় বড়। দ্বিতীয় ছত্রে যুক্তাক্ষর বেশী হওয়ায় মাত্রাকাল সমান হয়েও ছন্দটি যেন একটু ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলে। প্রথমটির দীর্ঘতর প্রবাহ মধুর মাতৃমূর্ত্তির প্রশান্তির সঙ্গে তাল রাখে, আর দ্বিতীয়টির খরতর আর একটু ঝাঁপিয়ে চলায় অঙ্গ শোভার ঝলমলানি তেমনি করেই চিত্তস্পর্শ করে যেমন সকাল বেলাকার অল্প বাতাসে দোলা পাতার ওপর সূর্য্যকিরণ ক্ষণে ক্ষণে ঝিকমিক করে—"হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।"

তৃতীয়তঃ, ১ম থেকে ৪র্থ পর্য্যন্ত যদিও ছত্রগুলি একটি অন্তর সমমাত্রিক, কিন্তু ৫ম থেকে ৭ম তিনটিই পর পর সমান দীর্ঘমাত্রিক আর লঘুস্বর সমন্বিত। ফলে ঐ ছত্রগুলিতে নদীর, ধান ক্ষেতের আর পাখীর গানের যে উচ্ছলতা, অজস্রতা আর প্লাবনের কথা বলা হয়েছে তার ঢেউ পর পর আর অবাধভাবে এসে আমাদের লাগে আর সেই অবাধগতিতে মাতৃস্নেহের বাঁধনহারা বেগও আরো স্পষ্ট বিকাশলাভ করে। পরের ছত্রদুটিতে ছন্দ আবার মন্থর হয়ে এসে থেমে যায়। আমরাও তখন দেখি এতখানি চঞ্চলতার মধ্যে জননী দাঁড়িয়ে আছেন অবিরল ভাবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে থাকবে যে ছন্দের নির্ব্বাচনও কাব্যের ভাবরূপের দ্বারা স্বভাবতঃ নির্দ্ধারিত হয়। দুঃখে সুখে আমরা যেমন সহজেই হাসি কাঁদি, ছন্দের স্ফুরণও তেমনি সহজে হয়। আর তার বেগ আর বৈচিত্র্যও বিষয়ভাবের বেগ আর বৈচিত্র্যের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। ভাবরূপ বজায় রেখে তাই ছন্দও বদলান যায় না। ছন্দ বাইরে থেকে আরোপ করা পরিচ্ছদ নয়। কাব্যের রূপ আর সঞ্চারিণীশক্তির উন্মেষ আর লয় ছন্দের মধ্যেই। তার মধ্যে থেকে কাব্যের রস ছাড়া পায় কিন্তু ছড়িয়ে হারিয়ে না গিয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার বাঁধের মধ্যে থেকে অনন্ত আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে থাকে।

ছন্দ প্রসঙ্গেই কাব্যরচনার একটি অলঙ্কার "অনুপ্রাস সম্বন্ধে দুটি একটি কথা বলতে হবে। প্রথম দুই ছত্রে "র" বেশী রণিত হয়েছে। "মূরতি"র "ত" এর সঙ্গে "প্রভাতে"র "ত" তাল রেখেছে। "বঙ্গ"র প্রতিধ্বনি করছে "অঙ্গ"। আর "শ্যামল অঙ্গ"র ঢেউ এসে লাগছে "অমল শোভায়" "ল" দিয়ে "শ" আর "অ" আর "অ" আর "শ" এই পর্য্যায়ের মালা গেঁথে। অনুপ্রাসের সাহায্যে ছন্দ আর একটু গুঞ্জিত হয়; তার গতি আর একটু স্ফূর্ত্ত হয়। কিন্তু অনুপ্রাসের প্রয়োগও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আর সহজ হলে তবেই তার উদ্দেশ্য সফল হয়। স্বাভাবিক উদ্রেক নেই অথচ কেবল বাক-চাতুর্য্যের জন্যে রচনাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোচড় দিয়ে অনুপ্রাস বিদ্ধ করলে রচনা শ্রুতিকটু হয়, ভাব আড়ষ্ট হয়ে যায়, গতির সাবলীলতা থাকে না। ঘাড় ধরে শশীশেখর সরকারকে শশা খাওয়াবার পরিণাম ভাল হয় না। বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে অনুপ্রাসগুলি এত স্বাভাবিক যে তাদের যেন প্রথম দৃষ্টিতে দেখাই যায় না, অথচ অলক্ষ্যে থেকে তারা ছন্দকে আন্দোলিত করছে।

এ প্রবন্ধ এইখানেই উপসংহার করবো। কাব্যের আরো যে সকল লক্ষণ ও ভঙ্গী আছে সে সম্বন্ধে পরে অন্যান্য কবিতা থেকে উদ্ধৃত করে' আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। উপস্থিত আমরা জানলুম যে কবিতার স্বরূপ হ'ল রূপের মধ্যে ভাবের বিকাশ। কবির মনে প্রথম থেকে রূপে জড়িয়েই সে ভাবের আবির্ভাব আর ছন্দ অলঙ্কার ও ভাষার সাহায্যে তার স্পষ্টতা, আবেগ আর সঞ্চারিণীশক্তিতে প্রকাশ। ভাবরূপের প্রকৃতি এই যে সে ক্রমাগত অর্থের অতিরিক্ত, ধরা ছোঁওয়া আর বর্ণনার বাইরে, অথচ অনুভূতিরাজ্যের মধ্যে, এক বিস্ময় আর আনন্দের রসলোকের দিকে সঙ্কেত করতে থাকে যার পূর্ণ সংস্পর্শের জন্যে আমাদের আকুলতা হয়, আর প্রাপ্তি অনুসারে তৃপ্তি ঘনীভূত হয়। তখন যেন আমাদের চারিদিকের স্থূল পরিবেষ্টন মিলিয়ে আসতে থাকে আর এই রূঢ় জীবন এক স্বপ্নসঞ্জীবনে মেদুর হয়।

নবেন্দু বসু

কবি

শ্রীসুবিনয় ভট্টাচার্য্য এম-এ

তরুণ রাজকবি সে। রাজবাড়ীর উৎসব, আনন্দ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, বেদনাকে মূর্ত্ত করে তোলে সে তার বীণার ঝঙ্কারে, ছন্দের বন্ধনে। চোখে তার মোহন স্বপ্নাবেশ, কণ্ঠে তার সুরের মূর্চ্ছনা, জীবনযাত্রা তার নিয়ম-শৃঙ্খলহীন। আপন হৃদয়ের দুঃসহ আবেগকে সে বেঁধে ফেলে ভাষার বাঁধনে, লোকে বলে বিশ্ববাণীর অনিন্দনীয় প্রকাশ তাই। সে যেন বিশ্ব-বেদনার বাণী-রূপের প্রতীক—নিজস্ব কোনো সত্তাই যেন নেই তার! তার একান্ত নিজস্ব আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা-বোধ যেন থাকতে পারে না!···

······রাজকন্যা তরুণী। নিটোল পরিপূর্ণ তার যৌবন, অনবদ্য অতুলনীয় তার রূপ। বন্য হরিণীর নৃত্য-চাঞ্চল্য তার চরণে, পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর কলোচ্ছ্বাস তার হাসিতে, চকিত-চঞ্চল বিদ্যুতের দীপ্তি তার চোখে। কুমারী হৃদয়ের ধ্যান দিয়ে মনে মনে সে তার বরণমালা গাঁথে—অনাগত প্রিয়-তমের গলায় পরাবে বলে। নিজেকে ও নিজের ভবিষ্যত স্বপ্নকে নিয়ে রাজকন্যার দিন কেটে যায়। অন্তরালে বসে তরুণ কবি যে তারই স্তুতি-গানে পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলল, সে-কথা জানবার অবকাশ তার হয় না। কবির প্রেমের কবিতা পড়ে প্রশংসা-মুখর পাঠক বলে, "তরুণ হৃদয়ের চিরন্তনী বিরহ-ব্যথার নির্ভুল, ধ্রুব, শাশ্বত প্রকাশ এই কবিতা—এর মর্ম্মস্পর্শী, করুণ আবেদন যুগে যুগে বিরহী তরুণকে তার অন্তরতম মনের সঠিক ভাষাটি যুগিয়ে দেবে। ধন্য কবি, সার্থক তার রস-সৃষ্টি!"······

···তারপর একদিন মহাসমারোহে রাজকন্যার বিবাহ হয়ে যায়। সবল, উন্নত, প্রিয়দর্শন রাজপুত্রের বুকে মাথা রেখে রাজকন্যা মনে মনে বলে, "ওগো! আজ আমি ধন্য—পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আমার হৃদয়। আমার কুমারী হৃদয়ের যত মধু, যা কিছু সম্বল, সব তোমার পায়ে উজাড় করে দেবো বলে সঞ্চয় করে রেখেছি। আজ আমি নিশ্চিন্ত-নির্ভরতায় সঁপে দিলাম নিজেকে তোমার বুকে। জানি, এর চেয়ে দৃঢ়, এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আমার জগতে কোথাও নেই।"...অজস্র পাওয়ায় ভরে-যাওয়া বুক নিয়ে তৃপ্ত রাজকন্যা ছুটে আসে কবির কাছে। বলে, "কবি, বাজিয়ে তোলো তোমার বীণায় পরিপূর্ণ মিলনের অনাহত রাগিণী। দিকে দিকে ঘোষণা করো তোমার অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের মহামিলনের আনন্দ-বার্ত্তা। বিস্ময়-বিমুগ্ধ বিশ্ব-প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে শুনুক সেই অমর প্রেমের মহান গাথা।" আনন্দের আবেগে রাজকন্যা তার পুষ্প কলির মত হাতে চেপে ধরে কবির দুই হাত। বেতস পত্রের মত কেঁপে ওঠে কবির সারা অঙ্গ। আনন্দ ও বেদনার এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হয় তার মনে। আবেগের আতিশয্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে রাজকন্যা লজ্জিত হয়ে পড়ে। আরক্ত মুখে বলে, "ভুলো না, কবি, আমার অনুরোধ।"···

···সরস, মধুর মিলন-গীতি হাতে পেয়ে রাজকন্যা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মহামূল্য রত্নহার উপহার পাঠিয়ে দেয় কবিকে। স্বহস্ত-চয়িত গন্ধপুষ্পের কোমল শুভ্র মালাটি কিন্তু থাকে রাজপুত্রের তরে—রাজকন্যার বুক-ঢালা ভালবাসার অম্লান পূজা-উপচার হয়ে।···

···রাজকন্যা চলে যায় শ্বশুরের রাজ্যে। কবির ভুবন শূন্য হয়ে যায়। আকাশ হারিয়ে ফেলে তার নীলিমা, বাতাসে থাকে না মাদকতার স্পর্শ, দেবদারু গাছের কচি সবুজ পাতার কাঁপন মনে কোনো সাড়াই জাগায় না। নিরুৎসুক, উদাস দুটি চোখ মেলে কবি চেয়ে থাকে সুদূর দিগন্তের পানে যেখানে ডুবে-যাওয়া সূর্য্যের শেষ-রশ্মি-রেখা-রক্তিম আকাশ মিশে গেছে ধরিত্রীর শ্যামল বুকে। অন্ধকার নিবিড় হয়ে নামে, নীড়ে-ফেরা পাখীর কলরবে সাঁঝের

আকাশ মুখর হয়ে ওঠে। কবির অন্তঃস্থল হতে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস অতি ধীরে উঠে গন্ধে-আকুল দখিনা-বাতাসে মিশে যায়।···

···দিন যায়···রাজকন্যা আবার ফিরে আসে তার পিতৃ-সকাশে। পুঞ্জে পুঞ্জে নববর্ষার নিকষ-কালো মেঘ নীল আকাশকে ঢেকে ফেলেছে। মেঘান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার বুকে প্রিয়-বিচ্ছেদের নিবিড় বেদনা ঘনিয়ে উঠছে। আঁধার আকাশের দিকে চেয়ে রাজকন্যা তার নির্ব্বাক বেদনাকে একটা রূপ দিতে চেষ্টা করছে—পারছে না। রাজকন্যা ডেকে পাঠালে রাজ-কবিকে। কবি এসে দেখলে রাজকন্যার পেলব তনু ঘিরে আজ ঘন নীল বাস; কবরীতে তার সিক্ত-যূথির মালা; নিবিড় কালো চোখে তার বাদলের সজল ছায়া নেমেছে। বৃষ্টি-ভেজা বাতাস তার বন্ধন-চ্যুত অলকগুচ্ছ নিয়ে খেলা করছে।···রাজকন্যা বল্লে, "ওগো ভাষার ভাণ্ডারী! যে ব্যথা আজ মনের মধ্যে বাণীর কাঙাল হয়ে গুমরে গুমরে উঠছে, তাকে তুমি ছাড়া কে পারবে মুক্তি দিতে? বলো, কবি, কী কথা আমি বলতে চাই আকাশ, বাতাস, চরাচর ভুরে দিয়ে? আমার সুতীব্র অনুভূতিকে তুমি দাও ভাষা, তুমি দাও সুর।" মস্তক অবনত করে কবি রাজকন্যার আদেশ শিরোধার্য্য করে নিলে। যে নিবিড় ব্যথার কান্না ঝরে ঝরে পড়তে লাগলো কবির বীণার ঝঙ্কারে, রাজকন্যা তা শুনে চোখের জল ধরে রাখতে পারলে না। সে সুর শুনে মনে হতে লাগলো যেন একটা বিশ্ব-জোড়া ব্যথার ভার পৃথিবীর বুকে চেপে বসেছে। বৃষ্টির ধারায় কার যেন বুক-ভাঙা কান্না অবিরল ধারে ঝরছে। বাদল-বাতাস যেন সেই চির-বিরহীর বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস। কবি তখন মনে মনে বলছে, "যে আছে দূরে, সে কাছে এলেই তো বিচ্ছেদের অবসান। কিন্তু যে কাছে থেকেও দূরে রয়ে গেল, তার দূরত্ব ঘুচবে কি করে?" রাজকন্যা আর সইতে পারলে না। দু'হাতে মুখ ঢেকে বল্লে, "থামাও কবি, তোমার নিদারুণ দুঃখের গান। উঃ, তুমি কি যাদুকর? এত কান্না কি করে পুরে দিলে তোমার ঐ প্রাণহীন যন্ত্রের বুকে?"······

······শ্রাবণ পূর্ণিমা। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে অনাবিল জ্যোৎস্নার ধারা এসে পড়েছে সিক্ত রাজোদ্যানের ওপর। অনতিস্ফুট, আবছা আলোয় চতুর্দ্দিক অপরূপ রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দীঘির পাড়ে মর্ম্মরবেদীতে বসে কবি গাইছে—

"যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি,
তবু মনে রেখো।"

রাজকন্যা উদ্যানে যূথি, বেলি ও মল্লিকা চয়ন করছিলো—স্বহস্তে। গান তার কানে গেল। বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সংশয় তার মনে উঁকি দিল। মুহূর্ত্তের জন্যে সে একটা প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার ঝাড়ের কাছে মর্ম্মরমূর্ত্তির মত স্থির, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবলে। তারপর চঞ্চল পদে সে কবির কাছে গিয়ে বল্লে, "একটা কথা জিজ্ঞেসা করবো, কবি। সত্য উত্তর চাই।" কবি তার স্বপ্নময় চোখদুটি একবার রাজকন্যার মুখের ওপর স্থাপন করেই ফিরিয়ে নিলে। রাজকন্যা পুনরায় বল্লে, "সত্য বলো, কবি, কে তোমার মানসী? কে তোমার প্রিয়া? বলো, কে তোমায় প্রেরণা জোগায়?" নির্ব্বাক কবি অপরাধীর মত মস্তক অবনত করলে। রাজকন্যা আবেগ-বিকম্পিত স্বরে বল্লে, "বলো, বলো কবি। চুপ করে থাকলে চলবে না। আমি উত্তর চাই। তোমার মানসী-প্রিয়া কে?" ধীরে, অতি ধীরে কবি বল্লে "তুমি।" রাজকন্যার আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে কবি আবার বল্লে, "তুমি আমায় বলতে বাধ্য করলে, রাজকন্যা। নৈলে, একথা এক আকাশের সন্ধ্যা তারা আর আমার অন্তর্য্যামী হৃদয়দেবতা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তুমি আমায় তিরস্কার করবে? আমায় শাস্তি দেবে? কিন্তু তার তো প্রয়োজন ছিল না, রাজকন্যা! আমার নীরব ভালবাসা নিয়ে আমি তো চিরদিন দূরেই থেকেছি। প্রেম-নিবেদন করে আমার আরাধ্যদেবীর অপমান তো আমি কখনো করিনি।" অভিমান-ক্ষুব্ধ-কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে এল।

···রাজকন্যার স্নিগ্ধ চোখ দুটিতে সম-বেদনার অশ্রু ছলছল করে উঠলো। তার অতুলনীয় আঁখিদুটি কবির মুখের দিকে তুলে কোমল কণ্ঠে রাজকন্যা বল্লে, "বুঝতে পেরেছি, কবি, তোমার ব্যর্থ প্রেম তোমায় কতটা আঘাত দিয়েছে। কিন্তু সে আঘাত নিষ্ফল হয়নি। নীলকণ্ঠ তুমি, বেদনার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে জগতকে তুমি যা দিয়েছো, যুগ যুগ ধরে রস-পিপাসু নরনারী তাতে তৃপ্ত হবে। জগত তোমায় দিয়েছে আঘাত, কিন্তু তোমার সুরে বাঁধা হৃদয়বীণা সেই আঘাতে অনির্ব্বচনীয় রাগিণীর সৃষ্টি করে সমগ্র সংসারকে বিস্ময়-স্তব্ধ করে দিয়েছে। তোমার বেদনা পাওয়া সার্থক হয়েছে, কবি। ব্যথার সাগর মন্থন করে তুমি সুধা বিতরণ করেছো জগত-জনকে।···আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা সঞ্চিত রইল তোমার জন্যে। সারা প্রাণ দিয়ে আমি কামনা করি তোমার বিচ্ছেদও রমণীয় হয়ে উঠুক। চরমতম দুঃখকেও যেন তুমি কেবল হৃদয়ের গুণে সুন্দর করে তুলতে পারো। আর কামনা করি জগত যেন তোমার যথার্থ মূল্য বুঝতে পারে।"

সুবিনয় ভট্টাচার্য্য

রেমব্রাণ্ড্ ও ডাচ্ আর্ট

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম্-এ

Art for arts sake কথাটা আমরা আজকাল যত সহজে আওড়াইয়া যাই রেম্‌ব্রাণ্ডের সময়ে এ কথাটার প্রচলন তো ছিলই না, অধিকন্তু তখন art for all কথাটাই লোকের মুখে মুখে ফিরিত। প্রোটেষ্টাণ্ট হলাণ্ডে আর্ট বা চিত্র-শিল্পকে যাহারা মর্য্যাদা করিত তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল সাধারণ জন-মণ্ডলী। ফটোগ্রাফ তখনও আসিয়া আমাদের ড্রয়িং-রুমে স্থান করিয়া লয় নাই, চিত্র-শিল্পটা নিতান্তই করিয়াই মানুষের হাতের কাজ ছিল। কিন্তু বেশীকাল এমন চলিল না, বিজ্ঞানের পড়ুয়া মানুষের হাতের কাজের উপরও যন্ত্র-রাজের রঙের ছোপ বসাইয়া দিল। যখনকার কথা বলিতেছি তখন ফ্লাণ্ডার্স কাল্‌চারের দিক দিয়া অন্য সব শহরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। বড়লোক আর সৌন্দর্য্য-পিপাসুরা দলে দলে আসিয়া ভীড় করিতেছেন, আর্ট কেবলমাত্র সুন্দরের আরাধনায় মজিয়া আছে। কিন্তু চিত্র-শিল্প জিনিষটা নিতান্ত করিয়াই "tailors and shoe makers"-দের নির্দ্দেশিত পথে চলিতেছিল। ঠিক এমনি সময়ে রেম্‌ব্রাণ্ড ভ্যান্ রিজন্ লেডেনের এক কল-ওয়ালার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাপ কল্-ওয়ালা, আর্ট লইয়া তাহার চৌদ্দ পুরুষ কেহ কোনদিন মাথা ঘামায় নাই, কিন্তু ছেলেটিকে যে কেমন করিয়া চিত্র শিল্পের মোহ পাইয়া বসিল তাহা কেহই ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিল না। হলাণ্ডের জলো জমিতে ফুলের বাহার সুপ্রচুর; লাল-নীল-হলুদ ফুলে চোখ ঝল্‌সাইয়া দেয়। রেম্‌ব্রাণ্ড জন্মাবধিই প্রকৃতির দুলাল। ড্রয়িং-রুমের দুই চারিটা সাজানো শিশি লইয়া তিনি ছবি আঁকেন নাই, যে প্রকৃতি ফুলে-ফলে, রূপে-রসে চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া মানুষের নয়নকে ভুলাইতেছে তিনি সেই প্রকৃতিকেই তাঁহার ওস্তাদ্ ব্রাশের মুখে বন্দী করিয়া রূপ দিয়াছেন। তখনকার দিনে লোকে ছবি আঁকিত ফরমাইসের ফলে। হল্‌বিন্, র‍্যাফেল, ভ্যালাজকুয়েজ, রুবেন্স্ এঁরা সবাই "কমিশনে" ছবি আঁকিতেন, অর্থাৎ কিনা চুক্তি করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট চিত্র শেষ করিতেন ও সেই অনুসারে পুরস্কার পাইতেন। আর্ট হইয়া পড়িয়াছিল হুকুমের দাস। রেমব্রাণ্ড এই হুকুমের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিলেন। ডাচ আর্ট যখন গোলামীর পায়ে তাহার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়াছে, রেমব্রাণ্ড তখন তাহার মুক্তি-বাণী ঘোষণা করিলেন। যে আর্ট ছিল art for all সে আর্ট হইল art for arts sake! আজ তাই যখন চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা শেষোক্ত কথাটি আওড়াই তখন মনে পড়িয়া যায় যে এ বাণীর জন্মদাতা বিখ্যাত শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ড এবং আপনা হইতেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে।

মস্ত বড় পড়ুয়া পণ্ডিত লোক হইব এই আশা লইয়াই রেমব্রাণ্ডের লেখাপড়া প্রথম আরম্ভ হয়। লেডেনের য়ুনিভার্সিটিতেই তিনি যাতায়াত করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাঁহার ভিতরকার শিল্পী-আত্মাটি জাগিয়া উঠিল। ল্যাণ্ডস্কেপ্ পেইণ্টার আইজাক্ সোয়ানেনবার্‌ঘ্ এই সময়েতে লেডেনে খুব নাম-ডাক করিয়া বসিয়াছিলেন। তরুণ-শিল্পী আইজাকের সঙ্গে মিতালী করিয়া তাহার ষ্টুডিয়োতে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই রেম্‌ব্রাণ্ডের মন বদ্‌লাইল, তিনি Pieter Lastman এর ষ্টুডিয়োতে ঢুকিলেন। সোয়ানেনবার্‌ঘ বা লাষ্টম্যান্ রেম্‌ব্রাণ্ডের উপর যে কতখানি impression সৃষ্টি করিয়াছেন সে কথা সঠিক বলিতে গেলে অসত্যেরই অবতারণা করা হইবে। সত্যকারের genius লইয়া যাঁহারা পৃথিবীতে জন্মাইয়াছেন তাঁহারা পরের genius-কেও এমন সুন্দর আয়ত্ত করিয়া ফেলেন যে কোনটা তাঁহাদের

নিজস্ব আর কোনটা পরকীয় তাহা চেনা ভার। রেম্‌ব্রাণ্ডের পক্ষেও এ কথাটি নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। সুতরাং সোয়ানেনবারঘ বা লাষ্টম্যানের কাছে রেম্‌ব্রাণ্ডের ঋণ কতটুকু বা কতখানি সে বিচারে আজ না বসিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে Durer-Wohlgemuth শিষ্যত্বের কথা মনে পড়িয়া যায়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে Durer' এর সঙ্গে Rembrandt'এর খানিকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

রেম্‌ব্রাণ্ডের প্রাথমিক চেষ্টার ইতিহাসের কথা শুনিলে অনেকেরই হাস্যোদ্রেক হইবে। একটি সমালোচক এ সম্পর্কে মস্ত বড় একটা খাঁটি কথা বলিয়াছেন, "these youthful efforts are painfully devoid of interest……At one time he occupies himself with meticulous trivialities which are both uninteresting and pedantic, and at another he grapples laboriously with the light problems which his age had propounded to its painters." রঙ্‌দারী কাজের জন্য পৃথিবীর চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে রেম্‌ব্রাণ্ডের নাম অমর হইয়া আছে। র‍্যাফেল আর রেম্‌ব্রাণ্ড দুইজনা যেন ল্যাটিন ও জার্ম্মেনিক্ চিত্র-বোধের নমুনা দিতেছে। র‍্যাফেলের আর্টে beauty of form যেমন একান্ত করিয়া চোখে পড়ে, রেমব্রাণ্ডের আর্টে আলো-ছায়ার রঙের জৌলুষটাই মন ভুলাইয়া দেয়। এক কথায়, র‍্যাফেল চোখ ভুলায় আর রেমব্রাণ্ড মনোহরণ করে। এখন কথা হইতেছে কোনটাকে বড় বলিব, কোনটাকে ছোট বলিব। চোখ মনের চাইতে বড় অথবা মন চোখের চাইতে বড় এ প্রশ্নের মীমাংসা যখন হইবে না, তখন সেই হিসাবে এই দুই শিল্পীর ছোট-বড়ত্বর বিচার করিতে বসিলে কেবলমাত্র মূর্খতারই পরিচয় দেওয়া হইবে। ষোড়শ শতাব্দীতে চিত্র-শিল্প লাইন এবং মডেলের দিকেই নজর দিত বেশী, কিন্তু ইহার বাহিরেও যে বিস্তর টেক্‌নিক্ রহিয়া গিয়াছে সে কথা সহজে স্বীকার করিত না। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাঠামোর দিকে ততটা নজর না দিয়া আলো-ছায়ার setting'এর উপর চিত্র-শিল্পীদের জোর ঝোঁক চাপিল। Light and shade contrast জিনিষটার জন্য অবশ্য আমরা ক্যারাভ্যজিও'র কাছে ঋণী। আল্‌সের পাহাড়ে যে আলো-ছায়ার লীলা প্রতিনিয়ত রিহার্সাল দিতেছে, ক্যারাভ্যজিও সে দৃশ্যে মুগ্ধ হইলেন। আলো ও ছায়ার খেলাকে ব্যাক্-গ্রাউণ্ড করিয়া ছবিস্থ বক্তব্যটিকে সুস্পষ্ট করিবার রচনা-রীতি এই ইতালীয়ানটিই পৃথিবীকে শিখাইয়াছেন। রেম্‌ব্রাণ্ডের এককালীন গুরু লাষ্টম্যান্ এই ক্যারাজিও'র কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন এ কথাটাও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং আমার এই মতটি প্রকাশ করিতে এতটুকু দুর্ভাবনা নাই যে আলো-ছায়া বৈষম্য সম্পর্কিত চিত্রাবলীতে রেম্‌ব্রাণ্ডের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিতান্তই কম। রেওয়াজ যখন যেটা ওঠে তখন সেটার নিন্দা এবং প্রশংসা দুইই সুপ্রচুর শুনিতে পাওয়া যায়—ক্যারাভ্যজিও'র আর্ট যেমন আপনা হইতে একদল শিষ্য জোগাড় করিয়া লইল, অপর দিকে তেমনি আর একদলের সৃষ্টি হইল যাহারা "the art of the cellar trap-door" বলিয়া ক্যারাভ্যজিও'র ওপর একচোট গালি-বর্ষণ করিল। এখন দেখা যাউক রেম্‌ব্রাণ্ড এই আলো-ছায়া মূলক ছবি কেমন আঁকিয়াছেন। জেলের ভিতর বৃদ্ধ পলের যে ছবি রেমব্রাণ্ড আঁকিয়াছেন সে ছবিখানি দেখিলে মোটামুটি একটা কথা বিশেষ ভাবে চোখে লাগে। অন্ধকার একটা কুঠুরীতে যদি সহসা দুই চারিটি আলোর রেখাপাত করা যায় তো সেই কুঠুরীর ভিতরের জিনিষগুলি আলো এবং অন্ধকারের ব্যাক্-গ্রাউণ্ডে এক নতুন চেহারা লইয়া দেখা দিবে; শুধু আলো বা শুধু অন্ধকারে সে বৈচিত্র্যের পরিচয় মিলিবে না। Paul in Prison ছবিখানিতে তাই চোখের খোরাক যেমনটি আছে মনের খোরাক তেমনটি নাই। Richard muther এই ছবিটি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে "his picture resembles a Caravoaggio reduced to trivial prettiness." ইহার চাইতে স্পষ্টতর বিশ্লেষণ আমি করিতে পারিব না।

ঠিক এই স্কুলেরই আর একটি ছবি বার্লিন ম্যুজিয়ামে রহিয়াছে এবং অনেকে হয়তো সেটি দেখিয়াও থাকিবেন। একটি বৃদ্ধ পোদ্দার মোমবাতির আলোতে একটি স্বর্ণ-মুদ্রা

পরীক্ষা করিতেছে এইটিই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। এই চিত্রটিতেও চিন্তা-শক্তির পরিচয় খুবই কম, কেবলমাত্র রঙ্ দারী কারুকার্য্যের নমুনা।

"Je häis le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne ris, jamais je ne pleure।" ষোড়শ শতাব্দীর পক্ষে Beaudelaire-এর এই কথাটি সর্ব্বাংশে এবং সর্ব্বথা প্রযোজ্য। কিন্তু barocco period নিতান্ত করিয়াই চিত্ত-চাঞ্চল্যের যুগ ছিল। রেমব্রাণ্ড সহজেই যে কোন জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেন। সুতরাং তাঁহার চিত্রাবলীতে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন attitude ধরা পড়ে। লেডেনের সময়ের আরো দুইটি ছবির নামোল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। এ দুটিই ১৬৩১ সনে আঁকা, একটি আছে ম্যুনিকে, আরেকটি দি হেগে। একটিতে একটি কারু-শিল্পীর গৃহাভ্যন্তর দেখা যায়, আরেকটিতে "Simeon in the Temple." এগুলি শিল্পীর ছোটোখাটো কাজের মধ্যে গণ্য হইয়া আছে। কিন্তু Woman Bathing, The Flayed Ox প্রভৃতি যে ছবিগুলি প্যারীর লুভ্‌র মুজিয়ামে আছে সেগুলিতে আমরা অমর শিল্পী রেমব্রাণ্ডের মনোলোকে গিয়া পৌঁছাই, দুই চারিটি লাইনে এমন কতগুলি feature ফুটিয়া উঠিয়াছে যে কোটী কথায়ও তাহাদের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া সবটুকুনই অব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে The mother of Herdrickje ছবিখানায় অপূর্ব্ব মুন্সিয়ানা আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হলাণ্ডে প্রতিকৃতি (portrait) জাতীয় ছবি অগুণতি আঁকা হইয়াছে। ফ্লেমিশ শিল্পীদের ক্যানভাসে "blue-blooded aristocrats" বা অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের চেহারাই বেশীর ভাগ দেখিতে পাই কিন্তু ফ্লেমিশ আর্ট যে সময়ে আভিজাত্যের উপর ঝোঁক দিয়াছে ঠিক সেই সময়েই ডাচ্ আর্ট ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, পাদ্রী ইহাদের প্রতিকৃতি অঙ্কনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। ভ্যান্ ডাইক্ যে সমস্ত কুল-ললনার প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হইতেছেন অভিজাত শ্রেণীর— ভ্যান্ ডাইকের আর্ট লইয়া যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এ সত্য নিশ্চয়ই ধরা পড়িয়াছে। ডাচ্ আর্টে সাধারণ ঘরোয়া জীবন, নিতান্তই অকেজো একটা ঘটনা-চিত্র, অথবা একটি দাসী কি বাঁদী, কি নিতান্তই একটা বুনো ফুল এই সমস্তই দেখিতে পাই বেশীর ভাগ। ফ্লেমিশ আর্টে বাহিরের ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। রাণী চলিয়াছেন সম্মুখে, পিছনে দাসী শাড়ীর আঁচল হয়তো সশঙ্কিতে আগ্‌লাইয়া চলিয়াছে অথবা প্রকাণ্ড কোন রাজপ্রাসাদ, তাহার মিনার কিম্বা প্রাচীর-গাত্রের শিল্প-সৌকর্য্য-এই সকল লইয়াই ফ্লেমিশ আর্টিষ্ট্‌রা বেশীর ভাগ বেসাতি করিয়াছেন। জীবনের দারিদ্র্যে, জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় যে অলক্ষ্য ঐশ্বর্য্য পলে পলে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়া ঠিক তেমনি ভাবে সবাকার অগোচরে সকল ঐশ্বর্য্যকে অপচয়ের পথে নিরন্তর টানিয়া লইয়া চলিয়াছে তাহার পরিচয় বা স্বাদ ফ্লেমিশ্‌দের কপালে মিলে নাই। ডাচ্ আর্ট এই দিক দিয়া একটা প্রকাণ্ড বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। রেম্‌ব্রাণ্ডের শিল্পে তাই প্রথম দিক্ দিয়া ক্যারাভ্যাজিও'র "Cellar trap style" এর ছাপ্ থাকিলেও, শেষের দিকে ডাচ্ আর্টের এই সুস্পষ্ট attitude-টুকুনের অব্যর্থ পরিচয় আছে। রেম্‌ব্রাণ্ড এজন্য আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

রেম্‌ব্রাণ্ডের শিল্পী-জীবনকে গুটিকয়েক স্তরে ভাগ করা যায়। পূর্ব্বোক্ত ক'টি লাইনে যাহা লিখিয়াছি তাহা কেবলমাত্র তরুণ বয়সের শিল্প প্রচেষ্টার আভাসই দিতেছে। এইবার পরিণত বয়সের শিল্প-পরিণতির কথা বলিব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাস্তবের প্রতি একটা আকর্ষণ আপনা হইতেই জন্মাইয়া উঠে। এই ছোট্ট প্রবন্ধ-টুকুনের মধ্যে আমি রেম্‌ব্রাণ্ডের জীবনী আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার আর্টেরই কিছুটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু একটা কথা এই জায়গায় বলিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রেম্‌ব্রাণ্ড Amsterdamএ কাজ করিতে করিতে একটি মেয়ের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলেন, এই মেয়েটির নাম হইতেছে Saskia. কিন্তু সেই পুরাণো গল্প—কল্‌ওয়ালার ছেলে আর ধনীর মেয়েতে বিবাহ বড় সহজে হইয়া উঠেনা। এই ব্যাপারে রেম্‌ব্রাণ্ডের পার্থিব

অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটিল। ইহার পর রেম্‌ব্রাণ্ডের চিত্র-শিল্পে আমরা যাহা কিছু বাস্তব তাহারই সমাদর দেখিতে পাই সমধিক। রেম্‌ব্রাণ্ডের জীবনে এই realism period এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। Rape of Proserpine এই সময়েরই একটি ঘটনামূলক চিত্র। The Rape of Ganymede ছবিটি এখন ড্রেস্‌ডেনে আছে। যে বাস্তব-প্রীতির কথা এইমাত্র আপনাদের কাছে উল্লেখ করিলাম, এই ছবিখানিতে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু যেন বিশেষ করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুথারের যে বইখানি Francis Cox তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহাতেও এই লাইনটি লেখা রহিয়াছে "treats his subject.........with a realism similar to that which distinguishes Ribera from Correggio" (p. 22)

ঠিক্ এই সময়েতেই প্রাচীর প্রতি রেম্‌ব্রাণ্ডের একটা অসম্ভব টান জন্মিয়া উঠিল। ডাচ্ বুর্জ্জোয়া সমাজ তাঁহার শিল্প-প্রেরণার খোরাক্ জোগাইতে গিয়া সহসা যেন হার মানিল। উত্তরে Amsterdam-এ ইহুদীদের একটা প্রকাণ্ড আস্তানা ছিল। রেম্‌ব্রাণ্ড্ ক্রমশঃ ইহুদীদের মস্ত দোস্ত্ হইয়া পড়িলেন, এমন কি লোকে বলাবলি করিতে সুরু করিল যে রেম্‌ব্রাণ্ড্ নিজেই একজন ইহুদী। Sacrifice of Abraham ছবিখানি দেখিলে অবাক্ হইতে হয়—কী নিখুঁতভাবে ইহুদীদের প্রত্যেকটি আচার-বৈশিষ্ট্যের প্রতি রেম্‌ব্রাণ্ড্ লক্ষ্য রাখিয়াছেন! ফরাসী রোমাণ্টিক্ স্কুলের শিল্পীরা, Delacroix, Decamps, Guillaumet ইত্যাদি য়্যাল্‌জিয়ার্স, টিউনিস্, ক্যায়্‌রো প্রভৃতি জায়গায় শফরে বাহির হইতেন তাঁহাদের শিল্প-প্রেরণায় বৈচিত্র্যের জন্য। রেম্‌ব্রাণ্ডের না ছিল সুবিধা, না ছিল অর্থ বল। সুতরাং এক Amsterdam-এর ইহুদী-সমাজই এই ডাচ্-শিল্পীকে নব-প্রেরণা বহন করিয়া আনিল। আর ঠিক্ এই সময়েতেই তিনি Breestraat-এ একটি বাড়ী কিনিলেন। Reconciliation of David and Absalom, Angel foretelling the birth of Samson to Manoah and his wife প্রভৃতি চিত্রে রেম্‌ব্রাণ্ড্ Amsterdam'এর ইহুদী ও ইহুদীনিদের ছবিই আঁকিতেছিলেন মাত্র। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিত্রও রেম্‌ব্রাণ্ড্ অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত আঁকিয়াছেন। ইতালীয়ান্ শিল্পীদের এই শ্রেণীর ছবিগুলি নিতান্তই "Church pictures" হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেই হেতু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-বোধ যে পরিমাণে বেশী, সৌন্দর্য্য-বোধ বা শিল্প-বোধ সেই পরিমাণে কম। এক জিনিষ দুই কাজ সমান শৃঙ্খলার সহিত করিতে পারেনা ইহা সাধারণ-জ্ঞানের কথা। ইতালীয়ান্ শিল্পীদের জন্য তাই দুঃখ হয়। চমৎকার চিত্র, গস্‌পেলের যতরকম নির্দ্দেশ আমরা পুঁথিতে পড়ি প্রায় সব কিছুই ছবির পরিকল্পনায় লাগানো হইয়াছে। লাইন, রঙের ব্যবহার সরঞ্জামের সৌকর্য্য সবই নিখুঁত্ হইয়াছে কিন্তু তবু কেন যেন একটা স্বচ্ছতা, একটা মনো-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিতে পাইনা। রেম্‌ব্রাণ্ডের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিত্রাবলীতে গস্‌পেলের নির্দ্দেশিত অনেক কিছু প্যারাফার্‌নেলিয়াই নাই, কিন্তু আছে আরেক্‌টা জিনিষ—সেটা Soul Quality বা প্রাণ-বস্তু। Barocco যুগের ইটালীয়ান গীর্জ্জা সমূহের বেশীর ভাগ ছবিই এক টাইপের—রেমব্রাণ্ডের ছবিতেও এই ইতালীয়ান ছাপ সুপ্রচুর রহিয়া গেছে। কিন্তু রেমব্রাণ্ডের শিল্প-সৃষ্টিতে কোন দাসত্বের চিহ্ন নাই, তিনি প্রত্যেকটা জিনিষ নতুন করিয়াছেন এবং সেই চিন্তাকে কলমের আঁচড়ে অপরূপ ঐশ্বর্য্য, অপূর্ব্ব ভাবাবেগ দিয়াছেন। গতানুগতিক আর্টিষ্টদের সঙ্গে এইখানেই রেমব্রাণ্ডের তফাৎ। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমানে ভারতীয় আর্টে একটা সমস্যার আমদানি দেখিতেছি। রবি বর্ম্মার ছবিতে আমরা পৌরাণিক দেব-দেবীর কতকগুলি বিশিষ্ট pose দেখিয়াছি এবং আজ অবধি সেইগুলি আমাদের আঁখির আগে অক্ষয় স্মৃতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু এ কালের কয়েকটা তরুণ শিল্পী এই Conventional types গুলোকে পিছনে ফেলিয়া নিজেদের কল্পনা মত ছবি আঁকিতে সুরু করিয়াছেন। ইহা সু-লক্ষণ, তাই বলিতেছি আমাদের আর্টিষ্টদের এই সুমতি যেন অব্যাহত থাকে। শ্রীযুত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এসম্পর্কে চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। রেম্‌ব্রাণ্ড্‌ই ডাচ্ আর্টে সর্ব্ব-প্রথম নব-কল্পনার, নব চেতনার উদ্বোধন করেন—তিনিই প্রথম "টাইপে"র দাসত্ব হইতে নিজেকে সবলে

মুক্ত করেন। লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চির Last supper আর রেম্‌ব্রাণ্টের Last supperএর পরিকল্পনায় আকাশ-পাতাল তফাৎ রহিয়া গেছে। Adoration of the Magi, Good Samaritan, Christ with disciples at Emmaus প্রায় সবগুলি চিত্রেই ডাচ্‌ কল্পনার অনবদ্য পরিচয় পাই। কিন্তু অন্ততঃ আর একটী ছবির নাম না করিলে এ প্রবন্ধ একপ্রকার অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে—সেটী হইতেছে Night Watch. এই ছবিটীর প্রশংসা করিতে গেলে হয়তো সে চেষ্টা বৃথাই হইবে কেননা রেম্‌ব্রাণ্ডের এই ছবিখানির ভাষা আজ বৎসরের পর বৎসর বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। বাংলাদেশে এক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দুই চারিটী ছবিতে এই ধরণের শিল্পরীতি-বোধ দেখিয়াছি। কোন অনাবশ্যক detail লইয়া শিল্পী ছবিটাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই, দুই চারিটী suggestion'এর ভিতর দিয়া একমাত্র ঘটনা আঁখির আগে অতি অনায়াসে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শিক্ষানবিশ শিল্পীরা যেখানে আঁচড়ের উপর আঁচড় কাটিয়া হয়রান্ হইতেছেন, ওস্তাদ মণিকার সেখানে দুই চারিটী রেখা-পাতে একটী সুবৃহৎ প্রাণ-বস্তু সৃষ্টি করিয়া ফেলিবেন। Signac তাঁহার বিখ্যাত' বই D' Eugine Delabroix au neoimpressionisme'এতে যে সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন রেমব্রাণ্ড্‌ বহু পূর্ব্বেই সে সম্বন্ধে ভাবিয়াছেন। Luminist হিসাবেই অনেকে তাঁহাকে জানেন, কিন্তু কত বিচিত্রভাবে যে রঙের, আলো-ছায়ার খেলা-ঘর রচিয়াছেন তাহা ভাবিলে অপরূপ বিস্ময়ে মন ভরিয়া ওঠে। ডাচ্‌ আর্ট আজ যদি কাহারও জন্য সমাদৃত হইয়া থাকে তো তাহা রেম্‌ব্রাণ্ডের অপূর্ব্ব শিল্প-সৃষ্টির দৌলতেই হইয়াছে। সকল বিষ হরণ করিয়া তিনি যে নীলোৎপলের সৃষ্টি করিয়া গেছেন, সেই নীলোৎপল যুগে যুগে নব নব যাত্রীর আশা--উদ্বেল প্রাণে লক্ষ লক্ষ লীলা-কমল ফুটাইয়া তুলিয়া শিল্প-সৃষ্টি সার্থক করিবে।

জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

আশা

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

হারাবার ভয় করিয়ো না
অনুরাগি!
তোমার ঠাকুর একাকী ভুবনে
আছেন জাগি—
তোমার লাগি,
—হে অনুরাগি!

নয়ন যখন গভীর আঁধারে
দিশেহারা হ'য়ে খুঁজিবে তাহারে,
দেবতা তোমার ডাকিয়া ক'বেন
—"রয়েছি জাগি—
তোমার লাগি,—
হে অনুরাগি!"

তোমার জীবন তোমার মরণ
সব বিনিময়ে লয়েছ শরণ
ব্যাপিয়া সকল, ঢাকিয়া সকল,
আছেন জাগি—
তোমার লাগি—
হে অনুরাগি!

যতীন্দ্র প্রয়াণে

শ্রীপ্রসাদ বসু

ফুরাইল দিন !
মিটাইয়া পরিপূর্ণ জীবনের ঋণ,
হে সৌম্য তাপস, বীর, সত্যের পূজারি,
অন্যায়ের চিরশত্রু, ন্যায়ের নির্ম্মল-পথ-চারি,
শ্রাবণের অশ্রুঝরা অমার আঁধারে,
গেলে চলি দূর সিন্ধুপারে
জন্ম-মৃত্যু-হীন সেই জ্যোতির্ম্ময় লোকে
ভাসাইয়া ধরিত্রীরে সীমাহীন শোকে !

হে বঙ্গ জননীর সুযোগ্য সন্তান,
তোমারে গড়িতে মাতা যত কিছু ক'রেছিল দান,
সযতনে তুমি তার
করিয়াছ সসম্মান যোগ্য ব্যবহার ;
অবশেষে জননীর পূজাবেদীমূলে
লক্ষ শতগুণে তারে করিয়া বর্দ্ধিত, রেখে গেলে তুলে।
আপনার করি, কিছু রাখ নাই তুমি।
দীনহীন কাঙালেরে, ভাই বলি চুমি
বিলাইয়া দিয়াছ সকল,
টানিয়া ল'য়েছ বুকে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত অভাগার দল।
তুমি ত্যাগী, দ্বিতীয় দধীচি !
ওহে সব্যসাচী,
জননীর রাখিতে সম্মান
সত্যেরে সারথী করি, করে ধরি ধর্ম্ম ধনুর্ব্বাণ,
করিয়াছ অপূর্ব্ব সমর,
অরাতি কেঁপেছে থরথর।

স্বাধীন উন্মুক্ত তুমি, গিয়াছ যেথায়,
জ্ঞানে, কর্ম্মে, প্রেমে প্রিয়, গ'ড়েছ সেথায়
নব নব নন্দন কানন।
হেরি তব শিশু সম সুন্দর আনন।
দশদিক উঠিয়াছে হাসি
নব জীবনের বান গেছে সেথা ভাসি।
আজি হায়, অসময়ে সব শেষ!
বন্ধুহারা, প্রিয়হারা, শূন্য মনে কাঁদে সারাদেশ।
পড়ে মনে,—
যাঁর কাছে মন্ত্র তুমি নিয়েছিলে বসিয়া নির্জ্জনে,
সূর্য্যসম তেজস্বান দেশবন্ধু গুরুরে তোমার।
ধন্য তিনি, ধন্য তুমি যোগ্য শিষ্য তাঁর;
আর ধন্য সেই সে জননী
যে তোমারে পেয়েছিল আপনার নয়নের মণি।
চলিয়াছ আজি হাসি মুখে
মৃত্যুজয়ী মহাপ্রাণ পরিপূর্ণ সুখে
গুরু যেথা ব'সে আছে শিষ্য পথ চাহি।
যাও বীর, আত্মার উল্লাসে;
আমরা ধরার নর, অশ্রু ও নিশ্বাসে
নিবারিয়া শেষ বার তব জয় গাহি।
তারপর, যুগ যুগ ধরি
তব স্মৃতি স্মরি,
যে পবিত্র পুণ্যস্থানে করি গেলে সব সমর্পণ
সেথা বসি ম্লান হেঁট মুখে ক'রে যাই অশ্রুর তর্পণ।

প্রসাদ বসু



অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২

পরদিন প্রাতে প্রিয়লালের যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন ছ'টা বাজে। নববধূর সহিত প্রেমালাপের মত্ততায় অনেকখানি রাত্রিই জাগরণে কেটে গিয়েছিল, সুতরাং যে সময়ে সে সাধারণত শয্যা পরিত্যাগ করে আজ তার চেয়ে কতকটা বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। নিদ্রাভঙ্গের পর সন্ধ্যা কখন্ উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে, টের পায় নি। তার ব্যবহৃত শয্যাংশের কুঞ্চনে দেহভারের ছাপ মুদ্রিত, বালিসে সুগন্ধী তৈলের মৃদু সৌরভ, মাথার একগাছা ছিন্ন চুল দু-তিন পাকে কুঞ্চিত হয়ে বাতাসে অল্প-অল্প নড়্‌চে। সুন্দরী কিশোরী পত্নীর এই চিহ্নগুলি প্রিয়লালের মনে একটি সুমধুর স্বপ্নের বিলাস জাগিয়ে তুল্‌লে। মনে প'ড়ে গেল গত রজনীর কাব্য-জীবন-যাপনের কথা,—দুটি মিলন-প্রয়াসী হৃদয়ের সে কি অধীরোন্মত্ত ব্যাকুলতা, অথচ তারই মধ্যে সঙ্কোচের সে কি সুমিষ্ট অনতিক্রমণীয় বাধা! প্রিয়লাল ক্ষণকাল নিশ্চল ভাবে সেই বিগত সম্ভোগের তরল চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে ব'সে পাশের জানলাটা খুলে দিলে।

শ্রাবণ মাস। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তার প্রমাণ তরু লতা গুল্মে তখনো বর্ত্তমান। গৃহ-প্রাঙ্গণের পরেই সুবৃহৎ ফলের বাগান, তার পরে বিস্তৃত মাঠ, মাঠ, ভেদ ক'রে চ'লে গেছে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা শড়ক ঝাড়গ্রামের দিকে, মাঠের শেষে শালবনের অনির্ব্বচনীয় শোভা। প্রিয়লাল এ-সকল কিছুই দেখ্‌লে না। দৃষ্টি তার একেবারে মেঘলিপ্ত মলিন আকাশের উপর প'ড়ে সমস্ত মন সহসা এক অজ্ঞাত অনির্ণেয় ঔদাস্যে ঘুলিয়ে উঠল। গতরাত্রির সমুজ্জ্বল চিত্রের সকল রঙগুলি যেন একমুহূর্ত্তে সেই বর্ষাদিনের মলিনতার মধ্যে সমাধি লাভ করলে। মনে হ'ল এ যেন শুধু সেই-দিনটিরই নয়, তার জীবনেরও এক নূতন অঙ্কের সূচনা, যার সঙ্গে তার পূর্ব্ব জীবনের কোনো মিল নেই।

বিরক্তিভরে জান্‌লাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় রেলিংএর ধারে দাঁড়াল। চেয়ে দেখ্‌লে নীচে প্রবলভাবে কর্ম্মের স্রোত চলেছে,—বাঁধাবাঁধি, কষাকষি, হাঁক-ডাকের অন্ত নেই;—সুনির্ম্মম ভাঙনের উপদ্রবে সংসারের জমাট অস্তিত্বটি একেবারে খ'সে পড়েছে,—সুটকেস, হোল্‌ড-অল্, ট্রঙ্ক, বাক্স, বিছানা—সংসারের যাবতীয় দ্রব্য—নিরুপায় নিশ্চিন্ততায় চট্ এবং দড়ির কবলে আত্মসমর্পণ করেছে। সে বুঝ্‌লে এই ঐকান্তিক কর্ম্ম-তৎপরতার সঙ্গে একমাত্র তারই এ-পর্য্যন্ত কোনো যোগ নেই, কিছুক্ষণ আগেও পরম নির্ভাবনায় সে তার সুখ-নীড়ের মধ্যে নিদ্রিত ছিল। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হ'য়ে অগ্রসর হ'তেই সিঁড়ির মুখে দেখা হ'ল সুধারাণীর সঙ্গে।

সুধারাণী পাঁচ-পয়সা সরিকদের মেজবউ,—সম্পর্কে প্রিয়লালের বউদিদি। তার স্বামী জামসেদপুরে বড় চাকরী করে। বিবাহোপলক্ষে সে পীরনগরে এসেছে এবং জহরলালের গৃহেই বাস করছে। শিক্ষিতা ব'লে সুধারাণীর সুনাম এবং অভিমান আছে, তার উপর সে সুরসিকা। প্রিয়লালকে দেখে সে মৃদু হেসে বল্‌লে, "কি ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙল? সন্ধ্যার খাতিরে তুমি যে উষার মুখদর্শন করবে না ব'লে পণ করেছ!"

সুধাময়ীর রহস্যের অর্থ উপলব্ধি ক'রে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বল্‌লে, "প্রেমে যে একনিষ্ঠ সে ত' সন্ধ্যার খাতিরে উষা উপস্থিত হ'লে চোখ বুজে থাক্‌বেই বউদিদি। কিন্তু আমার এ সুনাম সকলেরই কাছে রাষ্ট্র হ'য়ে গিয়েছে, না একা তুমিই জান্‌তে পেরেছ?"

সুধারাণী সহাস্যমুখে বললে, "তোমাদের দিকে যাদের চোক-কাণ খোলা আছে তাদের কারুরই জান্‌তে বাকি নেই।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ! আমাদের দিকে চোক কাণ খোলা ত' দেখ্‌তে পাই বাড়ির বারো-আনা লোকের! কিন্তু কি করি বল বউদি,—সন্ধ্যা যদি তাঁর প্রভাব রাত বারোটা পর্য্যন্ত বিস্তার করেন তা হ'লে ভোর পাঁচটায় কি ক'রে ঊষাকে স্বীকার করা যায়?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুধারাণী বল্‌লে, "রাত বারোটা কি রকম? রাত দুটো বল!"

কপট বিরক্তির সহিত প্রিয়লাল বল্‌লে, "সে গুণও তাহ'লে আছে দেখচি তোমায়। আড়িপাতা হয়েছিল?—ছি, ছি, বউদিদি, তুমি সহরের শিক্ষিত মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে এসে তোমার নৈতিক অবনতি ঘটেচে। স্বামী-স্ত্রীর ঘরে তুমি আড়ি পাতো?"

সুধারাণী আরক্তমুখে খিল্‌খিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে, "স্বামী-স্ত্রী কি রকম? বিয়ের আটদিনের মধ্যে ত' বর-কনে।" তারপর একটা ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে পিছন ফিরে বল্‌লে, "শীগ্‌গির নীচে যাও ঠাকুরপো, মেজকাকিমা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

নীচে এসে মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "মা, তুমি আমাকে ডাকছিলে?"

মমতাময়ী বল্‌লেন, "ওমা, ডাক্‌ব না? আর কি সময় আছে? আমাদের ত' বেরিয়ে পড়লেই হয়। তুমি যত শীঘ্র পার তয়ের হ'য়ে নিয়ে চা-টা খেয়ে বাইরে যাও। কর্ত্তা তোমার জন্যে অপেক্ষা করচেন,—কোথায় তোমাকে কি মামলা নিষ্পত্তি করতে যেতে হবে।"

প্রিয়লাল চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে, "মামলা নিষ্পত্তি আবার কি মা?"

মমতাময়ী বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বল্‌লেন, "কে জানে বাপু! যত হাঙ্গামা উনি বাধাতে পারেন! কোথায় প্রজায় প্রজায় কি বিবাদ বেধেছে—তা এই পালাই-পালাই গোলযোগের মধ্যেও নিষ্পত্তি ক'রে যেতে হবে। তা-ও আবার নিজে করবেন না, তোমাকে দিয়ে করাবেন!"

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বল্‌লে, "সে ত' ভাল কথাই মা, বাবা আমাকে উপযুক্ত পুত্র ব'লে মনে করেন তাই আমাকে মামলা নিষ্পত্তি করতে পাঠাচ্ছেন। তুমি আমাকে উপযুক্ত মনে করনা তাই কোথাও পাঠাতে চাও না।"

পিছনে পিছনে সুধারাণী এসে কখন নিকটেই দাঁড়িয়েছিল; হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "এ তোমার অন্যায় কথা ঠাকুরপো,—মেজকাকিমা, তোমাকে উপযুক্ত মনে করেই ত' সেদিন বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সেকথা ভুলে গেলে না-কি?"

নিকটে যারা উপস্থিত ছিল সুধারাণীর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠ্‌ল। মমতাময়ী প্রসন্নস্মিতমুখে বল্‌লেন, "আমার উকিলের মুখ থেকে উত্তর শুনলে ত'?—এখন যাও, তাড়াতাড়ি তয়ের হয়ে নাও।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বল্‌লে, "তোমার উকিল নয় মা, মোক্তার! এ উত্তর উকিলের মুখ থেকে বেরোয় না।"

পুনরায় একটা হাসির কলরব উঠ্‌ল। মমতাময়ী বল্‌লেন, "আচ্ছা, মোক্তারই না হয় হোল। এখন তোমরা যাও বাপু, দুজনে তর্ক লেগে গেলে আজ হয়ত' যাওয়াই হয়ে উঠ্‌বে না।"

"আচ্ছা, মার অনুরোধে তোমাকে উপস্থিত ক্ষমা করলাম বউদি, কিন্তু এর উত্তর পরে দোবো।" বলে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রিয়লাল প্রস্থান করলে।

কিছুক্ষণ পরে প্রিয়লাল বহির্বাটীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লে বৈঠকখানার বারান্দায় টেবিল চেয়ারে ব'সে জহরলাল খাতাপত্র পরিদর্শন করছেন, পাশে একটা বড় তক্তপোষের উপর ব'সে কয়েকব্যক্তি নীরবে অপেক্ষা করছে। প্রিয়লাল উপস্থিত হ'তেই তারা সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করলে।

বিবাদ তাদেরই মধ্যে। বিবাদের বস্তু অকিঞ্চিৎকর,—দশ বারো কাঠা জমি মাত্র। কিন্তু উভয়পক্ষ প্রবল, এবং এই সামান্য জমির টুক্‌রা উভয়ের বসত বাটীর মধ্যে পড়ায় বিবাদের প্রাবল্য বিবাদী বস্তুর মূল্যকে অপরিমিত ভাবে অতিক্রম ক'রে গেছে। ইতিমধ্যেই দু-তিন নম্বর ফৌজদারী হয়ে গেছে, পুনরায় একটা খুব জমকালোভাবে হবার উপক্রম হয়েছিল, এমন সময়ে জমিদারের পুত্রের

বিবাহ উপস্থিত হওয়ায় আপাতত স্থগিত আছে। বিবাদী জমির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রজা গ্রাম ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর উভয় পক্ষই এক একটি কোবালা বার ক'রে জমি দখল করতে উদ্যত হয়েচে। প্রত্যেকেই অপরের কোবালাকে জাল ব'লে অভিহিত করছে। বিবাদকে জটিলতর করেছে জহরলালের নায়েব। সে বলে দুটো কোবালাই জাল, প্রকৃতপক্ষে জমিটি পলাতকা জমা, সুতরাং আইনত আপাতত জমীদারের প্রবেশের যোগ্য; তারপর পরে ইচ্ছামত বা সুবিধামত বিলি-বন্দোবস্তই করা হোক কিম্বা জমিদারের খাস দখলেই থাক্। এই নূতন জটিলতার সৃষ্টি কোনো-পক্ষকেই কিছুমাত্র শান্ত করতে সক্ষম হয়নি, কিন্তু প্রিয়লালের বিবাহোপলক্ষে জহরলাল গ্রামে আগমন করার পর উভয়পক্ষই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েচে। জহরলাল এই সর্ত্তে বিবাদ মিটিয়ে দিতে রাজি হয়েচেন যে, পুত্রবধূর মঙ্গলকামনায় তিনি তাঁর পলাতকা জমার দাবী উপেক্ষা করবেন, কিন্তু বিবাদী জমি তিনি যেভাবে উভয়-পক্ষর মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন বিনা আপত্তিতে তাতে উভয় পক্ষকে সম্মত হ'তে হবে; অন্যথা তিনি জমিতে প্রবেশের জন্য কালেক্টারীতে দরখাস্ত দেবার জন্য নায়েবকে আদেশ দিয়ে যাবেন। প্রজারা এ সর্ত্তে সম্মত হয়ে যথাবিধি সোলেনামা লিখে দিয়েছে।

প্রিয়লালের নিকট সংক্ষেপে বিবাদের কাহিনী বিবৃত ক'রে জহরলাল বল্লেন, "সবই প্রায় ঠিক হ'য়ে আছে। তুমি গিয়ে বিবাদী জমিটুকু উভয়ের প্রয়োজন এবং সুবিধামত উভয়ের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবে।"

প্রিয়নাথ মাথা নেড়ে বল্লে, "আচ্ছা।"

"আর দেখ, চকদীঘি এখান থেকে তিন পো রাস্তা। পাল্কী ক'রে যাবে, যেতে আস্তে বড় জোর এক ঘণ্টা, সেখানে থাক্‌বে এক ঘণ্টা। দশটার মধ্যে এখানে ফিরে আসা চাই। বারোটার মধ্যে রওনা না হ'লে ঝাড়গ্রামে পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে। আমিই যেতাম, কিন্তু আমি এখানে না থাক্‌লে অসুবিধা হবে। আরও দু-তিনটে বিবাদ নিষ্পত্তি করবার আছে, যাবার গোছ-গাছ ঠিক করারও অনেক বাকি। তা ছাড়া, তোমার বিয়ে উপলক্ষ্য ক'রে এ বিবাদ মেটানো হচ্চে, সুতরাং আমার ইচ্ছে তুমিই এ বিবাদ নিষ্পত্তি কর।"

প্রজারা উচ্চস্বরে বলে উঠ্‌ল, "হ্যাঁ, মহারাজ, আমাদেরও ইচ্ছে যে, ছোটবাবুর হাত থেকেই এবার আমরা বিচার পাই।" তারপর প্রিয়লালকে পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে 'জয় ছোটবাবুর জয়' বল্‌তে বল্‌তে তারা পাল্কীর সঙ্গে ছুটে চল্‌ল। আটজন বেহারা পাল্কী নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চকদীঘির অভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

৩

চক্‌দীঘি থেকে দশটার মধ্যে ফেরা হ'য়ে উঠ্‌ল না। প্রিয়লাল যখন ফিরে এল তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। গৃহ প্রায় জনশূন্য। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের অভ্যাগতেরা সকলেই ষ্টেশনের অভিমুখে রওনা হয়েচে। জিনিষপত্র বহু-পূর্ব্বেই গরুর গাড়িতে চালান দেওয়া হয়েচে। বাড়িতে আছেন শুধু জহরলাল, সন্ধ্যা এবং এমন দু-চার জন আত্মীয় যাঁরা পীরনগরেই থাক্‌বেন।

প্রিয়লালের বিলম্ব দেখে জহরলাল একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, প্রিয়লালকে দেখ্‌তে পেয়ে বল্লেন, "কি হ'ল প্রিয়,—কাজ মিট্‌ল?"

প্রিয়লাল বল্লে, "মিটেছে।"

"খুসী হয়েচে তারা।"

প্রিয়লাল অল্প হেসে বল্লে, "খুসী হয়েচে কি-না বল্‌তে পারিনে, বাবা, রাজি হয়েচে।"

জহরলাল বল্লেন, "খুসী কেউ হয় না,—উভয় পক্ষ ত হয়-ই না, সময়ে সময়ে কোনো পক্ষই হয় না। আচ্ছা যাও, একটু জিরিয়ে নিয়ে আহারাদি ক'রে প্রস্তুত হও;—একটার মধ্যে রওনা হওয়া চাই-ই, তা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়গ্রামের বাসায় পৌঁছে চা-টা খাওয়া চল্‌বে। আমি এখনি রওনা হচ্চি, ঝাড়গ্রামে পৌঁছে একবার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে, একটা জরুরী পরামর্শ আছে, সেটা সেরে যেতে পারলেই ভাল হয়।"

প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "গ্রামের খবর কেমন বাবা? —আর কারু—

প্রিয়লালের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই জহরলাল চিন্তিত মুখে বল্লেন, "খবর মোটেই ভাল নয়। কাল রাত্রে তিনজন মারা গিয়েছে—আজও চার পাঁচজনের নূতন অসুখ করেচে। তোমাদের সঙ্গে গোটা দুই-তিন ওষুধ থাক্‌বে, ভগবানের কৃপায় ব্যবহার করবার প্রয়োজন হবে না।"

প্রিয়লাল অন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল জহরলাল ডাক দিয়ে বল্লেন, "আর শোন প্রিয়, তোমাদের সঙ্গে জল আর খাবার থাক্‌বে,—বৌমাকে মাঝে মাঝে ক্ষিদে তেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা কোরো। ছেলেমানুষ, এতখানি পথ যেতে দুই-ই প্রয়োজন হবে। জিজ্ঞাসা কোরো।"

প্রিয়লাল মৃদুস্বরে বল্লে, "কোরব"। তারপর জহরলালের নিকট এগিয়ে এসে বল্লে, "বাবা, তুমি কিসে যাবে?"

"হাতীতে।"

"রোদ বৃষ্টিতে কষ্ট হবে ত?"

জহরলাল বল্লেন, "না, তা হবে না। নায়েব মশায়কে তোমাদের সঙ্গে দিলেই ভাল হোত—কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি না গেলে উকিলের কাছে অসুবিধায় পড়তে হবে।"

প্রিয়লাল বল্লে, "না, না, আমাদের সঙ্গে নায়েব মশায়ের যাবার কোনো দরকার নেই, তোমার সঙ্গেই তিনি যান।"

দূরে ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। জহরলাল বল্লেন, "হাতী আস্‌চে; এখন নায়েব মশাই এলেই বেরিয়ে পড়া যায়।" সঙ্গে সঙ্গেই হাতী এবং নায়েবকে এক সঙ্গে দেখা গেল। জহরলাল বল্লেন, "পাকা লোক, একেবারে বাহনটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌চেন।" তারপর প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্লেন, "যাও, তুমি আর দেরী কোরো না। একটার মধ্যে যাত্রা করা চাই। রাত্রে যে-রকম বৃষ্টি হয়েচে, নদীতে যদি ঢল নেমে থাকে তা হ'লে সেখানে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়গ্রামে পৌঁছন চাই।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রিয়লাল সজোরে তাড়া লাগিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা হাতে রেখে বল্লে, "সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরোনো চাই-ই।"

অদূরে বিমলা, প্রিয়লালের খুড়তুত বোন, দাঁড়িয়েছিল, সে নিকটে এসে হাসিমুখে বল্লে, "নিজে ত' গিয়েছিলে চক্‌দীঘিতে হাকিমী করতে, তাড়া দিচ্ছ কাকে দাদা?—বউকে? সে ত' সেজে-গুজে তৈরি হ'য়ে ব'সে আছে;—শুধু দুটো ভাত মুখে দিয়ে নিলেই হয়।"

বিমলা প্রিয়লালের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, কিন্তু বিবাহ যদি মানুষের নাবালকত্ব মোচন ক'রে একটা নূতন জীবনের সূত্রপাত করে তা হ'লে সে প্রিয়লালের চেয়ে অন্তত বছর আষ্টেকের বড়। বিবাহিত জীবনের সেই প্রবীণত্বের জোরে সে প্রিয়লালের সহিত পরিহাস করতে সঙ্কুচিত হয় না; বল্লে, "এত দেরি করলে কেন দাদা? বউ-এর তোমার জন্যে ভারি মন-কেমন করছিল।—বিশ্বাস হচ্চে না?"

প্রিয়লাল গম্ভীর-মুখে বল্লে, "বিশ্বাস না হবার ত কোনো কারণ দেখ্‌চিনে। রূপে, গুণে এমন একটি কামনার বস্তুর জন্যে মন না-কেমন করাইত আশ্চর্য্য!"

বিমলা বল্লে, "ঈশ্‌, নিজের বিষয়ে গর্ব্বও ত' কম দেখচি নে!"

"গর্ব্বের বনেদ যখন খাঁটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে গর্ব্বকে কি বলে জানো বিমলা?"

পুলকোজ্জ্বল মুখে বিমলা বল্লে, "কি বলে?"

"আত্মোপলব্ধি!"

প্রিয়লালের কথা শুনে বিমলা হেসে ফেললে; বল্লে, "আচ্ছা বেশ, পাল্কী চ'ড়ে ঝাড়গ্রাম যেতে যেতে সমস্ত পথ আত্মোপলব্ধি কোরো,—এখন তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নেবার ব্যবস্থা দেখ দেখি। একটার মধ্যে রওনা হতে হবে সে কথা মনে আছে? শেষ পর্য্যন্ত তাড়াতাড়িতে খাওয়াটাই হয়ত হয়ে উঠ্‌বে না।"

আহারাদি সেরে একটার মধ্যে প্রিয়লাল এবং সন্ধ্যা প্রস্তুত হ'ল বটে, কিন্তু রওনা হ'তে পারলে না। পাল্কীতে উঠ্‌তে যাবে এমন সময়ে হুড়্‌তে-পুড়্‌তে এসে পড়ল চকদীঘির সেই দুই দল বিবাদী প্রজা। নিষ্পত্তির কোন্ এক অজ্ঞাত গোপন কোণ থেকে সহসা মতভেদের এমন একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা উঠেচে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল হ'য়ে যাবার উপক্রম করেছে। এ কথাটা তখন ওঠে নি তা সত্য; উঠ্‌লে হয়ত সেই সময়েই অন্যান্য কথার

সঙ্গে এরও একটা মীমাংসা সহজেই হয়ে যেতে পারত। তর্ক এবং যুক্তির গোলাগুলি যখন চলছিল তখন এক আঘাতেই যে পরাভূত হ'তে পারত, সন্ধির নিরস্ত্রতার মধ্যে হঠাৎ সে দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেচে।

এক ব্যক্তি চকদীঘি থেকে সঙ্গে এসেছিল, ঝাড়গ্রামে তার ভাইপো মোক্তারী করে। নিরপেক্ষতার দাবী তারই সকলের চেয়ে বেশি; সে বল্‌লে, "বিপদের কাঁটা রেখে যাবেন না হুজুর! ও আমগাছটা মনিরুদ্দীনকেই দিয়ে যান, নইলে তার ছেলেপিলে বৎসরান্তে একটা আমও খেতে পাবে না।"

মোক্তারের খুড়োর কথা শুনে অপর পক্ষ হাঁ হাঁ ক'রে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "বেশ ত কও মুখুয্যে মশায়! কাঁটা মেরে সড়কি থানাবার সল্লা দিচ্ছ! আমগাছটা মনিরুদ্দীনকে দিলে আম পাড়বার জায়গা তাকে দিতে হবে না?"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিবাদ জমে উঠ্‌ল এবং প্রিয়লালও ধীরে ধীরে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ক'রে একটা বিরোধকে শান্ত করবার মাদকতা ত আছেই,—তা ছাড়া, ছাড়েই বা তাকে কে? মোক্তারের খুড়ো হাতে পৈতা জড়িয়ে বল্‌লে, "আদালতে গেলে শুধু পয়সার শ্রাদ্ধ হুজুর,—আপনি গরীবের মা-বাপ, বিবাদটা মিটিয়ে দিয়ে যান। আমগাছটা—

অপর পক্ষ আগুন হ'য়ে জ্বলে উঠ্‌ল; কথাটা মুখুয্যেকে শেষ করতে না দিয়ে বল্‌লে, "ফের আমগাছটা?—তুমি দেখ্‌চি মুখুয্যে মশায়, এক নম্বর না বাধিয়ে ছাড়বে না!" তারপর প্রিয়লালের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "হুজুর, ওনার এক ভাইপো ঝাড়গ্রামে মোক্তারী করে।"

শুনে মুখুয্যে প্রশান্তমুখে বল্‌লে, "সে ত বাপু, ফেল কড়ি মাখ তেল। সে মনিরুদ্দীনেরও কেনা নয়, তোমারও কেনা নয়। যদি এক নম্বর বাধেই, তুমিই না হয় তাকে নিযুক্ত কোরো, সে তোমারই গুণগান গাইবে।"

হাতের রিষ্টওয়াচের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বল্‌লে, "মুখুয্যে মশায়!"

"হুজুর?"

"আপনি যদি একটু চুপ করেন, তা হ'লে আমি একটু চেষ্টা দেখ্‌তে পারি।"

হাত জোড় ক'রে মুখুয্যে বল্‌লে, "যে-আজ্ঞে, আমি আর একটি কথাও উচ্চারণ করব না, কিন্তু এ কথা ব'লে রাখলাম হুজুর, আমগাছটা মনিরুদ্দীন না পেলে সুবিচার হবে না।"

বহুক্ষণ বিচার-বিতর্কের পর নবজাত বিবাদের এক-রকম রফা হোল এবং আমগাছ সম্বন্ধে এই স্থির হোল যে, গাছটা মনিরুদ্দীনের ভাগেই থাক্‌বে, কিন্তু জমি থাক্‌বে পতিতপাবন বিশ্বাসের। যতদিন গাছটা ফলদান করবে ততদিন পতিতপাবন কাঁচা এবং পাকা আম মনিরুদ্দীনের বাড়ি পৌঁছে দেবে, গাছ শুকিয়ে গেলে মনিরুদ্দীন গাছ কাটিয়ে নিয়ে যাবে।

মুখুয্যে বল্‌লে, "পুকুর সম্বন্ধে বিচার খাশা হয়েচে হুজুর, কিন্তু গাছ সম্বন্ধে হোল না। ও জমিও রইল পতিতপাবনের, গাছও রইল পতিতপাবনের, আমও রইল তারই—কাঁচা পাকা দুই-ই। প্রতি বছর আমের মরশুমে দু-তিন নম্বর ফৌজদারী হ'তে থাক্‌বে।"

প্রিয়লাল মৃদু হেসে বল্‌লে, "তখন তার ব্যবস্থা আপনি করবেন।" তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "উপস্থিত আমি চল্লাম, আর একটুও অপেক্ষা করতে পারি নে। দুটো বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ।"

একতলায় একটা বসবার ঘরে সন্ধ্যা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল, পরিচারিকা এসে বল্‌লে, "চলুন বউরাণী, দাদাবাবু পাল্কীতে উঠ্‌চেন।"

প্রণম্যদের প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা অন্দরের প্রবেশ-দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল, সেইখানে তার জন্যে পাল্কী অপেক্ষা করছিল। পাল্কীটি সাবেক কালের সম্পদ, সাধারণত ক্রিয়াকর্ম্মেই ব্যবহৃত হয়; সুনির্ম্মিত, প্রশস্ত, প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষ্যে ভাল ক'রে রঙ করা হয়েচে, পাল্লায় পাল্লায় বিবাহের মাঙ্গলিক চিত্র অঙ্কিত, দুই দিকের দরজায় ঘন নীল রঙের আভাময় রেশমের পরদা, তার ধারে ধারে একই রঙের পুরু ক'রে পাকানো রেশমী সুতার সার-গাঁথা স্তবক। এই পাল্কী ক'রেই সে কয়েকদিন আগে ঝাড়গ্রাম রেল-ষ্টেশন থেকে পীরনগরে এসেছিল।

পাল্কীতে ওঠবার আগে সন্ধ্যা বিমলার হাত ধ'রে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "চল্লাম বিমলাদি, মনে রেখো, ভুলোনা যেন।"

বিমলার চোখ ভ'রে অশ্রু নেবে এল; হাসি-অশ্রু-মাখা মুখে সে বল্লে, "তোমার এই চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি কি ক'রে ভুলে যেতে হয় তা হ'লে সে কথাও শিখিয়ে দিয়ে যাও সন্ধ্যা। এ ক'দিন পীরনগরের । বাড়িখানি আলো ক'রে ছিলে ভাই, আজ সে আলো নিজের হাতে নিভিয়ে দিয়ে যাচ্ছ!"

শুনে সন্ধ্যার লাবণ্যময় মুখমণ্ডল আরক্ত হ'য়ে উঠল, চোখ এল সজল হ'য়ে, বিমলার দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সে পরদা ঠেলে তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলে।

সদর দেউড়ীর মুখে প্রিয়লাল তার পাল্কীতে অপেক্ষা করছিল, সন্ধ্যার পাল্কী সেখানে উপস্থিত হ'তেই উভয় পাল্কী দ্রুতবেগে ঝাড়গ্রামের পথে অগ্রসর হ'ল।

পাল্কীতে পাল্কীতে আটজন ক'রে বেহারা, ছ'জনে পাল্কী বহন করছে, বাকি দু'জন হাতে একটা ক'রে কেরাসিন তেলের লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চলেছে, প্রয়োজন হলেই কাঁধ বদল দেবে। সন্ধ্যার পাল্কীর আগে-পিছে দুজন পাইক চলেছে, একজনের কাঁধে বন্দুক অপরজনের কটিতে তরবার। তার পশ্চাতে প্রিয়লালের পাল্কী, এবং সর্ব্বশেষে একটা ডুলিতে সন্ধ্যার পরিচারিকা মতি, তারই কাছে খাবার এবং জল।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের পথে পড়তেই সন্ধ্যা দু-দিকের পরদা সরিয়ে দিলে। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে ঘন-নিবদ্ধ শালবন, মাঠের সর্ব্বত্র ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়, —অধিকাংশই শিয়াকুল আর মনসা কাঁটায় ভরা, পথের ধারে ধারে কত নাম-না-জানা গাছ, তাদের শাখায় শাখায় কত নাম-না-জানা পাখী, কি অপূর্ব্ব তাদের কাকলী! আকাশ মেঘমেদুর, বায়ু সুশীতল, মাঝে মাঝে তাতে অজানা ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। পাল্কী বেয়ারারা মন্থর দুলকি চালে ছুটে চলেছে, মুখে তাদের পথশ্রান্তিহরা ছড়ার মৃদু গুন্‌গুনানি, পাইকদের কড়া নাগরা জুতার মচ্‌মচানির শব্দ, মাঝে মাঝে তাদের মুখে 'হুঁসিয়ার' 'হুঁসিয়ার' ডাক। পথের বাঁকে বাঁকে প্রিয়লালের পাল্কী নজরে পড়ে, কখনো তার মুখের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়, কখনো বা চোখে চোখে দৃষ্টিবিনিময়ও হ'য়ে যায়, মুখে মুখে ফুটে ওঠে একপক্ষে আনন্দের এবং অপর পক্ষে লজ্জার সুমিষ্ট হাসি।

সন্ধ্যার মনে হ'ল সে যেন চলেছে কোন স্বপ্নরাজ্যের অপরিচিত প্রান্তে যার সহিত নিত্যকার বাস্তব জীবনের কোনো যোগাযোগ নেই। সে ধীরে ধীরে ভুলে গেল যে, সে পীরনগর থেকে আসচে, ভুলে গেল কলকাতায় যাচ্ছে, সে তার বাপ মাকে ভুলে গেল, এমন কি স্বামীকেও। শুধু মনে হ'তে লাগ্‌ল সে যেন চলেছে কোনো এক স্বপ্নের রাজ্যে, স্বপ্নের নগরে, এক অজানিত স্বপ্ন-পুরীতে। এম্‌নি একটা স্বপ্নের মদিরা তার মনকে সমস্ত পথটাই আচ্ছন্ন ক'রে রইল; সে মোহ ভাঙল যখন পাল্কী এসে নামল কাঁসাই নদীর তীরে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন, পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দিনের চিতা জ্বলে উঠেছে।

প্রিয়লাল সন্ধ্যার পাল্কীর পাশে এসে ডাকলে, "সন্ধ্যা, বেরিয়ে এস।"

সন্ধ্যা পাল্কী থেকে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লে পাইক এবং বেহারারা দূরে এক জায়গায় ব'সে ভাজাভুজি বার ক'রে জল-পানের উদ্যোগ লাগিয়েছে আর মতি জলের কুঁজো এবং খাবারের পাত্র হাতে নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়লাল বল্‌লে, "সন্ধ্যা, একটু কিছু খেয়ে নাও।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "এখন দরকার নেই, ঝাড়গ্রাম পৌঁছে খাব।"

"সে অনেক দেরি, এখনো ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।"

"তুমি আগে খাও।"

মতি একটু দূরেই ছিল, তা'কে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে একটু মৃদু গলায় প্রিয়লাল বল্‌লে, "আগে কেন?—একসঙ্গেও ত খেতে পারি?"

প্রিয়লালের প্রস্তাবে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে, "না।"

"আচ্ছা, তাহ'লে আমিই আগে খেয়ে নিই।" মতির দিকে ফিরে বল্‌লে, "মতি, খাবারটা নিয়ে এস।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে মতির হাত থেকে খাবারের পাত্রটা নিয়ে খুলে ফেললে, তারপর একটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে একগ্লাস জল নিয়ে প্রিয়লালের নিকট উপস্থিত হ'ল।

প্রিয়লাল সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের প্লেটটা নিয়ে বললে, "এরি মধ্যে স্বামী-সেবা আরম্ভ ক'রে দিলে সন্ধ্যা? —এই নদীর তীরে, এই মুক্ত আকাশের তলায়, এমনি ভাবে যার সূত্রপাত হ'ল সে যেন আমার চিরজীবনকে ধন্য ক'রে রাখে!"

সন্ধ্যা একথার কিছুই উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডল পুনরায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল এবং ওষ্ঠাধরে গভীর আনন্দের রুদ্ধ হাসি ঈষৎ হিল্লোলিত হ'য়ে গেল।

আহার শেষ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আমি নদীর ধারে ওই বাবলা গাছ তলায় গিয়ে বস্‌ছি, খাওয়া হ'য়ে গেলে তুমি ওখানে এস। জুতো প'রে এসো সন্ধ্যা, বাবলা-গাছের তলায় অনেক সময় শুকনো বাবলা ডালের কাঁটা থাকে।"

প্রিয়লালের প্লেটেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাকি খাবারটা মতিকে খেতে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হ'ল।

প্রিয়লাল সন্ধ্যাকে নিজের পাশে বসিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, "কেমন লাগছে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "খুব চমৎকার!"

"নদী পেরিয়ে ওপারে যখন আমরা পৌঁছব তখন কিন্তু এই চমৎকার শোভা একেবারে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাবে।"

শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিলে; বললে, 'খুব ঘন কি?"

"খুব ঘন। কিন্তু তার জন্যে তোমার উৎকণ্ঠার কোনো কারণ নেই।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

"কি কাজ?"

একটু অপেক্ষা ক'রে মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে ান্ধ্যা বললে, "এক পাল্কীতে গেলে হয় না?"

বাঁ হাত দিয়ে সন্ধ্যাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে একটু চাপ দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "চমৎকার হয়,—কিন্তু তোমার লজ্জা করবেনা সন্ধ্যা? অন্ধকারে অন্ধকারে অত লোকের মধ্যে আমার সঙ্গে যেতে?"

সন্ধ্যা ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল; তারপর বললে, "তবে তোমার পাল্কী আমার পাল্কীর পাশে পাশে রেখো।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "পথ সঙ্কীর্ণ, দুটো পাল্কী পাশাপাশি যাওয়া ত' অসুবিধা হবে। এবার পাইক দুজন তোমার পাল্কীর দু'দিকে দরজার পাশে পাশে চল্‌বে, আর আমার পাল্কী তোমার ঠিক পিছনেই থাক্‌বে। কেমন, তা হ'লে হবে ত?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছিল, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌ল। প্রিয়লাল সন্ধ্যাকে নিয়ে উঠে পড়ল। পাইক বেহারারাও তাদের জলপান শেষ ক'রে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

নদী পার হ'তে বেশ একটু বিলম্ব হয়ে গেল। এপারে এসে প্রিয়লাল তাদের বাহিনীটি, সন্ধ্যার সহিত যে ভাবে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইমত সাজিয়ে নিলে। তখনো অন্ধকার খুব বেশি হয়নি, তবুও লণ্ঠন চারটি জ্বেলে নিয়ে তারা দ্রুতবেগে রওনা হ'ল।

আধঘণ্টাটাক্ যাওয়ার পর আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নাম্‌ল, অন্ধকার হ'ল দুশ্ছেদ্য, চারটি লণ্ঠনের ক্ষীণ রশ্মি-রেখা নিজেদের একান্ত অক্ষমতায় অপ্রতিভ হয়ে জ্বল্‌তে লাগল অন্ধকারকেই বিশেষভাবে প্রকট ক'রে।

বাহিনীটি ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে একটি শালবনের মধ্যে। এ অরণ্যটি অত্যন্ত ঘন এবং বিস্তৃত। একমাইল পথ যাওয়ার পর বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায়। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, দ্রুতবেগে চলা নিরাপদ নয়, বেহারারা পা চেপে চেপে চলেছে এবং পাইকরা ঘন ঘন 'হুঁসিয়ার' 'হুঁসিয়ার' হাঁক্‌চে।

সন্ধ্যা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে তার পাল্কীর মধ্যে ব'সে ছিল। একবার একটু পরদা সরিয়ে দেখ্‌লে বাইরে মসীর সমুদ্র, আর তার মাঝে মাঝে দু-একটা জোনাকির ঝিকিমিকি, তাছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। নদীর ও-পার যা ছিল, নদীর এপার ঠিক তার বিপরীত! সে আলো সে ছায়া নেই, সে পাখী সে ফুল নেই, সে আকাশ নেই বাতাস নেই, আছে শুধু ঘন জমাট অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝরঝর

শব্দ। কোথায় সে ওপারের স্বপ্নরাজ্য আর স্বপ্নপুরী, এ যেন চলেছে কোন্ পাতালপুরীর পথে! একবার তার একটু কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল, একবার ইচ্ছে হ'ল চিৎকার ক'রে প্রিয়লালকে ডাকে। কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে কান্নাও বেরোলো না, কথাও বেরোলো না।

প্রায় অর্দ্ধেক বন-পথ অতিক্রম করা হয়ে গিয়েছে, এমন সময় পথের বামদিকে একটা খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। সন্ধ্যার পাল্কীর একজন বেয়ারা শুনতে পেয়ে চুপি চুপি বল্‌লে, "মানুষ না কি গো?"

শব্দটা একজন পাইকেরও কাণে গিয়েছিল, সে সজোরে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "খবরদার!"

কিন্তু তার পরই অকস্মাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটা পৈশাচিক নৃশংসতার লীলা। একটা বিকট হল্লায় সমস্ত বন থরথর ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গেই দশ বারোজন লোক বড় বড় লাঠি নিয়ে ভীমবেগে এসে পড়ল প্রিয়লালের দলের উপর। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে লেগে গেল একটা ভয়ঙ্কর মারামারি আর চেঁচামেচি, তার মধ্যে একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে বন্দুকধারী পাইক ভূমিশায়ী হ'ল, কোথায় ছিট্‌কে পড়ল তার হাতের অস্ত্র তা কেউ জান্‌লেনা। পাল্কী বেহারাদের পিঠের উপর দু-চার ঘা লাঠি পড়তেই তারা প্রাণ-ভয়ে ভীত হয়ে পাল্কী ফেলে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে প্রিয়লাল প্রথমটা বিমূঢ় হ'য়ে গেল, তারপর 'সন্ধ্যা' 'সন্ধ্যা' ক'রে চিৎকার করতে করতে পাল্কী থেকে পা বাড়াতেই সজোরে পায়ের উপর এসে পড়ল একটা লাঠি,—যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে পাল্কীর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে সে অচৈতন্য হ'য়ে গেল।

তখন দু'জন ভীমকায় লোক সন্ধ্যার পাল্কীর নিকট উপস্থিত হ'য়ে তার মূর্চ্ছিত শিথিল দেহ পাল্কীর ভিতর থেকে টেনে বার করলে, তারপর দ্রুতপদে মতির ডুলির নিকট উপস্থিত হয়ে মতিকে টেনে বার ক'রে ফেলে দিয়ে তা'তে সন্ধ্যার বিবশ দেহ স্থাপিত করলে। জন পাঁচ সাত লোক লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাকি চারজনে সন্ধ্যার ডুলি কাঁধে নিয়ে দ্রুতপদে অরণ্যের নিবিড় অংশে অন্তর্হিত হ'ল। যারা পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে তারা যখন দেখ্‌লে যে বিপক্ষ দলের কোনো ব্যক্তিরই ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই এবং বুঝলে যে ইত্যবসরে ডুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন তারাও ডুলি যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল।

(ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ"

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায় বি-এ

কুমু কবির মানস-কন্যা। প্রাচ্যের মিষ্টিসিজম্ ও পাশ্চাত্যের পজিটিভিসম্-এর মিলিত পরিমণ্ডলের মধ্যে কুমু-চরিত্রের বিকাশ। জীবন-আদর্শের এই বিভিন্ন সুর দুটি নিবিড় মিলনে তার চিত্তকে ক'রে তুলেছিল যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি সুবিকশিত। মুকুন্দলালের বাহুজীবনের মত কুমুর অন্তরজীবনটা দুই-মহলা। 'দুইকালের আলো আঁধারে তার বাস।' বিচারহীন, অর্থহীন কুসংস্কারের ওপর কুমুদিনীর অগাধ মোহ। তার অন্তরের এ মহলে 'যুক্তির সুসঙ্গতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, ভালোমন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই।' এখানে এমন কি বিপ্রদাসেরও কোন দখল নেই। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যেও আলোকের এক অচপল শিখা তার অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছিল। কুসংস্কারে যেমন তার অন্ধ বিশ্বাস, ইষ্টদেবতার চরণে তেমনি নিঃশেষে সে আত্ম-নিবেদনও করতে পেরেছিল। তাই কুসংস্কারের মোহ তার চিত্তকে দুর্ব্বল করতে পারেনি। কুমু যেন 'একটি নিরলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।' কুমুর আর এক মহলের দেবতা স্বয়ং বিপ্রদাস। সেখানে ঘেঁটু, মঙ্গলচণ্ডী, পাঁটা মানত নেই। খেলা, সাহিত্য, সঙ্গীত এ মহলকে সহজ-আনন্দে বিকশিত করেছিল। যে যে বিষয়ে দাদার রুচি, সে সমস্তই ও বহুযত্নে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। কোলকাতায় কুমুর সমবয়সী কোন মেয়েসঙ্গিনী না থাকায় এই দুই ভাইবোন দুই ভায়ের মত হয়ে উঠেছিল। বিপ্রদাস সম্পূর্ণ একেলে,—পজিটিভিসম্ তার ধর্ম্ম। তার সবলচিত্তের সংস্পর্শ অতিগোপনে কুমুর অন্তরে জাগিয়ে দিয়েচে সহজ মর্য্যাদাবোধ। ওর কুমারী জীবনের চিত্রটি বড় অপরূপ। সহজ শুচিতা, গভীরতর পবিত্রতা, অনবদ্য সরলতা, সাংসারিক অনভিজ্ঞতা ওর চরিত্রকে অনুপম ক'রে তুলেছিল। ও যেন সংসারারণ্যের সরলা মৃগী। কিংবা প্রকৃতির তপোবন পালিতা শকুন্তলা। শিশুকাল থেকেই কুমু প্রকৃতির প্রাণময় পরিমণ্ডলের মধ্যে লালিত হয়েছিল। শকুন্তলার মত ওর অন্তরে ছিল বিশ্ববাৎসল্য। দাদার 'বেসী' ঘোড়া এবং টম কুকুরটা সব চেয়ে ওরই প্রিয়। কবি ওর এই বিশ্ব-বাৎসল্যের একটি অপরূপ চিত্র দিয়েচেন। শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে, দেখতে পাই, কুমু দাদার ঘোড়াটিকে সস্নেহে খাওয়াচ্চে আর মূক জন্তুটি খেতে খেতে পরম খুসিতে তার বড় বড় কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষপাত করচে।

কুমুচরিত্রের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব—তার মিষ্টিক মনের আধ্যাত্মিকতা। মীরাবাই ওর জীবনের আদর্শ। সেই অদৃশ্য, অজানার সন্ধানে ব্যাকুল সাধনার অশ্রুসিক্ত আনন্দ ওর অন্তর পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছিল। ওর রূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই কবি বলেচেন, "সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব।" এই আধ্যাত্মিকতার জন্যে ওর চিত্তের সহজ-গতি অন্তর্মুখী। ও স্বভাবতঃই মনের মধ্যে একলা। এই রকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জ্জনতা এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারে। কুমারীজীবনে কুমু এই তিনটিই নিখুঁতভাবে পেয়েছিল। তাই তখন তার জীবনে কোন দ্বন্দ্ব বা অসামঞ্জস্য ঘটেনি। বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন আবেষ্টনে কোনটাই মেলেনি। অবাধ স্বাধীনতা, বিস্তৃত নির্জ্জনতা অথবা স্বামীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসা কোনটারই সুযোগ হয়নি। তাই মধুসূদনের বাড়ীতে তার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

অধ্যাত্মবোধ কুমুচরিত্রের একই সঙ্গে শক্তি ও দুর্ব্বলতা। এই অধ্যাত্মবোধ তার চিত্তকে ক'রে তুলেছিল আদর্শ বিলাসী এবং কল্পলোকবাসী। যারা আদর্শবাদী, কল্পনা-

প্রবণ,—সংসারের সাধারণ ভোগে তাদের বিশেষ আসক্তি থাকে না। ধনে, ঐশ্বর্য্যে—জীবনের সাধারণ সুখে কুমুর যে বিতৃষ্ণা রয়েছিল, সেটা তার প্রকৃতিগত এবং অকৃত্রিম। তাই মধুসূদনের বিপুল ঐশ্বর্য্য,—ইহজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের রঙিন্ আশা কুমুর চিত্তকে জয় করতে পারেনি। চিত্তের এই দুই বিশিষ্টতার জন্যে তার মনের আরও একদিক অন্ধকার হয়েছিল। বিবাহের আগে বাস্তবজীবনের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় হয়নি। কোলকাতার বাড়ীতে বিপ্রদাস ও কুমুদিনী সুনিবিড় স্নেহের আবেষ্টনে যেন এক কল্পলোকে বাস করত। সেখানে না ছিল দ্বন্দ্ব, না-বা বিরোধ। পৃথীর শ্যামল বুকে তারাই যেন একমাত্র দুটি প্রাণী স্নেহের নীড় রচনা ক'রে পরস্পরের জীবন সার্থক ক'রে তুলচে। তাই বিবাহের পর মধুপুরীতে বিপ্রদাসবিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে যখন কটু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংসারের সঙ্গে তার বাস্তব পরিচয় হল, তখন কল্পলোকবাসী চিত্তের সহজ-মহিমা দিয়ে আপনাকে সে আর স্থির রাখতে পারেনি। বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতের মানুষের আবেষ্টনে কুমু তার জীবনের সহজ সূত্রটি শত চেষ্টায়ও খুঁজে পায়নি। পরে ভাইবোন দুজনেই একথা বুঝেছিল। বিপ্রদাস যখন বললে, "আমি তোকে ঠিক মতো শিক্ষা দিতে পারিনি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ীর জন্যে প্রস্তুত ক'রে দিতে পারতেন।" তখন কুমু উত্তর দিয়েছিল, "আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা-যে এতো বেশী তফাৎ তা' আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা' কিছু কল্পনা করেচি, সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয়নি।..."

* * * *

মধু প্রথমেই ভুল করলে। উন্মত্তের মত শেয়াকুলিতে ঘোষালদীঘির ধারে তাঁবু গেড়ে নিজের ধনের বড়াই দেখালে। এ যেন সুমিত্রালাভের আশায় বিক্রমের পশুবলের রুদ্র-অভিযান। মধু ও বিক্রম একই স্তরের। নারীচিত্ত জয় করার গোপন পথের সন্ধান ওরা দুজনেই জানত না। পিতৃকুলকে অপমান করার এই দম্ভভরা নীচ-চেষ্টা কুমুর সূক্ষ্মচিত্তে কঠিনভাবে আঘাত করলে। তবু ওর আদর্শ-নিষ্ঠাই শেষে জয়ী হল। ও মনে-মনে ভাবলে, মধু ভালই হোক, আর মন্দই হোক, সেই ওর জীবনের পরমগতি। যদি সে মধুকে প্রেম না দিতে পারে—ভক্তি' দিতে পারবে। অন্তরের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কুমুকে উপন্যাসের শেষ পর্য্যন্ত বারবার দুঃসহ পীড়া দিয়েচে। প্রতিদিন নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে যতই মধুর চিত্তের সত্যিকার রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল, ততই ও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলে, এখানে দরদ নেই, আছে কেবল শাসন, বাসা নেই, আছে কেবল ফাঁস। ওর নিজের বলে এখানে কিছু নেই,—এমন কি উপহার দেওয়া, দান করার মত স্বাধীনতাও নয়। মধুর সংসারে স্ত্রীর আসন দাসীত্বে। বিপ্রদাসের নিবিড় সংস্পর্শে উনিশবৎসর ধরে যা' পরিপুষ্ট হয়েছিল, কুমুর সেই আত্মমর্য্যাদাবোধ এই দাসীত্বকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বারবার ওর ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদা বিদ্রোহ করেচে,—শুধু মধুর বিরুদ্ধে নয়, আপন আদর্শের বিরুদ্ধেও। এই দ্বন্দ্ব ইষ্টদেবতার চরণে ওর একান্ত বিশ্বাসকে বারবার চূর্ণ ক'রে দেবার উপক্রম করেচে। তাই আমরা দেখি, কুমু নিজেকেই বারবার শুধিয়েচে, দৈবলক্ষণে যে রাজপুত্রকে দেখেছিলুম, সে কি তবে শুধু মরীচিকা? সেই সত্যিকার রাজা কোথায়? এই হীনতার আশ্রয়ে কেমন ক'রে কাটবে আমার সারাজীবন? কিন্তু এই সংশয়—এই বিদ্রোহ কখনও স্থায়ী হতে পারেনি। প্রতিবারই সব সংশয় নিঃশেষে দূর ক'রে দিয়ে জেগে উঠেচে ওর প্রাণের সেই একান্ত দৃঢ়বিশ্বাস। ও মনে মনে জোর করে বলেচে, না-না, একেই গ্রহণ করব, এর মধ্যেই জাগিয়ে তুলব সেই নিরঞ্জন দেবতাকে। অপমান, অত্যাচার, রূঢ়তা কিছুই আমাকে বিচলিত করতে পারবে না। কুমুর চিত্তের মধ্যে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতার সঙ্গে ব্যক্তিত্ববোধের এই যে বারবার দুর্ব্বিষহ দ্বন্দ্ব এ যেমন ওর চরিত্রকে ক'রে তুলেচে বাস্তব, তেমনি ওর প্রতি নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করেচে আমাদের সহানুভূতি। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই ফুটে উঠেচে কুমুচরিত্রের অনবদ্য সৌন্দর্য্য।

এদিকে কুমুর আদর্শবাদী, পারমার্থিক চিত্তের সঙ্গে মধুর জাগতিক, জবরদস্ত চিত্তের শুধু ঘাতপ্রতিঘাত নয়, মধুর

নিজের প্রকৃতির মধ্যেও ঘনিয়ে উঠেছিল দুটি বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্ব। আখ্যানধারার মধ্যে গতিদান করেচে শুধু ওদের এই বাইরের সংঘর্ষ নয়, নিজেদের সঙ্গে নিজেদের অন্তরের সংঘর্ষ-ও। মধুসূদন পশু নয়,—রক্তমাংসে-রচা মানুষ। মর্ত্যের মৃত্তিকা দিয়ে তার সৃষ্টি। তাই দেখা যায় ও প্রথমদিনই অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করেছিল। ও বুঝেছিল, এ মেয়ে সাধারণ শ্রেণীর নয়। তাই প্রথম থেকেই অন্য মেয়েদের মত কুমুকে একেবারে অবজ্ঞা করতে পারেনি। ক্রমে ওর মনের গভীর তলদেশে এই মেয়েটির মন পাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল। এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেই ওর চিত্তের অখণ্ড কর্তৃত্ববোধের দ্বন্দ্ব ওকে বারবার বিচলিত করে তুলেচে। এই দ্বন্দ্বের তাড়নায় ও বারবার কুমুর কাছে হার মেনে নিজের প্রভুত্বকে ক্ষুণ্ণ করেচে। কবি মধুর প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বকে অজস্র ছোট ছোট সূক্ষ্ম রেখা দিয়ে বড় সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তুলেচেন। শোবার ঘরে অসময়ে এসে কুমুর দেখা পাবার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের আগে আফিসের কাজ ফেলে চলে আসা (যে ব্যতিক্রম ওর জীবনে আর কখনও ঘটেনি), অথবা নববধূর পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে একলা যাপন করার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বাইরের দিকে বেগে হন-হন ক'রে যাওয়ার মধ্যে আমরা মধুর চিত্তের সেই দ্বন্দ্বের পরিচয় পাই।

এই দ্বন্দ্বই শেষে একদিন ওর প্রভুত্বের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটালে। সমস্ত সঙ্কোচ দূর ক'রে সেদিন মধু কুমুকে তার ব্যাকুল মিনতি জানালে, "আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেচি।" শুধু তাই নয়, যে নবীন ও মোতির মার কাছে তার সবচেয়ে অখণ্ড প্রতাপ, তাদের ডেকে এনে ও নির্বিকার চিত্তে কুমুর সামনে বললে, "কাল তোমাদের রজবপুর যেতে বলেছিলুম, কিন্তু তার আর দরকার নেই। কাল থেকে বড় বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত ক'রে দিচ্চি।" নিজের দাম্ভিক, উগ্র, কর্তৃত্ববোধকে আর কখনও ও এমন ভাবে খর্ব করতে পারেনি। একদিকে কুমুর সবল মনের সঙ্গে অপরদিকে নিজের চিত্তের সঙ্গে অহরহ সংঘাতে ওর অন্তরে এসেছিল পরিবর্তন। মধু ঠিক আর আগেকার মধু নেই। কুমুকে পাওয়ার জন্যে ও আজ যা' দিলে তা দেওয়া ওর পক্ষে সব চেয়ে দুঃসাধ্য।

এই ঘটনাই আখ্যানধারার চরম সন্ধিক্ষণ। এসময়ে যদি একটা মীমাংসা হয়ে যেত, তাহলে বিবাহিত জীবনের সাধারণ ব্যবহার হয়ত ওদের মধ্যে কখনও অসম্ভব হত না। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সেরকম কোন সন্ধি হল না। তাই ক্রমশঃই ওদের বিচ্ছেদ ঘনিয়ে উঠতে লাগল। অবশ্য, এই বিচ্ছেদের আরো একটা কারণ ছিল। মধুর রূঢ় ইতরতা শুধু কুমুর আত্মমর্য্যাদা-বোধে আঘাত দেয়নি, কুমুর চিত্তের শুচিতাবোধও বিচলিত হয়ে উঠেছিল মধুর লালসার স্বেদাক্ত স্পর্শে। কুমুর সংস্পর্শের আকর্ষণে মধুসূদনের অন্তরে সুপ্ত লালসা জেগে উঠেছিল। অতৃপ্তির আকর্ষণ বড় দুর্নিবার। মধুর সেই অতৃপ্ত লালসা সুযোগ পেয়ে আর ধৈর্য্য মানলে না। মন পাবার আগেই মধু দেহ পাবার জন্যে ব্যগ্র। ও জানে না, "সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একটা ফলের মতো, আলোহাওয়ার মুক্তির মধ্যে সে পাকে; কাঁচা ফলের যাঁতায় পিষলেই তো পাকে না।" এই অতৃপ্ত লালসার আক্রোশে যতই মধুর চেষ্টা বেড়ে উঠল, ততই ও আসল মানুষটাকে হারাতে লাগল। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের কথা মনে পড়ে: "সংসার পাতবার জন্যেই যে-মানুষ তৈরি, তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়ন-পিটোন আপনিই ঘটিতে থাকে। কিন্তু যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারেনা। যে-মেয়ে তা' না বোঝে সে যতোই দাবী করে ততোই হয় বঞ্চিত; যে পুরুষ তা' না বোঝে সে যতোই টানা-হেঁচড়া করে ততোই আসল মানুষটাকে হারায়।" কুমু যে একেবারেই মাটির মানুষ নয়। তাই কিছুতেই নিজেকে মধুর জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে না।

শেষে একদিন ওর সব অন্ধকার ঘুচে গেল। ও নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পারলে, মধুকে ভালবাসা বা ভক্তি করা ওর পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সেই কথাই একদিন মোতির মাকে জানালে: "পারতুম ভালবাসতে, মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমতো ক'রে নেওয়া সহজ

হলো। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েচেন। আজ সব জিনিষ কড়া হয়ে আমার বাজচে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘস্‌ড়ে তুলে দিলে। তাই চারিদিকে সবই আমাকে লাগচে, কেবলি লাগচে, যা' কিছু ছুঁই তাতেই চম্‌কে উঠি। এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোন একদিন হয়ত সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনদিন আর আনন্দ পাবনাতো।" কুমারী জীবনে কুমু ভাবত, পাত্র যেমনই হোক না কেন, তাকে ভালোবাসাটা খুবই সহজ। আজ ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেচে, ভালোবাসতে পারাটাই জীবনে সবচেয়ে দুঃসাধ্য। মোতির-মা হেসে বললে, "ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কি করে?" পাদ্রী 'ম্যানডার্স'-এর কথা মনে পড়ে। মিসেস 'অলভিং'কে সে ঠিক এই ধরণের কথাই বলেছিল, "To crave for happiness (কুমু যাকে আনন্দ বলেচে) in this world is simply to be possessed by a spirit of revolt. What right have we to happiness? No! We must do our duty, Mrs. Alving. And your duty was to cleave to the man you had chosen and to whom you were bound by a sacred bond." * কুমু তা-ই সত্য ব'লে মেনে নিলে। ও শেষে প্রেমহীন, নিরানন্দ নারীত্ব নিয়ে ভাল স্ত্রী হবার ব্রত গ্রহণ করলে।

* * * *

হয়ত বাপের বাড়ীতে বিপ্রদাসের স্নেহের আবেষ্টনে কিছুদিন থাকার পর মন শান্ত হয়ে এলে এই কঠোর ব্রত সফল ক'রে তোলবার চেষ্টা চলত। কিন্তু

কিন্তু অদৃষ্টের যোগাযোগ নূতন বাধা সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল। মধুসূদন ও শ্যামাসুন্দরীর নূতন সম্পর্কের সংবাদ বিপ্রদাসের কানে এল। শুদ্ধ, সবল, স্বাধীন চিত্ততার দুঃখে, ক্ষোভে অপমানে অবলা নারীত্বের পক্ষ হয়ে গর্জ্জে উঠ্‌ল। বিপ্রদাসচরিত্রের গোপনতলটি এখানে একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে পড়েচে। এতদিন তাকে দেখেচি, যতদূর সম্ভব আত্মত্যাগের দ্বারা জগতে অপরের পথ পরিষ্কার ক'রে দিতে। নিজেকে সদম্ভে প্রকাশ করার শক্তি যেন তার চিত্তে শিথিল। কিন্তু এইটাই তার সম্পূর্ণ রূপ নয়। ব্যবহারিক জীবনে ও ঠিক হ্যামলেট নয়। ওর আদর্শবাদী অন্তর যেখানে নিজের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র খুঁজে পেলে সেখান থেকে ও কাপুরুষের মত পালালো না। পাপের সঙ্গে সন্ধি করা ওর ধর্ম্ম নয়। তাই সে ভাব্‌লে, স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েচে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার কোন পন্থা রাখা হয়নি।...সতীত্ব গরিমা দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই।...দুই পক্ষের সততায় বিবাহবন্ধন সত্য হয়। সমাজের এই এক তরফা সতীত্বের মিথ্যাদাবীর বিরুদ্ধে বিপ্রদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। কুমুদের দাম্পত্য জীবনের পরিণতি হল বিচ্ছেদ। পাপের মধ্যে—অবমাননার মধ্যে,—অশুচিতার মধ্যে কুমু আর আশ্রয় নেবেনা, এই স্থির করলে। বাধা এল, ভয় প্রদর্শন হল, প্রিয়জনের অনুরোধ, অভিমান,—কিছুই ওর শেষ সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে পারলে না। জগতে শাস্ত্রগড়া, নির্ব্বিচার, মিথ্যা শ্রেষ্ঠতার বিরুদ্ধে আজ যে জীবনের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সুরু হয়েচে, কুমুর এই সঙ্কল্পে রয়েচে যে তারই মূর্ত্তরূপ! স্বাধীনচিত্ত বিপ্রদাস আগেকার মত আবার কুমুর জীবনে স্বাধীনতার আবহাওয়া রচনা করবার চেষ্টা করলে। দাদার আশ্রয়ে অবলা সে ভার হয়ে আছে—এই ভেবে পাছে তার অন্তরের ব্যক্তিত্বমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তাই বিপ্রদাস কুমুকে তার জীবনের প্রাত্যহিকতার সাথী করে নিলে।

* * *

আখ্যানধারার যবনিকা কিন্তু এখানে পড়েনি। কুমু আদর্শ বিলাসী, অন্তর্মুখী, ইষ্টদেবতার 'পরে একান্ত বিশ্বাসী। ওর জীবনযাত্রার মন্ত্র অসহযোগ নয়,—বর্জ্জন নয়। ও জানে, জগতের এই এলোমেলো কান্নাহাসি, দুঃখসুখের মধ্যে আছে ওর প্রভুর কল্যাণ স্পর্শ। এদের চরম পরিণাম স্বরূপে একদিন না একদিন ফিরবে ওর জীবনের পরম

* ইবসেন-কৃত "Ghosts."

চরিতার্থতা। সেই আশার মোহে বর্ত্তমানের দুঃখকে তুচ্ছ ক'রে অদৃষ্টকেও প্রসন্ন মনে গ্রহণ করে,—এই ওর প্রকৃতির ধারা। তাই মনে হয়, কুমুকে যদি রবীন্দ্রনাথ আত্মসর্ব্বস্ব, বিদ্রোহিণী জননীরূপে দেখিয়ে গ্রন্থের শেষরেখাপাত করতেন, তাহলে অনেক নারীদরদী-পাঠকের-মনতুষ্টিকর, অতি-আধুনিকী রমণী-চরিত্র সৃষ্টি করা হত বটে এবং নারীর স্বাধিকার সংগ্রামকে স্পষ্টতর বাণী দেওয়াও হত, কিন্তু, তাতে কুমু-চরিত্রের স্বাভাবিক গতিছন্দ অকারণে খাপছাড়া ও বিকৃত হয়ে পড়ত। নারীর স্বাধিকারকে অতিরঞ্জিত করতে গিয়ে কলালক্ষ্মীর স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করা হত।…

যাহোক, অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে কুমুর শেষ-সঙ্কল্পও স্থায়ী হল না। এতদিন বাইরে থেকে এসেছিল দুর্নিবার বাধা, কুমু বা বিপ্রদাসের দৃঢ়তা তাতে বিচলিত হয়নি। আজ ভিতর থেকে বাধা জাগল। নিষ্ঠুর প্রকৃতি তার অন্তরেই সৃষ্টি করে রেখেছিল পরম বিঘ্ন। বিপ্রদাসের কানে গেল কুমু সন্তানসম্ভবা। কাল যা' ছিল, স্থির, অটল, আজ আর তা রইল না। মধু একদিন আগ্রহে ভেবেছিল, "কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটিমাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।" বিধাতা আজ ওর সেই আশাই সফল করলেন। কুমু একদিন যে সম্বন্ধের কটুবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করতে চেয়েছিল, দেখা গেল, তা আজ ওর দেহের রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে গেচে। অক্টোপাসের মত তার শত গ্রন্থি। তাকে অস্বীকার করা মানুষের অসাধ্য।

আজ জীবনপ্রাঙ্গণে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার চায়। কিন্তু প্রকৃতি তাকে করেচে দুর্ব্বল। সৃষ্টির বীজ থাকে পৌরুষের মধ্যে। পুরুষ সৃষ্টি করেই মুক্ত। স্থিতির সাধনা নারীর একান্ত নিজস্ব। এই biological সত্যকে শুধু সমান অধিকারের উত্তেজিত আস্ফালন দিয়ে উপেক্ষা করা যায় না। নারীর এই আদি-দৌর্ব্বল্য যে প্রকৃতির চরম নির্ম্মমতা। প্রকৃতিই যে তার দুর্দ্দম শত্রু।

কিন্তু বিপ্রদাস আর স্থির থাকতে পারলে না। কুমুর সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ম্মূল করে দেবার অধিকার ত' তার নেই। তাই সে কুমুকে বললে, "তোকে নিষেধ করতে পারি, এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে নিজের ঘরছাড়া করব কোন স্পর্দ্ধায়?" যে বিপ্রদাস কিছুদিন পূর্ব্বেও স্থির করেছিল, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সমস্ত নারীসমাজের পক্ষ হয়ে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারই মুখে একথা আজ যেন অত্যন্ত বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়। ঘোর অসম্মানের নরকে কুমুকে নির্ব্বাসন দেবার এই হঠাৎ ব্যবস্থায় মনে হয় বিপ্রদাস হটকারী,—একান্ত দুর্ব্বল চরিত্রের লোক। তার আগেকার সমস্ত সঙ্কল্প শুধু উত্তেজনার নিষ্ফল স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। শান্তপ্রকৃতি বিপ্রদাস উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে যায়নি। কুমুকে পাঠাবার সঙ্কল্পের মধ্যে বিপ্রদাসের পক্ষ থেকে প্রধানতঃ দুটো কারণ দেখা যায়। আমাদের সমাজ গঠনের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সন্তানের কুলশীল ধনমান সমস্ত নির্ভর করে পিতার উপরেই। এক্ষেত্রে গণচক্ষে মাতৃকুলের প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এ শুধু ভারতে নয়, যাযাবর নারী যেদিন থেকে আত্মসমর্পণ ক'রে গৃহহীন পুরুষকে গৃহস্থ করলে, সেদিন থেকেই দেশে-দেশে যুগ-যুগ ধরে এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা চলে আসচে। বস্তুতঃ সমাজের যজ্ঞশালায় সন্তানের আসন নির্দ্দেশ পিতৃকুলদেবতারই একান্ত নিজস্ব অধিকার। বিপ্রদাস সেকথা ভোলেনি। কিন্তু সন্তানের এই ভবিষ্যৎ চিন্তার চেয়েও আরো একটা বড় কারণ বিপ্রদাসের ছিল। তা' কুমুর অন্তরের সদ্য-জাগ্রত মাতৃত্ব। কুমু যখন বললে তার কিছুই ভাল লাগচে না, তখন বিপ্রদাস উত্তর দিয়েছিল, "ভুল বলচিস্ কুমু, তোর ভালই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।" প্রথম মাতৃত্বের আস্বাদ নারীর জীবনে সর্ব্বদুঃখহরা, অভিনব অভিজ্ঞতা। মনে হয় বিপ্রদাস এ সত্য উপলব্ধি করেছিল যে "There is only one thing in the world which can make a woman forget everything else, everything else : and that is the child." (John Christopher : Vol. IV. P. 153.)

কুমু কিন্তু সহজে এ ব্যবস্থায় রাজী হল না। অন্ততঃ যদি যেতেও হয় তবু সে স্থির করলে, ওদের ছেলে ওদের

হাতে দিয়েই সে মুক্তি নেবে। কিন্তু অবশেষে কুমুর চিত্তের স্বাভাবিক মহিমাই জয়ী হল। মনের আবেগে প্রথমে ও যাই বলুক, শেষে এই দৈবনির্মমতাকে বিধাতার কঠোর কিন্তু কল্যাণী বিধান, ব'লে গ্রহণ করলে। ওর শেষ কথায় সেই আত্মনিবেদনের ভাব—ইষ্টদেবতার চরণে ওর একান্ত নির্ভরতাই ফুটে উঠেচে: "আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবচি যে চারিদিকে এতো এলোমেলো, এতো উলটো, পালটা, তবু এই জঞ্জাল একেবারে ঢেকে ফেলেনি জগৎটাকে। এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্র সূর্য্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলচে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেচে, সেইখানেই আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর।" সুমিত্রার শেষ কথা মনে পড়ে। তার শেষ সংকল্পের কথা শুনে দেবদত্ত যখন সভয়ে বললে, "এ কিন্তু বড় সঙ্কটের কথা মহারাণী। অনেক পাপ সে করেচে, অবশেষে দুর্বৃত্ত যদি দেবালয়ে এসে দেবতার অসম্মান করে, পুণ্যতীর্থে যদি কলুষ আনে?" সুমিত্রা তখন নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিল, "ভয় নেই, ঠাকুর, কোন ভয় নেই। আমার প্রভু আমার হিরণ্যদ্যুতি, সকল সঙ্কট দগ্ধ করবেন, নিঃশেষে ভস্ম করবেন। সেই রুদ্র আমাকে গ্রহণ করেচেন,—তাঁর কাছ থেকে আমাকে ছিন্ন ক'রে নিতে পারে এমন শক্তি কারো নেই।" যাবার দিনে কুমু ইষ্টদেবতার পরে এইরূপ দীপ্ত, সবল, একান্ত বিশ্বাস নিয়ে গেছ্‌ল। মনে হয়, কুমু ও তপতী চরিত্রের ভিত্তি একই জাতীয়, অবশ্য ওদের মধ্যে স্তরের বৈষম্য আছে।

প্রশ্ন হতে পারে, জীবনে তবে কি কুমুর পরাজয় ঘটল? পাপের সঙ্গে সন্ধি করে ও কি তবে কাপুরুষের পূজার পূজারিণী সংখ্যা বৃদ্ধি করলে? আখ্যায়িকার এ কি শেষ রেখাপাত? সমাজের নরককুণ্ডে দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাই কি কবির চরম নির্দেশ? কুমুচরিত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণত স্তরের সৃষ্টি। ওকে সাধারণ চরিত্রের মানদণ্ড দিয়ে বিচার করতে গেলে পদে-পদে ভুল বোঝা হবে।

কুমু চরিত্রের এই শেষ চেষ্টাটি ওর আগেকার কাজকর্ম্মের সঙ্গে বড়ই সুসঙ্গত। কুমু তার ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদাকে বিসর্জ্জন দেয়নি মধুর রূঢ় প্রভুত্ব বা নিয়তির নিষ্ঠুর অসহায়তার মধ্যে। আদর্শবাদী, কল্পলোকবাসী ওর চিত্ত ইষ্টদেবতার চরণে জীবনের সব কিছু চাওয়া পাওয়া নির্ব্বিকার চিত্তে উৎসর্গ ক'রে আবার নূতনভাবে জয়যাত্রা সুরু করলে—যেমন বিবাহের পূর্ব্বে দৈব-লক্ষণ দেখে এক দিন করেছিল। এটা ওর চিত্তের দুর্ব্বলতা নয়, আধ্যাত্মিক সবলতার চিহ্ন। ওর এই চেষ্টা পাপের সঙ্গে সন্ধি নয়—মধুসূদনের দম্ভের কাছে আত্মনিবেদন নয়। ইষ্টদেবতার চরণে নিঃশেষে আত্মবিসর্জ্জনের শুভ প্রয়াস মাত্র। অতএব কুমুদিনীর দিক থেকে বিচার করলে মনে হয়, ওর এই যাওয়ার মধ্যে পাপের অন্যায়ের—অত্যাচারের বেদীমূলে আত্মবলির কোন নিদর্শন নেই। হতে পারে, কুমুর এই শেষ পরিণতি শ্রেয় হলেও, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রেয় নয়। কিন্তু একথা সত্য যে কুমুচরিত্রের পক্ষে কোন ক্রমেই এ কাজ অস্বাভাবিক নয়।......

যাহোক, কুমুর এই যাত্রার যা পার্থিব উদ্দেশ্য, তা একদিন সফল হয়েছিল। ওর সন্তান তার পিতৃগৃহের প্রাপ্য আসনটি অধিকার করতে পেরেছিল। কবি সেকথার ইঙ্গিত দিয়েচেন প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে: "আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হলো বত্রিশ। ভোর থেকে আসচে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম আর ফুলের তোড়া।"......

কবি উপন্যাসের যেখানে পূর্ণচ্ছেদ দিয়েচেন, পাঠকের চিত্ত সেখানেই শুব্ধ হয়ে থাকে না। পিতৃগৃহ থেকে কুমুর শেষ বিদায়ের পর এই যে বত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ পরিসর—এর অন্ধকারের মধ্যে পরম আগ্রহে আমাদের চিত্ত কুমুর সন্ধান করে বেড়ায়। ওর জীবনের সেই পরিত্যক্ত অধ্যায়ের নিষিদ্ধজ্ঞানের জন্যে আমাদের অন্তর একান্ত উৎসুক হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, "যোগাযোগ" একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়—সেই অলিখিত উপন্যাসের লিখিত ভূমিকা মাত্র। কুমুর জীবনের চরম পরিণতির সেই অজ্ঞাত কাহিনী পাঠকের চিত্ত নিজের খেয়ালেই রচনা করে নেয়। কবির নিষিদ্ধরাজ্যে পাঠকের কল্পনা নির্ব্বিবাধে যাত্রা করে। অবশ্য, এ আমাদের অহেতুক উত্তেজনা, আখ্যানভাগের স্বর্গারোহণপর্ব্ব পর্য্যন্ত শোনবার তৃপ্তিপিপাসু মনস্তাত্ত্বিক

মনোবৃত্তি। কারণ, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে "যোগাযোগ" গল্পের যতি যেখানে পড়েচে, মূলকথার ইতি হয়েচে সেখানেই। সেই মূলকথাটিকে ধরতে না পারলে কথাবস্তুকে অসমাপ্ত বলেই মনে হবে।

"যোগাযোগ" নরনারীর প্রচলিত সামাজিক সম্বন্ধ-বন্ধনের ধ্রুবত্ব নিয়ে লেখা হয় নি। অথবা বিবাহিত জীবনে নারীর অবাধ স্বাতন্ত্র্য এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বিবাহ সম্বন্ধ নিয়ে স্ত্রীলোকের দুঃসহ অবমাননার অন্ত নেই, প্রতিদিন কত আত্মহত্যা ও ততোধিক দুর্গতির ইতিহাস এখানকার মানুষ অবিচলিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে শুনে আস্‌চে।" এই সব হেয় অন্যায়ের বেদনার মধ্যে "যোগাযোগে"র উৎপত্তি। অবশ্য এই জটিল ও অতিবৃদ্ধ সমস্যাটিকে কবি পুরুষের দিক থেকেই বিচার করেচেন। তাই গ্রন্থে আছে পুরুষের কি কর্ত্তব্য তারই নির্দ্দেশ। কবি ইঙ্গিত দিয়েচেন, নারীকে তার ব্যক্তিগত জীবনে প্রাপ্য মর্য্যাদা দাও, তার ব্যক্তিত্ব-গৌরবকে সম্মান কর। বিবাহের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত কুমুর যে অসহ অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে শুধু কোন একজন মেয়ের নয়। স্ত্রী সম্বন্ধে মধুর প্রথমে যে ধারণা ছিল, আমাদের সমাজে অনেকেরই অবচেতন মনের অন্ধকার কোণে আছে সেই ধারণা। "কুমু এসে দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্ত্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে, এই মধু আশা করেছিল।" "বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধু তেম্‌নি করেই ভেবেছিলো।" শাস্ত্রে আমরা যত আড়ম্বরের সঙ্গে স্ত্রীর মহিমাকীর্ত্তন করেচি, ব্যবহারিক জীবনে তার আসনকে ততই নীচে ঠেলে দিয়েচি। আমাদের সংসারে স্ত্রীর আসন আজ হীনতার মধ্যে,—অবমানকর দাসীত্বে। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ভুলে যাই, "গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয় শিষ্যালিলতে কলাবিধৌ।" স্ত্রীর মধ্যে যে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, তাকে যে সম্মান করতে হয়, সে কথা মনে রাখবার মত শিক্ষা সমাজে নেই। কুমু বিপ্রদাসকে বলেছিল,…"আমি ওদের বড়-বৌ, তার কি কোন মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?"*

কুমুর মধ্যে সব চেয়ে আদি বস্তু তার ব্যক্তিত্ব। সকলের আগে সে মানুষ—পুরুষের মতই মনুর সন্তান। তার সেই মনুষ্যত্বকে প্রাপ্য মর্য্যাদা দিতে হবে।

অন্তরের সহজ প্রেরণায় এ মর্য্যাদা দিতে পারলে অধিকারবোধের কূটতর্ক এবং দুঃসহ দ্বন্দ্ব কারো চিত্তকে বিচলিত করতে পারবে না। নবীন ও মোতির মার জীবনে এ কূটতর্ক জাগবার অবকাশ পায়নি। "যোগাযোগে"র মূল প্রশ্নের উত্তর কবি বড় কৌশলে ফুটিয়ে তুলেচেন এই নবীন ও মোতির-মা-সৃষ্টির মধ্যে। দ্বন্দ্বের মধ্যে নরনারীর বিবাহিত জীবনের চরম চরিতার্থতা নেই—আছে তাদের সম্বন্ধের সহজ সুসঙ্গতির মধ্যে। শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মীও এ কথা স্বীকার করেচে। একদিন শ্রীকান্ত যখন বললে, "আমি কোন দিন বলিনি যে তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোনদিক থেকে আমাদের চেয়ে একতিল ছোট নও।" তখন রাজলক্ষ্মীর চোখ দুটি ছলছল ক'রে উঠ্‌ল। সে উত্তর দিলে "সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত' একথা তোমার কাছে শিখ্‌তে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এম্‌নি ক'রে ভাবতে পারতো, তাহলে পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা (অর্থাৎ নারীরা দাসীর জাত) শুনতে পেতে। কে বড়, কে ছোট, এ সমস্যাই কখন উঠ্‌ত না।" উপন্যাসের প্রথম দিকে বিপ্রদাসের কণ্ঠে একদিন এই কথাই ধ্বনিত হয়েছিল, "দিদি, আসলে কিছুই নয়—কে বড়ো, কে ছোটো, কে উপরে, কে নীচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌গুলোর কোনটার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়।" "যোগাযোগে"র মূল কথার মধ্যে দিয়ে বিবাহিত জীবনে নরনারীর সমঅধিকার সম্বন্ধে কবির যে বাণী আভাসে ঘোষিত হয়েচে, মনে হয় তার মধ্যে শুধু ভারত নয়, নারীপ্রগতির হট্টকোলাহলমুখরিত পাশ্চাত্য ও নূতনতর পথের সন্ধান পাবে। মনে হয়, তার মধ্যে যেন দুই বিপরীত দৃষ্টি "ইবসেন" ও "ষ্ট্রাইণ্ডবার্গ" বিশ্বসমাজের কল্যাণের জন্যে পরস্পরকে মিলিয়ে দিয়েচেন।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

* "A Doll's House"-এ Nora "I believe that before all else I am a reasonable human being, just as you are..." (Act. 3)

কল্পতরু

(আচার্য্য ওকাকুরা কাকুজো) *

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

অগাধ পরিখা বাধা, তারি পরপারে
হিমবান শৈলেন্দ্রের বক্ষের তুষারে,
পুষ্পিত অনিন্দ্য তরু, শুভ্র নিরাময়
কত জন্ম জন্ম হায়, আকুল হৃদয়,
শৈবালে আচ্ছন্ন স্তব্ধ শিলাসন 'পরে
মায়ামুগ্ধ তারি পানে নম্র চন্দ্রকরে
বর চাহি, গত-পাপ কত যুগে হায়
তারি পুণ্য মধু-স্বাদ লভিব হিয়ায় ॥

* আচার্য্য ওকাকুরা কাকুজো বঙ্গীয় সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত কিনা জানিনা, কেননা তাঁহার পুস্তকাদি সবই ইংরাজিতে লিখিতেন—Ideals of the East, Spirit of Japan, Book of Tea গ্রন্থ ইংরাজীতে লিখিত ও বহু প্রশংসিত। ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন এমন সুন্দর রচনা ইংরাজী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারাও লিখিতে পারে না। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু—সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে একত্র গ্রথিত করা ছিল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও আগ্রহ—অকাল মৃত্যু হওয়ায় সে আগ্রহ কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই— তিনি স্বদেশী যুগে বৎসরাধিক কাল ভারতবর্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশী প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময়কার মিকাডো অর্থাৎ জাপান সম্রাটের নিকট আত্মীয় যে কুড়িজন জাপানী যুবককে ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষা দিবার জন্য সম্রাট ইউরোপের সর্ব্বত্র হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পাঠান তিনি তাহার অন্যতম। আমাকে অনেকগুলি পত্র লেখেন ও কবিতা জাপানী ছবির মত অক্ষরে লিখিয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাঠান। সেই কবিতা ও পত্রাবলী ভাষান্তরিত করিয়া বিচিত্রাকে উপহার দিবার ইচ্ছা আছে। লেখিকা

গ্রাম্যগান কেন ধ্বংস হইল

জসীম উদ্‌দীন

আমাদের দেশের গ্রামগুলি আজ দিনে দিনে বিধাতার অভিসম্পাত কুড়াইতেছে। গাজীর গান, জারীগান, কবি ও তরজার ছড়া, ঝুমুরের নৃত্য, তুমরি খেলার নৃত্য প্রভৃতির আনন্দের হাটগুলি আজ ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অনেকে বলেন, এরূপ যে হইয়াছে তাহা অর্থনৈতিক কারণে। একথা আংশিক সত্য। সম্পূর্ণ সত্য নহে। গ্রামে গ্রামে ফুটবলের ক্লাব হইতেছে। থিয়েটারের ষ্টেজ উঠিতেছে। গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি পল্লীগ্রামে হাজার হাজার টাকার রেকর্ড বিক্রয় করিতেছে। এ সবের জন্য যদি পয়সা জোটে তবে পল্লীর সে-কেলে ধরণের আনন্দ উৎসবগুলির জন্য যে যৎসামান্য খরচ হয় তাহা লোকে দিতে পারে না কেন?

এই কেনর উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। দেশের লোকের রুচি বদলাইয়া গিয়াছে। বিলাতী কাঁচের চাকচিক্য আমাদিগকে আজ পাইয়া বসিয়াছে। তারই মোহে আমরা ঘরের মণিমাণিক্য পথের ধূলায় ছড়াইয়া দিতেছি।

বর্ত্তমান সভ্যতা সহরমুখিন। সহরে যাহা হয় সমস্ত দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত দেশ চলিয়াছে সহরের অনুকরণ করিয়া। সহর হইল বিদেশী পণ্যের বাজার। বিদেশীর পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফের তার ও রেল ষ্টিমারের পথ বাহিয়া বিদেশী সস্তা পণ্যের সাথে বিদেশী সস্তা রুচি আমাদের সহরগুলিতে প্রথম আমদানী হইতেছে, আবার সেখান হইতে পল্লীগ্রাম ছড়াইয়া পড়িতেছে। সহর হইতে যাহা গ্রামে যায় তাহা ব্যবহারের সামগ্রী। গ্রাম যেমনটি পাইয়াছে তেমনটিই গ্রহণ করে, কি চিন্তার দিক দিয়া, কি বাহিরের বিলাসোপকরণের দিক দিয়া। কিন্তু গ্রাম হইতে যাহা সহরে আসে তাহা কাঁচা মাল (Raw-Materials) সহর তাহাকে নিজের ইচ্ছামত ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নতুন করিয়া লয়। তাই গ্রাম দিনে দিনে সহর হইতেছে কিন্তু সহর গ্রাম হইতেছে না। গ্রাম হইতে যাহারা সহরে আসে, তাহারা তাই সহরের রুচির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহারা সহরে আসিবার সময় গ্রামের আনন্দ উৎসবগুলি সাথে করিয়া লইয়া আসে না। সহরের প্রচলিত আনন্দ উৎসবে তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারায়। ইহার কারণও আছে। গ্রাম হইতে যাহারা সহরে আসে, তাহারা আসে অর্থোপার্জ্জন করিতে অথবা সহরের বিদ্যা শিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত হইতে। নানা কাজের ভিড়ে আনন্দ করিবার যে-টুকু অবসর তাহারা পায়, সহরের তথাকথিত আনন্দ উৎসবে যোগ দিয়া তাহা তাহারা পূর্ণ করে। সহরের আনন্দ উৎসবের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারাও প্রচলিত পথে গা ভাসায়। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা কয়জনই বা। গ্রামের অধিকাংশ লোক সহরে আসিয়া যেদিন পা দিল সেইদিনই সে সহরের রুচির কাছে দাসখত লিখিয়া দিল।

বিদেশী সভ্যতা বাঙলাদেশের যতটা ক্ষতি করিয়াছে বোধ হয় আর কোন প্রদেশের ততটা করে নাই। বাঙলার রাজধানী কলিকাতা। এই সহর বিদেশীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশগুলিতে যেমন স্থানীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের কতকটা প্রচলন দেখা যায় বাঙলার কলিকাতায় বঙ্গদেশের শিল্প সঙ্গীতের প্রভাব ততটা দেখা যায় না। ইহার কারণ যে সব প্রদেশের সহরগুলি পুরাতন সেই সব স্থানে দেশের শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যের একটা প্রাচীন বনিয়াদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজ আমলে তাহাদের প্রভাব কতকটা ক্ষীণ হইয়া আসিলেও একেবারে নিরর্থক হইয়া যায় নাই। আর সেই সব সহর পুরাতন বলিয়া সেখানে সেকেলে ধরণের রাজামহারাজা ও নবাবজাদারা দেশের প্রাচীন সঙ্গীত ও

শিল্প-সাধনার ধারাকে কতকটা উৎসাহ দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাই অন্যান্য প্রদেশের নর্ত্তক ও গায়কেরা অনেকটা অর্থবান বলিয়া সুদূর বাঙলায় আসিয়াও তাহারা সময় সময় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এই সব সুযোগের অভাবে বাঙলাদেশের বাউল ভাটিয়াল ও কীর্ত্তন গানের দল কলিকাতায় কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বাঙলার নৃত্য বাঙলার শিল্প আজ লোক চক্ষুর অন্তরালে। জাপানী আর্ট, ইটালীয় আর্ট, অজন্তা আর্ট, মোগল আর্ট বাঙলার শিল্পীদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। বহু অর্থব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে বহু সমারোহে এই সব শিক্ষা করিয়া বাঙালী শিল্পীরা বাহবা পাইতেছেন। বাঙালীর রুচি তাহাদিগকে দিনে দিনে নব নব অর্থের পথ বাতলাইয়া দিতেছে। কিন্তু দেশের পটুয়া ও ভাস্করেরা (যারা প্রতিমা তৈরি করে) ও সূত্রধরেরা (যারা কাঠের মূর্ত্তি তৈরী করে) না খাইয়া মরিতেছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও মিষ্টার গুরুসদয় দত্ত বাঙালার শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা কতটুকু। আজকাল বাঙালাদেশে হিন্দুস্থানী গান ও গজল গান গাহিয়া বহু অবাঙ্গালী গায়ক পসার করিয়া লইয়াছেন। বাঙালী গায়কেরাও কেহ কেহ তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু বাঙালাদেশের কীর্ত্তন বাউল, ভাটিয়াল গায়কেরা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া কোন রকমে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। অবশ্য কীর্ত্তনের আদর এখনও কিছু কিছু আছে কিন্তু হিন্দুস্থানী গানের তুলনায় তাহা অতি সামান্য।

ইহার কারণ বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। সে আজ অন্যান্য প্রদেশ হইতে নিজেকে প্রধান বলিয়া মনে করে। এই বলিয়া মনে করে যে সে আজ বিদেশকে অন্যান্য প্রদেশ হইতে বেশী অনুকরণ করিয়াছে। বাঙালায় সাহিত্য সমিতি হইয়াছে। ইহা এদেশী ধরণের নয়। বাঙলার বাহিরে বহুমশায়েরার অধিবেশন হয়। এই সব মশায়েরার দেশের কবিরা নিমন্ত্রিত হন। রাত্রের বেলাই সাধারণত ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। একটি আলো হাতে লইয়া একজন কবি কবিতা পাঠ করেন তারপর তিনি আলোটি অন্যের হাতে দেন। তিনি আবার তার কবিতা পাঠ করেন। এইরূপে আলোটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব কবির হাতে যাইয়া পড়ে। মশায়েরার অধিবেশনে জনসাধারণের যেরূপ উৎসাহ দেখা যায় আমাদের দেশের কোন সাহিত্যসভায় সেরূপ হইবার যো নাই। অথচ মশায়েরাটা সম্পূর্ণ এ দেশী ধরণের।

আজ অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও বাঙলার গান শিক্ষা করিবার সুযোগ পান না। কারণ সহরে বাউল ভাটিয়াল ও কীর্ত্তন শিক্ষা করিবার তেমন ভালো বন্দোবস্ত নাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই সব শিক্ষা করিবার কষ্ট কয়জন স্বীকার করিতে চাহেন?

গ্রামের লোক যে সহরে আসিয়া তাহাদের গান গাহিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে এরূপ সুযোগও তাহারা পায় না। কারণ প্রথম অবস্থায় এরূপ দুঃসাহসের [illegible] অর্থের প্রয়োজন। তা ছাড়া আরও অন্তরায় আছে। ইংরাজের সাথে পরিচিত হইয়া আমরা সময়ের মূল্যটা ভালমতই শিক্ষা করিয়াছি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র নানান দিক দিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। আনন্দ করিবার সময় আমাদের অল্প। এই অল্প সময়ের অনুপাতে আনন্দ দিবার ক্ষমতা পল্লীগানে নাই। গ্রামের লোকদের আগে অবসর ছিল বেশী। একটি গান বারবার করিয়া বহুবার গাহিলেও তাহাতে শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত না। সারারাত্র যাত্রা গান চলিতেছে। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হইলেন। অমনি তুড়ীজুড়ী উঠিয়া গান ধরিল। দুঘণ্টায় গানের শেষ হইলে উঠিলেন বেহালাদার। তিনিও দেড়ঘণ্টার কম বাজাইলেন না। তারপর রামের বিলাপ, সীতার বিলাপ, হনুমানের বিলাপ...এরূপ ধৈর্য্যবান শ্রোতা আজকাল পাওয়া যায় না। শ্রোতাদের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে দেশীয় ধরণের গান গাওয়ার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ভাসান ও যাত্রার আসরে তাই লোক জমে না। থিয়েটারে জমে। আজ যদি কেহ পল্লীগানকে এই দিক দিয়া কিছু ছাটিয়া কাটিয়া লন তবে নিশ্চয় তিনি পল্লীগান প্রচারে কৃতকার্য্য হইবেন।

সহরে যাহারা পল্লীগান গাহিতে চেষ্টা করে তাহারা অনেকটা ভুল করেন। অন্ততঃ কয়েকজন গায়ককে পল্লী-

গান শিক্ষা দিতে যাইয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহারা এই গানের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাবান নন। তাই অন্যান্য গানের সাধনা করিতে যতটা সময় তাঁহারা দিতে প্রস্তুত পল্লীগান শিক্ষা করিতে তার শতাংশের একাংশ সময়ও দিতে প্রস্তুত নন। সুপ্রসিদ্ধ নর্ত্তকী ইসাডোরা ডানক্যান তার জীবনস্মৃতি লিখিতে যাইয়া একটি বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছিলেন—

It has taken me years of struggle, hard work and research to learn to make one simple gesture and I know enough about the art of writing to realise that it would take me again just so many years of concentrated effort to write one simple beautiful sentence.

আজীবন হিন্দুস্থানী গান শিক্ষা করিয়া যাঁহারা কতকটা প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন তাঁহারা দুগার ঘণ্টা পল্লীগান শিক্ষা করিয়াই নাম কিনিতে চাহেন। প্রত্যেক শিক্ষার পিছনে সুদীর্ঘ দিনের পরিপূর্ণ সাধনা না থাকিলে তাহা দিয়া লোকের মনে স্থায়ী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যায় না। এই কথাটা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না। সহরের শ্রোতারা আজ হিন্দুস্থানী ও গজলগান শুনিতে অভ্যস্ত। পল্লীগানকে যেমন বহুদিন বহুশিক্ষার দ্বারা আয়ত্ব করিতে হইবে সেই সাথে, শ্রোতাদের মনেও বাঙলার গানের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চিরাচরিত পথে ত সকলেই চলিতে পারে। কিন্তু এই পথে বিশিষ্ট প্রশংসা তাঁহারাই পাইবেন যাঁহারা শ্রোতার মনে নিজেকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

আজকাল পল্লীগান শুনিবার জন্য একদল শ্রোতা তৈয়ারী হইয়াছে বটে। কিন্তু জাপানী খদ্দরের মত সহরের সুরে বাউল ভাটিয়ালী সুরের দু একটা টান মিশাইয়া গান রচনা করিয়া শ্রোতাদিগকে ঠকান হইতেছে। নকলের মোহ বেশীদিন টেকে না। তা ছাড়া এই সব কৃত্রিম গানগুলি শুনিয়া পল্লী সঙ্গীতের প্রতিই লোকের অশ্রদ্ধা বাড়িয়া যাইবে।

গ্রাম্যগানের সুরে যে সব কোমল টান রহিয়াছে তাহা হারমোনিয়াম যন্ত্রে ভাল মত ওঠে না। হারমোনিয়াম যে গ্রাম্য সঙ্গীত গাহিবার পক্ষে কতটা অন্তরায় তাহা অধ্যাপক বাকে সেদিন তার প্রবন্ধে ভালমত বলিয়াছেন। অথচ আমাদের দেশের গায়কেরা অনেকেই হারমোনিয়াম ছাড়া গাহিতে পারেন না। সুতরাং সহরের লোকদের মুখে আমরা যে সব পল্লীসঙ্গীত শুনি তাহা খাঁটি পল্লীসঙ্গীত হইয়া উঠে না। ওস্তাদিগানগুলি অনেকটা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপরে কাজ করে। বাঙলা গান আমাদের ভাবজগতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভাটিয়াল সুরের কথাই ধরা যাক। ইহার এক একটা টানের ভিতর এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে যে বহুদিন পর্য্যবেক্ষণ না করিলে তাহা ধরা যায় না। কিন্তু সুরের সেই সব কাজ আমাদের অগোচরে মনে প্রভাব বিস্তার করে। পল্লীগ্রাম হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাল গায়ক আনিয়া সহরের রুচি বিষয়ে তাহাদের কিছু সামান্য শিক্ষা দিলেই তাহাদের দ্বারা পল্লীগান প্রচারে কতকটা সাহায্য হইতে পারে। আমাদের দেশের গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি ও রেডিওর কর্ম্মকর্ত্তারা এদিক দিয়া কতকটা সাহায্য করিতে পারেন। হিন্দুস্থানী রেকর্ড কোম্পানী ইতিমধ্যেই এদিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্যোগে আমরা গ্রাম হইতে একটি রাখাল ছেলেকে আনিয়া তাহার বাঁশের বাঁশী রেকর্ড করাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। মেকানিক্যাল কি গণ্ডগোলে রেকর্ডখানি খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা গ্রাম হইতে খাঁটি গ্রাম্যগায়ক আনাইয়া এরূপ বহু রেকর্ড করাইবেন এমন আশ্বাস আমাদিগকে দিয়াছেন। সহরে যদি এই ভাবে পল্লীগানের কতকটা স্থান করিয়া দেওয়া যায় তবে আমাদের দেশের আনন্দ উৎসবগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে। কারণ গ্রাম যে প্রকার দ্রুতগতিতে সহরকে অনুকরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে মনে হয় আর কিছুদিন পরে এগুলির অস্তিত্বও থাকিবে না।

দেড়শত বৎসর আগে আমাদের দেশে মুসলমানদের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। ইহা ওহাবী আন্দোলনের ফলে (Protestant) প্রটেষ্টান্টধর্ম্মের মত এই আন্দোলন মুসলমান সমাজকে একপ্রকার ভাজিয়া গড়িল।

দেশে মোল্লা মৌলবীর প্রভাব বাড়িয়া গেল। তাহাদের মতানুসারে নৃত্যবাদ্য ও সঙ্গীত হারাম। কোরাণের দোহাই* দিয়া ইহারা সমাজে এমনই প্রভাব বিস্তার করিল যে তাহার ফলে মুর্খ জনসাধারণ গায়কদিগকে ধরিয়া মারিল, সামাজিক বয়কোটে তাহাদের হুকো নাপিত বন্ধ করিল মাথার লম্বা চুল ও জটা কাটিয়া দিল। আজও তাহাদের শাসন পুরামাত্রায় চলিতেছে। এই সব লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত হইয়া অনেকেই গান বাদ্য ছাড়িয়া দিয়াছে। যাহারা ছাড়ে নাই তাহারা হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ জাতিদের মত তাহাদেরই সাথে চলিয়া কোনরকমে জীবন কাটাইতেছে। ঢুলী এবং সানাইদারদের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য মুসলমান সমাজে থাকিয়াও গোপনে গোপনে অনেকে গান করে।

এই ধরণের অত্যাচারের একটা বিবরণ দিব। আমাদের দেশে একজন মুসলমান জমিদার ছিলেন। তিনি গোঁড়া মুসলমানদলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নদীর তীরে কি একটা কাজে তিনি আসিয়াছিলেন। তখন একখানা বাছ-খেলার নৌকা গান গাহিয়া বৈঠা ঠুকিয়া চলিয়াছিল। জমিদারের হুকুম মত নৌকা তীরে ভিড়িল। নৌকার মালিক একজন বৃদ্ধ মাতব্বর ছিলেন। জমিদারের ইঙ্গিতে দুর্দ্দান্ত পিয়াদা তাহাকে কিল থাপ্পড় মারিয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিল। এইভাবে মুসলমান ধর্ম্মের কঠোর শাসনে গ্রাম্যগান কতকটা লোপ পাইয়াছে। অবশ্য আজকাল মওলানা আকরম খাঁ প্রমুখ বহু মুসলমান নেতা গান গাওয়ার স্বপক্ষে মত দিতেছেন। তরুণ মুসলমানেরাও এদিক দিয়া কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু দেশের প্রবল গোড়া মোল্লাদের প্রভাব হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে আরও সময় লাগিবে। সব জেলায় অবশ্য মোল্লাদের প্রভাব বেশী নয়। ঢাকা ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের মুসলমানেরা গান গাওয়ার বিষয়ে মোল্লাদের আদেশ পরিপুর্ণভাবে মানে নাই।

শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বাংলাদেশের পল্লীগানের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মও অনেক প্রকারের পল্লীগান নষ্ট করিয়াছে। আগে বাঙলা-দেশে পাড়ায় পাড়ায় গাজনের উৎসব হইত। জয়ঢাকের গম্ভীর তালে নৃত্য করিতে করিতে চৈত্রপুজার সন্ন্যাসীরা অষ্টগান গাহিত। দেশের লোকেরা বৈষ্ণব হইয়া এইসব উৎসব ছাড়িয়া দিয়াছে। ধুপতি নাচ, কালীর নাচ, দশাবতারের নাচ, বেদেবেদেনীর নাচ, আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

আজকাল হিন্দুমুসলমানের মনোমালিন্যের দিনে কোন কোন জায়গায় মুসলমানেরা হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে যেসব মেলা হয় তাহা বয়কট করিয়াছে। আগে এইসব মেলা উপলক্ষ করিয়া মুসলমানেরা নৌকাবাছ খেলিত, জারী গান গাহিত। যেগুলি এখন লোপ পাইতে বসিয়াছে।

আগে গ্রাম্যগায়কেরা দেশের জমিদার ও বড় লোকদের কাছে উৎসাহ পাইত। বাঙলা দেশের অনেক বড় বড় জমিদার সখের কবিগানের দল করিতেন। আজকাল তাঁরা সহরে আসিয়া আবাস গড়িয়াছেন। পূজাপার্ব্বন কি বিবাহ আদি উপলক্ষে যদিও তাঁরা গ্রামে যান তাঁরা কলিকাতা হইতে থিয়েটারিক্যাল যাত্রার দল বায়না করিয়া লইয়া দেশে আমোদ করেন। কালীপূজায় কলিকাতা হইতে নর্ত্তকী আনাইয়া নাচান। গ্রাম্য গায়কেরা তাঁদের কাছে কোনই উৎসাহ পায় না।

ইহাছাড়া উপযুক্ত গ্রাম্যগান রচকের অভাবও গ্রাম্যগানকে কতকটা প্রভাব-হীন করিয়াছে। আগে অনেক শিক্ষিত লোকও এইসব গান রচনা করিতেন। কবিকঙ্কন চণ্ডী অথবা বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ যারা পড়িয়াছেন তারা একথার সাক্ষ্য দিবেন। আজকাল শিক্ষিত লোকের রচনার সাথে গ্রাম্য গানের কোনই যোগ নাই।

আমাদের দেশে অধিকাংশ গানই কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাথে জড়িত। আজকাল বস্তুতন্ত্রের জগতে সেই সব অন্ধসংস্কারের প্রতি মানুষের আস্থা নাই। তাছাড়া যারা এখনও সে সব বিশ্বাস করে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সমাজের কাছে হেয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৈরাগী, বাউল ও নেড়ার ফকীরদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রাম্যগানকে আজ যারা বহুলভাবে প্রচার করিতে চাহেন তাঁরা উপরের কারণগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। এইসব অন্তরায় দূর করিতে হইলে গ্রাম্যগানের স্বপক্ষে একটা প্রবল জনমত গঠন করিতে হইবে। দেশের লোক যদি এগুলিকে ভালবাসিতে শেখে তবে সকল অন্তরায় আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে।

জসীম উদ্‌দীন

* কোরাণ সরিফে কোথাও গানবাদ্য নিসিদ্ধ নয়।

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

১২

কলকাতার জীবন আগের মত চলল। সুরেশের হোষ্টেলের কাছের সেই মেসেই থাকি। তবে নিতান্ত সময়াভাব। জমিদার বাড়ীর কাজ শেষ ক'রে অন্য মাষ্টারীটা করতে যাই। ফিরে এসে বেশী দম থাকে না। কোন রকমে চারটি খেয়ে ঘণ্টা দুই পড়াশুনো করি। সকালে আইনের ক্লাসে যেতে হয়। সে ক্লাসে বিদ্যাশিক্ষা বিশেষ হয় না তবু "প্রেজেন্ট, স্যার" বলে আসতে হয়। নইলে পরীক্ষা দিতেই দেবেনা। আসল পড়াশুনোটা হয় দুপুর বেলা ঘণ্টা চারেক। এই সব গোলমালের মাঝে সুরেশের সঙ্গে বড় একটা দেখাশুনো হয় না। একদিন তার ঘরে গিয়ে দেখি সে গালে হাত দিয়ে ডেস্কের সামনে বসে আছে। ডেস্কের উপর এক সুকেশিনী, সুবেশিনী, সাভরণা সুন্দরীর ফোটো। ছবিটা একবার আড়চোখে দেখে নিয়ে সুরেশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। কিন্তু দেখলাম সে ভয়ানক অন্যমনস্ক। চোখের নীচে কালী পড়েছে, যেন সারারাত ঘুমোয় নেই। তার এই আনমনা ভাব, উস্কোখুস্কো চেহারার সঙ্গে ছবিটার একটা যোগ আছে সহজেই বোঝা গেল। খানিকটা সময় গেল, তবুও সে নিজে কিছু বললে না। বোধ হল লজ্জায় বলতে পারছে না। শেষ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ও কার ছবি রে, সুরেশ ?"

"নরেশদা ভাই, তোমাকে আগেই বলা উচিত ছিল। ফোটোটা ষ্টার থিয়েটারে কিনেছি। যে শৈবলিণী সেজেছিল, তার ছবি।"

"তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে না কি ?"

"না ভাই, অতদুর যায় নেই। তাহলে তোকে গিয়ে ব'লে আসতাম। শনিবার দিন ষ্টারে চন্দ্রশেখর দেখতে গেছলাম আমার বন্ধু সমরের সঙ্গে। থিয়েটার দেখতে দেখতে আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম। ফিরে এসে এই রকম বসে রইলাম সারারাত। একবার চক্ষে পাতায় করতে পারলাম না। যেই ঘুমে-চুলে পড়ি কানে আওয়াজ আসে শৈবলিণীর। যেন বলছে, কি প্রতাপ ? আজ এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন ? তারপর কাল রাত্রেও ঘুমোতে পারি নেই। আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছে।"

আমি যথাসাধ্য গম্ভীরভাবে বললাম, "সুরেশ, এ রকম ত চলবে না। আজ বাদে কাল পরীক্ষা।"

"তা ত চলবেই না, ভাই। মনটা সোজা করতে চেষ্টাও করছি প্রাণপণে। কিন্তু আর এক গোল হয়েছে। আমার বন্ধু সমর আমার অবস্থা দেখে বললে যে আমার সঙ্গে ওর চেনা পরিচয় করে দেবে। সমররা বড়লোক। তাদের বাড়ী এক বিয়েতে আজ ওকে নাচতে ডেকেছে। সেখানে আমার সঙ্গে আলাপ হবে।"

"তুই যাবি ?"

"না ভাই, যাব না। যেতে ইচ্ছা নেই। কিন্তু সমর একটু পরেই এসে আমায় ধরাধরি করবে।"

"আচ্ছা তুই এখনই চল্ আমার মেসে। পরীক্ষা পর্য্যন্ত এ কদিন সেইখানেই থাক্‌বি। সেখানে সমর এলে আমি দেখে নেব।"

"তাই চল্, ভাই। আমাকে কি রকম ভূতে পেয়েছে, নইলে ওসব স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশামিশি করার কোন ইচ্ছা নেই আমার। ছবিটা নিয়ে যাব ?"

"না, ও ছবি ছিঁড়ে ফেলতে হবে।"

লক্ষ্মী ভাইটির মত সুরেশ ছবি ছিঁড়ে ফেলে আমার সঙ্গে মেসে চলে এল। সঙ্গে নিয়ে এল পড়ার বইয়ের সঙ্গে,

বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর। দিন দুই চন্দ্রশেখরখানা খুব পড়লে। আমার সঙ্গে শৈবলিনী চরিত্রের বিশ্লেষণও হল অনেক। তারপর একদিন হঠাৎ বলে বসল,

"নরেশদা, আমি ভেবে দেখলাম শৈবলিনীটা ভ্রমর প্রফুল্লের কাছেও লাগে না। আর ভাই, বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু আমার যে মাথা খারাপ হয়েছিল সেও নটীটার জন্য নয়, প্রতাপের মনোমোহিনীর জন্য। এখন সেটাও কেটে গেছে। কেতাবের শৈবলিনী সই আর সেই ষ্টারের সাজা শৈবলিনী দুই মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। এইবার কোমর বেঁধে এগজামীনের পড়া পড়ব। সমরটার সঙ্গে দেখা হলে কিন্তু খুব দুঘা উত্তম মধ্যম লাগাব।"

"না ভাই, ভূত যখন আপনিই নেমেছে তখন আর ঝাড়-ঝোড়ে কাজ নেই। এইবার পড়বার বইগুলো ঝেড়ে মুছে নিয়ে মুখস্থ করতে লেগে যা।"

কয়েক সপ্তাহ পরে সুরেশ সুবোধ-বালকের মত পরীক্ষা দিয়ে সুরপুর চলে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম। সুরেশের ঘাড়ে ভূত চাপা কতদিনে সারবে কে জানে। আমার ক্লাস বন্ধ হলে আমিও দু দশদিনের জন্য বাড়ী গেলাম। বেশীদিন থাকার জো নেই, কলকাতায় কুমার বাহাদুরের খিদমৎ আছে। যথাসময় সুরেশের পাশের খবর বেরোল। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কায়ক্লেশে। আমার তার পেয়ে কলকাতায় এল। পরামর্শ ক'রে ঠিক হল যে সে এম-এ পড়বে। আর একটা জিনিস সে নিশ্চয় করলে যে সমরজাতীয় বন্ধুদের ত্যাগ করবে। আমাকে বললে,

"কিন্তু ভাই, আমার দুই একটা তোমার পরিচিত ব্রাহ্ম-ঘরে আলাপ ক'রে দাও। তুমি ত এ বছর বি-এল নিয়ে মহাব্যস্ত থাকবে। আমার সঙ্গে কখনই বা দেখা হবে। আমি ভদ্র পরিবারে মেলামেশা করলেই আগের সব বন্ধুরা আর কাছে ঘেঁসবে না। তুমিও আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকবে। ব্রাহ্মরা থিয়েটারে যায় না। ওদের সঙ্গে ঘুরলে ফিরলে আমারও থিয়েটার দেখা বন্ধ হবে। তুমিই ত কতবার বারণ করেছ।"

আমি সুরেশের কথা শুনে সুখী হলাম। অনাত্মীয় ভদ্রঘরের মেয়েদের সঙ্গে মিশলে ওর অনেক উপকার হবে। তবে বিলেত ফেরতদের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজেও একটা উচ্ছৃঙ্খল ভাব ঢুকেছে শুনতে পাই। যদি এ কথা সত্য হয় ত সে আবহাওয়ায় সুরেশ কি মাথা ঠিক রাখতে পারবে? যাই হোক সমরবাবুদের সঙ্গ ছাড়াতে হবেই। তাই বললাম,

"সে ত অতি সহজ কথা। আমি দু এক বাড়ী নিয়ে যাব। তারপর সেনমহাশয়কে ধরিস। তিনি ত সবাইকে চেনেন।"

সুরেশের বয়স এখন একুশ বছর। সুন্দর স্বাস্থ্য, কপাট বক্ষ, দীর্ঘ আকৃতি। ইংরেজী কাপড় প'রে যখন smart set-এ, নব্য সমাজে মিশতে বের হত, তখন বাস্তবিক বিজয়ী বীরের মত সুন্দর দেখাত। শরদিন্দু আর আমি নিয়মিত বেড়াতে যেতাম। যেদিন সুরেশ আমাদের সঙ্গে থাকত সেদিন আমাদের খাতির বেড়ে যেত সব জায়গায়। আমার ছাত্র এখন বেশ ইংরেজী বলে। খুব কেতাদুরুস্তও হয়েছে। মসনদে বসলে ষ্টেটের ইজ্জৎ রাখতে পারবে। এই সবে রাজাবাহাদুর আমার উপর মহা খুসী। এখন আবার সুরেশের মত সুপুরুষকে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে দেখে তার আহ্লাদ আর ধরে না। আমায় বললেন, "বাবা, তোমার ঐ বন্ধুটিকে আমার ষ্টেটে ঢুকিয়ে দাও না। শরতের সঙ্গে থাকলে ওর উপকার হবে।"

"ওর বাবা চান যে ও উকীল হয়। পাসটাস হোক না, তারপর রাখবেন।"

"আচ্ছা, সে পরের কথা। তোমার কাছে আমি যে কত কৃতজ্ঞ তা ব'লে জানাতে পারি না। রাণী সাহেবের বড় ইচ্ছা যে তুমি কষ্ট করে আর মেসে না থেকে আমাদের এখানে থাক। এত বড় বাড়ী, তোমাকে একদিকে দুটো ঘর ছেড়ে দেব।"

"এখন ত সেটা সম্ভব হবে না। আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে নিশ্চয় থাকতে পারব। আপনারা আমাকে এত যত্ন করেন যে আমার কোন সঙ্কোচ হবে না।"

"তুমি একবার বি-এলটা পাস ক'রে নাও, আমার সব মোকদ্দমা তোমায় দেব। উকীলে বছরে আমার অনেক টাকা খায়। আর তুমি যদি আমার জমিদারীর ভার নাও ত ছোঁড়াটার একটা হিল্লে হয়ে গেল। তোমায় কি সাধ

ক'রে সেন মশায় এত ভালবাসেন। তোমার গুণের সীমা নেই।"

বৃদ্ধ রাজা মহাশয় যতই লম্বা লম্বা জমীদারী চালে কথা বলুন, মানুষ খুব ভাল। আর আমার উপর সত্যি একটা বিশ্বাস ও ভালবাসা জন্মেছে। ওকালতীর কাজে ওঁর কাছ থেকে অনেক সহায়তা পেতে পারব তা আমি জানি। তবু তিনি রাজা, আমি গরীব, একথা ভুলতে পারি না। সেদিনকার মত নমস্কার করে বিদায় নিলাম।

সুরেশ এই সব কথা শুনে বেজায় আস্ফালন করতে লাগল।

"তুমি মেনেজারী নাও, নরেশদা। মস্ত বড় জমিদারী। আমি উকীল হলে আমায় মোকদ্দমাগুলো দিও।"

"এখনই লাফালাফি কেন? আমি বি-এল পাস হই তুই বি-এল পাস হ তারপর ওসব কথা হবে।"

"ভাই নরেশদা, আমি উকীল হব না। এইবার ত বি-এ পাস হয়েছি তুমি আমার বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। আমি সেদিন বাবাকে বলতে গেছলাম। তিনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন। তারপর আবার রমেশের ব্যাপারে আরও খেপে যাবেন।"

"কেন, রমেশের আবার কি হল?"

"শোন নেই? আমি সুরপুরে থাকতে সতীশবাবু এসেছিলেন দুদিনের জন্য সরলাকে দেখতে। বাবাকে বললেন যে রমেশ তাঁকে চিঠি লেখা একরকম বন্ধ করেছে। টাকার দরকার পড়লে দুছত্র লেখে, এই পর্য্যন্ত। যখন শুনলেন যে সরলাকেও বড় জোর মাসে একখানা পত্র দেয়, তখন রেগে আগুন হয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন,

'এইবার টাকা পাঠান বন্ধ করছি। তাহলেই বাছাধন শায়েস্তা হবেন।'

"বাবা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন।"

"বাস্তবিক, সুরেশ, রমেশটা করছে কি? পড়াশুনো ছেড়ে দিলে না কি? আজও ত কোন পরীক্ষা পাস হল না।"

এর পর রমেশের রহস্য খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ এসে এক গল্প করলে। সে পার্ক ষ্ট্রীটে, চাটারজী সাহেবের বাড়ী চা খেতে গেছল। সেখানে ডস্ ব'লে এক নূতন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আলাপ হল। সে সবে বিলেত থেকে ফিরেছে। এখনও চায়ে চিনি খায় না, সকালে নুন দিয়ে Oat সিদ্ধ খায়, রুই মাছ শুনলে জিজ্ঞাসা করে কি মাছের roe (ডিম)?

সুরেশ ডস্ সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল রমেশচন্দ্র বোসকে চেনে কি না। তাতে সাহেব গোঁফে তা দিতে দিতে একটু আকাশ পানে চেয়ে জবাব দিলে,

"ওঃ, রোমেশ বাসু? চিনি বইকি। তবে সে আজ এক-বছর গা ঢাকা দিয়েছে। বারে খানা খেয়ে যায় এই পর্য্যন্ত। কোথায় থাকে তার পাত্তা কেউ জানে না। লোকে সন্দেহ করে যে একটা love affair (প্রেমের ব্যাপার) এ জড়িয়ে পড়েছে। প্রেমিকার সঙ্গে কোন গলি ঘুঁজিতে থাকে।"

গল্প শুনে রোমা চাটারজী নাকি বলে উঠেছিলেন "A love affair? How very interesting! প্রেমের ব্যাপার, বাঃ কি চমৎকার! কিন্তু ওর এদেশে একটি হিন্দু বালিকা স্ত্রী আছে না?"

ডস্ অনুগ্রহ ক'রে উত্তর দিলেন, "হিন্দুদের এই রকম ক'রে শিক্ষা হওয়া উচিত। ও রকমের বিয়ে ত বিয়েই নয়।"

সুরেশ এই গল্প বলতে বলতে মহাউত্তেজিত হয়ে উঠল, "ভাই আমি ডসকে কানে কানে, চুপ রও উল্লুক, বলে চলে এলাম। বৈঠকখানার মাঝে ত মারামারি করতে পারি না। কিন্তু ভাই একবার যদি রমেশ হতভাগাকে হাতের কাছে পেতাম!"

"কি হত তাহলে? তাকে মারতিস, কিন্তু বোনের দুঃখ ঘুচত কি?"

"সরলার আর সে বাঁদরের মুখ দেখা উচিত নয়। সে ফিরে এলেও আমি তাকে সরলার ত্রিসীমানায় যেতে দেব না।"

"তুই এক ডসের কথায় এত লাফালাফি করিস কেন। হয়ত সে মিথ্যা কথা বলেছে।"

"তা মনে হয় না, ভাই। চিঠি পত্র লেখা ত ছেড়ে

দিয়েছে। আর নিজেই ত লিখেছে যে বিলেতি সমাজ দেখে মশ্‌গুল হয়ে আছে।"

"ও সব কেতাবে পড়া কথা। এই ছোকরারা কি আর সত্যি বিলেতী ভদ্রসমাজে আমল পায়? যাহোক, তুই এখন আর এসব কথা কাউকে বলিস্‌না।"

কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে দেখলাম যে রমেশচন্দ্র বসু লিংকন ইন্‌ থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ হ'য়েছে। ভাল নম্বর পেরেছে। পড়ে এত আনন্দ হল যে কি বলব। যা শুনেছিলাম যা ভাবছিলাম, সব তাহলে মিথ্যা! সুরেশ চোখ রক্তবর্ণ ক'রে বললে,

"নরেশদা, এইবার অনুমতি দাও। একবার ডস্‌টার কাছে যাই। দেখে আসি কত গরু খেয়েছে বিলেতে। ব্যাটা কি ভয়ানক পাজী মিথ্যাবাদী!"

"না, তোর ডসের কাছে যেতে হবে না। তার চেয়ে চল্‌, আজ আনন্দের দিনে শরদিন্দুকে নিয়ে পেলেটিতে খেয়ে আসি।"

সুরেশ তৎক্ষণাৎ রাজী হল। সে যুদ্ধপ্রিয় ছিল বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ছিল ভোজন বিলাসী।

কিন্তু এ আনন্দ বেশীদিন রইল না। দুহপ্তা পরে সরলার এই চিঠি পেলাম।

"ভাই দাদা, বিলেত থেকে এই মেলে যে পত্র এসেছে তোমায় পাঠাচ্ছি। আমার বলবার কিছু নেই। মা বাবার উপযুক্ত মেয়ে, তোমার উপযুক্ত বোন যাতে হতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ কর। আমার কিসের কষ্ট? তুমি রয়েছ, মা রয়েছেন, তোমাদের সেবা করব। আমাকে ত মুক্তি দিয়েছে, এখন যাতে পাঁচজনের উপকারে লাগি সেই রকম আমাকে শিখিয়ে নিও।

মার সেবা করা বোধ হয় বেশীদিন অদৃষ্টে নেই। একবার তুমি এসে দেখে যেও। তাঁকে বিলেতের কথা কিছু বলবার দরকার নেই। পাস হয়েছে পর্য্যন্ত জানিয়েছি।

আমার কেবল একটা কথা বলার আছে। তার দেওয়া পয়সা আমি কিছুতেই নেব না। আমি উত্তর দিয়েছি, 'নিষ্কৃতি দিলাম। কিন্তু আমাকে টাকা পাঠিও না।' ইতি প্রণতা, সরলা।"

সঙ্গে রমেশের এই চিঠি ছিল,

"সরলা, তোমার কাছে এতদিন কথাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ বলছি। তুমি একদিন ঠাট্টা ক'রে যা লিখেছিলে তাই সত্য হয়েছে। আমি এই দেশে এক বছর হল বিয়ে করেছি। তোমার কাছে যে অপরাধ করেছি তার ক্ষমা নেই। ক্ষমা চাইবার সাহসও আমার নেই। কিন্তু এখন এমিকে আবার ত্যাগ করলে আর একটা অপরাধ করা হবে। তাকে ছেড়ে দেশে ফিরলেও আমি আর তোমার স্বামী হওয়ার যোগ্য থাকব না। তাই আমার প্রার্থনা তুমি আমায় নিষ্কৃতি দাও। আমি যে বেঁচে আছি তা ভুলে যাও। তোমাকে যতটুকু দেখেছি তার থেকেই আমি জানি যে তোমার চরিত্র কত উদার। আজ আমার যা দণ্ডবিধান করবে আমি নিতে প্রস্তুত।

আমি পাস হয়েছি শুনে থাকবে। আমার এখানে রোজগারের খুব সুবিধাও হয়েছে। তোমাকে প্রতি মাসে যে টাকা পাঠাব তা নিও এইটুকু দয়া আমায় ক'র।

এমিকে আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তাকে ছাড়া আর মরা আমার কাছে এক। সে অল্পবয়স্কা, অশিক্ষিতা তাকে তুমি ক্ষমা ক'র। সে কোন অপরাধই করে নেই।

রমেশ।"

সুরেশকে ডেকে এনে চিঠি দুখানা পড়তে দিলাম। সে প'ড়ে ছোট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। খানিক পর আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে,

"নরেশ দা, আমি এ সহ্য করতে পাচ্ছি না। কি করা যায়? আমি বিলেত যাই। রমেশকে ধ'রে আনিগে।"

"ভাই, অধীর হস্‌ না। বোনের স্বামীসুখ আর ফিরে আসবে না। রমেশের চিঠিটা ভাল ক'রে প'ড়ে দেখ্‌। ওকে নিয়ে সরলা কি করবে? ও অন্যের হয়ে গেছে। সরলা কি ছোটলোকদের মত স্বামী নিয়ে সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করবে? রমেশ বিলেতেই থাক। ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি করুক।"

"দাদা, তুমি কি ক'রে অত ধীর হয়ে কথা কইছ?"

"বোনের কাছে শিখেছি, সুরেশ। সরলার চিঠিখানা ভাল করে পড়লেই বুঝতে পারবি।"

"তুমি কবে নুরপুরে যাবে? চল তুজনে একসঙ্গে যাওয়া যাক্। সরলাকে দেখবার জন্য প্রাণটা অস্থির হয়েছে।"

সন্ধ্যাবেলা সেন মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি সেকেলে মানুষ, রমেশের তরফে একটা কথাও আমায় বলতে দিলেন না। সজল চোখে বললেন,

"বাবা, পত্নীত্যাগীর মত পাষণ্ড আর পৃথিবীতে নেই। অবৈধ প্রেমের পক্ষে ত কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। রমেশ অনুতপ্ত হলে ভগবান্ তাকে ক্ষমা করবেন। আজ বিলেতের সংস্পর্শে আমাদের ব্রাহ্ম সমাজের পবিত্র আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এ রকম হলে এই সমাজকে কেউ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।"

মাসীমা বললেন, "তোর দুঃখিনী মার কথাই কেবল ভাবছি, বাবা নরেশ। সে যে-কদিন বেঁচে আছে, তাকে এসব জানতে দিস্ না। আমি রইলাম তোদের মা। যখন যা দরকার জানাস্।"

সুরেশ আর আমি পরদিন নুরপুর রওয়ানা হলাম। বাড়ীতে আমার গরুর গাড়ী পৌঁছতেই সরলা বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে আমার পায়ের ধুলো নিলে। আমি লজ্জায় কাঁদতে পারলাম না। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। শুধু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলাম।

সুরেশ সাহস ক'রে সরলার সামনে আসতে পারে নি। সে সোজা বাড়ী চলে গেছল। আমি মাকে প্রণাম ক'রে ডাক্তার কাকার কাছে গেলাম। সেখানে দেখি রমেশের বাবা বসে আছেন। রমেশ তাঁকেও সব কথা খুলে লিখেছে। তিনি বললেন,

"নরেশ, আমি সে হতভাগাকে টেলিগ্রাম করেছি যে আর তার মুখ দেখতে চাই না। তার নামও আমি আর করব না। বৌমার আমার এই দশা সে করলে! তোমার কাকার সঙ্গে সব কথা আমি কয়েছি। আজই দেশে ফিরে যাচ্ছি। আবার এসে তোমার মার সঙ্গে দেখা করব। আজ বড় লজ্জা বড় অপমান বোধ হচ্ছে। তোমার মাঐ-মা পুণ্যবতী ছিলেন তাই তাঁকে এ সব পাপ দেখতে হল না।" বলতে বলতে ঐ রাশভারী লোক কেঁদে ফেললেন। সুরেশ আর আমি বেরিয়ে গেলাম। কাকীমাকে প্রণাম করতে গেলাম। তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরল না। কেবল এইটুকু বললেন,

"দিদিকে কিছু বলিস্ না বাবা।"

বাড়ী যাওয়ার পথে সুরেশকে সাবধান করে দিলাম,

"একেবারে শক্ত হয়ে থাকবি, সুরেশ। এ ভেঙ্গে পড়বার সময় নয়। মাকে কিছু জানতে দেওয়া হবে না।"

সরলার সামনে বেচারা ঠিক ছিল, কিন্তু মা যখন বললেন,

"আমার রমেশ পাস হয়েছে রে, সুরেশ। এইবার ফিরে আসবে।"

তখন চোখ ছলছল ক'রে এল। কোন রকমে সরলার মুখের দিয়ে চেয়ে সামলে গেল। আমার ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে।

সাতদিন কেটে গেল। সরলার সঙ্গে কোন কথাই হল না। সেই বা কি বলবে, আমিই বা কি বলব? বাবার বাৎসরিকের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি ব'সে আছি বৈঠকখানায়, সুরেশের সঙ্গে কথা কইছি, এমন সময় সরলা দৌড়ে এসে বললে,

"দাদা, তোমরা শীগ্‌গীর এস মার কাছে।"

দৌড়ে গিয়ে দেখি, মা ভূমিষ্ঠ হয়ে পড়ে রয়েছেন তুলসী তলায়। আমি "মা" ব'লে ডাকতেই মুখ তুলে চাইলেন, খুব আস্তে আস্তে বললেন,

"আমায় উনি ডাকতে এসেছেন, বাবা। যাই এইবার?"

তিনজনকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর সরলার হাত নিয়ে আমার হাতে রেখে অস্ফুট স্বরে বললেন,

"দেখো। রমেশ না।"

তারপর চোখ বুজলেন। সব শেষ হল।

(ক্রমশঃ)

চারুচন্দ্র দত্ত

হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ

শ্রীগদাধর সিংহ রায় এম-এ, বি-এল

এবার পূজার ছুটীতে হরিদ্বারে ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ দেখার সুযোগ আমাদের হ'য়েছিল। সেই সম্বন্ধে আজ কিছু বলি।

গঙ্গার জল সুপ্রশস্ত রুরকী-খাল দিয়ে অনবরত তরতর বেগে বয়ে যাচ্ছে। বাস্তবিকই এখানে যাওয়া মাত্র মন অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠে।

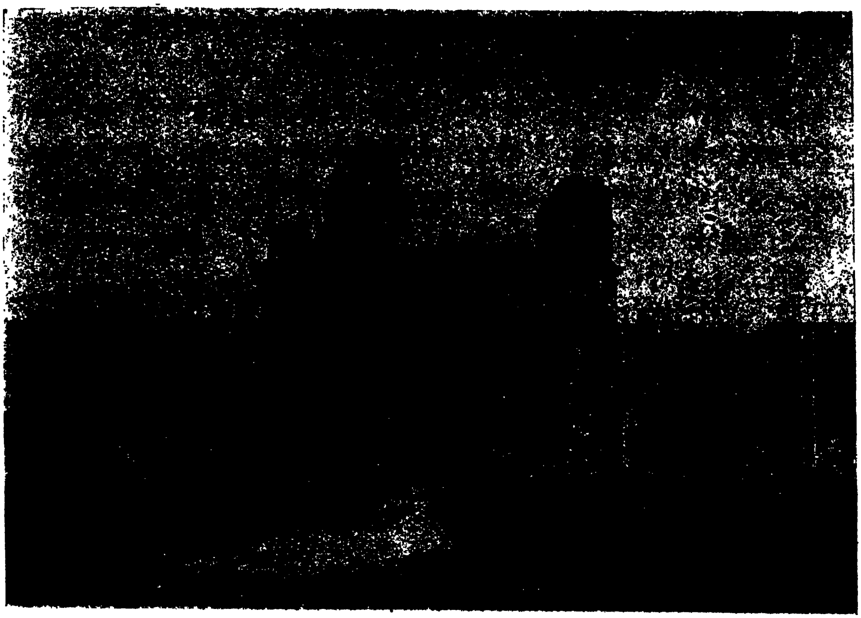


ঋষিকুল-কার্য্যালয়

[যে ঘরের সম্মুখে টেবিল-চেয়ার পাতা রয়েছে ঐটি দপ্তরখানা।]

আশ্রমটি হরিদ্বার ষ্টেশন থেকে প্রায় চার ফার্লং দূরে জাওলাপুরের পাকা রাস্তার উপর। দক্ষরাজস্থান প্রাচীন কন্‌খল, পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারধাম আর জাওলাপুর এখান থেকে প্রায় সমদূরবর্ত্তী। স্থানটির দৃশ্য মনোরম। ওদিকে কিছু দূরে হিমালয়ের অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা সাগর-তরঙ্গের মত দেখাচ্ছে, এদিকে একেবারে আশ্রমের পূর্ব্ব গা দিয়ে

বড় রাস্তা দিয়ে ঢুকতেই প্রথমে কার্য্যালয়। আশ্রমের প্রচার-মন্ত্রী (Propaganda Secretary) পণ্ডিত কেদার নাথ শর্ম্মা সেখানে বসে ছিলেন। তিনি অতি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রমের সমস্ত অংশ ঘুরে ঘুরে দেখালেন। আসবার সময় আটখানি ফটোছবিও দিলেন। তাঁরই সৌজন্যে পাঠকগণের সন্তোষ বিধানার্থে সেগুলি এখানে ছাপা হ'ল।



ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রধান দ্বার

চতুর্ব্বেদ। এ ঘরে ঢুকতেই পণ্ডিতজী সেইদিকে হস্ত-নির্দ্দেশ করে বল্লেন, আমরা পরিদর্শকগণকে প্রথমেই এই ভারতীর মন্দির দেখাই—তার উদ্দেশ্য বেদই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের মূল, সুতরাং হিন্দুমাত্রকেই প্রথমে বেদের কাছে মাথা নোয়াতে হ'বে। কথাটি খুব খাঁটি। সরস্বতী পূজার সময় এই বেদ-ভারতীরই পূজা হয়। ঘরের ভিতর চারিদিকের দেওয়ালের গায়ে অনেক আলমারি। পৃথক পৃথক আলমারিতে পৃথক পৃথক বিষয়ের পুস্তক। যথা—বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি ইত্যাদি। আশ্রমের ভিতর বড় উঠানে

কার্য্যালয়ের সম্মুখে একটা বড় আঙ্গিনা। তার অপর দিকে আশ্রমের চক-ঘেরা উঁচু দেওয়াল ও ফটক বা প্রধান দ্বার। দূর থেকে ফটকটি ঠিক প্রাচীন তোরণ দ্বারের মতই দেখায়। ভিতরে ঢুকে প্রথমে পাঠশালার কামরাগুলি দেখলাম। এক এক শ্রেণীর এক একটি ঘর। সাজ-সজ্জা অনেকটা আধুনিক। তারপর ছাত্রাবাস। এক একটি বালকের জন্য এক একটি তক্তপোষ পাড়া আছে। ছোট ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা এক অংশে আর বড় ছেলেদের আর এক অংশে। তারপর বেদ-ভবন ও পুস্তকালয়। এ একটি প্রকাণ্ড লম্বা ঘর। মাঝখানে একটি ছোট পাথরের মন্দিরে বেদীর উপর বস্ত্রাচ্ছাদিত



ঋষিকুল বেদভবন ও পুস্তকালয়
মাঝখানে ছোট মন্দিরটির ভিতর চতুর্ব্বেদ রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এটি ভারতীর মন্দির।

শিব, লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতি সকল দেবতারই মন্দির আছে। তাঁহাদের নিত্য পূজা হয় এবং ভোগ দেওয়ার পর প্রসাদ আশ্রমবাসীগণ ভোজন করেন। সে সব দেখে গেলাম কর্ম্মকাণ্ড বিদ্যালয়ে। মেঝের উপর প্রায় আধ হাত উঁচু লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল পাড়া। তার সম্মুখে বসবার কুশাসন সারি সারি। এইআসনে বিদ্যার্থিগণ বসে ঐ টেবিলের উপর বেদ রেখে পড়েন। এটি প্রাচীন ব্যবস্থা বলেই মনে হ'ল। আমরা যখন গেলাম তখন একটি পাশের ঘরে কয়েকজন পণ্ডিত বসে যথারীতি চণ্ডীপাঠ করছিলেন। তখন শারদীয় পূজার অনধ্যায়, কাজেই বিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ। তবে মহামায়ার পূজা বলে চণ্ডীপাঠ হচ্ছিল। এই বিদ্যালয়ে বেদ ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড পড়ান হয়।

তারপর যজ্ঞশালা। প্রত্যহ প্রাতঃ-সন্ধ্যা ও সায়ং-সন্ধ্যার সময় আশ্রমবাসীগণ এখানে যথারীতি ঘৃতাহুতি দিয়ে হোম করেন। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অপর সময়েও হোম হয়। আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিগণের অসুখ হ'লে একটি পৃথক রুগ্নালয়ে রাখা হয়। রুগ্নদের চিকিৎসার জন্য একটি সংলগ্ন ঔষধালয়ও আছে। চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ মতেই হয়। আমরা এই রুগ্নালয়ে একটি পীড়িত ছেলেকে দেখ্‌লাম। তার ভাই শুশ্রূষার জন্য এসেছে। সে তার কাছেই থাকে।

তারপর পণ্ডিতজী রন্ধনশালায় নিয়ে গেলেন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণে পাক করে। রন্ধনের পর দেবতার মন্দিরে ভোগ দিয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে বসে সকলে ভোজন করেন। তারপর স্নানের ঘাট। সেও একটি দেখ্‌বার জিনিষ। একেবারে গঙ্গাগর্ভ হ'তে ধাপের পর ধাপ উঠেছে। সমস্তই পাকা গাঁথুনি।

পণ্ডিতজী আক্ষেপ করে বল্লেন যে, কেবল বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ ছাড়া ভারতের অন্য অন্যদেশ থেকে বালক আসে। তবে সম্প্রতি একটি বাঙ্গালী ছেলে আছে। এ কথাটি শুনে তার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে হ'ল। একটি আট বছরের হিন্দু কাবুলী বালক কর্পূর গাছের উপর উঠে মনের আনন্দে খেলা করছিল। মুণ্ডিতমস্তকে দীর্ঘ শিখা। পণ্ডিতজী বল্লেন, এ ছেলেটি যেমন বুদ্ধিমান তেমনই চঞ্চল। পণ্ডিতজীর আদেশমত সে গাছ থেকে নেমে এক দৌড়ে বাঙ্গালী বালকটিকে ডেকে নিয়ে এল। নাম—দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বাড়ী ২৪-পরগণা। মা নেই, বাপ আছে।



ঋষিকুল—শিবমন্দির
[এইখানে ভোগ দিয়ে তবে ভোজন করা হয়।]

তার সঙ্গে বাঙ্গলায় কথা কইতে লাগলাম। বয়স আন্দাজ ১০ বৎসর। ছয় মাসের মধ্যে সে বাঙ্গলা বল্‌তে বল্‌তে হিন্দী বলে ফেলে। এমনই আবহাওয়ার গুণ। শুন্‌লাম, হিন্দী শিখাতে তাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হচ্ছে না। তবে যারা বাঙ্গলা থেকে যেতে চায় তাদের পক্ষে অন্ততঃ হিন্দী প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগটি পড়ে গেলে অনেক সুবিধা হয়। বলা

বাহুল্য আশ্রমে হিন্দীই হ'ল চলিত ভাষা। ছেলেটি বল্লে সেখানে বেশ ভালই আছে— কোন কষ্ট নেই। আশ্রমের ভিতর ব্রহ্মচারীর বেশে ছেলেগুলিকে বেশ ভালই দেখায়।

সর্ব্বশেষে পণ্ডিতজী নিয়ে গেলেন আয়ুর্ব্বেদ-মহাবিদ্যালয়ে (College)। এটি আশ্রমের উত্তর গায়ে অবস্থিত। এটিও একটি বড় ইমারৎ। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুযোগ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় এই মহাবিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য (Principal)। ছুটীতে কলিকাতা আসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না। আর একজন অধ্যাপক (Professor) ছিলেন, তিনিই সব দেখালেন। কলেজের দুইটি বিভাগ আছে—এ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজী। এ্যালোপ্যাথি বিভাগে কেবল অস্ত্র চিকিৎসা (Surgery) শিখান হয়। বাকী সব কবিরাজী বিভাগে।

ঔষধ যা কিছু সব আয়ুর্ব্বেদীয় মতে ব্যবস্থা করা হয়। এ্যালোপ্যাথি বিভাগটির ভার একজন সুযোগ্য এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জনের (Assistant Surgeon) উপর। অস্ত্র-চিকিৎসার ঘরে আধুনিক সমস্তই সাজসরঞ্জাম আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য একটি রসায়ন-শালা ও ছোট রকমের উদ্ভিজ্জ-উদ্যান (Botanical Garden)ও আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি শাস্ত্রমতে এখানেই তৈয়ারী হয়। বাহিরের দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়ার (Outdoor dispensary) ব্যবস্থা আছে। শুনলাম কলিকাতা সহায়ক সমিতি এই আয়ুর্ব্বেদীয় মহাবিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা চাঁদা তুলে দিয়েছেন। গবর্ণমেণ্ট (U. P. Government) ও ইমারতের জন্য এককালীন ৮০,০০০৲ (আশি হাজার টাকা) দিয়েছেন এবং প্রতি বৎসর ১০,০০০৲ (দশ হাজার টাকা) দিচ্ছেন। এজন্য তাঁরা আমাদের সকলেরই

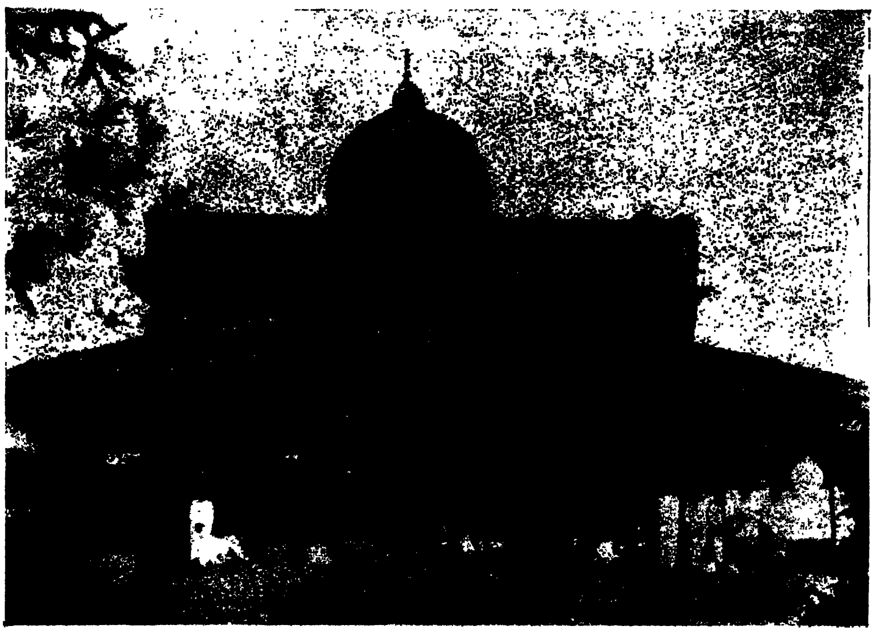


ঋষিকুল—কর্ম্মকাণ্ড বিদ্যালয়

[এইখানে বেদ ও বেদের কর্ম্মকাণ্ড পড়ান হয়।]

ধন্যবাদের পাত্র। বাস্তবিক এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠের এই আয়ুর্ব্বেদীয় মহাবিদ্যালয়টি একটি মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান। এখন এর ইতিহাস ও বিধি ব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলি।

ইংরাজী ১৯০৫ সালে এলাহাবাদে সনাতন ধর্ম্ম মহাসভার এক অধিবেশন হয়। বর্ত্তমান জড়বাদমূলক ভাবধারার গতিরোধ না কর্ত্তে পারলে দেশের যে সর্ব্বনাশ এবং আমাদের প্রাচীন অধ্যাত্মবাদী আর্য্যঋষিগণের সহজ ও সরল জীবনযাপনের উচ্চ আদর্শকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করে নিয়ে দেশবাসীর সম্মুখে ধরাই যে তার প্রকৃষ্ট উপায় এরূপ একটা চিন্তা সভ্যগণের অনেকের মনের মধ্যেই জাগে। এটা একেবারে নূতন কল্পনা নয়। ভোগলালসার মুখে ইন্ধন যোগাতে যোগাতে আজ যে সে বিশ্বনাশী মূর্ত্তি ধারণ করেছে—আজ যে তারই ফলে আমরা অভাবের দারুণ তাড়নায় নির্জীবপ্রায় এ কথা কে অস্বীকার করবে? মহামতি টলষ্টয় থেকে আরম্ভ করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাশীল মহাত্মাগণ সকলেই এ সত্য ঘোষণা করেছেন এবং করছেন। তাঁদের মধ্যে ভেদ কেবল এ রোগের প্রতিকারের পথ নিয়ে। যাই হোক্, এরূপ এক মহদুদ্দেশ্যে উক্ত মহাসভার পর বৎসরই অর্থাৎ ইংরাজী ১৯০৬ সালে কাশীপুরনিবাসী প্রসিদ্ধ সনাতনধর্ম্মী বাগ্মী রায় বাহাদুর পণ্ডিত দুর্গাদত্তজী পণ্ডিত মহাশয় প্রমুখ মনীষীগণ সর্ব্বপ্রথম এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন।



ঋষিকুল—যজ্ঞশালা

[বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে মাঝখানে একটি বেদী দেখ্‌তে পাবেন। তার ওদিকে কয়েকজন আশ্রমবাসী বালক বসে রয়েছে। এইখানে একটা যজ্ঞকুণ্ডও আছে। নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় হোম হয়।]

প্রথমে একটি ছোট কুটিরে একটি পাঠশালা আরম্ভ করা হয়। দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষাই ছিল তার খরচ নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে ভাঁড় রাখা হত। সেই ভাঁড়ে প্রতিদিন সকলে আটা তুলে রাখতেন। সেই আটা বিক্রয় করে খরচ চল্‌তো। ১৯০৬ সালে আয় হ'য়েছিল মাত্র ২৩৮৫৶০ টাকা আর ব্যয় ১৬৮১।৶০ টাকা। শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ও একনিষ্ঠ কর্ম্মিগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এখন আর আশ্রমের সেদিন নাই। যেখানে সামান্য কুটির ছিল সেখানে এখন বড় বড় পাথরের ও ইটের পাকা ঘর উঠেছে। তা ছাড়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করে এক আয়ুর্ব্বেদীয় মহাবিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলেছি। ১৯২৭-২৮ সালে আয় হয় ৬২০১৮৷৷১০ টাকা আর ব্যয় ৫২৭৬৪৷৷৵৭ টাকা। এতেই বুঝতে পারবেন এই কয় বছরের ভিতর কতদূর উন্নতি হ'য়েছে।

এখন এ আশ্রমের আভ্যন্তরিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও

ও এক কথা বলা প্রয়োজন। আট থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে অবিবাহিত অক্ষতদেহ নীরোগ দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের) বালক মাত্রকেই ভর্ত্তি করা হয়। আশ্রমের সাহায্যের জন্য মাসিক মাত্র ১০৲ দশ টাকা হিসাবে চাঁদা বালকের অভিভাবককে দিতে হয়। ভোজন ও বস্ত্র আশ্রম হ'তেই সরবরাহ হয়। বালকের ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আশ্রমে পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ হ'য়ে থাকবার নিয়ম। এ সময়ে বাড়ী আসা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। ব্যবহারিক, নৈতিক

আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারিগণের দিনচর্য্যা বা দৈনন্দিন কার্য্যের তালিকা এইরূপ—

প্রাতে ৫টার সময় শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন ও গঙ্গাস্নান ও পরে সকলের একত্রে যজ্ঞশালায় সান্ধ্য ও হোম ক্রিয়া। ৭॥০টা থেকে ১০॥০টা পর্য্যন্ত পাঠশালা। ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন। ১২টা থেকে ১টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম বা অভ্যাস। ১টা থেকে ৪॥০টা পুনরায় পাঠশালা। বৈকাল ৪॥০টা থেকে ৫॥০ টা ব্যায়াম ক্রীড়া বা



ঋষিকুল ঔষধালয় ও রুগ্নালয়

[এ ঔষধালয়টী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজের সংলগ্ন নয়। আশ্রমবাসিদের কেহ রুগ্ন হলে পৃথক ঘরে রাখা হয়, আর সেই রুগ্নদের চিকিৎসার জন্য সব রকম ঔষধ এই ঔষধালয়ে রাখা হয়। রুগ্নালয়ের কাছে ঔষধালয় না থাকলে অনেক অসুবিধা। এ দুটীই আশ্রমের প্রাচীরের ভিতর। আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ ও দাতব্য চিকিৎসালয় আশ্রমের প্রাচীরের বাহিরে।]

ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; যথা —সাঙ্গোপাঙ্গ চতুর্ব্বেদ, ষড়দর্শন, কল্প, ব্যাকরণ, কাব্য, জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, মীমাংসা, কর্ম্মকাণ্ড, ইংরাজী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্রণ, মুদ্রণ, অঙ্কন—এমন কি, বুনন ইত্যাদি বর্ত্তমান কালোপযোগী কুটীর শিল্প পর্য্যন্ত। শারীরিক ব্যায়ামের জন্য প্রাচীন দণ্ড, মুদ্গার, কসরৎ ইত্যাদি ছাড়া আধুনিক ফুটবল ক্রিকেট খেলার ও ময়দান এবং সাজসরঞ্জাম আছে।

ভ্রমণাদি। ৫॥০টা থেকে ৭টা শৌচশুদ্ধি, সায়ংসন্ধ্যা ও হোম-ক্রিয়া ইত্যাদি। রাত্রি ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে সায়ংভোজন। ৮টা থেকে ১০টা অভ্যাস। তারপর ঈশ্বরস্মরণ পূর্ব্বক শয়ন। শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল ভেদে কিছু প্রভেদ আছে।

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে বেদমন্ত্রের সঙ্গে যখন ব্রহ্মচারিগণ যজ্ঞশালায় একত্রিত হ'য়ে হোম করেন তখন বাস্তবিকই আমাদের স্মৃতিপটে সুদূর অতীতের কথা জাগিয়ে

দেয়। এরূপ ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আশ্রমে অধ্যয়নের পর পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্রহ্মচারীকে 'স্নাতক প্রমাণ-পত্র' (certificate) দেওয়া হয়। তখন তিনি ঘরে ফিরে এসে নিজ যোগ্যতানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর্ত্তে পারেন। এই ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে এখান থেকে অনেক বড় বড় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত বেরিয়েছেন এবং ভারতের নানাস্থানে বড় বড় কাজ করছেন।

কেবল সংস্কৃতই যে এখানে পড়ান হয় তা নয়। যদি কেহ 'বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি নিতে চান তাহ'লে তাঁকে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক পড়ান হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রী পাওয়া যায়। কর্ম্মকাণ্ড-বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর পড়ার পর শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে 'বেদকর্ম্মকাণ্ড-ভাস্কর' উপাধি দেওয়া হয়। এ ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ে চার বৎসর পড়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে 'ভিষগাচার্য্য' ইত্যাদি উপাধি পাওয়া যায়।

এই আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ দুটি সমিতির দ্বারা পরিচালিত—প্রধান সমিতি বা সভা (General Body) ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি। তিন বৎসর অন্তর ভারতের সকল প্রদেশের সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু চাঁদাদাতাগণের ভিতর থেকে প্রধান সভার সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়। এই প্রধান সভা হ'তে নির্ব্বাচিত ১৫ জন সদস্য নিয়ে কার্য্যকারিণী সমিতি গঠিত হয়। কার্য্যকারিণী সমিতি প্রতি কাজের জন্য সাধারণ সভার কাছে দায়ী। বলা বাহুল্য এতদিন এ আশ্রম ও বিদ্যাপীঠ বেশ সুপরিচালিত হ'য়েই এসেছে। শিক্ষা দান এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুমাত্রেরই উৎসাহের সামগ্রী। শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করি কর্ত্তৃপক্ষের সকল চেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

শ্রীগদাধর সিংহ রায়



ঋষিকুল—ঘাট

[এটী একেবারে আশ্রমের পুব্দ গায়ে, সুপ্রশস্ত রুরকীর খালের উপর। মায়াপুর থেকে গঙ্গার জল এই খাল দিয়ে বহুদূরে গেছে। কেবলমাত্র আশ্রমবাসীরা এ ঘাটে স্নান করেন।]

মর্ম্মর-স্বপ্ন

শ্রীনবগোপাল দাশ আই-সি-এস্

পার্থরের উপর খোদাই ক'রে প্রভাস মূর্ত্তি তৈরী কর্‌ত।

স্কুলের পড়া শেষ ক'রেই সে ভাস্কর্য্যের দিকে মন দেয়। কলেজে দু'একদিন সে গিয়েছিল, কিন্তু দেখ্‌তে পেলে যে অধ্যাপকের ব্যাখ্যাত মিরাণ্ডার চরিত্রবর্ণনা তার কানের ভিতর দিয়ে একটুও ঢুক্‌ছে না, তার পরিবর্ত্তে তার সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে নির্জ্জনদ্বীপপরিবেষ্টিতা সরলা একটি মেয়ের প্রথম প্রেম-উচ্ছ্বাসের ছবি। পাথরের কায়াতে মিরাণ্ডার ছবিটি তার সম্মুখে ফুটে উঠত, আর সে নিজের মনের মধ্যে আলোচনা সুরু কর্‌ত—কী ড্রেপারিতে মিরাণ্ডার ফেনিলোচ্ছল আবেশ ফুটে উঠবে, গ্রীক্, না প্যাগান?

অধ্যাপক বা সহপাঠীরা কেউই তার চিন্তাধারার সাথে তাল রেখে চল্‌তে পার্‌লে না। ফলে হ'ল এই যে সে একদিন তার পুঁথিপত্র পুরাণো বইএর দোকানে বিক্রী করে দিয়ে সোজা চলে গেল লক্ষ্ণৌ—সেখানকার স্কুল অব্ আর্টস্-এ কিছু শিখ্‌তে।

বছরখানেক শিখে সে কল্‌কাতায় ফিরে এল।

প্রথম কয়েকটা মাস সে খুবই উৎসাহের সহিত কাজ আরম্ভ কর্‌লে। দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে তার মধ্যে নানা রকম ছবি টাঙিয়ে আর মূর্ত্তি সাজিয়ে সে দেবীর আরাধনায় লেগে গেল। দিন নেই রাত নেই সে শুধু শিল্পের ধ্যানে ডুবে রইল।

বন্ধু প্রবীর এসে বল্‌ত, এম্‌নি ভাবে আপন ভোলা হয়ে থাকিস্‌নে, প্রভাস, বাইরের আলোর মুখ দু' একবার দেখ!

প্রভাস তার পাথর থেকে চোখ না তুলেই সংক্ষেপে জবাব দিত, এই যাচ্ছি...এখানকার আঁচড়টা ঠিক হচ্ছে না ভাই!

প্রবীর কাছে এসে দেখ্‌ত, প্রভাস্ তার chiselটি নিয়ে ঠোঁটের কাছটাতে সযত্নে রেখা টান্‌ছে—যেন নিজের গানে সুর বাঁধ্‌ছে। আঁচড়টি আর ঠিক হত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, প্রভাসের অতৃপ্ত মন কিছুতেই তৃপ্ত হত না। প্রবীর বিরক্ত হয়ে চলে যেত।

প্রথম ছয়টি মাস প্রভাস এম্‌নি ধারা স্বপ্নেবিভোর হ'য়ে রইল। তার ঘুম ভাঙ্গল তখন যখন দালাল রামসদয় বাবু এসে মূর্ত্তিগুলো দেখে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, উঁহুঃ—এ ত' ঠিক হচ্ছে না!

প্রভাস বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, কেন?

—আপনি যা' কর্‌ছেন তা' মোটেই পপুলার হচ্ছে না। আপনার ওই একটি আঁচড়ের বিশ্লেষণ বসে বসে কে কর্‌তে যাবে বলুন? মানুষে চায় হঠাৎ চোখে যেটা ভালো লাগে... আপনার মূর্ত্তিগুলোর মধ্যে সে ভালো-লাগার গুণটুকু নেই!

—কিন্তু এর মধ্যে আমার পরিকল্পনা রয়েছে যে!

—আপনার মন আর সাধারণের মন ত এক নয়, প্রভাসবাবু। বাজারে জিনিষ বেচ্‌তে হ'লে ক্রেতাদের মন দেখ্‌তে হ'বে ত!...শুধু নিজের খুসীতে যা হয় কয়েকটা আঁচড় বসিয়ে গেলেই ত চল্‌বে না!

প্রভাস বুঝ্‌লে তার শিল্পীমনের ধারা আর জনস্রোতের ফ্যাসন-খেয়াল এক পথে চলে না। সে রাগ ক'রে বল্‌লে, তাই ব'লে আমি আমার প্রতিভাকে বলি দিতে পার্‌ব না সাধারণের ক্ষণিক খেয়ালের কাছে!

রামসদয়বাবু জবাব দিলেন, তাহ'লে আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না। আপনি নিজেই আপনার মূর্ত্তিগুলো বেচ্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন।

গুম্ হয়ে বসে প্রভাস খানিকক্ষণ কী ভাব্‌লে। তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্‌লে, আপনি এতদিন যে কষ্ট করেছেন তার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জান্‌বেন। নমস্কার...

বিদায় নিতে নিতে শ্লেষমাখা সুরে রামসদয়বাবু বল্‌লেন,

ধন্যবাদটা এত শীগ্‌গীরই জানাবেন না, আবার হয়ত ডাক্‌তে হ'তে পারে।

প্রথমটা প্রভাস একটু দমে গিয়েছিল। তারপর গা' ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার পুরো উদ্যমে তার রেখার আঁচড় নিয়ে বস্‌লে। আনন্দ যার গানকে রূপ দেওয়াতো সে কি কখনও তা' ছেড়ে থাক্‌তে পারে?

রামসদয় বাবুর ভয় দেখানোতে সে বিচলিত হ'ল না। তার শিল্পের মধ্যে সত্য ও সুন্দরের অবদান যদি থেকে থাকে তবে একদিন না একদিন তার সমাদর হ'বেই। যে দেশ অজন্তার দান পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম সে কি বুঝ্‌বেনা?

আরো গোটাকয়েক মূর্ত্তি শেষ ক'রে প্রভাস কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, তরুণ ভাস্কর তার কতকগুলো মূর্ত্তি বিক্রী কর্‌তে চায়।

বিজ্ঞাপনের জবাব এল অনেক—প্রভাস উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল। চারপাঁচটি দিন সে দর্শনপিপাসু ক্রেতাদের সাথে দেখা ক'রেই সময় কাটিয়ে দিলে।

কিন্তু ফল দেখে তার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌ল। সবাই রামসদয়বাবুর মতই সমালোচনা ক'রে বিদায় নিলেন। অপ্রিয় বল্‌তে যাদের বাধেনা তারা মুখের উপরই বলে দিলে, এরকম জিনিষ দেখবার জন্য আমাদের সময় নষ্ট না কর্‌লেও পার্‌তেন বোধ হয়।...আর ভদ্রতার মুখোস্‌ ব্যবহার করে যারা অভ্যস্ত তারা একটু হেসে বল্‌লে, আপনার আর্ট সত্যি বড় উঁচুদরের, প্রভাসবাবু, কিন্তু জনসাধারণ এর মর্য্যাদা বুঝ্‌বেনা এই যা দুঃখ!

দু'একজন এই ব'লে সান্ত্বনা দিলেন, আপনি দম্‌বেন না, প্রভাসবাবু। জগতের সব শিল্পীরই প্রথমে এরকম অবস্থা হয়...অনাদৃত, উপেক্ষিত হ'য়েই তাঁদের জীবন সুরু হয়। কিন্তু জগৎসভায় সম্মান পাবার সময় যখন আসে তখন তা' শ্রাবণ বন্যার মত ছুটে আসে! তার উচ্ছ্বাসে আপনার এসব অনাদর উপেক্ষার দুঃখ কোথায় চলে যাবে!

ফল হ'ল একই। ক্রেতাদের কোলাহল যখন মিলিয়ে গেল তখন প্রভাস মনে মনে তীব্র একটু হাসি হেসে তার chiselটি আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেল্‌লে।

কেবল একটি খেয়ালী বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রভাসের গড়া সুজাতার মূর্ত্তিটি দেখে ভয়ানক পছন্দ ক'রে দশটি টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রভাস বসে বসে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাব্‌ছিল আর মনে মনে বিষাদের হাসি হাস্‌ছিল। এমন সময় প্রবীর এসে তার ঘরে ঢুক্‌লে।

বন্ধুর কথা প্রবীর সব সময়ই ভাব্‌ত, আর তার মন চিন্তায় আকুল হ'ত এই ভেবে যে কী ক'রে সে সাহায্য কর্‌তে পারে। তার নিজের অবস্থা এত স্বচ্ছল নয় যে সে আর্থিক কোন সাহায্য প্রভাসকে কর্‌তে পারে। তবু একটু দরদ আর সমবেদনা দিয়ে প্রভাসের মুহ্যমান শক্তিকে সঞ্জীবিত ক'রে তুল্‌তে পার্‌লেই সে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্‌ত।

অন্ধকার ঘরে সাঁঝের বেলায় প্রভাস অম্‌নিভাবে শুয়ে আছে দেখে প্রবীর জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লে, এ সময়টিতে শুয়ে আছিস্‌ কেন ভাই?

প্রবীরের এই স্নেহভরা কথাটিতে প্রভাসের চোখ জলে ভরে এল। সে প্রবীরকে কাছে ডেকে এনে বসালে।

তারপর ধীরে ধীরে সে তার কাহিনী প্রবীরকে বল্‌লে।

প্রবীর ভয়ানকভাবে ব্যথিত হ'য়ে বল্‌লে, সংসারের রীতিই এই ভাই...খাঁটি সোনাকে কেউ চিন্‌তে পারেনা। মেকির জৌলুষ বাইরে থেকে এতখানি সত্য ও চিরন্তন ব'লে মনে হয় যে তার তুলনায় তপ্তকাঞ্চনের আভাও নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কিন্তু তার দাম ত তাতে কমেনা!

বিপদভরা হাসি হেসে প্রভাস বল্‌লে, বুঝছি ভাই, কিন্তু এই কঠোর সংসারকেও ত উপেক্ষা করা যায়না! আমি ভেবেছিলাম, বুঝি বা যায়। এখন দেখ্‌ছি গোটাকয়েক জিনিষ না হ'লে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা এবং শান্তি যে ভয়ানক ভাবে দরকারী, ভাই, তা না হ'লে আমার রেখার আঁচড় ফুটবে কি ক'রে?

অতি খাঁটি কথা। এর আর কী জবাব প্রবীর দিবে? সে চুপ ক'রে প্রভাসের হাতটি ধরে বসে রইল।

খুবই দুঃখমাখা সুরে প্রভাস বল্‌লে, তাই ভাব্‌ছি, ভাই, কুলটাবৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে হ'বে!

প্রবীর প্রভাসের কথায় শিউরে উঠে বল্‌লে, তুই কী বল্‌ছিস্‌?

একটু হেসে প্রভাস জবাব দিলে, ভয় খাস্‌নে ভাই···। আমি বল্‌ছি এই যে এতদিন যে একনিষ্ঠতার সহিত সত্য ও সুন্দরের পূজো ক'রে আস্‌ছিলাম আজ তাকে বলি দিতে হ'বে লোকরঞ্জনের বেদীতে! একে কুলটাবৃত্তি ছাড়া আর কি বল্‌তে পারি ভাই?

প্রবীর প্রভাসের মনের দুঃখ বুঝ্‌তে পেরে তার সাথে দরদ ভরা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়্‌লে।

প্রভাস সেই একই সুরে বল্‌তে লাগলে, এখন অবশ্যি ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে···এখনও আমি বিশ্বাস ক'রেই উঠ্‌তে পার্‌ছি না যে আমার সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে হ'বে এই সাংসারিক উন্নতির দুয়ারে।···কালে হয়ত সবই অভ্যাস হয়ে যাবে!

প্রবীর প্রভাসের হাত দুটি চেপে ধর্‌লে।

প্রভাস বলে চল্‌ল, কুলটা হ'তে হ'বে এই মনে ক'রে আমার তত দুঃখ হচ্ছে না, প্রবীর। সব চেয়ে দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, পথে যখন নাম্‌ব তখন আমার সব সৌন্দর্য্য-বোধ লোপ পেয়ে যাবে। আমি যে কুলটা সে লজ্জাটাও বোধ হয় আমার মনে আস্‌বে না—একটা কৃত্রিম গর্ব্বে হয়ত আমার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে! মনের এতখানি অবনতিও নিজেই বরণ ক'রে নিতে হচ্ছে এই ভেবেই আকুল হ'য়ে উঠেছি।

রাত হ'য়ে এল। থম্‌থমে অন্ধকারের মধ্যে প্রভাসের গোপন ব্যথায় ভরা কথার প্রতিধ্বনি শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রবীর দু'চারটে সান্ত্বনার কথা ব'লে প্রভাসের কাছ থেকে বিদায় নিলে।

তন্দ্রায় আচ্ছন্নের মত প্রভাস একইভাবে সেখানে শুয়ে রইলে।

ঘড়ির কাঁটা চলেছে। প্রভাসের মন তার নিজের মধ্যে ছিল না, সে গিয়েছিল দেশ দেশান্তরের ভ্রমণে।

তার মনে পড়্‌ছিল লক্ষ্ণৌর কয়েকটি দিনের কথা। শিল্পলক্ষ্মীর পূজোর নৈবেদ্য সাজাতে সে গিয়েছিল···তখন তার প্রথম যৌবনের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সুর হ'য়ে তার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এম্‌নি সময় তার দেখা হ'ল শকুন্তলার সাথে।

কী অপরূপ মুহূর্ত্তেই না তাদের দেখা হয়েছিল! লক্ষ্ণৌর বাইরে একটা বনে একদল ছেলেমেয়ে গিয়েছিল চড়ুইভাতি কর্‌তে, তাদের নেতা ছিল সপ্তদশী শকুন্তলা।

আর প্রভাস গিয়েছিল সেখানে বেড়াতে···একা।

হঠাৎ কানন ঘিরে আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে এল, বর্ষার শীতল শিহরণ লেগে চড়ুইভাতির আনন্দ-কলরব লোপ পাবার জোগাড় হ'ল। জিনিষ-পত্তর যেমন তেমন ক'রে গুটিয়ে নিয়ে শকুন্তলা সদলবলে গাছের নীচে আশ্রয় নিলে।

বিধাতার অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বন্ধ, প্রভাসও ঠিক সেই গাছেরই নীচে আশ্রয় নিয়েছিল।

শকুন্তলা ছেলেমেয়েদের কোলাহল মুখরতা কিছুতেই দমিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না। তার চেষ্টার ব্যর্থতা দেখে প্রভাস ভয়ানক আমোদ অনুভব কর্‌ছিল।

একজোড়া চোখ যে তাকে আগ্রহভরে লক্ষ্য কর্‌ছে এটা শকুন্তলা বেশ টের পেয়েছিল। সে বিব্রত বোধ কর্‌ছিল, কিন্তু চোখের উপর ত কারোর হাত নেই···কাজেই সে কিছুই বল্‌তে পার্‌ছিল না।

প্রভাস বেশ তীক্ষ্ণভাবে শকুন্তলাকে লক্ষ্য কর্‌ছিল। গতিভঙ্গীতে তার আশ্রমবালাসুলভ চঞ্চলতা, কথাগুলোতে আলোর পরশ, হাসিতে তার রঙীন্‌ ফুলের আল্‌পনা।

একটুখানি ভেবে সে এগিয়ে এসে বলেছিল, এরা আপনাকে ভয়ানক ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ছে, না?

শকুন্তলা তার এই মুরুব্বিয়ানা সুরে রুষ্ট হ'য়ে জবাব দিয়েছিল, দেখ্‌তে পাচ্ছেন না কি?

ভয়ানক যেন অন্যায় হ'য়ে গেছে এম্‌নিভাবে মাপ চাওয়ার সুরে প্রভাস বলেছিল, আমি ইতস্ততঃ কর্‌ছিলাম আপনি কী ভাবেন তাই মনে ক'রে!

ব'লেই সে আর অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে ছেলে-মেয়েদের দলে মিশে গিয়েছিল। তারা এই অচেনা লোকটিকে দেখে প্রথমে একটুখানি সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছিল, পরে

প্রভাসের স্বচ্ছ হাসি ও উচ্চ কলরবের মধ্যে নিজেদেরই একজন সাথীর সুর পেয়ে তাকে আপন ক'রে নিয়েছিল।

ফির্বার পথে শকুন্তলার সাথে তার আলাপ অনেকখানি সহজ হ'য়ে এসেছিল। প্রভাস জেনে নিলে যে শকুন্তলা বাবার একমাত্র মেয়ে, তার মা নেই, বাবা লক্ষ্ণৌ-এ চাকুরী কর্ছেন। প্রভাসের কোমল মন স্নেহ ও অনুকম্পায় আর্দ্র হ'য়ে উঠেছিল।

তারপর শকুন্তলাদের বাসায় সে অনেকদিন গিয়েছিল। সৌম্য প্রিয়দর্শন হরিহরবাবুর (শকুন্তলার বাবার) সাথে তার গভীরভাবে মনের মিল হ'য়ে গিয়েছিল। শীগ্‌গীরই সে আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে, শকুন্তলাও একজন শিল্পী—তুলির রেখায় সে সিদ্ধহস্ত।

দুইটি তরুণ শিল্পীর মন সহজেই একসুরে মিশে গিয়েছিল। প্রভাস হেসে বলেছিল, আপনার ছবি যেদিন পাথরে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌ব সেদিনই হ'বে, আমার রেখাভঙ্গীর সার্থকতা!

শকুন্তলাও হেসে জবাব দিয়েছিল, আপনার ছবি কিন্তু আমি আমার তুলিতে আঁক্‌বনা—সে বড্ড বিশ্রী দেখাবে। তার বদলে আমি রূপ দেবার চেষ্টা কর্‌ব আপনার শিল্পী প্রতিভাকে, আপনার ঐকান্তিক সাধনাকে।

এই দিশাহারা আলোচনায় ব্যাঘাত পড়্‌ল তখন যখন হরিহরবাবু সরকারী হুকুমে লক্ষ্ণৌ থেকে বদ্‌লী হ'য়ে গেলেন। ধীরে ধীরে যে স্বপ্নসৌধ প্রভাস গড়ে তুল্‌ছিল তা' একনিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

প্রভাসের মনের গোপন কামনা মনেই রয়ে গেল, কথাটি আর বলা হ'ল না।

আজ প্রবীর যাবার পর প্রভাস শুয়ে শুয়ে এই স্মৃতিটি নিয়েই খেলা কর্‌ছিল।

শকুন্তলার মুখটি তার তেমন স্পষ্ট ক'রে মনে পড়্‌ছিল না, কিন্তু তার কথাগুলো, তার বিদ্যুতের মত হাসি তার রূপপিপাসু মনে কতকগুলো রেখায় ছবি এঁকে দিচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল, যেন স্বপ্ন…

তন্দ্রালস চোখে প্রভাস কত কী কল্পনার জালই বুন্‌ছিল! যেন শকুন্তলা কাছে এসেছে…তার আলোর ঝরণাধারায় প্রভাসের সব দুঃখদুশ্চিন্তা যেন দূর হ'য়ে গেছে।…অজন্তার নৃত্যশীলা চঞ্চলা অপ্সরী যেন সে!

দূরাগত সুরের রেশ প্রভাসের কানে এসে বাজ্‌ল, ওগো, তুমি ভাব্‌ছ কেন?…আমায় তুমি রূপ দেও, তোমার পাথর জীবন্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। তখন যারা নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে তোমার শিল্পকুশলতাকে দেখেছ তারাও তাদের নতি জানাবে!

ঘড়ির ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠ্‌ল।

প্রভাস তাড়াতাড়ি উঠে চোখ মুছে তাকিয়ে দেখ্‌লে, রাস্তার জনকোলাহল থেমে গেছে, বাইরে গ্যাসের আলো শুধু জ্বল্‌ছে, আর তার একটি ম্লান রেখা জানলা দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে।

প্রভাসের কানে তখনও শকুন্তলার কথার সুরটি বাজ্‌ছিল। একি স্বপ্ন, না কল্পনা?

যাই হোক্ না কেন প্রভাস স্থির কর্‌লে সুরের কথা সে শুন্‌বে।

বাতি জেলে তক্ষুনি সে কাজ আরম্ভ ক'রে দিলে।

ভোরবেলা প্রবীর আবার এসে হাজির। আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় প্রভাসের অমন বিষাদভরা কথা শুনে তার মনও উৎকণ্ঠিত ছিল, তাই ভোর না হ'তেই সে বন্ধুর খোঁজে উপস্থিত হয়েছিল।

অবাক্ হয়ে দেখ্‌লে প্রভাতী আলো আসা সত্ত্বেও বাতি জেলে প্রভাস একমনে পাথরে কাজ কর্‌ছে। প্রবীর যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে হুঁসটুকু পর্য্যন্ত তার ছিল না।

প্রশ্ন কর্‌লে, সারারাত ধরে তুই এই কর্‌ছিস্ বুঝি?

প্রভাস যেন শুন্‌তে পেলে না। সে তখন গভীর মনোনিবেশ ক'রে তার শকুন্তলার বনজ্যোৎস্নাসম স্নিগ্ধদৃষ্টিটি ফুটিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল।

প্রবীর এবার প্রভাসের কাঁধে একটু মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌লে, একেবারে নেশায় বিভোর হ'য়ে আছিস্ যে! কথাটুকু পর্য্যন্ত শুন্‌তে পাচ্ছিস্ না?

প্রভাসের তখন হুঁস্ হ'ল। Chiselটি হাতে রেখেই বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের ভোলামনের জন্য একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, তাইত, ভোর হ'য়ে গেছে দেখি!

প্রবীর একটু ধমক দিয়ে বল্‌লে, এতক্ষণে বুঝি তুই টের পেলি?...আচ্ছা, এমনধারা পাগলামি যদি করিস্ শরীর টিক্‌বে কী ক'রে?

প্রভাস অদ্ভুত এক হাসি হেসে বল্‌লে, শরীরের চেয়েও বড় একটা জিনিষ আছে, ভাই, সেটা হচ্ছে আর্টিষ্টের মন।...আমি তার খোরাক জোগাচ্ছি।

—কিন্তু তোর শরীর যদি ভেঙ্গে প'ড়ে তাহ'লে মনের খোরাক আসবে কোত্থেকে?

—শরীর কি আর এত সহজেই ভাঙবে, প্রবীর?...বড়ো দুঃখকষ্টের মাঝখান দিয়ে গেছে আমার এ কঙ্কাল-দেহ!

প্রবীর হাল ছেড়ে দিলে। কিন্তু কী ক'রে বন্ধুর এই খেয়ালভরা একগুঁয়েমি থামানো যায়? এ যে থামাতেই হ'বে!

প্রস্তাব কর্‌লে, আয় প্রভাস, একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।

প্রভাস সংক্ষেপে জবাব দিলে, এখন নয়।

এবার প্রবীর ভয়ানকভাবে রাগ কর্‌লে। বল্‌লে, তুই যদি আমার একটি কথাও না শুনিস্ তাহ'লে আর আমি তোর সাথে দেখা কর্‌তে আস্‌বনা।

তখন প্রভাস করুণভাবে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, তুইও যদি আমায় ছেড়ে যাস্, প্রবীর, তাহ'লে আমি কী নিয়ে থাক্‌ব বল্?

প্রবীর প্রভাসের কথার দরদে আর্দ্র হ'য়ে বল্‌লে, তোকে কি আমি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি ভাই? তুই যে আমার একটি কথাও শুন্‌ছিস্ না, তাতে আমার মনে একটু দুঃখ হচ্ছে বৈ কি!

প্রভাস মিনতিভরা চোখে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, এই মুখটা মোটামুটি সারা হ'লেই আমি বেরুব।...তুই বিকালবেলা আসিস্, তখন বেরুনো যাবে।...

বিকালবেলা প্রবীর প্রভাসের ঘরে এসে দেখে তখনও প্রভাস তার মর্ম্মরমূর্ত্তির সাম্‌নে বসে আছে, আর মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আছে। চুলগুলো তার উস্কখুস্ক, কিন্তু মুখে তৃপ্তি-ভরা হাসি।

প্রবীরকে দেখে খুবই শান্ত সহজসুরে বল্‌লে, এই যে! ওঃ—এতক্ষণে মুখটা মোটামুটি শেষ হ'লো!

প্রবীর জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, আজ কি কিছু খাস্‌নি'?

—হ্যাঁ, খেয়েছি ত! বামুনঠাকুর এখানেই ভাত দিয়ে গিয়েছিলেন, ওই দেখ্‌না থালা পড়ে আছে।

প্রবীর তাকিয়ে দেখ্‌লে এককোণে একটা চৌকীর উপর প্রভাসের ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে রয়েছে বটে।

প্রভাস জিজ্ঞেস্ করলে, কেমন হয়েছে বল্ দেখি?

—আমি ত ভাই তোর আর্টের কিছু বুঝিনা, আমার মতের দাম আর কী হ'বে?...তবে মুখটি আমার চোখে বেশ লাগ্‌ছে!

—কার ছবি এ জানিস?

—কার?

—আমার স্বপ্ন-প্রিয়ার।

প্রবীর একটু হাস্‌লে। পরে বল্‌লে, স্বপ্ন নিয়েই দেখ্‌ছি তোর দিন কেটে যাবে প্রভাস! এ প্রিয়াকে আবার কখন স্বপ্নে দেখ্‌লি?

—কাল শেষবারের মত দেখেছি। কিন্তু আমার এ প্রিয়া বহুদিন থেকেই আমার কল্পনার রন্ধ্রে বিরাজ কর্‌ছিলেন, তাঁরই অদৃশ্য অঙ্গুলী স্পর্শে তাঁকে রূপ দেবার চেষ্টা করি............

প্রবীর প্রভাসকে নিয়ে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে বার হ'য়ে গেল।

বহুদিন পর বাইরের মুক্ত হাওয়া খেয়ে প্রভাসের শরীর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল, আর তার মনও খুসীতে ভরে উঠ্‌ছিল। সে প্রবীরের সাথে যা খুসী তাই গল্প করছিল। প্রবীরও বন্ধুর এই প্রফুল্লতার ভাব দেখে স্বস্তি বোধ করছিল।

প্রবীর বল্‌ছিল, তুই যে রকম ঐকান্তিক সাধনা নিয়ে তোর আর্টের পেছনে লেগেছিস্ তাতে একটা কিছু না ক'রে ছাড়বি না ব'লে মনে হচ্ছে।

প্রভাস বল্‌লে, পার্থিব সাফল্যের দুরাশা আমি আজকাল করছি না, প্রবীর। আমি এখন আমার মনকে খুসী করতে চাই।

একটু কৌতুক মেশানো হাসি হেসে প্রবীর বল্‌লে, সে কি স্বপ্ন-প্রিয়ার মূর্ত্তি গ'ড়ে?

—হ্যাঁ, ক্ষতি কি?

—ক্ষতি কিছুই নয়, তবে মূর্ত্তি গ'ড়েই কি তোর সাধনার শেষ হবে? প্রাণ আস্‌বে কোত্থেকে?

প্রবীরের এই কথায় প্রভাস হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াল।... তাই ত, প্রাণ আস্‌বে কোত্থেকে?

—ওকি, দাঁড়ালি যে?

প্রভাস জবাব দিলে, না, বিশেষ কিছু নয়!...তোর কথায় একটা সমস্যার মাঝখানে পড়ে গেলাম যে!

—কী হ'ল?

—মূর্ত্তি ত' গড়ে চলেছি, কিন্তু তার প্রাণ কি ক'রে দেব সে কথা ত' ভাবিনি'!

হো হো ক'রে হেসে প্রবীর বল্‌লে, এই!...তা'ত আর বিশেষ কিছু কঠিন নয়, আজকালকার autosuggestion-এর দিনে!

—কি রকম?

—তুই যদি গভীর বিশ্বাস নিয়ে ভাব্‌তে থাকিস্ যে তোর মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণ আছে তাহ'লে দেখ্‌বি সে তোর জীবন্ত প্রিয়া হ'য়ে দাঁড়াবে।...তখন যদি তোর ঘরে আসল কোন প্রিয়ার আগমন হয় তিনিও ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে উঠ্‌বেন!

প্রভাস চিন্তিত স্বরে বল্‌লে, না রে, প্রবীর, ঠাট্টার কথা নয়। আচম্‌কা তোর মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়ে গেল তার মধ্যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে।

এবার প্রবীর বল্‌লে, একেবারে মিথ্যে আমার কথা অবশ্য নয়! আমাদের দেশেই ত পদরেণুস্পর্শে পাষাণী অহল্যার প্রাণ এসেছিল!...কিন্তু এ রকম প্রাণ আন্‌তে হ'লে গভীর নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আত্মবিশ্বাস এবং প্রাণ আন্‌তেই হ'বে এই দৃঢ়তাটুকু থাকা চাই। সে কি তোর আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব?

প্রভাস একথার আর কোনও জবাব দিলে না, কিন্তু বাকী সময়টা সে প্রবীরের সাথে সংক্ষিপ্ত দু'একটা "হ্যাঁ", "না" ছাড়া আর কোন কথাই বল্‌লে না।

সন্ধ্যার আলো জ্বল্‌তে না জ্বল্‌তেই প্রভাস বাসায় ফিরে এল। প্রবীর তাকে আরও খানিকক্ষণ বাইরে ধরে রাখ্‌তে চেয়েছিল, কিন্তু প্রভাস কিছুতেই শুন্‌লে না।

ঘরে এসে সুইচ টিপে দিয়ে প্রভাস নির্নিমেষ নেত্রে শকুন্তলার স্মৃতির পরিকল্পনায় তৈরী মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে রইল। মূর্ত্তিটির ভিতর রেখাগুলো তখনও ফুটে ওঠেনি... শুধু outlineটি প্রভাসের দিকে তাকিয়ে যেন হাস্‌ছিল।

প্রভাস অস্ফুটস্বরে বল্‌লে, ভাব্‌ছ তুমি আমায় ধরা দেবে না, শকুন্তলা...কিন্তু আমি তোমাকে ধরা দিইয়ে ছাড়্‌ব!... আজ আমি মন্ত্র খুঁজে পেয়েছি। এ মন্ত্রে তোমায় সাড়া দিতে হবেই!

তার যন্ত্রপাতি নিয়ে সে আবার শকুন্তলার মুখটি নিয়ে বস্‌ল। সে কী অধ্যবসায় আর ধৈর্য্য! যেন তার বুকের সব আগুন আর কামনা সে ঢেলে দিচ্ছিল তার যন্ত্রের আগাটুকুতে! মূর্ত্তিটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে দেখ্‌ছিল কোথাও কোন ত্রুটি হচ্ছে কিনা। কিছুতেই তার যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না, কেবলই ভয় হচ্ছিল বুঝি বা স্বপ্নে ছবির চেয়ে রাস্তা খাটো হ'য়ে গেল!...মূর্ত্তির যদি সম্পূর্ণতা না হয় তাহ'লে প্রাণ আস্‌বে কি ক'রে?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে চলেছে, প্রভাসের শান্তি নেই। রাত্তিরের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হ'বে যে! তারপর সে তার প্রিয়ার আরাধনায় বস্‌বে, মনের গানের তালে 'তালে পাথরের মধ্যে বিদ্যুতের শক্তির সঞ্চার করবে...

রাত বারোটা। প্রভাসের মাথা ঘুর্‌ছিল...এ রকম অনিদ্রায়, অর্দ্ধাহারে কতদিন আর চলে?

বাইরের মুক্ত বাতাসের স্পর্শ পাবার আশায় প্রভাস জানালার কাছে সরে গেল। সামনের বাড়ীর ছাদে কার যেন মৃদুহাসির শব্দ শোনা গেল।...শকুন্তলাও এমনি হাসবে! এর চেয়েও মধুর হাসি হবে তার, সে হাসিতে বুকের ভিতর আনন্দের তুফান উঠ্‌বে, পাগ্‌লামিতে মন মাতামাতি কর্‌বে।

প্রভাস আবার তার মূর্ত্তির কাছে ফিরে গেল।

তার চোখ টন্ টন্ কর্‌ছিল, কপালের শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বল্‌ছিল।

অস্বাভাবিক এক শক্তি নিয়ে সে তার শেষ আঁচড় ক'টি

কাটছিল।···ওই ভ্রূর কাছটা ত ঠিক হয়নি'!—শকুন্তলার ভ্রূ যে আরও পাতলা!...একী তার হয়েছে? কেবলই ভুল হচ্ছে?

তন্দ্রাচ্ছন্ন মোহের মধ্যে থেকে যেন প্রভাস তার পাথরের কাজটুকু শেষ করছিল। ঘড়িতে চারটা বাজ্‌ল...ভোরের আলো আস্‌বার আগেই যে তাকে ধ্যানে বসতে হ'বে! শকুন্তলা যে বড় লজ্জাসরমশীলা গো···প্রভাতী আলোর নগ্নতায় যে সে সঙ্কোচ বোধ করবে!

পাঁচটার সময় কাজ শেষ ক'রে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রভাস উঠে দাঁড়াল।

মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়ে বিজয় গর্ব্বে একটুখানি হেসে বল্‌লে, পাথরকে সম্পূর্ণতা ত' দিয়েছি, এবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'লেই আমার সাধনার জয় হবে।...তুমি কি তখনও আস্‌বে না শকুন্তলা...?

প্রভাসের মাথা ঘুরছিল...সে একটুখানি টল্‌তে টল্‌তে মূর্ত্তির মুখটি চেপে ধরলে। তার মনে হ'ল, সারা বিশ্বব্যাপী যেন জীবনের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল···শকুন্তলার মুখে হাসি ফুটল, তার ঠোঁট দুটো একটুখানি নড়্‌ল···

তারপর কী হ'ল প্রভাসের আর মনে নাই। শিথিল পা দুটির উপর ভর দিয়ে সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না। একটি অস্ফুট চীৎকার করে সে মূর্ত্তির নীচে পড়ে গেল।

জান্‌লা দিয়ে তখন অরুণ আলোর ঝিলিমিলি এসে পড়েছে।

নবগোপাল দাস

তুমিই সুন্দর

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

তবু···তবু বলি আমি সব চেয়ে তুমিই সুন্দর—
আজীবন পরিভ্রমি' অবারিত নিখিল ভুবনে
দেখেছি সৌন্দর্য্য যত—স্পষ্ট সবি আছে মোর মনে।
অদ্রি-শিরে বসি' একা দেখেছি এ-বিশ্বচরাচর:
দেখেছি নামিতে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে দিকচক্রবালে,
বিজন সৈকতে বসি' দেখিয়াছি উতলা সাগর,
আর উর্দ্ধে পূর্ণ-শশী, তারা-ভরা উন্মুক্ত অম্বর।
ঊষার উদয় কত হেরিয়াছি পূর্ব্বাচলভালে।

তবু···তবু বলি আমি সবচেয়ে তুমিই সুন্দর—
তোমার চিবুকে, ওষ্ঠে, অধরের বক্র রঙিমায়,
অলক-আকুল ভালে, ঘনকৃষ্ণ যুগ্ম ভ্রূ-রেখায়,
মুকুলিত মধুহাস্যে, গ্রীবাভঙ্গে, আয়ত নিথর
তব নেত্র-তারা-তলে—দেখেছি যে-সৌন্দর্য্য ভুবনে
শত বিশ্ব লোষ্ট্রসম পড়ে রয় তারি এককোণে।

সারনাথ

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়

বসুধা ভরেছে সুধা ঘন-বনে শ্যামল শোভায়।
বক্ষে তার দোলা দিল দক্ষিণ বাতাস ॥
শূন্যে মেলি' পুষ্পভরা সহস্র-শাখায়
ধরিত্রী ধরিতে চায় সুদূর আকাশ ॥
সবুজ-স্বপ্নের খোঁজে বন-বীথি হয়েছে সার্থক।
উচ্ছ্বসিত অন্তরের অর্ঘ্য বিরচিয়া
মিটিয়াছে বনানীর সখ ॥
বর্ণ-রস-গন্ধ ভরা মঞ্জু-সাজি হাতে
বসন্ত ব্যাকুল হ'ল ফাল্গুনের প্রাতে ॥
রৌদ্ররেখা হল তৃপ্ত
আলোকলতার বুকে করিয়া চুম্বন।
সূর্য্যমুখী ঊর্দ্ধমুখে ভুলি' গেল মাটীর বন্ধন ॥
করবী বধির সুখে।
বকুল মাগিছে চুমা মলয়ের মুখে ॥
রজনীগন্ধার চোখ স্বপ্নাতুর সে কার সন্ধানে।
চম্পকের কম্প্র-বক্ষ ভরে' গেছে বসন্তের গানে ॥
মর্ত্তের অমৃতপানে কৃষ্ণচূড়া রক্তিম রঙ্গীন।
মধুমালতী'র বুকে মধু জমে ওঠে দিন দিন ॥
প্রান্তহীন প্রান্তরেতে তৃণপুঞ্জ বিছাইছে মায়া।
পলাতক-মৃগের সন্ধানে,—মৃগী ছোটে একা অসহায়া ॥
সেদিন সকালে—
নীল-অঞ্চলের প্রান্ত খসি' পড়ি' কুঙ্কুমের থালে
হয়ে গেল লাল।
বিভাসের নেশাসুখে তন্দ্রাতুর-বন হয়েছে মাতাল ॥
গুহার আঁধারে আলো ভাঙ্গি দিল সুপ্তির বন্ধন।
উন্মিল সহস্র শত হরিণ-নয়ন ॥
চঞ্চল-মৃগের লম্ফে বন-বুকে জাগিল কম্পন ॥
মৃগপতি হ'ল অগ্রদূত
পশ্চাতে মাতিল পথে লক্ষ-মৃগ-যুথ ॥

লজ্জাবতীলতা পথে বক্ষে বাঁধে চঞ্চল-চরণ।
পদাঘাতে বক্ষতা'র শতছিন্ন হ'ল,—আসিল মরণ ॥
তবু তা'রা পদে পদে বাঁধে।
লতার ললিত অঙ্গে ব্যর্থ-আলিঙ্গন মর্ম্মরিয়া কাঁদে ॥
মহোৎসাহে ছোটে মৃগপতি।
পশ্চাতে অযুত-যুথ বাধা হীন গতি ॥

*　　　*　　　*
*　　　*　　　*

বসন্ত-উৎসব লাগি' আসিলেন বনে কাশীপতি।
মৃগের চঞ্চল-পদে অলসিত-গতি ॥
বনস্পতি মর্ম্মরিল ত্রাসে।
প্রস্ফুট পুষ্পের চক্ষে আশঙ্কার বিভীষিকা ভাসে।
কাতর কাজল-চোখে অশ্রু জমে উঠে—
মৃগয়ার রুদ্রমর্ম্মে মিনতির অর্ঘ্য হয়ে ফুটে
গেল ব্যর্থ হয়ে।
জীবন্তের স্তিমিত জীবন মারমুখী মানুষের ভয়ে ॥
ধনুকের ধ্বনিল টঙ্কার।
মর্ম্মাহত-মৃগ চক্ষে নামে অন্ধকার ॥
মৃগপতি হয়েছে কাতর।
নৃপতি সমীপে আসি' কহে অতঃপর,—
"ওগো রাজা ওগো বীর, ক্ষান্ত হও মৃগয়ার রণে।
শ্মশানের অভিশাপ এনোনা সুধীর
বসন্ত-ব্যাকুল-ঘন-বনে ॥
আমি তোমা করি যা'ব দান
উৎসবের প্রতি প্রাতে মৃগের পরাণ ॥
তুমি বুঝি দেখ নাই ধনী
কালবৈশাখীর ঝড়ে মরেছে নলিনী?
সরসীর বক্ষে কাঁদে কঙ্কাল-কমল।
বন্ধ-হরিণের চক্ষে ফুটিয়াছে আজি তারি অশ্রুজল?

বনের বসন্ত প্রিয় ব্যর্থ করোনা'ক।
আমি মৃগ-যূথ-পতি, মোর কথা রাখো॥"
বিস্মিত-নৃপতি কহে, "বেশ তাই হবে।
মৃগ এনে দিও মোর প্রত্যহ উৎসবে॥"
তারপর কতদিন যায়।
বনের বিষণ্ণ-মনে চঞ্চলতা নাই॥
একে একে প্রাণ দিল সবা'।
সেদিন হরিণী এলো সন্তান-সম্ভবা॥
বক্ষে তা'র জননীর আশা।
মর্ম্মরিছে মৌন মনে সৃজনের ভাষা॥
তাহারে সঁপিয়া দেবে বলে'
ভাসে মৃগ-যূথপতি তপ্ত-আঁখি জলে॥
কণ্ঠে ওঠে বেদনার সুর।
কহে কাঁদি, "ওগো ও নিষ্ঠুর।
নতমুখী হরিণী না মেরে' লহ মোর প্রাণ।
জননী-হত্যার শাপে নাহি যেন আসে অসম্মান॥"
নির্ব্বাক-নৃপতি কহে, "তৃপ্ত আমি তব কথা শুনে
বিমুগ্ধ হয়েছি তব অসম্ভব গুণে॥
করিনু ঘোষণা,
এ অরণ্যে বধিবেনা মৃগ কোনজনা॥
আজি হ'তে মৃগয়ার উৎসবের শেষ।
বন ত্যজি' দুষ্ট-ব্যাধ হোক্ নিরুদ্দেশ॥"
বুকভরা ব্যথা নিয়ে মূক ছিল নিশীথের তারা
হিমের পরশে তা'র ম্লান চোখে জমেছিল জল।
প্রাসাদের সুপ্ত-কক্ষে রমণীকে হ'ল সর্ব্বহারা
বাহুর বন্ধন তোলে প্রিয়তম বিদায়-চঞ্চল—
রাজার দুলাল নামে পথের ধূলায়।
পৃথিবীর কণ্ঠভরি'—ওঠে কলরব,—"ওরে আয়—
ওরে আজ অনন্ত-উৎসব,—এসেছেন বুদ্ধ তথাগত।
ফিরিয়া এসেছে সেই মৃগযূথপতি,—অশ্রু-ভার-নত॥"
সিদ্ধার্থের সিদ্ধ হ'ল ব্রত।
যূপকাষ্ঠে ছাগশিশু যত
প্রাণ পেল ফিরে
সংযত করিল রুদ্র উদ্যত-মুষ্টিরে॥

সংসার সংগ্রামে মত্ত মানবের ঘর
হিংসা দ্বেষ বেদনায় আছিল জর্জ্জর॥
প্রতিবেশী ভুলি' ভালবাসা
স্বজনে হানিছে অস্ত্র হীন সর্ব্বনাশা॥
ভুলি' গিয়া জীবনের অল্প-পরিসর
আত্মমোহে ছিল মত্ত অন্তিম-বাসর॥
বুদ্ধ তা'রে শুনাইল বাণী,—
"সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টি তোর অশিষ্ট-সন্ধানী
ক্ষুদ্র জীবনের মদে মাতাল-মানব
থামা তোর হিংসা-কলরব॥
এক হোক্ তৃপ্ত আজ সহস্রের তৃপ্তির সন্ধানে।
রুদ্ধ-মন শুদ্ধ হোক্ গ্রহণে ও দানে॥"
অতীতের নাই চিহ্নলেশ।
হয়েছে নিঃশেষ
সে ঘন-অরণ্যপ্রাণ।
কঙ্কালের কালীমাখা অতৃপ্ত-আত্মারে তাই করিয়া আহ্বান
চোখে জল ভালে জ্যোতিঃ পরি ভিক্ষু বেশ
লুপ্তবনে বুদ্ধদেব করি' পদার্পণ
মোহমত্ত মানবেরে করিয়া উদ্দেশ
করিলেন অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ॥
দেবতার প্রশান্ত-আননে
অতীতের মৃগপতি ফিরে চায় সজল-নয়নে॥

* * *

* * *

কঠিন কালের জালে কত যুগ পড়ি' গেল ধরা।
ধরিত্রীর বক্ষে কত রাজ্য ভাঙ্গাগড়া॥
ধর্ম্মের প্রচার লাগি জন্মিল অশোক।
বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রে ধ্বনিল ভূলোক॥
শত-বুদ্ধ-সন্ন্যাসী-চরণে করি প্রণিপাত।
অশোক রচিল বৌদ্ধ-তীর্থ—সারনাথ॥
অহিংসার বন্দনার ধ্বনি
ত্রিলোকের মর্ম্মে মর্ম্মে উঠিল রণণি॥

* * *

তারপর কত যুগ কাটে।
তীর্থ সারনাথ লুপ্ত রৌদ্র-দগ্ধ-মাঠে ॥
কালের অতল কোলে অবলুপ্ত হ'ল ইতিহাস।
বিস্মৃতির সত্য মাঝে মিথ্যা হ'ল স্মৃতির বিলাস ॥
ক্ষুদ্রতার রুদ্র-অসি দিল ধ্বংস করে'
সভ্যতা আশ্রয় নিল ধরিত্রী অন্তরে ॥

* * *

শত বর্ষ পরে পুনঃ জিজ্ঞাসু-মানব
চাহিল জানিতে লুপ্ত অতীত গৌরব ॥
প্রত্নতত্ত্ব প্রশ্নে ভরি' আঁখি
খুঁড়িয়া তুলিল তা'রে মাটী যারে রেখেছিল ঢাকি ॥
বিনিদ্র-নিশার শেষে রৌদ্রমাখে আসিল প্রভাত।
হেরিনু বিস্ময়ে মোরা,—লুপ্ত কোন্ সভ্যতার সার—সারনাথ ॥
যা'রে কভু দেখিনাই মনে হ'ল সে যে কত চেনা।
নিঃশেষ করিয়া পুঁজি ভেবে দেখি রয়ে গেছে দেনা ॥
মুহূর্ত্তের মূর্ত্তি আছে কালস্রোতে ভরে' আছে ছায়া।
কাল যারে ছেড়ে আসি আজও তার ঘোচেনিক মায়া ॥
সৃষ্টির প্রথম-উষা ঘোচেনিক' তার যাওয়া আসা।
প্রলয়-প্লাবিত সাঁঝে বক্ষ ভরি' জাগে ভালবাসা ॥
ভাবি তাই,—
ফিরিয়া আসিব বলে' শুধু চলে যাই ॥
জীবনের প্রতিক্ষণে ভাবি।
মানুষেরই কাছে আছে মানুষের দাবী ॥
প্রতিপল জড়ো করে' গড়ে বারোমাস।
মানুষেরই আছে ইতিহাস ॥
জড়ো করা স্তূপে স্তূপে বুঝি
অনন্ত-কালের কোলে অমরত্ব খুঁজি'
রাখে যুগ যুগান্তের পুঁজি
মহাকালস্রোত-গর্ভে অক্ষয়-মানব।
ভাবে তার ঘোচে নাই আজিও শৈশব ॥
মা'র বুকে খেলা করে মাটীর দুলাল।
আজ যত্নে গড়ে যারে ভাঙ্গে তারে কাল ॥
দিন যায় আসে।
দিবসের দীপ্ত-সূর্য্য মৃত্যু যাচে ম্লান-সন্ধ্যাকাশে ॥

অজিত মুখোপাধ্যায়

স্বপন বিলাস

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

'We were happy and dead, you and I—'
—*A. E.*

তোমাতে আমাতে ছিলাম মগন মরণঘুমে,
সোণালি আলোর স্বপন আসিয়া নয়ন চুমে ;
চাঁদের আলায় চলিনু দুজনে সে কত দূর—
রূপালি মেঘের ছোট ছোট ঢেউ করিনু চুর।
তোমাতে আমাতে চলেছি দুজনে স্বপন পুর।

আমরা দুজনে ঘুমায়ে কাটানু সে কতকাল,
অসীম আকাশ রচনা করিল কী মায়াজাল—
কুহেলিমাখানো শুভ্র জোছনা হিম শীতল,
শিহরি শিহরি গুমরিছে হেথা ধরণীতল।
আমরা দুজনে দেখিনু আকাশ চিরশ্যামল।

মরণ পারের সোণার স্বপন লাগিছে ভালো,
মেঘের মায়ায় ছায়া ঘনাইছে গভীর কালো,
দেহের দেউলে নূতন কতনা আশার মেলা—
জোছনা জোয়ারে ছুটিয়া চলেছে মনের ভেলা।
আমরা মগন মরণ ঘুমেতে নীশিথ বেলা।

মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

এক

জ্যোৎস্নাসিক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া একটা রেলগাড়ি রক্তচক্ষু-দানবের মত ছুটিয়া যাইতেছে। প্রান্তরের মাঝে মাঝে কোথাও জল জমিয়া,—তাতে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্‌মিক্‌ করে। বিস্তৃত শস্য ক্ষেত অস্পষ্ট পড়িয়া আছে, যেন নিদ্রায় আচ্ছন্ন এবং হঠাৎ-বাতাসে ঘুমের মধ্যেই শিহরিয়া উঠিতেছে। দিক্‌চক্ররেখার কাছে তাল ও সুপারি গাছের ছায়া-ছবি যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। এবং শেষ রাত্রের বিশীর্ণ চাঁদ যেন কেবলই ম্লান হইয়া চলিল।

গাড়ির একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরার জান্‌লার ধারে বসিয়া যে বাহিরের এই ছবি দেখিতেছিল, সে যুবকটি আর যাই হোক্‌, কবি নয়। শেষরাত্রে ঘুম ছাড়িয়া ঘুমন্ত পৃথিবীর দৃশ্য দেখিবার স্পৃহা তার কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু একি আর কবিত্ব করিবার জন্য সে উঠিয়া বসিয়াছে? কিন্তু ঘুম নিতান্তই না আসিলে কি আর করা যায়। জান্‌লা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া দিয়াছে শুধু এই জন্য যে মাথাটা ঠাণ্ডা হইলে যদি ঘুম আসে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ঘুম অত্যন্ত দরকারী,—ব্যায়ামের মত। কিন্তু ঘুম না আসিলে কি আর করা যাইবে। অগত্যা সে এলোমেলো চুলগুলি আঙুল দিয়া আচ্‌ড়াইয়া বালিশের তলা হইতে একটা বই টানিয়া লইয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিল। এমন হইবে জানিলে কে আর সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনিয়া টাকা খরচ করিয়া মরিত!

তবে যাই হোক্‌, বইখানা উপাদেয়,—পড়া চলে। নিছক প্রেমের ছিঁচ্‌কাঁদুনী নয়, গভীর জ্ঞানের কথা। বইটির নাম,—'মানবের শত্রু নারী'। স্বামী প্রস্তরানন্দ প্রণীত নারীসম্বন্ধীয় পুস্তক। এই বইটা অরুণাংশুর কাছে গীতার মত হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশ উপদেশ সে এখান হইতে নেয়। কারণ ন্যাকামি সে পছন্দ করে না এবং কবিতাকে যে ঘৃণা করে। তার কাপড় জামায়, তার সমান করিয়া ছাঁটা চুলে, তার শুঁড়-ওয়ালা চটিজোড়ায় তার কোমলত্ব বিদ্রোহের সাক্ষ্য দেয়। শুধু মাত্র প্রেমের কথায় ভরপুর বলিয়া অরুণাংশু উপন্যাস পড়া ছাড়ান দিয়াছে, এবং তার বদলে পড়ে মুলারের ব্যায়ামের বই, ক্যাপ্টেন্‌ কুকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, চেম্বার অব্‌ কমার্সের বাৎসরিক বিবরণী, ও সব চাইতে বেশী স্বামী প্রস্তরানন্দের বিখ্যাত 'মানবের শত্রু নারী'।

অনেকবার সে বইটা সারা করিয়াছে, কিন্তু তবু পড়ার কামাই নাই। এখনো বিশেষ মনযোগের সাথে 'মানবের শত্রু নারী' পড়িতেছিল। মাঝে-মাঝে হাত ও মাথা নাড়িয়া বইয়ের ভাব-বস্তুর সাথে তার যে মতের একান্ত মিল তাহা জানায়। একটু অগ্রসর হইতেই লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া একটা জায়গা চোখে পড়িল,—'সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই নারী বর্জ্জনীয়া। এই নারীই জগতে শোক, তাপ, বুদ্ধি-ভ্রংশ ও কলহ টানিয়া আনে, এবং একপাল কালো কুৎসিত সন্তানের জন্ম দিয়া জগত অন্ধকার করিয়া তুলে।'

তর্জ্জনী ও ঘাড় নাড়িয়া অরুণাংশু অত্যন্ত বেশী রকম সায় দিল। কিন্তু মাথা উঠাইতেই চোখে পড়িল গাড়ির দেওয়ালের এক জায়গায় স্যানাটোজেনের বিজ্ঞাপন,—এক বিলাতী তরুণীর ছবি। অরুণাংশু মুখ বিকৃত করিল। ভ্রূ কুঁচকাইয়া একটু ভাবিল, একবার 'মানবের শত্রু নারী'র দিকে চাহিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিল, তারপর উঠিয়া গিয়া বিজ্ঞাপনটার উপরকার হুক্‌-এ বর্ষাতিটা ঝুলাইয়া দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। নিজের জায়গায় ফিরিয়া আসিবার জন্য যেই মুখ ফিরাইয়াছে, দেখে ফ্লোরে এক টুক্‌রা কাগজে 'একটি মেয়ে ওভেলটীন্‌ তৈরী করিতেছে। গভীর বিতৃষ্ণায়

অরুণাংশু জুতা দিয়া তার মুখটা মাড়াইয়া বার্থের তলায় ঠেলিয়া দিল। স্বামী প্রস্তরানন্দ এদের কাছ হইতে শতহস্ত দূরে থাকিতে বলিয়াছে, সেটা ভুলিলে চলিবে না। বিছানায় গিয়া বসিয়া পড়িতেই তার কিন্তু মনে হইল একটা বইয়ের উপর বসিয়া পড়িয়াছে। উঠাইলে দেখা গেল সেটা টাইম্‌-টেবল্‌,—আর একী, পরিত্রাণ নাই নাকি কোথাও,—টাইম-টেবল্‌এর উপরটা সিগারেটের বিজ্ঞাপন,—একটা বিলাতী মেয়ে সিগারেট টানিতেছে। অরুণাংশু নিতান্ত রাগিয়া গেল। টান্‌ দিয়া উপরের পাতাটা ছিঁড়িয়া জানলা দিয়া সেটা বাহিরে ছুঁড়িয়া মারিয়া তবে তার রাগ কমিল। লজ্জাকর,—মেয়ের মুখ দেখাইয়া সকল আহাম্মুক-গুলি নিজেদের জিনিষপত্রের খরিদ্দার জুটাইতে চায়!

যাক্‌, আবার হেলান দিয়া সে 'মানবের শত্রু নারী'কে চোখের সমুখে মেলিয়া ধরিল। চমৎকার বই এইটি,—প্রত্যেক পাতায় ভারী সুন্দর সুন্দর লাইন্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের পুস্তক,—নইলে এরই মধ্যে আর তৃতীয় সংস্করণ হয় না কি! অরুণাংশু পড়িয়া গেল,—'অজগর সর্পের দৃষ্টিতে পড়িলে পশুপক্ষিগণ যেমন এক দুর্নিবার বেগে আকর্ষিত হইয়া তাহার খপ্পরে গিয়া পড়ে, তেমনই নারীর খর-দৃষ্টিতে পড়িলে, নরের আর রক্ষা নাই। অতএব বুদ্ধিমান নরগণ যেন এই পরম অরির ছায়া এড়াইয়া চলিতেও যত্নবান হন্‌। হায়, যে ভ্রান্ত পুরুষ একবার নারীর প্রকোপে পড়িয়াছে, তার আর দুর্গতির সীমা নাই।' অরুণাংশু ক্রমেই বুঝিতেছে, নারী ভয়ঙ্কর বস্তু। তার মা অবশ্য প্রস্তরানন্দের বর্ণনার সাথে মেলে না। কিন্তু নারী বলিলে কি আর মাকে বোঝায়! নারীর বিশেষ অর্থ হইতেছে,—যাক্‌, সে তো সবাই জানে। সেই বিশেষ অর্থে নারী আতঙ্কেরই বস্তু।

নারীর ভয়ঙ্করতা কল্পনা করিয়া অরুণাংশু শিহরিয়া উঠিল। হায়, স্বামী প্রস্তরানন্দের বইখানা যদি তার হাতে না আসিত তবে এই বিপদ-সঙ্কুল সংসারে কত মুস্কিলেই না তাকে পড়িতে হইত।

বড় একটা ষ্টেশান্‌ আসিয়া পড়িল। গাড়ির গতি কমিয়াছে,—অদূরে বিস্তর বিজ্‌লী-আলোর দেয়ালী সুরু হইল। তারপরই, কুলী চাই, পান সিগ্রেট, চা গ্রম্‌, চেঁচামেচি। হুঁসিয়ার,—লগেজ যাইতেছে!

কিন্তু সে সবে মনযোগ দিবার অবকাশ অরুণাংশুর নাই। শব্দ আট্‌কাইবার জন্য জান্‌লা আটকাইয়া দিয়া সে 'মানবের শত্রু নারীর' একটা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ জায়গা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়িতে লাগিল। 'নারীর হাস্য, নারীর লাস্য, নারীর কণ্ঠ সকলই পুরুষের জন্য বাগুড়া বিস্তার করিয়া আছে। এতএব সাধু সাবধান্‌'।

প্ল্যাটফর্ম্মে সেই গাড়িটার দরজার ধারে তখন দুজন যাত্রী আসিয়াছে। তখন অরুণাংশু যদি তাদের দেখিত তবে কে জানে হয়ত সে ভিতর হইতে ল্যাচ্‌-কী টানিয়া দিত কিনা। তাদের মধ্যে একজন একটি তরুণী মেয়ে, আর তার সঙ্গে তার চেয়ে কিছু ছোট তার ভাই। সঙ্গে কুলীদের মাথায় পোর্টম্যাণ্টো, সুটকেশ, হোল্ড-অল্‌,—বিস্তর জিনিষপত্র। মেয়েটি গাড়ির দরজার কাছে লট্‌কানো কার্ডটা পড়িয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মোটগুলি উঠিয়ে ফেল ভাই, আমাদেরই বটে। ছেলেটি নিজে গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়া কুলীদের দিয়া মাল উঠাইতে লাগিল, আর মেয়েটি নীচে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল সব কিছু উঠান হইতেছে কিনা।

প্ল্যাটফর্ম্মের আলোয় মেয়েটিকে দেখা যায় বেশ সপ্রতিভার মত। তনু-মধ্য দেহ, দাঁড়াইবার ভঙ্গীটাতে ওর সম্বন্ধে একটা মধুর ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্যে কোনো ধরাবাঁধা মাপকাঠি নাই। তবু ওর সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে ও একটা হঠাৎ-খুসীর মত, সেই ধরণের মেয়ে যারা জীবন সরস করিয়া তোলে। প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া সুজাতা যখন মাল ওঠানো দেখিতেছিল ও নানান্‌ যাত্রীর দিকে সকৌতুহল চোখে চাহিয়া একটা না-জানা খুসীতে টই-টম্বুর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমাদের অরুণাংশু নারীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য 'মানবের শত্রু নারী' হইতে আহরণ করিয়া প্রায় শিহরিয়া উঠিবার জোগাড় হইতেছিল। শব্দ পাইয়া চোখ উঠাইয়া দেখিল একটি ছেলে, আর কুলী ও মোট। কোন কথা না বলিয়া অরুণাংশু আবার বইয়েতে মনোযোগ দিল।

মোটমাট গুছান হইলে বাব্দল কুলীদের পয়সা মিটাইয়া

দিতে নীচে আসিয়া নামিল। সুজাতা কত দিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দিতে উদ্যত হইতেই তার পৌরুষে আঘাত লাগিল। সে কহিল, সে তোমাকে বল্‌তে হবে না,—আমি বুঝি আর জানিনে কত দিতে হবে।

কত দিতে হবে বল তো?

যা দেব, তার চেয়ে প্রথমটায় কম দিতে হবে।

'ওস্তাদ' বলিয়া হাসিয়া সুজাতা বাদলের পৌরুষের গর্ব্ব খর্ব্ব না করিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া একজন অচেনা যুবাকে দেখিয়া সুজাতা প্রথমটা একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাঠমগ্ন অরুণাংশুর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া কি ভাবিতেই তার মনে পড়িল। রেণুকার দাদাকে সে চোখে দেখে নাই কখনো, কারণ তার বাবা মাত্র ছ-সাত মাস রেণুকাদের ওখানে বদ্‌লী হইয়াছে এবং তখন রেণুকার দাদা কলকাতায়। কিন্তু রেণুর দাদার ছবি দেখিয়াছে সে। এ ঠিক তারই মতন। সুজাতা আবার তাকাইয়া দেখিল, গভীর মনোযোগ দিয়া অরুণাংশু বই পড়িতেছে।

রেণুর অ-দেখা দাদার সম্বন্ধে সুজাতার খানিকটা স্বপ্ন, খানিকটা কল্পনা না-বলা মায়ায় জড়ান ছিল। তার সাথে সুজাতার বিয়ে হইতে পারে এমনি একটা সম্ভাবনার কথা সে শুনিয়াছে। মনের মধ্যে তাই অনেক কথা ওঠে, অনেক হঠাৎ-সুর, অনেক মৃদু গন্ধ। কবিতার মধ্য হইতে কুড়াইয়া পাওয়া, শ্রাবণ দিনের অশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে চরণ-ধ্বনি-শোনা ঘুম ভাঙা রাতে চমকিয়া-ওঠা' একটা কল্পনা!

রূপকথার রাজপুত্রের যেমন হওয়া উচিত অরুণাংশুর মধ্যে তার যে-টুকু ছিল মহা-আয়াসে সে তাহা দূরে রাখিয়াছে। অত্যন্ত এলোমেলো চুল, জামা কাপড়ে উদাসীন অনাদর, এবং খুব যে কাঁচাসোনার বর্ণ তাও বলা চলে না। কিন্তু তা হইলেও একটা প্রসন্ন স্বাস্থ্যের দীপ্তি তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

গাড়িতে যে কেহ প্রবেশ করিয়াছে তা অরুণাংশুর খেয়ালই নাই। সুজাতা ভাবিল হয়ত অত্যন্ত মজার একটা উপন্যাস হইবে। চাহিয়া কিন্তু তার আর সন্দেহ রহিল না। বইটির নাম,—'মানবের শত্রু নারী', স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত। অকস্মাৎ ওর ঠোঁটের উপর একটু স্মিত হাসি ও চোখে দুষ্টুমী খেলিয়া গেল।

এতক্ষণ পরে অরুণাংশুর মনে হইল নবাগত সহযাত্রীকে গন্তব্য জায়গার খবর জিজ্ঞাস করিলে হয়,—অতটুক ছেলে একলা একলা কোথায় যাইতেছে! মুখের সমুখ হইতে বই সরাইয়া সে বলিতে গেল, তুমি—। ওদিকে চাহিয়াই কিন্তু সে শিহরিয়া উঠিল। একটি ভোজবাজী, ভানুমতীর তামাসা, আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ না কী? কোথায় সেই ছোক্‌রা,—তারই দিকে কৌতূহল-ভরা চোখে তাকাইয়া আছে এক,—হ্যাঁ, নারী। অরুণাংশুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া গেল, তারপর চোখ পড়িল কোলের বইটির উপর,—'মানবের শত্রু নারী'। অত্যন্ত হতভম্ব শঙ্কিত ভাবে সে জান্‌লা খুলিয়া বাহিরে মাথা বাহির করিয়া দিল। সেটা এমনই অকস্মাৎ হইল যে সুজাতার চোখ দুইটি কৌতুকে বড় হইয়া উঠিল এবং অপ্রকাশ হাসিতে ঠোঁটের কোণা চকমক করিতে লাগিল। হঠাৎ তার মনে হইল, বাদলের এতটা দেরী হওয়া উচিত নয় তো। ও-দরজার দিকে যাইয়া চাহিয়া দেখিল বাদল মুটেদের উপদেশ দিয়া এই বুঝাইতেছে যে গল্পলোকের এক তন্তুবায় অতি লোভ করিয়া নষ্ট হইয়াছিল। সুজাতার তাড়ায় সে বক্তৃতা থামাইয়া আরো কিছু পয়সা দিয়া তাদের বিদায় করিল।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতে বাদল কহিল, মেয়ে মানুষকে অমনি করে ঠকিয়েই তো ওরা পয়সা নেয়। আমি হ'লে দিতুম নাকি আর পয়সা।

সুজাতা কহিল, কী কিপ্টে হচ্ছিস্ রে তুই! টাকা জমাতে চাস্ না কি!

বাদল কহিল, টাকা জমালে বুঝি এতদিনে আর সাইকেল কিনে ফেলতুম না?

গাড়ি ছাড়া পর্য্যন্ত দুই ভাইবোন্ দরজা আটকাইয়া তার ভিতর দিয়া মাথা বাহির করিয়া বাহিরের লোকজন দেখিতে লাগিল। অরুণাংশু আড়চোখে দু-একবার তাদের দিকে চাহিয়া প্রায় বিরক্তভাবে চোখ ফিরাইয়া 'মানবের শত্রু নারী'তে মনযোগ দিল। এবং গাড়ি ছাড়িলে দেখিল 'কোথা হইতে ওদের মুখে একবার লাল ও একবার নীল

আলো পড়িল,—তারপর ওদের দরজা ত্যাগ এবং বইয়েতে অরুণাংশুর পুনর্বার গভীর মনোনিবেশ।

কিছুক্ষণ ধরিয়া গাড়িটা চলিতেছে। এদিককার বার্থটায় অরুণাংশু সতেজে মানবের শত্রু পড়িতেছে। মাঝের বার্থটায় বাদল শুইয়াছিল, ঘুম আসিতে তার মাত্র দেড় মিনিট লাগিল, দিদির পাহারা হইয়া যে সে আসিয়াছে তাহা আর মনে রহিল না। ও-দিককার বার্থ-এ সুজাতা বালিশে হেলান দিয়া কোলের উপর একটা ম্যাগাজিন রাখিয়া বাহিরের অন্তহীন আবছায়ার দিকে, পাণ্ডুর চাঁদ ও দিকচক্রবালের মসীছবির দিকে চাহিয়া স্বপ্নালস চোখে বসিয়াছিল।

অরুণাংশু একবার তাকে তাকাইয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু সর্বনাশ, একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া সুজাতার কোলে স্বল্পাবৃত হাতে, তার চুলে তার গলায় মুখে পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সে মানবের শত্রুতে চোখ ফিরাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। সুজাতা ও দু-একবার তার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল,—সমান তেজে সে মানবের শত্রু নারীকে সম্মান করিতেছে। শুধু কি তাই। কেবল কি আর পড়া, ঘাড় নাড়া, আঙুল দিয়া দাগান, উৎসাহের প্রাচুর্য্যে বেঞ্চিতেই ঘুষি এসব ক্ষণে ক্ষণে এমনি চলিতেছে যে সেদিকে চাহিয়া সুজাতার হাসি চাপা দায় হইয়া পড়িয়াছে। আদত ক্ষ্যাপা না হইলে অমন করে নাকি কেউ।

এবার অরুণাংশু এদিকে চোখ ফিরাইতেই সুজাতার সাথে চোখাচোখি হইয়া গেল। এ কী? হাসিতেছে না কি ঐ মেয়েটা? ওর ঠোঁটের একটা কোণ হইতে কৌতুক-হাসির একটা টুক্‌রা যেন উঁকি দিতেছে, আর ওর নাকও যে ফুলিয়া উঠিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। তার দৃষ্টি মানবের শত্রুতে পালাইয়া সে যাত্রা হাঁপ ছাড়িল। কিন্তু শান্তি নাই। দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছে অরুণাংশু। তার মনে হইল, তার গায়ে পিঠে, তার কাঁধে, তার চোয়ালে মেয়েটার দৃষ্টি ফুটা করিতেছে। এমন হইলে কার আর নিশ্চিন্ত পড়া চলে। কাজে কাজে সভয়ে আবার সে এদিকে তাকাইল।

সুজাতা তার দিকে তাকাইয়া কিছুতেই আর হাসি চাপিতে পারিতেছিল না। অরুণাংশুর শঙ্কিত দৃষ্টি, ওর 'মানবের শত্রুর' উপর গভীর মনযোগ সব কিছুতেই তার বেজায় হাসি পাইতেছে। অরুণাংশু একান্ত অচেনা না হইলে হয়ত সশব্দে হাসিয়া উঠিত। কিন্তু হাসির শব্দ না করুক, কৌতুকে ওর চোখ দুটি টল্‌টল্‌ করিতেছে। এই চোখের সাথেই অরুণাংশুর চোখ পড়িল।

অরুণাংশু এই অভাব্য দুর্ঘটনায় মোটেই কাব্য-রসের খোঁজ পাইল না। প্রায় রাগান্বিত ভাবেই সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া এমনি ভাব করিল যাতে মনে হইতে পারে তার পৌরুষ গুরুতর জখম হইয়াছে। কিন্তু পুনরায় শক্তি-পরীক্ষার মত সাহস জোগাড় হয় না,—তাছাড়া এ বিষয়ে 'মানবের শত্রু নারী'ও নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু তা যাই হোক, এখানে অরুণাংশু নিতান্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছে। ঘুম? অসম্ভব। যথেচ্ছা তাকান? পাগল নাকি,—তাকাইলেই তো ওটার সাথে—। না, আর পারা যাইতেছে না।

গাড়ি এখন ছোট্ট একটা ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। একটা তৃপ্তির গভীর শ্বাস ছাড়িয়া এক মিনিটে অরুণাংশু উঠিয়া পড়িল। বিছানাটা দেখিতে দেখিতে জড়াইয়া লইল। দুইটা সুটকেশ টানিয়া নামাইল। 'মানবের শত্রু নারী' বগলে। বর্ষাতিটার কথা মনে নাই। ঠেলিয়া ঠুলিয়া জিনিষপত্র দরজার কাছে উপস্থিত করিল। এ-কোঠায় আর একদণ্ড নয়,—সসর্প গৃহে বাস করা আর এখানে থাকা প্রায় একই কথা।

সুজাতা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। এখানেই নামিয়া যাইবে নাকি এ। এই অজ-পাড়াগাঁর ইষ্টিশানে। বাঃ রে, কিন্তু এ যে রেণুর দাদা, তাতে একটুও সন্দেহ নাই তার। ছবিই না হয় দেখিয়াছে সে, কিন্তু তাই বলিয়া চেনা যায় না বুঝি! অরুণাংশুর তোড়জোড়ের ঠেলায় এমন কি বাদল পর্য্যন্ত জাগিয়া উঠিল। কুলী, কুলী—, কোথায় কুলি। এ ইষ্টিশানে বাস করিতে কুলিও নারাজ। কাজে কাজেই স্বাবলম্বন প্রশস্ত উপায় এ কথাটা মনে মনে আওড়াইয়া অরুণাংশু হাতা গুটাইতে লাগিল।

বাদল খাতির করিয়া কহিল, আপনি বুঝি এখানেই

নাব্‌বেন ? কোন গাঁ এটা। শুধুমাত্র গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া অরুণাংশু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। পাশের কাম্‌রাতেই জায়গা খালি ছিল, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তার নিজের গাড়ি হইতে বিছানাটা আনিয়া এখানে তুলিল। তারপর,—এইবার সুটকেশ নিতে হইবে। উত্তেজনার আতিশয্যে গার্ডের হুইসিল তার কানে ঢোকে নাই। কিন্তু যেমনই সুটকেশ তুলিতে যাইবে অমনি,—পুঁ, কটাঙ্‌ ঘটাঙ্‌—গাড়ি ছাড়িল। আরে, এ কী মুস্কিল! বিছানাটা ও-গাড়িতে, সুটকেশ ও-গাড়িতে। যায় কোথায়। সর্ব্বনাশ, এ গাড়িটাও যে আগাইয়া যাইতেছে। হাতছাড়া হইবে না কি শেষে। নিরুপায় হইয়া অরুণাংশু ছুটিয়া আগেকার গাড়িতেই উঠিয়া পড়িল।

বিস্মিত হইয়া সুজাতা ও বাদল তাকায়। সুজাতার মুখে সেই দুষ্টু হাসি,—কারণ ব্যাপারটা যে কি, তা বুঝিতে তার আর বাকি নাই। কি অদ্ভুতরে বাবা,—এই রকম ইষ্টিশানে এক মিনিটের বেশী গাড়ি থামে নাকি কখনো। এরই মধ্যে গাড়ি বদ্‌লান,—উঃ হাসি পায়!

বাদল দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া তারপর অরুণাংশুকে কহিল, এখানে নাম্‌লেন না বুঝি ? কী বিশ্রী পাড়াগাঁ,—এখানে নাম্‌লেই মাটী। বোধ হয় ভুল করেছিলেন,—এটা আপনার জায়গা মোটেই নয়, তাই না ?

গম্ভীর অসন্তুষ্ট মুখে অরুণাংশু কহিল, হুঁ—অন্ধকারে চেনা যায় না।

সুখে থাকিতে ভূতে কিলায় বলিয়া একটা কথা আছে। অরুণাংশুর নিজের দোষ নয়, ও অশরীরী জীবটিই তাকে দুর্মতি দিয়াছিল নইলে এত হৈ-চৈ করিয়া ফল কি হইল ? বিছানা-হীন্ বার্থটাতো ? একটা বালিশ ও নাই,—বাকীটা রাস্তা সটান্ বসিয়া কাটাইতে হইবে।

কিন্তু 'মানবের শত্রু নারী' তাকে সাহায্য করিতে আসিল। কী উপাদেয় গ্রন্থ, কী গভীর জ্ঞানের পরিচয়! পড়িয়া পড়ার আর তৃপ্তি মিটে না। নারীর সমস্ত দুষ্টামি স্বামী প্রস্তরানন্দ কী সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এক সময় নিশ্চয়ই স্বামীজি নারী নিয়া নাড়াচাড়া করিতেন!

যতক্ষণ সুজাতার ঘুম আসিল না ততক্ষণ সে কৌতুক-রঙীন এক অকারণ স্নেহে পাঠ-মগ্ন অরুণাংশুর দিকে বার বার চোখ ফিরাইল। রাত্রি-শেষের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না গাড়ির ভিতর এক টুক্‌রা স্বপ্ন ডাকিয়া আনিয়াছে। ছায়া একটু, একটু আলো,—ধানের ক্ষেতের পরশ-লাগা একটু হঠাৎ হাওয়া।

দুই

মফঃস্বলের ঘোড়ার-গাড়ি একটা জীবন-মরণ ব্যাপার। প্রতিক্ষণে মনে হয়, চাকাগুলি গাড়ির সাথে বিদ্রোহ করিয়া তলা ছাড়িয়া অন্যদিকেই যেন গড়াইয়া চলিল। কিম্বা ঘোড়াগুলিই হয়ত কিছুটা দূর পর্য্যন্ত যাইয়া বলিয়া বসিল,—আর যাইব না মশায়। কিন্তু তবু এরাই ভরসা।

পরদিন ভোরে এমনি একটি গাড়িতে অরুণাংশু চলিয়াছে। তার সুটকেশ দুইটা দেখা যাইতেছে, এমন কি বর্ষাতিটা পর্য্যন্ত শেষতক ভোলে নাই। কিন্তু বিছানাটার কথা সতন্ত্র। সেটা নাই,—কিন্তু সেজন্য অরুণাংশুকে দোষ দেওয়া চলে না। নামিবার সময় ও-কাম্‌রাতে বিছানাটা খুঁজিয়া আর পাওয়া যায় নাই।

কোচ্‌ম্যান্ জিহ্বা দিয়া এক অদ্ভুত শব্দ করিয়া ঘোড়াগুলিকে দৌড়াইতে উৎসাহ করিতেছে, চাবুক শাসান ও আঘাত কোনটারই কম্‌তি নাই,—কিন্তু সে সমস্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ঘোড়াদুটি নিজের ইচ্ছাই বহাল রাখিল। কোথাও মিঠাইর দোকান,—মুদী হয়ত ঘরের ঝাঁপ খুলিতেছে, মাঝে মাঝে দু'একটা দালান,—তরকারির চুপ্‌ড়ী লইয়া পসারিণী চলিয়াছে।

মফঃস্বলের সহরগুলি শরৎকালে পূজার গন্ধে ভরিয়া ওঠে। বর্ষাতে যে হাওয়া মাতাল হইয়া বেড়াইত কোথা হইতে তাতে শান্ততার ছাপ লাগিল,—উদ্দাম প্রেমের প্রশান্তির মত। শিউলির গন্ধ আসে,—প্রভাতগুলি যেন সোনায় তৈরী। কিন্তু অরুণাংশুর খুসী মোটেই এসব কারণে নয়। সে ভাবিতেছে, যাক্ গন্তব্যস্থানে পৌছান গেল,—মা বিস্তর খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে-নিশ্চয়। আর গাড়ির এই অভদ্র ঝাঁকুনির পর তার ক্ষিধেটা যদি একটু বেশী ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তারপরই ঘুম,—সম্পূর্ণ দুদিন আর সে উঠিবে না,—অর্দ্ধেক রাত্রি

জাগিয়া কাটান চালাকি নাকি ? চোখের পাতা যে আর বশ মানে না !

গাড়ি সুস্থ শরীরেই তাকে বাড়ির সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিল। একবার মাত্র গাড়ির দেওয়ালে মাথায় ঠোকা লাগিয়াছিল,—আর কিছু হয় নাই। চাকররা আসিয়া জিনিষপত্র নামাইতে লাগিল। বারাণ্ডায় মা ও রেণুকা দাঁড়াইয়াছিল, এবং উচ্ছ্বাস-সংযত যে অভ্যর্থনা সমস্ত প্রবাসী ছেলে তাঁর মার কাছ হইতে পায় তাহা বাদ পড়িল না। ঘুমে ঢুলিয়া-পড়া চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে আসিয়া মাকে নির্ব্বাক এক প্রণাম,—কথা কহিবার মত অবস্থা তার নয়। রেণুকা দাদাকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল। কিন্তু সে অবসরটুকুও না দিয়া অরুণাংশু পাশের ডেক্‌-চেয়ারটাতে সটান্ শুইয়া চোখ বুজিল। আনন্দ করিবার কথা নয়,—সারারাত সে জাগিয়া আসিয়াছে এবং কখনো ভীত-শঙ্কিত ভাবে চাহিয়া দেখিয়াছে ঐ মেয়েটা তার দিকে মিটমিট করিয়া তাকাইতেছে ! সমস্ত রাত যেন একটা দুঃস্বপ্নে কাটিয়া গেল।

মা'র জ্বালাতনে অবশেষে অরুণাংশুকে মুখ ধুইয়া আসিতে হইল। কিন্তু চোখে জল পড়াতেও তার ঘুমান্ধতা কিছুমাত্র কমিল না। কিন্তু চা খাওয়া দরকার। চা ও খাবার টেবিলে সাজান রহিয়াছে। একটা চেয়ারে হেলান দিয়া অরুণাংশু খাইতে খাইতে ঘুমাইতে লাগিল। সমুখেই একটা চেয়ারে মা বসিয়া। বোন রেণুকা পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণাংশুর একবার মনে হইয়াছিল সে যেন শাহান্ শা, বাদশা,—চারদিকে সবাই তার অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। কিন্তু এখন শাহান্ শা'র বেজায় ঘুম পাইয়াছে। হুকুম করিবার মত অবস্থা তার নয়।

চায়ের কাপ মুখের সমুখে তুলিয়া ধরিয়া যেই একবার ঘুমে ঢুলিয়াছে অমনি খানিকটা চা ছিট্‌কাইয়া অরুণাংশুর গায়েই পড়িয়া গেল। তারা যেন বলিল,—ঠোঁট এবং পেয়ালার মধ্যে বিস্তর ফস্‌কানি ! এই উষ্ণ তিরস্কারে অরুণাংশু যেই চোখ মেলিয়া চাহিল অমনি তার হাত ফস্‌কাইয়া পেয়ালাটা পড়িবি তো পড়, রেণুকার পায়ে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, উঃ, খুন করলে,—আলীবাবার ডাকাত করলে।

অরুণাংশু চোখ বুজিতে বুজিতে কহিল, চুপ্ !

মা দেখিলেন অরুণাংশুর প্রায় আফিং খাওয়া গোছের অবস্থা। তাই বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাস করিলেন, গাড়িতে ঘুমুস নি নাকি রে ?

ঘাড় নাড়িয়া অরুণাংশু জানাইল, না।

কেন ? বার্থ রিজার্ভ করে আসতে বলেছিলুম যে।

অরুণের জবাব দেওয়ার ইচ্ছা ছিলনা,—জবাব দিবার মতন অবস্থাও তার নয়। কিন্তু মা যদি একবার মনে করেন যে সে তার কথামত বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসে নাই, তবে আর রক্ষা থাকিবে না। এমনি তাকে বকিতে সুরু করিবে যে ঘুমাইতে আর দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে অরুণাংশুর মনে খেলিয়া গেল কালরাত্তের ভয়াবহ স্মৃতি, আর মনে পড়িল 'মানবের শত্রু নারী'র লাইনগুলি,—'অজগর সর্পের খর-দৃষ্টিতে পড়িলে যেমন পশুপক্ষিগণ এক দুর্নিবার বেগে আকর্ষিত হইয়া তাহার খপ্পরে গিয়া পড়ে, তেমনি নারীর খর-দৃষ্টিতে পড়িলে নরের আর রক্ষা নাই।'

মা তখন বলিতে সুরু করিয়াছেন,—তোদের নিয়ে কী মুস্কিলে পড়েছি বাপু,—একশোবার করে লিখে দিলুম—

তাড়াতাড়ি অরুণাংশু কহিল, বার্থ রিজার্ভ করেছিলুম বৈকি।

তবে ?

কিন্তু গাড়িতে কী ছিল জান ?

কি ?

অরুণাংশু গম্ভীরভাবে কহিল, সাপ, গোখ্‌রো সাপ।

মা শিহরিয়া উঠিলেন,—বলিস কিরে, সর্ব্বনাশের কথা। সাপ এলো কি করে গাড়িতে। তারপর ?

মাটী করিয়াছে,—এর জবাব দিতে গেলে আর ঘুমাইবার আশা নাই। তাছাড়া অভ্যেস না থাকিলে তাড়াতাড়ি গল্প সাজান যায় নাকি। কিন্তু তার জন্য ভয় কি। কহিল, আর কথা বলতে পারিনা। বিষম ঘুম।

মা উঠিয়া গেলেও রেণুকা কিন্তু গেল না। দাদাকে যে জরি আনিতে বলিয়াছিল এম্ব্রয়ডারির জন্য, তা আনিয়াছে কিনা সে খোঁজটা নিতান্ত নেওয়া দরকার। শুধুমাত্র জরির অভাবে শেলাইটা সারা হইতেছে না।

অরুণাংশু এবার একবার চোখ ঈষৎ মেলিতেই রেণু কহিল, দাদা, আমার জরি এনেছো তো,—লিখেছিলাম যে।

নিরুত্তরে অরুণাংশু আবার চোখ বুজিল।

রেণুকা কহিল, শুধু বল এনেছ কি না,—আমিই খুলে নিইগে। বল না গো—

সাড়া নাই।

রেণুকা কহিল, কি, আননি বুঝি? ও দাদা?

অরুণাংশু ঘুমাইতেছে।

রেণু নাছোড়বান্দা। তার এত সাধের ফুলটার অবস্থা সঙ্কট-জনক। হয়ত মুকুলেই শুকাইয়া মরিবে! সে কহিল, বাঃ রে!

অরুণাংশু নাক ডাকিতেছে। উত্যক্ত হইয়া রেণুকা অরুণাংশুর চেয়ার ধরিয়া খুব ঝাঁকিতে লাগিল। তাতে কোনো ফল হইল না। আরো আয়াস করিয়া অরুণাংশু কাৎ হইয়া শুইল। দু-দিন আর সে উঠিবে না!

ঘুমটা হয়ত খুব গভীর হইয়াই আসিয়াছিল। আটচল্লিশ ঘণ্টার জায়গায় চারঘণ্টাতে অরুণাংশু সুস্থ হইয়া উঠিল।

এখানে আসিলে সাধারণত যে-ঘরটা তার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত সে ঘরে গিয়াই তো তার চক্ষুস্থির! এ করিয়াছে কি! বিছানায় পুরু গদী,—গদী-আলা চেয়ার, টিপয়-এর উপর ফুলদানীতে ফুল। সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই বিলাস, এই ভোগের ব্যবস্থা! হায় 'মানবের শত্রু নারী' তোমার এই অপমান। সংযম সম্বন্ধে এত উপদেশ যে এতদিন পড়িল তাকে এমন করিয়া আর কেউ মুখ-ভেঙচাইতে পারিত না। অবশ্য আগে এসবে তার অভ্যাস ছিল, এবং এটা স্বাভাবিকও ছিল। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না এর মধ্যে কত যুগ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পূর্ব্বে মূর্খ ছিল বলিয়া চিরকালই বুঝি তেমনি থাকিতে হইবে! 'মানবের শত্রু নারী' পড়িয়াছিল নাকি সে আগে কখনো।

বিছানার গদী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার বিছানায় শুধু একটা সতরঞ্চ থাকিবে,—তার উপর বড় জোর একটা চাদর থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া গদী! সর্ব্বনাশের তবে আর বাকী কত? চেয়ারটা নিজেই বদলাইয়া লইয়া আসিল,—নির্জ্জলা কাঠ ছাড়া অন্য কিছুর উপর বসিতে স্বামী প্রস্তরানন্দ মানা করিয়াছেন। ফুল-টুলে তার প্রয়োজন নাই। আর কী আস্পর্দ্ধা বল, মেমের ছবি-আলা দিন-পঞ্জিকা তার ঘরের দেওয়ালে! ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়াও অরুণাংশুর রাগ যায় না।

স্নান করিতে যাইবার আগেই সে ঘরটির এমনি চেহারা করিয়া গেল যে বাড়ির মেয়েরা দেখিয়া তো শিহরিয়া উঠিল। স্বামী প্রস্তরানন্দ হয়ত বা এমনই একটি ঘরের ছবি কল্পনা করিয়াছিলেন। ব্যায়ামবীর মুষ্টিবীর ও স্বামিজীদের ছবিতে দেওয়াল ছাইয়া গেল। হাতল ছাড়া একটা কাঠের চেয়ার ও মমতাহীন বিছানা ঘরের মধ্যে যেন অনুস্বার ও বিসর্গ উচ্চারণ করিতে লাগিল। ঘরখানা যা দেখিতে হইল তা মঠের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়াও সচরাচর সম্ভব নয়। কিন্তু এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া লাভ নাই।

দুপুরবেলা মহা আয়াসে হাতলহীন কাঠের চেয়ারে শিরদাড়া খাড়া রাখিয়া অরুণাংশু 'গীতায় ব্রহ্মবাদ' পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে একরকম তন্ময়ই হইয়া গিয়াছিল,—এমন সময় দুপুরের রোদ হেলিয়া আসিয়া তাকে খোঁচা দিল। দোতলার ঘরের এই দোষ,—সূর্য্যটা খানিকটা নিকটে হয়। কাজে কাজেই ব্রহ্মাকে টেবিলের উপর অপেক্ষা করিতে বলিয়া অরুণাংশু জানালা আটকাইতে উঠিল।

এমন সময় তার ঘরের অন্যদিকের দরজা খোলার শব্দ হইল। চমকিয়া উঠিয়া অরুণাংশু সভয়ে দেখে তার মা,—আর শুধু মা নয়, তার সঙ্গে মায়েরই মত বর্ষিয়সী এক মহিলা। মহা হাঙ্গামা হইয়াছে,—সে কি চিড়িয়াখানার জন্তু না কি যে চেনা অ-চেনা সবাইকে ডাকিয়া দেখাইতে হইবে।

পার্ব্বতীদেবী একবার অরুণাংশু ও পরে সেই বর্ষিয়সী মহিলার দিকে চাহিয়া কহিল, এই আমার ছেলে দিদি। অরুণ, দিদিকে নমস্কার কর্।

অরুণাংশু মহা ফাঁপরে পড়িল। নমস্কার করিবে যাকে তাকে? বেশ তো! কিন্তু মা যখন বলিয়া ফেলিয়াছে তখন উপায় কি। অথচ নারীকে নমস্কার! দ্বিধা করিয়া মায়ের দিকে তাকাইতেই দেখে চোখ দিয়া তিনি অবাধ্য ছেলেকে

নমস্কার করিতে ইশারা করিতেছেন। উপায়ান্তর নাই,—অন্তত মায়ের সম্মান রাখিবার জন্য দায়টা আর এড়ান যাইবে না। থাক্, এখন না হয় নমস্কারই করিল, তারপর ইনি চলিয়া গেলে মাকে জবাবদিহি করা যাইবে।

অরুণাংশুর নত মাথাটায় হাত দিয়া মায়ের বন্ধুনী কহিলেন, থাক থাক্, বেঁচে থাক। ভাল দেখে বউ আসুক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্।

এই কথায় অরুণাংশু, অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে চোখ উঠাইল। যা-তা বলিবে না কি। স্বামী প্রস্তরানন্দের কাছে এর জন্য সে কী জবাব দেবে। শুধু কি তাই? রেণুকা ঘরে ঢুকিতেছে। নিশ্চয়ই সে তার নমস্কার দেওয়া দেখিয়া ফেলিয়াছে। অপমানের ভবে আর অন্ত নাই।

রেণুকা তো ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একী,—তার সাথে এ কে? সন্দেহ নাই, কাল রাত্রের ট্রেণের সেই মেয়েটা। এরা আরম্ভ করিয়াছে কি। তার ঘরেই এদের সব ভীড় কেন? মহা জ্বালাতন!

তারপর কী ভয়ানক, অরুণাংশুর ঘরেই ওরা কন্‌ফারেন্স সুরু করিয়া দিল।

পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গেছ সুজাতা। বোর্ডিংএ ভাল করে খেতে দেয় না বুঝি?

সুজাতার জবাব শুধু এক টুক্‌রা হাসি।

সুজাতার মা সুপ্রিয়া দেবী কহিলেন, বেশী খেতে দিলেই আর কি হবে দিদি,—ওরা খাবে বুঝি? তাতে ফ্যাশান্ নষ্ট হয় যে।

এই অভিযোগের জবাবও সুজাতা দিল একটুখানি হাসি দিয়া। অরুণাংশু আর ঘরে থাকিতে পারিতেছে না। এই রকম স্থানে থাকা তার আর হইতেই পারে না,—তা হইলই বা এটা তার নিজের ঘর। কেবল পালাইতে তার পৌরুষে যা একটু বাধিতেছিল, নইলে তার অবস্থা নিতান্তই কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

সুপ্রিয়াদেবী একবার অরুণ ও পরে সুজাতার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, অরুণ বুঝি তোদের সাথে কাল এক গাড়িতেই এসেছে?

একবার অরুণাংশুর দিকে কৌতুক ভরা চোখে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুজাতা কহিল, হ্যাঁ, কিন্তু বালিশ ছিলনা বলে ঘুমুতে পারেন নি।

তোরা একটা দিলিনি কেন?

বাঃ রে।

পার্ব্বতীদেবী তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল না কি তোমাদের কামরায় একটা সাপ ছিল,—গোখ্‌রো সাপ?

গোখ্‌রো সাপ? অরুণাংশু টুথ্-ব্রাশে পেষ্ট ঢালিয়া মুখে দিল,—নিশ্চয়ই তার দাঁত কেমন করিতেছে!

বিস্মিত হইয়া সুজাতা কহিল, সাপ? কই,—না।

অরুণাংশু তখন ঘন-ঘন টুথ্-ব্রাশ চালাইতেছে। বারবার করিয়া দাঁত মাজা ভাল। তাছাড়া তার মুখও এদের সকলের হইতে অন্যদিকে ফিরিল। অরুণাংশুর দিকে বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া মা দেখেন সে প্রবলভাবে দাঁত মাজিতে মাজিতে দরজার দিকে চলিয়াছে। ব্যাপার কি! সুজাতাকে কহিলেন, তবে ও যে বল্লে সাপের জন্য সারা রাত ঘুমুতে পারে নি? সকৌতুকে সুজাতা বলিল, তাই বলেছেন না কি?

হ্যাঁ।

অকস্মাৎ প্রবল রুদ্ধ হাসিতে সুজাতার মুখটা টস্‌টস্ করিতে লাগিল। মাগো, কাণ্ড দেখ একবার! কিন্তু তার জবাব শুনিবার জন্য অরুণাংশু আর ঘরে নাই,—ইতিমধ্যে সে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

মা'রা চলিয়া গেলেও সুজাতা ও রেণুকা দুই সখী সেই ঘরেই রহিয়া গেল। রেণু সুজাতার চাইতে কিছু ছোট। ম্যাট্রিক দিয়াই পরের বার সুজাতার মত কলেজ-বর্ডিঙে থাকার সে উচ্চাভিলাষ করে। উঃ, কলেজে পড়া যা মজা!

সুজাতা কহিল, কাল গাড়িতে যা তামসা করছিল তোর দাদা,—মাগো, হেসে আর আমি বাঁচিনে।

তাই নাকি? কী করেছিলরে সুজাতাদি?

সাপ কাকে বলেছে জানিস?

কাকে?

কাকে আর আমাকে। আমার সাথে চেনা থাক্‌লে দেখাতুম।

রেণুকার ব্যাপারটা প্রায় বোধগম্য হয় না। যে সময়ে হাঁ করিলেই মেয়েরা সব কথা বুঝিয়া লইতে পারে সে বিস্ময়কর সময় রেণুকার এখনো আসিয়া পৌছায় নাই। কিন্তু সুজাতার আসিয়াছে,—একটা অজানা মন্ত্রে তার সকল কল্পনা প্রখর হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

সুবোধ বসু

নাইট্রোজেন-রহস্য

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত এম্-এস্-সি

বিশ্ববৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের সমস্ত উপাদান যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া এক মহাসত্যে উপস্থিত হইয়াছেন যে আকাশস্থ বায়ু কতকগুলি বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। যে সমস্ত গ্যাসগুলি এই বায়ুমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্ব্বন্ ডায়োক্সাইড, আর্গন্ ইত্যাদি প্রধান। দুর্ল্ভ (Rare) বা স্বল্পবিদ্যমান্ গ্যাস্গুলিকে বাদ দিলে বায়ুমণ্ডলকে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, কারণ বায়ুমণ্ডলের একশত ভাগের ৭৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ২৩ ভাগ অক্সিজেন। আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে ঐ অক্সিজেনই রক্ত চলাচলের সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন অঙ্গারকগ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া এবং নাইট্রোজেন অরূপান্তরিত অবস্থায়ই বহির্গত হইয়া আসে। এতদ্ভিন্ন এই নাইট্রোজেনকে বায়বীয় আকারে (Gaseous state) কোন জীবজন্তুর ব্যবহারে লাগিতে দেখা যায় না। সুতরাং অসীম বায়ুমণ্ডলের বিরাট ভাণ্ডারে যে এই বৃহৎ নাইট্রোজেনের ভাণ্ড নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ভাবেই রহিয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য কি, ইহা জানিবার জন্য স্বতঃই একটা কৌতুহলের উদ্রেক হয়।

বিশ্ববৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে আমরা অধুনা ধরাপৃষ্ঠে যে নৈসর্গিক অবস্থার অধীন হইয়া বিচরণ করিতেছি, তাহাতে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের মাত্রা শতকরা ২৩ ভাগ। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগ হয়, তবে আমাদের প্রাণধারণ করাই অসম্ভব হইবে। পক্ষান্তরে যদি বায়ুমণ্ডল কেবল অক্সিজেন দ্বারা গঠিত হইত, তবে আমাদের রক্তচলাচল বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের উত্তাপ এত বেশী বৃদ্ধি পাইত যে সেই অবস্থাতেও আমাদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্যগতি ছিলনা। শশক, ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণী একমাত্র অক্সিজেন সেবন করিয়া মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় আমাদের প্রাণধারণোপযোগী যে বায়ু আমরা সেবন করি, তাহাতে নাইট্রোজেনের অবস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ এই নাইট্রোজেনই অক্সিজেনকে তরলীকৃত (diluted) করিয়া বায়ুকে আমাদের দেহোপযোগী করিয়া তোলে। ধরাপৃষ্ঠে কোন স্থলেই নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের পরিমাণ সমান নয়,—স্থলবিশেষে তাহাদের পরিমাণের ইতরবিশেষ হইতে দেখা যায়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে শতকরা ১২ ভাগ অক্সিজেন থাকিলেও মানুষ বা ইতরপ্রাণী সেই বায়ু সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু কোনও প্রকার প্রদীপ ঐ বায়ুতে প্রজ্জ্বলিত থাকিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবদেহে বা উদ্ভিদ্দেহে নাইট্রোজেনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং নাইট্রোজেন ভিন্ন যে জীব বা উদ্ভিদ্ দেহের সম্যক্ পরিপুষ্টি হয়না, ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য এই যে এই নাইট্রোজেন কোথা হইতে আসে? ইহা কি আকাশস্থ নাইট্রোজেন যাহা আপাত-দৃষ্টিতে অকর্ম্মণ্যভাবে আকাশের ২/৩ অংশ স্থান দখল করিয়া আছে? ইহা বুঝিতে হইলে একটু রহস্য উদঘাটন করা দরকার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ সাক্ষাৎ ভাবে (directly) নাইট্রোজেনকে আহরণ করিতে সমর্থ হয়না। ইহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয় যে যখন আকাশে কালবৈশাখীর সঙ্গে সঙ্গে মেঘে মেঘে তুমুল ঘর্ষণ হইয়া বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের সৃষ্টি হইতে থাকে তখনই আমাদের একান্ত অগোচরে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী হইয়া এই নাইট্রোজেন আকাশ হইতে ধরাবক্ষে অবতীর্ণ হয়। মেঘ-ঘর্ষণের ফলে যে বিজলীর উৎপত্তি হয়,

এই বিজলী আকাশস্থ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনকে জলে দ্রবণীয় কয়েকটি যৌগিক গ্যাসে পরিণত করে। তৎসঙ্গে অ্যামোনিয়া নামক একটি জলে দ্রবণীয় গ্যাসও উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিধারার সঙ্গে এই গ্যাসগুলি জলে গলিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসে এবং মাটীতে যে সোডা ও পটাস্ নামক পদার্থ আছে, তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া 'সোডা ও পটাস্ নাইটার' নামক লবণের সৃষ্টি করে। উদ্ভিদ্‌গণ রসের সহিত এই লবণগুলিকে স্বশরীরে টানিয়া লইয়া দেহ পরিপুষ্টি করে। উদ্ভিদ্‌দেহে ঐ লবণ সকল আরও অধিকতর মিশ্র পদার্থে পরিণত হয়। প্রাণীগণের উদ্ভিদ্ ভক্ষণের ফলে প্রাণীর দেহে ঐ নাইট্রোজেন সংযুক্ত মিশ্র পদার্থ (complex compound) সঞ্চারিত হয়। এই ভাবে দেখা যায় আকাশের নাইট্রোজেন বায়বীয় অবস্থা ত্যাগ করিয়া জীবদেহে একটি জটিল পদার্থে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

এক্ষণে দেখা যায় যে প্রতিনিয়ত প্রতিবর্ষারম্ভে এইভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইতেছে এবং উদ্ভিদ্ ও জীবগণ প্রতিদিন সেই নাইট্রোজেনকে কোনও না কোন আকারে আত্মসাৎ করিতেছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ ক্রমাগত আত্মসাৎ করার ফলেও বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষিত হইতেছে। কালের বিবর্ত্তনে যে সকল উদ্ভিদ্ ও জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ক্রমিক গলন ও পচন ক্রিয়ায় এক প্রকার বীজাণুদ্বারা অত্যন্ত জটিল এমোনিয়া জাতীয় যৌগিক পদার্থে পরিণত হয়। তৎপর ঐ জটিল পদার্থের এক অংশ "নাইট্রিক ও নাইট্রাস্" ফার্ম্মেণ্ট নামক দুই প্রকার বীজাণুদ্বারা উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী দুই প্রকার লবণে পরিণত হয়। এতদুল্লিখিত ফার্ম্মেণ্ট (ferment) দুইটি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভিনাগ্রেড্‌স্কি নামক বৈজ্ঞানিক স্বতন্ত্রভাবে পরিদর্শন করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বীজাণুদ্বয়ের প্রক্রিয়া দ্বারা মৃত্তিকায় সার সংগ্রহ হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত জটিল পদার্থের বাকী অংশ নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হইয়া আকাশে পলায়ন করে। পলায়িত নাইট্রোজেনও পুনরায় বিজলী সংযোগে বন্দীকৃত হয়। এইভাবে একই নাইট্রোজেন আকাশ হইতে উদ্ভিদ্‌দেহে, তৎপরে জীবদেহে সঞ্চারিত হইয়া, পুনরায় আকাশেই গমন করিয়া তথায় সমতা রক্ষা করিতেছে। নাইট্রোজেনের এই চক্রাকার পরিবর্ত্তনটিকে (Nitrogen cycle) লক্ষ্য করিয়া একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন:—

Today a nitrogen atom may be throbbing in the cells of the meadow grass; to-morrow it may be pulsating through the tissues of the living animal. The nitrogen atom may afterwards rise from decaying refuse and stream to the upper regions of atmosphere, where it may be yoked with oxygen in a flash of lightning and return as plant food to the soil in a torrent of rain; or it may be directly absorbed from the atmosphere by the soil and there rendered available for plant food by the action of symbiotic bacteria. Thus each nitrogen atom has doubtless undergone a never ceasing cycle of changes through countless aeons of time.

উপরোল্লিখিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন জীব ও উদ্ভিদ্ দেহের পরিপুষ্টির জন্য সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। আমরা জমিতে যে সব সার প্রদান করি, তাহা কি ভাবে ও কি আকারে উদ্ভিদ্ দেহে প্রবেশ করে, এই তথ্য বৈজ্ঞানিকগণ নিরূপণ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ আকারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত সার যদি সাধারণ-প্রযুক্ত সারের বদলে ব্যবহার করা যায়, তবে নিশ্চয়ই অল্পায়াসে প্রচুর শস্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে কিছুদিন পূর্ব্বে এক আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং যাহাতে নাইট্রোজেনকে অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য করা যাইতে পারে, ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়। মাটী হইতে আমরা সহজ উপায়ে নাইট্রোজেন পাইলেও বৈজ্ঞানিকগণ আকাশস্থ নাইট্রোজেনের বিরাট ভাণ্ডেই হস্তক্ষেপ করিলেন। কি উপায়ে আকাশের নাইট্রোজেনকে মানুষ স্বীয় চেষ্টায় বন্দী করিতে সুরু করিয়াছে, ইহার ইতিহাস আলোচনার পূর্ব্বে, কি কি উপায়ে আমাদের উপযোগী নাইট্রোজেন সরবরাহ হইতেছে, ইহার আলোচনা একটু করা দরকার।

প্রথমতঃ দেখা যায় যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে সুসমৃদ্ধ সারের প্রয়োজন। এই সব সার বিভিন্ন

দেশে বিভিন্ন পদার্থ হইতে সংগ্রহ করা হয়। আমাদের দেশে মনুষ্য ও গো-মহিষাদি প্রাণীর মূত্রপুরীষই সাররূপে গণ্য হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দেশে অন্যান্য অনেক সহজলভ্য ও লাভজনক সার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রে এত প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হইতেছে যে তথাকার শস্যসমৃদ্ধি আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এই সহজপ্রাপ্য নাইট্রোজেন সম্ভূত সারের উৎসগুলি মুখ্যতঃ এই : (১) কয়লার খনি ও গ্যাসের কারখানা (২) চিলি প্রদেশের নাইটার লবণের খনি (৩) গোময় ও অন্যান্য পশ্বাদির পুরীষ (৪) বায়ু-মণ্ডলের নাইট্রোজেন এবং (৫) কৃত্রিম ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থিরীকৃত (fixed) নাইট্রোজেন।

পাথুরিয়া কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার আজকাল সকলেরই পরিজ্ঞাত। কয়লা হইতে উদ্ভূত যে গ্যাসদ্বারা আজকাল সহর ও সহরতলী সমূহ আলোকিত করা হয়, সেই গ্যাস কয়লাকে পরিশ্রুত করিয়া করা হয়। পরিশ্রুত করার সময় অন্যান্য বহু পদার্থের সঙ্গে এমোনিয়া নামক গ্যাসও বহির্গত হয়। এই গ্যাসকে সাল্‌ফিউরিক্ এসিডে গলাইয়া এমোনিয়াম সালফেটে পরিণত করা হয়।

এই লবণ ক্ষেতে সারস্বরূপ ব্যবহার করা যায় এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কাজে লাগানো যায়।

নাইট্রোজেনের দ্বিতীয় উৎস 'নাইটার' নামক লবণ। প্রতিদেশেই এই লবণ কম বেশী পাওয়া যায়। পেরু, বলিভিয়া, চিলি প্রভৃতি বৃষ্টিহীন প্রদেশে ইহার বিরাট বিস্তৃত খনি আছে। পৃথিবীর সমস্ত নাইটার এইখান হইতে বেশীর ভাগ সরবরাহ করা হয়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কয়েক শত মাইল ব্যাপী এই খনি হইতে সারোপযোগী শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ সমৃদ্ধ লবণ বাজারে চালান হইতেছে। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় ২৫০০০ টন নাইটার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী করা যায়।

নাইটার লবণ এই খনি ভিন্নও অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত হইবার উপায় আছে। এইজন্য যে ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, ইহাকে Nitre plantation বলে। গো-মহিষাদি পশুর মল একত্রে একটি গর্ত্তে জমা করা হয়; এই গর্ত্তের চারিদিক মাটী দিয়া ঈষদুন্নত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। নানাবিধ বীজাণুদ্বারা পচন ক্রিয়ার ফলে এই মলমূত্র প্রভৃতি নাইটার জাতীয় লবণে পরিণত হইয়া উপরে জমা হইতে থাকে। ক্রমাগত এই লবণ উপর হইতে চাঁছিয়া ফেলা হয়; এইভাবে নাইটার লবণ প্রস্তুত হয়। সার ভিন্নও নাইট্রিক এসিড্ এবং বন্দুকের বারুদ প্রস্তুত করিতে নাইটার লবণ ব্যবহৃত হয়। নেপোলিয়ানের যুদ্ধের সময় বারুদ প্রস্তুত করার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত নাইটার সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ফরাসী রাজ্যে প্রচুরভাবে এই নাইটার plantation প্রচলন করেন। যুদ্ধের পর ঐ সব plantation উঠাইয়া দেওয়া হয়; কারণ, তখন ফরাসীরা সস্তায় বাঙ্গালা হইতে এই লবণ আমদানী করিতে পারিত। আজকালও বঙ্গদেশের অনেক স্থলে এই লবণ উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত করা হয়।

অতি পুরাকাল হইতেই কৃষক সমাজে ইহা পরিজ্ঞাত যে, কোন কোন শস্য ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা ভীষণভাবে নষ্ট করে এবং কোন কোন শস্য জমির উর্ব্বরতা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করে। মটর ছোলা কলাই প্রভৃতি শস্য জমিতে বপন করিলে তাহারা জমির উর্ব্বরাশক্তির হানি না করিয়া বরং তাহা বৃদ্ধি করে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে H. Hell নামক বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করিলেন যে একজাতীয় বীজাণু এই সকল গাছের শিকড়ে বাস করে। এই বীজাণুসকল শিকড়ে এবং তৎসান্নিধ্য ভূমিতে থাকিয়া বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে বৃক্ষের খাদ্যোপযোগী করিয়া দেয়। Hell এই সকল বীজাণুকে Symbiotic bacteria বলিয়া অভিহিত করেন। জমির উর্ব্বরা শক্তির বৃদ্ধির জন্য ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে Noble এবং Hilner নামক দুইজন বস্তুবিদ্ এই জাতীয় 'Nitrogen fixing' বীজাণু বিক্রয় করিতে সুরু করেন। জমিতে এই সকল বীজাণু প্রয়োগের ফলে বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই, তবে দেখা গিয়াছে যে পেপ্টোন্ ও গ্লোকোজ সহ যদি বীজাণু প্রয়োগ করা যায়, তবে কতগুলি বিশিষ্ট শস্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

বিশ্বসভ্যতায় বিজ্ঞানের আধিপত্যের ফলে বৈজ্ঞানিক

উপায়ে আজকাল মানবের অধিকাংশ কার্য্যই সাধিত হইতেছে। একদিকে মানুষ মারিবার জন্য বিজ্ঞান যেমন আপন হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে মানুষকে বাঁচাইবার জন্যও ইহার বিন্দুমাত্র নিশ্চেষ্টতা নাই। যেই নাইট্রোজেনকে বিভিন্ন উপায়ে বন্দী করিয়া মানুষ নিজের দেহের পরিপুষ্টির উপায় করিতেছে, তেমনি আবার সেই নাইট্রোজেন-জাত জিনিষদ্বারা মানুষকে হত্যা করিবার উপায়ও উদ্ভাবন করিতেছে। বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে নাইট্রিক এসিডের আবশ্যক হয়; আবার ইহা দ্বারা জমির সারও প্রস্তুত করা যায়। এখন কি ভাবে সহজ উপায়ে এই দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, ইহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলে প্রধানতঃ চিলিয়ান নাইটারের প্রতিই বিভিন্ন জাতির লক্ষ্য পতিত হইতে লাগিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চিলিয়ান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত এক কমিশনের রিপোর্টে ইহা প্রকাশ করা হয় যে যদি এই হারে প্রতি বৎসর নাইটার consume করা হয়, তবে আগামী ৬০।৬৫ বৎসরের মধ্যে চিলিতে নাইটারের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকগণের অভিনব চেষ্টার ফলে অধুনা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে বন্দী করা হইয়াছে। ইহাকে Fixation of Nitrogen বলে। এই প্রসঙ্গে Sir William Crookes লিখিয়াছেন :—The fixation of Nitrogen is vital to the progress of civilized humanity and unless we can class it among the certainties to come, the great caucasian race will cease to be foremost in the world and will be squeezed out of existence by the races to whom wheat en bread is not the staff of life.

গত কয়েক বৎসরের বৈজ্ঞানিক সাধনার ফলে যে কয়েকটি উপায়ে নাইট্রোজেনকে স্থিরীকৃত করা হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ এই :—(১) কার্ব্বাইড্‌কে শুষ্ক নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া উহাকে ক্যাল্‌সিয়ম্ সায়েনামাইডে পরিণত করা (২) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনকে উত্তাপের সাহায্যে সংযুক্ত করিয়া এমোনিয়াতে পরিণত করা এবং (৩) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনকে তাপের সাহায্যে সংযুক্ত করা। এই তিনটি উপায়ের মধ্যে শেষোক্ত উপায় দুইটি বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। এস্থলে তৃতীয় পদ্ধতিটির কিছু আলোচনা করিব।

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সাধারণতঃ সংযুক্ত হয় না; কিন্তু অতিরিক্ত তাপ প্রয়োগ করিলে ইহাদিগকে সংযুক্ত করা যায়। আবার অত্যধিক তাপ প্রয়োগ করিলেও সংযুক্ত পদার্থটির বিভেদ (dissociation) হয়। Nernst ও Haber এই দুইটি গ্যাসের সংযোজন ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে বিভিন্ন প্রকারের তাপে বিভিন্ন পরিমাণ নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric oxide) সংযোজিত হয়। যথা :—
তাপের পরিমাণ ডিগ্রী ১৮১১° ২০৩৩° ২১৯৯° ৩০০০° ৩২০০° সংযোজনের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ·৩৭% ·৬৪% ১·৯৭% ৪·১৫% ৫·০০%

তাঁহাদের গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে যদি ৩৫০০° ডিগ্রী উত্তাপ রাখা যায়, তবে অন্ততঃ ৫ পার্সেণ্ট নাইট্রিক অক্সাইড সংঘটিত হয়। এত অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইলে কোন কয়লার চুল্লীদ্বারা উহা সম্ভবপর নয়, সেজন্য বৈদ্যুতিক উপায়ে তাপ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য শক্তিশালী জলপ্রপাতের প্রয়োজন; জলের শক্তিকে অবলম্বন করিয়া ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্, জার্ম্মানী, নরওয়ে, ইটালী প্রভৃতি স্থানে কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। এই সব কারখানায় এত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করা হয় যে, যেই স্থলে উপরোক্ত রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেই স্থলটি যেন ঠিক জলন্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই সংযোজন ক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রকার কটাহের (furnace) প্রচলন আছে। গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ১২০০০০টন ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৩৬৩০০০টন এসিড প্রস্তুত হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়ায় জার্ম্মানী প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ টন এসিড্ প্রস্তুত করে এবং সমস্ত ইউনাইটেড্ কিংডমে হয় ৬০০০০ টন। বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত পরিমাণ এসিড্‌গুলি সমস্তই সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় না; বিস্ফোরক দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্যই অর্দ্ধেকাধিক ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত দেশ; ভারতের আকাশে নাইট্রোজেনের ভাণ্ডটি কোন হিসাবে দরিদ্র নয়। নাইট্রোজেন ক্রমাগত ব্যয়িত হইলেও আমাদের নাইট্রোজেন নামক মহাসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার কোন কারণ নাই। এদেশে জলপ্রপাত, ধনবল বা জনবলের অভাব নাই; অথচ যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভগবদ্দত্ত এই সহজপ্রাপ্য জিনিষটিকে বন্দী করিয়া 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম' খাদ্য বিধান করা যাইতে পারে, সেই যত্নের যথেষ্ট অভাব আছে। দেশীয় শিল্পের প্রতি যাহাদের অনুরাগ আছে, তাহারা এই দিকে সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত

দৈন্য

শ্রীইন্দ্রভূষণ সেন

নরেনের সাথে হরেনের দেখা বছর তিনেক পরে।
কহিল হরেন, "ভালো আছো, দিন চলেছে কেমন করে?"
কহিল নরেন, "আর ভালো দাদা, বিধাতা বিমুখ ভারি!
দৈন্যের মাঝে পয়সার দায়ে খোকাটাও গেল ছাড়ি;
ওষুধের জল এক ফোঁটাও ত পারি নাই দিতে মুখে;
খুকিটাও ভাই জ্বরে মর মর, আছি কি তেমন সুখে?
ভোরবেলা হ'তে হাটখোলা থেকে কালিঘাট আসি হাটি;
মাটির পথেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথাটাই করি মাটি।
এ পথে ওপথে ঘুরা ফেরা সার চাকরী জোটেনা কিছু,
আশার গেহেতে আগুন জ্বালায় শনির দৃষ্টি পিছু।
মনে হয় ভাই, কাঙালের বেশে বাঁচিবই আর কেন,
মাতার মতন রয়েছে দাঁড়ায়ে মরণ-দেবতা হেন।"
কহিল হরেন, "আমরাও ভাই নহিকো তেমন সুখী;
কেস্‌লি দিয়েছি, হারের জন্তে কেঁদে হ'ল খুন খুকি।
গিন্নী বলেন, 'সোণার চিরুণী, ব্রেস্‌লেট তার চাই,
ওগুলো হয়েছে অনেক পুরাণো, পিতল যেন গো ছাই।'
এই সব দিতে কম্‌তি হ'লেও হাজার দুয়েক যাবে;
নাহ'লে তাদের হুকুম তামিল মাথাটি আমার খাবে।
সেদিন গিয়েছে মায়ের শ্রাদ্ধে নগদ হাজার টাকা;
মাসের কাবারে দু'শেরে থলেটি একেবারে হয় ফাঁকা।
কষ্টে-সিষ্টে কোনও রকমে সংসারটা যে চলে,
যারে বলে লোকে ঘোলের তৃষ্ণা মিটানো যে ভাই জলে।
চাকরীতে ভাই সুখ নাই মোটে ব্যবসার দিকে ঝোঁকো,
শুধু শুধু ব'সে কয়দিন যাবে? মিছে আর ঘুরোনাকো।
ব্যবসার মাঝে লক্ষ্মীর স্থিতি শাস্ত্রের কথা শুনি,
স্থির ক'রে ফেল মনটা তোমার ভাল ও মন্দ গুনি।"
ব্যথায় বিকল বেকার নরেন, বিষে জর্জ্জর তনু।
শুনে তার কথা মনে পায় হাসি, "এসেছে কলির মনু,
এমনি অনেক বুদ্ধিদাতারা উপদেশ খুব জানে;
পয়সার বেলা কহিবে না কথা শুনিবে না মোটে কানে।
ভিক্ মাগি যার জোটেনা অন্ন, দৈন্যের দায়ে সারা,
নীতির বচন শাস্ত্রের বুলি মিথ্যাই শুধু খাড়া।"

মূর্ত্তি পূজা

শ্রীপিনাকী লাল রায়

যখন কোন পুরাতন ধর্ম্মের আচার পদ্ধতিতে বিকৃতি বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে, তখনই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ স্বরূপ একটা নূতন ধর্ম্মের উদ্ভব হয়। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্ম, মুখ্যভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিবাদ। মানুষ ছাড়া মানুষের আত্মাছাড়া যে একটা স্বতন্ত্র ধাতা-পাতা-স্রষ্টা-পরমেশ্বর আছেন, ইহাই বুঝাইবার জন্য খৃষ্টান ধর্ম্মের উদ্ভব। বৌদ্ধ অজ্ঞেয়তাবাদের (aquosticism) প্রতিবাদ হইতেছে খৃষ্টান ঈশ্বরবাদ (Theism)। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রথম উদ্ভব কালে মূর্ত্তি বা প্রতীক পূজার তেমন তীব্র বিরোধ ঘটানো হয় নাই। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানগণ অনেকটা পৌত্তলিক,—ইসলাম ধর্ম্ম এই পৌত্তলিকতার ঘোর প্রতিবাদ। আরবে ইসলাম ধর্ম্ম উদ্ভবের পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল। হুণ ও তাতারগণ বৌদ্ধ ছিলেন,—পারসীক ও ইরানীগণ অগ্নিপূজক ও তান্ত্রিক ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্ম, এই বৌদ্ধ ও তন্ত্রধর্ম্মের প্রতিবাদ স্বরূপ। মুসলমানের মসজিদে কোন ছবি বা কাহারও প্রতিমূর্ত্তি শোভার্থেও রাখিতে নাই,—গৃহশোভার হিসাবেও পক্ষী বা মৃগ বা ফলফুলের আলেখ্য অঙ্কিত করিতে নাই। মোসলেম্ ধর্ম্মের মতন পৌত্তলিকতার এমন তীব্র প্রতিবাদ জগতে পূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছিল কিনা, তাহা বলা যায় না। আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যেখানে মোসলেম্ গিয়াছে, সেইখানেই মূর্ত্তি বা দেব প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে, দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার উপর মসজিদ গড়িয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণেরও মত এই যে, বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের আর্য্যবর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে আধুনিক হিসাবের মূর্ত্তি-পূজার প্রচলন ছিল না। বৈদিক ধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে দ্বিজাতি মাত্রই যাগযজ্ঞ করিতেন, গৃহে গৃহে অগ্নিহোত্রী বিরাজ করিতেন, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য সর্ব্বব্যাপী হইয়াছিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে মূর্ত্তি পূজা নাই, মীমাংসা-শাস্ত্রে প্রতিমা নির্ম্মাণের এবং প্রতিমা পূজার কোন পদ্ধতির উল্লেখ নাই। অনেকে অনুমাণ করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষব্যাপী হইলে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির পূজা এদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। পরে বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিকগণ প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, নীল সরস্বতী প্রভৃতির পাষাণময়ী মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। তবে তাহারা গৃহে গৃহে উৎসব উপলক্ষে মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিতেন না। তাঁহারা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, সেই মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং বৌদ্ধ নরনারীগণ প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা মন্দিরে যাইয়া দেবতার পূজা আরতি করিয়া আসিতেন। তাহার পর বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিলে যে নব হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সে ধর্ম্মের ধার্ম্মিকগণ বৌদ্ধ প্রথা অনুসরণ করিয়া মন্দিরে বা মঠে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করিয়া আসিতেন। বৌদ্ধ যুগাবসানের পর সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নাটকনাটিকা লিখিত হইয়াছে, সে সকল পুস্তকে মন্দিরে যাইয়া পূজার পদ্ধতির উল্লেখই আছে। এখনও ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই, বাঙ্গালার মতন, মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করা হয় না। মৃণ্ময়ী প্রতিমার পূজা বাঙ্গালায় যেরূপ সাধারণভাবে প্রচলিত, এমন মূর্ত্তি পূজার প্রচলন ভারতবর্ষের আর কোন দেশে বা জাতির মধ্যে নাই।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্রধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের মতন পুরাতন এবং সনাতন। শিবলিঙ্গ পূজা কেবল ভারতবর্ষে কেন, এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার বহু দেশেই বহু যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া প্রচলিত



‘ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে”

বিচিত্রা
ভাদ্র, ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীখগেন রায়

ছিল। পুরাতন মিশরী, রোমক, যবন, অসুর প্রভৃতি বহু পুরাতন জাতির মধ্যে শিবলিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল। পুরাতন বাবিলনে ও তাতার দেশে লিঙ্গ পূজা হইত। অনার্য্য বর্ব্বর জাতি সকল ত অনাদি কাল হইতে ভূত প্রেত ও মূর্ত্তি পূজা করিয়াই আসিতেছে; আর্য্যজাতির বহুশাখার মধ্যে মূর্ত্তি পূজা বা প্রতীক পূজার প্রচলন ছিল। অতএব বলিতে হয় যে, যাগ যজ্ঞ, হোম জপ, যেমন সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, প্রতিমা বা প্রতীক পূজাও তেমনি সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। সুতরাং নিগমাগম বা তন্ত্রের ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্মের সমসময় কালের বলিলেও চলে, বোধ হয় বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পুরাতন হইলেও হইতে পারে। এই সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের বিশ্বাস যে, শ্বেতাঙ্গ আর্য্যদিগের উদ্ভবের সময়ে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণাঙ্গ আর্য্যও একদল ছিল। বেদে কৃষ্ণাঙ্গ আর্য্যদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহারা ইরাণ বা পারস্য দেশ হইতে বাহির হইয়া বর্ত্তমান কাবুলের উত্তর উপত্যকা বাহিয়া, "তাগলামাকান্" অধিত্যকা হইতে কাশ্মিরে নামিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; পরে কাশ্মীর হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ বাহিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে গান্ধার সুবাস্তু হইয়া লাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ পর্য্যন্ত ইহাদের বিস্তার ঘটিয়াছিল। ইহারাই নাকি ভারতবর্ষে তন্ত্রধর্ম্ম আনয়ন করে। ইহারাই আদিম বর্ব্বরগণের পৌত্তলিকতা, তন্ত্রধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লয়। সুতরাং এই অনুমাণ বা থিওরি সত্য হইলে বলিতে হয় যে, মূর্ত্তিপূজা বৈদিক যজ্ঞধর্ম্মের সমসময়ের এবং সনাতন।

কোনো তন্ত্রে পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি, পূজার বিষয়ীভূত নহে; উহারা প্রতীক আলম্বন—ধ্যানের সহায়ক মাত্র। তবে সাধু মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার চিহ্ন বা স্মারক হিসাবে পূজ্য এবং সেব্য। যেমন শাক্যসিংহের, জামদগ্ন্যের, জড়ভরতের দত্তাত্রেয়ের প্রতিমা পূজা করিতে হয় প্রতিমারই হিসাবে—সাধুসজ্জনের প্রতিমূর্ত্তির হিসাবে, প্রতীক বা আলম্বনের হিসাবে নহে। এক্ষেত্রে প্রতিমাই পূজ্য; কেননা ঐ সকল সাধু মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্যই তাঁহাদের প্রতিমা গড়াইয়া রাখিতে হইয়াছে। পরন্তু ঈশ্বরোপাসনায় যে প্রতিমার পূজা করিতে হয়, তাহা প্রতীকের হিসাবেই করিতে হয়। কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা॥"

ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপই এক। যেমন জমা ঘি এবং তরল ঘি দুইই ঘৃত, কেবল অবস্থান্তর মাত্র। তেমনি চিন্ময় ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম দুইই একরূপ। কারণ পূজক যিনি তিনি আত্মাবান পুরুষ; তাঁহার সোপাধিক আত্মা পরমাত্মার সহিত মিশিতে চাহে; তাই সে উপাসনা করিতে উদ্যত হয়। সেই উপাসনার সহায়তার জন্যই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিতে হয়। যেমন কোদাল কুড়ুল লইয়া বন কাটিয়া রাজপথ তৈয়ার করিতে হয়, তেমনি প্রতিমা, পূজার উপাচার, পত্র পুষ্প ফল গন্ধদ্রব্য, বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে উপাসকের ভক্তির পথ প্রশস্ত করিতে হয়। "তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম, স্ত্রী পুংরূপং ধত্তে।" ইহাই হইল মূর্ত্তিপূজার গোড়ার কথা।

উপনিষদে দেবী সূক্তে যেমন আমিই সব, আমা হইতেই সব—এই তত্ত্বের উপর তন্ত্রধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছিল, খৃষ্টানের ঈশ্বরবাদে তাহা চাপা পড়িয়া যায়। আমা হইতে প্রবলতর, প্রবীণতর একটা শক্তি আছে। তিনি ইচ্ছাময়, শক্তিময়, কৃপাময় মহাপুরুষ—তিনিই ঈশ্বর। জীব-মানুষ এই ঈশ্বরের কিঙ্কর-সেবক-দাসানুদাস। ঈশ্বর সকলের প্রভু—বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। এই ভাবটা প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাব হইতেই রামানুজাচার্য্যের কৈঙ্কর্য্যবাদ ও সেবাপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, রামানুজাচার্য্যের কাল হইতে শ্রীচৈতন্যের কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের তলায় প্রচ্ছন্নভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকল লুকান আছে। তাঁহারা বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত তন্ত্র ও উপনিষদের আত্মপ্রধান অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ধর্ম্ম, ভারতবর্ষে প্রবল ছিল। তাহার পর যত বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, সে সবই খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকলের সহিত আপোষ মাত্র। যেখানে আত্মা ছাড়া অন্য একটা ঈশ্বরের উপকল্পনা হইয়াছে, সেই খানেই বৈদেশিক প্রভাব বিরাজ করিতেছে বুঝিতে হইবে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভাবময় দেবমূর্ত্তির পরিকল্পনা এণ্টিওকের আর্ম্মিনিয়ান খৃষ্টান বুধগণের সিদ্ধান্তের ছায়া মাত্র। এ কথাটা সত্য কি না, তাহা বলিতে পারিনা। তবে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খৃষ্টান ও মোসলেম্ ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জানেন। এ সাদৃশ্য কোথা হইতে আসিল, কেন হইল, তাহা এখনও কেহ খুলিয়া দেখাইতে পারে নাই।

তন্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, আত্মাই আমাদের উপাস্য। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পদার্থ বলিয়া তন্ত্র মনে করেন না। তন্ত্র বলেন, ভাষায় তেমন করিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু একবার সাধনা করিয়া দেখ দেখি, আত্মার আস্বাদন পাইলে কি অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়! যে বুঝিয়াছে সেই মজিয়াছে! পরমাত্মায় ও দেহাবচ্ছিন্ন আত্মায় যে ভেদ নাই তাহা যে বুঝিয়াছে সেই মজিয়াছে, তবে যে ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই মায়া—মিথ্যা মাত্র। এই মায়াজাল ছেদ করিয়া আত্মা ও পরমাত্মার মিলনানন্দের জন্যই সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু "বিনা চোপাসনাং দেবি ন দদাতি ফলং নৃণাং"—বিনা উপাসনায় মনুষ্য কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। সে উপাসনা কি ও কেমন? এক—আত্ম আরাধনা; দ্বিতীয়—পূজাপাঠ স্তুতি গীতি এবং রসাশ্রিত ভাবের উপাসনা। আত্ম আরাধনায়—কাম ও মদনতত্ত্ব, নাম ও রূপতত্ত্ব, জপযজ্ঞ, শক্তিসাধনা, ষট্‌চক্রভেদ, শবসাধনা প্রভৃতি। আর পূজাপাঠ স্তবস্তুতির মধ্যে—খাঁটি মূর্ত্তিপূজা, প্রবৃত্তি মূলক পূজা ও শেষে নিষ্কাম উপাসনা। এই উপাসনায় ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি, অগণ্য প্রতিমা আছে। এই উপাসনায় দেশভেদে জাতিভেদে নানা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিপূজার মধ্য দিয়া অদ্বৈত-বাদের প্রাধান্যই ঘোষিত হইয়াছে। তথাচ দ্বৈতভাবে পূজা করিতে তন্ত্র কোথাও কোন স্থানে কোন বাধা দেননি। "যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যাহার যেমন ভাবনা, যেমন রুচি, তাহার তেমন ভাবেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহাই তন্ত্রের অনুশাসন। তন্ত্রে যেখানে যত দেবদেবীর পূজা পদ্ধতির উল্লেখ আছে, সেইখানেই স্তবের আবরণে অদ্বৈত-বাদের সিদ্ধান্ত সকল বেমালুম চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। গণেশ, শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, সূর্য্য—যাহার স্তব পাঠ করিবে, তাহাকেই সর্ব্বময় ও অদ্বৈত তত্ত্বের আধার স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সকলেই সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বরূপময়, সর্ব্বসাক্ষী ও সনাতন। আসল কথা—সবাই এক, এক পরমাত্মার, এক আত্মার, বিভিন্ন পাত্রানুসারে, ভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যঞ্জনা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে আছেন এক পরমাত্মাই—আর সব তাঁহার উপর উপাসকের আরোপিত ভাবের ছায়া মাত্র। সাধকের কল্পনা ছাড়া তাহাদের অন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যখন যে ভাবের উপাসনা করিতে হয়, তখন সেই ভাবকে বাড়াইয়া তুলিতে হয়। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখে। পুত্র মায়ের কোলে শুইয়া মায়ের মুখ যেমন দেখে এমন মিষ্ট ও মধুর আর কিছু দেখে না; প্রণয়ী যুবক প্রণয়িণীকে যত সুন্দরী ও মাধুর্য্যময়ী দেখে এত আর কিছুই দেখে না। যেখানেই ভাব, যেখানেই আসক্তির কেন্দ্র, সেইখানেই ভাবুকের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও সুন্দর বোধ হয়;—সে তেমন আর দেখে নাই—তেমন আর দেখিবে না। তেমনি ভাবের দেবতা প্রকৃত ভাবুকের কাছে, রসিক প্রেমিকের কাছে, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, মনোহর, শক্তিশালী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভাবের দিকের এই গুপ্ত তত্ত্বটুকু লইয়া তাহার সহিত অদ্বৈত সিদ্ধান্ত জড়াইয়া আমাদের স্তব স্তোত্র সকল রচিত হইয়াছে। তাই, যখন যে দেবতার কথা পুরাণে বা তন্ত্রে লেখা থাকে, তখন তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সুন্দর ও মনোহর বলিয়া পরিচিত করা হয়। কালীর স্তব করিতে গিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন:—

ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনুঃ॥

ইহা হইতেই মূর্ত্তি পূজার উপাসনাতত্ত্ব কেমন অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। যে কোন পুরাণ, যে কোন তন্ত্র পাঠ

কর না কেন সর্ব্বত্র এই ভাবের কথাই পাইবে। আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্ম চিন্তা সকল উপাসনার, সকল মূর্ত্তি-পূজার অন্তরালে আছে। দ্বৈতবাদীরা বলেন বটে যে, জীব শিব কখনই এক হইবে না—সাধক অনন্তকাল সেবা করিবে; কিন্তু এ কথাটা নিত্য রসাস্বাদনের লোভেই বলা হইয়াছে। 'চিনি খাইব, চিনি হইতে পারিব না'—ইহা মধুর রসলম্পট সাধকদেরই কথা।

এক্ষণে উপাসনাতত্ত্বের মধ্য দিয়া মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। এই সিদ্ধান্ত দুইটি ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রথম সিদ্ধান্ত, আত্ম-আরাধনার দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, মন্ত্র জপ দ্বারা হৃদয়পটে দেবতার শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে "দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।" তাই মন্ত্র জপ করিতে করিতে হৃদয়পটে বা চিন্তাক্ষেত্রে এক একটা মূর্ত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই মূর্ত্তিই সাধক বিশেষের ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি—তাহার আরাধ্য—তাহার উপাস্য—"বর্ণরূপেণ যা দেবী জগদাধাররূপিণী"—এই বাক্য প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়াই তন্ত্র বলিয়াছেন।

ধ্যান দুই প্রকারের—স্থূল এবং সূক্ষ্ম।—"সূক্ষ্মমন্ত্রময়ং দেহং, স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্।" সূক্ষ্মধ্যান মন্ত্রময়। মন্ত্রজপ এবং মন্ত্রের উপর একাগ্রতা, ইহা বড় কঠিন কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। স্থূলধ্যান বিগ্রহচিন্তা—রূপের ধ্যান। এই ধ্যানই সাধারণ সাধকে করিতে পারে এবং এই ধ্যানে সিদ্ধ হইলে সাধক আপনা আপনি সূক্ষ্মতত্ত্বে যাইতে পারে। অতএব "তস্মাংবীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ" এই বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিতে পারিলে সাধক নিজের হৃদয়পটে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পারেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মন্ত্রজপের একাগ্রতায় ব্রহ্মের একটা রূপ, বর্ণ ও মূর্ত্তির বিকাশ সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে স্বতঃই উদ্ভব হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গের—রসাশ্রিত ভাবের উপাসনা। বড় সাধ এই হয় যে, জগদীশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে মাতা-পিতা-গুরু-সখা-প্রভু বলিয়া ডাকি, তাঁহাকে সেইরূপে দেখিতে থাকি। আমার হৃদ্গত একাদশ আসক্তির তৃপ্তির জন্য আমি বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে চাহি। এই পিপাসা—এই উপাসনার তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য যে পূজা. পদ্ধতির নির্দ্দেশ আছে, তাহাতে দেবতার রূপ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। সেরূপ বাঙ্ময়রূপ হইতে পারে, চিত্রলেখা হইতে পারে, ধাতু নির্ম্মিত বা পাষাণ ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহা রসের রূপ—ভাবের রূপ। এইরূপে ভক্তি কেন্দ্রীকৃত হইলে, একনিষ্ঠার বিকাশ হইলে, সাধকের পরিতৃপ্তি সাধন হয়, তিনি সদানন্দ লাভ করিতে পারেন। স্তব স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে, তাহার সাহায্যে তাঁহার প্রার্থনা করিতে করিতে একটা রূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে—একটা রূপের ছাপ হৃদয়ে গাঁথিয়া যায়ই। এই ছাপ, এই আলেখ্য প্রতিমায় পরিণত হইলে উহা দেবতার বিগ্রহ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। শ্রীরামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি রামায়ণ ও ভাগবতাদি গ্রন্থের বর্ণনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেশ ভেদে, রুচি ভেদে, কলা কৌশলের প্রকার ভেদে, এই সকল মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পূজা ও উপাসনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া—ভাবোন্মেষের প্রধান সহায় বলিয়া—জনসমাহারের প্রধান উপায় বলিয়া, এই সকল মূর্ত্তি শ্রদ্ধার সামগ্রী—"যা যস্যাভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।" সাধকের অভিমত বা রুচি, প্রবৃত্তি অনুসারে এক এক দেবমূর্ত্তি তাহার ইষ্টদেবতা হইয়া থাকে।

প্রথম সিদ্ধান্ত—আত্মআরাধনায় বলা হইয়াছে যে, বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবতা বিশেষের শরীর হৃদয়-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ যথাপদ্ধতি বীজমন্ত্র অনবরত জপ করিলে স্বয়মেব—একটা মূর্ত্তির বিকাশ মনোমধ্যে হইয়া থাকে। যেমন একটা ধাতুপাত্রে জল থাকিলে এবং সেই ধাতুপাত্রের পার্শ্বের কোন স্থানে আঘাত করিলে জলে একটা কম্পন হয় এবং কম্পনজনিত একটা রূপের প্রকাশ হয়। অথবা একটা থালায় অল্প কিছু সূক্ষ্ম বালুকণা থাকিলে এবং সে থালার তলায় আঘাত করিলে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বালুকাকণাগুলি নড়িয়া ঘুরিয়া ছুটিয়া একটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করে। তেমনিই একনিষ্ঠভাবে বীজমন্ত্র জপ করিতে

থাকিলে, মনোময় আস্তরণে একটা রূপের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রত্যেক শব্দেরই একটা রূপ, একটা আকার আছে। সঙ্গীতের প্রত্যেক সুরের একটা রূপ আছে, সেই রূপ সেই সুরের দেবতা। সেই সুর আলাপ করিতে করিতে যতক্ষণ না মনোমধ্যে উহার রূপের বিকাশ হইতেছে, ততক্ষণ সে সুরে সিদ্ধ হওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্র এ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন এবং ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রূপের নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, সপ্ত স্বরেরও ভিন্ন ভিন্ন পরদায় রূপের নির্দ্দেশ আছে। বাহ্য-জগতে রূপ ফুটিবার পূর্ব্বে শব্দ ফুটিয়া উঠে। প্রথম প্রভাতে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে নিসর্গ সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গে প্রণবের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়, তারপর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের কনকরেখা আকাশক্রোড়ে ফুটিয়া উঠে। অতি ঘোর অমানিশায়, দ্বিযামার পরে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা শ্মশান ক্ষেত্রে হুঙ্কারের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়;—সে শব্দ না হইলে নিশার তমোময়রূপ ফুটে না। প্রকৃতির সকল অবস্থায় একটা করিয়া শব্দ আছে, আর সেই শব্দের অনুরূপ একটা রূপ আছে; প্রত্যেক ঋতুর রূপ আছে, ত্রিসন্ধ্যার রূপ আছে। এ রূপ যে কেবলই মানব মানবীর রূপ তাহা নহে, অন্য নানারূপের অবস্থানুসারে বিকাশ হইয়া থাকে। তবে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে প্রায়শঃ মানব মানবীর রূপের বিকাশ হয় বলিয়াই, মানুষের অনুভূতি-গম্য যাহা, তাহারই রূপ অনেক সময়ে নরনারীর রূপের মতন একটা কিছু রূপ হয়।

মানুষের দেহ একটা শব্দযন্ত্র বিশেষ। এই নরদেহকে বীণার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বীণার বহু তার বাঁধা থাকে। দেহের মধ্যেও বহু তার নাড়ীর আকারে টানা আছে। দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে,—আসক্তির সাহায্যে, গুরু সেই দেহগত বীণাযন্ত্রকে একটা সুরে, একটা গ্রামে, বাঁধিয়া দেন। সাধক সেই বাঁধা যন্ত্রে বীজ-মন্ত্রের আলাপ করিয়া থাকেন। আলাপ করিতে করিতে যখন সুর বেশ জমিয়া যায়—একটা শব্দবিভূতির সৃষ্টি হয়, তখন সেই বিভূতির অভিব্যঞ্জনা স্বরূপ একটা রূপের ছবি মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠে। ইহাকেই বলে ধ্যান-সিদ্ধ মূর্ত্তি। যেমন সকল বীণায় রাগ রাগিণী সমান ভাবে ধ্বনিত হয়না, নির্ম্মাতার নির্ম্মাণকৌশল অনুসারে শব্দ ও সুর ধ্বনিত হয়, তেমনি দেহ হিসাবে, পিতামাতার প্রকৃতি অনুসারে, বংশের ধারা অনুসারে, রূপের বিকাশ পৃথক পৃথক ভাবে হইয়া থাকে।

যাহা হউক এক্ষণে এই মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের মুনি ঋষিগণ, সিদ্ধ সাধকগণ, জপ যজ্ঞের ফলে যে ধ্যানগম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, যাহার মানসপূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, স্তব স্তোত্রের ইসারায় তাঁহারা সেই রূপের বর্ণনা লোক সাধারণের শ্রবণ গোচর করাইয়াছেন। সাধারণ পূজকে সাধকের মুখ নিঃসৃত স্তব শুনিয়া, একটা রূপের, একটা প্রতিমার কল্পনা করিয়া লইয়াছে এবং ধাতু, পাষাণ বা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহারই প্রকাশ্যে পূজা অর্চ্চনা করিতেছে। লোকহিতের জন্য সমাজে একটা ভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে, এই পদ্ধতি অনুসারে বাঙ্গালায় মূর্ত্তিপূজার প্রচলন হইয়াছে। এখন যে সিংহ-বাহিনী দশভূজা দুর্গার প্রতিমা গড়িয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি, শতবর্ষ পূর্ব্বে ঠিক এমন ভাবের প্রতিমা বাঙ্গালার কারিকর গড়িত না। গোড়ায় যখন সিংহবাহিনীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পূজা এদেশে প্রচলিত হয়, তখন কার্ত্তিক, গণেশ লক্ষ্মী, সরস্বতী কেহই ছিলেন না, তখন একা সিংহবাহিনী মহিষাসুর মথন করিতেছেন। সেকালের সিংহের চেহারা আর এক রকম ছিল। মহিষাসুরও আজ কালকার চোরা অসুরের মতন ছিল না। যাহার যেমন অভিরুচি হইয়াছে, যেমন সখ হইয়াছে, ধ্যানে যে যখন নূতন কিছু দেখিতে পাইয়াছে, তখন সে তাহাই প্রতিমার সঙ্গে বসাইয়া দিয়াছে। কারণ, আসল কথা এই যে, দুর্গোৎসবের সময়ে যে প্রতিমা গড়াইয়া, চণ্ডীমণ্ডপ জোড়া করিয়া আমরা যে উৎসব করিয়া থাকি, সে উৎসবে ঠিক সেই প্রতিমার পূজা হয় না। পূজা হয় ভদ্রকালীর, পূজা হয় পূর্ণ ঘটের; দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে। কেননা, ঘট ঐখানে পূজকের দেহঘটের অনুকল্প মাত্র। প্রতিমা বাহ্য শোভার জন্য রাখা হয় এবং লোক সাধারণের তুষ্টির জন্য উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সামান্য একটু পূজা করা হয়। বাহিরের মূর্ত্তি অবলম্বন মাত্র, লোক দেখাইবার ছবি মাত্র।

পিনাকীলাল রায়

বৈশাখের রূপ

শ্রীজিতেন্দ্র বক্‌সী

ঋতুর পরে ঋতু ফিরিয়া আসে আবার চলিয়া যায়। এই যে তাহাদের আসা এবং যাওয়া, এর জন্ত ধরণী তাহার প্রান্তরের বিস্তীর্ণতা মেলিয়া রাখিয়াছে—আর আকাশের অবাধ উজ্জ্বলতা দিকে দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। এই পটভূমির উপর সেই যাওয়া আসার ছায়ারূপ ধরে নিজস্ব বৈশিষ্টতায় এবং সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মহিমায়। সেই রূপ ফোটে কভু বৈশাখের মেঘে, কভু ঝরা কদম্ব-কেশরে, কাশফুলের হাস্ত-বিভাতে, কভু শীতের তৃণশূন্ত শস্তশূন্ত প্রান্তরের সীমাহীন-রিক্ততায়।

কাজের মানুষ থাকে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের সাথে, বাঁধা বাহিরের চক্ষু দুইটি রুদ্ধ করিয়া। বাহিরের বিস্তীর্ণ আকাশ—পাতালের বৈচিত্রময় এ ধরণীতল তাদের কাছে চিরদিন অর্থহীন—ব্যর্থ। প্রভাতের প্রথম রবি-রশ্মিটি তার পূর্ব্বদুয়ার দিয়া যে আমন্ত্রণ মেলিয়া ধরে—তাহার কাছে তাহার বাণী নাই। সন্ধ্যায় নিরালা ছাদের নির্জ্জনতায় যে তারাটি সুদূর-দিকপ্রান্তে একটি উদাস-ইঙ্গিত রচনা করে—তাহার কাছে তাহা ব্যর্থ! বর্ষার নব-ধারায় যে রজনীগন্ধা তার উঠানের একপ্রান্তে মৃদু-সুগন্ধে আনন্দ জ্ঞাপন করে—সে ভুল করিয়া একবার তাহার পানে ফিরিয়াও তাকায় না। এমনিই এই জগতের কাজের মানুষের দল!

এই কর্ম্ম-মুখর জগতের ব্যস্ত-মানুষের ভিড়ের একপ্রান্তে অকেজো-মানুষের দল আছে; প্রচুর বাধাহীন তাদের অবসর, রহস্তচঞ্চল মুগ্ধ তাহাদের মন—সময় তাদের অকাজের কাজেই পরিপূর্ণ। তারাই কবি, গীত-রসিক, ছন্দ-রসিক মানুষের-চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিবার, সুন্দর করিবার ভার তাদের উপর। চিরন্তনকালের জয়টিকা অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের প্রশস্ত ললাটে। তাহাদের উদ্দীপ্ত, মধুর বাণী অনাগত-কালের মধ্যে প্রসারিত।

তাহারাই কর্ম্ম বন্ধন-মুক্ত চির-আনন্দময় প্রাণ।

বস্তু-জগতের লোক প্রদীপ্ত বৈশাখকে কী চক্ষে দেখিয়া থাকে—তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। বৈশাখের জ্যোতির্ম্ময় রূপটি কবির চক্ষে কিরূপে ধরা পড়িয়াছে আমরা তাহাই দেখিব। বাংলা-সাহিত্যে এর রূপ কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথে কাব্যে ও গানে যেমন ফুটিয়াছে—এমন অন্ত কোন কবির কাব্যে বা অন্ত কোন সাহিত্যে দেখিতে পাই নাই।

দেখিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যাকাশ ঘন-বর্ষার মেঘ-মেদুরতার ছায়ায় ছায়াচ্ছন্ন। তবু তার মাঝে বৈশাখের উগ্রতাপক-মূর্ত্তি দেখিয়াছি—মুগ্ধ হইয়াছি।

মনে পড়ে অনেক দিনের কথা। পল্লীর-দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের পাশে আম্র-কাননছায়ে নিভৃত আলয়ে বাধাহীন অবসর! তখন ছিলাম বিদ্যালয়ের ছাত্র, নতুন কাব্য-মধুপান অনুরাগী। সেই কিশোর-বয়সের মোহ-মুগ্ধ চক্ষে পাঠ করিয়াছিলাম 'চয়নিকার' 'বৈশাখ' কবিতাটি। তপ্ত দ্বিপ্রহরে, সূর্য্য-তাপ-দগ্ধ আতাম্র আকাশে, চিল তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিয়া যায়; বহুদূর-প্রসারিত শ্যামল মাঠে মাঠে শস্ত বাতাসে বাতাসে আন্দোলিত হইতে থাকে; বেণু বন ক্বচিৎ মর্ম্মরিত হয়; নিস্তব্ধ দুপুরের প্রগাঢ় শান্তি বিদীর্ণ করিয়া বনে ঘুঘু ডাকে অফুরন্ত অক্লান্ত সুরে। চারদিকে দীপ্ত-রৌদ্রের প্রদীপ্ত আভা। এই মধ্যাহ্নে, দাহ-দীপ্ত আকাশতলে কবিতাটি যেন পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছিল একটি কল্পনা কুশল কিশোর মনের সম্মুখে।

দেখিয়াছিলাম রুদ্র বৈশাখ ধূলায়ধূসর জটাজাল উড়াইয়া তপঃক্লিষ্ট তনু মধ্যাহ্নের দুঃসহ প্রদীপ্তির মাঝখানে পিনাক বাজাইয়া ডাকিয়া চলিয়াছে।

দগ্ধ তৃণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া যেন প্রত্যক্ষ

দেখিয়াছিলাম—দীপ্তচক্ষু শীর্ণ-সন্ন্যাসী পদ্মাসনে বসিয়া আছে, রক্তনেত্র ললাটে তুলিয়া; মনে হইয়াছিল—তার সম্মুখে বিরাট চিতা জ্বলিতেছে—নিখিলের পরিত্যক্ত স্বতস্তূপ ভস্মসার করিয়া। সমস্ত-অম্বরে সেই শিখা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

এই বিরাট বৈরাগ্যের রূপ-মহিমায় সমস্ত মন সাড়া দিয়াছিল; কবির বাণী সঙ্গে বলিয়া উঠিয়াছিল—

"হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ
উদার উদাস-কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে
যাক্ নদী পার হ'য়ে যাক্ চলি গ্রাম হ'তে গ্রামে
পূর্ণ করি মাঠ॥

বলিয়াছিল—"সকরুণ তব মন্ত্র সাথে,
মর্ম্মভেদি যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক্ বিশ্ব পরে
ক্লান্ত কপোত কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে
অশ্বত্থ-ছায়াতে;
সকরুণ তব মন্ত্র সাথে॥

আজি মনে পড়ে অন্তরের ভিতর বৈশাখের যে বৈরাগ্যের বাণী আছে, তাহা সেইদিন মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া, প্রাণীশূন্য তৃণদগ্ধ দিগন্তের পারে নয়ন মেলিয়া প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছিলাম —রুদ্র বৈশাখের গম্ভীর আহ্বান-রব দীপ্ত দুপুরের তপ্ত আকাশে ধ্বনিত হইতেছে।

* * *

রবীন্দ্র-কাব্যে ও গানে বৈশাখের যে অনির্ব্বচনীয় তেজোদীপ্ত রূপ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই লিখিব। ভাবের দিক দিয়া এগুলি অনুপম।

কবির ভুবনে বৈশাখ আসিল, তাহার দেহদীপ্তি, বাহিরের ও মনের আকাশে ছড়াইয়া পড়িল। তাকে উদ্দেশ করিয়া কবিচিত্ত অভিনন্দিত করিল গানে—

নমো নমো বৈরাগী
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো
নির্ব্বাণহীন নির্ম্মল আলো
অন্তরে যাক্ জাগি'॥

ডাকিয়া কহিল—হে ধূসর-বসন, রক্তলোচন নির্ব্বাক বৈশাখ, হে দস্যু, তুমি হাসি ও অশ্রু সমস্তই শুষিয়া লইতে চাও!

কহিল—"তোমার হুঙ্কার তপ্ত হাওয়ায় প্রান্তর হ'তে প্রান্তরে ছুটিয়া যায়, ধূলি উড়ায়, দিগ্বধূদিগকে কাঁদায়। বিজয়-পতাকা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে।

এই নির্ম্মম দস্যুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল

দুহিয়া লয়েছ গগণ ধেনুরে
ঝরায়ে দিয়েছ শিরিষ রেণুরে
উদাস করেছ রাখাল বেণুরে—
তৃষ্ণা করুণ সারং তানে;
শীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়
ঝিরি ঝিরি জল ধীরি ধীরি বয়
আকুলিয়া ওঠে কাননের ভয়
ভীরু কপোতের কাকলি-গানে॥

বৈশাখের যে দিকটি এখানে দেখান হইয়াছে তাহা নির্ম্মমতায় ভরা—তাহা তাপে তৃষ্ণায়—ক্রন্দন-হাহাকারেই পর্য্যবসিত। নিরাশ্বাস ও নিরানন্দতেই এ দিকটি সুপ্রকাশ।

অন্যদিকও আছে। সেখানে বৈশাখ ধ্বংসের ভিতর দিয়া সৃষ্টিকে সুন্দর করিতেছে; জীর্ণকে ধ্বংস করিতেছে—নবীনতার-বাণী উচ্চারণ করিতে, কলুষকে বিনষ্ট করিতেছে; দীর্ণকে উজ্জীবিত করিতেছে। এখানেই বৈশাখের মঙ্গল স্পর্শ! কবি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

মুছে যাক্ গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা
অগ্নিস্নানে, দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা।
রসের আবেশ-রাশি
শুষ্ক করি' দাও আসি;
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।

আবার কোথাও রৌদ্র-দগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ হতাশাভরা চিত্তে কবি গাহিয়া উঠেন নির্ম্মম-বন্ধুটির প্রতি—

নাই রস নাই দারুণ দাহন বেলা
খেল খেল তব নীরব ভৈরব খেলা।

বলেন—'পাতা যদি ঝরে' যায় ঝরে' পড়ুক, মালা যদি ম্লান শুষ্ক হ'য়ে যায় যাক্; জনহীন পথের ওপর মরিচিকার জাল ফেলা থাকুক। শুষ্ক ধূলির ওপর যে ফুলগুলি ঝরেছে, হে বন্ধু, তা' দিয়ে আকাশে ঘূর্ণি আঁচল ওড়াও!

শেষে বলেন—"প্রাণ যদি কর মরুসম
তবে তাই হোক, হে নির্ম্মম
তুমি একা আর আমি একা—কঠোর মিলন খেলা॥"

আবার কোথাও বৈশাখের তপশ্চর্য্যার নিগূঢ় গম্ভীর রূপটি উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—'হে তাপস, তোমার শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে মন আমার ভাবের আবেশে উদাস বিভোর হইয়া যায়। দেখি তোমার পিঙ্গল জটা দীপ্তি হানে—তোমার রুদ্র-দৃষ্টি আমার অন্তরের ভিতর প্রবেশ করে। তোমার রুদ্র-বাণী আমার মনের মাঝে কি যে বলে বুঝিনা—জানিনা; শুধু দিগ্‌দিগন্ত-দহানো দুঃসহ তাপ ভরা তোমার নিঃশ্বাস বক্ষের তলে রহিয়া রহিয়া অনুভব করি।'

কোথাও অগ্নিতপ্ত বৈশাখের দিনে—ক্লান্ত মন্থর আরাম-হীন আশ্বাস বিহীন উদ্বেগভরা প্রহরগুলির নিঃশব্দ-সঞ্চারণ অন্তরে অনুভব করিয়া গাহিয়া উঠেন—

"দারুণ অগ্নি বানে হৃদয় তৃষ্ণায় ভরা। রজনী হ'ল নিদ্রাহীন; দীর্ঘ-দগ্ধ-দিবসগুলি কোনই আরাম বহন করেন। বনানীর শুষ্ক শাখায় ক্লান্ত কপোতে ডাকি করুণ-কাতর স্বরে। আকাশের দিকে চেয়ে আছি—জানি ভয় নাই, ভয় নাই। হে বন্ধু, জানি তুমি ঝঙ্কার বেশে একদিন তাপিত প্রাণে দেখা দিবে, এ আমি অন্তরে অন্তরে জানি।

বৈশাখের তেজদীপ্ত প্রখর তপস্যার রূপটি নানাভাবে দেখিলাম। তপ্ত-দিন, নিদ্রাহীন রাতের পরম দুঃখের তপস্যার শেষে বন্ধু যে সিদ্ধি লইয়া আসিবেন কবি-হৃদয় তা' উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই বৈশাখের দুঃসহতার মাঝে কবি-কণ্ঠে আশ্বাসের সুর বাজিয়া উঠে—

"জানি ঝঙ্কার বেশে
দেখা দেবে তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে।"

আষাঢ়ের পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ-সমারোহে, উতল-সজল হাওয়ায় ও ধারাবর্ষণে বৈশাখের সিদ্ধি আসে। মৃত্তিকা, তৃণগুল্ম, অরণ্য ফুল পত্র ও মনুষ্য হৃদয় সমস্তই মেঘের স্নেহার্দ্র পরশের জন্য প্রতীক্ষায় আকাশ চাহিয়া থাকে।

বৈশাখ যেন একটি তাপস—হোম-কুণ্ড জ্বালিয়া গভীর তপশ্চর্য্যায় রত—তার সিদ্ধি শেষে দেখা গেল—আসিল—মেঘ-মেদুরতায় ও ধারা বর্ষণে—'শ্যামল-রূপে'। অনির্ব্বচনীয় রূপে এই ভাব কবি প্রকাশ করিয়াছেন।

বৈশাখ হে মৌনীতাপস, কোন অতলের-বাণী
কোথায় খুঁজে পেলে
তপ্ত-দিনের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি এলো
গভীর-ছায়া ফেলে।
রুদ্র-তপের সিদ্ধি এ কি; ঐ যে তোমার বক্ষে দেখি?
ওরি লাগি' আসন পাতো—হোম-হুতাশন জ্বেলে'॥

কবি বলেন—'নিঠুর, তুমি মৃত্যু-ক্ষুধার মত রক্ত-নয়ন মেলে তাকিয়েছিলে যেন সকল প্রাণের-বাঁধন অবহেলায় ছিঁড়্‌বে—প্রলয় সাধনে। কিন্তু তাহা ত' নয়।

হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এযে
আশার-ভাষা উঠ্‌ল বেজে'
দিলে তরুণ শ্যামল-রূপে করুণ সুধা ঢেলে'॥

এক একদিন হঠাৎ কালবৈশাখীর মাতন লাগে। সমস্ত ভুবনে রুদ্রের প্রলয়োৎসব জাগিয়া ওঠে। দিগ্বধূরা মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকে; নদীর জল উত্তাল, উদ্বেল, ফেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; বেণু-বন শাখাপ্রশাখা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া উন্মত্তের মত নৃত্য করে। বিদ্যুৎ আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত লক্ষ অগ্নি-নাগিনীর মত চিরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। মেঘ-ডম্বরু ধ্বনি ঘনঘন আকাশে বাজিতে থাকে।

কবি গাহেন—হে আমার হৃদয় তোমার বৈশাখী ঝড় ঐ এল বুঝি। উদ্দাম-উল্লাসে বেড়াভাঙার মাতন্ নামল্।

তোর মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে
এল তোমার সাধন ধন
চরম সর্ব্বনাশ।

বলেন—এতদিন বাতাসে সুর ছিলনা ছিল শুধু দুঃসহ তাপ—তোর ধরণী ছিল পিপাসাতে শুষ্ক। তার হতাশ, আর ভয় নেই এবার ওঠ জাগ্—তোর পথের সাথী ঐ বিপুল অট্টহাসি হেসে এল।

জীর্ণতার ধ্বংসের ভিতর দিয়া নবীনের জয়-যাত্রা। ভীষণতার বুকের ভিতর সুন্দরের কমল-আসন পাতা। দুঃখের তপস্যার ভিতর দিয়া পরমামুক্তির আবির্ভাব হয়। এই সুরই বাজিয়াছে এই কবিতাটিতে। কবির সাধন-ধন-চরম সর্ব্বনাশের ভিতর দিয়া আসিলেন ও এই কথা তিনি আকুল স্বরে গাহিয়াছেন।

আরেকটি কবিতা সম্বন্ধে বলিয়া বৈশাখের পালা শেষ করি। এই কবিতাটি গ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষার প্রারম্ভ সূচনা করিতেছে। কবিতাটি একটি রূপকথার মতো। ধরণী-রূপিণী রাজকন্যাকে মরু দৈত্য শুষ্কতাপের পুরীতে শৃঙ্খলিত করিয়া বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। রাজপুত্র কোথা হইতে হঠাৎ আসিলেন—রাজকন্যাকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া। রঙে রেখায় চিত্রিত একটি ছবির মত এই কবিতা—

শুষ্কতাপের দৈত্য-পুরে দ্বার ভাঙবে বলে'
রাজপুত্র কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চলে'।
সাত-সমুদ্র পারের থেকে—বজ্র স্বরে এল হেঁকে
দুন্দুভি তার উঠল বেজে' বিষম কলরোলে।

মরুদৈত্যের পরাজয় হইল। বসুন্ধরা মূর্চ্ছা হইতে জাগিয়া বীরের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিলেন।

বীরের পাদ পরশ পেয়ে মূর্চ্ছা হ'তে জাগে
বসুন্ধরার তপ্ত প্রাণে বিপুল-পুলক লাগে।
মরকত মণির-মালা সাজিয়ে,গাঁথে বরণ মালা
উতলাতার হৃদয় আজি, সজল হাওয়ায় দোলে॥
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥

দারুণ দাহনের পালা শেষ হইল। বৈশাখের খর-তাপে রৌদ্রবিভাসিত আকাশে, কপোতের করুণ কণ্ঠে এবং প্রখর অগ্নি-দাহনে যে ইঙ্গিত আছে তাহা খণ্ডখণ্ড ভাবে কবির কাব্যে রূপ ধরিয়াছে। তাহার কিছু আভাস দিলাম।

* * * *

নগরীর প্রদীপ্ত আকাশ অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। মধ্যাহ্নে পথের জনস্রোত কমিয়াছে—চারদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে নীচের রাস্তা হইতে ক্ষীণ কলরব উত্থিত হইতেছে। একটি বাড়ীর ছাদের টাঙানো বাঁশের উপর বসিয়া কাক ডাকিতেছে—নগরীর স্তব্ধতাতে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ করিয়া। চারিদিকে ইট কাঠের ইমারত উঠিয়া দৃষ্টি অবরুদ্ধ। আকাশ ভালো করিয়া দেখা যায় না। কোথায় বা ধরণীর-উদার বিস্তার যাহার প্রান্ত পর্য্যন্ত বাধাহীন দৃষ্টি চলে। কোথায় বা আম্র মুকুল সুগন্ধ—কোথায় বা শিমুল যে বনান্তে সহস্র রঙিন দীপ জ্বালাইয়া দিয়াছে, কোথায় বা পলাস ও কাঞ্চন—যারা বৈশাখের অভিনন্দনের থালা সাজাইল—কোথা বা স্বর্ণ চম্পকের দল—যারা ধূপসুগন্ধে বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। কোথায় ঝরা-পত্রের মর্ম্মরধ্বনি—কোকিলের বিলিয়মান কুহু ধ্বনি। নির্দ্দয় নগরীতে এতটুকু তার স্থান নাই—এতটুকু আয়োজন নাই।

কবির বাণী এখানে জাগিতে পায় না—চারিদিকে বাধা পায়। এই বাণী প্রকাশ হইবার জন্য যে পরিবেষ্টনীর প্রয়োজন—যে আকাশ এই বাণীকে পদ্মের মত প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবে—সেই নীল দীপ্ত আকাশ এখানে নাই।

ছোট বেলাকার গ্রাম্য-জীবনের কথা মনে আসে। সেই উদার বিস্তৃত অবারিত প্রান্তর কচি শস্য আন্দোলিত; সেই স্তব্ধ মধ্যাহ্নের ঘুঘুর ঘুম-পাড়ানিয়া ডাক্—সেই চম্পকের উগ্র-সুবাস।

কবির কাব্যে যে রূপ দেখিলাম বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিলাম না—যেমনটি করিয়াছিলাম সেই কিশোর বয়সে—আম্র কাননছায়ে॥

জিতেন্দ্র বক্সী

উনপঞ্চাশী

শ্রীসরোজমোহন চক্রবর্ত্তী

দুই ভ্রাতা, মধুসূদন ও কৈলাস, একই আপিসে কর্ম্ম করিত। আমাদের জন্মের পর হইতেই, গলির মুখের ঐ চুণবালি খসিয়া পড়া বাসাটাতে উহাদের দুই ভ্রাতাকে বাস করিতে দেখিয়াছি। কনিষ্ঠ মধুসূদন, পাতলা ছিপ-ছিপে ও লম্বা। তাহার সম্মুখের গোটাদুই দাঁত ছিল না। জ্যেষ্ঠ কৈলাস, মধুসূদন অপেক্ষা মাথায় ছোট ও কিঞ্চিৎ স্থূলকায় এবং যদিও তাহার কানের পাশ দিয়া দুই রগের উপরের কিছু কিছু কেশ পাকিয়া গিয়াছিল, তথাপি সময়ে সময়ে কনিষ্ঠ মধুসূদনকেই অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হইত। দুই ভ্রাতা পরস্পরের ছায়ার ন্যায় দিবারাত্রির এক মুহূর্ত্তও কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিত না। ঘাটে, পথে যেখানেই, যে-কেহ, যখনই উহাদিগকে দেখিতে পাইত, সেই দেখিত, হয় দুই ভ্রাতা পাশাপাশি নয় আগুপাছু চলিয়াছে। একাকী কাহাকেও দেখিয়াছে বলিয়া কদাচিৎ শোনা যাইত।

ইংরাজীতে 'উনপঞ্চাশ' সংখ্যাটিকে সাহেবেরা কি এবং কোন্ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন জানি না। কিন্তু আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া ছেলের দলে বিদেশী ঐ উনপঞ্চাশ সংখ্যাটির একটা বিশেষ অর্থ এবং বিশেষ প্রয়োগ দেখিয়াছি। আমাদের নিজেদের উনপঞ্চাশের বোধ করি জোর কম, তাহা না হইলে পরদেশীর উপর এত টান কেন? সে যাহাই হউক, আমাদের মধুসূদনদের দুই ভ্রাতাকে লোকে কহিত, 'ফর্টিনাইন'। কেন যে উহারা উনপঞ্চাশ হইতে গেল, সে ইতিহাস শুধু আমার নয় বোধ করি অনেকেরই জানা ছিল না। নানা জনে নানা প্রকার কারণ দেখাইতেন। কেহ কহিতেন, আঁক কষিতে গিয়া কন্ম হইয়াছিল উনপঞ্চাশ। কেহ বা উনপঞ্চাশ বায়ু ভ্রাতাযুগলকে আশ্রয় করিয়াছে, কহিতেন। কেহ কহিত, পরীক্ষায় কোন এক বিষয়ে উনপঞ্চাশ পাইয়া পাশ হইয়াছিল। আর কেহ কহিত, কলেজের ক্লাসে মধুসূদনের রোল ছিল উনপঞ্চাশ। এ ছাড়া আরও কত জনে কত কি কহিতেন। কারণ যাহাই হউক, কৈলাসের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই, একথা উহার সহকর্ম্মীরা কহিত, এবং এমনও ঘটিতে দেখা গিয়াছে, দৈবাৎ কৈলাসকে পথে একাকী পাইয়া ছেলের দল চীৎকার সুরু করিয়াছে, 'ফর্টিনাইন', 'ফর্টিনাইন'; কিন্তু কৈলাস ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া ক্রোধহীন, শান্ত গম্ভীরমুখে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কনিষ্ঠ মধুসূদন প্রকৃতপক্ষেই 'ফর্টিনাইন' ছিল। সে ছেলেদের 'ফর্টিনাইন' শুনিলে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিত না; ক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চাতে ছুটিত এবং কাহাকেও ধরিতে না পারিয়া অক্ষমতার রোষে গালি পাড়িত। দৈবাৎ কোনদিন কাহাকেও ধরিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। তবে এমনও দেখিয়াছি কাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে সম্মুখবর্ত্তী কোনও নির্দ্দোষ বালককে পাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করিয়াছে এবং বালক যখন বার বার উনপঞ্চাশ বলা অস্বীকার করিতে থাকে, তখন সে অন্য কোনদিন কহিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় একই প্রকার উত্তর লাভ করিয়া দুই ভ্রাতা ফিরিয়া গিয়াছে। কৈলাসের আচরণ আরও অদ্ভুত। সে একাকী থাকিলে ভালই থাকে, কিন্তু ভ্রাতার সঙ্গে থাকিলে সেও বালকদের পশ্চাতে ছোটে এবং গালাগাল করে। বোধ করি, কনিষ্ঠের প্রতি স্নেহে, মধুসূদন ব্যথা পায়, ক্রুদ্ধ হয়, ইহা তাহার সহ্য হয় না এবং সেও ভ্রাতার ব্যথায় সমান বেদনা বোধ করে, ক্ষুব্ধ হয়।

দুই ভ্রাতাই অবিবাহিত। কিন্তু দুই ভ্রাতা সম্মিলিত চেষ্টা পরিশ্রমে যাহা মাসের পর মাস উপার্জ্জন করিয়া ঘরে

আনিত সকলই নিজেদের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে এবং মধুসূদনের নানাবিধ খেয়াল চরিতার্থ করিতেই নিঃশেষ হইয়া যাইত। মধুসূদনের বহুবিধ বিচিত্র খেয়ালের মধ্যে ছোট ছোট ছেলের দলকে সন্দেশ খাওয়ান ছিল একটা প্রধান খেয়াল। ছোট বেলায় কত সন্দেশ যে, ইহাদের দুই ভ্রাতার খাইয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার মনে পড়ে, এমনি সন্দেশ খাওয়া লইয়া গৃহে, দাদার নিকট তিরস্কৃত হইয়া কয়দিন-আর উহাদের বাসা-বাড়ীতে যাই নাই। হঠাৎ, একদিন বাড়ীর ভিতরে বসিয়া আছি, দাদা আসিয়া কহিলেন, ওরে, তোকে ডাকছে। মধুসূদনবাবু এবং তাঁর ভাই এসেছে। হাতে দেখলাম একটা খাবারের ঠোঙ্গা। দাদা একটুখানি হাসিলেন। দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া যখন বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম তখন দেখিতে পাইলাম, দুই ভ্রাতা একখানি চৌকিতে পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছে এবং মধুসূদনের হস্তে একটা খাবারের ঠোঙ্গা। প্রথমেই মধুসূদন এই কয়দিন যাই নাই কেন, জিজ্ঞাসা করিল এবং পরে বার বার সন্দেশ খাইতে কহিতে লাগিল। খাবার খাওয়াইয়া সে তাহার কী তৃপ্তি। চোখে মুখে বেশ দিব্য একখণ্ড তৃপ্তির আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলাম। দুই ভ্রাতা উঠিয়া দাঁড়াইল। মধুসূদন আমার পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া কহিল, বিকেলে যেয়ো, কেমন? দুই ভাই চলিয়া গেল। দাদা সামান্য একটু হাসিলেন। দাদার হাসি দেখিয়া কেনই জানি না সেইদিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ইহার কয় বৎসর পরের কথা। আমিও পাঠশালা ছাড়িয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়িতেছি। কিন্তু মধুসূদনের ব্যবহার পূর্ব্ববৎ। সে যখন পূর্ব্বের ন্যায় ছোট এতটুকু বালকমাত্র মনে করিয়া আদর করিত তখন যথার্থই লজ্জায় আমার গণ্ডস্থল রক্তিমাভা ধারণ করিত। একদিন কথায় কথায় মধুসূদনের নিকট শুনিলাম যে, তাহারা শীঘ্রই ঐ বাসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং ঐদিকে কোথায় একখানা দ্বিতল ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইবে। একথাও অবশ্য আমাকে জানাইয়া দিল যে, প্রথমদিনই আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া বাসা দেখাইয়া দিবে।

ইহার পর, কয়দিন স্কুলের পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম; মধুসূদনবাবুদের বাসায় আর যাইতে পারি নাই। মনে পড়ে সেইদিন পরীক্ষা শেষ হইয়াছে; মনে মনে ঠিক করিয়াছি বৈকালের দিকে একবার যাইব। দাদা হঠাৎ বাহির হইতে আসিয়া মাকে কহিলেন, মধুসূদনবাবুর জ্বর; বোধ হয় ভদ্রলোক আর বাঁচবে না। কথাটা শুনিয়াই মনের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল।

বৈকালের দিকে মধুসূদনবাবুদের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম মধুসূদন শঙ্কটাপন্ন জ্বরে বেহুঁস; চেতনা মাত্র নাই। দেখিলে চিনিয়া উঠা শক্ত। কৈলাস মুমূর্ষুর শিয়রে একান্ত একাগ্র হইয়া স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। তাহার অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সন্ধ্যার পর মধুসূদনের মৃত্যু হইল। গিয়া দেখিলাম, কৈলাস কনিষ্ঠের মৃত্যু-কঠিন, শীতল বক্ষে মুখ লুকাইয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই অশ্রু-আবিল মুখখানা তুলিয়া পরক্ষণেই ব্যাকুল হইয়া একটা মর্ম্মভেদী হা, হা শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। কহিল, আমি না বড় ভাই? অশ্রু উদ্বেল হইয়া আমার নয়নকোণ দুটা দিয়া ঝরিয়া পড়িল। আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিতেছি, শুনিলাম কৈলাস আবেগে কম্পিত আর্ত্তস্বরে কহিতেছে, ওরে, আমি না তোর বড় ভাই? থাকিয়া থাকিয়া সে কি আর্ত্ত বুক ফাটা ক্রন্দন। কৈলাসবাবুর মত অতখানি বয়সে ভ্রাতার মৃত্যুতে ভ্রাতার অমন আকুল হৃদয়ভেদী ক্রন্দন আর দেখি নাই।

কৈলাস সহস্র অনুরোধেও বাসা পরিবর্ত্তন করিতে আর সম্মত হইল না। পথেও আর একটা বড় বাহির হইত না। আপিসে একাই যাইতে হয়। একটা ঘোর গাম্ভীর্য্য কালো হইয়া তাহার সমগ্র মুখখানা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, যেন মূর্ত্তিমান শোক জমাট হইয়া বসিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে একদিন বাসায় গিয়া দেখি, কৈলাস কনিষ্ঠের মোটা বেতের লাঠিটা, নিঃশব্দে বসিয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন এবং তাঁহার আর্দ্রচক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু ঝরিয়া লাঠিটা

ভিজাইয়া দিয়াছে। দিনের শেষ, ক্ষীণ আলোটুকু ঘরখানিকে ঈষৎ আলো-অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে কৈলাস স্তব্ধ হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ লাঠিটা আবেগের সহিত বক্ষে চাপিয়া ধরিল। নয়নের কোণ বহিয়া হু হু করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এমনি আর একটা দিনের কথা মনে পড়ে, কৈলাস অপলক দৃষ্টিতে দেয়ালের গায়ে মধুসূদনের প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া রহিয়াছে;—সমগ্র মুখমণ্ডল তাঁহার প্রচ্ছন্ন শোকের দীপ্ত আভায় সামান্য একটুখানি কুঞ্চিত হইয়া গিয়া দিব্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নয়নের কোণে দুই ফোঁটা অশ্রু। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ হইয়াছে এই যে, যে কৈলাস পূর্ব্বে 'ফর্টিনাইন' শুনিলে নিজে ক্রুদ্ধ হইত না,—ভ্রাতার দুঃখে দুঃখিত হইত মাত্র, সেই কৈলাস পথে বাহির হইলে উনপঞ্চাশ কেন, আটচল্লিশ শুনিলেও এখন ক্ষিপ্তের ন্যায় রুখিয়া মারিতে উঠে।

উনপঞ্চাশীদের জন্য দুঃখ হয়। কেবলি মনে হয়, ভগবান, এই উনপঞ্চাশ বায়ুর একটুখানি যদি আজ বাঙ্গলার বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারিত;—বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অনেক অশান্তি দূর হইয়া যাইতে পারিত। তুমি শুধু আজ বৃদ্ধ কৈলাসকে মুক্তি দিয়া চরণে টানিয়া লও।

সরোজমোহন চক্রবর্ত্তী

আমার মৃত্যুর দিনে—

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

আমার মৃত্যুর দিনে তুমি এস শ্রান্ত লঘু পায়ে—
ভীরু বালিকার স্বরে,—কুমারীর অশান্ত স্পন্দনে,
প্রথম প্রেমের মত, প্রভাতের বিহঙ্গের গানে;
তুমি এস ধীরে ধীরে—মৃত্যুর শীতল শান্ত ছায়ে।
অদেখা সুন্দরী মোর! আমার দৈন্যের রূঢ় ঘায়ে
যদি ভুল বুঝে থাকি, ভ্রান্তি হেতু তোমার সম্মানে
উপেক্ষা দেখায়ে থাকি, আমার মৃত্যুর আহ্বানে
তুমি তারে ক্ষমা করো,—শান্তির মাধুরী বিছায়ে।
তুমি কি বোঝনি প্রিয়া কার লাগি গাহিয়াছি গান;
সারাটী যৌবন ভোর কারে আমি চাহি বার বার,
দৃষ্টীর ও অন্তরালে কারে আমি দিয়াছি সম্মান,
অকাতরে ভুলে গেছি দুর্ব্বিসহ শোক যাতনার;
যৌবনের শক্তি দিয়া মাল্য আমি রচেছি তোমার,
তুমি এস স্বপ্ন শেষে কল্পনার কর পরিত্রাণ।

বিস্ময়

শ্রীরাধেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

আজিকার প্রভাতের বাণী,
দিল আনি,—
মঞ্জরিত বল্লরীর, কম্পন-কল্লোলে,
পল্লবিত শাখীদের শাখার হিল্লোলে,—
আজি হ'তে শত বর্ষ পূর্ব্বের কাহিনী ;
খ্যাতি-হারা, স্মৃতিহারা, জীবনের অনন্ত বাহিনী,
বিগত যুগের শেষ,
অজানার অন্তিম উদ্দেশ !
এই পর্ণে,
বর্ণে, বর্ণে,
এই পুষ্পদলে,
আজিও গোপনে বুঝি, তাহারাই চলে !
নাম-হীন অস্তিত্বের, বিপুল ঘূর্ণনে,
নেমি-হারা রথ-চক্রে, চূর্ণনে, চূর্ণনে,
আজিও ফিরিছে তারা
চিহ্ন-হারা,
তাহাদের মন্ত্র লয়ে জ্বালায়েছে শিখা,
মালঞ্চের অঞ্চলেতে, কনক-কাঞ্চন, করবিকা।

২

মৃত্যু-হীন অমৃত-পিপাসা
দিল ভাষা,
রূপে, রূপে, অস্ফুটের স্ফুটন গৌরবে,
জাগাইল বিস্মৃতের জাগ্রত সৌরভে—
অন্তর্লীন, অচেতন, অতীত-রঙ্গিমা,
সুপ্ত-রূপ সুন্দরের, সুপ্তোত্থিত, নূতন ভঙ্গিমা,
নূতন তরঙ্গপরে
অবিনাশি মৃত্যুর উত্তরে !
তা'রি' মন্ত্রে,
যন্ত্রে, যন্ত্রে,
বেদধ্বনি সম,
উদিল উর্দ্ধের পানে প্রাতঃ সূর্য্য মম।
চিরন্তন দিবসের দিল পরিচয়
আঁখিতে, আঁখিতে বুঝি জাগিল বিস্ময় !
নীরবে শুধালো তারা,
মূর্ত্তি-হারা—
"আজিকে পেয়েছি কি গো আশ্রয় সন্ধান ?"
অমনি সন্ধ্যার আলো ধীরে তা'রে ক'রে গেল ম্লান।

৩

মোর সন্ধ্যার বিস্ময়খানি,
নাহি জানি—
কখন আসিয়া ধীরে মোর চিত্ত মাঝে,
গুঞ্জরিল—"এই বিত্ত কভু রহে না যে
পথ-প্রান্তে চির-শ্রান্ত ফেলে যেতে হয়,
যুগ হ'তে যুগ ধরি, যাহা তুমি করিবে সঞ্চয় !"
আরক্ত গগনে বুঝি,
মেঘে, মেঘে তা'রি খোঁজা-খুঁজি—
তা'রি চিহ্ন,
শত ছিন্ন,
কুড়ায়ে কুড়ায়ে,
গোধূলির ধূলি যত্নে দিয়াছে উড়ায়ে।
অতি ক্ষুদ্র ছিল যাহা জীর্ণ পুরাতন
সে আজি দিয়াছে ছেড়ে শূন্যের অঙ্গন ;—

তা'র স্বর্ণ রথে
তা'র পথে
যে তুমি এসেছ' আজি সুন্দর নবীন;
তোমাকেও যেতে হবে, সব ছেড়ে কোনো একদিন।

৪

তোমারেও দিতে হবে তুলে।
পথ মূলে
নিজ হস্তে বিরচিত গাণ্ডীব তোমার।
আজিকার পরিপূর্ণ গৌরব সম্ভার,
বজ্র সম ছিন্ন করি ওই বক্ষ হ'তে,
অকারণে দিবে তুলে, অবহেলে, কোন নিত্যস্রোতে—
অজ্ঞাত অশ্রুত জনে।

মুকুলিত কুসুম কাননে—
অকস্মাৎ,
কশাঘাত,
জাগাবে কম্পন;
মুহূর্ত্তে জাগাবে শুধু তীব্র আলোড়ন;
মুহূর্ত্তে মুছায়ে ওই রূপ মরিচিকা,
নিভে যাবে অন্ধকারে সব দীপ শিখা।
তা'রপর ধীরে,
আঁখি নীরে,
আবার আসিবে সূর্য্য সারা বিশ্বময়,
সে অশ্রুর এক প্রান্তে যুগ শ্রান্ত জাগিবে বিস্ময়।

রাধেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণ-প্রেম

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অপূর্ব্ব প্রেমের কীর্ত্তি; আমারে হারায়েছিনু বসুধার বন্ধন ক্রন্দনে,
ভুলিয়া আছিনু মোরে প্রত্যহের তুচ্ছতায় দীনতার দারুণ ধিক্কার;
প্রাণ আর প্রেম আজ আবিষ্কার করিয়াছে আমার এ জীবন-নন্দনে
বাঁচিবার উপযোগী আনন্দ-অঙ্কুর বেঁচে রহিয়াছে আজো স্তূপাকারে।
রূপ ও রসের তৃষ্ণা যেদিন হয়েছে ব্যর্থ অসীমার পিছু অভিসার,
আপনার অন্বেষণে আপনারে হারায়েছি জগতের জনতার মাঝে,—
সেদিন কি এক শক্তি মর্ম্মরি উঠেছে মর্ম্মে—অনবদ্য প্রকাশ তাহার—
প্রেম আর প্রাণ-রস পরিব্যাপ্ত রয়েছে তা' জীবনের ছোট বড় কাজে।
যে-আমি পড়িয়াছিনু নিষ্প্রাণ নিস্তেজ হ'য়ে রন্ধ্রহীন মৃত্যুর আঁধারে,
বাঁচিবার বিলাসে সে মগ্ন আজ,—পাইয়াছি পূর্ণতার পূর্ণিমা-সন্ধান
আনন্দের রোমাঞ্চনে প্রাণেরে চুম্বন আর আলিঙ্গন করি বারে বারে
প্রেমের প্রণামী রাখি প্রাণের অসংখ্য নতি জীবনের জয়যাত্রা-গান।
আত্মহত অনাদৃত এ জীবন হ'তে পারে এত প্রিয় এত যে সুন্দর,
অনুপম এই প্রেম এই প্রাণ দেখাল' তা' স্পষ্ট করে' আমার উপর।

ঘরের কথা

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার, এম-এ

পাত্রপাত্রী

সুধেন্দু বসু

বিভা

বিমল

[কল্‌কাতার বিশিষ্ট ভদ্রপল্লীতে একখানা বাড়ী। বাড়ীটা তেতলা। তেতলায় উত্তরদিকে মাত্র দুইখানা ঘর—তার সামনে খানিকটা জায়গা শেড্‌ দেওয়া—ঘরগুলোকে আব্‌হাওয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্যে। এছাড়া বাকি ছাদটা খালিই পড়ে আছে। পুবদিকে বুক পর্য্যন্ত উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটা অশথ গাছ উঠেছে। বাড়িটা বেশ নিরিবিলি জায়গায়। গাড়ী আর লোকের অবিশ্রাম গণ্ডগোল নেই। তেতলার এই ছাদটাই এই নাটিকার একটি মাত্র দৃশ্য।

রাত্রি নয়টা। দুটো ঘরেই ইলেকট্রিক জ্বলছে। শেডের ছায়ায় মধ্যে কাঁচের জানলাগুলো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সামনের ছাদে একটা ডেক্‌-চেয়ারে ব'সে বিমল আরাম ক'রে চুরোট টানছে; আর একটা চেয়ারে সুধেন্দু ব'সে আছে—তার সামনে টি-পয়, তার ওপর একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক খোলা পড়ে রয়েছে। সুধেন্দু রোগা এবং ফর্সা। মুখ দেখলে বিশেষ সুন্দর ব'ল মনে হয় না, কিন্তু চওড়া কপাল, উঁচু নাক আর চিবুকের রেখা তীক্ষ্ণ এবং সুস্পষ্ট হওয়ায় মুখে বেশ একটা দীপ্তির আভাস পাওয়া যায়। চোখে একটা করুণ ভাব আছে যেটা ওর মুখে মানায় না। সাধারণতঃ হাসে না—বোধ হয় সেই জন্যেই খুব-গম্ভীর আর বুদ্ধিমান ব'লে বোধ হয়। কিন্তু হঠাৎ ওর ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিলে ওকে একেবারে আলাদা মানুষ ব'লে মনে হয়; মনে হয় যেন ও ভেতরে ভেতরে ভয়ানক কাঁচা আছে—যেন ও একান্ত ছেলে মানুষ এবং অসহায়। দর্শকের মনে ওর প্রতি সম্ভ্রমের ভাব হঠাৎ মমতায় পরিণত হয়। এবং ও নিজেই লজ্জিত হয়ে দ্বিগুণ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বিমলের বিশেষ বর্ণনার দরকার নেই। খেলাধুলো ও ব্যায়ামে সুগঠিত দেহ—মুখে চোখে উৎসাহ এবং সারল্যের পরিচয় আছে—হৈ চৈ করতে ভালবাসে—গভীর ভাবে কিছু ভাবনা চিন্তা করা অনাবশ্যক ব'লে মনে করে।]

বিমল। [চুরোটটা ছুঁড়ে ফেলে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে উঠে বসলো] আচ্ছা, এই কি ভালো হচ্ছে সুধীদা? এতদিন বাদে এলাম তা তুমি একখানা বই খুলে ব'সে রইলে! তাও বুঝতাম কোনো ভাল 'অথরের' বই—তা নয় একটা বাজে 'উইক্‌লি পেপার'!

সুধেন্দু। তাতে তোর কি ক্ষতি হচ্ছে? এই আধঘণ্টা তো সমানে তোর সঙ্গে ব'কে যাচ্ছি।

বিমল। তার চেয়ে সোজা কথায় বললেই হয়—বাপু, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, আমাদের নিরালা ঘরের শান্তি ভঙ্গ করো না। সেই যে শকুন্তলায় পড়েছিলাম—'মত্তকরী ইব' না কি। সেই কথাটা স্পষ্ট ব'লে দিলেই হয়—

সুধেন্দু। ডেঁপোমি করিস্‌নি—বোস। বুড়ো বয়সে শেষে কানমলা খেয়ে মরবি—

বিমল। [উচ্চকণ্ঠে] বিভা! বিভা!

সুধেন্দু। দোহাই তোর, চেঁচানি থামা। পাড়ার লোক ছুটে আসবে যে—

বিমল। তবে বই বন্ধ কর।

সুধেন্দু। নাঃ, তোর আর কোনো পরিবর্ত্তনই হল না। সেই আগেকার মতোই গোঁয়ার গোবিন্দ র'য়ে গেলি।

বিমল। ও, এখন আমিই হলাম গোঁয়ার গোবিন্দ? অথচ এই গোঁয়ার গোবিন্দের জন্যেই মশায়ের ধনে পুত্রে না হোক লক্ষ্মীলাভ তো বটেই? সে কথা আর এতদিন বাদে মনেই বা থাকবে কেন? ছ' ছ'মাস আগেকার কথা —সে তো বলতে গেলে শৈশবের কথা—

সুধেন্দু। [মৃদু হেসে] ফের ইয়ার্কি হচ্ছে?

বিমল। আচ্ছা সুধীদা, বাস্তবিক ভাব তো সে কি মজাই হয়েছিল। তুমি তো এধারে আমায় বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে নিঃশেষে বুঝিয়ে দিলে যে বিভার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে 'আইডিয়াল হোম' কাকে বলে তুমি দেখিয়ে দেবে; ওদিকে পিসেমশাই গোঁ ধরেছেন—না, ও ছেলের সঙ্গে

কিছুতেই বিভার বিয়ে দোব না, ও কোন্ দিন স্বদেশীর হিড়িকে প'ড়ে ফাঁসি যাবে, মেয়েটা বিধবা হবে। এমন সময়ে রঙ্গমঞ্চে আমার প্রবেশ।

সুধেন্দু। বাস্তবিক, তুই গিয়ে তাঁকে কি ব'লে মত করালি তা তো এখনও জানি না।

বিমল। [উচ্চকণ্ঠে হেসে] হ্যাঁ, তাই বলি—আর বিভা আমায় গালাগালি দিক—

সুধেন্দু। কেন, বিভা গাল দেবে কেন? কি ব্যাপার খুলে বল্ না।

বিমল। তুমি বিভাকে বল্বে না, কথা দাও—

সুধেন্দু। [একটু ভেবে অল্প হেসে] আচ্ছা, কথা দিচ্ছি—

বিমল। পিসেমশায়কে গিয়ে বললাম, 'এ বিয়ে হতেই হবে—নইলে বিভা আফিং খাবে'।

সুধেন্দু। যাঃ, এই কথা তিনি বিশ্বাস করলেন?

বিমল। আলবৎ করলেন। যখন এক ডেলা আফিং দেখিয়ে বললাম—বিভার হাত থেকে কেড়ে এনেছি—ভদ্রলোকের তো চক্ষুস্থির। দৌড়ে অন্দরের দিকে যাচ্ছিলেন; ডেকে বললাম—বিভা যদি কোনও ক্রমে জানতে পারে যে আপনি একথা জানেন তাহলে সে লজ্জার খাতিরে অন্ততঃ আত্মহত্যা করবে; এখন এগোলেও আত্মহত্যা পেছলেও তাই অতএব ব্যাপারটা চেপে গিয়ে ওদের দুই হাত এক ক'রে দিন। পিসেমশায় অসহায়ভাবে বললেন—কিন্তু একটা স্বদেশী খুনে ডাকাত—! প্রায় আধঘণ্টা 'লেক্‌চার' দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, সুধীদা আমাদের 'নন্-ভায়োলেণ্ট্' দলীয়—অর্থাৎ হাত পা না নেড়ে ঘরে ব'সে দেশের সেবা করেন। তাঁর লেখা বইগুলো বড় জোর 'প্রোসক্রাইব্‌ড্' হতে পারে—তাঁর সশরীরে 'প্রোসক্রাইব্‌ড্' হবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই—। তখন তিনি মত দিলেন।

সুধেন্দু। বলিস্ কি রে? তুই বিভার নামে মিছিমিছি—

বিমল। মিছিমিছি কি আবার? আফিংটা হচ্ছে এখানে রূপক—ওর মানে হচ্ছে চিন্তাবিষ। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর মেয়ে দিন দিন যে রকম শুকোচ্ছিলেন তাতে পরিণামটা আফিং খাওয়ার মতোই হত। যাক্—সব বাজে কথা। এখন সুধীদা, তোমার 'আইডিয়াল হোমের' কি হোল বল?

সুধেন্দু। কি হবে আবার—নিজের চোখেই তো দেখছিস্—

বিমল। না না, সুধীদা, সত্যি বল্‌ছি—তুমি সেই যখন বলতে তোমার গৃহ আর গৃহলক্ষ্মীর কথা—তখন আমর ভারী ভালো লাগতো। মনে মনে কামনা করতাম, তোমার এ স্বপ্ন সফল হোক্। বাঙালীর ঘরের অবস্থা দেখ্‌ছি তো আজ এই পঁচিশ বচ্ছর।—সত্যি বল না সুধীদা, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্বন্ধটা কিরকম?

সুধেন্দু। [একটু নীরব থেকে] কি জানি, নিজেই ঠিক বুঝতে পারি না। দেখ্ বিমল, বিয়ের পর প্রথম যখন আমাদের সংসার হোল—সে কি একটা অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে দিয়ে যে দিনগুলো কেটেছে! কিন্তু এখন মাঝে মাঝে মনে হয়—

বিমল। কেন, তোমাদের সংসারে তো কোনও অশান্তি থাক্‌বার কথা নয়—

সুধেন্দু। না। অশান্তি হবার কোনো পথ রাখিনি। বিভাকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে অলস ভাবালুতা আর স্বার্থপরতায় সংসার চলে না। সংসার একটা সুবিধাজনক যন্ত্র মাত্র—তার উপকারিতা নির্ভর করে সেটাকে চালাতে জানার ওপর। মহামূল্য আতর শিশির পর শিশি ঢাল্‌লেও মোটর চলে না, তার জন্যে চাই পেট্রোল—

বিমল। তবে—

সুধেন্দু। সেই তো হয়েছে মুস্কিল! অশান্তি কিছুই নেই, অথচ…এক একবার আমার কি মনে হয় জানিস্? শুন্‌লে হাস্‌বি। অশান্তি নেই ব'লেই যেন সংসারটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা—যেন মোটেই জমাট্ বাঁধছে না। বিরক্ত হবার মত কিছুই নেই, কিন্তু উৎসাহ পাবার মতও যেন কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। কি কি করতে নেই, স্থির হয়ে গেছে—কিন্তু কি কি করা দরকার তার মীমাংসা হচ্ছে না। আমি থাকি তবু নিজের লেখা নিয়ে; কিন্তু বিভা যেন কি রকম ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়ায়। সে

যে কি চায়—তার জন্যে কি করলে ভালো হয় কিছুই বুঝি না।

বিমল। দেখ সুধীদা, আমার মনে হয় তুমি এমন একটা উঁচু বায়ুহীন শূন্যে তোমাদের সংসারকে টেনে তুলেছ—যেখানে সাধারণ ভাবে নিশ্বাস নেওয়াও শক্ত।—বেঁচে থাক্‌তে হলে মানুষের তুচ্ছ জিনিষগুলোও বাদ দেওয়া যায় না।

সুধেন্দু। একথা মান্‌তে আমি রাজি নই। সংসারের এই তুচ্ছ কথাবার্ত্তা ঘাত প্রতিঘাতগুলো লোককে আপাততঃ ভুলিয়ে রাখে বটে, কিন্তু তাদের ক্রিয়া হচ্ছে slow poison এর মত! তিলে তিলে মনটাকে একেবারে জখম ক'রে ফেলে, তখন আর তার নড়বার ক্ষমতা থাকে না—

[বিভা কখন এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের মধ্যে কেউই টের পায়নি। বিভা হচ্ছে সেই ধরণের মেয়ে যারা খুব চালাক চতুর—ইংরেজিতে যাকে 'স্মার্ট' বলে—অথচ যাদের মনটা স্বভাবতঃই নম্র।' যারা বেশী সময়ই নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে থাকে—কোনো বিশেষ কারণে নিজেদের দিকে চাইতে বাধ্য হলে লজ্জিত হয়ে পড়ে; যাদের খুব দূরের জিনিস ব'লে মনে হয় না—যারা অতি নিকট; যারা লোভনীয় নয়—কমনীয়া বিভা এইমাত্র নীচে বাথরুম থেকে আসছে। একটা অতি সাধারণ কাপড়ই ও বেশ অদ্ভুত সুন্দর ভাবে পরতে পারে। ওর কাপড়ের পাড়ে—চওড়া লাল!]

বিভা। এর মধ্যে আবার মন জখম হোল কার? বিমলদার ঐ শরীরের মধ্যে থেকে মনটা খুঁজে বার করাই তো অসম্ভব—জখম করা তো দূরের কথা। তা হলে 'অ্যাক্‌সিডেন্ট্'টা কি তোমারই হোল?

বিমল। আরে, তুই কখন এসে দাঁড়িয়ে আছিস? মুস্কিল করেছিস—শিগগীর চা নিয়ে আয়।

বিভা। [হেসে ফেলে] মুস্কিলটা আমি আর কি করলুম? তোমার দাদাই করেছেন। এখন ওঁর মন মেরামতের একটা উপায় বার করো। আমাদের 'আইডিয়াল হোম' জান তো? এখানে 'লিবার্টি', 'ফ্রেটারনিটি' সবই পাবে—

বিমল। 'ফ্রেটারনিটি'? কার সঙ্গে রে?

বিভা। [সপ্রতিভ ভাবে] কেন, দ্বিতীয় পক্ষটির সঙ্গে—যিনি ভাঙা মন জোড়া লাগাবেন—

সুধেন্দু। [উচ্চ কণ্ঠে] সহদেব! সহদেব!

বিমল। এর মধ্যে আবার সহদেবটা কে?

সুধেন্দু। চাকর।

বিভা। সহদেবকে ডাকছ কেন—কিছু দরকার আছে?

সুধেন্দু। হ্যাঁ, বিমলকে চা ক'রে দিক্—

বিমল। বাঃ, তার জন্যে চাকর কেন? বিভাকে বল্‌লেই তো হয়! [হাসতে হাসতে] হ্যাঁ রে বিভা, স্বাধীন সংসারে নিজের হাতে চা তৈরী করতে নেই বুঝি?

বিভা। বাঃ, আমি চা তৈরী করি না বুঝি? তুমি এতক্ষণ 'লেকচার'টা কিছু শোনোনি—ফাঁকি দিয়ে 'পার-সেণ্টেজ' নিয়েছ। আমাদের সংসারে কেউ কারুর কাছ থেকে কিছু আশা করবে না। আমাকে চা করতে বল্‌লে যে আশা করা হয়ে যায়!

[বিমল উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলো—সুধেন্দুও মৃদুমৃদু হাসতে লাগ্‌লো। বিভা দ্রুতপদে নীচে নেমে গেল। দুজনে অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।]

বিমল। [হঠাৎ একটু অদ্ভুতভাবে হেসে] হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল—আমি তখন দিনে এক বেলা ক'রে খাই। রাত্রে বিভাদের বাড়ী গিয়েছি। ও তখন আই-এ পড়ে। কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বে না। ওর জেদ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। স্পষ্ট আমার মুখের ওপর ব'লে দিলে, 'নিজের মন-গড়া কতকগুলো খেয়ালকে 'প্রিন্সিপ্‌ল্' ব'লে চালিও না। সত্যি যা করতে পারবে এবং অন্য সকলের মনের দিকে চেয়ে যা করতে পারা উচিত, সেইটুকুই করো। অনর্থক অন্য লোককে কষ্ট দিয়ে নিজে বড় হবার স্বপ্ন দেখো না।'

সুধেন্দু। [অসহায় ভাবে হেসে] বুঝি না। অথচ—! আচ্ছা বিমল, তুই তো আমায় বহুদিন থেকে দেখে আসছিস্—আমাকে কি কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক ব'লে বোধ হয়? কল্পনা করতে পারিস্ যে আমি মনটা বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলো নিয়ম আঁকড়ে থাকতে পারি?

বিমল। তুমি একটু গম্ভীর বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় নেই একথা পাগল না হোলে কেউ বলবে না। কেন, বিভা কি—

সুধেন্দু। [তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে] না—না—এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

[চা নিয়ে বিভা এল। বিমলকে এক কাপ দিয়ে আর এক কাপ টিপয়টার ওপর সুধেন্দুর দিকে এগিয়ে দিল।]

সুধেন্দু। এ কার?

বিভা। [স্নিগ্ধ কণ্ঠে] তোমার। খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিমল। [হঠাৎ কি কারণে খুব খুসী হয়ে উঠে] ওঃ, এতক্ষণ নজরই পড়েনি। সুধীদা, ঘাড়টা ফেরাও। দেখছিস্ বিভা? এটা কোন্ দেশী ভূতুড়ে চাঁদ রে?

বিভা। কিরকম ঘোলাটে হল্‌দে রং—

বিমল। আর অন্যদিনকার চেয়ে প্রায় দুগুণ বড়। বিভা, শিগ্‌গীর একটা গান ধর্—

বিভা। কি গান?

বিমল। গানের আবার অভাবটা কি? 'মলয় শিহরে কোকিল কুহরে' গোছের যা হোক একটা গা' না।

বিভা। মলয় আর কোকিলের খবর আমার তেমন জানা নেই। তুমিই বরং গাও—আমি শিখে নিই।

বিমল। [হতাশভাবে মাথা নেড়ে] ওরে, যদি গান গাইতেই জানতাম তাহলে আর তোকে অনুরোধ ক'রে অপমানিত হতাম না—নিজেই উচ্চৈঃস্বরে আরম্ভ ক'রে দিতাম।

বিভা। বা রে, অপমান আবার কখন করলুম? অপমান যাতে না ক'রে ফেলি, সেইজন্যেই তো গাইছি না। গুরুজনের সাম্‌নে গান গেয়ে শেষকালে বেহায়াপনা ক'রে বসি আর কি—উঃ—[ব'লে বিভা ভাণ-করা আতঙ্কে শিউরে উঠলো।]

বিমল। [উচ্চহাস্যে] উঃ, দেখিস্? অত ভক্তি ভালো নয়। কিসের লক্ষণ জানিস্ তো?

বিভা। যার লক্ষণই হোক্, তোমার ভয়ের কারণ নেই। নিজেকে গুরুজন-পর্য্যায়ে ফেলে কেন অনর্থক মনোকষ্ট পাচ্ছ?

বিমল। [রাগের ভাণ ক'রে] বটে—আমি গুরুজন নই? জানিস্—আমি তোর চেয়ে চার বছরের বড়? সম্পর্কে আমি তোর ঐ গুরুজনটিরও গুরু?

বিভা। [বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে] ঈস্—তাই বই কি। তাই অনবরত 'দাদা' 'দাদা' করা হয়।

বিমল। [গর্জ্জন ক'রে] 'দাদা' 'দাদা' করা হয়? মূর্খ, বুঝলি না, সেটা একটা লৌকিকতা মাত্র—'ফর্ম্মালিটি'। [হঠাৎ খুব মুরুব্বিয়ানা সুরে] ওহে সুধেন্দু, সিগারেট টিগারেট আছে? একটা দাও তো হে, একটু মৌতাত করা যাক্।—দেখ্‌লি?

[বিভা হেসে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। সুধেন্দু বিমলের একটা কান মৃদুভাবে ধ'রে বললে,]

সুধেন্দু। ও রাস্কেল! মার খোর অনেকদিন খাস্‌নি—না? [একটু পরে হাসি থামলে] তোরা বোস্—এখুনি আস্‌ছি— [প্রস্থান]

বিমল। [নীচু সুরে] বিভা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো—ঠিক সত্যি উত্তর দিবি?

বিভা। [চমকে] কি?

বিমল। [ইতস্ততঃ ক'রে] এই সুধীদার কাছে—মনে কর্ সুধীদার তো কতকগুলো খেয়াল আছে—তোর মনে কোনো দুঃখ বা—

বিভা। [আরক্ত মুখে তাড়াতাড়ি] যাঃ—দুঃখু কিসের—কি যে বল—

বিমল। চাপা দিতে চেষ্টা করিস্‌নি বিভা। আমি বুঝতে পেরেছি। আর তুই এমনি মুখ্যু যে নিজের মতটা জোর ক'রে শুনিয়ে দিতে পারিস্ না? এই কি তোদের 'আদর্শ গৃহস্থালীর' ফল?

বিভা। বাঃ, তা বল্‌বো না কেন? উনি তো সব বিষয়েই আমার মত জিজ্ঞাসা করেন।

বিমল। [উত্তেজিত ভাবে] আঃ, সে মত নয়। মনে কর্ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে তোর—হিসেব-করা কেতাবে পড়া মত নয়—সত্যি মনের ভেতরের কথাটা—

বিভা। [ব্যাকুল সুরে] চুপ কর—উনি আস্‌ছেন—

বিমল। বাঃ—এ কি দুর্ব্বলতা—

বিভা। তোমার পায়ে পড়ি বিমলদা—

[বিমল চুপ করলো বটে কিন্তু তার মুখে অপ্রসন্নতা ফুটে উঠলো। সুধেন্দু একটা এস্রাজ হাতে নিয়ে এল। এস্রাজে বাঁরোয়ার একটা তান তুলে বললে।]

সুধেন্দু। বিভা, সত্যি একটা গান গাও না

বিভা। [যেন কুণ্ঠভাবে] গাইছি।

[খানিকক্ষণ সকলে চুপ ক'রে রইলো—তারপর অতি মৃদুস্বরে বিভা গান ধরলে—সুধেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগলো।]

গান

মিলন-লোভী এল তো রাতি
এল সে ভয়াতুর
ভাবি এ নিশা কেমনে কাটে!
আবেগে তার নিভৃতি হিয়া
কাঁপিল দুরুদুর!
হাওয়ায় ভাসে এলোচুলের রাশ
শিহরে মন শিহরে নীলাকাশ!
ভাবি কি করি, এ বিভাবরী
কি অনুরোধে রাখিব ধরি'!
চরণহীন, স্মরণহীন;
গলায় নাই সুর;
কেমনে তারে থাকিতে বলি
যে জন যায় দূর!

[গান হয়ে গেলে সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। সুধেন্দু অকারণে এস্রাজটায় অল্প অল্প আওয়াজ করতে লাগ্‌লো—বিভা আকাশের দিকে চেয়ে রইলো—বিমল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো।]

বিমল। [হঠাৎ উঠে] আমি উঠলাম। আজ তাহলে যাই—রাত্রি হয়ে গেছে—

বিভা। বসো। এখানে আজ খেয়ে যাবে।

বিমল। না-না, সে বড্ড দেরী হয়ে যাবে—আজ থাক—অন্য আর একদিন—

বিভা। তোমাদের মেসে 'ফোন্' আছে তো? 'ফোন্' ক'রে দাও আজ আর সেখেনে ফিরবে না।

বিমল। তাই বই কি। ফিরতে আমাকে হবেই। খেয়ে না গেলে যখন ছাড়বি না তখন কি আর করবো—

বিভা। [উঠে] তোমরা বসো, আমি রান্নাঘর থেকে এখুনি আস্‌ছি— [প্রস্থান]

বিমল। ভাল কথা। সুধীদা, তোমার নতুন বই টই কিছু বেরুলো?

সুধেন্দু। বই তো দু' তিনখানা বেরিয়েছে, কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে কি বল? মাঝে মাঝে যখন ভাবি যে দেশের এই যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে ব'সে রয়েছি তখন নিজের ওপর ঘেন্না হয়। [নিঃশ্বাস ফেলে] যাই বল, বিবাহ একটা বন্ধন এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই—

বিমল। সে কি, সুধীদা? তোমাদের তো তা হবার কথা নয়—

সুধেন্দু। কথা তো নয়, কিন্তু মানুষের মন ব'লে যে অদ্ভুত খাপছাড়া একটা জিনিষ আছে তাকে সুসঙ্গতির মধ্যে আন্‌বার মতো কোনো উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি—

বিমল। কেন—বিভা কি তোমার আদর্শ গ্রহণ করতে পারে নি?

সুধেন্দু। বুদ্ধি দিয়ে নিশ্চয়ই পেরেছে কিন্তু হৃদয় দিয়ে নয়। অবশ্য মানুষের রুচির তফাৎ থাক্‌বেই। একজনের আদর্শ আর একজনকে নিতে বাধ্য করা অত্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দুঃখ এই যে আমার আদর্শ ব'লে নয়,—যুক্তি দিয়ে সত্য ব'লে যেটাকে ও বুঝেছে সেটাকে ও ভালবেসে নিতে পারছে না। ও আমার কাছে নানারকম তুচ্ছ জিনিষ আশা করে—যা না পেলে ওর বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই। অথচ ও নিজেই জানে যে এই জিনিষগুলোর দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে অনেক মনোমালিন্যের বীজ গোপন আছে।

বিমল। একটু খুলে বল—বুঝতে পারলাম না। কি চায় ও?

সুধেন্দু। এই ধর্, লিখতে আমার অনেক সময় যায়—তখন আমি ওর দিকে মনযোগ দিতে পারি না—আর পারা উচিতও নয়—কারণ বিয়েটা সব রকমে দু পক্ষের উন্নতিরই জন্যে, অনর্থক বাধা সৃষ্টির জন্যে নয়। ওর বোধহয় সেটা ভালো লাগে না—যদিও মুখে কখনো বলে না। তাছাড়া ও আমার দিকে একটু অনাবশ্যক বেশি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে—আমি কি খেতে ভালবাসি, কিসে আমার একটু

'কম্ফর্ট' হয়—এই সব আর কি! আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা করে আমি এই সব 'অ্যাপ্রিসিয়েট' করবো এবং হয়তো এটাও আশা করে যে ওর জন্যে আমি এই রকম অনাবশ্যক ভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবো—

বিমল। [রেগে বাধা দিয়ে] তুমি এমন ভাবে কথা কইছ, যেন তোমরা দুজনে একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটির মেম্বার মাত্র—তার চেয়ে বেশি কোনো সম্বন্ধ নেই—

সুধেন্দু। নেইই তো। 'সেন্টিমেন্ট্' এর দোহাই দিয়ে একান্ত অপ্রয়োজনীয় কতকগুলো দায়িত্বের সৃষ্টি ক'রে তোল্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই। এইটে আমার ভারী আশ্চর্য্য বোধ হয় যে বিভার মত মেয়ে—যার মনের একটা নিজস্ব মৌলিক দিক রয়েছে সে কেন এই সব তুচ্ছ জঞ্জালের মধ্যে নিজের সমস্ত মনটাকে জলাঞ্জলি দিতে চায়। ও যদি নিজের স্বতন্ত্র সাধনাকে প্রধান ক'রে রাখতে পারতো তাহলে আর কোনো গণ্ডগোলেরই সৃষ্টি হোত না। ওর জন্যে আমার দুঃখের আর শেষ নেই—সামান্য জিনিষের আকাঙ্ক্ষায় ও নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা হারাতে বসেছে।

বিমল। কি জানি বাপু, তোমাদের কথাবার্ত্তা বুঝি না। যাকে ভালবাস তার কখন কি দরকার, কিংবা কি হোলে সে সুখী হয়—সেদিকে একটু নজর দিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং আত্মিক অবনতি ঘটবে?

সুধেন্দু। [মৃদু হেসে] বিয়ে কর্—তখন বুঝবি। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, পাছে না পাই এই ভয়, না পেলে মনোমালিন্য—এতেও যদি আত্মিক অবনতি না ঘটে তো কিসে ঘট্‌বে তা তো জানি না। [কিছুক্ষণ চিন্তার পর] হয়তো অনেকের পক্ষে ঐরকম জীবনই ভাল—কিন্তু আমার ও সয় না। মিলন-বিরহ, আশা-নিরাশা, কলহ-দ্বন্দ্ব এবং পুনর্মিলনের রং ফলিয়ে আঁকা 'কন্‌ভেন্‌শন্যাল' সংসার-চিত্র আমার মোটেই লোভনীয় ব'লে মনে হয় না। ও তো সত্যি জীবনটাকে ভুলে থাক্‌বার জন্যে একটা হৈ চৈ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

[ব্যস্তভাবে দুই হাতে দুটো থালা নিয়ে বিভা এল। আঁচলটা কোমরে বাঁধা, খোঁপাটা খুলে গিয়ে অল্প কোঁকড়ানো কালো চুলের রাশ বুকের ওপর, ঘাড়ের ওপর, গালের পাশে দোল্ খাচ্ছে। মুখ হাসি হাসি। সুধেন্দু ও বিমল দুজনেই অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।]

বিভা। বিমলদা, শীগ্‌গির একবার উঠে পড়—ওই ঘর থেকে আর একখানা টিপয় আছে নিয়ে এস—লক্ষ্মীটি যাও—হাত ভারিয়ে গেল যে—

[বিমল টিপয় নিয়ে এল। বিভা থালা দুটো টিপয়ের ওপর রাখলো।]

বিভা। সহদেবটা আজ বুঝে বুঝে ভেগেছে। কোথায় তাদের দেশী যাত্রা হচ্ছে দেখতে গিয়েছে। হ্যাঁ গো, 'উইক্‌লি পেপার'টা যে মাটিতে প'ড়ে গেছে—ওটা ঘরে রেখে মুখ হাত ধুয়ে এস।

সুধেন্দু। তুমি নিজে—কেন বামুনটাকে তো বল্লেই হোত—

বিভা। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—শিগ্‌গীর যাও। বিমলদা, এসো—জল দিচ্ছি।

[মুখ হাত ধুয়ে সুধেন্দু এসে বসলো। বিমলের আগেই মুখ হাত ধোয়া হয়ে গিয়েছিল। সে এতক্ষণ ছাদের কোণে আলিসার ওপর হাতে মাথা রেখে কি একটা বোধ হয় ভাবছিল। সুধেন্দু এসে বসতে সেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সুধেন্দুর পাশে ব'সে পড়্‌লো।]

সুধেন্দু। তুমি বস্‌লে না বিভা?

বিভা। আমি খাব অখন—

বিমল। তবে রইলো। তুই খেতে না বস্‌লে আমিও খাচ্ছি না।

বিভা। আঃ, কি ছেলেমান্‌ষি করো—

বিমল। আহা, কি আমার বুড়োমানুষ রে।

[বিভা হেসে ফেললো। সুধেন্দু উঠে গিয়ে আর একটা টিপয় এনে রাখলে।]

সুধেন্দু। ঠাকুরকে বল তোমারও ভাত দিয়ে যাক্।

[বিভা একটু অবাক্ হয়ে সুধেন্দুর দিকে চেয়ে রইলো। তারপর চেঁচিয়ে ঠাকুরকে ভাত আন্‌তে ব'লে দিল। তিনজনে এক সঙ্গে ব'সে খেতে খেতে গল্প করতে লাগলো।]

বিভা। [মাঝে মাঝে থেমে] বিমলদা, লজ্জা কোরো না।...ঠাকুর, এই বাবুকে আর একখানা মাছ দিয়ে যাও। বাঃ, তুমি তো মাছের কালিয়া ভালবাস।...তাই বই কি,

ওটা না খেলে ছাড়বো ভেবেছ—ওটা আমি নিজের হাতে রেঁধেছি।…মিষ্টি খেতে আবার তোমার অরুচি হোল কবে থেকে, শুধু গুড় চুমুক দিয়ে খেতে যে, মনে নেই?…বা রে, দই খাবে না কেন, আর একটু নাও—তুমি তো আর গাইয়ে-বাজিয়ে লোক নও।—পাত যে একেবারে খালি, আর দুটি ভাত নাও—

বিমল। আরে গেল! তুই কি আমায় কুটুম্ব-সাক্ষাৎ পেলি নাকি? সুধীদাকে তো কিছু বল্‌ছিস্ না। সুধীদার পাতেও তো ভাত নেই—

বিভা। [লজ্জিত হয়ে] বল্‌লে যে রাগ করেন। ঠাকুর দুটি ভাত দিয়ে যাও—

সুধেন্দু। না থাক্, দরকার নেই।

[বিভা হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেল। বিমলের কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। খানিকক্ষণ বাদে একটা অদ্ভুত রকমের নীরবতার মধ্যে খাওয়া শেষ হোল। বিভা থালাগুলো নিজেই সরিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেল্‌লে। বিমল তার চেয়ারটা একধারে টেনে নিয়ে একটা চুরোট ধরালে। বিভা মশলার প্লেট হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।]

সুধেন্দু। তোমরা গল্প সল্প করো—আমার আর বস্‌বার উপায় নেই। [বিমলের উদ্দেশে] একটা লেখা শেষ ক'রে কালকেই প্রেসে দিতে হবে। এখন আরম্ভ না করলে আর হয়ে উঠবে না।

বিমল। [স্বরটা যথাসম্ভব প্রফুল্ল ক'রে] না সুধীদা, আজ যাই—আর একদিন আসা যাবে। অনেক রাত হয়ে গেছে।

[বিভা কিছু বলবে আশা ক'রে দুজনেই চুপ ক'রে রইলো। কিন্তু বিভা কিছুই বললে না।]

বিমল। আমার মেসের চাকরটা আবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চেয়েও বেশি ভয়ানক হয়ে উঠেছে। ফিরতে একটু রাত হলেই—জানিস্ বিভা—রীতিমত কৈফিয়ৎ দিতে হয়। হা—হা—হা!

[নিজের গলার স্বরটা যেন অনাবশ্যক উঁচু বোধ হওয়ায় বিমল চুপ করলো। মৃদু স্বরে 'আবার আসবো' ব'লে নীচে যাবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হোল। বিভা নীরবে তার সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্য্যন্ত গেল। সিঁড়ির মধ্যে দুজনে অদৃশ্য হতে সুধেন্দু খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে ডানদিকের ঘরটার কাঁচের উজ্জ্বল দোর পর্য্যন্ত গিয়ে আবার কি ভেবে ফিরে এসে ডেক্ চেয়ারটায় ব'সে পড়লো।

[বিভা ওপরে এসে একবার ডান দিকের ঘরটার দিকে চাইলে, তারপর অন্যমনে এসে ডেক্ চেয়ারটায় বস্‌তে গিয়ে চম্‌কে উঠলো।]

বিভা। ওঃ, তুমি এখানে—

সুধেন্দু। হাঁ, বেশ রাতটি! আজকে আর—ওকি, কোথায় যাচ্ছ?

বিভা। যাই, একটা সেলাই বাকি রয়েছে—

সুধেন্দু। [ইতস্ততঃ ক'রে] বিভা, শোনো না। সেলাই কাল হবে এখন। এখানে একটু বোসো না।

[বিভা ঠিক পুতুলটির মতো একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। সে যেন কিসের অপেক্ষা করছে—সুধেন্দুর যাহোক কিছু একটা বলা দরকার।]

সুধেন্দু। [অনেকটা আপন মনে] বহুদিন বাদে বিমলের সঙ্গে দেখা হোল। বেশ ছেলেটি—আচ্ছা, ও তোমাকে খুব স্নেহ করে—না?

বিভা। হুঁ।

[সুধেন্দু হঠাৎ হাসতে লাগলো—কেন বোঝা গেল না। তাকে যেন অত্যন্ত খেলো ব'লে মনে হতে লাগলো। বিভা নীরব বিরক্তিতে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। সুধেন্দু হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে উঠলো।]

সুধেন্দু। আজ একটা কথা তোমায় বলবো ব'লেই ডেকেছি। অনেকদিন থেকেই ভাবছি, কিন্তু—। মানে, আজকে বল্‌লে কথাটা ঠিক বোঝা যাবে। তুমি ভাবছ আমি হাসলাম কেন—হয়ত মনে মনে বিরক্তও হয়েছ।

বিভা। আমি বিরক্ত হয়েছি কিনা সে কথা তো অপ্রাসঙ্গিক।

সুধেন্দু। [আহতভাবে] থাক্—তা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। কারণ আমি জানি এ বিষয়ে দোষ আমার বিন্দুমাত্র নেই। তোমার নিজের মতামত দেবার বা নিজের খুসি মতো চলবার স্বাধীনতা আমার চেয়ে কম নেই একথা তুমি নিজেই ভালভাবে জান। কিন্তু সে শক্তি ব্যবহার করতে তোমার উৎসাহ নেই—কেন তা আমি এতদিন চেষ্টা করেও বুঝতে পারলাম না। আমি জানি—আমার আদর্শ তুমি একান্তভাবে গ্রহণ করতে পারনি, তাই তোমার মনে

অশান্তি, আর সেই অশান্তির ঢেউ আমারও মনে এসে লেগেছে। কিন্তু তুমি খুলে বল না কেন? আমি একজন Tyrant নই, যে জোর ক'রে আমার আদর্শ—তা সে আমার যত প্রিয়ই হোক—আর একজনের ঘাড়ে চাপাব। বিভা—

বিভা। [প্রশান্ত স্বরে] অনেক রাত হয়েছে—শুতে যাও।

সুধেন্দু। [বিভার হাত ধ'রে] শোন। এভাবে নিজের মন খারাপ ক'রে কোনো লাভ আছে? তুমি হয়ত মিছিমিছি ভেবে নিয়েছ যে আমি তোমায় তেমন—ভালবাসি না। আচ্ছা বিভা, সত্যি বল—তোমার কি তাই মনে হয়?

বিভা। [হাত ছাড়িয়ে নিয়ে] আচ্ছা, কি ছেলেমানুষি করছ বল তো। ওসব কথা কে বলেছে তোমায়?

সুধেন্দু। কেউ বলেনি। আমি জানি। বিভা—। তুমি আমায় বিশ্বাস কর না।

বিভা। [অপ্রস্তুত ভাবে যেন নিজের মনেই] কি যে সব বলছ! আমি যেন তাই—বাঃ।

সুধেন্দু। [হঠাৎ বিভাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিয়ে] তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। তুমি জান—আমি তোমায় ভালবাসি। বল—তুমি জান?

বিভা। [মন্ত্রমুগ্ধের মতো] জানি।

সুধেন্দু। তবে? তবে কেন—

[কি বলতে যাচ্ছিল তা আর সুধেন্দুর মনে পড়ছে না। চাঁদের আলোয় বিভার মুখটি ভালো দেখাচ্ছে। দু একবার কথাটা শেষ করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে শেষকালে বিভার মুখে চুমা খেয়ে অসমাপ্ত পদ-পূরণ করলো।

বিভা অদ্ভুত রকম ব্যবহার আরম্ভ করলো। প্রথমে দু একবার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার ক্ষীণ চেষ্টা ক'রে শেষ হঠাৎ কাঁদতে সুরু ক'রে দিলে—একান্ত নীরবে। সুধেন্দুর হাতে চোখের জল না লাগলে সে তো বুঝতেই পারতো না।]

সুধেন্দু। ওকি বিভা, কাঁদছ? বিভা, বিভা! আচ্ছা, আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি কি ভাবলে আমি তোমায় জোর ক'রে—তুমি আমাকে বারণ করলেই পারতে। বোসো না ঐ চেয়ারটায়। আমি তো আর তোমায়—। আচ্ছা, হঠাৎ কাঁদলে কেন বল তো?

বিভা। [অতি কষ্টে সাম্‌লে] কাঁদব কেন?

সুধেন্দু। নিশ্চয়ই কেঁদেছ। তুমি যদি শুধু আমায় একবার—

বিভা। আঃ, আমি কি তাই বল্‌ছি?

সুধেন্দু। সে জন্যে নয়—? তবে?

বিভা। তোমায় না কাল সকালের মধ্যে এক—ফর্ম্মা লিখে প্রেসে দিতে হবে?

সুধেন্দু। [অবাক হয়ে] সেই কথা ভেবে তুমি কাঁদছিলে!

বিভা। কি যে বলে—। [ব'লে গোড়ায় আস্তে এবং শেষে বেশ জোর ক'রে টেনে টেনে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিল।]

সুধেন্দু। নাঃ—এদের কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

[বিভা কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। শিরশির্ ক'রে হাওয়া বইতে সুরু করেছে। সেই হাওয়ার উদ্দামতার মধ্যে তাদের মনের তীব্র ভাবগুলো সহজ হয়ে উঠলো বোধ হয়। সুধেন্দু যেন স্বপ্ন দেখছে এমনভাবে মৃদুস্বরে কথা কইতে আরম্ভ করলো।]

সুধেন্দু। মনে পড়ে বিভা, যেদিন আমাদের বিয়ে হোল? আর একসঙ্গে সেই প্রথম রাত? মনে হচ্ছে যেন—কাল। অথচ ছ'মাস হয়ে গেল। এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। কি ক'রে যে কি হোল। আমাদের সত্যি সত্যি যে বিয়ে হতে পারে একথা তো ভাবিইনি।

বিভা। [অতি মৃদুস্বরে] তুমি একদিন আমায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে আর কিছুতে বাড়ী ফিরে যেতে দেবে না। বাড়ীর কথা বল্‌তে গেলেই রেগে উঠতে লাগলে। শেষকালে কান্নাকাটি ক'রে তবে বাড়ী ফিরি। মনে পড়ছে না?

সুধেন্দু। খুব মনে পড়ছে। তোমার বাবার সে কী বকুনি। সেদিন আবার তোমার জন্মদিন ছিল। [চিন্তিত ভাবে] কিন্তু কত কথাই ভুলে গিয়েছি। সব যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করি—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারি না। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে—এত বড় একটা অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা—এ যেন ঠিক আয়ত্ত ক'রে

উঠতে পারি না। মনে হয় প্রত্যেক মুহূর্ত্তটাকে ধ'রে এক একটা চিহ্ন বসিয়ে দিই—মধুর, সুন্দর, উদাস, স্বর্গীয়—যাতে পরে তাদের চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু শেষে দেখি একটাকেও আর চেনা যায় না। এ যেন একটা প্রকাণ্ড অবিচ্ছিন্ন তটহীন প্রবাহ—বোঝবার উপায় নেই কতদূর এলাম—শুধু ঢেউ আর ঢেউ—একটা দ্বীপও নেই যে তাকে ঘিরে নিজের চলার বেগ অনুভব করি। বিভা, আমরা যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছি—!

বিভা। তোমারও তাই মনে হয়? আশ্চর্য্য! সেই জন্যেই তো আমি—। [আকাঙ্ক্ষার সুরে] আচ্ছা, তুমি আমাকে অন্য সব মেয়েদের স্বামীদের মতো খুব খাটিয়ে নিতে পারো না?

সুধেন্দু। সেকি, তা আমি করতে গেলাম কেন?

বিভা। [ক্লিষ্ট সুরে] আমার ভয় হয়! মনে হয় যেন শূন্যে ভাসছি—মাটিতে পা ঠেকছে না। মনে হয় যেন কি একটা খুব দরকারী কথা ছিল—ভুলে গেছি। [প্রায় কান্নার সুরে] আমরা কি সুখী?

[সুধেন্দু যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চেয়ার থেকে উঠে পড়লো। উত্তেজিতভাবে ছাদের ওপর পায়চারি করতে লাগলো। 'আমরা কি সুখী' কথাটা যেন আকাশে hollow ভাবে থম্ থম্ ক'রে বাজতে লাগলো, সুধেন্দুর কানের মধ্যে বিরক্তিকরভাবে গুঞ্জন আরম্ভ করলে। হাওয়াটা হঠাৎ প'ড়ে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ বাদে আবার এক দমকা হাওয়া উঠতে কথাটা ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে হয়ে ছাদের ধারের টবে বিভার নিজের হাতে পোতা কামিনীফুলের গন্ধের মতো মৃদু হয়ে এল। সুধেন্দু একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এসে চেয়ারটায় শ্রান্তভাবে এলিয়ে পড়লো। আধ-খোলা চোখে সে বিভার দিকে চেয়ে রইলো—তাকে অতি অদ্ভুত ব'লে মনে হতে লাগলো—সে যেন একটা বিরাট ট্র্যাজেডির নায়িকা।

চতুর চাঁদ বিভার এলোচুলগুলো গুছিয়ে খোঁপা বাঁধবার ছায়াচিত্র নিতে বারবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে শেষকালে একটা মেঘে ঢাকা প'ড়ে গেল। বিভা যেন কি রকম অস্থির হয়ে উঠেছে—একভাবে এক মুহূর্ত্ত বসতে পারছে না—তার ঠোঁটদুটি কাঁপছে অথচ সে কিছুই বলছে না। শেষকালে চেয়ারের হাতলটা ধ'রে শক্ত হয়ে ব'সে সে হঠাৎ অস্বাভাবিক গলায় মরিয়া হয়ে বলতে আরম্ভ করলো।]

বিভা। আমি মেয়েদের স্কুলে চাকরি নিয়েছি—

[কথাটা ব'লেই দু হাতে মুখ ঢেকে বিভা কান্নায় ভেঙে পড়লো। খানিকক্ষণ বাদে সে মুখ তুলে দেখলে সুধেন্দু আগের মতোই নিশ্চল হয়ে ব'সে রয়েছে। সে ভয় পেয়ে গেল—তার কান্না থেমে গেল সেই জন্যেই। সুধেন্দুর চেয়ারের পাশে মাটিতে হাঁটু রেখে সে তার কোলের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। একটা অদ্ভুত ঘোর থেকে সুধেন্দু যেন জেগে উঠলো। বিভার মাথায় হাত দিয়ে প্রথমে বোধ হয় তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—তারপর হঠাৎ তার মুখটা দু হাতে তুলে ধরলে। উত্তেজনায় তার সর্ব্ব শরীর কাঁপতে লাগলো।]

সুধেন্দু। বিভা, বিভা! আমি তোমায় ভালবাসি।

বিভা। [কান্নাজড়ান স্বরে] না—না—না!

সুধেন্দু। [বিভাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে] শোনো। শুনছ? আমি তোমাকে ভালবাসি—আমি তোমাকে ভালবাসি—আমি—তুমি যেরকম ভালবাসা চাও সেই রকম ভালবাসি। তুমি কি চাও?

বিভা। আমায় ছেড়ে দাও—আমার লাগছে—

সুধেন্দু। [পাগলের মতো] বল, তুমি কি চাও—

বিভা। উঃ—

[সুধেন্দু তাকে ছেড়ে দিলে। সে উঠে প্রায় দৌড়ে ছাদের আলিসাটার কাছে চলে গেল। সুধেন্দু হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ ব'সে রইলো। তারপর অতি ধীরে বিভার কাছে গিয়ে মৃদুভাবে তাকে স্পর্শ করলে। বিভা মুখ ফেরালে না—সাড়াও দিল না।]

সুধেন্দু। [আশ্চর্য্যরকম প্রশান্ত গলায়] তাই হবে বিভা, এ আমাদের সইবে না।

[দুজনেই নীরব]

বিভা, তুমি কি কাজ নিয়েছ, তাই করো। আমারও এবার আলস্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার সময় হোল। দেশের এই চরম দুরাবস্থায় নির্লিপ্ত থাকবার গ্লানি থেকে এবার মুক্তি পাব।

[দুজনে অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। আড়চোখে পরস্পরকে দেখতে লাগলো—যেন নতুন মানুষ। তারপর বিভা যেন নববধূটির মতো লজ্জিত-সঙ্কোচে এসে সুধেন্দুর হাত ধরলো।]

বিভা। শোবে চল—অনেক রাত হয়েছে।

—যবনিকা—

সুনীলচন্দ্র সরকার

ডন্ কুইক্জট্

শ্রীসুশীলকুমার দেব

আজ ছুটি। কালও ছুটি। এম্নি বসে-বসে কি করা যায়? উপরন্তু, আজ শনিবার—লণ্ডনের সাপ্তাহিক উৎসব-সমারোহ মেতে ওঠার দিন। নাঃ! একবার বেরোতেই হচ্ছে। কী সোনালি রোদই না উঠেছে আজ। গ্রীষ্ম এসেছে নব বরের বেশে—ঐ বাগানের এক গাদা টিউলিপ্ ফুলের লাল রঙ্ মাখানো উত্তরীয় পরে, নীল আকাশের গায়ে হাঁসের পালকের মতো থোকো-থোকো সাদা মেঘ-খণ্ডের চন্দ্রাতপ তলে, আসর জমিয়ে। লণ্ডনের গ্রীষ্ম তো একটা আদ্যন্তমধ্য ঋতুর ব্যাপার নয়; সে বছরে অবুরে-সবুরে এক-আধবার আসে কয়েক দিনের জন্যে, কয়েক ঘণ্টার জন্যে—দেবতার আশীর্ব্বাদের মতো-ই দুর্ল্লভ অকারণ বিস্ময় যেন! একে অবহেলা করা পাপ।

অরবিন্দ তাই বেরোলো। রয়েল্ পেলেস্ হোটেলে একটু চা খেয়ে আস্‌বে; লণ্ডন্-লাইফের উৎস পিকেডিলিতে গিয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে আস্‌বে।

একখানা বাস্ গোল্ডার্স গ্রীণের চৌমাথা থেকে রওনা দিচ্ছিলো। অরবিন্দ চট্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো। অবকাশ-ভরা রোদ্দুর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব কর্‌বে বলে দোতলায় গিয়ে আসন নিলে। আজ মনটা উৎসবের আনন্দে এতো ভরপুর যে, চল্‌তি পথে চোখ্ দিয়ে শত শত কৌতুককর জিনিষ দেখেও যেন সে দেখ্‌ছিলো না; চোখ্ স্তিমিত হয়ে এসেছে, আর মনটা কুশাগ্রের মতো সজাগ। নেমে একটা মোড় পেরিয়েই হোটেলে সরাসর ঢুকে একখানা টেবিলে আসন নিলে।

ঘর-ভরা লোক। চা-এ চুমুক দেওয়া ও কেক্ কামড়ে খাওয়ার ফাঁকে অরবিন্দ চেয়ে দেখে ছোটো-ছাটো টেবিল ঘিরে নর-নারীর কেমন নির্ভীক সহাস্য গুঞ্জনালাপ! ইস্, ঐ মেয়েটি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বোটার্-হ্যাট্ পরে এসেছে। কী সেজেছে—যেন এক্ষুণি ফ্লিমে ওঠার জন্যে কেমেরার সাম্‌নে পোজ্ দেবে! ওমা! দেখো, কী নির্লজ্জের মতো তাকাচ্ছে! এ-কী, এদিকেই উঠে আস্‌ছে যে!

'এখানে বস্‌তে পারি কি?—আপনার যদি কিছু অসুবিধে না হয়।'

'না, কিছু না; বসুন। পরিচারিকাকে ডেকে দেবো?'

'ধন্যবাদ।...আপনি এদেশে অনেক দিন আছেন—নয় কি? আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে, এদেশী চাল-চলনে আপনি অভ্যস্ত।'

'আমি এই দু'বছর আছি। আরো বছরখানেক থাক্‌বো।'

'আপনি একজন বাঙালি, না? সে আমি আপনার হাসি দেখেই টের পেয়েছি।'

'দেখুন, হাসি দেখে জাত ঠিক করা যায়, এ আজ নতুন শুন্‌লুম। আপনি বোধ হয় জানেন না: আপনাদের দেশী একজন আমাদের সম্বন্ধে বলেছেন যে, আমরা হাস্‌তে জানিনে; তিনি একজন ভূতপূর্ব্ব বাঙ্‌লার লাট্।'

'তাঁর কথাটা মেনে নিজের অভিজ্ঞতাকে অবিশ্বাস কর্‌তে পারিনে। আমার বাবা বারো বছর কল্‌কাতার একটা কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। এখানে কলেজে ডিগ্রী নেবার পর আমিও বাঙ্‌লা দেশে বাবার সঙ্গে চার বছর ছিলুম। এক ফরাসী ছাড়া পৃথিবীতে এমন দিল্-খোলা হাসি আর কোনো জাতের নেই বলেই আমার ধারণা।'

'আমাদের দেশে দেখেছেন? ও! তাহলে আপনার অজানা নেই আমাদের মজ্জাগত দুঃখাদর্শ, পরকাল চিন্তাপর জীবন-যাত্রা ঠিক কি রকম আপনাদের ধারার উল্টো। আপনাদের চিয়ারফুল্‌নেস্'—

'আপনি ভুল বল্‌ছেন মিষ্টার···ক্ষমা কর্‌বেন।'

'বড়ুয়া।'

'মিঃ বড়ুয়া, চিয়ারফুল্‌নেস্ আপনি যাকে বলেন তার সমাজগত চর্চ্চা আপনাদের নেই; এ আমি দেখেছি। আমরা যেখানে খুসী হয়ে উঠি সেখানে আপনারা ভদ্রতা-সূচক কোনো ভঙ্গী করেন মাত্র। ভদ্রতার ভেতর আপনাদের নম্রতা আনন্দের মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায়। খামোখা খুসী হয়ে ওঠার যে একটা আর্ট আছে, তা আপনারা আদৌ জানেন না। কিন্তু, খুসী না হলেও সুখী হতে জানেন। খুসী-ভাব বড়ো জোর সমস্ত মুখখানাকে ক্ষণিক বিভাময় করে তোলে। কিন্তু, সুখী হন আপনারা একেবারে অন্তর থেকে, হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে। এর পরিমাণ খুব বেশী না হতে পারে—গভীরতা আছে। পরিমাণ কম. বল্‌ছি এজন্যে নয় যে, আপনাদের হৃদয়ের বিস্তার অল্প। এজন্যে মোটেই নয়। একটা কারণ বোধ হয়, আপনাদের সামাজিক-রাজনীতিক জীবনে দারিদ্র্য।'

'দারিদ্র্য?—হাঁ।'

'তবু তো এ-দারিদ্র্য বাইরের থেকে চাপানো—যে-দারিদ্র্য শুধু পেটে ভাত ও গায়ে কাপড়ের জন্যে দায়ী। এ-দারিদ্র্য বাঙালীদের মনের ওপর অনেক মার করে সত্যি, কিন্তু মনকে মেরে ফেল্‌তে পারে না। মনের দারিদ্র্যই প্রকৃত দীনতা হীনতা। রোম এককালে গ্রীসের ওপর আধিপত্য কর্‌লেও কাল্‌চারের ব্যাপারে সর্ব্বত গ্রীসের মুখাপেক্ষী ছিলো। সেই যে প্রাচীন ভারত-ভারতীর মন থেকে সচ্চিদানন্দের উৎস বেরিয়েছিলো তার মুখ বাঙালীর প্রাণে এখনো বুজে যায়নি। আপনাদের রামকৃষ্ণ পরমহংসের মনে যে আনন্দ-সুধার অভ্যুদয় হয়েছিলো তা সব বাঙালীর মনেই কিছু কিছু আছে।'

'ও! আপনি সদ্য-প্রকাশিত রোঁম্যা রোল্যাঁর বই পড়েছেন বুঝি?'

'ম্যাক্স মুলরের লেখা বইটিও অনেক দিন হলো পড়েছিলুম।'

'আবার সচ্চিদানন্দের কথাও বল্লেন? আপনি অনেক খবর রাখেন সত্যি। কিন্তু ঐ যে বল্লেন—আমাদের সামাজিক জীবনে আনন্দের দারিদ্র্যের কথা, তার প্রত্যেকটি অক্ষর খাঁটি।'

'কিন্তু, এ-ও জানবেন—আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক চিয়ারফুল্‌নেস্ আপনাদের সচ্চিদানন্দের ছায়া নিয়ে ভণ্ডামি করা মাত্র।'

'সেই কথাই তো বলি। ভালো-কে নিয়ে ভণ্ডামি করাও শ্রেয়। আমি তো বাঙালি। কই, সচ্চিদানন্দ-অনুভূতি আমার কোথায়? অথচ আপনাদের ভণ্ডামিটাও আমার কাছে দুর্লভ।···ভারতীয়দের প্রতি আপনার সহানুভূতির তারিফ্ কর্‌ছি। তবে প্লেটের কেক্-গুলোকে একেবারে ভুলে যাবেন না। একটু চা ঢেলে দেবো কি?'

'আপনারও চা দরকার দেখ্‌ছি। আমিই দিচ্ছি ঢেলে। চিনি দু' চামচ?'—এই বলে অরবিন্দর পেয়ালায় চা-চিনি-দুধ পরিবেশন করে দিলেন।

অরবিন্দ ধন্যবাদ দিয়ে বল্লে: বেশী চিনি খেয়ে কার্ব্বো-হাইড্রেডের বোঝা হতে চাই নে।···হাস্‌ছেন? আমরা যা মোটা আর বেটে! আপনারা কেমন টল্ আর স্লিন্! আচ্ছা, যদি কিছু না মনে করেন তো বলি, আপনি সাজগোজ কর্‌তে খুব ভালোবাসেন, না?

'খুব chic যে! হাঁ, আমার প্রসাধনটি আর কাপড়-চোপড় বড্ড ভালো লাগে।'

'লোক ভুলোবার জন্যে বুঝি?'

'কেন, লোক ভুলিয়ে লাভ কি? অমন্ লোভ-ই বা হবে কেন? নিজেকে ভোলাবার জন্যেই সাজি, বুঝ্‌লেন?'

'বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছে হয় না।'

'তাহলে এ আপনার মানসিক দুর্ব্বলতা।···নিজের রূপ-গর্ব্বে আমরা নিজেরাই সুখী হই। আমরা যে বর্ত্তমান যুগের নার্সিসাসের দল। একদা নাকি নারী ইভ্ সৃষ্টির আদিম পুরুষকে ফুস্‌লিয়ে ভোগের পিচ্ছিল পথে টেনে এনেছিলো।'

'অধুনা বুঝি ইভ্‌রা তা করেন না?' 'তারপর থেকে যুগ-যুগান্ত ধরে পুরুষেরাই নারীকে

প্রলোভিত করেছে, অধিকার করেছে, আত্মসেবায় নিয়োজিত করেছে ;—ডন্ জুয়ানের দল। সেদিনও গেছে। এলো য়ুরোপে ও আমেরিকায় ডন্-জুয়ানা নারীরা। এরা রূপ দিয়ে, কলা-কৌশল দিয়ে পুরুষের চিত্ত সহজে হরণ করতে লাগ্‌লো।'

'করছেও এখনো, নয় কি ?'

'বাইরে থেকে তাই মনে হয়, মিঃ বড়ুয়া। একবার যদি অন্তঃসন্ধান করেন, দেখ্‌বেন ভাঙন্ ধরে গেছে। যে-প্রেমে কলুষের এতটুকু কলঙ্ক নেই, আত্মার মহামিলনে যার তৃপ্তি—তাকে পুরুষ ও নারী উভয়েই দেহ-মনের সঙ্গম বলে যখন ভুল করলো, তখন সৃষ্টির এই লোকায়ত অতৃপ্ত অসম্পূর্ণ নর-নারীর প্রেম নিয়ে বিতর্ক উঠ্‌লো নারীর মনে। নর-নারীর প্রেমকে লোকে দিব্য বলে জান্‌তো। বিচারে ধরা পড়্‌লো : অসম্পূর্ণ প্রেম ভালো-মন্দ মেশানো ভেজাল জিনিষ, জগতের আরো পাঁচটা জিনিষের এ-ও একটা। একে নিয়ে অতো মেতে ওঠা, সীরিয়স্ হওয়া বোকামি। তাই, যে-প্রেমকে দিব্য ভেবে "লীলা" বলা হতো, তাকে এখন আমরা বলি "খেলা"। জীবন একটা খেলা বইতো নয়। সব খেলারই নিয়ম থাকে। প্রেমের খেলারও নিয়ম জানা চাই। অন্যান্য খেলার মতো এ খেলায়-ও হার্-জিত্ আছে ; ড্র-ও যে কদাচিৎ হয় না, তা নয়। যাক্। আপনাদের দেশের ধারণা, সধবারা এ-খেলায় দিব্যানন্দ লাভ করে—বিষকন্যা, অরক্ষণীয়া, গতিহীনা বা পতিতা নারী চির-দুর্ভাগা ; কারণ তারা এ-খেলায় হেরে গেছে।'

'খেলাই যখন বল্‌ছেন, তখন শেষাশেষি অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। অদৃষ্টের খাতিরে যেমন একদল জেতে, তেম্‌নি আবার আরেক দল "মহত্ত্বর উদ্যতবজ্র" অদৃষ্টের চাপে পিষে মরবে ;—এতে আশ্চর্য্য কী ?'

'কেন ? খেলায় একবার-দু'বার হেরে গেলেই—না, খেলা বন্ধ করে দাও বলে অভিমান করা মানে মনুষ্যত্বকে ধিক্কার দেওয়া মাত্র। কি বলেন ? অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়াই করেই জো সভ্যতার সৃষ্টি, মনুষ্যত্বের প্রসার। তাই, আমি প্রেমের খেলায় স্পোর্টস্‌ম্যান্ হতে চাই।'

'ম্যান্ না ওম্যান্ ?'

'তা যা ইচ্ছে হয় বলুন। কিন্তু, এই খেলাকেও আমরা দশটা খেলার মতো খেলাই মনে করি ; এবং খেলা মানে নিয়ম-মাফিক খেলা। স্পোর্ট্ পদার্থটা একটা অ্যানার্কি নয়—মস্ত বড়ো ডিসিপ্লিন্। প্লেতোর Republic-এ প্রজা-সৃষ্টির আইন-নির্দ্ধারিত সময়-অসময়ের ইতিবৃত্ত পড়ে তথাকথিত নীতিবিৎ কেউ-কেউ নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, প্লেতো নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর এই রাষ্ট্র-গত যৌন-কার্য্য ব্যবস্থার মূল সূত্র ছিলো—ডিসিপ্লিন্।...যাক্, যে কথা বল্‌ছিলুম—আমরা চাই সুখ। সে সুখ তো অন্তরে ; তাকে বাইরে পুরুষের গায়ে টেনে এনে ফায়দা কি ? ডন্-জুয়ানা নারীর পালা এবার শেষ হতে চল্‌লো। নারী এখন পুরুষমুখাপেক্ষিণী নয়, পত্যনুসারিণীও নয়, ডন্ জুয়ানাও নয়। আজ সে স্বতঃরতা, আত্মসংস্থা।...আমি দেহ থেকে আরম্ভ করেছি, মিঃ বড়ুয়া। নিজেকে সাজিয়ে বেশ সুখ পাই। আশা করি, একদিন দেহের মনোযোগ আত্মায় গিয়ে পৌঁছোবে।'

'আপনি চান নারীরা স্বতঃরতা হবেন। তাহলে বিয়ের ব্যাপারে শৃঙ্খলা থাকবে না। তার কি ?'

'প্রচলিত বিবাহে শুধু বিশৃঙ্খলা হবে ভাব্‌ছেন ?—এ একদিন আমূল উচ্ছেদ হবে। আপনারা বিবাহ বল্‌তে কী বোঝেন : নারী হবে পুরুষের যৌবনে তার বিলাস-সঙ্গিনী, প্রৌঢ়াবস্থায় তার বান্ধবী, বার্দ্ধক্যে তার সেবিকা—এই তো ? কেন ? নারীরও তো আত্মা আছে—যে আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত নিঃসঙ্গ। এই আত্ম-মহিমার আলোকে নারীর জীবন-পথে স্বতন্ত্র স্বাধীন পদচারণার শুভ লগ্ন-কাল অদূরে।'

অরবিন্দর ইচ্ছে হলো একটু রহস্য করে। তাই সে বল্লে : আপনার কপালে দেখ্‌ছি বিয়ে নেই। কিন্তু এ-কথার উত্তরে সে যা শুনলে তা নিতান্তই করুণ।

'ও ! বিয়ে আমার হয়ে শেষ হয়ে গেছে।' ক্ষণকাল থেমে বলতে লাগলেন : 'আমার বিয়ে হয়েছিলো কেম্ব্রিজের একজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে দু'জনে যখন এক সঙ্গে পড়্‌তুম। তারপর দু'বছরের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার দুর্ভাগ্য—ভারতবর্ষে আমার বেশী দিন থাকা হলো না। বাবাও কয়েক বছর হলো মারা গেছেন।

এখন লণ্ডনেই একটা মেয়ে-ইস্কুলে মাষ্টারি করি।' কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই হাত-ব্যাগ থেকে খুলে একখানা কার্ড অরবিন্দর হাতে দিয়ে বল্লেন: আপনার যদি অবসর থাকে আমাদের ইস্কুল দেখার জন্তে যেতে পারেন। আমাদের একটা নৃতত্ত্বের বিভাগ আছে। নানা দেশের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। এড্‌মিশন্ ফ্রি। আমি গত বছর ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বারোটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

অরবিন্দ কার্ডে দেখলে, নাম মিসেস্ আইরীন্ চ্যাটার্জ্জি। বল্লে: 'মাষ্টারি করে দিনের পর দিন কাটাতে ভালো লাগে?' এবারে যে-উত্তর শুন্‌লে তা আরো করুণ।

'উঁহু, ভালো লাগে না, মিঃ বড়ুয়া। আমার বড্ড নির্জ্জন জীবন। বই পড়ে ছবি এঁকে নিত্য-নতুন "হবি" নিয়ে কোনো রকম কেটে যাচ্ছে।... আপনি জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসেন? বাবা চলে যাওয়ার পর একবার একটা ভালো কুকুর পুষেছিলুম। দেখ্‌তুম, আমার যত্ন-অযত্নর বড়-একটা তোয়াক্কা রাখ্‌তো না। হামেশাই যেন কি-জন্তে ছট্‌ফট্ কর্‌তো। একটা স-গোত্রা কুকুরী কিনে এনে এর সঙ্গিনী করে দিলুম। কুকুরটা কী খুসি! এদের বাচ্চা-কাচ্চা হলো—একটা মহামারীর সময় সবগুলো গেলো মরে। দুঃখে মা-ও মর্‌লো। তারপর কুকুরটার কী-কান্না। উঃ! আমি কিছুতেই সইতে পার্‌লুম না। রিভল্‌ভার দিয়ে নিজের হাতে গুলী করে তার দুঃখ-শান্তি কর্‌লুম। আমিও যেন বাঁচলুম। তারপর থেকে পশু পোষার নামও করিনে। এখন একাই বেশ আছি।'

'একটা সিগ্রেট্ আপনাকে দিতে পারি কি?'

'না, ধন্তবাদ। আপনি নিন। আমি আগে খেতুম কেম্ব্রিজে পড়ার সময়। আমার স্বামী একদিন বারণ করাতে আর খাইনি।'

'বটে?'

'হাঁ, আমার স্বামী খুব ধার্ম্মিক ছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে আমায় পুজো-আহ্নিক শিখিয়েছিলেন। আমার কী যে ভালো লাগতো, কি বল্‌বো! ধূপ-ধুনো, কোশাকোশি, পুজোপাত্র সাজিতে ফুল-বেলপাতা, চন্দন—এসব দেখলেই প্রাণ নেচে উঠ্‌তো! ইংলণ্ডে ফিরে এসে আর সে অভ্যাস রইলো না। রোজ সকালে হাত-মুখ ধুয়ে ব্রেক্‌-ফাষ্টের সময় পুজোর কথা মনে পড়্‌লেও এগ্‌-বেকনের লোভটা ঠিক সে-সময়ে এম্‌নি চেপে বস্‌তো যে, ইশ্‌পিশ্‌ কর্‌তে-কর্‌তে গিয়ে খাবার টেবিলে বসতুম; পুজো না করেই খেতুম। খেয়ে আর পুজো কর্‌তে ইচ্ছে হতো না। এম্‌নি ধীরে ধীরে পুজো বন্ধ হলো।'

'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা অনুরোধ করি।'

'অতো লজ্জা কেন? বলেই ফেলুন না।'

'দেখুন—প্রত্যেক শনিবার দিন যদি আপনি এম্‌নি বেড়াতে বেরোন্, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার দেখা শোনা কথাবার্ত্তা হতে পারে। এতে আপনারও সময় বেশ কাটবে। আপনাকে আনন্দিত কর্‌তে পার্‌লে আমিও নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আমাকে বন্ধু বলে নেবেন।......এই আমার ঠিকানা দিচ্ছি। শুক্রবার দিন আমায় একখানা কার্ড লিখে জানাবেন—কোথায় দেখা হবে। তদনুসারে দেখা কর্‌বো।'

'এ তো খুব ভালো প্রস্তাব।'

তারপর দু'জনেই মুহূর্ত্তকাল চুপ। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বল্লেন: চলুন, এবার ওঠা যাক্। বাইরে একটু বেড়িয়ে বেড়ালে হয়।

অরবিন্দ অনতিবিলম্বে পরিচারিকার কাছ থেকে এক বিলে-ই দু'জনের খরচাটা লিখিয়ে নিয়ে কাউণ্টারে টাকা দিয়ে বেরোলো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ডিনারের সময় এলো। এবারে বিদায় নিতে হবে। বেড়ানোর আর সময় নেই। যাবার বেলায় আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে বল্লে: আচ্ছা, আগামী শনিবারের কথাটা ভুল্‌বেন না কিন্তু।

তারপর দু'জন দু'দিকে চলে গেলো।

সন্ধ্যার পিকেডিলি বিজ্‌লি-আলোয় আলোময়। ভ্রাম্যমান্ নর-নারীর শোভা-সম্পদে অতুলনীয়। নাঃ! আজ আর এই সিনেমা-রেস্তোঁরার চাকচিক্য, যান-বাহনময় রাস্তার গমাগম ভালো লাগ্‌বে না। অরবিন্দ টিউব্ ষ্টেশনে নাম্‌লো।

'স্মোকিং' লেখা একখানা ক্যারেজে তাড়াতাড়ি উঠেই একটা সিট্ ভিড়ের মধ্যেও ভাগ্যিস্ মিলে গেলো। একটি

সিগ্রেট্ মুখে দিয়ে লাইটার্ সাহায্যে আগুন ধরালে। উঃ! কী ভীড়! কতো মেয়ে-পুরুষ সিট্ না পেয়ে ঝোলানো হাতল্ ধরে ঘিচিঘিচি দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, কারুর মুখেও তো এতটুকু বিরক্তি নেই। এদের এই উৎসাহ উদ্যম দেখলে মনে হয় না এদের কিছুমাত্র দুঃখ আছে—তা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি যাই বলুন। কল্‌কাতায় যখন পথ চলতুম তখন তো এমনটি দেখিনি। "রাইটার্স্ বিল্ডিং" থেকে চারটের পর যারা বাড়ী ফিরতো তাদের চেহারার গাম্ভীর্য্য দেখে বার-বার সহস্র-বার মনে পড়েছে—এদের চিত্ত চিন্তাক্লিষ্ট। পড়ুয়াদের ভেতর একটা হৈ-চৈ মাঝে মাঝে দেখা যেতো বটে—শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো, আকস্মিক আসেন আবার আকস্মিক অজ্ঞাতে বিলীন হয়ে যান; কোথায়—কে জানে! জীবনটার ভেতর "চিয়ারফুলনেস্" এদের মতো কি আমাদের আছে? অথচ এদের দেশে সমস্যা কতো! আমাদের থেকে কম নয়! স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছে—রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, সমাজে, আচারে, চিন্তায় জীবনে। কিন্তু এদের কিচ্ছু কম? বিরাট সাম্রাজ্যের শরীরে ফাটল্ দেখা দিচ্ছে (ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স-গুলো তার নজির), পেলেস্তাইনে ধর্ম্ম-বিরোধ থাম্‌ছে না, মিশরে অশান্তি, আয়র্লণ্ডে ভারতে স্বাধীনতার তূর্য্য-নিনাদ, অর্থনীতি-রাজনীতিতে ফ্রান্সের আধিপত্য, আমেরিকা ও ফ্রান্স দুনিয়ার গোল্ড্ ভাগাভাগি করে নিচ্ছে, সোভিয়েট্ রাস্তার কৌমগত রাষ্ট্রের উদ্বর্ত্তন, ফ্যাসিজম্—এ-সবই তো ইংলণ্ডের একদাতন প্রতিপত্তির প্রতিকূল।······ তবু তো হাসছে: দেখো না, দুটি মেয়েতে কেমন ঠা-ঠা করে হাসছে! বাপ্‌রে!! চিয়ারফুল বটেই তো। এই যে, প্রথম দেখায় 'ভ্যারি প্লিজ্‌ড্ টু মিট্ ইউ' বলা, কথা প্রসঙ্গে কিছু বলার না থাকলেও 'ইজ্ ইন্‌ট্ ইট্' বলে সায় দেওয়া, মদ খাবার সময় গেলাস ঠোকাঠুকি করে 'বেস্‌ট্ অব্ লাক্' বলে ভাগ্যদেবীর আবাহন করা, মিলনে বিদায়ে সম্ভাষণ, ট্রেনে বাসে বিদায়কালে রুমাল বা হাত উড়ানো, আহারে বিহারে নারীর অগ্রিম সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে পুরুষের ত্যাগ-স্বীকার—এতে এদের মধ্যে সামাজিক একটা প্রীতি-মধুর রসের সৃষ্টি করে, বস্তুত ভণ্ডামি হলেও করে। জগদিন্দু ঠিকই বলে, ইংরেজেরা প্রীতির মূল্য বোঝে সমাজের ঠাট বজায় রাখার জন্যে কিন্তু গভীর ভালোবাসার মর্ম্ম কিছুই জানে না। আচ্ছা, এ কি ঠিক? মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি তাই কি খেলার কথা বল্লেন? অবশ্যি, প্রেমের খেলায় অগভীরতা থাকবে এমন কিছু তিনি বলেন নি—বরং ডিসিপ্লিনের কথাই বলেছেন। আচ্ছা, উনি কি বিধবা-বিবাহে বিশ্বাস করেন?···

সিগ্রেটের ধোঁয়া মৃদু বাতাসে পাশের সিটের একজন ভদ্রলোকের চোখে গিয়ে লাগ্‌ছিলো। অরবিন্দ বল্লে: সরি। ভদ্রলোকটি বল্লেন: ইট্‌স্ অল্ রাইট্। অরবিন্দ একটু হেসে উঠে পড়লো। এবার গাড়ী বদ্‌লাতে হবে। লোক উঠ্‌ছে নাম্‌ছে। যারা নামবার তারা আগে নামে; ততক্ষণে আগন্তুক যাত্রীরা 'কিউ' করে একজনের পর আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে—উঠ্‌বার পালা এলেই একে-একে পর-পর গাড়ীতে গিয়ে উঠবে। শব্দ নেই, গোলমাল নেই, মারামারি নেই, পুলিশের হাঁকাহাঁকি নেই। সত্যি কী ডিসিপ্লিন! এ-ও কি খেলা? মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি হয়তো বল্‌বেন: খেলা বৈকি! অসংখ্য যাত্রীরা কতো পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছে নিয়ে এদিক-ওদিক যাতায়াত কর্‌ছে। কেউ ফুর্ত্তি কর্‌তে যাচ্ছে, কেউ হয়তো একজনকে ঠকাতে যাচ্ছে, কেউ বা দোকান থেকে জিনিষ কিনে প্রেমাস্পদকে উপহার দেবে এই ভেবে ভেবে যাচ্ছে, রেল্ কোম্পানি ট্রেনের পর ট্রেন চড়িয়ে নিত্য-নূতন রেল্-লাইন খুলে লক্ষপতি কোটিপতি হয়ে যাচ্ছে। শত জনের শত প্রয়োজন! অথচ এ প্রয়োজন আছে শুধু বেঁচে-বর্ত্তে আছে বলেই তো। যখন মরে যাই—তখন? সব প্রয়োজনের ইতি হয়ে যায়। তবু যারা বেঁচে থাকে তারা তাদের প্রয়োজন সাধন করার জন্যে ডিসিপ্লিনকে শক্ত করে বাঁধে। যে গেলো তার এই ডিসিপ্লিনের বালাই নেই। ······মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির এখন তার বিধবা পত্নীতে কোনো প্রয়োজন আছে কি?—নেই। কিন্তু মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি তো ইচ্ছে করলে ফের বিয়ে করতে পারেন; তাঁকে তো বেঁচে-বর্ত্তে থাক্‌তেই হবে। খেলা বৈকি! কিন্তু প্রেমের খেলার মত খেলা নেই। আহা, বেচারী আইরীন্ চ্যাটার্জ্জি! যাই হোক্ নামটি বেশ—আইরীন্······

অরবিন্দ আপন মনে শিষ দিতে দিতে বাড়ী চল্‌লো।

রবিবার। সকালে বিছানায় বেড-টি খেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে প্রায় ন'টা বাজ্‌লো। তারপর যথারীতি এটা-ওটা-সেটা রুটিন্ মাফিক্ করে যাচ্ছে। তবু কী ঢিমেতেতালা দিন! এখনো সাম্‌নে ভরদিন পড়েই আছে; যেন দূর-দিগন্ত-বিসর্পী পথ বেলাবেলি পাড়ি দিতে হবে, অথচ ভাবনার ক্লান্তি পায়ের বেড়ি হয়ে পথিককে অচল করে ফেল্‌ছে।

আবার ঠাণ্ডা ভারী হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। আজ আকাশটার ঘোলা ডিমের রঙ্ দেখে কে মনে কর্‌বে যে, এই লণ্ডনের আকাশেরই তলে কোনো একটি ঘরে বসে কাল রোদ্দুরের ঝিকিমিকি সাক্ষী করে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলেছিলো যে, তাঁর বড় নির্জ্জন জীবন। বল্‌তে এতটুকু লজ্জা কর্‌লো না। যে-জীবনকে সবে মাত্র হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে উপভোগ কর্‌বার আয়োজন সুরু করেছিলো, তাতে-ই হঠাৎ অবাঞ্ছিত দৈবাঘাত আপতিত হয়ে সব বানচাল করে দিলে;—নৃতত্ত্বের বারোটা কেন বারোশ-টা বক্তৃতায়ও এই নির্জ্জনতাকে কোন্‌ঠেসা করতে পারবে না।

ভালোই হলো। বৃষ্টিটা পড়ুক। দেখি পোড়া আকাশের পেটে কতো জলই না আছে;—পড়ুক, আকাশের সমস্ত সত্তাটা জল হয়ে গলে পড়ুক। যে বাতাস আকাশের চাপে ভারী হয়ে উঠেছে, পাখা মেলে উড়্‌তে পারছে না, তা অবাধে হু-হু করে ওপরের বাতাসের সঙ্গে গিয়ে মিশে যাক্;—নীচের বাতাস যাক্ ওপরে, ওপরের বাতাস আসুক নীচে খোলাখুলি ভাবে। ভারী বাতাসের যায়গায় তরল স্বচ্ছ ফুরফুরে হাওয়া প্রাণে শান্তির মুক্তির প্রলেপ বুলিয়ে যাক্।

সত্যি, মুক্তি কে না চায়! মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিও চায়। তা না হলে, কুকুরটাকে নিজের হাতে গুলী করে মেরে ফেলে? প্রতিপালন করার দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় না —স্বার্থপর! আচ্ছা, দায়িত্বের গুরুভার বইতে সাধ যায় কেন?—করুণায় না সহানুভূতিতে? তা, আইরীন্ তো দুঃখ দেখে সগোত্র্য কুকুরী সঙ্গিনী করে দিলে; আপনার সঙ্গ-সুখে প্রতিদ্বন্দ্বিনী জুটিয়ে দিয়ে স্বার্থত্যাগও করলে। লাভ কি হলো? মহামারী থেকে তাদের বাচ্চাকাচ্চাদের বাঁচাতে পার্‌লে? তাহলে এ দায়িত্বের দৌড় কতটুকু? শুভকর্ম্ম করার শুভ বুদ্ধির যোগান কে দেয়?—খেয়াল? হবেও বা। কিন্তু যাই বলো, তাঁকে পশু পুষ্‌তে হয়েছিলো সাধ করে নয়, বাধ্য হয়ে, অন্য আর কিছু করার পথ ছিলো না বলে। আইরীন্ বদ্ধ না মুক্ত? আদতে কিন্তু ও চায় মুক্তি—আত্ম-তন্ত্র হয়ে কর্ম্মবন্ধন স্বীকারের স্বচ্ছন্দ অধিকার। যাক্‌গে।...আইরীন্ সঙ্গিহীনা। তা না হলে, অমন্ করে আমার শনিবারের নিমন্ত্রণ-প্রস্তাবে সায় দেয়? বল্‌তেই খপ্ করে কথাটা গিলে উদরস্থ করে? না ডাক্‌তেই সেধে এসে আলাপ জমায়? আমায় তো কথা বল্‌তেই দেয়নি। আত্ম-প্রকাশ করার জন্যে তাঁর পুঁজির বাক্য-সম্ভার নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে, খাবার ভুলে, আশেপাশে না তাকিয়ে, আমাকেই তাঁর অবকাশ-রঞ্জন পরমার্থ করে তুলেছিলো! এমন্ যার রূপ—রুবেন্সের সুডৌল প্রতিমাবৎ নারীচিত্রের জীবন্ত প্রতিরূপ এই ইংরেজ রমণী—যে তাঁর দেহসজ্জা সম্বন্ধে নিরবধি সজাগ, সে কিনা কথার ফাঁকে অন্তত একবারটিও তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগের সদ্‌ব্যবহার কর্‌লো না! বিধবা মেয়ের পর-পুরুষের প্রতি অতো লালসা কেন? নাঃ, এঁর সঙ্গ অবিধেয়। আজই চিঠি লিখে দেবো আমি যেতে পারবো না। আমার বহুৎ সজ্জন নর-নারী বন্ধু-বান্ধবী আছে। অশিষ্ট বন্ধুতার কাছে যুক্তিকে নীতিকে বিসর্জ্জন দিতে পারিনে! যা কু বলে জান্‌ছি তাতে পা দেবার আগেই যখন বন্ধন-যাতনা তখন খামোখা জেনে শুনে মরতে যাবো কেন?...

বাতাস প্রবল হয়ে এলো ঝঞ্ঝা। মেঘের অন্ধকারের মধ্যে আকাশ গেছে ডুবে। ক্ষেপা প্রকৃতি দিক্‌পাল-গুলোর গলা টিপে ধরেছে;—তারা দিঙ্‌মণ্ডল ব্যথার হুঙ্কারে সরগরম করে তুলছে। কড়্—কড়াকড়্—বিদ্যুৎ খেলে গেলো। অরবিন্দর সে খেয়াল নেই। চেয়ারখানা আগুনের কাছে আরেকটু টেনে এনে, ড্রেসিং গাউনটা গায়ের সব ফাঁক বন্ধ করে আরেকটু জড়িয়ে দিয়ে, মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে: আইরীন্ চ্যাটার্জ্জি আর কিছুতেই তাকে ভোলাতে পার্‌বে না। সে কি এদ্দিন ধরে অনর্থক বার্কেন্‌হেডের উপদেশগুলো পড়েছে? বার্কেনহেড্ বলেছেন, একটা কেস্

হাতে এলেই সমস্ত ডিটেল্‌স্ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তারপর অর্থসঙ্গতি করবার চেষ্টা করতে হবে—ব্যারিষ্টার হবার এই হলো সিক্রেট্। অথচ, কাল সে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির কথাগুলোর মূলার্থ তলিয়ে তন্ন-তন্ন করে না-দেখেই যা-নয়-তাই ভেবে ফেলেছে। খবরদার!

মঙ্গলবার। অরবিন্দর চিঠির উত্তর এসেছে। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি লিখেছেন :···আপনার সুদীর্ঘ পত্রখানি পড়ে নারী-পুরুষ-ঘটিত মিলন-বিচ্ছেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হলুম। সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাই;—এই চিঠির কথাগুলো আরেকটু গুছিয়ে নিয়ে লম্বা করে লিখ্‌লেই একটা বিশুদ্ধ প্রবন্ধ খাড়া করা যেতো। বিশেষত, আপনি যে-কয়টা কোটেশন চিঠিতে সন্নিবেশ করেছেন তাতে, বাস্তবিকই আপনার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু প্রবন্ধ না করে চিঠি করেই যতো মুস্কিলে ফেলেছেন। চিঠিটা লিখ্‌লে হতো নিতান্ত আমার সম্পত্তি; প্রবন্ধটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্ব্বসাধারণের। তাই আপনার চিঠি বা প্রবন্ধ—যাই বলুন—আপনার কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুধু আমার অনুরোধ, একবারটি দয়া করে রি-রাইট করে "স্পেক্টেটর"-এ পাঠিয়ে দিন। ছাপানো দেখ্‌লে জান্‌বেন, সত্যি-সত্যি আপনারি মতন আনন্দ আমারো হবে। আপনিই বলেছেন, আমি বন্ধু।

নিতান্তই আমাকে উদ্দেশ করে যেটুকু লিখেছেন তার তাৎপর্য্য এক কথায় এই হয়, যেহেতু একদা-বিবাহিতা নারীর সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলন অস্বাস্থ্যকর সেজন্যে আসছে শনিবার আমাদের দেখা হবে না। আমি আপনার দু'টো কথার একটাও মেনে নিতে পারছি নে।

নারী-পুরুষের বনিবনাও নিয়ে বেদ থেকে সুরু করে বার্ণার্ড্‌শ পর্য্যন্ত কেউ-ই একটা সঠিক সনাতন মীমাংসা দিতে পারেন নি এবং আমার বিশ্বাস অনাগতকালেও কেউ-ই তা পারবেন না। কারণ, মানুষের জীবনটা জিয়োমেট্রির থিয়োরেম্ নয় যে, চট্ করে ফিগার এঁকে দেখিয়ে দেবেন, ত্রিভুজের তিন কোণ মিলে দু'সমকোণের সমান হয়। কোনো সংজ্ঞা বা সাধারণ নিয়মই জীবনকে সুষ্ঠু প্রকাশ করতে পারে না। নিরন্তর সচল পরিবর্ত্তনময় উত্থান-পতন-শীল গতি-বেগকে অঙ্কের জমা খরচের সংখ্যা দিয়ে বেঁধে রাখবেন কি করে? আইন্‌স্টাইন কি অঙ্ক কষেই দেখাননি যে, জীব-জগতে অঙ্কের অচল নিয়ম ব্যর্থ? মানুষের বুদ্ধিতে যতখানি কুলোয় হয়তো বা চারটে পরিমাণ (dimension) বেরিয়েছে; কিন্তু এমনি আরো কতো পরিমাণ অজানাই থেকে গেছে। নারী-পুরুষের মিলন-মীমাংসার পথে 'পরিমাণ' আবিষ্কার সুরু হয়েছে মাত্র। বেদের আত্ম-প্রেম, ইব্‌সেনের পরস্পরের মধ্যে মনের জানাজানি, দায়িত্ব স্বীকার করে স্বার্থত্যাগ—এ রকম দু'চারটে সূত্র না হয় বেরিয়েছেই। তাতে কি হলো? এখনো জীবন ব্যাকরণের সূত্রগুলির নিপাতনের সংখ্যাই বেশী। এখনো তো অনেক জান্‌বার বাকী রয়ে গেছে। উদ্বৃত্ত অজানাকে স্বল্প-জ্ঞানের অহঙ্কার দিয়ে জড়িয়ে ফেলবেন না, এই আমার অনুরোধ। আপনি যে স্থির করে ফেলেছেন আমাদের মিলন অনুচিত, এ আপনার একান্ত একচোখোমি। সুতরাং, আপনার তর্কের প্রস্তাবনাই যখন অভ্রান্ত নয় তখন আপনার মীমাংসাও অব্যর্থ হতে পারে না। অতএব শনিবারে আমাদের দেখা হবে না কেন, বলুন?—কোথায় দেখা হবে, জানাবেন কিন্তু।

এতোখানি লেখার উদ্দেশ্য আরেকটা পাল্টা প্রবন্ধ তৈরী করা নয়। প্রবন্ধ লিখ্‌তে হলে আপনাকে লক্ষ্য করে এমনিতরো সোজাসুজি আমার মনোভাব খুলে লিখ্‌তুম না। বড় জোর আপনাকে উপলক্ষ্য করে কোটেশনের নক্সা বুনে তুল্‌তুম—যেমনটি আপনি করেছেন। এ চিঠি-ই লিখলুম; এবং নিতান্ত আপনাকেই লিখ্‌লুম, তবে চিঠি লিখতে প্রবন্ধ লিখে বসে—এ হেন লোক পৃথিবীতে বিরল। একথা বলিনে, ঢের লোক আছে যারা প্লট-ওয়ালা নাটকের পাত্র-পাত্রীদের দেখাদেখি নিজেদের জীবনকেও একটা প্লটের গাঁথুনিতে পরিণত করতে চায়। এঁদের কাছে উত্তর দিতে হলে চিঠি কিছুটা প্রবন্ধ-ঘেঁষা (অর্থাৎ কৃত্রিম) হয়ে পড়ে: জীবন-যাত্রার ডিসিপ্লিনের এই নিয়মটি রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করলুম মাত্র। সব খেলারই নিয়ম আছে কিনা, তাই। এতগুলো বকুনির ত্রুটি নেবেন না তো?

যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে শনিবার দিন ৩টে থেকে বিকেলের বাকী-টুকু আমারই বাড়ীতে একটু চা খেয়ে ও গল্প করে কাটানো যেতে পারে। জানাবেন আপনার প্রত্যুত্তর। ইতি

অরবিন্দ নিজের জীবনকে কতগুলো প্রবচনের সমষ্টি করে গড়ে-পিটে তুল্‌তে চায়। সে আদর্শবাদী: জগতে যা আছে তার চাইতে জগতে যা থাকা উচিত সে তারই বেশী পক্ষপাতী। তাই সে একসঙ্গে দু'-দুটো প্রবচন স্মরণ করে ফেল্‌লে; [এক] Face the Devil, [দুই] ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ ইত্যাদি। আইরীন্ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে দেখা করবেই। আপন চরিত্রের নিকষ-পাষাণে অনভিপ্রেতের দাগ কেটে পরখ্ করে নেবে।

শুক্রবার রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর কারুর সঙ্গে গল্প-গুজব না করেই গুরুগম্ভীর ভাবে অরবিন্দ ওপর তলায় শোবার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। কাল দেখা করার দিন কি-না; ব্যাপারটা থব-স্থব হয়ে আছে, একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেলেই ব্যস্। কাপড় ছেড়েই টেবিলের ড্রয়ার থেকে সেই চিঠিখানা বের করে পড়্‌তে বসে গেলো। কিছুক্ষণ পড়েই সব শেষের প্যারায় চোখ্ বুলোতে লাগ্‌লো। "যদি আপনার আপত্তি না থাকে"—কথাগুলো খুব কায়দা করে লেখা; দেখানো হচ্ছে, বিশেষ কিছু জোর-জবরদস্তি করছেন না;—অথচ বন্ধুত্বের দাবীটুকু-ও করতে ছাড়েন নি, কি-জানি ফস্কে যাই। একেই বলে বৈড়াল-ব্রত—বাইরে এক ভেতরে আর। সত্যি, সুন্দরীদের ঐ এক যন্ত্রণা—ভোগা দেওয়ায় ওস্তাদ্। সাধে বলে 'স্ত্রীচরিত্র'!

চিঠিখানা যথাস্থানে রেখে বিছানায় উঠে শুয়ে পড়্‌লো। একটি মধুর স্বপ্নালস ভাব অরবিন্দর মনের আনাচে-কানাচে ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। অরবিন্দ মনে-মনে উচ্চারণ করছে: কী রূপ!—যেন ক্লিওপেট্রো, অ্যাস্‌পেসিয়া, না না উর্ব্বশী;—"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।"...আইরীনের একখানা ফটো চেয়ে নেবো। দেবে না? আইরীন্! আ-ই-রীন্! কী সুন্দর নাম! দেবে না একখানা ফটো? নিশ্চয়ই দেবে। আ-ই-রী-ইন্—

আবার কে দরজায় গায়ে আঙুলের ঠকাঠক্ শব্দ সুরু করেছে এখন? সুইসেন্স্! দরজা খুল্‌তেই মুখোমুখী দেখা হলো জগদিন্দুর সঙ্গে। এই বন্ধুটি গোল্ডাস্ স্ট্রীটেই কাছের একটা বাড়ীতে থাকে। সময়ে অসময়ে এর-ওর বাড়ীতে দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। জগদিন্দু ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে বল্লে: কি হে, কদ্দূর প্রিপেরেশান্ হলো? আমি ভাই এবার আর "টর্ট্" দিচ্ছিনে। ঘোড়ার ডিম! অতো কেস্ মুখস্থ করতে পারি নে বাপু।

অরবিন্দ বল্লে: আরে রাখো তোমার পরীক্ষা। ব্যারিষ্টার তো হতে চল্লে। বলো দিকিন্, আমাকে বিধবা বিবাহ করতে হলে কি-কি করতে হবে? প্র্যাক্‌টিকেল্ প্রব্‌লেম্ দিচ্ছি। বলেই, একবার বিজ্ঞের মতো হেসে জগদিন্দুর মুখের কাছে হাত নিয়ে তেড়ে একটা তুড়ি দিলে। জগদিন্দু ভ্যাবাচাকা লাগার ছেলে নয়। পকেট থেকে কয়েক টুক্‌রো চক্‌লেট্ বের করে দিয়ে বল্লে: নে নে, খাবি নাকি খা। বসে-বসে ঘরে একলা ভাল লাগ্‌ছিলো না। তাই এলুম। কি কচ্ছিস্?

অরবিন্দ চক্‌লেট্‌গুলো টপাটপ্ মুখে দিয়ে ঘরের এদিক-ওদিক লম্বা-লম্বা পা ফেলে পায়চারি করতে-করতে সুর করে বল্লে:

> অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
> নাচে রক্তধারা।
> দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
> অয়ি অসম্বৃতে॥

জগদিন্দু অনুরূপ সুর করে বলে যেতে লাগ্‌লো:

> স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
> হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী।

অরবিন্দর আর মুখস্থ ছিলো না। তাই সে শুন্‌তে লাগ্‌লো। জগদিন্দু, বলে যাচ্ছেই, থামছে না। অরবিন্দ অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লো—থাম্ থাম্! জগদিন্দু নাছোড়বান্দা। সে বল্‌ছে:

> ফিরিবেনা ফিরিবেনা, অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী,
> অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।

অরবিন্দ বল্লে, থাম্ থাম্! জগদিন্দু কবিতাটি শেষ কর্‌তে-কর্‌তে বল্লে :

তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অশ্রি অবন্ধনে ॥ *

তারপর বল্লে, কেমন্? আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হচ্ছিলো? অরবিন্দ মেনে নিয়ে বল্লে, না না ভাই! তুমি হচ্ছো কবি। আমার কবিতা-কবিতা একেবারেই মনে থাকে না। জগদিন্দু বল্লে, তোর মনে থাকুক-না-থাকুক কিচ্ছু ক্ষতি নেই। কিন্তু আমার যদি না থাকে যথেষ্ট লোকসান; বুঝিস্ তো?—কবিতার ভেতর দিয়েই আমার স্মৃতি-পূজো। শোন্ আমার লেখা একটা কবিতা।

'রক্ষা কর বাপু, এখন কবিতার সময় নয়।'

অরবিন্দর এ-উত্তরে কিছুমাত্র খেই না হারিয়ে জগদিন্দু আবৃত্তি কর্‌তে লাগ্‌লো :

মধ্যাহ্ন কিরণ যবে নুয়ে যেতো ঘুমে
পাতার আড়ালে ধীরে,
(আর) অঞ্চল-খানি উড়ায়ে আঁধারে গোধূলি আসিত নেমে
ধীরে ধীরে ধীরে ;
কী ভুবন খুলিত তখন পূর্ণ-মদিরতা !

অরবিন্দ বাধা দিয়ে বল্লে, কি—ইলার সঙ্গে তোর সেই মুন্ লাইট্ এপয়েন্ট্‌মেন্ট্-এর কথা বুঝি? জগদিন্দু বল্লে, হুঁ বল্ দেখি—কবিতার আরেকটা অংশ কেমন হয়েছে?—

কূলহারা অসীম আকাশ
তীরহীন জলধি-মণ্ডল
স্বপ্ন মতো তুচ্ছ তব পাশে।—

রোস্ রোস্। আরেকটা অংশ মনে হচ্ছে না।··· হেঁ-হেঁ, দুটো লাইন্ মনে পড়্‌ছে :

—যবে আকুল বিয়োগ-বিধুর
কেঁদেছিনু পিপাসু তিয়াসে ॥

কেমন হলো?···যাক্, তোর ভায়ের কচ্‌কচানি না শুন্‌লেও চল্‌বে। খাবি আর চকলেট্? বলেই, অরবিন্দর হাতে আরো খান কয়েক চকলেট্ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "তোর মর্‌গানের নোট্‌স্ দে তো? কাল রাত্তিরে ফিরিয়ে দেবো। একদিনেই নোট্-গুলো পড়ে কন্‌ষ্টিট্যুসনেল্ ল-টা তৈরী করে নিতে হবে। পার্‌বো রে?"···

অরবিন্দ বস্‌তে বল্লেও জগদিন্দুর আর অপেক্ষা করার সময় ছিলো না। কারণ আর আধঘণ্টার মধ্যেই তাকে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাই সে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। অরবিন্দ নীচের তলায় বাইরের দরজা অবধি বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে এসে বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়্‌লো।

অরবিন্দ মনে একটা কাতরানি অনুভব কর্‌ছে। ভেবেছিলো, আইরীনের কথাটা পেড়ে বন্ধুকে অবাক করে দেবে। কিন্তু জগদিন্দু নিজেকে নিয়েই এতো ব্যস্ত ছিলো যে একটিবার-ও তার কথাটা শুন্‌তে চাইলে না। যাক্, শুধু যে জগদিন্দুর-ই ইলা আছে তা নয়। তার জীবনেও বসন্ত-ঋতুর উদয় হয়। এমন কি, এবারে কোকিলও ডেকেছে। কিন্তু কোকিলের ডাকে সুখ যতখানি দুঃখ তার চেয়ে ঢের ঢের বেশী; নয়তো তার এ অন্তর্দাহ ভোগ্ কর্‌তে হবে কেন?······

পরদিন সকাল বেলা অরবিন্দ রুটিনানুযায়ী পড়্‌তে না বসে একটু বেড়াতে বেরোয়। ঘরের হাওয়াটা বড্ড গরম। বেশীক্ষণ বেড়াতেও ভালো লাগে না। বিকেলে আইরীন্ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতে হবে। কোট্-টা একটু ব্রাস্ করে রাখা চাই। এই "কাপুড়ে সভ্যতার" দেশে আইরীনের আবার পোষাকের ওপর নজরটা যেরকম তাতে—

বাড়ীতে ঢুকেই দেখ্‌লে তার টেবিলের ওপর একখানা স্লিপের কাগজে জগদিন্দুর লেখা চিঠি। লিখেছে—মিসেস্ আইরীন্ চ্যাটার্জ্জি তাকে বিকেলে জরুর যেতে বলেছেন। এ কী! জগদিন্দু এঁকে জান্‌লে কি করে? কখনো তো এঁর কথা বলেনি? তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে পড়্‌লো; —জগদিন্দুর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা পরিষ্কার করে নিতে হবে। পাঁচ-ছয় মিনিট হাঁটলেই জগদিন্দুদের বাড়ী। দুটো মোড় পেরিয়ে যেতে হয়। একটা মোড় পেরিয়েছে, অমনি দেখে ব্যাগ্ হাতে করে দ্রুতগতি জগদিন্দু টিউব্ ষ্টেসনের দিকে যাচ্ছে। পথেই দেখা; ভালোই হলো।

জগদিন্দু একটু এগিয়ে এসে বল্লে, 'আমার চিঠি পেয়েছো ?'

অরবিন্দ উর্দ্ধশ্বাসে প্রতি-প্রশ্ন করলে, 'তুমি কি ওঁকে জানো ?'

জগদিন্দু বল্লে, 'কাকে ? আইরীন্ চ্যাটার্জ্জিকে ? জানি বৈকি। তুমি যে ওঁকে জানো তাইতেই আমি ভাই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। যাক্ পরে কথা হবে। এখন এই বইগুলি (ব্যাগ্‌টি উঁচু করে দেখালে) ফেরত্ দিতে যাচ্ছি —রাসেল্ স্কোয়ার।'

অরবিন্দ জিজ্ঞেস করলে, 'কি ডক্টর্ উইলিয়ম্‌স্ লাইব্রেরী ? আচ্ছা হে, বলো না একটা কথা—তুমি তাঁকে কদ্দিন থেকে জানো ?

'কদ্দিন থেকে ?'—কিছুটা থিয়েটারি ঢং-এ স্বরগ্রামকে উঁচু-নীচু করে বল্লে, 'যদ্দিন থেকে ভারতবর্ষের ইলাকে হারিয়েছি। এখন এ-ই আমার ইলা। জানো ? ইলার মুখে একদিন যে "পরমাশ্চর্য্যকে" দেখেছিলুম তাকে ফের আইরীন্ চ্যাটার্জ্জির মুখে প্রত্যক্ষ করেছি। এখন থেকে আমি আইরীনের।'

'কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো তোমার ?'

'কাল রাত্তিরে তোমার ওখান থেকে গিয়েই। আচ্ছা যাই ভাই, দেরী হয়ে যাবে শেষে।'

বটে! তাই অতো কবিতা আওড়ানো হচ্ছিলো। এই তবে আইরীন্ চ্যাটার্জ্জির রাত্তিরে এঁর সঙ্গে কিসের এগেজ্‌মেণ্ট্ থাকতে পারে ?—থিয়েটার-সিনেমা-রেস্তোঁরা হবে-বা।···দেখা করতে যেতেই হবে। শেষ্‌মেষ কয়েকটা কড়া-কড়া কথা না শোনালে চলবে না।

অরবিন্দ বিকেলে যখন মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছেছে তখন তিনটে বেজে দশ মিনিট। তার এমন কিসের গরজ ? এসেছে শুধু ভদ্রতার খাতিরে। হাজার হোক্, একজন ভারতীয়ের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়েছিলো তো ? কিন্তু এই শেষ।

দরজা থেকে অভ্যর্থনা করতে এসে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বল্লেন: আপনার দশ মিনিট দেরী,—খেয়াল আছে ? আমি ভেবেছি বুঝি অভিমান করে আসা হয়নি। যাক্, আমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। আসুন, আমরা সবাই আপনার অপেক্ষা করে রয়েছি।

বাঃ! 'সবাই' মানে ? ঢুকে দেখলে রীতিমতো বারোয়ারী আয়োজন উৎসব। ব্যাপার কী ?—সেন, মিটার, সুব্রহ্মণিয়ন্, বাহাদুর সবাই যে ভারতীয়। পরিচয়ের পালা শেষ হয়ে গেলো। জগদিন্দুও আছে (সেন)। সে বল্লে: ওহে, মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের সবাইকে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত উদ্দেশ্যে একবার ক'রে পার্টি দিয়ে থাকেন। আজ তোমার উপলক্ষ্যে, বুঝলে ?

অরবিন্দ প্রায় বোকা বনে আর কি! কোনোরকমে সাম্‌লে নিলে। বল্লে: এতোগুলো বন্ধুর সঙ্গে জানা-শোনা হলো, সে আমার সৌভাগ্য।

তারপরই আবার ছবির কথা উঠ্‌লো। একখানা ছবি শান্তিনিকেতনের একটি বন্ধু এঁকে পাঠিয়েছেন জগদিন্দুকে। জগদিন্দু সেখানা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিকে উপহার দিয়েছে। তিনি ছবি-খানা খুব যত্ন করে এর হাত থেকে ওর হাতে তুলে দিয়ে অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করছেন। পুকুরের মাছ স্রোতের জলে পড়লে যা করে, অরবিন্দও তার নকল করতে লাগ্‌লো; অর্থাৎ ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌লো। সে এই হট্ট-গোলের জন্যে মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসেনি। তার মনটা হয়ে উঠ্‌লো কঠিন।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি অরবিন্দর অবস্থাটা নিমেষে ঠাউরে নিলেন। তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বল্লেন: আজ আমাকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর-গিন্নীর পালাটা অভিনয় করে যেতে হবে। মা'র শরীর অসুখ। তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলেন না বলে দুঃখ জানিয়েছেন। জগদিন্দুকে দেখিয়ে আর সবাইকে বল্লেন: বিশেষ করে ইনি আমার হয়ে আমাদের সবাকার বন্ধু মিঃ বড়ুয়াকে এন্টারটেন্ করবেন।

জগদিন্দু তাঁকে থামিয়ে বল্লে: হাঁ, আমি Strange Interlude-এর গল্পটা বলবো, ঠিক করেছি। কাল আমরা এই নবাগত আমেরিকান্ থিয়েটারটি দেখে যে কী-রকম আনন্দ পেয়েছি, তা বল্‌বার নয়।

ও! থিয়েটার দেখতে যাওয়া হয়েছিলো দু'জনে! অরবিন্দ একেবারে উৎকর্ণ হয়ে আছে।

সুব্রহ্মণিয়ন্ জগদিন্দুর জোড়্‌জোড় করে কথা বলার ভঙ্গী দেখে পাশের ভদ্রলোককে ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌ছে : মিঃ সেন বক্তা বেশ।

ততোক্ষণে সবাই খাবার টেবিলে বসেছে।

জগদিন্দুর ব্যারিষ্টারী পড়াটা গৌণ; সাহিত্যালোচনাই মুখ্য কাজ। রবি ঠাকুরের কবিতা তার শ দু'এক মুখস্থ। ইংরেজী অনার্স নিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস্ পেয়েছিলো। গল্পটি বলে যাচ্ছে চমৎকার করে;—যেমন ভাষার ষ্টাইল্ তেম্‌নি বলার ষ্টাইল্। মুখবিকৃতি নেই, উত্তেজনা নেই, অথচ একটা সহজ সতেজ ভাব। চোখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। বল্‌তে-বল্‌তে যেখানটা কথায় আর পরিষ্কার করে বোঝানো সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌ছে না, সেখানটায় মাঝে-মাঝে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির দিকে এমন সুগভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি কর্‌ছে যে, তার বক্তব্য বিষয় না হোক্ বিষয়ের গভীরতাটা অন্য সকলের কাছে জলবৎ তরল বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

খালি অরবিন্দ ভেতরে-ভেতরে আগুন হয়ে জল্‌ছে। তারই কাছে বসেছেন মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি। তিনি একবার ফিস্‌ফিস্ করে অরবিন্দর কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লেন : মিঃ সেন সামাজিকতা খেলার নিয়মগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করেছেন, কি বলেন? অরবিন্দর অজান্তে তারই মুখ থেকে একটা জোরালো উত্তর বেরিয়ে এলো : হুঁ। সমাজের ঠাট বজায় রাখার কার্‌দানি বেশ জানে; মেকী প্রীতির মূল্য বোঝে, কিন্তু ভালোবাসার মর্ম্ম কিছুই জানে না। যাঁকে বলা হলো তিনি না বুঝে হতবাক্ হয়ে রইলেন।

বক্তৃতায় বাধা পেয়ে জগদিন্দু থাম্‌লো;—একটিবার মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি মুখ বাঁকিয়ে ইঙ্গিত করলেই আবার সুরু কর্‌বে, এই প্রতীক্ষায়। সুব্রহ্মণিয়নের বক্তৃতা বেশ টুটে যাবার উদ্যোগ হতেই অরবিন্দকেই দায়ী বিবেচনা করে সে ভারী বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

অভীপ্সিত ইঙ্গিত পেয়েই জগদিন্দু এক চুমুক চা খেয়ে পুনরায় আরম্ভ করলে : ঘটনার সংঘাতে যে মেয়েটির তিনজন পুরুষের সঙ্গে লেন্‌দেন্ স্থাপিত হয়েছিলো, তার একটি স্বামী একটি পুত্রদাতা একটি বন্ধু। তার জীবনে এই তিনের-ই প্রয়োজন ছিলো। সাধাসাধি করে সে এই প্রয়োজন সৃষ্টি করেনি। নাট্যকার দেখিয়েছেন, মানুষের জীবনে যা-যা ঘটে তা যে কি-প্রয়োজন সাধন করে, তা মানুষের জানা নেই। আমরা হয়তো একটা প্রয়োজন নিয়ে কাজ কর্‌তে লেগে গেলুম। হয়তো, কাজের শেষে দেখ্‌তে পাবো অন্য-একটা প্রয়োজন সাধিত হয়ে গেছে। এজন্যেই লাইফ্-কে জন্ম-মরণের সন্ধি-স্থলে একটা "অপরূপ অবকাশ" (strange interlude) বলা হয়েছে। দেখুন না, আমাদের নায়িকাটি ভেবেছিলো যে, তার হৃদয় সে স্বামীকে দিতে পারবে, নয়তো তার পুত্রদাতাকে দিতে পার্‌বে; কিন্তু তা পার্‌লে না। অবশেষে কি-না তার একমাত্র আন্তরিক আশ্রয় হলো চির-অবহেলিত বন্ধুটি।

অরবিন্দ রাগে গর্‌-গর্ করে বলে ফেল্‌লে : এসব আগাগোড়া রিভোল্‌টিঙ্।

সুব্রহ্মণিয়ন্ বাহাদুরের গা টিপে বল্‌লে : লোকটা কী অদ্ভুত!

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি জগদিন্দুকে সঙ্কেত করে থাম্‌তে বলে অরবিন্দ এবং অন্যান্যদেরকে তার নিজের অভিমত বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কর্‌লেন। অরবিন্দ তার কথা কেয়ার না করে বল্লে : আপনি ওকে সাপোর্ট কর্‌ছেন? নারীত্বকে তিনটে পুরুষের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করায় কিছু দোষ নেই? তার মুখ থেকে অধিকন্তু দু'তিন লাইন কোটেশন্ উচ্চারিত হয়ে এলো। (এখানে বলা উচিত, সমাগত বন্ধুদের মধ্যে এমন-ও কেউ-কেউ ছিলো যারা এতে না হেসে থাক্‌তে পার্‌লো না।)

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি হাস্যকারীদের সঙ্গে একজোট না হয়ে বরং একটু গম্ভীর ভাবেই বল্লেন : দেখুন মিঃ বড়ুয়া! আমার মনে হয়, এই নাটকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখানো যে, জীবন একটা খেলা। এর নানান্ অভিজ্ঞতাকে ভালো বলে অভিনন্দিত করে উচ্ছ্বসিতও হয়ে উঠ্‌তে পারি নে; আবার খারাপ বলে দূর্-দূর্ করে নিন্দাও কর্‌তে পারি নে। খেলায় যারা হারে তাদেরকে আপনি গালাগাল করেন কি? —না। তবে? ধরুন না, এই নায়িকাটি জীবন-খেলায় হেরে গেছে। কোথায় তাকে সহানুভূতি কর্‌বেন, না, আপনি উল্টো রাগ কর্‌ছেন!

অরবিন্দর মাথা বন্-বন্ করছিলো। সে বল্লে: আপনার কথা আমি বুঝ্‌তে পারছি নে। এসব বাড়াবাড়ি মত আমার ভালো লাগে না।

'বেশ তো, সয়ে যান্ না।'

আপোষ করার দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আরেকটা কোটেশন্ অরবিন্দর মনে উকিঝুঁকি মারছিলো। লেখকের নামটি আউড়েছে কি খপ্ করে তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলতে লাগ্‌লেন: বইর কথা রাখুন। আপনি পুঁথি-পাঁজিতে যার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা যে সেখানে নেই, মিঃ বড়ুয়া। লাইফ্ তো আর বই নয়, লাইফ্ হচ্ছে অভিজ্ঞতা। বইগুলি যে বিশ্ব-অভিজ্ঞতার কথা বিনিয়ে বিনিয়ে বলেছে তাতে সমস্যার গভীরতা বা বিস্তারের পরিধি বেড়েই চলেছে। আমি সমাধান খুঁজ্‌ছি জীবনে, কাজের মধ্যে, মানুষের মেলামেশার মাঝখানে। এই মেলামেশার মধ্য থেকে যে সত্য আবিষ্কৃত হতো তা আপনি আপনার চিন্তা দিয়ে রোধ করে দিয়েছেন। চিন্তাকে সজাগ রেখে কাজের মধ্যে ঢুকে পড়ে রহস্যটি কি দেখ্‌বার সুযোগই দিচ্ছেন না, এই যা আমার দুঃখ। জীবনের খেলার মাঠে নেমে, হরেক রকমের খেলা খেলে, তবে তো খেলার নিয়ম জান্‌বেন শিখ্‌বেন?

একটু থেমে সমাগতদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন: 'খেলা' মানে—এঁকে আমি বলেছিলুম যে, জীবনটাই একটা খেলা বা বহু খেলার সমষ্টি মাত্র।

কথাটার ভেতরে চমক আছে। শুনেই উপস্থিত বন্ধুরা সায় দিয়ে গেলেন। কেউ-কেউ সজোরে বল্লেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলতে লাগ্‌লেন: অভিজ্ঞতার ভেতরে সত্যের খণ্ড-খণ্ড রূপ পরিস্ফুট হয়। পরের মতামতের ওপর নিজের অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত নয়। আপনার অভিজ্ঞতা থেকেই আপনার নিজের মত তৈরী হবে। আগে থেকেই মতের প্রাচীর খাড়া করে লাইফ্‌কে কাজ থেকে অবরুদ্ধ করে রাখ্‌বেন না।

স্মিত-মুখে বল্লেন: এতোক্ষণ শুধু মতামত নিয়ে আলোচনা হলো। এবার একটু কাজ হোক্। মিঃ সেনকে আমি একটা উপহার দেবো ঠিক করে রেখেছিলুম;—আমারই নিজের আঁকা ছবি একখানা—পাহাড় ও সমুদ্রের একত্র সমাবেশ। নিজেই ছবিখানি বেঁধেছি। মিঃ সেন যদি অনুমতি করেন তাহলে সেখানা মিঃ বড়ুয়াকে আজ উপহার দেবো।

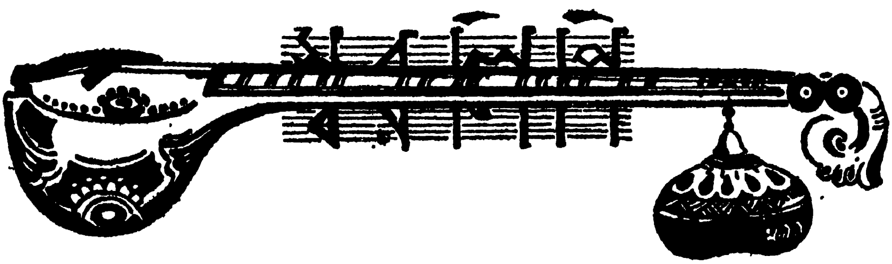
জগদিন্দুর দিকে মুখ করে অনুমতি চাইলেন: আপনাকে একখানা পরে দেবো। রাগ কর্‌লেন না তো? জগদিন্দু সম্মতি জানিয়ে হাস্‌লে।

পাশের ঘর থেকে সুদৃশ্য বাঁধাই একখানা ছবি এনে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি অরবিন্দর হাতে তুলে দিতেই অরবিন্দ ছবিখানা না দেখেই গায়ের জোরে জগদিন্দুর দিকে ছুড়ে মার্‌লে। আর এক ইঞ্চি বাঁ দিকে গেলেই জগদিন্দুর মাথা ফেটে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেতো। তবু, কাণ্ড একটা হলো। সাম্‌নের দেয়ালে লেগে ছবি ভেঙে চৌচীর হয়ে গেলো।

অরবিন্দ নিজেই জান্‌তো না, কি কর্‌লে। কাঁচুমাচু হয়ে একবার ছবিটার ভাঙা ছেড়া টুক্‌রোগুলোর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগ্‌লো। কেউ একটা কথা বল্‌ছে না। অরবিন্দর ইচ্ছে করছে মাটিতে মিশে যায়; কিন্তু কী আশ্চর্য্য, দু'মিনিট তিনমিনিট চলে গেলো মাটিতে সে মোটেই মিশে গেলো না! যেম্‌নি দাঁড়িয়েছিলো তেম্‌নি নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি নিঃশব্দে কাছে এসে বল্লেন: চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। কোনো কথা না বলে সে বাইরের দরজার দিকে তার লজ্জাবনত দেহ টেনে নিয়ে চল্‌লো।

এরা দু'জনে যাত্রার উদ্যোগ করছে, এমন সময় সুব্রহ্মণিয়ন্ চটেমটে লাল হয়ে চেঁচিয়ে বল্লে: দেখুন দেখি, আস্ত একটা ডন্ কুইক্জট্।

সুশীলকুমার দেব



দেশ—কাওয়ালী

এবে যাও যাও ঘন গরজে।
বাহিল প্রভঞ্জন গগন ভরিল রজে।
চমকে চপলা, কাঁপে সভয়ে কানন,
হের ময়ূর ময়ূরী ত্রাসে সত্বরে নর্ত্তন,
আঁধার ঘনাল, হ'ল নির্জ্জন পথ যে!
বেশ বিফল, বৃথা বিরচন কেশ,
কণ্ঠে মালতীমালা ঝরিল নিঃশেষ,
চিত্ত বিকল তব, অঙ্গ বিবশ যে!
যাও যাও ঘন গরজে!

কথা, সুর ও স্বরলিপি—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

০ ১ + ৩
II মা মা মা মা । গা রগা রা সা । রা -া -া -া । -া -া রা গা I
যা ও যা ও ঘ ন গ র জে ০ ০ ০ ০ ০ এ বে

I রগা মা মা মা । গা রগা রা সা । রা -া -া -া । -া -া -া ররা I
যা০ ও যা ও ঘ ন গ র জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ এবে

I রগা গা ধা পা । মা গা রা সা । রা -া -া -া । -া -া -া -া I
যা ও যা ও ঘ ন গ র জে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রা রমা মা মা । মপা পা পা পা । মা মণা ধণা ধা । পা মা গা রা II
ব হি০ ল প্র ভ ন্ জ ন গ গ ন ভ রি ল র জে

II { মা পা পনা না । না না না নর্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সর্সা র্সা -া র্সর্সা I
চ ম কে০ চ প লা কাঁ পে০ স ভ য়ে কা ন ন ০ হের্

I র্সা র্রা র্রা র্রা । র্রা র্গা র্মা র্মা । র্গা র্রর্গা র্রা র্রা । র্সা -া র্সা র্সা } I
ম য়ূ র ম য়ূ রী ত্রা সে . স ত্ ব রে ন র্ ত্ত ন

I র্সা র্সর্রা র্সা ণা । ধা পা পা পা । পা ধা পা মা । গা রা রা গা II
আঁ ধা • র ঘ না ল হ ল নি র্ জ ন প থ যে •

II রা মা রা রা । সা সা সা সা । রা রমা মা মা । পা -া পা -া I
বে • শ রি ফ ল বৃ থা বি র • চ ন কে • শ •

I া রা মা রা । সা সা া সসা । রা রমা মা মা । পা -া পা -া I
• বে শ বি ফ ল • বৃথা বি র • চ ন কে • শ •

I মা পা না না । না না না না । না না না নর্সা । র্সা -া র্সা -া I
ক ন্ ঠে মা ল তী মা লা ঝ রি ল নিস্ শে • ষ •

I র্সা র্রা র্সা ণা । ধা পা পা পা । পা ধা পা মা । গা রা রা গা III*
চি • ত্ত বি ক ল ত ব অ • ঙ্গ বি ব শ যে •

* সুপ্রসিদ্ধ খেয়াল ও টপ্‌পা গায়ক পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় একখানি দেশ গাইতেন, তার প্রথম ছত্র "অব ঘাঁউ ঘাঁউ ঘন গরজে"। সে গানখানিতে তিনি অদ্ভুত মাধুর্য্যের অবতারণা করতেন। উপেনবাবু সে গানখানির প্রথম ছত্র এবং মোটামুটি সুর-ভঙ্গী অবলম্বন ক'রে এ গানটি রচনা করেছেন। এর দ্বিতীয় ছত্র থেকে অবশিষ্ট অংশে সে গানের সহিত বিশেষ কোনো মিল নেই বলেই তাঁর বিশ্বাস। স্বরলিপিটি তিনি জটিল করেননি ;—স্বরলিপি সুরের কাঠামো,—সুনিপুণ গায়ক ইচ্ছা মত স্পর্শ সুর এবং বিস্তারাদি দ্বারা তা'তে মূর্ত্তি সংযোগ করেন। সঙ্গীত-রসিক অধ্যাপক শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-এ এই গানটি সম্বন্ধে এবং দেশ রাগিণী সম্বন্ধে একটি মন্তব্য পাঠিয়ে দিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা মুদ্রিত করা হইল। সুশীলচন্দ্র মিত্র

দেশ রাগিণী

উপেনবাবুর এ গানটি আমি শুনেছি। গানটি আমার ভাল লেগেছে। তবে স্বরলিপিতে গানটি কি রূপ নেবে বলতে পারি না।

৺সুরেন মজুমদার মশাই 'ঘাঁউ ঘাঁউ ঘন গরজে' গানটি গাইতেন। সুর ছিল দেশ, যদিও তিনি মধ্যম ও পঞ্চমের উপর একটু বেশি ঝোঁক দিতেন। বোধ হয় তিনি গানটি রেকর্ডেও দেন, অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্রের কাছে এখনও থাকতে পারে। সুরেন বাবুর মুখে গানটি শোনবার যাঁর সৌভাগ্য হয়েছে তিনিই নিজেকে ধন্য মনে করেন। অনেকের মুখেই দেশ শুনেছি, কিন্তু অমনটি আর কখনও শুনলাম না। উপেনবাবু সেই স্মৃতি উদ্রেক করলেন ব'লে সুরেনবাবুর ভক্তরা, অর্থাৎ প্রত্যেক রসগ্রাহী ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হবেন। এই বাংলা গানটি তাই ব'লে অনুবাদ নয়। হিন্দী গানের অন্তরার ভাষা ছিল অন্যরূপ। সে ভাষাও উপেনবাবুর মনে নেই। যতদূর মনে পড়ছে, অন্তরায় 'বিজুরী চমকে' গোছের কথা ছিল। ভাবটি অবশ্য একই, বর্ষার উদাস-করা পরিমণ্ডলের বর্ণনা। সেটা দেশ সুরেরও মর্ম্মকথা। এইখানেই সাধারণত হিন্দী গানের রচনার বাহাদুরী—সুরের সঙ্গে কথার সুসঙ্গতি। আদিতে কথার সাহায্যে সুরের রূপ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, কি স্বর বিন্যাসের নিজের কোন অন্তর্নিহিত রূপ আছে জানিনা। ব্যাপার এই, আজকাল যখন আমরা গান শুনি তখন কথা ও সুরের মধ্যে একটা সঙ্গতি প্রত্যাশা করি। উপেনবাবুর গানে হিন্দী-গানের রচনা চাতুর্য্য রয়েছে। অথচ গানটিতে ক্রিয়াপদ অপেক্ষাকৃত কম থাকাতে সাহিত্যিক অর্থ গ্রহণের প্রয়াস সুর-উপভোগ থেকে মনকে বেশি বিক্ষিপ্ত করেনা। যুক্তাক্ষরগুলিকেও সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা হয়েচে—অর্থাৎ সেগুলি ছোট্ট গমক ও আশ বহন করতে পারে। যাঁরা বাংলা ভাষায় খেয়াল, অন্ততঃ টপ্-খেয়াল গাইতে চান, তাঁরা এই গানটি গেয়ে আনন্দ পাবেন। যাঁরা বাংলা ভাষা জানেন না তাঁরাও গানটির সাধারণ অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন।

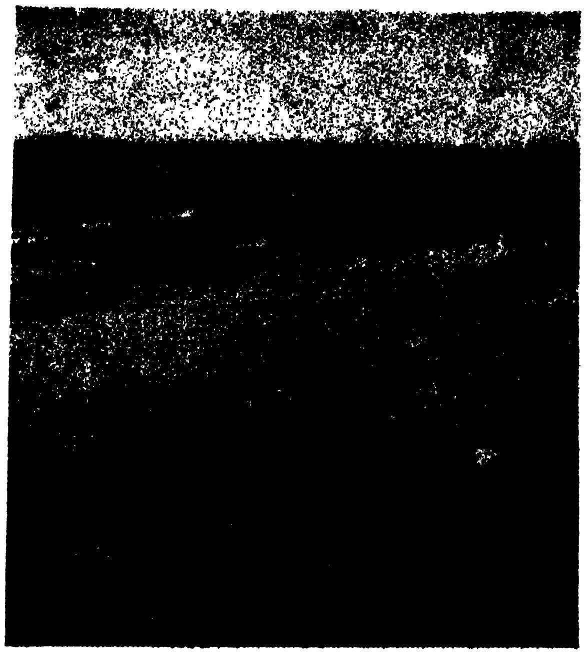
এক-ঘেয়েমীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে 'চমকে' কথাটি 'নি, নি, পা'-তে বসানো যায়, চমকান ভাবটি ফুটে উঠতে পারে, এবং 'কাঁপে' কথাটির মধ্যে কিংবা শেষে নিখাদের আশ্রয়ে একটু কম্পন দেওয়া চলতে পারে। "বেশ বিফল, বৃথা বিরচন কেশ, কণ্ঠে মালতীমালা ঝরিল নিঃশেষ" এই পদটি একাধিক উপায়ে গাওয়া চলতে পারে। মল্লারের একটু বেশি ঝোঁক দিলে মন্দ হয় না, না হয় দেশ-মল্লারই হবে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ক্যানেদা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

ভারতে ডোমিনিয়ন্ ষ্টেটাসের কথা উঠলেই ক্যানেদার কথাই আগে মনে পড়ে। এ রাজ্যটি আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত—য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের উত্তর সীমানা থেকে এ দেশটির শ্যামলিমা ছড়িয়ে পড়ে আর্কটিক্, এ্যাট্‌লান্টিক্ ও প্যাশিফিক্ মহাসাগরের বেলাভূমির শেষে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে। শস্য-শ্যামলা জনপদ, তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বত, ঘনবৃক্ষ সমৃদ্ধ বনানী—প্রকৃতির সকল শ্রী ও সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দেশটি প্রায় তেত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার বর্গ মাইল ব্যেপে বিস্তৃত হয়ে আছে—প্রায় সমগ্র য়ুরোপীয় মহাদেশের সমতুল্য। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-প্রসূত আকাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত সব কিছু বৈশিষ্ট্যই এদেশে আছে—প্রাচুর্য্য ও খনিজ সম্পদে কোন দেশের চেয়েই এ হীন নয়।



কিউবেক প্রদেশের একটি হ্রদের দৃশ্য

পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে এদেশটিতে ছিল শ্বাপদ-সঙ্কুল বনানী ও নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রিয় "লাল ভারতীয়দের" (Red Indian) বাসভূমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জনপদ। এই ছোট ছোট জনপদগুলিকে তারা বলতো 'ক্যানেদা' অর্থাৎ গ্রাম। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসীজাতি যখন অন্যান্য জাতির অনুকরণে উপনিবেশ স্থাপনের ঔৎসুক্যে সাগরের বুকে পাড়ি দিতে সুরু করেছে নতুন দেশ বা দ্বীপ আবিষ্কারের পরিকল্পনায়, তখন ফরাসী নৌচালক 'জ্যাকে কার্টার'ই সদলবলে এই দেশটিতে পদার্পণ করেন। প্রথমে এর তীরে তারা জাহাজ ভিড়ান বন্ধুভাবেই, তখন যাদের আতিথ্য তারা স্বীকার করেছিলেন তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা বলেছিল, ক্যান্নেথা অর্থাৎ একটী গণ্ডগ্রাম সেই কথাটিই আজ উচ্চারণ ভেদে ক্যানেদা হয়ে সারা দেশটির পরিচয় হয়েছে।

তারপর বন্ধু রূপ নিল বিজেতার।

জ্যাকে কার্টার সুরু করলেন দেশটিতে ফরাসী আধিপত্যের প্রচেষ্টা। শক্তিশালী বিজেতার সামর্থ্য ও কৌশলের কাছে শান্তিপ্রিয় অসভ্যেরা মাথা নত করলো, যারা করলো না, তারা পালিয়ে গেল অরণ্যের মধ্যে। ধীরে ধীরে একটি ফরাসী উপনিবেশ গড়ে' উঠলো সমুদ্রতীরের

এক একটি জনপদ দখল করে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ফরাসী উপনিবেশ হিসাবে ক্যানেদা প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠলো।

তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধের কথা।

যুদ্ধ শেষ হোল "ট্রিটি অফ্ প্যারী"র সন্ধিতে। এই যুদ্ধের ফলে উপনিবেশের অধিকার হস্তান্তরিত হয়ে গেলো—সন্ধিসূত্র অনুসারে ইংরাজরা ক্যানেদা দখল করলো। সে সতেরো তেষট্টি খৃষ্টাব্দের কথা।



য়ুকুন ও ফ্রেজার নদীর ধারে ধারে ক্যানেদিয়ানরা এমি ছোট ছোট নৌকা নিয়ে স্বর্ণমিশ্রিত বালির সন্ধান করে

ইংরাজদের অধিকার-ভুক্ত হোল বটে কিন্তু এদেশের ফরাসী আচার ব্যবহার ও ফরাসী জীবনধারার পরিবর্ত্তন হোল না বিশেষভাবেই। মাঝে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের অবসানে এদেশের দক্ষিণ সীমান্ত প্রদেশ স্বাধীন আমেরিকার করতল গত হয়। এখন এ দেশটি ইংরাজ-রাষ্ট্র শক্তির অধীনে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ পেয়েছে।

—এই গেলো এ দেশটির মোটামুটি ইতিহাস।

এইবার এদেশের জীবন ধারার কথা।—

প্রায় পৌণে দুশো বছর এ দেশটি ইংরাজ রাজশক্তির অধীনে থাকলেও এখানকার অধিবাসীরা ফরাসী ভাষাকেই মাতৃভাষা জ্ঞান করে, ফরাসী ধরণেই এদের রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত, জীবনধারা ও রাজনীতিতেও এরা ফরাসী—নিজেদেরকে ফরাসী বলে পরিচয় দিয়ে এরা গর্ব্ব করে। ফরাসীরাই প্রথম এদেশে সভ্যতার আলোকপাত করেছিল-এই এদের গৌরব। জনসংখ্যাতেও ফরাসীরাই বেশি; ইংরাজ, চৈনিক, জাপানী ও ভারতীয়ও আছে তবে এদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। চৈনিক ও জাপানীদের সংখ্যা অল্প হবার কারণ আছে: বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চৈনিক ও জাপানীরা এদেশে আসতে সুরু করেছিল অতিরিক্ত ভাবে। তাদের সংখ্যা ক্রমে এত বৃদ্ধি পায় যে অনাগত আগন্তুকদের সংখ্যা ক্ষীণ করে ফেলবার জন্য উনিশ-শো দশ সাল থেকে নবাগত চৈনিক ও জাপানীদের উপর ব্যক্তি-কর ধার্য্য করা হয়। এই 'পালেৎ' কর এখনও ক্যানেদায় প্রবর্ত্তিত আছে। কোন নূতন চৈনিক বা জাপানী সে দেশে গেলে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রায় একশো পাউণ্ড জমা দিতে হয় উপরন্ত চীন ও জাপানী রাজশক্তির সঙ্গে এরা একটা চুক্তি করেছে—যে একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশি চৈনিক ও জাপানী ক্যানেদার স্থায়ী অধিবাসী-স্বত্ব লাভ করবে না। ইংরাজ ও হিন্দুদের উপর কোন বিধি নিষেধ নেই, তারা একই ব্রিটিশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলেই হয়তো।

জ্যাকে কার্টার যখন প্রথম ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করলো, তখন সেই সব প্রবাসী তরুণ ঔপনিবেশিকদের নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য নারীর সাহচার্য্যের প্রয়োজন হয়েছিল। লাল ভারতীয়দের মেয়েদের তাদের পছন্দ হোল না, তাই তারা ফরাসী রাজার কাছে আবেদন করলো জাহাজ জাহাজ ফরাসী মেয়ে ফ্রাঁস থেকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাদের সে আবেদন গ্রাহ্য হোল,

প্রতি বছরে ছশো ফরাসী তরুণী একখানি করে জাহাজে এসে পৌছতো এদেশের বন্দরে। বন্দরের সামনেই ছিল গির্জ্জা। সেই গির্জ্জার হলে নবাগতাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হোত। ইতিমধ্যে এক একটি যুবককে দু'মিনিটের জন্য সেখানে প্রবেশ অনুমতি দেওয়া হোত, সেই সময়টুকুর মধ্যেই একটি তরুণীকে পছন্দ করে, তার হাত ধরে সে বাহির হয়ে আসতো। পুরোহিত তৈরীই থাকতেন, একটির পর একটি বিবাহ তিনি সম্পন্ন করতেন



লাল ভারতীয়দের মেয়েরা মৃৎপাত্র তৈরী করছে

অবিলম্বেই।—এ ছিল উপনিবেশের প্রথম যুগের কথা। আজকাল কিন্তু ওদেশে তরুণীর অভাব নেই মোটেই।

এদেশের ঋতু ভারতের মতই।

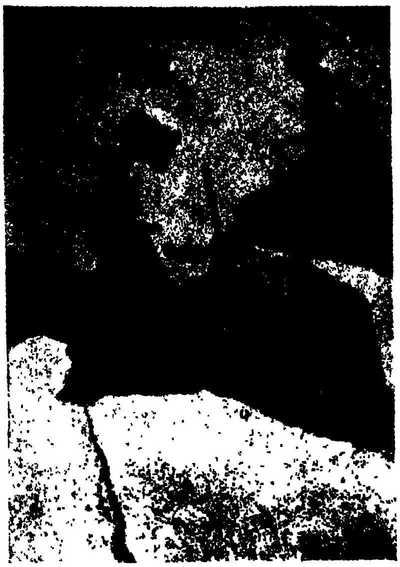
গ্রীষ্মকাল এদেশে দীর্ঘস্থায়ী নয়, শীতকালের স্থায়িত্ব প্রায় পাঁচ মাস। দেশটির বুকে বারিপাতও হয় প্রচুর। এই বারিবর্ষণের উপর এদেশের হাজার হাজার মাইল বিস্তীর্ণ গম-ক্ষেতগুলির শস্য-প্রাচুর্য্য নির্ভর করে। গমই এদেশের প্রধান ফসল।

এদেশটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে ফেলাও চলে—দক্ষিণ ও উত্তর। দক্ষিণাংশটি আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে, দোদুল্যমান শস্যশ্যামল গম ক্ষেতের জন্যই এ অংশটি প্রসিদ্ধ আর উত্তরাংশটি প্রায় বনভূমি বললেও অত্যুক্তি হয় না, জঙ্গলাকীর্ণ এই ভূভাগটিতে আদিম অধিবাসীদের বসবাসই বেশি। বিংশ শতাব্দীর প্রাসাদ-বেষ্টিত যান্ত্রিক সভ্যতা এখানে নেই। আদিম অধিবাসীরা অসভ্যতার আবরণে নিজেদের আত্মগোপন করেছে এই বনপ্রান্তরের বুকে প্রাকৃতিক জীবনধারার মধ্যে। হিংস্র শ্বাপদের অভাব নেই এই সব অরণ্যে, শিকারীদলও তাই মাঝে মাঝে এই সব বনভূমিতে হানা দেয়। তাই এদেশের শিকারীদের উপরেও কড়া আইন জারি করা আছে—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক জীবজন্তু শিকার করলেই উচ্চহারে জরিমানা দিতে হয়। এই বনভূমির মাঝে অনাবিষ্কৃত সোনার খনির স্বপ্ন দেখে অনেক তরুণ য়ুরোপীয় ভবিষ্যতের রঙীন আশার মোহে এ অঞ্চলে এসে স্বাস্থ্য হারায়—মৃত্যুমুখেও পতিত হয় অনেকে।

এখানকার লোকেরা খুব স্বদেশ প্রেমিক—জগতে নিজ মাতৃভূমির গৌরব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরা সব কিছুই করতে পারে। বিদেশীদের সুবিধার জন্য এরা যথেষ্ট চেষ্টা করে। বিদেশীদের থাকবার জন্য এদেশের অর্থশালী নাগরিকেরা সম-ব্যয়ে সহরে সহরে দু-একটি করে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে—এই ক্লাবগুলি আমাদের দেশের ধর্ম্মশালারই উচ্চ আধুনিক সংস্করণ মাত্র। এই সব ক্লাবের বহু বৈদেশিকের একত্র বাস করার সব কিছু সুখ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। এক একটি ক্লাবে দু-শো থেকে দু-দশ হাজার পর্য্যন্ত লোকের স্থান সংকুলন হতে পারে। এ ছাড়াও প্রতি সহরে এক একটি করে দোকান আছে, সেখানে পোষ্টকার্ড থেকে সুরু করে ফলমূল পর্য্যন্ত কিনতে পাওয়া যায়। শুধু কি তাই, উপরন্তু তার মালিকের কাছ থেকে কোন কিছু জানতে চাইলে তার সন্তোষজনক উত্তর

পাওয়া যাবেই—এর জন্ত কর্তৃপক্ষ তাদের উপযুক্ত বৃত্তি দিয়ে থাকেন।

ওদেশে ক্যাথলিক্ ও প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ দুই ধর্ম্মেরই প্রচলন আছে, তবে ক্যাথলিকদের সংখ্যাই বেশি। এরা অতিরিক্ত



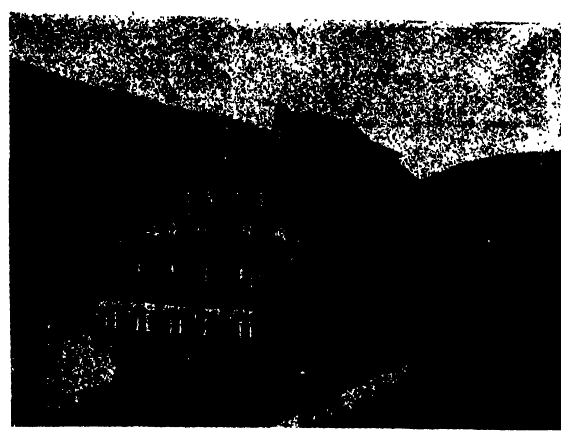
পাহাড়ে উঠ্ছে

ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মের নামে অম্লান বদনে সব কিছু কষ্ট ও পরিশ্রম এরা স্বীকার করতে পারে। তার উপর কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—সব কিছুতেই এরা রক্ষণশীল, পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতেই এদের আগ্রহ অতিরিক্ত।

রাজনীতি চর্চ্চার পক্ষপাতি এরা মোটেই নয়—পরাধীনতার পেষণে এরা এম্নি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল যে রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করতেও এরা ভয় পেতো কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত। তারপর অধুনা ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাবার পর রাজনীতি-চর্চ্চায় এরা আগের চেয়ে প্রেরণা পেয়েছে। ওদের আইন কানুন ও বিচার পদ্ধতি ইংরাজীরই রূপান্তর মাত্র কিন্তু শাসন ও রাষ্ট্রপদ্ধতি ফরাসীধারায় গঠিত। পুলিশকে ওরা অতিরিক্ত সমীহ করে চলে, সাধ্যপক্ষে পুলিশের সংস্পর্শে আসতে চায় না মোটেই। পুলিশকে এরা এতটা মর্য্যাদা দেখায় যে পথের মোড়ে সাধারণ কনেষ্টেবল্গুলোর সঙ্গে মুখোমুখি ঘটলে এরা মাথা থেকে টুপী নাবায়। শোনা যায় এদেশের পুলিশেরাও নাকি অতিরিক্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ, কর্ত্তব্যের খাতিরে এরা দৈহিক ও মানসিক সব কিছু ক্লেশকে অম্লান বদনে উপেক্ষা করে। এই জন্তই হয়তো ওদেশে চৌর্য্যবৃত্তির সংখ্যাও কম। পুলিশের সহযোগী হিসাবে গুপ্তচর বিভাগও ওদেশের শাসন পদ্ধতির একটি অঙ্গ। এদের কাজ হচ্ছে আব্গারী করের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা—যে সব মাদক দ্রব্য বিক্রেতারা আব্গারী কর দিতে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে তাদের ধরে দেওয়া। গুপ্তচর ছাড়া গোয়েন্দা বিভাগও আছে খুন ও চৌর্য্যবৃত্তি সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্ত।

আমাদের মত ওদেশে রৌপ্যমুদ্রারই প্রচলন বেশি, তাম্রমুদ্রাও চলে, নোটেরও অভাব নেই। "ডলার"ই হোক, "সেণ্ট্"ই হোক বা "কপার্"ই হোক—সকল মুদ্রাকেই ওরা বিট্ বলে। ওদের চার কপারে এক সেণ্ট্ হয়, একশো সেণ্টে হয় এক ডলার। ওদের ডলারের দাম আমাদের আড়াই টাকা, আর সেণ্টের দাম প্রায় দেড় পয়সা।

ক্যানেদিয়ানদের লেখাপড়ার দিকে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না—ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করে তোলার চেয়ে



লেকের ধারের বাড়ী

ব্যবসা-বাণিজ্যে দীক্ষিত করবার আকাঙ্ক্ষাই এদেশের পিতামাতাদের বেশি। এই জন্তই হয়তো এদেশের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য পুষ্টিলাভ করতে পারেনি অন্যান্ত দেশের মত। তা বলে এদেশের ছেলেমেয়েরা যে একেবারেই লেখা-পড়া

শেখে না তা নয়—উচ্চ-ইংরাজী-ধরণে-গঠিত স্কুল-কলেজগুলিতে এদেশের ছেলেমেয়েরা একত্রে শিক্ষালাভ করে ইংরাজ রাষ্ট্রগুলিরই মত। বিভিন্ন প্রদেশের বড় বড় সহরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই, তার উপর স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বাধ্যতা-মূলক নীতিও প্রবর্ত্তিত হয়েছে—এতে ওদেশের শিক্ষার প্রসারতা বিস্তৃতি লাভ করছে বিশেষ ভাবেই।

পড়াশুনার সম্পর্কে খেলার কথাটাও উল্লেখ না করলে চলবে না—খেলাধূলার উপরেই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য তথা জাতীয় ভবিষ্যৎ জীবনী-শক্তি বিশেষ ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে থাকে। এদিক দিয়া এরা জগতের অনেক জাতীর চেয়েই শ্রেষ্ঠ—আবালবৃদ্ধ-বনিতার খেলার দিকে অত্যাধিক উৎসাহ দেখা যায়। ক্রিকেট্, টেনিশ, হকি, বেশবল, পোলো, গল্ফ্—এসব তো আছেই, তা ছাড়া গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে চড়া এদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি যেন। শীতকালে এদেশের বুকে যখন অতিরিক্ত ভাবে তুষারপাত হয়, মাঠের শ্যামলিমা যখন তুষার ধবল হয়ে ওঠে তখন এদেশের ছেলে মেয়েরা "আইস্-হকি", না হলে "কোষ্টিং" খেলে। বরফের উপর স্কেটিং পড়ে' আইস্-হকির খেলোয়াড়িরা যখন হকিষ্টিক্ হাতে নিয়ে ছুটোছুটি ও লাফালাফি করে তখন সে দৃশ্যে অনভ্যস্থ লোকেরা চমৎকৃত না হয়ে পারে না। আইস্ হকি খেলার সুবিধা না হলে কুকুর-টানা-স্লেজে চড়ে বরফ ঢাকা জমীর উপরে পাঁচ ছ' মাইল ছুটোছুটি করে এরা "কোষ্টিং" খেলে। অবসর সময়ে হাতের কাছে কোন একটি খেলা এদের চাইই না হলে এদের প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে। গল্প ও উপন্যাস পড়ার চেয়ে খেলারই এরা বেশি পক্ষপাতি।

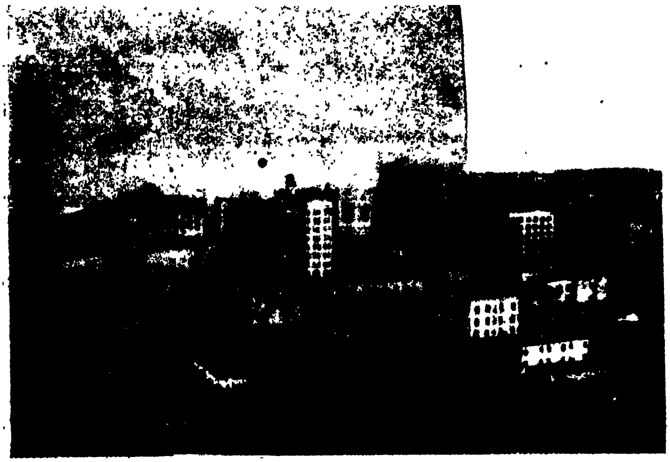


নোৎরডাম গীর্জ্জা—মণ্ট্রিল

এদের গৃহে শীতগ্রীষ্মের প্রবেশ নিষেধ বললেই হয়। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপদগ্ধ দ্বিপ্রহরে এদের গৃহের মধ্যে গ্রীষ্মের আভাসটুকুও জাগে না। আবার শীতকালে বরফাচ্ছন্ন মাঠের শ্যামলিমা যখন তুষারধবল হয়ে ওঠে তখন সেই শীতকে গৃহ মধ্য হ'তে দূরীভূত করবার জন্য যত কিছু ব্যবস্থা হতে পারে তার সব কিছুই এরা অবলম্বন করে। এই জন্যই গ্রীষ্মের উত্তাপ ও শীতের শৈত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি হয় না এদের গৃহ মধ্যে। টেলিফোন এদেশের প্রায় সকল গৃহেই আছে, এটি না থাকলে যেন গৃহের পূর্ণতার হানি হয়। ইলেক্‌ট্রিক্ আলো-পাখার কথা তো বলাই বাহুল্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এদের গৃহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করে এজন্য সে সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেও এরা মোটেই কার্পণ্য করে না। ধনীর অট্টালিকা থেকে দরিদ্র চাষার ঘরে পর্য্যন্ত কোথাও অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্নতার আভাষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না—এটি এদের জাতীয় জীবনের যেন একটি বৈশিষ্ট্য।

ক্যানেদার রেলপথের দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় উনিশ হাজার মাইল—লিভারপুল থেকে পিকিং-এ আসতে হলে যত লম্বা রেলপথের দরকার হয়। এদেশের সব ক'টি রেলপথের মধ্যে "ক্যানেদিয়ান প্যাসিফিক্" রেলপথই অন্যতম। তবে এদেশের রেলপথের কর্ম্মচারীদের মধ্যে Division of Labourএর একান্ত অভাব—একা গার্ডকে টিকিট্ বিক্রীর কাজ থেকে টিকিট্ চেকারের কাজ পর্য্যন্ত করতে হয়। ট্রেন ছাড়বার আগে গ্রামোফনের মত একটি টিনের চোঙ মুখে নিয়ে তিনি গম্ভীর স্বরে যাত্রীদের আদেশ করেন গাড়িতে ওঠবার জন্য, সকল যাত্রী উঠলে পর ট্রেন ছাড়ে। তখন তিনি টিকিট্ চেক্ করতে সুরু করেন, সঙ্গে সঙ্গে যে

সব যাত্রী টিকিট্ কেনবার সুযোগ পায়নি তাদের টিকিট্ বিক্রীও করেন।



ভ্যানকুভার সহরের সাধারণ দৃশ্য

এদেশের ট্রেনের গঠন ধারা অন্যান্য দেশ হতে বিভিন্ন। মাঝখান দিয়ে থাকে একটি সরু পথ, আর তারই দুপাশে পড়ে ছোট ছোট কামরা—কোন কামরাতেই চারজনের বেশি যাত্রী বসবার স্থান নেই। যতক্ষণ ট্রেন চলে ততক্ষণ ইঞ্জিনের মধ্য থেকে ঘণ্টা বাজানো হয় আমাদের দম্‌কলের মত। এদেশের ষ্টেশনগুলি সাধারণতঃ খুবই প্রশস্ত হয় কিন্তু সেই অনুপাতে ষ্টেশনের কর্ম্মচারী সংখ্যা বিশেষ ভাবেই কম, না হলে গার্ডকে টিকিট্ চেকারেরই বা কাজ করতে হবে কেন! লাগেজ্ নিয়ে ভ্রমণ করবার একটি মস্ত অসুবিধা আছে এদেশের রেলপথে, সাধারণতঃ কোন ষ্টেশনেই মুটে পাওয়া যায় না বিশেষ বড় বড় সহরগুলি ছাড়া।

ওদেশের দক্ষিণাংশে প্রচুর পরিমাণে ফসল হয় সেকথা আগেই বলেছি। স্বায়ত্ত-শাসন পাবার আগে পর্য্যন্ত চাষ আবাদের সময় ওদেশে বিশেষ জলকষ্ট ছিল, অধুনা কর্ত্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। বিখ্যাত "সেন্ট লয়েন্স্" নামক খালই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গমই হচ্ছে ক্যানেদার প্রধান শস্য, হাজার হাজার বিঘে জমীতে শুধু গমেরই আবাদ করা হয়। গম ছাড়া ভূট্টা, যব, চা প্রভৃতিরও চাষ হয় তবে গমের মত সেগুলি উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যান্য দেশের মত নানাবিধ ফলমূলও যে সেদেশে পাওয়া যায়, একথা বলাই বাহুল্য।

খনিজ দ্রব্যের জন্য ক্যানেদা প্রসিদ্ধ। এ দেশীয় খনিজ পদার্থের মধ্যে সোনা, তামা, কয়লা ও লবণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোনার-খনি আছে এদেশে অনেক, এমন কি এদেশের দুটী নদীতট থেকেও সোনা পাওয়া যায়। এই নদী দুটীর নাম "য়ুকোন" ও "ক্রেণ্ডাব্"। কিন্তু সোনা পাওয়া গেলে কি হয়, এ নদী দুটির তটভূমি জীবন সংশয়কর অস্বাস্থ্যকর। রূপার খনিও এদেশে আছে বহুসংখ্যক। সিল্‌ভার দ্বীপে এত বেশি পরিমাণে রূপা পাওয়া যায় যে তার নামকরণই হ'য়েছে রৌপ্য (silver) দ্বীপ। তাছাড়া কয়লার খনি ও লবণের খনিও বড় কম নাই।

ক্যানেদার গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে গরুই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ দেশের মত সুস্থ, সবল ও নিরোগ গরু খুব অল্পই দেখা যায় এই জন্যই আমেরিকার অন্যান্য রাজ্যে ও



ষ্ট্যানলী পার্ক—ভ্যানকুভার

অষ্ট্রেলিয়ান্ উপনিবেশগুলিতে এ দেশীয় গরুর বিশেষ চাহিদা আছে। এ সব ছাড়া উত্তরাংশের বনভূমিগুলির কল্যাণে

এদেশের কাঠ আজ পৃথিবীর প্রায় সকল রাজ্যকেই সমৃদ্ধ করে তুলেছে। য়ুরোপীয়ানদের মতে ক্যানেদাকে জগতের কাঠ ভাণ্ডার বলা চলে। এ দেশের কাঠ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অতিরিক্ত পরিমাণে রপ্তানী হয়।

ক্যানেদার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রদেশ হচ্ছে "বৃটিশ কলম্বিয়া"। তিন লক্ষ, বিরাশী হাজার, তিনশো বর্গমাইল ব্যাপী এই প্রদেশটীর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ, আটাত্তর হাজার। অনতি উচ্চ "রকি" পর্ব্বতশ্রেণীর ব্যবধান এ প্রদেশটীকে ক্যানেদা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গরিমায় এটী ক্যানেদার শ্রেষ্ঠ প্রদেশ। সুইট্জারল্যাণ্ডের মত এ প্রদেশটী চিরবসন্তের লীলা নিকেতন। স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবেও ক্যানেদার মধ্যে এটী অদ্বিতীয়। এ প্রদেশটীর অধিকাংশই অরণ্যবহুল, সেইজন্যই হয়তো বাসন্তী সুষমা এ প্রদেশটীকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। এই প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সহর হচ্ছে "ভিক্টোরিয়া"। সহরটির জনসংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ।

তারপর কিঙ্গবেক্ প্রদেশ। এ প্রদেশটীর বিস্তার হচ্ছে দু' লক্ষ, সাতাশ হাজার, পাঁচশো বর্গ মাইল, আর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ষোল লক্ষ, আটচল্লিশ হাজার, ন'শো। এই প্রদেশটীতেই নাকি সর্ব্বপ্রথম ফরাসী ঔপনিবেশিকরা পদার্পণ করেন। এ প্রদেশটী বেশ সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল, কয়েকটী সোনারখনিও আছে এ অঞ্চলে। এই প্রদেশের প্রধান সহর হচ্ছে কিঙ্গবেক, লক্ষাধিক এখানকার জনসংখ্যা। এ সহরটীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফরাসী ঔপনিবেশিক "চ্যাপ্লেন"। চমৎকার কয়েকটী হ্রদ এ সহরটীকে বেষ্টিত করে আছে, এ সহরটী যেন মরূদ্যানের মত মাদকতাময়। চট্টগ্রামের মত এ সহরটীর অর্দ্ধেকটা সমতল ও অপরার্দ্ধ ঢালু পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দূর থেকে একখানি ছবির মত দেখায় এ সহরটীকে।

নাভাস্কোটিয়া, অণ্টারিয়ো, ম্যানিটোয়া প্রভৃতি আরো কয়েকটী প্রদেশে ক্যানেদা বিভক্ত, নীচে তাদের পরিমিতি ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটী তালিকা দিলাম: নাভাস্কোটিয়ার বিস্তৃতি হচ্ছে কুড়ি হাজার, পাঁচশো, পঞ্চাশ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ, ষাট হাজার। অণ্টারিওর বিস্তৃতি হচ্ছে দু' লক্ষ, উনিশ হাজার, ছ'শো, পঞ্চাশ বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় একুশ লক্ষ, বিরাশী হাজার। ম্যানিটোবার বিস্তৃতি চৌষট্টি হাজার ছেষট্টি বর্গ মাইল, জনসংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ, পঞ্চান্ন হাজার। নিউব্রান্সউইক্এর বিস্তৃতি আটাশ হাজার একশো বর্গমাইল, জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ, একত্রিশ হাজার। এই সকল প্রদেশ ছাড়া গুটিকয়েক দ্বীপকেও ক্যানেদার অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য করা হয়। দ্বীপগুলি হচ্ছে "প্রিন্স এডোয়ার্ড", "যুকন", "ম্যাকেঞ্জি" প্রভৃতি। এদের বিস্তৃতি তেইশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার, চারশো একাশী মাইল, জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ, পনেরো হাজার। সর্ব্বশুদ্ধ এই সাতটী প্রদেশ নিয়ে সারা ক্যানেদার পরিমিতি হচ্ছে তেত্রিশ লক্ষ, পনেরো



ক্যানেদার পুরাতন পার্লামেণ্ট্ ভবন—টোরেণ্টো

হাজার, ছ'শো সাতচল্লিশ বর্গ মাইল আর জনসংখ্যা প্রায় তিপ্পান্ন লক্ষ আশি হাজার।

"টরেণ্টো" ছিল ক্যানেদার পুরাণো রাজধানী, এখনকার রাজধানী হচ্ছে "ওটোয়া"। শেষোক্ত সহরটীকে বড় বলা যায় না, মাত্র দেড় লক্ষ অধিবাসী নিয়ে এই সহরটী গড়ে উঠেছে। ক্যানেদার শ্রেষ্ঠ সহর হচ্ছে "মেণ্ট্রিয়েল", ক্যানেদার শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হচ্ছে এই সহরটী। এত বড় সহর ক্যানেদায় আর নেই, এখানকার জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ন' লক্ষ।

ক্যানেদার দুটী অট্টালিকা আমেরিকার মধ্যে প্রসিদ্ধি

অর্জ্জন করেছে; প্রথমটী হচ্ছে টরেন্টো সহরের পুরাণো পার্ল্যামেণ্ট ভবন আর দ্বিতীয়টী হচ্ছে ওটোয়া সহরের আধুনিক পার্ল্যামেণ্ট ভবন।

ক্যানেডিয়ানরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী, ফুলবাগান তাই এদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। গৃহসংলগ্ন একটী ফুলের বাগান এদের থাকা চাইই, এটী যেন ওদের নিত্যনৈমিত্তিক বিলাসীতার একটী অঙ্গ। তাছাড়া আমেরিকানদের মত আধুনিক সভ্যতাপ্রসূত সবকিছু বিলাসীতারই এরা পক্ষপাতী। এদেশের সুদূর পল্লীগৃহেও পিয়ানো ও রেডিওর প্রচলন আছে। এদেশের হ্রদের ধারে



পার্লামেণ্ট ভবন—ওটোয়া

ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে ছোট ছোট এক নতুন ধরণের পল্লীভবন দেখা যায়, সেগুলিকে এরা কাষ্ঠভবন (Log Cabin) বলে। ছোট ছোট দুতিনখানি কাঠের ঘর নিয়ে এক একটী ছোট বাড়ি, অপরিচিতদের দৃষ্টিতে দূর থেকে ষ্টিমার বলে ভুলও হতে পারে। সাধারণতঃ এই পল্লী ভবনগুলিতে সহরের লোকেরা এসে বাস করে, কেহবা লেকের ধারে মৎস্য শীকারের উদ্দেশ্যে আবার কেহবা পার্ব্বত্য বনানীর মধ্যে পশুশিকারের আশায়। ওদেশের লোকদের শীকার করার যে একটী বিশেষ বদ্‌খেয়াল আছে এই পল্লীভবণগুলির বহুলতাই সে সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গ্রামের লোকদের আতিথ্য-বাৎসল্য প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। অপরিচিত, বিশেষভাবে ভিন্নদেশীয়দের দেখলেই তাদেরকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে পানাহার না করিয়ে এরা কখনও ছাড়ে না—অবশ্য পানাহারের শ্রেষ্ঠত্ব গৃহস্থের অবস্থার উপর নির্ভর করে। শুধু পানাহারেই এদের আতিথ্য শেষ হয় না, উপরন্তু সে অঞ্চলে দর্শনীয় কোন বস্তু থাকলে তা অপরিচিতকে দেখবার জন্য এরা উৎসুক হয়ে ওঠে।

পল্লীবাসীরা খুব সরল ও সত্যপ্রিয় হয়। স্বাস্থ্যমণ্ডিত এদের আকৃতি। আমাদের দেশের পল্লীর মত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি নানাবিধ রোগের প্রকোপ এদেশের নেই। স্বদেশের সামান্য নিন্দা এরা সহ্য করতে পারে না, সে নিন্দাকে স্খালন করবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও এরা কখনও কুণ্ঠিত হয় না। শীতকালে এই সব পল্লীবাসীদের কষ্টের আর সীমা থাকে না। অবিরাম তুষার-পাতে গৃহের বাহিরে দুতিন ফিট্ করে তুষার জমে ওঠে। সে সময়ে বাড়ির বাহির হওয়া হয়ে ওঠে অসম্ভব। এই প্রচণ্ড তুষারপাত স্থায়ী হয় চারপাঁচ মাস, সময় সময় ছ'মাসও। এই ক'মাস এরা বাড়ির বাহির হতে পারে না বলেই শীতের পূর্ব্ব থেকেই এরা মাসছয়েকের মত খাদ্যদ্রব্য ঘরে মজুত রাখে। বাড়িতে খুব ভারী অসুখ হলেও সে সময়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এইবার এদেশের আদিম অধিবাসীদের কথা।—

এদেরকে সাধারণতঃ "লাল ভারতীয়" বলা হয়, বিদেশী কিম্বা সাহেবদের সংস্পর্শে আসবার আগ্রহ নেই এদের একটুও, নিজেদের সমাজ ও পরিজনের মধ্যেই এরা সম্পূর্ণ, বাহিরে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ এদের এখনও হয়নি। কর্ত্তৃপক্ষ এদের জন্য একটী রিজার্ভ প্রদেশ করে দিয়েছেন,

সেখানেই এরা নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সংখ্যায় এরা সাহেবদের চেয়ে ঢের বেশি। লাল ভারতীয় ছাড়াও এদেশে আরেক জাতীয় আদিম অধিবাসী আছে তারা হচ্ছে "এস্কিমো।" ক্যানেদার উত্তর সীমান্তে আর্কটিক্ মহাসাগরের উপকূলে এরা বাস করে। প্রচণ্ড শীতে বরফাচ্ছন্ন প্রদেশে বরফের ঘর বেঁধে এরা বাস করে। আবাদ করা সে সব প্রদেশে অসম্ভব, কাজেই পশু মাংস, মৎস্য ও দুগ্ধই এদের প্রধান খাদ্য। শীল মৎস্য শীকার করা এদের পেশা। ছাগল ভেড়া এদের প্রধান গৃহপালিত পশু, তাদের মাংস ও দুগ্ধই এদের প্রধান খাদ্য। সংখ্যায় এরা অতি নগন্য। সহগুণ ও সাহস এদের অসামান্য। অতিরিক্ত শীতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এরা সাধারণতঃ ছাগচর্ম্মের জামা ব্যবহার করে, আর বরফের উপর দিয়ে এরা চলাফেরা করে 'স্লেজে' চড়ে'।

ধীরেন্দ্রলাল ধর

ভরা ভাদরের নদীজল

শ্রীবিমলজ্যোতি সেনগুপ্ত

উছলিয়া ওঠে ভরা ভাদরেব নদীজল,
কূলের বুকে সে আছড়িয়া পড়ে অবিরল,
সাগরের পানে চলে' অবিরাম গাহি' গান ;—
সঙ্গীতে তার নাচে আজি মোর হিয়াখান।
হিল্লোলে তার কল্লোল-কল বাজে সুর ;
চঞ্চলা নদী নাচিয়া চলেছে বহুদূর।

বহে শরতের উদাস সমীর অতি ধীর,
কানায় কানায় ভরেছে আজিকে নদীতীর ;
তরু আবছায়ে সবুজ হয়েছে দুইকূল—
কাননে ফুটেছে পারুল বকুল যুঁইফুল,
শেফালীর দল লুটায় তলায় নিরাশায়,—
হাসি উচ্ছ্বাসে ফেনিল সলিল উছলায়।

ঢেউয়ের উপরে লুটায়ে পড়েছে শ্যামকাশ,
হাল্কা হাওয়ায় ছড়ায়ে গিয়াছে ফুলবাস।
নাচে অবিরল ভরা ভাদরের নদীজল
উচ্ছল ছল চঞ্চল চল টলমল।

বিতর্কিকা

১। বাংলা ভাষার প্রচার

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

বাংলা ভাষার উপর বাঙ্গালীর আজকাল দরদ আসিয়াছে। ইংরাজীতে কাব্য-রচনার মোহ আর নাই। বন্ধুর কাছে ইংরাজী চিঠি লেখার সখও কমিয়াছে। মিটিংএ ইংরাজী বক্তৃতাও কমিয়া গিয়াছে। আবার বোধ হয় শীঘ্রই ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্য পুস্তক সমূহ ছেলেদের বাংলায় পড়িতে হইবে। এসব কথা সত্য এবং ইহাও সত্য যে পৃথিবীর উন্নত ভাষা সমূহের মধ্যে বাংলাভাষা অন্যতম। জগতে বাঙ্গালীর যদি কোন কিছু লইয়া গৌরব করিবার থাকে ত সে তাহার ভাষা।

কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার চাপে বাঙ্গালীর এই ভাষাও ক্রমশঃ কোনঠাসা হইয়া পড়িতেছে। তাহারই সীমানার মধ্যে আসিয়া অন্যান্য ভাষা কেমন স্বচ্ছন্দে বাসা বাঁধিতেছে এবং ধীরে ধীরে বাঙ্গালীকে তাহাদের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জীবিকার্জ্জনের কতকগুলি পথে যাইতে বাঙ্গালীর অনিচ্ছা কিম্বা অক্ষমতাই ইহার প্রধান কারণ। এবং দ্বিতীয় কারণ হইতেছে বাংলা ভাষা প্রচারের একান্ত অভাব।

কলিকাতাকে অনেকে অবাঙ্গালীর সহর বলিয়া থাকেন তার কারণ ইহার এগার লক্ষ লোকের মধ্যে পাঁচ লক্ষেরও উপর লোক অন্য ভাষায় কথা বলে। তাহা হইলেও এখানে বাঙ্গালী সমাজ কিম্বা বাংলাভাষার কোন ক্ষতি হয় নাই। তার কারণ উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীই কলিকাতায় বেশী এবং অবাঙ্গালীদের সাড়ে পনর আনাই নিম্ন শ্রেণীর। তাহারা ইহাদের নাগাল পায় না। সমস্যাটি দেখা দিয়াছে মফঃস্বলের কোন কোন অঞ্চলে। কল কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী বাংলা দেশে আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও আসিবে। কারখানা শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে ইহার গতি নিরোধ করা যাইবে না।

এখন কথা হইতেছে এই যে, ইহাদের প্রভাব হইতে নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালী সমাজকে রক্ষা করা যাইবে কি করিয়া। হালিসহর, নৈহাটি, ভাটপাড়া ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী হইয়া গিয়াছে। নূতন মিলের প্রতিষ্ঠা আর হইতেছে না কিন্তু নূতন লোক আসা বন্ধ হয় নাই। তাহার কারণ মিলে কাজের স্থায়িত্ব খুব কম। সাহেব, বাবু ও সর্দ্দারের খেয়ালমত জবাব হইয়া থাকে। কাজেই তাহাদের জানা আছে সেখানে গেলেই কাজ মিলিবে। এদিকে যাহাদের জবাব হইয়া যায় তাহাদের সকলেই দেশে ফিরিয়া যায় না। বোধ হয় অন্য উপায়েও এখানে জীবিকা অর্জ্জন সহজ বলিয়া। চাকর, মুটে, ফেরিওয়ালা সব তাহারাই। দোকানদারীর ত কথাই নাই। পান বিড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া মনোহারী কাপড়ের দোকান পর্য্যন্ত সব তাহাদেরই। সম্প্রতি বাজারের মাছ শাকও তাহারাই বেচিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মিলের কুলি ব্যারাক ছাড়িয়া অন্য যায়গায় আসিয়া ঘর বাঁধিতেছে। ফলে বাঙ্গালী পল্লীর পাশে পাশে হিন্দুস্থানী পল্লী গড়িয়া উঠিতেছে। আমি অনেক নিম্ন শ্রেণীর বাঙ্গালীকে দেখিয়াছি যাহারা ইহাদের সহিত অত্যধিক মেলামেশার ফলে একেবারে অবাঙ্গালী ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে। ভাটপাড়ায় একটি কুড়ি একুশ বছর বয়সের যুবককে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। এতদূর পরিবর্ত্তনও কি সম্ভব? সে বাংলায় কথা বলিতে ভুলিয়া

গিয়াছে। অথচ হিন্দুস্থানীদের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বেশ বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল ঠিক উল্টা।

এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দরকার এবং আরও দরকার হইতেছে বাংলা যাত্রা গান প্রভৃতি শুনিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা। এইরূপ ব্যবস্থায় যে অবাঙ্গালীকে বাঙ্গালীতে পরিণত করা সম্ভব তাহা শ্রীহট্টের চা বাগানের কুলিদের দেখিলেই বেশ বোঝা যায়। বাগানের কাজ ছাড়িয়া অনেকে আজকাল ঐসব অঞ্চলে চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাত্রাদি হইলে শুনিতে যায়। সময় সময় তাহারাও দল লইয়া আসিয়া গাওয়াইবার ব্যবস্থা করে। ইহাদের ছেলেরা বাংলা শিখিতেছে। এইভাবে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি একটি চা বাগানের ডাক্তারবাবুর মুখে শুনিলাম সেদিকে নাকি হিন্দি প্রচারকদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা হউক এ বিষয়ে দেশবাসীর অবহিত হওয়া উচিত। হইলে বাঙ্গালীর অনেক সমস্যার উপর আরও একটি সমস্যা শীঘ্রই প্রকট হইয়া দেখা দিবে। উড়িষ্যার ক্যারা এবং বিহারের কোন কোন অঞ্চলের বাঙ্গালীদের দেখিলে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর অবস্থা বেশ বোঝা যায়। ইহাদিগের মধ্যে ভাল লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া পুস্তক সরবরাহ করিলে এবং বাঙ্গালার বাঙ্গালীদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিলে এ অবস্থার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষগণও যদি এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে ভাল হয়।

বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীদের কাবু হইবার আরও একটি কারণ সম্প্রতি দেখা দিয়াছে। সেটি হইতেছে শিক্ষিত অবাঙ্গালীর বাংলাভাষার উপর বিদ্বেষ।

উড়িষ্যাবাসীরা বাংলাভাষা বর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন এবং এ আন্দোলনের কর্ত্তা হইয়াছেন তথাকার রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা। "প্রবাসী"তে দেখিলাম শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মজঃফরপুর হইতে শুনিয়া আসিয়াছেন কে একজন পাঞ্জাবী নাকি বলিয়াছেন তাহারা রবীন্দ্রনাথকে চান না, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একটি প্রাদেশিক ভাষাকে বড় করিয়া তুলিতেছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সময় বাংলাভাষাকে তাড়াইবার চেষ্টা হইয়াছিল তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম বাংলাভাষাকে তাঁহারা ভাল চক্ষে দেখেন না। দেখিয়া মনে হয় বাংলাভাষা আপনা হইতেই একটু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে মহারাষ্ট্রীয় সমাজের উপর। হিন্দির ন্যায় এই ভাষাতেও অনেক বাংলা বইয়ের অনুবাদ হইয়া যাইতেছে। অনেক শিক্ষিত মারহাঠী বাংলা বইও পড়িতে পারেন। ফলে মারহাঠী ছেলেমেয়েদের নাম বাংলা নামের অনুরূপ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তাঁহারা অপরের ন্যায় প্রতিশোধ লইতে ব্যগ্র নহেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির প্রারম্ভ হইতেই যদি ইহার প্রচারের চেষ্টা চলিত তাহা হইলে বাংলাই ভবিষ্যৎ ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইতে পারিত। কিন্তু এখন সে আশা আর নাই। এখন কেবল আত্মরক্ষার জন্যই বাঙ্গালীকে বাংলাভাষার প্রচার করিতে হইবে। "হিন্দি প্রচারিণী সভা" সমগ্র ভারতে হিন্দি চালাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সাহায্যে উর্দ্দুও বেশ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। হায়দরাবাদের নিজাম এই ভাষার উন্নতিকল্পে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুসভার রিপোর্টে দেখা যায় ভূপালের নবাব তাঁর রাজ্যে একমাত্র উর্দ্দুই চালাইতে চান যদিও তাঁহার প্রজাবৃন্দের শতকরা নব্বই জন হিন্দু।

কেবল রামকৃষ্ণ মিশনই একটু আধটু বাংলাভাষা প্রচার করিতেছেন। কিন্তু এটা মিশনের গৌণ উদ্দেশ্য। তাহা হইলেও এইটুকুর জন্যই বাংলাভাষা মিশনের নিকট কৃতজ্ঞ। সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই অল্পবিস্তর উন্নতির পথে চলিয়াছে। বাংলাভাষাকে চিরদিনই ইহাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে হইবে। শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সেবকগণ যদি বিষয়টি একটু ভাবিয়া দেখেন ত বড়ই ভাল হয়।

২। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিচিত্রার পাতায় উপেন বাবু 'তুই, তুমি ও আপনি'র ব্যবহার নিয়ে যে বিতর্ক তুলেছেন সে সম্বন্ধে আমি দু'চারটি কথা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। এই তর্ক বিতর্কের কোন মীমাংসাই হবে না যদি না প্রথমত আমরা বুঝি যে সম্বোধনগুলি সামাজিক, অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসেরই সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে ধুরন্ধরগণের মনে একটা গড়পড়তা সাধারণ ধারণা থাকার প্রয়োজন স্বীকৃত হওয়া চাই। যে সমাজ একটি কোন শ্রেণীকে কেন্দ্র করে শৃঙ্খলা বদ্ধ হয়েছে, সে সমাজে সেই শ্রেণীর প্রতি অন্য শ্রেণীর সম্বন্ধ সুনির্দ্দিষ্ট। সম্বোধনগুলিও এই সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের প্রতীক ও সংজ্ঞা। সেইজন্য কেবলমাত্র রক্ষণশীল সমাজে সম্বোধন বিভ্রাট ঘটে না। বিভ্রাট ঘটে তখনই যখন প্রতীক ও সংজ্ঞার অজ্ঞাতে পুরাতন সমাজের ধ্বংস আরম্ভ হয়। ভাঙ্গন ধরে নিম্নতম স্তর থেকে, অভিজাত ও শক্তিশালী সম্প্রদায়ের অলক্ষ্যে। সেইজন্য পুরাতন সংজ্ঞার সঙ্গে নতুন ঘটনার বিরোধ ঘটে। অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে 'আপনি' ব্যবহার করেন, নিম্নতরশ্রেণীকে বলেন 'তুমি', দাসদের বলেন 'তুই'। দাস চায় 'আপনি'র কোঠায় উঠতে, শেষে রফা হয় 'তুমি'তে। 'তুমি'র দল নতুন-দল, তারাও চায় আপনি হতে। এতদিন এইভাবে সমাজের দেহে রক্ত চলাচল হয়ে এসেছে। কিন্তু আর চলছে না, বিশেষত, বাঙ্গালী সমাজে। আমাদের সমাজে নানাকারণে পুরাতন শ্রেণীবিভাগ চলে যাচ্ছে, নতুন যা হচ্ছে তার রূপ প্রকট হয়নি। 'ভদ্দর লোকের' ব্যবহারই ভদ্রতার রূপ নয়, তাই 'আপনি-তুমি-তুই'এর ত্রিকোণ বিরোধ।

আজ যদি ভবিষ্যৎ সমাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোন একটা অস্পষ্ট ধারণাও থাকে তাহলে উপেন বাবুর বর্ণিত অনেক বিভ্রমই ঘটে না। ধরা যাক, আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রগতি হল অ-সমতা লোপ করে সাম্য-স্থাপনের দিকে। বিশ্বাসটি স্থির ও প্রকৃত হলে 'আপনি, তুমি ও তুই'এর গোলমাল খানিকটা চুকে যায়। অ-সমতা দূর হবার পর প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের শক্তি অনুসারে ফুটে উঠতে পারে তাহলে যান্ত্রিক সমীকরণের পরিবর্ত্তে সত্যকারের অভিজাত-পার্থক্যটুকু বজায় থাকে। সেই নতুন সমাজের পরিশীলন ও কৃষ্টিতে 'তুমি'র অর্থ 'আপনি'র মতই হবে। ততদিন আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে প্রত্যেককেই আপনি বলব।

ব্যক্তিগত সম্বন্ধেও ঐ একই কথা ওঠে। বাড়ীর চাকরকে, স্ত্রীকে, ছেলে-মেয়েকে আপনি বলা হয় না। মূলে আছে—সেই পুরাতন সমাজের শ্রেণীগত সম্পত্তিজ্ঞান। ময়লা-পোষাক পরা পণ্ডিতকেও, এমন কি ভদ্র মুসলমান ও ভদ্র শূদ্রকেও আমরা তুমি বলি। মূলে আছে সেই শ্রেণী বিভাগ, অর্থাৎ এক শ্রেণীর অন্য শ্রেণীকে স্বার্থের জন্য ব্যবহার ও অত্যাচার। এই সম্পত্তি জ্ঞান ও শ্রেণীর অত্যাচারই সম্বোধন-বিভ্রাটের হেতু। যখন শূদ্র বলেন 'তুই বলবেন না', যখন স্ত্রী বলেন 'তুই বোলোনা', তখন তাঁরা ভাবেন এই, 'ওসব আগের সমাজে চলত, এখনকার নতুন সমাজে চলে না, আমি না হয় ঘৃণ্য, কিন্তু শূদ্র-জাতিকে ঘৃণা করেন কেন? স্ত্রী-জাতি কি শুধুই দাসী?'

আমার বক্তব্য; যাই চলুক না কেন, শ্রেণীগত অত্যাচার ও তারই ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজ্ঞানের হ্রাস হলে আপনি, তুমি ও তুইএর যে কোন একটা চলবে। প্রকাশ্যে অন্তত। তাই হলেই যথেষ্ট। সমাজের পর ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটবে। আমি লক্ষ্ণৌ থাকি, সেজন্য 'আপনি'র পক্ষপাতী, তা ছাড়া সংস্কারমুক্তও নই।

৩। তুই, তুমি, আপনি

সুধীর মিত্র

গত শ্রাবণের বিতর্কিকায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বাংলাভাষার 'তুই, তুমি ও আপনি' এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করেচেন এবং এদের মধ্যে পরস্পরের যে বিরোধ ছিল তা নিরসন করবার জন্যে বিচিত্রার পাঠকবর্গের কাছে নোতুন একটি প্রস্তাবনা দিয়েচেন। ঐ তিনটি শব্দের প্রয়োগ নিয়ে অনেক সময় যে কী দুর্ভোগ ভুগ্‌তে হয় সম্পাদক মহাশয় সেটা বিস্তৃত ভাবেই দেখিয়েচেন এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি আমরাও সমর্থন করি। তবে এদের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করতে বসে তিনি মাঝামাঝি একটা রফা করে 'তুমি'কেই বাহাল রেখেচেন এবং বাকী দুটিকে একরকম নির্ব্বাসনে পাঠাবার সঙ্কল্প করেচেন। কিন্তু 'তুমি' কথাটির বিস্তার যতই থাক্‌, আমাদের মনে হয় ব্যবহারিক জীবনে নির্ব্বিচারে সর্ব্বত্র একে সচল করা অসম্ভব।

'তুই, তুমি ও আপনি'র উৎপত্তি মানুষের সম্মান বোধের সূক্ষ্মজ্ঞান থেকে। সাধারণতঃ যাদেরকে আমরা আমাদের চেয়ে বয়স, বিদ্যা বুদ্ধি, বৃত্তি বা জাতিতে ছোট মনে করি তাদেরকে বলি 'তুই', সমান বয়সী ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে 'তুমি'—এবং পূজনীয় ও অপরিচিতদের, যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচিত হন তাঁদেরকে বলি 'আপনি'। সুতরাং সম্মান-বোধের ক্রম (grade) অনুসারে এ তিনটির প্রয়োগ চলে আস্‌চে। কাজেই আজ যদি তিনটিকে অবাঞ্ছনীয় মনে করে' দুটিকে বর্জ্জন করার আবশ্যক হয় তাহলে শ্রেষ্ঠ সম্মানবোধক 'আপনি' শব্দটাকে রেখে নিম্নক্রমের বাকী দুটিকে বর্জ্জন করাই যুক্তি-সঙ্গত। কারণ, অসম্মান কাউকে করবার অধিকার আমাদের নেই পক্ষান্তরে মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই সম্মানের পাত্র।

'তুই'কে বাদ দেওয়া যেতে পারে নির্ব্বিবাদে—কেননা 'তুই' কথাটির চেয়ে 'তুমি'র সম্মান এক ধাপ উঁচুতে। আজ যাদের বল্‌চি 'তুই', কাল তাদের 'তুমি' বল্‌লে তারা খুসীই হবে। খুসী না হোক অন্ততঃ মানহানির দায়ে যে ফেল্‌বে না সেটা নির্ভয়ে বল্‌তে পারি। কিন্তু যাঁদের 'আপনি' বলে থাকি তাঁদের তুমি বল্‌তে সুরু করলে তাঁরা নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করবেন। কারণ 'আপনি'র চেয়ে 'তুমি'র গ্রেড একধাপ নীচুতে। মনে করুন সাহিত্য-সম্রাট শরৎবাবুকে যদি বলি, 'তোমার শেষ প্রশ্নটা আমাদের ভালো লেগেচে' অথবা ক্লাসের অধ্যাপককে যদি অনুরোধ করি 'তুমি আমার ফাইনটা মাপ করে দাও স্যর'—তাহ'লে তাঁদের মুখের যা অবস্থা হবে তা'তে দ্বিতীয়বার আলাপ করার ভরসা হবে না। তাঁরা যদি বা সৌজন্য বশতঃ চুপ করে থাকেন—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে যখন বলব,—"তুমি হুজুর সুবিচার কোরো,"—তখন বিচারের পূর্ব্বেই আরদালীকে বল্‌বেন—"শালাকো কান পাকড়ো।" এটা কখনোই সম্ভবপর নয় যে সবাই সর্ব্বত্রই "তুমি"র দ্বারা আপ্যায়িত হবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাক্‌বেন। এটা প্রচলন করতে হলে যাঁর সঙ্গেই আলাপ করব সর্ব্বাগ্রে তাঁর মত নিতে হবে এবং তারপরে 'তুমি' বলা যেতে পারবে নইলে ঘোর অনর্থপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু এভাবে মত নিয়ে 'তুমি' প্রচলন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আর যদি কখনো মত নেয়া সম্ভবপর হয় তাহলে মুখে কেউ কেউ সম্মতি দিয়েও মনে মনে বিরক্ত হবেন এবং ফলে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হ'তে পারে। সাধারণ পরিবারের কোন অর্দ্ধ-শিক্ষিত পুত্র যদি তার সল্প শিক্ষিত পিতা বা পিতৃস্থানীয় (যথা শ্বশুর) কোন ব্যক্তিকে বলে, "বাবা আজ থেকে আপনাকে 'তুমি' বলব"—তাহ'লে পিতা মুখে হয়ত কাষ্ঠহাসি হাস্‌তে পারেন কিন্তু মনে মনে বলবেন "ছেলেটা গোল্লায় গেছে"। ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপদে এই রকম অসুবিধা হবারই সম্ভাবনা রইল ষোল আনা। কাজেই আমরা বলি,—'তুমি' সার্ব্বজনীন হবার পূর্ব্বে ওকে সার্ব্বজনীন করতে যাওয়া দুঃসাহসের কাজ।

অতএব ব্যবহারিক জীবনে যেটা সম্ভবপর হতে পারে সেই দিক দিয়ে আলোচনা করলে বল্‌তে হয় 'আপনি'

শব্দটাই প্রয়োগ করা শোভন, যুক্তি-সঙ্গত এবং সহজ সাধ্য। প্রথমতঃ 'তুমি'র চেয়ে 'আপনি'র মর্য্যাদা ক্রম অনুসারে উঁচুতে সেইজন্যে সবাইকে নির্ভয়ে এবং নির্বিবাদে 'আপনি' বলা যায় তা'তে কারো আত্মসম্মান খর্ব্ব করা হবেনা। দ্বিতীয়তঃ যারা 'তুমি' কথাটি পছন্দ করেনা এবং 'আপনি' বলে অভিহিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেনা তারা খুসীই হবে তৃতীয়তঃ যাদেরকে চিন্‌তে না পারার দরুণ ভুল করে অনেক সময় "তুই" বা "তুমি" বলে বিরোধের সৃষ্টি করে তুলি বা নিজে লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি তাদেরকে আপনি বল্‌লে সে আশঙ্কা আর থাকবে না। আর সব চাইতে সুবিচার করা হবে তাদেরই পর যাদের আমরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিনিয়তই অসম্মান করচি মানুষ হিসেবে তাদের মর্য্যাদা স্বীকার না করে। কোন ব্যক্তিবিশেষকে আমরা তাঁর গুণ, কর্ম্ম বা অন্যকারণে বিশেষ মর্য্যাদা সামাজিক জীবনে দিতে পারি, তাই বলে যারা ঐরূপ মর্য্যাদা পাবার অনুপযুক্ত মানুষ হিসেবেও কি তাদের মর্য্যাদা পাওয়া উচিত নয়? কিন্তু মানুষ হিসেবে মানুষের মর্য্যাদা আমরা দিইনে—সম্বোধনে অন্ততঃ সাম্যভাব দেখানোর মত উদারতা আমাদের থাকা উচিত। কোন ব্যক্তিকে—সে ড্রাইভারই হোক বা দোকানদার বা মুটেই হোক—পেশার জন্যে যদি তাকে সম্মান-বোধক 'আপনি' বলে সম্বোধন না করতে পারি সেটা হবে অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা। শ্বেতাঙ্গেরা যখন আমাদের "কালা আদ্‌মি" বলে তখন আমরা অনুযোগ করি অথচ সমানই ঘৃণাব্যঞ্জক আচরণ প্রকাশ পায় যখন আমরা বৃত্তির জন্যে কোন ব্যক্তিকে হীন পদবাচ্য মনে করে বলি, "তুই" বা 'তোম্'। কাজেই এখন যাদের "আপনি" বলিনে তাদের "আপনি" বল্‌লে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মানই দেওয়া হবে।

আমরা মনে করি "আপনি" শব্দটা ব্যবহার করাই সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক—এতে কোন গণ্ডগোলের সম্ভাবনা ত নেই-ই, বরং এর সার্থকতা যে ঢের বেশী তা উপরে দেখবার চেষ্টা করেচি। অবিশ্যি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার ক্ষেত্রে 'তুমি'কেও না রেখে উপায় নেই।

নীলি আর বেলি

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার নাগ

নীলি আর বেলি, যুগল কিশোরী,
দুজনি দেখিতে ভালো;
বেলি যেন সোনা শরতের রোদ,
নীলি সে চাঁদের আলো!
প্রখর বোশেখী দিনে বেলি যেন
কনক-চাঁপার ফুল,
আষাঢ় প্রদোষে নীলি যেন যুঁই
স্বপনেতে ঢুলুঢুল্‌!
গিরিপাদমূলে বেলি যেন চল-
চপল ঝরণা ধারা,
নীলি যেন স্থির সরসী, আপন
অতলে আপনাহারা।

শারদ অভ্রে বেলি যেন সদা
ভরা শুধু গতিবেগ।
নীলি সে পূর্ণ স্নেহের সলিলে
শ্রাবণ দিনের মেঘ!
চপল, উগ্র তবুও তো বেলি
অপার মধুতে ভরা,
শান্ত, মধুর লাজনতমুখী
নীলি চিরব্যথাহরা!
স্বপনলোকের যুগল মাধুরী
মরতে বেঁধেছে বাসা,
দুজনারি লাগি' গুমরিয়া মরে
ব্যথিত কবির আশা!

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণ

দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে, যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় তীক্ষ্ণধী, কর্ম্মকুশল, পরিচালনদক্ষ, বাগ্মী, দৃঢ়চেতা, সত্যনিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বশালী অকপট দেশপ্রেমিক এবং সর্ব্বজনমান্য নেতার আকস্মিক মৃত্যুতে জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহা বাস্তবিক পক্ষে অপূরণীয়। অনেক ক্ষেত্রে এই কথাটাকে মামুলীভাবে বলা হইয়া থাকে, কিন্তু, আলোচ্যস্থলে ইহা নিতান্ত নির্ম্মম সত্য। সকল বড় লোকের মৃত্যুতেই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু, তবুও, লোকের মনে আশা থাকে যে, বিগত ব্যক্তির স্থান, অন্তত আংশিকভাবে অমুক লোক পূরণ করিতে পারিবেন, বা তাঁহার প্রারব্ধকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে এমন একজন লোকও থাকিলেন না, যিনি বাংলার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেন, বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের কথা বিশ্বের বা সারা ভারতবর্ষের গোচরে আনিতে পারিবেন। বাক্যবীর বলিয়া বাঙ্গালীর একটা অখ্যাতি আছে; বাঙ্গালী শুধু কথা বলিতে পারে কাজ করিতে পারে না, এই বিশ্বাস বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী অনেকেরই আছে। কিন্তু, বাংলার আজ এমনই দুর্দ্দিন যে, কথা বলিবার লোকেরও আজ এখানে অভাব ঘটিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে যে দুর্দ্দিনের আরম্ভ হইয়াছিল, যতীন্দ্র মোহনের মৃত্যুতে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যে-দুইজনের নেতৃত্বের উপর বাংলার রাজনীতিক ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছিল, তাহার একজন থাকিলেন, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বিদেশে, এবং আর একজন তাঁহার কর্ম্মভূমি হইতে অকস্মাৎ চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশের উপর দিয়া যে শোকের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে, সর্ব্বশ্রেণীর লোক তাঁহার মৃত্যুতে যেরূপ বিচলিত হইয়াছেন, তাহা হইতে, বাস্তবিক পক্ষে তিনি যে দেশের লোকের কতটা প্রিয় ছিলেন, দেশের লোকের মনের উপর তাঁহার প্রভাব যে কতটা গভীর ও শক্তিশালী ছিল, তাহা কতকটা অনুমিত হইতে পারে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই আত্মীয়-বিচ্ছেদের দুঃখ ও ক্ষতি অনুভব করিয়াছেন। কর্পোরেশন ও দেশের লোকের পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। অন্যান্য দেশে যে-সময়ে লোকের রাজনীতিক (এবং অন্যান্য) প্রতিভা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়, এবং অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রবীদেরা (এবং অন্যপ্রকার বড় লোকেরা) যখন তাঁহাদের পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অনেক ভ্রমপ্রমাদ হইতে জাতিকে রক্ষা করিয়া, নানাদিকে তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন; আমাদের দেশের সেই বয়সের বড়লোকদের জন্য শোকসভার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে বাংলার আবার বিশেষ দুর্ভাগ্য আছে। বাঙ্গালীর উপর শুধু অবাঙ্গালীরাই নহে, বিধাতাও বিরূপ। দেশ-প্রিয়ের জীবন কর্ম্মবহুল, ত্যাগসমৃদ্ধ ও জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট; তাহা আলোচনা করিবার উপযুক্ত স্থান ইহা নহে মনে করিয়া সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে বারম্বার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহার স্বজনদিগের প্রতি সমবেদনা এবং সমদুঃখ জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশপ্রিয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

দেশপ্রিয়ের মৃত্যুতে প্রতি বাঙ্গালীরই গৃহে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। শবানুগামী জনতার বিপুলতা হইতে

সমগ্র দেশব্যাপী সংখ্যাতীত শোক-সভা হইতে, বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হইতে, বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন দলের বড় লোকদের উক্তি হইতে তাহার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তিনি যোগ্যতা ও চরিত্র বলে, সপক্ষ বিপক্ষ সকল লোকের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু, বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটায়, সরকারী কোনও লোক বা প্রতিষ্ঠান তাঁহার জন্ম শোকপ্রকাশ করেন নাই।

বাংলার বাহিরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং প্রতিনিধি স্থানীয় অনেক প্রতিষ্ঠান তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, সংবাদ পত্রের সংবাদ হইতে যতটুকু অনুমান করা যায়, তাহাতে মনে হয়, বাংলার বাহিরে ইহার অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে হয় নাই। না হইয়া থাকিলে, বিশেষ দুঃখের কথা বলিতে হইবে।

আর ২।১টি ব্যাপারে বাঙ্গালীদের প্রতি অন্যদের ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছিল। বাংলা যেরূপ উদ্যমের সহিত গান্ধী ও মালবীয় জয়ন্তী করিয়াছিল, বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষের অন্যত্র রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই।

বর্দ্ধিত ডাকমাশুল—

আইন পরিষদের আগামী অধিবেশনে মিঃ মামুদ আহমেদ্ ডাকমাশুল বৃদ্ধির আর্থিক ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন। ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে, ডাকবিভাগের আয় হয়ত কিছু বাড়িয়াছে এবং সেদিক দিয়া হয়ত সরকারের কিছু সুবিধা হইয়া থাকিবে।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গে এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে, ডাকবিভাগের ন্যায় সাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সরকারের বণিক-বুদ্ধি কখনই প্রশংসনীয় নহে। দেশের দরিদ্র-সাধারণ যাহাতে বিনাকষ্টে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন, সর্ব্বপ্রথম তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তদনুসারে কাজ করাই এ ব্যাপারে অধিকতর সঙ্গত হইত। খরচ সঙ্কুলানের জন্য ব্যয় সংক্ষেপ বা অন্যবিধ উপায় অবলম্বন করা যাইত।

সংবাদপত্রও পুস্তকাদি প্রেরণ এবং মুদ্রিত পুস্তিকা প্রভৃতি নানাস্থানে বিতরণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায়, ইহা দেশে শিক্ষা বিস্তারের আংশিক বিঘ্ন ঘটাইয়াছে। দেশের ব্যবসা প্রভৃতির উপরও ইহার প্রভাব আছে।

কিন্তু, এ সকল কথা অপেক্ষা ইহার ক্ষতির একটা বিস্তৃততর দিক আছে। চিঠিপত্রের মাশুল বাড়িয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর পরোক্ষভাবে একটা ট্যাক্স বসিয়াছে। পরোক্ষ এই জন্য যে, ইহা আবশ্যিক নহে। কেহ ইচ্ছা করিলে, চিঠি না লিখিয়া ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। কিন্তু, এই সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে নানাকারণে চিঠিলেখাটা এমনই অপরিহার্য্য ব্যাপার যে, কেহই এই স্বেচ্ছামুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন না। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ অর্থ কষ্টে পতিত হইয়াছেন এবং নানাদিক দিয়া তাঁহাদের এত অধিক ট্যাক্স দিতে হয় যে, এই নূতন করভার তাঁহাদের পক্ষে বহন করা বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ডাকবিভাগ পরিচালন ব্যাপারে সাধারণকে সুবিধা দান করিবার নীতি মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হইলে, নানাদিক দিয়া দেশের উপকার হইবে।

আমাদের জনশক্তি

পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে জন-সংখ্যায় ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে প্রথম স্থানীয়। চীন-সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ভারতের স্থান দ্বিতীয় ছিল। অনেক শক্তিশালী স্বাধীন দেশের জন-সংখ্যা অপেক্ষা ভারতের একটি ছোট প্রদেশে অধিক সংখ্যক লোক বাস করে। এক রাশিয়াকে বাদ দিলে, ইউরোপের—কোনও দেশ অপেক্ষাই বাংলা প্রদেশ জন-সংখ্যায় নিকৃষ্ট নহে, মাত্র জার্ম্মানির জনসংখ্যা বাংলা অপেক্ষা কিছু বেশী। যে শক্তিশালী দেশগুলি সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, তাহার মধ্যে ব্রিটীস দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স, এবং ইটালি অপেক্ষা বাংলার জনসংখ্যা অধিক।

জনসংখ্যা সব সময়েই কিন্তু, (হয়ত, বেশীর ভাগ সময়েই) প্রকৃতপক্ষে জনশক্তির পরিচায়ক নহে। সঙ্ঘবদ্ধ সংখ্যাল্প জনমণ্ডলী প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর ইতিহাস গঠন করিয়া আসিয়াছে, ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ যখন পাঠানদিগের দ্বারা বিজিত হয়, তখন, সমগ্র আফগানিস্থানের জনসংখ্যা বাংলার দুইটি বড় জেলার জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল না। মুসলমান আক্রমণকারীরা যে-সকল স্থান হইতে সৈন্স সংগ্রহ করিতেন তাহার সম্মিলিত জনসংখ্যা বাংলাপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক ছিল না। ভারতবর্ষের প্রথম যুগে ক্ষত্রিয়দিগের আধিপত্য এবং পরবর্ত্তী কালে রাজপুত, শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্য এই একই কথার সাক্ষ্য প্রদান করে। বর্ত্তমান ব্রিটীস সাম্রাজ্যের তিন চতুর্থাংশ লোক ভারতবাসী অথচ এখানে তাহাদের স্থান নিতান্তই গৌণ। বর্ত্তমান ভারতে শিখেরা তাঁহাদের সংখ্যানুপাতে যে প্রকার রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাহার মূলে তাঁহাদের সংঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি রহিয়াছে। মুসলমানদের সম্পর্কেও এই কথা আংশিক সত্য।

ভারতবাসীরা যদি সংঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সংখ্যার শক্তিকে কাজে লাগাইতে পরিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের রাজনীতিক, সামাজিক, আর্থিক এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় দুর্দ্দশার অবসান, নিঃসন্দেহ ঘটিত।

তাহা হইলেও, ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য যেটুকু চেষ্টা হইয়াছে, এবং ভারতবাসীরা বিচ্ছিন্ন অথবা একত্রিত ভাবে যে-সকল ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন এবং যে-সকল ব্যাপারে বিদেশীয়দের সহিত, তাঁহাদিগকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে, সঙ্ঘবদ্ধতা অথবা চেষ্টার তুলনায় সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাফল্য যে আশানুরূপ হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। যে-সকল কারণে এই বাধা ঘটিতেছে, তাহা অপসারিত না হইলে, আমাদের জন-সংখ্যাকে কখনও শক্তির মাপ বলিয়া ধরা যাইবে না।

ভারতের লোকের গড় আয়ু মাত্র ২৩ বৎসর। অর্থাৎ গড়ে আমরা জনপ্রতি কাজ করিবার জন্য মাত্র ২।৩ বৎসর সময় পাই। যুক্তরাষ্ট্রে মানুষের গড় আয়ু ৫৬ বৎসর; ইংলণ্ডে ৫১ বৎসর এবং জাপানে ৪৪ বৎসর। ২।১টি ছোট দেশের গড় আয়ু আরও বেশী। সাধারণভাবে একটা দীর্ঘজীবি দেশের তুলনায় মনে করি আমাদের গড় আয়ু সেই দেশের অর্দ্ধেক বা আড়াই ভাগের এক ভাগ এবং আমাদের কর্ম্মশক্তিও মাত্র সেই পরিমাণে কম। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আমাদের গড় আয়ুষ্কাল ধরিলে, কাজ করিবার বয়স পুর্য্যন্ত গড়ে আমরা কেহই বাঁচি না। যদি ২।৩ বৎসর আমাদের কার্য্যকাল ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, অন্যান্য দেশের লোকের জনপ্রতি কার্য্যকাল, আমাদের দেশ অপেক্ষা ১৫—২০ গুণ অধিক। অর্থাৎ ভারতবর্ষের জনশক্তি মাত্র ২ কোটি লোক অধ্যুষিত একটি দেশ অপেক্ষা অধিক নহে।

কথাটাকে অন্যভাবেও ঘুরাইয়া বলা যায়। আমাদের দেশের গড় আয়ু কম; তাহার অর্থ এই যে, দীর্ঘায়ু লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, পূর্ণ বয়স্কদের সংখ্যাও কম এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক যে, গড় হিসাবে দীর্ঘজীবিদের আয়ুর পরিমাণ কমিয়া গিয়া অত নিম্নে গিয়া পৌছিয়াছে। তুলনায় অনেক অধিক সংখ্যক লোক আমাদের, পূর্ণবয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মারা যান বলিয়া, এদেশে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের আনুপাতিক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই অপ্রাপ্ত বয়স্কদের একটা বড় অংশ (যাঁহারা অকালে মারা যান) জন-সংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিলেও, শক্তি বৃদ্ধি করে না, বরং এক হিসাবে শক্তি হ্রাস করে। বৃদ্ধ বা পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন, অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়ায়, তাঁহাদের প্রতিপাল্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকে। এই প্রতিপাল্যদের খাওয়াইবার, তাহাদিগকে সুস্থ রাখিবার ও যোগ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হয়। অবশ্য এই প্রকার অসম যুদ্ধে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা কম। কাজেই, প্রাপ্ত বয়স্কদের সকল শক্তিই এই দিকে ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এই সকল কাজ আশানুরূপ ও উপযুক্ত ভাবে হইয়া উঠে না। নিজেদের ভরণপোষণ সংগ্রহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা যাহারা করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের দ্বারা শক্তি, উদ্যম অধ্যবসায় ও ঝুঁকি সাপেক্ষ কোনও প্রকার কাজ হওয়া সম্ভব নয়। এই

হিসাবেও আমরা কর্ম্মশক্তিশূন্য এবং আমাদের সংখ্যা আমাদের শক্তির যথাযথ পরিমাপ প্রদান করে না। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সংখ্যাবাহুল্য (বা অন্য কথায় অকাল মৃত্যুর অতি বৰ্দ্ধিত সংখ্যা) অন্য প্রকারেও আমাদের শক্তি হ্রাসের কারণ হইয়াছে। যাঁহাদের প্রতিপালনে সমাজের বর্ত্তমান শক্তি নিঃশেষে ব্যয় হইতেছে, তাঁহাদের আশানুরূপ সংখ্যা বাঁচিয়া থাকে না বলিয়া, সমাজ তাঁহাদের নিকট হইতে কোনও প্রকার প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয় না এবং তাঁহাদের জন্য সামাজিক শক্তির যে ব্যয় হয়, তাহা অপব্যয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও আমরা দেখিতে পাই, বহুলোকেরই প্রতিপাল্যের সংখ্যা তাঁহাদের প্রতিপালন করিবার ক্ষমতার অপেক্ষা অধিক। অনেক পরিবারে আবার প্রাপ্তবয়স্ক লোক একেবারেই নাই।

দেশে দীর্ঘজীবিদের সংখ্যা (বা গড় আয়ুর পরিমাণ) কম হইবার কারণ, আমাদের মধ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবনী শক্তির অভাব, শক্তি ও উদ্যম অপহারক অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব ও দেশে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যকর অবস্থার অভাব। কাজেই, যাঁহারা দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকেন, তাঁহারা, অন্য কারণে তাঁহাদের শক্তির অপব্যবহার না হইলেও, অন্যান্য দেশের লোকদের সমকক্ষ হইতে পারেন না। তাঁহাদের উদ্যম, কর্ম্মশক্তি ও দৃঢ়তা স্বভাবতই কম হইবে।

নারীরা জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক। দেশের অবরোধ প্রথার জন্য, সমাজ তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। এইজন্য আবার, আমাদের কর্ম্মক্ষম, পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার অর্দ্ধেক বাদ পড়িয়া যায়। কেহ কেহ এই বলিয়া তর্ক করিতে পারেন যে, আমাদের মেয়েরা অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিলেও সেখানে তাঁহাদিগকে বিশেষ প্রয়োজনীয় সাংসারিক কাজকর্ম্মাদিতে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়—এবং তাঁহারা সে সকল কাজকর্ম্ম না করিলে, অন্য লোককে তাহা করিতে হইত। প্রথম কথা, সাংসারিক কাজকর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার জন্য অন্য কোনও দেশের লোক আমাদের ন্যায় এতটা কর্ম্মশক্তি অপব্যয় করেন না এবং আমাদিগকেও কর্ম্মঠ হইয়া উঠিতে হইলে সেই প্রকার আদর্শের অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু, আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, তাহা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ এবং এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের উপযোগিতা সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে। তাহা হইলেও, নিঃসংশয়ে একথা বলা যায় যে, শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ থাকা সর্ব্বথা উচিত। যে সকল নারীর প্রতিভা ও শক্তি বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী, বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের পক্ষে তদপেক্ষা অনুপযুক্ত পুরুষদের পরিবর্ত্তে, তাঁহাদিগকে গৃহকর্ম্মাদিতে আটকাইয়া রাখায়, আমাদের জনসংখ্যার শক্তি আংশিকভাবে যে খর্ব্ব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

এই সকল কথা বিচার করিলে আমাদের জনসংখ্যাকে শক্তির পরিচায়ক বলিয়া ধরিতে পারা যায় না।

বাংলা কাউন্সিলে বাংলা ভাষা

বাংলা কাউন্সিলের আগষ্ট অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আনয়ন করিবেন যে, আগামী শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য যাহাতে বাংলা ভাষায় পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হউক।

সভা সমিতিতে চালাইবার মত, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধীয় বিতর্কাদি করিবার মত, সূক্ষ্ম প্রভেদ বিশিষ্ট একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয়, অবস্থা ও পদ্ধতির পার্থক্য বুঝাইবার মত পারিভাষিক শব্দ বর্ত্তমানে বাংলাভাষায় প্রয়োজনানুরূপ নাই। না থাকিবার কারণ, প্রয়োজন হইতেই এই সকল শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু, বাংলাভাষা সৃষ্টির পর হইতে এই প্রয়োজন বাঙ্গালীর হয় নাই। মুসলমান শাসনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদেশীভাষা আমাদের অভিজাত শ্রেণীদের নিকট আদৃত হইয়াছে ও কৃষ্টির বাহন বলিয়া গণ্য হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বিদেশী ভাষাই দেশের রাজভাষা রহিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষা-প্রীতি অতিশয় অল্প কালের এবং এখনও সভা সমিতির বক্তৃতা, কার্য্যাবলী প্রস্তাব প্রভৃতিতে অনেক

স্থলে ইংরাজী ব্যবহৃত হয়। অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী ও চিঠিপত্রাদি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত যে সকল কার্য্যে আমাদিগকে বাহিরের সংস্পর্শে আসিতে হয় সেখানেই আমরা বাংলা বর্জ্জন করি। প্রাদেশিক অনেক ব্যাপারেও ইংরাজী ব্যবহারকে আমরা এখনও অগৌরবের মনে করি না। ইচ্ছা করিলে, ইহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ব্যবহার করিতে পারিতাম এবং প্রয়োজনের তাগিদে সাহিত্যের এই শাখা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিত। বিদেশীভাষার সঙ্কীর্ণ পথে একটি গোটা জাতির চিন্তা ও মানসিক শক্তি কখনও স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতে পারে না, বিদেশীভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, এমন বহু বাঙ্গালীর প্রতিভা ও বুদ্ধি অনাদৃত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটাইয়াছে।

বর্ত্তমানে কাউন্সিলের বিতর্কাদি বাংলায় চালাইতে, মাঝে মাঝে হয়ত কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু, ইহার মধ্য দিয়াই বিভিন্ন অর্থবোধক নূতন শব্দের সৃষ্টি হইবে এবং পূর্ব্ব প্রচলিত শব্দ নূতন নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইবে। প্রয়োজন, সুবিধা এবং শক্তি অনুসারে বিদেশী শব্দ করা, বাংলাভাষার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। আমাদের পরবর্ত্তীরা অন্ততঃ এ বিষয়ে মাতৃভাষার দৈন্য ও আমাদের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে পারিবেন না।

প্রাদেশিক কাউন্সিলে, প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুক্তি এই যে, যে-সকল প্রতিনিধি জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা যে ইংরাজী জানিবেনই এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই কারণ ইংরাজী জ্ঞান ভোটার হইবার জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা বলিয়া গণ্য হয় না। ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধিরা অধিক সংখ্যায় যাইতে পারিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজী না জানা লোকের সংখ্যা অধিক থাকিবার সম্ভাবনা থাকিবে। বর্ত্তমানে নির্ব্বাচক মণ্ডলী বহুভাগে বিভক্ত হওয়ায়, ইহার অনেক বিভাগ হইতে ইংরাজী অনভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে। কাউন্সিলের কার্য্যাবলী ইংরাজীতে পরিচালিত হইবার প্রথা থাকিলে এই সকল প্রতিনিধি নিজেদের দায়িত্ব এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলীর উপর তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথ প্রতিপালন করিতে পারিবেন না।

ইহার আর একটা ফল এই হইতে পারে যে, জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন এবং অন্য সর্ব্বপ্রকারে যোগ্য লোকেরা, ইংরাজী জানা না থাকিলে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন না, এবং ইহাতেও পরোক্ষ ভাবে সাধারণের প্রতি অবিচার করা হইবে।

বর্ত্তমানেও যাঁহারা কাউন্সিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের সকলেরই, বক্তৃতাদি করিবার মত যথেষ্ট ইংরাজী জ্ঞান বা ইংরাজীতে দখল থাকে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। বুদ্ধি, যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা, কোনও স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, ইংরাজীতে ভাল দখল না থাকায়, অনেক সময়েই নষ্ট হইতে পারে।

আশা করা যাইতে পারে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, উন্নত, অনুন্নত এবং বিভিন্ন রাজনীতিক দলের সকল বাঙ্গালীই ইহা সমর্থন করিবেন।

ইহাতে, সাধারণভাবে দেশের ও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর এবং বিশেষভাবে নির্ব্বাচিতদের অনেক পূর্ব্বে প্রাপ্য সুবিচার করা হইবে।

আমরা শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কে, তাঁহার এই অত্যন্ত সঙ্গত ও দেশহিত মূলক প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করিবার জন্যও তাঁহার চেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

মেয়েদের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষার বিস্তার

বর্ত্তমানের নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও মেয়েদের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষার বিস্তার বিশেষ আনন্দের কথা ও জাতীয় প্রগতির অবিসংবাদী পরিচয়। এবারকার এম-এ, এম-এস-সি, পরীক্ষায় ৬৯৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩ জন মহিলা আছেন। অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বাধা না থাকিলে, এবং পড়িবার মত যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়াদি থাকিলে, মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা পুরুষদের সমান হইতে পারিত। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলে সহশিক্ষার অনুমতি দান করিলেও মহিলা ছাত্রী এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও অনেক বেশী হইতে পারিত।

ম্যালেরিয়া ও বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষমতা

খুব অনিষ্টকর জিনিসও দীর্ঘদিন সহিয়া গেলে, তাহার অনিষ্টকারিতা ও কুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়ি। বাংলার ম্যালেরিয়া এবং তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা সম্পর্কে জনসাধারণ ও সরকারের ঔদাসীন্য অনেকটা এই কথাই প্রমাণিত করে।

বাংলায় প্রতি বৎসর সাড়ে তিন লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া জীবনীশক্তি নষ্ট হওয়ায়, যাহারা সহজে অন্য রোগে আক্রান্ত হয় ও মারা যায়, অর্থাৎ যাহাদের মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ ম্যালেরিয়া, তাহাদের সংখ্যা ইহার সহিত ধরিতে পারিলে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী দেখা যাইত। সাধারণভাবে যাহা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, ম্যালেরিয়ায় যত লোকে আক্রান্ত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ১—২ এর অধিক লোক প্রত্যক্ষভাবে এই রোগেই মারা যায় না। অর্থাৎ এই মৃত্যু সংখ্যানুসারে বাংলার ¾ তিন চতুর্থাংশ লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া থাকে। বাংলার ম্যালেরিয়া প্রধান জিলাগুলিতে কেহই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় না এবং অনেকেই বৎসরের অধিকাংশ সময় রুগ্ন অবস্থায় থাকে। শিশু ও বালকবালিকারা অতি সহজেই এই রোগের কবলিত হয় এবং সহজে সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে না। ম্যালেরিয়া-রুগ্ন ও প্লীহাগ্রস্ত নহে এমন শিশুর সংখ্যা বাংলার পল্লীতে নিতান্তই বিরল।

কাজেই, শুধুমাত্র মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া ম্যালেরিয়ার অনিষ্টকারিতার পরিমাণ নির্ণয় পূর্ণভাবে করা যাইবে না। রোমের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা ধ্বংসের জন্য অনেকে ম্যালেরিয়াকে দায়ী মনে করেন। বাস্তবিক পক্ষে, ইহা যে, মানুষের জীবনীশক্তিকে কতটা ক্ষীণ করিয়া ফেলে, কর্ম্মোদ্যম, শক্তি ও সাহস নষ্ট করিয়া মানুষকে কতটা জড় প্রকৃতি-বিশিষ্ট অলস ও কাপুরুষ করিয়া ফেলে, বাঙ্গালীর তাহা অজানা নাই। বাংলার জাতীয় প্রগতিকেও যে ইহা বিশেষভাবে ব্যাহত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভিন্ন প্রদেশবাসীদের নিকট জীবনের নানাক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের পরাজয়ের মূলেও, ম্যালেরিয়ার প্রভাব, আমরা যতটা সন্দেহ করি তদপেক্ষা অনেক বেশী রহিয়াছে। সমগ্র বাল্যকাল ধরিয়া যাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছেন এবং বৎসরের এক চতুর্থাংশ সময় যাঁহারা এই রোগগ্রস্ত থাকেন, (অধিকাংশ বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা সত্য) তাঁহাদের পক্ষে উদ্যম, শ্রম, সাহস, শক্তি ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ কোনও কাজে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে কখনও যথেষ্ট মনোযোগী হন নাই এবং যথোচিত অর্থব্যয় করেন নাই। বাংলার জনমতও ইহার বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়া, বাঙ্গালীকে আত্ম-রক্ষার জন্য সচেষ্ট করে নাই। যাহা কিছু সামান্য চেষ্টা হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন, শিথিল এবং দেশকে এই শত্রুর হাত হইতে মুক্ত করিতে হইবে এই দৃঢ় সঙ্কল্প বিরহিত। অন্যান্য দেশে যে সকল উপায়ে ম্যালেরিয়া দূর করা হইয়াছে, এখানে তাহার দ্বারা অনুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে কিনা, অথবা নদী, খাল প্রভৃতি সংস্কার ও খনন করিয়া যাতায়াত ও মালবহনের সুবিধার সহিত প্লাবনের দ্বারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়া দূর করা সম্ভব হয় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের কতকটা স্থানে ম্যালেরিয়া দূর করিবার একটি নূতন উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। 'প্লাস্‌মোচীন' নামক ম্যালেরিয়ানাশক ও ম্যালেরিয়ারোধক এক প্রকার ঔষধের সাহায্যে বর্ষার পূর্ব্বেই এই স্থানের অধিবাসীদের সম্পূর্ণভাবে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা হইবে। ম্যালেরিয়ার বীজ বহনকারী মশকেরা ইহাতে বিষ সংগ্রহের সুবিধা পাইবে না এবং ফলে, এই রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার বন্ধ হইবে।

এই ব্যবস্থা এত ব্যয়সাপেক্ষ যে, ইহা সফল হইলেও, ব্যাপকভাবে ইহার প্রয়োগ সম্ভব হইবে কিনা, তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। তাহা হইলেও, পরীক্ষাটি ফলপ্রসূ হইলে অন্ততঃ এই লাভ হইবে যে, একটি নিশ্চিত ফলপ্রদ উপায় আমাদের জানা থাকিবে এবং সুবিধা মত সঙ্কীর্ণ বা বিস্তৃতভাবে—ইহাকে কাজে লাগান যাইবে। যাঁহারা এই পরীক্ষা চালাইবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের

ভবিষ্যৎ তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে এবং ইহা মনে রাখিয়াই বিশেষ উদ্যম এবং সতর্কতার সহিত তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে।

অন্যান্য অনেক অসুখের মূলেও ম্যালেরিয়া

বাংলাদেশে ক্ষয়রোগের অতিবিস্তারকেও ম্যালেরিয়া বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে অনেক রোগীকেই ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায়; বহুস্থলে ক্ষয়রোগের গোড়ার ইতিহাস ম্যালেরিয়া। খারাপ শরীরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোক অর্থ অথবা বিদ্যার্জ্জনের জন্য সহরে যাইয়া এই রোগে আক্রান্ত হন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ক্ষয়রোগ আবার দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সমভাবে ব্যাপ্ত নহে। দরিদ্রভাবে যাঁহাদের বৎসরের অধিকাংশ বা কতক সময় সহরে বাস করিতে হয়, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাজেই, দেশের সমগ্র জনসংখ্যা ধরিয়া যক্ষ্মা-রোগীদের, বা, যক্ষ্মায় মৃত্যুসংখ্যার অনুপাত কষিলে ভুল করা হইবে।

যে-সকল স্থানে এবং যে-সকল শ্রেণীর মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব আছে, সেই সকল স্থানের এবং সেই সকল শ্রেণীর লোক সংখ্যা ও রোগীর সংখ্যার অনুপাত দেখিলে ইহার ভয়াবহতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। বাংলাদেশে প্রায় দশলক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত। এখানে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যবিত্তদের সংখ্যা ৩০ লক্ষের উপর নহে। কালা-জর প্রভৃতি এদেশের লোকক্ষয়কারী ও স্বাস্থ্যনাশকারী অনেক ব্যাধি বহুস্থলে ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়।

স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যম

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং জয়েণ্টসিলেক্ট কমিটি সম্পর্কিত ব্যাপার সমূহে, শ্রীযুক্ত সরকার স্বীয় অসাধারণ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের দ্বারা বাঙ্গালীর মুখ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নিরলস উদ্যম, অক্লান্ত চেষ্টা, শক্তিশালী অথগুনীয় যুক্তি, তথ্যের বিন্যাস, এবং সূক্ষ্ম ও সুদক্ষ বিশ্লেষণ, বাংলার স্বার্থ অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে এবং বাংলার প্রতিকৃত, এবং সম্ভাবিত অবিচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে। মেষ্টনী ব্যবস্থার পর হইতে বাংলার উপর যে আর্থিক অবিচার হইয়া আসিতেছিল, পাটের রপ্তানি শুল্ক ও আয়কর সম্বন্ধে অনুকূল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পূর্ব্বেই কতকটা ফলপ্রসূ হইয়াছে, আরও কিছু হইবার আশা করা যাইতে পারে।

সাম্প্রদায়িক মীমাংসায় বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রতি যে বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে, খৃষ্টান ও ইউরোপীয়দের যে সকল অধিক পদ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যে প্রধানতঃ হিন্দুদের অংশ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে, হিন্দুদের শিক্ষা যোগ্যতা এবং অগ্রবর্ত্তিতার দাবীর কথা—যাহা খৃষ্টানের বেলায় স্বীকৃত হইয়াছে—যে, সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে, মস্তক গণনার নীতি অনুসরণ করিলেও যে, হিন্দুরা আরও সদস্য পদের অধিকারী হইতে পারিতেন এবং সাম্প্রদায়িক মীমাংসা ও পুণাচুক্তির মিলিত ফলে যে, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে বাঙ্গালী বর্ণহিন্দুদের কোনও প্রকার স্থান থাকিবে না, সে সকল কথা তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্থাপন করিয়াছেন এবং প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে অনুকূল মত সৃষ্টি করিয়াছেন, যদিও তাহাতে বিশেষ কোন ফল লাভের আশা নাই।

পুণাচুক্তি সম্বন্ধে বৈশাখের 'বিচিত্রা'য় আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং আমাদের পূর্ব্ব মতেই দৃঢ় আছি। ইহাতে বর্ণহিন্দুদের উপর অবিচার যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে, এখন তাহার প্রতিকারের চেষ্টা, (যাহার সাফল্য সংশয়যুক্ত), করিতে গেলে হিন্দু সমাজের সংহতি এবং ঐক্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহা শুভ ফলদায়ক হইবে না। এইজন্য, সার এন, এন, সরকারের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলেও, তাঁহার সহিত এবং অন্য যাঁহারা পুণাচুক্তি বাতিল করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত এই বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই।

বাঙ্গালী হিন্দুদের বিরুদ্ধতা

বাঙ্গালী হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার বিপক্ষে বিলাতে একটি প্রবল দল আছে বলিয়া প্রকাশ। যাঁহারা ভারতবর্ষকে ক্ষমতাদানে অনিচ্ছুক, তাঁহারা যে বাঙ্গালী হিন্দুদের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিরূপ, ইহা শেষোক্তদের যোগ্যতার পরোক্ষ স্বীকৃতি। বাঙ্গালী হিন্দুরা এজন্য গৌরব অনুভব করিতে পারেন।

অবাঙ্গালী ভারতীয় সদস্যের অনেক ব্যাপারে বাংলার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নহেন। তাহার প্রধান কারণ, বর্ত্তমানে বাংলা, ভারত সরকারকে যে অত্যন্ত অধিক টাকা দিতে বাধ্য হইতেছে, তাহা দ্বারা সকল প্রদেশই উপকৃত হইতেছে। এই প্রকারে অন্যান্য প্রদেশের দ্বারা বাংলা শোষিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে। অন্যান্য প্রদেশীয়েরা সম্ভবতঃ মনে করিতেছেন, বাংলা তাহার প্রাপ্য সুবিচার পাইলে তাঁহারা বর্ত্তমানের অন্যায় সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ বাংলার বরেণ্য পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরলোক গমন করেন। বাংলার গণ-স্মৃতি বড়ই দুর্ব্বল, তাই ৪২ বৎসরের মধ্যে আমরা তাঁহার কথা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। সাধারণভাবে আমাদের মন নিষ্ক্রিয় এবং নূতনের বিরোধী। যাহা কিছু নিদ্রিতাবস্থায় শায়িতভাবে গ্রহণ করা যায়, তদতিরিক্ত কিছু আমাদের মন সহসা নিতে চাহে না। বিদ্যাসাগর, দয়ারসাগর ছিলেন, বিদ্যার সাগর ছিলেন, তেজস্বী লোক ছিলেন এবং তাঁহার স্বজাতি প্রীতি অনন্য-সাধারণ ছিল, একথা যদিও বা আমরা মনে করি, কিন্তু, তিনি যে, তাঁহার সত্যদর্শনের তেজস্বিতায় এবং প্রদীপ্ত বুদ্ধির আলোকে সমাজের বহুবিধ গ্লানি এবং অতীতের অন্ধ উপাসনা দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেকথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের জন্য, বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য, এবং সর্ব্বোপরি বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি যে চেষ্টা, অর্থব্যয় এবং দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা যে-কোনও দেশের যে-কোনও কালের মানুষকে গৌরব দান করিতে পারিত। তখনকার দিনে বিধবা বিবাহের কল্পনা করা, সে মত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা এবং তাহা প্রচলনের জন্য চেষ্টা করা বিশেষ দুঃসাহসের কাজ ছিল। বিদ্যাসাগরের প্রাণনাশের চেষ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা যে কতটা ছিল, এবং এজন্য যে তাঁহাকে কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পুত্রের বিধবা-বিবাহের পর লিখিত একখানি পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"......আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা-বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম, জন্মে ইহাপেক্ষা অধিক কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই, এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি..."

হিন্দু বিধবাদের দুঃখ আজও ঘুচে নাই; বিধবা বিবাহ আজও সমাজে নিতান্ত বিরল ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্রের পরবর্ত্তী স্বদেশীয়েরা এবিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালন করেন নাই।

সমাজে নারীদের হীনাবস্থার জন্য বিদ্যাসাগর বিশেষ ব্যথিত হইতেন। এসম্বন্ধে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ তাঁহার অনেক উক্তি আছে। নারীদের এই হীনবস্থাও আজিও ঘুচে নাই এবং এদিক দিয়া বিদ্যাসাগরের স্মৃতিকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখাইবার যোগ্যতা আমরা অর্জ্জন করি নাই।

আর একদিক দিয়া তাঁহার ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য। রাজা রামমোহনের পর, তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলাগদ্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া যান। তাঁহারই

কৃত দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর স্থাপিত হইয়া বাংলাভাষার বর্ত্তমান উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার অন্য কোনও কীর্ত্তি না থাকিলেও, শুধু এই জন্যই বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

তিনি সর্ব্ব বিষয়ে প্রগতিশীল বাংলার অগ্রদূত ছিলেন।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সার সুরেন্দ্রনাথের অষ্টম মৃত্যুতিথি উপলক্ষে আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। বাংলার (এবং ভারতের) জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম চিরদিন অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রথিত থাকিবে। তাঁহার সময়ে বাংলায় এবং সম্ভবতঃ ভারতে তাঁহার সমকক্ষ বাগ্মী কেহ ছিলেন না। পরেও, বাংলাদেশে এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহ জন্মেন নাই। সংবাদ পত্র পরিচালনায়ও তাঁহার দক্ষতা অনন্যসাধারণ ছিল।

মহাত্মাজীর শেষ ত্যাগ

আশ্রমবাসীদের সহিত অভিলষিত কার্য্য করিবার জন্য মহাত্মাজী সবরমতী আশ্রম উঠাইয়া দিয়াছেন। এই আশ্রমটি একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং আদর্শের প্রতীক ছিল বলিয়া, মহাত্মাজীর এই কার্য্য দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। লাভ ক্ষতি হিসাবের সাধারণ মাপকাঠি দ্বারা মহাত্মাজীর কার্য্যের পরিমাপ করিতে গেলে, ভুল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে। তাঁহার সুগভীর দেশপ্রীতি এবং অকপট সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে অনেকবার হিসাব বহির্ভূত পথে লইয়া গিয়াছে।

অর্থদানের পরিমাণের দ্বারা আমরা সাধারণতঃ লোকের ত্যাগের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া থাকি। কিন্তু, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে উচ্চস্তরের লোক, দেশের জন্য বা দশের জন্য যাঁহারা অন্তরে দুঃখ অনুভব করেন, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সুখ সুবিধা অপেক্ষা, তাঁহাদের প্রিয় দেশ বা দশের স্বার্থের জন্য অর্থব্যয়কে তাঁহারা অধিকতর শ্রেয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু, সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা দিয়া প্রতিষ্ঠিত আদর্শের প্রতীকস্বরূপ কোনও প্রতিষ্ঠানকে উৎসর্গ করিবার যে ত্যাগ, তাহার মূল্য অনির্দ্দেয়। মহাত্মাজীর এই সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (আমাদের বিবেচনায়) দান, তাঁহার দেশপ্রীতির সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন এবং তাঁহার চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার মহত্তম পরিচয় বলিয়া গণ্য হইবে।

মহাত্মাজী ও অন্যান্য ঘটনা

পুণা নেতৃবৈঠকের সিদ্ধান্ত; বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহাত্মাজীর দুইবার প্রার্থনা, এবং বড়লাটের অসম্মতি; আশ্রমবাসীগণের সহিত মহাত্মার নূতন অভিযানে যাত্রা; তাঁহাদের গ্রেপ্তার; মুক্তি; পুনরায় গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে, নানাকারণে নিরপেক্ষ আলোচনা সম্ভব নহে বলিয়া সে সম্বন্ধে কোনও কিছু বলাই সঙ্গত বিবেচনা করিলাম না।

বাঙ্গালী সেনাদল

ভারতীয় সেনা বাহিনীর মধ্যে একটি বাঙ্গালী সেনাদল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে যাহাতে বাঙ্গালীদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থার্থ ইংলণ্ডের রাজসরকারকে সুপারিশ জানাইবার জন্য, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব আনয়ন করিবেন।

বাঙ্গালীদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ না করায়, নানাদিক দিয়া বাঙ্গালীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। ভারতবর্ষকে সামরিক এবং অসামরিক জাতি সমূহে বিভক্ত করায়, ভারতের ঐক্যের এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথে যে-প্রবলতর বিঘ্ন উৎপাদিত হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা বাদ দিয়া, অন্য কয়েকটি দিকের কথা বলা হইতেছে।

বাঙ্গালীদের এবং অন্যান্য অসামরিক জাতিকে যে-যে কারণে সেনাদলে ঢুকিতে দেওয়া হয় না, সামরিক মনোভাবের অভাবের অভিযোগ তাহার মধ্যে অন্যতম। অনেকদিন হইতে বাঙ্গালীদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় না; কাজেই, যুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের পৈতৃক সংস্কার বর্ত্তমানে কিছু

নাই। কিন্তু, ব্যক্তিগত সাহস, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা যদি সৈনিকোচিত গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, বাঙ্গালীদের মধ্যে তাহার পরিচয় এই দুর্গতির যুগেও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীনকালের বাঙ্গালীদের বীরত্বের কথা এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভের কথা বাদ দিলেও, হিন্দু সমাজের নমঃশূদ্র, রাজবংশী পৌণ্ড্র প্রভৃতি জাতি এবং মুসলমান কৃষকদের এক বৃহৎ অংশের মধ্য হইতে যে যুদ্ধ প্রিয়তা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হন নাই, তাহা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক (ক্ষুদ্র আকারে), উপসাম্প্রদায়িক এবং ছোট ছোট দলগত কলহ ও দাঙ্গার সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন। পুলিশের কড়া শাসন ও সতর্কতা এবং পরে শাস্তির ভয় সত্ত্বেও, এই সকল ব্যাপারে যেরূপ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত ও দলগত সাহস ও শৌর্য্যের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

গত মহাযুদ্ধের সময় বাঙ্গালী সেনাদলগুলি, সাহস, শৃঙ্খলা এবং শীঘ্র শিখিবার ক্ষমতার জন্য সকলের প্রশংসা পাইয়াছিল। সাধারণতঃ শিক্ষিত যুবকেরাই এ সময়ে সেনাদলভুক্ত হইয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাদেরও সামরিক যোগ্যতার প্রমাণ রহিয়া গিয়াছে।

ভারতসরকারকে বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর দিয়া থাকেন। সৈন্যদল পোষণের জন্য ভারতসরকারের যে ব্যয় হয়, বাঙ্গালী সৈনিক হইতে পারিলে, তাহার কতকাংশ ফিরাইয়া পাইতে পারিত।

বাঙ্গালীরা সৈন্যদলে গৃহীত হইলে, বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা আংশিক পরিমাণে কমিত। বাঙ্গলার পুলিশ বাংলার বাহির হইতে সংগৃহীত না হইলেও, বাংলার অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত বেকার সমস্যা হ্রাস পাইত। ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত বাংলার সন্নিহিত। ইহা রক্ষার দায়িত্ব, অবশ্য ভারত সরকারের এবং প্রধানতঃ এই সমস্যা ব্রহ্মদেশ ও আসামের। তাহা হইলেও, ইহাতে বাংলারও আংশিক ভয়ের কারণ আছে এবং নিজ সীমান্ত রক্ষায় অংশ গ্রহণের অধিকার বাঙ্গালী দাবী করিতে পারে।

সৈনিকবৃত্তির দিকে বাঙ্গালীর ঝোঁক নাই, কাজেই, সুযোগ পাইলেও, বাঙ্গালী এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিবে না, বাঙ্গালীকে সৈনিক হইবার সুযোগ দানের বিরুদ্ধে এই যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু, উপযুক্ত সুযোগ ও উৎসাহ দিবার ও অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির জন্য যতটা সময় লাগা স্বাভাবিক, ততটা সময় পর্য্যন্ত প্রচার করিবার ও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার পরও যদি, বাঙ্গালীরা এদিকে আকৃষ্ট না হন, তাহা হইলে, এ সম্বন্ধে কাহারও অভিযোগ করিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যথোচিত পরীক্ষা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রকারের কথা কোনও বাঙ্গালী অথবা অন্য কোনও নিরপেক্ষ লোক স্বীকার করিতে চাহিবেন না।

গত জার্ম্মান যুদ্ধের সময়, ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং যাহাতে সকলে সৈন্যদলভুক্ত হয়, তাহার জন্য যথোচিত প্রচারও করা হইয়াছিল। কিন্তু, এই সময়ে বাংলাদেশ হইতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। এ সময়ে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চারি কোটি এবং পাঞ্জাবের ছিল দুই কোটি। অথচ, বাংলা হইতে মাত্র ৭,১১৭ জন যোদ্ধা সংগৃহীত হয়, এবং পাঞ্জাব হইতে সংগৃহীত হয় ৩৪৯,৬৮৮ জন। যোদ্ধা নয় সেনাদলভুক্ত এরূপ লোকদের ধরিয়া বাংলা ও পাঞ্জাবের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৯,০৫২ এবং ৪৪৬,৯৭৬ জন ছিল।

কিন্তু, এই অঙ্ক হইতে এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না। পাঞ্জাব হইতে বরাবর সৈন্য সংগৃহীত হয়, এবং ভারতীয় সেনাদলের শতকরা ৬২ ভাগ লোক পাঞ্জাববাসী। শান্তির সময়ে যত সহজে লোকে সেনাদলভুক্ত হইতে চায়, যুদ্ধের সময় তত সহজে লোকে সেনাদলভুক্ত হইতে চায় না। শান্তির সময়ে সৈন্যদলে চাকরি করিয়া সৈনিক জীবন ও যুদ্ধ সম্বন্ধে অমূলক ভয় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, যুদ্ধের সময়েও পাঞ্জাব হইতে সৈন্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল।

অপর পক্ষে বাঙ্গালীর অনেকদিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নাই, কাজেই সে সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক থাকা স্বাভাবিক। তদ্ব্যতীত কোনও নূতন আন্দোলন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরে পৌছায়। যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহের আন্দোলন, প্রধানতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ

ছিল, এবং শুধু মাত্র ইহাদের সংখ্যা ধরিলে, যুদ্ধের সময় বাংলা হইতে সৈন্য সংগ্রহ কম হয় নাই। ব্রহ্মবাসীরা ভারতীয় সামরিক জাতিদের ন্যায় সামরিক শৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী নহে এবং এই জন্য ব্রহ্ম সৈন্যদলগুলি কম দক্ষ এবং ইহাদের পোষণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ (আমাদের কথা নহে)। ইহা সত্ত্বেও ভারত সরকার একাধিক বার ব্রহ্ম-সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বাঙ্গালী পল্টন গঠনের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়া, তাহা বিফল হইলে, বাঙ্গালীদের বলিবার কিছু থাকিবে না। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে নিজেদের অযোগ্যতা মানিয়া লইতে তাঁহারা রাজী হইবেন না।

সংস্কার মানুষকে কতটা অন্ধ এবং নির্ম্মম করিতে পারে

হরিজন পত্রিকা হইতে গৃহীত নিম্নের সংবাদটি 'বঙ্গবাণী' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কাথিয়াওয়াড়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষকের সদ্যপ্রসূতা মুমূর্ষু পত্নীর চিকিৎসার জন্য তিনি তথাকথিত উন্নত শ্রেণীর একজন ডাক্তারকে ডাকিতে যান। ডাক্তার প্রথমতঃ হরিজন পল্লীতে যাইবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন, পরে অনেক অনুনয়ে এই সর্ত্তে যাইতে রাজী হন যে, তাঁহার স্ত্রীকে গ্রামের বাহিরে লইয়া আসিতে হইবে। দুইদিন পূর্ব্বে যিনি সন্তান প্রসব করিয়া চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার গ্রামের বাহিরে আসা কিরূপ অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি তাঁহার আসিতে হইল এবং ফলে মৃত্যু হইল।"

যদি এই সংবাদ মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত না হয়, (হওয়াই অবশ্য সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়) তাহা হইলে, আলোচ্যক্ষেত্রে চিকিৎসকের অপরাধ নরহত্যার সমপর্য্যায়ভুক্ত হওয়া উচিত। এরূপ হৃদয়হীন সহানুভূতিহীন ঔদ্ধত্য, এরূপ কুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচ জাতির অহংকার, অন্ধসংস্কারের এরূপ নির্লজ্জ পরিচয়, এরূপ নিদারুণ পৈশাচিক নির্ম্মমতা মানুষ মাত্রকেই লজ্জিত করিবে। এই আচরণ আবার ব্যক্তিগত না হইয়া একটি সমাজের উপর আর একটি সমাজের মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া ইহা অনেক অধিক ঘৃণ্য ও অনিষ্টকারী হইয়াছে।

উক্ত শিক্ষকের ২ খানি পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে, ব্যাপারটির একদিকের বীভৎসতা এবং অন্যদিকের কারুণ্য পরিস্ফুট হইবে।

"……রোগিনীকে বস্তির বাহিরে আনিয়া দেখান হইবে, এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল। অতঃপর ডাক্তার আমাদের সঙ্গে আসিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি আসিলে যে-রমণীটি মাত্র দুইদিন আগে সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাকেই বস্তির বাহিরে টানিয়া আনা হইল। ডাক্তার একজন মুসলমানের হাতে থার্ম্মোমিটারটি দিলেন, সে আবার উহা আমার হাতে দিল, থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া আমি আবার তাহা মুসলমানকে ফিরাইয়া দিলাম, সে আবার উহা ডাক্তারের হাতে ফিরাইয়া দিল।...ডাক্তার তাহাকে স্পর্শ করিলেন না, কেবল দূর হইতে চোখের দেখা দেখিয়া গেলেন।" ১ম পত্র

"জীবনে যে আমার আলো ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে। আজ ঠিক দুইটার সময় আমার স্ত্রী মারা গিয়াছেন"

২য় পত্র

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের (বাঙ্গালীদের) পক্ষে কিছু সান্ত্বনার বিষয় এই যে, এতটা বাড়াবাড়ি বাংলা-দেশে সম্ভব হইত না।

সুশীল কুমার বসু

পুস্তক পরিচয়

আরব্য-উপন্যাস—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় অনূদিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স কর্ত্তৃক প্রকাশিত; মূল্য পাঁচ টাকা।

যে গ্রন্থের অনুবাদক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, তাঁর গ্রন্থের পরিচয় দেবার চেষ্টা করার যে কিছুমাত্র দরকার আছে, তা আমার মনে হয় না; তবুও দুই একটা কথা ব'লে এই বইখানির শোভা ও সৌন্দর্য্যের একটু আভাস দিচ্ছি।

এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি কখন ইংরাজীতে বা বাঙ্গালায় লিখিত আরব্য উপন্যাস পড়েন নি, তা হ'লে তিনি এই বইখানি প'ড়ে কিছুতেই বলতে পারবেন না যে এখানি অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে—এমনই সুন্দর রচনা ভঙ্গী—এমনই মনোহর শব্দ প্রয়োগ কৌশল। হেমেন্দ্রবাবু ঠিকই বলেছেন, তিনি যদি যথাযথ অনুবাদ করতে যেতেন, তা হ'লে গল্পগুলি হয়তো জমানো যেত না, তাতে রসের সন্ধান পাওয়া যেত না। তাই, হেমেন্দ্রবাবু মূল গল্পটা প'ড়ে নিয়ে, নিজের সহজ সুন্দর সাবলীল ভাষায় গল্পগুলি লিখেছেন; এবং তিনি যে কবি, সে কথা কিছুতেই গোপন করতে পারেন নি; তিনি তা পারেনও না। তাঁর গদ্য রচনা কবিতা ব'লেই গ্রহণ করতে হয়। তাই এই আরব্য-উপন্যাসখানি আগাগোড়া না প'ড়ে থাকতে পারিনি, যদিও এর আগে এই গল্পগুলিই কতবার পড়েছি।

তারপর এই আরব্য উপন্যাসের ছাপার কথা। সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌সের মালিকেরা এই বইখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন; তাঁরা যত্ন, চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে একটুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কতকগুলি বহুবর্ণ-চিত্র ত দিয়েছেনই; তারপর এক-বর্ণ চিত্র যে কত তার হিসাব দিতে গেলে বলতে হয় এই বইখানিতে যতগুলি পৃষ্ঠা আছে, চিত্রের সংখ্যাও তত বা তারও অধিক। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একেবারে প্রাণ ঢেলে দিয়ে এই আরব্য উপন্যাসকে চিত্র শোভিত করতে লিখেছিলেন। তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে, প্রকাশক মহাশয়গণের প্রভূত অর্থ ব্যয় সার্থক হয়েছে, হেমেন্দ্রবাবুর রচনা সার্থক হয়েছে। এমন একখানি বই যা বহুমূল্যের কাগজে নানা রংয়ের কালীতে ছাপা, যার পাতায় পাতায় ছবি, যার বহুবর্ণ চিত্রগুলি বই থেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার উপযুক্ত, তা পাঁচ টাকা দিয়ে কিনতে সাহিত্যামোদিগণ কুণ্ঠিত হবেন না, এ কথা আমি বলতে পারি।

শ্রীজলধর সেন

প্রতাপাদিত্য—শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—কুলজা সাহিত্য-মন্দির, ১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

এই পুস্তকখানিতে বালক-বালিকাদের উপযোগী ক'রে প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত লেখা হয়েছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। বইখানির ভাষা, রচনাভঙ্গী, এবং ছাপা, কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি বাহ্য সৌষ্ঠবও মন্দ নয়। বালক-বালিকারা প'ড়ে আনন্দ পাবে আশা করা যায়। সুতরাং লেখকের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে না।

কিন্তু পুস্তকখানি ত্রুটি-শূন্য নয়। প্রথম ত' এটিতে যে ক'খানি ছবি দেওয়া হয়েছে তার সবগুলিই একান্ত বাজে, অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের মনোরঞ্জন করার যোগ্যও নয়। দ্বিতীয়ত' কোনো ঐতিহাসিক পুরুষের জীবন-চরিত লেখার সময় ঐতিহাসিক স্থান, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামান্য পরিচয়ও সরলভাবে দেওয়া দরকার। কারণ ছোটোদের কাছে জীবন-চরিতকে গল্পের আকারে উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয় হ'লেও গল্পচ্ছলে ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ঘটনা ও তার

তাৎপর্য্যের পরিচয় দেওয়াই এই ধরণের পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পুস্তকে সে প্রয়াস দেখা গেল না এবং যে-টুকু প্রয়াস আছে তাও সফল বা প্রমাদশূন্য হয়েছে বলা যায় না। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ পাদ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমান ভূঞারা দিল্লীর মোগলের বিরুদ্ধে যে তুমুল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তার সামান্য পরিচয় দেবার প্রয়াসও পুস্তকখানিতে দেখ্‌লুম না।

আমাদের নবলব্ধ স্বাদেশিক চেতনার ফলে প্রতাপাদিত্য ক্রমশই আমাদের নিকট কর্ণার্জ্জুন প্রভৃতি পৌরাণিক বীরপুরুষ কিংবা প্রতাপসিংহ, শিবাজি প্রভৃতি ঐতিহাসিক বীরপুরুষদের সমান মর্য্যাদা লাভ করছেন। জাতীয় জাগরণের দিনে স্বজাতির ঐতিহাসিক গৌরব ও ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক চেতনা ব্যতীত জাতীয় উদ্বোধনই সম্ভব নয়। কিন্তু একথা কখনও ভোলা উচিত নয় যে, সত্য স্বদেশ এবং স্বজাতির চেয়েও বড়ো এবং স্বদেশের গৌরব-সন্ধানের লোভে সত্যের মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন ক'রে গেলে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণও কিছুতেই সাধিত হবে না। প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে আমরা কতখানি যথার্থ গৌরব বোধ করতে পারি, ঐতিহাসিক মহলে সে সমস্যা ও সংশয় সম্বন্ধে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে নিঃশেষরূপে পৌছানো যায়নি। কাজেই তরুণ-বয়স্ক কল্পনাপ্রবন পাঠক-পাঠিকাদের চোখের সাম্‌নে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনো চিত্র তুলে ধরবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। নতুবা অল্প বয়সের ভুল ধারণাগুলিকে পরিণত বয়সে মুছে ফেল্‌তে গিয়ে অনেকখানি মানসিক শক্তি ও আনন্দের অপচয় ঘটবে।

প্রতাপাদিত্যের আদর্শ কি ছিল, ছেলেমেয়ের কাছে তার পরিচয় দেবার সময়েই সব চেয়ে বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। এই বইখানিতে দেখানো হয়েছে, মুসলমানের হাত থেকে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করে স্বাধীন বাংলায় হিন্দু বাঙালীর আধিপত্য স্থাপন করাই ছিল প্রতাপাদিত্যের জীবনের উদ্দেশ্য। "আজি যে তিনি স্বাধীন রাজা হ'য়ে সিংহাসনে বস্‌লেন এ তাঁর নিজের সুখের জন্য নয়, সমস্ত বাংলা দেশকে বিদেশী মোগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য" (পৃঃ ১০-১৩ এবং ৪৫ দ্রষ্টব্য)। এই আদর্শটি খুবই মহৎ ও আধুনিক কালের পক্ষে খুবই মনোরম সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি কি ঐতিহাসিক সত্য? আধুনিক স্বাদেশিতার আদর্শ কি ষোড়শ শতাব্দীতেও ছিল? আধুনিক কালের আদর্শ ও কল্পনাকে অতীত কালের উপর আরোপ করার যে মনোবৃত্তি, এইটেই হচ্ছে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক আলোচনার পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয় মনোবৃত্তি।

এই পুস্তকখানিতে তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ককে যে-ভাবে দেখানো হয়েছে তাও ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তা-ছাড়া, ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধেও এই পুস্তকখানিতে ভুলচুকের অভাব নেই। সে-সমস্ত এ স্থলে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। কেবল প্রথম ক' পৃষ্ঠা থেকেই দুই তিনটি ভুল দেখাচ্ছি। প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলা হয়েছে, গৌড়-নগরের প্রাধান্য থেকেই "গোটা বাংলা দেশটা" গৌড় নামে অভিহিত হয়েছিল। এ কথা সত্য নয়। কারণ "গোটা বাংলা দেশটা" কখনও গৌড় নামে অভিহিত হয়নি, পূর্ব্ববঙ্গ সর্ব্বদাই গৌড়ভূমির বহির্ভূক্ত ছিল। আর, গৌড় নগরের প্রাধান্যই গৌড়ভূমির নামের হেতু নয়। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "গৌড়-নগর একশত বৎসরেরও বেশী বাংলা দেশের রাজধানী ছিল।" শুধু "একশত

বৎসরেরও বেশী" নয়, তার চেয়ে ঢের বেশী কাল গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল। মুসলমানদের আমলেই গৌড় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত বাংলার রাজধানী ছিল, এর মধ্যে শুধু কিছুকালের জন্য বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল। অন্যত্র (পৃঃ ৪-৭) দায়ুদ শার রাজত্বকালে এবং আকবর বাদশার সঙ্গে বাংলার পাঠানদের যুদ্ধ বিগ্রহের সময়েও গৌড়কে বাংলার রাজধানী ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুলেমান কররানির রাজত্বকালেই গৌড়নগর মহামারীতে বিনষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল এবং বাংলার রাজধানী তাণ্ডা বা তাঁড়ায় স্থানান্তরিত হ'য়েছিল। সুতরাং সুলেমানের পুত্র দায়ুদশার রাজত্ব এবং আকবরের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সময়ে তাঁড়াই ছিল বাংলার রাজধানী, গৌড় নয়। বইখানিতে গৌড় সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু গৌড়ের অবস্থান সম্বন্ধে কোনো কথাই বলা হয় নি।

এই রকম আরও ভুল ত্রুটি এই বইখানিতে আছে। সে-সব এখানে দেখানো নিষ্প্রয়োজন। জানি গ্রন্থকার ইতিহাস লিখ্‌তে বসেন নি; তিনি বসেছেন প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত্রের গল্প লিখ্‌তে। কিন্তু যে-হেতু প্রতাপাদিত্য ঐতিহাসিক ব্যক্তি, সেইজন্যই এইরূপ পুস্তকেও ঐতিহাসিক ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নয়; গল্পচ্ছলেও ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা ফুটিয়ে তোলা চাই। আশা করি গ্রন্থকার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই সমস্ত ভুলচুক ও অপূর্ণতাগুলো সংশোধন ক'রে বইখানির মর্য্যাদা ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করবেন। সে-সময়ে চিত্রগুলিও পরিবর্ত্তিত ক'রে আরও সুন্দর সুন্দর চিত্র দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। অবশ্য এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, এই সংস্করণের প্রচ্ছদপটের চিত্রখানি তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের কল্পলোকে উদ্দীপ্ত করবার পক্ষে অনুপযোগী নয়।

স্বাগতম—(উপন্যাস) শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশ্যামসুন্দর মজুমদার ৫০।৭ বি হরিশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

প্রবোধকুমারের এই সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাসখানি পড়ে যে বস্তু আমাকে সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেচে সে হচ্চে ভাষার এবং ভাবের সংযম। এই বইখানির ভিতর দিয়ে লেখক যে seriously একখানা উপন্যাস লিখ্‌তে চেষ্টা করেচেন সেটা বুঝতে দেরি হয় না।

রূপমতী গুণবতী বাংলাদেশের একটি মেয়ের সুপাত্রে বিয়ে হয়েছিল কিন্তু কিছুদিন পরেই তার বৈধব্য ঘট্‌লো। তারপর সুবৃহৎ যৌথ পরিবারে তাকে ফিরে আসতে হ'ল এবং সেখানে নিজের গুণে সে পেলে সম্মানের একটি বিশিষ্ট আসন। অতঃপর গুরুদেবের কাছে সে দীক্ষা নিলে এবং শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপন করে সেই পূজার ঘরে বেশি সময় কাটাতে লাগলো। সেই ঠাকুরই হ'ল তখন তার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বেরিয়ে পড়লো সত্যবতীর নিকট লিখিত একখানি প্রেমপত্র। তখুনি তাসের ঘরের মত ধসে পড়লো তার সম্মানের আসন এবং তারপর চল্‌লো তার উপর নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা এবং কঠিন অত্যাচার। ঠাকুরের মন্দির তার কাছে রুদ্ধ করে দেওয়া হ'ল। অবশেষে লাঞ্ছিত অত্যাচারে পীড়িত সত্যবতী একদিন যাত্রা করলো তার প্রেমাস্পদের উদ্দেশে একটি সন্তানের আশায়।

এই হ'ল গল্পের কাঠামো। এই অকালবৈধব্য এবং তার পর পূজার্চ্চনায় বিধবার সমস্ত জীবন কাটাতে পারার অলীকতা নিয়ে লেখক আগেরও উপন্যাস লিখেচেন। তার থেকে মনে হয় যে এই theme খুব দৃঢ়ভাবে তাঁর মনকে অধিকার ক'রে আছে এবং তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা অনুসারে এই সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন interpretation দিচ্চেন। এই বইয়ের interpretation পূর্ব্বের থেকে ভিন্ন কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁর এই interpretation এখনো সুসমঞ্জস নয়। তিনিই ভবিষ্যতে এই সমস্যার অন্য ভাবে সমাধান করবেন এ আশা আমার মনে আছে।

সত্যবতীকে গোড়া থেকে লেখক যে ধীরতা, সংযম এবং ত্যাগ দিয়ে মহিমান্বিত করেচেন তার থেকে এ ইঙ্গিত একরকম অসম্ভব হয়েই পড়ে যে এই মেয়েটি একদিন অত্যাচারের ফলে নিজের বাঞ্ছিতের কাছে কেবলমাত্র সন্তানলাভের আশার অভিসার যাত্রা করবে। সে বাঞ্ছিতের এমন কি দুর্জ্জয় শক্তি যার ফলে সত্যবতীর মত মেয়ে

কয়েকদিন মাত্র এলাহাবাদে থেকেই তার অনুরাগিণী হ'ল তার কোন পরিচয় লেখক দেন নি। এ হয়েচে সত্যবতীর উপর অবিচার। আর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা নারীর পক্ষে অপরিহার্য্য হলেও সংসারে প্রতিষ্ঠা এবং লোকলজ্জার ভয়ও নারীর পক্ষে কম বন্ধন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সে বন্ধন দুশ্ছেদ্য।

সত্যবতী, বড় ভাসুর কেদারবাবু এবং বড় বৌ—এই তিনটি চরিত্রের উপর শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র শৈল, যাদব এবং বড়বৌএর চরিত্রের ছায়াপাত আছে। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের উক্ত চরিত্রের বিশেষত্বগুলি লেখকের রচিত চরিত্রেও প্রধান হয়ে ফুটে উঠেচে।

লেখকের ভাষা অত্যন্ত সুন্দর—সংযমের কথা আগেই বলেচি। তিনি লিখেচেন, "জীবনকে সহজ করে ছেড়ে দেওয়াই মানুষের সাধনা। তোমার পথ রয়েচে তোমার মনে।" এই দুটি লাইনেই লেখকের মূল বক্তব্য ধরা পড়ে। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা যত বাড়বে লেখক তত দেখ্‌বেন যে মনে অনেকেরই অনেক পথ থাকে কিন্তু বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে তার সবগুলি মানুষ সব সময় ইচ্ছে হলেই বেছে নিতে পারে না।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মাশুকের দরবার—এস্ ওয়াজেদ্ আলি, বি-এ (কেণ্টাব্) বার্-এট্-ল্ প্রণীত ও ৫২, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৭। মূল্য একটাকা।

ইহা একখানি ছোট গল্পের বই। লেখক ইহার পূর্ব্বে "গুল্‌দাস্ত" ও "দরবেশের দোয়া" প্রভৃতি কয়েকটি গল্পের বই লিখিয়াছেন। আলোচ্য বইখানির গল্পগুলি হাল্‌কা ধরণের; তবে লেখকের সামান্য জিনিষেও বেশ অভিনিবেশপূর্ণ দেখিবার ক্ষমতা আছে। ইহা নিতান্ত সহজ জিনিষ নহে। এইদিকে লেখক যদি চেষ্টা করেন তো ভবিষ্যতে তিনি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার আশা করিতে পারেন। লেখকের ভাষাও বেশ সহজ ও অনাড়ম্বর।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

প্রভাতী—শ্রীপ্রভাবতী দেবী প্রণীত ও ২নং বেথুন রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ১৫৬ পৃঃ। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতার বই। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতালি প্রভৃতি গানের বইগুলি যে অভিনব কাব্যরসে অভিষিক্ত এই বইখানিতেও সেই রসমাধুর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতি কবিতাটি ভগবৎপ্রেমে সুসিক্তিত ও আত্মসচেতনতায় পরিপূর্ণ! জীবন্-সন্ধ্যায় কবি যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছেন ব্যথার অর্ঘ্যস্বরূপ তিনি তাহা ভগবানকে উৎসর্গ করিতে চান, কিন্তু সরম ও সঙ্কোচে তিনি তাহা পারিতেছেন না। চারিদিকে আনন্দের কত জয়গান, সার্থকতার কত চিত্ত-নিবেদন চলিতেছে, কিন্তু কবির প্রাণের দুঃখ সঙ্কোচ কিছুতেই ঘুচিতেছে না।

> কতই ভাষায় আকুল করে প্রাণ;
> বক্ষে আমার অক্ষমতার ব্যথা
> ততই জাগে, জাগিয়া উঠি মত!

এই সুন্দর বেদনা-বিধুর সুর রসোন্মুখী পাঠক-চিত্তকে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। কবির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনও কোন্ অসীমের স্পর্শসুখ আকাঙ্ক্ষায়, কোন অজানার সন্ধান-কামনায়, কোন অদেখার প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া ওঠে। ছাপা বাঁধাই অতি চমৎকার।

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

নানাকথা

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যু সহসা বজ্রপাতের মতই দেশের প্রাণে বেজেছে। গত দেড় বৎসর যাবৎ তিনি ছিলেন রাজবন্দী, এই সময়েই তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে যায়,—কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি মরণের কোলে মুক্তিলাভ করবেন,—তা' কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। দেশের যে তিনি কতখানি প্রিয় ছিলেন,—তাঁর শবদেহের শোভাযাত্রার বিপুল জনতার মধ্যে দেশ তা' জানিয়ে দিয়েছে।

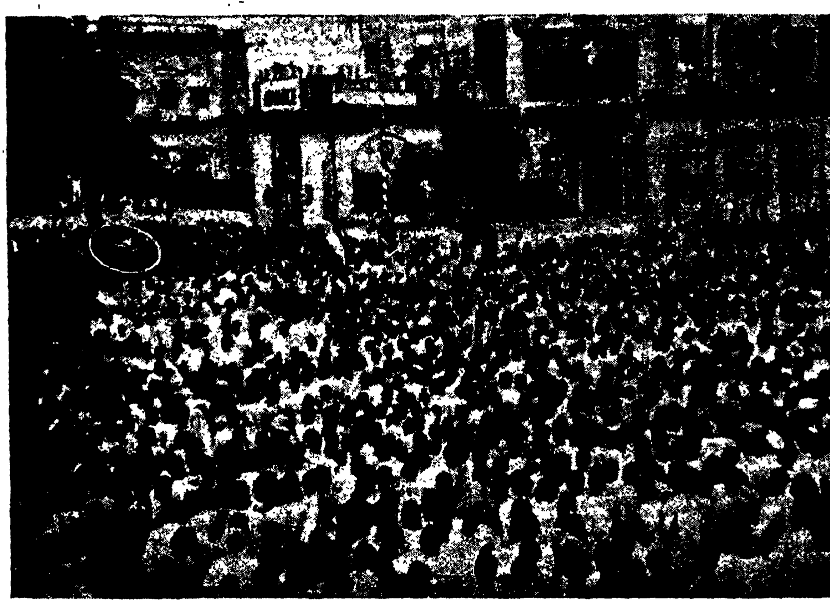


দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন

দেশবন্ধুর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন তিনি; তাঁর মধ্যে যে-আলো জালিয়ে গিয়েছিলেন দেশবন্ধু,—দেশের বর্ত্তমান নেতাদের মধ্যেও সাধারণ জনশক্তির মধ্যে সেই আলোকের শিখা কখনো নির্ব্বাপিত হ'বে না, আশা করা যায়। "মৃত্যুহীন প্রাণ" মরণের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়ও রেখে গেলেন তাই।

যতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার মধ্যে যে-বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন, তাই এখন আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ধনীর সন্তান ছিলেন তিনি,—নিজেও ছিলেন সুদক্ষ আইন-ব্যবসায়ী, শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম, প্রভূত অর্থও উপার্জ্জন করতেন। ইচ্ছা করলে সুখে, স্বচ্ছন্দে, অলসে, বিলাসে, আরামে তিনি কাটাতে পারতেন চিরকাল,—হয়ত শরীরের উপর এতখানি অত্যাচার না করলে আরও বহুকাল জীবিত থাকতে পারতেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল কোমল, স্পর্শভীরু, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত। জন্মের সৌভাগ্যে যে-সুখের তিনি অধিকারী হ'তে পারতেন সে-সুখ তাঁর সইল না। তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন পরের জন্য।

কিন্তু একি সহজ কাজ? পরাধীনতার শৃঙ্খল ত আমাদের শুধু বাইরে থেকে আসেনি। তাহ'লে ত বিপুল প্রাণ-



হাওড়া টাউন হল

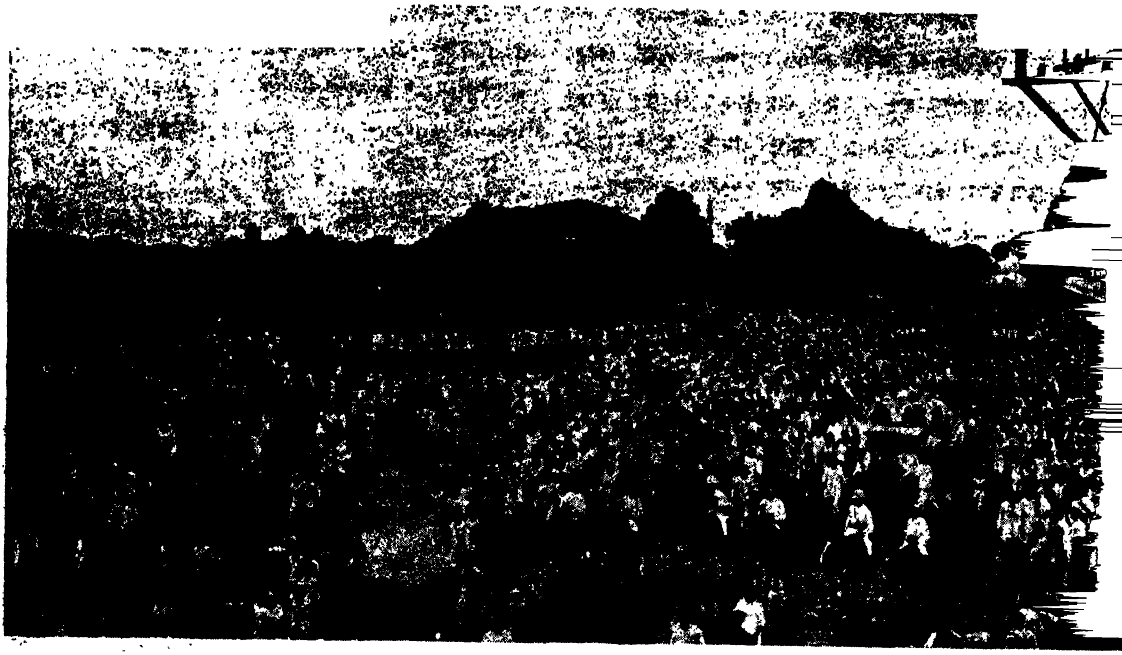
শক্তির বলে সে-শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেল্‌তে এতখানি সময় লাগ্‌ত না। শৃঙ্খল যে জাতীয় জীবনের শিকড় থেকে তার অস্থি-মজ্জাকে জড়িয়ে জড়িয়ে সমস্ত জাতিকে নাগপাশে বেঁধে রেখেছে। একে ত সহজে ছেঁড়া যায় না। তাই যতীন্দ্রমোহন বক্তৃতামঞ্চ থেকে বারবার দেশকে বল্‌তেন,—দেখ,—দেখ,—আপনার অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখ, খুঁটিয়ে



চৌরঙ্গী দৃশ্য

দেখ,—আপনাকে পরীক্ষা করে দেখ,—সেখানে আছে পৃষ্ঠে কী বাঁধন। ছেঁড় এই বাঁধন তবে পাবে মুক্তি। স্বাধীন হ'তে হ'লে চাই জাতীয় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন, না হ'লে চল্‌বেই না। ভেবে দেখ ত আজ কত বছর ধরে ভারতে কত বড় বড় জাতীয় আন্দোলন,—বড় বড় নেতৃবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত,—ভারতেই কেন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, আর পৃথিবীর অন্যত্র তুর্কীতে, পারস্যে, চীনে কেন সফল হয়। এর কারণ, যতীন্দ্রমোহনের ভাষায়—

"Slavish worship of the past, communal dissensions, the caste, purdah, polygamy, early marriage and such other canker of the body-politic are responsible for our failure. We live a life divided into compartments; our patriotism is communal; our unity amounts to mere juxtaposition. Steeped into the prejudices of a medieval age, with half the nation losing their vitalities behind the purdah, and in its turn devitalising the other half; disintegrated by warring castes and creeds which condemn



পথের একটি দৃশ্য

a population more than half of the united kingdom or Japan as untouchables whose shadow even it is pollution to tread."

আমরা যতীন্দ্রমোহনের পরলোকগত আত্মাকে প্রণিপাত করি, তাঁর শান্তি কামনা করি, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা নিবেদন করি। তাঁদের দুঃখ আমাদেরও দুঃখ, দেশেরও দুঃখ।



কেওড়াতলা—শ্মশানে যতীন্দ্রমোহনের শবদাহ

রামমোহন শতবার্ষিকী

রামমোহন শতবার্ষিকী সমিতি থেকে শ্রীযুক্ত অমল হোম কর্ত্তৃক সম্পাদিত "Rammohon Roy, The Man and His Work" শীর্ষক প্রথম পুস্তিকাখানি আমাদের হস্তগত হয়েচে। ইহার মধ্যে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদ্বোধন সভায় প্রদত্ত কবিগুরুর বক্তৃতা, প্রস্তাবিত শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ, সম্পাদকের টিপ্পনীসহ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত রামমোহনের জীবনবৃত্তান্ত এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক লিখিত দুটি চিন্তা ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েচে। তা ছাড়াও আরো দু একটি ছোটখাট প্রবন্ধ, রামমোহনের রচনাবলীর তারিখ অনুযায়ী সাজান একটি বিস্তৃত তালিকা ও কয়েকখানি ছবিও বইখানিতে আছে। সঙ্কলন পুস্তক হিসাবে বইখানি উৎকৃষ্ট হয়েচে। বর্ত্তমান সময় এমন বই দেশের লোকের বারবার করে পড়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান ভারতের যে সকল কঠিন সমস্যা দেশনেতাদের বিচলিত করেচে এবং কি ভারতের কংগ্রেস নেতাদের বৈঠকে, কি বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল সমস্যার পুনঃপুনঃ আলোচনা হয়েও কোন মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না সে সমস্ত সমস্যারই সমাধান করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে। সেই জীবনের বিচিত্র কর্ম্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল যে গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা তার মূলে এসে মিলিত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের ধর্ম্মপ্রাণতা, কোনরকম বাইরের যোগ-সাধনার দ্বারা নয়, তিনটি ধর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত নিবিড় ঐক্যসূত্রটি আশ্রয় করে। আজ ঠিক একশত বছর হলো রাজা রামমোহন রায় পরলোক গমন করেছেন। এই একশ বছরের মধ্যে আমাদের প্রগতিশীল জাতীয় জীবন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। রামমোহনের জীবনের বিরাট অনুপ্রেরণা ও প্রাণশক্তি আমাদের জাতীয় জীবনকে জীবনের বিবিধ অভিব্যক্তির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। আজ আমরা সাহিত্যে ও শিল্পে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রজীবনে ও সামাজিক নিয়মে সতেজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় আত্মপ্রকাশ করতে পারি, বিশ্বের চিন্তাধারার স্রোতে নিজেদের কিছু চিন্তাও জুড়ে দিতে পারি, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের মিলন-সমস্যা এই চিন্তা সমৃদ্ধির মধ্যেও জটিলতরই হয়ে উঠছে। সেই সমস্যার গ্রন্থি শিথিল করা দিন দিন যেন ক্রমশই দুরূহতর হয়ে উঠছে। এর কারণ,—যে আলো জলেছিল রামমোহনের মধ্যে, আমাদের প্রাণে তা জলেনি। রামমোহনের বাণী রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক ভাষায় সুস্পষ্টতর হয়ে উঠেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশবাসীর জড়তা তবুও ঘোচেনি।

রামমোহনের মৃত্যুর শতবর্ষ পরে এই অনুষ্ঠানের সাহায্যে নূতন ভারতের সেই প্রথম আলোকশিখা যদি আবার দেশবাসীর অন্তরে একটুও জ্বালাতে পারা যায়, তবেই বর্ত্তমান ভারতের কঠিন সমস্যা একটু সহজ হ'য়ে আসতে পারে। যে আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যে অনুষ্ঠান কর্ত্তাদের এইদিকেই লক্ষ্য আছে দেখে আমরা সুখী হ'য়েছি।

নিখিল ভারত লাইব্রেরী সম্মেলন

আমরা শুনে সুখী হলাম যে আগামী ১২ই ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় একটি নিখিল ভারত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যেই দেশের সভ্যতাও মানসিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের গ্রন্থাগার পরিচালনায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা সকলে একত্রে মিলিত হয়ে দেশে নূতন নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনায় উন্নততর

ব্যবস্থার উদ্ভাবন করতে পারলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হবে। বর্ত্তমান সম্মেলন যাঁরা আহ্বান করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন, শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথান (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ) শ্রীযুক্ত নিউটন দত্ত (বরদা ষ্টেট্ লাইব্রেরীগুলির কিউরেটর) শ্রীযুক্ত চ্যাপম্যান্ (রামপুর ষ্টেট্ লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ), শ্রীযুক্ত গঙ্গাশঙ্কর মিশ্র (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী) শ্রীযুক্ত করমানন্দ (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী) শ্রীযুক্ত হামিদ উজ্জাফার (হায়দরাবাদ) শ্রীযুক্ত জসি (মহারাষ্ট্র) ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ সরকার

আমরা শুনে দুঃখিত হ'লাম যে বিগত ২রা আগষ্ট বুধবার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সরকার মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। কলকাতার সমাজে তিনি বেশ সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে যে স্থানটি শূন্য হোলো, তা সহজে পূর্ণ হ'বার নয়। তাঁর অভাব অনেকেই অনুভব করবেন। তিনি ছিলেন স্বর্গীয় নলিনবিহারী সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সমস্ত সদ্‌গুণাবলীরও তিনি অধিকারী। যে অল্প কয়েকজন বাঙালী ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম, কারতারক কোম্পানীর অন্যতম অংশীদাররূপে ব্যবসায়ীসমাজে সুপ্রসিদ্ধ, এবং বহু বৎসর ধরে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্সের সহকারী সভাপতি। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও তাঁর কিছু খ্যাতি ছিল। তিনি একাধিকবার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের সহকারী সভ্য নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

পরলোকগত শিল্পী জীমূতকান্তি রায়

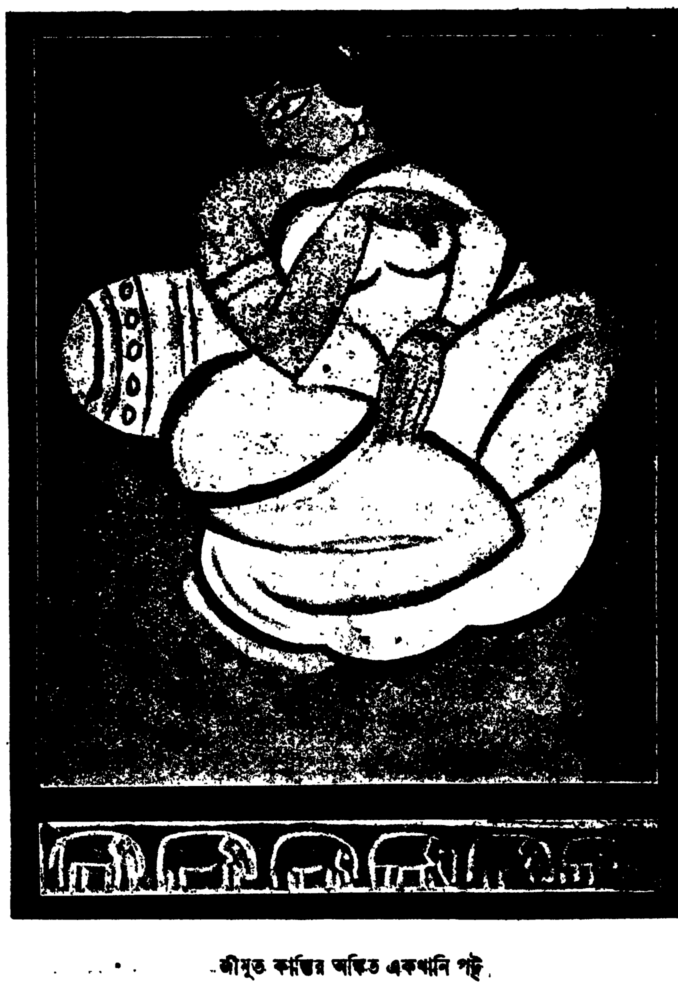
শিল্পী জীমূতকান্তি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের পুত্র ছিলেন। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তাঁর



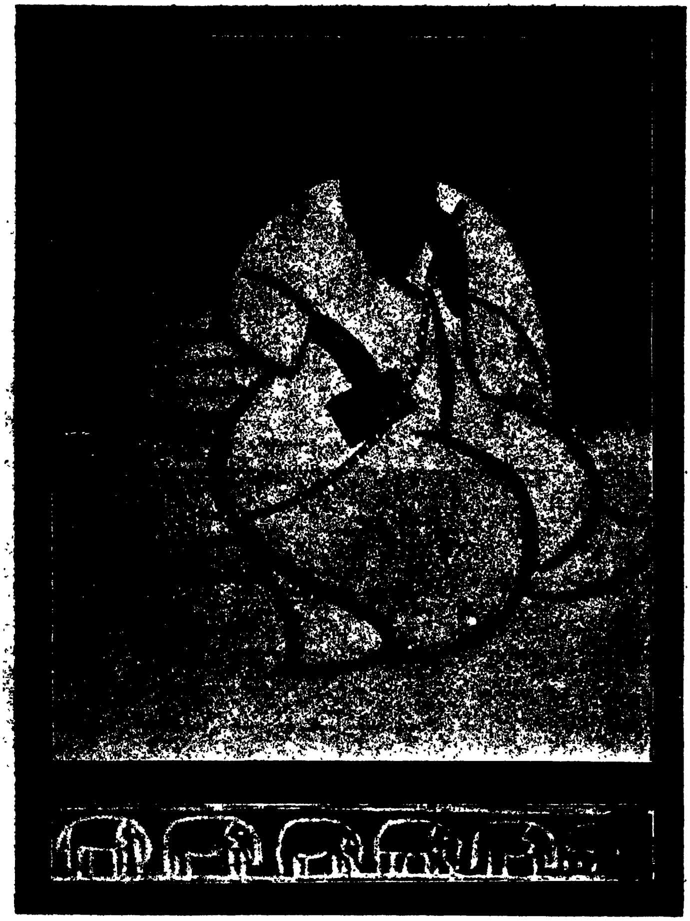
৺জীমূতকান্তি রায়

মৃত্যু ঘটেচে। বছর দুয়েক কলিকাতার আর্ট স্কুলে শিক্ষা গ্রহণের পর জীমূতকান্তি ১৯৩১ সালে স্কুল পরিত্যাগ ক'রে পিতার সহকর্ম্মীরূপে বাংলার পটাঙ্কন ধারায় ছবি আঁকতে আরম্ভ করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, বেঁচে থাক্‌লে হয়ত তিনি একদিন তাঁর পিতার বাংলাদেশের প্রাচীন পটাঙ্কন ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারতেন। জীমূতকান্তির অঙ্কিত ১৯৩০ সালের কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিয়ুটের চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত "ময়ূর" এবং ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে যামিনীবাবুর গৃহে চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত রামায়ণ চিত্রাদি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জীমূতকান্তির শিল্প প্রতিভার পরিচয় পেয়েছেন। এই শক্তিমান সহকর্ম্মী পুত্রের অকাল মৃত্যুতে যামিনীবাবুর মনে কি মর্ম্মন্তুদ আঘাত লেগেচে তা আমরা জানি। প্রকৃত প্রতিভাবান শিল্পীর ধ্যান-বিলাসে যামিনীবাবুর মন ভরপুর, শিল্পকে তিনি অন্তরের অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন, শিল্পের প্রতি এই একান্ত নিষ্ঠা এবং অনন্যপরতার প্রভাবে তিনি এই কঠোর শোককে অতিক্রম করবেন এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

এখানে আমরা জীমূতকান্তির অঙ্কিত দুখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করলাম।



জীমূত কান্তির অঙ্কিত একখানি পট



জীমূতকান্তির অঙ্কিত একখানি পট

উদয়ন

এই নব প্রকাশিত মাসিক পত্রটির কয়েক সংখ্যা দেখে আমরা সুখী হয়েছি। মুদ্রণ সৌষ্ঠবের দিক থেকে এ পত্রটি সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছে। কলিকাতা ট্রেডিং কোম্পানীর ছাপাখানার সুনাম উদয়নের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত। মুদ্রণ পারিপাট্যের বিষয়ে আমাদের বাঙলা দেশের কয়েকটি মাসিক পত্রের ঔদাসীন্য দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওই পত্রগুলির কর্তৃপক্ষেরা হয় ত মনে করেন যে, মাসিকপত্র সাবেক-কেলে গাদা বন্দুকেরই মত একটা পদার্থ,—তাতে নিরেট ক'রে যতই লেখা ঠাসা যাবে, ততই তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। বস্তুর মূল্য নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু আশে-পাশে একটু-আধটু অবকাশ থাকারও কিছু মূল্য থাকতে পারে। তা যদি না হয়, তা হ'লে এইটুকু ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে অতখানি বায়ুমণ্ডলের কোনো অর্থ হয় না।

উদয়নের সম্পাদক এবং পরিচালক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দে একজন কর্ম্মী পুরুষ। তাঁর পরিচালনায় উদয়ন লেখার দিক দিয়েও উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হবে এ বিশ্বাস আমাদের সম্পূর্ণ আছে। যে-কোনো সদ্য-জাত মাসিক-পত্রের একটি নির্দ্দিষ্ট রূপপরিগ্রহ করতে, দানা বাঁধতে, কিছু সময় লাগেই। সজীব পদার্থের বিষয়ে প্রযোজ্য এই সত্যটি, মাসিকপত্রের বিষয়েও খাটে। আমরা এই নব-জাত সহযোগীর সাফল্য কামনা করি।

ছবি-ঘর

সুবিখ্যাত ব্যায়ামী এবং সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত শান্তি পালের সুপরিচালনায় ফলে এই সিনেমা-গৃহটির উত্তরোত্তর উন্নতি লক্ষ্য ক'রে আমরা বিশেষ সুখী হয়েছি। সম্প্রতি ইঁহারা একটি নূতন সেট প্রতিষ্ঠিত ক'রে শব্দোৎপাদন বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছেন। দর্শকগণের, বিশেষত ভদ্র-মহিলাগণের, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এঁদের নিরবচ্ছিন্ন দৃষ্টি অভ্যাগতদিগকে সত্যই তৃপ্তি দেয়।

"আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা বিচিত্রা"

আগামী শারদীয়া পূজা উপলক্ষে, আশ্বিন সংখ্যা "বিচিত্রা" প্রকাশিত হ'বে ২০শে ভাদ্র ও "কার্ত্তিক" সংখ্যা প্রকাশিত হ'বে ৩রা আশ্বিন। বিজ্ঞাপনদাতাগণ বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করতে হ'লে বা নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হ'লে অনুগ্রহ করে তদনুযায়ী সময় মত আমাদের জানাবেন।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



শরতের অঞ্জলি

শিল্পী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪০ | ৩য় সংখ্যা

মালঞ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাসে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মার্ব্বেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, ছুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই; এক কোণে পিতলের কলসীতে রজনী-গন্ধার গুচ্ছ, তারি মৃদু গন্ধ বাঁধা প'ড়েছে ঘরের বদ্ধ হাওয়ায়।

পূবদিকের জানলা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অরকিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরী; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প্ চল্‌চে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকচে যেন মরিয়া হয়ে।

বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা ছুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্য্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, না না থাক্। চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্রছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালবাসা আর তার স্বামীর ভালবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায় নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্য্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুষ্পিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়চে সেই দিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিমধারে প্রাচীন মহা নিম গাছ। তারি জুড়ি আরো একটা নিম গাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারি গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোর বেলায় চা খেয়ে নিত দু'জনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হোত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হোত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত,—"সত্যি বলচি, ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।" কেউবা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেচে, "ওগুলো কি সূর্য্যমুখী?" নীরজা ভারি খুসী হয়ে হেসে উত্তর করেচে, "না, না, ওতো গাঁদা!" একজন বিষয়বুদ্ধি-প্রবীণ একদা বলেছিল—"এতবড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী? আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর।" সমজ্‌দারের পুরস্কার মিল্‌ল; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা টবশুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিক্রম, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগ্‌নোলিয়া, কারনেশন্‌,—তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজি লেবু, কয়েৎবেল,—ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েৎবেল। যথাঋতুতে সব শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বল্‌ত, "কী মিষ্টি জল!" উত্তরে শুন্‌ত, "আমার বাগানের গাছের ডাব।" সবাই বলত, "ওঃ, তাইতো বলি!"

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জ্জিলিং চায়ের বাষ্পে মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায় হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙীন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্‌ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন? ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট করে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী? কোন্‌ বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ! কোন্‌ বিরাট পাগল! এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পারল কে!

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষ্যা করেছে সখীরা; মনে করেচে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েচে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেচে, "লাকি ডগ্‌।"

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকো প্রথম যে ব্যাপার নিয়ে ধস্‌ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের "ডলি" কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্ব্বেই ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হোলো দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন ল্যাজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হোত স্বামিনীর তর্জ্জনী সঙ্কেতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ল্যাজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে

দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করুণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্য্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস ক'রেছে। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটেনি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হোলো তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হোলো এটা অলক্ষণের প্রথম-প্রবেশ দ্বার। মনে হোলো বিশ্ব-সংসারের কর্ম্মকর্ত্তা অব্যবস্থিত চিত্ত,—তাঁর আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলেনা।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না এমন সময় ঘটল সন্তানসম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠ্‌ল ভরে, ভাবী-কালের দিগন্ত উঠ্‌ল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলঙ্করণে নীরজা লাগ্‌ল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এলো প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সঙ্কট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হোলো, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তারপর থেকে নীরজা আর উঠ্‌তে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হোলো নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসচে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবীফুলের নিঃশ্বাস, যেন তার সেই পূর্ব্বকালের দূরবর্ত্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কেমন আছ ?"

সকলের চেয়ে তাকে বাজ্‌ল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূর সম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েচে। খোলা জানলা থেকে যখনি সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্চে তখন নিজের অকর্ম্মণ্য হাত-পা-গুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েচে নতুন চারারোপণের উৎসবে। ভোর বেলা থেকে কাজ চল্‌ত। তারপরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তারপরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি বিদিশি সঙ্গীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখী ডাক্‌ত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হোত দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে-রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্ব্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে-স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে,

তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়চে বুঝি, কোন্‌দিন হয় তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজ্‌ল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জ্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকল, "রোশ্‌নি"।

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপরে ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গীতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেচে। মানুষ করেচে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন কি, নীরজার স্বামী পর্য্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "জল এনে দেব খোঁখী।"

"না, বোস্।" মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বল্‌লে, "আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।"

আয়া কিছু বল্‌লে না; কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, "কবে না শোনা যায়!"

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, "সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন।"

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বল্‌তে লাগল, "আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশি দিনের কথা নয়।"

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বল্‌লে, "ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে।"

নীরজা আপন মনে বলে চল্‌ল,—"নিয়ুমার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেই রকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি।"

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বল্‌লে, "আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম, মালীরা ফাঁকি দিতে পারেনি।"

আয়া উঠ্‌ল গুমরিয়ে, বল্‌লে, "সেদিন নেই, এখন লুঠ চল্‌চে দু'হাতে।"

"সত্যি না কি?"

"আমি কি মিথ্যা বলচি? কলকাতার নতুন বাজারে ক'টা ফুলই বা পৌছয়। জামাই বাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।"

"এরা কেউ দেখে না?"

"দেখবার গরজ এত কার?"

"জামাইবাবুকে বলিস্‌নে কেন?"

"আমি বলবার কে? মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে তো। তুমি বল না কেন? তোমারি তো সব।"

"হোক্ না, হোক্ না, বেশ তো। চলুক্ না এমনি কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক্ না।"

"কিন্তু তাও বলি খোঁখি, তোমার ঐ হলা মালিটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।"

হলার কাজে ঔদাসীন্যেই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসঙ্গতরূপে বেড়ে উঠ্‌চে, এই কারণটাই সব চেয়ে গুরুতর।

নীরজা বল্‌লে, "মালীকে দোষ দিইনে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন? ওদের হোলো সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়? হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস্‌নে কথা, চুপ করে থাক্।"

"সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"

"কেন, কী জন্যে?"

"ও বসে বসে বিড়ি টানচে; আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্চে। জামাইবাবু বল্‌লে, "গোরু তাড়াসনে কেন?" ও মুখের উপর জবাব করলে, "আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই!"

শুনে হাস্‌লে নীরজা, বললে, "ওর ঐরকম কথা! তা যাই হোক্, ও আমার আপন হাতে তৈরি।"

"জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।"

"চুপ কর্ রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায়নি সে কি আমি বুঝিনে। ওর আগুন জ্বলচে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেচে। ডাক্ তো ওকে।"

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে "কীরে, আজকাল নতুন ফরমাস কিছু আছে?"

হলা বল্‌লে, "আছে বই কি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।"

"কী রকম, শুনি।"

"ঐ যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্চে, ঐখান থেকে ইঁটপাটখেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হোলো ওঁর হুকুম। আমি বল্লুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয়না আমার কথায়।"

"বাবুকে বলিস্‌নে কেন ?"

"বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক্‌। বৌদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।"

"তাই দেখেচি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আন্‌ছিলি।"

"বৌদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলি মজুর ?"

"আচ্ছা এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুরকি বইতে বল্‌বে আমার নাম করে বলিস্‌ আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে।"

"দেশ থেকে চিঠি এসেচে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।" বলে মাথা চুল্‌কতে লাগল।

নীরজা বল্‌লে, "না মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস্‌নে।" এই বলে, টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

"আবার কী ?"

"বউয়ের জন্যে একখানা পুরানো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।" এই বলে পানের ছোপে কালো বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাস্‌লে।

নীরজা বল্‌লে, "রোশনি, দেতো ওকে আলনার ঐ কাপড়খানা।"

রোশনি সবলে মাথা নেড়ে বল্‌লে, "সে কী কথা ওযে তোমার ঢাকাই সাড়ি !"

"হোক্‌ না ঢাকাই সাড়ি। আমার কাছে আজ সব সাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।"

রোশনি দৃঢ়মুখ করে বল্‌লে, "না সে হবেনা। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্‌ হলা, খোঁখিকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস্‌ বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বল্‌লে, "আমার কপাল ভেঙেচে বৌদিদি।"

"কেনরে কী হয়েচে তোর।"

"আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বৌদিদি, তোমার যদি দয়া হোলো উনি কেন দেন বাগড়া। কারো দোষ নয় আমারি কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় পড়ে।"

"ভয় নেইরে, তোর মাসি তোকে ভালোইবাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।"

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বৌদিদি। আমার ময়লা

হাত, দাগ লাগবে।” সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, “আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস্ বাবু বেরিয়ে গেছেন?”

“নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া! টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।”

“আজ এই প্রথম হোলো। আমার সকাল বেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়লো। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।”

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অর্কিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপ্ছিপে লম্বা, সামলা রং, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের সাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ বন্ধনে নেমে পড়েচে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেচে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না। সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বল্লে, “কে আন্তে বলেচে?”

“আদিৎদা।”

“নিজে এলেন না যে?”

“নিয়ুমার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হোলো চা খাওয়া সেরেই।”

“এত তাড়া কিসের?”

“কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা চুরির খবর এসেচে।”

“টানাটানি করে কি পাঁচমিনিটও সময় দিতে পারতেন না?”

“কালরাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আস্তে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।”

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্ব্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেচে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। একথা তার মনে আসেনি যে ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বল্লে, “জানো মার্কেটে এ ফুলের দাম কত! পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী?” বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বই কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, “জানো এ ফুলের নাম?”

বল্‌লেই হোতো, জানিনে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগ্‌ল, বললে, "এমারিলিস্।"

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, "ভারি তো জানো তুমি ; ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।"

সরলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "তা হবে।"

"তা হবে মানে কী ? নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও আমি জানিনে ?"

সরলা জান্‌ত নীরজা জেনে শুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাক্‌ল, "শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে ?"

"অরকিডের ঘরে।"

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, "অরকিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার ?"

"পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্যে আদিৎদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।"

নীরজা বলে উঠল ধমক দেওয়ার সুরে—"আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না ?"

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ-আমলে ঠিক মতো কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুসি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাশ না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বৌদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করচে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে-বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্ব্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বললে, "দাও, বন্ধ করে দাও ঐ জানলা।" সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি।"

"না কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।"

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, "মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।"

"না দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাস আছে না কি ?"

"গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।"

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বল্‌লে, "তার সময় এই বুঝি ! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে, শুনি।"

সরলা মৃদুস্বরে বল্‌লে, "মফঃস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।"

"বারণ করেছিলে বুঝি ! আচ্ছা, আচ্ছা ডেকে দাও হলা মালীকে।"

এলো হলা মালী। নীরজা বললে, "বাবু হয়ে উঠেছ ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে ! দিদিমণি তোমার এসিষ্টেণ্ট মালী না কি ? বাবু সহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস

ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাস পাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস্ ঝিলের ডান পাড়িতে।" মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিস্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরে বললে, "বৌদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিষের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।"

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "এর দাম কত ?"

জিভ কেটে হলা বললে, "এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরীব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে পরে যে মানুষ।"

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগ্‌নীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বৌদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারি নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারি ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।"

নীরজা বললে, "আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা!" হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠ্‌ল, "রোশ্‌নি, রোশ্‌নি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।"

আয়া বললে, "ও কী বলছ খোঁখি, ছি ছি!"

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, "আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন? আমি কি জানিনে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখ্‌ছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাস্‌তে হাসতে বক্‌শিস্ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে! খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর সয়তানি ঘোচাতে হবে।"

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠ্‌ল, নীরজা বললে, "থাক্ থাক্, আজ থাক্!" (ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বাঙালীর বেকার সমস্যার কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

আজকের পৃথিবীতে যে সব অর্থনৈতিক সমস্যা নিদারুণ হয়ে উঠেছে, বেকার সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। বেকার সমস্যা বিশেষ করে' ভয়াবহ এই হেতু যে মহাযুদ্ধের পরে, পশ্চিমের সুশাসিত দেশেও, বেকারের সংখ্যা নিযুতকে অতিক্রম করেছে এবং এখনো বেড়েই চলেছে। বলা বাহুল্য, জনসাধারণের একটা বিপুল অংশ যারা কাজ পেতে চায়, কাজ করতে ইচ্ছুক অথচ কাজের নাগাল পাচ্ছে না—তাদের অস্তিত্ব সমাজের অস্তিত্বের পক্ষে সুবিধার নয়, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দুর্য্যোগ ঘনাবার আশঙ্কা সেই কোণ থেকেই। প্রত্যেক দেশেই, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তরণীর যাঁরা কর্ণধার তাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন এই ভেবে যে এ অবস্থায় কি করে' সবদিক বাঁচানো যায়। তাঁরা যে শুধু মাথা ঘামাচ্ছেন তা' নয়—এ বিষয়ে তাঁদের চেষ্টারও ত্রুটি নেই।

মহাযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর বড় বড় রপ্তানির বাজারের সঙ্গে পশ্চিমের যোগাযোগ ছিন্ন হয়—তারই ফলে সেখানকার বেকার-সমস্যা। পশ্চিমের যে সব বাণিজ্যপ্রাণ দেশ চিরদিন বিদেশের বাজারের ভরসা করে এসেছে তাদের অর্থনৈতিক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই এই সর্ব্বনাশের বীজ ছিল। তাদের কল কারখানার তৈরি মাল তারা পাঠিয়ে দিত বিদেশের বাজারে, সেখানে তাদেরই ছিল একচ্ছত্র অধিকার, সুতরাং চড়া দামে মাল কাটাতে কোনোদিন তাদের বেগ পেতে হয়নি—যতদিন অর্দ্ধেক পৃথিবী ব্যবসা ও বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায় পিছিয়ে ছিল ততদিন এই ব্যবস্থা চলেছিল চমৎকার; কিন্তু যখনি সেই সব দেশের অর্থনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হোলো তখনি বাধ্‌ল সঙ্কট। কেননা তখন আর তারা বিদেশী মাল কাটাবার কেন্দ্র বলে' নিজেদের মনে করতে পারল না, নিজেরাই কল কারখানা ব্যবসা বাণিজ্য ফেঁদে নিজেদের অভাব মেটাবার পথ দেখ্‌ল। ফলে সেই সব দেশে রপ্তানি গেল কমে,' বিদেশের বাজার ক্রমশই ছোট হয়ে এল—চাহিদার অভাবে বাধ্য হয়ে পাশ্চাত্যদেশকে মালের যোগান কমাতে হোলো, কল-কারখানার উৎপাদনী শক্তিকে সংযত করতে হোলো। এই ভাবে বিকর্ম্মিক লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে সেখানে বেকার সমস্যা আজ প্রবল হয়ে উঠেছে।

এখানকার বেকার সমস্যার কিন্তু একেবারে আলাদা গোত্র,—এক হিসাবে, পৃথিবীর বৃহত্তর সমস্যার সঙ্গে এর কোনো যোগই নেই, বল্‌তে গেলে। পশ্চিমের সমস্যার সঙ্গে কারণে, প্রকৃতিতে এবং লক্ষণে এর প্রভেদ। আপাততঃ এর আক্রমণে বিশেষ করে' চাকুরিজীবি মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বেশি কাহিল হয়েছেন, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার ফলে সমগ্র জাতিকেই দুর্ব্বল হতে হবে; কেননা নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য জনসাধারণের জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে' মনুষ্যত্বের চরম বিত্তে তাদের দরিদ্র করে' তোলে।

চাকরীহীন বেকার ছাড়াও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের সংখ্যা অনুমান করাও অসম্ভব এবং সরকারী Statistics এর খাতায় যাদের উল্লেখমাত্র নেই, যারা বেকার নয় অথচ কর্ম্মসূত্রে যাদের উপার্জ্জন এত যৎকিঞ্চিৎ যে তাতে যথার্থভাবে তাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। কিন্তু সে আরেক সমস্যা।

আমাদের বেকার-সমস্যার গোড়ায় আসা যাক্। পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লবের ধাক্কা যখন ভারতবর্ষে এসে লাগ্‌ল তখন আগেকার সামাজিক ও আর্থিক যে ব্যবস্থা আমাদের ছিল তা একেবারে গেল ভেঙে—এ দেশের বেকার সমস্যার সূত্রপাত হোলো সেই মুহূর্ত্ত থেকে। আনুষঙ্গিক ভাবে আধিপত্যের সুযোগে ইংরেজরা এখানকার আভ্যন্তরীণ কারেন্সী, টারিফ ও রেলওয়ের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের যে ক্ষমতা

পেয়েছিল স্বদেশী বণিকদের সুবিধার দিকে চেয়ে সেই ক্ষমতার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করতে তারা কসুর করেনি—তার ফলে ভারতে ব্রিটিশ-বাণিজ্য-বিস্তারের তাল কেবল দ্রুত নয়, তা নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ হয়েছে।

পশ্চিমের কলে-তৈরী মালের আমদানি সুরু হতেই হাতে-তৈরী মালকে বাজার থেকে হট্‌তে হোলো। অসংখ্য ভারতীয় কারিগর, যারা সস্তা বিলাতী মালের প্রতিযোগিতায় টিক্‌তে পারল না তাদের ভাগ্যে ঘটলো বেকার দশা। এই ভাবে প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে' বহু-সংখ্যককে বংশগত কর্ম্ম থেকে বিচ্যুত করে' পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লব কেবল এইটুকু উপকার করেছে যে তার সংঘাতে এদেশের অর্থনৈতিক বোধ জাগ্রত হয়ে ক্রমিক বাণিজ্যায়ন সম্ভব হোলো। বলা বাহুল্য, এই ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়াসে যেমন একদিকে দেশের সম্পদ ও সৌষ্ঠব কিছু পরিমাণে বেড়েচে তেমনি অন্যদিকে কলকারখানার বাড়্‌তি মালের পয়দায়, যারা কুটীর-শিল্প ও সামান্য কারিগরী কাজে জীবিকার্জ্জন করত তাদের বেকার হতে হয়েছে।

অতএব ভারতের বেকার সমস্যা যে পশ্চিমের থেকে পৃথক্‌ এটা বেশ স্পষ্ট। পশ্চিমের সমস্যার মূলে আছে অতিরিক্ত পয়দা, তাদের মালের যোগান্‌ তাদের ঘরোয়া বাজারের চাহিদাকে ছাপিয়ে উঠেছে, কিন্তু আমাদের বেলা সেকথা বলা যায় না, কেননা আমাদের কলকারখানার যোগান্‌ আমাদের চাহিদার সামান্য অংশও মিটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। এমন কি, Auxiliary Industries বল্‌তে যা বোঝায়, সে সবের গোড়াপত্তন পর্য্যন্ত এখনো হয়নি। আমাদের সামান্য প্রয়োজন মিটে গেলেই স্বভাবতঃ আমরা সন্তুষ্ট। আমাদের চাষী নিজের খাদ্য নিজের ক্ষেতে ফলায়, কেবল কয়েকটি না-হলে-নয় জিনিসের দরকারেই সে বাহিরের অপেক্ষা রাখে। এই কারণেই আমাদের সমস্যার সমাধান অনেকটা সোজা। আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য যে গড়ে ওঠেনি তা একদিকে যেমন সুযোগের অসদ্ব্যবহার এবং সরকারের অসহানুভূতির পরিচয়, তেমনি অন্যদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বেকার সমস্যার যথার্থ এবং আশু সমাধানের সম্ভাবনা এরই মধ্যে আছে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই বেকারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ক্রমাগত জনসংখ্যা বাড়ার ফলে এই সমস্যা এখন তীব্রতা লাভ করেছে, যদিও জনতাবৃদ্ধি একমাত্র এই প্রদেশেরই একচেটে নয়, বল্‌তে গেলে এ একটা পার্থিব ব্যাধি। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার গোড়া খুঁজ্‌তে হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যেতে হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারির বাঁধা আয়ে কোনো বাধা নেই, বিপদ কম—আনুষঙ্গিক মর্য্যাদা ত আছেই, তার ওপরে জমির দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা এমনি লাভের ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল যে জমিদার হওয়াটা ধনী বাঙালীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় হোলো। ফলে তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা না খাটিয়ে, অর্থের ব্যবহারের আর সব উপায়কে অবহেলা করে' তাঁদের মনোযোগ ও ধনযোগ জমিদারি বাড়ানোর দিকেই দিলেন। এমন কি যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্যে ছিলেন তাঁরাও আয়ের বাড়্‌তি অংশ দিয়ে জমিদারি কেনাটা বড় মনে করতেন—কেননা জমিদার হওয়ার মধ্যে সম্ভ্রম ছিল, গৌরব ছিল অথচ পরিশ্রম ছিল না।

তার ফলে এই হোলো যে অন্য প্রদেশ থেকে, এমন কি সুদূর বিদেশ থেকে উৎসাহী লোকেরা আমাদের ব্যবসায় বাজারে ভিড় করে' এলো। আমাদের অবহেলার সুযোগ গ্রহণ করতে তাদের দেরি হোলো না,—এবং অল্পদিনেই তারা আমদানি-রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসাবাণিজ্যের সমস্ত ঘাঁটি দখল করে' নিল। আজ আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশীয় ও অন্য প্রদেশীয় এমন একচেটে অধিকার যে বাঙালীর পক্ষে সেখানে মাথা গলিয়ে নিজের জায়গা করে' নেওয়া একেবারে অসাধ্য না হলেও, দুঃসাধ্য ত বটেই।

বাংলার অধিকাংশ বাণিজ্যসূত্রই যে কেবল অবাঙালীর হাতে তাই নয়, তাদের কলকারখানায় যেসব শ্রমিক খাটে তাদেরও বেশির ভাগ অবাঙালী। কলকাতা ও আশ-পাশের মিলে যারা মজুরগিরি করে তাদের অধিকাংশই এসেছে যুক্তপ্রদেশ ও বেহার উড়িষ্যা থেকে। ১৯২১ সালের সেন্‌সাস্‌ অনুসারে, সবগুলো কলকারখানা জড়িয়ে প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার মজুর-কারিগরের মধ্যে, কেবল

মাত্র একান্তর হাজার অর্থাৎ শতকরা চল্লিশ ভাগেরও কম বাঙালী। এইরূপে নিম্নশ্রেণীর বাঙালীদের শ্রমের ক্ষেত্রও চারিধার থেকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। এক কলকাতা সহরেই দোকান পসারী, মিস্ত্রি-মজুর, ট্যাক্‌সি চালক, দারোয়ান-চাকর-বেয়ারার মধ্যে হাজার হাজার ভিন্নপ্রদেশী পাওয়া যাবে।

কয়েক বছর থেকে এই দুর্লক্ষণ মধ্যবিত্তের কর্ম্মক্ষেত্রেও সংক্রামিত হয়েছে—অন্য প্রদেশ থেকে কেরাণী ও কর্ম্মচারী-আমদানির ক্রমবর্দ্ধমান হারেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে; যেখানে এতদিন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাঙালী যুবকেরা নির্ব্বিবাদে চাক্‌রী পেয়ে এসেছে এখন সেখানেও বাইরের লোক উড়ে এসে জুড়ে বসছে। এখানে কথা উঠতে পারে যে, যেমন বাংলায় অন্যপ্রদেশীর জন্য সুযোগের সিংহদ্বার প্রশস্ত এবং অবারিত, তেমনি অন্য প্রদেশেও হয়ত বাঙালীর চাক্‌রী পাওয়ার সম্ভাবনা বিরল নয়, কিন্তু একথা পূর্ব্বকালে একদা সত্য হলেও, আজ আর সত্য না। আজ প্রত্যেক প্রদেশের দরজাই বাঙালীর কাছে রুদ্ধ।

অন্য প্রদেশে ত বটেই, এমন কি তার নিজের ঘরেরও অনেক দরজা তার কাছে মুক্ত নয়; সরকারী কাজের কতকগুলি বিভাগে বাঙালীর প্রবেশের অধিকার নেই, সেখানে অন্য প্রদেশের লোক নেওয়া হয়। সৈন্যদলে যোগ দিতে বাঙালী অনধিকারী, এমন কি কন্‌ষ্টেবলের কাজেও অন্য প্রদেশ থেকে লোক আসে। যদি উপজীবিকার এই সব পথ বাঙালীর কাছে উন্মুক্ত থাকত তাহলে আজ যে হাজার হাজার যুবক চাকরীর মরীচিকার পেছনে বৃথাই ঘুরে মরছে তাদের একটা ব্যবস্থা হত; যাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে তারা তার সমাধান খুঁজে পেত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে চাক্‌রী না পাওয়ার দুঃখটা কয়েক বছর থেকে ভয়ানক রকম বেড়ে উঠেছে—তার কারণ, যারা চাকুরে রাখ্‌ত তারা খরচ কমাবার চেষ্টায় যেমন এদিকে লোক কমাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জঠর থেকে চাক্‌রী প্রত্যাশী যুবকের দলে দলে আসার বারণ নেই। যতদিন এই বিষম ব্যবস্থা থাকবে ততদিন এই শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যার বিপাক বেড়েই চল্‌বে। কেবল চাক্‌রীজীবিই নয়, অন্য উপজীবিকা যাঁদের তাঁরাও আজ কম বিপন্ন নন; ডাক্তার উকীল এঁরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, কিন্তু চাষীদের সমৃদ্ধির উপরেই তাঁদের প্রত্যাশা,—ক্রমাগত কয়েক বছর ধরে চাষের ফসলের দর না থাকায় আজ এই বিশিষ্ট মধ্য শ্রেণীর ভেতরেও বেকার-দশার দুর্য্যোগ ঘনিয়ে আস্‌ছে।

অনেকের এই মত যে কালেজী শিক্ষার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকই এই বেকার সমস্যার জন্য দায়ী, কিন্তু আমি একথা মানি না। সত্যকথা বল্‌তে কি আমাদের ছেলেরা হাতে-হাতিয়ারের শিক্ষাকে মোটেই বিরাগের চোখে দেখে না, তার প্রমাণ এদেশে যতগুলি টেক্‌নিকাল স্কুল-কলেজ আছে তার প্রত্যেকটিই জনাকীর্ণ তো বটেই, টেক্‌নিকাল বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যেতেও ছেলের কম্‌তি নেই। ছেলেরা যে দলে দলে সাধারণ আর্ট্‌স্ ও সায়ান্স কলেজে ভর্ত্তি হতে বাধ্য হয়, কালেজী শিক্ষার ঝোঁক নয়, টেক্‌নিকাল্ শিক্ষায়তনের অভাবই হচ্ছে তার কারণ।

এই সমস্যার কি প্রতিকার তার আলোচনার আগে এটা কতদূর ব্যাপক হয়েছে দেখা দরকার,—যে কোনো মাপকাঠির বিচারেই এ যে মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে বেকারের সংখ্যা যে কত তা জানার উপায় নেই, কেননা তার সরকারী বা বেসরকারী কোনো Statistical Record নেই। মোটামুটি হিসাব করা যেতে পারে যে গোটা ভারতবর্ষে কর্ম্মহীনের সংখ্যা প্রায় চার কোটি হবে এবং যারা অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের দৈন্যে পীড়িত এমন লোকের সংখ্যা হবে প্রায় দশ কোটির কাছাকাছি, খুব কম করে' ধরলেও। কিন্তু এই হিসাবকে পাকা বলে' ধরা যায় না, কেননা এই যদি অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে এদেশে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন করে' বেকার, যেটা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হবে। যাই হোক্ মোট বেকারের সংখ্যা জানার আমাদের উপায় নেই, কিন্তু এই সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনায়, যতদিন না সঠিক তালিকা পাওয়া যাচ্ছে ততদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত সাধারণ

স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ থেকে যতটা সাহায্য পাওয়া সম্ভব তার থেকে আমি মোটামুটি এই হিসেবে এসেছি যে সর্ব্বশ্রেণীর কর্ম্ম-হীনের সংখ্যা একত্র করলে তা চোদ্দ লক্ষ ষাট হাজার দাঁড়াবে। এবং এর সঙ্গে যোগ হবে যারা ফি বছর স্কুল কলেজের কবল থেকে চাকুরির বাজারে ছাড়া পাচ্ছে ; এ বিষয়ে কেবল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই বার্ষিকী হচ্ছে গড়-পড়তা এগারো হাজার ছশো ছাব্বিশ জন। এই ভাবে বিপুল বেকার বাহিনী ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

যাঁরা উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেছেন, যাঁরা আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যাঁরা এম্-এ ও এম্-এস্ সি—এমন সব ব্যক্তিরও স্বাভাবিক ঝোঁক সামান্য চাকুরির দিকে—যৎসামান্য বেতন, নামমাত্র দায়িত্ব,—তাঁদের যোগ্যতার অনুপাতে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর এমন পদ গ্রহণ করতেও তাঁদের আপত্তি নেই। আমার মতে, এইটাই হচ্ছে ট্রাজেডি। এই সব উচ্চতম যোগ্যতা অর্জ্জন করতে যে সময়, অর্থ ও শ্রম গেছে, অর্থনীতির ভাষায়, তা নিতান্তই অপব্যয় হয়েছে বলতে হবে। কেননা উচ্চতম যোগ্যতার লোক এই সব সামান্য কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ায়, যাদেরই সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি তারা এসব কাজ পাচ্ছে না—অথচ এসব কাজ চালাতে অল্প বিদ্যাবুদ্ধিই যথেষ্ট।

এইবারে প্রতিকারের আলোচনায় আসা যাক্। যে-সমস্যার শিকড় সকল শ্রেণীর মধ্যেই বিস্তৃত হয়েছে তাকে উন্মূলিত করতে হলে সকলেরই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমবেত চেষ্টার দরকার সেকথা বলাই বাহুল্য। তবু, এর সমাধানের অনেকখানি গভর্ণমেণ্টের ওপরে নির্ভর করে একথাও আমি বলতে চাই, যদিও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে তাঁরা কতটা এগুবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যে সব সার্ভিসে এ পর্য্যন্ত বাঙালীদের নেওয়া হয়না তা যদি বাঙালী যুবকদের কাছে অবারিত করে দেওয়া হয় তাহলে এখনি অনেক মুস্কিলের আসান ঘটে। সৈন্যবিভাগে বাঙালীর প্রবেশ নিষেধের মানে আমি বুঝতে পারি না—এর ভেতরে যুক্তি বা ন্যায় কোন্‌খানটায়? পাঞ্জাবীদের সৈন্যদলে যোগ দেবার বাধা নেই, এই কারণে পাঞ্জাবে বেকারের দল এত ভারী নয়। বাঙালী যুবক জীবনের অন্যান্য নানা বিভাগে যে যোগ্যতা এবং দক্ষতা দেখিয়েছে, সৈন্য বিভাগেই যে তার অন্যথা হবে একথা মনে করার কারণ নেই। তার পরে, যদি এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্ব্বজনীন করা হয় তার ফলে শিক্ষাদান ও শিক্ষাচালন-ব্যাপারে হাজার হাজার যুবক কাজ পেতে পারে। জনমঙ্গল ও হিতকর কর্ম্মের বিস্তারেও চাকুরীর একটা উদার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে। স্বাস্থ্য-সাধন, আরোগ্যবিধান, প্রসূতিসদন ও শিশু কল্যাণের ব্যবস্থা দেশব্যাপী করলে বহুসংখ্যক নরনারীর কাজ জোটে এবং সে কাজ হচ্ছে কাজের মত কাজ। কেননা এই সব কর্ম্ম-যোগেই দেশের স্বাস্থ্য, আয়ু এবং দৈহিক ক্ষমতা বাড়ে, যথার্থ কল্যাণের পথে জাতি এগোয় ; জীবনী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের জীবন বড় হয়ে ওঠে।

বেকার সমস্যা দূর করার ব্যাপারে কৃষিকর্ম্মের উন্নয়নের কথা আসে। চাষের উন্নতি না হলে এবং চাষীর দুঃখ দূর না হলে মধ্য শ্রেণীর দুঃখ ঘুচবার নয়। চাষবাসের কাজে সরকারী বা বেসরকারী ঋণদানের পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট গলদ আছে একথা সকলেই স্বীকার করবেন। এর সংস্কার হওয়া চাই—জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ও আরো ঢের বেশি কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার ; এই সূত্রে চাষীকে যেমন সাহায্য করা হবে, তেমনি অনেক শিক্ষিত যুবকের চাকুরির সংস্থান হবে। এই সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই, যদিও আমি জানি যে বাংলাদেশে চাষ-যোগ্য জমি বিনা আবাদে বড় বেশি পড়ে নেই, তবু এটা নিশ্চয়ই যে জায়গায় জায়গায় স্যার্ ড্যানিয়েল্ হ্যামিলটনের স্কীমকে অনায়াসেই কাজে খাটানো যেতে পারে।

অবশ্য, কেবল কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বিধানেই বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হতে পারে না—এবং এই হেতুই ব্যবসা-বাণিজ্য-বিস্তারের প্রয়োজন। কিন্তু একথা মনে রাখ্‌তে হবে যে প্রত্যেক ব্যবসায়িক প্রচেষ্টারই বনিয়াদ্ পাকা হওয়া দরকার—এবং এমন সাবধানে তার গোড়া বাঁধা চাই যেন বেকারের কর্ম্ম সংস্থান করাই তার লক্ষ্য হয়, কিন্তু সেই লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অসুবিধার সৃষ্টি না করে' বসে। কলকারখানা প্রতিষ্ঠার সহজাত প্রয়োজন তার ব্যবসায়-গত সফলতাকে উপেক্ষা

করে' শিল্প বাণিজ্যের প্রয়াস কখনই দাঁড়াতে পারে না। এই সত্যকে অবহেলা করে' যখনি আমরা হঠাৎ নতুন কোম্পানি ফেঁদে বসি তখন বিফলতাকেই আহ্বান করে' আনি এবং এর পরে যারা অনুরূপ প্রচেষ্টা করে আমাদের এই হঠকারিতার ফল তাদের ভুগ্‌তে হয়। এইভাবে আর্থিক প্রগতির অকালমৃত্যু ঘটে।

এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, বড় বড় বা মাঝারি গোছের কলকারখানা ফাঁদ্‌লে, যন্ত্র-শিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুটীরশিল্প কি দাঁড়াতে পারবে? তার ফলে, যারা ব্যক্তিগত শ্রম-শিল্পে জীবিকা উপায় করে তারা পরাস্ত হয়ে, বেকারের সংখ্যা কমা দূরে থাক্‌, উল্টে বাড়িয়ে দেবে না কি? এরকম কোনো দুর্ঘটনা অন্ততঃ বাঙ্‌লায় ঘট্‌বে, আমি তা মনে করি না। বহুদিন ধরে' বিপুল পরিমাণে বিদেশী সস্তা মাল আমদানির ধাক্কায় আমাদের কুটীর-শিল্পের যতদূর সর্ব্বনাশ হবার হয়ে গেছে এবং তার ফলে যতটা বেকার, দুর্দ্দশা ঘটা সম্ভব তার সীমান্তে আমরা পৌঁছেচি। কলকারখানার সুযোগে যে সব নূতন শিল্প প্রয়াস আমরা করতে চাই তার পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হবে; যে-সব স্বদেশী শিল্প আগে থেকে বাজারে চল্‌ছে তার সঙ্গে কাটাকাটি করা তার উদ্দেশ্য হবে না, তার লক্ষ্য হবে বিদেশী মালের কাট্‌তি কমানো। এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে যে স্থান আমরা খুইয়ে এসেচি তার পুনরুদ্ধার করতে পারব; এছাড়াও এমন কতকগুলি কারবার আছে—যেমন চিনির এবং কাগজের—যার প্রচেষ্টায় নষ্ট স্থান নয়, নতুন স্থান আমরা দখল করব, একেবারে নতুন সম্ভাবনার দ্বারে উত্তীর্ণ হব।

ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থ এবং সাফল্য অর্জ্জনের একটি বিশেষ সুযোগ বাঙালীর আছে, তা হচ্ছে পাট। সারা পৃথিবীতে পাটের চাহিদা এবং সেই পাট বাংলার একচেটে—সুতরাং এর যে বিস্ময়কর সম্ভাবনা আছে সেকথা বলাই বাহুল্য। পাট, এক হিসেবে, যাবতীয় ব্যবসার বাহন, কেননা পাট ব্যতিরেকে রপ্তানি-ব্যাপারই অসম্ভব; বাহনের অন্য পরিবর্ত্ত আবিষ্কারের জন্য চেষ্টার অন্ত না থাকলেও এ পর্য্যন্ত পাটের ফলই এক এবং অদ্বিতীয় রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বাজার একচেটে থাকা সত্ত্বেও পাটের ব্যাপারে লাভের গড় খুব সামান্যই বাঙালীর ভাগ্যে জোটে। কৃষকের 'টক' করে' রাখার ক্ষমতার অভাবে পাটের বাজারদর নেমে যায় এবং বিত্তশক্তিশালী মিলের দালাল সহজেই চাষীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে লাল হয়ে ওঠে। যাতে করে' পাটের পুরো ষোলো আনাই, যারা পাট জন্মায় তাদের মধ্যে যথাযথ বণ্টিত হতে পারে এবং মধ্যবর্ত্তীদের মাঝখান থেকে ভাগ বসানোর ফন্দিবাজী ব্যর্থ হয়, এমন একটা স্কীম কেন যে কাজে লাগানো হয় না তা আমি ভেবে পাই না। এমন একটা বিরাট স্কীমের পত্তনেই বহু বেকারের কর্ম্মসমস্যার সমাধান হবে এবং এর মধ্যে এমন কিছু অসম্ভব বা অসাধ্য নেই যার আশঙ্কায় আমরা অবিলম্বেই কাজ সুরু করতে দ্বিধা করতে পারি। এই পাটের সূত্রেই মধ্যবিত্ত ও চাষীর অন্ন সংস্থানের যোগ এবং এই যোগ-সূত্রেই বাংলার ভবিষ্যৎ।

এই প্রবন্ধের উপসংহারে একটি কথা বল্‌তে চাই, বল্‌তে গেলে সেইটেই হচ্ছে গোড়ার কথা। দেশেরই হোক্ বা নিজেরই হোক্, আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হলে সব আগে আমাদের শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাতে হবে। বাঁধা মাইনের কেরাণীগিরির ঝোঁক ছেড়ে দিয়ে শ্রমের মর্য্যাদাবোধ মনের মধ্যে জাগাতে হবে। এই বিষয়ে শিক্ষকদের অনেকখানি হাত আছে, তাঁরা নিজের ছাত্রদের স্বাধীনবৃত্তি ও স্বদেশীর ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারেন; —বেকার সমস্যার মূল কেবল বাইরেই নেই, মনের মধ্যেও খানিকটা আছে, তাকে উন্মূলিত করাও সমাধানের অনেক দূর। প্রত্যেক সহরে ছাত্ররাই প্রধান খরিদ্দার, তারা স্বদেশী কিন্‌তে বদ্ধপরিকর হলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হয়ে ওঠে এবং তাদেরও ভাবী জীবনে কাজের ভাবনা ভাব্‌তে হয় না।

বেকার সমস্যার সমাধান ভাব্‌তে গিয়ে আমি দেখেচি যে এর গলদ হচ্ছে গোড়ায়—আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে, আমাদের ধরণ-ধারণায়; এইজন্য বাঁচার মত বাঁচ্‌তে হলে দুনিয়ার পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে আমাদের আদর্শ ও দর্শন বদ্‌লে চল্‌তে হবে, জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন চোখে দেখ্‌তে হবে। বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকের পরিশ্রমের কাজে অনিচ্ছা, কেবল অনিচ্ছা নয়, তীব্র বিতৃষ্ণা আমি দেখেচি, দেখে

আমার দুঃখ হয়েছে। যুবক বন্ধুদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ, তাঁরা এই বদ্ধমূল সংস্কার দূর করুন। এ না হলে' এই দুর্গতি থেকে আমাদের আদৌ মুক্তি নেই।

এই কলকাতা সহরেই দেখি কত চীনে মুচি ও চীনে মিস্ত্রি, শিখ চালক ও উড়িয়া কারিগর, দুহাতে পয়সা উপায় করছে এবং এই সহরেই আমাদের যুবকেরা হা অন্ন হা অন্ন করে ফিরচে অথচ তাদের দৃষ্টি যে কেন এ দিকে পড়ে না আমি ভেবে পাই না। এ সব কাজে নিশ্চয়ই খুব লাভ আছে, তা নইলে সুদূর দেশ থেকে এরা এসে ভিড় জমাত না। তারপরে দারোয়ান ও পাহারোলার কাজ—যদিও এসব কাজে অসম্মানের কিছু নেই তবু যুক্তিহীন জনমত এর বিরুদ্ধে বলে' বাঙালী যুবকের রুচি নেই এদিকে। অনুকূল জনমত তৈরী হলে এসব কাজে যোগ দিতে বাঙালী ছেলের দ্বিধা থাক্‌বে না স্বীকার করি, কিন্তু তাদের যোগ দেওয়ার ফলেই অনুকূল জনমত তৈরি হতে পারে। এ ছাড়াও হাতে হাতিয়ারে কাজের কত পথ কত দিকে খোলা—যেমন ছাতা তৈরি, কাট্‌লারি, ফিটিংস্ ইত্যাদি, এসব পথেও বহু যুবকের কর্ম্মযোগ রয়েছে। সামান্য কারিগরি শিখে নিলেই এসব লাইনে যাওয়া যায় এবং অসংখ্য লোকের সুযোগ আছে এসব ক্ষেত্রে—তাছাড়া, খুব বেশি মূলধন লাগেনা এসব কাজে। কিন্তু এদিকে বাঙালী যুবকের প্রবৃত্তি আন্‌তে হলে, আগেই বলেছি, তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী আর মনোবৃত্তি বদ্‌লানো দরকার—বেকার বসে' থাকার চেয়ে যে কোনো শ্রমের কাজে জীবিকার্জ্জন শ্রেয়ঃ, এই ধারণাকে অঙ্গীকার করা চাই আগে।

নলিনীরঞ্জন সরকার



বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩

সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বিপ্রদাস সেইমাত্র নিজের লাইব্রেরি-ঘরে আসিয়া বসিয়াছে; সকালের ডাকে যে-সকল দলীল-পত্র বাড়ী হইতে আসিয়াছে সেগুলা দেখা প্রয়োজন, এমনি সময়ে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন,—হাঁরে বিপিন, তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস্।

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিসের মা?

—অক্ষয় বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে আমরা যে দেখে এলুম।

—মেয়েটি কি মন্দ?

দয়াময়ী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, না মন্দ বলিনে,—সচরাচর এমন মেয়ে চোখে পড়েনা সে সত্যি,—কিন্তু তাই বলে আমার বউমার সঙ্গে তার তুলনা করলি? বউমার কথা যাক্, কিন্তু রূপে বন্দনার কাছেই কি সে দাঁড়াতে পারে?

বিপ্রদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেচ। সে মৈত্রেয়ী নয়।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে। আমাদের সঙ্গে তার কত কথা হলো, কি যত্ন করেইনা সে বউমাদের খাওয়ালে—তারপরে কত বই কত লেখা-পড়ার কথাবার্ত্তা বন্দনার সঙ্গে তার হলো,—আর তুই বলিস আমরা আর কা'কে দেখে এসেচি!

বিপ্রদাস বলিল, বন্দনার সব প্রশ্নের সে হয়ত জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু মা লেখা-পড়ায় বন্দনা ইস্কুল-কলেজে কত বই পড়ে কতগুলো পরীক্ষা পাশ করেচে আর তার শুধু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোট ছেলের তফাৎ।

শুনিয়া দয়াময়ীর দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল,—চুপ কর্ বিপিন, চুপ কর্। দ্বিজু ও-ঘরে আছে শুনতে পেলে লজ্জায় বাড়ী ছেড়ে পালাবে। একটু থামিয়া বলিলেন, তোর মা মুখ্যু বলে কি এতই

মুখ্যু যে কলেজের পাশ করাকেই চতুর্ব্বর্গ্য ভাবে যে ? তা নয় রে, বরঞ্চ ছোট্ট ছোট্ট কথায় মিষ্টি করে সে বন্দনার সকল কথারই জবাব দিয়েছে। গাড়ীতে আসতে মেয়েটির কত প্রশংসাই বন্দনা করলে। কিন্তু আমি বলি আমাদের গেরস্ত-ঘরে দরকার কি বাপু অত লেখা-পড়ায় ? আমার একটি বউ যেমন হয়েছে আর একটি তেমনি হলেই আমার চলে যাবে। নইলে বিদ্যের গুমোরে সে যে মনে-মনে গুরুজনদের তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করবে সে হবেনা।

বিপ্রদাস বুঝিল জেরার জবাবটা মায়ের এলো-মেলো হইয়া যাইতেছে, হাসিয়া কহিল, সে ভয় কোরোনা মা। বিদ্যে যাদের কম গুমোর হয় তাদেরই বেশি। ও বাপের কাছে যদি সত্যি-সত্যিই কিছু শিখে থাকে আচার-আচরণে সকলের নীচু হয়েই থাকবে তুমি দেখে নিও।

যুক্তিটা মা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, এ কথা তোর সত্যি, কিন্তু আগে থেকে জানবো কি করে বল্‌ ? তা'ছাড়া আমাদের পাড়া-গাঁয়ে বিদ্যের কম-বেশি কেউ যাচাই করতে আসেনা, কিন্তু বউ দেখতে এসে সকলে যে নাক তুলে বলবে বুড়ো-মাগীর কি চোখ ছিলনা যে অমন বৌয়ের পাশে এই বউ এনে দাঁড় করালে। এ আমার সইবেনা বাবা।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু অক্ষয় বাবুকে ত একটা জবাব দিতে হবে মা। সেদিন তাঁকে ভরসা দিয়েছিলুম আমার মায়ের বোধ হয় অমত হবেনা।

শুনিয়া দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও কথা না বললেই ভালো হতো বিপিন। তা সে যাই হোক, বৌমার কি ইচ্ছে আগে শুনি তারপরে তাঁকে বললেই হবে।

বিপ্রদাস কহিল, অক্ষয়বাবু আমাদের নিতান্ত পর নয়। এতদিন পরিচয় ছিলনা বলেই তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আত্মীয়তার জন্যেও বলিনে, কিন্তু তোমার আর এক ছেলের যখন বিয়ে দিয়েছিলে নিজের ইচ্ছেতেই দিয়েছিলে অন্য কাউকে জিজ্ঞেসা করতে যাওনি। আর এর বেলাতেই কি যত মত-জানাজানির দরকার হলো মা ?

তর্কে হারিয়া মা হাসিমুখে বলিলেন, কিন্তু এখন যে বুড়ো হয়েছি বাবা, আর কত কাল বাঁচবো বল্‌তো। কিন্তু চিরকাল যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মত না নিয়ে কি বিয়ে দিতে পারি ? না না, দুদিন আমাদের তুই ভাবতে সময় দে। এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া দয়াময়ী নিজের ঘরের দিকে না গিয়া বেহাইয়ের ঘরের উদ্দেশে চলিলেন। এই কয় দিনের ঘনিষ্ঠতায় বন্দনার পিতার কাছে তাঁহার অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল,—প্রায়ই নিজে আসিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেন— এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আহ্নিকে বসিলে শীঘ্র উঠিতে পারিবেননা ভাবিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন,—কেমন আছেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিলনা। ঘরের অপর প্রান্তে বসিয়া একটি সুদর্শন যুবক বন্দনার সহিত মৃদুকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, নিখুঁত সাহেবি-পোষাকের এই অপরিচিত লোকটির সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় দয়াময়ী সলজ্জে পিছাইয়া যাইবার উপক্রমেই রায়-সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কোথায় পালাচ্চেন বেয়ান, ও যে আমাদের সুধীর। ওকে লজ্জা কিসের ? ওতো বিপ্রদাস দ্বিজদাসের মতোই আপনার ছেলে।

আমার অসুখের খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে দেখতে এসেচে। সুধীর, ইনি বন্দনার দিদির শাশুড়ী, বিপ্রদাসের মা, এঁকে প্রণাম করো।

সুধীরের প্রণাম করার হয়ত অভ্যাস নাই, ও-পোষাকে করাও কঠিন, সে কাছে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া কোনমতে আদেশ পালন করিল।

এই ছেলেটির সহিত দয়াময়ীর সন্তান-সম্বন্ধ যে কি সূত্রে হইল ইহাই বুঝাইবার জন্য রায় সাহেব বলিতে লাগিলেন, ওর বাপ আর আমি একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলুম বেয়ান, তখন থেকেই আমরা পরম বন্ধু। সুধীর নিজেও বিলেতে অনেকগুলো পাশ করে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগে ভালো চাকরি পেয়েছে। কথা আছে ওদের বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলেতে যাবে, সেখানে ইচ্ছে হয় বন্দনা কলেজে ভর্ত্তি হবে, না হয় শুধু দেশ দেখেই দুজনে ফিরে আসবে। ছাখো সুধীর, তোমরা যদি এই আগষ্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পারো আমিও না হয় মাস তিনেকের ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসি। কি বলিস্‌রে বুড়ি,—ভালো হয়না?

বন্দনা সেখান হইতেই আস্তে আস্তে বলিল, কেন হবেনা বাবা, তুমি সঙ্গে থাকলে ত ভালোই হয়।

রায় সাহেব উৎসাহ ভরে কহিলেন, তাতে আরও একটা সুবিধে এই হবে যে তোদের বিয়ের পরেও মাস খানেক সময় পাওয়া যাবে, কোন রকম তাড়া-হুড়ো করতে হবেনা। বুঝলেনা সুধীর, সুবিধেটা?

ইহাতে সুধীর ও বন্দনা উভয়েই মাথা নাড়িয়া সায় দিল। দয়াময়ী এতক্ষণে বুঝিলেন এই ছেলেটি রায়-সাহেবের ভাবী জামাতা। অতএব, তাঁহারও পুত্র-স্থানীয়। বুকের ভিতরটায় হঠাৎ একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বিপ্রদাসের মা, বলরামপুরের বহুখ্যাত মুখুযো-পরিবারের কর্ত্রী; মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধীর, তোমাদের বাড়ী কোথায় বাবা?

সুধীর কহিল, এখন বোম্বায়ে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেচি আগে ছিল দুর্গাপুরে, কিন্তু বর্ত্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছু নেই।

—কোন্ দুর্গাপুর সুধীর? বর্দ্ধমান জেলার?

সুধীর বলিল, হাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেচি। কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট্ট গ্রাম, এখন নাকি সেদেশ ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাবার নামটি কি?

সুধীর বলিল, আমার বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসু।

দয়াময়ী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামহর নাম কি ছিল হরিহর বসু?

প্রশ্ন শুনিয়া রায়-সাহেব পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনি কি ওদের জানেন নাকি?

—হাঁ, জানি। দুর্গাপুরে আমার মামার বাড়ী। ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছি বলে ও গ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি। ওঁদের বাড়ী ছিল আমাদের পাড়ায়। কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই সুধীর, আমায় আহ্নিকের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু না খেয়েও যেন তুমি চলে যেওনা,—আমি এখনি সমস্ত ঠিক করে দিতে বলচি।

সুধীর সহাস্যে কহিল, তার আর বাকী নেই,—বিপ্রদাস বাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন।

দিয়েছে? আচ্ছা, তাহলে এখন আমি আসি, এই বলিয়া দয়াময়ী বাহির হইয়া গেলেন। বন্দনার প্রতি একবারও চাহিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না।

পরদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া বিপ্রদাস প্রতিদিনের অভ্যাস মতো মায়ের পদধূলির জন্য আজও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তাঁহার জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা হইতেছে।

—এ কি মা, কোথাও যাবে না কি?

দয়াময়ী বলিলেন, তোকে খুঁজে পেলুম না তাই দত্তমশায়কে জিজ্ঞেসা করে জানলুম সাড়ে নটার গাড়ীতে বার হতে পারলে সন্ধ্যার আগেই বাড়ী পৌঁছতে পারবো। কিন্তু পরশু তোর মোকদ্দমার দিন, তুই ত সঙ্গে যেতে পারবিনে, দ্বিজুকে বলে দে ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল মায়ের দুই চোখ রাঙা, মুখ শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় সারারাত্রি তাঁহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেছে।

বিপ্রদাস সভয়ে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েচে মা?

মা বলিলেন, দুদিনের জন্যে এসে আট দশ দিন কেটে গেল, ওদিকে ঠাকুর-সেবার কি হচ্চে জানিনে, পাঁচ-ছ'টি গরুর প্রসব হবার সময় হয়েছে দেখে এসেচি তাদের কি হলো খবর পাইনি, বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্চে,—আর ত দেরী করা চলেনা বিপিন।

এ সকল ব্যাপার দয়াময়ীর কাছে তুচ্ছ নয় সত্য, কিন্তু আসল কারণটা যে তিনি প্রকাশ করিলেন না বিপ্রদাস তাহা বুঝিয়াই বলিল, তবু কি আজই না গেলে নয় মা?

—না বাবা, তুই আমাকে বাধা দিস্‌নে। দ্বিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, নাহয় আর কেউ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

—তাই হবে মা, বলিয়া বিপ্রদাস পায়ের ধূলা লইয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল সতী অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কাছে বসিয়া অন্নদা সন্দেশের হাঁড়ি, ফল-মূল ও ছেলের দুধের ঘটি গুছাইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে।

সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল, অন্নদা দিদি, ব্যাপার কি জানো?

—না দাদা, কিছুই জানিনে। সকালেই মা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন ছেলে-বৌয়ের গাড়ীতে খাবার কষ্ট না হয়, তিনি ন'টার ট্রেনে বাড়ী যাবেন।

বিপ্রদাস সতীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেও মাথা নাড়িয়া জানাইল সে কিছুই জানেনা।

শুনিয়া বিপ্রদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্নদা না জানিতেও পারে কিন্তু বৌ জানে না শাশুড়ীর কথা এমন বিস্ময় কি আছে? কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে নীচে চলিয়া গেল, উদ্বেগের সহিত ইহাই

ভাবিতে ভাবিতে গেল এ সকল মায়ের একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি জানি কোন্ গভীর দুঃখ তাঁহার এই বিপর্য্যস্ত আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল যাহা কাহারো কাছেই তিনি প্রকাশ করিলেন না।

দয়াময়ী যাত্রা করিয়া যখন নীচে নামিলেন তখনও ট্রেনের অনেক সময় বাকি, কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার বিলম্ব সহে না, কোন মতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত, আর একটায় জিনিস-পত্র চাপাইয়া চাকরেরা উঠিয়া বসিয়াছে, ব্যাগ হাতে বিপ্রদাসকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দ্বিজু কই?

বিপ্রদাস কহিল, সে যাবেনা মা, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবো।

—কেন, যেতে রাজি হলোনা বুঝি?

বিপ্রদাস সবিনয়ে কহিল, তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে সে সত্যিই কবে অবাধ্য হয়েছে বলো ত?

—তবে হলো কি? গেলনা কেন?

আমিই যেতে বলিনি মা, এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, যে জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েচো তোমার সেই ঠাকুর, তোমার গরুর পাল,—তাদের সত্যিই কি অবস্থা ঘট্‌লো নিজের চোখে দেখবো বলেই সঙ্গে যাচ্চি। অন্য কিছুই নয় মা।

আর কোন সময়ে দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া হয়ত কত কথাই ছেলেকে বলিতেন কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নদা বন্দনাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে সেইমাত্র স্নান করিয়া পিতার ঘরে যাইতেছিল, অন্নদার আহ্বানে দ্রুতপদে নীচে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দয়াময়ী কহিলেন, আজ আমরা বাড়ী যাচ্চি বন্দনা।

—বাড়ী? সেখানে কি হয়েছে মা?

—না, হয়নি কিছু। কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে দশ-বারো দিন দেরি হয়ে গেল আর বাড়ী ছেড়ে থাকা চলেনা। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলোনা—তখনো তিনি ওঠেননি—আমার ত্রুটি যেন বেয়াই মার্জ্জনা করেন। দ্বিজু রইলো, অন্নদা রইলো, তুমিও দেখো যেন তাঁর অযত্ন না হয়। এসো বৌমা, আর দেরি কোরোনা, এই বলিয়া তিনি গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন।

সতী পিছনে ছিল, সে কাছে আসিয়া বোনের হাত ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল,—আমরা চল্লুম ভাই —আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইলনা, চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে তাহার শাশুড়ীর পাশে গিয়া বসিল।

বন্দনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া,—যেন পাথরের মূর্ত্তি,—অকস্মাৎ এ কি হইল!

বাসু আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যাচ্চি মাসিমা,—তখনি তাহার চৈতন্য হইল তাহারো এখনো কাহাকেও প্রণাম করা হয় নাই। তাড়াতাড়ি বাসুর কপালে একটা চুমা দিয়া সে গাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দয়াময়ীর ও মেজদির পায়ের ধূলা লইল। সতী নীরবে

তাহার চিবুক স্পর্শ করিল, মা অস্ফুটে আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু কি বলিলেন বুঝা গেলনা। মোটর ছাড়িয়া দিল।

অন্নদা কহিল, চলো দিদি, আমরা ওপরে যাই।

তাহার স্নেহের কণ্ঠস্বরে বন্দনা লজ্জা পাইল, ক্ষণকালের বিহ্বলতা সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি যাও অন্নদা, আমি রান্না-ঘরের কাজগুলো সেরে নিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

কাল বিকালেও কথা হইয়াছিল রায়সাহেব বোম্বাই রওনা হইলে সকলে একত্রে বলরামপুর যাত্রা করিবেন। কিন্তু আজ তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নয়, সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিনের মৌখিক আহ্বান পর্য্যন্ত নয়।

ঘণ্টাখানেক পরে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বন্দনা পিতার ঘরে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, বেহানরা চলে গেলেন, সকালে উঠতে পারিনি মা, ছিছি কি না-জানি আমাকে তাঁরা মনে করে গেলেন!

বন্দনা বলিল, বাবা আমরা কবে বোম্বায়ে যাবো?

বাবা বলিলেন, তোমার যে বলরামপুরে যাবার কথা ছিল মা, গেলেনা কেন?

মেয়ে বলিল, তোমাকে একলা ফেলে রেখে কি করে যাবো বাবা, তুমি যে আজও ভালো হতে পারোনি।

—ভালো ত হয়েছি মা। বেহানকে কথা দেওয়া হয়েছে তুমি যাবে, না হয়, যাবার পথে আমি তোমাকে বলরামপুরে নাবিয়ে দিয়ে যাবে। কি বলো মা?

—না বাবা সে হবেনা। তোমাকে এতটা পথ একলা যেতে আমি দিতে পারবো না।

কন্যার কথা শুনিয়া পিতা পুলকিত চিত্তে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দূর্ বুড়ী। দেখা হলে বেয়ান তোরে ঠাট্টা করে বলবে বুড়ো বাপটাকে মেয়েটা চোখের আড়াল করতে পারেনা। ছি—ছি—

তুমি খাও বাবা, আমি আসচি, এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল।

১৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়, বন্দনা আসিয়া দ্বিজদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, একবার আসতে পারি দ্বিজবাবু? ভিতর হইতে সাড়া আসিল, পারো। একবার নয়, শত সহস্র অসংখ্যবার পারো।

বন্দনা দরজার পাল্লা দুটা শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত টেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘরের সব কয়টা আলো জ্বালিয়া দিয়া খোলা দরজার সম্মুখে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

দ্বিজদাস হাতের বইটা একপাশে উপুড় করিয়া রাখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হুকুম?

—কি পড়ছিলেন?

—ভূতের গল্প।

—অতিথি বড়ো না ভূতের গল্প বড়ো?

ভূতের গল্প বড়ো।

বন্দনা বিরক্ত হইয়া বলিল, সকল সময়েই তামাসা ভাল নয়। আমরা যে আপনার বাড়ীতে অতিথি এ জ্ঞান আপনার আছে ?

দ্বিজদাস কহিল, তোমরা যে দাদার বাড়ীতে অতিথি এ জ্ঞান আমার পূর্ণ মাত্রায় আছে। এবং বাড়ী-আলা আদেশ দিয়ে গেছেন তোমাদের যত্নের যেন-না ত্রুটি হয়। ত্রুটি নিশ্চয় হতোনা কিন্তু এই ভূতের গল্পটায় আত্মবিস্মৃত হয়ে কর্ত্তব্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটেছে। অতএব অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

—সমস্ত দিনটা আমার কত কষ্টে কেটেছে আপনি জানেন ?

নিশ্চয় জানি।

—নিশ্চয় জানেন ? অথচ, প্রতীকারের কি কোন উপায় করেছেন ?

দ্বিজদাস কহিল, না করার প্রথম কারণ পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি। দ্বিতীয় কারণ, এ প্রতীকার আমার সাধ্যাতীত।

—কেন ?

—সে আমার বলা উচিত নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ী চলে গেলেন কেন ?

—মেজদি গেলেন প্রবল পরাক্রান্ত শাশুড়ীর হুকুম বলে। নইলে তিনি নির্দ্দোষ।

—কিন্তু মা গেলেন কেন ?

—মা-ই জানেন।

—আপনি জানেন না ?

দ্বিজদাস কহিল, একেবারেই জানিনে বললে মিথ্যে বলা হবে। কারণ, বৌদি কিঞ্চিৎ অনুমান করেছেন এবং আমি তার যৎসামান্য একটু অংশ লাভ করেচি।

বন্দনা বলিল, সেই যৎসামান্য অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তবেই বিপদে ফেল্‌লে বন্দনা। এ কথা কি তোমার না শুনলেই চলেনা ?

—না সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

—না-ই বা শুনলে।

বন্দনা বলিল, দেখুন দ্বিজুবাবু, আমাদের সর্ত্ত হয়েছিল এ বাড়ীতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনবো এবং আপনিও আমার সমস্ত কথা শুনবেন। আপনি জানেন আপনার একটি আদেশও আমি লঙ্ঘন করিনি ? বলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল আর একদিকে চাহিয়া তাহা কোনমতে সামলাইয়া লইল।

দ্বিজদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার তাই বলার আমার ইচ্ছে ছিলনা। মা তোমার পরেই রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ মা'র

নিজের। বৌদিদিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সব চেয়ে নিরপরাধ বেচারা দ্বিজদাস নিজে।

বন্দনা অধীর হইয়া উঠিল,—বলুন না শীগ্‌গীর চক্রান্তটা কিসের?

দ্বিজদাস বলিল, চক্রান্ত শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নয়। কিন্তু মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলঙ্কা ভাগ। কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যে পড়লো যখন শূন্য তখন সমস্ত সংসারের উপর গেলেন চটে। চটাও ঠিক নয়, অনেকটা আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ অভিমান।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, জানো' নিশ্চয়ই যে একদিন তোমার প্রতি ছিল তাঁর যত বড় বিতৃষ্ণা আর এক দিন জন্মালো তাঁর তেমনি গভীর স্নেহ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাজে-কর্ম্মে দয়া-মায়ায় একা বৌদি ছাড়া মা'র কাছে কেউ তোমার আর জোড়া রইলো না। তোমাকে ম্লেচ্ছ বলে সাধ্য কার? তখনি মা কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে বসতেন এতবড় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-তনয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হাতড়ালে খুঁজে মিলবে না। এই বলিয়া দ্বিজদাস নিজের রসিকতার আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হাসি বন্দনার অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও সে নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

দ্বিজদাস বলিল, হাস্‌চো কি বন্দনা, আসলে সেইতো হয়েছে সকলের বিপদ।

বন্দনা কহিল, এতে বিপদ হবে কিসের জন্যে?

দ্বিজদাস বলিল, তবে অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করো। দয়াময়ীর দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের প্রতি যেমন অগাধ আশা ও ভরসা, কনিষ্ঠের প্রতি তেমনি অপরিসীম সন্দেহ ও ভয়। তাঁর ধারণা অপদার্থতায় পৃথিবীতে কনিষ্ঠের সমকক্ষ নেই। কিন্তু মা তো? গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না,—অতএব মনে মনে পুত্রের সদ্‌গতির উপায় নির্দ্ধারণ করলেন তোমার স্কন্ধে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সংসার মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, অকস্মাৎ কাল সন্ধ্যায় আবিষ্কৃত হলো বন্দনার স্কন্ধদেশে স্থান নাই ছোট সে তরী—অর্থাৎ কিনা—দয়াময়ীর সকল সঙ্কল্প সকল স্বপ্নজাল ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে কে এক সুধীরচন্দ্র তথায় পূর্ব্বাহ্লেই সমারূঢ়, তাঁকে নড়ায় সাধ্য কার! এই বলিয়া সে আর এক দফা উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এরকম বিকট হাসির কারণটা আপনার কি? মা অপদস্থ হয়েছেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন তারই আনন্দোচ্ছ্বাস? কোনটা?

দ্বিজদাস স্মিতমুখে বলিল, যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধা নেই যে অকস্মাৎ পদস্খলনে মা-জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্ত্তিতে দর্শক হিসেবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ-রস উপভোগ করেচি। তবে, ক্ষতি তাঁর বিশেষ হবেনা যদি এর থেকে তিনি অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে সংসারে বুদ্ধি পদার্থটা তাঁরই নিজস্ব নয়, ওতে অপরেরও দাবী থাকতে পারে। কারণ, আমাকে নাহোক দাদাকেও মা যদি তাঁর ষড়যন্ত্রের আভাস দিতেন, আর কিছু না ঘটুক, এ কর্ম্মভোগ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি

দিতে পারা যেতো। দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম তুমি অন্যের বাক্‌দত্তা বধূ, পরস্পর প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অতএব এ ব্যবস্থার অন্যথা ঘটা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কার কাছে কবে শুনলেন?

দ্বিজদাস বলিল, তোমার বাবার কাছে। এখানে আমাদের আসার দিনই রায়-সাহেব তোমাদের ভালোবাসা, বাক্‌দান ও আশু বিবাহের মনোজ্ঞ আলোচনায় আমাদের দু'ভায়ের দুজোড়া কানেই সুধা বর্ষণ করেছিলেন। না না, রাগ কোরোনা বন্দনা, শাদা-সিধে নিরীহ মানুষ, চিত্তের প্রফুল্লতায় সুসংবাদ আত্মীয়-জনের কাছে চেপে রাখবার প্রয়োজনই মনে করেননি।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এই জন্যেই কি মুখুয্যে মশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে ঠিক জানিনে। কারণ দাদার সমস্ত মনের কথা দেবতাদেরও অজ্ঞাত। শুধু এটুকু জানি তাঁর মতে মৈত্রেয়ী দেবী সর্ব্বগুণান্বিতা কন্যা। বলরামপুরের ধনী ও মহামাননীয় মুখুয্যে-পরিবারের অযোগ্যা নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি?

দ্বিজদাস বলিল, এ বাড়ীতে ও প্রশ্ন অবৈধ। আমি তৃতীয় পক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মা ও দাদা যে-কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন তাঁরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকবো। এই এ-গৃহের সনাতন রীতি, এর পরিবর্ত্তন নেই।

তাহার বলার ভঙ্গীতে বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্ত্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন?

দ্বিজদাস ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, হায় বন্দনা, সে আশা বৃথা! দুষ্ট রাহু পূর্ণ চন্দ্র ভক্ষণ করেছে, কোথাকার সুধীরচন্দ্র লাফ মেরে এসে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণলঙ্কা চোখের সম্মুখে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো কল্যাণি, অভাগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তাহার নাটকীয় উক্তিতে বন্দনা আর একবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, সোনার লঙ্কার সবটা তো পোড়েনি দ্বিজুবাবু, অশোক কাননটা রক্ষে পেয়েছিল। হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আশ্বাস বৃথা। শ্রীরামচন্দ্রের বরাতের জোর ছিল কিন্তু আমি সর্ব্ববাদিসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,—কিছুই অবশিষ্ট নেই।

—না যায়নি।

—কি যায়নি?

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য বলে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সুধীরের নেই। সংসারে কারও নেই, মায়েরও না, আপনার দাদারও না।

তাহার শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বরে দ্বিজদাস অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—চুপ করে রইলেন যে? আমার মনের কথা আপনি টের পাননি আজ কি এই ছলনা করতে চান?

—না, ছলনা করতে চাইনে বন্দনা, অনুমান করেছিলুম তা মানি। কিন্তু সন্দেহও ছিল প্রচুর।

বন্দনা কহিল, সে সন্দেহ যেন আজ থেকে যায়। ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সন্দেহ আমার ত ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকেই না। বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এলুম, একলা উপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে বিদায় দিলেন, মাত্র একটি বেলার পরিচয়, তবু কি অর্থ তার আমার কাছে এতটুকু অস্পষ্ট ছিল ভাবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বন্দনা বলিল, গেল সন্দেহ?

দ্বিজদাস বলিল, বোধ হয় আর একটু তাড়া দিলেই যাবে। কিন্তু ভাবচি, আমার সংশয় মিটোতে এই পদ্ধতিই কি চিরকাল চালাবে?

বন্দনা বলিল, চিরকালের ব্যবস্থা আগে ত আসুক। কিন্তু সমস্ত জেনেও যে তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে তাকে বোঝাবার আমার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু সে আমি নয়, মা। তাঁকে বোঝাবে কি কোরে?

বন্দনা বলিল, মা আপনি বুঝবেন। আমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালোবাসেন। আজ হঠাৎ যত চঞ্চল হয়েই চলে যান, যা জেনে গেছেন সে যে সত্যি নয় এ কথা মাকেই যদি না বোঝাতে পারি আমি কিসের আশা করি বলুন ত? আমার কোন ভাবনা নেই দ্বিজুবাবু, একদিন-না-একদিন সমস্ত কথা তাঁকে আমি বোঝাবই বোঝাবো। বলিতে গিয়া শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলা ভাঙিয়া দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সত্য ও মিথ্যার দ্বিধা দ্বিজদাসের ঘুচিয়াও ঘুচিতেছিল না, কিন্তু এই চোখের জল ও কণ্ঠস্বরের নিগূঢ় পরিবর্ত্তনে তাহার সকল সংশয় মুছিল,—এ তো শুধুই পরিহাস নয়! বিস্ময় ও ব্যথায় আলোড়িত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, এ কি বন্দনা, তুমি কাঁদচো যে?

প্রত্যুত্তরে বন্দনা কথা কহিলনা, কেবল অশ্রু মুছিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজদাস নিজেও বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সুধীর ত তোমার কাছে কোনও দোষ করেনি বন্দনা।

বন্দনা মুখ ফিরিয়া চাহিলনা, শুধু বলিল, দোষের বিচার কিসের জন্যে বলুন ত? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসেচি?

দ্বিজদাস এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইলনা, বুঝিল প্রশ্নটা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের,—অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাসে, আচরণে মুখুয্যেদের সঙ্গে তোমার কোথাও মিল হবেনা। তবে কিসের জন্যে এঁদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্যে তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা? আমার জন্যে? আজ হয়ত বুঝবেনা, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে তখন পরিতাপের অবধি থাকবেনা। আমাকে তুমি কি ভাবে বুঝেচ জানিনে কিন্তু বৌদি,

মা, দাদা, আমাদের ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এঁদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে ত তুমি কোনদিনই পাবেনা। দীর্ঘকাল এ কি তোমার সইবে?

বন্দনা বলিল, না সইলে মানুষের মরার পথ ত চিরকাল খোলা থাকে দ্বিজুবাবু, কোন কয়েদখানাই তা বন্ধ করতে পারেনা। কিন্তু আমাকেও আপনি কি বুঝেছেন জানিনে, কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাশুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-সমাজ এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে আমি একদিনও পেতে চাইনে। তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়েই যেন আমার থাকেন।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ সব ধারণা ত তোমাদের নয়, এ তুমি কার কাছে শিখলে বন্দনা?

বন্দনা কহিল, কেউ আমাকে শেখায়নি দ্বিজুবাবু, কিন্তু মার কাছে থেকে, মুখুয্যে মশাইকে দেখে এ সব আমার আপনিই মনে হয়েছে। এ বাড়ীতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তারপরে মুখুয্যে মশাই, তারপরে দিদি, তারপরে আপনি, এখানে অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ বাড়ীতে যায়গা যদি কখনো পাই এঁদের ছোট হয়েই পাবো, কিন্তু সে আমার একটুও অসঙ্গত মনে হবেনা।

শুনিয়া দ্বিজদাসের যেমন ভালো লাগিল তেমনি মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। কিন্তু বন্দনার মনের কথা এমন করিয়া জানিয়া লওয়া অন্যায়,—এ আলোচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া নিজেকে সে কঠিন করিয়া বলিল, কিন্তু মাকে আমাদের এই সব কথা জানিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি তোমাকে মেয়ের মতো ভালোবাসেন এ আমি জানি, তাই তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল তুমি হবে এ বাড়ীর ছোট বৌ, তোমাদের দুই বোনের হাতে তাঁর দুই ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবেন তিনি কৈলাসে, ফিরতে যদি আর না পারেন, সেই দুর্গম পথেই যদি আসে পরকালের ডাক, এই কথাটা মনে নিয়ে তখন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যাত্রা করতে পারবেন তাঁর বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব হস্তান্তরে আর কোন দিকে ফাঁক নেই। কিন্তু সে হবার আর যো নেই, তাঁর মতে বাক্‌দান মানেই সম্প্রদান। ভালোবেসে যাকে সম্মতি দিয়েছো সে-ই তোমার স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি বলে তাঁকে ত্যাগ করতেও তুমি পারো, কিন্তু সেই শূন্য আসন জুড়ে দয়াময়ীর ছেলে গিয়ে বসতে পারবেনা।

শুনিয়া বেদনায় বন্দনার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, মা কি এই সব বলে গেছেন

দ্বিজদাস কহিল, অন্ততঃ, বলা অসম্ভব মনে করিনে বন্দনা। বৌদি বলছিলেন মায়ের সব চেয়ে বেজেছে এই ব্যথাটা যে সুধীর আমাদের জাত নয়,—আসলে তোমরা জাত মানোনা। এ এতবড় বিভেদ যে কিছু দিয়েই এ ফাঁক ভরানো যাবেনা।

—আপনিও কি এই কথা বলেন?

—আমি ত তৃতীয় পক্ষ বন্দনা, আমার বলায় কি আসে যায়।

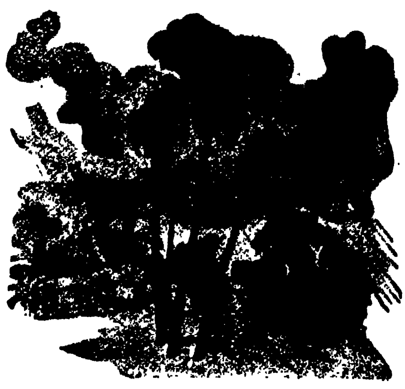
রায় সাহেবের আহারের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার পূর্ব্বে কহিল, বাবার ছুটি শেষ হয়েছে কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, এ'ও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেওনা। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা জানাবো, লজ্জা করবোনা। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি আর রইল আমাদের বন্দেমাতরমের মন্ত্র।

বন্দনা ইহার কোন উত্তর দিলনা, নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র



রবীন্দ্রনাথের মুক্তিসাধন

শ্রীযোগেশচন্দ্র মিশ্র বি-এ

মায়াবাদীরা এই সংসারকে ঘোর মায়াময় বলিয়া মনে করেন। ছায়া যেমন কায়া নয়, এই বিশ্বসংসারও তেমনি সত্য নয়,—সত্যের ছায়া মাত্র। ছায়ার মতই ইহা অসত্য ও অবাস্তব (unreal and unsubstantial)। অন্ধকারে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তেমনি মায়ার প্রভাবে মিথ্যাজগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। জলে প্রতিবিম্বিত কাল্পনিক মাংসখণ্ডের লোভে কুকুর যেমন প্রাণ হারাইয়াছিল, তেমনি এই অবাস্তব জগতের অসত্য বস্তুর পিছনে ছুটিয়া জীব প্রাণ হারায়। বালুময় মরুভূমিতে মরীচিকা যেমন মিথ্যা জলাশয়ের লোভ দেখাইয়া পিপাসার্ত্ত পথিকের জীবন নাশ করে, তেমনি এই সংসার-মরুতে মায়া-মরীচিকা সত্যের রূপ ধরিয়া জীবকে মিথ্যার মৃত্যু-সঙ্কুল পথে টানিয়া আনে। শিশু-বিনির্ম্মিত খেলাঘর যেমন তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ (Phenomenal world) মায়াবাদীর কাছে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর।

পড়িয়ে ভব-সাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে মা শঙ্করী॥

—এই সংসারে মায়া-ঝড় ও মোহ-তুফানে নৌকাডুবির ভয় আছে বলিয়াই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মুক্তিকামী জীবকে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে কত রকমের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন,—সংসার অনিত্য, সুতরাং অনিত্যবস্তু পরিহার করিয়া নিত্য বস্তুর সন্ধানে বাহির হওয়াই মুক্তিকামী জীবের কর্ত্তব্য; বিশ্বসংসারের সুখ অত্যল্প ও ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর ক্ষুদ্র সুখের জন্য শাশ্বত ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত থাকা মূর্খতা; এই অশান্তি-বেদনা-ভরা সংসার হইতে দূরে সরিয়া আসিতে পারিলেই জীব চির-সুখময় চিরানন্দময় অমৃত-লোকের সন্ধান পায়; এই মায়ার সংসারে মাতাপিতা স্ত্রী পুত্র পরিজন, কেহ কাহার নয়, সুতরাং ইহাদের চিন্তা ত্যাগ করিয়া সদাসর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করাই মুক্তিপ্রার্থী জীবের কর্ত্তব্য।—

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ,
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-সাধনা এই মায়া-বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। এই প্রতিবাদের সুর তাঁহার একাধিক কবিতায় বিচিত্র ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন, এই জগৎ মিথ্যা নয়,—ইহার কিছুই মিথ্যা নয়। ইহার ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত সত্য ও সার্থক। এই অনন্ত অসীম বিশ্বের মহামেলাকে, ভগবানের সেরা সৃষ্টি মানুষের এই বৈচিত্র্য-পূর্ণ চির-রহস্যময় সংসার-লীলাকে যাহারা নিরর্থক ছেলেখেলা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, কবি তাহাদিগকে বিদ্রূপের সুরে বলিয়াছেন,—

লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা।

যে বিধাতার জগৎকে স্নেহ-সুকোমল মাতৃক্রোড় বিবেচনা করিয়া যেখানে অগণ্য পশু পক্ষী প্রাণী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ (joy of living) উপভোগ করিতেছে, সেই জগৎকে তিনি মিথ্যা বলিবেন কেমন করিয়া? যে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-ভরা, গ্রহ-তারাময় অনন্ত সৃষ্টি বিধাতার বিচিত্র বিধানের অপূর্ব্ব মহিমা প্রচার করিতেছে, সেই সৃষ্টি কি উপেক্ষার বিষয়? যাহারা বলেন, মা যেমন খেলনা দিয়া শিশুকে ভুলাইয়া রাখেন, তেমনি সংসার-রূপ খেলনা দিয়া ভগবান জীবকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন,—তাহারা ইহা কেমন করিয়া ভাবিতে পারেন যে, পিতা সন্তানকে প্রবঞ্চনা করেন?

ইহা সত্য যে, এই বিশাল বিশ্বে অন্তহীন কালের কোলে আমরা ক্ষুদ্র শিশু বই আর কিছুই না। অনন্ত লীলাময়ের যুগ-যুগান্তরব্যাপী অচিন্ত্য লীলার তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের জীবন-লীলা ছেলেখেলা ছাড়া আর কি হইতে পারে? তা' ছাড়া, লীলাময় ত লীলার জন্যই আমাদিগকে তাঁহার লীলাক্ষেত্র এই সংসারে পাঠাইয়াছেন। "আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই ত আমি এসেছি এই ভবে।" তাই যদি হয়, তবে এই লীলাকে তুচ্ছ ছেলেখেলা মনে করিবার মত অকাল বার্দ্ধক্য কবির আসে নাই। তাই, এই আনন্দময় বিশ্বের মহাখেলায় যোগদান করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন না। যে খেলায় জীবনের বাঁশী বিচিত্র মহান্ ছন্দে বাজিয়া ওঠে, তাহাতে যোগদান করিয়া তিনি কেন নিজকে সফল ও সার্থক করিবেন না?—

হোক্ খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দ-কল্লোলাকুল নিখিলের সনে।
সব ছেড়ে' মৌন হয়ে কোথা বসে' রবে,
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে।

মানবাত্মার বিকাশের ক্ষেত্র—এই সুখ দুঃখ পূর্ণ, সহস্র কল্লোল-মুখরিত, ধূলি-ধূসরিত ধরণী,—নির্জ্জন গিরি-কন্দর বা তরুলতা-গুল্মাদি-সমাকীর্ণ নিস্তব্ধ অরণ্য নহে। মৃত্তিকা হইতে বিচ্ছিন্ন তরুলতাদির যে অবস্থা হয়, এই ধরণীর সংস্পর্শ-রহিত মানব-জীবনেরও সেই অবস্থা হয়। সুতরাং প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে এই কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত সংসারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।—

থেকোনা অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা,
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা?

বস্তুতঃ, অজস্র বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল, সহস্র প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা ভীষণ ও কঠোর এই সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া টিকিয়া থাকিবার চেষ্টাই প্রকৃত জীবন। বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—Swamiji, what is life? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—Life is a tendency of unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down. অর্থাৎ সংসারের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা ঠেলিয়া স্থির-পদে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবার দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির নামই জীবন। বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের সংঘাতেই জাগিয়া ওঠে প্রকৃত জীবন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

কবি সংসারবন্ধন স্বীকার করেন; কিন্তু এই বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত হইতে চান না। শিশুর কাছে মাতার বাহুবন্ধন যেমন বাঞ্ছনীয়, এই বিশ্বের বন্ধনও তেমনি তাহার কাছে বাঞ্ছনীয়।

বন্ধন? বন্ধন বটে সকলি বন্ধন
স্নেহ-প্রেম-সুখ-তৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান।

মাতৃপাণি যেমন শিশুকে স্তন হইতে স্তনান্তরে টানিয়া লয়, তেমনি এই বন্ধন আমাদিগকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে টানিয়া লইয়া নব নব রসের আস্বাদ দান করিতেছে। স্তনপিপাসা যেমন শিশুর পক্ষে কল্যাণকর, তেমনি সংসারের স্নেহপ্রেম-সুখ-তৃষ্ণা মানবের পক্ষে কল্যাণকর। স্তনপিপাসা আছে, তাই শিশু মাতৃস্তন্য-রসধারা পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ। সেইরূপ সহজ ভোগতৃষ্ণা আছে বলিয়াই মানব বিশ্বের সমস্ত রস সুখে-দুঃখে আকর্ষণ করিয়া, সেই রসে জন্মে-জন্মে প্রাণমন পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ জীবন গড়িয়া তুলিতেছে। সুতরাং নিবৃত্তির সাধনাদ্বারা সমস্ত ভোগপ্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া কোন মূর্খ এই ধরণীর স্নেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায়!—

স্তন্য-তৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবক্ষ পাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন মুক্তিভ্রমে?

কবি মুক্তি চান না, তিনি চান—এই শ্যামলা ধরণীর স্নেহময় মাতৃবক্ষে জন্মে জন্মে আসিতে। তিনি চান—যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও আনন্দের রসামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে। যে শ্যামা ধরিত্রীর কোলে যুগে-যুগে জন্মে-জন্মে তিনি ছিলেন এবং থাকিবেন, সেই মৃণ্ময়ী মাতার যুগ যুগান্তরের পরিচিত, জন্মজন্মান্তরের স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত সুমধুর বাহুবন্ধন হইতে তিনি নিজেকে কেমন

করিয়া বিচ্ছিন্ন করিবেন? সন্তান কি মাতাকে ছাড়িতে পারে কিম্বা মাতা কি সন্তানকে ছাড়িতে পারে? তিনি মাতৃস্বরূপিণী স্নেহশ্যামলা বসুন্ধরাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ছেড়ে দেবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগ-যুগান্তের মহামৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি?
চতুর্দ্দিক হতে মোরে লবে নাকি টানি
এই সব তরুলতা গিরি-নদী-বন,
এই চির দিবসের সুনীল গগন,
এ জীবন পরিপূর্ণ উদার সমীর;
জাগরণ-পূর্ণ আলো সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি পাইয়াছেন—নিজেরই অন্তরে; যেখানে বিশ্বের সহিত তাঁহার একাত্মতার নিত্যানুভূতি হয়,—যেখানে বিশ্বের স্নেহপূর্ণ শত-সহস্র আহ্বান তিনি নিরন্তর শুনিতে পান। তাই জিজ্ঞাসা করিবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি স্থির বিশ্বাসের সহিত বলিতেছেন,—

ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয়মাঝে; কীট-পশু-পাখী
তরু-গুল্ম-লতারূপে বারম্বার ডাকি'
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে-যুগে জন্মে-জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শতলক্ষ আনন্দের স্তন্য-রস-সুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।

স্রষ্টা ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ, তাঁহার সৃষ্টিও আনন্দের ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। আনন্দ হইতে সৃষ্টির উদ্ভব, আনন্দ হইতেই প্রাণীগণের উৎপত্তি।—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। যে বিশ্বসংসারে চিরানন্দময়ের আনন্দময় সত্তা নিত্য বিরাজমান, সেখানে বন্ধনভয় কিসের? যেখানে আনন্দের একান্ত অভাব সেইখানেই যত বন্ধনভয়; যেখানে আনন্দের প্রভূত প্রাচুর্য্য সেখানে কোন বন্ধন নাই;—সেখানে কেবল অসীম অবাধ আনন্দময় মুক্তি। ওই যে বসন্তের বাতাস দিকে দিকে, কুসুম-সুরভি ছড়াইয়া, বনে-বনে আনন্দের বাঁশী বাজাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, সে কি মুক্ত! ওই যে প্রভাত-পাখী অরুণালোক গায়ে মাখিয়া, প্রাণভরা আনন্দে গান গাহিয়া পুষ্পিত তরুর শাখায়-শাখায় নাচিয়া বেড়াইতেছে, সে কি মুক্ত! আর ওই যে সদ্যজাত দিবসের নির্ম্মল হাসি শ্যামল তৃণদলে ও শিশিরস্নাত তরুপল্লবে লুটাইয়া পড়িয়াছে সেও কি মুক্ত!

যে নিজের ভিতরে ও বাহিরে আনন্দময় ব্রহ্মের আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারে, সে কিছুতেই ভয় পায় না।—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। কবি নিজের ভিতরে ও বাহিরে এই আনন্দ দেখিতে পাইয়াছেন, তাই এই সংসারের কোন বন্ধনকেই তিনি ভয় করেন না এবং ভয় করেন না বলিয়াই সংসারের কোন বন্ধনই তাঁহার কাছে বন্ধনের মত ঠেকে না। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য এই সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করার কোন আবশ্যকতা তিনি দেখেন না। তিনি চান—সংসারের অগণিত বন্ধনের মাঝে থাকিয়া 'আনন্দময় মুক্তির স্বাদ' লাভ করিতে।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে ঈশ্বরোপলব্ধির অন্তরায় বলা হইয়াছে; কারণ ইহারা জীবকে নিয়ত বহির্জ্জগতের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার ধর্ম্ম সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়। ভাগবতে আছে—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

ইহার ভাবার্থ এই,—যত ইন্ধন যোগাও না কেন, এই ইন্দ্রিয়-বাসনার তৃপ্তি নাই। কোন ব্যক্তি বহু বিবাহ করিলে

যেমন তাহার পত্নীগুলি তাহাকে নানাদিক হইতে টানিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তেমনি এই ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে নানাদিক হইতে টানিয়া উৎপীড়িত করিতে থাকে। কবি কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে এইভাবে দেখেন নাই। তিনি বলেন, চক্ষু আছে তাই ভগবানের যে সৌন্দর্য্য পুষ্পে পুষ্পে বিকসিত হইয়া উঠে ও তারায় তারায় কাঁপিয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমরা তৃপ্ত হইতেছি; কর্ণ আছে, তাই ভগবানের যে সঙ্গীত বিহঙ্গের গানে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে নিত্য ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে তাহা শুনিতে পাইতেছি; ত্বক আছে, তাই ভগবানের যে স্পর্শ বসন্ত-বাতাসে ভাসিয়া আসে তাহা অনুভব করিতেছি; মন আছে, তাই ভগবানের যে আনন্দ বিশ্বজগৎ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে পাইতেছি। তাই তিনি বলেন,--'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।' সাধক কবীরের একটি দোঁহায় এই ভাবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়,--'আঁখ্ না মুদু কাণ না রুধু' ইত্যাদি। কবি চান—এই বিশ্বে দৃশ্যে-গন্ধে গানে-স্পর্শে যে-কিছু আনন্দ আছে তাহার মাঝে ভগবানের আনন্দ উপলব্ধি করিতে।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে-গন্ধে-গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।

তিনি আরও বলেন, এই যে চক্ষু-কর্ণাদিযুক্ত দেহ, ইহার সাহায্যে স্রষ্টা তাহার সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও আনন্দের রসধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান, কবি যেমন তাহার কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে তাহার সৃজনী শক্তির আনন্দলীলা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান। স্রষ্টা আমাদের এই দেহের পাত্র ভরিয়া সৃষ্টির অমৃত পান করেন; আমাদের এই শ্রবণে নীরবে থাকিয়া তিনি তাঁহার গান শ্রবণ করেন।

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ-প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরবে রহি,
শুনিয়া লইতেছ আপনার গান।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, জগতের সহিত কেবল আমাদের আনন্দের যোগ নহে, কর্ম্মের যোগও আছে। যেমন আমাদের অন্তরের ক্ষুধা আছে, তেমনি আমাদের দেহেরও ক্ষুধা আছে। বিশ্বের আনন্দরস পানে অন্তরের ক্ষুধা মিটিতে পারে; কিন্তু তাহাতে দেহের ক্ষুধা মিটে না। দেহের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে হইলে কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক। তাই জীব শরীর-যাত্রার জন্য কর্ম্মজগতে ছুটাছুটি করে। শরীর যাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ। অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও দেহস্থিতির জন্য কর্ম্ম করিতেই হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এই জগতের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য কর্ম্মযোগ রহিয়াছে।

স্বয়ং বিশ্বপ্রভু এই কর্ম্মের বন্ধনে সৃষ্টির কাছে বন্দী। সন্তানকে জন্মদান করিয়াই পিতার কর্ত্তব্য শেষ হয়না, তাহাকে লালন-পালন করার দায়িত্বও পিতাকে গ্রহণ করিতে হয়। সেইরূপ সৃষ্টি করিয়াই স্রষ্টার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই, রৌদ্রে জলে ফলে-ফুলে সৃষ্টির প্রতিপালন তাঁহাকে করিতে হইতেছে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে;
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন-প'রে
বাঁধা সবার কাছে।

স্বয়ং মুক্তিদাতা ভগবান যখন মুক্ত নন, তখন তুমি কেন বৃথা মুক্তির আশা কর? অতএব মুক্তির আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মময় সংসারে কর্ম্ম করিতে থাক। কর্ম্ম ছাড়া মানুষের উপায় নাই। প্রকৃত আনন্দ কর্ম্মে—কর্ম্মের ত্যাগে বা কর্ম্মের অবসানে নহে। কর্ম্মানুষ্ঠানের আনন্দই মানব-জীবনের উপজীব্য। জনৈক ইংরেজ কবি গাহিয়াছেন,—

Success is sweet, but joy is in the doing;
Not the end of journey, but the travelling is
What makes life worth while.

এই কর্ম্ম অশেষ, তাহার শেষ নাই। এই কর্ম্মের সংসারে একটি কর্ম্ম শেষ হইলে আর একটি কর্ম্মের ডাক আসে। জীবনের সমস্ত কাজ চুকাইয়া দিয়া আমরা যখন ভাবি, আমাদের করিবার আর কিছুই নাই,—তখন কোথা

হইতে আবার কর্ম্মের আহ্বান আসিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দেয়। তাই জীবনের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া কবি যখন পরপারের খেয়ায় পা দিয়াছেন, তখন আবার কর্ম্মের আহ্বান আসিল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আবার আহ্বান?
যত কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ ত করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চ'লে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যূষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্য দিন।
মাঠের পশ্চিম শেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হ'ল অবসান
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়াছি তরণীতে
আবার আহ্বান?

কর্ম্মের যে বন্ধনভয়ের জন্য জীব কর্ম্মত্যাগ করিতে চায় সেই ভয় তাহার থাকে না, যদি সে সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে পারে। তাই কর্ম্মত্যাগের চেয়ে কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। অর্থাৎ ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মে বদ্ধ হয়। এই ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম কি? কেহ হয়ত বলিবেন, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের নিভৃত কোণে চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করাই ঈশ্বরের প্রীতিবিধায়ক কর্ম্ম, কেহবা হয়ত বলিবেন, এই সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া তপস্যা করাই ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন,—'ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা' কোন কিছুতেই ভগবান তুষ্ট নন। তিনি বলেন, ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তাঁহার সৃষ্ট এই বিপুল বিশ্বের মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিতে হইবে, সমস্ত বিশ্বমানবকে প্রেমালিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিতে হইবে। পুত্রকে কেহ ভালবাসিলে পিতা যেমন বেশী সন্তুষ্ট হন, তেমনি সৃষ্টিকে ভালবাসিলে স্রষ্টা বেশী সন্তুষ্ট হন, কারণ স্রষ্টা তাঁহার সত্তাকে নিজের মধ্যে যতটা অনুভব করেন, তাহার চেয়ে বেশী অনুভব করেন তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে। "মাতা যেমন একমাত্র মাতৃ-সম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ,—সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য্য—তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম্ম করি। এইজন্য মানব সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক—কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,—সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি; কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।"

মানবের লীলাক্ষেত্র এই বিশ্ব হইতে বিমুখ হইয়া, শুধু নিজের আত্মাটিকে ধরিয়া মুক্তির জন্য তিনি কোথায় সন্তরণ করিবেন? সমস্ত জগৎকে দুঃখ শোকের অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়া, শুধু নিজের মুক্তির জন্য তিনি কোথায় ছুটিবেন? সে মুক্তি শুধু নিজের মুক্তি, সমস্ত জগতের মুক্তি নয়, সে মুক্তি তিনি চান না।

বিশ্ব যদি চলে' যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা বসে' রব মুক্তি সমাধিতে?

কবি জানেন, এই সংসারে দুঃখের অন্ত নাই। ইহা জানিয়াও তিনি এই সংসারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান। কেন? কারণ, দুঃখকে তিনি দুঃখ বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, সুখ যাঁহার দান, দুঃখ তাঁহারি দান। তাই যদি হয়, তবে সুখের ন্যায় দুঃখকেও কেন তিনি হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবেন না? যিনি সুখের বেশে আসেন, তিনিই ত আবার দুঃখের বেশে দেখা দেন। তবে, দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেন তিনি ভয় পাইবেন?

দুখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে;
যেখানে ব্যথা, তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে।

তিনি বলেন, মানব-জীবনে দুঃখের আবশ্যকতা আছে। সুখের আরাম-শয়নে মানুষের জীবন যখন অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, তখন দুঃখের কঠোর আঘাতই সে ঘুম ভাঙাইয়া দেয়।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার;
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার।

তিনি আরও বলেন, মানুষের যাহা-কিছু গৌরবের ও মহত্ত্বের, তাহা দুঃখের কঠিন আঘাতেই জাগিয়া ওঠে। ধূপ না পোড়াইলে যেমন গন্ধ বাহির হয়না, দীপ না জ্বালাইলে যেমন আলো পাওয়া যায় না, সেইরূপ দুঃখের দহন-শিখায় না জ্বলিয়া পুড়িয়া মানুষ মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। তাই তিনি দুঃখদাতা রুদ্র ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিতেছেন,—

এই করেছো ভালো, নিঠুর,
এই করেছো ভালো!
এম্‌নি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালা'লে
দেয় না কিছুই আলো।

কবি দুঃখকে এইভাবে দেখিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ত তাহার দুঃখ ভয় নাই, এই দুঃখময় সংসারের ভয়ও নাই।

রবীন্দ্রনাথ জানেন, এই সংসার মৃত্যুর অধীন। ইহা জানিয়াও কেন তিনি এই সংসারকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান? তাহার কারণ, মৃত্যু তাঁহার কাছে মৃত্যু নয়। তিনি বলেন, মৃত্যু এই জীবনের উপর ক্ষণিকের আবরণ মাত্র। বিধাতা এই আবরণ ক্ষণিকের জন্য জীবনের উপর টানিয়া দিয়া আবার পরক্ষণেই সরাইয়া ফেলেন। এই আবরণ যখন তিনি টানিয়া দেন, তখন ভয়ার্ত্ত আমরা হতাশ্বাসে কাঁদিয়া উঠি,—হায়! এই বুঝি সব ফুরাইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই এই আবরণ সরিয়া গেলে আমরা দেখি,—আমাদের সবই আছে, কিছুই হারায় নাই, কিছুই ফুরায় নাই। তখন আমাদের মনে হয়, এ শুধু আনন্দময়ের আনন্দময় লীলা।—

আছে ত যেমন যা ছিল,
হারায় নি কিছু ফুরায়নি কিছু
যে মরিল যেবা বাঁচিল!
বহি সব সুখ দুখ
এ ভুবন হাসি মুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে
ভরিয়া উঠেছে বুক।

তিনি বলেন, জননীর হস্ত যেমন শিশুকে স্তন হইতে স্তনান্তরে টানিয়া আনে, তেমনি মৃত্যু আমাদিগকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে লইয়া যায়; এক স্তন হইতে অন্য স্তনে তুলিয়া আনার সময় শিশু যেমন ভয়ে কাঁদিয়া ওঠে, তেমনি আমরা এক জন্ম হইতে অন্য জন্মে যাইবার সময় ভয়ে কাঁদিয়া উঠি, শিশু আবার স্তন মুখে পাইয়া যেমন সান্ত্বনা পায়, তেমনি আবার নবীন জীবন লাভ করিয়া আমরা আশ্বাস লাভ করি।—

স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

তিনি আরও বলেন, নিজের দিকে না তাকাইয়া যখন আমরা অসীম ভগবানের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখিতে পাই, কোথাও মৃত্যু, দুঃখ বা বিচ্ছেদ নাই। কিন্তু যখন ভগবানকে ভুলিয়া আমরা নিজেকে লইয়া মত্ত থাকি, তখনই মৃত্যু মৃত্যুর রূপ ধারণ করে, দুঃখকে গভীরতর দুঃখ বলিয়া মনে হয়।—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যতদূরে আমি যাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় দুঃখের কূপ,
তোমা হ'তে যবে স্বতন্ত্র হ'য়ে
আপনার পানে চাই।

কবি মৃত্যুকে এইভাবে দেখিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যু ভয় নাই, এই মৃত্যু-সঙ্কুল সংসারের ভয়ও নাই।

মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ইহাদের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে তত্ত্বজ্ঞ মহাজনগণ মোহ বলেন। পদ্মপুরাণে আছে,—

মম পিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিত:॥

—অর্থাৎ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ, "এই আমার, আমার" জ্ঞানই মোহ। কবি বলেন,—এই মোহভয় মানুষের থাকে না, যখন সে বিশ্বের সকলকে ভালবাসিয়া নিজের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজনদিগকে ভালবাসিতে পারে। তখন মোহ প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া ওঠে এবং এই প্রেমই ভক্তিরূপে ফুটিয়া মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। তাই তিনি বলিয়াছেন,—

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

বিশ্বপ্রেমের দ্বারা মোহকে এইভাবে জয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি মোহ ভয় হইতে মুক্ত।

উপসংহারে, আমাদের ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ সংসারকে ব্রহ্মের আনন্দ দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাই তাঁহার দুঃখ-ভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, মোহ-ভয় নাই। এই ব্রহ্মের আনন্দকে তিনি নিজের ভিতরে ও বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বন্ধন ও মুক্তি তাঁহার কাছে এক হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—"সংসারকে যদি ব্রহ্মের আনন্দ দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়—তাহার সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি মারামারি থামিয়া যায়।" ইহাই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-সাধনার গোড়াকার কথা।

যোগেশ চন্দ্র মিশ্র



ভোগের জগৎ

শ্রীসুধীরকুমার সেন

ভারতের সব চেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্চে তার আপামর সমস্ত নরনারীর দীক্ষা ত্যাগ-মন্ত্রে, তার শাস্ত্রে, পুরাণে সব চেয়ে বড়ো এবং সব চেয়ে ভালো আদর্শ যা' তা' ত্যাগের। মানুষের কাজে নামতে চাও ত্যাগ দেখাতে হবে, মানুষের মাঝে নাম করতে চাও, ত্যাগ দেখাতে হবে। খ্যাতির-জীবনের প্রবেশ-পথের মুখে ত্যাগ হচ্ছে একটা ঝাঁঝরি, প্রবেশ করতে চাও ত' জলের মতো তরল হতে হবে; তোমার যাওয়ায় কোনো আপত্তি উঠ্‌বে না কিন্তু রাজ-পোষাকটি দরজায় রেখে।

আমাদের সমাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে অতি বৃহৎ পর্যন্ত এই আদর্শ, রাজা থেকে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত। বাণপ্রস্থে আমাদের জীবধর্ম্মের পরম বিকাশ, যতিত্বে আমাদের পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, সতীত্বে শ্রেষ্ঠ নারীত্ব, বৈধব্যে মহান্ ত্যাগ এবং পবিত্রতার আদর্শ। ব্রাহ্মণের ত্যাগ ধর্ম্মের কাছে, ক্ষত্রিয়ের দেশের কাছে, বৈশ্যের দশের কাছে, শূদ্রের সকলের কাছে। মানুষ খালি খাটো হচ্চে, তবুও তার মাথা দেখা যায় ব'লে চারদিক থেকে প্রতিনিয়ত রব উঠ্‌ছে, আরো খাটো হ'তে হবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নির্ম্মূল হয়। এর সাম্‌নে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদ ত' দূরের কথা, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় আহার্য্যও যে একদিন অতি অপ্রয়োজনীয় বলে আবিষ্কৃত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কী?

ভারতের আদর্শ আপনাকে আঘাত করবার; আত্মঘাতী, মায়াবাদী, দুঃখবাদী (Pessimist) ধর্ম্মসংস্থাপকের হাতে পড়ে যুগে যুগে সে লাঞ্ছিত হয়েছে, তার নরধর্ম্ম লাঞ্ছিত হয়েছে। প্রতিনিয়ত ডাক পড়েছে 'ছেড়ে এসো, চলে এসো।' কোন রকমে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের গণ্ডী পার হয়ে গার্হস্থ্য রসের মধু ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছে, আর অমনি ডাক সুরু হয়েছে, 'ছেড়ে এসো, চলে এসো।' মানুষের জন্ম মানুষের কী টান, মানুষের জন্ম মানুষের কী অপার বেদনানুভূতি। খেতে বস্‌তে শুতে দাঁড়াতে নিস্তার নেই, স্বস্তি নেই। গৃহস্থদের ডাক্‌ছে সংসার-বিমুখ ধার্ম্মিকেরা, ধার্ম্মিকদের ডাক্‌ছে যতিরা, যতিদের ডাক্‌ছে তাদের মুক্ত আত্মারা। ভারতের শৈশব থেকে এই ডাক সুরু হয়েছে মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত, গৃহ থেকে বন পর্য্যন্ত। খালি ওপরের টান।

ত্যাগ করতে গিয়ে মানুষ এত মত্ত হয়ে উঠেছে, যে ত্যাগের সীমা কতদূর তা' ভেবে দেখ্‌বার পর্য্যন্ত অবসর পায়নি। বলিরাজা দানের মত্ততায় পাতালে ঢুক্‌লেন, কর্ণ নিজের ছেলের মাথায় করাত চালালেন, শিবি কপোতক-বেশী বৈশ্বানরকে রক্ষা করতে নিজের দেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করলেন। সভামধ্যে কৃষ্ণা যখন হীনভাবে অপমানিত হ'লেন তখনও যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাধর্ম্মের কম্‌তি ঘটেনি। রাম পিতার স্ত্রৈণতাকে মেনে নিয়ে যৌবনে বনে যাওয়াই যুক্তি-সঙ্গত মনে করলেন, পিতৃভক্তি এবং ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করতে। আদর্শের মোহে মানুষ আত্মসঙ্কোচন করতে করতে শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকেছে। প্রজার মনোরঞ্জন করতে গিয়ে রাম ভুলে গেলেন যে তিনি স্বামী এবং ভুলে গেলেন যে-সীতাকে তিনি বনে পাঠালেন তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের তিনিই পিতা। আমাদের গর্ব্ব ভুয়ো আদর্শের, মিথ্যার। আমাদের গর্ব্ব সহমরণ বন্ধ করার জন্য, রামমোহনকে গালাগালি দিয়ে, আমাদের গর্ব্ব বিধবাবিবাহের নাম শুন্‌লে চক্ষু কর্ণ রুদ্ধ করে' পাপের শ্রবণ দর্শন থেকে নিজেকে রক্ষা করার।

কতকগুলি বিশেষ প্রতিভাকে সার্ব্বজনীন অনুসরণীয় আদর্শ বলে সকলের সামনে তুলে ধরা, কতকগুলি অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্তকে মহান্ আদর্শ বলে ঘোষণা করা, এসবই হচ্চে আমাদের জাতিগত অধঃপতনের মূল কারণ।

ত্যাগের আদর্শ সকলের জন্য নয়। বহুর ত্যাগ জাতির

দৈন্য, একের ত্যাগ জাতির ঐশ্বর্য্য। ভারতের ত্রিশ কোটী লোক আজ যদি সমবেত কণ্ঠে বলে বসে যে আমরা সবাই কটীবস্ত্র পরে মহাত্মা হবো, ত' কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকই না বলে পারবে না, যে ভারতের মানসিক দৈন্য আর্থিক অসচ্ছলতার চেয়েও প্রকট এবং প্রবল হয়ে পড়েছে। যে মানুষ অনশনে শুকোচ্ছে, দুর্ভিক্ষে মরছে, যে মানুষ কাপড় না পেয়ে শতগ্রন্থি ন্যাক্‌ড়ায় অঙ্গ ঢাকছে, যার জীবনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়া আর কিছুরই আড়ম্বর নেই, সেও যদি বলে বসে যে আমি এর থেকেও ত্যাগ করব, ত' তার চেয়ে দুর্দ্দশার কথা আর কী হতে পারে? মানুষ কত ছাড়বে, ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে কোন পর্য্যায়ে আস্‌বে, সে পর্য্যায়ে এসে তার মনুষ্যত্বের কতটুকু অবশিষ্ট থাক্‌বে? রাজা ভিখারীর বাস পরবে, প্রজা কৌপীন ধরবে, কৌপীনধারী দিগম্বর হয়ে মঠে বনে আত্মগোপন করবে, হায় সভ্য মানুষ! তারপর?

ভোগের জন্য অন্তর্নিরুদ্ধ অতি-কামনা পোষণ করাও যেমন পাপ, ভোগে অশ্রদ্ধাও তেমন পাপ। ত্যাগ কর্‌তে কর্‌তে মানুষ জানোয়ারের কোঠায় নেমে এসেছে, তবু সে ভাব্‌ছে আরও কতটুকু ছাড়তে পারে। ক্ষুধার আহার সামনে রেখে সে গালে হাত দিয়ে হিসেবই করে' চলেছে এর থেকেও কতটুকু সে বাদ দেবে। যতো ছাড়ছে ততো ছাড়ার মত্ততা তার ঘাড়ে যেন আরো চেপে বস্‌ছে। বলি, যে কাপড় তোমার কটীতে উঠেছে, সেটুকু ঘোচালেই, ত' ঘুচে গেল তোমার হাজার বছরের উৎকর্ষের সাধনা। তখন তুমি আর তোমার পশুচর্ম্ম-পরা বর্ব্বর পূর্ব্বপুরুষের মাঝে তফাৎ কী থাক্‌ল?

ছেলেবেলা থেকেই তার চারদিকে কাঁটা তারের বেড়া। বইতে পড়েছে, দরকারের বেশী কিছু চাওয়া পাপ। তরুণ বয়সে ফরসা কাপড় জামা পরে' রাস্তায় বেরিয়েছে, একটু দামী জুতো পায়ে দিয়েছে, অমনি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের চক্ষু খাড়া। বাপ মা উপদেশ দিলেন: 'বিলাসী হয়োনা।' চারদিক থেকে খালি খরচ কমানোর ডাক: 'ছেড়ে এসো, চলে এসো।' বড় হয়ে সংসারের একজন ছোটখাটো দায়িত্বশীল লোকের যখন আসন পেল, তখন সবারই দাবী, 'বিলাসী হয়ো না।' আরো বেশী বয়সে যখন সংসারের সমস্ত দায়িত্ব মাথায় তুলে নিল, তখনও অধীনস্থ ছোট থেকে বড়ো পর্য্যন্ত সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে: 'দেখ বিলাসী হয়ো না, আত্মসুখের চেয়েও পরকে সুখ দেওয়া বড়। দেখো ত্যাগেই আনন্দ, ভোগে সুখ নেই।' যদি বল: 'বল্‌ছো কী? কতো ছাড়বো? না খেয়ে খেয়ে ত' বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়েছি, এখন ভিক্ষু থেকে কোন পর্য্যায়ে যাবো?',— কে শোনে? যদি বল: 'না খেয়ে আবার কবে কোন্ মানুষ বেঁচেছে, যে বেঁচেছে সে আবার মানুষ কোথায়? মুখে যা' আজও ওঠেনি তা' ত্যাগ করব কী করে? আগে ভোগ, তারপর ত্যাগ, নইলে আবার ত্যাগ কী? যাকে ধরতে পারিনি তাকে ছাড়বার আমার অধিকার কী, তাকে ছাড়ার মাঝে যুক্তিটাই বা কী?'—যদি বল: 'বুদ্ধ হওয়া মানুষের ধর্ম্ম নয়, বুদ্ধ হওয়া মানুষের বিশেষত্ব—যদি বল: 'মহাত্মা হওয়ার জন্য আমাদের তপস্যা নয়, যদি হয়ে যাই তাইতেই আমাদের পরম আনন্দ—।' অমনি উপরে নীচে শত মানুষের শত কোলাহল উঠ্‌বে: 'কী স্বার্থপর?'

কিন্তু মানুষের ছোটোবড়ো কোলাহলের দিকে চেয়ে থাক্‌লে, তার প্রত্যেক মতামত নিয়ে চল্‌তে চাইলে, তুমি কিছুই হতে পারবে না, মহাত্মাও না, নীচাত্মাও না। রাস্তার ধারের বারণার্ড্‌ শ' লোকের তামাসায় অবিচলিত ছিলেন বলেই আজ তিনি হয়েছেন সেই বারণার্ড্‌ শ যাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌তে গেলে ঘাড়ে লাগে ব্যথা। যে-সমালোচকেরা একদিন রবীন্দ্রনাথকে কবিতা না লিখ্‌তে উপদেশ দিয়েছিল, তাদের কথায় কবি সেদিন কর্ণপাত করেন নি বলেই, আজ তারা শুঁড়ি শুড়ি মেরে আছে ভয়ে, পাছে কবির এক কলমের খোঁচায় যায় তাদের কলম চালনা বন্ধ হয়ে। মা বাপ আত্মীয় প্রতিবেশীকে খুসী করবার মতো প্রবৃত্তি নিয়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হতে পারতেন না, নিমাই চৈতন্য না, নরেন্দ্র বিবেকানন্দ না, গান্ধী মহাত্মা না। বন্ধু বান্ধবের উপদেশ মাফিক-চলা সুশীল বালক হলে, সিদ্ধার্থ জোর হতেন একজন চন্দ্রগুপ্ত কী শিলাদিত্য, নিমাই একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত, নরেন্দ্র কেরাণী, গান্ধী জোর একজন বড়ো ব্যারিষ্টার।

কিন্তু উপরের দিকে যার টান রয়েছে সে গায়ে-জড়ানো লতার টানে মাটীতে লতায় না, তাদের ছিঁড়ে ছাড়িয়ে ওপরে উঠে আসে, তখন সেই একদিনকার বন্ধু, ভীরু লতারা তার অশেপাশেই ঘোরে একটু প্রসাদের আশায়, বলেনা : 'নেমে এসো।' যদিই বলে, মহীরুহ হাসে। কিন্তু নামে না।

সে তখন বলে : 'কী ত্যাগ করবো? আমার বড়োত্বকে? না বন্ধু, ও জিনিষ কী ছাড়াবার না ছাড়বার। আর সেই ত্যাগই ত' আমার বড়ো ত্যাগ নয়, শ্রেষ্ঠ ত্যাগ হচ্চে আমার পরিপূর্ণ রূপের ফল। আমার ছায়া, আমার ফুল ফল সৌন্দর্য্য। তাই নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট হও। আমি নেমে এসে তোমাদের সমান খাটো হলে, তোমাদের ঈর্ষা কম্‌তে পারে কিন্তু দুঃখ কম্‌বে না। আমার মাথায় চাঁটী মেরে কি তোমরা দুঃখের মাথায়ও চাঁটী মারতে পারবে? আমি যতক্ষণ উপরে আছি ততক্ষণই তোমাদের পরম দুঃখের মধ্যেও সুখ, মহাত্মা আজ পাপাত্মার স্তরে পা দিলে পাপ ছাড়া পৃথিবীর পুণ্যের ঘরে জমা বাড়বে না। ঈর্ষায় ত বড়ো হবে না, হবে, বড়ো হওয়ার কামনায়।

নিজেকে যে ভালবাসে সে বড়োকে নেমে এসে নিজের সমান খাটো হতে বলে না, নিজের মাথা উঁচু করে' বড়োর মাথা ছাড়িয়ে যেতে চায়। ঋষি চরক বলেছেন : 'হেতাবীর্ষুঃ ফলেনীর্ষুঃ।' উন্নতির হেতুতে ঈর্ষা ক'রো কিন্তু ফলে ঈর্ষা করো না। যে বীজ মানুষের ভিতর থাক্‌লে বড়ো হওয়া যায় তাই অঙ্কুরিত করবারই তোমার সাধনা। দৌড়োতে গিয়ে প্রতিযোগীর পা-ভাঙ্গার মতো দৈব ঘটনার যে তপস্যা করে সে ফার্ষ্ট্‌ হওয়ার নয়, ফার্ষ্ট্‌ সেই হবে যার তপস্যা নিজের স্পীড্‌ বাড়িয়ে প্রতিযোগীকে পরাস্ত করবার। এক ঢিলে কবি এবং কবিতাকে বধ করে' যে রাতারাতি মহাকবি হওয়ার স্বপ্ন দেখে তার বইয়ের একটা ইম্‌প্রেশনই যথেষ্ট, কিন্তু কবির কোনো বইয়ের তাতে কাটতি কম্‌বে না। বড়ো হতে চাও ত' আগে ছোট হ'তে হবে কথা নয়, বড়ো হ'তে চাও ত' আগে বৃহতের বীজ আপনার ভিতর অঙ্কুরিত করতে হবে।

ছোট হওয়া ত' বড়ো কথা নয়, বড়ো হওয়া বড়ো কথা। হাজার বছরের তপস্যা এক মুহূর্ত্তে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু হাজার বছরের তপস্যা এক মুহূর্ত্তে সমুদ্র থেকে সমুদ্রমন্থনের ফল স্বরূপ ওঠে না। তার জন্য চাই বহুর তপস্যা, বহুদিনের, চাই সমুদ্র মন্থন।

বড়ো যে, সে ভোগী কী ত্যাগী সে কথা নয়, বড়ো সে হয়েছে। শ' কী রবীন্দ্রনাথ কী খান্‌ আর ক' তলায় ঘুমোন তাই নিয়ে আমাদের কারবার নয়, কথা আমাদের তাই নিয়ে যা' আমরা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। তিন আনা যাদের দৈনিক খোরাক তাদের সংখ্যা ভারতে কম নয়, কিন্তু তাই বলে সবাই মহাত্মা নয়। কটী বস্ত্র ত' কুলীতেও পরে কিন্তু তাতে সে মহাত্মাও হয় না তাতে তার মাহাত্ম্যও বাড়ে না। গান্ধীর মহাত্মা হওয়ার পেছনে হয়ত তাঁর স্বল্প খোরাকেরও কিছু সাহায্য আছে, কিন্তু তোমার আমার কাণা কড়িও নয়। ওসব দিয়ে বিচার করতে যাওয়া শুধু মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। আর ভোগী হলেই তার সমস্ত উৎকর্ষকে ত্যাগবাদের ছুরিতে কেটে কুচি কুচি করে দেওয়া চরম দুর্ব্বলতা। কতো ত্যাগী সন্ন্যাসী হিমালয়ের গুহায় গুহায় কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন কে তার খবর রাখে? কুম্ভমেলার স্মৃতি যতক্ষণ প্রয়াগে আছে ততক্ষণই, তার বেশী নয়। যার সঙ্গে মানুষের দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে মানুষের মনে রাখার সম্বন্ধও আল্‌গা। পৃথিবীর গোপন ভাণ্ডারে নিত্য কতো তপস্যা সঞ্চিত হচ্চে তার হিসেব আমাদের নয়, আমাদের হিসেব পৃথিবীর খুচ্‌রো তহবিলে মানুষের নিত্য খোরাক যোগানোর জন্য কি সঞ্চিত হচ্চে। মহাত্মা যদি বলেন : 'থাকো তোমরা ভারতবর্ষ নিয়ে আমি চল্লুম গুহায় আমার পারমার্থিক তপস্যা করতে।' আমরাও তখন বল্‌ব : 'তোমার সঙ্গে আমাদের হিসেব চুকলো, আর তোমার কথা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা করবার নয়, এখন আমাদের আয়োজন নতুন মহাত্মা আবিষ্কারের অভিযানের।'

তাই বলছিলুম, ত্যাগ অথবা ভোগ দিয়ে মনুষ্যত্ব যাচাই করবার নয়, দেখ্‌তে হবে সেই মনুষ্যত্বকে যা' ত্যাগ অথবা ভোগের মধ্য থেকে সমুত্থিত হয়েছে। আকাশের দিকে চেয়ে চাঁদের গুহ্যাতিগুহ্য খবর জান্‌তে জান্‌তে বৈজ্ঞানিকদের

জন্ম যাবে কেটে, আমরা ত' সে খবরের জন্য জীবন মরণ পণ করে' বসে নেই, আমরা চাই তার আলো। সেই টুকুই আমাদের দরকার, যা' দরকার তাই নিয়েই আমাদের কারবার। চাঁদ যখন আলোহীন মরুভূমি হয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকবে তখন আমরা ভুলেও তার খোঁজ নিতে যাবো না, তখন আমরা নতুন চাঁদ নিয়েই মাতবো। ঘরের খবর নিয়ে টানাটানি জীবনীকারের, বাইরের জীবন নিয়ে টানাটানি, তোমার, আমার, সকলের, সকল কালের, সব মানুষের।

ভোগ করতে যে মানুষ শেখেনি সে ত্যাগেরও মর্য্যাদা বুঝবে না, ত্যাগীরও না। আগে ভোগ, তারপর ত্যাগ। 'ছোট হও, আদর্শ মাফিক চলো' বললে বড় ছোট হয়ে আসবে না, ছোটই আরো খাটো হয়ে আসবে। তোমার কাজ আদর্শকে অনুসরণ করা নয় নিজেকে আদর্শ স্থানীয় করা। অনুসরণ করতে গিয়ে লোকে অনুকরণ করেছে, সীমানায় পৌঁছতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র যা' সৃষ্টি করেছেন তা' তাঁর জন্যই, তারপর তাঁকে যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁরা সবাই মধ্যপথে, কেউই গোল্‌এ পৌঁছুতে পারেননি। তোমার চলবার পথের বাধাগুলো দলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পথের সৃষ্টি হবে শুধু তোমার চল্‌বার, একেবারে নিজস্ব। সে পথ অপরের জন্য নয়, শুধু তোমার জন্যই। তারপর যারা আসবে তারা তাদের নিজেদের পথ বেছে নেবে আবার পথ চলবে, কতো পড়বে কতো মরবে, কতো মধ্যপথে থেকে যাবে। কিন্তু তার জন্য ত' দুঃখ নয়, দুঃখ তারা চল্‌বার সাহস না পেলে। পোঁ ধরে ধরে জাতটা বেজাত হতে বসেছে, এখন যে যার খেয়ালমতো রামশিঙ্গে বাজিয়ে জানিয়ে দিতে হবে যে আমরা বেঁচে আছি বেঁচে থাকলে ভয় নেই, মরলেও ভয় নেই, মরার মতো বাঁচাতেই ভয়। পৃথিবীতে দশ দিক, দশ কোটি পথ, পথ কে আবার বেঁধে দিতে পেরেছে। কে বলতে পারে যে এই পথটাই সব চেয়ে বড়ো সব চেয়ে মহৎ? তুমিই ত' স্রষ্টা, তুমিই ত' আবিষ্কারক। কলম্বস্‌এর সাহস ছিলো বলেই ত' সে কলম্বস্ হ'লো, সাহস না থাকলে শুধু কেরাণী। অনাবিষ্কৃত আমেরিকা আবিষ্কার করবার অধিকার তোমারও আছে, আমারও আছে, রামেরও, শ্যামেরও। শুধু চাই সাহস, চাই সকল ভুলে সকল-ভোলার মত্ততা। চাই, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পর্য্যন্ত সকলের সব কান্না দুঃখ ক্রোধ অভিমানকে উপেক্ষা করে' ক্ষুদ্রের মাঝে বৃহৎরূপে প্রবর্ত্তিত হওয়া। অঙ্কুরের তপস্যা কাঁটা গাছের শক্তি কমানোর জন্য নয়, কাঁটা গাছকে অবজ্ঞা করায়। মাথা তুলে বল: 'আমিই সকলের চেয়ে বড়ো, আমার কাছে আবার বাধা কী, সমস্যা কী?' ব্যস্—চুকলো তোমার সব বাধা সব সমস্যা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথি হয়ে কুরুক্ষেত্রের মাঠে যুদ্ধ করছেন, দৈবশক্তি দিয়ে কুরুকুল নির্ম্মূল করবার জন্য নয়, মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার সামনে যে বিরাট বাধা সমস্যার মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাকে মানুষের শক্তি দ্বারা অতিক্রম করতে। এ যুদ্ধ প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক মানুষের। কবে সেই দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্র সুরু হয়েছে, আজও তা' শেষ হয়নি, আজও আমরা তার ভেরী শুনছি। আমাদের সকলকেই এযুদ্ধে নামতে হবে। একজনের একাজ নয়, একজনের দ্বারা এর শেষ নেই। অনন্তকাল ধরে অনন্ত নরস্রোতের মাঝে অনন্তহীন এর পরিসমাপ্তি। কেউ সিংহাসনে বসে বলতে পারেনা যে আমি আমার বংশধারার জন্য অক্ষয় সিংহাসন পেতে রেখে গেলাম। প্রত্যেককে সেই সিংহাসনে বসতে হবে প্রত্যেকের নিজের চেষ্টায়, নিজের পরাক্রমে, পৈতৃক অধিকারের দাবীতে নয়। পড়ে-পাওয়া আর উত্তরাধিকার সূত্রের জিনিষের সমানই কথা, সমানই মূল্য। সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ হচ্চে যা' নিজের চেষ্টায় লব্ধ।

তোমার জীবনের মাঝে এই অক্ষমতার বীজটুকু নষ্ট করে ফেল। সব জিনিষেই আদর্শ, ভোগে ত্যাগে, রাজায় প্রজায়, সতীত্বে, সন্ন্যাসীত্বে। বর্ত্তমান কেন অতীতের পিছনে দৌড়বে? তার সঙ্গে অতীত কালের সম্বন্ধ কী, কী সম্পর্ক আগামী কালের? কেউ কারো তাঁবে না। যত কিছু সম্পর্ক এই লতার সঙ্গে চারা গাছের। ছাড়িয়ে ওঠ, ব্যস্, সব সম্বন্ধ গেল চুকে। পুরাতন, অতীত সব। সব আত্মীয়তার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে, নিজের বোঝা নাও নিজের ঘাড়ে, আপনি পথ চলো আপনার চলার নেশায়, একলা পথে, নিজের পথে। পিছনের ডাক, সামনের বাধা, ওসব লক্ষ্য করা তোমার কাজ নয়, চলাই তোমার কাজ। তাতে কতো লোক কাঁদবে, কতো অভিমান করবে, কতো পড়বে, কতো মরবে, সে হিসেবও তোমার নয়।

সারাটা দিন তোমার কাটুক শুধু নিজের খেয়ালের বাঁশী বাজিয়ে, কী দরকার তোমার মাথা ঘামানোয় কার কী বলা না বলা নিয়ে, কী দরকার হিসেবের কার কী করা না করা নিয়ে, শুধু সন্ধ্যেবেলায় আপন মনে ঘরে ফেরার সময় এই হিসেবে ঠিক থেকো যে সারাটা দিন তুমি অপব্যয় করোনি, তা নাই বা রেখেছ হাজারো মানুষের হাজারো রকমের মন নাই বা মেনেছ পান্থশালার পুরানো পান্থদের দেয়ালে লিখে-যাওয়া বাণী।

সুধীরকুমার সেন

আগমনী

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

ডুবিল রক্তিম সূর্য্য প্রান্তরের সীমান্ত রেখায়,
দিগন্তের ম্লান কান্তি রাঙা মেঘে বিচিত্র লেখায়
ফুটিয়াছে দিকে দিকে। শরতের দিনান্ত কুয়াসা
অস্পষ্ট জালের মত রচিয়াছে হেঁয়ালীর ভাষা
নিস্তব্ধ পল্লীর কোলে। গোধূলির ম্লানিমার মাঝে
সপ্তমীর অর্দ্ধ চন্দ্র অন্তরীক্ষে একেলা বিরাজে
ছন্দহীন কাহিনীর মত। শান্ত নীল নভস্তলে
ফোটেনি তাহার হাসি ; শুধু রাঙা ছেঁড়া মেঘদলে
লক্ষ্যহীন হেথাহোথা ভাসিয়া বেড়ায়। তারি ফাঁকে
নীলিমার শান্ত শোভা গৃহহীন পথিকেরে ডাকে
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে।
নিঃশব্দ গোপনে ধীরে ধীরে
দিনান্ত শেষের লেখা মুছে যায়। উত্তপ্ত পৃথ্বীরে
সুশীতল করস্পর্শে স্নিগ্ধ করি' নামে সন্ধ্যারাণী
বিলোল কুন্তলময়ী। সুনিবিড় নীলাম্বরীখানি
উড়ে পড়ে দিকে দিকে। অকস্মাৎ জ্যোৎস্নার আলোকে
সপ্তমীর অর্দ্ধশশী এক করি' দ্যুলোকে ভূলোকে
বহে আনে শান্তি বাণী সুস্মিত উদার। আপনারে
ভুলে যাই, বিশ্বের বিচ্ছিন্ন সত্তা একের মাঝারে
নিঃশেষে মুছিয়া যায়। শুধু এক চিন্ময়ী প্রতিমা
জ্যোৎস্নার প্লাবন মাঝে ভাসাইয়া নিয়ে যায় সীমা
অসীমের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মূর্ত্তিরূপে ; বনে বনান্তরে
শ্যামল ধানের ক্ষেতে, পল্লীমাঝে, সুদূর প্রান্তরে
নীল-পীত-সবুজের ভিন্ন ভিন্ন রঙের রঙ্গিমা
মুক্তি পায় চন্দ্রালোকে। শুধু এক রূপ বিভঙ্গিমা
জ্যোৎস্নারাগে বিশ্বরূপ ধরে—পেলব শীতল কান্তি।
চারিদিকে আত্মভোলা বিশ্ববাণী —শান্তি, শান্তি, শান্তি—
বিশ্বময় শুধু শান্তি—অবিচ্ছিন্ন একটি স্পন্দন.
তন্ময় ধ্যানের মাঝে। ঘুচে যায় সীমার বন্ধন
অসীমের তালে তালে।
—অকস্মাৎ ভেঙে যায় ধ্যান,
দূর পল্লীপ্রান্ত হতে ভেঁসে আসে আরতির তান
জীবন স্পন্দন সম। ক্ষীণ মন্দ সুরের আবেশে
সুসম্বদ্ধ ঘণ্টাধ্বনি মন্দ বায়ে ঝঙ্কারের রেশে
কর্ণে আসি' পশে মোর ; সানায়ের মূর্চ্ছনার মাঝে
বিবাগী হৃদয়ে মোর বিরহের সাহানা যে বাজে।
মনে হয় শুধু রিক্ত—রিক্ত এই ত্রিভুবনখানি ;
মোর কাছে মিথ্যা হলো সন্ধ্যারতি ;—কেন নাহি জানি
আগমনী হলো নিরর্থক। প্রাণের দেবতা কোথা,
কোথা মোর প্রিয়তম! একা, একা, একা আমি হোথা
বিশ্বের প্রাঙ্গণ তলে একা আমি যাপিতেছি নিশি,—
বাহিরে অনন্ত জ্যোৎস্না ; অন্তরেতে ঘোর অমানিশি
সুবিপুল বিরহের। একা আমি—কোথা প্রিয়তম—
আগমনী সত্য যদি, প্রাণ মন রিক্ত কেন মম ?

[পরপৃষ্ঠা হইতে মুদ্রিত 'সুভদ্রা' গল্পের নিম্নলিখিত মুদ্রিত অংশটুকু ভ্রমবশত যথাস্থানে মুদ্রিত হয় নাই। এ অংশটুকু ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনের পরে এবং ৭ম লাইনের পূর্ব্বে মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল। পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া তদনুযায়ী গল্পটি পাঠ করিবেন। বিঃ সঃ]

সুভদ্রা শেষদিন বলেছিল, "যেমন করে' আমি অবিরত ছোড়্‌দার উপস্থিতি প্রার্থনা করি' আমার কাছে, ইচ্ছা হয় ছোড়্‌দা আমার সম্মুখে থাকুন, আমার পাশে থাকুন দিবারাত্র, যুগযুগান্ত ধরে' তেমনিতর আমার মনে হ'ত আপনাদের বাড়ীর ওই সত্তাটির সঙ্গে যেন আমার দিনরাত বিচ্ছেদ না ঘটে, আপনাদের গৃহের সকল বিদ্যা, সর্ব্ব রুচি বোধ যেন আমি আমার নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি—"

সুভদ্রার মুখ থেকে রণজিৎকুমারের উপস্থিতির সঙ্গে তুলনামূলক কোন উক্তির কথা জীবনে বোধ হয় আর কেউ শোনেনি,—ওই প্রথম ওই শেষ। ওটা যে ভদ্রার কাছে কত বড় কথা, তা ওকে যারা না জান্‌ত তাদের পক্ষে আন্দাজ করা অসম্ভব। এমনই ছিল বিদ্যার প্রতি ওর মমতাবোধ, জ্ঞানের প্রতি সর্ব্বগ্রাসী অনুরাগ,—অথচ ভগবান ওর ললাটে গভীর কৃষ্ণাক্ষরে কি লেখাই না লিখেছিলেন।

আমার বেশ মনে আছে বছর দুয়েক আগেকার এক ছুটির দিনের কথা।—সকালবেলা চায়ের টেবিলে ছোড়্‌দা অকস্মাৎ প্যানামা ক্যানালের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন,— সুভদ্রা এসে ঘরে ঢুক্‌ল, একখানি চেয়ার টেনে এনে বাবার কাছে বসে নিঃশব্দে ছোড়্‌দার মুখের পানে চেয়ে যেন একেবারে প্যানামা ক্যানালের কাহিনী গিল্‌তে লাগ্‌ল। ওর প্রতি বাবার একটি সকরুণ স্নেহ ছিল। মনুষ্য চরিত্রে তার অসামান্য জ্ঞান, তাই মনে হয়, বাবা বোধ হয় সুভদ্রাকে ঠিক বুঝেছিলেন, বোধ হয় টের পেয়েছিলেন যে কুণ্ডুবাড়ীতে ভদ্রা নিরাশ্রয়া, তাই একটুখানি স্নেহের লোভে, আশ্রয়ের আশায় সে যখন তখন আমাদের বাড়ী ছুটে আসে।

আমার ছোড়্‌দার প্রতি সুভদ্রার ছিল একটি সুমধুর শ্রদ্ধা,—বিশেষ কোনও কারণে নয়, কেবলমাত্র তিনি ছোড়্‌দা বলে'। "ছোড়্‌দা শব্দটাই সুভদ্রার অত্যন্ত প্রিয়, বাংলাভাষায় ওর চেয়ে মিষ্টতর সম্বোধন আছে বলে সুভদ্রা স্বীকার করত না, রণজিৎকুমারকে স্মরণ করেই অরুণ রায়ের প্রতি ভদ্রা শ্রদ্ধা প্রকাশ করত।

ভক্তিমান্ হিন্দু যেমন করে' মাটির মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে দেবতার আরাধনা করে, অথচ পুতুলকেই তার চরম উপাস্য বলে' স্বীকার করে না, এবং তজ্জন্যই পূজাবসানে সেই মূর্ত্তির নিরঞ্জন কার্য্যে তার দ্বিধা নেই, আমার ছোড়্‌দার প্রতি ভদ্রার ভক্তিপ্রকাশের আরম্ভের ধরণও ছিল অনেকটা সেই রকম। অরুণ রায়ের মধ্য দিয়ে সুভদ্রা শ্রদ্ধা নিবেদন করত রণজিৎকুমারকে, অরুণ রায়কে নয়। এটা প্রথম দিককার কথা।

কিন্তু বিশেষ দিনের নির্দ্দিষ্ট তিথির মৃণ্মূর্ত্তিকে হিন্দু একদিন সমারোহপূর্ব্বক জলে ভাসিয়ে দেয়, অথচ তার গৃহদেবতাকে বুক দিয়ে সেবা করে,—সেখানে তার ঠাকুর ছায়াও বটে, কায়াও বটে। গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে একদিন নদীগর্ভে নিমজ্জিত করবার কথা কোনও হিন্দুসন্তান স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারে না।—আমার ছোড়্‌দার প্রতি ভদ্রার ভক্তি ক্রমে ক্রমে এই শেষোক্ত রূপ ধারণ করল।—এক ভাইয়ের পরিবর্ত্তে ও দু' ভাই লাভ করল।—আর সে কি তীব্র স্নেহ! আমি তাকে বর্ণনা করতে পারিনে,—সে যে ঠিক কি বস্তু, কেমন তার রূপ, কেমন তার প্রকাশ, তা আমি বুঝিয়ে বল্‌তে পারব না। সুভদ্রার প্রীতির আকৃতি নেই, তবুও তা এক সম্পূর্ণ সামগ্রী—কিন্তু তাকে আমরা বুদ্ধির দ্বারা পাইনি, জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিনি,—কেবল মনে হ'য়েছে, এর চেয়ে সুমধুর কিছু দেখিনি, দেখিনি এর চেয়ে কিছু মহৎ।

কুণ্ডুবাড়ীর লোকেরা কিন্তু টিপ্পনী কাট্‌ল—ভদ্রার সম্মুখে নয়, তার আড়ালে অগোচরে। সাপের ঝাঁপির ঢাক্‌না বন্ধ করে' দিলেও ভিতরকার ফোঁস্ ফোঁসানি ঠিক সমানই থাকে, বরং আরও বেড়েই চলে। সুভদ্রার এতবড় অদ্ভুত স্নেহের এই বিস্ময়কর রূপ যে কুণ্ডুবাড়ীর লোকেরা বুঝ্‌বে এতবড় আশা মনে পোষণ করা বাতুলতা, কিন্তু ক্রোধে ঘৃণায় ভদ্রা দাঁতে দাঁত ঘস্‌ল, বারংবার বল্‌তে লাগ্‌ল এগুলো জন্তু, এগুলো জানোয়ার,—না, তারও অধম এই মানুষগুলো,— এদের এই পাপের জন্য আমি এই লোকগুলোকে এমন শিক্ষা দেব যেন সে-কথা এরা কোন দিন না ভুল্‌তে পারে—"

চোখের জল মুছে ভদ্রা বারংবার বলে, "এগুলো পশুর চেয়েও নীচ, এরা

সুভদ্রা

শ্রীআশীষ গুপ্ত

সোমবার, ২৬এ জুন—

সন্ধ্যাবেলা দিল্লী এক্সপ্রেসে শিয়ালদহে এসে পৌছলাম। সমস্ত শরীর ক্লান্ত, অপরিচ্ছন্ন,—ট্রেন জার্নির চেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে' আমি মনে করিনে।

স্নান করে' পরিষ্কার কাপড় পরে' একটি পরিপাটি করে' সিঁদুরের টিপ পর্‌বার জন্য মনটা ব্যাকুল হ'য়ে রইল। পর্‌ব সেই ফিরোজা রঙের শাড়ীখানা, গায়ে দেব কলার-দেওয়া সেই ব্লাউজটি,—তুমি যে শাড়ীটি ভালবাস, যে ব্লাউজ তোমার পছন্দ,—মনে হ'বে তোমার সান্নিধ্য আরও নিবিড়ভাবে লাভ কর্‌ছি।

আমাদের গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াতেই উচ্চ ক্রন্দনের শব্দ কানে এল, সম্মুখের তেলিবাড়ী থেকে। তাদের বাড়ীর সাম্‌নে লোকজন জড়ো হ'য়েছে, মৃতদেহ বহনের জন্য একখানা দড়ির খাটিয়াও এসেছে।

বেদনাবিক্ষুব্ধ অশ্রুসজল কণ্ঠে মা বল্‌লেন, সুভদ্রা মারা গেল। শুনে, আমার চোখ ছলছল করে' উঠ্‌ল না, আজ রাত্রিবেলা যে চিত্ত আমার বিষণ্ণ হ'য়ে থাক্‌বে তাও নয়, অথচ এমনটি আমার স্বভাবও না। তবুও যে কেন দুঃখ অনুভব করছি না, কিচ্ছুটিই কেন মনে হচ্ছে না, তার হেতুটা আর একদিন বল্‌ব,—যেদিন অবসর থাক্‌বে বেশী, রাজ্যের ঘুমে চোখ ভেঙে আস্‌বে না, অনেক সময় নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে' যেদিন অনেক কথা [illegible] চল্‌বে।

তেলিবাড়ীর বউ মারা গিয়েছে,—এপারের দেনা পাওনা এই নারীর চুকল, ওপারের কথা ঠিক বল্‌তে পার্‌ব না। আমাদের পোর্চ্চের উপরকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম,—ওদের বাড়ীর সম্মিলিত ক্রন্দনের একটানা সুর কানে ভেসে আস্‌ছে। বাংলাদেশে মড়াকান্নার এই সুরটি বাঁধা, এটাকে এখন পরিবর্ত্তিত করা প্রয়োজন হ'য়েছে। জীবন ত আমাদের এম্‌নিতেই একঘেয়ে, তার উপর মরণটাকেও যদি এত বৈচিত্র্যহীন করে' তুলি, তাহ'লে বেঁচে ত সুখ নেই-ই কিন্তু মরেই বা ছাই সুখ কি! এই বিশেষ সুরে কান্না অথবা চীৎকার এটা এমন অশোভন এবং শ্রুতিকটু যে কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের শেষে ধূলিম্লান পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মধ্যে যে গাম্ভীর্য্য এবং পবিত্রতা থাকা উচিত, এই বাঁধা সুরের প্রলাপ পদে পদে অপমানের দ্বারা তাকে ক্লিষ্ট করতে থাকে।

আজ অনেক দার্শনিক তত্ত্বের কথাই মনে উদিত হচ্ছে। মৃত্যুর সম্মুখে চশমাবিহীন চোখে দাঁড়িয়ে দার্শনিক তত্ত্ব না মনে হওয়াটাই অস্বাভাবিক,—কিন্তু জাপানে ভূমিকম্পে পাঁচ হাজার লোক মরেছে, এ সংবাদের চেয়ে ছোড়্‌দির মাথা ধরেছে বলে' আজ সিনেমায় যাওয়া হ'বে না, এ অঘটন আমাদের কাছে ঢের বেশী গুরুতর, এবং এরই জন্য দুঃখের আর আমাদের পরিসীমা থাক্‌বে না।—আমরা এতই ছোট, এমন বিসদৃশ রকমের ক্ষুদ্র মন নিয়ে আমরা সংসারে বাস করি।—কিন্তু এ ত তত্ত্বকথা, অতএব এ-ও থাকে।

এই মৃত্যুপথযাত্রিণীর উদ্দেশে একটি ছোট নমস্কার করে' আজ আমার কর্ত্তব্য সমাপন করি। জীবন এদের কুৎসিত, মৃত্যু এদের মলিন,—জীবন এদের জীবন নয়, মৃত্যু এদের অসুন্দর। এরা বঞ্চিত, সর্ব্বপ্রকারে রিক্তের দল এরা, জীবনে-মরণে কোথাও এদের রুচির পরিচয় নেই। কিন্তু তবুও নাকের নিশ্বাস যখন আর বইবে না, চোখের তারা যখন আর নড়্‌বে না, রসনা যখন আর খরবেগে পরিচালিত হ'বে না, তখন ডাক্তাররা বল্‌বে মৃত্যু এল। সেই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করে' নিয়েই বল্‌ছি, তেলিবাড়ীর বউ মারা গেল,—ডাক্তারি সেই উক্তিকে স্বীকার করে' নিলাম বলেই বল্‌লাম, এই মৃত্যুপথযাত্রিণীর উদ্দেশে ছোট একটি নমস্কার করে' আমার কর্ত্তব্য সমাপন করি।

শনিবার, ৫ই অগাষ্ট—

এই যে ডায়্যারী লিখি এ শুধু তোমার জন্ত। বম্বে মেলে ওঠার সময় সেই যে তুমি বলে' গেলে ডায়্যারী যদি না লিখি তাহ'লে প্রতি মেলে চিঠি লিখ্‌বে না আমার কাছে, শুনে আমার চোখে জল এসেছিল, তাইত তখন রাগ করে' বলেছিলাম, বেশ ত না লিখ্‌লে চিঠি, ব'য়েই গেল। ভেবেছিলাম, তুমি জান যে আমাকে এর চেয়ে বড় আঘাত দেবার অস্ত্র আপাততঃ তোমার হাতে আর নেই, সেইজন্তই এমন কথা বল্‌তে পার্‌লে। কিন্তু কেন বল্‌বে তুমি ঠাট্টাচ্ছলেও অমন কথা?—ভাবলাম, লিখ্‌ব না আমি ডায়্যারী। এ শুধু তোমার দুষ্টুমি,—আমার মনের সকল কথা, তোমার সম্বন্ধে আমার যে চিত্ত অমৃত সাগরে রইল মগ্ন হ'য়ে, সেই চিত্তের সর্ব্ব অনুভূতির সন্ধান পেতে চাও তুমি দুষ্টুমি করে'! স্থির কর্‌লাম লিখ্‌ব না আমি ডায়্যারী। কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল, তোমার দুষ্টুমির উত্তরে আমিও কর্‌ব দুষ্টুমি, লিখব না ঠিক কথা,—সকল প্রশ্নকে যাব এড়িয়ে, দিনের পর দিন লিখে যাব লেখাপড়া, বেড়ানো ইত্যাদির ষ্টিরিয়োটাইপড্‌ কাহিনী।—তুমি পড়ে' হতাশ হ'বে, আমি বল্‌ব কেমন জব্দ!—যে উদ্দেশ্যে আমায় বলেছ ডায়্যারী লিখ্‌তে, তোমার সে উদ্দেশ্য গোড়া থেকেই জানি বলে' তা হ'বে ব্যর্থ।

—কিছুদিন থেকে রোজ কলেজ যেতে দেরী করে' ফেলি,—অধ্যাপকদের কুঞ্চিত ভ্রূ'র অসন্তুষ্ট দৃষ্টির পানে তাকাতে সাহস করিনে, মাথা নীচু করে' ক্লাসে প্রবেশ করি। পাঁচ ছ' দিন আগে স্থির কর্‌লাম, এ চল্‌বে না। পড়্‌বার ঘরের ঘড়িটাকে করে' দিলাম তিন কোয়ার্টার ফাষ্ট্‌, ভাবলাম এবার দেরী হ'বার আর জো কি! যাব সবার আগে ক্লাসে,—হয়ত এত আগে যাব যে সকলে মনে কর্‌বে ক্লাসের দরজা খোলা, বেঞ্চি ঝাড়ার ভার বুঝি বা আমার 'পরেই আছে। কিন্তু তা হয়নি, আমি ঠিক কন্‌সিষ্টেণ্ট্‌লি লেট্‌ হচ্ছি। ঘড়ির পানে তাকিয়ে যখন সময় হয়, তখন আমি তার থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদ দিয়ে হিসেব আরম্ভ করি, কারণ, ঘড়ির যে কারসাজী আমার দৌলতে সম্পন্ন হয়েছে, তা যদি না আমি নিজে ব্যর্থ কর্‌তে পারি, তাহ'লে লজ্জা রাখ্‌ব কোথায়! অতএব এখনও নত মস্তকে ক্লাসে প্রবেশ কর্‌ছি।

আমাকে তোমার ডায়্যারী লিখ্‌তে বলাও তেম্‌নি হ'ল ব্যর্থ, ঘড়িকে তিন কোয়ার্টার ফাষ্ট রাখার মত। বল্‌ব না তোমার সম্বন্ধে কোন কিছু, আমার মনের সকল কথা তোমার কাছ থেকে আমি আড়াল করে' রাখ্‌ব, তোমার দুষ্টুমির ফল পাবে তুমি হাতে হাতে।

—ডায়্যারীর আগের পাতাগুলো ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে এক জায়গার প্রতিশ্রুতিতে এসে দৃষ্টি গেল আবদ্ধ হ'য়ে। তেলিবাড়ীর বউ যেদিন মারা গিয়েছিল সেদিন লিখেছিলাম তার সম্বন্ধে,—বলেছিলাম, যেদিন ঘুমে চোখ ভেঙে আস্‌বে না সেদিন আমার ডায়্যারীর সাদা পাতায় তার জীবনের ইতিহাস লিখে রাখ্‌ব। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন কর্‌তে চাই।

কয়েকদিন আগে ওর শ্রাদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে,—ওর স্বামীর সম্বন্ধ স্থির হ'য়েছিল কিছুদিন পূর্ব্বে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই তার বিয়ে। এটা পরিহাসের ছলে বলিনি, কথাটা লিখে বিস্ময়ের চিহ্নটুকু অবধি দেব না।

আমাদের পাড়ার সদানন্দ কুণ্ডু একখানা জোরালো ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস,—ছোট জিনিষকে বড় করে' দেখ্‌বার এবং দেখাবার ক্ষমতা এ লোকটির অসাধারণ।

যেদিন আমাদের পাড়ায় নূতন উকীল ভাড়াটে এল সেদিন সদানন্দ কুণ্ডু রাষ্ট্র করে' দিল যে আমরা শীগ্‌গিরই হাইকোর্টের জজের প্রতিবেশী হ'ব। সওদাগরী অফিসের কেরাণীকে ও বলে, ম্যানেজার বাবু। ওর বাড়ীতে একতলার একখানা ঘর একবার সদানন্দ ভাড়া দিল এক ট্রামের কণ্ডাক্টারকে,—সদানন্দর মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে সে লোকটা নাকি ট্রামকোম্পানীর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার। কর্পোরেশানের বেলিফ ওর অনুগ্রহে কালেক্টার টু দ্য কর্পোরেশান হ'য়ে ওঠে, ব্যাঙ্কের কেরাণী হ'য়ে দাঁড়ায় ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার। প্রতি বস্তুতে ওর বিস্ময়,—সিমেণ্ট দিয়ে দেয়াল গাঁথ্‌লে ওর চমক লাগার সীমা

থাকে না, বাইরের ঘরে টেবিল চেয়ার নূতন করে' পালিশ করালে সদানন্দ চোখ বড় করে' চেয়ে থাকে এবং জিভ বড় করে' আলোচনা করে।

ভারী সরল প্রকৃতির লোক ও, লোকে বলে। বুড়ো মানুষ, বছর পঁয়ষট্টি বয়স, ঝক্‌ঝকে টাকপড়া মাথা, ক্ষৌর-কার্য্যের সাহায্যে সুমসৃণ মুখমণ্ডল, রোগা মিশকালো তালগাছের মত লম্বা চেহারা, পুরোপুরি ছ'ফুট ত বটেই, হয়ত তার বেশীও হ'তে পারে। তেল চক্‌চকে বাঁশের লাঠির মত পাকানো শরীর, দাঁত অনেকগুলো নেই,—ফোক্‌লা মুখে সব সময়ে এক গাল হাসি লেগেই আছে, লোকে বলে ও-হাসি নাকি সরলতার হাসি।

ভারী সৌখীন প্রকৃতির লোক ওই সদানন্দ, শাড়ী ছাড়া পরে না,—ছোট্ট ছ'হাত শাড়ী, তা আবার তিন-পাড় হওয়া চাই! সেইটা পরে' সকালবেলা সদানন্দ তার বাড়ীর রোয়াকে বসে' থাকে, দুপুরবেলা পড়াময় ঘুরঘুর করে' ঘুরে বেড়ায় এবং প্রত্যেকের ঘরের নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহের জন্য অনলস আন্তরিকতার সহিত করে পরিশ্রম।—সন্ধ্যাবেলা আবার কখনও নিজের রোয়াকে বসে, বেশীর ভাগ সময়েই বসে অপরের বারান্দায়, এবং সেখানে বসে' জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাড়ীর ভিতরটা দেখ্‌বার জন্য ওর অত্যধিক আগ্রহ! এই আগ্রহের প্রমাণ মধ্যাহ্নকালেও সদানন্দ অজস্র পরিমাণে দিয়ে থাকে।

ওর ছেলে পরে গামছা, ও পরে শাড়ী। সেদিন পাড়ায় বারোয়ারীর চাঁদা চাইতে লোক এল ওদের বাড়ী,—শাড়ী গামছা পরে পিতাপুত্রে এসে দাঁড়াল বাড়ীর রোয়াকে। তারপর চাঁদা দেওয়ার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে হাত পা মুখ নেড়ে সেই ছেলের দলের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধরে' আলোচনা, যারা চাঁদা চাইতে এসেছিল তাদের সঙ্গে। আলোচনা অবশেষে বিতণ্ডায় পরিণত হ'ল,—একঘণ্টা কোলাহলের পর সদানন্দ বল্‌ল চাঁদা দেওয়ার তার সুবিধে হ'বে না।

সুভদ্রা এই বাড়ীর বউ, মাসখানেক আগে সে-ই মারা গিয়েছে।

ওর শাশুরীর দিকে তাকিয়ে আমাদের শ্রীর আর শ্রদ্ধার সীমা নেই, আমার কোল ঘেঁসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুণ্ডু বাড়ীর রোয়াকে উপবিষ্টা সদানন্দগৃহিণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' শ্রী বলে, "পিতি, ব্যাং কোলা,—মস্ত ব্যাং কোলা—" একটু থেমে দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে দিয়ে আয়তন পরিমাপ কর্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস করে' বলে, "এই এত্ত বলো ব্যাংকোলা—"

রাজ্যের গাম্ভীর্য্য ওর মুখে নেমেছে, বিপুল শ্রদ্ধায় ওর দুই চোখ দীর্ঘায়ত। কোলা ব্যাংকে উল্টিয়ে নিয়ে শ্রী বলে, "ব্যাং কোলা" এবং সেই কথাটি সদানন্দগৃহিণীর প্রতি সে প্রয়োগ করে। অমন নিরেট বেঁটে খাটো জোয়ান মূর্ত্তি আমি অদ্যাবধি আর কোনও নারীর দেখিনি,—এ যে হ'তে পারে, যারা একে না দেখেছে তাদের পক্ষে সেকথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। ও যেন মেয়ে অষ্টাবক্র। তিনি যে কেমন ছিলেন, তা সদানন্দপত্নীকে দেখে আন্দাজ কর্‌তে পারি। সে যখন চলে, তখন একবার ডানদিকে কোমর বাঁকায়, একবার বাঁকায় বাঁদিকে, যেন অত্যন্ত নড়্‌বড়ে ষ্টীমরোলার।—ওকে ""ব্যাং কোলা" বলে' শ্রী কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি করেনি।

ওরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রীতে বাড়ীর রোয়াকে বসে' থাকে।—সকালবেলা দেখি উভয়ে মিলে বেগুনী খাচ্ছে,—সদানন্দ-গিন্নীর কাপড়ের আঁচলে মুড়ি আর বেগুনী, আঁচল পেতেছে ও রোয়াকের 'পরে। তারপর খুব দু'জনে চলেছে আলোচনা,—আর প্রত্যেকে এক এক গ্রাসে গাদাখানেক মুড়ি এবং গোটা গোটা বেগুনী নিঃশেষ কর্‌ছে। সদানন্দগিন্নীর ভালো নাম জানিনে, কিন্তু ডাক নাম জানি। মুড়ি কিনে এনে সদানন্দ রোয়াকে বসে' ডাকে, "খেঁদি, মুড়ি খাবি আয়।"

ও বেরিয়ে আসে,—এইবার সুরু হয় ওদের রাজ্যের আলাপ, অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে পাড়ার লোকের নিন্দে, বয়স্থা মেয়ে এবং বধূদের কুৎসা এবং অজস্রভাবে হাসি। যে সদানন্দ ফোক্‌লা দাঁতে সরল হাসি হাসে, নূতন পালিশ করা টেবিল চেয়ার দেখ্‌লে যার বিস্ময়ের সীমা নেই, কোনও ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে হ'লে যে মাথা চুল্‌কে চুল্‌কে সারা হয় এবং বোকার মত ঠোঁটে ঝুলিয়ে হাঁ করে থাকে, সে যে কিরকম ভাষায় কথা কইতে পারে এবং ধূর্ত্তামি তার

যে কত প্রচুর, খেঁদির সঙ্গে সদানন্দর একদিনের বিশ্রম্ভালাপ শুনলেই তা টের পাওয়া যাবে।

মুড়ি খেতে খেতে সদানন্দ আবার মাঝে মাঝে সাম্‌নের রাস্তায় পায়চারী করে' বেড়ায়।

খেঁদি জিজ্ঞেস করে, "আর বেগুনী খাবিনে ?"

সদানন্দ বলে, "ক'টা খেয়েছিস্ তুই ?"

"হিসেব করে' খেয়েছি নাকি! আর একটা বাকী আছে, খাস্ ত বল্—"

সদানন্দ বোঝে খেঁদি যখন বেগুনীর সংখ্যা বল্‌তে নারাজ, সে সম্বন্ধে যখন ওর সঙ্কোচ আছে, তখন সংখ্যাটা নিশ্চয়ই নেহাৎ ছোট হ'বে না, অতএব ও-ই খায় বাকী বেগুনীটা। খেঁদি সদানন্দকে "তুই" করেই বলে, সদানন্দও তাই। ওরা পরস্পরের অত্যন্ত নিকট, "তুমি"র দূরত্বটুকুনও ওরা সইবে না।

এদের বাড়ীর বউ সুভদ্রা একদিন একখানা দ্বিতীয় ভাগ আর ফার্ষ্টবুক সন্তর্পণে একটি ক্যাশবাক্সের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে গৃহপ্রবেশ কর্‌ল। আট বৎসর তখন তার বয়স,—সদানন্দর নিয়মের হিসেবে সুভদ্রার একটু বেশী বয়স হ'য়েছিল, ছ' বছরটাই ডিসেণ্ট, তার কম হ'লেই ভালো হয়, কিন্তু বেশী হ'লে নাসিকা কুঞ্চিত করা ছাড়া আর উপায় নেই।

এই যে সুভদ্রার "দ্বিতীয় ভাগ" এতেই প্রথমে কুণ্ডুবাড়ীতে আগুন জল্‌ল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে বারান্দায় পা ছড়িয়ে সুভদ্রা যেদিন "উ আর দ-য়ে ধ-য়ে ব ফলা রেফ্ ঊর্দ্ধ,—ম-য়ে দীর্ঘ উ-কার আর দ-য়ে ধয়ে ব ফলা আকার মূর্দ্ধা" পড়্‌তে বস্‌ল, সেদিন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে খেঁদি আর তার ছেলেমেয়েরা হি হি করে' হেসে বল্‌ল, "দেখ্‌সে আয় তোরা, আমাদের বাড়ী মেয়ে বিদ্যেসাগর এয়েছে—"

সুভদ্রা চোখ পাকিয়ে তাদের পানে চেয়ে বেশী করে' জিভ বার করে' ভেংচি কাট্‌ল।

সে বলেছিল, বিয়ের দিন একটা ভাঙা থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ী করে' বর ত বিয়ে কর্‌তে এল। মেয়ে সাজিয়ে যখন সভাস্থ করা হ'ল তখন কিন্তু বরের দেখা পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে সে যে কোথায় সরেছে তা কেউ জানে না। হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার, খোঁজ খোঁজ চারদিকে খোঁজ, কোথাও বরের সন্ধান নেই। এদিকে লগ্ন যায় অতিক্রান্ত হ'য়ে,-সুভদ্রার বাবা পাগলের মত হ'য়ে উঠ্‌লেন, সদানন্দ ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত খামোকা খামোকা তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ কর্‌ল। তার সঙ্গের লোকজন কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিদের অকারণে শাসাতে সুরু করেছে, এমনি সময় সুভদ্রাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশ ঝোপের ভিতর থেকে ভদ্রার এক ভাই আবিষ্কার কর্‌ল সাতকড়িকে নিঃশেষে ফুঁকে দেওয়া গাঁজার এক কল্‌কের পাশে অজ্ঞান অবস্থায়। নেশার সময় উপস্থিত হওয়াতে নিরালায় বিবাহের আনন্দে অতি-উৎসাহে গাঁজা টান্‌তে গিয়ে কেমন করে যেন এটা ঘটে গিয়েছিল।

জল পাখার আশ্রয় নেওয়া হ'ল—বহুক্ষণের চেষ্টার পর রক্তনেত্র উন্মীলন করে' সাতকড়ি উঠে বসে' প্রথমেই একচোট বক্তৃতা দিয়ে, ভাবী শ্বশুর এবং শ্বশুরবাড়ীর কুটুমদের কড়া ভাষায় গালাগালি দিয়ে বল্‌ল, "ব্যাটারা, জমাট নেশাটা মাটি করে' দিলি!—"

এই পর্য্যন্ত বলে সুভদ্রা হেসেছিল।—ওকে আমার মনে হ'ত রক্তশোষা বাদুড়! ও যেন তেলিবাড়ীর লোকগুলোর রক্ত শুষে খাবে, ওদের ভিতরে কোনও পদার্থ আর রাখ্‌বে না যেন সুভদ্রা। তার সম্বন্ধে গুরুতর একটা অন্যায়ের ভয়াবহ কোনও প্রত্যুত্তরের জন্য যেন ভদ্রা জীবন বহন করে' বেড়াচ্ছে।

সে বলেছিল অবশেষে হ'ল বিয়ে। ভীত দৃষ্টি মেলে সেই শিশু মেয়ে বসে' রইল, রাঙা দুই চোখ পাকিয়ে সাতকড়ি কর্‌ল শুভদৃষ্টি।

তারপর এই বউ এল দ্বিতীয় ভাগখানা তার ক্যাশ বাক্সের মধ্যে ভরে' নিয়ে।

সুভদ্রার জীবনের অনেক কাহিনী, প্রায় সব কাহিনীই, আমাদের বাড়ীর সকলে তার মুখ থেকে শুনেছে।

কিন্তু এই যে ডায়্যারীর পাতায় সুভদ্রার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছি, এতে তুমি অসন্তুষ্ট হ'বে না ত?

বল্‌বে না ত, কি দরকার ছিল এর, এই কথাই তোমাকে লিখ্‌তে বলেছিলাম না কি?—তা যদি বল, অর্থাৎ যদি এখানে বসে' এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর ব্যবধান হ'তে অনুভব করতে থাকি যে তুমি মৃদু হেসে বলছ, বাবলু, লেট্ আস্ চেঞ্জ্ দ্য টপিক, তাহ'লে আমি আমার গল্পের সুর পরিবর্ত্তিত করি। কিন্তু তা ত বোধ করছি না, বরং মনে হচ্ছে যেন তোমার বড় বড় চোখ আমার মুখের পানে তুলে শান্ত কৌতুহলী দৃষ্টিতে আমায় জিজ্ঞাসা করছ, "থাম্‌লে কেন? বল, তারপর—"

তারপর সেই মেয়ে এল শ্বশুরবাড়ী দ্বিতীয় ভাগখানা তার বাক্সের মধ্যে পুরে নিয়ে।

সেইদিন থেকে তেলিবাড়ীতে যে গজকচ্ছপের লড়াই সুরু হ'ল তার' পরিসমাপ্তি ঘট্‌ল মাত্র মাসখানেক আগে সুভদ্রার মৃত্যুতে। আর পরিসমাপ্তিই বা বলি কেমন করে? যে বীজ সুভদ্রা বপন করে' রেখে গেল, সে বীজ একদিন মহান মহীরুহে রূপান্তরিত হ'য়ে ফল দান করবে। সেই মহৎ কার্য্যের সাফল্য ইতিমধ্যেই হ'য়ে উঠেছে পরিস্ফুট। অতএব সুভদ্রা মরেছে বলেই যে এ সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেছে তা নয়,—এর আর শেষ নেই, কুণ্ডুবাড়ীর প্রতি মানুষটি পর্য্যন্ত একেবার সমাপ্ত না হ'য়ে যাওয়ার পূর্ব্বে এর আর ইতি হবে না। আর সে শেষ হওয়াও যে কি অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে শেষ হওয়া, সেকথা ত আজ সারা পৃথিবীর যারা এই করাল ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী তারা আর্ত্তনাদ করে' বারংবার বলছে। কিন্তু সে সব এখন থাক।

একটা কথা পরিষ্কার করে' বলি। গজকচ্ছপের লড়াই বলছি বলে' যেন একথা মনে কোরো না যে সুভদ্রা এবং তার শ্বশুর শাশুরীর কাহিনী বধূকণ্টক শ্বশুর শাশুরী এবং শ্বশুর শাশুরীকণ্টক বধূর ইতিহাস। কদাচ তা নহে নহে নহে!—বাইরের ঝগড়াবিবাদের চেয়ে সুভদ্রার সম্বন্ধে ওদের মানসিক ভীতি ছিল বেশী। আমি কতদিন দেখেছি, রাস্তার ধারের রোয়াকের 'পরে বসে' বেগুনী খেতে খেতে, দরজার কাছে সুভদ্রাকে আসতে দেখে সদানন্দ আর খেঁদি নিদারুণ ভয়ে পাথর হ'য়ে গিয়েছে, ওদের মুখ টাট্‌কা-পাট-খোলা বিছানার চাদরের চেয়েও সাদা।

ঠোঁটের বাঁদিককার কোণটা একটুখানি গোল করে' তার চেয়েও কম করে' একটুখানি হাস্‌বার ভঙ্গীর পর সুভদ্রা বাড়ীর ভিতর চলে' গেল। এ দৃশ্য ত আমি নিজের চোখে কতদিন দেখেছি।

সুভদ্রা চলে' যেতেই মনে হ'ল যেন সদানন্দ আর খেঁদির কাঁধের উপর থেকে আরব্যোপন্যাসের সিন্ধবাদ নাবিকের স্কন্ধোপবিষ্ট সেই নিষ্ঠুর দৈত্যটা নেমে গিয়েছে, মনে হ'ল যেন ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর পৃথিবী শান্ত, ঘন ঘন শাঁখ বাজিয়ে বাসুকীর দুর্জ্জয় ক্রোধকে প্রশমিত কর্‌বার আর চেষ্টা করতে হবে না।

কিন্তু যখন বল্‌তে আরম্ভ করেছি, তখন ভদ্রার কাহিনীটা প্রথম থেকেই বলি।

সুভদ্রা যে বাড়ীর মেয়ে, সে বাড়ীতে লেখাপড়ার খানিকটা চর্চ্চা ছিল, খুব বেশী কিছু নয় তবুও একটু ছিল। ওর বাবা উকীল, ভাইয়েরাও চলনসই রকমের পড়াশুনা করে' কেউ চাকরী করে,' কেউ বা ব্যবসাদার।

সুভদ্রার ছোড়্‌দা কণ্ট্র্যাকটারী করেন। তিনি ভদ্রার চেয়ে দু' বৎসরের বড়। এই ভাইয়ের সম্বন্ধে ভদ্রার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যেন সীমা ছিল না। নিজের প্রতি সহস্র অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য কর্‌তে পার্‌ত, কিন্তু ছোড়্‌দার তুচ্ছতম অসম্মানটুকুও তার সইত না। বাঘিনী যেমন করে' তার শাবককে রক্ষা করে, রণজিৎকুমারের মর্য্যাদাও সুভদ্রা তেমনই করে রক্ষা করত। ভাইয়ের মুখের একটি উক্তির জন্য ওর পক্ষে যে-কোনও কাজ করা সম্ভব ছিল। শ্রদ্ধাপ্রীতির এমন উগ্র রূপ পৃথিবীতে অদ্যাবধি ক'জনের যে চোখে পড়েছে, তা জানিনে।

আমি ভদ্রার এই ছোড়্‌দাকে দেখেছি। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ, ঋজু চেহারা,—দেহের গঠনকে রোগাই বলা যেতে পারে, কিন্তু চোখ দু'টির মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধ দীপ্তি এবং মুখের গড়নে সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য ও শিক্ষা এবং ভদ্রতার এমন একটি সমাবেশ দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে মনে মনে বিস্ময় বোধ হ'য়েছিল। ওই পরিপার্শ্বের লোকের কাছ থেকে ঠিক যে এতটা প্রত্যাশিত তা নয়। মনে হ'ল ভাইয়ের সম্বন্ধে

সুভদ্রার উচ্ছ্বসিত উক্তির মধ্য থেকে ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য বাদ দিলেও সত্যের পরিমাণ যা থাকে, তা একেবারে তুচ্ছ করবার মত নয়।

সুভদ্রার বয়স যখন সাত এবং ওর ছোড়্দার নয়, তখন ভদ্রা একবার ওদের বাড়ীর পুকুরে ডুবে যায়। পাড় থেকে তাই দেখে রণজিৎকুমার দিলেন জলে ঝাঁপ, কিন্তু অতটুকু ছোট ছেলের পক্ষে ভদ্রাকে জল থেকে টেনে তোলা সম্ভব ছিল না। যথেষ্ট পরিমাণে জল উদরস্থ ক'রে' দু'জনেই যখন নীচের দিকে তলিয়ে গেল, তখন বাড়ীতে পড়্ল ছেলে-মেয়ের সন্ধান, এবং অবশেষে বাড়ী সুদ্ধ লোক এসে সলিল-সমাধি থেকে ভাইবোনকে উদ্ধার কর্ল। এ কাহিনী ভদ্রা যে আমার কাছে কতবার বলেছে! বল্তে বল্তে তার চোখ জলে ভরে' যেত, আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আস্ত, সে বল্ত, "ছোড়্দা আমার জন্য কর্তে পারে না এমনতর ত্যাগ নেই।—আমি কোনও অসুবিধায় পড়্লেই ও যে কোথা থেকে এসে হাজির হ'ত! অন্য মেয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া বেধেছে, ছোড়্দা হঠাৎ উপস্থিত,—মাষ্টার মশাই শক্ত অঙ্ক দিয়েছেন, কিছুতে না কর্তে পেরে ভয়ে কেঁদে ফেলে দু'হাতে চোখ রগ্ড়াচ্ছি,—কোথায় ছিল ছোড়্দা, ঠিক টের পেয়েছে,—লুকিয়ে এসে অঙ্ক কসে দিয়ে গেল।—জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমার ছোড়্দার প্রীতি, আমার ছোড়্দার স্নেহ, একমুখে বলে শেষ কর্বার নয়। সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ, সামান্য অসামান্য কত কাজে যে আমরা দু'ভাই-বোনে পাশাপাশি চলেছি তা আমি কাউকে বলে' বোঝাতে পার্ব না। সন্ধ্যাবেলায় যখন আমি ঠাকুর নমস্কার করি তখন বারবার এই কথাই বলি, ওগো ভগবানের চিরজাগ্রত দৃষ্টি, আমার প্রিয়জনদের দিকে চোখ রেখো, তাদের শান্তিতে রেখো, আমার ছোড়্দাকে সুখে রেখো, আমি তাদের সকলের জন্য প্রতিভূ রইলাম—" বলে' সুভদ্রা একটুখানি চুপ করে' রইল, তারপর কি ভেবে বল্ল, "ভগবান কেমন করে' পৃথিবী রক্ষা করেন আমি জানিনে, কিন্তু মনে হ'ত ছোড়্দা যেন সর্ব্ব বিপদ, সকল দুঃখ থেকে আমাকে চিরকাল আড়াল করে' রাখ্বে। শৈশবে যে, সব জিনিষ এত পরিষ্কার করে' বুঝ্তে পার্তাম তা নয়, কিন্তু কেমন করে' যেন বিশ্বাস হ'য়ে গিয়েছিল জল না হ'লে যেমন বাঁচ্ব না, আলো বাতাস না হ'লে যেমন এক মুহূর্ত্তও টিক্‌ব না, ছোড়্দা ছাড়া তেমনিতর একদণ্ডও আমার চল্বে না।"

সুভদ্রা বল্ত যে, বিবাহের পর নিজের প্রিয়জনদের ত্যাগ করে' মেয়েদের যে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন বংশের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়ার দুঃসাধ্য চেষ্টা,—যাদের সঙ্গে কোন কিছুতে না মিল্বার সম্ভাবনাই ষোল আনা তাদের সঙ্গে মিল্বার ক্লান্তিকর প্রয়াস—এক অজানা সংসারে প্রবেশপূর্ব্বক সম্পূর্ণ অনাত্মীয় এবং বিপরীতধর্ম্মী মানবদের কাজে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে' পরমাত্মীয়তার অভিনয় কর্তে বাধ্য হওয়া, এবং তারই ফলে জীবনে যারা প্রকৃতপক্ষে নিকটতম ছিল তাদের সুদূরতম করে' তোলা, এর তুল্য ট্র্যাজেডি নাকি পৃথিবীতে আর নেই,—অথচ সারা বিশ্বে এ মর্ম্মান্তিক ব্যাপার ত নিত্য নিয়তই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেয়েদের জীবনে এটা সবচেয়ে বড় অভিশাপ,—ভগবানের এ অপূর্ব্ব বিধানের অর্থ সুভদ্রা বুঝ্ত না।

মনে রেখো কথাগুলো আমার নয়, ভদ্রার। অতএব এ নিয়ে আমার সঙ্গে দাম্পত্য কলহ, যদিও তা কিছুক্ষণ পরেই লঘু ক্রিয়ায় পরিণত হ'বে জানি, তবুও তা চালাবার হেতু নেই।

সুভদ্রা এ কথাটা সব সময় অতিশয় তীব্রভাবে অনুভব কর্ত যে পৃথিবীর লোকেরা তার সঙ্গে অতীব অভদ্র আচরণ করেছে। ভদ্রার বিবাহটা যে ওর প্রতি ঘোরতর অবিচার, এ বিষয়ে ওর মনে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং এক্ষেত্রে ভদ্রার সঙ্গে তার ছোড়্দা রণজিৎকুমারের ছিল মত-সাদৃশ্য। ছোড়্দা যে সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছে তা থেকে তিলপ্রমাণ এদিক ওদিক হওয়া সুভদ্রার পক্ষে অসম্ভব। অতএব শ্বশুর কুলের সঙ্গে অতিরিক্ত বিরোধের মধ্য দিয়ে ভদ্রার জীবন সুরু।

ছোটবেলায় শিশু ভদ্রা শ্বশুর বাড়ীতে পদে পদে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাটা পছন্দ কর্ল না,—একে ত পিতামাতা, ভাইবোন এবং বিশেষ করে' ছোড়্দাকে ছেড়ে এসে মেজাজ ছিল প্রথম হ'তেই বিগ্ড়িয়ে, তার উপর ওই

গেঁজেল স্বামী, কোলা ব্যাংএর মত শ্বাশুরী, তিন-পাড় শাড়ী পরা সৌখীন প্রকৃতির শ্বশুর এবং এদেরই সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে রকম বে-রকম টাইপের দেবর, ননদ এবং যা প্রভৃতিদের দর্শন পেয়ে সুভদ্রার মেজাজ যে উন্নতি লাভ করল না, সে কথা বোধ হয় না বল্‌লেও চলে।

ওদিকে রণজিৎকুমার বোনের বিচ্ছেদ বেদনায় দিন কয়েক হাত পা ছুড়ে কেঁদে অবশেষে শান্ত হলেন। শিশু ভদ্রা বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় পিতৃগৃহে এবং অবশিষ্ট কাল শ্বশুর বাড়ীর কড়া শাসনে কাটিয়ে ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

ভদ্রার স্বামীর হাতে উল্কী, শুধু হাতে নয়, গায়েও। দু'হাতে এবং বুকের 'পরে বিভিন্ন ধরণের অনেকগুলি মূর্ত্তি আঁকা আছে। এ জিনিষটা সুভদ্রাকে যেন ভিতরে ভিতরে চাবুক কষাতে থাকৃত,—তার উপর এই স্বামী যখন অত্যন্ত ইতরজনোচিত বাংলা উচ্চারণে ওর প্রতি প্রেম নিবেদন এবং রসিকতা কর্‌ত তখন ভদ্রার অতিশয় ভয় হ'ত যে আর আত্মসংবরণ কর্‌তে না পেরে এবার হয়ত ও একটা গুরুতর কিছু করে' বস্‌বে। কিন্তু এই প্রেমিকতার চেষ্টা সাতকড়ির বেশী দিন চলেনি,— সুভদ্রার ভিতরকার নিষ্ঠুরা নারীটিকে সে অবশেষে যমদূতের চেয়েও বেশী ভয় কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

একদিন গাঁজা খেয়ে সাতকড়ি যখন রাস্তার দিক্‌কার রোয়াকের 'পরে বসে' সপ্তম স্বর্গে বিচরণ কর্‌ছে এমনই সময় সম্মুখের পথ দিয়ে একজন ভদ্রলোককে চলে' যেতে দেখে সে একেবারে হৈ হৈ করে' উঠ্‌ল, "যুধিষ্টির দাদা, যুধিষ্টির দাদা—"

ভদ্রলোক ত একেবারে স্তম্ভিত! সাতকড়ি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে' বল্‌ল, "আমি ভীম, যুধিষ্টির দাদাকে ডাক্‌ছি—"

ভদ্রলোকের মুখ এবার কৌতুকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। মুচ্‌কি হেসে সাতকড়ি বল্‌ল, "যুধিষ্টির দাদা, সেই আনারসের গানখানা গাও ত দাদা"—বলে' নিজেই আরম্ভ কর্‌ল, "কমলা লেবুরে সিলেটেতে জন্ম তোমার, বেলেঘাটায় বাস—" বলে' হাতে তুরি দিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে বারংবার বল্‌তে লাগ্‌ল, "সিলেটেতে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় বাস—"

ভদ্রলোক হাস্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা আদ্যোপান্ত সুভদ্রার দৃষ্টিগোচর হ'ল, আর সইতে না পেরে এতক্ষণ পরে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। ভদ্রার চোখ দিয়ে তখন ঘৃণা এবং ক্রোধ যেন যুগপৎ ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে! আতঙ্কে সাতকড়ির মাথা নাড়া এবং সঙ্গীতলহরী বন্ধ হ'য়ে গেল। ঘাড় হেঁট করে' সে একেবারে নীরব,—পথচারী ভদ্রলোকটি চলে' গেলেন। —সুভদ্রা কিছুক্ষণ নতমস্তক সাতকড়ির দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটি কথাও না বলে' ভিতরে চলে' গেল।—এতক্ষণ পরে মাথা তুলে' একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে সাতকড়ি কেবল বল্‌ল, "ব্‌-বা-ব্‌-বা—"

এর বেশী কিছু বল্‌বার তার শক্তিও ছিলনা সাহসও ছিল না।

সুভদ্রা ওর চোখ দুটো দিয়ে সমস্ত বাড়ীটাকে যেন গিলে খেতে লাগ্‌ল। ভদ্রার দৃষ্টি ইস্পাতের মত শাণিত এবং শ্রাবণ মাসের বর্ষণ পূর্ব্বের আকাশের ন্যায় অতলস্পর্শ। ওর মনের মধ্যে একটি ভদ্র নারী বাস কর্‌ত, তাকে ওর জন্মসূত্রে পাওয়া। আটবছর বয়সে যখন ভদ্রার বিয়ে হয় তখন সে ছিল বিবর্দ্ধমানা,—ষোল বছর বয়সে যখন ওর জীবনের বিরোধ কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে উঠেছে, তখন ওর ভিতরকার সেই সুভদ্রা মেয়ে দুঃখে ম্লান, ব্যথায় স্তিমিত। ভদ্রা ক্রমে মন স্থির ক'রে ফেল্‌ল সদানন্দবংশকে সে শিক্ষা দিয়ে ছাড়্‌বে।—আটাশ বৎসরের যে বধূ সেদিন পরলোকের পথে যাত্রা কর্‌ল, তার অন্তর্নিহিত চিত্ত পাথরের চেয়েও কঠিন, কারাগৃহের প্রাচীরের চেয়েও নিশ্ছিদ্র।—সদানন্দবংশকে শিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি যে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে' গিয়েছে,—এর চেয়ে বড় কামনা তার ছিলনা, সার্থকতার ভয়ঙ্কর আনন্দ নিয়ে সে দেহত্যাগ করেছে, তার জীবনের উদ্দেশ্য সে সফল করে' গেল।

খেঁদি বল্‌ল, "বউমা, তোমার ভাই এয়েছে তোমাকে

নিয়ে যেতে,—এখন ত তোমার যাওয়া হ'তে পারে না,—বাড়ীতে সব অসুখ-বিসুখ, তোমার ভাইকে বারণ করে' দিনু"—

শশব্যস্তে সুভদ্রা বল্‌ল, "চলে' গিয়েছেন ছোড়্‌দা ?"

"না, তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে' বসে' আছে—"

ভদ্রা ছুটে এসে রণজিৎকুমারকে প্রণাম করল, বল্‌ল, "তুমি বোসো ছোড়দা,—আমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিতে আধঘণ্টার বেশী লাগ্‌বে না—"

সদানন্দ এসে দরজার পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে বল্‌ল, "বউমা, এখন না গেলেই ভালো হ'ত, সাতকড়ির অসুখ, কেলোর জ্বর, পটলীর পেটের ব্যামো —"

সুভদ্রা চোখ তুলে চাইল, বর্ণহীন চোখ, ভাবহীন মুখ, অথচ সেই চোখ মুখের দিকে চাইলেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায় যে একটা রুদ্ধ আক্রোশ তার নীচে নিরীহভাবে আত্মগোপন করে আছে। সদানন্দ দ্রুতপদে অন্তর্হিত হ'তে পথ পেল না। রণজিৎকুমারের জন্য সুভদ্রা পয়সা বার করে' খাবার আন্‌তে দিল,—দিল আবার খেঁদির হাতেই, বল্‌ল, "কাউকে পাঠিয়ে দিন শিগ্‌গির করে' দোকানে, রসগোল্লা আর গরম গরম খাস্তা কচুরী যেন নিয়ে আসে, আর যেন আনে শিঙ্গাড়া,—দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়ে আনে যেন,— যদি বেশী পয়সা চায় তাই দেবে,—ভালো চা আন্‌তে দিন্‌,—ছোড়্‌দার জন্য চা করব—"

খেঁদি যেন ওর পাঁচকড়ায় কেনা দাসী, সদানন্দ যেন ওদের বাড়ীর বাসন মাজা চাকর, এমনিতর সুভদ্রার আচরণ,—এবং ওর এই রকম আচরণই কুণ্ডুবাড়ীতে ক্রমশঃ প্রচলিত হ'য়ে আস্‌ছে। ভদ্রার মুখের মাংসপেশীগুলো নির্দ্দয়, চোখের দৃষ্টি নির্ম্মম এবং সমস্ত আচরণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সুভদ্রার অসাক্ষাতে তার উদ্দেশে খেঁদি এবং সদানন্দর বিষ উদ্গীরণের শেষ নেই এবং সম্মুখে আতঙ্কের পরিসীমা নেই। ভদ্রা বেশী কথা কয় না,—সেইজন্যই সে যে কখন ওদের কোন্‌দিক দিয়ে কেমন ভাবে আঘাত দেবে, তা ভেবে ভেবে খেঁদি-সদানন্দর মনে আর স্বস্তি নেই।

কিন্তু খাবার এল এবং পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ভাইয়ের হাত ধরে' সুভদ্রা পিতৃগৃহে প্রস্থান কর্‌ল।

সে চলে' যেতেই খেঁদি এবং সদানন্দ রোয়াকের 'পরে দাঁড়িয়ে সমস্বরে চীৎকার করে' বল্‌ল, "বজ্জাত মেয়েমানুষ—"

খেঁদি তার কোমরে দুই হাত দিয়ে ফীল্ড্‌ মার্শ্যালের মত দাঁড়িয়েছে,—সদানন্দ ঠিক বোল্‌তা-কামড়ানো লোকের মত ছট্‌ফটিয়ে বেড়াচ্ছে, বাড়ীর সব ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য পুত্রবধূরা সকলেই রোয়াকের 'পরে এসে উপস্থিত। তারপর সে কি নোংরা ভাষায় সমস্বরে সুভদ্রার উদ্দেশে গালাগালি! —মনে হ'ল, কুণ্ডুবাড়ীর বিষাক্ত বাতাসের পাত্‌লা চামড়ার থলিটাকে ভদ্রা যেন যাবার সময় ফুটো করে' দিয়ে গিয়েছে।

নবীনবাবু বাবার বন্ধু,—তুমি ত তাঁকে আমাদের বাড়ীতে বহুবার দেখেছ। নিরীহ, নির্ব্বিরোধী লোক, কিন্তু একবার রাগ্‌লে পরে আর জ্ঞান থাকে না। তিনি এসে তাঁর বাড়ীর দরজায় দাঁড়ালেন, রাস্তায় নেমে সদানন্দকে ডেকে কঠিনভাবে বল্‌লেন, "এটা ভদ্রপল্লী, আপনারা বাড়ীসুদ্ধ লোক মিলে পথের উপর দাঁড়িয়ে এমন বিশ্রীভাবে হল্লা কর্‌তে পারেন না,—যদি করেন তাহ'লে আমি অপ্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন কর্‌তে বাধ্য হ'ব—"

দাঁত ফোক্‌লা হ'লেও সদানন্দ অতিশয় ধূর্ত্ত, শক্ত লোক দেখ্‌লে সে চিন্‌তে পারে। ফিরে গিয়ে খেঁদিকে ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র রাস্তার কোলাহল গুটিয়ে বাড়ীর মধ্যে স্থান লাভ কর্‌ল, এবং তারই আভাস বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থেকে থেকে আমাদের কানে এসে পৌছতে লাগ্‌ল।

এর তিন মাস পরে ফির্‌ল সুভদ্রা বাপের বাড়ী থেকে।

একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে অকস্মাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল,—রাস্তায় বহুলোকের কলরব। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম,—কুণ্ডুবাড়ীর সম্মুখে জনতা।

সদানন্দর মেজ ছেলেকে পুলিশে ধরে' নিয়ে গিয়েছে,—এইমাত্র তার এক বন্ধু এসে সংবাদ দিয়ে গেল। কুণ্ডু ত নূতন পালিশ করা টেবিল চেয়ার দেখ্‌লেই নানারকমভাবে

কোলাহল করতে থাকে, অতএব তার মেজ ছেলেকে পুলিশে ধরে' নিয়ে গিয়েছে, রাত্রি একটার সময় এ খবর পেয়ে সে যা কলরবটা করল, তা সহজেই অনুমেয়। সদানন্দ আর খেঁদি কড়া নেড়ে নেড়ে সব বাড়ীর লোকদের ঘুম ভাঙিয়াছে,—সকলের হাতে ধরে' এবং পা জড়িয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে, তাদের কুলতিলককে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য। খেঁদি তার জলদগম্ভীরস্বরে সেই রাতদুপুরে চীৎকার লাগিয়েছে, "ওরে কেলোরে, কি করলি রে বাপ আমার—"

নবীনবাবু সদানন্দকে বললেন, "শশাঙ্ককে ধরুন, ব্যারিষ্টার মানুষ, থানার দারোগাকে দুটো কথা বুঝিয়ে বললেই ছেড়ে দেবে'খন।"

সদানন্দ আবার মাটিতে বসে' পড়ে' নবীনবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরল, বলল, "ওঁর কাছে আমার যেতে সাহস হয়না। আপনি যদি দয়া করে' বলে' রাজী করাতে পারেন—"

নবীনবাবু বললেন, "আচ্ছা চলুন আমি একবার শশাঙ্ককে বলে' দেখছি—"

নবীনবাবু এসে ডাকতেই বাবা নীচে নেমে গেলেন। ঘটনাটা যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই।—খেঁদি আমাদের রত্নগর্ভা,—তার এই মেজ ছেলেটি প্রচণ্ড মাতাল। আজ সন্ধ্যাবেলা মত্ত অবস্থায় তারই সমগুণ সম্পন্ন এক সুহৃদের সঙ্গে মারামারি করে' আপাততঃ সে হাজতবাস করছে,—সেই সংবাদ এসেছে রাত্রি দ্বিপ্রহরে, এবং কৃতী পুত্রকে নিষ্ঠুর এবং অবিবেচক পুলিশের দুর্গ থেকে পুনরুদ্ধার করে' আনবার জন্য মধ্যাহ্ন রজনীতে সদানন্দর এই অভিযান।

বারান্দার উপর থেকে আমি কুণ্ডুবাড়ীর দোতালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সুভদ্রা জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে; রাস্তার গ্যাসের আলো অস্পষ্ট হ'য়ে ওর দেহের 'পরে অবলুণ্ঠিত! সেই আবছা আলোতে ওকে যেন স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তির মত মন হচ্ছিল। আমি অনুভব করতে লাগলাম, ওর চোখের পলক আর পড়ছে না, দাঁত দিয়ে ও নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, দাঁত খুলে নিলে যেন ঠোঁট কেটে রক্ত পড়বে। জানালার গরাদে ধরে আছে ভদ্রা সবল মুষ্টিতে,—দশজন লোকেরও সাধ্য নেই ওর সে মুঠো খুলে নেয়। ভদ্রা যেন নেমেসিস, ওর মনের ভিতরটা আমার কাছে একমুহূর্ত্তেই সূর্য্য ওঠা কুহেলীর মত স্পষ্ট হ'য়ে গেল। মনে হ'ল, ওর দেহ পিঞ্জরের কঠিন বন্ধনের গায়ে ভদ্রার লজ্জিত অবমানিত চিত্ত যেন মাথা খুঁড়ে মরছে,—ওর আর বাঁচবার পথ নেই মরবার রাস্তা নেই, সহস্র মানসিক দৈন্যের গুরুভার মাথায় বহন করে' ধীরে সুস্থে পৃথিবীর পথ অতিক্রম করা ছাড়া যেন ওর আর কোনও উপায় নেই। অস্পষ্ট অন্ধকারের মাঝে ভদ্রার রূপান্বিত তনু যেন লজ্জায় ভেঙে পড়তে লাগল।

নবীনবাবু বাবাকে বললেন তিনি যদি একটু কষ্ট করে' গিয়ে কানাইকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন! হাজার হ'ক সদানন্দ আমাদের প্রতিবেশী ত!

তুমি জান আমাদের বাড়ী থেকে থানা মিনিট চারেকের পথ এবং নবীনবাবু বাবার অনেকদিনের বন্ধু, কাজে কাজেই তাঁর পক্ষে বাবার কাছে বিনা দ্বিধায় এ-অনুরোধ করা সম্ভব ছিল। সদানন্দ যে বিশেষ করে' তাঁকেই একাজের জন্য পাকড়ে ছিল, তা একেবারে অকারণ নয়।

নবীনবাবুর মনটি অতিশয় কোমল, এবং মানুষের দুঃখ-কাহিনী সত্যই হ'ক আর কাল্পনিকই হ'ক, তাঁকে অভিভূত করে' ফেলবার পক্ষে উভয়ক্ষেত্রেই তার সমান সার্থকতা।

বাবা বললেন, "এই রাতদুপুরে আমি থানায় যাব এরকম একটা নোংরা ব্যাপারে, বল কি নবীন?"

নবীনবাবু বললেন, "তা হ'ক ভাই, তোমাকে একটু কষ্টস্বীকার করতে হ'বে,—দেখছ না বুড়ো মানুষটা কিরকম করছে,—আর সে হতভাগাকে ছাড়িয়ে এনে আচ্ছা করে' কান মলে' দিলেই সায়েস্তা হ'য়ে যাবে—"

মনুষ্যচরিত্রে নবীনবাবুর চেয়ে বাবার অভিজ্ঞতা বেশী, তাই সদানন্দর শোক এবং তার পুত্রের সংশোধন সম্বন্ধে তিনি আর কিছু বললেন না। কিন্তু নবীনবাবুর আগ্রহে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে থানায় যেতে হ'ল এবং দারোগাকে বলে' কানাইকে ছাড়িয়ে আনতে হ'ল।

বাড়ী ফিরে বাবা হেসে বললেন, "কানাই আর তার বন্ধু দু'জনে আপোষে মারামারি করেছিল, এই কথাই কানাই আমাদের কাছে এইমাত্র বলল—"

শুনে আমরা হাস্যসংবরণ করতে পারলাম না। কিন্তু বাতায়নতলে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান যে ছায়ামূর্ত্তি নিশ্বাসের শব্দটি অবধি রোধ করে এই ঘটনার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ল, অবশেষে কানাই যখন তার পিতৃদেবের স্কন্ধ অবলম্বন করে' থানার লোকদের শক্ত বাংলা এবং হিন্দীতে ভর্ৎসনা কর্‌তে কর্‌তে বিজয় গৌরবে রাত তিনটের সময় বাড়ী ফির্‌ল, তখন যে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে গোপন পদে অপসারিত হ'য়ে গেল, আমি তার হৃদয়ের নিবিড়তম বেদনার সংবাদ জানি। এ ঘটনার মলিনতা তার সমস্ত দেহ মনে কেমন করে' বিষ ছড়িয়ে দিল, তা আমি জানি। সেই অন্তরাল-বর্ত্তিনী নারী অন্তরালেই রইল বটে, কিন্তু সেই রজনীতে তার চিত্তের অসামান্য জুগুপ্সার কাহিনী, তার মনের সঞ্চিত হলাহলের ইতিহাস আমার কাছে গোপন রেখে গেল না।

সুভদ্রার মধ্যে একটি জিনিষের আতিশয্য আমি লক্ষ্য করেছিলাম, সে হচ্ছে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রতি তার লোলুপতা। কুণ্ডুবাড়ীর নরকের মধ্যে বাস করেও নিজের চেষ্টায় শুধু যে সে দ্বিতীয় ভাগই ছাড়িয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন বিষয়ের অনেকগুলো বাংলা এবং ইংরেজী বই সমাপ্ত করে' সে অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিতাও হ'য়ে উঠেছিল। ভদ্রা যখন তার নিজের ঘরটিতে পড়্‌তে বস্‌ত তখন বাড়ীসুদ্ধ লোকের চোখে চোখে উপহাসের চাপা ইঙ্গিত এবং নিম্নকণ্ঠে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের নির্দ্দয় উক্তি কিছুই তার চোখ কান এড়িয়ে যেত না। কিন্তু পড়্‌তে বস্‌লে সে বিশ্বভুবন ভুল্‌ত, তাকে তখন জীবন্ত পুড়িয়ে মার্‌লেও তার খেয়াল হ'ত না। অতএব এ সব ব্যাপারে ভদ্রার ক্রোধে ইন্ধন পড়্‌ল বটে কিন্তু তার আসল কাজের বিশেষ ক্ষতি হ'ল না। মনে হয়, দেবী বীণাপাণিকে সুভদ্রার মত করে' আমরাও বোধ হয় ভালবাস্‌তে পারিনি। অথচ ও যে বাড়ীর বউ, সে বাড়ীতে পুলিশের সার্চ্চ হ'য়ে গেলেও একটা ভাঙ্গা নিব শূন্য কলমের সন্ধান পাওয়া যাবে না, এবং সুভদ্রার পতিদেবতার নাম লেখার পদ্ধতি হচ্ছে "সাতকোরী"! আর সে কি লেখা! সুভদ্রা সাতকড়ির হস্তাক্ষর এনে একদিন আমাদের দেখিয়েছিল, তারপর মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে ওর সে কি হাসি!

সাতকড়ির লেখার গুণ হচ্ছে এই যে তার যে কোনও অক্ষরকে বর্ণমালার যে কোনও অক্ষর বলে' মনে করে' নেওয়াতে একটুও বাধা নেই।

সদানন্দর সম্বন্ধে সুভদ্রা বলেছিল,—ওর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ যেন উচ্ছ্বলিত হ'য়ে উঠেছিল,—ভদ্রা বলেছিল, "কলমের কোন্‌দিকটা দিয়ে লিখ্‌তে হয় তাও বোধ হয় ওই লোকটা জানে না। ওর সবচেয়ে বড় গর্ব্ব তিরিশ বছর এক অফিসে চাকরী করেছে, কিন্তু তিন দিনের বেশী কামাই করেনি! ওর আর একটা গর্ব্ব, অদ্যাবধি দু'বারের বেশী কলকাতার বাইরে পা বাড়ায়নি,—একবার গিয়েছিল আমার বিয়ের সময় আমাদের দেশ বর্দ্ধমানে, আর একবার গিয়েছিল এক মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে হুগলীতে—"মৃদু হেসে ভদ্রা আমাকে বল্‌ল, "এতবড় মহাপুরুষের পুত্রবধূ আমি, কিরকম ভাগ্যবতী বলুন ত, 'সাতকোরী' লেখা স্বামীর সহধর্ম্মিণী আমি, আমার গর্ব্বের কি সীমা আছে!" বল্‌তে বল্‌তে ওর চোখ ছল ছল করে' উঠ্‌ল। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার প্রতি জ্ঞানের প্রতি ওর অপরিসীম শ্রদ্ধা, বিদ্যাহীনতার সম্বন্ধে ভদ্রার অকুণ্ঠ ঘৃণা,—কুণ্ডুবাড়ীর আবহাওয়ার মধ্যে ওর সেই বিতৃষ্ণা অনুকূল পবনপরিচালিত অগ্নিশিখার মত দিন দিন উন্নতি লাভ কর্‌তে লাগ্‌ল।

—সকালবেলা আমাদের চায়ের টেবিলটি পৃথিবীর গল্পে সরগরম হ'য়ে উঠ্‌ত। এই টেবিলে ঘট্‌ত প্রায়ই সুভদ্রার আবির্ভাব। কেবল তার মৃত্যুর আটমাস পূর্ব্ব থেকে সে আর আমাদের এই টেবিলে আসেনি, এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের বাড়ীতেই আসেনি। কেন তার কারণটা আমি জান্‌তে পারি যেদিন দিল্লী রওনা হই মাত্র সেই দিন, অর্থাৎ সুভদ্রার মৃত্যুর মাত্র দু'মাস পূর্ব্বে।

আমাদের এই প্রাতঃকালের সভাটি যে ভদ্রার কাছে কত লোভনীয় ছিল তা আমরা পূর্ব্ব হ'তেই জান্‌তাম, কিন্তু এ আকর্ষণ যে এত প্রার্থিত, এত দুর্নিবার ছিল এটা আমরা কোনদিন বুঝিনি। একে বর্জ্জন করে, এ লোভ অতিক্রম করে' সুভদ্রা যে আত্মসংযম এবং মহত্ত্বের পরিচয়

দিয়েছে তাকে উপযুক্তরূপে ব্যক্ত ক'র্তে পারি, এমন ভাষা আমি জানিনে। ভদ্রার কথা মনে করে' এতক্ষণ পরে আমার চোখে জল দেখা দিল। মনে মনে বল্‌ছি, ভগবান, ওর চিত্তের পূর্ণ মর্য্যাদা তোমার হাতে এবার হ'বে জানি, কিন্তু জীবনে ওর লজ্জার সীমা রাখ্‌লে না কেন?

জন্তু জানোয়ারেরও অধম—"

সুভদ্রার মুখ চোখের কঠিনতার দিকে তাকিয়ে সাপের ফোঁসফোঁসানি অতি শীঘ্র বন্ধ হ'য়ে গেল বটে কিন্তু খেঁদিদের দু'এক দিনের সামান্য এবং অনতিগুরুতর সমালোচনার জন্য মনে মনে সে তাদের প্রতি অন্যায়ের বহু গুণে অতিরিক্ত শাস্তিবিধান করে' রাখ্‌ল। কারণ, সুভদ্রার ভ্রাতৃস্নেহ ওর জীবন মরুভূমিতে একমাত্র মরূদ্যান, সেখানে ভদ্রা আর্গাসের চেয়েও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সচেতন প্রহরী।

কিন্তু সেকথা যাক। আমাদের চা খাওয়া শেষ হ'ল অথচ প্যানামা কাহিনী তখনও চল্‌ছে। কোন এক বন্ধুর আগমন সংবাদ পেয়ে গল্প অসমাপ্ত রেখে ছোড়দা উঠে চলে' গেলেন। আমরাও যে যার উঠে পড়্‌লাম।

—বেলা তখন বারোটা,—কি একটা কাজে খাওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি নিজের চেয়ারটিতে একই ভাবে বসে' সুভদ্রা কুণ্ডগৃহের দিকে তাকিয়ে আছে।—চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট,—মনে হয়, ও কিছু ভাব্‌ছে না, চোখ খোলা থাক্‌লেও ভদ্রা কিছু দেখ্‌ছে না।—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "একি, এখনও বাড়ী যান্‌নি?

সে অকস্মাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল,—তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতভাবে বল্‌ল, "ছোড়্‌দা যে গল্পটা বল্‌ছিলেন, তার সবটা শুন্‌তে পাইনি, ভেবেছিলাম উনি ফিরে' এলে শুন্‌ব।" একটু লজ্জিত হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ছোড়্‌দা ফিরেছেন?"

আমি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ কর্‌তে লাগ্‌লাম, বল্‌লাম, "আমাকে ডেকে পাঠাননি কেন? আমার পড়বার ঘরে চলে' এলেন না কেন? বেশ বসে' বসে' গল্প কর্‌তাম—চুপ করে' এতক্ষণ একলাটি বসে' রয়েছেন, ভারী অন্যায় কিন্তু—"

সুভদ্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বল্‌ল, "না, না, কিছু খারাপ লাগেনি, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গিয়েছে তা টেরও পাইনি,—আবার আপনাকে বিরক্ত করব, তাই আর ডাকিনি—" বলে' চলে' যেতে যেতে বল্‌ল, "কিন্তু প্যানামা ক্যানালের গল্পটা শুন্‌তে পেলাম না—"

বুঝলাম বিদ্যার প্রতি প্রচণ্ড লোভই ওকে এতক্ষণ এইখানে বসিয়ে রেখেছে। বল্‌লাম "আসুন পড়বার ঘরে, বই-টই ঘেঁটে প্যানামা ক্যানালের ইতিহাস বার করিগে, সে কাহিনী আমি নিজেও বিশেষ কিছু জানিনে, আমারও শেখা হ'য়ে যাবে—"

সুভদ্রাকে আমার পড়বার ঘরে নিয়ে গেলাম, বল্‌লাম, অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছে, এবং আরও হ'বে, আপনার বাড়ী যেতে ত বেশ দেরী আছে, আপনি আজ এখানেই খাবেন—"

ভদ্রা প্রথমে আপত্তি জানিয়ে অবশেষে আমার আগ্রহে রাজী হ'ল। বল্‌লাম, "আপনাদের বাড়ীতে একটা লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিই—"

সুভদ্রা ঘাড় নেড়ে বল্‌ল, "কিচ্ছু দরকার নেই—"

কিন্তু তবুও আমি ওদের বাড়ীতে সংবাদ পাঠালাম যে ভদ্রার বাড়ী ফির্‌তে বিলম্ব আছে এবং সে আজ আমাদের এখানেই আহার কর্‌বে।

সেদিন আমাদের দু'জনের খাবার দেওয়া হ'ল আমার পড়বার ঘড়ে।

প্যানামা ক্যানালের কাহিনী যখন শেষ কর্‌লাম তখন অপরাহ্ণ চার্‌টে। প্রতিমুহূর্ত্তে সুভদ্রার কত প্রশ্নেরই যে উত্তর দিতে হ'ল! শিশুর মত ওর উৎসাহ, বালকের মত ও কৌতূহলী, সব কিছু খুঁটিয়ে বুঝবার জন্য ওর অপরিমিত আগ্রহ। দ্য লেসেপের মত অতবড় এঞ্জিনীয়ার যা করতে পার্‌লেন না কার্ণেল গোথ্যালস্‌ কেমন করে' তা সফল কর্‌লেন, কত টাকা দিয়ে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ ফরাসী কোম্পানীর সমস্ত স্বত্ব কিনে নিল, রেপাব্‌লিক অফ্‌ কলম্বিয়ার ভিতর থেকে এই ক্যানালের অনুগ্রহাতে কিরূপে রেপাব্‌লিক অভ্‌ প্যানামা গজিয়ে উঠ্‌ল, তারপর ইয়েলো ফিভারের কথা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্য ডক্টর গর্গাসের

তত্ত্বাবধান এবং বন্দোবস্ত, এ সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংবাদটি পর্য্যন্ত জানাতে হ'ল সুভদ্রাকে। ছবি দেখে, বই পড়ে এ সম্বন্ধে আরও কত কথা যে তাকে বল্‌তে হ'ল তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার যথাসাধ্য আমি বল্‌লাম, কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষা যেন আর তৃপ্ত হ'তে চায় না। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল, এতখানি লোভ নিয়ে এমনতর নিবিড় আনন্দের সঙ্গে বাগ্‌দেবীর আরাধনা সংসারে কজনই বা করেছে!

যাবার সময় সুভদ্রা খুসীমনে বাড়ী গেল।

৫

এই সময় এমন এক ঘটনা ঘট্‌ল যাতে সুভদ্রার জীবনের গতি একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে আশ্রয় লাভ করল।

কুণ্ডুবাড়ীর লোকেরা ভদ্রার অন্তহীন তিক্ততার দ্বারা পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌ছে, অথচ এর যে কি সমাধান আছে তা-ও বেচারীদের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। ভদ্রাও অবিরত অনুভব করতে থাকে যে সে আর পেরে উঠ্‌ছে না, এইবার তার মুক্তি চাই, এমন করে' আর তার দিন চলে না। দিবারাত্র সংঘর্ষের দ্বারা তার বুকের মধ্যে যে গরলরাশি সঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাকে যেন আর ভদ্রা নিজের মধ্যে ধারণ কর্‌তে পার্‌ছে না।—উভয় পক্ষের মনের অবস্থা যখন এইরকম স্থানে এসে পৌঁছেছে তখন খেঁদির এক দূর সম্পর্কের বোন আন্নাকালী দিন কয়েকের জন্য কল্‌কাতায় বেড়াতে এসে কুণ্ডুবাড়ীতে অতিথি হ'ল। জয়নগরের ওদিকে তার শ্বশুরবাড়ী, কল্‌কাতায় সপ্তাহ দুই অবস্থান করে' 'মরা শুশাইটি, চিড়িয়াখানা, বাইশকোপ' ইত্যাদি দেখে বাড়ী ফির্‌বে, এই মনের বাসনা।

আন্নাকালী এসে পৌঁছল বটে কিন্তু সুভদ্রাকে দেখে তার চিত্ত স্নেহার্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল না। গৃহের সকলের প্রতি ভদ্রার সুগভীর ঘৃণা, সময়ে অসময়ে পাড়াবেড়ানোর দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি এবং সম্পূর্ণ বেপরোয়া স্বাধীন মতিগতি দেখে, নির্ব্বাক বিস্ময়ে আন্নাকালী প্রথমটা চুপ করে' থাক্‌লেও অবশেষে বল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, "ওমা, আমাদের ঘরে এমনধারা বাইজী বউ হ'লে দু'দিনে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিতুম—"

খেঁদিকে ডেকে বল্‌ল, "এ সমস্ত বজ্জাতি, বুঝ্‌লি খেঁদি, সমস্ত বজ্জাতি!—তোরে পেয়েছে ভালোমানুষ, তাই,—পড়্‌ত একবার আমার পাল্লায়।" বলে' একটা গুরুতর কাল্পনিক আনন্দে আন্নাকালী দাঁত কিড়মিড় কর্‌তে লাগ্‌ল। সে আরও অনেক কথা বল্‌ল,—ভদ্রার বিরুদ্ধে অনেক কুৎসিত অভিযোগ, তার সম্বন্ধে বহু সতর্কতার বাণী। যাকে সে সব সৎ পরামর্শ দেওয়া, সে কিন্তু আন্নাকালীকে ক্রমাগত অনুরোধ জানাতে লাগাল নিবৃত্ত হবার জন্য।—ভদ্রা বাড়ীতে আছে, এবং এসব উক্তি যদি ঘুণাক্ষরে তার কানে পৌঁছোয় তাহ'লে যে কি মহা অনর্থ ঘট্‌বে সেকথা বারেক চিন্তা কর্‌তে গেলেও খেঁদির হৃৎপিণ্ডটা যেন আর তার দেহাশ্রয়ে থাক্‌তে চায় না।

সুভদ্রার সম্বন্ধে কুণ্ডুগৃহে যে দৃঢ়মূল ভীতি বর্ত্তমান ছিল, তার সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব থেকে শেষ পর্য্যন্ত আন্নাকালীও অব্যাহতি পেল না,—সাত দিনের মধ্যেই তার কণ্ঠস্বর সুরেলা হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তলে তলে ষড়যন্ত্রের আর তার অবধি রইল না।

খেঁদি কিন্তু ভারী অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে,—ভদ্রার সম্বন্ধে নিজের আতঙ্কের কোন সহজ কারণ খেঁদি নির্দ্দেশ কর্‌তে পারে না, অথচ সে আতঙ্ক এত সুস্পষ্ট যে লোকের চোখ থেকে তাকে গোপন রাখাও মুস্কিল। আন্নাকালীর উপস্থিতিটা অঙ্কুশের সাহায্যে হাতীকে তাড়না করার মত খেঁদিকে যেন নিরন্তর খুঁচিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করে, ওর কেবলই মনে হ'তে থাকে, কালীদি আমাকে দুর্ব্বল ভাব্‌ছে, আমাকে ভাব্‌ছে অসহায়!—খেঁদির মত লোকও একদিন চিন্তা কর্‌তে সুরু করে যে সে যেন অত্যন্ত অপমানিত হ'য়েছে!

—কুণ্ডুগৃহে সুভদ্রা অতিশয় মিতভাষী। ভদ্রার সমস্ত আচরণের মধ্যে যে কঠোর আত্মসংযম বিরাজ করত তার চরম প্রকাশ দেখা যেত সদানন্দর বাড়ীতে তার ব্যবহারে। কথা সে অত্যন্ত অল্প কইত, এবং তন্মধ্যে সাড়ে-পনেরো আনা উক্তি হ'ত রণজিৎকুমারের উচ্ছ্বসিত স্তুতিতে পরিপূর্ণ। মুখ খুল্‌লেই যে কেমন করে' ছোড়দার কথা এসে পড়ে তা ভদ্রা বুঝ্‌তে পার্‌ত না, কিন্তু অন্যের কাছে ছোড়্‌দার কাহিনী

বলার চেয়ে অধিকতর আনন্দের কোন কিছুও ভদ্রার জীবনে আর নেই। কুণ্ডুবাড়ীর লোকেরা যে এটা খুব উপভোগ কর্‌ত তা নয়, কিন্তু চুপ করে' থাকা ছাড়া তাদেরও আর গতি ছিল না।

সেদিন খেঁদির ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আন্নাকালী খেঁদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হ্যাঁলা, তোর বড় বউয়ের ছোড়্‌দা কি করে লা? বউয়ের কথা শুনে ত মনে হয় বুঝি বা লাট-বেলাটই হ'বে।—"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে খেঁদি জবাব দিল, "হ্যাঁ, লাট-বেলাটই বটে! করে ত রাজমিস্ত্রীগিরি, তাইতেই এই, অন্য কিছু হ'লে না জানি কি হ'ত!"

ভদ্রা গৃহে থাক্‌লে তার সম্বন্ধে আলোচনা আজকাল কুণ্ডুবাড়ীতে আপনা আপনিই নিষিদ্ধ হ'য়ে এসেছে,—পূর্ব্বেকার নিয়ম অবশ্য অন্যরকম ছিল, বর্ত্তমান সুভদ্রা গঠিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল সেই সময় হ'তেই।—অনেকদিন পরে ভ্রমক্রমে খেঁদি আজ সেই নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌ল এবং তৎক্ষণাৎ সভয়ে তার মনে হ'ল যে একথা মুখ দিয়ে বার হবার পূর্ব্বে পক্ষাঘাতে তার জিভ্‌টা অবশ হ'য়ে গেলেই বোধ করি তার পক্ষে হ'ত পরম মঙ্গলের। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সে দেখ্‌ল সুভদ্রা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সম্মুখে।—তার চোখমুখের চেহারা দেখে সংশয়মাত্র রইল না যে সমস্ত কথাই তার কর্ণগোচর হ'য়েছে। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভদ্রা আত্ম-সংবরণ কর্‌ল, দরজার 'পরে একখানি হাত রেখে অতিশয় ধীরে ধীরে বল্‌ল, "দেখুন পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌বার আপনাদের কোন অধিকার নেই, কিন্তু তবুও আমি এখন পর্য্যন্ত ঘরেদোরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এ গৃহের প্রত্যেক জীবটিকে পুড়িয়ে মারিনি কেবলমাত্র আমার সেই রাজমিস্ত্রী ছোড়্‌দা দুঃখ পাবেন, তাই—" বলে' সুভদ্রা চলে' গেল।

খেঁদি আর আন্নাকালী ফ্যালফ্যাল করে' তাকিয়ে থাকে,—ওদের মুখ যেন কে শেলাই করে' দিয়েছে, অকস্মাৎ একটা গুরুতর আঘাত পেয়ে ওদের মনোবৃত্তিগুলো যেন অসাড় হ'য়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সংবিৎ ফিরে আস্‌তেই ত্রাসে, ভয়ে দুশ্চিন্তায় খেঁদির পেটের মধ্যকার নাড়ীগুলো যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে লাগ্‌ল।

সদানন্দ এবং তাদের বাড়ীর অন্যান্য সকলেই এই ঘটনার কথা শুন্‌ল। ভদ্রাকে ওরা কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দ্বিপ্রহর রাত্রির ভূতের কাহিনীর অপেক্ষাও বেশী আতঙ্কের চোখে দেখ্‌ত, মনে মনে কুণ্ডুবংশ বেশ ভালো করেই জান্‌ত যে ভদ্রার হাতে তাদের অশেষ দুর্গতি আছে এবং সে দুর্গতির থেকে কিছুতেই তাদের পরিত্রাণ নেই। রণজিৎকুমারের সম্বন্ধে সুভদ্রার মনোভাবের কাহিনীও যে কুণ্ডুগৃহের অজ্ঞাত ছিল তা নয়, সেইজন্যই ওদের কেমন করে' বিশ্বাস হ'য়েগিয়েছিল যে ভদ্রার মানসিক গঠনকার্য্যে রণজিতের হাত আছে, কিন্তু ওদের সম্বোধন করে' সেই মনের এমনতর বহিঃপ্রকাশ কুণ্ডুরা এর পূর্ব্বে আর দেখেনি। ক্রুদ্ধ হ'য়ে কুণ্ডুবংশ সিদ্ধান্ত কর্‌ল, যত অনিষ্টের মূল ওই রণজিৎকুমার।

ভদ্রা তার ছোড়্‌দাকে লিখ্‌ল, "এখানে আর থাক্‌তে পার্‌ছিনে, আমাকে নিয়ে যাও—"

রণজিৎকুমার এলেন সুভদ্রাকে নিয়ে যাবার জন্য, শুধু যে ভদ্রার অনুরোধ পালনের জন্য তা নয়, সুভদ্রার বাবা আজ প্রায় পাঁচমাস যাবৎ শয্যাশ্রয়ী,—অকস্মাৎ তাঁর অসুখ বেড়েছে সেই কারণেও ভদ্রার এখন পিতৃগৃহে যাওয়া প্রয়োজন।

চোরের মতন সন্তর্পণে পা টিপে টিপে রণজিৎকুমারের কাছে এসে, খেঁদি ফিসফিস করে' বল্‌ল, "তুমি বাছা বাড়ী যাও,—বোনকে এত ঘন ঘন বাপের বাড়ী নিতে চাইলে চল্‌বে কেন?—বউ আমরা দিতে পারব না,—আর এতবড় বজ্জাত মেয়েমানুষও বাপের জন্মে দেখিনি—"

রণজিতের চোখের দৃষ্টি ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল,—এই গৃহের লোকগুলের প্রতি তাঁর অনুরাগ থাক্‌বার কথা নয়, ছিলও না,—কিন্তু অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির বলে' তিনি ক্রোধপ্রকাশ কর্‌লেন না, ক্ষুব্ধকণ্ঠে শুধু বল্‌লেন, "আপনারা যদি আর একটু ভদ্র হ'তেন।"

ঝগড়া বাধাবার জন্য খেঁদি আজ কোমর বেঁধে এসেছিল,—অতএব সে একটা কঠিন উত্তর দিতে উদ্যত হ'য়েই দ্রুতপদে স্থানত্যাগ কর্‌ল। ছোড়্‌দা এসেছে সংবাদ পেয়ে সুভদ্রা আমাদের বাড়ী থেকে কুণ্ডুগৃহে

গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে সেইমাত্র,—খেঁদির অন্তর্দ্ধানের কারণটা এই।

কাপড় জামা ট্রাঙ্কে গুছিয়ে ভদ্রা গেল রণজিৎ-কুমারের জন্ত খাবার তৈরী কর্‌তে।

আন্নাকালী আজ এক মাস হ'ল খেঁদির বাড়ীতে এসেছে, অথচ এখন পর্য্যন্ত তার নড়্‌বার নামটি নেই,—এই নিয়ে খেঁদির সঙ্গে তার খুব একচোট কলহ হ'য়ে গিয়েছিল পূর্ব্বদিন। আন্নাকালী মনে মনে বোনের উপর অতিশয় রুষ্ট হ'য়ে ছিল।—এখন সে এসে উপস্থিত হ'ল রান্নাঘরে, পরম সোহাগের সুরে ভদ্রাকে বল্‌ল, "বউমা, দেখগে যাও খেঁদির ঘরে বসে' তোমার ছোড়দাকে সকলে মিলে' কি গালাগালটাই না দিচ্ছে—"

রইল পড়ে' খাবার তৈরী,—সুভদ্রা নিঃশব্দ দ্রুতপদে সিঁড়ি অতিক্রম করে' খেঁদির ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে যেন একটা রাউণ্ড্ টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্স বসেছে, কুণ্ডুবংশের সকলেই সেখানে উপস্থিত, তর্জ্জন গর্জ্জনের আর শেষ নেই, কিন্তু বদ্ধগৃহের অগ্নিকাণ্ডের মত তার আক্রোশ কেবলমাত্র দেয়ালের গায়ে গায়ে প্রতিহত হ'য়েই ফিরে আসে।

ক্ষিপ্ত কুকুরের মত খেঁদি ঘরের মধ্যে চীৎকার করছে,—তার কণ্ঠস্বর চাপা, হঠাৎ লেজ-মাড়িয়ে-দেওয়া নিদ্রিত কুকুরের গলার শব্দের ন্যায় গড়ানে। খেঁদি বলে, "এতবড় আস্পদ্দা, আমার বাড়ীতে বসে' আমায় বলে' কিনা ছোট লোক!—ছোটলোক তোর চোদ্দপুরুষ!—বাপের অসুখ! বোন্‌কে তাই নিতে এসেছেন!—তোর বাপের ত নিত্যি অসুখ,—একেবারে তার ছেরাদ্দোর সময় নিয়ে যাস্,—তোর ছেরাদ্দ শেষ করে' যেন ফিরে আসে—" বল্‌তে বল্‌তে খেঁদি হাঁপাতে আরম্ভ করে।

সদানন্দ তার তিন-পাড় পাঁচ-হাত শাড়ী খানাকেই মাল-কোঁচা দিয়ে পর্‌বার ব্যর্থ প্রয়াসপূর্ব্বক বদ্ধোন্মাদের মত ঘরের এধার থেকে ওধার অবধি ছুটোছুটি করে' হিন্দীভাষায় বল্‌তে থাকে। "নিকালো, আভি নিকালো—"

সাতকড়ি তখন ছিলিমের পরে ছিলিম চাপিয়ে গাঁজায় দম দিয়ে ব্যোম হ'য়ে ছিল, সে বলে, "কেয়া, হামারা জননী জননী গভ্‌ভধারিণীকো—"

ঘরের মধ্যকার নারীকাহিনী অনেক কিছু বল্‌বার পর অবশেষে গালে হাত দিয়ে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, "ওমা, কোথায় যাব গো!"

ভদ্রার মনে হয়, তাকে যেন কেউ দেয়ালের গায়ে রিভেট দিয়ে এঁটে দিয়ে গিয়েছে, সে যে ওখান থেকে আর কোনদিন নড়্‌তে পারবে এমনও বোধ হচ্ছিল না।—পটলী ঘরের বাইরে এল, ভদ্রার দিকে তাকিয়ে খেঁদিকে ডেকে কোনরকমে শুধু একবার বল্‌ল, "মা, বড়বৌদি এখানে—"

ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাত হ'লেও এর চেয়ে গুরুতর হ'ত না, সাপের বিষদাঁতকে কেউ যেন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। নারীবাহিনী গেল চোখের পলকে অদৃশ্য হ'য়ে,—সাতকড়ি নিজের মনে বিড়বিড় কর্‌তে লাগ্‌ল, "আমি বাবা কিছু বলিওনি—"

সদানন্দ দ্রুতগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে ত্বরিতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌তে লাগ্‌ল,—তার মুখ দেখে মনে হ'তে পারত, সে বানপ্রস্থ নেবে,—যথেষ্ট হ'য়েছে,—সংসার ধর্ম্মে আর তার মতি নেই।

তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে একবার আড়চোখে সুভদ্রার পানে তাকিয়ে খেঁদি ব্যস্তভাবে চীৎকার করতে লাগ্‌ল, "ওরে পটলী, এক ঘটি জল আন্, ওরে রাসি একখানা পাখা নিয়ে আয় না রে—বউমার বুঝি ফিট হ'ল—" বল্‌তে বল্‌তে সে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

উত্তেজনায় সুভদ্রার সর্ব্বশরীর থরথর করে' কাঁপছে, ওর মুখ বকের পালকের মত সাদা,—ওর সমস্ত অনুভূতি, সকল চেতনা যেন অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। এমনই করে' ওখানে দাঁড়িয়ে যে কতক্ষণ কেটে গেল, তা সুভদ্রা জানে না, —সহসা এক সময় সচেতন হ'য়ে উঠে তার মনে হ'ল, জীবনের চরম পরিণতির দিক নির্ণয়ের জন্য আর ভেবে আকুল হ'তে হ'বে না, গভীর অন্ধকারে পথের জন্য হাত্‌ড়ে বেরিয়ে প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আর মরতে হ'বে না, সুভদ্রা যেন সহসা বেঁচে গেল। শান্তভাবে রণজিৎকুমারের

কাছে এসে বল্‌ল, "ছোড়্‌দা আজ আর তোমার জলখাবার খেয়ে কাজ নেই ভাই,—এখনই চল—"

রণজিৎকুমারের সঙ্গে সুভদ্রা ফির্‌ল পিতৃগৃহে,—প্রতি মুহূর্ত্তটিতে আপন মনে বল্‌তে বল্‌তে এল, ছোড়্‌দার অপমানে এবার আমার সাধনযজ্ঞে শেষ আহুতি পড়্‌ল, এ আহুতি যেন পূর্ণাহুতি হয় ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

দেবতার উদ্দেশে দিবারাত্র প্রণাম করে' ভদ্রা বলে, ভিতরে ভিতরে একান্ত চিত্তে অনুভব কর্‌ছি জীবনের মৃৎপ্রদীপে তেল আমার ফুরিয়ে এল, কিন্তু আমার ছোড়্‌দার এতবড় অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে যদি মরি তাহ'লে মিথ্যা হবে আমার ভালবাসা, মিথ্যা হ'বে আমার জীবনধারণ, মিথ্যা হ'বে আমার মৃত্যু।—এবার সুভদ্রা জীবন বহন কর্‌তে লাগ্‌ল যেন ওর একটি শেষকৃত্য আছে, কেবলমাত্র সেইটিকে পরিপাটিরূপে সমাধা কর্‌তে পার্‌লেই ওর চিরাবসর।

ভদ্রার বাবা মারা গেলেন।

রণজিৎকুমার বল্‌লেন, "রাণী, তোর আর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাজ নেই ভাই, যথেষ্ট হ'য়েছে,—সুখের ভরা ত তোর একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল, এবার তুই ঘরের মেয়ে ঘরে বসেই পড়াশুনায় মন দে—"

উত্তর স্থির কর্‌তে সুভদ্রার এক মুহূর্ত্তও লাগ্‌ল না, সুনিশ্চিত কণ্ঠে সে বল্‌ল, "না ছোড়দা, শ্বশুরবাড়ী আমাকে ফির্‌তেই হ'বে,—সেখানে আমার অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য পড়ে' রয়েছে,—না গেলে কিছুতেই চল্‌বে না।"

কারও স্বাধীন ইচ্ছায়, এমন কি সুভদ্রারও নয়, হস্তক্ষেপ করা রণজিতের স্বভাববিরুদ্ধ, অতএব মনে মনে বিস্মিত হ'লেও ভদ্রাকে তিনি আর কিছু বল্‌লেন না।

রণজিৎকুমারের অনুরোধ অথবা আদেশ অগ্রাহ্য করা সুভদ্রার জীবনে এই প্রথম। সে আপন মনে বারংবার বলে, "এই একবার এবং কেবলমাত্র এই একবার, এই প্রথম, এই শেষ, তোমার কথার অবাধ্য হ'বার দুর্ভাগ্য জীবনে আর আমার হ'বে না। ওদের দেনাপাওনা মিটানো হয়নি, —তোমার অসম্মানের ঋণ এখনও আমি পরিশোধ করিনি। এ বোঝা বহে' যদি মরি তাহ'লে নরকে গিয়েও শান্তি পাব না, স্বর্গবাস করে' ত নয়ই। অতএব আমাকে ফির্‌তেই হ'বে।"

সাতমাস পরে সুভদ্রা কুণ্ডুবাড়ীতে ফির্‌ল,—দেহের ভিতর সযত্নে বহন করে' নিয়ে এল। টিউবারকিউলসিসের বীজ। অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ওই অতিপ্রার্থিত বস্তুটিকে সে নিজের বুকের মধ্যে সংগ্রহ করেছে।

ভদ্রার পিতৃগৃহের পাশের বাড়ীর বধূ মলিনার সঙ্গে ওর অনেকদিনের অন্তরঙ্গতা। সে আজ দু'বছর হ'ল টিউবার-কিউলসিসে শয্যাগত। দিন তার ফুরিয়ে এসেছে, এবার তল্পীতল্পা গুটিয়ে সরে' পড়্‌লেই হয়।

বাপের বাড়ীতে গেলেই সুভদ্রা তাকে দেখ্‌তে যেত,—অথচ এর পূর্ব্বে এই অতি সহজ কথাটা কোনদিন তার মনে হয়নি ভেবে ভদ্রার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। ও যেন অকস্মাৎ পথের ধূলায় মণিমাণিক কুড়িয়ে পেয়েছে—ভদ্রার আর উল্লাসের অবধি নেই।

দুপুর বেলা ভাইয়েরা সকলে কাজে কর্ম্মে বেরিয়ে গেলে, সরযূদের বাড়ী শেলাই শিখ্‌তে যাবার নাম করে' সে মলিনার কাছে এসে বসে।

সুভদ্রাকে পেয়ে মলিনা যেন হাতে স্বর্গ লাভ কর্‌ল। যে লোক মাঝ-নদীতে একা-একা ডুবে মর্‌ছে, সাঁতার দিয়ে তার কাছে কেউ উপস্থিত হ'লে সে তাকে সুদ্ধ ডুবিয়ে মারে।—মলিনার ব্যাধির ভয়ে সহজে কেউ তার কাছে ঘেঁসে না, ভদ্রাকে তাই সে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, ওদের পুরাতন সখিত্ব আবার যেন নূতন করে' জন্মলাভ করে।

দ্বিপ্রহরে ঘরের দরজা বন্ধ করে' পাশাপাশি শুয়ে দু'জনের হাসিগল্পের আর অন্ত রইল না। এক গেলাসে জল খাওয়া, মুখের জিনিষ কাড়াকাড়ি করে' খেয়ে ফেলা, এসব ত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হ'য়ে উঠ্‌ল। মলিনা প্রথম প্রথম বল্‌ত, "অসুখটা ভালো নয় ভদ্রা, অমন করে' ছোঁয়া-ছুঁয়ি কোরোনা ভাই—"

ভদ্রা শুক্‌নো হাসি হাস্‌ত, বলত, "অত সহজেই যদি অসুখ হ'ত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না,—তোমার মত অমন ননীর পুতুল নই আমি—"

শুনে মলিনা চুপ করে' থাকে, আর কিছু বলে না।

—অবশেষে সুভদ্রা নিশ্চিন্ত হয় যে ওর শেষ দিবসের নোটিস্ এতদিনে এসে পৌঁছেছে। ভদ্রার মনে আর খুসী ধরে না,—গৃহের সবার কাছ থেকে সন্তর্পণে সে তার রোগের ইতিহাস গোপন করে' রাখ্‌ল। জেদ ধরল এবার শ্বশুরবাড়ী ফিরবে,—অনেকদিন হ'ল এসেছে, আর বেশী দেরী করাটা ভালো দেখায় না। ভদ্রার মুখে এমন অদ্ভুত কথা শুনে সকলে ত অবাক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, সকলের অনুরোধ উপরোধ এবং আদেশ ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করে' সুভদ্রা শ্বশুরবাড়ী চলে' আসে।

—আমার কাহিনী প্রায় সমাপ্ত হ'য়ে এসেছে, রাত্রি পৌঁছেছে অস্তাচলের তীরে। অকস্মাৎ বোধ কর্‌ছি যেন আমি অতিশয় শ্রান্ত। যে মৃত্যুপথযাত্রিণী মেয়ের উদ্দেশে মাত্র একটি শুষ্ক নমস্কার করে' একদিন কর্ত্তব্য সমাপন করেছিলাম, সে এখন হঠাৎ আমার হৃদয় জুড়ে বস্‌ল। কলমের আঁচড়ে ভদ্রার কাহিনী স্পষ্ট করে' তুল্‌তে গিয়ে তার জন্য আমার অন্তরে নিজের অগোচরে নব জাগরিত সহানুভূতির যেন আর পরিমাপ নেই। এখন যদি তুমি আমায় দেখ্‌তে তাহ'লে আমার মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তোমাকে সাধ্য সাধনা কর্‌তে হ'ত। চোখের জলে আমার চোখ ভরেছে। চশমা হ'য়ে উঠেছে ঝাপ্‌সা, কতবার খুল্‌ব, কতবারই বা মুছ্‌ব সেটা?—কিন্তু সুভদ্রার জীবনের মিলিয়ে-যাওয়া শেষ রেখাটিকে তোমার চোখের মধুর স্নেহে উজ্জ্বল করে' তুল্‌তে চাই,—আমাদের অশ্রুতে ওর ক্ষুধিত আত্মার তর্পণ হ'ক।

ভদ্রা এল শ্বশুরবাড়ী এবং অন্য সকলের গৃহ সে এবার নির্ব্বিচারে নির্ব্বিশেষে বর্জ্জন কর্‌ল, অথচ এইগুলোই ছিল তার নিশ্বাস ফেল্‌বার জায়গা, বিষাক্ত সিন্দুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মেলে আকাশ পানে চাওয়ার মত।

আমাদের চায়ের টেবিলকে ভদ্রা বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ কর্‌ল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কতদিন ওর সঙ্গে কথা হ'য়েছে, কতবার ওকে বলেছি আমাদের বাড়ী আস্‌বার জন্য, কিন্তু কাজকর্ম্মের ব্যস্ততা, সময়ের অভাব ইত্যাদি নানান অজুহাত দেখিয়ে ও আর এলনা। শেষবারের মত যখন দেখা দিল তখন বল্‌ল ওর ব্যাধির ইতিহাস, বল্‌ল ওর জীবনের সকল কল্যাণকে যারা চেটেপুটে নিঃশেষ করে' খেয়েছিল তাদের জন্য কি মহা অভিশাপ ও রেখে যাচ্ছে,—বল্‌ল ওর আর দুঃখ নেই, অনুতাপ নেই,—জীবনের যাত্রাশেষে পশ্চিমদিক্-প্রান্তে মৃত্যুতটরেখা দেখা গেল উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর রূপে,—আস্‌ছে শান্তি, আস্‌ছে তৃপ্তি, সকল মলিনতার শেষে আসছে পূর্ণ বিশ্রামের আনন্দ।—অপূর্ব্ব বিজয়গৌরব নিয়ে পৃথিবী থেকে সুভদ্রা বিদায় নেবে, তার সকল দুঃখ আজ সোনা হ'য়ে গেল।

ভদ্রার দেহে আর রক্ত ছিল না, শীর্ণ থেঁৎলে-যাওয়া চেহারা,—রুমাল দিয়ে সে বারংবার মুখ ঢাক্‌ছিল। বেশীক্ষণ ভদ্রা বস্‌ল না,—আমার কাছে তার জীবনের গোপন কথাটি ব্যক্ত করে' চলে' গেল।

নির্ব্বাক বিস্ময়ে ওর পানে চেয়ে রইলাম। কপালের নীচেকার চোখ দুটো দিয়ে এই দুর্গভমনা মেয়েটিকে স্তম্ভিত হ'য়ে আমি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। চিত্তের এত কাঠিন্য, চরিত্রের এমন দৃঢ়তা যে পৃথিবীর পথে ঘাটে মিল্‌বে না তা আমি জানি।—অকস্মাৎ যুগপৎ শ্রদ্ধা এবং ঘৃণায় আমার মন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল,—মনে হ'ল ওর নিশ্বাসের আগুণে যেন আমি ভস্মীভূত হ'য়ে যাব, ওর চোখের দৃষ্টিতে যেন আমার মন বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। ভদ্রার সম্মুখে বসে' শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণেও আমার কষ্ট হয়, ও উঠে গেলে যেন আমি বাঁচি।

ভদ্রা বল্‌ল, "আসি তাহ'লে ভাই,—আপনি যখন দিল্লী থেকে ফিরবেন তখন আর আমাকে দেখ্‌তে পাবেন না,—কিন্তু আমি যখন আর এ-লোকে থাক্‌ব না, তখনও যদি আমার কথা কোন কোনদিন স্মরণ করেন, তাহ'লে যেখানে থাকি যেমন অবস্থায় থাকি, শান্তি পাব—"

ভদ্রা জান্‌ত না, ওকে ভুল্‌বার জো নেই।

একটু থেমে বল্‌ল, "আপনাদের বাড়ীটা যে আমার কত আকর্ষণের বস্তু ছিল, যে আমি আপনাকে বলে' বোঝাতে পার্‌ব না! আটমাস আমার দেহের উপর দিয়ে এই কাল-ব্যাধির কুৎসিত যন্ত্রনাকে সুপ্রসন্নচিত্তে বহন করেছি,—পাছে এর থেকে আরোগ্য হ'য়ে উঠি সেই দুশ্চিন্তায় দিবারাত্র

কণ্ঠকিত হ'য়ে রয়েছি।—লোকে যেমন করে' কুকুর পোষে, বেড়াল পোষে, পাখী পোষে, তেমনই স্নেহে একে আমার দেহে লালন করেছি,—কিন্তু এর জন্য আপনাদের গৃহের দ্বার আমার মুখের 'পরে নিজ হাতে, রুদ্ধ করে' দিতে হ'য়েছে, একথা মনে হ'লেই আমার বুক ব্যথায় ভরে' উঠ্‌ত—"

ভদ্রা আবার মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাশ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, একটু পরে বল্‌ল, "আমার মত পাষাণীরও চোখের জলে চোখ ভেসে যেত—" বল্‌তে বল্‌তে ওর দুই চোখ এখনও আবার অশ্রুতে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল।—একটু পরেই সুভদ্রা উঠে চলে' গেল,—যাবার সময় গেল মা'কে এবং বাবাকে প্রণাম ক'রে।

মৃত্যুর দু'দিন পূর্ব্বে ভদ্রা আমার ছোড়্‌দাকে ওদের বাড়ী ডাকিয়ে নিয়েছিল,—রণজিৎ কুমারও উপস্থিত ছিলেন তার শয্যাপার্শ্বে। ওর দুই ছোড়দার পদধূলি মাথায় নিয়ে ভদ্রা এক সুদীর্ঘ পথে যাত্রা করেছে, ওই মেয়ের বিশ্বাস পথ যতই অন্ধকার, যতই বন্ধুর, যতই দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল হ'ক না কেন, বিন্দুমাত্র ভয় নেই,—পাথেয় তার যথেষ্ট আছে। ছোড়দাদের পায়ের ধুলার জোরে ভদ্রা একা একাই ত্রিভুবন জয় করে' আস্‌তে পার্‌বে।

সুভদ্রা শেষদিন আমার কাছে যা বলেছিল এবার সেই কথাই বলি।

—দেহে অতিকাঙ্ক্ষিত ব্যাধি নিয়ে ভদ্রা ত শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ল, এবং সেখানে ফিরেই ওর ব্যবহার আশ্চর্য্য রকমে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। শ্বশুর, শাশুড়ী, যা, ননদ, দেবর প্রভৃতির প্রতি ভদ্রার আর এবার অনুরাগের সীমা রইল না। ও যেন পিতৃগৃহ থেকে একেবারে নূতন মানুষটি হ'য়ে এসেছে!—যা ননদদের সঙ্গে ভদ্রা এক থালায় আহার সুরু করে' দিল,—কথায় কথায় তাদের সঙ্গে হাসি, কথায় কথায় তাদের সঙ্গে ঠাট্টা!—ওরা সকলে যত আতঙ্কে ঘর্ম্মাক্ত হ'য়ে উঠ্‌তে থাকে, সুভদ্রার হৃদ্যতা ততই বেড়ে চলে।

রন্ধনগৃহের ভার ভদ্রা স্বহস্তে তুলে নিল।—অতিশয় যত্ন-সহকারে সে সকলের জন্য রান্না করে,—শ্বশুর দেবরদের কোনও কিছু সামগ্রী দিতে হ'লে প্রথমে তাদের বাটি থেকে চুমুক দিয়ে চেখে নিয়ে কেমন হ'য়েছে সে-স্বাদ গ্রহণ করে' পরে সেই পাত্রের জিনিষ এনে তাদের পাতের পাশে রাখে,—এমনিতর যত্ন ভদ্রার ওদের খাওয়ার আয়োজনে!

শাশুড়ী যখন ফুলুরী খেতে ব্যস্ত, তখন হয়ত সে অকস্মাৎ পিছন হ'তে তার গলা জড়িয়ে ধরে' আচম্‌কা কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আদর করে' ডাকে "মাগো—"

ভদ্রা কখনও খেঁদিকে কোন কিছু বলে' সম্বোধন করেনি, কিন্তু এবার বাপের বাড়ী থেকে ফিরে পর্য্যন্ত ওর কর্ত্তব্য-জ্ঞান বেড়েছে।—খেঁদি ত হঠাৎ এমন আদরে আঁৎকে উঠে মাটিতে ফুলুরী ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে, "আঁই, আঁই" করে' ওঠে!—মুখ ফিরিয়ে সুভদ্রা টিপে টিপে হাসে,—রান্নাঘরে বসে' ওর উচ্ছ্বসিত উল্লাস আর বাধাবন্ধন মানে না,—তারই ফাঁকে কখন্ নামে অশ্রুর বন্যা, হৃদয়ের চিরসঞ্চিত গ্লানি উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, তারপর ওঠে কাশি।

ভদ্রা তার প্রতিবেশীগৃহভ্রমণ একেবারে বন্ধ করে' দিল,—দিবারাত্র সে গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হ'য়ে থাকে, সকলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কর্‌তে চায়। ওর আচরণ দেখে ভয়ে এবং বিস্ময়ে কুণ্ডুবাড়ীর লোকেদের হৃৎপিণ্ডগুলো যেন স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

সাতকড়ির প্রতি প্রীতি-যত্নের আর সুভদ্রার সীমা নেই!

শেষ অবধি ভদ্রার কর্ত্তব্যপরায়ণতার ফল ফল্‌ল,—আর, ও এমন জিনিষ যে ওর ফল না ফলে' যায় না!—চারদিকে কাশির শব্দ, আর গলা দিয়ে ওঠে রক্ত। সমস্ত বাড়ীটার 'পরে বিধাতার অভিশাপ নাম্‌ল ভদ্রাকে আশ্রয় করে'।—তিলে তিলে পলে পলে নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়ে একটি একটি করে' এই গৃহের লোকগুলো একদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে,—কথাটা মনে হ'তেই ভদ্রা আনন্দে হাত কচ্‌লাতে লাগ্‌ল।

—স্তব্ধ বিবর্ণ মুখে সে আমাকে বলেছিল, "আমার মায়া নেই, দয়া নেই, অনুতাপ নেই,—আমার জীবনের সর্ব্ব গ্লানি, সকল অসম্মান, সর্ব্ব অকল্যাণ, সমস্ত রুচিবিপর্য্যয়ের জন্য, আমার ছোড়্‌দার অমর্য্যাদার জন্য আমি ওদের কাছ থেকে কঠিন মূল্য আদায় করেছি।—শৈশব হ'তে অদ্যাবধি

এই গৃহ থেকে যা লাভ করেছি, তার হিসেব হয়না, তাকে যথাযথরূপে প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই,—কিন্তু দেনা পাওনা আমার এবার চুক্‌ল,—ওদের বিরুদ্ধে আর আমার নালিশ রইল না, আমার বিপক্ষেও ওদের না—" বলে' সুভদ্রা অন্যদিকে চেয়ে চোখের জল গোপন কর্‌ল।

আমি সেদিন ভয়ে বিস্ময়ে ভদ্রার সঙ্গে কথা কইতে পারলাম না, ওর মুখের পানে তাকিয়ে আতঙ্কে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল ওর বিরুদ্ধে সদানন্দকে সাবধান করে' দিয়ে আসি,—তা যদি না দিই তাহ'লে যেন আমার গুরুতর অপরাধ হ'বে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা,—সুভদ্রা তার কর্ত্তব্যাকর্ম্মের কোথাও কোন ত্রুটি রাখেনি, তার নিজের হাতে আঁকা ছবি সম্পূর্ণ না ক'রে যে সে আমাকে তা দেখাতে এনেছে এমন বোকা মেয়ে ভদ্রা নয়।

কলেজ ছুটির পর দাদুর অসুখের সংবাদ পেয়ে আমি চলে' গেলাম দিল্লীতে,—তারপর যেদিন ফির্‌লাম, সদিন কুণ্ডুবাড়ীর বউটি মারা গেল।—দিল্লী যাওয়ার দিনের স্মৃতি নিমেষে আমার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল,—অকস্মাৎ বিতৃষ্ণায় মন গেল পূর্ণ হ'য়ে, না পড়ল চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল, না পেলাম লেশমাত্র বেদনা। কিন্তু আজ ভদ্রার কাহিনী শেষ কর্‌তে গিয়ে কতবারই না চোখের জল আমার চোখ ছাপাল। যাকে আমি ঘৃণা করতে এসেছিলাম, তাকে আমি ভালবেসেছি। মনে হচ্ছে, সেই ভয়ঙ্করী মেয়ের অন্তরে যে মধু ছিল তার সন্ধান কুণ্ডুবাড়ীর লোকেরা পেল না,—এরা কত বড় দুর্ভাগা।—এদের জন্য সুভদ্রা যে ভয়াবহ শাস্তি বিধান করে' গেল তার চেয়েও সে লোকসান যেন এদের বেশী।

—ভদ্রার কথা বারংবার মনে হচ্ছে,—নিজেকে দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উৎসর্গ করে', ক্ষয় করে', ধ্বংস করেও প্রতিশোধ গ্রহণের কি বিপুল প্রয়াস! উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ওর কি আশ্চর্য্য সহনশীলতা!

—ভদ্রা আমায় বলেছিল, "নরকযন্ত্রণা ত আমার এ সংসারেই হ'য়ে গেল, অতএব পরকালের নরকের জন্য আমি এখন থেকেই প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম,—সে নরকের ভয় আর আমার নেই।—যে কালকূট কণ্ঠ ভরে' একদিন স্বেচ্ছায় পান করেছিলাম তা আমার পক্ষে যেমন ভীষণ তেমনই মধুর,—কিন্তু যাবার দিনে আমি পরমানন্দে পূর্ণতৃপ্তিতে চলে' যাব,—দুঃখ কর্‌বার, শোক করবার আর আমার কিছু থাক্‌বে না—"

তা না থাক্, আমি কেবলই ভাব্‌ছি, এ কি বিস্ময়কর নিষ্ঠুরতা, এ কি নররাক্ষসের ন্যায় আচরণ!—তবুও ভদ্রার জন্য আজ আমার সমস্ত মন কেঁদে মরছে,—আশ্চর্য্য এর রহস্য! চোখের জল পড়ে' টাটকা-লেখা কালি-না-শুকানো অক্ষরগুলো ছড়িয়ে গিয়ে অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। ও-লেখা আমি ব্লট করব না,—এই চোখের জলের ফোঁটা দু'টি সুভদ্রার জন্য রইল।—মৃত্যুতে সে পরম শান্তি পেয়েছে, ভদ্রা বেঁচেছে পৃথিবীর কবল হ'তে, পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে ওর গ্রাস থেকে।—আমার চোখের জল ওর আত্মার তর্পণ কর্‌লাম, তুমি কি আমার সঙ্গে যোগ দেবে না?

ভাব্‌ছি, সংসারে আমরা না চাইতেই সব পেয়েছি, বিশ্বদেবতা আমাদের জীবনে কোথাও লেশমাত্র দৈন্য রাখেননি,—আমরা কি ভদ্রার কথা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ব? অন্তরে বাহিরে আমাদের ঐশ্বর্য্যের শেষ নেই, জীবনে আমাদের প্রীতির অন্ত নেই, আমাদের প্রিয়জনদের কাছ থেকে নিত্য নিয়ত কত স্নেহের কত নিদর্শনই না আমরা লাভ কর্‌লাম! আমার আত্মমর্য্যাদার স্বর্ণমুকুটে তোমার ভালবাসা মধ্যমণি,—অথচ তুমি যদি একদিন কেবলমাত্র "বাব্‌লু" না বলে' আমাকে "বাব্‌লি" বলে' ডাকো, তাহ'লেই আমার মন সমস্ত দিন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে থাক্‌বে, বেদনার্ত্ত চিত্তে ভাব্‌ব এত নিষ্ঠুর তুমি কেমন করে' হ'লে!—আর ভদ্রা কতবড় বঞ্চিতা, কুরুচির দ্বারা ওর জীবন হ'য়ে উঠেছিল কত কুৎসিত!—তাই ভাব্‌ছি, ওর ব্যথা কি আমার চিত্তে সঠিক ধরা পড়্‌বে?

রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এল।—আর কিছুক্ষণ পরে সূর্য্য উঠ্‌বে,—অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, পূর্ব্বগগনপ্রান্তে লালের আভাস।—এতক্ষণ পরে ঘুমে চোখ ভেঙে আস্‌ছে। সুভদ্রার কথা আলোচনা করলে আমার মনে ভয় জাগে—কিন্তু জানি ঘুমোলে পরে তুমি শিয়রে এসে দাঁড়াবে, স্বপ্নের মধ্যে দেখা দেবে অভয়ঙ্কর বেশে,—তাই বলে' ভদ্রার কথাটাও এক একবার বুঝতে চেষ্টা কোরো।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

উত্তর পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য ছড়া

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

ভারতের গীতিসাহিত্যের ভাণ্ডারে যে অজস্র মণিমুক্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে আমরা তাহার কোন সন্ধান রাখি না। পুরাতনের নামে ভ্রূকুঞ্চিত করিবার প্রবৃত্তি আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মত এখনও আমাদের অনেকের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। হীরকখণ্ডের উপরে মৃত্তিকা লিপ্ত থাকিলে তাহার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে পারে না, অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে তাহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু রত্নখণ্ডটির মালিন্যের অন্তরালে যে উজ্জ্বল দীপ্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে অভিজ্ঞ মণিকারের সুনিপুণ দৃষ্টির কাছে তাহা ঢাকা থাকে না। "যুমতী, ক্যান্ যা কর মন ভারী! পাবনা য্যাহে আন্তে দেব ট্যাহা-দামের মোটরী!" একটি গ্রাম্য গীতের এই খণ্ডাংশটুকু শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের একদিন মনে হইয়াছিল, "গানের এই দুইটি চরণে সেই শৈবালবিকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল।" কিন্তু আমাদের কি সে মন আছে? সত্যই লোক সাহিত্যের মধুচক্রে যে অমিয় সঞ্চিত আছে তাহার সন্ধান এতদিন আমরা পাই নাই। কারণ, সে চক্রে যে মধু আছে নন্দনের পারিজাত হইতে তাহা চয়ন করা হয় নাই আমাদেরই কুটির প্রাঙ্গণে যে ক্ষুদ্র অপরাজিতাটি ফুটিয়া থাকে সে মধু আহৃত হয় তাহারই স্নিগ্ধ নীলিমা হইতে। জনকজননী ভ্রাতাভগ্নী বেষ্টিত এই যে সুখনীড়টি রচনা করিয়াছি, সে গানের অমরাবতীতে ইহারই ছবি পড়িয়াছে। আমাদের প্রতিদিনের হাসি ও অশ্রু এই গানগুলির মধ্যে সজীব হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রাম্য গীতগুলি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের আদর এখনও পায় নাই। 'পাণিনি' ইহাদের পাণিপীড়ন করেন নাই তাই ইহাদের ভাষা অমার্জ্জিত, 'দণ্ডীর' দণ্ড হইতে ইহারা চিরকালই বহুদূরে তাই কবিসমাজে ইহাদের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, 'বিশ্বনাথ কবিরাজের' রাজত্ব ইহারা মানিয়া লয় নাই তাই বিশ্বনাথের অনুচরগণ ইহাদের উপর বেত্রহস্ত কিন্তু বিশ্বের দ্বার ইহাদের জন্য উন্মুক্ত ও অবারিত। শিশুর কলকণ্ঠে, রমণীর গৃহকর্ম্মে, কৃষকের শস্যক্ষেত্রে, মাঝির নৌকায় হিন্দোলের দোলনে সর্ব্বত্রই এই গেঁয়ো ছড়ার অবাধ রাজত্ব। ভারতের গ্রামে গ্রামে এইরূপ অসংখ্য ছড়া এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। লোপ পাইয়াছে অনেক, তবু যাহা আছে তাহাও কম নয়।

ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে এইরূপ গ্রাম্য গীতের প্রচলন সমধিক পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। কি নিত্য কর্ম্মে কি নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন আছেই। শিশু ভূমিষ্ট হইলে 'সোহর' গানের সুরে গৃহ মুখরিত করিয়া রমণীগণ নবীন অতিথিকে প্রথম অভিনন্দন দেয়। 'জনেউকা গীত' শ্রবণ করিয়া দ্বিজ বালক প্রথম উপবীত ধারণ করে। মঙ্গলগীতের মধুর ধ্বনি নবীন দম্পতীর মাঙ্গল্য বিধান করিয়া তাহাদিগকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গান গাহিয়া সে দেশের গৃহস্থ রমণী পরিশ্রম ভুলে, ধান রোপণ করিতে করিতে গান গাহিয়া তাহারা কর্ম্মকে উৎসবে রূপান্তরিত করে। হিন্দোলের দোলে দোলে, পথচলার তালে তালে, সুখে-দুঃখে, শোকে-আনন্দে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র তাহাদের সঙ্গীত। তাহারা গান গাহিয়া হাসিতে হাসিতে বরানুগমন করে আবার গান গাহিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে শবানুগমনও করিয়া থাকে। জল বাতাসের মত গান সে দেশের প্রাণ ধারণের সামগ্রী বিশেষ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে ছড়াগুলি আলোচনা করিব সেগুলি গেঁয় ছড়া। সুরই তাহাদের প্রাণ অথচ সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রাণহীন দেহগুলিকে লইয়াই আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, সঙ্গীতের সহিত স্থানকাল আদির যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সে সম্বন্ধও এখানে রক্ষিত

হইতে পারে না। কেমন করিয়া দেখাইব উত্তর পশ্চিম ভারতের পল্লী কুটিরের 'বয়ার-পবনের' মত স্বচ্ছন্দ সঙ্গীত মুখরিত ক্ষুদ্র জাঁতঘরের সেই অনাড়ম্বর অথচ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আর কেমন করিয়াই বা দেখাইব মেঘমেদুর শ্রাবণ অপরাহ্নের আনন্দবিহ্বল হিন্দোললীলা? হিন্দোলের দোলের সহিত তাল রাখিয়া, বেণী দুলাইয়া, হাতের চুড়িগুলিতে ঝঙ্কার তুলিয়া বালিকা যখন গায়,—

"লবংগা ইলায়চিকে বীড়া জোড়াএবঁ।
মেরা কুঁচনবালা বিদেস তরসৈ॥
কলিয়া চুবি চুবি সেজ লগাএববঁ।
মেরা সুতনবালা বিদেস তরসৈ॥"

'লবঙ্গ ও এলাচ দিয়া পানের খিলি তৈয়ার করিব, কিন্তু যে খাইবে সে বিদেশে। ফুলের কুঁড়ি তুলিয়া তুলিয়া শয্যা পাতিব কিন্তু যে শুইবে সে বিদেশে।' তখন তাহার গান যতটুকু বলে তাহার প্রাণও কি ততটুকু বলিয়াই নিরস্ত হয়?—না। তাহার বলা ঐখানেই শেষ হয় না। সে যাহা বলে তাহা তাহার বক্তব্যের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু ভাষায় যাহা ব্যক্ত হইল না তাহা যে অব্যক্ত রহিয়া গেল এমন নয়, গ্রাম-প্রান্তে পুষ্করিণীতীরে হিন্দোল-আন্দোলিত তরুশাখা, বর্ষা অপরাহ্নের মন উদাস-করা শীতল বাতাস, বর্ষণক্লান্ত মেঘ ভারাক্রান্ত পিঙ্গল বিক্ষুব্ধ আকাশ ইহারাই একে একে বাকিটুকু বলিয়া দেয়। কথা যেখানে ফুরাইয়া আসে, ইহারা সেখানে আগাইয়া যায়। কিন্তু যখন ছড়াগুলিকে কেবলমাত্র অক্ষর পঙ্‌ক্তিতে পরিণত করিয়া ফেলি, তখন কোথায় পাইব সেই শ্রাবণ সন্ধ্যার শীতল পবনের স্পর্শ, আর কেমন করিয়াই বা দেখিব সেই সঙ্গীতমুখরিত সদ্য বর্ষণসিক্ত পুষ্করিণীতীর? রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছেলে ভুলান ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আটঘাট বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা, কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য্য।" আলোচ্য ছড়াগুলি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। তবে এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাটা আরও কিছু বাড়ে। অন্যান্য অত্যাচার ত আছেই, তাহার উপর আবার ভাষান্তরিত করিয়া এই গীতিকাগুলির প্রতি অত্যাচারের মাত্রাটা সম্পূর্ণ করিয়া তুলি। গল্প শুনি, মুসলমান বাদশাহগণের মধ্যে না কি কেহ কেহ তাঁহাদের অন্য দেশী এবং অন্যভাষী বেগমগণের জন্য মুন্‌সি ডাকাইয়া বেগমগণের নিজ নিজ ভাষায় প্রণয়-পত্র রচনা করাইয়া লইতেন। অনুবাদের সাহায্যে মূল গানগুলির রস উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে গেলে ঐ প্রকার দোভাষীর সাহায্যে প্রেমালাপ করার কথাই মনে পড়ে।

শাঁখারিবেশী শিব যখন গৌরীর হাতে শাঁখা পরাইয়া মূল্য সম্বন্ধে নিতান্ত ঔদাসীন্য দেখাইলেন এবং কেবলমাত্র পরাইয়া দিবার পারিশ্রমিক স্বরূপ, যাঁহার হাতে শাঁখা পরাইয়াছেন শুদ্ধ তাঁহাকে পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া জানাইলেন, তখন আমাদের বঙ্গপল্লীর গৌরী বলিয়াছিলেন,—

"কেমন কথা কও শাঁখারি কেমন কথা কও।
মানুষ বুঝিয়া শাঁখারি এসব কথা কও॥"

আর প্রবাসী 'বলমুসা' (বল্লভ) পথিকের ছদ্মবেশে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর নিকটে গলহার ও মুক্তামালা অঙ্গীকার পূর্ব্বক যখন এক সাধু প্রস্তাব করিয়া বসিল যে, পরদেশিয়ার আশা ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া আমার সহিত চলিয়া চল, তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গৃহবধূ উত্তর দিয়াছিল,—

"অগিয়া লগৈ গলহার বজর পরৈ মতি লড়ি।
তোহরলে পিআ মোরা সুন্দর গুলাব কি ফুল ছড়ি॥"

বাঙ্গালা ও হিন্দী যে দুইটি ছড়া হইতে এই দুইটি অংশ উদ্ধৃত করা হইল, সে দুইটি ছড়ারই বিষয়বস্তু প্রায় সমান। দুইটিতেই আছে,—ছদ্মবেশী পতির পত্নীকে ছলনা, অথবা স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে কুতূহলী স্বামীর সকৌতুক পরীক্ষা এবং পরীক্ষায় স্ত্রীর জয়লাভ। তাহার পর স্বামীর পরিচয় প্রদান। এবং সর্ব্বশেষে পতি-পত্নীর মধুর মিলন। কিন্তু এত মিল থাকা সত্ত্বেও ইহাদের একটা বিরাট স্বাতন্ত্র্য আছে, সেখানে কেহ কাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে না। 'পিআ মোরা সুন্দর গুলাব কি ফুলছড়ী' কে যখন ভাষান্তরিত করিয়া

বলি, 'প্রিয় মোর সুন্দর গোলাপের ফুলছড়ি', তখন ফুলছড়ির ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে থাকে শুধু ছড়ি। তেমনি যদি গৌরীর উক্তিকে রূপান্তরিত করিয়া বলি, 'কৈসা বাত কহতে হো শাঁখারিআ, কৈসা বাত কহতে হো', তাহা হইলেও ব্যাপার দাঁড়াইবে ঐরূপ। ফলকথা, অনুবাদের দ্বারা মূলকে অক্ষুণ্ণভাবে পাওয়া কঠিন। একভাষা হইতে অন্য ভাষায় চলিবার পথেই, তাহার নিজস্ব রূপটি সে হারাইয়া ফেলে। কিন্তু উপায় নাই।

গ্রাম্য গীতসমূহ আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই যে জিনিসটি আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে সেটি হইতেছে ইহাদের স্বাভাবিকতা। যাঁহাদের হাতে এই কবিতাগুলির জন্ম, তাঁহারা মেমের স্কুলে পড়িয়া "সোজা সোজা" চলিতে বা 'অন্য দেশীর চালে' কথাবার্ত্তা বলিতে শিখেন নাই। কুঙ্কুম বা সিন্দুরের রক্তিমাভা তাঁহাদের ললাটদেশ রঞ্জিত করে বটে কিন্তু অধররঞ্জনের জন্য তাঁহারা তাম্বুলই যথেষ্ট মনে করেন। ওষ্ঠশলাকার বিজ্ঞাপন এখনও তাঁহাদের দৃষ্টির অগোচর। এক কথায় বলা যায়, তাঁহাদের জীবনযাত্রার গতি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। তাজেই তাঁহাদের রচনার মধ্যেও ঐ সরল ও সুন্দর জীবনের ছায়া পড়িয়াছে।

উপমার জন্য তাঁহাদিগকে তিলফুল বা পক্কবিম্বের শরণাপন্ন হইতে হয় না। তাঁহারা মনে করেন 'হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে তাই অনেক আছে।'

"জোলহিন লাগৌ ন হমরে গোহনবাঁ হো না।
জোলহিন তোহঁকা রাগব জৈসে ঘিউ গাগরি হোনা॥"

কোন রাজপুত্র এক ধীবরকন্যার প্রতি অনুরক্ত হইয়া বলিতেছেন,—'ওগো কন্যা, আমার বাড়ী চল, ঘিয়ের কলসীর মত তোমাকে যত্ন করিয়া রাখিব।' নিরক্ষর কবির রাজ্যহীন রাজপুত্রই এই কথা বলিতে পারেন, অন্য কেহ হইলে ঘিয়ের কলসীর স্থানে সম্রাজ্ঞী না হউক অন্ততঃ রাজরাণী না বসাইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু এখানে তাহা হইবার নহে, কবির পিতার পুত্রের মুখে যাহা বাহির হওয়া সম্ভব রাজার পুত্রের মুখে তাহাই বসাইয়া দিয়াছেন।

"দুরহি দেস জনি করেহু করেরুবা
কে তোহৈ তোরণ জাই।
দুরিহি দেস জনি বরেহু বিটিয়বা
কে তোহৈ আনন জাই॥"

'হে করেরুবা (এক প্রকার ফল) দূরদেশে ফলিও না কে তোমাকে পাড়িতে যাইবে? কন্যার বিবাহ দূরদেশে দিও না, কে তাহাকে আনিতে যাইবে?' উপমার জন্য সমুদ্রমন্থন করিয়া মাণিক তুলিতে হয় নাই, ক্ষুদ্র ফলের দ্বারাই সে কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

বাবা নিমিয়া ক পেড় জিনি কাটেউ,
নিমি চিরৈয়া বসের— বলৈয়া লেউ বীরন॥
বাবা বিটিয়উ জিনি কেউ দ্যুম দেউ
বিটিয়া চিরৈয়া কী নহি— ,, ,, ,,
সবরে চিরৈয়া উড়ি জইহৈঁ
রাহি জইহৈঁ নিমিয়া অকেলি— ,, ,, ,,
সবরে বিটিয়বা জইহৈঁ সাসুর,
রহি জইহৈঁ মাঈ অকেলি— ,, ,, ,,

'বাবা, নিমগাছটি কাটিয়া ফেলিও না পাখীরা উহাতে বাসা বাঁধে। বাবা, কন্যাকে কোন কষ্ট দিও না। কন্যা আর পাখী উভয়ই সমান। সব পাখী উড়িয়া যাইবে নিমগাছটি একলা পড়িয়া থাকিবে। সব কন্যাই শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে, ঘরে একলা পড়িয়া থাকিবে মা।' দুটি কথাতেই কন্যার মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে।

কন্যার শ্বশুরালয় যাত্রার একটি দৃশ্য দেখুন;—

ভিতরে তে মায়া জো রোবই
অঞ্চলেমাঁ আঁসু পোঁছই হো।
এহো মোরি বিটিয়া চলী পরদেশ
কোখিয় মোরী সূনী ভঙ্গ না॥
বৈঠকসে বাবূজী রোবই
পটকে মাঁ আঁসু পোঁছই হো।
মোরী ধেরিয়া চলী পরদেশ
ভবন মেরা সূন ভয়ে না॥

রান্নাঘরটির অন্ধকার কোণে বসিয়া বধূ যখন রন্ধনে ব্যস্ত তাহার মনটি তখন ছাড়া পাইয়া কখন যে সেই শৈশবের খেলাঘরে গিয়া খেলার রান্না আরম্ভ করিয়া দেয় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। চিরাচরিত গৃহকর্ম্মের ও তাহারই আনুষঙ্গিক লাঞ্ছনা ও তিরস্কারের হাত হইতে মুহূর্ত্তের মত মুক্তি পাইয়া বাঁচে। তাহার পর স্বপ্ন একদিন সত্য হইয়া দেখা দেয়, শৈশবের খেলার সাথী ভাইটি একদিন সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়। বহুদিনের রুদ্ধ অশ্রু সেদিন আর বাধা মানে না। শাশুড়ী ননদের দৃষ্টি এড়াইয়া ধীরে ধীরে ভ্রাতার নিকটে যাইয়া বধূ বলে,—

"মুড় দেখো এ ভৈয়া মুড় দেখো ভৈয়া
জৈসে কুকুরিয়া কৈ পুঁছরে।
পীঠ দেখো ভৈয়া তো পীঠ দেখো ভৈয়া
জৈসে হৈ ধোবিয়া ক পাট রে॥
কপড়া দেখো ভৈয়া কপড়া দেখো ভৈয়া
জৈসে হৈ সবনবা কৈ বাদরী রে॥"

দেখ ভাই মাথার চুল হইয়াছে কুকুরের পুচ্ছ, পিঠ হইয়াছে ধোপার পাট আর কাপড় যেন শ্রাবণের ধারা।" ইহা শুনিয়া মনে পড়ে,—

"গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।"

বাঙ্গালা ছড়ার মধ্যে বাঙ্গালী বধূর দুঃখের কাহিনীও অনেকটা এইরূপ, এবং সে করুণ কাহিনীর শ্রোতাও বধূর ভ্রাতা। দুইটি পঙ্‌ক্তি শুনুন,—

"হাড় হ'ল ভাজা ভাজা মাস হ'ল দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥"

শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয় লইয়া যাইতে হইলে একমাত্র ভ্রাতাই সহায়। দুর্গমপথ, যানবাহনের সুবিধা নাই, রাস্তায় বাঘ ভালুকেরও সন্ধান মিলিতে পারে—বৃদ্ধ পিতা কি এত ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন? আর অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব? তাহারাই বা অনর্থক কষ্ট সহ্য করিয়া কন্যার শাশুড়ীর দুর্বাক্য গলাধঃকরণ করিতে যাইবেন কোন্ সুখে? সুতরাং ভ্রাতা ব্যতীত এ কাজ করিবার আর কে আছে? তাই পিতৃগৃহের কথা মনে হইলেই সকলের আগে মনে জাগে 'গুণবতী ভাই'টির কথা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গৃহবধূও শ্বশুরালয়ে থাকিয়াই মায়ের উদ্দেশে কাঁদিয়া বলে,—

"মাঈ তলবা কুহকহ মোর।
মাঈ লহুয়া ভইয়বা পঠয়ে সাবন নীঅর।
মাঈ বোই গাই বিদবা করই হৈঁ সাবন নীঅর॥

'মা, পুকুরের পাড়ে ময়ূরের ডাক শোনা যাইতেছে, শ্রাবণের আর দেরী নাই। মাগো, ছোট ভাইটিকে পাঠাইয়া দিও সে কাঁদিয়া কাটিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে,—

"ও পারেতে কাল রঙ, বৃষ্টি পরে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে॥"

উত্তর ভারতের মাতা কন্যার নিকট খবর পাঠাইতেছেন,—

"ববলী তো জোগিয়া হো গয়ে কাকুল হৈ নিরমোহী।
ভৈয়া তুম্হারে বেটী চকরী গয়ে পরুকো মৈঁ লৈহৌ বুলায়।
য সৌ কে সাবন বেটী উহীঁ রহো॥"

"তোমার বাবা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন, কাকা ত নির্দ্দয়, ভাই গিয়াছে চাকরি করিতে। সুতরাং এই বৎসরটা কোন রকমে ওখানেই কাটাইয়া দাও আগামী বৎসর তোমাকে লইয়া আসিব।"

বাঙ্গালা দেশের ভাই ভগ্নীকে আশ্বাস দিতেছে,—

'এ মাসটা থাক দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে॥"

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বেশী কথা বলিবার উপায় নাই কিন্তু তথাপি শেষ করিবার পূর্ব্বে আর দুই একটি কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' বিষম বিপত্তির কারণ হইলেও বৃদ্ধেরা তরুণী ভার্য্যা গ্রহণে কখনও দ্বিধা বোধ করেন না এমন কি এ-যুগেও। সুতরাং বিপত্তিও অলঙ্ঘনীয়।

"পাঁচ বরিসবা কৈ মোরি রংগরৈলী
অসিয়া বরস কি দমাদ।
নিকরি ন আবৈ তু মোরি রংগরৈলী
অজগর ঠাঢ় দুবার॥

আংগন কিচ্‌কিচ্‌ ভিতর কিচ্‌কিচ্‌
বুঢ়উ গিরে মুঁহ বায়।
সাত সখী মিলী বুঢ়উ উচাবৈ
বুঢ়উ সেঁদুর পহিরাব ॥"

পাঁচ বছরের কন্যা এবং আশী বছরের জামাতা। কন্যা, বাহিরে আসিও না, দুয়ারে ঐ দেখ অজগর। ভিতর ও বাহির কাদায় কিচকিচ করিতেছে, বুড়া পা পিছলাইয়া উপুড় হইয়া পড়িল তখন সাত সখী মিলিয়া বরকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার দ্বারা কন্যার মাথায় সিঁদুর দেওয়াইল। রক্ষা এই যে কন্যাটি পঞ্চমী, জ্ঞান হইলে বর ও বিবাহ উভয়ই স্মৃতিপট হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হইবে। পঞ্চদশী হইলে অবস্থা জটিলতর হইত। আমাদের দেশেরও একটি "তামাক খেকো বুড়ো" বরের কথা শুনুব। ইঁহার সহিত পাঠকদের অনেকের পরিচয় থাকিতে পারে—শৈশবের পরিচয়।

"তালগাছ কাটম্‌ বোসের বাটম্‌ গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি ॥
টক্কা ভেঙ্গে শঙ্খ দিলাম কানে মদন কড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপ দাড়ি ॥
চোখ খাওগো বাপ মা চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো ॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে ॥"

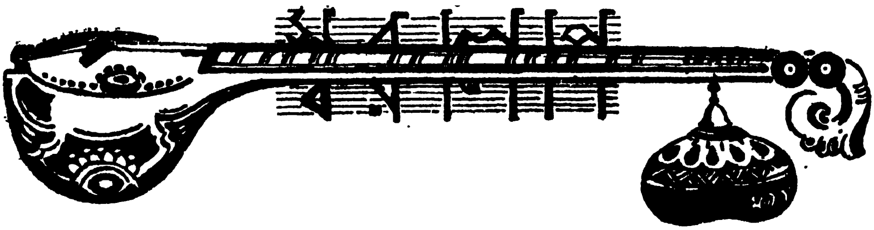
ইহাত গেল বৃদ্ধ বর ও বালিকা কন্যার দাম্পত্য বন্ধনের কথা। হিন্দী ছড়ার মধ্যে বয়স্থা কন্যা ও বালক বরের বিবাহপ্রসঙ্গ লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দেখা যায়। কুলীনদের মধ্যে কুমারী নাম ঘুচাইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে প্রায় দেড়শ বৎসর পূর্ব্বে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধার সহিত বালকের বিবাহ-অভিনয় হইত। এইরূপ অসম মিলন উত্তর পশ্চিমেও ঘটিত। একটি ছড়ার মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় দিতেছি।

"নাহক গৌন দিহে মোর বাবা বালক কন্ত হমার রে।
চীলর অস দুই দেবর হমর রে বলমা মুসে অনুহার রে ॥"

'হায় আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম কিন্তু আমার স্বামী এখনও বালক। আমার দুই দেবর দুইটি উঁইয়ের মত ছোট আর আমার স্বামীর চেহারা বড় জোর ইঁদুরের মত।' এখানেই শেষ হয় নাই পরে আছে—এই অতি ক্ষুদ্র পতিদেবতাকে কন্যা তেল মাখাইয়া খাটিয়ার উপরে শোয়াইয়া দিয়াছিল, ইঁদুর ভাবিয়া বিড়াল তাহাকে লইয়া পালায়, কিন্তু কন্যার সৌভাগ্যক্রমে কিনা জানি না তাহাকে উদরসাৎ না করিয়া ফেলিয়া দেয়। পরে তাহার রোদনধ্বনি শুনিয়া কন্যা গৃহ কোণের ধূলিকুণ্ড হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পতিদেবতাকে উদ্ধার করে।

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য





যদি নিশীথে আলাপন
হ'লনা হ'লনা—
তবে আঁখিধারা জলে
কেন আলপনা,
আঁক আলপনা
যদি পথ বাহি কেহ নাহি এল,
সবে বন-পথ ধূলি ছাহি গেল,
তবে কেন ঘরে ধীরপদভরে
চলনা চলনা।
যদি চন্দ্রিত নভে তারি দেখা মিলে,
তবে কেন চাহ তারে হৃদি তলে
পলে পলে।
তারি স্মৃতিখানি যদি সারা হিয়া
গেছে কি যে মাধুরীতে ভরি দিয়া,
তবে কেন ফিরে চাহ তা'রি তরে
বলনা বলনা।

কথা—শ্রীদেবীপ্রসাদ কর

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীঅশোকপ্রকাশ মিত্র

গা গমা ‖ রা গা মাঃ ধঃ । পা মগা রমা -গরা ‖ সা ন্া রসা -া । -া -া না না ‖
য দি॰ নি শী থে ॰ আ লা॰ পন্ ॰॰ হ ল না ॰ ॰ ॰ হ ল

নর্রা-র্সনা-ধপা-হ্মপা। -গমা -গরা-সন্া -সা ‖ রা গা মাঃ ধঃ । পা মগা রমা -গরা ‖
না॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰ নি শী থে ॰ আ লা॰ পন্ ॰॰

সা না রসা -া । -া -া ন্া ন্া ‖ প্া -া ন্া সা । রা গা রগা মা ‖
হ ল না ॰ ॰ ॰ ত বে আঁ ॰ খি ধা রা ॰ জ॰ ॰

মা -মগা রমা -গরা । সন্‌া সা রা পা I পমা গা -া -া । -া -া ক্ষা ক্ষা I
লে • কে• •• ন• • আ ল্ গ না • • • • আঁ ক

ক্ষা -া পা পা । -পা -মা -গা -রা I রা গা মাঃ ধঃ । পা মগা রমা-গরা I
আল্ • প না • • • • নি শী থে • আ লা• পন্ ••

সা ন্‌া রসা -া । -া -া -া -া II
হ ল না • • • • • নিশীথে আলাপন হ'লনা ইত্যাদি।

পা পা II না -ধা না র্রা । র্সা -া র্সা র্সা I নর্রা -র্সনা ধা পা । ধা না -া -া I
য দি প • থ বা হি • কে হ না• •• হি এ • ল • •

-পা -ধা -া -গা । -পা -া -া -া I পা -মধা না রর্সা । না -া র্সা র্সা ।
• • • • • • • • প • • থ বা হি • কে হ

নর্রা -র্সনা ধা পধা । না -া পা পা I গপা -ধনা র্সা র্সা । ধর্সা -ণধা পা পা I
না• •• হি এ• ল • স বে ব• •• ন প থ• •• ধূ লি

ক্ষধা -পক্ষা গা মা । গা -া -া -া I পা মা গা গরা । সা ন্‌া রসা -া I
ছা• •• হি গে ল • • • ত বে কে ন স • রে •

সা -গরা গা গা । গা -ক্ষা ক্ষা পা I না নধা পা -া । -া -া ক্ষা গা I
ধী •• র প দ • ভ রে চ ল• না • • • চ ল

মা -া -া -গা । রগা গরা সা -া I সা সা গা মা । পা না র্সা র্সা I
না • • • চ• ল না • ধী র প দ ভ রে চ ল

নর্রা -র্সনা -ধপা ক্ষপা । -গমা -গরা -সন্‌া -সা I
না• •• •• •• •• •• •• • নিশীথে আলাপন ইত্যাদি।

ন্‌া সা II রা -া রা রগা । গা -রা গা পমা I গা -া -া -পা । পা -ক্ষা গা পমা I
য দি চন্‌ • দ্রি ত • ন • ন্তে তা রি • • • দে • খা মি

গা -া -া -া । -া -া গা গা I গমা -পধা পা পা । গপা -মগা রা রা I
লে • • • • • ত বে কে • • • ন চা হ • • • তা রে

রা -গা গরা সন্‌া । নসা -া -া -া I ক্ষা -া ক্ষা ক্ষা । ধপা -া -া -া} II
হৃ • দি ত • লে • • • প • লে প লে • • •

পা পা II পা নধা না র্রা । র্সা -া র্সা র্সা I নর্রা -র্সনা ধা গপা । ধা -না পা পা I
তা রি স্মৃ • • তি খা নি • য দি সা • • • রা হি য়া • গে ছে

গপা -ধনা র্সা র্সা । ধর্সা -ণধা পা পা I ক্ষপা -পক্ষা গা মা । গা -া -া -া I
কী • • • যে মা ধু • • • রী তে ভ • • • রি দি য়া •

পা মা গা গরা । সা -ন্‌া রসা -া I সা -গরা গা গা । গা -ক্ষা ক্ষা পা I
ত বে কে ন ফি • রে • চা • • হ তা রি • ত রে

না নধা পা -া । -া -া ক্ষা গা I মা -া -া -গা । রগা গরা সা -া I
ব ল না • • • ব ল না • • • ব • ল না •

সা সা গা মা । পা না র্সা র্সা I নর্রা -র্সনা -ধপা -ক্ষপা । -গমা -গরা -সন্‌া সা I III
চা হ তা রি ত রে ব ল না • • • • • • • • • • •

নিশীথে আলপন ইত্যাদি।

স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় *

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ,

শিক্ষকদের সহিত স্নেহের সম্পর্কের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকেন্দ্রের সহিত ছাত্রদের স্নেহবন্ধন প্রধানতঃ অবিচ্ছিন্ন থাকে। কোনো বিদ্যায়তনের ভাবরূপটিকে অন্তরের সহিত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা ও তাহাকে মনে-প্রাণে ভালোবাসিতে পারার শক্তি ছাত্রজীবনের প্রথম যুগে খুব অল্প কয়জনের মধ্যেই আশা করা যায়। গাছপালা ঘরবাড়ী ইত্যাদির মধ্য দিয়া বিদ্যায়তনের যে-জড়রূপটি স্থূলদৃষ্টিতে প্রকাশ পায় তাহাকেই মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া সেখানকার জীবিত ব্যক্তিদের সহিত জীবনযাত্রার স্মৃতি কল্পনায় এক অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করিয়া চলে। লর্ড সিংহ নাকি প্রায়ই বলিতেন—"Dear to me is the memory of Raipur School, but dearer is Haribabu।" সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের ছাত্রাবস্থায় হরিবাবু ছিলেন একজন পুরাতন ও সুদক্ষ শিক্ষক। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র আমরা বাল্যাবস্থায় শিক্ষক মহাশয়দের সহিত নিবিড়তর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি; আমাদের নিকট আমাদের মাষ্টার মহাশয়দের স্মৃতি অধিকতর প্রিয়।



স্বামী জগদানন্দ

শ্রদ্ধেয় জগদানন্দ রায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদের সম্যক্ সত্য উপলব্ধি করিতে পারা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। অবিচ্ছিন্ন সাত বৎসর কাল ধরিয়া যাঁহার সুকঠোর শাসন ও সুগভীর স্নেহের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইলাম, শান্তিনিকেতনের বহু পুরাতন মাধবীমঞ্চের নীচে সুদীর্ঘকাল দুইবেলা যাঁহার যত্নে বাল্যের সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিকর বিষয় গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিলাম, যাঁহার ছাত্রপরিচালনা গৃহপর্য্যবেক্ষকতা ও কার্য্যাধ্যক্ষতায়

* শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের (প্রাক্তন অধ্যাপক ও ছাত্রদের সভা) কলিকাতা শাখাসমিতির জন্য বিশেষভাবে লিখিত।

ছাত্রজীবনের অধিকাংশসময় যাপন করিলাম,—তাঁহার ছবি এমনি জীবন্ত ও গভীর ভাবে নয়নসম্মুখে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে যে দূরে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যুর সংবাদমাত্র শুনিয়া সে-ছবি মুছিতে চাহেনা। হয়ত আবার যেদিন আমাদের শান্তি-নিকেতনে যাইব, সেইদিন সেখানকার সকল পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট স্থানগুলিতে যখন মাষ্টার মহাশয়কে বারে-বারেই অনুপস্থিত থাকিতে দেখিব তখন বুঝিব যে তিনি সত্যই আমাদের নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছেন।

১২৭৬ বঙ্গাব্দে নদীয়া-কৃষ্ণনগরে জগদানন্দ রায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁহার ছাত্রজীবন মধ্যপথেই শেষ হয়। অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই গোয়াড়ির এক মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য আরম্ভ করেন। সেই হইতে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে, কখনো শিক্ষকরূপে কখনো সরলভাষায় সারগর্ভ পুস্তকরচনা করিয়া বিদ্যাবিতরণের ভিতর দিয়া তিনি বাংলার কিশোর-চিত্তের উন্মেষ-সাধনে প্রভূত সাহচর্য্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় ত্রিশবৎসর বয়সের সময় তিনি কবিবর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। শিলাইদহে জমিদারী-সংক্রান্ত কাজ ব্যতীত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের গণিতশিক্ষার ভারও তাঁহার হাতেই ছিল।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮ ইংরাজি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের শ্রাবণমাসে শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার দিনটি জগদানন্দবাবু কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেন। তাঁহার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসবিরল ভাষায় তিনি বলিয়াছেন :

"যখন শুনিলাম গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকিবেন এবং সেখানে বিদ্যালয় হইবে তখন তাঁহার সঙ্গ লইয়া আনন্দবোধ করিয়াছিলাম। যদি জমিদারীর কাজেই থাকিয়া যাইতাম তাহা হইলে আজ আমার কি দশা হইত তাহা অনুমানই করিতে পারি না।"

শান্তিনিকেতনে আসিয়াও প্রথম কয়েক মাস রথীন্দ্রনাথকে গণিত ও প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়াই তাঁহার কাজ ছিল। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জগদানন্দবাবুর ভাষাতেই অল্পকথায় সেই শুভদিনটির বর্ণনা পাই :

"কলিকাতা হইতে আগত অনেকেই সে-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। * * * * * * *

"পাঁচটি বালক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্ত ক্ষৌমবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ইঁহারা যেরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহা আজ সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে। আমি এবং শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় তসরের ধুতিচাদর পরিয়া নিকটে ছিলাম।"

সেই জন্মদিন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়টির সকল প্রকার বিপদে ও সম্পদে উৎসবে ও ব্যসনে তিনি ছিলেন পরম আত্মীয় ও প্রধান সহায়স্বরূপ। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যালয়ের একজন নিকটতম আত্মীয়ের বিয়োগ ঘটিল এবং আজিকার বিশ্বভারতীগ্রস্ত শান্তিনিকেতনে অতীতের ক্ষীণপ্রায় শিখাগুলির মধ্য হইতে একটি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। প্রাক্তনদের পক্ষে এখন জানিনা কবীন্দ্র ব্যতীত আর কয়জনকে অবলম্বন করিয়া পুরাতন আশ্রমের স্মৃতি কল্পনায় আনা সম্ভব হইবে।

শান্তিনিকেতনে প্রথম যখন যাই তখন বয়স নিতান্তই অল্প। "মাষ্টার মহাশয়" জগদানন্দবাবুকে প্রথম দেখিলাম মাধবীবিতান গেটের তলে গণিতক্লাসে। খড়্গাকৃতি বক্রনাসা, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, ঈষৎ চাপা দুই ঠোঁট, বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূভঙ্গি, এবং মোটা কম্বলের মত এক গরম চাদর মুড়ি দিয়া (তখন পৌষের শীত) বসিবার ভঙ্গি এই সমস্ত মিলিয়া বালক প্রাণে যে-অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছিল তাহা নিতান্তই ভয়ঙ্কর। ক্লাসে সকলেই অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে থাকিতাম। কয়েকদিন পরে প্রথম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিল বেণুকুঞ্জের কুটিরে, যখন দেখিলাম এক বাজনার আসরে জগদানন্দবাবু সকলের পিছনে এক কোণে বসিয়া একমনে বেহালা বাজাইতেছেন। সেইদিন জানিলাম মাষ্টার মহাশয়ের সবটুকুই শুষ্ক গণিতে পূর্ণ নহে, রসের স্থানও তাঁহার অন্তরে আছে। পরে আরো কয়েকবার তাঁহার বেহালা শুনিবার

সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং জানিতে পারিয়াছিলাম যে তিনি একজন সত্যকার সুররসিক ছিলেন। এই সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গীত প্রীতির কথা মনে পড়ে। সাধারণতঃ গানের দলের ছেলেদের প্রতি যে-সম্ভাষণ তিনি ক্লাসে ব্যবহার করিতেন তাহাতে তাঁহার রসবোধের প্রশংসা করিতে অনেকেরই দ্বিধা হইত। গীত-উৎসবাদি উপলক্ষে ঘন ঘন কলিকাতায় আসায় ক্লাসের যে-ক্ষতি হইত তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার ছাত্রদের-প্রতি-দায়িত্ব-বোধ সকল সময় তাঁহার রসবোধকে ছাপাইয়া উঠিত। কিন্তু অবসর সময়ে আবার সেই কঠোর মাষ্টারমহাশয়কেই তন্ময় হইয়া সুদূরপানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া গান শুনিতেও দেখিয়াছি। কলিকাতা-জোড়াসাঁকোয় একবার "শারদোৎসবের" অভিনয় অভ্যাস চলিতেছিল। লক্ষেশ্বরের ভূমিকা লইয়া জগদানন্দবাবুও আসিয়াছিলেন। সমস্ত গান একবার করিয়া গাওয়া হইয়া গেলে জগদানন্দবাবু প্রায়ই অত্যন্ত সলজ্জভাবে রবীন্দ্রনাথকে "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা" গানটি গানের দলকে দিয়া আবার গাওয়াইবার অনুরোধ করিতেন। তাঁহার এই অনুরোধ অনেকেরই মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। প্রথম প্রথম কবি নিজেও ইহা লইয়া জগদানন্দবাবুর সহিত একটু রঙ্গ করিতেন। কবির কোন্ গানগুলির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল তাহা তখন জানিতে পারা সম্ভবপর হয় নাই তাঁহার প্রকৃতিগত নীরবতা ও আমাদের ছাত্রসুলভ সাহসের অভাবে; আজ সে-সাহস সঞ্চয় করিবার পর দেখি মৃত্যু সে পথ নির্ম্মমভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

মাষ্টারমহাশয়ের প্রতি ভয় শান্তিনিকেতনে থাকিতে সম্পূর্ণ দূর কখনো হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্নেহের যে-পরিচয় ক্রমশঃ পাইতে লাগিলাম তাহা পূর্ব্বের অপরিচয়ের ভীতি অল্পদিনেই শ্রদ্ধায় পরিণত করিয়া দিল। ভয়ও ভালোবাসার সংমিশ্রণে তাঁহার সহিত যে-অপূর্ব্ব সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল আজো তাহার মোহ এড়াইতে পারিলাম না। শান্তিনিকেতনে যাইবার পরের বৎসর জগদানন্দবাবুর "গ্রহ-নক্ষত্র" আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইল। বইটির উৎসাপিত্রের মধ্যে মাষ্টারমহাশয়ের অন্তরের অন্তঃশীলা স্নেহধারার প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাইলাম। পরলোকগত প্রিয়ছাত্র যাদবের প্রতি যে-স্নেহমধুর ভাষায় তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাই ত তাঁহার স্নেহের সত্যকার ভাষা। কঠোর শাসনের অন্তরালে এই স্নেহধারার পরিচয়াভাস পাইতাম বলিয়াই চিরকাল তাঁহাকে কেবলমাত্র যে শ্রদ্ধা করিয়াছি তাহা নহে, একান্তভাবে ভালোও বাসিয়াছি। অনেকদিন পরের কথা মনে পড়িতেছে—ছাত্রদের শাস্তি দিতে গিয়া খাওয়া বন্ধ করিয়া নিজেও না খাইয়া থাকিতে কেবলমাত্র তাঁহাকেই দেখিয়াছিলাম। শুষ্কদেহ, রুক্ষ ব্যবহার বৃদ্ধ শিক্ষকের অন্তরে জননীসুলভ গভীর স্নেহের এইরূপ গোপন সঞ্চয় আর কোথাও দেখি নাই। শান্তি-নিকেতন ছাড়িয়া কলিকাতা হইতে দূরে বিরক্তিকর বিচিত্র রুচির ছাত্রদের মধ্যে প্রথম যখন কলেজ-জীবন আরম্ভ হইল, যখন সতীর্থ বন্ধুদের উদ্দেশ পাওয়াও নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল, মনে পড়ে সেই সময়ে জগদানন্দবাবুর স্নেহের গভীর পরিচয় পাইয়াছিলাম তাঁহার প্রেরিত "আলো" পুস্তকের মধ্যে। কোথা হইতে ঠিকানা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজো জানিতে পারি নাই। তখনকার একটানা নিরানন্দ দিনগুলির মধ্যে সেই দিনটিতে যে-আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা আজো সুস্পষ্ট মনে পড়ে।

সচরাচর গম্ভীর থাকিলেও জগদানন্দবাবুর মধ্যে হাস্যরসের উৎস কখনো সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া যায় নাই। অঙ্কের শিক্ষকতাকার্য্য ও বিজ্ঞানের জটিল সমস্যাকে সরলভাষায় ব্যক্ত করার সুকঠিন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে আপনার মধ্যে সকলপ্রকার রসবোধ জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। "শান্তিনিকেতন পত্রে" (রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা ১৩৩৩) প্রকাশিত তাঁহার "স্মৃতি" রচনাটিতে যে-সহজ ও সুন্দর রসসাহিত্যসৃষ্টির পরিচয় পাই তাহা অপূর্ব্ব। "শারদোৎসবে" কৃপণ লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় তিনি যে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার রসবোধের পরিচয় পাই। লক্ষেশ্বরের ভূমিকা অভিনয়ে পদে-পদেই অতিরিক্ত করিয়া ফেলার ভয় আছে। চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে যে-রসবোধ থাকার একান্ত দরকার কেবলমাত্র তাহাই যে তাঁহার ছিল তাহা

নহে, উহাকে লোকসমক্ষে ফুটাইয়া তুলিতে যে-অভিনয় পটুত্বের প্রয়োজন তাহাও তাঁহার অধিকারে ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়েই জগদানন্দবাবুর লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। "ফাল্গুনী"র "দাদা"র ভূমিকাতেও তাঁহার অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

তাঁহার রসিকতার পরিচয় একবার বাল্যকালে বড় অদ্ভুত ভাবে পাইয়াছিলাম। মাষ্টারমহাশয় ডিটেক্টিভের এক রোমাঞ্চকর গল্প একরাত্রে বলিতেছিলেন। তাঁহার বলার ভঙ্গিতে অভিভূত হইয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছি। গল্পটি তিনি উত্তমপুরুষে বলিয়া চলিয়াছেন। গল্প ক্রমে শেষ হইল; আমরা সকলেই গল্পটির সমস্তই প্রায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম এমন সময় কে-একজন অসমসাহসী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: "এ সব সত্যি মাষ্টার মশাই?" কৃত্রিম ক্রোধের সহিত চোখ পাকাইয়া মাষ্টারমহাশয় উত্তর করিলেন: সত্যি নয় ত আবার কি? তোমাদের কাছে কি এই বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথা বলতে বসেছি?" পিছন হইতে বড়দের কেহ কেহ তাঁহার এই বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমরা কিন্তু ইহাতেও অবিচলিত থাকিয়া সকল কথাই সেদিন বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

হাসি ও গাম্ভীর্য্যের এই সমাবেশ শেষ বয়সে পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও রোগের পীড়নে হয়ত কিছু নষ্ট হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার স্নেহধারা বাহিরের সকল রুক্ষতাকে অতিক্রম করিয়া শেষ যেদিন দেখা হইল সেদিনও সাধ্যমত আপনার পরিচয় দিয়াছে।

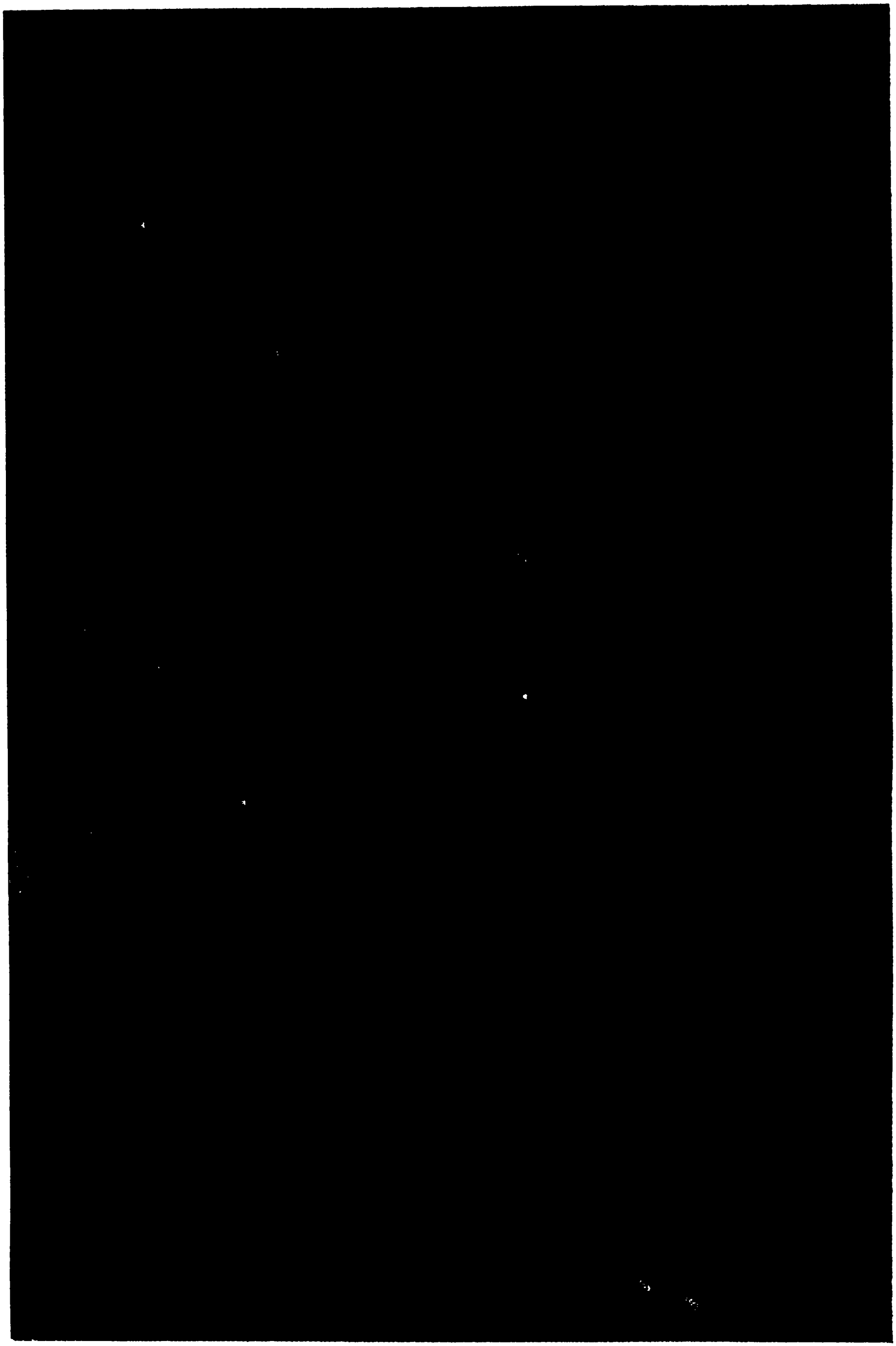
সকল কাজই জগদানন্দবাবু শান্তভাবে লোক চক্ষুর অন্তরালে করিতে ভালোবাসিতেন। ভিড় তাঁহার সহ্য হইত না। তাঁহার যে-ছবি আমাদের মনে পড়ে তাহার চারিপাশে জনতার হট্টগোলের আবেষ্টনী নাই। বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠান-সমারোহের প্রখর আলোকে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। বর্ম্মা চুরুটটি মুখে লইয়া চোখের সামনে দৈনিক সংবাদপত্রখানি মেলিয়া ধরিয়া শালবীথির প্রশস্ত রাঙাপথ ছাড়িয়া পথপার্শ্বের ঘাসগুলির উপর দিয়া অন্যমনস্ক পদবিক্ষেপে চলার চিত্র চোখের সম্মুখে এখনো দেখিতে পাই। সকল সভা-সমিতিতেও তিনি দূরে আড়াল দেখিয়া বসিতেন। অথচ আশ্রমবালকদের সকল অভাব-অনুযোগ ইত্যাদির খুঁটিনাটির তত্ত্বাবধানের ভিতর দিয়া এই দূরের মানুষটিই সকলের অন্তরের অতি কাছাকাছি বাসা বাঁধিয়াছিলেন। ছাত্রেরা সকলের অপেক্ষা ভয় করিত যাঁহাকে, সকলের অধিক ভরসাও রাখিত তাঁহারি উপর।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস হইতে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানে তাঁহার সেবার দানের যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিবার সাধ্য ও অধিকার একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথেরই আছে। জগদানন্দবাবুর ন্যায় নীরব ও সুদক্ষ কর্ম্মীর অপসরণের যে-ক্ষতি তাহারও নিষ্ঠুরতম অনুভূতি একমাত্র তাঁহারি।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে জগদানন্দবাবু অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্তচাপের আধিক্য ও অন্যান্য উপসর্গে শরীর তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ক্লাসে বসিয়া ছাত্রদের পড়াইবার পরিশ্রম সহ্য করিবার শক্তি তিনি হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি তাঁহার পুস্তক রচনার কার্য্য ত্যাগ করেন নাই। শিক্ষকতা করিয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের শিক্ষাদান আর না করিতে পারিলেও শান্তিনিকেতনের বাহিরে বাংলার অগণিত বালকবালিকাদের জন্য জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত তিনি করিতেছিলেন। এইখানে সাহিত্যিক জগদানন্দবাবুর কথা বলা প্রয়োজন।

শান্তিনিকেতনের বাহিরে জগদানন্দবাবুর এই পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাংলার বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়োবৃদ্ধ পর্য্যন্ত "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" "প্রাকৃতিকী" "পোকামাকড়" "গ্রহনক্ষত্র" "গাছপালা" "বাংলার পাখী" ইত্যাদির রচয়িতা জগদানন্দবাবুর মৃত্যুতে যে-ক্ষতি ও অভাব অনুভব করিতে থাকিবেন তাহার সান্ত্বনা কোথায়!

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মধ্যে জনসাধারণে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রচারের যে-প্রচেষ্টা প্রথম দেখা গিয়াছিল তাহারি বহুব্যাপক ও বিচিত্র প্রকাশ জগদানন্দ রায়ের মধ্যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়। ১৯০৫ সালের আরম্ভের



বিরাজ বৌ

বিচিত্রা
আশ্বিন ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীনিশীথ রায় চৌধুরী

দিকে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে গিয়া তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি দেখাইতেন। "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামক জগদানন্দ বাবুর প্রথম প্রকাশিত পুস্তকের সূত্রপাত হয় এই উপলক্ষ্যে। তাহার পর হইতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সরল মাতৃভাষায় লিখিত নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক পুস্তকের প্রচারকার্য্য চলিতে লাগিল। বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগের বিষয়েই তিনি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ছাত্র জীবনেই জগদানন্দবাবুর বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক নানা তথ্যের অনুসন্ধানে নানা বিষয়ের বিজ্ঞানপুস্তকের মধ্যে তাঁহার দিন কাটিত। তখনকার প্রধান মাসিকপত্র "ভারতী" ও "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ে রচনার মধ্য দিয়া জগদানন্দবাবুর সাহিত্যিক জীবনের সূচনাও ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর নূতনত্ব ও রচনাপদ্ধতির অভিনব ও বিশিষ্ট ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। জমিদারীর কাজ ছাড়িয়া আসিয়া শান্তিনিকেতনের আশ্রম-ছায়ায় সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের নানাপ্রকার অমূল্য উপদেশে উপকৃত হইয়া তাঁহার রচনাকার্য্য উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাঁহার আগেকার রচনার ভাষা অত্যন্ত জটিল ছিল। কবির নিকটে সহজ সরল ভাষায় লিখিবার উপদেশ বারবার পাইয়া আজ তিনি স্বচ্ছ সরল আড়ম্বরশূন্য ও সম্পূর্ণ বিষয়োপযোগী যে-রচনাভঙ্গির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর বাংলা-সাহিত্যে কে কতদিনে আনিয়া দিবে জানিনা। জগদানন্দ-বাবুর বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রচারের শক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছিল। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির বিষয়ে আলোচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন জগদানন্দবাবু তাহার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

শেষজীবনে জগদানন্দবাবুর কর্ম্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের বাহিরেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। বহুবৎসর ধরিয়া তিনি বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতির সুযোগ্য সভ্য ছিলেন। বোলপুর ইউনিয়ন বোর্ড বেঞ্চকোর্টের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে স্থানীয় নগর ও গ্রামের অধিবাসীদের ক্ষতি ও দুঃখ নিতান্ত কম নহে। তাহারাও যে তাঁহার স্নেহ ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

তবুও সকল ক্ষতির উপরে আজ নিজেদের ক্ষতির কথাই বারবার মনে হইতেছে কারণ বুঝিতে পারিতেছি সেই ক্ষতি সত্যই অপূরণীয়। বিশ্বভারতীর বিপুল আয়োজনের মধ্যে পুরাতন শান্তিনিকেতনের স্নেহশীতল ও শান্তিপূর্ণ আশ্রম-রূপটির অভাব যখন একান্তভাবে অনুভব করিতে থাকি সেই সময় জগদানন্দবাবুর মত পুরাতন মাষ্টার মহাশয়দের স্নেহধারাই অন্তরে পুরাতন স্মৃতির সুমধুর ছবি জাগাইয়া তুলিত। তাঁহার মৃত্যুতে সেই পুরাতন শান্তিনিকেতনেরই অনেকখানি আমাদের হারাইতে হইল।

নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পাইপ

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পাইপ ধরা গেল। না ধ'রে আর উপায় ছিল না। কি রকম হাল্কা মনে হচ্ছিল, যেন পানসীতে বেয়ে যাচ্ছি দম্‌কা হাওয়ার খেয়ালে, না আছে উদ্দেশ্য, না আছে সিদ্ধি। হিন্দুর ছেলে হাজার হোক, একটা বয়সের পর বানপ্রস্থের আহ্বান কানে আসবেই আসবে। বন আর কোথায় পাই? এই সংসারটাই অরণ্য, কেননা শ্বাপদ-সঙ্কুল। অন্তধারে এ যুগের মানুষ ত', মনে পশ্চিমী সভ্যতার আমেজ লেগেছে। তাই পূর্ব্ব পশ্চিমের মধ্যে রফা ক'রে ফেললাম। পয়লা জানুয়ারী মনস্থ করলাম সিগারেট আর খাব না। কিন্তু মুখ সড়সড় করতেই থাকে। বিড়ি চলে না। চললে আর কিছু ভাল লাগে না শুনেছি। কিন্তু নিজের ওপর পরীক্ষা করবার সাহস নেই। বিড়ি ছাড়া চুরুট চলতে পারে বটে, কিন্তু কোন্ চুরুট খাব? বর্ম্মা চুরুট কড়া। মাদ্রাজী চুরুট রুচ্‌ল না। জাভার তামাকে মুখ চুলকোয়। কিন্তু সস্তা। সস্তার তিন অবস্থা স্মরণ করেও প্রতিজ্ঞা অটল রাখতে চেষ্টা করলুম। ফলে এত বেশী চুরুট খেতে লাগলাম যে হৃৎপিণ্ড বিগড়ে গেল। অন্তত তাই মনে হল, ডাক্তার ডাকিনি, তামাকের ওপর, চাএর ওপর তাঁদের জাতক্রোধ। বিপদের সময় কেউ শত্রুকে ডাকে না। তাই নিজেই নিজের ডাক্তারী করলাম। পাইপ ধরা ঠিক করলাম।

এতদিনে নিজেকে পেলাম। গুহ্যধর্ম্মের ভাষায়, আমার এতদিন ছিল আত্মার অন্ধকার রাত্রি। অন্ধকার অপসৃত হল চুরুট ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তখনও আত্মার রূপটি প্রকাশিত হয়নি। যেই পাইপ কিনব ঠিক করলাম, ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যা সাতটা বেজে ৩৮ মিনিটে, তখনই আমার মানসচক্ষে একটা তীব্র আলোর ঝলক খেলে যায়। মাথা ঘুরে পড়ে যাই। যখন জ্ঞান হয়, ঠিক অজ্ঞান হইনি, তখন অনুভব করি অলকা আমার মাথায় হাওয়া করছে। এ অবস্থাও যোগের শুনেছি। প্রথম আওয়াজ শুনলাম অলকার 'এখন কেমন আছ? সস্তার দেশী চুরুট আর খেয়োনা কতবার বলেছি, এইবার এপোপ্লেক্সি হলত!' অলকাকে ইঙ্গিতে হাওয়া করতে বারণ করে একেবারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ভীষণ লজ্জা হল। বেটাছেলের অজ্ঞান হওয়া উচিৎ নয়, যদি জ্ঞান হারাতেই হয় তা হলে ফুটবলের মাঠে। নচেৎ ড্রয়িংরুমে, বিশেষত অলকাদের ড্রয়িংরুমে! কেলেঙ্কারী করবার যায়গা পেলাম না! কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর ওপর আমার কখনও কোনও হাত ছিল না। স্নায়ু আমার দুর্ব্বল। অলকা বলত, চা, সিগরেট, ও সস্তা চুরুটের জন্যই আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে। তা নয়, স্নায়ুর দোষ আমার ছেলে বয়স থেকে। না হলে অলকার সঙ্গে ও ব্যাপার হবে কেন? কথায় বলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান। ডাক্তারী ভাষায় বলতে গেলে, আমার স্নায়ু ও শিরা পাকিয়েই ঐ প্রকার দড়ি তৈরী হয়েছিল। অলকা চেহারা ও বুদ্ধিতে আমার চেয়ে নীচু, তবু কেন? সিগরেট, সিগার ও চা-কে দোষ দিলে শুধু হয় না। যদি তাদের কোন দোষও থাকে, তা হলে, বেশ—পাইপ ধরব। তখন দেখব, অলকা কি করে? আর বাস্তবিকই তাই, দুর্ব্বলের স্থান নেই এ পৃথিবীতে। জগতের পিছনে কোন বড় ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে কিনা জানিনা। একদল দার্শনিক অন্তত তাই বলছেন। তাঁদের লেখা মনোযোগ সহকারে পড়েও নিজেকে দৃঢ় করতে যখন পারলাম না তখন বুঝতে হবে যে তাঁদের ব্যাখ্যা ভুল। অথচ বিস্তর লোক দেখেছি যাঁদের ইচ্ছামত অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠছে। সেইজন্য মনে হয়, ইচ্ছাশক্তির সার্থকতা দার্শনিক ব্যাখ্যায় নয়, জগতের পরিবর্ত্তন-কার্য্যে। আমি জগতকে যে ভাবে পেয়েছি সেই ভাবেই উপভোগ

করতে চাই। আজ যদি আমার পরিমণ্ডলী ভিন্ন আকার ধারণ করে তাহলে আমিও বদলে যাব। অথচ অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি যে আমি লোকটা মন্দ নই। নিষ্কামবুদ্ধির এই সিদ্ধান্তটি অভ্যাসের সমর্থন পেয়ে প্রামাণ্যে পরিণত হয়েছে। তাই যেমন আছে তেমনি ভাল। শুধু যদি অলকা আমার প্রামাণ্যটুকু মেনে নেয়, তা হলেই পৃথিবীটাকে আর অদলবদল করতে হয় না—আমার ইচ্ছাশক্তির ওপর অত টান পড়েনা, আমাকে জার্ম্মান দর্শনও পড়তে হয় না। কিন্তু অলকা নিজের স্বভাব থেকে এক চুল হটবে না, তাইত আমাকে সিগারেট ও সিগার ছেড়ে পাইপ ধরতে হল।

যে অলকাকে দশবৎসর আগে দেখে লঘুচিত্ত মনে হয়েছিল আজও সে তাই রয়েছে দেখে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। প্রথম দেখি, এক আত্মীয়ার বিবাহের বাসরে। মুখে কথার খই ফুটছে, চোখ সর্ব্বদাই চঞ্চল, হাল্‌কা গড়ন, হাত দুটো খুব লম্বা, আঙুলগুলো অজন্তার ছবি থেকে ধার করা। চোখ দুটো কালো ও গভীর বটে, কিন্তু তালগাছ পরিবেষ্টিত ছোট্ট ডোবা থেকে মাছরাঙ্গা পাখী ছোঁ মেরে পুঁটিমাছ তুলে নেবার পর জল যেমন ঈষৎ আলোড়িত হয়, তারা দুটো তার সর্ব্বদাই তেমনি কম্পিত। কোথায় যেন তার রূপে একটু অসামঞ্জস্য ছিল ঠিক্‌ ধরতে পারিনি। প্রায় সব মেয়েদেরই কোথাও না কোথাও বেমানান থেকেই যায়। কিন্তু লাখে একজনের সেই বেমানানটুকুই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান হয়। অলকার মুখ ছিল ডিমের মতন, ঠোঁট ছিল পুরু, ইটালীয়ান প্রিমিটিভ ও প্রি-র‍্যাফেলাইটের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। গলা ছিল লম্বা, কাঁধ ছিল ঢালু, অথচ চুল ছিল কোঁকড়া ও রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ছবির কোন স্কুলের মধ্যেই সে খাপ খেত না। অনুপম কথাটির মধ্যে একটু রোমাঞ্চের ইঙ্গিত আছে, এবং তাকে দেখে আমার রোমাঞ্চ হয়নি, সেইজন্য অনুপম বলতে কুণ্ঠা হচ্ছে কিন্তু অনুপম ছাড়া তার চেহারার অন্য বর্ণনা দেওয়া যায় না। আর তার গালে বড় তিল থাকাতে তাকে আরো স্বতন্ত্র দেখাত। পরে কতবার তাকে বলেছি—এই ছোট্ট কাল দাগটি দিয়ে তার দেবতা তার চরিত্রের কাল ও অজ্ঞাত অংশটা ফুটিয়ে তুলেছেন। সে গম্ভীর হয়ে যেত—আর আমার খুব ভাল লাগত। তাকে গম্ভীর করা কত শক্ত আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। প্রত্যেকবারে কিছু সন্ন্যাস-রোগের ভয় দেখান যায় না। শেষে সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র থাকে না—সে অস্ত্র নিক্ষেপ করতেও নারাজ।

কথা দিয়ে কথা না রাখা কাল ছিল তার অঙ্গের ভূষণ। এই বল্লে, রাখা চিঠি লিখব পরশু পাবে; আমি অপেক্ষাই করছি, অপেক্ষাই করছি, পিয়ন এল, চলে গেল, কোন চিঠিই নেই। বিকেলে গিয়ে শুনলাম, আমি চলে আসার পর থেকেই ভীষণ মাথা ধরে, এইমাত্র বিছানা থেকে উঠছে। সে কী কষ্ট! চিঠি না হয় নাই লিখুক চশমা পরে থাকলেই হয়। তা সে পরবে না, খারাপ দেখায়। অথচ দামী চশমা, হালফ্যাসানের। "সে হবে না, চশমা হালফ্যাসানের হলে কি হয়, চশমা পরাটা হালফ্যাসানের নয় যে।" এরপর উত্তর চলে না, তর্ক চলতে পারে। বল্লাম, 'তোমাদের সবই ফ্যাসান!' "নিশ্চয়ই, জানতে না? চশমাটা গয়না, স্বাস্থ্যটাও তাই।" "সে গয়না কে পরে?" "মানুষ নয়।" "বোধ হয় তাই।" মেয়ে মানুষের মধ্যে মানুষ নেই, তারা শুধুই মেয়ে, অন্তত অলকা তাই।

ছোট ভাইএর বন্ধুর নচেৎ অত সেবা করতে পারে। মেয়েরা যে খুব সেবা করতে পারেন চিরকাল শুনে এসেছি, ঠিক বিশ্বাস করিনি। মারমিয়ানের লাইন কয়টি যুবাবয়সের মনে অতি সহজেই দাগ দিতে পারে। পরে যখন যাচাই করার প্রবৃত্তি জন্মায় তখন সুবিধা হয় না। কিন্তু অলকা সত্যই সেবা করতে জানে। তার ছোট ভাইএর বন্ধুর কি একটা অসুখ হয়। অলকা, যে অলকা অত ফিট্‌ফাট্‌, অত সজ্জাপ্রিয়, সেই অলকার নতুন রূপ দেখলাম। অবশ্য নতুন রূপই আমার মনকে হরণ করেনি, করেছিল তার সাজসজ্জার প্রতি অনুরাগের ক্ষুণ্ণতা। বিতৃষ্ণাই হয়ত বলতাম যদি না জানতাম তাকে। একদিন একটু আলাদা পেয়ে তাকে ভাল রঙীন সাড়ি পরতে অনুরোধ করি। উত্তর পেলাম, 'সে কি হয়! খোকন সেরে উঠুক, তুমি যা পরাতে চাইবে, তাই পরব। এখন রঙীন সাড়ি পরলে ও কি ভাববে?' এই 'ও কি ভাববে' ভাবটি আমার সহ্য হয় না। আমি কি ভাবব না ভেবে জগতের অন্য প্রত্যেকে কখনও কোনদিন

যা ভাবতে পারে তাই হল তার সমগ্র ব্যবহারের নিয়ন্তা, বিধাতা। পরের মুখ চেয়ে কাপড় পরার সার্থকতা আমি কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তবু খোকন সেরে ওঠে। অলকার তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। শয্যাত্যাগের সময় উত্তীর্ণ হবার বহু পরে ছোকরাটি গৃহত্যাগের সুবিধা পায়। তার পর অলকার ভীষণ অসুখ করে। সেবা ক'রে ক'রে তার স্বাস্থ্য ভগ্ন হবার জন্যই তার অসুখ করেছে শুনে সে বেশ আনন্দিত হত আমার মনে পড়ে। মজার ব্যাপার এই, চলে যাবার পর ছোকরাটি তার ফ্লোরেন্স নাইটাইঙ্গেলের দিক মাড়াল না। তার অকৃতজ্ঞতার কথা অলকাকে স্মরণ করিয়ে দিই। অলকা বলে, 'আমার কাজ আমি করেছি। আহা, ছেলেমানুষ, সে ম্যাচ দেখবে না?' কিন্তু সিল্ড্ ফাইনালের পরও খোকনবাবু এল না। একদিন আমি স্মিথ ষ্টানিষ্ট্রিটের দোকানের সামনে তাকে দেখি। পালাবার পথ পায় না, তাকে এক রকম ধরে বেঁধেই তার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলাম। পাইপটা ভাল করে টেনে ধোঁয়া বার ক'রে সে বল্লে, 'তাইত! সত্যই অন্যায় হয়ে গিয়েছে, এই উদয় শঙ্করের নাচের হুজুগটা গেলেই যেতে হবে। আমার হয়ে একবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবেন।' ছোকরার কথাবার্ত্তায় একটা আত্মস্থভাব লক্ষ্য করে খুব অসন্তুষ্ট হয়নি, একটু হয়েছিলাম যা ঐটুকু ছেলের মুখে পাইপ দেখে। কাচপোকা যখন তেলাপোকাকে ধরে তখন তেলাপোকার মুখ দিয়ে যে লালা নির্গত হয় সেটা পাইপের নিকোটিনমাখান থুতু নয় শপথ করে বলতে পারি।

মোদ্দা কথা, পাইপে গাম্ভীর্য্য এনে দেয়। পাইপের সাহায্যে আত্মস্থ হওয়া যায়। পাইপ খেলে চোয়াল দুটো ভারী হয়, চোখ দুটো সর্ব্বদা পাইপের আগুনের দিকে নিবদ্ধ থাকে ব'লে দৃষ্টিটা যোগীর মত হয় ওঠে, প্রায়ই দিয়াশালাইএর সন্ধান করতে হয় বলে পাইপ-ভোগীকে দার্শনিকের মত একটু অন্যমনস্ক দেখায়। তা ছাড়া, পাইপ টানতে হয় সময় বুঝে, এবং সে সময় কখন কোন্ অবস্থায় অলকাকে ভাল দেখায়, তার চুলের ঝাঁপি কখন তার গালের ওপর পড়েছে, তার দুল দুলতে দুলতে কেমন করে তার গালে রামধনু সৃষ্টি করছে, এ সব তুচ্ছ ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। পাইপকে একটু অবহেলা করেছ কি সে নীচে গিয়েছে। এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রেমের চেয়ে ঢের ভাল। সে নিষ্ঠার প্রক্রিয়ার একটা রীতি আছে, কিন্তু প্রেমের কোন নিয়ম নেই। একটু বুঝে সুঝে টানলেই পাইপ সাড়া দিল, সাড়া দিল, কিন্তু অলকা! এতদিনেও কিছুই তাকে বুঝিনি। তাছাড়া, দেশলাইএর দামই বা কত? আর আর্কেডিয়া মিক্শ্চার—না হয় নেভিকাট, না হয় থ্রি নানস্—থ্রি নানস্ মেয়েলি সেই বা কত খরচ? নাম হলেও জিনিষটা ভাল, বোধ হয় ভাল বলেই নান্স্ হয়। জগতের ভাল মেয়ে কি নেই? আছে, তবে তারা নানারিতে। এখানে আমি হ্যামলেটের সঙ্গে একমত নই। অবশ্য, অলকাকে আমি ঐ ধরণের কোন আশ্রমে পাঠাতে চাই না। আশ্রমে শৈথিল্য আসবে। আর সে যাবেও না।

* * *

পাইপ-সেবনের ফল হাতে হাতে পেলাম। অলকা আমাকে লিখেছে, 'একবার এস, জরুরী কাজ আছে।' কাজ মানে মাথা আর মুণ্ডু, শান্তিনিকেতনের কোন ছাত্রীর কাছ থেকে ব্লাউসের ওপর এমব্রয়ডায়রীর নমুনা আঁকিয়ে এনেছে, তাই দেখান। কিন্তু আমারও হাতে কাজ ছিলনা। থলিতে একটু কড়া তামাক ভরে নিয়ে হাজির হলাম। উত্তরার পৃষ্ঠায় আমার একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে তারই তারিফ শুনতে হল। লেখাটা হাল্কা কলমে, তাই পছন্দ হয়েছে—বেশই পছন্দ হয়েছে মনে হল।

"পরিচয়ের লেখাটা পড়েছ?"

"না, বুঝতে পারিনা।"

"পরিচয় না পড়ে উত্তরা পড়াই তোমাদের স্বাভাবিক। পরিচয়ে গল্প থাকে না, ইংরেজী গল্পের অনুবাদ থাকে, এবং সে গল্পে প্রেমের কথা অল্প। তোমাদের ভাল লাগবে না।"

"মিথ্যে কথা বোলো না। এ-দেশী গল্পও থাকে, সে গল্প প্রেমেরও গল্প। কিন্তু নামগুলো বাঙ্গালীর ছাড়া সে সব গল্পের মধ্যে অন্য কোন দেশী ভাব নেই। যে প্রেম

বর্ণনা কর, সেটাও খাদি প্রতিষ্ঠান মার্কা প্রেম নয়। ও কাগজের অন্য লেখা বোঝা যায় না। কোন মেয়েরাই পরিচয় পড়ে না। তোমরা কাগজটা বার করেছে মেয়েদের অপমান করতে, সে কি জানিনা?"

"তোমার সত্যকারের দিব্যদৃষ্টি আছে। পরিচয়ের লেখা পড়তে হলে একটু গম্ভীর হতে হয়, সে তোমার কোষ্ঠীতে লেখেনি।"

"তুমি স্ত্রীজাতির আলোচনা শেষ কর আমাতে—এটা অন্যায়।"

"অন্যায় নয়, অনভিজ্ঞতা। তোমাদের মধ্যে বৈচিত্র্য কম, একটিকে জানলেই সকলকে জানা হয়।"

"তুমি আমাকে মোটেই দেখতে পারনা জানি—কিন্তু আমার জন্য তোমার স্ত্রীবিদ্বেষ হবে কেন?"

ঐ এক অস্ত্র আছে অলকার। আমার পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র। অন্তত পাইপ-সেবনের পূর্ব্বে তাই ছিল। আমার নিকোটিন-আচ্ছাদিত বুকে কিন্তু এই অভিমান আছড়ে ফিরে এল। আমি বল্লাম, "তুমি জান, আমি তোমাকে দেখতে পারি কিনা, যদি মনে কর পারিনা, পারিনা।"

"বর্দ্ধমানের লোকে মুড়ী খায়! আচ্ছা, খায় ত' খায়।"

"আমাকে ঠাট্টা কোরো না।"

"তুমি সহ্য করতে পারনা জানি। কি করে পারবে? প্রীগ্‌রা পারে না যে।"

পাইপের মুখে কড়া তামাক যদি না ভরে দিতাম তা হলে অপমানটি সহ্য করতে পারতাম না। অপমান সহ্য করলাম—প্রত্যুত্তরে তাকে ফ্লার্ট বলে চলে আসি। শুধু সিগরেটে উত্তরটি জোগাত না। দাঁতের মধ্যে ডাঁটাটি চেপে একটু ইংরেজী ধরণেই ফ্লার্ট কথাটি উচ্চারণ করেছিলাম। শেষে পাইপের মুখে আগুন দিতে দিতে তাদের বাড়ী থেকে চলে আসি। আত্মসম্মান বজায় ছিল বলেই ত মনে হচ্ছে। সিগরেট মুখে দিয়ে ও রকম আত্মসম্মানের সঙ্গে চলে আসা যেত না।

আত্মসম্মান খোয়ালে পুরুষের আর কি থাকে? অথচ মেয়েরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যেখানে নিজের কাছেই নিজের সম্ভ্রম থাকে না। নিজেরা কিন্তু সম্ভ্রমের ত্রুটি সহ্য করতে পারেন না। একেই বলে 'নিজের বেলা আঁটি শুঁটি, পরের বেলা দাঁত কপাটি।' আমি কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। এত আন্দোলন সত্ত্বেও মেয়েদের প্রতি পুরুষের সম্মান কমতে থাকবেই থাকবে। প্রকৃত সম্মান আপনার কাছে, অর্থাৎ চিবুকে ও চোখে, কেন না, আগে দেহ পরে মন। সেখানেও দৃঢ়তা ও তেজ কমে আসছে। আসবেনা বাই কেন? পান-দোক্তা যেদিন থেকে তাঁরা ছেড়েছেন সেদিন থেকে চোখ হয়ত ঢল ঢলে হয়েছে, গ্রীবা গোল হয়েছে, কিন্তু চরিত্র তাঁদের দুর্ব্বলতর হয়ে পড়েছে। কোন পান-দোক্তাসেবিকাকে যদি ফ্লার্ট বলতাম (এর একটি উৎকৃষ্ট বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে) তাহ'লে আমাকে আর সসম্মানে ফিরতে হত না। তাই বলে অলকাকে দোক্তা খেতে পরামর্শ কখনও দিতে পারব না। আমার মুখে পাইপ, তার মুখে দোক্তা—ভারী ঝগড়া হত তা হলে। 'বলি হাঁগা এত দেরী কেন?' কিংবা 'ও বাড়ীর হর-ঠাকুরণীর নথটা দেখেছ গা' কিংবা 'লাল কস্তাপেড়ে সাড়িই এ বয়সে ভাল, তাই এন,' কিংবা আমাকে ঠাকুর-জামাই বলা,—এ আমি সহ্য করতে পারতাম না। নাঃ, সে কিছুতেই পারতাম না। তার চেয়ে আমিই শুধু পাইপ খেয়ে যাই, সে মাঝে মাঝে দু একটি পান খাবে, ঠোঁট দুটো দেখাবে একটি ফালি বার করা তরমুজ। গোলাপ কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করতে পারলাম না সত্যের খাতিরে। অলকা কাল, গাল দুটি টঁ্যাপর টঁ্যাপর। তবুও আমি এ উপমা দিতাম না, ফাটা ডালিমই বলতাম, কিন্তু বলব না, আমার পাইপের খাতিরে, পাইপ আমাকে একটু নিষ্ঠুর করেছে। পাইপের তেত রস আমার হৃদয়কে তিক্ত করেছে।

পরের দিন ভোর বেলাতেই অলকার চিঠি পেলাম। "আমি তোমাকে অপমান করেছি বলে ক্ষমা চাইছি। আমি ভুল করেছি—তুমি প্রীগ্ নও তাই জানি তুমি আসবে।" অলকার দিব্যজ্ঞান হয়েছে দেখছি। এ রকম তার পূর্ব্বেও দু' একবার যে হয়নি তা নয়। হঠাৎ সে কেমন দোষ স্বীকার ক'রে ফেলে! যাই হোক, তার আত্মজ্ঞানকে স্থায়ী করতে যাওয়া উচিৎ মনে হল। সঙ্গে পাইপ নিলাম ও মিঠে-কড়া মিকশ্চার। অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হল আমাদের উভয়েরই অন্যায় হয়েছে—আমিও প্রীগ নই, সেও

ফ্লার্ট নয়। শান্তিস্থাপনের পর কফি চাইলাম, নিজে হাতে তৈরী করে দিলে। একটা সিগারেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলে। কিন্তু ডেলাইলার গল্পটি হঠাৎ মনে পড়ে গেল—বল্লাম, 'সিগরেট সিগার সব ছেড়ে দিয়েছি, ডাক্তারের পরামর্শে।'

"সেই গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগল ত? কতদিন না বলেছি ওসব ছাড়তে? আমার ওদের গন্ধে মাথা ধরত! তখন শোননি, এবার দেখ শরীর ও মন দুইই সুস্থ হবে, আর আমার ওপর অত কথায় কথায় রাগ করবে না।"

পাইপকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। মানৎ করেছি যেন দুদিন পরে অলকা ডাক্তারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির জন্য আমাকে পাইপ ছাড়িয়ে সিগারেট ধরাতে বাধ্য না করে। ভগবানের কাছে আমার এইটুকু প্রার্থনা, "তুমিত' জান, আমার অন্য কোন নেশা নেই। আর অন্য একজনের এত মাথা ধরলে আমিই বা কি করি! আমি ত আর অভদ্র হতে পারিনা।"

ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নে

শ্রীব্রজকান্ত ঘোষ

কাল রজনীর শেষে
দেখেছিনু আমি তাহারে স্বপনাবেশে।
দেখেছিনু তার আঁখি-পল্লব পুটে,
দু'ফোঁটা অমল অশ্রু রয়েছে ফুটে';
দেখেছিনু তার রাঙা ঠোঁটে পরকাশি
উঠিয়াছে এক কোমল করুণ হাসি!
কয়েছিল দু'টী কি কথা অফুট স্বরে,
শুনেছিনু আমি সারা প্রাণ মন ভরে';
তারপর সেই শুভখন গেছে ব'য়ে
গভীর স্তব্ধতায় মুখরিত হ'য়ে!

জাগিনু যখন তখন এসেছে উষা,
আকাশ পরেছে কনককিরণ-ভূষা;
দূর দিগন্তে জাগিয়াছে কলগীতি,
পুলকিত করি ঘন-শ্যাম-বনবীথি।
স্বপনের ছবি তখন হয়েছে লয়,
শুধু বুকে আঁকা হাসিটি অশ্রুময়;
শুধু হৃদয়ের তীরে
দুটি কথা তার রণিয়া রণিয়া ফিরে!

হৃষীকেশে

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মুখে মম মহামেঘ সম উদিত রূপেশ্বর,
ব্রাহ্মী উষার জ্যোতিরুন্মেষে প্রণমিছে অন্তর।
একি অনুভব, নব উৎসব, অদ্ভুত, অতুলন,
মানব-ভাষার অভিধানে তার নাহি কোন বিশেষণ।
শৃঙ্গের কোলে শৃঙ্গ-লহরী মিলিয়াছে নীলিমায়,
কল-হংসেরা মেলিয়াছে পাখা মহাজল-পিপাসায়।
কোথায় সুদূর ‘চন্দ্র-তীর্থে,’ কোন সে ‘পদ্মাকরে’
যাত্রা ক’রেছে দেবযান-পথে দুর্গম সরোবরে?
রজতোজ্জ্বল কিরীট পরিয়া যেথা গিরীন্দ্র-শির
রক্ষণ করে অক্ষয় শিখা দৈবত বহ্নির।
বৈবস্বত মনুর তরণী জলপ্লাবনে ভেসে’
না জানি সে কোন্ ‘নৌ-বন্ধন’ শৃঙ্গে লেগেছে এসে’!
কবে পাতালের অগ্নি-প্রবাহে বিদীর্ণ হ’ল ভূমি,
এই হিমালয়— ভূধরের ভ্রূণ উঠিল আকাশ চুমি’?
নয়নে তাহার কাজল পরালো ঘন-নীল অঞ্জন,—
নিমেষের তরে থেমে গেল বুঝি ধরণীর ঘূর্ণন।
দোলে শম্ভুর ডম্বরু-নাদে ‘বিষ্ণুপদী’র বেণী,
শোনে কল্লোল দেবদারু-বীথি, রুদ্রাক্ষেরই শ্রেণী।

স্বর্গ-মর্ত্ত্য, পর্ব্বত-দিক্— ব্যাপি’ সহস্র ক্রোশ
সুমেরু-শেখরে শোনা যায় এই ভাগীরথী-নির্ঘোষ।
শোনে সে বিশাল বদরী-বৃক্ষ, বজ্রে বিজয় করি’
আছে দাঁড়াইয়া কালের রন্ধ্রে শীর্ষ ঊর্দ্ধ্বে ধরি’
দেখি দূরে ‘নীল- কণ্ঠ’-শিলায় আলিপনা দেয় নাগে,
জপমালা সম স্থূল বসুধারা গলিত অঙ্গ-রাগে
হোথায় তাপসী, উপবাস-কৃশা, উমারে প্রদানি’ বর,
রাখী-বন্ধনে গৃহী হইলেন ভোলা শ্মশানেশ্বর।
দেবতারা এল’ বরযাত্র সে, প্রথম-নৃত্য-সাথে
চন্দ্র-ভানুর আলোর নিশান উড়ে নন্দীর হাতে।
শুভ লগ্নের সুর-মূর্চ্ছনা শ্রবণে পশিছে আজি,
লীলাসুন্দর গৌরীর করে কঙ্কণ ওঠে বাজি’।
হেথা আদর্শ সত্যের পথ, এই একপদী দিয়া
চলিয়া গিয়াছে পাণ্ডু-সুতেরা বনবাস-ব্রত নিয়া।
অঙ্কিত তাদের চরণ-চিহ্ন দিগ্-ভ্রম করে দূর,
জীবনে যাহারা রূপ দেখিয়াছে প্রেম-ঘন বন্ধুর।
জানিত কি তারা আবার আসিতে হবে এ গহন পথে,
মহা-প্রস্থান— শঙ্খ বাজিবে মেঘেরই আড়াল হ’তে?

মন্দাকিনীর   কূলে কূলে তারা   চ'লে যাবে সেই দেশে
ইচ্ছা-মরণ   ইচ্ছা-জীবন   যুক্ত যেখানে এসে।
মর্ত্ত্যবাসীর   পরিকল্পনা   পায় না সে সন্ধান,
কোন্‌খানে শেষ   হ'য়েছে অশেষ,   অসীম অপরিমাণ।

এই হৃষীকেশ,   মহামুনি ব্যাস   কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
করিলেন হেথা   বেদের বিভাগ,   এই সেই তপোবন।
রাবণ-বধের   পাপ ক্ষয় করি'   রাম লক্ষ্মণ হেথা
শুধালেন পুনঃ— যে কথা যমেরে   জিজ্ঞাসে 'নচিকেতা'।
সংহার যাঁর   ক্রোধের উপমা   সেই দেবতারে ডেকে
জ্বালেন এপারে   আরতির আলো   পারের প্রদীপ থেকে।
ভিখারীর ঝুলি,   তা'ও ত্যাগ করি'   চল্‌রে বাউল মন,
অন্তর্‌-গূঢ়   বেদনা-জুড়ানো   তারণ-মন্ত্র শোন্‌।
গলে নাম-রস   বহির্ভুবনে   নারদ ঋষির মুখে,
পাষাণের লোম   হর্ষণ করে,   বিশ্বাস ভরে বুকে।
নাহি আরম্ভ,   শেষ নাহি যার,   তাহারই উদ্বোধনী,—
অভয়ের মাঝে   মিলাইয়া যায়   ভয়ের প্রতিধ্বনি।
শুনি ভ্রমরের   গুঞ্জন সনে   স্পন্দিত সাম-গান,
গঙ্গার জলে   ঝঙ্কারি' ওঠে   ব্রহ্মেরি সংজ্ঞান।

ভরিয়াছে ব্যোম্‌ হর হর বম্‌,   জয় তারা-শঙ্কর,
জয় সীতারাম,   জয় রাধাশ্যাম,   অভিন্ন হরিহর।
থামে বরষের   রথের চক্র,   অম্বুমন্ত্রণ শুনি'
পলকে পলকে   প্রকাশে আকাশ,   জ্বলে বিদ্যুৎ-ধুনী।
আর বেলা নাই,   চল্‌ একেলাই,   মিলিবে রাতের ডেরা,
গণনারায়ণ   সেবার সদনে   ফেরে নাক' পথিকেরা।
ডাক দ্যান্‌ তোরে   চিত-নন্দন,   কেন মিছে সংশয়?
মিলিবে দোসর,   সেই দেবে তোর   আপনার পরিচয়।
খণ্ডিত মাঝে   হেরিবি বিরাট,   পাবি অখণ্ড সুখ,
এক বিনা তুই   দেখ্‌বি না দুই,   মিটে যাবে শেষ ভুখ্‌।
নমঃ সহস্র-   শীর্ষ পুরুষ,   সর্ব্ব-বিভূতিমান্‌,
ব্রহ্মা,বিষ্ণু,   রুদ্রের ধ্যেয়,   অচিন্ত্য ভগবান্‌।
চির-পুরাতন   নিত্য-নূতন,   তুমি বর্দ্ধন-ক্ষয়,
চিরসুন্দর,   ক্ষণসুন্দর,   নমি তোমা লীলাময়।
জীবলোকে তব   অংশ-প্রকাশ,   তুমি আদি নারায়ণ,
দাও ছিঁড়ে দাও মায়ামৃত্যুর   মহাপাশ-বন্ধন।
সম্মুখে তুমি,   পশ্চাতে তুমি,   হেরি দক্ষিণে বামে,
তুমিই সৌম্য,   ভৈরব তুমি,   অর্চ্চিত নানা নামে।
দিব্য অবাঙ্‌-   মনসগোচর,   ত্বংহি প্রাণের গতি,
নমো যুগ-ধারী   বিশ্বম্ভর,   ব্রহ্মাণ্ডেরি পতি।
নূতন করিয়া   গড়িতে নিয়তি   জ্বালিনু 'বিরজা' হোম,
নমো গোবিন্দ,   পূর্ণানন্দ,   ওম্‌ শান্তিঃ ওম্‌।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণের জয়যাত্রা



কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এম্-এল্-সি

মানব মাত্রেরই জ্ঞানোন্মেষের পর হইতে দেশকাল পাত্রানুযায়ী দশ বার বৎসর কাল জ্ঞান আহরণের প্রকৃষ্ট সময়। জ্ঞান-লিপ্সা শৈশব-কালেই উদ্রিক্ত হয়। শিশু চক্ষের সম্মুখে যাহা দেখে তাহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তা বলিয়া সকল শিশুর ঔৎসুক্য সমান নহে। বংশধারা, মনোবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যের উপর তাহা কতক পরিমাণে নির্ভর করে। তবে সাধারণতঃ বাহ্য প্রকৃতির সহিত এবং জীব জগতের সহিত পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিশু মাত্রেরই হৃদয়ে জাগরুক হয়। শিশুহৃদয়োদগত প্রশ্নের তাই সীমা নাই। সকল অভিভাবক বা অভিভাবিকা এক প্রকৃতির লোক নহেন — জ্ঞানেরও কম বেশী আছে। কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে উত্যক্ত হইয়া শিশুকে তাড়না করেন—কেহ বা জ্ঞানের অভাবে শিশুর প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না, বা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হন, তাহাতে ক্রমে প্রশ্নের ধারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, পরিশেষে তাহার গতি নিরুদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে। অভিভাবক বা অভিভাবিকা শিশু চরিত্রাভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। কৌতূহলী শিশুর মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে সদা উন্মুখ থাকিতে হইবে—তাহার প্রশ্নের সদুত্তর দানে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। হয় তো তাহাতে প্রশ্নের ধারা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে।



ব্রুক্লিন্ পাব্লিক লাইব্রেরী—ব্রাউন্‌স্‌ভিল্ শিশু-শাখা

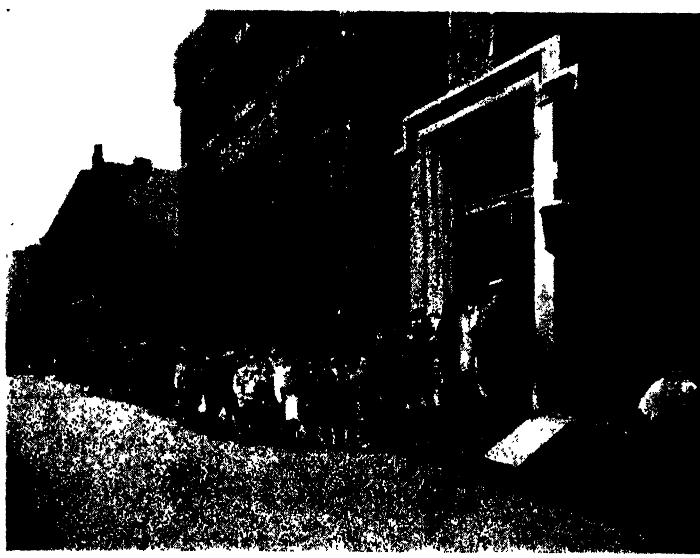
বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের আশুতোষ-স্মৃতি সভায় পঠিত। সভাপতি ছিলেন 'বিচিত্রা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিশুর তরুণ হৃদয় অতি সুকোমল, উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই সময় তাহাকে ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া



ব্রাউন্‌স্‌ভিল্‌ শিশু-শাখা—বালকদের পাঠাগার

লইতে হইবে। মৃত্তিকা যখন নরম থাকে তখন তাহার দ্বারা যথেচ্ছামত আকৃতি গঠন করা যাইতে পারে—মৃত্তিকা কঠিন হইলে নিরুপায়। তখন গঠনের কাল অতীত হইয়া যায়। শিশু সম্বন্ধে সেই কথাই প্রযুজ্য। শিশু হৃদয় নরম থাকিতে থাকিতে তাহাকে ইচ্ছামত গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতির ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ সবই শিশুর উপর নির্ভর করিতেছে। জাতিকে উন্নত করিতে হইলে প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে,—আমাদের দেশ কিন্তু এবিষয়ে একান্ত নিশ্চেষ্ট। নিশ্চেষ্টতা পঙ্গুতার পূর্ব্ব সূচী। পঙ্গু হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে কি? এই পঙ্গুতা ও জড়তায় আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা আজ মরণোন্মুখ জাতি। যদি বাঁচিতে হয় বাঁচার মত করিয়া বাঁচিতে হইবে—নতুবা না বাঁচাই ভাল—জগৎ হইতে বিলুপ্ত হওয়াই শ্রেয়। যদি মেরুদণ্ড ঝুঁকিয়া পড়ে, সে বাঁচায় লাভ কি? যদি স্বামী বিবেকানন্দর মত বুক ফুলাইয়া খাড়া হইয়া শির উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পায়—তবেই জগতের সম্মান অর্জ্জন করিতে পারিবে। তা বলিয়া আমি কেবল দৈহিক বল সঞ্চয়ের কথা বলিতেছি না—তাহা তো চাই-ই। তাছাড়া মানব মাত্রেই মানসিক বলে বলীয়ান হইতে হইবে। মানসিক বল সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান হইতেছে জ্ঞান বা বিদ্যার্জ্জন। পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার সুবর্ণ যুগ। জীবনের ভবিষ্যৎ এই যুগের শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে। এই শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা সকল সভ্য দেশেই চলিতেছে। ঐ সংক্রান্ত



ব্রুক্‌লিন্‌ পাব্‌লিক্‌ লাইব্রেরী—ব্রাউন্‌স্‌ভিল্‌ শিশু-শাখা

এপ্রিলমাসে একটি শনিবারের প্রাতঃকাল, লাইব্রেরী খুলিবার ঠিক পূর্ব্বে

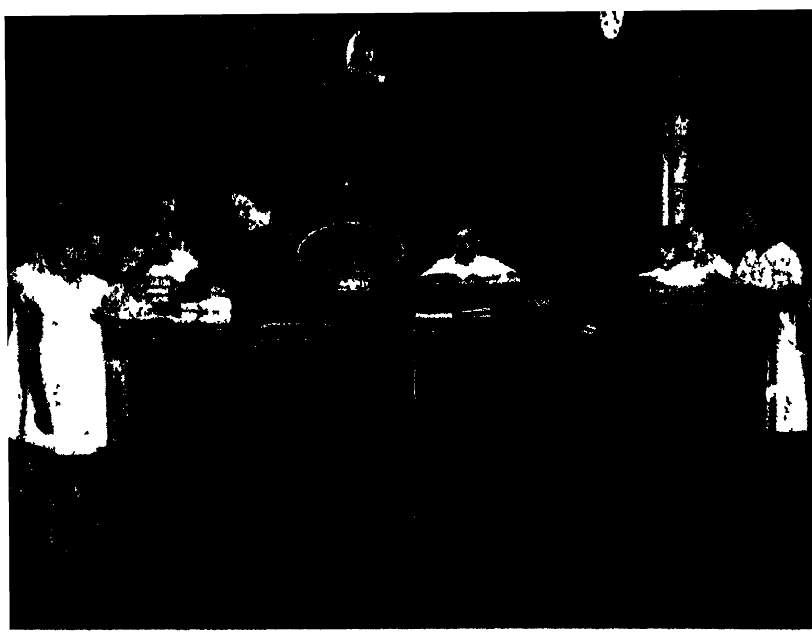


নম্মামেলড্রম্ শিশুকক্ষ—হাড্‌ষ্টন্ পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী
মিস হ্যারিয়েট্ ডিক্‌সন শিশুদের লাইব্রেরীয়ান, নানা সম্প্রদায় হইতে সমাগত বালকবালিকাদের বই পড়িয়া শুনাইতেছেন।

কয়েকটি কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে লাইব্রেরী-এসোসিয়ানে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

'The creation in the child of intellectual interests which is furthered by a love of books, is an urgent national need; while it is the business of the school to foster the desire to know, it is the business of the library to give adequate opportunity for the satisfaction of this desire; library work with children ought to be the basis of all other library work; reading rooms should be provided in all public libraries, where children may read books in attractive surroundings with the sympathetic and tactful help of trained children's librarians; but such provision will be largely futile except under the conditions which experience has shown to be essential to success.'



নর্ম্মা মেলড্রম শিশু কক্ষে দৈনন্দিন দৃশ্য

অর্থাৎ "শিশুর মধ্যে জ্ঞানোন্নতির স্পৃহা উদ্রিক্ত করিতে হইলে তাহাদের পুস্তক-প্রীতি বাড়াইতে হইবে—এইটাই হইতেছে একটা অত্যাবশ্যক জাতীয় অভাব। বিদ্যালয়ের

কাজ হইতেছে জ্ঞান আহরণের ইচ্ছা বর্দ্ধিত করা, আর লাইব্রেরীর কাজ হইতেছে এই ইচ্ছা পূরণের যথাযথ সুযোগ দেওয়া ; শিশু সংক্রান্ত লাইব্রেরীর কাজ লাইব্রেরীর অন্যান্য কার্য্যের ভিত্তি হওয়া উচিত ; প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক পাঠগৃহের ব্যবস্থা করা আবশ্যক ; চিত্তাকর্ষক আব্‌হাওয়ার মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন সুদক্ষ এবং শিশুদের উপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ানের তত্ত্বাবধানে ছেলে মেয়েরা যাহাতে বই পড়িতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; কিন্তু যাঁহারা কার্য্য পরিচালনা করিবেন কি প্রণালীতে কার্য্য করিলে সাফল্যলাভ হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকা চাই নতুবা সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।" এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিলাতে অধিকাংশ লাইব্রেরীর সহিত পৃথক শিশু বিভাগ খোলা হইয়াছে। শিশু বিভাগের জন্য তদুপযোগী পৃথক লাইব্রেরীয়ানের ব্যবস্থা আছে।

লর্ড ব্রাইস্ (Viscount Bryce) বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "সচরাচর ১৩।১৪ বৎসরের ছেলে নিজে কি পড়িবে সেই পুস্তক বাছাই করিতে আরম্ভ করে কিন্তু তাহাদের ঠিক পথে চালিত করিবার সুযোগ্য লোকের অভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। শিশু বা যুবক একা লাইব্রেরীতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। তাহাদের কি বই পড়া উচিত তাহা জানিবে কি করিয়া ? কি ভাবে পড়িতে হইবে তাহাই বা জানিবে কি করিয়া ? আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি করিয়া পড়িতে হয় তাহা শিখাইবার জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক না হউক অন্য যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করা উচিত। ছাত্র মাত্রেই তাহার ইচ্ছামত বই আবিষ্কার করিতে পারে—কিন্তু তাহার পক্ষে শ্রেয় কি তাহা স্থির করা বহু সময়-সাপেক্ষ।"



হাউয়াই লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষরা সবাই বিশ্ব-প্রেমিক। এই ছবিটিতে আমেরিকান্, পোর্টোরিকান্, ইংরাজ, জাপানী, স্পেনিস, হাওয়াইন, চীনা এবং কোরিয়ান বালকবালিকাদের দেখা যাইতেছে।

আমাদের দেশের ছেলেদের লাইব্রেরীর ব্যবস্থা কোনও কালে ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঠাকুরমার কাছে মুখে মুখে গল্পচ্ছলে ছেলেরা শিক্ষা পাইত কিন্তু সে রকম ঠাকুরমা আজ কোথায় ? কাজেই সে বিষয়ে ভাবিবার কারণ ঘটে নাই। বিলাতে ১৯০৫ হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত জল্পনা কল্পনাতেই কাটিয়া যায়—তাহার পর কাজ আরম্ভ হয়। বিগত পনর বৎসরের মধ্যে কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। হেণ্ডন (Hendon) লাইব্রেরীর মত কয়েকটি লাইব্রেরীর ছেলে মেয়েদের বিভাগের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

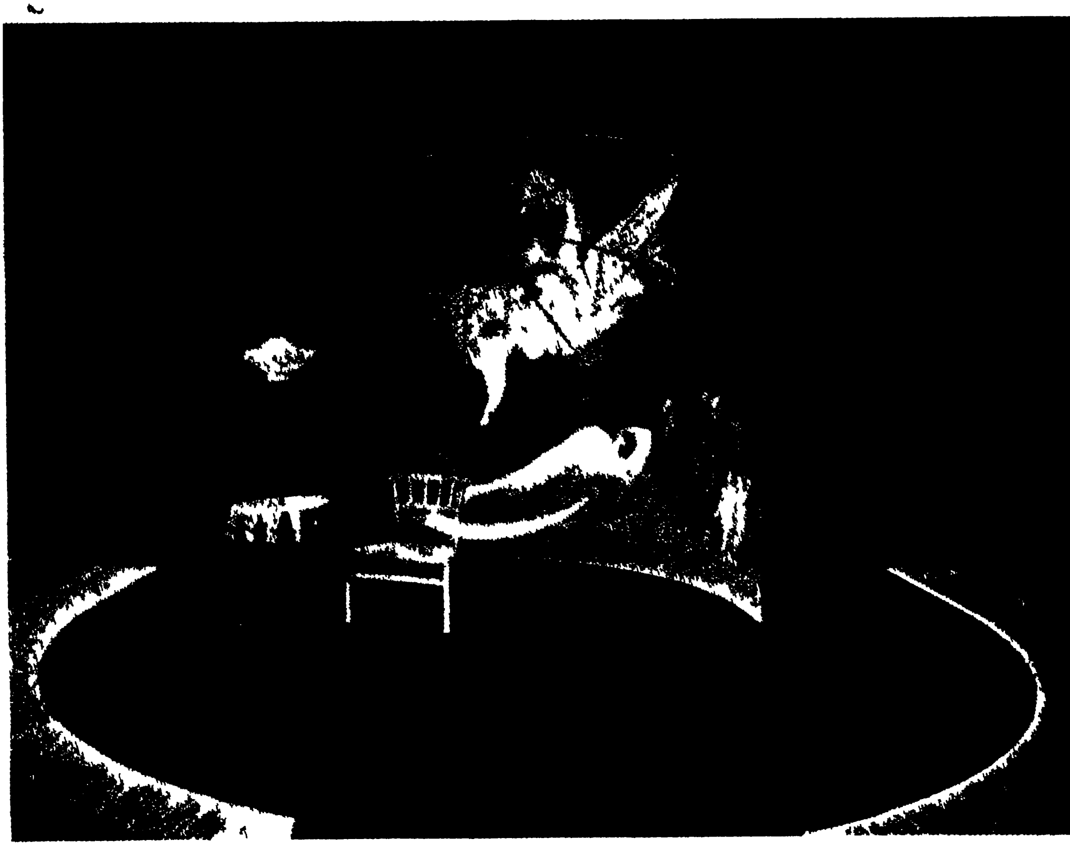
জার্ম্মানীতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ছেলেদের লাইব্রেরী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন হয় ছোটখাট জনহিতৈষী সভা, নয় দানশীল নরনারী। অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও আন্তরিক উৎসাহের উদ্ভব হওয়ায় অনেকে অবস্থাতিরিক্ত দান করিয়া ছেলেদের লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করেন। এই সব লাইব্রেরীর জাঁকজমক কিছুমাত্র ছিলনা, সব ব্যবস্থাই ছিল মোটামুটি—অতি সাধারণ রকমের। বার্লিন সহরে একটি বড় হলে ছেলেদের লাইব্রেরী স্থাপিত ছিল। একটি কেরোসিনের আলো হলটি কোনও রকমে আলোকিত করিত। একটি বড় টেবিলের উপর রাশীকৃত সস্তা মূল্যের পুস্তিকা থাকিত। এই ব্যবস্থাতেও পাঠকের অভাব হইত না, ছেলেরা ঘর ভর্ত্তি করিয়া থাকিত। টেবিলের কিনারায় যেখানে একটু আধটু খোলা স্থান মিলিয়াছে সেই-সেই-খানে মেজের উপর কাঠের বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে বসিয়া ছেলেরা বই পড়িত। ছেলেরাই এই লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধান করিত ও তাহারাই পুস্তক বিলি করিত। সব সময় সুশৃঙ্খলে কাজ চলিত না—তাহাদের মধ্যে কলহ ও হাতাহাতিও হইত। পড়াশুনা করিবার জন্য যে শান্ত আব্‌হাওয়ার আবশ্যক তাহারও ব্যাঘাত ঘটিত। তবুও ছেলেরা সেখানে থাকিতে ভালবাসিত। তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আসিত অস্বাস্থ্যকর এবং জনবহুল গৃহ হইতে। অধিকাংশ স্থলেই একটি ক্ষুদ্র ঘরে সমগ্র পরিবার বাস করিত। কাজেই ছেলেপিলেরা লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ কাটাইয়া যাইতে পছন্দ করিত। সেখানে তাহারা পুস্তকের সদ্ব্যবহার করিতে অবহেলা করিত না। ছেলেদের লাইব্রেরীর প্রথম অবস্থায় প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল যায় নাই। যাহারা এই সব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিত না তাহাদের দৃষ্টি ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ক্রমে অনুকূল জনমত সৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে নাগরিক সভা (Municipality) ছেলেদের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা জন্য অর্থানুকূল্য করিতে আরম্ভ করেন। এখন জার্ম্মানীতে ছেলেদের জন্য তিনরকম শাসনাধীনে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকটা কিণ্ডারগার্টেনের মত ছেলেদের আপিসের সহিত সংযুক্ত লাইব্রেরী, স্কুলের শিক্ষকদের পরিচালনায় স্কুল সংস্পৃষ্ট লাইব্রেরী এগুলি স্কুল পাঠ্যের অতিরিক্ত জ্ঞানলাভের জন্য স্থাপিত। তবে সব চেয়ে ভাল হইতেছে—মিউনিসিপ্যাল পাবলিক্ লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত ছেলেদের লাইব্রেরী। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের শিশু লাইব্রেরীর আদর্শে এই লাইব্রেরীগুলি পরিচালিত হইয়া থাকে।



হাউয়াই লাইব্রেরী—শিশু কক্ষ অভিমুখে পুস্তক সঙ্কালন বিভাগ

সে দেশে ছেলেমেয়েদের লাইব্রেরীতে পুস্তকপাঠের কিরূপ আগ্রহ দেখুন। বর্ষাকাল অপরাহ্ণ—সকালে বৃষ্টি নামিয়াছে—বৈকাল পর্য্যন্ত প্রায় একই ভাবে চলিয়াছে। ছেলেরা সকাল হইতে স্কুলে পাঠত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নে আহারের পর ছুটী পাইয়াছে। ছেলেদের লাইব্রেরী খুলিয়া থাকে অপরাহ্ণ দুইটায়। এইরূপ বাদ্‌লার দিনে লাইব্রেরীতে অতিশয়

ভীড় হইয়া থাকে। নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য হইলেও ছেলে মেয়েরা লাইব্রেরী খুলিবার প্রতীক্ষায় অনেক পূর্ব্ব হইতে লাইব্রেরীর বাহিরে জড় হইতে থাকে। লাইব্রেরীয়ান কখন আসিয়া পৌছেন তাহার অপেক্ষায় তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে। দুইটা বাজিবামাত্র লাইব্রেরীয়ান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন হাত মুখ ধুইবার পালা পড়িল। নোংরা হাতে কেহ



ষ্টকহল্‌ম সরকারী পাঠাগার—শিশুদের গল্প কক্ষ

লাইব্রেরীতে প্রবেশাধিকার পায় না। এক এক দলে পাঁচজন করিয়া পাঠগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। এইরূপে পাঠগৃহের পঁচাত্তরটি আসন পূর্ণ হইল। প্রত্যেকেই ইচ্ছামত পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিয়া গেল। বাকী ছেলে মেয়েরা আসন খালি হওয়ার আশায় হলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই দুর্য্যোগের দিনে দুইশত ছেলেমেয়ে লাইব্রেরীতে উপস্থিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ৭।৮ বৎসরের ছেলে মেয়েরা দীর্ঘকাল থাকে না—তাহারা নূতন নূতন ছবির বই পড়িতে আসে—পড়া শেষ হইলে আসন ত্যাগ করিয়া যায়। ১৩।১৪ বৎসরের ছেলে মেয়েরা দুই ঘণ্টাকাল লাইব্রেরীর পুস্তক পাঠে কাটাইয়া দেয়। দুই ঘণ্টার বেশী প্রায় তাহারা থাকে না। আবার পর দিন যথা সময়ে আসিয়া হাজির হয়। রবিবার ভিন্ন প্রত্যহ বৈকালে লাইব্রেরী খোলা থাকে।

জার্ম্মান ছেলে মেয়েরা কোন্ বই বেশী পড়ে? অন্য সব দেশের ছেলে মেয়েরা যে সব বই পড়িতে চায় এরাও সেই সব বই পড়িতে চায়। বড় ছেলেরা দুঃসাহসিক কার্য্য সংক্রান্ত বিবরণ, ছোট মেয়েরা ছেলেদের গল্প পছন্দ করে। তাহারা

সকলে পরীর গল্প এবং জনশ্রুতি মূলক কাহিনী আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকে। জগতের সর্ব্বত্র শিশু সাহিত্যের পুস্তক সংগ্রহ সাধারণতঃ একই ধরণের হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পুস্তকেরও শিশু পাঠক আছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়েও অনেকের আগ্রহ দেখা যায়, তাহারা সেই সেই বিষয়ের সব বই পড়িয়া ফেলে। অনেকে রেডিও (radio) শুনিয়া বা সিনেমা (cinema) দেখিয়া তৎসংক্রান্ত পুস্তক চাহিয়া থাকে। মরুপ্রান্তর, ভূকম্পন, আকাশের নক্ষত্র এই সব বিষয়ে জ্ঞান লাভের আগ্রহও অনেকের মধ্যে



ষ্টকহলম্ সরকারী পাঠাগার—শিশু-পাঠাগার

দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রম শিল্প, রেডিও ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণ সংক্রান্ত পুস্তকের চাহিদা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে।

শীতকালে যখন দিনগুলি ছোট হয় ও শীঘ্র শীঘ্র অন্ধকার হইয়া আসে তখন জার্ম্মান শিশু লাইব্রেরীগুলি অনেক সময় রূপান্তরিত করা হয়। পাঠগৃহ থিয়েটারে পরিণত হয়। ছেলে মেয়েরা সেখানে অভিনয় করিয়া থাকে।

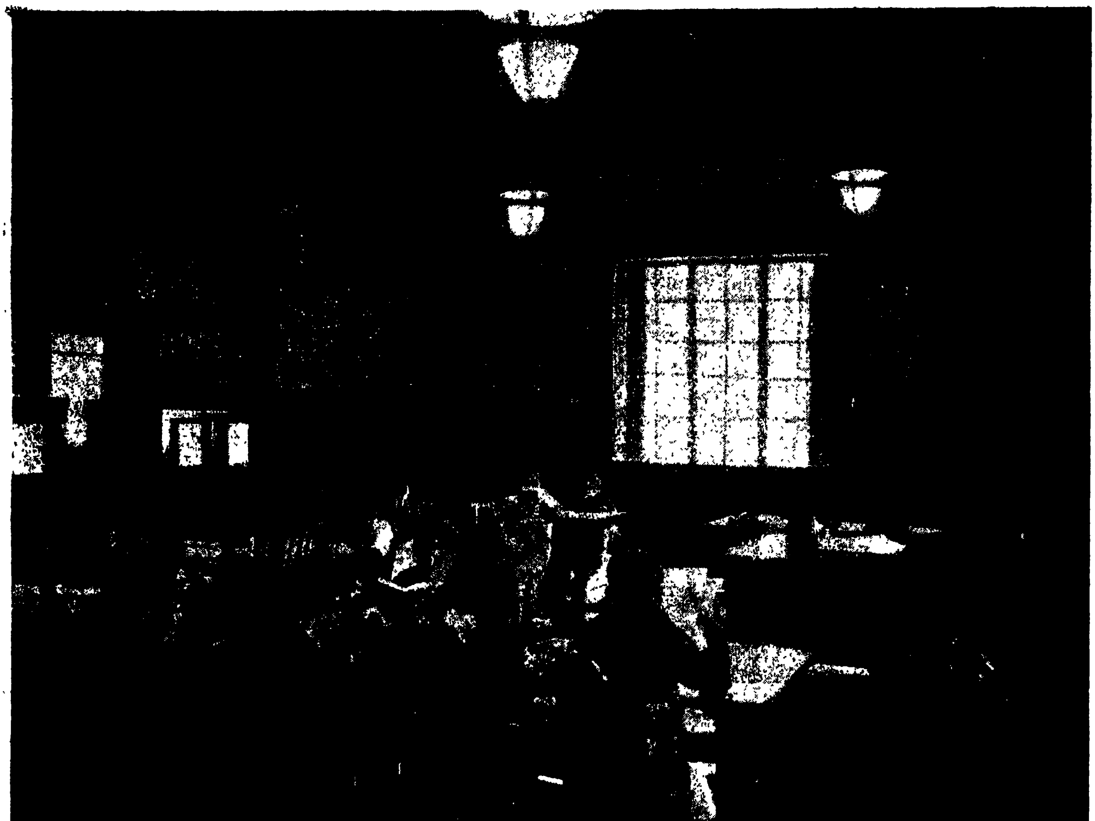
আমেরিকা যুক্তরাজ্যে শিশু লাইব্রেরীর অভিনবত্ব জগতে অতুলনীয়। সেখানকার দু'একটি শিশু লাইব্রেরীর পরিচয় দিতেছি। ব্রাউন্সভিল (Brownsville) লাইব্রেরীর ছেলে-মেয়েদের বিভাগে দেখিবেন বৃহত্তর নিউইয়র্কের শ্রমিক সন্তানেরা সেই বড় হলে সমবেত হইয়া পুস্তক নির্ব্বাচন কার্য্যে রত রহিয়াছে, কেহ পুস্তক ফেরৎ দিতেছে, কেহ বা পুস্তক পাঠে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে, আবার প্রবেশ লাভের জন্য কত ছাত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। এত লোক চলাচল এবং গোলমালের মধ্যেও অনেক চিন্তাশীল ছাত্র রহিয়াছে, তাহাদের কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—আপন চিন্তায় তাহারা বিভোর, জগতের কোলাহল তাহাদের কানে পৌঁছাইতেছে না। এ দেশের তরুণ লাইব্রেরীর সহিত জার্ম্মান দেশের তরুণ লাইব্রেরীর তুলনা হয় না। আদর্শেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে জার্ম্মানীর বিদ্যানুশীলন বা culture আবদ্ধ আর আমেরিকার আদর্শ সর্ব্বসাধারণ বা massএর উৎকর্ষ সাধন।

যুক্তরাজ্যে ক্লেভল্যাণ্ডের (Cleveland) তরুণদের লাইব্রেরীর অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। একশত সাঁইত্রিশ জন বিমানবিহারী প্যাসিফিক্ (Pacific) হইতে আটলাণ্টিক (Atlantic) মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ এরোপ্লেনে (Aeroplane) ঘুরিয়াছেন—লাইব্রেরী রিপোর্টে এই সংবাদ পড়িয়া তরুণদের শিক্ষা সংক্রান্ত বড় কর্ত্তা (Director of work with Children) বিচলিত হইয়া উঠেন। লাইব্রেরীর রিপোর্টে এ সংবাদের সার্থকতা কি? তার পরের অংশ পাঠকালে তিনি জানিতে পারেন যে বর্ত্তমান বর্ষে যে সব বালকবালিকা গ্রীষ্ম ঋতুতে লাইব্রেরীর পাঠক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেককে পাঠকের লাইসেন্সের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের একখানি মানচিত্র দেওয়া হয়—তাহাতে একটি ছোট উড়ো জাহাজ চড়ান ছিল যখন এক এক স্থান সম্বন্ধে এক একখানি বই পড়া শেষ হয়, তখনই উড়ো জাহাজখানি চিহ্নিত একস্থান হইতে অপর স্থানে সরাইয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে সকলে গন্তব্য স্থানে গিয়া

পৌঁছায়। কেহ পর্ব্বতে পড়িয়া নিরুদ্দেশ হয় নাই—এঞ্জিনের কল বিগড়াইয়া কাহাকেও অবতরণে বাধ্য হইতে হয় নাই। এখন সেই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবের নাম "পুস্তক সপ্তাহ"। লাইব্রেরী, পুস্তকের দোকান এবং স্কুলে এই উৎসব ব্যাপক ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। ক্লেভল্যাণ্ড সাধারণ পাঠাগারের তরুণ বিভাগ "পুস্তকের হাট" নাম দিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, ইতালীয়, সুইডিশ এবং জগতের অন্যান্য দেশের তরুণরা যে সব বই পড়িতে ভালবাসে সেই সব বই এবং তাহার ইংরেজী অনুবাদ, বিজয়শ্রী ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া আমেরিকানরা যে সব বই প্রকাশ করিয়াছে, দেশভ্রমণ বৃত্তান্ত, সকল দেশের বীর কাহিনী, ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক ছবির বই—এই সব সেখানে প্রদর্শিত হয়। ভারত সম্বন্ধে সেখানে তরুণদের অতি প্রিয় বই হইতেছে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত—"বাঙ্গালী বালক হরি" ('Hari, the Jungle lad') "করি বা হাতি" (Kari, the Elephant) এবং কিপলিংএর কিম্ (Kipling's Kim)।

আর একটি লাইব্রেরীর উল্লেখ করিয়া এইখানে আমেরিকার কথা শেষ করিব। সেটির নাম হইতেছে—Norma Meldrum Children's Room Houston Library। এই লাইব্রেরীটির শিশু বিভাগটি Mr. এবং Mrs. Norman S. Meldrum এর বদান্যতায় তৈয়ারি। তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যাকে হারাইয়া স্থানীয় সকল মেয়েকে নিজের করিয়া লইয়াছেন। শোক-সন্তপ্ত পিতা মাতার সান্ত্বনার কি অপূর্ব্ব পন্থা। ইহা বস্তুতঃই শিক্ষণীয়।



কেলিফোর্ণিয়া—লসএঞ্জেলস্ সাধারণ পাঠাগারে শিশুদের জন্য আইভেনহো রুম্

প্রশান্ত মহাসাগরের নীল জলের উপর হাওয়াই দ্বীপ—(Hawaiian Islands) সংস্থিত। হাওয়াই দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা বড় অতিথিবৎসল। তাহারা কখনও অতিথিকে বিমুখ করে না। নানাজাতির সংস্পর্শে আসিয়াও তাহারা আতিথেয়তা পরিত্যাগ করে নাই। এখন অন্যূন দ্বাদশটি জাতি এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী—সকলের ভাষা, দ্বীপপুঞ্জ আটটি বড় এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত। ভাষার বিচিত্রতা, আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা, পথঘাটের স্বাভাবিক অসুবিধা প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এখানকার লাইব্রেরীর ব্যবস্থা অনেক সুসভ্য দেশকেও লজ্জা দিয়া থাকে। আমাদের দেশ যে এ বিষয়ে কত পিছাইয়া আছে তাহা ভাবিতে গেলে বস্তুতঃই মস্তক অবনত



লস্‌এঞ্জেলস্‌ পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী—ভ্যার্মণ্ট্‌ স্কোয়ার শাখা

পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার বিভিন্ন। আমেরিকান, স্পেনিয়, পর্ত্তুগীজ, রাশিয়ান, জার্ম্মান, ইংরেজ, জাপানী, চীনা, ফিলিপিনো এইরূপ নানাজাতির সমাবেশে দ্বীপটি অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে। তাই এই দ্বীপকে 'melting pot of Nations' অর্থাৎ সকল জাতির গলিত হইয়া মিলিত হইবার পাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই করিতে হয়। হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লাইব্রেরী সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছেন। লাইব্রেরীয়ানগণ লোকের বাড়ী গিয়া পাঠক সংখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের চাহিদা বাড়াইয়া থাকেন। দ্বীপগুলির অধিবাসী সংখ্যা আড়াই লক্ষ; তাহাদের পুস্তকের চাহিদা সাত লক্ষ। একটি ক্ষুদ্রতম দ্বীপে কেবল্ ষ্টেশন আছে তাহার অধিবাসী সংখ্যা মোট

পনর জন। সেখানেও তিন মাস অন্তর পরবর্ত্তী তিন মাসের পাঠোপযোগী নূতন নূতন পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।



লস্‌ এঞ্জেলস্‌, সাধারণ পাঠাগার—শিশু-কক্ষ হলি উড্‌ শাখা

হাওয়াই দ্বীপে তরুণদের লাইব্রেরী আমেরিকার আদর্শে পরিচালিত। সেখানকার একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের তরুণদের লাইব্রেরীর একটু বিস্তৃত পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। দ্বীপটির নাম কাবাই (Kavai)। হনলুলু হইতে সদা উত্তাল তরঙ্গান্বিত সমুদ্রে একশত মাইল ধাইলে কাবাই পৌছান যায়। দ্বীপটি পাঁচ শত বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার অপর নাম হইতেছে উদ্যান-দ্বীপ। সমগ্র দ্বীপটি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত,—যেন সবুজ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। তাহার মাঝে মাঝে পত্র ও পুষ্পের প্রাচুর্য্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। ঢালু শৈলমালার গাত্রে ফল-ভারানত আতা বৃক্ষ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধান্য ক্ষেত্র, উপত্যকায় সারি সারি নারিকেল বৃক্ষ ও অধিত্যকায় কদলী উদ্যান দ্বীপটিকে ছবির মত করিয়া রাখিয়াছে। এই দৃশ্যের প্রতিকৃতি সমুদ্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। উপরের নীলাকাশ আর এই প্রকৃতিদেবীর নন্দন কানন সমুদ্রবক্ষে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত আছে আধুনিক সাধারণ পাঠাগার। এই পাঠাগারটি যে স্থানে আছে তাহার নাম লিহু (Lihue)। এটি কেবল স্থানীয় অভাব পূরণ করে না, ১৭টী স্কুলে এবং হানালে (Hanalei) হইতে ওয়ামিয়া ক্যানিয়ন (Waimea canyon) পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আটটি ডিপজিট ষ্টেশনে যত পুস্তকের আবশ্যক হয় সব এই লাইব্রেরী হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে তরুণদের



লস্‌ এঞ্জেলস্‌, সাধারণ পাঠাগার লিঙ্কলন্‌ হাইড্‌স্‌, শাখা বাগানের মধ্যে গল্প বলা

লাইব্রেরীর কার্য্যে অভিজ্ঞ লাইব্রেরীয়ান ছিল না। ১৯২৬ সালে ১লা জুলাই হইতে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। নব

নিয়োজিত লাইব্রেরীয়ান মিঃ এস্ হফম্যানকে যাইতে হইল ইক্ষুক্ষেত্রের মাঝখানে এই লাইব্রেরীতে। সহরের কোনও চিহ্ন এখানে নাই—আছে কেবল একটি পাকা রাস্তা আর এই সুন্দর লাইব্রেরী। এলবার্ট স্পেন্সর উইল ককসের (Albert Spencer Wilcox) স্মৃতি সংরক্ষণ জন্য এই লাইব্রেরীটি স্থাপিত। তিনি প্রথমে এইখানে আসিয়া বসবাস এবং ইক্ষু চাষ আরম্ভ করেন। যুক্তরাজ্যের কার্ণেগী ট্রাষ্টের শাখা লাইব্রেরীর আদর্শে এই বাড়ীটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সুন্দর বাড়ীতে যে পুস্তক-সংগ্রহ আছে তাহা নিতান্ত অল্প নহে।



লস্ এঞ্জেল্‌স্ সাধারণ পাঠাগার—স্কুলের পর একটি পুস্তক ভাণ্ডার কক্ষে

তরুণদের পাঠ গৃহটি অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক। লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ তরুণদের নূতন লাইব্রেরীয়ানকে আজ কাল আমেরিকায় যে ভাবে ছেলে-মেয়েদের লাইব্রেরী সাজান হয় সেই আদর্শে সাজাইবার ভার দেন। তরুণদের চিত্তবিনোদনের উপযোগী টেবিল সাজান হইল বড় বড় অক্ষরে চিত্রিত পোষ্টার দেওয়ালে আটকান হইল। র‍্যাকে প্রদর্শনীর মত পুস্তক সজ্জিত করা হইল। দীর্ঘ অবকাশের পর ১লা সেপ্টেম্বর স্কুল খুলিবার পূর্ব্বে সাজ সরঞ্জাম শেষ হইল। স্কুল খোলার পর তরুণদের লাইব্রেরীতে ছেলে মেয়েদের আমদানী আরম্ভ হইল। প্রথমে অধিক সংখ্যা আসিল স্যাণ্ডাল পায়ে রং বেরঙের ফুল ও পাতা আঁকা কিমনো পরিচ্ছদ পরিহিত জাপানী ছেলে মেয়েরা। তারপর আসিল আদিম নিবাসী কৃষ্ণবর্ণ হাউইয়ের বালক বালিকারা। তাদের পরীর গল্প শুনিবার আগ্রহ সব চেয়ে বেশী। তারপর ফিলিপিনোরা আসিল। তাহাদের বার



সেণ্ট্ লুই সাধারণ পাঠাগার—একটি শাখায় নিগ্রো বালক বালিকারা গল্প-ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে

বার বুঝাইয়া দিতে হয়—হাত ধুইয়া পুঁছিয়া বই স্পর্শ করিতে হয়, বই ধুইতে হয় না। সব চেয়ে বৈচিত্র্য আছে মিশ্র জাতিতে। হাওয়াই—চীনা, হাওয়াই ককেশীয় এবং অন্যান্য মিশ্র জাতি যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া বলা হয়েছে 'the true melting pot of the world' জগতের সব জাতির মিশ্রণের স্থান। এই নূতন প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে গল্পের ক্লাস বসিতে লাগিল। অতি প্রাচীন যুগের কাহিনী, পরীদের গল্প শুনিবার জন্য, নানা জাতির ছেলে মেয়েরা সেখানে জড় হইতে আরম্ভ করিল। এখনও প্রতি শনিবারে তরুণ শ্রোতৃবর্গে সে স্থানটি পূর্ণ হইয়া যায়। মিশ্র ও আদিম জাতির শিশুদের বোধ শক্তি কম—ভাষাও সঙ্কীর্ণ,—অনেকের উচুদরের গল্প বুঝা সামর্থ্যে কুলায় না।



ডেট্রয়েট্ পাবলিক্ লাইব্রেরী—শিশু-কক্ষ, মেপ্ দেখা হইতেছে

ধরণের তরুণদের লাইব্রেরী দেখিয়া শিক্ষক এবং অভিভাবিকাদের আনন্দের সীমা রহিল না,—তাঁহারা উৎসাহের সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কি করিয়া লাইব্রেরীর বইয়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়—কিরূপে সদ্গ্রন্থ বাছাই করিতে হয়—আশে পাশে যত স্কুল ছিল প্রতি সপ্তাহে সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ গল্পের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। একটি লাইব্রেরীয়ান আবার মধ্যে মধ্যে তাহাদের উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে লইয়া যান এবং গল্পচ্ছলে নানা বিষয়ে উপদেশ দেন।

এখানে যত স্কুল আছে সব হয় ইক্ষু ক্ষেত্রে বা আতা ক্ষেত্রের মাঝখানে অবস্থিত। প্রত্যেক স্কুলে ছেলেদের লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আছে। তবে ছেলে মেয়েরা উন্মুক্ত স্থানে বা গাছ তলায় বসিয়া পড়িতে ভালবাসে। ধান্যক্ষেত্রে চাষ

চলিতেছে, তাহার কিনারায় বসিয়া বা তালগাছের তলায় বসিয়া তাহারা পড়িতেছে। কেহ রাজা আর্থারের গল্প, কেহ বা রবিন হুডের লোমহর্ষণ কাহিনী—কেহ পামার কক্স্ ব্রাউনির জনপ্রিয় বই একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতেছে। গত বড় দিনের সময় হাওয়াই দ্বীপের ছেলে মেয়েরা বই দিয়া খৃষ্টমাস্ বৃক্ষ সাজাইয়া একটা বড় রকম উৎসব করিয়াছিল।

সুইডেন দেশে ষ্টক্‌হলম্ সহরের লাইব্রেরীতে ছেলেদের গল্প বলিবার জন্য একটি মনোরম গৃহ আছে। দেওয়াল গাত্রে আখ্যান বস্তু চিত্রাঙ্কিত আছে—কোথাও পরী, কোথাও দৈত্য আরও কত কি অঙ্কিত আছে। ছবির নীচেই কথক বসেন—তাঁহার সাম্‌নে বসে ছেলে মেয়েরা। তাহারা গল্প শুনে ছবির দিকে তাকায় - আর কল্পনা রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। ষ্টকহলম্ লাইব্রেরী সংলগ্ন অনেকগুলি পাঠচক্র আছে—তাহাতে অধিক বয়সের বালক বালিকারা কোনও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকে।



ইভান্‌ষ্টোন্‌ সাধারণ পাঠাগার—ইলিনয়েস্‌

আর্মেনিয়ার তরুণদের লাইব্রেরীর কর্ত্তা তরুণরা। বেরুটের (Beirut) নিকট য়্যান্টিয়াসের (Antiyas) লাইব্রেরীয়ানের বয়স ১৪ বৎসর। সেখানে আরবী ফরাসী ও কিছু কিছু ইংরেজী শিখিবার ব্যবস্থা আছে।

জেকো স্লোভাকিয়ার প্রাগ সহরের মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরীতে তরুণদের জন্য পৃথক পাঠাগার আছে তাহাতে ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে মেয়েদের এক সঙ্গে আশী জনের বসিবার আসন আছে। চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের পাঠকগণের জন্য পৃথক আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাদের জন্য আলাহিদা প্রবেশ দ্বার আছে।

হল্যাণ্ডে হেগ (Hague) সহরের সাধারণ পাঠাগারের মধ্য স্থলে এবং দুইটি শাখা লাইব্রেরীতে তরুণদের জন্য পৃথক পাঠগৃহ আছে। ইচ্ছা করিলে তাহারা বাড়ীতে বই লইয়া গিয়া পড়িতে পারে। গ্রীষ্মের কয়েক মাস আমষ্টার্ডাম্ এবং রটারডামে উদ্যান লাইব্রেরীতে তরুণদের জন্য তিনটি পৃথক বিভাগ আছে। উট্রেচ্‌টে তরুণদের জন্য চারিটি শাখা লাইব্রেরী আছে—তা ছাড়া অন্যান্য সহরে স্কুল লাইব্রেরীতে সকল ছেলেমেয়েদের পাঠের অধিকার আছে।

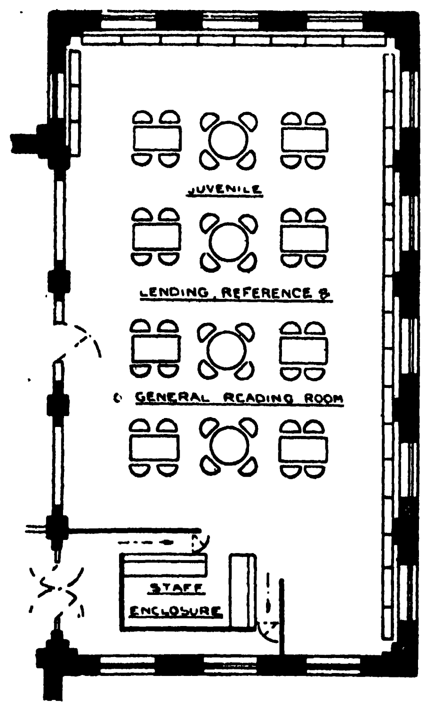
মেক্সিকোর তরুণদের জন্য পৃথক পাঠগৃহ আছে। রেড্ রাইডিংহুডের দৃশ্যের চিত্র দ্বারা গৃহটি সুশোভিত। আধুনিক কালের উপযোগী সাজ সরঞ্জামে গৃহটি সজ্জিত করা হইয়াছে।

রাশিয়ায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল হইতে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ভার লইয়া থাকেন—তা তাহারা সদ্বংশ জাত হউক বা জারজই হোক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সকল শিশুরই গবর্ণমেণ্টের উপর সমান অধিকার। কাজেই কিসে

শিশুদের ইষ্ট সাধন হইবে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য আছে। সোবিয়েট নীতির অনুকূলে তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। জাতীয় চরিত্র গঠনে পঠন অভ্যাস অল্প সহায়ক নহে। মস্কো সহরে ছেলে মেয়েদের স্বতন্ত্র পাঠগৃহ আছে—সেখানে তাহাদের প্রতিভা স্ফুরণের নানারূপ সুযোগ দেওয়া হয়। শিশুর উৎকর্ষ সাধনোপযোগী অনুসন্ধান এবং গবেষণার কার্য্য সেখানে হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরীক্ষা কার্য্য ও তাহার ফলাফলের আলোচনা হইয়া থাকে। পুস্তকের আখ্যান ভাল নাটকে রূপান্তরিত করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা, খ্যাতনামা লেখকগণের জন্মস্থান দর্শন উপলক্ষ্যে ভ্রমণের বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। ছেলে মেয়েদের পুস্তক পাঠে যাহাতে নেশা জন্মে সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। ছেলেদের খেলা ধূলার সহিত পড়ানর সুন্দর ব্যবস্থা এবং তাহাদের রুচি অনুযায়ী পুস্তক প্রকাশের বিরাট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ছেলেরা যে যে রূপকথার বই ভালবাসে তাহা জানিয়া লইয়া সেই রকম ভাবে বই লেখান হয়। আর তাহা প্রকাশ করা হয় চিত্তাকর্ষক করিয়া। প্রত্যেক বই-ই বহু সহস্র করিয়া ছাপান হয়।

এতক্ষণ বিদেশের কথা বলিলাম। এখন ভারতের কথা বলি। বরোদা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে শিশু লাইব্রেরী স্থাপনের পথ প্রদর্শক। বরোদার মহারাজা সায়াজিরাও গাইকোয়াড় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ছেলেদের জন্য পৃথক পাঠগৃহের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারই বদান্যতায় গুজরাটী ভাষায় শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। এই বিভাগে ছেলেদের উপযোগী তিন সহস্র ইংরেজী পুস্তক রক্ষিত হইয়াছে। তা ছাড়া নানারূপ ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। গল্পের ক্লাস আছে—দেওয়ালে নানা চিত্তাকর্ষক চিত্র আছে। এই বিভাগের তত্ত্বাবধারণ করেন একজন বিদুষী মহারাষ্ট্রীয় মহিলা। পুস্তক নির্ব্বাচনের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত আছে। ছেলেদের চিত্তবিনোদনের সঙ্গে শিক্ষার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন বা সিনেমা সহযোগে নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে।

মাদ্রাজেও ছেলেদের লাইব্রেরীর ভালরকম ব্যবস্থার সূচনা হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত রঙ্গনথন্ এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আছে। ছেলেরা যে বিষয়ে পাঠ করে সে সম্বন্ধে তাহাদের প্রবন্ধ লিখিতে হয়—তাহাতে নিঃসন্দেহে শিক্ষা পাকা হয়। প্রবন্ধ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। মলাট সূচী বা নির্ঘণ্ট সবই তাতে থাকে। মলাট নক্সা বা চিত্র দ্বারা সুশোভিত করা হয়। তাহাতে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।



বোস্টনের একটি শিশু-লাইব্রেরীর প্ল্যান—এই কক্ষটি ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২৭ ফুট প্রস্থ। ইহাতে ৪৮ জন পাঠকের বসিবার এবং ৩০০০ পুস্তকের স্থান আছে।

বাঙ্গলা দেশে শিশু লাইব্রেরীর ব্যবস্থা এতদিন ছিল না ক্রমশঃ শিশুবিভাগ খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিগত অক্টোবর মাসে আমাদের বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের সহিত একটি শিশুবিভাগ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে ছেলেদের পাঠের আগ্রহ বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এই বিভাগে গল্পের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছে। আশা করি অচিরে বাঙ্গালার সব লাইব্রেরীতেই

শিশুবিভাগ স্থাপন করিয়া শিশুদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইবে।



গ্রেনথাম্ শিশু-পাঠাগার

সব দেশেই ছেলে মেয়েদের মধ্যে গল্প শুনিবার উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। গল্প হইতে বঞ্চিত করিলে জীবনের একটা অংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তরুণ হৃদয়ের উপর গল্প কথকের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। গল্প পড়া এবং গল্প শুনা দুইটা স্বতন্ত্র জিনিস। তরুণের সাগ্রহ চক্ষের সামনে বসিয়া কথক যখন প্রাণ খুলিয়া কাহিনী বলিতে থাকেন তখন তাহা তরুণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছাইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সহিত কথকের একটা ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। নির্ব্বোধ, অলসপ্রকৃতি বা উদ্দেশ্যবিহীন ছেলে মেয়ের পক্ষে গল্পের প্রভাব অশেষ কল্যাণকর। তরুণদের লাইব্রেরীয়ানকে গল্প বলিবার প্রণালী বা ভঙ্গিমা শিক্ষা করিতে হয়। হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক করিয়া গল্প বলা লাইব্রেরীয়ানের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের বাংলাদেশে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই, বাংলা সরকার তাহার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। সকল সভ্যদেশেই তরুণদের লাইব্রেরীয়ান অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকেন। তাঁহার তরুণ সাহিত্য, তরুণের প্রকৃতি এবং বর্ত্তমান সমাজ ও শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তরুণ সাহিত্য বলিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে তাঁদের কেবল ছেলেদের বই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট। সাধারণতঃ সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান থাকা দরকার। আর ছেলেদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ না হইলে তিনি তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করিবেন কি করিয়া? কেমন করিয়া পুস্তকের সহিত তরুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া দিবেন? লাইব্রেরী কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠান নহে, পুস্তক নির্ব্বাচন ও পড়িবার স্থান। সহৃদয়তার সহিত ভাবের আদান প্রদান না



ক্যাথেজ শিশু-পাঠাগার—কার্ডিফ্

হইলে শিশুচিত্ত আকৃষ্ট হইবে কি করিয়া? সমসাময়িক বস্তুতন্ত্রের পলকহীন চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দুদণ্ড সাধু সঙ্গ লাভের আশায় লোকে লাইব্রেরীতে আশ্রয় লয়। সেখানে তাহার অনুকূলে আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। বস্তু জগৎ হইতে তাহাদের টানিয়া এমন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে যাহা তাহারা কখনও দেখে নাই। তাহারা যা চায় তাই পাইবে এই আশাতে তরুণরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সচরাচর লাইব্রেরীতে গিয়া থাকে। পুস্তকের অন্তরালে কত সুন্দর ভাবধারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কত অমূল্য তথ্য আবিষ্কারের অপেক্ষায় রহিয়াছে, কত অপূর্ব্ব পুরা কাহিনী বা লোকসাহিত্য দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে—প্রত্নতত্ত্বের কত মালমশলা অবহেলায় নষ্ট হইতেছে—সেই অজানা রাজ্যের পথ প্রদর্শক হইবেন লাইব্রেরীয়ান।



ক্যান্টন শিশু-পাঠাগার—কার্ডিফ্

যাঁহারা পুস্তক পাঠে অনাসক্ত তাহাদের পুস্তকে আসক্তি জন্মাইয়া দিবেন লাইব্রেরীয়ান। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক তরুণের সম্মুখে তাঁহাকে উচ্চাদর্শ তুলিয়া ধরিতে হইবে। তরুণের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে লাইব্রেরীয়ানের বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। তাঁহার কার্য্যের দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নহে—ছেলেদের মধ্যে পাঠস্পৃহা এমন ভাবে উদ্রিক্ত করিতে হইবে যেন আজন্ম তাহাদের পাঠের নেশা না ঘুচে। জ্ঞান-ভাণ্ডার অফুরন্ত—জন্মজন্মান্তরেও তাহা নিঃশেষ হইবার নহে।

স্বল্প ব্যয়ে তরুণদের লাইব্রেরী কিরূপ হওয়া উচিৎ এ সম্বন্ধে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এক কথায় তাহার সদুত্তর দেওয়া চলে না। সব স্থানের লোকের অবস্থা বা প্রকৃতি এক নহে। তবে এটা ঠিক ব্যয় বাহুল্য না করিয়া তরুণদের বিভাগ খোলা অসম্ভব ব্যাপার নহে। লাইব্রেরীর বড় ঘর থাকিলে তাহার এক কোণে ছেলেদের পৃথক ব্যবস্থা বা একটি ছোট ঘর পাইলে তাহাতেও কাজ চলিতে পারে। সাজ সরঞ্জাম সাদাসিধা হইলেও তাহাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য রঙের বাহুল্য আবশ্যক। দেওয়াল খালি থাকিলে সেখানে ভাল ভাল ছবি দিতে হইবে। ফুল ও ফার্ণের টব বেশী ব্যয়সাধ্য নহে অথচ সাজাইলে বেশ সৌষ্ঠব হয়। জানালায় রঙীন পর্দ্দা আর পুস্তকের খোলা তাকে সকলের অবাধ গতির ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। পুস্তক নির্ব্বাচন কঠিন কাজ, তাহাতে একটু পরিশ্রম ও বিবেচনার দরকার। লাইব্রেরী পরিচালনের আইন কানুন যত কম ও সোজাসুজি ভাবে হয় তাহাই কর্ত্তব্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পাঠগৃহে সুশৃঙ্খল রক্ষা, পুস্তকে যত্ন, বাড়ীতে বই লইয়া যাইয়া পড়িবার ব্যবস্থা এবং কোনও সংক্রামক ব্যাধি পুস্তক সংস্পর্শের দ্বারা যাহাতে ছড়াইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

তরুণের ভাব তরুণের ভাষা এবং তরুণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্ফুরণের কেন্দ্র হইবে এই সব পাঠগৃহ। স্বাস্থ্য-নৈতিক, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্ব্ববিধ কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনার কেন্দ্র হইবে এইসব শিক্ষায়তন। এই জ্ঞানমন্দিরের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত,—স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ এখানে নাই,—ইহা বিবাদ বিসম্বাদ বা বাক বিতণ্ডার স্থান নহে,—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার এখানে প্রবেশ নিষেধ। জ্ঞানমন্দিরে যে ভেদনীতি আনিতে চাহে সে দেশের পরম শত্রু। তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা, তাহাদের গড়িয়া তুলিবার জন্য সকল সভ্যদেশেই প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছে, আমাদের দেশ কেবল পিছনে পড়িয়া আছে। জগতের সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে তরুণের জাগরণ এখন সর্ব্বব্যাপী। আমাদের দেশেও তরুণ জাগিয়া উঠিয়া একটা বড় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই গুরু সমস্যা সমাধানের জন্য জ্ঞানের আলোক ধরিয়া তাহাদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহাদের কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য সকলে অবহিত হউন—তরুণের জয়যাত্রা সার্থক করুন।

শ্রীমুণীন্দ্রদেব রায়

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

১৩

ডাক্তার কাকা খবর পেয়েই এলেন। তিনি অনেকদিন থেকে জানতেন যে মার হৃদ্‌যন্ত্র খারাপ হয়েছে, যখন হয় হঠাৎ এই রকম চ'লে যাবেন। সতীশবাবুও সে কথা জানতেন। তিনি বলে গেছেন যে সরলাকে তিনি নিয়ে যাবেন, সে তাঁর কাছে থাকবে অন্ততঃ আমার ঘরকন্না হওয়া পর্য্যন্ত। দুদিন বাদ আমি সরলাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে আজ এই প্রথম ভেঙ্গে পড়ল। আমার মুখ চেয়ে সে মার জন্যেও কাঁদতে পায় নেই এতদিন। একটু সুস্থির হলে বললে,

"দাদা, মা কি ব'লে গেছেন মনে আছে? আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। তাছাড়া, সে নিজে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেছে আমি তাদের বাড়ী যেতে পারি না। তুমি যেমন ক'রে পার ওঁদের বুঝিয়ে বল। এখন থেকে বোনকে নিয়ে তোমায় একটু বিব্রত হতে হবে, দাদা। তার আর কেউ নেই।"

আমি সরলাকে বুকে চেপে ধ'রে বললাম,

"সে ভার আমি নিলাম, বোন। মা সব জিনিস দিব্যচক্ষে দেখে সে ভার আমায় দিয়ে গেছেন।"

সুরেশ কলকাতা চলে গেল। আমি কাকার সাহায্যে শ্রাদ্ধশান্তি যেমন তেমন ক'রে শেষ করলাম। তারপর সুরপুরের বাড়ী বন্ধ ক'রে সরলাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে উঠলাম। তাকে সোজা মাসীমার কাছে নিয়ে গেলাম। সেন মহাশয় আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন,

"নরেশ, আজ আমার যে কি আনন্দ হল বলতে পারি না। এই দুর্দ্দিনে তুমি সরলাকে তোমার মাসীমার হাতে তুলে দিলে। বুঝলাম তুমি আমাদের যথার্থ ভালবাস। তোমার পরীক্ষা শেষ ক'রে নাও। সরলা তার আপন বাড়ীতেই রইল।"

সুরেশের সঙ্গে আমি বাসায় গেলাম। সেরাত্রি সে আমার কাছেই রইল। অনেকক্ষণ ধ'রে দুজনে সুখ দুঃখের গল্প করলাম। সুরেশ বললে,

"নরেশদা, তুমি সুরপুর একেবারে ছেড়ে দিলে চলবে না কিন্তু।"

"ছেড়ে কি ক'রে দেব, ভাই? কাকা কাকীমা যতদিন আছেন, বছরে একবার তাঁদের দেখা দিয়ে আসতেই হবে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই একবার যাব। সম্পত্তি সামান্য যা আছে, তাও ত দেখতে হবে। কাকা বুড়ো হয়েছেন তার ঘাড়েই বা ফেলে রাখলে চলবে কেন? তবে পরীক্ষা পাশ হয়ে নিজের একটা এখানে ঘরকন্না করা, এইটে সব চেয়ে দরকারী। সরলাকেই বা সেন মহাশয়ের বাড়ী কতদিন রাখব?"

"সরলাকে দিন কয়েক শ্বশুর বাড়ী পাঠাবে না? সতীশবাবু অত করে বলছিলেন।"

"না, ভাই, সে হবে না। সে নিজে যেতে চায় না। মনে করে গেলে নিজেকে খাটো করা হবে। আর সত্যি ভেবে দেখলে ওর সঙ্গে রমেশের কি তার বাড়ীর একটা মনের যোগ কবে হল? একটা নামে মাত্র পতিব্রতার ধর্ম্ম নিয়ে কতদূর এগোন যায়?"

"সত্যি, ভাই নরেশদা, ব্যাপারটা কি হল বল দেখিনি। এক বছর আগেও স্বপনের অতীত ছিল।"

"তা ত বটেই সুরেশ। কিন্তু বাবা বলতেন, ভগবান মঙ্গলময়, তার রাজ্যে মঙ্গল বই অমঙ্গল হয় না। যতই কেন আপাত ভয়ানক হোক না, সব জিনিসের মধ্যেই মঙ্গলের বীজ পোঁতা আছে। হয়ত এই জঘন্য ব্যাপার থেকেই সরলার জীবন একটা পূর্ণতর সার্থকতার দিকে যাবে। স্ত্রীলোকের জীবন পতি বিনা সার্থক হয় না এ ত

একটা কুসংস্কার মাত্র। খুব প্রাচীন আর ব্যাপক কুসংস্কার ব'লে ধর্ম্মের বেদীতে উঠেছে। কথাটা ঠিক নয়, ভাই ?"

"হ্যাঁ ভাই, এতে আর সন্দেহ কি ?"

"সেন মহাশয়ের কাছে সরলাকে আরও এই জন্য রাখলাম যে তিনি একজন শক্তিমান পুরুষ, সরল ভক্তি থেকে কি ক'রে শক্তি সঞ্চয় করতে হয় তা জানেন। ঐ ভাল মানুষ বুড়ো, কিন্তু ভেতরটা পর্ব্বতের মত অটল।"

"কিন্তু নরেশদা, সেন মহাশয় একে গোঁড়া ব্রাহ্ম তায় প্রচারক। তাঁর কাছে থেকে সরলার চরিত্রে একটা সঙ্কীর্ণতা ত আসতে পারে।"

এই তুই সেন মহাশয়কে বুঝলি ? কোন রকম সঙ্কীর্ণতা তাঁর মত মানুষের কাছেও ঘেঁসতে পারে না। তিনি শুধু ব্যাভিচারের শত্রু। তাই বলে কি তাঁকে সঙ্কীর্ণ বলা যায়। সমাজদ্রোহীকে সমাজ আশ্রয় না দিলে কি সমাজকে দোষী বলা যায় ? Lawএর শাসন যে মানবে না তাঁকে Law রক্ষা করবে না, এতে ন্যায়ের ব্যতিক্রম ত হয় না। এ সম্বন্ধে সেন মহাশয় একদিন আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন। আমার মনে আর কোন সংশয় নেই।"

"আমার বড় ইচ্ছা সেন মহাশয়ের কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে দুটো ভাল কথা শুনে আসি। কিন্তু যা Societyর হিড়িকে পড়েছি! টেনিস, চা খাওয়া, খানা খাওয়া, বনভোজন একটা না একটা হরদম লেগে আছে।"

"তা বেশ ত। কদিন আমোদ ক'রে নে। আবার ত পরীক্ষার সময় কাছে আসবে। কোথায় কোথায় যাস্ Society করতে ?"

"তুই এক ঘর গেরস্ত ব্রাহ্ম আছেন যাদের সঙ্গে সেন মহাশয় আলাপ ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা খুব ভাল লোক। কিন্তু সেখানে বড় dull একঘেঁয়ে লাগে, কিছু মজা নেই। সাদাসিধে মানুষ, আদর যত্ন খুব করেন, কিন্তু—"

"আচ্ছা, তাঁদের কথা থাক। যেখানে dull লাগে না এমন জায়গার কথা বল্।"

"সে রকম তুতিন বাড়ী আছে। প্রথম, পার্কষ্ট্রীটে চাটারজী সাহেবেরা। যে বাড়ীতে রমেশের খবর প্রথম ডসের কাছে শুনি। তাদের মেয়ের নাম রোমা। লেখাপড়া করে নেই কিন্তু খুব কেতা দুরুস্ত, খুব রূপসী, আর গান বেশ গাইতে পারে। ডসের সঙ্গে তার খুব ভাব। তারপর ডাক্তার মিটারদের বাড়ী দুবার গেছলাম। তাঁরা B. F. এর Climax অর্থাৎ বিলেত ফেরতের চরম। দুই এক বছর অন্তর বিলেত যান। তাদের মেয়ে Myra ফরাসী দেশে কনভেন্ট ইস্কুলে লেখাপড়া করেছে। খুব চমৎকার পিয়ানো বাজায়, আর ইংরাজী ফরাসী গান গায়। মিটাররা চাটারজীদের ঠাট্টা করে কারণ রোমা বাঙ্গলা গান বই জানে না, আর ফরাসী বলতে পারে না। মীরা নিজেও এত বেশী নাক উঁচু ক'রে বেড়ায় যে তার স্বামী বিলেত অঞ্চলে ছাড়া মিলবে না। তবে রঙ্গ রোমার চেয়ে নিরেস আর কথাবার্ত্তাও রোমার মত অত সরস নয়। সেই জন্য আবার চাটারজীরা মিটারদের ঠাট্টা করেন। দু'বাড়ীতেই ছেলে আছে। তারা মামুলী সেন্ট্ জেভিয়ারের ছাত্র, কেউ জুনিয়ার কেউ সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাস করেছে। দুবার বছরে বিলেত যাবে তকমা সংগ্রহ করতে। মিটারদের বাড়ীতে অনেক নিষ্কর্ম্মা ব্যারিষ্টারের দল বিকেল বেলা টেনিস ব্যাট হাতে জমা হন কিন্তু মীরা তাদের আমল দেয় না। বরং আমার উপর বেশী সদয়।"

"আচ্ছা, সুরেশ, তোর বেশ ভাল লাগে ঐ সমাজ, বেশ বনে ওদের সঙ্গে ?"

"কেন বনবে না ? মেয়েরা লেখাপড়া জানে, চালাক চতুর আমুদে। পুরুষগুলো একটু পেগ খায়, এই যা বলতে পার।"

"দেখিস, এই চালাক চতুর আমুদে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধাস্ না, রমেশের মত।"

"কে, আমি ? কক্ষণ না। আর যদি কিছু বাধে, ত ক্ষতি কি ? আমার ত আর বিয়ে হয় নেই।"

"তা বুঝি, কিন্তু কাকার মতামত জানা আছে ত ? তোকে বিলেতেই যেতে দিলেন না, ব্রাত্যসমাজে বিয়ে করতে দেবেন ?"

"না, দাদা, তোমার ভয় নেই। আমি বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে যাব না। কাল এক বাড়ীতে মীরা

মিটার নিয়ে গেছল, তাদের কথা বলি শোন। তাদের বড় মজার ইতিহাস। বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন এক পঞ্জাবী সরদার, সেদেশে বড় জায়গীর আছে। এখন মারা গেছেন। মিসেস্ সিং বাঙ্গালী। তাঁর প্রথম বয়সের একটা মেয়ে, মায়া, আমার চেয়ে একটু ছোট। আর ছোট্ট একটি ছেলে কুন্দন সিং, বছর চারেকের। সম্প্রতি লুধিয়ানা থেকে এসে লাউডন ষ্ট্রীটে বাড়ী নিয়েছেন। উদ্দেশ্য, বোধহয়, মেয়ের বিয়ে দেওয়া। মস্ত বাড়ী, অগাধ পয়সা। রোজ চায়ের সময় বৈঠকখানায় গাদা গাদা অতিথি অভ্যাগত জমা হয়। নানা রকমের নানা জাতের লোক আসে। মিটারদের বাড়ী যেমন জন কয়েক ছোকরা ব্যারিষ্টার আসে তা নয়। মিসেস্ মিটার, মিসেস্ চাটারজী এই জন্য সিংদের হিংসেয় জ্বলছেন। তবে রোমার জন্য বোধ হয় আর ভাবনা নেই। ডস্‌কে গেঁথেছে বলেই ত মনে হয়। মিসেস্ মিটারের কথার ভাব এই যে কোথা থেকে সিংরা এসে জুড়ে বসেছে আর তাঁর দল ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছে। মীরা বলে, 'I dont mind. I dont want a lot of penniless fools bwzzing round me। (আমার আপত্তি নেই। এক গাদা মূর্খ ভিখারীর দল আমার চারিদিকে ভ্যান ভ্যান করবে, এ আমার অসহ্য।)'

মিস্ সিং রঙ্গ ময়লা হলেও চমৎকার দেখতে। রোমা আর মীরার মত দিবারাত্র মুখে রুমাল দিয়ে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে না। বেশ গম্ভীর অমায়িক চেহারা। বাড়ীর যথার্থ গিন্নী সেই। অথচ এদিকে পঞ্জাবের ফার্ষ্ট ক্লাস বি এ। আমার শনিবারে সেখানে নিমন্ত্রণ। চা খেতে হবে আর মাডু মুকারজী ব'লে এক ব্যক্তিকে টেনিসে ঠুকে দিতে হবে।"

"মাডু ব্যাপারটি কি?"

"পৈত্রিক নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। অক্সফোর্ডের তৃতীয় শ্রেণীর বি-এ। অনেক কষ্টে একটি অস্থায়ী প্রফেসারী পেয়েছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। কলকাতায় থাকেন কম্বুলিয়া টোলায় পিত্রালয়ে। বাপ সেকেলে লোক, পাঁউরুটী পর্য্যন্ত বাড়ী ঢোকবার জো নেই। পাকা চাকরী মিলছে না, একটা শ্বশুরালয়েরও বন্দোবস্ত হচ্ছে না, তাই সাহেব অনুগ্রহ ক'রে লাউয়ের ঘণ্ট মুলো ছেঁচকী ইত্যাদি বরদাস্ত করেন নইলে,

'By Jovi, I would go to Spence's tomorrow, কালই হোটেলে চলে যেতাম।' খুব উঠে পড়ে লেগেছে মিসেস্ সিংকে শ্বাশুড়ী পদে বরণ করতে। মিসেস্ও তাকে কতকটা নাই দিয়ে মাথায় চড়িয়েছেন।"

"তাকে টেনিসে ঠুকতে হবে কেন?"

হুকুম। মিস্ সিং, যতদূর বুঝলাম, তাকে দেখতে পারে না। লোকটা যখন খুব টেনিস খেলার বড়াই করছিল, তখন মীরা আর মিস্ সিং ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইছিলেন। বোধ হয় মীরা বলে দিলে যে আমি বেশ টেনিস খেলতে পারি। ফলে শনিবার দিন একটা challenge হয়ে গেল, বাজী লাগান হল যে সেদিন যে টেনিসে জিতবে, সে ওঁদের সঙ্গে রাত্রে করিন্থিয়ান থিয়েটারে ম্যাক্‌বেথ দেখতে যাবে।"

"তা বেশ, ভায়া। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় যেন।"

১৪

সন্ধ্যাবেলা আমি সরলাকে দেখতে গেলাম। বারান্দায় ব'সে সে সেন মহাশয়ের কাছে পড়ছিল। আমাকে দেখে দৌড়ে এল। সেন মহাশয় বললেন,

"বেটী এরই মধ্যে আমাকে হাতের মুঠোর ভেতর পুরেছে। কাল এসে অবধি এমনই মেসোমশায়, মেসোমশায়, করছে যে আমার কেবল চোখের জল আসছে। আমায় রেঁধে খাওয়ান পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা ভাল দেখতে পাই না ব'লে আমাকে Imitation of Christ পড়ে শোনান হচ্ছিল। কিন্তু একটা বড় দোষ আছে, বাবা নরেশ, খায় না, মোটে খায় না। তুমি বেশ ক'রে ব'কে দিয়ে যেও।"

সরলা চেঁচিয়ে উঠল, "মেসোমশায়, আপনি আচার্য্য হয়ে কথা উল্টোচ্ছেন! কাল সন্ধ্যাবেলা নিজেই কিছু খেলেন না। আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে খেতে বসিয়ে এমন কাঁদতে লাগলেন, যে খাওয়া দাওয়া কিছু হল না।"

সেন মহাশয় একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "আচ্ছা মা, আজ থেকে আমিও ভাল ক'রে খাব, তুইও খাবি।"

মাসীমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ঝগড়া শুনে স্নেহভরা সুরে বললেন, "তা বাছা, উনি বুড়ো মানুষ। উনি যতটি খাবেন তা খেয়ে তোর পত্তি লাগবে কেন?"

"বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে, নরেশ!" ব'লে চোখ মুছতে লাগলেন। এ বাড়ীতে সরলার শিক্ষা, সরলার আদর, সম্বন্ধে কোন ভাবনাই রইল না।

রাজা রত্নেন্দুনারায়ণ এই দুঃখের দিনে অনেক দরদ দেখিয়েছিলেন। রোজ সকাল দরওয়ান পাঠিয়ে আমার ও সরলার খবর নিতেন। বারণ শুনতেন না। সন্ধ্যাবেলা এক একদিন না খাইয়ে ছাড়তেন না। শরদিন্দু বেশ মানুষের মত হয়ে উঠছিল। বেড়ান কমিয়ে দিয়েছিল, পাছে আমার পড়াশুনোর ক্ষতি হয়। একটু বেড়িয়ে আমার বাসায় এসে চুপ করে কিছু বই নিয়ে পড়ত।

সুরেশের সঙ্গে খুব বেশী দেখা হত না। দু'চারদিন অন্তর একবার এসে খানিকটে গল্প ক'রে, "এইবার তুমি পড়, ভাই।" ব'লে চ'লে যেত। কিন্তু রোজ সরলার খবর নিয়ে আসত নিয়মিত, যতই তার সামাজিক কর্ম্মের হিড়িক থাকুক। এই রকমে আমার পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

যথা সময় পরীক্ষা দিলাম। বেশ ভালই লিখেছি মনে হল। শেষ দিন হল্ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সুরেশ আর শরদিন্দু দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে খুব ঘটা ক'রে আমার পায়ের ধূলো নিলে। তারপর সুরেশ বললে,

"দাদা, আজ তোমার একজামীনের পালা শেষ হল। সেই উপলক্ষে খুব হাল্লা করা হবে ঠিক করেছি। See the conquering hero comes, বিজয়ী বীর আসছেন, হুররে।"

"কি যে পাগলের মত করিস্, সুরেশ। সবাই চেয়ে দেখছে। ওরাও ত বি-এল দিয়ে এল। ওদের নিয়ে কি কেউ নাচছে।"

"ওদের ছোট ভায়েরা যদি গাড়ল হয় ত সে কি আমাদের দোষ? কি বল, শরদিন্দু?"

শরদিন্দু বললে, "এখানে আর দেরী করবেন না, ছোটদা। সরলা দিদি বসে আছেন।" গাড়ীতে দেখি সরলা। সেন মহাশয়ের বাড়ী গিয়ে তাদের প্রণাম ক'রে চার জনে বেরিয়ে পড়লাম হাল্লা করতে। খুব এ বাগান, সে বাগান, গঙ্গার ধার ঘুরে ছাত্রের বাড়ী গেলাম। সেখানে আজ বিশাল ভোজের বন্দোবস্ত। বাঙ্গলা, ইংরেজী, মোগলাই সব রকম খাদ্য। রাজামশায় খাইয়ে লোক। তাঁর এদিকে প্রচেষ্টা দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে তাঁর বাতরোগ সারে না কেন। আমরা যতটুকু কয়তে পারলাম সে কাঠবেরালের সেতু বন্ধনে সহায়তার মত। রাণীজী সরলাকে খুব আদর যত্ন করলেন। বিদায়ের সময় বললেন,

"কবে এখানে এসে থাকবে বল, মা। তোমার দাদা মিছেমিছি মেসে কষ্ট পাচ্ছেন।"

"মাসীমা মত করলেই আসব, রাণীমা। আমার এখানে থাকার অনিচ্ছা কেন হবে? আপনারা সবাই দাদাকে এত ভালবাসেন।"

সেন মহাশয় মত করলেন না, বললেন যে তিনি সরলাকে নিয়মিত পড়াচ্ছেন, সেটার ব্যাঘাত হবে। তিনিই রাজার সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা কইলেন। আমারও সে রকম আগ্রহ ছিল না। দুই একদিন পরে আমি একা রাজবাড়ীতে উঠে গেলাম। একতলায় দুটো বেশ বড় ঘর পেলাম। আমার ভয় ছিল ওখানে থাকলে সারাক্ষণ গোলমাল পোয়াতে হবে, নিরিবিলি দুদণ্ডও থাকতে পাব না। কিন্তু দেখলাম সে ভয়ের কারণ নেই। রাজা সাহেবের প্রকৃতি যথার্থ বনেদী ঘরের যোগ্য। মাইনে দিচ্ছেন বলে সারাদিন ঘানিতে জুড়ে রাখবার প্রবৃত্তি নেই। অন্যের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ আগে থেকেই ভেবে রাখেন। আমার ঘরের লাগা বারান্দা আলাদা ক'রে দিলেন আর আমায় বললেন,

"সকালের দিকে তোমার নিজের কাজকর্ম্ম সেরে নিয়ে এইখানেই খাওয়া দাওয়া করবে। আমি শরৎকে বলেছি তোমায় বিরক্ত না করে। বিকেলে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে এসে আমার কাছে ঘণ্টাখানেক বসবে। তারপর সবাই একসঙ্গে খাব। এতে তোমার অসুবিধা হবে না ত?"

"না আমার খুব সুবিধা হবে। আমি শরদিন্দুর পড়ার সময়টা তার সঙ্গে ঠিক ক'রে নেব।"

"আমার বড় ইচ্ছা তোমার সঙ্গে ছেলেটার একটা স্নেহ সম্বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে ওরই মঙ্গল। আমি দুই একজন বড় উকীলের সঙ্গে কথা কয়েছি তোমাকে হাইকোর্টে বসান সম্বন্ধে। টাকা যা দিতে হবে আমি দিতে রাজী আছি।"

"আজ্ঞে না, আমি টাকার সংস্থান করে রেখেছি। তবু আপনার দয়ার কথা ভুলব না।"

"আমি যা বলছি বাবু, নিজের গরজেই। তুমি একবার উকীল হয়ে বসলেই তোমাকে একটা retainer, বাঁধা মাইনে, দিয়ে আমার জমীদারীর মোকদ্দমা তদ্বিরের কাজে লাগিয়ে দিতে চাই। রাজী আছ ত?"

"আমার অদৃষ্টগুণে আপনার মত মুরুব্বী পেয়েছি।"

"তা নয়, বাবা। আমার ছেলেকে তুমি ভালবাস তাই আমার আপনার জন হয়ে যাচ্ছ।"

ক্রমশঃ

চারুচন্দ্র দত্ত

মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

তিন

সেদিন রাতে বর্ষা পড়িতেছে। চারদিকে ঝমঝাম শব্দ, কখনো বৃষ্টির ছাট্ আসিয়া গায়ে লাগে। সুজাতার বড় ভালো লাগিতেছে,—বিছানাটার অর্দ্ধেক হয়ত ভিজিয়া গেল কিন্তু জান্‌লা বন্ধ করিবার কথা তার মনেই হয় না।

চমৎকার এখানে বিষ্টি হয়,—জল-পড়ার শব্দটা কী যে ভাল! স্তব্ধ সহরটার চারদিকে অন্ধকার আর বৃষ্টিধারার পতনধ্বনি! সুজাতা ভাবিতেছে কত কিছু তার ঠিক নাই। কলেজ বোর্ডিং,—মায়ের তাড়ায় ছুটীর পনের দিন আগে চলিয়া আসিতে হইয়াছে,—হাঁ্যা, তারও ইচ্ছা ছিল বৈ কি। এর মধ্যে লজিক পড়া যে কতটা আগাইয়া যাইবে কে জানে! সুপ্রভা, শিউলি রেখা,—ওদের কাছে ক্রমে ক্রমে চিঠি লিখিতে হইবে। কলেজের অভিনয়ে ভূমিকা নেওয়া হ'লো না এবার। বোর্ডিং-এ থাকিলে হাসি গানে-গল্পে কল্পনায় জীবন টগ্‌বগ করে। কিন্তু এখানেও মা আছে, বাবা আছে,—আচ্ছা রেণুকার দাদা ঐ রকম করে কেন। পাগ্‌লাটে গোছের কেমন যে মানুষ, কিন্তু—দূর ছাই, কী মাথামুণ্ডু যে সব ভাবনা মনে আসে।

কাৎ হইয়া সুজাতা ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। এক দুই তিন,—ব্যস্ এইবার সে ঘুমাইয়া পড়িবে। হয়ত একটু স্বপ্ন দেখা, সম্পূর্ণ শান্ত বিশ্রাম,—তারপরই ভোর হইবে। জীবনের খাতার আর একটা পাতা সকাল বেলার রোদে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রত্যেকটা দিন তার কল্পনায় ভরিয়া ওঠে।

জল-পড়ার শব্দ, বিছানাতে এক টুকরা গাছের ছায়া, আর,—রেণুর দাদা চুলগুলি ভাল করিয়া আঁচড়ায় না কেন? কী ক্ষতিটা হইত তার তাতে। এমনি করিয়া সুজাতা ঘুমাইয়া পড়িল।

সে-রাতে অরুণাংশু তখনও ঘুমায় নাই। তার জীবনেও সমস্যা আছে, তার কল্পনা নাই এমনও নয়। ডেভেলাপারটা ছিঁড়িয়া গেছে,—নতুন একটা না কিনিলে আর হইবে না। তার প্রাণায়াম শিখিতে বড় ইচ্ছা, কিন্তু সুবিধা মত সুযোগ পাইতেছে না। বদরীকাশ্রমটা নিশ্চয়ই একটা অপূর্ব্ব জায়গা। পাহাড় পাইনবন, তুষার,—আর আশ্রমের শান্তি, আর,—আঃ মশা বড় জ্বালাতন করে। মফঃস্বল-সহরের তো ঐ দোষ,—সন্ধ্যা না হইতেই মশার কনসার্ট শুনিতে হয়!

বৃষ্টি পড়ার দরুণ স্বভাবতই অরুণাংশুর ঘুম পাইয়াছে। কিন্তু 'মানবের শত্রু নারীর' অন্তত এক অধ্যায় না পড়িয়া সে কখনো শোয় না। বইটা শুধু মাত্র নারী সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দেয় নাই,—কি করিলে এই মিথ্যা সংসার ত্যাগের আসক্তি জন্মে, কেমনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তাহার সমস্ত সর্ট-কাট্‌ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে।

অরুণাংশু যখন ঘুমাইতে গেল তখন কল্পনা করিবার মত অতটুকু ক্ষমতাও তার মাথার অবশিষ্ট নাই। চোখের পাতা দু'টি মগজের দরজা-খিল পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টি পড়ার শব্দে কোন সুর সে শুনিল না,—তার বিছানায় গাছের ছায়া অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আসে। যাদের মন কোমল স্বপ্ন তাদেরই বেশী আসে,—মুনির ধ্যানের মধ্যে অপ্সরার মত,—কিন্তু অরুণাংশুর ঘুম স্বপ্ন প্রবেশ করিবার মতও ছিদ্র রাখে না এমনি তা মজবুত।

এমনি চিন্তা-হীন নিদ্রা, যথেষ্ট খাওয়া আর রামকৃষ্ণ মিশানে ঘুরিয়া অরুণাংশুর দিন কাটিতেছে। মনের মধ্যে কোনও অভাব বোধ নাই, স্বপ্ন দেখিবার, কল্পনা করিবার অবসরের অভাব। গান শোনে, কিন্তু সুরের মোহে উচ্ছ্বসিত হয় না। কবিতা পড়িবার দরকার হয় না

কখনো। কোনও গভীর রাতে ঘরে যদি জ্যোৎস্না আসিয়া প্রবেশ করে, কামিনীফুলের গন্ধ আসে তখন 'মানবের শত্রু নারী' পড়ে। কী উপাদেয় গ্রন্থ,—এমনটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার! কী পাকা জ্ঞানের কথা! হইবে না,—লেখা কার!

পরের দিনটা অরুণাংশুর পক্ষে সুদিন ছিল না। ভোর হইল তার আটটায়,—রৌদ্রে তখন চারিদিক জ্বলজ্বল করিতেছে। সর্ব্বনাশ হইল,—ডেভেলাপার টানিবে কখন? এই রোদ্দুরে একসারসাইজ করা যায় না কি? বেশ তো,—একটা লোকও কি তাকে এতক্ষণে ডাকিতে পারিল না! এলার্ম ঘড়িটাকে না বদ্‌লাইলে আর চলিতেছে না,—একেবারে যাচ্ছেতাই হইয়া গেছে ওটা। নইলে অমন টুন্‌টুন্‌ করিয়া বাজে নাকি আবার!

এমন সময়ে তার ভোরের খাবার আসিল। অরুণাংশুর রাগটা পড়িল গিয়া খাবারগুলির উপরে। তারা যে নিতান্তই নিরপরাধ, পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে আসিয়াছে তা তার আর মনেই রহিল না। কুশের কাঁটা পায়ে বিঁধিয়া চাণক্য পণ্ডিত যেমন রাগিয়া উঠিয়াছিল শোনা যায়, অরুণাংশু তেম্‌নি ক্ষেপিয়া উঠিল। ঝন্‌ঝন্ চন্,—খাবারগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—প্লেটটা অভিমানে ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল।

রেণুকা কহিল, এ কী?

ইচ্ছা।

বাপ্‌রে বাপ্,—এত রাগ কেন?

অরুণাংশু কহিল, যখন-তখন একটা খাওয়ার এনে দিলেই হ'লো। সময় জ্ঞান নেই,—রাক্ষুস নাকি আমি?

রেণুকা দুষ্টুমি করিয়া কহিল, কী তবে?

চোখ কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে অরুণাংশু কহিয়া উঠিল, তবে রে লক্ষীছাড়ী। তার সঙ্গে হয়ত তার কথার সুর মিলাইয়া কোন রকম ভঙ্গী দৃষ্ট হইয়া থাকিবে, রেণুকা 'মার্ খেয়ে,—মাগো, মেরে ফেল্লে দাদা,'—বলিয়া দারুণ ভয়ের অভিনয় করিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পালাইল।

এইবার বাহিরে গিয়া কাহার উপর দোষ চাপান যায় তাহা কল্পনা করিতে করিতেই অরুণাংশু দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল,—কিন্তু সহসা কিসের সাথে হুচট্ লাগিল। নীচে চাহিয়া দেখিয়া,—অ্যাঁ! কী এটা? 'মানবের শত্রু নারী'—আরেঃ মাটিতে পড়িল কী করিয়া। নিশ্চয়ই কাল রাতে ঘুমের ঘোরে ফেলিয়াছিল,—টের পায় নাই। তাড়াতাড়ি উঠাইয়া বইটাকে সে কপালে ঠেকাইল, কোঁচার খুট্ দিয়া ঝাড়িল, এবং কি যে করিল না তাহাই বলা কঠিন। সামান্য বই নাকি এটা?

কিন্তু তালিকা এইখানেই শেষ নয়।

দুপুরের খাওয়াটা তার মাটি হইল। যে-ভাতের মাড় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তা সে খায় না। কিন্তু বামুনটা এমনি আহাম্মুক যে সে-কথা তার মনে নাই। তাছাড়া আজ হইতে নিরামিষ খাইবে বলিয়া মাকে আগেই জানাইয়াছিল। কিন্তু তার এ কী ফল! অরুণাংশুর ইচ্ছার এত বড় প্রতিবাদ আর হইতে পারিত না,—অন্তত তিন পদের মাছ এবং এক পদের মাংস রান্না হইয়াছে। অর্থাৎ স্বামী প্রস্তরানন্দের কোনো উপদেশই তাকে মানিয়া চলতে দিবেনা এরা সব।

অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ভাবে অরুণাংশু মাকে বলিল, এ কী?

মা বলিলেন, কি আবার!

মাছ?

মাছ তাতে কি। থা থা ফাজ্‌লামী করিস না। মাছ খাবিনে,—বিধবা নাকি তুই।

আলু সেদ্ধ আছে?

না নেই,—মোটেই নেই। মাছ না খেয়ে ওঠ্ দেখি তুই। কেন কি হয়েছে তোর,—চোখ দুটো নষ্ট করবার বুঝি ইচ্ছে হয়েছে।

হায় নারী,—জানে না স্বামী প্রস্তরানন্দ কি উপদেশ দিয়াছেন। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিতে নিরামিষ যে কতটা উপকারী তাহার বিশদ ব্যাখ্যা 'মানবের শত্রু নারী'তে আছে। এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও আমিষ ছাড়া দরকার। কিন্তু মা'রা কি অত শত বোঝে,—তা হইলে আর ভাবনা ছিল কি। রাগিয়া, প্রতিবাদ করিয়া অরুণাংশুকে অবশেষে নিরুপায় ভাবে সেদিনের জন্য মাছই খাইতে হইল। কিন্তু আণ্ডার্ প্রটেষ্ট্ খাইল,—এবং

বারবার করিয়া শুনাইয়া দিল যে ভবিষ্যতে নিরামিষের ব্যবস্থা না হইলে আর খাইবেই না সে। যতই স্বামী প্রস্তরানন্দের উপদেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছে ততই যত রাজ্যের বিঘ্ন আসিয়া জড়ো হইতেছে!

সেটা বিষ্যুৎবার ছিল কিনা জানা নাই, কিন্তু যত অপ্রিয় কিছু আজ অরুণাংশুর ভাগ্যে জুটিতে লাগিল। বিকাল বেলায় যে-কাণ্ডটা ঘটিল সেটাই সবার চাইতে সাজ্ঘাতিক,—তাতে অরুণাংশুর চটিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। ব্যাপারটা দশজনের কাছে সামান্য হইতে পারে, কিন্তু অরুণাংশুর কাছে মোটেই তা নয়।

বিকালবেলা পার্ব্বতী দেবী রেণুকার চুল বাঁধিয়া দিতেছেন। পাশে অরুণাংশু বসিয়া ডঙ্‌এর বইটা খুলিয়া ছবি দেখিতেছে, আর মাঝে মাঝে ছোট টেবিলটার উপর হইতে টেপ্‌টা উঠাইয়া লইয়া শরীরের কোন না কোন জায়গার মাপ নিতেছে। অরুণাংশুর কাণ্ডকারখানায় সবাই কৌতুক অনুভব করে,—ওর মা পর্য্যন্ত।

কিন্তু রেণুকা হাসি চাপিতে পারে না,—যতই বন্ধ করিতে চেষ্টা করে ততই বজ্‌বজ্‌ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

অরুণাংশু কহিল, কি হয়েছে, হাসিস কেন? বেঞ্চে দাঁড়া করে রেখেছিল বুঝি ইস্কুলে?

রেণু বলিল, হুঁ, তা বৈকি!

তবে আর হাস্‌চিস কেন?

তোমার পড়া দেখে,—নইলে আর হাসব কেন। ষণ্ডপুরাণ নাকি ওটা দাদা?

অরুণাংশু মায়ের কাছে নালিশ করিয়া কহিল, তোমার মেয়েকে সাবধান ক'রে দাও,—নইলে ওর ফাজলামী আমি বের করব কিন্তু।

মা শুধুমাত্র হাসিলেন। অরুণাংশু কহিল, কি শাসন করবেনা তুমি আহ্লাদে মেয়েকে। তবে আমিই—। রেণুকার চুল বাঁধা তখন শেষ হইয়াছে। বেণী দুলাইয়া সে এমনি মরি-বাঁচি করিয়া ছুটিল যেন আর একটু হইলে সে গিয়াছিল আর কি! অরুণাংশু চেঁচাইয়া কহিল, দাঁড়া, তোদের মাষ্টারণীকে চিঠি লিখতে হবে।

ঠিক এর পরেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত মা যে কথা কহিলেন তাহা শুনিয়া অরুণাংশু তো প্রথমটায় একেবারে নির্ব্বাক্। এই প্রশ্ন সনাতন কাল হইতে সকল মা তার যুবক পুত্রকে করিয়া আসিতেছে। কহিলেন, পাগ্‌লামী-গুলো রেখে এইবার বিয়েটিয়ে করতো। গায়ের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা বিছা ছাড়িয়া দেওয়া হইল!

কথা ফুটিলে অরুণাংশু স-আতঙ্কে কহিল, কে?

মা কহিলেন, কে আবার, তুই। কথার একবার ছিরি দেখো।

অরুণাংশু কথার আর জবাব দিলনা। সরোষে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া খর-দৃষ্টিতে একবার মাত্র চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কথা শোন একবার,—সখটা দেখ! তার প্রায় চীৎকার করিয়া ধমকাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে!

ছুটিয়া সে নিজের ঘরে গেল। টেবিলের উপরই 'মানবের শত্রু নারী' খোলা পড়িয়া আছে। বইটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কয়টা পাতা উল্টাইয়া সে একটা জায়গা বাহির করিল। সেখানে এই লেখাটি দাগ দেওয়া আছে,—'—অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই চিরকুমার থাকা উচিত। বিবাহিত ব্যক্তির শুধু ইহকালই নষ্ট হইল না, তার পরকালও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া রহিল। স্ত্রীলোককে সর্প সম পরি—' দৃঢ়তার সাথে সে জায়গাটা ধরিয়া বইটা লইয়া মার কাছে ফিরিয়া গেল। সে-জায়গাটা আগাইয়া দিয়া কহিল, পড়ো।

মা সে স্থানটায় চোখ বুলাইলেন কিন্তু প্রবুদ্ধ হইলেন না। কহিলেন, চুলোয় দে বই, চুলোয় দে। এই কথায় অরুণাংশু ভারী আহত হইল। কী অপূর্ব্ব বই,—তার প্রতি মায়ের এই কী অবিচার। ক্ষণকাল সে আহত-দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ রাগান্বিত ভাবে গট্‌গট করিয়া হাঁটিয়া পর্দ্দাটা সজোরে ঠেলিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু এখানেই চরম সর্ব্বনাশ।

শয়তানের কাণ্ডকারখানা নয়ত কি, এমন সময় সুজাতা সেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল। হুড়মুড় করিয়া অরুণাংশু গিয়া তার উপর পড়িল। সুজাতা ছিটকাইয়া গিয়া ও-ধারের দেওয়ালের সাথে খাইল মৃদু ধাক্কা। দেখিয়া তো অরুণাংশুর চোখ প্রায় কপালে উঠিয়াছে। অবস্থা তার সত্য সত্যই

সঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। সে না পারে পালাইতে, না পারে কোনো কথা জিজ্ঞাস করিতে। কী যে করিবে সে ভাবিয়া পাইতেছে না। হাত কচ্‌লাইল, সুজাতাকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিল, না পারিয়া অধৈর্য্য হইল, একবার আগাইল ও একবার পিছাইল। অনেক চেষ্টায় যখন খানিকটা সাহস সংগ্রহ করা হইয়াছে তখন কহিয়া বসিল, আপনার লেগেছে নাকি ?

সুজাতার বিশেষ কিছুই লাগে নাই,—বরঞ্চ অরুণাংশুর বিব্রত ভাব দেখিয়া তার পেট ফুঁড়িয়া অজস্র হাসি বাহির হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তা সে স্বীকার করিবে কেন ? মুখ কৃত্রিম-গম্ভীর করিয়া সে কহিল, বেশ, এত জোরে ধাক্কা দিলেন, আর বল্‌ছেন লেগেছে কিনা। আমি কি পাথর নাকি !

অরুণাংশু কহিল, ওঃ। আমি কিন্তু—

তা বটে, কিন্তু মাথাটা তো আমার ফাটিয়ে দিলেন। রক্ত বেরুচ্চে নাকি ?

আমি গিয়ে আপনার,—কথাটা সমাপ্ত করিতে না পারিয়াই অরুণাংশু অত্যন্ত সহসা সড়াক করিয়া সরিয়া পড়িল। এই রকম কাপুরুষতায় তার নিজেরই লজ্জা হইল, কিন্তু উপায় কি। নারীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিবে ? আর শুধু কি কথা কাটাকাটি, মেয়েটা যে মিটিমিটি হাসিতেছে তার কি করা যায় ! এই রকম অবস্থায় স্বামী প্রস্তরানন্দ স্ত্রী-সংসর্গ সর্পবৎ পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। নিজের ঘরে ঢুকিয়া তবে অরুণাংশু হাঁপ ছাড়িল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নাই। ডান হাতের তর্জ্জনীটা নাকের তলায় জানিনা কোন প্রয়োজনে গিয়াছিল। অকস্মাৎ এক সুগন্ধ পাইয়া অরুণাংশু চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে,—খানিকটা তেলের ছাপ। সর্ব্বনাশের আর বাকী নাই। সুজাতার মাথার চুল হইতেই যে এ গন্ধতেল লাগিয়াছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন কী করা যায়। আর দেরী নয়,—তোয়ালা টানিয়া এম্‌নি জোরে সে জায়গা রগড়াইতে সুরু করিল যে চাম্‌ড়া পর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিবার জোগাড়। তারপর ? তারপর কী করা যায় ! তাড়াতাড়ি 'মানবের শত্রু নারী' খুলিয়া পড়িল,—'এমন কি নারীর ছায়া গায়ে পড়িলেও স্নান করিয়া ফেলা উচিত।'

আর কাল বিলম্ব নয়। সাবান, কাপড় তোয়ালা প্রভৃতি লইয়া অরুণাংশু স্নানের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইল। পরক্ষণে গায়ের জামা কাপড় লইয়াই সে কল খুলিয়া দিয়া তার তলায় সটান্ বসিয়া পড়িয়াছে।

চার

সুজাতা এবং অরুণাংশুদের বাড়ি একই রাস্তায় অতি কাছাকাছি। অনুক্ষণ দু-বাড়ির মেয়েদের যাতায়াত চলে। তার ফলে এই হয় যে অরুণাংশুকে সাবধান হইয়া নিজেদের বাড়িতেই চলাফেরা করিতে হয়। কারণ, সুজাতার কি সময়-ক্ষণ জ্ঞান আছে নাকি। যখন তখন তাদের বাড়িতে আসিয়া বসিয়া থাকে। কি রেণুকার সঙ্গে, কি তার মায়ের সঙ্গে সুজাতার কথা জমিতে কিছুমাত্র দেরী হয় না।

অরুণাংশুদের বাড়িতে সেদিন সন্ধ্যায় সুজাতাদের সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। পার্ব্বতী দেবী দুপুর হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাঁধুনী ঠাকুরের কাছে সমানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া লোকটাকে আর অখাদ্য রাঁধিতে দিলেন না। রেণুকা না-বলা আনন্দে টগ্‌বগ করিতে লাগিল,—কাউকে খাওয়াইতে পারিলে আনন্দিত হওয়া মেয়েদের স্বভাব। অথচ একই কারণে অরুণাংশু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। বিকালে বেড়াইতে বাহির হইবার সময় সে ঠিক করিয়া গেল রাত্রি দশটার আগে সে আজ বাড়ি ফিরিবে না। গণ্ডগোল সব মিটিয়া গেলে আসাই সব চাইতে নিরাপদ !

বাহির হইবার সময় রেণুকা কহিল, আজ শীগ্‌গির বাড়ি ফিরো কিন্তু দাদা,—ওদের বাড়ির সবার আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ জানতো ?

চটিয়া অরুণাংশু কহিল, নিমন্ত্রণ তো আমার কি তাতে,—পাতা ফেলবার জন্য তুইতো আছিস্।

রেণুকা কহিল, বাপ্‌রে !

অরুণাংশু কহিল, মাকে বলে দিস্, দশটার আগে ফিরবো না আমি। সাড়ে দশটাও হ'তে পারে।

রেণুকা কহিল, আজ রাতে খাবে, না খাবে না বল্‌বো।

হাতের আয়ত্তের মধ্যে তার বেণীটা পাওয়া গেল। কাজে কাজেই যা স্বাভাবিক তাই হইল, এবং রেণুকাও

যতটুকু ব্যথা পাইয়াছে তার অনুপাতে চারগুণ চীৎকার করিল। কম চুল টানা সে অরুণাংশুর কাছে খায় না। কিন্তু তবু ওর পরিহাস করার অভ্যাস গেল না।

সন্ধ্যার পরেই সুজাতা, ওর বাবা ও মা, এবং ভাই বাদল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। সুপ্রিয়া দেবী ও সুজাতাকে পার্ব্বতী দেবী আর রেণুকা আসিয়া ভিতরে লইয়া গেল। অরুণাংশুর বাবা নীরোদবাবু, সুজাতার বাবাকে বৈঠকখানা ঘরে টানিয়া লইয়া গেলেন। মাঝখান হইতে শুধু বাদল বাদ পড়িয়া গেল,—তার সমান বয়সের বাড়িতে কেহ নাই যে তাকে টানিয়া লইবে। তাছাড়া উৎসাহের আতিশয্যে ও-বেচারীর কথা কারুর মনেই রহিল না। হয় কর্ত্তা নয়ত গিন্নী যে কারুর সাথে সাথেই সে যাইতে পারিত কিন্তু তাতে তার গর্ব্বে বাধিল। কাউকেই অনুসরণ না করিয়া সে এক তলার ঢাকা বারান্দায় দুইটা চেয়ার সাম্না সাম্নি টানিয়া, একটাতে পা ছড়াইয়া ও অন্যটাতে বসিয়া চোখ বুজিল। আর মমতাময়ী ঘুম,—তার বাদলের উপর দরদ অত্যন্ত বেশী!

দুই বাড়ির দু-কর্ত্তা দুজনেই সমান মোটা। যখন তাদের ভূঁড়িতে প্রায় ঠেকাঠেকি তখনও তারা পরস্পরের কাছে হইতে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। বৈঠকখানায় বসিয়া তারা তখন আলবোনা টানিতেছে। নীরোদবাবু খবরের কাগজ পড়িয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া নিজের ভাষ্য ও মন্তব্য ব্যক্ত করিতেছেন। ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক! মোহনবাগান এক গোরা দলের কাছে হারিয়া গিয়াছে। নীরোদবাবু কহিতেছেন যে এর কারণ শুধু এই যে বাঙালীরা কেবল ডাল আর ভাত খায়,—মাংস না খাইলে আবার ফুটবল খেলা যায় নাকি। মাংস না খাইলে এমনি করিয়া চিরকাল ভারতবাসী মাংসাশী সাহেবদের অধীনে থাকিবে। ভারতবর্ষের মুক্তির উপায় মাংসাহার! মাংস খাই না বলিয়াই তো আমরা এত রোগা হই!

সুজাতার বাবা আলবোনা টানিতেছিলেন। শেষের কথাটা শুনিয়া একবার বক্তার প্রকাণ্ড দেহের দিকে ও একবার নিজের ভূঁড়ির দিকে চাহিলেন, তারপর শুধু একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার তামাক টানিতে লাগিলেন। কিন্তু নীরোদবাবু এসব লক্ষ্য করেন নাই,—তিনি বাঙালীর কৃশতা সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

ভিতরে মেয়ে-মহলে তখন অত্যন্ত দ্রুতবেগে জিহ্বাগুলি চলিতেছে, এবং যে-সব প্রসঙ্গ ও যে-সব লজিক আলোচিত হইতেছে তার সম্বন্ধে না বলাই ভাল।

কর্ত্তাদের খাওয়া হইয়া গেল। রাতারাতি বাঙালী জাতির উন্নতি করিবার জন্য যে পরিমাণ মাংস পরিবেশন করা হইয়াছিল তার সবটা যদি খাওয়া হইত তবে পরজন্মে নিশ্চয়ই দুটি হৃষ্ট শিশুর জন্ম হইত, কিন্তু তাতে এদের যে খুব উৎসাহ দেখা গেল তা নয়। খাওয়া-শেষে বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া পান খাইয়া ও তামাক টানিয়া সুজাতার বাবা প্রসন্নবাবু কহিলেন, তবে উঠি দাদা, রাত করতে ডাক্তারের বারণ।

বৈঠকখানার বড় ঘড়িটাতে তখন কম রাত বাজে নাই,—সাড়ে আটটা বাজিয়া কোন্ দু-মিনিট বেশী না হইবে!

নীরোদবাবু কহিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়, শরীর সবার আগে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে তোমার শরীরের কি আর কিছু আছে।

প্রসন্নবাবুর কলেবরখানা যদিও মোটেই এ-কথার সাক্ষ্য দেয় না, তবুও তিনি অত্যন্ত দুঃখিতের মতন মাথা নাড়িলেন। তারপর পান চিবাইতে চিবাইতে বিদায় নিয়া নীচ তলায় নামিয়া আসিলেন।

নীচের ঢাকা বারান্দাটায় আসিয়া পাশে নজর করিতে প্রসন্নবাবু দেখিলেন দুটো চেয়ার জড়ো করিয়া বাদল আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে। কাছে গিয়া তাকে তিনি ঠেলাঠেলি করিয়া জাগাইলেন। কহিলেন, চল্ বাড়ি চল্, জায়গা মতো গিয়ে ঘুমুবি।

বাদল চোখ রগড়াইতেছিল। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, আমি?

বাবা কহিল, হ্যাঁ তুই,—তুই না কে। না না তোকে থাক্‌তে হবেনা, তোর মা আর দিদির যেতে দেরী আছে।

বাদল আপত্তি করিয়া কহিল, কিন্তু আমি যে—

তাকে সমাপ্ত করিতে না দিয়াই বাপ ধম্‌কাইয়া উঠিলেন, ঘুমুলে আর জ্ঞান-গম্যি থাকে না। চল্ চল্ দেরী করিস নি।

বাদল স্তম্ভিত। বাবা বলিতেছে কি। নিমন্ত্রণ খাইতে

আসিয়াছে, না খাইয়াই যাইবে নাকি! আরে,—এ যে মহা মুস্কিল,—বাবা একেবারে না-ছোড়বান্দা। বাদল কহিয়া উঠিল, বাঃ রে, আমি যে এখন পর্য্যন্ত—

প্রসন্নবাবু এবার সত্যই রাগিয়া উঠিলেন। বড় জ্বালাতন করে ঘুমাইলে এ ছেলেটা। শুধু শুধু এখানে পড়িয়া ঘুমানোয় কোন্ লাভটা! চাহিয়া কহিলেন, 'ফের কথা বল্‌ছে,—আয়, উঠে আয়—' অনিচ্ছুক বাদলের হাত ধরিয়া তিনি ওকে জোর করিয়া হন্‌হন্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

গেটের সমুখে অরুণাংশুর সাথে দেখা। অরুণাংশু বাহির হইবার সময় দশটার আগে ফিরিবেই না বলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দশটা বাজিতে যে এত দেরী হয় তা কে জানিত। একই রাস্তায় তিন-চার বার করিয়া হাঁটিল সে, তবু আটটাই বাজে না,—এমনি বড় সহর! একই রাস্তায় আর বেশীবার ঘুরিতে তার ভরসা হইল না। নিতান্ত চোর না মনে করুক, পুলিশের টিকটিকি সন্দেহ করা বিচিত্র নয়। সেটা আর যাই হোক, খুব গৌরবজনক মনে হইল না। অগত্যা আর কি করা যায়। মিউনিসিপ্যালটির পুকুরটার পারে গিয়াই সে দাঁড়াইয়া রহিল জলের দিকে চাহিয়া। তবে সেটা মোটেই কবিত্ব করিবার জন্য নয়,—সময় কাটাইবার জন্য। কিন্তু তাই বা আর কতক্ষণ পারা যায়। পাশ দিয়া চলিতে চলিতে দু-একটা লোক তার দিকে এমনি করিয়া তাকাইল যে অরুণাংশুর মনে হইল তারা সন্দেহ করিতেছে যে জলে ঝাঁপাইয়া সে হয়ত আত্মহত্যা করিয়া বসিবে। নিরুপায় হইয়া সে বাড়ি ফিরাই ঠিক করিল। চুপ চুপ করিয়া উঠিয়া গিয়া একবার তার নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে পারিলে আর কে পায় তাকে! কিন্তু বাড়ির গেটে প্রবেশ করিতেই প্রসন্নবাবুর সাথে দেখা হইয়া গেল। অরুণাংশু প্রথমটা চম্‌কাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে যখন তার মেয়েরা নাই দেখিল তখন আশ্বাস পাইল।

ওকে দেখিয়া প্রসন্নবাবু কহিলেন, অরুণ নাকি?

হ্যাঁ।

বেরিয়ে ফিরছ বুঝি? কোথায় গিছ্‌লে।

নানান্ জায়গায়।

তাই দেখ্‌তে পাইনি। আমাকে শেষ না করে আর তোমার বাবা ছাড়বেন না,—এক হপ্তার খাওয়া খাইয়ে দিয়েছেন।

অরুণাংশু কহিল, ওঃ

সামাজিক কথাবার্ত্তা কেমন ভাবে বলিতে হয় সে-সম্বন্ধে ওর জ্ঞান এতই সামান্য যে হুঁস থাকিলে ও নিজেই লজ্জিত হইত। যখন প্রসন্নবাবু বলিলেন যে অরুণাংশুর বাবা তাকে সপ্তাহের খাওয়া খাওয়াইয়া দিয়াছেন তখন আহারের পরিমাণ আর খাদ্যের আয়োজন না জানিয়াও তার বলা উচিত ছিল,—'না না, এমন আর কি'। কিন্তু সে বিদ্যা কি অরুণাংশুর আছে নাকি। প্রতিবাদের কথা সে কল্পনাই করিল না, কহিল, ওঃ।

প্রসন্নবাবু কহিলেন, আচ্ছা আসি, বিস্তর রাত হয়ে গেল।

অরুণাংশু কহিল, আচ্ছা।

ওরা চলিতে সুরু করিল। কি কারণে বলা যায় না, অরুণাংশুর মনে সহসা সামাজিকতা চাড়া দিয়া উঠিল। বাদলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাদলের পেট ভরেচে তো?

মুখ-অন্ধকার করিয়া চলিতে চলিতেই বাদল কহিল, হুঁ। বাস্!

ভাগ্যিস্ সবাই তার বাবার মত নয়, তাই শেষে বাদল সত্যই আর বাদ পড়িল না। অন্যান্য সবার আহারের জোগাড় করিবার সময় পার্ব্বতী দেবীর ওর কথা মনে হইল। বাদলকে সে-রাত্রের জন্য আর উপোস করিতে হইল না। রাত্রে ওর ঘুম ভালই আসিয়াছিল।

এদের বিদায় দিয়া অরুণাংশু নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। শুক্ল চতুর্থীর খণ্ড-চাঁদ তখন পলাশ ও কৃষ্ণচূড়া বনের আড়ালে বিলুপ্ত হইবার জোগাড় হইয়াছে। ক্ষীণকায় চাঁদের পাণ্ডুর জ্যোৎস্না সিঁড়িতে, জানলার কপাটে, বারান্দার এখানে ও-খানে আসিয়া অবিচারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে।

বেশ একটু আশঙ্কিত ভাবে অরুণাংশু এদিকে বারান্দা পার হইয়া নিজের ঘরের দিকে চলিল। তার ঘরের সমুখের বারান্দাটা অন্ধকার,—দেওয়াল দিয়া জ্যোৎস্নার পথ আটকান। তাতে অরুণাংশুর যে কোনো বিশেষ আক্ষেপ

আছে তা নয়। বরঞ্চ অনেক সময় জমাট্ অন্ধকারেই তার বেশী ভাল লাগে। অন্ধকারের মধ্যে একটা সাধনার রূপ আছে। বিশেষ 'মানবের শত্রু নারী'তে লেখা আছে যে,—যাক্!

নিজের ঘরের কাছাকাছি উপস্থিত হইয়া অরুণাংশু দেখে বারান্দার রেলিঙে ভর করিয়া বাহিরের দিকে রেণুকা তাকাইয়া আছে। ওর মুখ এখান হইতে দেখা যায় না,—মনে হয় এক ছায়া-মূর্ত্তি। কোথা হইতে এক-খণ্ড জ্যোৎস্না শুধু মাত্র ওর মাথায় আর খোঁপায় আসিয়া পড়িয়াছিল। রেণু যে ওর আগমনের কথা টের পায় নাই তাতে অরুণাংশুর সন্দেহ রহিল না। সাথে সাথেই ওর মনে দুষ্টুমি বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে ওকে চমকাইয়া দিলে কি সহজেই না একটা মজা হয়! পা টিপিয়া খুব সাবধানে অরুণাংশু আগাইয়া গেল। ঠিক হইয়াছে,—এখনও ও টের পায় নাই।

অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া ওর খোঁপাটা টানিয়া দিয়া অরুণাংশু চীৎকার করিয়া উঠিল, বাপ্ রে, ভূত!

মেয়েটি চম্কাইয়া ফিরিল বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখিয়া অরুণাংশু তো বজ্রহত। একটা আস্ত ভূত দেখিলেও সে এর বেশী শিহরিয়া উঠিত না। এ মোটেই রেণুকা নয়,—তার আশে পাশেও না,—এ,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে সুজাতা! সর্ব্বনাশ নয়ত কি,—অরুণাংশু চোখ বুজিয়া একদম ছুট্ দিবে নাকি। মন্ত্র দিয়া কেউ তাকে অদৃশ্য করিয়া দিতে পারে না! আরে ছাই, কি করিবে সে!

তাড়াতাড়ি এখন কিছু একটা না বলিলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে এ বুদ্ধিটা তার ছিল,—'মানবের শত্রু নারী' তার অন্তত অতটুকু বিচার বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু ভাষাই যে খুঁজিয়া পায় না।

কহিল, দেখুন, ইচ্ছে করে আমি আর,—আমি ভাব্লাম,—অন্ধকার কিনা—সুজাতা কহিল, হুঁ।

অরুণাংশু কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিয়া কহিতে উদ্যত হইল, দেখুন আমি—

ওর বিব্রত শঙ্কা-ম্লান মুখ লক্ষ্য করিয়া সুজাতার বেদম হাসি পাইতেছিল। রেণুকা ভাবিয়াই যে অরুণাংশু তার খোঁপা টানিয়াছিল তা সে খুব বোঝে। আর ভুল করিলে অতটা লজ্জিত হইবার কোন্ ঠেকা! সে মোটেই কিছু মনে করে নাই,—কিন্তু 'মানবের শত্রু নারী'র একাগ্র পাঠকটি এম্নি বিপদে পড়িবে সেটা যে কী মজার কথা তার আর তুলনা নাই।

কিন্তু অমন একটা স্ত্রী-বিদ্রোহীকে সে ছাড়িবে নাকি। এ সুযোগটার যদি পারা যায় সুব্যবহার করিয়া লইবে। 'দেখুন আমি—' বলিয়া অরুণাংশু আরম্ভ করিতেই সুজাতা তাকে অগ্রসর হইতে না দিয়াই কহিয়া উঠিল, ভুল করেছিলেন, এই তো? কেমন, বলুন তো, তাই বলছিলেন না?

আশ্বস্ত হইয়া অরুণাংশু কহিল, হ্যাঁ।

মুখে গম্ভীর ভাব টানিয়া আনিয়া সুজাতা কহিল, বাবাঃ, ভুল করেই যেমন মাথা ফাটাতে, চুল ছিঁড়তে সুরু করেছেন, ইচ্ছে করে করলে আর বেঁচে থাকতে হ'তো না আমাকে।

অরুণাংশু কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বলিবার কিছু জোগাড় হইল না। এ অবস্থায় পালাইতে পারিলেই ভাল হয়, কিন্তু তার সুযোগও মিলিতেছে না। অন্তত পক্ষে কিছুক্ষণের জন্য একান্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া তার উপায়ান্তর নাই। এমন হইবে জানিলে অনায়াসে সে পুকুরপাড়ে আরও দু-ঘণ্টা কাটাইয়া আসিতে পারিত। কিন্তু কি আর করা যাইবে,—কথায় আছে ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র!

সহসা সুজাতা কহিয়া উঠিল, অরুণ দা?

অরুণ দা? অরুণাংশু গুরুতর শাস্তির জন্যও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এর জন্য নয়। কান তার ঠিক আছে তো?

সুজাতা কহিল, আপনি এতো মুখ-চোরা কেন, অরুণ দা? আমাকে দেখে আপনি খুব লজ্জা পান্ বুঝি?

অরুণাংশু কহিল, আমি?

সুজাতা হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আপনি নয়ত কে আবার! এর পর থেকে আর লজ্জা করে' দরকার নেই,—বুঝ্লেন তো?

জবাব দেবার মত ক্ষমতা অরুণাংশুর অবশিষ্ট ছিল না।

কখন যে সুজাতা চলিয়া গেল তাও তার খেয়াল হইল না। চমক ভাঙিলে তাড়াতাড়ি সে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। এতক্ষণে তার পৌরুষ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। লজ্জা করিবে সে নারীকে? আস্পর্দ্ধার কথা শোন একবার! মহা আহাম্মুক সে,—এর একটা কড়া জবাবও দিতে পারিল না। লজ্জা না আরো কিছু,—কিন্তু তাই বলিয়া নারীকে প্রশ্রয় দিবে বুঝি! নাঃ,—'মানবের শত্রু নারী' না খুলিলে আর চলিতেছে না।

বিজলী আলোর সুইচ্ টিপিয়া সে 'মানবের শত্রু'র সন্ধানে গেল। টেবিলটার উপরে তার যথাস্থানে সেটা সগর্ব্বে পড়িয়া আছে। কিন্তু বইটা তুলিয়া লইতেই,—এ কী সর্ব্বনাশ। বইটার উপরে 'মানবের শত্রু নারী' 'শত্রু' কাটিয়া কে যেন কালি দিয়া বড় বড় হরফে লিখিয়া রাখিয়াছে 'বন্ধু'। অরুণাংশু প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে তার মধ্যে অকস্মাৎ একটা হিংস্র কল্পনা জাগিয়া উঠিল,—লক্ষ্মীছাড়ী রেণুকার বেণীটার নাগাল যদি পাওয়া যাইত তবে তার একটা চুলও বাকী রাখিত না অরুণাংশু। তার ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ জানায়। শুধুমাত্র বাড়িতে এতগুলি লোক বলিয়াই দক্ষ-যজ্ঞ একটা আর সে বাধাইতে পারিল না। মনের ক্ষোভে গজ্ গজ্ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীসুবোধ বসু

সঙ্কেত

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

আমারে ডেকেছে প্রিয়া
আজি দুরু দুরু হিয়া
উঠিছে পুলকি
নূপুর নিক্কণ সুখে
ভরা কলসের মুখে
ছুলকি ছুলকি।
কঠিন কর্কশ ভূমি
লভিছে চরণ চুমি
পরশ বাতুল—
দেহলতা থর থর
দখিন-সমীর থর
পরশ আকুল।
বক্ষে প্রেম পারাবার
কক্ষে কলসের ভার
অবনত শ্রমে
দোলায়ে দক্ষিণ করে
আমারে সঙ্কেত করে
সরমে সম্ভ্রমে।

"ঘরের দাওয়ায় খাট্‌লি পাতা"

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

ঘরের দাওয়ায় খাট্‌লি পাতা
জড়ানো তার পরে
জীর্ণ মাদুর, ময়লা বালিশ,
দেয়ালে ঝোলে পুরাণো শাড়ির পাড়ের টানায়
ছেঁড়া মশারি।
হাত পা ধোয়ার জল গড়িয়ে পড়ে
কানাচ কাদায় ভরা।
দিনের বেলা মাছির জ্বালা,
রাত্রে আবার মশার উপদ্রব।
দশটা থেকে পাঁচটা অফিস
হাড়ভাঙ্গা খাটুনী
সন্ধ্যার পর ঢুকলে খাওয়া
আরাম যা ঐ খাট্‌লি খানার কোলে।
এ মহল্লায় আরো ক'জন থাকে
মোক্তারের মুহুরী,
বয়স হবে পঁয়তিরিশের কাছাকাছি,
এরই মধ্যে চুল পাকিয়ে
কলপ লাগান রোজ সন্ধ্যাবেলায়।
আরেক জন,—সে স্কুলমাষ্টার
অম্লশূলে ভোগে।
এ ছাড়াও মাঝে মাঝে আসেন পরেশবাবু
পোষ্টাফিসের ক্লার্ক,
কম্পোজিটর বরেনবাবু।
ভাঙা মোড়া, চটঘেরানো ইজিচেয়ার পেতে
বিড়ির টানের ফাঁকে ফাঁকে আলাপ চলে—
"দিন পড়েছে খারাপ
কাজের চাপও ক্রমেই উঠছে বেড়ে।
মাইনে বাড়া দূরে থাকুক,
বড় বাবুর মেজাজ কড়া
কে যায় কে যে থাকে
সবাই এখন সেই ভাবনায় কাবু।
বাড়ির চিঠি—
তাও মিলেছে দুটি হপ্তা পরে।
কী আর খবর!—
আমাশা আর খোঁসপাঁচড়ায় ভুগছে বেজায়
কাচ্চাবাচ্চাগুলি,
পরিবারের মাথা ধরা,
কাপড় গেছে ছিঁড়ে,
মাসকাবারে টাকার টানাটানি।
বিদেশ বিভুঁই—
তৃণটিও পয়সা বিনে যায় না পাওয়া।
জল মেশানো দুধ,
বরফ দেওয়া মাছ,
আলুর কথা ছাড়ান্ দিলাম
পটল, সেও তিন আনা সের,
কী দিয়ে কী করা!—
নানান কথা বলতে বলতে
প্রতিদিনই কোনো একটি ফাঁকে
এই গুটি কয় কথা
হবেই হবে।
ঘণ্টাখানেক পরে, সভাভঙ্গ,
যে যার ঘরে ঢোকা।
তারপরে চুপচাপ।
ঘরের সামনে ঘাসে ভরা দশ বারো হাত ফাঁকা
একটু জমি।

নিরেট আঁধার ঘেরা
দূরে একটি বকুল গাছ,
—পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ঝাকে ঝাকে জোনাক পোকা
ঝিন্ ঝিনিয়ে জ্বলে।

নীল আকাশের বুক ছেয়ে রয় হাজার তারা
শিখা তাদের নুয়ে এসে
লাগায় ছোঁওয়া সারা গায়ে।

ভাগ্যহত জীবনখানির অসীম শূন্য ভরে
জ্বলে উঠে অমনি যে কোন্ আশার দীপালী।
চোখের পরে সকল সত্য স্বপ্ন হয়ে নাচে।

কখন যে ঘুম পায়,
রাত মিলায়ে যায় বা কখন,
কখন লাগে মধুর পরশ, মৃদুল নিশাস্
আদুল গায়ে।
নরম চুলের গোছাগুলি এলায় মুখের 'পরে।
বাসি একটা মিষ্টি গন্ধ পেলেব দেহের
মাতাল করে মন।

আবেশ রসে দুইটি শ্লথ হাত
আপনা হতেই তন্দ্রাঘোরে ধায় লুটাতে গলে।

* * * *

পাখীর ডাকে তন্দ্রা মিলায়।
মুঠোয় ঠেকে খস্‌খসে কোন ছোঁওয়া।
চোখ মেলে যায় দেখা,
ভোর বাতাসের বেগে
মশারিটির প্রান্ত এসে
গায়ের উপর লোটে।
সদ্য ফোটা বকুলগুলির
গন্ধে ভরা দিক্।
ভোরের তারা পূব গগনে হাসে।
স্তব্ধ হয়ে বসে বসে
মনে পড়ে বাড়ির চিঠিখানি,—
কোন সুদূরের অভিশপ্ত আর একটি সেই
জীবন কোরক।
মনে পড়ে, আজকে মাসের আটাশ তারিখ,
দুদিন পরেই পাঠানো চাই
তিরিশ টাকার পুঁজি থেকে
অন্ততঃ বিশ টাকা॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর



প্রথম অভিজ্ঞতা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

'পৃথিবীতে এখনো রয়েচে কিছু বন্ধুত্ব, কিছু প্রেম, হতাশ হবার কোনো কারণ নেই সুনন্দা···দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও সুনন্দা, তোমাকে দেখিনি অনেকদিন—'

সুনন্দা পথের উপরেই থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখে বিরক্তির আভাস প্রকাশ করিয়া কহিল, 'আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তোমার বেলা হয়ে যাচ্ছে'—লোকটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমার অনেক কাজ, তোমার জীবন-সংগ্রাম, তোমার ইস্কুলে পড়ানো···সত্যি, একটু সাবধানে পথ হেঁটো, আঁচলটা একটু সামলে; জানোই ত, বড় রাস্তা—বাস্, ট্রাম, মোটর,—সাবধান সুনন্দা, সব আশা তোমার এখনো মেটেনি—'

সুনন্দা কহিল, 'আপনি কি বল্‌তে চান বলুন—' কালো ফিতা-বাঁধা সোনার ছোট রিষ্টওয়াচটা সে একবার হাত তুলিয়া দেখিয়া লইল।

'বলবার এমন কিছুই নেই, এই কেবল দেখা হয়ে গেল তাই—কিন্তু কেন তোমার এই তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসা? হ্যাঁ, মাষ্টারী করা ভালো, টাকা পয়সা নৈলে কি স্বাধীন হওয়া চলে, তোমরা যে আবার স্বাধীন মেয়ে; আজকাল স্বাধীন মেয়ের খুব ডিমাণ্ড, না সুনন্দা? আচ্ছা, তুমি যদি আজ একটা ভালো বিয়ে কর তাহলে ত আর স্বাধীন হতে চাও না? বাস্তবিক, বর পছন্দ না হলেই মেয়েরা চায় স্বাধীন হতে—কি বল? এদেশের ছেলেগুলোর কথা আর বলো না সুনন্দা, ঘষে-মেজে না নিলে ভদ্র সমাজে তাদের বা'র করা কঠিন।'

'সে ত' আপনাকে দেখলেই কতকটা বুঝতে পারা যায়।' বলিয়া সুনন্দা আর দাঁড়াইল না, কোনমতে লোকটিকে এড়াইয়া সে ফুটপাথ হইতে নামিয়া আসিল, হাত তুলিয়া একখানা চলন্ত বাসকে দাঁড় করাইল এবং কোনোদিকে আর না তাকাইয়া সে হাণ্ডল্ ধরিয়া উঠিয়া পড়িল।

যাক্, নিশ্চিন্ত। সীট্-এ বসিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বাঁচা গেল এ-যাত্রায়। ও-লোকটার জন্য ওই পথটা দিয়া আসা দিন দিন তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। লোকটাকে দেখিলে তাহার ভয় করে, সব গোলমাল হইয়া যায়, আঘাত দিয়া কিছু বলিতেও তাহার মুখে কথা আসে না,—অথচ, নিতান্তই প্রশ্রয় পাইয়া গিয়াছে! আলাপ একটু ছিল বৈ কি, একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল; লোকটার চার্ম আছে, আপাত ব্যবহারটাও ভারি সুন্দর, অনেকের উপকারও করিয়া থাকে,—হাঁ, খুব শিক্ষিত লোক। কিন্তু সুনন্দা ছাড়া আর কেউ জানে না, লোকটি কী, কী ভয়ানক, মাঝে মাঝে তাহার চরিত্রের পালিশের ভিতর হইতে বন্য হিংস্র মানুষ উঁকি মারে: সাপের মতো কুটিল, শৃগালের মতো চতুর। 'এমন একদিন আসবে সুনন্দা, আমাকে দেখতেও পাবে না সেদিন।'—শ্যেনপক্ষীর মতো লোকটা তাহার দিকে তাকাইয়া একদিন হঠাৎ এই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। থাক্, স্কুল যাইবার সময় অমন লোকের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিবারও তাহার প্রবৃত্তি নাই।

স্কুল তাহার আসিয়া পড়িয়াছে, সে উঠিয়া পড়িল। কনডাক্‌টর্ চেন টানিয়া হাঁকিল, 'একদম বাঁধকে, জেনানা উৎরেগা—'

এই কথাটা শুনিলেই তাহার রাগ হয়। সে কি জেনানা? দেশের মূঢ় নারী-সাধারণের সে কি একজন? সে ত স্বচ্ছন্দেই যে-কোনো ছেলের মতো সহজে চলন্ত বাস হইতে নামিয়া পড়িতে পারে! নামে না কোনোদিন, কারণ, লোকেরা কী মনে করিবে! বাস্তবিক, লোকের ভয়ে চুপ

করিয়া না থাকিয়া সেই লোকটাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতে পারিত। ছেলেরা যতই শিক্ষিত হোক, মেয়েদের চেয়ে তাহাদের কাল্‌চার কম,—নৈলে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অমন করিয়া ভদ্র মহিলার আচল লইয়া, স্কুলে পড়ানো লইয়া কেহ ঠাট্টা করিতে পারে ?

এই ত সেদিন, এই মাত্র কয়েকদিন আগে, সারকুলার রোড দিয়া আসিবার সময় একজন ছোক্‌রা তাহার পিছু লইয়াছিল। পিছু-পিছু আসিলেই যেন মেয়েদের মন জয় করা যায়; এমন বোকা, এমন গর্দ্দভ! কী ছিল তাহার মনের কথা, কেন এমন করিয়া কাঙালের মতো অনুসরণ করে? ছেলেদের চরিত্রের দৃঢ়তা নেই, গাঁথুনি নেই,—জঘন্য তাহাদের মন, মন্দ দিকটাই তাহাদের লক্ষ্য! আর একদিন চা'য়ের দোকানের ধার দিয়া আসিবার সময়, ভাবিতেও অপমানে মাথা কাটা যায়,—ভিতর হইতে একটা টেরিকাটা ছোক্‌রা তাহাকে দেখিয়া অশ্লীল গান ধরিয়া দিল। সে-গানের না আছে মাথা, না মুণ্ডু!

স্কুলের দরজায় সে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। যে-ক্লাসে তাহার ফার্ষ্ট পিরিয়ড্, সেখানকার ছোট-ছোট মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'দিদিমণি, নমোস্কার!'

'হয়েছে থামো।' বলিয়া সুনন্দা তাড়াতাড়ি হেড্ মিস্ট্রেসের ঘরে নাম সই করিতে চলিয়া গেল।

ক্লাসে আসিয়া সে যখন ঢুকিল মেয়েগুলা তখন খানিকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। একটু উঁচু ক্লাসে আজকাল তাহাকে পড়াইতে হয়। অর্থাৎ ফ্রক ছাড়িয়া কোনো-কোনো মেয়ে সবে মাত্র সাড়ী পরিতে সুরু করিয়াছে। কেহ কেহ এখনই ছুল্ পরে, মাথার চুলে ক্লিপ আঁটিয়া আসে। প্রসাধনের প্রতি মেয়েদের প্রকৃতিগত পক্ষপাতিত্ব, মন তাহাদের বড় সচেতন।

রোল্-কল্ শেষ হইবার পর সবাই একে-একে টাস্ক আনিয়া দেখাইল। যাহারা দেখাইলনা তাহাদের মধ্যে অণিমা একজন। মেয়েটি নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। লাষ্ট্ বেঞ্চে বসিয়া থাকে, পড়া জিজ্ঞাসা করিলেই সে ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। কে একটা দুর্বিনীত মেয়ে সেদিন বাড়ী হইতে এক চিম্‌টি হলুদ-বাটা আনিয়া অলক্ষ্যে তাহার কাপড়ে মাখাইয়া দিয়াছিল। উঁচু ক্লাসের একটি মেয়ে তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, তোর বুঝি গায়ে হলুদ হয়ে গেল রে?—অপমানে ও লজ্জায় অণিমা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

নূতন পড়া বুঝাইয়া দিতেই প্রথম ঘণ্টা শেষ হইয়া গেল।

তারপর দ্বিতীয় ঘণ্টা। সুনন্দা ক্লাস হইতে বাহির হইয়া টিফিন-রুমে চলিয়া গেল। জনতিনেক লেডি-টিচার্ বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। কলিকাতায় বাড়ী-ওয়ালাদের পকেট ভরাইতে কেমন করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ সর্ব্বস্বান্ত হয়, সলিলাদি' শয়ন-কক্ষে কি রকম ভাবে রান্নাবান্না করেন, করুণাদি'র বোন-ঝির বিবাহে কে কি দিয়া মুখ দেখিয়াছে,—মেয়েটির মুখ-চোখ বেশ ভাল, ইত্যাদি। সুনন্দা আসিয়া তাঁহাদেরই অপর প্রান্তে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া টেবলের উপর হাতের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

স্কুলের ঝি বাসায় গিয়াছিল, এইবার টিফিন-রুমে ঢুকিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া কহিল, 'কেলাসে আপনাকে খুঁজতে গিছ্‌লাম দিদিমণি, এই একখানা চিঠি আছে আপনার।' বলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

চিঠি এমন প্রায়ই আসে লেডি-টিচারদের নামে। সুনন্দা সেখানা খুলিয়া একান্ত আগ্রহে পড়িতে লাগিল। করুণাদি' কৌতুহলী হইয়া কহিলেন, 'কাকার ওখান থেকে এলো বুঝি?'

কৌতুহল মেয়েদের চরিত্রের সব চেয়ে বড় দৌর্ব্বল্য। সুনন্দা কহিল, 'না।'

'বাড়ীর সব ভালো ত সুনন্দা?'—সুনন্দার নাম ধরিয়াই তাঁহারা ডাকেন, কারণ সে বয়সে এখানে সকলের ছোট।

সুনন্দা পুনরায় মুখ তুলিয়া কহিল, 'বাড়ীর চিঠি নয়।'

আত্মীয় বলিতে তাহার আর কেহ নাই; থাকে সে মামার বাড়ীতে; কলিকাতাতেই মামার বাড়ী। সুতরাং চিঠিপত্র বাহিরের লোক ছাড়া আর কেহ লিখিতে পারে না। মায়াদি' একটু হাসিয়া কহিলেন, 'বন্ধুবান্ধব বুঝি?'

'হুঁ।'



জ্যোৎস্না রাতে

শিল্পী—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সলিলাদি চট্ করিয়া কহিলেন, 'মেয়ে-বন্ধু ত রে? দেখিস্!'

'মেয়ে নয়।' বলিয়া উত্যক্ত হইয়া সুনন্দা উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট্ লজ্জায় তাহার হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর কোনোক্রমে অঙ্ক ও বাংলা পড়াইয়া দুইটা ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার পর আর মন বসে না। মন না বসিলেও পড়াইতে হয়, জীবন-সংগ্রামের একটা প্রশ্ন আছে। মা নাই, দরিদ্র পিতা, ছোট-ছোট দুইটি ভাই-বোন। মামার বাড়ীর অবস্থাও তেমন সুবিধা নয়। কিন্তু যাক্ সে-কথা। কথা হইতেছিল চিঠিখানি লইয়া। চিঠিখানির অন্তর্গত বিষয়বস্তুটা তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল, অস্থির করিল। ঘড়ির দিকে সুনন্দা তাকাইল। দুইটা বাজে। কি আশ্চর্য্য, এখনো দুইটা বাজে? কাঁটা যেন আর নড়িতে চায় না; ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায় নাই ত? চিঠিখানা যেন তীরের মতো আসিয়া তাহাকে বিঁধিয়াছে। শিকারী কেমন করিয়া বুঝিবে হরিণের বুকে কি যন্ত্রণা হয়! নিষ্ঠুর, পৃথিবী নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম, নিষ্ঠুর বিধাতা!

'দিদিমণি, হাতী মানে এলিফ্যাণ্ট্ কেন? হাতীর ত চারটে পা আছে, না দিদিমণি?'

বিস্ফারিত বিস্ময়ে সুনন্দা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল; সে যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই, যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সত্যি, স্বপ্ন দেখিতেছে সে বহুদিন ধরিয়া। স্বপ্ন দেখিয়াই তাহার দিন যায়; দিন আর রাত্রি। প্রতিদিনের বাহ্য জীবনটা তাহার কিছু নয়, প্রতিদিনের সহিত তাহার মনের মিল নাই; নিজের কাছে সে সত্য হইয়া উঠে স্বপ্নে; স্বপ্নলোকেই তাহার আনাগোনা।

যে-মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, সে বসিয়া পড়িল। ক্লাসে মেয়েরা গোলমাল করিতেছে: কাহার হাতের সোনার চুড়ির মূল্য লইয়া কোন্ একখানা বেঞ্চে বিবাদ বাধিয়াছে, কাহার খাতায় গান লেখা ধরা পড়িয়াছে,—কিন্তু সুনন্দার মনে হইতেছিল, নির্জ্জন ভয়ানক নির্জ্জন, সে যেন নিতান্তই একা। হাঁ, একা সে; বাল্যকাল হইতেই একা, বরাবর একা, কোথায় একটু তাহার গোপন দম্ভ আছে, একটি আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ, যাহার জন্য সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে নাই, বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

স্কুল হইতে বাহির হইয়া একাকী পথে নামিয়া সে আর একবার চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। প্রথম সম্ভাষণ হইতে নাম সই পর্য্যন্ত যেন তাহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। সুস্পষ্ট ভাষা, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল বচন-বিন্যাস, পরিচ্ছন্ন বিষয়বস্তু,—কাগজে ছাপাইয়া দিলে সাহিত্যের এলাকায় আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই পত্রের সহিত যাহার জীবন লিপ্ত, সে-ই জানে ইহার শাণিত তীক্ষ্ণতা, ইহার মার্জ্জনাহীন নির্দ্দয় প্রয়োগ। সুনন্দা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় সে অন্য পথ ধরিয়া সে হাঁটিয়া আসে। কিন্তু বাসার কাছাকাছি আসিয়া সে হঠাৎ মোড় ফিরিল। এখন সে ফিরিবে না, ফিরিলেই তাহাকে শুইয়া পড়িতে হইবে। সেই জানালা, সেই আকাশ, সেই ভালো না-লাগা। শরীরে শক্তি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই,—তবু সময়ের রথের চাকা তাহাকে দলিয়া পিষিয়া চলিতে থাকিবে। আবার বড় রাস্তার ধারে আসিয়া সে বাস্-এর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিন নম্বর বাস্। তিন নম্বর ছাড়িয়া আবার আট নম্বরে উঠিতে হইবে। দুইখানা দেখিতে দেখিতে পার হইবার পর তিন নম্বর আসিয়া দাঁড়াইল। হাতল্ ধরিয়া সুনন্দা উঠিতেই দু'একটি লোক সসম্ভ্রমে জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নারীর প্রতি পুরুষের এই অতি-সম্মান অত্যন্ত বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু, কাঙালপনার উপরে যেন একটি ভদ্র আবরণ জড়ানো। স্ত্রীলোককে বড় করিয়া দেখিবার মধ্যে রহিয়াছে একটি দৈন্য, সূক্ষ্ম যৌন প্রবৃত্তির লোলুপতা; স্ত্রীলোককে ছোট করিয়া যাহারা দেখে, সেখানেও এই, না পাওয়ার আত্মগ্লানি। সুনন্দা নির্বিকার হইয়া বসিয়া রহিল। যাহারা জায়গা ছাড়িয়া দৃষ্টিপ্রসাদের আশায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। মোটর ছুটিতেছে। মোড়ে-মোড়ে আসিয়া থামে, সওয়ারির জন্য হাঁকাহাঁকি করে, আবার চলে। নগরীর মুখর কোলাহল, জনস্রোত, যান-বাহনের শব্দ,—তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আবার চোখের সম্মুখে চিঠিখানা আসিয়া দাঁড়াইল। চিঠিতে তাহার প্রতি অকথ্য কটূক্তি,-সে জঘন্য, সে কুৎসিত; যেন

পৃথিবীতে সবাই ভাল, সবার মনই যেন গেরুয়ায় ছোপানো, সকলেই নামাবলী পরা; শুধু সে-ই খারাপ, সে-ই ইতর। তাহার চরিত্রের প্রতি অযথা মন্তব্য সে সহ্য করিতে পারিবে না। না পারিবে না, সে ইহার প্রতিবাদ করিবে, আত্ম-হত্যা করিয়া প্রতিবাদ করিবে। সে কি এই কথারই যোগ্য? এই কথা শুনিবার জন্যই কি তাহাদের বন্ধুত্ব হইয়াছিল? যাহার নিকট হইতে সব চেয়ে সুমধুর কথা শুনিবার কথা, তাহারই মুখে শুনিতে হয় সকলের চেয়ে যাহা অশ্রাব্য? একেবারে নিরর্থক, একেবারে যুক্তিহীন কটূক্তি। মনে পড়ে প্রথম-প্রথমকার কথা। কত সৌজন্য, কত ভদ্রতা, কত পালিশ; সেদিন ত জানা ছিল না, ইহাদের পিছনে ছিল পুরুষের প্রকৃতির অখণ্ড বর্ব্বরতা, অলজ্জ অহঙ্কার! নারীর চরিত্রের উপর যাহারা কথায় কথায় কটাক্ষ করে, আপন চরিত্রের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু কি করা যাইবে,—সুনন্দার মনে হইল, উহারা মানুষ, দেবতা নয়।

তিন নম্বর ছাড়িয়া আট নম্বর বাস্-এ সে যখন চড়িয়া বসিল, ওয়েলেস্‌লী ও ইলিয়ট্ রোড দিয়া যখন মোটর ছুটিতে লাগিল, সুনন্দার গায়ে তখন কাঁটা দিতেছে। ভয়ে নয়,—কোথায় যেন একটি অত্যুগ্র আনন্দ স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। নারীর আত্মসম্মান কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কখন্ সে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, একথা সাধারণ মানুষ বুঝিবে কেমন করিয়া? হাঁ, একটি অব্যক্ত আনন্দ, অসামান্য রস, অযৌক্তিক উল্লাস। বসিয়া-বসিয়াই নিঃশব্দে সুনন্দা উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। কত সহজ সে, কতখানি স্পর্শাতুর। শরতের আকাশের মতো পরিবর্ত্তনশীল, দিনান্তের দিগন্তের মতো বহুবর্ণায়মান। সারকুলার রোড ছাড়িয়া নিউ পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া সে নামিয়া পড়িল। অনুসন্ধিৎসু চক্ষুকে সে চারিদিকে একবার প্রসারিত করিয়া দিল, এখনই যেন একটি অপূর্ব্ব আবিষ্কার করিবে; চক্ষু তাহার পাহারা দিতেছে। হয়ত বা এই অগণ্য পথচারী-গণের মধ্যে এখনই একটি বিশেষ মানুষকে দেখা যাইতে পারে।

স্বাধীন, স্বাধীন মেয়ে সে। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীন; অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে সে স্বাধীন। অপরিচিত রাজপথের ধারে চলিতে চলিতে কি যেন দৈবাৎ দেখিবার আশায় তাহার অবাধ্য দৃষ্টি ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অথচ কেনই বা সে আসিয়াছে, কী দরকার, কিছুই ত বলিবার নাই: অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসা, নিরর্থক যাওয়া আসা! দুর্ব্বলতায় মানুষকে করে ভীরু, বুদ্ধিহীন। এই অসংযত, হিসাব বুদ্ধিহীন দুর্ব্বলতা, ইহাকে রোধ করিলে অধিকতর উদ্ধত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, দুঃসাহসিক দুর্ব্বলতা! কিন্তু এই চিঠিখানা,—গায়ের ব্লাউসের ভিতরে থাকিয়া যাহা বুকের উত্তাপে গরম হইয়া উঠিয়াছে?—সুনন্দার চোখ দুইটি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। এ যে চরম অপমান বিষম লজ্জা, এ যে ঘৃণা, অবহেলা! সুনন্দা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। যে চিঠি সে পরম আগ্রহে ও যত্নে বহন করিতেছে তাহার ভিতরে লেখা আছে, সে জঘন্য, কুৎসিত, আর চরিত্রহীন। বিদ্রোহ করিবে সে, ইহার প্রতিবাদ করিবে। বুঝাইয়া দিবে, নারীর অসচ্চরিত্রের জন্য দায়ী নারী নয়!

'এই সুনন্দা, কোথায় এসেছিস রে?'

চকিত হইয়া সুনন্দা মুখ ফিরাইল। বন্ধুকে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'এদিকে আবার কোথায় আসবো, তোর কাছেই ত যাচ্ছিলাম। ছেলে কেমন আছে?'—যাক্, সে হাঁপ ছাড়িয়া আজকার মতো বাঁচিয়া গেল।

মেয়েটি কহিল, 'একটু ভালো, আয়না একবার, ডাক্তার-বাবুর ওখান থেকে—'

'চল্' বলিয়া সুনন্দা শৈবলিনীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল।

ঔষধ ও ব্যবস্থা লইয়া ডাক্তারের ওখান হইতে ফিরিবার পথে সুনন্দা কহিল, 'কাল তুই প্রসেসনে যাস্‌নি কেন রে?'

শৈবালিনী কহিল, 'আমি ভাই ভয় করিনে, ছ মাস খেটেছি, আরও ছ' মাস না হয় জেল খেটে আসবো। কিন্তু ওঁর ভাই শরীর খারাপ, ছেলেমেয়ের বড় কষ্ট হয়......তা ছাড়া অভাবের সংসার—তুই গিয়েছিলি?'

সুনন্দা কহিল, 'ইচ্ছে ছিল না যাবার, দূরে-দূরে

ছিলাম,—বিজয়াদি নাকি আদ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছিল ?'

শৈবলিনী কহিল, 'ইস্কুলের মেয়েদের দিয়েছিল এগিয়ে …যদি মার ধোর হয়! সরলাদি'কে জগৎবাবু যেতে দেন্‌নি : বলেছেন, এবার যদি জেল-এ যাও সরলা, তবে আমি আফিং খাবো।'

দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। হাসিল, তাহার কারণ, জেল্-এ সরলার ইণ্টার-ভিউর কথা সকলেরই মনে আছে। অফিস-রুমে বসিয়া স্বামী-স্ত্রীর গলা ধরাধরি করিয়া কী কান্না! জেল্-গেট্‌এর ফাঁক দিয়া তাঁহাদের বিরহ-মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কুমারী মেয়েরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। বাস্তবিক, সরলার মতো মেয়ের স্বদেশী করা উচিত নয়। জেল্-কর্ত্তৃপক্ষরা হাসাহাসি করে।

কথা কহিতে কহিতে শৈবলিনী বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িল। ভিতরের ঘরে কাহারা যেন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সদর দরজায় একখানা প্রাইভেট্ মোটর দাঁড়াইয়া। ভিতরে ঢুকিয়া দেখা গেল, শৈবলিনীর স্বামী অফিস হইতে ফিরিয়াছেন। সুনন্দার সহিত তাঁহার নমস্কার বিনিময় হইল। তিনি কহিলেন, 'গাড়ী পাঠিয়েছেন অণুভা দেবী, আপনিও যাচ্ছেন ত ?'

সুনন্দা পথের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'তার ছেলের অন্নপ্রাশনে ? আমার কিন্তু আজ একটু কাজ আছে জামাইবাবু।'

'গেলে কিন্তু অণুভা খুসি হতো।'—শৈবলিনী কহিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনন্দা কহিল, 'আজকে না, আর একদিন যাওয়া যাবে।'

গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, সুতরাং আর দেরি করা চলে না। শৈবলিনী কাপড় ছাড়িবার জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে স্বামী-স্ত্রীতে গাড়ীতে উঠিলে সুনন্দা বিদায় লইল। খানিকক্ষণ সময় তাহার কাটিল ; তাহাকে এখন অনেক দূর যাইতে হইবে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গিয়া মনটা তাহার অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে।

যাক্, শৈবলিনী তাহাকে বাঁচাইয়া দিল : শৈবলিনীর নিকট সে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ সে অনেকের কাছে ; এই কৃতজ্ঞতার জন্য তাহাকে অনেকের কাছেই মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হয়। অনেকে অপ্রিয় সত্য উক্তির দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করে, সে থাকে মুখ বুজিয়া : কারণ, কোনো-না-কোনো কারণে সুনন্দা হয়ত তাহার কাছে কৃতজ্ঞ।

বাস্তবিক, কী ক্ষণভঙ্গুর সে : জ্বলিয়া উঠিতেও তাহার দেরি লাগে না, নিবিয়াও যায় সে এক মুহূর্ত্তে। সুনন্দা পথের মোড়ে আসিয়া একখানা ট্রামে উঠিল।

চিঠি লিখিয়া যে-লোকটা তাহাকে এমন করিয়া অপমান করিয়াছে, স্নেহ-ভালোবাসার মূল্য যে-লোকটা জীবনে দিতে শিখে নাই, তাহার কাছে এমন করিয়া ভিখারিণীর মতো তাহার আসা উচিত হয় নাই। যাক্, আজ একটা ভয়ানক আত্ম অপমান হইতে সে বাঁচিয়া গেল। বাঁচাইল শৈবলিনী : শৈবলিনীর নিকট সে কৃতজ্ঞ। চলন্ত ট্রামে বসিয়া সুনন্দা ভাবিতে লাগিল, তাহার জীবনজোড়া এই হঠকারিতা। একদিন বাড়ী ছাড়িয়া সে পলাইয়াছিল কিছুই না ভাবিয়া : লেখাপড়া ছাড়িয়াছিল স্কুল-কলেজগুলিকে 'গোলাম-খানা' আখ্যা দিয়া—তাহার বিচার-বুদ্ধি ছিল না, ছিল ক্ষণিক মস্তিষ্ক-উত্তেজনা : ইম্‌প্যাল্‌স্! সে অত্যন্ত ইম্‌প্যাল্‌সিভ্। রাজনীতিতে ঝাঁপাইয়া, পিকেটিং করিয়া, প্রসেসন্ করিয়া, ফ্ল্যাগ্ উড়াইয়া ও জেল্ খাটিয়া তাহার ভাল লাগে নাই : তৃপ্তি পায় নাই ; যাহা কিছু সে স্পর্শ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেগুলির একটির প্রতিও তাহার মোহ নাই ; কিছু একটা দুর্ল্লভকে সে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, সে খুঁজিয়াছে কিছু গভীরকে, কিছু একটা অনির্ব্বচনীয়কে।

ঘরের ভিতরে তাহার ভালো লাগে নাই,—সুনন্দা ভাবিতেছিল,—তাই বাহিরে আসিয়া সে স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছে। ঘরে অসহনীয় বন্ধন, বাহিরে যন্ত্রণাদায়ক মুক্তি। আর্থিক স্বাধীনতা ? অবাধ চলাফেরা ?—কিন্তু তাহার ভিতরে মনের খোরাক কই ?

কন্‌ডাক্‌টর্ আসিয়া টিকিট চাহিল।

টিকিট্ করিয়া সে আবার নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার খেয়ালই হইল না যে, ট্রান্‌স্‌ফ্যর্ টিকিট লইতে হইবে।

টার্‌মিনাসের কাছাকাছি আসিয়া সে নামিয়া পড়িল। কি একটা স্বদেশী সভা উপলক্ষ্যে হৈ চৈ করিয়া লোকজন চলিয়াছে, মেয়েরাও যাইতেছে, জেল্‌-এ পরিচিত কোনো-কোনো মেয়েকেও যাইতে দেখা গেল,—তাহাদের নেশা আজিও কাটে নাই, দেশকে স্বাধীন না করিয়া আর তাহাদের বিশ্রাম নাই,—সুনন্দা সবাইকে এড়াইয়া চলিল অন্যপথে। আজ যদি তাহাকে কেহ সভামঞ্চে দাঁড় করাইয়া দেয় তবে সে চীৎকার করিয়া ওই মেয়েদের উদ্দেশে বলিতে পারে, সব তোমাদের মিথ্যা, তোমাদের মনের কথা আমি বেশ ভালরূপেই জানি। জানি, তোমরা কী চাও।

'এদিকে কোথায় এসেছিলেন? মিটিংয়ে নাকি?'

অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর; হাঁা, অত্যন্ত পরিচিত। মনে হইল, ছিদ্রলেশহীন রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে একটা শব্দ যেমন বহুক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তেমনি করিয়া সেই কণ্ঠস্বর সুনন্দার দেহের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে নিমেষমাত্র: পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইল, এবং একটি যুবকের সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, 'আশা করিনি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'তুমি নয়, আপনি: এই রাস্তা।'

সুনন্দা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, 'ওদিকে চলুন, কথা আছে। এদিকে বড় লোকজন।'

ছেলেটি তাহার পাশে-পাশে চলিতে লাগিল। সুনন্দার শরীরের সমস্ত রক্ত মুখের উপর উঠিয়া উত্তেজনায় ছুটাছুটি করিতেছিল। বলিল, 'আমি আশা করিনি: অপ্রত্যাশিত দেখা তোমা—আপনার সঙ্গে: আমি ভাবতেই পারিনি যতীনবাবু।'

যতীন কহিল, 'আমিও তাই ভাবচি।'

সুনন্দার গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল,—'আজ দুপুরবেলা ইস্কুলে ব'সে আপনার এই চিঠি পেলাম'—বলিয়া সে কাপড়ের ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিল, পরে আবার একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, 'এমন অপমান আমাকে আর কেউ করেনি। আমার স্বভাব-চরিত্র কুৎসিত, আমি জঘন্য, সভ্যসমাজের অযোগ্য, কিন্তু একদিন,—সেদিন আপনার মনোভাব ছিল অন্যরকম।'

....তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

যতীন কিয়ৎক্ষণ থামিল, তারপর কহিল, 'পথের মাঝখানে বেশি কথা বলা চলে না: কিন্তু আপনার কি ধারণা, আমি ভালোবেসেছিলুম আপনাকে?' বলিয়া সে একপ্রকার নির্দ্দয় হাসি হাসিল, কহিল, 'ভালো আমি কাউকে বাসিনে, ওটা নিয়ে আমি কেবল খেলা করি। যাক্‌গে,—আর একদিন কথাবার্ত্তা বলা যাবে, আমি এখন চলি।'

যতীন পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেই সুনন্দা বলিয়া উঠিল, 'আজ আপনার এমন সময় নেই যে আমার বাসা পর্য্যন্ত যান্‌?'

'না।' যতীন কহিল, 'একা বেশ আপনি যেতে পারবেন।'—কয়েক পা সে অগ্রসর হইল, তারপর পুনরায় পিছন ফিরিয়া কহিল, 'তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করেছিলাম সুনন্দা,—মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বই ভালো। কিন্তু বন্ধুত্ব মানে প্রেম নয়, মনে রেখো।'

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তিন নম্বর বাস্‌ হইতে নামিয়া সে বাসার পথ ধরিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা নামিয়াছে।

পথটা যেন তখনও দুলিতেছে, দু'ধারের বাড়ীগুলা যেন জীবন্ত জন্তুর মতো লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে: বন্ধুত্ব মানে প্রেম নয়: তবে কী?

যাক্‌, এই অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করিতে গিয়া তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যটি উৎসর্গ করিতে হইয়াছে: আজ তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল।

'আঁচলটা একটু সাম্‌লে, সুনন্দা: সাবধানে একটু পথ হেঁটো।'

সুনন্দা ফিরিয়া চাহিল, এ সেই সকালের সুরেশবাবু। মদ্যপান করে বলিয়া লোকটার সহিত সে আর বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করে না: এবার কিন্তু সে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, 'অসভ্যতা করেন কেন যখন-তখন?'

'আহা, বল্‌ছি যে সব আশা তোমার এখনো মেটেনি, একটু সাম্‌লে। এটা কি আমার অসভ্যতা হোলো, সুনন্দা?'

'আপনার উপদেশ দেবার দরকার নেই।'

অত্যন্ত বিনয় করিয়া সুরেশবাবু কহিল, 'রাগ করো না সুনন্দা, পৃথিবীতে এখনো আছে কিছু বন্ধুত্ব, কিছু ভালোবাসা—হতাশ হবার কোনো কারণ নেই!'

সুনন্দা পিছন ফিরিয়া আবার চলিতে লাগিল।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

মহাপ্রস্থানের পথে

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

"মহাপ্রস্থানের পথে", যখন "ভারতবর্ষে" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন লেখাটি আমার চোখে পড়ে। লেখাটি আমার যে খুব ভাল লেগেছিল সে কথা আমি শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যালকে একখানি চিঠিতে জানাই।

কোনও তরুণ লেখকের গল্প যদি আমার খুব ভাল লাগে, তাহ'লে আমি কখনো কখনো সে কথা লেখককে জানাই, অবশ্য লেখকের সঙ্গে আমার যদি পরিচয় থাকে। এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যাল, আমার পরিচিত তরুণ লেখক।

"মহাপ্রস্থানের পথে" সম্প্রতি পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয়েছে, এবং আমি আবার বইখানি আগাগোড়া পড়েছি।

যে বই দু'বার পড়া যায় আর দুবারই পড়ে সমান আনন্দ পাওয়া যায়, সে পুস্তকের একটি বিশেষ গুণ আছে; সে গুণ হচ্ছে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করবার শক্তি।

হালফেসানের ক'খানি বই আছে, যা' দু'বার ত দূরে থাক্ একবারও তন্ময় হয়ে আদ্যোপান্ত পাঠ করা যায়?

আমি অবশ্য এস্থলে, নূতন ইংরেজী বইয়ের কথা বলছি, কারণ আমি আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের চাইতে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে বেশি পরিচিত।

আর তা'ছাড়া এযুগের অনেক ইংরেজী নভেল পড়ে' মনে হয় যে, লেখক গল্প লিখ্‌তে বসে প্রবন্ধ লিখেছেন। এঁদের লেখার ভিতর নানারূপ মতামত আছে নানা বিষয়ে তর্ক আছে, আর সম্ভবতঃ সে সব মতামত সত্য, এবং এঁদের যুক্তিরও খণ্ডন নেই; কিন্তু এই নতুন বিলিতি লেখকদের লেখায় যা নেই তা হচ্ছে কথাবস্তুর রস।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ কুমার সান্যালের "মহাপ্রস্থানের পথে" গল্পের বই নয়, ভ্রমণ বৃত্তান্ত। তিনি বলেন, বইখানি হচ্ছে ভ্রমণ-কাহিনী। এই নাম ঠিক।

এ পুস্তকে কি আছে? কি নেই, তা গ্রন্থকার নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা এই!—

"আজ আমার এই ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে যারা শুনতে চায় দেবতাগণের বর্ণনা মন্দিরের ইতিবৃত্ত নদী ও পর্ব্বতের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক চিত্র, কেদারনাথ ও বদরীনাথের প্রতি ভক্তজনের হৃদয়োচ্ছ্বাস, তাদের নিতান্ত ব্যর্থ হতে হবে। ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে থাকবে ভ্রমণ ও কাহিনী।"

আমার বিশ্বাস এ ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে, এক ইতিবৃত্ত ছাড়া অনেকই আছে। যদি না থাকৃত-ত বইখানি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হত না। আর আমরা এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়ে, ভ্রমণের কতকটা আনন্দ পেতুম না। লেখকের মনে কেদারনাথ ও বদরিনাথের প্রতি ভক্তজনের হৃদয়োচ্ছ্বাস হয়ত নেই, কিন্তু তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই ছিল, আর ছিল বলেই তাঁরা এই দুর্গম পথের অশেষ ক্লেশ উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। লেখক অবশ্য পুণ্য সঞ্চয় করবার লোভে এই বরফের দেশে যান নি, লেখার খোরাক যোগাড় করবার জন্যও নয়, তাহলে নদী-পর্ব্বতের বর্ণনা কবিজনোচিত হয়ে উঠত। অর্থাৎ তার ভিতর বস্তুর চাইতে কথা বেশী থাকৃত। সুতরাং কি উদ্দেশ্যে এই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন, তা পাঠকের কাছে অবিদিত। এই তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে আমাদের জাতীয় সংস্কার কি লেখকের অন্তরে প্রচ্ছন্ন ছিল না? কেদার বদরীর টান হচ্ছে একটা ideaর টান। দেবতাত্মা হিমালয় নামক নগাধিরাজের প্রতি মনের টান কালিদাসেরও ছিল, আমাদেরও আছে। আমাদের হিন্দুদের কাছে হিমালয় শুধু একটি বিরাট পর্ব্বত নয়, সেই সঙ্গে একটি বিরাট idea, আর বিরাট ideaর টান একরূপ চুম্বক-প্রস্তরের টান।

এ বই কাহিনীও বটে। এ কাহিনীও হচ্ছে তাঁর সহ-

যাত্রীদের কাহিনী। এই সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ গাঁজাখোর, কেউ ভবঘুরে, আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউ বেশ্যা, কেউ দাসী, কেউ বা আবার পূর্ণযৌবনা ভৈরবী। লেখক অতি অল্প কথায় কলমের দুই চার আঁচড়ে এদের ছবি এঁকেছেন, অথচ এরা প্রত্যেকেই এক একটি জ্যান্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। আমি জানিনে, এঁরা সত্যসত্যই প্রবোধকুমারের সহযাত্রী ছিল কিনা। যদি এঁরা সব তাঁর মন-গড়া লোক হয়, তাহলেও তারা প্রকৃত মানুষ হিসেবেই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রবোধকুমার বলেছেন যে, তিনি সাহিত্যিক দৃষ্টিতেই সব দেখেছেন। সাহিত্যিক দৃষ্টি যে কাকে বলে, তা' আমি জানিনে। কিন্তু সাহিত্যিক শক্তি বলে' মানুষের একরকম শক্তি আছে। যাকে চর্ম্ম চক্ষে অথবা কল্পনা চক্ষে দেখেছি তাকে কথায় সাকার ও সপ্রাণ করে তোলবার শক্তিই সাহিত্যিক শক্তি। এ শক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রবোধ কুমার এ পুস্তকে দিয়েছেন।

ফেরবার-পথে তাঁর সঙ্গিনী রাণীর কাহিনীটি সম্ভবতঃ কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এ গল্পটি অতি চমৎকার গল্প। ঘোড়ায় চড়ার গল্প বলে' নয়। এ কাহিনীর যিনি কেন্দ্র, সেই রাণী নামক মেয়েটি সাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

কেন যে অপূর্ব্ব যদি জানতে চান্ ত বইখানি পড়ে' দেখুন। এ কাহিনীর পটভূমি হিমালয় আমাদের গরম অথচ ভিজে স্যাঁতসেতে বাঙলাদেশ নয়। রাণীর অন্তরে আমরা সেই নির্ম্মল উদার আকাশ দেখতে পাই,—যা' মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রীদের চারিপাশে বিরাজমান ছিল। *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

* আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।



দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাঙ্গালীর কৃষ্টির ভবিষ্যৎ

লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আশঙ্কা করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের ক্রম বৰ্দ্ধমান ক্ষয়িষ্ণুতায় বাংলার সভ্যতা ও কৃষ্টি ভবিষ্যতে বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইবে।

বাঙ্গালী হিন্দুরা যে ক্ষয়িষ্ণু জাতি, এ চিন্তা আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক হইলেও, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় মাত্র নাই। আদমসুমারের বিভাগানুসারে, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৮২, মধ্যবঙ্গে ৫১, উত্তরবঙ্গে ৩১.৫ এবং পূর্ব্ববঙ্গে ২৮.৪ জন হিন্দুর বাস। ১৮৭২-১৯২১ পর্য্যন্ত ৪৯ বৎসরে জনসংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫.৯ হারে, মধ্যবঙ্গে ২৭.৮ হারে, উত্তরবঙ্গে ২৫.১ হারে, এবং পূর্ব্ববঙ্গে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) ৭২.৫ হারে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯০১—১৯১১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২.৮, মধ্যবঙ্গে ৫.১, উত্তরবঙ্গে ৮ এবং পূর্ব্ববঙ্গে ১২.৪ শতকরা হারে বাড়িয়াছে। ১৯১১-২১ এর মধ্যে সমগ্র বাংলায় জনসংখ্যা ২.০৮ হারে বাড়িয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে ৪.৯ হারে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

বাংলাদেশের জেলাগুলি দেখিলে, মৈমনসিং, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে আর অন্যদিকে ১৯১১-২১এর মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ১০.৪ ও বীরভূম জেলায় ৯.৪ জন করিয়া লোক কমিয়াছে।

কাজেই বাসস্থানের দিক দিয়া, হিন্দুদের বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিতে হইতেছে।

পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের অনেকগুলি জেলায় কৃষির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে এবং কর্ষিত ভূমির পরিমান অৰ্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া পল্লীগুলিকে ধ্বংস করিয়াছে। অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গ পরিমাণে ম্যালেরিয়া-মুক্ত এবং এখানে কৃষি ও জন সংখ্যার বৃদ্ধি বিস্ময়কর।

কিন্তু বাসস্থানের অসুবিধা ব্যতীত হিন্দুদের বংশক্ষয়ের অন্যান্য কারণও বৰ্ত্তমান রহিয়াছে। ১৯১১—২১এর মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে সমগ্র জন-সখ্যার বৃদ্ধি ৮.৩, কিন্তু হিন্দুদের বৃদ্ধি মাত্র ৪.৬; এই সময়ে উত্তরবঙ্গে সমগ্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি ১.৯, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষয়—৩.২; এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ৪.৯ হারে সমগ্র জনসংখ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু, হিন্দুদের ক্ষয় হয়—৫.২ হারে।

হিন্দুদের মধ্যে অসংখ্য বিভাগ, প্রতি বিভাগের মধ্যে আবার সংখ্যাতীত উপবিভাগ থাকায় এবং ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকায়; খুব অল্পসংখ্যক লোকের মধ্য বৈবাহিক আদানপ্রদান সীমাবদ্ধ এবং ফলে স্বগোষ্ঠির মধ্যে বিবাহের কুফল আমরা সর্ব্বত্রই ভোগ করিতেছি।

পুরুষের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা সমাজের সকল স্তরেই, বিশেষ করিয়া উচ্চস্তরে নিতান্ত কম। ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রতি ১০০ জন পুরুষে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৮৩ জন; এই ৮৩ জনের মধ্যে আবার ২৬জন বিধবা। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। *

হিন্দুদের মধ্যেও আবার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা কম। নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি যে-সকল সম্প্রদায় এখনও ভূমির সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ক হয় নাই, তাহারা এখনও অপেক্ষাকৃত বৰ্দ্ধিষ্ণু রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে, বাংলার জনসংখ্যায় হিন্দুদের অনুপাত বৰ্ত্তমান

* প্রতি একহাজার জন পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৈদ্য ৯২২, ব্রাহ্ম ৭৬৩, এবং কায়স্থ ৯০১।

কাল অপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইবে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ক্ষতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, বাংলার যে নবসৃষ্ট কৃষ্টি, তরুণ বাংলার আদর্শকে নূতনবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে, তাহার জীবনকে নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে, যাহার প্রভাব ভারতের অপরাংশকে স্পর্শ করিয়াছে এবং যাহার খ্যাতি ও গৌরব ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হইয়া তথাকার বহু গুণী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার সৃষ্টি এবং পুষ্টি বাংলার শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে। কাজেই, একথা অনুমান করা অন্যায় নহে যে, ইঁহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, রোগগ্রস্ত হইয়া অথবা অন্যবিধ কারণে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং নিরুদ্যম হইয়া থাকিলে, দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া জীবনীশক্তির অভাবে আত্মপ্রকাশে অক্ষম হইলে, বাংলার বর্ত্তমান কৃষ্টি অবনত হইতে পারে অথবা তাহা রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে। বাংলার বর্ণ হিন্দুদের ধ্বংস শুধু যে মাত্র বাংলার কৃষ্টির পক্ষে হানিকর হইবে তাহা নহে। ভারতের জাতীয় জাগরণের বিভিন্ন বিভাগে ইহাদের দান তুচ্ছ নহে; অনেক বিভাগে আজও ইহা অন্য কোনও প্রদেশ বা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনতিক্রান্ত রহিয়াছে। কাজেই কর্ম্মভূমি হইতে ইহাদের সম্পূর্ণ বা আংশিক অন্তর্ধান, ভারতের জাতীয়জীবনকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

আরও কয়েকটি দিক দিয়া কথাটিকে বিচার করিয়া দেখিবার আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সংখ্যায় যদি বিশেষ বর্দ্ধিত না হন, অথবা কিছু হ্রাস প্রাপ্ত হন, এবং সেই সময়ে অন্যেরা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হন, তবে দেশের সমগ্র জন-সমষ্টির মধ্যে তাঁহাদের আনুপাতিক সংখ্যা কমিয়া যাইবে এ কথা সত্য। কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান কৃষ্টির স্রষ্টা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা তাঁহাদের আনুপাতিক সংখ্যার বলে, ইহাকে গড়িয়া তুলেন নাই। অবশ্য, তাঁহাদের মোট সংখ্যার শক্তি ইহার মূলে নিশ্চয়ই ছিল এবং আছে। সেই মোট সংখ্যা যদি অনেকটা এক প্রকার থাকে, তবে, এই কৃষ্টির স্বাস্থ্য ও প্রকৃতিকে তাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবেন না কেন? বরং জাতীয় জীবনে সচেষ্টতা পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকতর হইয়াছে বলিয়া, এদিক দিয়া সুবিধাই হইবে। কিন্তু, দেশে অন্যেরা যে সময়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবেন, সে সময়ে যদি কোনও বিশেষ সম্প্রদায় ক্ষয় পাইতে থাকেন, তবে, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের জীবনীশক্তি ও সজীবতা বিশেষভাবে হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। জীবনীশক্তিহীন নির্জ্জীব কোনও সম্প্রদায় জাতীয় সম্পদকে সৃষ্টি অথবা রক্ষা করিতে পারে না। কাজেই, বাঙ্গালী হিন্দুরাও বাঙ্গালী কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবেন না।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গে অন্য দিক দিয়া আর একটি প্রশ্ন আছে। বাঙ্গালী হিন্দুরা যদি এই প্রকারের দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা বাঙ্গালী কাল্‌চারের বর্ত্তমান রূপকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। অথবা যদি তাঁহারা বর্ত্তমান বিপদ হইতে মুক্তি পান, তাহা হইলে ইহার বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবেন। বাংলার নব্য কাল্‌চারকে যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা জনসংখ্যার অত্যন্ত সামান্য অংশ। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, যে সকল সম্প্রদায় এতদিন সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্র এবং কৃষ্টির ক্ষেত্র হইতে দূরে ছিলেন, তাঁহারা ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিবেন। অনুন্নত হিন্দুরা এবং মুসলমানেরা যত অধিক সংখ্যায় শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন, ততই তাঁহাদের চিন্তার ছাপ এবং মনের রঙ ইহাকে বিভিন্নতা দান করিবে (উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বর্ত্তমান শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও)। কাজেই, যে-কোনও অবস্থায় বাংলার বর্ত্তমান কাল্‌চারের রূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইহার সহিত জনসাধারণের যোগ যতই ঘনিষ্ট হইবে, ততই বরং, ইহা অধিক পরিমাণে বাংলার নিজস্ব হইয়া উঠিবে।

কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুদের পূর্ব্বশক্তি যদি অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে, এই পরিবর্ত্তন, যে-প্রকার ধীরে ধীরে আসিত, অতীতের সহিত তাহার যে-প্রকার যোগ থাকিত, তাহাতে বলা যাইত, বাঙ্গালী হিন্দুদের দ্বারা সৃষ্ট কাল্‌চারই এই প্রকার পরিণতি লাভ করিয়াছে; তাহাকে এই নূতনরূপে চিনিতে কষ্ট হইত না। কিন্তু, এই কাল্‌চারের বর্ত্তমান উৎস যদি রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অগ্রগতি বন্ধ হইবার এবং রূপান্তর ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিবে।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবনতির সহিত যদি অন্যেরা শিক্ষায়

এবং দৃষ্টি প্রতিভায় তাঁহাদের স্থান পূরণ করিতে না পারেন, তবে রূপান্তর অপেক্ষা অগ্রগতি বন্ধ হইবার সম্ভাবনা অধিক থাকিবে।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অবনতি ঘটিলে, এই রূপান্তর এবং অবনতি কতটা ঘটিবার সম্ভাবনা ?

দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও সামাজিক অব্যবস্থার জন্য যে-ক্ষয় ঘটিবে তাহা সমাজকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিবে; একদিনে সমাজকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। কাজেই, অন্যেরা এই অবসরে প্রয়োজনানুযায়ী অগ্রসর হইতে পারিবেন আশা করা যাইতে পারে। যাঁহারা এই ক্ষেত্রে নূতন প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা সহজেই বর্ত্তমান আভিজাত্য ও কৃষ্টির আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবেন এবং ইহাকেই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিবেন। কাজেই, এখানে তাঁহাদের যে দান, তাহার মূলেও প্রত্যক্ষভাবে এই কৃষ্টিরই প্রেরণা এবং প্রভাব থাকিবে। এরূপ হইলে, যতটা পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করা যাইতেছে, ততটা না-ও ঘটিতে পারে।

এই আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের অবনতি ঘটিলে, বাংলার কাল্‌চার নিঃসন্দেহ বিপন্ন হইবে ও রূপান্তর পরিগ্রহ করিবে। কিন্তু, এই কারণ ব্যতীতও কতকটা রূপান্তর গ্রহণ ইহার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল এবং উক্ত কারণে যতটা রূপান্তর এবং অবনতি ঘটিবার আশঙ্কা করা যাইতেছে, ততটা না ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও মহাত্মা গান্ধীর উপবাস

অবরুদ্ধ অবস্থায় হরিজন সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী করিবার ইচ্ছানুরূপ সুবিধা না পাওয়ায় প্রতিবাদ স্বরূপ মহাত্মা গান্ধী উপবাস আরম্ভ করিলে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মামুদ, হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, এই ব্যাপারে হিন্দু সমাজের মধ্যে আশানুরূপ সাড়া জাগে নাই এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি করিয়াও গবর্ণমেণ্টের বিবেক জাগ্রত করিবার চেষ্টা করে নাই। অথচ, যদি এইরূপে মহাত্মার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে, হিন্দুরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিবে। এ বিষয়ে যে মুসলমানদেরও দায়িত্ব আছে, সে কথা স্বীকার করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের কথা তিনি ইচ্ছা করিয়া উল্লেখ করেন নাই, কারণ তাহারা দেশ-সেবার কোনও প্রকার দাবী করে নাই। ডাঃ মামুদ একথাও বলিয়াছেন যে, তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে, মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় কোনও মুসলমান নেতাকে, মুসলমানেরা কখনই নিঃসহায়ভাবে মরিতে দিত না।

মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বজনমান্য রাষ্ট্রনৈতিক নেতা, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা জাগ্রত ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, বর্ত্তমান যুগের আর কাহারও কার্য্যের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। হিন্দুরাও ভারতীয় জাতির অংশ; এইজন্য ভারতবাসী হিসাবে মহাত্মার প্রতি বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যের ত্রুটি যদি তাঁহাদের ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহাদের সেই কলঙ্ক সহজে ক্ষালনীয় নহে। সেজন্য তাঁহারা সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নিকট নিন্দনীয় হইবেন।

কিন্তু মহাত্মাজী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক নেতা নহেন। তিনি যাহা করিয়াছেন, অথবা বলিয়াছেন, তাহা কখনই কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য উদ্দিষ্ট হয় নাই। কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তিনি কোনও সুবিধা বা অধিকার চাহেন নাই। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু সমাজের উপকার হইলেও, সমগ্র ভারতীয় জাতিই লাভবান হইবে। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু সমাজের লোক, এজন্য হিন্দু সমাজের প্রতিও হয়ত তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য রহিয়াছে, এবং তিনি এদিক দিয়া কিছু করিয়া থাকিলে, হিন্দুদেরও তাঁহার প্রতি কিছু কর্ত্তব্য থাকিতে পারে, কিন্তু, ইহা সর্ব্বথা গৌণ, কখনই মুখ্য নহে। তাঁহার অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ কার্য্যকে যদি সাম্প্রদায়িক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে, এ কথাও বলা যায় যে, খিলাফৎ আন্দোলনকে মহাত্মাজী যেভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে মুসলমানদিগেরও তাঁহার প্রতি সাম্প্রদায়িক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বরং খিলাফৎ আন্দোলনে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লাভ কিছু ছিল না; শুধু মাত্র মুসলমানদিগের ধর্ম্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই তিনি এরূপ করিয়াছিলেন।

মুসলমানেরা অনুরূপ ক্ষেত্রে যে, নিজ সম্প্রদায়ের কোনও নেতাকে নিঃসহায়ভাবে মরিতে দিতেন না, একথা বলিয়া ডাঃ মামুদ নিজের প্রতি ও নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। সমগ্র মুসলমান সমাজের নিকট যে জাতীয়তার কোনও মূল্য নাই, জাতীয় নেতাদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ নাই, শুধু মাত্র তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি দ্বারা চালিত হন এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদেরই মাত্র সম্মান ও সমর্থন করিতে পারেন, এ অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনয়ন করিতে কোনও অমুসলমান ইচ্ছুক হইবেন না।

ইহা ব্যতীত এই ব্যাপারটির আরও একটা দিক আছে। অন্য সকল কথা বাদ দিয়া, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার লোকোত্তর ধর্ম্মনিষ্ঠ চরিত্র, মানবপ্রীতি, গভীর আন্তরিকতা, নিজের বিশ্বাসানুযায়ী জীবন যাপন ও সেজন্য বিপুল দুঃখ-বরণের জন্য সকল দেশের সকল সমাজের লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবিত লোক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন (ডাঃ মামুদও ইহা স্বীকার করিয়াছেন)। এদিক দিয়া তিনি কোনও বিশেষ সমাজের লোক নহেন। তাঁহার প্রতি কৃত অবিচারের প্রতিবাদ করিবার দায়িত্ব সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল মতের এবং সকল দলের সমান।

বিহারী বাঙ্গালীদের অভিযোগ

কোনও দেশের সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ, পারিবারিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত অধিকার, ভাষা, সাহিত্য ও কৃষ্টির বিকাশের পূর্ণ সুযোগ যাহাতে অব্যাহত থাকে, দেশের অন্য বা অন্যান্য সম্প্রদায় যে সকল সুখ সুবিধা ভোগ করেন, তাহার কোনওটি হইতে সংখ্যাল্পতার জন্য যাহাতে ইঁহারা বঞ্চিত না হন, তাহার ভাল, কার্য্যোপযোগী এবং যথাযথ ব্যবস্থা করিবার নৈতিক দায়িত্ব সেই দেশের রাজসরকারের আছে। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘে বিশেষ বিধি সমূহ অবলম্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্রে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা লইয়া, অনেকের বিবেচনায় প্রয়োজনাতিরিক্ত কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় কোনও প্রদেশে কোনও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি ঘটিলে, তাহাতে ক্ষোভের সঞ্চার হইতে পারে।

কোনও সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা যত কমই হউক, তবুও তাঁহারা পূর্ণ অধিকার দাবী করিতে পারেন; কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য সঙ্গত ব্যবস্থার উপর বহু লোকের ভাগ্য নির্ভর করে বলিয়া, এই দাবীর জোর আরও অনেক বাড়িয়া যায়।

কোনও প্রদেশের কোনও সংখ্যাল্প সম্প্রদায় কোনও সুবিধা পাইয়া থাকিলে (বিশেষ কারণ ব্যতীত), অন্যান্য প্রদেশের সকল সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ই তদ্রূপ সুবিধা ন্যায়সঙ্গত ভাবে চাহিতে পারেন। কোনও প্রদেশের কোনও এক সম্প্রদায় নিজেদের সংখ্যাল্পতার জন্য যে-সকল সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন সেই প্রদেশে তাঁহাদের সমসংখ্যক অন্য কোনও সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই সকল সুবিধা সেই পরিমাণে না পাইলে, তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অবিচার করা হয়। এই অবিচারের প্রতিকারের জন্য সকল সম্প্রদায়ের ন্যায়পরায়ণ লোকদের চেষ্টা করা উচিত। যাঁহাদের উপর অবিচার হইয়াছে, তাঁহাদের এবং এই ব্যাপারে যাঁহাদের স্বার্থের সংস্রব আছে, তাঁহাদেরও বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে। আমরা বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙ্গালীদের কথা মনে করিয়া এ সকল কথা বলিতেছি।

বিহারের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৩ জন বাঙ্গালী (বিহারী)। এই প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যা ইঁহাদের অপেক্ষা অধিক নহে। কাজেই, ইঁহারা সহজেই সবদিক দিয়া তাঁহাদের তুল্য অধিকার পাইতে পারেন। শিখেরা পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১১ অংশ; মুসলমানেরা বঙ্গে, বর্ম্মা, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজের মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে মাত্র শতকরা ১৯,৩,৪, ও ৬ অংশ। এই শেষোক্ত প্রদেশ সমূহে শিখ ও মুসলমানেরা যে সুবিধা ও অধিকার পাইয়াছেন, এখানকার বাঙ্গালীরা তাহা পাইতে পারেন।

প্রকাশ, বাঙ্গালীরা এখানে শিক্ষা এবং চাকরির দিক দিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে অবাঙ্গালীরা যে সুবিধা পান, ইঁহারা তাহা হইতে

বঞ্চিত। ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিক্যাল, এমন কি, সাধারণ বিভাগেও তাঁহাদের প্রবেশ বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ। কোনও বাঙ্গালী ছেলের ভাগ্যে বৃত্তি জুটিলেও, তাহাকে তাহা দেওয়া হয় না। বাঙ্গালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ, অর্থ এবং সহানুভূতির অভাবে চালান দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। সরকারি এবং বেসরকারি চাকরিতে কদাচিৎ কোনও বাঙ্গালীকে গ্রহণ করা হয়। অভারতীয় কোনও বিদেশীও যেটুকু সুবিধা পাইবার আশা করিতে পারেন, এই প্রদেশবাসী একজন বাঙ্গালী তাহা পান না।

বিহার কাউন্সিলে মুসলমানদিগের জন্য ৪০টি পদ (১৫২র মধ্যে) রক্ষিত হইয়াছে, পাঞ্জাবে শিখদের জন্য ৩২ (১৭৫ এর মধ্যে), বঙ্গে মুসলমানদের জন্য ৩০, মধ্য প্রদেশে মুসলমানদের জন্য ১৪ (১১২র মধ্যে) এবং মাদ্রাজে মুসলমানদের ২৯টি পদ রক্ষিত হইয়াছে।

এদিক দিয়া বিহারী বাঙ্গালীদের সর্ব্বপ্রকার দাবী অস্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলার প্রতি আর্থিক অবিচার

বাংলার প্রতি নানাদিক দিয়া যে-সকল অবিচার হইয়াছে, আর্থিক অবিচার যে তাহার মধ্যে প্রধান, এবং ইহাই বাঙ্গালীর উন্নতির পক্ষে যে অন্যতম প্রধান অন্তরায়, সেকথা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মুখোপাধ্যায়, ওভারটুন্ হলের বক্তৃতায় বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্বের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের প্রদেশ সমূহের মধ্যে বাংলা সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী। ইহার মোট রাজস্ব প্রায় ৩৭ কোটি টাকা ;—অন্যপক্ষে মাদ্রাজের ২৫ কোটি টাকা, যুক্তপ্রদেশের ১৫½ কোটি টাকা এবং পাঞ্জাবের মাত্র ১২ কোটি টাকা।

কিন্তু, ভারতসরকারের অসম্ভব দাবীর ফলে, বাংলাই দরিদ্রতম প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। মেষ্টনী ব্যবস্থানুসারে, বাংলা তাহার ৫ কোটি লোকের অভাব মিটাইবার জন্য মাত্র ১১ কোটি টাকা পায়, অথচ, বম্বে ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের জন্য ১৫ কোটি, মাদ্রাজ ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোকের জন্য ১৭½ কোটি এবং পাঞ্জাব তাহার ২ কোটি লোকের জন্য ১১ কোটি টাকা পায়। অর্থাৎ, সরকার প্রত্যেক মাদ্রাজীর জন্য বৎসরে ৪৲ বম্বেবাসীর জন্য ৮৲, পাঞ্জাবীর জন্য ৫।।০, এবং বাঙ্গালীর জন্য মাত্র ২।।০ ব্যয় করেন।

ইন্‌কামট্যাক্স বিভাগে ভারত সরকারের মোট আয়ের শতকরা ৩৬ ভাগ, অর্থাৎ ৬ কোটি টাকা বাংলা হইতে গৃহীত হয় ; অন্যদিকে যুক্তপ্রদেশ হইতে মাত্র ৯০ লক্ষ, মাদ্রাজ হইতে ১½ কোটি এবং বম্বে হইতে ৩½ কোটি নেওয়া হয়।

এই অন্যায় ব্যবস্থার সমর্থনে বলা হইয়া থাকে যে, বাংলার ইন্‌কামট্যাক্স, উত্তর পশ্চিম ভারতের ব্যবসা হইতে সংগৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবিচারের ফলে, জনহিতকর কাজ সমূহে বাংলা মাত্র ৪ কোটি ব্যয় করিতে পারে, মাদ্রাজ ৭½ এবং পাঞ্জাব প্রায় ৫½ কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারে। অর্থাৎ জনপ্রতি বাংলা মাত্র ৵৹, বম্বে ৩৲, এবং পাঞ্জাব ২৷৹ ব্যয় করিতে পারে।

ইহা ব্যতীত, বাংলাভাষী যে-সকল অঞ্চলকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে, সেগুলি বাংলার সহিত যুক্ত হইলে, বাংলার আয় অন্ততঃ আরও ২ কোটি টাকা বাড়িয়া যাইবে।

বাংলার প্রতি সুবিচার করিতে হইলে, পাট রপ্তানি শুল্কের সমগ্র টাকা বাংলাকে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আয়করের যে অংশ, সম্পূর্ণভাবে যাহা এই প্রদেশের ব্যবসা, তাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা, এই প্রদেশবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, বা পরিচালিত ব্যবসা, শিল্পাদি হইতে সংগৃহীত হয়, তাহা বাংলাকে দিতে হইবে ; এবং অন্যান্য প্রদেশগুলির সহিত তুল্যরূপে, প্রাদেশিক আয়, জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাংলার আর্থিক ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জাপান ও আমাদের বিদেশগামী ছাত্র

বর্ত্তমান সভ্যতার কেন্দ্র হইতেছে ইউরোপ। ইহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, প্রাচীন বা আধুনিক এমন কোনও সভ্যতা বর্ত্তমানে নাই। জাপান ও তুর্কী ইউরোপের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া উন্নত ও শক্তিশালী হইয়াছে ; পারস্য ও আফগানিস্থান ইউরোপকে

ক্রুত অনুকরণ করিতেছে। আমরা একটি বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, এবং ইহাও সত্য যে, এই সভ্যতার অনেক দান সযত্নে রক্ষা করিবার মত মূল্যবান। তাহা হইলেও, যন্ত্রবিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানের সহায়তায় যে প্রভূত শক্তি মানুষের আয়ত্ত হইয়াছে, মানবজীবনের যে সকল সমস্যার নবতন সমাধান হইয়াছে, অথবা, তাহার জন্য চেষ্টা ও পরীক্ষা চলিতেছে, তাহার জন্য আমাদিগকে ইউরোপের দ্বারস্থ হইতে হইবে। এজন্য ইউরোপের নানাদেশের বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে আমাদের বিদ্যার্থীদিগকে পাঠাইবার প্রয়োজন আছে। সাধারণ বিদ্যা অপেক্ষা, নানাপ্রকার বিশেষ বিদ্যা, শিল্প ও যন্ত্রবিজ্ঞানে পারদর্শী হইবার জন্যই ছাত্রদের যাওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় যে বিদ্যার্থীরা ইউরোপের বিদ্যাকেন্দ্র সমূহে যাইতেছেন, ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে শুভ লক্ষণ।

কিন্তু, এদিকেও কিছু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। ছাত্রদের বিদেশে পড়াইবার জন্য যে টাকাটা দেশকে দিতে হয়, সে টাকাটা দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় বলিয়া দেশ এজন্য দরিদ্রতর হয়। প্রতিবৎসর এইরূপে দেশ হইতে অনেক টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কাজেই, যে-সকল বিদ্যাশিক্ষা করিবার ভাল ব্যবস্থা এদেশে আছে, তাহার জন্য বিদেশগমন যুক্তিযুক্ত নহে। যে-সকল বিদ্যা যে পর্য্যন্ত এখানে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সে পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, তদপেক্ষা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষার জন্যই মাত্র যাওয়া উচিত। যে-সকল ছাত্র প্রতিভাবান, ও অধিতব্য বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী শুধুমাত্র তাঁহারাই বিদেশে গেলে, একদিকে যেমন অর্থব্যয় কম হয়, অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গালী ছাত্রের সুনামও বর্দ্ধিত হয়। আমাদের নেতৃস্থানীয় বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সাধারণ ছাত্রদের দলে দলে বিদেশে যাওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, লণ্ডনের হাইকমিশনারও এই প্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে আমাদের ছাত্রেরা শুধুমাত্র বিলাতে যাইতেন; এখন ইউরোপের বিভিন্নদেশে যাইতেছেন। কিন্তু, ইউরোপে যাইবার ও সেখানে থাকিবার গুরুব্যয়ভার বহন করিবার সাধ্য আমাদের অধিকাংশ ছাত্রেরই নাই। এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও শ্রমশিল্প শিখিতে ইচ্ছুক ছাত্রেরা জাপানের কথা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। জাপানে যাইবার ভাড়া অল্প, এবং টোকিওতে থাকিবার খরচা কলিকাতা অপেক্ষা অধিক নহে। জাপান অতিশয় অল্প সময়ের মধ্যে, কি করিয়া ইউরোপীয় জাতিদের সমকক্ষ হইয়া উঠিল, তাহার ইতিহাস এবং সেই সকল শক্তির ক্রিয়াশীলতার সংস্পর্শ আমাদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং লাভজনক হইতে পারে। শ্রমশিল্পের প্রতিযোগিতায়, জাপান পাশ্চাত্য জাতিগুলিকেও হটাইয়া দিতেছে, কাজেই, এ সকল বিষয়ে এদেশের কার্য্য প্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী ও পরিচালন কৌশল প্রভৃতি কার্য্যকরী ও আমাদের দেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইবার সম্ভাবনা আছে।

জাপান প্রবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু জাপানগামী ছাত্রদের জ্ঞাতব্য কয়েকটি সংবাদ, সংবাদপত্র যোগে প্রকাশ করিয়াছেন; কিছু মন্তব্যসহ, তাহার কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বক্তৃতা উপদেশাদি জাপানি ভাষায় প্রদত্ত হয়, পাঠ্য পুস্তকাদিও এই ভাষায় লিখিত। কাজেই, বিদ্যার্থীদের জাপানি ভাষায় কিছু জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

জাপান দেশীয় ভাষাকে আধুনিক কালোপযোগী করিয়া লইয়া তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বাহন করিয়াছে, বিজ্ঞান শিক্ষায়ও পাঠ্যপুস্তক লিখনে ইহাকেই নিযুক্ত করিয়াছে এবং তাহার ফলে শিক্ষা সমাজের সর্ব্বস্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, দেশীয় ভাষা প্রবর্ত্তন সম্পর্কে, জাপানের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

২। কলিকাতার থ্যাকার, স্পিঙ্ক এণ্ড কোং এর জাপানিজ সেলফ্ টট্ সিরিজের বইগুলি জাপানি শিখিবার পক্ষে সহায়তা করিবে, যদিও জাপানের কথিত ভাষা শিখিবার জন্য অন্ততঃ ৬ মাস কাল জাপানে থাকিতে হইবে। জাপানে যাইবার পূর্ব্বে ভাষা কিছু শিখিয়া যাওয়া সুবিধা।

৩। টোকিওর এসিয়া লজে থাকিলে (ভারতীয় প্রথার নিরামিষ খাইবার ব্যবস্থা) আহার ও বাসস্থানের মোট ব্যয় মাসিক ২০র মধ্যে হইতে পারে। অন্যান্য সহরে (জাপানি খাবার খাইতে হয়) ২৪৲—৩০৲ পড়িতে পারে। টোকিও সহরের মধ্যে ভ্রমণাদির ব্যয় ৮৲র অধিক নহে।

কাজেই, এখানকার ব্যয় কলিকাতার সমান অথবা সামান্য কিছু বেশী হইতে পারে।

৪। পড়িবার খরচা ধরিয়া সর্ব্বসমেত মাসিক ৬০৲র কাছাকাছি পড়িতে পারে—অবশ্য কোনও বিশেষ শিল্পাদি শিখিবার ব্যয় ইহার অন্তর্গত নহে।

৫। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে এখানে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব নহে।

৬। ভারতীয় ছাত্রেরা এখানে সহজে নানাবিধ শিল্প-শিক্ষা করিতে পারেন। এখানে, সেলুলয়েড, রবার, বার্ণিশ, কাঠ খোদাই, চিত্রণ, ব্রাস প্রস্তুত, রেশম ও কার্পাস শিল্প, মৃৎশিল্প, পোর্সেলিন, সিমেণ্ট, কাচ, সাবান, ম্যাচ, সূচীশিল্প, পূর্ত্তবিদ্যা, দন্ত চিকিৎসা, খোদাই, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত, খাদ্য-রক্ষা, সমুদ্রজাত দ্রব্যাদির শিল্প ইত্যাদি এখানে শিখিবার সুবিধা আছে। বায়ুপোত চালনা শিক্ষার খরচা প্রায় তিন হাজার টাকা। এ সকল শিখিবার জন্য মোটামুটি চারি বৎসর সময়ের আবশ্যক হইতে পারে।

৭। এখানে শীত খুব তীব্র; কাজেই, শীতের পোষাকের জন্য ২৫০৲—৩০০৲ ব্যয় হইতে পারে।

৮। জাপান যাইবার ভাড়া, খাদ্যসহ তৃতীয় শ্রেণী ১৭৫৲, দ্বিতীয় শ্রেণী ইহার দ্বিগুণ, ও ১ম শ্রেণী তিনগুণ।

যাঁহারা দেশ ভ্রমণ হিসাবে ভারতের নানাপ্রদেশে বেড়াইয়া থাকেন, ছাড়পত্র যোগাড় করিয়া, তাঁহাদের কেহ কেহ সমান খরচায় জাপান বেড়াইয়া যাইতে পারেন।

যুক্ত কমিটির নিকট ভারতীয় মহিলাদের যুক্ত নির্ব্বাচনের জন্য প্রার্থনা

ভারতের নানা মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে রাজকুমারী অমৃত কাউর, মিসেস হামিদ আলী, মিসেস পি, কে, সেন ও মিসেস এল, মুখার্জী যুক্ত নির্ব্বাচনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মহিলারা ইহার পূর্ব্বেও বরাবর সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিরোধিতা করিয়াছেন।

পুরুষেরা, সঙ্কীর্ণতা, সন্দিগ্ধতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য যে-কল্যাণকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, মহিলারা যে, তাঁহাদের স্বাভাবিক উদারতা বশতঃ দৃঢ়তার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের অনেক নিরাশা ও দুঃখের মধ্যে ইহা তবুও কিছু আশার কথা।

বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের সম্মান

শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি মানুষকে জাতি, বর্ণ, দেশ, আচার প্রভৃতির পার্থক্যের, স্বার্থের বিরোধের এবং শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানের উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান দুর্গতির যুগেও যে, ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছে, তাহাতে এই কথাই সমর্থিত হইয়াছে। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর, পাশ্চাত্যদেশে ভারতবর্ষীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধির একটা বিশেষ দিকের পরিচয় দিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন।

লাহোর মিউজিক এসোসিয়েসনের সভাপতির সঙ্গীতে ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা মুসোলিনী এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি গায়কদের নিকট যাইয়া ভারতীয় পদ্ধতিতে মেঝেয় উপবেশন করিয়াছিলেন। ভারতীয় গায়কেরা ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের নানা শ্রেণীর গুণীলোকদের বাহিরে প্রচারের দ্বারা, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকে কার্য্যতঃ বাধা দেওয়া যাইবে।

ক্রীতদাসত্ব উচ্ছেদের শত বার্ষিকী

মহামতি উইলবার ফোর্সের চেষ্টায় ১৮৩৩ সালের ২৯শে জুলাই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে দাসব্যবসায় উচ্ছেদসূচক আইন পাশ হয় এবং ঐদিনই উইলবার ফোর্স পরলোক গমন করেন। এই ঘটনাদ্বয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ২৯শে জুলাই ইংলণ্ডের হাল সহরে এক আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

অর্থের মূল্যে মানুষ ক্রয় করিবার ও তাহারই বলে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার জীবন ও স্বাধীনতার উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার থাকার ন্যায় বর্ব্বর, নিষ্ঠুর ও অমানুষিক

প্রথার অস্তিত্বের কথা, বর্ত্তমান সভ্যমানুষের কল্পনাতীত। মানবসভ্যতাকে, যে-কত বিপুল বিরুদ্ধতা জয় করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে হইয়াছে, ইহা তাহাই প্রমাণিত করে, এবং বর্ত্তমানের গ্লানিকর সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক ও অন্যবিধ ব্যবস্থার সম্মুখীন হইবার সাহস, উৎসাহ ও আশা দান করে। সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ নৈতিক-শক্তি যেদিন প্রকাশ্যে মানুষের এই নীচ স্বার্থলোলুপতার উপর জয়লাভ করিল, সভ্যতার ইতিহাসে তাহা বিশেষ স্মরণীয় দিন। শতবর্ষ পরে, মানবপ্রগতির এই সর্ব্বপ্রধান জয়স্তম্ভকে আমরা নমস্কার করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করি যে, আজও মানব-সমাজ এই পাপ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই। এখনও ধনীর নিকট দরিদ্রের প্রবলের নিকট দুর্ব্বলের, পুরুষের নিকট নারীর দাসত্বের উচ্ছেদ হয় নাই; পৃথিবীর বহুসংখ্যক কারখানায় কলঘরে আপিসে ও ক্ষেত্রে সংখ্যাতীত নরনারী আজও পশুবৎ জীবনযাপন করিতেছে।

পৃথিবীর সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে, নারীর অধীনতা অধিকারখর্ব্বতা ও অসম্মান বিভিন্ন আকারে রহিয়াছে, এবং তাহার উচ্ছেদের জন্য পৃথিবীব্যাপী চেষ্টা নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু, আমাদের দেশে এইজন্য ইহার রূপ অতিশয় ভয়াবহ, ঘৃণ্য ও দাসত্বপ্রথার অনুরূপ যে, এখানে নারীর সামান্য মাত্র আর্থিক স্বাধীনতা, গতিবিধির স্বাধীনতা, এবং পারিবারিক ও সমাজিক তুল্যাধিকার না থাকায়, তাহাকে দৈনন্দিন জীবনেও সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও সর্ব্বতোভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। ইচ্ছা করিলেও যে অবস্থার মুক্তিগ্রহণ করা যায় না, ক্রীতদাসত্বের সহিত আকারগত প্রভেদ থাকিলেও, যে অবস্থার প্রকৃতিগত প্রভেদ নাই, আমাদের এই গ্লানি অপনোদনের জন্য, বিশ্বমানবের এবং সভ্যতার ঋণ পরিশোধের জন্য, আমাদিগকে এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে, সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা ও অন্য নানাবিধ গুণ সম্পর্কে মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, থাকা স্বাভাবিক, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে রহিয়াছে, তাহাদের সেজন্য কোনও প্রকার অসুবিধা, সুযোগের অভাব, দুঃখ অথবা অসম্মান ভোগ করা স্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত অথবা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। কিন্তু, বোধহয় এক রাশিয়া বাদে, পৃথিবীর সব দেশেই এই অন্যায় অবস্থা কোনও না কোনও আকারে রহিয়াছে। আমাদের দেশে আবার ইহা লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং জন্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, ইহার অনিষ্টকারিতা ও শক্তি অত্যন্ত অধিক। যতদিন আমরা এই পাপকে সমূলে এবং সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে না পারিব, ততদিন পৃথিবীর নিকট আমাদের লজ্জা দূর হইবে না।

এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুইজন মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মার মহদ্বাণীর কিয়দংশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"...কিন্তু, আমাদের ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ বীভৎস প্রথা অদ্যাপি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় নাই; আজিও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দাসত্বপ্রথা বর্ত্তমান—উহার নাম আজ শ্রুতিগোচর হয় না বটে, (কিন্তু) সেই মনোবৃত্তি পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে।.....

অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, একদল লোক, তাহাদের স্বার্থ-পরায়ণ উদ্দেশ্য সাধন কল্পে, নির্ম্মমভাবে স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিয়া মনে করে, তাহারা পরম অনুকম্পাশীল আদর্শ অনুসরণ করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথ

"যাহাদের প্রচেষ্টায় দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাদের নিকট আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার আছে। কারণ, আমাদের দেশের দাসত্বপ্রথা তথাকথিত শাস্ত্রানুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ইহা পাশ্চাত্য দাস-প্রথা অপেক্ষা বিষময়।"

মহাত্মা গান্ধী

রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধু খাঁর সৎকার্য্যে দান

যশোহর জেলার কেশবপুর হইতে, খুলনা জেলার কপিলমুনি পর্য্যন্ত ১৮ মাইল রাস্তা পাকা করিয়া দিবার জন্য,

কলিকাতার প্রসিদ্ধ তৈল ব্যবসায়ী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী সাধু খাঁ যশোহর ও খুলনার জেলাবোর্ডদ্বয়ের হাতে একলক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনি স্বীয় জনপল্লীর উন্নতি কল্পে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বহু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সহচরী বিদ্যামন্দির, (হাইস্কুল) অমৃতময়ী টেক্‌নিক্যাল স্কুল, অনেকগুলি রোগী থাকিবার ব্যবস্থাযুক্ত, আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত হাসপাতাল, সার্ব্বজনীন দেবালয় এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কপিলমুনিতে স্বীয় নামে একটি গঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিয়া, ইনি নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

একে, আমাদের দেশে ধনীলোকের সংখ্যাই কম। তাহাও আবার অর্থের সহিত, দানের ইচ্ছার সংযোগ অত্যন্ত বিরল। শ্রীযুক্ত সাধু খাঁর মধ্যে যে এই বিরল-সংযোগ ঘটিয়াছে এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। পল্লীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ এবং তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রভূত অর্থব্যয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ও সকল সম্পদশালী লোকেরই অনুকরণীয়।

স্বর্গীয় সার বিপিনকৃষ্ণ বসু সি, আই-ই

ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে বাংলার সর্ব্বাগ্রবর্ত্তিতা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সন্দেহ থাকিলেও, গত শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীরাই যে ভারতের নানাপ্রদেশে শিক্ষার আলোক ও জাগরণের প্রেরণা লইয়া গিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য। অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক ও উকিল হইয়া এবং বিদ্যাসাপেক্ষ নানাপ্রকার সরকারি চাকরি লইয়া যে-সকল বাঙ্গালী বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সকল প্রদেশের জাতীয়জীবন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিতে অগ্রণী লোকদের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীদের প্রতি অন্য অন্য ভারতীয়দের মধ্যে যে বিদ্বেষ সম্প্রতি দেখা যাইতেছে, তাহা সকল প্রদেশে বাঙ্গালীদের অবাধ প্রতিপত্তির প্রতি ঈর্ষা সঞ্জাত হইতে পারে।

কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে যে পুরুষের (generation) লোকেরা এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গতপ্রায়; তাই সার বিপিনকৃষ্ণ বৃদ্ধবয়সে (৮৩) পরলোক গমন করিলেও, তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী লোকের তিরোধানে, প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ যে বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, সেজন্য আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

মধ্য প্রদেশের এমন কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার গঠনে ও উন্নতিতে বসু মহাশয় সহায়তা করেন নাই। তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং ১৮৯৮ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের তিনিই একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন।

কিন্তু নাগপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। তাঁহারই চেষ্টায়, ১৯২৩ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং তিনিই ইহার প্রথম ভাইস্‌চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯২৯ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

একজন বাঙ্গালীর চেষ্টায় ও উদ্যমে যে অন্যপ্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা।

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিমিটেড বিমান বিদ্যা শিক্ষা-দানার্থ যে তিনজন ভারতবাসীকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে বেঙ্গল ফ্লাইংক্লাবের মিঃ কে, এন চৌধুরী অন্যতম।

তিনি এই মাসেই বিলাতযাত্রা করিবেন। তথায় তিন বৎসর শিক্ষালাভান্তে, বাগদাদে বা সিঙ্গাপুরে বিমান পথের ট্রফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন।

মিঃ চৌধুরী সিটি কলেজের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর; নিবাস রাজসাহী জিলার নওগাঁয়ে। রাজসাহী বিভাগে তিনিই একমাত্র বৈমানিক।

'বঙ্গবাণী'

বঙ্গে নারীহরণ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বাংলার অপহৃতা হিন্দুরমণীদের সংখ্যা ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ইহার উত্তরে সার উইলিয়ম প্রেন্টিস্ জানান্ যে, বিশেষভাবে কেবলমাত্র হিন্দু রমণীদের সম্বন্ধে পৃথক

হিসাব রাখা হয় নাই। ১৯৩২ সালে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ২৬০টি অভিযোগের মোকর্দ্দমা আনয়ন করা হয়, তাহার মধ্যের ৬১টি মামলায় আসামীরা মুক্তি পায় এবং ৬৮টি মামলায় আসামীদের শাস্তি হয়।

কিন্তু, এই সংখ্যা হইতে নারীহরণের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। বাংলাদেশে যত নারী দুর্ব্বৃত্তদিগের দ্বারা নির্য্যাতীতা হন, নানাকারণে তাহার অধিকাংশগুলি পুলিশের গোচরীভূত করা সম্ভব হয় না এবং পুলিশের সাহায্যে যে-সকল স্থানে প্রতিকারের চেষ্টা হয়, তাহার মধ্যেও অল্পসংখ্যক ব্যাপারেই মামলা আনয়ন করা সম্ভব হয়।

কথিত সময়ে যশোহরে মাত্র ৫টি নারীহরণের অভিযোগের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু, 'দেশের কথা'র লেখক অবগত আছেন যে, এই সময়ে এক যশোর সদর মহকুমায় অন্ততঃ ইহার তিনগুণ নারী নির্য্যাতীতা হইয়াছিলেন। পাঁজিয়া হইতে হিন্দুসভার কর্ম্মীগণ ইহাদের অনেকের উদ্ধার সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা আনয়ন করিতে পারেন নাই। এইরূপ ব্যাপার বাংলাদেশের সর্ব্বত্র ঘটিয়াছে, এবং ঘটিয়া থাকে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং অপরাধীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ব্যতীত, এই অপরাধ দমন করা যাইবে বলিয়া, এই ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল লোকেরা মনে করেন না।

যুক্তরাজ্যের কান্‌সান্‌ সহরে, এক নারীহরণকারী জুরীর বিচারে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। নারী ও পুরুষ হরণকারীগণের প্রাণদণ্ড বিধানের জন্য যুক্তরাজ্যে আইন প্রণয়নের ও এই অপরাধ দমনের জন্য একটি ফেডারেল বাহিনী গঠনের প্রস্তাব স্বীকৃত হইয়াছে।

বাংলাদেশেও অনুরূপ কোনও উপায় অবলম্বন করা যায় কিনা, তাহা সরকার ও দেশের লোকের ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

নারীরক্ষা সপ্তাহ

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে, নারীরক্ষা সপ্তাহ পালন করিবার জন্য হিন্দুসভার নারীরক্ষা শাখা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে সতর্ক রক্ষীদল গঠন, সর্ব্বত্র জনসভা আহ্বান, অপহরণকারী দুর্ব্বৃত্তদের অধিকতর শাস্তিবিধান পুলিশের অধিকতর কার্য্যতৎপরতার জন্য মন্তব্য গ্রহণ এবং বিশেষ করিয়া নারীরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যতালিকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সুশীলকুমার বসু

"বিতর্কিকা"

১। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী

আমার মনে হয় বাঙালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে আমাদের ভাব্‌বার সময় এসেছে। কাব্যে, চিত্র-শিল্পে, স্থাপত্যে, কারুকার্য্যে এবং নৃত্যকলায় যে নব জাগরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা'র শক্তির স্পর্শ আমাদের অঙ্গ-সজ্জাকে অতিক্রম ক'রে যাবে এমন সম্ভব বা স্বাভাবিক হ'তে পারে না। আমার মনে হয় আমরা যে অর্দ্ধ-দেশী অর্দ্ধ-বিলাতী পোষাক পরি তা'র হাস্যকরতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ধুতির সঙ্গে সার্ট, কোট, সময় সময় ওয়েষ্টকোট্‌, কোটের বা সার্টের ওপর উড়্‌নী, কিংবা পায়ে ডার্‌বি জুতো অত্যন্ত বেমানান এবং তাদের মধ্যে আমাদের স্বজাতীয়তা বা আর্ট কিছুই নেই। হয় সম্পূর্ণ বিলাতী, নয় সম্পূর্ণ দেশী পোষাক পরাই বাঞ্ছনীয়। আমি সম্পূর্ণ বিলাতী পোষাক পরার একটুও বিপক্ষে নই, যদি তা'র উপাদান স্বদেশী হয়।

কিন্তু সম্পূর্ণ দেশী পোষাকটি কি? আমার মনে হয় ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ধুতির সঙ্গে পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কোন অঙ্গাবরণ ব্যবহার না করা, কেননা সার্ট বা কোটের ব্যবহার অন্যজাতীয় লোকদের কাছে আমাদের বেশকে কৌতুককর ক'রে তোলে। জুতো আজকাল সকলেই যা ব্যবহার করেন, আমার মনে হয় তা বদ্‌লাবার দরকার নেই। তবে নাগরাটা বোধহয় পুরুষের পায়ে মানায় না।

এই সম্পর্কে আমি বাঙালী মুসলমানদের কিছু ব'ল্‌তে চাই। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত কৃষ্টির মধ্যে মানুষ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাঙালী ভাবটাই প্রধান দেখি অর্থাৎ তাঁরা বাঙালীর পোষাক পর্‌তে লজ্জা বোধ করেন না। কিন্তু অনেকে বোধ হয় নিজেদের মুসলমানত্বটাকে উচ্চৈঃস্বরে জাহির কর্‌বার জন্যে বাইরের মুসলমানদের মতো বেশভূষা করেন। তাঁদের বলি যে বাঙ্‌লা ভাষা যেমন বাঙালীর, তেম্‌নি বাঙালীর একটা স্বজাতীয় অঙ্গ-সজ্জা আছে। তাছাড়া পাঞ্জাবী জিনিষটা তাঁদের কাছ থেকেই ধার করা। সুতরাং ধুতি-পাঞ্জাবীতে তো হিন্দু-মুসলমানের মিলন।

কিন্তু চিন্তাশীল মাত্রেই জিজ্ঞাসা ক'রবেন, এই জাতীয় পোষাক কি চিরস্থায়ী? অর্থাৎ স্বরাজ-লব্ধ বাঙালী কি ধুতি প'রে তা'র দেশকে রক্ষা ক'র্‌বে? আমার মনে হয়, ক'রবে না। তখন তা'র পোষাক বদ্‌লাতে বাধ্য এবং খুবই সম্ভব সে, যেমন অনেক বিষয়ে তেম্‌নি পোষাকেও, য়ুরোপীয় হ'য়ে উঠ্‌বে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য স্বাধীন প্রাচ্যজাতির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করি।

তাই বলি, হয় সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, নয় সম্পূর্ণ দেশীয় হওয়াই স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জাতির ভালোগুলিকে একত্র ক'রে আমরা আদর্শজাতি হ'য়ে উঠ্‌ব, এমন কল্পনা স্বপ্নবিলাসী মনের পাগ্‌লামী।

বলা বাহুল্য, আমি পুরুষের অঙ্গ-সজ্জা সম্বন্ধেই এতক্ষণ বল্‌লাম্‌।

২। বলাকার ছন্দ

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস

বলাকার ছন্দ সম্বন্ধে আমার অভিমত লইয়া শ্রাবণের বিচিত্রায় জনৈক লেখক কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আশা করি লেখক আমার 'বাংলা মুক্তবন্ধ ছন্দ' (বিচিত্রা—শ্রাবণ ১৩৩৯) শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে

free verse বা মুক্তবন্ধ ছন্দ সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করিয়াছি, যদি তাহা লেখকের মনঃপূত না হয় তজ্জন্য আমি দুঃখিত। যাহা সাধারণ ঐক্যপ্রধান ছন্দ হইতে বিভিন্ন তাহাকেই মুক্তক নাম দিয়া সন্তুষ্ট হইতে আমি পারি না, সুতরাং তজ্জাতীয় ছন্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া নানা প্রকার ছন্দের নমুনা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। লেখক যদি মুক্তক বলিতে পারিলেই তৃপ্ত হন এবং বিশ্লেষণ অনাবশ্যক মনে করেন, তবে সে বিষয়ে আমার কিছু মন্তব্য নাই।

এক বিষয়ে লেখক আমার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। বলাকার কবিতা মাত্রই যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ঢালিয়া সাজান যাইতে পারে তাহা আমি কুত্রাপি বলিয়াছি মনে হয় না। বলাকায় নানা রকমের ছন্দ ও কবিতা আছে।

ছন্দোবন্ধের অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার বলাকায় আছে এই কথাকে লেখক কষ্টকল্পনা বলিয়াছেন। বলাকার ছন্দের প্রকৃতি ও আদর্শ সম্বন্ধে বিচারকের বোধের উপর ইহার আলোচনা নির্ভর করে। এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত বিতর্কের অবসর এখানে নাই। তত্রাচ যখন রবীন্দ্রনাথকে লেখক নজির বলিয়া ধরিয়াছেন, তখন একটা কথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে চাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'বলাকা'র ১১ সংখ্যক ('বিচার') কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ আমার অনুরোধক্রমে আমার সম্মুখে পাঠ করিয়াছিলেন। কবিতাটির ছন্দোলিপি আমি পূর্ব্বেই করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার ছন্দোলিপির সহিত কবির পাঠের মিল হয় কি না তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে আমার ছন্দোলিপি তখনও দেখাই নাই। কবি পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রলোক (তাঁহারা বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে সকলেই সুপরিচিত) আমার ছন্দোলিপি মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন। কবির পাঠের সহিত আমার ছন্দোলিপির সর্ব্বাংশে ও সম্পূর্ণরূপে মিল হইয়াছে এই কথাই সেখানে সাব্যস্ত হইয়াছিল। 'হে সুন্দর' শব্দ দুইটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখা যে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহাই সেখানে সকলে বলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে লেখককে একটি কথা জানাইতে চাই। ঐ শব্দ দুইটিকে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া মানেই তাহাদিগকে একঘরে করা বা বহিষ্করণ করা নহে। কিন্তু সেকথা বুঝাইবার স্থান ইহা নহে।

Free verse কথাটির অনেক সময় অপব্যবহার হইয়া থাকে। খাঁটি free verseর একটি নমুনা এখানে দিতেছি—

His heart, to me, was a place of palaces and
pinnacles and shining towers ;
I saw it then as we see things in dreams,—
I do not remember how long I slept ;
I remember the trees, and the high, white
walls, and how the sun was always
on the towers ;
The walls are standing today, and the
gates : I have been through the gates,
I have groped, I have crept
Back, back. * * *

গঠনরীতিতে এই ধরণের ছন্দ ও বলাকার ছন্দ যে এক তাহা বোধ হয় না। সুতরাং বলাকার ছন্দকে Free verse বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে কুণ্ঠা বোধ হয়। কিন্তু তজ্জন্য বলাকা-রচয়িতার অগৌরব কিছু নাই। বলাকার ছন্দ খাঁটি Free verse না হইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা সুন্দরতর।

পরিশেষে একটি কথা বলিতে চাই। যতি ও ছেদের স্বরূপ না বুঝিলে বৈচিত্র্যবহুল ছন্দের বিশ্লেষণ ও আলোচনা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র তথাকথিত সহজবুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে কোন শাস্ত্রেরই তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করা চলে না।

৩। আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় 'দেশেরকথা'র লেখক সুশীল কুমার বসু 'আমাদের স্কুলের অবশ্য শিক্ষণীয়তা' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য শিক্ষণীয় সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে কোনও একটি

আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে (অনেকগুলির মধ্যে নির্ব্বাচ্য) প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ছেলেদের পক্ষে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে।" আমরা লেখকের সাথে একমত নই।

প্রথমতঃ, লেখক মহাশয়ের মতে—'এই পর্য্যন্ত তাহারা যেটুকু সংস্কৃত শিক্ষা করে তাহা অতিশয় সামান্য। পরে সংস্কৃত না পড়িলে এইটুকু মাত্র জ্ঞান জীবনে কোনও প্রকার কাজেই আসে না।' কিন্তু এরূপ মত প্রকাশের পূর্ব্বে একথাও স্পষ্ট করে বলা উচিত, 'কাজে আসা' বলতে কি বুঝি। সুশীলবাবু যদি বলতেন যে এতটুকু শিক্ষা তাদের গবেষণার বা অধ্যাপনার পক্ষে অপ্রচুর তাহ'লে আমরাও তাঁর সাথে একমত হ'তাম। কিন্তু এইটুকু সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে কোনই কাজে আসে না এমন কথা বলা অতিরিক্ত নয় কি? কারণ, মনে রাখতে হবে বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় প্রায় সমুদয় ভাষাই সংস্কৃতমূলক, সুতরাং স্কুলে যেটুকু সংস্কৃত ছেলেরা শিক্ষা করে সেটুকু যে বেশ কাজে আসে তার প্রমাণ—'জঙ্গম' শব্দের অর্থ একটি হিন্দু ছাত্র তারই সহপাঠী মুসলমান ছাত্রটি অপেক্ষা সহজে বুঝতে পারে। আর যেহেতু অধিকাংশ বাংলা শব্দই সংস্কৃত থেকে এসেছে, তখন সংস্কৃতকে অন্ততঃ বাংলা শিখ্‌বার সাহায্যকল্পেও প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অবশ্য শিক্ষণীয় রাখা যুক্তিযুক্ত। এসম্বন্ধে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের মত আশা করি অপ্রয়োজনীয় হবে না। তিনি ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখেছেন—"বাঙালীদের সাহিত্য অনুন্নত নয়। **সংস্কৃতের সাহায্যে** ইহার প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দও রচিত হইতেছে ও হইতে পারে।"

(বিবিধ প্রসঙ্গ—৪৪৭ পৃষ্ঠা)

এমতাবস্থায় সংস্কৃতকে পাঠ্য তালিকা থেকে নির্ব্বাসিত করবার প্রস্তাব কতটুকু যুক্তিসহ সেকথা বিবেচ্য। বস্তুতঃ, উক্ত সংখ্যা প্রবাসীতেই আবার সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত) "কমিটি পাঠ্য-তালিকা হইতে সংস্কৃতকে বাদ না দিয়া ভাল করিয়াছেন।" এখানে সংস্কৃতের অবশ্যশিক্ষণীয়তার কথাই বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, এইটুকু সংস্কৃতও যদি ছাত্রেরা শিখ্‌তে বাধ্য না থাকে তবে পরে কাজে আসার মত সংস্কৃত শিখিবার চেষ্টা কয়জনই বা করবে? বাস্তবিক পক্ষে আমাদের স্বদেশের প্রাচীন যে কোন জিনিষ নিয়ে গবেষণা চালাতে হলে সংস্কৃত জ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং প্রবেশিকা পর্য্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যশিক্ষণীয় থাকলে, পরে এই ভাষায় জ্ঞান বর্দ্ধনের প্রচেষ্টা বহু ছাত্রের মধ্যে জাগা স্বাভাবিক এবং এতে করে ঐ ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে বহু তথ্য বার হবার সম্ভাবনা থাকবে। গত বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় দেখ্‌তে গিয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রের সংখ্যা অল্প জেনে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন যে প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রের অন্ততঃ সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত। একথার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

এখন, সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে তার স্থানে আধুনিক ভারতীয় ভাষার একটিকে প্রতিষ্ঠিত করা কেন উচিত হ'বে না সেকথা বলছি। সংস্কৃতের পক্ষে সুশীলবাবু যে কথা লিখেছেন সে কথা অন্য যে কোন ভাষার পক্ষেই খাটবে। পরে আলোচনা না করলে অন্য ভারতীয় ভাষাও বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। অধিকন্তু, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃতের মত অপ্রচলিত ভাষা (dead language) নয়। সেজন্য সে সব ভাষা ব্যাকরণের অতিরিক্ত সাহায্য ভিন্নও শিক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ, ঐ সকল ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রাদি পাঠে এবং সে সকল ভাষাভাষী প্রদেশে বাস করাতে ভাষা শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু সংস্কৃতের মত ভাষা, যে ভাষা ব্যাকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ঐভাবে স্বাধীনভাবে শিক্ষা করা, স্বাধীনভাবে আধুনিক যে কোন ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা অপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য। অথচ, সংস্কৃত শিক্ষা প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অবশ্য কর্ত্তব্য থাকলে, পরে স্বাধীনভাবে ঐ সকল আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার পক্ষেও সাহায্যকর হবে।

৪। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীনবগোপাল দাস আই সি-এস্

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় 'তুই, তুমি, আপনি' এই তিনটি সম্বোধনের ব্যবহার নিয়ে যে আলোচনা উপস্থিত করেছেন তার প্রয়োজন আছে অন্ততঃ একটি কারণে। তর্কবিতর্কের সুমীমাংসা হয়ত এখন হবেনা, কিন্তু এই সম্বোধন-প্রয়োগ-বিভ্রাটের দৃষ্টান্তগুলো মনে করিয়ে দেয় আমাদের সমাজের ঘোরতর ভেদবুদ্ধি, পার্থক্য এবং অসাম্যের কথা। এর আগে এই নিয়ে কেউ এরকম আলোচনার পথ খুলেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু 'বিতর্কিকা'র পাতায় আলোচনার বহর দেখে বোঝা যায় আমাদের সামাজিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই গভীরভাবে চিন্তা কর্‌তে আরম্ভ করেছেন।

সম্বোধন তিনটির গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে আমরা ব্যক্তি-বিশেষের মনে যে কতো বিহ্বলতা, গ্লানি বা অপমানবোধ উৎপাদন কর্‌তে পারি তার বহুল দৃষ্টান্ত সম্পাদক মহাশয় দেখিয়েছেন। একাধিক শব্দ ব্যবহারের অবাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে এর পক্ষে আছে যুক্তি এবং বিপক্ষে আছে সংস্কার অর্থাৎ sentiment। পক্ষে যুক্তি যে যথেষ্ট আছে সেটা আমি মানি এবং দেখ্‌তেও পাচ্ছি। কিন্তু বিপক্ষে সংস্কার ছাড়া আর কিছু নেই এরকম একতরফা ডিক্রী আমি মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নিতে রাজী নই। সমাজে এবং পরিবারে শ্রেণী বা ব্যক্তি-বিশেষ যে অপরের পিলসুজের মত দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া হয়ে, তা' আমি মানি এবং তার থেকে এরকম সম্বোধন প্রয়োগের শুচিতা যে সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে উঠেছে সেটাও আমি স্বীকার কর্‌তে রাজী আছি। কিন্তু সম্বোধন-তিনটি ছেঁটেকেটে একটিতে দাঁড় করালেই যে সব গলদের অবসান হ'বে তা'ও মনে হয়না। এই সংক্ষিপ্ততার পেছনে যে স্বাতন্ত্র্য, সাম্য এবং সৌভ্রাত্র্যের আদর্শের উদ্বোধন তা' আমাদের সমাজে কতটুকু আছে বিবেচনা করে দেখা উচিত। যদি না থাকে তবে বাইরে থেকে শুধু এই সংক্ষিপ্ত-করণে কোন ফল হবে কি? তা' স্থায়ী হবে কি? তার প্রচার বহুল এবং সর্ব্বজনসম্মত হবে কি?...যদি না হয়, তাহ'লে শুক্‌নো একটা নতুনত্ব সৃষ্টি ক'রে ব্যবহারিক জীবনে নতুন ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি করাটা কি সমীচীন হবে?

আমার কথাটি এই যে ছাঁচে ঢালা সৃষ্টি—তা' যতই যুক্তিসঙ্গত এবং অভিনব হোক্‌না কেন—কখনও টেঁকে না। সজীব সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের সাথে সৃষ্টি যদি না মেলে তাহ'লে হয় একদিন ছাঁচ ফেটে হয়ে যাবে চুরমার এবং সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌বে বেপরোয়া, নতুবা সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনে আস্‌বে দ্বন্দ্ব, গ্লানি এবং অসুবিধা। ডিমক্রেসী আদর্শহিসাবে হয়ত খুবই ভালো, কিন্তু যে আবহাওয়া এবং আবেষ্টনের মধ্যে ডিমক্রেসীর সব সৌন্দর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা' যদি বর্ত্তমান সমাজে না থাকে তাহ'লে শুধু একটা খোলস নিয়ে খেলা ধুলো ক'রে ত' লাভ নেই, তাতে নানা অবাঞ্ছিত পীড়ার সৃষ্টি হবারই সম্ভাবনা বেশী।

'তুমি-আপনি' প্রচলন লুপ্ত হ'লে বাংলাভাষার ঔপন্যাসিক এবং গল্প লেখকগণ একটা খুব উপকারী অস্ত্র হারাবেন তার জন্যে আমার একটুও ভাবনা হয়না, কারণ অস্ত্র আছে তাঁদের অসংখ্য।...তবু, সনাতনের জট ধরে টান মার্‌তে আমার আপত্তি, কারণ এখনও জিত্‌বার আশা খুবই কম, বরং পরোক্ষভাবে অন্য রকমের অশান্তি এবং গ্লানির সূচনা হ'বার সম্ভাবনাই বেশী।

৪ক। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

ভাদ্রের বিতর্কিকাতে সুধীর মিত্র 'তুই, তুমি ও আপনি'র আলোচনা করতে গিয়ে 'শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের' নিবন্ধের উপর শ্রদ্ধা রাখ্‌তে পারেন নি। আমরা কিন্তু বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবকে আপত্তিকর মনে করতে

পারি নি,—অন্ততঃ সমালোচক সুধীর মিত্র মহাশয় যে সকল কারণ দেখিয়ে প্রস্তাবিত 'তুমি' ব্যবহারের আপত্তি উঠিয়েছেন, সেগুলিকে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করতে আমরা অক্ষম। আমাদের যুক্তি নিম্নরূপ :

বলা হয়েছে—"তুই, তুমি ও আপনির উৎপত্তি মানুষের সম্মানবোধের সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকে। সাধারণতঃ যাদেরকে আমরা আমাদের চেয়ে বয়স, বিদ্যা-বুদ্ধি, বৃত্তি বা জাতিতে ছোট মনে করি তাদেরকে বলি 'তুই,' সমান-বয়সী ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে 'তুমি' এবং পূজনীয় ও অপরিচিতদের, যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচিত হন তাঁদেরকে বলি 'আপনি'।…সম্মানবোধক 'আপনি' শব্দটাকে রেখে নিম্নক্রমের বাকী দুটিকে বর্জ্জন করাই যুক্তি-সঙ্গত। কারণ, অসম্মান কাউকে করবার অধিকার আমাদের নেই পক্ষান্তরে মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই সম্মানের পাত্র।"

[বিচিত্রা—২৬১ পৃঃ]

তুই, তুমি ও আপনির উৎপত্তি যদি সকল মানুষের সম্মানবোধের সূক্ষ্মজ্ঞান থেকে হ'ত তা'হলে সকল ভাষাতেও এদের অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ থাকৃত। কিন্তু আমরা জানি ইংরাজী ভাষায় you কথার দ্বারা তিন্‌টি শব্দকেই অনায়াসে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সুতরাং মিত্র মহাশয় তিনটি শব্দের সাথে যে তিনটি অর্থ জুড়ে দিয়েছেন সেগুলিকে কিছুতেই সর্ব্বজনগ্রাহ্য এবং চিরস্থায়ী বলা যেতে পারে না। সেগুলির দ্বারা শুধু এই প্রমাণ হয় যে আমরা বর্ত্তমানে এই শব্দগুলিকে এই এই অর্থে ব্যবহার করে থাকি।

সম্মানবোধক 'আপনি'কে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে অসম্মানজনক [?] বাকী শব্দ দুটিকেই কেন বিলুপ্ত করে দেওয়া উচিত নয় তাই বলি। 'অসম্মান কাউকে করবার অধিকার আমাদের নেই,' একথা খুবই সত্য। কেবল 'তুমি' শব্দটিকে ব্যবহারে রাখবার প্রস্তাব করে 'তুমি'কে অসম্মানজনক অর্থে ব্যবহার করবার কথাই কি সম্পাদক মহাশয় বলেছেন,—না 'মানুষ হিসাবে প্রত্যেক্কেই [যে] সম্মানের পাত্র' সে কথারও ইঙ্গিত করেছেন? বিশেষ করে তিনি বলেছেন—"ভগবানকে আমরা বলি তুমি, দেশের মহৎ ও বরণীয় লোকদের অভিনন্দন-পত্রে সম্বোধন করি তুমি ব'লে, বাপ-মা-স্বামীকে বলি তুমি, আবার চাকর চাকরাণী মুটে মজুরদের বলি তুমি।" সুতরাং মনে রাখ্‌তে হ'বে, শুধু শব্দের আকার থেকেই অর্থ করা হয় না, বলবার ভঙ্গী অর্থাৎ কোন্ motive থেকে কথাটি বল্‌ছি তা' দিয়েই শব্দের অর্থ বুঝে নেওয়া উচিত। আর তা' যদি হয়, তবে 'সাহিত্য-সম্রাট্ শরৎবাবুকে'—"তোমার শেষ প্রশ্নটা আমাদের ভালো লেগেছে" কিম্বা 'ক্লাসের অধ্যাপককে'—"তুমি আমার ফাইনটা মাপ করে দাও" বল্‌তে আপত্তির কি কারণ থাকৃতে পারে? শরৎবাবু এবং অধ্যাপক মহাশয় দু'জনেই বুঝ্‌বেন যে এভাবে বলাতে তাদের অপমানিত করা হ'চ্ছে না। এই দিক থেকে বিষয়টাকে বিবেচনা করলে সমালোচক মহাশয়ের বাকী উদাহরণগুলিরও মীমাংসা হয়ে যায়।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাকে সম্পাদক মহাশয়ের মতের সহিত মিলিয়ে সম্পাদক মহাশয়ের মূল প্রস্তাবের স্বল্প সংশোধন ইচ্ছা করি। ধূর্জ্জটিবাবু লিখেছেন—"আমি লক্ষ্ণৌ থাকি, সেজন্য 'আপনি'র পক্ষপাতী, তাছাড়া সংস্কারমুক্তও নই।" সংস্কারের কথা অধিক বয়স্ক লোকের বেলা যদি উঠে, তাহ'লে যাদের কাছে 'তুমি' বলে আমল পাওয়া যাবে না সেরকমের বড়দের না হয় 'আপনি'ই বলা যেতে পারে। কিন্তু যারা নতুন সংস্কার নিজেদের মধ্যে গড়ে তুল্‌ছে বা তুল্‌বে তাদের পক্ষে 'তুমি' ব্যবহার অভ্যাস করা বোধ করি চল্‌বে।

উপরোক্ত প্রস্তাবে কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছে যে কিছুকাল পরে আর 'আপনি'র প্রয়োজন থাকৃবে না। বর্ত্তমানের পক্ষেই শুধু এর ব্যবহার অত্যাজ্য হ'লেও হ'তে পারে।

৪খ। 'তুই' 'তুমি' ও 'আপনি'

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল

শ্রাবণের 'বিচিত্রা'য় 'তুই,' 'তুমি' ও 'আপনি' এই শব্দ তিনটির ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। প্রসঙ্গটি বর্ত্তমান সময়ে বিতর্কেরই যোগ্য। বাস্তবিক আমাদিগকে এই শব্দ তিনটির প্রয়োগ নিয়ে মধ্যে মধ্যে ঘোর সমস্যায় পড়তে হয়। এই শব্দ তিনটির ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা খুব সজাগ অর্থাৎ কি রকমের লোককে কোন্ শব্দটির দ্বারা সম্বোধন করতে হবে তা' আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। তার ব্যতিক্রম যদি কোনো স্থলে কোনো কারণে ঘটে তাহলে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি এবং ভুল শোধরাবার জন্যে ব্যস্ত হই। অধিকন্তু উভয় পক্ষের মনের মধ্যে অস্বস্তির সঞ্চার হয়।

শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ নিয়ে বেশী বালাই। তাঁদের cultured মনে এ সকল শব্দের ব্যবহারের তারতম্যে খুবই খট্‌কা লাগে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, সাধারণ লোকদের মধ্যে অতি সহজ ও সরল ভাবে 'তুমি' ও 'আপনি'র চলতি আছে। ডারমণ্ডহারবারের দক্ষিণ অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা প্রায় সকলকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করে থাকে। ঠিক মনে পড়ছেনা অন্য কোন্ এক জায়গায় শুনেছি সেখানকার সাধারণ লোক সকলকেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করে। মর্য্যাদা বোধের কোনো প্রশ্ন নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে হয় না।

ইংরাজী You শব্দের মত 'তুমি' বা 'আপনি' যে কোনো একটী মাত্র শব্দ বাংলা ভাষায় চালাতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহলে বড় প্রশ্ন এই হয়ে দাঁড়ায় যে, মুড়ি-মুড়কির এক দর হয়ে যায়। মুড়ি মুড়কির অর্থে আমি বড় ছোট, উচ্চ-নীচ, উন্নত-অনুন্নত এ সবের কথা বলছিনা। আমি বলছি যাঁরা গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও মাননীয় ব্যক্তি—আর এঁদের বিপরীত যারা।

ভগবানকে 'তুই', 'তুমি' বলার কথা এখানে তুললে চলবে না কেননা তাঁর সঙ্গে মানুষের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও সখা প্রভৃতি অনেক সম্বন্ধই আছে। তিনি সকল মানুষেরই আপনার জন। তিনি কারো একার আত্মীয় নন, কারো অনাত্মীয় তো নন্‌ই। ব্রাহ্মণেতর জাতিরা ব্রাহ্মণকে 'প্রণাম' করেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিরা পরস্পর পরস্পরকে 'নমস্কার' করেন। 'প্রণাম' ও 'নমস্কারের' মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে। "নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায়" এই দৃষ্টান্ত থাকতে থাকতে ব্রাহ্মণের বেলায় 'প্রণামে'র সৃষ্টির আবশ্যক যে-কারণে সম্মানীয় বেলায় 'আপনি'র সৃষ্টিও সেই কারণে,—

ইংরাজী ভাষায় সম্বোধনের জন্যে মাত্র একটী শব্দের চলতি আছে বলে আমাদের বাংলা ভাষায়ও একটা শব্দ চালাতে হবে অথবা ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় একের অধিক শব্দের চলতি আছে বলে আমাদেরও বহু শব্দ থাকবে এ কোনো কাজের কথা নয়। আমাদের সুবিধা অসুবিধা বুঝেই এর সমাধান করতে হবে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ ও আমাদের রুচি এসব বিবেচনা করে দেখতে হবে।

'আপনি' শব্দটা চালালে ভাল হয় মনে করি। মধ্যবর্ত্তী 'তুমি' শব্দ চালানোর কথা আপোষ মীমাংসার মতই শোনায়, অর্থাৎ অধিকতর সম্মান-সূচক 'আপনি' আর অবজ্ঞাসূচক 'তুই' না বলে মাঝামাঝি ধরণের 'তুমি' বললে দুইকূল রক্ষা হবে এমনি ভাব। অবজ্ঞার ভাবটা যে একেবারেই মন্দ তা স্বতঃসিদ্ধ। 'তুমি' শব্দের দ্বারা যদি সম্মান জানানোর ভাব কতক পরিমাণে প্রকাশ করা হয় তবে যাঁকে সম্মান দেখাবো তাঁকে আংশিক না দেখিয়ে পুরোপুরি দেখালেই বা দোষ কি ? সে তো আরো ভাল কথাই হবে। যদি দেশের দুলে, বাগদী, ধোপা, নাপিত, জেলে, শুঁড়ী, হাড়ি, ডোম, মুচি প্রভৃতির হীন পেশার প্রতি আমাদের সত্যিকার ঘৃণা পরিহার করবার ইচ্ছা মনে জেগেই থাকে তবে তাদের 'আপনি' বলতে বাধা কি ? সংস্কার হয় তো পূর্ণ সংস্কারই হোক্। এবং এর দ্বারা হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে। ভদ্র সন্তানদেরও ডাকপিয়নগিরি, ট্রামের কণ্ডাক্টারগিরি, ফেরিওয়ালাগিরি, মটর ড্রাইভার-

গিরি প্রভৃতি হীন পেশা অবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ হবে না। ভারতে ইংরাজের স্বায়ত্ত্ব-শাসন দেবার মত ধাপে ধাপে দেবার নীতি দ্বারা আমাদের অন্তর খোলাসার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। আর যদি এই 'আপনি' শব্দটার প্রচলন সহজ হয়ে আসে তাহলে আমাদের সামাজিক সমস্যার জটিলতা হয়তো সরল হয়ে আসবে। প্রবন্ধ-লেখক উপেন্দ্র-বাবুর ভাষায়ই বলি—আজ কালকার সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার দিনে আমরা যখন মানুষের সহিত মানুষের সমস্ত অসঙ্গত ভেদগুলি বিলুপ্ত করতে উদ্যত হয়েছি তখন ভাষার মধ্যে সম্বোধনের এই রূঢ়তাটুকু রেখে লাভ কি?" তারপর রূঢ়তা রাখাতো উচিতই নয় অধিকন্তু সম্মানীদের অনুরূপ সম্মান সকলকে দেখানোই কর্ত্তব্য।

আর যদি অধিকতর সম্মানজ্ঞাপক নিত্য ব্যবহার্য্য 'আপনি' শব্দের ব্যবহার করতে বাধ-বাধ ঠেকবে মনে হয় তবে 'তাত' শব্দের ব্যবহার সবচেয়ে নিরাপদ হবে বলে মনে করি। 'তাত' শব্দের অর্থ পিতা, পবিত্র ব্যক্তি ও স্নেহ পাত্র। সুতরাং সকলকে 'তাত' বলা চলতে পারে। সংস্কৃত-সাহিত্যে 'তাত' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। কথ্য বাংলা ভাষায় এর প্রচলন নতুন হবে সুতরাং পাত্রাপাত্র বিচার করে ব্যবহার করতে কারো পক্ষে বাধার সৃষ্টি করবে না। কিন্তু 'তুমিই' হোক্ বা 'আপনিই' হোক্ অথবা 'তাতই' হোক্ পরিবর্ত্তন চালাতে লোক রাজী হবে কিনা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কেননা এর প্রতিকূলে আছে বদ্ধমূল সংস্কার।

পুস্তক-পরিচয়

নব জ্যোতি:—কাব্যপুস্তক; শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন প্রণীত। ২৬নং গোয়াবাগান লেন কলিকাতা হইতে বেঙ্গল পাব্লিশিং কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা।

পুস্তকের লেখক শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত নহেন। তিনি মহাভারত হইতে ত্বষ্টা নামক প্রজাপতির পুত্র ত্রিশিরা নামক মুনির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বক্ষ্যমান পুস্তকে এক মহাকাব্য লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং ইদানীন্তন সময়ে কাহাকেও মহাকাব্য লিখিতে চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। বইখানি সাধারণ পাঠক পাঠিকা পড়িয়া দেখিলে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হইবে। বই ১৪৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মোহানা—শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু প্রণীত। ৫২-১-১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

চমৎকার কবিতার বই। ইহাতে বড় বড় দুটি কবিতা আছে—বেণু ও আলো রবিবাবুর "পলাতকা"র ধরণে লিখিত। বেণু প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; আলো বিচিত্রায়। রবীন্দ্রনাথ, সতেন্দ্রনাথ, করুণানিধান প্রভৃতি কবি-সমষ্টির পর মোহিতলাল প্রমুখ যে সকল নবীন কবি আজকাল খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন কৃষ্ণদয়ালবাবু তাঁহাদের অন্যতম একজন। কৃষ্ণদয়ালবাবু সত্যকারের কবি। আলো ও বেণু—দুটি কবিতাই চমৎকার—কোথাও লিখিবার চেষ্টাকৃত প্রয়াসমাত্র নাই। গল্প দুটি বেশ স্বচ্ছ সরল ও অপ্রতিহত গতি লাভ করিয়াছে। লেখকের নিপুণ ও সংযত তুলিকাপাতে চিত্রদুটি সরস ও গভীররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুটি গল্পই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। কিশোর বয়সের প্রেমই আসল প্রেম; তখনকার মান, অভিমান, চোখের জল বড়ই সুন্দর; সেখানে প্রকট কামনা নাই, উৎকট বাসনা নাই—শুধু অনাবিল স্নেহ, অশমিত করুণা ও সুসংস্থিত মমতা। কিন্তু সমাজের বিরোধী হস্ত এই দুটী প্রেমোন্মুখী তরুণ তরুণীকে মিলিত হইতে দিল না। করুণ সুর ফুটাইয়া তুলিবার ক্ষমতা লেখকের বেশ আছে। গল্পের মধ্যে মধ্যে কবি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিয়াছেন—তাহা অতি অপূর্ব্ব! এই বিষয়ে তিনি বাংলার কোনো কবির অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের "পলাতকা"র প্রভাব বড় বেশী সুস্পষ্ট।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস

অনুচ্চারিত—শ্রীঅবনীনাথ রায় বি-এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম এ। মূল্য এক টাকা। পরিপাটি ছাপা ও বাঁধাই।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অবনীবাবু আধুনিক সাহিত্য সমাজে একটা কোণে বেশ জমিয়া বসিয়াছেন। প্রায় সকল মাসিক পত্রিকায় তাঁহার রচনা, আজকাল, দেখা যায়।

'অনুচ্চারিত'—কতকগুলি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি সত্যই ছোট—বিশেষত্ব এই যে অনাবশ্যক বর্ণনা, উচ্ছ্বাস, মন্তব্য বা প্রবলেম সমাধান—ইহাতে একেবারে নাই। গল্পগুলির এই লঘুত্ব—তাহাদের একটী সুন্দর গতি আনিয়া দিয়াছে। মোঁপাসার আফ্‌টার-ডিনার-সিরিজের ঐ জাতীয় গল্পের মত—সহজেই হৃদয়-গ্রাহী। মার্কিন লেখক ও হেনরীর ক্ষীণকায় গল্পগুলি—যেমন দুটী তিনটী কলমের আঁচড়ে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে, অবনীবাবুর গল্পগুলির সামান্য দুটী একটী কথার ইঙ্গিতে এমন সুন্দর, গভীর চিন্তা ও রসের উৎস খুলিয়া গিয়াছে—যাহা সুসাহিত্যিকের উপভোগের সামগ্রী।

আজকাল ছোট গল্পগুলিকে ভারাক্রান্ত করিবার একটা প্রবণতা আধুনিক লেখকগণের মধ্যেও দেখা যাইতেছে—ফলে, লেখকের অজ্ঞাতে, সেগুলি উপন্যাসের ছোট সংস্করণ হইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে অবনীবাবুর হাল্কা গল্পগুলি, বাস্তবিক, একটা বৈচিত্র্য আনিয়া দিয়াছে। আমরা বলিতেছিনা যে—অবনীবাবুর এই গল্পগুলি আদর্শ ও নিখুঁত গল্প; বা ছোটগল্প এইরূপ ছোট না হইলে সাহিত্যে গ্রাহ্য হইবেনা। তবে ইহা বিশেষ এক শ্রেণীর রচনা যাহার বহুল প্রসারে বর্দ্ধমান বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি হইতে পারে।

অবনীবাবুর ভাষা অতি স্বচ্ছ ও মধুর। কথিত ভাষায় রচনা হইলেও, তাহার শ্লীলতা, সাধুতা ও সুরুচি লেখকের ভাষার উপর অসাধারণ শক্তি ও অধিকারের পরিচয় দেয়। আমরা এই সাহিত্যিকের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়

ধূপশিখা—(সচিত্র উপন্যাস)—শ্রীফণীন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—শ্রীঅমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবসাহিত্য কুটীর ৫৪।৭, কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা। ১১৮ পৃষ্ঠা মূল্য এক টাকা।

হিন্দুসমাজের কয়েকটি গলদ দেখাইয়া দিবার জন্য বইখানি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া লেখা, এবং তজ্জন্য তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই লেখকের যুদ্ধকামী মনের বেশ ছাপ পড়িয়াছে। এই কারণ ইহার প্লট নিতান্ত মামুলী হইয়া পড়িয়াছে এবং কোন চরিত্রই জমিয়া উঠিতে পারে নাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সমাজের অনেক হিতসাধন করা যায় ইহা খুবই সত্য কথা; কিন্তু সমাজের হিতসাধনই সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়। ইহা তাহার বহু ধর্ম্মের একটি। কেবলমাত্র ইহাকে প্রাধান্য দিয়া অন্যগুলিকে উপেক্ষা করা মানে সাহিত্যকে জোর করিয়া শ্রীহীন করা।—স্থানে স্থানে অনাবশ্যক বক্তৃতার ভারে উপন্যাসের গতি বিশেষভাবে বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার চরিত্রগুলি এতই ভাল যে পাঠকের কাছে তাহারা প্রাণহীন অস্বাভাবিক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব-বর্জ্জিত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "শৈবলিনী"র অনুকরণে 'ব্রহ্মচারী' চরিত্রের সৃষ্টি করাতে উপন্যাসটি আরও অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি, এত ত্রুটি সত্ত্বেও উর্ম্মিলার করুণ-মধুর চিত্রটি আমাদের হৃদয়-স্পর্শ করে।

ধর্ম্মধারা—শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি ব্রাহ্ম-সমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, ৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারমহাশয় বৈদিক যুগের উপাসনা হইতে আধুনিক ব্রহ্মোপাসনা পর্য্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন এবং আর্য্য উপাসনার রীতি যে সর্ব্বদাই ব্রহ্মকেন্দ্রক ছিল নানাবিষয়ের অবতারণাপূর্ব্বক তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে "রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসক দিগের একটী মণ্ডলী গঠিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রাহ্ম বলিয়া বংশগত এক নবতর জাতি সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি কখনও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নানা উপায়ে ঐ মণ্ডলীই সংগঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।" তিনি বলেন যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মধ্যযুগে অতিরিক্ত বিদেশীয় ভাবধারা

প্রবেশ করাইয়া জাতীয় ভাবের সহিত একটি বড় রকমের বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছেন কিন্তু সবিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে আর্য্যধর্ম্মের পরিণামই ব্রাহ্মধর্ম্ম।—আকারে ক্ষুদ্র হইলেও এখানি নানা তথ্যপূর্ণ এবং সারবান্ পুস্তক বলিয়া মনে করি।

ফুলকলি—শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কামাল কাব্লা নবাবগঞ্জ, রংপুর। মূল্য চারি আনা।

—ছেলেদের জন্য লিখিত চলনসই কবিতার পুস্তক।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ছায়া সীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৷৷৹ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী কলিকাতা।

ছায়াসীতা বইখানি আমি মন দিয়ে পড়েচি। এতে ভাষার যে নতুনত্ব আছে, তা অনেকের ভাল লাগবে কি না জানিনা, আমার ভালই লেগেচে। নতুন পথে বেরিয়ে পড়বার দুঃসাহস যাদের আছে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোনো পক্ষেরই লাভ নেই, একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। বইয়ে যে কটী নারীচরিত্র অঙ্কিত হয়েচে, আমি জীবনে সে ধরণের নারী দেখি নি বলেই তা অবাস্তব হবে এ কথা সত্য নয়, কারণ সৃষ্টির দিক থেকে এ অঙ্কন অন্ততঃ দুটী ক্ষেত্রে (তনিমা ওফিরিঙ্গী মেয়ে বোর্জ্জয়াস্) সার্থকতা লাভ করেচে। হাস্যময়ী বোর্জ্জুয়াসের ছবি মনের মধ্যে কল্পনা কর্ত্তে গিয়ে তার বেদনাম্লান বিশাল নেত্র দুটী আগে মনে পড়ে। বেদনাবিদ্ধা অথচ কৌতুকময়ী এই তরুণীর ছবিটী যেমন জীবন্ত তেমনই প্রাণস্পর্শী।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



নানা কথা

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

বাঙলা দেশের হিন্দু বালিকাদের শিক্ষা পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তা এখনো একটি সমস্যা। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত শিক্ষা পদ্ধতি যে আমাদের দেশের বালিকাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী নয় এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য যদি পুঁথিগত বিদ্যার অর্জ্জন হ'ত তাহ'লে ছিল স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু নৈতিক উন্নতি সাধন এবং চরিত্র গঠনের দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশও শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শৈশব এবং কৈশোর কালের সমস্ত সময়টাই যদি একমাত্র পুঁথি পাঠে নিঃশেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্র গঠনের মহলাও না চল্‌তে থাকে, তা হ'লে বিদ্যা অর্জ্জন করা যেতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জ্জন না হ'তেও পারে। বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক দুর্গতির দিনে আমাদের দুঃখ-কষ্টের অধিকাংশের মূল বিলাসিতার অনাবশ্যক বাহুল্যতার মধ্যে। দৈনন্দিন জীবন-যাপনে অত্যাবশ্যকের দাবী খুব বেশি নয়; অন্নবস্ত্রের ব্যয়-মাত্রা আজকাল অপেক্ষাকৃত কম; বিলাসিতার উপকরণ সুলভ হ'লেও তার ক্ষেত্র বিস্তৃত,—মাথার কাঁটা থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের নাগরা জুতো পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তার আধিপত্য। সুতরাং বহু জায়গার তিল একজায়গায় তাল হয়ে ওঠে।



আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্তা গৌরীপুরী মাতা

মানুষের জীবনে সাজ-সজ্জা-প্রসাধনের কোনো প্রয়োজন বা উপকারিতা নেই এ কথা একবারও বলিনে, কিন্তু সকলেরই জীবনের পথ কমলার ঐশ্বর্য্য-বহুল ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে প্রসারিত নয়, দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ উচ্চাবচ প্রান্তর দিয়েও অনেককেই চল্‌তে হয়;—সুতরাং সংযম শিক্ষার প্রয়োজন। বিলাসিতার মোহ একবার মনকে অধিকার করলে তা হ'তে মুক্তি পাওয়া কঠিন। অভাবপীড়িত ব্যক্তির মনুষ্যত্ব সংযমের অভাবে বিলাস-লালসার অচরিতার্থতায় পদে পদে ক্ষুণ্ণ হ'তে থাকে। এই সংযমের শিক্ষা মেয়েদের স্কুল-জীবন থেকেই হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে যে শুধু প্রখর দৃষ্টি নেই তা নয় কোনো কোনো বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে শোচনীয় ঔদাসীন্যও আছে। সে-সকল বিদ্যালয়ের ধনী কন্যাদের বেশভূষা পারিপাট্যের প্রবল প্রতিযোগিতার সহিত তাল



নব নির্ম্মিত নিজস্ব আশ্রম ভবন—২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট্, শ্যামবাজার, কলিকাতা

দেবী মাতাজীকে এবং সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী (সাংখ্য-ব্যাকরণ তীর্থা, বি-এ) মহাশয়াকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সন ১৩৩৯ সালের বিবরণী পাঠ ক'রে আমরা নিঃসংশয়ে বুঝ্‌তে পেরেছি যে এই বিদ্যালয়টি বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনের চাহিদা এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মনীতির ধারা এই উভয়ের সমন্বয়ে সুপরিচালিত হচ্ছে।

এই বিদ্যালয়টির উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাপদ্ধতির সহিত যা'তে সাধারণে পরিচিত হ'তে পারেন তদুদ্দেশ্যে আমরা উক্ত বিবরণী থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

রেখে চল্‌তে মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যারা অস্থির হয়ে ওঠে।

এই অতিশয় প্রয়োজনীয় ব্যাপারে শ্রীশ্রী-সারদেশ্বরী অবৈতনিক বালিকা বিদ্যা-লয়ের প্রখর দৃষ্টি এবং ব্যব-স্থার কথা অবগত হয়ে আমরা অতিশয় সুখী হয়েছি, এবং এ জন্য আশ্রম-প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী



আশ্রম শিল্পাগার

"বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যনীতি, গৃহশিল্প, সংস্কৃত-স্তোত্র ধর্ম্ম-সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্য শেষ করিতে প্রায় আট বৎসর সময় লাগে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেমন পাঠ্য নির্ব্বাচন বা পাঠ আদান প্রদান করা হয়, এখানে অধ্যাপনা বিষয়ে ঠিক সে প্রণালী অনুসৃত হয় না। সকল শিক্ষাই আশ্রমের উদ্দেশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজনীয় ভাষা ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি শিক্ষার সহিত হিন্দু কুমারীগণ যাহাতে স্বধর্ম্মে আস্থাসম্পন্না সুশীলা হিন্দুনারী রূপে ত্যাগ ও শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরিজনের কল্যাণ সাধনে নিত্য নিরত থাকিতে পারেন তাহার উপযোগী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। তথাপি ইহার ভিতরে ছাত্রীগণ লিখন পঠনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহার পর আর এক বৎসর অধ্যয়ন করিলেই তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা লাভ করেন।

ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত বোর্ডের উচ্চতর পরীক্ষার জন্য এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থাও আশ্রমে আছে। প্রায় প্রতি বৎসরেই আশ্রমবাসিনীগণ উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া আশ্রমের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আশ্রম হইতে একজন মহিলা বি-এ পরীক্ষায় এবং ৫ জন ম্যাট্রিকিউলেসন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। দুইজন মহিলা সংস্কৃত ব্যাকরণে গভর্ণমেণ্ট উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া ব্যাকরণতীর্থা উপাধি লাভ করিয়াছেন। আশ্রমবাসিনী দুইটী কুমারী সাংখ্য-দর্শনের আদ্য পরীক্ষায়, একজন মধ্য পরীক্ষায় আর একজন উপাধি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বৃত্তি পাইয়াছেন। সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া উক্ত মহিলা সাংখ্যতীর্থা উপাধি লাভ করিয়াছেন। আশ্রমের শিক্ষয়িত্রীগণের অধ্যাপনায় ইতঃপূর্ব্বে বিদ্যালয়ের দুইটী ছাত্রী প্রথম বিভাগে এবং দুইটী ছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরেও পাঁচজন ছাত্রী প্রথম বিভাগে সংস্কৃত বোর্ডের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন এবং অপর চারিজন ছাত্রী ম্যাট্রিকিউলেন্ পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আশ্রম ও বিদ্যালয়ের ১২।১৪ জন ছাত্রী ম্যাট্রিকিউলেসন্ ও ৭।৮ জন ছাত্রী আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

প্রয়োজন হইলে যাহাতে মহিলাগণ শিল্প দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন তাহার বন্দোবস্তও আশ্রমে আছে। **এই উদ্দেশ্যে আশ্রমে তাঁত, চরকা এবং সেলাইয়ের কল আছে।** বালিকারা চরকায় সূতা কাটেন, তাঁতে কাপড়, তোয়ালে, চাদর গামছা এবং জামার ছিট প্রভৃতি বুনিয়া থাকেন এবং সেলাই ও ছাঁট-কাট শিক্ষা করেন। **আশ্রমকুমারীগণকে তাহাদের জামা সেমিজ প্রভৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ইহা ব্যতীত মখমল, কার্পেট, পাপোষ,** চটের আসন, সূক্ষ্ম সূচী-শিল্প, এবং উল ও পুঁতির কার্য্যও শিক্ষা দেওয়া হয়।"

জ্যোতিষ-পরিষদ

আজ প্রায় তিন বৎসর হোলো,—অর্থাৎ ১৩৩১ সনের ৫ই আশ্বিন তারিখে ৩৭নং কলেজ ষ্ট্রীটে এই পরিষদ গঠিত হয়। উদ্দেশ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা, লুপ্ত জ্যোতিষের পুনরুদ্ধার, এবং গ্রন্থাগার স্থাপন ও শিক্ষা-দানের দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্রকে জনপ্রিয় করা। এই জ্যোতিষ-পরিষদের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিৎ ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তিদের একটা মিলনের ক্ষেত্র সৃষ্ট হ'য়েছে বটে,—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জনসাধারণের দৃষ্টি এই পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ায় পরিষদের কাজ আশানুরূপ অগ্রসর হ'তে পারে নি। সম্প্রতি পরিষদের মুখপত্র স্বরূপ একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকার পরিচালনা আরম্ভ হ'য়েছে,—এবং তার দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েছে। সেই দুটি সংখ্যা পত্রিকা পড়ে আমরা আনন্দিত হ'য়েছি,—এবং এ দিকে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

জ্যোতিষ-পরিষদ পত্রিকার দুটি সংখ্যা পাঠ করে আমরা অবগত হ'লাম যে এখানে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নিয়মিত আলোচনা হয় এবং মধ্যে মধ্যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করা হয়, একটি অবৈতনিক জ্যোতিষ বিদ্যালয়ের পরিচালনা করা হয়,—তথাপি অর্থাভাবে গ্রন্থাগারের আজ পর্য্যন্ত কোনো উন্নতি হয় নি। অর্থাভাবের কারণ, জন-সাধারণের এবিষয়ে আগ্রহের অভাব। অথচ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের নিয়মিত চর্চ্চায় যে মানবজাতির উপকার বই অপকার হ'বে না,—একথা সুনিশ্চিত। একজন পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ বলেছেন; "In the interests of the race and of the individual, it is earnstly to be hoped that Astrology may be included in the education of the future." মানুষের ভাগ্য যে সবটা না হোলেও অনেকটা পরিমাণে মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে,—একথা কোনো জ্যোতিষ-শাস্ত্রেই অস্বীকার করা হয় না। অতএব সহস্রাধিক বর্ষব্যাপী সাধনার দ্বারা

জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে জ্ঞান অর্জ্জন করা গিয়েছে,—তার দ্বারা মানুষের অন্ধকারময় জীবনপথে যদি কিছু আলোকপাত সম্ভব হয়, তবে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের আলোচনায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা আছে,—মানুষ যে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকবে এমন আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। যাঁরা স্বভাবতই নিশ্চেষ্ট প্রকৃতির লোক,—তাঁরা নিশ্চেষ্ট হ'য়েই থাকবেন, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জ্ঞান না থাকলেও। কিন্তু কর্ম্মী যাঁরা,—তাঁরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে জীবনের বন্ধুর পথে অনেক আপদ-বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করে চল্‌তে পারেন।

জ্যোতিষ-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ও অন্যান্য কর্ম্মীগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ। তাঁরা যে কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন, বাংলাদেশে সে-কার্য্যের প্রবর্ত্তনা এই প্রথম। সর্ব্বপ্রকার কাজের প্রথম প্রচেষ্টায় বাধা আছেই,—এবং সেই বাধার মধ্যে প্রধান হ'চ্চে জনসাধারণের অবহেলা এবং আগ্রহের অভাব। কিন্তু আমরা আশা করি, এই পরিষদের চেষ্টাতেই ক্রমশঃ এ বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে, এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থের অভাব হ'বে না।

স্বদেশী প্রদর্শনী ১৩৪০

গত ১৯শে ভাদ্র সোমবার স্থানীয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমারোহের সহিত স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েচে। সার নীলরতন সরকারের কলিকাতায় অনুপস্থিতি বশতঃ লেডী সরকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু।

প্রদর্শনীতে শ্রমশিল্পজাত সর্ব্বপ্রকার পণ্যের বিপণী খোলা হয়েচে; স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে লোকশিক্ষার্থে নানাপ্রকার তথ্য সংবাদ এবং মন্তব্যাদি সংগ্রহ করা হয়েচে; এবং কি প্রকারে যৎসামান্য মূলধনে কুটীর-শিল্পের সহায়তায় জীবিকার্জ্জনের দ্বারা বর্ত্তমান সুকঠিন বেকার-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভব সে বিষয়েও উপদেশাদি দেবার এবং পরীক্ষাদি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েচে। প্রদর্শনীর প্রবেশ মূল্য করা হয়েচে মাত্র এক আনা,—সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে প্রদর্শনী সুগম হয়েচে। প্রদর্শনীটি প্রথম দিনেই (এখনো সকল বিপণি খোলা হয় নি) ঘুরে ফিরে দেখে আমরা অতিশয় আনন্দিত হয়েচি। সেখানে কিছু সময় কাটিয়ে গেলে সকলেরই যে সাধারণ জ্ঞান এবং তথ্য-সম্পদ বর্দ্ধিত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবহারকের সম্মুখ পরিচয়ের ফলে পণ্য দ্রব্যাদির উন্নতি-সাধন সহজ হবে, এবং আমাদের নিজের দেশে বর্ত্তমান সময়ে কত বিবিধপ্রকার পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়েও সাধারণে চেতনা লাভ করবে।

স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের পবিত্র মন্ত্র সর্ব্বপ্রথম বাঙলা দেশেই ১৯০৫ সালে উদ্ভূত হয়েছিল। সেই মন্ত্রের প্রভাবে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেকথা প্রধানত বঙ্গেতর প্রদেশগুলির পক্ষেই খাটে। বাঙলার অবস্থা বিশেষ কিছু উন্নত হয় নি। ভারতবর্ষের কল্যাণার্থে ভারতেতর দেশ-জাত পণ্য বর্জ্জন করা যদি আবশ্যক হয়ে থাকে ত' অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বাঙলা দেশের কল্যাণে বঙ্গেতর প্রদেশ-জাত পণ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। আমরা জনসাধারণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি দ্রব্যাদি ক্রয় করবার সময়ে এ-কথা তাঁরা যেন মনে রাখেন।

এই প্রদর্শনীটি কল্পিত এবং অনুষ্ঠিত করবার জন্য এর প্রধান উদ্যোগী ক্যাপ্টেন এন, এন, দত্ত মহাশয়কে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আশা করি তিনি এইরূপ স্বদেশী প্রদর্শনী প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত করবেন—এবং উদ্বোধন করবেন শারদীয় পূজার অন্তত একমাস পূর্ব্বে।

নিম্নে আমরা লেডী সরকারের উদ্বোধন অভিভাষণ প্রকাশিত করলাম।

"স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন" উপলক্ষে লেডী সরকারের অভিভাষণ

সমবেত বন্ধুগণ! আজিকার এই সুন্দর সায়াহ্নে কলিকাতার 'স্বদেশী প্রদর্শনী'র দ্বার উদ্বোধন করিতে অনুরুদ্ধ হওয়া আমার পক্ষে যেরূপ আকস্মিক, ততোধিক আনন্দের এবং গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি। তজ্জন্য প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সামাজিক, সাম্প্রদায়িক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ আমাদের দেশকে প্লাবিত করিয়াছে—আমাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি ও প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা হইতে মুক্তির পথানুসন্ধানই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আর্থিক দুর্য্যোগের তীব্র পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের দেশের কত হতভাগ্য নর-নারী অভাবে, অনাহারে, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহার একমাত্র প্রতীকার শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পের প্রসার।

এখন আমাদের সকলের কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। স্বদেশের ও স্বজাতির ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, নীতি,

প্রাণ, মন সকল দিক দিয়াই পরিপূর্ণ বিকাশ করাইতে হইবে। এই কার্য্যে যাহারা ব্রতী, তাহারাই মাতৃভূমির উপযুক্ত সেবক।

সমগ্র পৃথিবীতে জাতীয়তার যে জাগরণ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে দাবী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই প্রেরণায় জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাংলায় তথা ভারতে মাতৃসেবার জন্য যে নিঃস্বার্থ চেষ্টা দেখা গিয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্য অতি উচ্চ আশায় প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী পণ্য বর্জ্জনই স্বাদেশিকতার যথেষ্ট পরিচয় নয়। স্বদেশী জিনিষ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া লোকের মনে উৎসাহ বর্দ্ধন করা, অলস ও অকর্ম্মণ্য জীবনের দুর্দ্দশা দূর করাই আসল স্বাদেশিকতা। স্বদেশী প্রচারই শিল্প প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের জীবন মরণের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের সকলেরই বিলাস সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া মায়ের দেওয়া মোটা ভাত আহার করিয়া ও মোটা কাপড় পরিধান করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থোন্নতি করার জন্য দৃঢ় মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বদেশী ব্যতীত অন্য পথ নাই!

বিদেশী বণিকদের লুণ্ঠন নীতির ফলে আর্থিক জগতে যে দুর্যোগের সৃষ্টি হইয়াছে—আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ বিগ্রহ, ধনিক ও শ্রমিকদের অবিরাম বিবাদ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কার্য্য প্রণালীর মধ্যে অপর দেশের বাজার লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি পোষিত হয় না। ভারতের কুটীরশিল্পে শ্রমিকের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আরাধনা করিবার স্পৃহা পূর্ণ বিকাশ করিয়াছে। আমাদের দেশে ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির যে বিস্তার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূলীভূত কারণ হইতেছে দেশের দারিদ্র্য দূর করা, দেশকে অবনতির পথ হইতে রক্ষা করা। অপরের অনিষ্ট না করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই আমাদের বৈশিষ্ট্য—আমাদের উদ্দেশ্য।

বিগত ১৯০৬ সনে আমাদের বাংলাদেশে সর্ব্ব প্রথম যে স্বদেশী আন্দোলনের আকর্ষণ প্রতিগৃহে বালকবালিকা, নর-নারীর অন্তরে সাড়া জাগাইয়াছিল—১৯৩৩ সনে তাহার প্রতিধ্বনি কি আরও গভীরতর, আরও মধুরতর স্পন্দন জাগাইবে না? মূলধনের ও অভিজ্ঞতার অভাবে স্বদেশী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার পথ তখন বাঙ্গালীর পক্ষে সুগম ছিল না, কিন্তু মহাযুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালীর মনীষার যে অভাবনীয় উৎকর্ষ দেখা গিয়াছে—সমবেত চেষ্টা, উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতার স্রোতে এই মহাজাতি যে প্রবলবেগে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে তাহার প্রতিরোধ করিবে কে?

শিল্প জগতে আজ যে প্রখর প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, আমাদের জাতি তাহাতে আর পশ্চাৎবর্ত্তী নয়—এ কথা ভুলিলে চলিবে না। যন্ত্র-শিল্পের যে অপার সম্ভাবনা পশ্চিম আজ কল্পনা হইতে বাস্তবে পরিণত করিয়াছে, বাংলার জাগ্রতোমুখী প্রতিভা তাহাকে শুধু অনুকরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—নূতনরূপে ও নূতন আলোকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়াছে। বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের এই বিরাট অভিযান আপনাদের কার্য্যকরী সহানুভূতির উপর ভরসা করিয়াই চলিয়াছে। যে অনুপম শিল্পসম্ভারে সজ্জিত হইয়া এই স্বদেশী প্রদর্শনীর দ্বার আপনাদের জন্য আজ উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই স্বদেশী শিল্পের ক্রমোন্নতি আপনাদের উপর নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে কে রক্ষা করিবে? আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয় তরুণ তরুণীদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, তাহারা যেন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে শেখেন। অন্ধ-অনুকরণের যুগ চলিয়া গিয়াছে—এই ভীষণ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

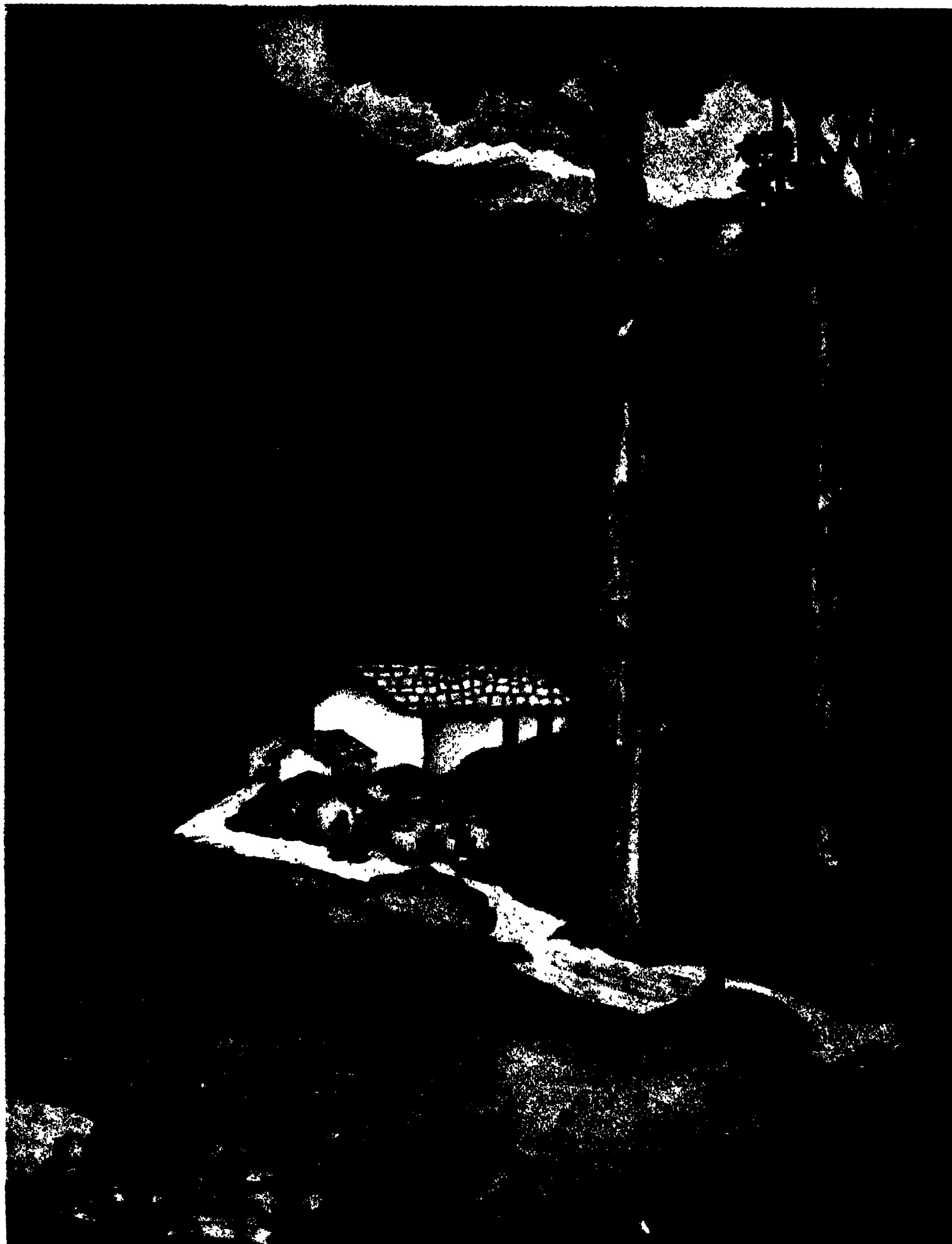
পরিশেষে আমার ইহাই বক্তব্য যে আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্তে জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমের যে অভিনব সমন্বয় আমাদের অন্তরকে আশায় আনন্দে, উৎসাহে ও উত্তেজনায় আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা অক্ষয় ও অমর হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হউক। বাঙ্গালীর এই স্বদেশী প্রদর্শনী বাংলার মুখোজ্জ্বল করুক—ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য ও শুভ কামনা করিতেছি।

কৃতী ছাত্র

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র, রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য, সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী শ্রীযুক্ত বি, কে, বসু সি-আই-ই মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান কল্যাণকুমার বসু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ল ট্রাইপস্" পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েচেন।

দেশে অবস্থান কালেও শ্রীমান কল্যাণকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'য়ে এম-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। আমরা কল্যাণকুমারের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

Edited by Upendranath Ganguli. Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259, Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



হিমালয়

বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

শিল্পী — শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ১ম খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৪০	৪র্থ সংখ্যা

মালঞ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুত দেওর রমেন এসে বললে, "বৌদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আফিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।"

নীরজা হেসে বললে, "খবর দেবার ছুতো করে এক দৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো। কেন আফিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি ?"

"তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বৌদি ? বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।"

"ওগো মিষ্টি ছড়াচ্চ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে ? তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবু কুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।"

"কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তারপরে যাব মালিনীর সন্ধানে।" এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুসি হয়ে বললে, "অশ্রু-শিকল" এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বলো তোমার কল্পনার দোসর তোমার স্বপ্ন-সঙ্গিনী। কী সোহাগ গো।"

রমেন হঠাৎ বললে, "আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।"

"কী কথা ?"

"সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে ?"

"কেন বলো তো ?"

"দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন কোন্‌দিকে ?'

ও বললে, 'যেদিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেইদিকে।' আমি বললুম, 'ওটা হোলো হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বললে, 'সব কথারই ভাষা আছে?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল "কাহার বচন দিয়েছে বেদন।"

"হয় তো তোমার দাদার বচন।"

"হোতেই পারে না।" দাদা যে পুরুষ মানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুঙ্কার দিতে পারে। কিন্তু "পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ" এও কি সম্ভব হয়?"

"আচ্ছা বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আই-বড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।"

"পুণ্যের লোভ রাখিনে কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, একথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।"

"তা হোলে বাধাটা কোথায়? ওর কি মন নেই?"

"সে কথা জিজ্ঞাসাও করিনি। বলেইছি-তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।"

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, "কেন হবে না, হোতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।"

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, "বৌদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তারপরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।"

"আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্চি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।"

"আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও-পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।"

"এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?"

"না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।"

হরলিক্‌স্‌ দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, "যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার? চিনতে পার?"

সরলা বললে, "ও তো আমার।"

"তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জ্যাঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্চে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে সাড়ি পরেছ।"

"এ তুমি কোথা থেকে পেলে ?"

"দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করিনি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।"

রমেন বললে, "তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল ? অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে ?"

নীরজা বললে, "ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোন একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে—যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি ঝরি করছে—একেই তোমরা রোম্যান্টিক্ বলো, না ঠাকুরপো ?"

সরলা চলে যেতে উদ্যত হোলো, নীরজা তাকে বললে, "সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষ মানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি ?"

রমেন বললে, "সমস্তটাই একসঙ্গে।"

"নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো ; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।"

"তুমি কি ওকে নীলেম করতে বসেছ নাকি বৌদি ? জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।"

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, "ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ ?"

রমেন হেসে বললে, "আর কোথাও দেখেছি কিনা তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।"

"অমন দুটি হাতের 'পরে দাবী করবে না ?"

"চিরদিনের দাবী নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবী করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সেই যথেষ্ট।"

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে, "একটা কথা দাও তবে পথ ছাড়ব।"

"কী, বলো ?"

"আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা,— এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

সরলা সহজ সুরেই বললে, "আচ্ছা এসো তুমি।"

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, "তবে আসি বৌদি।"

"আর থাকবার দরকার কী? বৌদিদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হোলো।"

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলি মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে "আমার রং মহলের সাকি।" দশ বছরে রং একটু ম্লান হয়নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, "সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারি দু-ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপ বনে লেগেছে তার নেশা।" কথায় কথায় সে বলত, "তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রানী।" হায়রে, যৌবন তো আজও ফুরোয়নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভরাতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়? সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকাল বেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর? আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন!

"রোশনি, শুনে যা।"

"কী খোঁখি?"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত রংমহলের রঙ্গিনী। দশবছর আমাদের বিয়ে হয়েছে সেই রং তো এখনও ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রংমহল!"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোওনি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।"

"রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত রাত্রে ঘুমোইনি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।"

"একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।"

"আচ্ছা ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে ?"

"ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায় ?"

"মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্চে। তা হোলে মালিদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই ?"

"তুমি নেই এখন ওদের গায় হাত দেয় কার সাধ্যি !"

"ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ ?"

"হাঁ বাবুর গাড়ি এল।"

"হাতআয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানী থেকে, সেফ্‌টিপিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।"

"যাচ্চি কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।"

"থাক পড়ে, খাব না।"

"দুদাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয়নি।"

"তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।"

আয়া চলে গেল।

৬

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদ্দুরের রং, ছায়া হেলে পড়েছে পূবদিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাতজোড়া বাসন্তী রংএর দেশী ল্যাবার্ণাম্ ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখিনি নীরু।" শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, "মনে মনে তুমি নিশ্চয় জানো আমার দোষ ছিল না।"

"অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো ? আমার কী আর সেদিন আছে ?"

"দিনের কথা হিসেব করে কী হবে ? তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।"

"আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাইনে যে মনে।"

"অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না ? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।"

"আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয় ?"

"ভুলতে ফুরসৎ দাও কই !"

"বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসৎ দিয়েছি যে !"

"উল্টো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।"

"সত্যি বলো আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?"

"কী কথা বলো তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।"

"কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা দুটো বিছানায় তোলো।"

"বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই!"

"হাঁ বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

"মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।"

"না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে? তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার।"

"আমিই তা হোলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।"

"তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।"

"যাই বলো আজ কিন্তু রাগ করছিলে আমার 'পরে!"

"কেন আবার সে কথা? শাস্তি তোমাকে দিতে হবে না—নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।"

"দণ্ড কিসের জন্য? রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হোলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।"

"যদি কোনও দিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।"

"অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।"

আয়া ঘরে এল। বললে, "জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায়নি, ওষুধ খায়নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।" বলেই হন্ হন্ করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, "এবার তবে আমি রাগ করি।"

"হাঁ করো, খুব রাগ করো, যত পারো রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তারপরে।" আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল—"সরলা, সরলা।"

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন্ ঝন্ করে উঠল। বুঝলে, বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, "নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?" নীরজা বলে উঠল, "ওকে বকচ কেন? ওর দোষ কী? আমিই দুষ্টুমি করে খাইনি, আমাকে বকো না। সরলা তুমি যাও। মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে?"

"যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক্। হরলিক্স্ মিল্ক তৈরি করে আনুক।"

"আহা সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মারো তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন? একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো না।"

"আয়া কি ঠিকমতো পারবে এ সব কাজ ?"

"ভারি তো কাজ, খুব পারবে ! আরো ভালোই পারবে।"

"কিন্তু"—

"কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া !"

"অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।"

"আমি আয়াকে ডেকে দিচ্চি" বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য্য হোলো, ভাবলে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্চে !

ওষুধ পথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে "সরলা দিদিকে ডেকে দাও।"

"কথায় কথায় কেবলি সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।"

"কাজের কথা আছে।"

"থাক্ না এখন কাজের কথা !"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো না।"

"তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ করো প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থীসিস্ লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।"

"সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে-বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে, তাইতো পোড়ো বাড়িতে ভূতের বাসা হোলো।"

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "অর্কিড্ ঘরের কাজ হয়ে গেছে ?"

"হাঁ হয়ে গেছে।"

"সবগুলো ?"

"সবগুলোই।"

"আর গোলাপের কাটিং ?"

"মালী তার জমি তৈরি করছে।"

"জমি ! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি।"

"হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হোলেই দাঁতন কাঠির চাষ হবে আর কী !"

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, "সরলা, যাও তো, কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।"

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম!"

"হাঁ উঠেছিলুম।"

"ঘড়িতে তেমনি এলারমের দম দেওয়া ছিল?"

"ছিল বৈ কী?"

"সেই নীম গাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?"

"রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবীতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।"

"দুটো চৌকিই পাতা ছিল?"

"পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রংএর চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যগ রূপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানী ট্রে।"

"অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন?"

"ইচ্ছে করে রাখিনি। আকাশে তারাগুলো গোণাগুণতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্ল পঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে!"

"সরলাকে কেন ডাকো না তোমার চায়ের টেবিলে?"

এর উত্তরে বললেই হোতো, তোমার আসনে আর কাউকে ডাকতে মন যায় না। সত্যবাদী তা না বলে বললে, "সকালবেলায় বোধ হয় সে জপ তপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।"

"চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অর্কিড্‌ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?"

"হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হোলো দোকানে।"

"আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও না কেন?"

"ঘটকালি কি আমার ব্যবসা?"

"না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়?"

"পাত্র আছে একদিকে, পাত্রীও আছে আর-একদিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে খবর নেবার ফুরসৎ পাইনি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খট্‌কা।"

একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললে নীরজা—"কোনো খট্‌কা থাকত না যদি তোমার সত্যিকারি আগ্রহ থাকত।"

"বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে? তুমি চেষ্টা দেখো না।"

"কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।"

"শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্‌স্‌রেজ আর কী।"

"মিছে বকচ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।"

"এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল না কি ?"

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বললে, "কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হোতে হবে না।"

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠল "আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অর্কিড্‌ ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাওনি তো সে কথা ? তারপরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না !"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, "সে কেমন কথা ? নষ্ট হোতে দেবার সখ আমার দেখলে কোথায় ?"

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের ?"

"বলো কী ? সরলা জানে না ? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জ্যাঠামশায়। তুমি তো জানো তাঁরি বাগানে আমার হাতেখড়ি। জ্যাঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরি, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।"

"আর তুমি ছিলে সঙ্গী।"

"ছিলেম বৈ কী। কিন্তু আমাকে করতে হোতো কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারিনি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।"

"সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। এমনি ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন। মেয়ে মানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।"

"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু ? কী কথা বলচ ? মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনি তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।"

সরলা কমলানেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, "ঐখানে রেখে যাও।" রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলোই না।

"সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন ?"

"শোনো একবার কথা। বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসেনি।"

"মনেও আসেনি ! এই বুঝি তোমার কবিত্ব !"

"জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হোলে কী হোতো বলা যায় না।"

"কেন সভ্যতার অপরাধটা কী?

"এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্ব্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইসারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।"

"সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।"

"সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।"

"আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাস্‌তে না?"

"নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ, যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিষ্টারী করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন কি তাঁর বিশ্বাস ছিল, এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তারপরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হোলো সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখোনি কি তুমি? ও যে ভালোবাসবার জিনিষ, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুসি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হোতো যেন পাখীর ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়েনি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।"

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বললে, "থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।"

"বারাসতের মেয়ে ইস্কুল? কেন আণ্ডামানও তো আছে?"

"না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো কিন্তু ঐ অর্কিড্‌ঘরের কাজ দিতে পারবে না।"

"কেন, হয়েছে কী?'

"আমি তোমাকে বলে দিচ্চি, সরলা অর্কিড ভালো বোঝে না।"

"আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান সখ ছিল অর্‌কিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস্‌ থেকে, জাভা থেকে, এমন কি চীন থেকে অর্কিড্‌ আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।"

কথাটা নীরজা জানে, সেই জন্যে কথাটা তার অসহ্য।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে এমন কি তোমার চেয়েও।

তা হোক, তবু বলছি ঐ অর্কিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবী করতে পারি। কপালদোষে না হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে—" কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার! বুঝতে পারল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে, দিনে, আদিত্য জানতে পারেনি মুহূর্ত্তের জন্যেও। এমন নির্ব্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুসি। বিশেষত ঋতুর হিসাব করে' বাছাই-করা ফুলের কেয়ারী সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, একদিন যখন কোনও উপলক্ষ্যে সরলার প্রশংসা করে' ও বলেছিল, "কামিনীর বেড়া এমন মানানসই করে আমি তো লাগাতে পারতুম না", তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, "ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।" আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনও মতে একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল "ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলা মালীও বলতে পারত।"

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তারপরে হাত ধরে বললে, "কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি?"

হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "কিছু চাইনে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারি বাগান। তুমি যাকে খুসি রাখতে পারো আমার তাতে কী?"

"নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান? তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে?"

"যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য্য সরলার সামনে? আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি?"

"নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবী নেবুর সঙ্গে কলম্বা লেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য্য করে দেবার জন্যে।"

"তখন তো ওর এত গুমোর ছিল না। বিধাতা যে আমারি দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে ও এত জানে ও তত জানে, অর্কিড্ চিনতে আমি ওর কাছে

লাগিনে। সেদিন তো এসব কথা কোনও দিন শুনিনি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে? আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন? মাপে সমান হব কী নিয়ে?"

"নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর কেউ।"

"না গো না সেই নীরুই বটে। তার কথা এতদিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সব চেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখিনি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হোতো আমার সতীন। তুমি তো জানো, আমার দিনরাতের সাধনা। জানো কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।"

"জানি বই কী। আমার সব কিছুকে নিয়েই যে তুমি।"

"ও সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে! আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়? আমি হোলে কি এমন করতে পারতুম?"

"কী করতে তুমি?"

"বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যবসা হোতো দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে। বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমোর আছে সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহঙ্কার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার। এমনটা কেন হোতে পারল, বলব?"

"বলো।"

"তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাসো বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তারপরে বিহ্বল কণ্ঠে বললে— "নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তারপরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পারো তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্ণারীর পাশে যে জাপানী ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।"

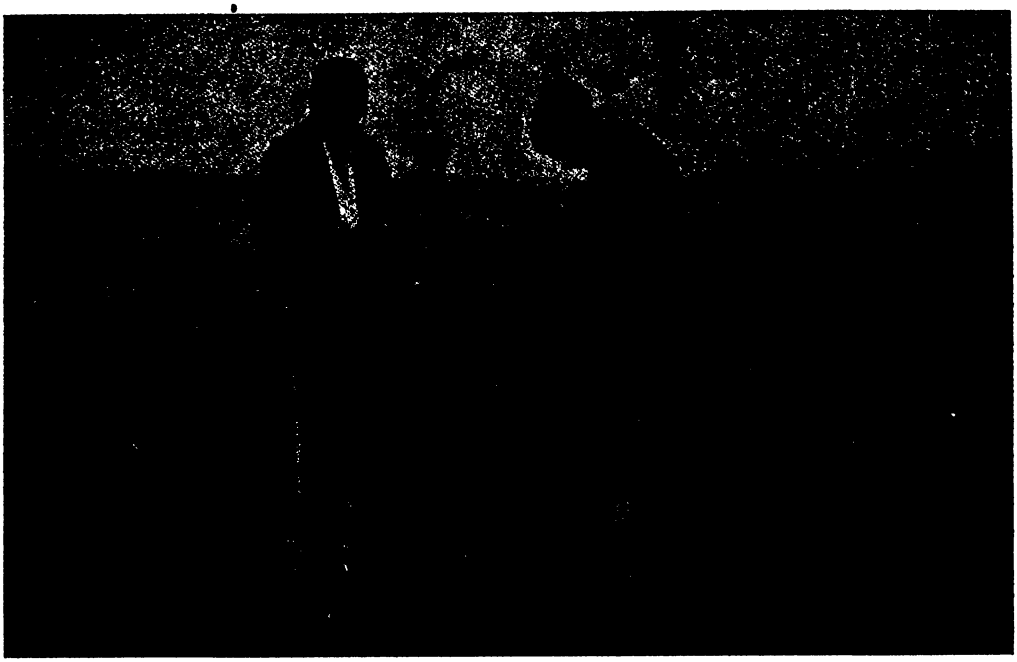
(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এঞ্জেলস্

(ফ্রাঁসোয়া মিলের বিখ্যাত চিত্রদর্শনে)

ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বাগ্‌চি এম-এ, এল্‌-এল্‌. ডি.



উপাসনার ডাক শুনিয়া

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে দিনের আলো ঢাকিয়া ফেলিতেছে এমন সময় গীর্জ্জায় ঘড়িতে এঞ্জেলসের সুর বাজিয়া উঠিল, সে সুর মানুষকে বলিতেছে অনন্তের কথা। সারাদিন ছোট খাট খুঁটি নাটির মধ্যে তাহার চিত্ত ছিল বিক্ষিপ্ত, সারাদিন তাহার হাত ছিল ব্যস্ত, মন অথচ সুপ্ত; সন্ধ্যার আজানে সে সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল, সে দেখ্‌ল জীবনের আরও একটি দিন অকিঞ্চিৎকর কাজে কেটে গেল, কালপ্রবাহের পরার্দ্ধাংশের এক অংশও সে ব্যয় করে না জীবনকে সার্থক করিতে অথচ সমস্ত দিন একবার একথা ভাবিবারও অবসর তাহার নাই। তাই এই আজানের বিধান এই এঞ্জেলস্ ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত নয়, এটি সার্ব্বজনীন আহ্বান। এ সুর বিশ্ব ব্যাপিয়া প্লাবিত, এ সুর তরঙ্গ কাঁপিয়ে তুলেছে বাতাসকে স্তরে স্তরে, সমুদ্রে ঢেউএর পর ঢেউ এরই বার্ত্তা বহন করিতেছে—মানুষ তুমি নিজকে জানিতে শেখ, আত্মানং বিদ্ধি, তুমি যে অনন্তের সহযাত্রী। যে মহান্ সত্বা বিরাট ব্যোমে ব্যাপ্ত তাহারই এক একটি কণা এক একজন নরনারী। এত বড় সত্য ভুলিলে চলিবে না। এই ধ্বনি কত যুগ যুগান্তর হ'ল গ্রহনক্ষত্র পার হ'য়ে মহামানবের কানে এসেছে। এঞ্জেলস্ সেই সুরই প্রতিদিন উদাত্ত-গম্ভীর স্বরে বাজায় "শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ!"

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৫

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বন্দনার অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। সে কি নেশা করিয়াছে যে নির্লজ্জ উপযাচিকার ন্যায় আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত আত্ম-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া আসিল? অথচ, দ্বিজদাস পুরুষ হইয়াও যেমন রহস্যাবৃত ছিল তেমনি রহিল। তাহার মুখের ভাবে না ছিল আগ্রহ না ছিল উল্লাস, সে না দিল আশা না দিল সান্ত্বনা। বরঞ্চ, পরিহাসচ্ছলে এই কথাটাই বার বার করিয়া জানাইল যে সে তৃতীয় পক্ষ। তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ বাড়ীতে অবান্তর বিষয়! শুধু কি এই? মায়ের নাম করিয়া বলিল, বাক্‌দান মানেই সম্প্রদান, বলিল নিরপরাধ সুধীরের শূন্য আসনে গিয়া দয়াময়ীর ছেলে বসিবেনা। কিন্তু অপমানের পাত্র ইহাতেও পূর্ণ হইল না, তাহার চোখে জল দেখিয়া সে অবশেষে দয়ার্দ্র চিত্তে মাত্র এইটুকু কথা দিয়াছে যে বন্দনার এই বেহায়া-পণার কাহিনী মায়ের কাছে সে উল্লেখ করিবে।

আবার এইখানেই কি শেষ? দ্বিজদাসের কথার উত্তরে সে যাচিয়া বলিয়াছিল এই পরিবারে যেখানে যে-কেহ আছে সকলের ছোট হইয়াই সে আসিতে চায়! আর সে ভাবিতে পারিল না, কাঠের মূর্ত্তির মতো সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল প্রকৃতই সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেছে,—এত ছোট যে আত্মঘাতী হইয়া মরিলেও এ হীনতার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বাহিরে হইতে কে আসিয়া জানাইল রায় সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। উঠিয়া সে পিতার ঘরে গেল, সেখানে তাঁহাকে বারংবার জিদ্‌ করিয়া সম্মত করাইল কালই তাঁহাদের বোম্বায়ে রওনা হইতে হইবে। অথচ, কথা ছিল বিপ্রদাস ফিরিয়া আসিলে রাত্রের ট্রেনে তাঁহারা যাত্রা করিবেন। হঠাৎ এইভাবে চলিয়া যাওয়াটা যে ভালো হইবেনা ইহাতে সাহেবের সন্দেহ ছিলনা,—ছুটিও ছিল স্বচ্ছন্দে থাকাও চলিত তথাপি কন্যার প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজি হইতে হইল।

বিছানায় শুইয়া বন্দনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তারপরে একসময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া সে নিজের এবং বাপের জিনিষ-পত্র সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল, ফোন্ করিয়া গাড়ী রিজার্ভ করিল, বোম্বায়ে তার করিয়া দিল, সন্ধ্যায় ট্রেন কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার বিলম্ব সহেনা।

বেলা তখন ন'টা বাজিয়া গেছে অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—এ কি কাণ্ড ?

বন্দনা ময়লা কাপড় গুলা ভাঁজ করিয়া একটা তোরঙ্গে তুলিতেছিল কহিল, আজ আমরা যাবো।

—সে তো আজ নয় দিদিমণি। যাবার কথা যে কাল।

—না, আজই যাওয়া হবে। এই বলিয়া সে কাজ করিতেই লাগিল মুখ তুলিলনা।

অন্নদা এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি উঠুন আমি গুছিয়ে দিচ্চি। আপনার কষ্ট হচ্চে।

—কষ্ট দেখবার দরকার নেই তোমার নিজের কাজে যাও তুমি। এ বাড়ীর সমস্ত লোকের প্রতি যেন তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেছে।

হেতু না জানিলেও একটা যে রাগারাগির পালা চলিতেছে অন্নদা তাহা জানিত। হঠাৎ মা কাল বাড়ী চলিয়া গেলেন আজ বন্দনাও তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত। কিন্তু রাগের বদলে রাগ করা অন্নদার প্রকৃতি নয়, সে যেমন সহিষ্ণু তেমনি ভদ্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, আমার দোষ হয়ে গেছে দিদিমণি, আজ সময়ে আমি উঠতে পারিনি।

বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল আমি ত তার কৈফিয়ৎ চাইনি অন্নদা, দরকার হয় তোমার মনিবকে দিও। দ্বিজুবাবু তাঁর ঘরেই আছেন তাঁকে বলোগে। এই বলিয়া সে পুনরায় কাজে মন দিল। বন্দনা পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া একটুখানি বেশি আদরেই প্রতিপালিত। সহ্য করার শক্তিটা তাহার কম। কিন্তু তাই বলিয়া কটু কথা বলার কুশিক্ষাও তাহার হয় নাই এবং হয়ত এতবড় কঠোর বাক্যও সে জীবনে কাহাকেও বলে নাই। তাই বলিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে অন্নদাই সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন, ফর্সা হয়েছে দেখে ভাবলুম আর শোবোনা, শুইনিও, কিন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে কি করে চোখ জড়িয়ে এলো কোথা দিয়ে বেলা হয়ে গেল টের পেলুমনা। মনিবের কথা বলচেন দিদিমণি, কিন্তু আপনিও কি আমার মনিব নয় ? বলুন ত, এ অপরাধ আর কখনো কি আমার হয়েছে ? উঠুন আমি গুছিয়ে দিই।

শেষের দিকের কথাগুলো বোধহয় বন্দনার কানে যায় নাই, অন্নদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল ডাক্তাররা চলে গেলেন মানে ?

অন্নদা কহিল, কাল রাত্তিরে দ্বিজুর ভারি অসুখ গেছে। এখানে এসে পর্য্যন্তই ওর শরীর খারাপ কিন্তু গ্রাহ্য করেনা। কাল মাদের নিয়ে বাড়ী যাবার কথায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে মা যেননা জানতে পারেন কিন্তু দাদাকে বলে আমার যাওয়াটি মাপ করে দাও অনুদিদি, আজ যেন আমি উঠতে পারচিনে এমনি দুর্ব্বল।

—ওকে মানুষ করেছি ওর সব কথা আমার সঙ্গে। ভয় পেয়ে বল্‌লুম সে কি কথা? শরীর খারাপ ত লুকচ্চো কেন? ওর স্বভাবই হলো হেসে উড়িয়ে দেওয়া তা সে যত গুরুতরই হোক। তেমনি একটুখানি হেসে বললে তুমি ওঁদের বিদেয় করোনা দিদি তারপরে আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। ভাবলুম মা'র সঙ্গে ওর বনেনা কোথাও সঙ্গে যেতে চায় না এবুঝি তারই একটা ফন্দি। তাই কিছু আর বললুম না বড়দাদাবাবু ওঁদের নিয়ে চলে গেলেন। তারপরে সমস্তদিনটা ও শুয়ে কাটালে, কিছু খেলেনা। দুপুরবেলা গিয়ে জিজ্ঞেসা করলুম, দ্বিজু কেমন আছো? বল্‌লে ভালো আছি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে তা মনে হলোনা। ডাক্তার আনাতে চাইলুম, দ্বিজু কিছুতে দিলে না, বল্‌লে কেন মিছে দাদার অর্থদণ্ড করাবে দিদি, তোমার অপব্যয়ের কথা শুনলে গিন্নী রাগ করবেন। মায়ের ওপর এ অভিমান ওর আর গেলনা। সমস্তদিন খেলেনা, বিছানায় শুয়ে কাটালে; বিকেলে গিয়ে জিজ্ঞেসা করলুম দ্বিজু, শরীর যদি সত্যিই খারাপ নেই তবে সমস্তদিন শুয়ে কাটাচ্চোই বা কেন? ও তেমনি হেসে বললে, অন্নুদিদি শাস্ত্রে লেখা আছে শুয়ে থাকার মতো পুণ্য কাজ জগতে নেই, এতে কৈবল্য মেলে। একটু পারত্রিক মঙ্গলের চেষ্টায় আছি। তোমার ভয় নেই। সব তাতেই ওর হাসি-তামাসা, কথায় পারবার জো নেই, রাগ করে চলে এলুম কিন্তু মনের ভয় ঘুচলো না। ও একখানা বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলে।

অন্নদা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, রাত্রি বোধকরি তখন বারোটা আমার দোরে ঘা পড়লো। কে রে? বাইরে থেকে জবাব এলো অনুদিদি আমি। দোর খোলো। এতরাত্রে দ্বিজু ডাকে কেন, ব্যস্ত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এলুম,—দ্বিজুর একি মূর্ত্তি! চোখ কোটরে ঢুকেছে, গলা ভাঙা, শরীর কাঁপচে,—কিন্তু তবু হাসি। বল্‌লে দিদি, মানুষ করেছিলে তাই তোমার ঘুম ভাঙালুম। যদি চোখ বুজতেই হয় তোমার কোলেই মাথা রেখে বুজ্‌বো। এই বলিয়া অন্নদা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না যেন থামিতে চাহেনা এমনি ভিতরের অদম্য আবেগ। আপনাকে সামলাইতে তাহার অনেকক্ষণ লাগিল, তারপরে কহিল, বুকে করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলুম কিন্তু যেমন কাট বমি তেমনি পেটের যন্ত্রণা—মনে হলো রাত বুঝি আর পোহাবে না কখন্ নিশ্বাসটুকু বা বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তারদের খবর দেওয়া হলো তাঁরা সব এসে পড়লেন, গা ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন, গরম জলের তাপ-সেক চলতে লাগলো—চাকররা সব জেগে বসে—ভোরবেলায় দ্বিজু ঘুমিয়ে পড়লো। ডাক্তাররা বললে আর ভয় নেই। কিন্তু কি ভাবে যে রাতটা কেটেছে দিদিমণি, ভাবলে মনে হয় বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেচি—ওসব কিছুই হয়নি। এই বলিয়া অন্নদা আবার আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, আমি কিছুই জানতে পারিনি আমাকে তুললেনা কেন অন্নদা?

অন্নদা কহিল, সকালে ঐ একটা অশান্তি গেলো আর তোমাকে ব্যস্ত করলুমনা দিদিমণি। নইলে দ্বিজু বলেছিলো।

বন্দনা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল, কহিল দ্বিজুবাবু এখন কেমন আছেন?

অন্নদা কহিল, ভালো আছে, ঘুমোচ্চে। ডাক্তাররা বলে গেছেন হয়ত সন্ধ্যার আগে আর ঘুম ভাঙবে না। বড়বাবু এসে পড়লে বাঁচি দিদি।

—তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

—না। দত্তমশাই বলেন তার আবশ্যক নেই তিনি আপনিই আসবেন।

—ও-ঘরে লোক আছে ত ?

—হাঁ দিদিমণি, দুজন বসে আছে।

—ডাক্তার আবার কখন আসবেন ?

—সন্ধ্যার আগেই আসবেন। বলে গেছেন আর ভয় নেই।

চিকিৎসকেরা অভয় দিয়ে গেছেন বন্দনার এইটুকুই সান্ত্বনা। এ ছাড়া তাহার কি-ই বা করিবার আছে !

বন্দনা গিয়া পিতাকে দ্বিজদাসের পীড়ার সংবাদ দিল কিন্তু বেশি বলিলনা। তিনি সেইটুকু শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—কৈ আমি ত কিছুই জানতে পারিনি ?

—না, আমাদের ঘুম ভাঙানো কেউ উচিত মনে করেননি।

—কিন্তু সেটা ত ভালো হয়নি।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল, তিনি ক্ষণেক পরে নিজেই বলিলেন, এদিকে টিকিট কিনতে পাঠানো হয়েছে, গাড়ী রিজার্ভ হয়ে গেছে, আমাদের যাওয়ায় ত দেখচি একটু বিঘ্ন ঘট্‌লো।

বন্দনা বলিল, কেন বিঘ্ন হবে বাবা, আমরা থেকেই বা তাঁদের কি উপকার করবো ?

—না উপকার নয়, কিন্তু তবু—

—না বাবা, এমনি করে কেবলি দেরি হয়ে যাচ্চে আর তুমি মত বদলোনা। এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া আসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে বন্দনার ঘরে ঢুকিয়া অন্নদা মেঝের উপর বসিল। তাঁহাদের যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরি। বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজুবাবু ভালো আছেন ?

—হাঁ দিদি ভালো আছে, ঘুমুচ্চে।

বন্দনা কহিল, আমাদের যাবার সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হলোনা। একজনের তখনো হয়ত ঘুম ভাঙবেনা আর একজন যখন বাড়ী এসে পৌছবেন তখন আমরা অনেকদূর চলে গেছি।

অন্নদা সায় দিয়া বলিল, হাঁ বড়দাদাবাবু আসবেন প্রায় ন'টা রাত্তিরে। একটু পরে কহিল, তিনি এসে পড়লে সবাই বাঁচি, সকলের ভয় ঘোচে।

—কিন্তু ভয়ত কিছু নেই অন্নদা।

অন্নদা বলিল, নেই সত্যি কিন্তু বড়দাদাবাবুর বাড়ীতে থাকাই আলাদা জিনিস দিদি। তখন কারও আর কোন দায়িত্ব নেই, সব তাঁর। যেমন বুদ্ধি তেমনি বিবেচনা তেমনি সাহস আর তেমনি গাম্ভীর্য্য। সকলের মনে হয় যেন বট গাছের ছায়ায় বসে আছি।

সেই পুরাতন কথা সেই বিশেষণের ঘটা। মনিবের সম্বন্ধে এ যেন ইঁহাদের মজ্জাগত হইয়াছে। অন্য সময় হইলে বন্দনা খোঁটা দিতে ছাড়িতনা কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিল। অন্নদা বলিতে লাগিল, আর এই দ্বিজু। দুই ভায়ে যেন পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ।

বন্দনা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

অন্নদা বলিল, তা' বইকি দিদি। না আছে দায়িত্ব বোধ না আছে ঝঞ্ঝাট না আছে গাম্ভীর্য্য। বৌদি বলেন ও হচ্চে শরতের মেঘ না আছে বিদ্যুৎ না আছে জল। উড়ে উড়ে বেড়ায়, ব্যাপার যত গুরুতর হোক হেসে খেলে ও কাটাবেই কাটাবে। না গৃহী না বৈরিগী, কত খাতক যে ওর কাছে 'বুঝিয়া পাইলাম' লিখিয়ে নিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে তার হিসেব নেই।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যে মশাই রাগ করেননা?

—করেননা? খুব করেন। বিশেষ মা। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে কোথায়? কিছু দিনের মতো এমন নিরুদ্দেশ হয় যে বৌদি কান্নাকাটি সুরু করে দেন তখন সবাই মিলে খুঁজে ধরে আনে। কিন্তু এমন করেও ত চিরদিন কাটতে পারে না দিদি, ওরও বিয়ে হবে, ছেলে-পুলে হবে, তখন যে এ ব্যবস্থায় একেবারে দেউলে হতে হবে।

বন্দনা কহিল, এ কথা তোমরা ওঁকে বলোনা কেন?

অন্নদা কহিল, ঢের বলা হয়েছে কিন্তু ও কান দেয়না। বলে, তোমাদের ভাবনা কেন? দেউলেই যদি হই বৌদিদি ত আর দেউলে হবেনা তখন সকলে মিলে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চাপবো।

বন্দনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি কি বলেন?

অন্নদা কহিল, দেওরের ওপর তাঁর আদরের শেষ নেই। বলেন, আমরা খাবো আর দ্বিজু উপোস করবে নাকি? আমার পাঁচশ টাকা আয় তো আর কেউ ঘুচোতে পারবেনা আমাদের গরিবী-চালে তাতেই চলে যাবে। বড়বাবু তাঁর লক্ষ-লক্ষ টাকা নিয়ে সুখে থাকুন আমরা চাইতে যাবোনা।

শুনিয়া বন্দনার কি যে ভালো লাগিল তাহার সীমা নাই। যে বলিয়াছে সে তাহারই বোন। অথচ, যে-সমাজে, যে আবহাওয়ার মধ্যে সে নিজে মানুষ সেখানে এ কথা কেহ বলেনা হয়ত ভাবিতেও পারেনা। বলার কখনো প্রয়োজন হয় কিনা তাই বা কে জানে। কিন্তু অন্নদা যাহা বলিতেছিল সে যেন পুরাকালের একটা গল্প। ইহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার, কেবল বাহিরের আকৃতিতে নয়, ভিতরের প্রকৃতিতে। অন্নদা এখানে শুধু দাসী নয়, দ্বিজদাসের সে দিদি। কেবল মৌখিক নয়, আজও সকল কথা তাহার ইহারই কাছে। এই অন্নদার বাবা এই পরিবারের কর্ম্মে গত হইয়াছে, তাহার ছেলে এখানে মানুষ হইয়া এখানেই কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অন্নদার অভাব নাই তবু মায়া কাটাইয়া তাহার যাবার জো নাই। এই সমৃদ্ধ বৃহৎ পরিবারে অনুবিদ্ধ এমন কতজনের পুরুষানুক্রমের ইতিহাস মিলে। দয়াময়ীর অবাধ্য সন্তান

দ্বিজদাসও কাল বলিয়াছিল তাহার মা দাদা বৌদি, তাহাদের গৃহদেবতা, অতিথিশালা সমস্ত লইয়াই সে,—তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া বন্দনার কোনদিন তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন বন্দনা অস্বীকার করে নাই বটে তবু আজই একথার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিল।

কথা শেষ হয় নাই, অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া জানাইল রায় সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ছ'টা বাজিয়াছে। যাত্রা করিবার সময় একঘণ্টার বেশি নাই। প্রস্তুত হইবার জন্য বন্দনাকে উঠিতে হইল।

যথাসময়ে রায়-সাহেব নীচে নামিলেন, নামিতে নামিতে মেয়ের নাম ধরিয়া একটা হাঁক দিলেন বন্দনার কানে আসিয়া তাহা পৌঁছিল। অন্যায় যতবড় হোক, অনিচ্ছা যত কঠিন হোক যাইতেই হইবে। বারংবার জিদ্ করিয়া যে ব্যবস্থা নিজে ঘটাইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন চলিবেনা। ঘর হইতে যখন বাহির হইল এই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে হইল ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিন কোন ছলেই এখানে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনেক সুখের স্বপ্ন দিয়া যে এই ঘরখানি পূর্ণ হইয়া রহিল তাহা কোন কালে ভুলিতে পারিবেনা। সোজাপথ ছাড়িয়া দ্বিজদাসের পাশের বারান্দা ঘুরিয়া নামিবার সময়ে সে ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফিরাইল কিন্তু যে-জানালাটা খোলা ছিল তাহা দিয়া দ্বিজদাসকে দেখা গেলনা।

মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া দত্তমশাই, রায়-সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া ভৃত্যদের দেবার জন্য অনেকগুলা টাকা হাতে দিলেন এবং হঠাৎ যাবার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দ্বিজদাসের খবরটা তাঁহাকে অতিশীঘ্র জানাইবার অনুরোধ করিলেন।

গাড়িতে উঠিবার পূর্ব্বে বন্দনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল, দ্বিজুবাবুর তুমি দিদি, তাঁকে মানুষ করেছো,—এই আঙটিটি তোমার বৌমাকে দিও অনুদিদি সে যেন পরে, এই বলিয়া হাতের আঙটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়াই বাবার পাশে গিয়া বসিল।

মোটর ছাড়িয়া দিল। এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও দত্তমশায় নমস্কার করিল।

বন্দনা নিজের অজ্ঞাতসারেই উপরে চোখ তুলিল কিন্তু আজ সেখানে আর একদিনের মত সকলের অগোচরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে বিদায় দিতে দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া নাই। আজ সে পীড়িত,—আজ সে নিদ্রায় অচেতন।

ক্রমশঃ

শরৎচন্দ্র



রাজা রামমোহন

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় রাজা রামমোহন, চিরঞ্জীব, ব্রাহ্মণ-প্রবর,
জানায়েছ বার্ত্তা তার, মর্ত্ত্যে যাহা করে গো অমর।
মরু-তলে মায়া-জলে হে পিয়াসী, জন্মেনি বিভ্রম,
প্রতিভার অগ্রগতি ভয়েরে করেছে অতিক্রম।
সে দীক্ষা দাওনি যাহা মানুষেরে করে ক্রীতদাস,—
উদয়-উৎসবে তব পূর্ব্বাশায় আলোর উল্লাস।
উন্নতির অন্তরায়, বাধা-বিঘ্ন, ভেদের কারণ
হরণ করিতে তব আবির্ভাব, হে প্রিয়-দর্শন,
সামাজিক নানা মিথ্যা, অমঙ্গল-দানবে দলিয়া
বোধায়ন-মন্ত্রবিৎ সত্য-লোকে গিয়াছ চলিয়া।
সমুদ্র-মহিষী গঙ্গা ধায় যথা ঈপ্সিতের তরে
জাতিকুল-নির্ব্বিচারে, নিষ্কলুষ করি' নারী-নরে।
পাবনী তোমার বাণী চমকিয়া মগ্ন-চেতনায়
মদমত্ত ঐরাবতে ভাসায়েছে আষাঢ় ধারায়।
পুণ্য কর্ম্ম-ফলে হেথা যশোভাতি করিয়া অর্জ্জন
শুভ তব শেষ যাত্রা, লভিয়াছ নিত্য নিকেতন।
কঠোর তপস্যা করি' মিশিয়াছ ঋষির সমাজে,
উদ্‌ঘোষিত নাম তব, শতাব্দীর স্মৃতি-ডঙ্কা বাজে।

আকাশের সম সূক্ষ্ম, অগ্নি যা'রে পারে না পোড়াতে,
অ-খণ্ডিত রহে যাহা পুনঃ পুনঃ খড়্গের
আঘাতে,—
সম্পদে মোহিত হয়ে, সে চিন্মণি হওনি বিস্মৃত,
পেয়েছ নির্ম্মল নেত্র, কীর্ত্তি তব অটল-অজিত।
মানুষী মুরতি ধরি' বিশালাক্ষী শ্রুতি-সরস্বতী
মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে দেখেছেন তোমার আরতি।
পশিয়াছ জ্ঞানময় অনন্তের সর্ব্বোচ্চ মন্দিরে,
শুনেছ ওঙ্কার-স্পন্দ ; মোক্ষভূমি ভারতের তীরে,
যুগে যুগে কল্পান্তরে, ভেসে আসে যে লীলা-কমল,
যার মধু-বিন্দু লাগি' বিশ্বপ্রাণ আকুতি-পাগল,
নাগাল পেয়েছ তা'র, রূপ দেখে চিনেছ অরূপ,
অনাদি রসের উৎসে লভিয়াছ আনন্দ অনুপ।
জগৎ-তরঙ্গ ছোটে যে পরম পদের উদ্দেশে,
যে পদ ব্যথিত নহে প্রলয়ের মহানৃত্য শেষে
যেথা তুমি আছ সেথা পৌঁছে নাকি এ প্রশস্তি-
সাম ?
অজানা সে ঠিকানায় পাঠাইনু প্রাণের প্রণাম।

অভিজ্ঞান

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

কিছু পূর্ব্বে যেখানে চলেছিল নিদারুণ নির্ম্মমতার অট্টরোল সহসা সে স্থান মগ্ন হ'ল সুগভীর স্তব্ধতায় এবং অন্ধকারে। বৃষ্টি কিছু পূর্ব্বে থেমে গিয়েছিল, শুধু ফোঁটা ফোঁটা পাতা-ঝরা জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে লণ্ঠন দুটো ছিল তার কোনো অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছিল না। একটাকে হাতে নিয়ে একজন পাল্কী-বেহারা পালিয়ে গিয়েছিল, এবং অপরটাকে দুর্বৃত্তেরা লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছিল অন্ধকারকে আরও গাঢ় করবার অভিপ্রায়ে।

পাল্কীর ভিতর প্রিয়লালের যখন চৈতন্য হ'ল তখন প্রথমে সে মনে ভাবলে স্বপ্নেরই জের চ'লেছে, ঘুম তখনো সম্পূর্ণ ভাঙেনি,—কিন্তু শরীরটাকে একটু নাড়া দিতেই আহত পায়ের তীব্র বেদনার মধ্য দিয়ে ফিরে এল সমস্ত ঘটনার পরিপূর্ণ স্মৃতি। সন্ধ্যার খবর নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পাল্কী থেকে নাম্‌তে গিয়েই দেখ্‌লে পায়ের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারে তা অসম্ভব। একটা নিদারুণ হতাশা এবং দুশ্চিন্তার তাড়নায় সমস্ত দেহটা অবশ হ'য়ে এল। পরক্ষণেই মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক জড়তাকে অতিক্রম ক'রে সে উচ্চস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—সন্ধ্যা! তমসাবৃত শুব্ধ অরণ্য সেই সহসা-উচ্চারিত শব্দের আঘাতে চকিত হয়ে উঠ্‌ল,—কিন্তু উত্তরে কোনো দিক থেকেই কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। আরও তিন চার বার সন্ধ্যাকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে কোনো ফল লাভ না ক'রে সে স্থির করলে সন্ধ্যা নিশ্চয় তার পাল্কীতে ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। অতি কষ্টে কোনো রকমে পাল্কী থেকে মুখ একটু বাহির ক'রে প্রিয়লাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে ডাক্‌লে "রূপন সিং!" তলোয়ারধারী পাইকের নাম রূপন সিং।

নিকটবর্ত্তী ঝোপের মধ্যে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল এবং তারপরেই সে দিক থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—মহ্‌রাজ!

"তুম্ কীধর হ্যায়?"

"ঈধর্ মহ্‌রাজ!"

নিরর্থক উত্তর। বিরক্তিভরে প্রিয়লাল বল্‌লে, "সাম্‌নে আও।"

ঝোপের মধ্যে রূপন সিং খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, তারপর সন্তর্পণে প্রিয়লালের পাল্কীর সামনে এসে করজোড়ে আর্ত্তস্বরে বল্‌লে, "হুকুম মহ্‌রাজ!"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রিয়লাল বল্‌লে, "বহুমায়জীকা কিয়া হাল হ্যায়?"

ঝোপের ভিতর থেকে রূপন সিং সমস্ত ব্যাপারই নিরীক্ষণ করেছিল, কিন্তু নিদারুণ দুঃসংবাদের কথা নিজমুখে প্রকাশ করতে সে ভয় পেলে; বল্‌লে, "বেগর বত্তি অব্ কা কহা যায় মহ্‌রাজ! সুঝৎ কুছ্ নইখে হু!"

উত্তর শুনে প্রিয়লাল ক্রোধে আগুন হয়ে উঠ্‌ল। কঠিন স্বরে তর্জ্জন ক'রে বল্‌লে, "নিকালো ঢুঁড় কর্ বত্তি!"

সেই গভীর অন্ধকারে বন জঙ্গলের মধ্যে লণ্ঠন খুঁজে বার করা কঠিন কাজ, কিন্তু প্রভুর কঠোর আদেশে সে কাজে রূপন সিংকে প্রবৃত্ত হ'তেই হ'ল। সে ব'সে ব'সে চতুর্দ্দিক হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজতে লাগ্‌ল।

প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে ডাক্‌লে, "ক্ষীরোধর সিং!" ক্ষীরোধর সিং অপর পাইকের নাম।

ক্ষীরোধর সিং-এর পক্ষ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া গেল না কিন্তু উত্তর দিলে ব'সে-ব'সে হাতড়াতে হাতড়াতে রূপন সিং-ই। বল্‌লে, "ক্ষীরোধর সিংকো ডাকুলোগ জান্‌সে মার দিয়া মহ্‌রাজ!"

শুনে প্রিয়লাল দুঃখে এবং আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ল! অনেকদিনের প্রভুভক্ত পুরাতন ভৃত্য, অবশেষে এমন ভাবে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ হারালো! রূপন সিং ত' সবে ছ মাসের আরা জিলার আমদানী। সন্ধ্যাই বা এখন কি অবস্থায় কোথায় অবস্থান করছে সে দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের সমস্ত

দেহ-মন আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পাল্কী থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, পায়ে এত অসহ্য বেদনা। সে ব্যগ্রস্বরে রূপন সিংকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান্ সে মার দিয়া সো তুমকো কৈসে মালুম হুয়া ?"

রূপন সিং বল্‌লে, "উয়ো খুদ আপ্ হি কহা মহ্‌রাজ !"

রূপন সিংএর কথার অপূর্ব্ব যুক্তিতে প্রিয়লাল বিরক্তিতে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল, "মুরদা তুমকো আপসে কহা যো মর গিয়া ?"

প্রিয়লালের বোধশক্তির শোচনীয় অভাব দেখে রূপন সিংএর বিস্ময় এত বেশী হ'ল যে, তার তাড়নায় সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে উঠে দাঁড়ালো। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল ক'রে বল্‌লে, "গিরতেহি ক্ষীরোধর সিংনে কহা, জান্ লিয়া ; পিছে, পুকারনে সে হর্‌গিজ্ বোলৎ নৈথন্। অব ইস্‌সে দুস্‌রা বিচার ক্যা কিয়া যায় মহ্‌রাজ ?"

রূপন সিংএর যুক্তির বিরুদ্ধে প্রিয়লাল কি বল্‌ত বা বল্‌ত না তা বলা যায় না, কিন্তু তার আর অবসর হ'ল না, অন্ধকারের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক টল্‌তে টল্‌তে এসে প্রিয়লালের পাল্কীর সম্মুখে আছ্‌ড়ে পড়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, "সব্বনাশ হয়ে গেছে দাদাবাবু—"

উন্মত্তের মত প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "কি হয়েচে মতি ?"

"ওগো দাদাবাবু, বউরাণীকে ডাকাতরা ডুলি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছে !"

কোথায় রইল প্রিয়লালের আহত পায়ের বেদনা,—কোথায়ই বা রইল তার ত্রস্ত মনের জড়তা,—একটা বিকট আর্ত্তনাদ ক'রে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে পাল্কীর বাইরে এসে দাঁড়াল, তারপর ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ দিকে মতি, কোন্ দিকে তারা গেছে ?"

কাঁদতে কাঁদতে হাত দিয়ে দিক নির্দ্দেশ ক'রে মতি বল্‌লে, "পথের বাঁ দিকে গো দাদাবাবু !"

পাগলের মতো প্রিয়লাল পথ-পার্শ্বের নালী অতিক্রম ক'রে ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলে। মুখে তার সন্ধ্যা সন্ধ্যা ডাক, পায়ে অসংযত অনির্ণীত চপল গতি, বুদ্ধির একটা দিক দিয়ে সে বেশ বুঝ্‌তে পারছে যে এই অজানা অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে সন্ধ্যার সন্ধান খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতার আগ্নেয়গিরি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকাও'ত একই রকম অসম্ভব।

পাল্কী-বেহারাদের মধ্যে একজন ছিল, নাম তার মোহন। মাথায় চোট্ খেয়ে সে অচেতন হ'য়ে পথের পাশে প'ড়ে ছিল, প্রিয়লাল এবং রূপনসিং-এর কথার শব্দ পেয়ে তার চেতনা ফিরে আসে। বয়স তার ষাট বৎসর অতিক্রম ক'রে গেছে, মাথায় আধাআধি কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু শুধু ঐ পর্য্যন্তই ;—তার বেশিএক ইঞ্চিও জরা তার শরীরে অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। মোহনের গায়ে পঁচিশ বৎসরের যুবাপুরুষের বল ; শরীরের গঠন দীর্ঘ অনবনত, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া ; পাল্কী বইবার সময় লোকাভাব হ'লে স্বেচ্ছায় সে একাই দুজনের কাঁধ দেয়। জাতে সে গয়লা, সাবেককেলে লোক, জহরলালের পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে কুস্তি লড়া ছিল তার যৌবনকালের কাজ। সে দৌড়ে গিয়ে দু-হাত দিয়ে প্রিয়লালকে আট্‌কে ধরে দাঁড়াল ; বল্‌লে, "ও কাজ কোরোনা ছোটবাবু, রেতের বেলা মিছিমিছি বনের মধ্যে সেঁধিয়ো না, বর্ষাকালে পোকা-মাকড়ের ভয় আছে। এই পরশুদিন এই পথেই একটা লোক পোকার কামড়ে ম'রে গেল।"

প্রিয়লাল মোহনকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লে, "মোহন, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি যাবই।"

দুহাতে প্রিয়লালকে জড়িয়ে ধ'রে মোহন বল্‌লে, "কোথা যাবে ছোটবাবু, তারা কি এখানে ব'সে আছে ? এতক্ষণে কোশ খানেক রাস্তা চলে গেছে। তাদেরও পাবে না, নিজেও পথ হারাবে। তার চেয়ে তুমি পাল্কীতে বস্‌বে চল, আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি। তা'তে কাজ হবে।"

"কিন্তু সে সময়ে তোমরা অত সহজে পাল্কী ফেলে পালিয়ে গেলে কেন মোহন ?"

"পালাই নি ছোটবাবু। কি করব বল ? পিছন থেকে হঠাৎ এসে মাথায় দিলে চোট, মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়লাম। সমুখ দিক থেকে এলে তাদের নিদেন পাঁচটাকে না নিয়ে মোহন গয়লা ভুঁই নিতো না ! কি বলব বল হুজুর,

একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চ'লে গেল, মহারাজের কাছে কি ক'রে মুখ দেখাবো জানিনে! এখন চল, তোমাকে পাল্কীতে বসিয়ে একটা সল্লা ক'রে বেরিয়ে পড়ি।"

"শুধু হাতে যাবে?"

"শুধু হাতে নয়,—সক্কলের লাঠি আছে পাল্কীর নীচে বাঁধা।"

প্রিয়লাল ব্যগ্রস্বরে বল্লে, "আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব মোহন!"

প্রিয়লালের কথা শুনে মোহন একটু যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠ্‌ল; বল্লে, "এ সময়ে বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট কোরো না ছোটোবাবু, তুমি কি আমাদের সঙ্গে এই আঁধারে বন-বাদাড় ভেঙে চল্‌তে পারবে? এখনো ছুটে গেলে যদি কোনো রকমে তাদের ধরতে পারি। এ বন ছেড়ে অন্য বনে ঢুকলে আর কিনারা লাগাতে পারব না।"

মোহনের কথা শুনে প্রিয়লাল আর কোনও কথা না ব'লে তার কাঁধে ভর দিয়ে পাল্কীর কাছে ফিরে এল। এসে দেখ্‌লে ক্ষীরোধর সিং মরে নি, পাল্কীর কাছে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রিয়লালকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল; বল্লে, "হামি জিন্দা আছি এ বহুৎ লজ্জার কথা মহ্‌রাজ! বহুরাণীকে হামি রক্‌ছা করতে পারলামনা, হামার জান্ গেলে ভালো ছিলো!"

প্রিয়লাল উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে মোহন বল্লে, "তোমার বন্দুক কোথায় সেপাইজী?"

বন্দুকটি ক্ষীরোধর সিং খুঁজে বার করেছিল; বল্লে, "বন্দুক ঊ কা আছে।"

"বহুরাণীর তল্লাসে আমরা যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?"

"বহুরাণীর ওয়াস্তে জান্ দিতে পারে, আর তাল্লাসে যেতে পারবে না?—আলবাৎ যেতে পারবে।"

তখন মোহন সহসা সমস্ত অরণ্য কম্পিত করে অতিশয় উচ্চস্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। উত্তরে দূর থেকে মনুষ্যকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল।

তেমনি উচ্চস্বরে মোহন চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "হা—আ—জির!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সকল পাল্কী-বেহারা এসে উপস্থিত হ'ল, শুধু রঘু নামে এক জনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সে সকলের অগোচরে সোজা ঝাড়গ্রাম চ'লে গিয়েছিল জহরলালকে ডাকাতির সংবাদ দেবার জন্তে।

মিনিট দুই তিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে একটা মোটা-মুটি পরামর্শ ক'রে নিয়ে ডাকাতরা যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে মোহন সদলে বেরিয়ে পড়ল। সকলের হাতে লাঠি, ক্ষীরোধর সিংএর হাতে বন্দুক। রূপন সিংকে এবং একজন বেহারাকে তারা রেখে গেল প্রিয়লাল এবং মতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। লণ্ঠনটাও রেখে গেল তাদেরই নিকট।

লণ্ঠন নিয়ে মতির কাছে রূপন সিং আর পাল্কী-বেহারাকে বস্‌তে ব'লে প্রিয়লাল ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করলে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও এই শয্যা সন্ধ্যাকে ধারণ ক'রেছিল! সন্ধ্যা,—তার সুখ-সৌভাগ্যলক্ষ্মী সন্ধ্যা,—তার অন্তরের অমূল্য সম্পদ সন্ধ্যা! এখনো যেন শয্যার মধ্যে তার মধুময় স্পর্শটুকু লেগে রয়েছে! উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয়লাল সমস্ত দেহ বিস্তার করে শয্যার উপর শুয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্‌ল। নিরুপায় দুর্ভাগ্যের এ কি মর্ম্মন্তুদ গ্লানি!—বিগত কয়েক দিনের অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগের কথা মনে পড়ল,—মনে পড়ল নদীর ওপারের সুদীর্ঘ পথের কাব্য-যাপনার স্মৃতি! যে অদৃষ্ট দস্যু নিমেষের মধ্যে সে-সকল এমন ক'রে অপহরণ করলে সমস্ত মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠ্‌ল!

রাত্রি দশটার সময়ে দূরে মনুষ্য কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রিয়লাল পাঁচ সাতটা আলো দেখ্‌তে পেলে। অবুঝ মন মনে করলে সন্ধ্যাকে নিয়েই বা তারা ফিরে আস্‌ছে। এসে উপস্থিত হলেন জহরলাল,—পুলিস আর লোকজন নিয়ে,—সঙ্গে রঘু বেহারা।

"বউমার কোনো সন্ধান পেয়েছ প্রিয়?—পাওয়া গেছে তাঁকে?"

মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বল্লে, "না।"

"লোকজনেরা কোথায়?"

খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে।"

নূতন দল অবিলম্বে আর একদিকে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত ধ'রে চল্‌ল সারা অরণ্য তোলপাড় করে অধীর অন্বেষণের পালা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন পুনরায় নূতন উদ্যমে তারা চতুর্দ্দিকে সন্ধ্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধারে ধারে, বনের ঝোপে ঝাড়ে, দু তিন মাইল দূরান্তরের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে চল্‌ল অন্বেষণ। কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হ'ল।

অবশেষে পুলিশের হাতে অন্বেষণের ভার সমর্পণ ক'রে বধূহীন ভাগ্যহীন অস্নাত অভুক্ত প্রিয়লালকে সঙ্গে নিয়ে জহরলাল হাওড়াগামী দ্বিপ্রহরের রেলগাড়িতে এসে উঠ্‌লেন। অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা!—পীরনগরের চৌধুরী বংশের অম্লান গৌরব-পটে কলঙ্কের কুৎসিৎ রেখা! গাড়ি চল্‌তেই জহরলাল শয্যা গ্রহণ করলেন। (ক্রমশঃ)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পথের রোমান্স্

শ্রীসুধীরকুমার সেন

শীতকালে দিল্লী যায়গাটা বেশ। তাই এবার সেখানে ছুটী কাটাবো ঠিক্ করলাম। সময়টা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। রাত দু'টোর মে'লে যাবো কিন্তু ষ্টেশনে এসে বসে' আছি রাত দশটা থেকে, কারণ তা না হলে অমন অভদ্র সময়ে গাড়ী পাওয়া সম্ভব না। ট্রেন মাত্র দু'মিনিট দাঁড়ায়, জড়তা ভাঙ্গতেই ত ৬।৭ মিনিট কেটে যায়, তাতে আবার ভিতর থেকে দরজা বন্ধ থাকলে ত কথাই নেই, গাড়ীতে ওঠার আশা ত্যাগ করতে হয়। ঠিক্ তাই হলো, প্রাণপণে ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করেও কোনও গাড়ীর দরজা খোলাতে পারলাম না। বরং ভিতর থেকে বাংলা ইংরাজী উর্দ্দু, তেলেগু, পস্তু, নানাবিধ ভাষায় শ্রুতি সুখকর চোস্ত গালাগালী শুনতে পেলাম,—কাঁচা ঘুম ভাঙ্গলে যা হয়ে থাকে আর কি! এদিকে গার্ড-সাহেব ত নীল আলো হাতে করেছেন, আর সময় নেই। শেষে মরিয়া হয়ে একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে বল্লাম—ইংরাজীতে "আমার স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ, কোথাও স্থান পাচ্চিনা,—দয়া করে দরজাটা খুলুন"—ভিতর থেকে আলো জ্বালা হলো,—ভরসা পেয়ে আবার হেঁকে বল্লাম—"দোহাই ভগবানের, বড় বিপদে পড়েছি, উদ্ধার করুন"—গাড়ীর দরজা খুলে গেল, গাড়ীও ছেড়ে দিল। একলাফে সুটকেস্টা হাতে করে ভিতরে ঢুকলাম, কুলী বিছানাটা ছুঁড়ে দিল—

সামনে ফিরে দেখি একটি ইংরাজী বেশে বাঙ্গালীর মেয়ে, সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করছেন। আমি ফিরতেই তিনি বলে উঠ্লেন—"But where's your wife?"

তাইত! চট্‌করে জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে ষ্টেশনের শেষ নাম-ফলকটাকে উদ্দেশ করে'—বল্লাম—"ওগো! পরের ট্রেনেই চলে এসো, আর ঠাণ্ডায় বাইরে থেকোনা—হাত বাক্সটা"— গাড়ী প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়ে গেল। মুখে একটা আশঙ্কা ও বিরক্তির ভাব এনে জানলা থেকে সরে এলাম; দেখি আমার সহযাত্রিণী অবাক্ হয়ে' আমাকে দেখ্‌ছেন। নাঃ, স্ত্রীর অনেক মাহাত্ম্য আছে; শরৎবাবু তাঁর "নারীর মূল্য"তে নারী সম্বন্ধে এ কথাটা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন দেখ্‌ছি! এবারে ফিরে যেয়েই সব কয়টী চেনাশুনা মেয়েকে এক এক করে propose করে দেখ্‌তে হ'বে, যদি একজনও রাজী হয়! আমার সাময়িক স্ত্রীবিয়োগ-জনিত বিরহের বাড়াবাড়ি না দেখে বোধ হয় মেয়েটীর মনে সন্দেহ হয়েছিল; তাই একটা ধার-করা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে এনে ধপাস্ করে সাম্‌নের বেঞ্চটায় বসে' পড়লাম—মাথায় হাত দিয়ে—

তবু তাঁর মুখ চোখের ভাব দেখে বিশেষ ভরসা পেলাম না, হয়ত বা আমারই মনের ভুল,—হঠাৎ আবার দেশী মুখে বিদেশী টানে ও সুরে প্রশ্ন হলো—

"Why couldn't you take her in?"—বাহবা! এমন না হলে আর বুদ্ধি! দেখ্‌ছে যে ট্রেন চলতে আরম্ভ করার পরে আমি উঠ্‌লাম, তাতে আবার মেল ট্রেন, আরম্ভেই ছুট দেয়,—একেবারে যাকে বলে নক্ষত্র বেগে; তাতে আবার বাঙ্গালী ঘরের অবলা,—কি করে চড়্‌বে? গাড়ীর দরজাও এমন বড় নয় যে জড়িয়ে ধরে' "জোড়ে" উঠ্‌বো;—বল্লাম—

"দেখ্‌লেন ত উঠবার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল, নিজেই অতিকষ্টে উঠ্‌লাম; উনি অসুস্থ ছিলেন কিনা, তাই লাফিয়ে উঠ্‌তে পারলেন না, আর সে চেষ্টা যদি করতেও যেতেন তবে নিশ্চয়ই আমার এখুনি স্ত্রী বিয়োগ হ'তো—"

এবার বাংলায় উত্তর হলো—

"তাহলে আপনার নেমে যাওয়া উচিৎ ছিল।"

কি সূক্ষ্ম বিচার। সাধে দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে? আবার শুন্‌ছি নাকি হাইকোর্টেএ মেয়ে জজ্‌ হবে! ঐ চলন্ত ট্রেন থেকে নাম্‌তে গেলে স্ত্রী থাক্‌লেও সে যে নিশ্চয়ই বিধবা হতো! যাক্‌গে, বল্‌লুম—

"ওর সাথে অন্য লোক আছে, বিশেষ অসুবিধা হবে না, পরের ট্রেনেই চ'লে আস্‌বেন। রাতটা শুধু ষ্টেশনে কাটাতে হবে'।"

"The worst of these married men—" বলে' বিড়্‌বিড়্‌ করে' বকৃতে-বকৃতে বব্‌ করা চুলে একটা ঝাঁকানী দিয়ে, রাগ্‌টা বেশ ভাল করে' গায়ে জড়িয়ে তিনি বেঞ্চে বস্‌লেন, মুখ ফিরিয়ে বিশ্বের যত বিবাহিত পুরুষের পাপ অম্লান বদনে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে—সত্যই যদি নিজের স্ত্রী থাক্‌তেন, এবং তাঁকে অমন অসঙ্গত ভাবে মাঝ পথে ফেলে আস্‌তাম, তাহলে হয়ত এই মন্তব্য মাথা পেতে নিতাম, অন্ততঃ ঝগড়া করার মতো মানসিক অবস্থা তখন থাক্‌তো না। কিন্তু মনগড়া প্রেয়সীর এই সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিপদের জন্যে এতটা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলাম না; তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—

"The worst of these modern girls is that they form hasty judgments"—তিনি সবেগে এবং সশব্দে আমার দিকে ফিরে বস্‌লেন; বসে' বসে' যে এতটা বেগ দেওয়া সম্ভব তা জান্‌তাম না, মনে হলো যেন এখনি একটা বিস্ফোরণ হবে—

একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি, সে গাড়ীতে শুধু তিনি একা,—না, তাঁর একটা পোষা pake একটা বেঞ্চে শুয়েছিল। সেটাও এই সময়ে জেগে উঠে মিহি গলায় চীৎকার সুরু করে দিল।

"Just what do you mean?". গলার স্বর ও বলার ভঙ্গি শুনে মনে হলো যেন পাঞ্জাব মেলের বদলে ভুল করে Continental Expressএ চড়েছি,—যেমন হঠাৎ দশবিশটা উড়ে কণ্ঠের কাকলী শুন্‌লে আচম্‌কা মনে হয় যেন শ্রীধামে এসে পড়েছি:—

আমি ততক্ষণ কম্বলটা ও বালিশটা গুছিয়ে নিয়ে শোবার জন্যে তৈরী হচ্ছি, বল্‌লাম—

"I men just what I say"—বলে শুয়ে পড়্‌লাম। একবার Lords' Prayerটা আওড়ে দিই যদি ও পক্ষের ঘাড়ের ভূত নামে;—কিন্তু বাড়াবাড়ি হবে ভেবে সাম্‌লে নিলাম।

জবাব স্বরূপ কট্‌ করে সুইচ্‌ টিপে আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হলো'।

কম্বলের ভিতর থেকে বল্‌লাম—

"থ্যাঙ্ক্‌ ইউ"।

* * * *

ট্রেনের ঝাকানী ও শব্দে তন্দ্রার ভাবটা গাঢ় হবার সুযোগ পাচ্ছিল না। নিদ্রাদেবী যেম্‌নি কোলে টেনে নিচ্ছিলেন, অমনি কে যেন চুলের মুঠি ধরে সজাগ করে' দিচ্ছিল;—নিদ্রা ও জাগরণের এই দোটানার মধ্যে পড়ে' মনে মনে রাত্রি শেষ হবার প্রার্থনা করছিলাম। বোধ হয় একবার এর মধ্যে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, কারণ তার আগের কোনও ঘটনা মনে নাই।...কোন একটা অজানা ষ্টেশনে কেল্‌নারের ভগ্নদূত কাতরস্বরে চা-এর বার্ত্তা জানাচ্ছিল, তাই শুনে সজাগ হয়ে দেখি রাত্রি ভোর হয়েছে। মুখ বাড়িয়ে তাকে ডেকেছি, এমন সময়ে ও পক্ষ থেকে একটা তীব্র শব্দ কানে এলো—

"দেখুন"!

হ্যাঁ, দেখবার মতো জিনিষই বটে। সদ্যনিদ্রোত্থিতা তরুণীর রূপ বর্ণনা শাস্ত্রে, ইতিহাসে, উপন্যাসে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, কাজেই ওটা বাদ দিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল তরুণীর বাহুল্য বিবর্জিত বেশভূষা—চুল বব্‌ করা, ঘাড়ের গোড়ায় এসে পড়েছে,—

ড্রাগন আঁকা পায়জামা সুটের পায়ের ঝুল গোড়ালী থেকে চার ইঞ্চি উপরে, কোটটি কোমর পর্য্যন্ত, আর কোটের বোতাম যেন বুকের কাছে এসে লজ্জায় থেমে গেছে—আর এগোতে সাহস পায় নাই—ভিতর থেকে পিঙ্ক্‌ রং এর সিল্কের রঙিন্‌ বডিস্‌ চোখে নেশা ধরিয়ে দেয়, পায়ে জাপানী ঘাসের চটি, আঙুল কয়টিকে মাত্র ঢেকে রেখেছে,— ... ... এ যেন শরীরের সজ্জা হয়েছে কিন্তু আবরণ হয়নি;

এক কথায় যাকে বলে "daring"···রাত্রে ভালো করে' দেখ্‌বার সুযোগ হয় নাই··· ···দেখলাম, বয়স বেশী না,—২০।২১ হবে, কিন্তু সে দিকে বেশী মনোনিবেশ করার মত অবস্থা তখন ছিলনা। তরুণীর রূপে নাকি মুনিঋষীদেরও তপো ভঙ্গ হয়ে থাকে শুনতে পাই, এবং তাঁরা কটাক্ষে জগৎ জয় করতে পারেন বলে প্রবাদ আছে। আমার সহযাত্রিণী সুন্দরী এবং তরুণী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবার উপক্রম হলো ··· ···বুঝ্‌তে পার্‌লাম না কি অপরাধ করেছি; ··· ··· গতরাত্রের অসমাপ্ত—বাগ্‌যুদ্ধের পালা কি এখনও শেষ হয় নাই?—

সভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—

"কি হয়েছে"?

"Scoundrel!"

বড় রাগ হ'লো,—সকালে উঠেই বাসিমুখে গালাগালি! বল্‌লাম—

"Wake up, স্বপ্ন দেখ্‌ছেন নাকি?"

"অভদ্র! ইতর!"

"বেশ বেশ, সকালে উঠেই গলা শানাচ্ছেন কেন বলুন ত?—হয়েছে কি?"

"How dare you?"

"দেখ্‌বেন, বিষম খাবেন না যেন"—

"আপনাকে আমি পুলিশে দেবো"—

"বাধিত হলেম,—আমার অপরাধ?"

"আমার জামাকাপড় কি করেছেন?"—ভাব্‌লাম বলি' যে বেচে খেয়েছি,—কিন্তু,—

"সে আবার কি? আপনার জামাকাপড়ে আমার কি দরকার থাক্‌তে পারে? তাছাড়া আপনার কাপড় জামা আমি চুরি করে' থাক্‌লে এখানে বসে' থাক্‌বো কিসের জন্য?"—

"আপনি আমাকে অপদস্থ কর্‌বার জন্তে জান্‌লা দিয়ে হয়ত ফেলে দিয়েছেন"—

"হয়ত? তাহ'লে আপনি না জেনে শুনে এতক্ষণ আমাকে গালাগালি কর্‌ছেন শুদ্ধ সন্দেহের জোরে?—সিনেমা দেখে দেখে মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?—হঠাৎ আমাকেই আপনার বস্ত্রসঙ্কটের কারণ ঠাওরাবার হেতু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি—?"

"গাড়ীতে আপনি ছাড়া ত আর কেউ ছিল না"—

"আপনি কি সারারাত্রি জেগে ব'সে দেখেছেন নাকি কে উঠ্‌লো আর কে নাম্‌লো?—আপনার কাপড় জামা যদি কেউ নিয়েই থাকে, বা ফেলেই দিয়ে থাকে তাহলে সেকি আপনার সাম্‌নে বসে' থাক্‌বে—?"···

মুখে বল্‌লাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক আমার অবস্থা সত্য সত্যই সঙ্কটজনক।—

একে ত পরিবারের অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও তার দোহাই দিয়ে একটি তরুণীর সাথে একা এক গাড়ীতে রাত্রিবাস করেছি, তাতে ব্যাপার যা দেখ্‌ছি শেষে চোরাই মালের জন্তে বুঝি বা পুলিশের হাতে পড়্‌তে হয়,—নাঃ, যাত্রাটা কি ত্র্যহস্পর্শে হয়েছিল? না অশ্লেষাতে?

আমার সহযাত্রিণী তখন বেঞ্চএর উপরে নীচে ভীষণ ভাবে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছেন···কিন্তু তাঁর পরিধেয় যৎসামান্ত রাত্রাবাস ও দুটি রাগ্‌ ও বালিস ছাড়া অন্য কোনও জিনিষ দেখ্‌লাম না। সভয়ে নিজের জিনিষপত্রের খোঁজ নিতে যেয়ে দেখি যে আমার সুটকেসটা আছে,—

তখন লক্ষ্য কর্‌লাম গাড়ীর দরজাটা খোলা। রাত্রে নিশ্চয়ই চোর এসেছিল।

ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে সত্যই তখন কষ্ট হ'লো; হাজার হোক্‌ বাঙ্গালীর মেয়ে ত? ঐ বেশে দিনের বেলায় লোকের সাম্‌নে যেতে তার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে। কিন্তু আমাকেই বা এমন রসিক চোর মনে করবার হেতু কি, তা বুঝলাম না;—স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী চিরকাল শুনে এসেছি, কিন্তু সে যে আবার নীরেট্ তা জানা ছিল না,······বলা যায় না হয়ত বা আমার কপালে শেষে একটা প্রলয় সৃজন করে' বসে'!

ট্রেন অনেকক্ষণ চল্‌তে আরম্ভ করেছে। চা রুটী অভুক্ত পড়ে' রইল। এবারে উঠ্‌তে হ'লো; আর নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার ও নিশ্চল থাক্‌বার সময় নেই—এখনি হয়ত alarm chain টেনে দেবে;···বসে' বসে' আমার দিকে

যে রকম রোষকষায়িত কটাক্ষপাত হচ্ছিল, তাতে যে কোনও মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বনাশ হ'তে পারে,—

উঠে কাছে গেলাম।

একটা মৃদু মিষ্টি গন্ধ ভেসে আস্‌ছিল; বোধ হয় চুলের;—গন্ধে রুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়,…রুচি খুব উঁচুদরের সন্দেহ নাই; শুধু মেজাজটা যদি আর একটু মোলায়েম হ'তো।

বল্লাম,—

"আপনি মিছে আমাকে সন্দেহ কর্‌ছেন, আপনার সাথে এরকম অসঙ্গত ব্যবহার করবার আমার কোনও কারণই নেই;…আপনার পরিচয় পর্য্যন্ত আমি জানি না;…মিথ্যা সন্দেহের বশে একজন ভদ্রসন্তানকে এমন অপবাদ দেবেন না;…ভেবে দেখুন, এতে আমার লাভ কি?…আপনাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌ছি, সেজন্য আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ কর্‌বেন না; …প্রত্যেক লোকেরই কর্ত্তব্য সেটা,—তাতে আমার বিশেষত্ব কিছুই নেই,—"

দেখলাম চিত্ত দোলায়মান; আমাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নাই;—হয়ত ভাব্‌ছিল যে তার প্যারিস ক্রেপের সাড়ী ও ব্লাউজ, আমার স্ত্রীর জন্যে চুরি করেছি; তাই সুটকেসটা খুলে তার সামনে ধরে' বল্‌লাম যে সন্দেহ থাক্‌লে তিনি নিজে দেখ্‌তে পারেন;…

এবারে বোধ হয় একটু চক্ষুলজ্জা হলো;—বল্‌লেন "তাহ'লে কি চোরে এসে সব নিয়ে গেছে?"

"আমার তাই বিশ্বাস, তাছাড়া আর কি হ'তে পারে? আপনার সাথের সবই কি গেছে?"

"হ্যাঁ,—একটা সাড়ী পর্য্যন্ত নেই।"

"প্রথমেই, ট্রেন থাম্‌লে পুলিসে একটা খবর দেওয়া দরকার; তার পর আপনার জামাকাপড়ের একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হ'বে;—আপনার ব্যাগটাও গেছে নাকি?"—

রুদ্ধস্বরে জবাব এলো,—

"হ্যাঁ,—তাতে আমার টিকিট ও প্রায় এক'শ' টাকা ছিল।

"বেশ!"

—"আপনার নিশ্চয়ই খুব স্ফূর্ত্তি হচ্ছে?—একজন "modern girl"-এর দুর্গতি দেখে?"

ভাব্‌লাম আওরঙ্গজেবের ভাষায় বলি "খোদা হায়!" কিন্তু দেখ্‌লাম বিষের জ্বালা তখনো যায় নাই; পাছে আবার বিষদৃষ্টিতে পড়ি' সেই ভয়ে বল্‌লাম—

"মাপ করবেন, গতরাত্রে দৈবদুর্ঘটনায় স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ হওয়াতে মনটা ভালো ছিল না, তাই হয়ত আপনাকে অযথা কিছু বলেছি,—আমাকে আর লজ্জা দেবেন না"—

স্বর এবার আর এক পর্দ্দা নেমে এল—

"আপনার নিজের বিপদও ত কম না; স্ত্রী রইলেন পড়ে' কোথায়…"।

ভাব্‌লাম এইবার আসল কথাটা স্বীকার করে' ফেলি,—কিন্তু এই বস্ত্রহরণের পালার পরে যদি নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিই, তাহ'লে পূর্ব্ব সন্দেহ দ্বিগুণ বেগে ফিরে আস্‌বে,—এবং ফলে যা হবে তাতে আর যাই হোক আমার মঙ্গল নাই। কাজেই ইচ্ছা থাক্‌লেও, স্বীকারোক্তিটা তখনকার মত চাপা রইল।

একটা বড় জংসনে এলাম। সেখানে নেমে রেলপুলিশের শরণাপন্ন হওয়া গেল। পুলিশের জমাদার এলেন; দেখ্‌লেই প্রাণে ভরসা হয়, একেবারে গালভরা নামের মত "চোখ ভরা" চেহারা, মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি সমস্ত কর্কশ এবং স্থূল, উদরের পরিধি রেগুলেশন বেল্টকে ছাড়িয়ে গেছে, তাই কোমরে চামড়ার বদলে লাল কাপড়ের কোমরবন্ধ, মস্তকটি সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র,—গলারস্বরে অন্ধকারে আঁৎকে উঠ্‌বার সম্ভাবনা,…

অনেক মাথা নাড়া এবং বুদ্ধি খরচের পর তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন যে পরিধেয় বস্ত্রাদি চুরি গেল, অথচ মহিলাটি জান্‌তে পার্‌লেন না কেন?

তার বিশ্বাস, যে পরণের সাড়ী যখন চুরি গেছে, তখন নিশ্চয়ই তা পরে' শোওয়া হয়েছিল, এবং বোধ হয় মহিলাটির বর্ত্তমান বেশভূষা নারীজনোচিত নয় দেখে ভেবেছে যে দুর্ঘটনার পরে হয়ত ওসব আমার কাছ থেকে ধার নেওয়া!!—পায়জামা যত সূক্ষ্ম চীনাংশুকের তৈরীই হোক না কেন, তার মহিমা পুলিশের জমাদার কি করে' জান্‌বে? বেচারা!

দেখ্‌লাম লোকটা নয়নবানে বিদ্ধ না হলেও বাক্যবানে দগ্ধ হবে; তাই বস্ত্র সমস্যাটা তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

প্রায় আধঘণ্টা রসালাপের পর, এই স্থূলোদর এবং ততোধিক স্থূল মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকটির সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য হ'লো, সেই সাথে তার হাতের ডায়েরিটাও প্রায় ভ'রে উঠ্‌লো ; দু'একটা নমুনা দিই—

"আপ্‌কা উমর্ ক্যা ?"

"উমর্ সে কোন কাম ? চোরকা পতা মিলেগা ?"

"আপ্ যব্ কাপ্‌ড়া বদ্‌লায়ে", তব্ কোই হাজির থা ?"

—সাক্ষী প্রমাণ চায় বোধ হয় !...

"দেখুন, দয়া করে' ওকে থাম্‌তে বলুন, আমার চোর ধরে' কাজ নেই, চুরির কিনারা চাই না, ওটাকে দূর করে' দিন, এখনি তাড়িয়ে দিন, নইলে—"

"দেখিয়ে—"

জমাদারের মুখের কথা আর শেষ হ'লো না ; হঠাৎ তার দিকে ফিরে তাকে এইসা এক ধমক !—সে বেচারা ঘাব্‌ড়ে গিয়ে থেমে গেল, তারপর বিশুদ্ধ ইংরাজীতে তাকে একপ্রস্থ গালাগালি, জমাদারজী সব কথা বুঝতে না পার্‌লেও, মোটামুটি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বোধ হয়, কাজেই, আস্তে আস্তে পিছু হট্‌তে লাগ্‌লেন, শেষটায় গাড়ী থেকে নেমে দ্রুত গতিতে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌লেন—

তারপর আমার পালা :—

"কেন আপনি ঐ অপদার্থটাকে ধরে' এনেছিলেন, মজা দেখ্‌বার জন্যে ?"—

"কি বিপদ ! আমার অপরাধ কি বলুন ? আমি ত ওকে শিখিয়ে দিই নাই, তাছাড়া সব রকম প্রশ্ন করার অধিকারই ওদের আছে, ওদের তদন্ত করার একটা নিয়ম আছে, আমরা হয়ত ওদের প্রশ্ন অসংলগ্ন বা অবান্তর ভাব্‌তে পারি, কিন্তু হয়ত আমাদের কথা থেকেই মাল-মসলা সংগ্রহ করে' ওরা কাজ করে' থাকে, কাজেই—"

"আপনি ঠাট্টা করবার আর সময় পেলেন না !"

অতি কষ্টে কোনও রকমে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বল্‌লাম—

"না, না, ঠাট্টা করবো কেন ? ওকথা ভাব্‌বেন না, আমি শুধু এই লোকটির স্বপক্ষে যা বলা যেতে পারে তাই বল্‌ছিলাম ;—"

ইতিমধ্যে তিনজন পুলিস নিয়ে অন্য একটি জমাদারের আবির্ভাব ; অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তিনি কাম্‌রা সার্চ্চ করার বাসনা জানালেন, বল্‌লাম—"জমাদারজী ! চোর কি লুকোচুরি খেল্‌ছে তোমার সাথে ? তাছাড়া এখানে যা আছে তাত চোখেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, এর মধ্যে কোথাও কি ২৬ ইঞ্চি সুটকেস্ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে ?"

"এহি আইন হ্যায়"—

"তথাস্তু"।

সার্চ্চ শেষ হলো, আমি কুকুরটাকে হাঁ করিয়ে দেখিয়ে দিলাম যে তার মুখের মধ্যেও কোনও জিনিষ লুকানো নেই ; শেষে অনেক কষ্টে পাপ বিদায় হলো।

কিন্তু পুলিশের জেরার ফলে আমার সহযাত্রিণীর নাম ধাম জানা গেল। মিস্ বিনীতা মিত্র,—পেশা শিক্ষয়িত্রী, দিল্লীতে আত্মীয় সকাশে যাচ্ছেন, ছুটী যাপনের জন্য।

নামের বাহার আছে ! মেজাজের সাথে নামের এমন গরমিল বইএ পড়েছি, কিন্তু চোখে দেখি নাই,—শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লো এতদিনে···

চুরির যে কোনও কিনারা হ'বে এমন ভরসা নেই। বিনীতা দেবীর বস্ত্রাদির ব্যবস্থা এখনই কর্‌তে হয় ; আমার সুটকেসটা খুলে তাঁর সাম্‌নে ধরে' বল্‌লাম—"দেখুন এর মধ্যে আপনার কাজে লাগতে পারে এমন কিছু আছে কিনা—আমার স্ত্রীর বাক্সটা এসময় থাক্‌লে—" কথাটা শেষ কর্‌লাম না, বেশী বাড়াবাড়ি ভালো না !

তিনি রাগ্‌টা গায়ে জড়িয়ে বসেছিলেন, কপালে ভ্রূকুটী, চোখে বিরক্তি, মুখে নৈরাশ্য ;—বল্‌লেন,—"আপনি কি আমাকে ধুতি পাঞ্জাবী পর্‌তে বলেন ? না গরম সুট্ ?—"

"কি বিপদ ! আমি কি তাই বলেছি ? সাড়ীর বদলে জরীপেড়ে ধুতি চল্‌তে পারে না ?"

—"সাড়ী ছাড়া মেয়েরা আরও অনেক জিনিষ পরে' থাকে"—বলে' তিনি ফিরে বস্‌লেন, জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে।

এত মহা সমস্যার কথা হ'লো দেখ্‌ছি ! কম্বল জড়িয়ে মহাদেব দিন কাটাতে পারেন, কিন্তু—যাক্‌গে, আমার সিল্কের কিমোনোটা বের করে' বল্‌লাম, "আচ্ছা, এটা না

হয় আপাততঃ গায়ে জড়িয়ে রাখুন, এর চেয়ে ভাল আপনার উপযুক্ত আর কিছু পাচ্ছি না"—

মুখে বিরক্তির ছায়া ঘনিয়ে এলো, কিন্তু হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন।

হঠাৎ মনে হলো যে এ পর্য্যন্ত ওঁর মুখ হাত ধোওয়া হয় নাই। বাক্স থেকে সাবান তোয়ালে এই সব বের ক'রে দিলাম; বললাম "আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি আহারের ব্যবস্থা করছি—"

তিনি উঠে বাথরুমে গেলেন, যাবার সময়ে ছোট্ট একটি "থ্যাঙ্ক্ ইউ" বলে';—আমি ব্রেক্‌ফাষ্টের ফরমাইস্ দিলাম।

খাবার এলো, তিনিও এলেন। আহারের পরে বোধ হয় মেজাজটা কিছু মোলায়েম হলো;—কিমোনো পরে' নেহাৎ মন্দ দেখাচ্ছিল না; ওটা আমার এক আত্মীয় আমাকে উপহার দিয়েছিলেন এবং পুরুষের চেয়ে সেটা মেয়েদের ব্যবহারেরই বেশী উপযোগী ছিল, কাজেই ওকে মানিয়েছিল ভালো। এতক্ষণ পরে শ্রীমুখে হাসি দেখা গেল; বল্‌লেন—

"ট্রেনেত একরকম করে' কাটিয়ে দিলাম, নাম্‌বার সময়ে কি কর্‌বো? এবেশে প্ল্যাট্‌ফর্‌ম্-এর ভিতর দিয়ে যেতে হলে আমার মাথাকাটা যাবে, তাছাড়া আমাকে যাঁরা নিতে আস্‌বেন তাঁদের ঠাট্টাতে আমাকে অস্থির হয়ে উঠ্‌তে হবে—

"সেজন্য ভাব্‌বেন না,—তার ব্যবস্থাও কর্‌বো"—সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি? আবার ধুতি পাঞ্জাবী পর্‌তে বল্‌বেন নাকি?"—

"না, না, ভয় নেই আপনার, যদি আর কিছু নাই জোটে তবে আমার ওভার কোট্‌টা ওর পরে গায়ে দিয়ে নেবেন, শীতকালে রাত এগারটার সময়ে ওতেই চলে যাবে, কেউ অত লক্ষ্য করবে না—"

দেখ্‌লাম যে কাজের অভাবে ওঁর সময় কাট্‌ছে না; হয়ত বেশী চিন্তার অবসর দিলে এখনই আবার আমার "স্ত্রীর" বিষয়ে কথা উঠ্‌বে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সেটা মোটেই মঙ্গলজনক হবে না; তাই আমার বাক্স থেকে Edgar Wallace এর একখানা নতুন বই বের করে ওঁর হাতে দিয়ে বল্‌লাম,

"এটা নিয়ে এখন কোনও রকমে সময় কাটান" একটু কৃতজ্ঞতার হাসি হলো,—বল্‌লেন

"থ্যাঙ্ক্‌স্, আপনি যে 'ম্যারেড', তা বেশ্ বোঝা যায়, এই সব ছোটখাটো কাজে"—মনে মনে ভাব্‌লাম, ছাই বুঝেছ, এমন বুদ্ধি না হলে আর চোরে কাপড় চুরি করে?"

বল্‌লাম্—"না, না, সেকি কথা,—আপনাকে বিপদে সাহায্য কর্‌বো না?"—

তিনি বইখানা খুলে' তাতে মনোনিবেশ করলেন আমিও একটা চুরোট ধরিয়ে একখানা ম্যাগাজিন ওল্‌টাতে লাগ্‌লাম।

* * *

ক্রমে বেলা বেশী হলো। মেল ট্রেন তার চিরাভ্যস্ত দ্রুত-গতিতে সহর জঙ্গল মাঠ নদী অতিক্রম করে' চলেছে। বাংলার শস্যশ্যামল সমতট বহুক্ষণ অতিক্রম করে' এসেছি। তার বদলে যুক্তপ্রদেশের জনবহুল গ্রাম নগরী এক এক করে পার হয়ে চলেছি; দুধারে ধূসর প্রান্তর, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, পুতুল খেলার ঘরবাড়ীর মত দেখা যাচ্ছে, লাইনের দুধারে রাখাল ছেলেদের মেলা; গ্রামের পথে ঘাটে ঘাঘরা ও ওড়না পরা "পরদেশী বধূ" পিতল কাঁসার অলঙ্কারে পথ মুখরিত করে' মাথায় ও কক্ষে বড় বড় মাটীর গাগরী নিয়ে জল আন্‌তে চলেছে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে "চাই খাবার"-এর বদলে "রোটী কাবাব" ও "হালুয়া পুরী"র আয়োজন;—

আমি একবার আড়চোখে সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে দেখলাম;—তিনি কখন ঘুমে ঢুলে পড়েছেন; বইখানা বুকের পরে খোলা, একটী হাত পাশে ঝুলে পড়েছে; কিমোনোর ভাঁজ সরে যেয়ে আবার সেই মন মাতানো রাঙ্গা বডিসের আভাষ, ঠোঁটের লালিমার ভিতর দিয়ে মুক্তার শ্রেণীর মত ঝক্‌ঝকে কয়টী দাঁত দেখা যাচ্ছে;—আয়ত চোখ দুটীতে আর ভ্রূকুটীর ঘনঘটা নেই, প্রশস্ত ললাটে ঘুমের কোমল ছায়া পড়েছে,·········ধরা পড়্‌বার ভয় নেই, একমনে দেখতে লাগলাম হঠাৎ বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে' উঠলো—মনে হলো যেন জীবনের দিনগুলো এ যাবৎ শুধু

হাসি তামাসা করেই কেটেছে; লক্ষ্যহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে,—আমার যদি এঁর মত—ইনি যদি আমার……

সেই নিস্তব্ধ, নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে অপরিচিতার সান্নিধ্য বুঝি এবার একটা বিপত্তি ঘটায়!

শুনেছি জলে ডুবে মরবার সময়ে নাকি জীবনের অতীত ঘটনাগুলি ছায়াবাজীর মত চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে' আবার মিলিয়ে যায়;—ট্রেণে বসে' বসে' নৌকাডুবি হয় না সত্য, কিন্তু আমার মনের মধ্যে, জীবনে যত মেয়েকে দেখেছি বা জেনেছি, তাদের সকলের ছবি এক এক করে' ফুটে উঠে আবার মিলিয়ে যেতে লাগলো,—কিন্তু পাশের ঘুমন্ত মেয়েটীই যেন বাস্তব, আর সব শুধু স্বপ্ন,—নাঃ, ব্যাপার মোটেই সুবিধার নয় দেখছি! জোর করে' মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু মনের মধ্যে সেই ঘুমন্ত ঠোঁটের হাসির আভাষ রং ধরিয়ে দিয়েছে,……আবার ফিরে বস্‌তে হলো;…………চুলগুলি এলিয়ে পড়েছে, বাতাসে ২।১ গোছাচুল কপালের পরে দুলছে, ইচ্ছে হলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিই,………লীলায়িত শরীর ঘুমে অচঞ্চল, শুধু বুকের স্পন্দনে জীবনের সাড়া পাওয়া যায়;—মনে হচ্ছিল যেন কত কোমল, কত অসহায়……একটু আঘাতেই ভেঙ্গে পড়্‌বে……

* * * *

বুকের পর থেকে খোলা বইখানা সরিয়ে নিয়ে হাতটী তুলে পাশে রেখে দিলাম,—কি নরম হাতখানি! ইচ্ছে হচ্ছিল মুঠোর মধ্যে ধরে' বসে থাকি!—

তখন মনে হলো বিনীতা যে অবিনয় প্রকাশ করেছেন, নিশ্চয়ই তার প্রচুর কারণ আছে;—তাঁর স্বপক্ষে বলবার-ও ত অনেক কিছু থাক্‌তে পারে? হয়ত তাঁর তরুণ নিঃসঙ্গ জীবন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে' চল্‌তে হলে নিঃসম্পর্কীয় যুবার সাথে রূঢ় ব্যবহার না করলে চলে না; তাদের অযাচিত ঘনিষ্টতার হাত থেকে বাঁচতে হলে কটাক্ষের বদলে ভ্রুকুটীরই বেশী প্রয়োজন—কাজেই ওঁর যে সব ব্যবহার দুষণীয় বলে' প্রথমে মনে হয়েছিল, এখন দেখ্‌লাম যে ওঁর পক্ষ থেকে সে সব বাস্তবিক প্রশংসনীয়……

বেলা শেষ হয়ে' এল। টেলিগ্রাফের খুটীর ছায়া ক্রমে তীর্য্যক হয়ে' আস্‌ছে, দূরে বনান্তরালে দিন শেষের গোধূলির আভাষ, সেই ধূলির যবনিকার পরে সূর্য্যের আলো পড়ে' যে বর্ণচ্ছটার ইন্দ্রজাল তৈরী হয়েছে, তা'রি ভিতর দিয়ে ঘুমন্ত বিনীতাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওঁর সর্ব্বাঙ্গে কেউ সোণার গুড়ো ছড়িয়ে দিয়েছে;…বাতাসে শীতের প্রথম স্পর্শ,—হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে গেল; আমি রাগ্‌টা খুলে অতি সন্তর্পণে ওঁর গায়ে দিয়ে দিলাম;—

একটা ষ্টেশনে গাড়ীটা অনাবশ্যক ঝাঁকানী দিয়ে থাম্‌তেই ওঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল; তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌লেন; পাশের জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে একবার হাত দিয়ে মাথার চুল সমান করে' নিলেন, তারপর গায়ের রাগ্‌টাতে নজর পড়্‌তেই চম্‌কে উঠে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"আমার গায়ে রাগ্ এলো কি করে?"

আমি যেন শুন্‌তে পাই নাই এইভাবে ঝুঁকে পড়ে' বইএর পাতায় মনোনিবেশ কর্‌লাম—

"শুন্‌ছেন?—the worst of these married men is—"

"That they presume too much"!

আমি মুখ তুলে অসমাপ্ত কথাটার পাদপূরণ করে' দিতেই তিনি হেসে উঠ্‌লেন,—যাক্, মেঘ কেটে গেছে; আমার যা ভয় হয়েছিল!

তিনি আর কিছু না ব'লে মুখ হাত ধুতে চ'লে গেলেন, আমিও বই বন্ধ করে' চা-এর ফরমাসই দিলাম।

পথে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই। কেবল ওর জন্যে একখানা টিকিট কিন্‌তে হয়েছিল,—চুরি গেছে এ ওজর রেলের কর্ত্তৃপক্ষ শোনেন না,—Railway Budget এর ধার বোধ হয় যাত্রীদের পকেট থেকে নিয়ে শোধ হ'বে এবার!

রাত্রে আহারের পর দেখ্‌লাম উনি শীতে কষ্ট পাচ্ছেন, আমার ওভার-কোট ওঁকে পরিয়ে দিলাম। বড় হলেও শীতে কষ্ট পাবেন না। উনি বেশ আরাম ক'রে বেঞ্চের উপর উঠে গুটীসুটী হয়ে' বস্‌লেন; মাঝে মাঝে টুক্‌রো টুক্‌রো আলাপ হচ্ছিল—

"আপনি কতদূর যাবেন ?"

"দিল্লী পর্য্যন্ত।"

"তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত আপনি থাক্‌বেন ? ভালই হলো ; আপনার ঠিকানাটা দেবেন, এ জিনিষগুলো কালই আপনার বাসায় পৌঁছে দেবো।"

ঠিকানা লিখে দিলাম।

তিনি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন—

"তাইত! আপনি কত পাবেন আমার কাছে ? এই ধরুণ টিকিটের ২১৲, তারপর চা, ডিনার,—"

"আমি প্রবলবেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বল্‌লাম—

"সে হতেই পারে না,—টিকেটের দাম আমি নিতে বাধ্য, কারণ, আপনার পরে আমার এমন কোনও দাবী নেই যার জোরে ওটা মাপ কর্‌তে বল্‌বো ; কিন্তু খাবারের দাম ? Shame! আমি কি দোকানদার ?

"আমার পরে যখন আপনার কোনও দাবীই নেই, তখন ওটাই বা নেবেন না কেন ?"

"সাধারণ ভদ্রতার হিসাবে ; আপনি আমার গেষ্ট ;— তাছাড়া সুবিধা কি শুধু আপনারই হয়েছে ? আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার কিছু লাভ হয় নাই ?"

তিনি হঠাৎ হেসে উঠে বল্‌লেন—

"কি লাভ ? আমার সঙ্গ লাভ ? আপনার স্ত্রী একথা শুন্‌লে নিশ্চয়ই খুব খুসী হবেন না ?"

ঐ যাঃ! একদম্ ভুলে গিয়েছিলাম যে! তাইত, কি করা যায় ? কাল্পনিক স্ত্রীটিকে বিদায় না করা পর্য্যন্ত বাস্তব প্রিয়াকে যাওয়ার কোনও উপায় দেখ্‌ছি না, অথচ তখন মরিয়া হ'য়ে বল্‌লাম—

"দেখুন, 'আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছি, আপনার সাথে এতক্ষণ ছলনা করে' এসেছি, যদিও তা'তে আমার খুব দোষ নেই ; আমি—আমি অবিবাহিত"—'

তিনি অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—

"তবে প্ল্যাটফরমে কালরাত্রে আপনি কার সাথে কথা বল্‌লেন ?"

"কেউ না,—ওটা ঝোঁকের মাথায় হয়ে' গেছে ;— আপনি যখন স্ত্রী সম্বন্ধে জেরা আরম্ভ কর্‌লেন, তখন না বলে' কি করি ? তাছাড়া"—

"হ্যাঁ, বলুন ?"—

কণ্ঠস্বরে এমন একটা শীতল কঠোরতা ছিল, যা আমাকে একেবারে দমিয়ে দিল ;—অতি কষ্টে বল্‌লাম—

"আমার আর কিছু বলার নেই ; যখন স্ত্রীর অস্তিত্ব না থাকাতেও তার দোহাই দিয়ে ট্রেণে উঠেছিলাম, তখন জান্‌তাম না যে আমার সহযাত্রিণী একজন মহিলা, তারপর যখন সকালে সব কথা প্রকাশ করে আপনার কাছে ক্ষমা চাইব ভেবেছিলাম তখন ঘটনাচক্রে, এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে আমার নির্দ্দোষ ছলনা তখন প্রকাশ কর্‌লে আপনার সন্দেহ আমার পরে শতগুণ বেড়ে যেতো, কাজেই তখন আত্মরক্ষা জন্যে আমি কিছু বল্‌তে পারি নাই ; আমাকে মাপ করুন"—

"আপনি জানেন যে মেয়েরা পুরুষের কাছে অপদস্থ হওয়াকে সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করে ? হাস্যাস্পদ হওয়াকে আরও বেশী—?"

আবার সেই সংহার মূর্ত্তি! কোথায় গেল আমার রোম্যান্টিক্ স্বপ্ন, কোথায় বা—প্রেমের অঙ্কুরে বিনাশ আর কাকে বলে! তিনি বলে যেতে লাগ্‌লেন—"আপনাকে কিছুতেই আমি ক্ষমা কর্‌তে পারি না আপনি যে আমাকে অপদস্থ করেছেন, তা কিছুতেই ভুল্‌তে পারি না ; এবং আপনি একজন অবিবাহিত যুবক একথা মনে হলে আপনার অপরাধ আরও অমার্জ্জনীয় বলে' মনে হয়"—

মনে মনে ভাব্‌লাম যে তবে কি মৃতদার হলে অপরাধটা কম হ'তো ? অপরাধ যত সব ত অবিবাহিত বলেই, নৈলে আর কি অপরাধ করেছিলাম!—আর তাছাড়া অবিবাহিত যুবক চিরকালই বিশ্বের অবিবাহিতা তরুণীদের কাছে অপরাধী, এ আর নতুন কথা কি ?

মনে মনে অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম—ভাগ্যে propose করি নাই! আমি না থাক্‌লে ওকে যে একবস্ত্রে মাঝপথে নেমে থাক্‌তে হ'তো, সে কথাটা ভেবেও আমার 'অপরাধের' মাত্রা কম্‌লো না—বল্‌লাম—

"অপরাধ ত স্বীকার কর্‌ছি, সেজন্যে ক্ষমাও চাচ্ছি, আর কি করতে বলেন ?"

—"তর্ক করবেন না,—আপনি আমার আত্মসম্মানে যে আঘাত দিয়েছেন, তা ভুলতে আমার যথেষ্ট সময় লাগবে,—"

আর কত সহ্য করা যায় ?—বললাম "অহং জ্ঞানটা কিঞ্চিৎ কম থাকলে হয়ত বেশী সময় লাগতো না, অত কষ্টও হ'তো না"—

একটা তীব্র কটাক্ষপাত করে' তিনি বললেন—"আপনার সাথে তর্ক করাও আমার শোভা পায় না"—

"তথাস্তু !"

দুজনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে' রইলাম, ট্রেণ আমাদের বাক্‌বিতণ্ডাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' চলে' যেতে লাগলো ; ক্রমে নামবার সময় হয়ে' এলো, দিল্লী দুর্গের রক্তবর্ণ প্রাচীর যমুনার পুলের উপর থেকে দেখা গেল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বিছানা বাক্স ঠিক্ করতে লাগলাম। উনি হাতের বইখানা আমার দিকে ফেলে দিলেন। আমি কথা না বলে' সেটাকে বাক্সে ভরলাম। ট্রেণ দিল্লী ষ্টেশনে এসে থামলো। লোকজনের ভিড় ও গোলমালের মধ্যে আমি কুলী সংগ্রহ করে' নেমে পড়লাম। দেখলাম উনিও নেমে এলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন যে যাবার সময়ে আমি আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করবো, কিম্বা নিদেন একটা নমস্কার জানাবো,—আর উনি সেটাকে উপেক্ষা করে' চলে' যাবেন ! কিন্তু সে আশা সফল হ'লো না, আমি কোনও কথা না বলে' সোজা একটা টাঙ্গাতে যেয়ে উঠলাম। যেতে যেতে দেখলাম একদল পুরুষ ও মহিলা কলরব করতে করতে ওঁকে ঘিরে চলেছে—মনটা বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো —দুত্তোর ছাই ! টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম—"চালাও, নয়াদিল্লী"—

* * * *

পরদিন সকালে একটী নেপালী "বয়" আমার কিমোনো এবং ওভারকোট নিয়ে উপস্থিত। একখানা খাম সে আমার হাতে দিল। তার ভিতর একুশ টাকার একটী চেক্, [খাবারের দাম ধরা হয়নি দেখে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম], এবং একখানি চিঠি বিনাতা দেবী লিখেছেন—

"—আপনি যে অবিবাহিত, তা আপনি ট্রেণে ওঠার পরই বুঝতে পেরেছি, আপনি চলন্ত ট্রেণে উঠেছিলেন,—অর্থাৎ আপনার স্ত্রী ও সাথে জিনিষপত্র থাকলে তাদের ওঠাবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা, তা জানতেন ; কাজেই নেহাৎ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার মতলব না থাকলে ও রকম অবস্থায় লোক সাধারণতঃ গাড়ী মিস্ করে, কিন্তু স্ত্রীকে ছাড়ে না ;—তারপর আপনার অভিনয় এত অস্বাভাবিক যে তাতে কেউ ভুলতো না ; তৃতীয়তঃ আপনার স্যুটকেসের জিনিষপত্র যা দেখলাম তাতেই আপনি অবিবাহিত এই ধারণা আরও দৃঢ় হলো ; তাতে বিবাহিত লোকের শৃঙ্খলা বা স্ত্রীর যত্ন দুই এরই অভাব—

কাজেই Edgar Wallace না পড়লেও এ কথা জানতে আমার বেশী দেরী হয় নাই—এবং আপনি নিজেকে বিবাহিত বলে' পরিচয় দিতে, পরদিন যখন আমার জামা কাপড় চুরি গেল, তখন আপনাকেই সন্দেহ করেছিলাম,… …আমার খুব বেশী অপরাধ নেই তাতে। [শিক্ষয়িত্রী ? না মেয়ে ডিটেক্‌টিভ্ ?—?]

আমার অহং জ্ঞানটা সত্যই কিছু বেশী,—এজন্যে লোকের সাথে আমার ভাব থাকেনা,—কিন্তু আপনি যখন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সেটা সহ্য করতে পেরেছেন, তখন আশা আছে যে আরও দু এক ঘণ্টা (না, না, আরও অনেক বেশী !) পারবেন।

তা ছাড়া আপনি আমাকে যে, যত্ন করেছেন এবং আমি আপনাকে যে অপমান করেছি,—[না, না,—সেকি কথা ! !] তার একটা প্রতিদান হওয়া চাইত ?—কাজেই আজ বিকালে যদি আপনি আসেন, তবে বাস্তবিকই সুখী হবো,……

আর চুরির দায়ে ধরা পড়বার ভয় নাই !

ইতি—বিনীতা মিত্র।

* * * *

সাধা নিমন্ত্রণ কখনো উপেক্ষা করতে নাই ;—কাজেই বিকালে গেলাম। তিনি সামনের বাগানে ছিলেন, দেখা হতেই হাতযোড় করে নমস্কার করে বললেন, হাসতে হাসতে—

—"আপনার স্ত্রীর খোঁজ পেলেন" ?

আমি সেকহাণ্ড্ করার ছলে তাঁর হাতখানি ধরে' বললাম—

"না, এখনও পাই নাই, তবে আশা আছে শীঘ্রই পাবো—।"

শ্রীসুধীরকুমার সেন।

বাঙালীর বেকারদশা ও ঘি-এর ব্যবসা

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এই দেশেই চার্ব্বাকের অনুশাসন ছিল—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। কিন্তু কর্ম্মহীনতার দুর্দ্দশা থেকে বাঙালীর জীবনে যে অনর্থের দশা আজ এসেছে তাতে কোনো ধারেই ধার পাবার ভরসা নেই! এমন কি, ঘৃত-পানের জন্যও না, শ্রীঘৃতের জন্য তো নয়ই, সস্তা ভেজিটেবল ঘিয়ের জন্যও না! কিন্তু পানের জন্য নয়, যদি ঘি-এর ব্যবসা করা হয়, এমন কি ঋণ করেও, তাহলে ঘৃত-যোগে বহু বেকারের বিকর্ম্মদশার দুর্য্যোগ দূর হতে পারে; সংক্ষেপে সেই পথের ইঙ্গিত দেবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

চাক্‌রি না-জোটার যত ভ্যাজাস্, তেমনি বেড়েছে ঘিয়ের ভেজাল; অন্ন-সমস্যা ও ঘি-সমস্যা দুয়েরই সমাধান হতে পারে—এক ঢিলে দুটো পাখীই মরে যদি বাংলার ধনবল ও জনবল আজ ঘি-এর ব্যাপারে লাগে। অবশ্য ঘিয়ের কাজেই যে সমস্ত বেকারের মুক্তি হবে এমন কথা বলিনা, তবু এই পথে যে অনেকেরই কর্ম্মসুযোগ আছে একথা জোর করেই বলা যায়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুদিন থেকে বল্‌ছেন যে বাঙালীকে বাঁচ্‌তে হলে চাক্‌রির মোহ ছেড়ে ব্যবসার বাজারে ভিড়তে হবে। বহু ব্যবসার মধ্যে ঘি-ও একটা ব্যবসা, কিন্তু একমাত্র ব্যবসা নয় একথা মনে রাখা দরকার। ক্লাইব ষ্ট্রীটের মায়া-মরীচিকার পেছনে ছোটা ছাড়তে হবে তা সত্য, কিন্তু কটন্ ষ্ট্রীটেই যে সবার মোক্ষ রয়েছে একথা আমি বল্‌ছিনে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য এই যে সমস্ত বড় বাজার জুড়েই বাঙালীর ভবিষ্যৎ—এই বড় বাজারের অধিকার বাঙালী হারিয়েছে, এই অধিকার তাকে আবার ফিরে পেতে হবে। কিন্তু এই কথাও সেই সঙ্গে মনে রাখা চাই যে এই বড় বাজার কেবলমাত্র কলকাতার এক বিশেষ অংশে বদ্ধ হয়ে নেই—সমস্ত বাংলার বুকে, বাংলার বাইরে, সারা দুনিয়া জুড়ে এই বড় বাজার। এই বড় বাজারে যখন বাংলার টাকা আর বাঙালীর ছেলে খাটবে তখনই এই দেশের অদৃষ্টে সম্পদের শুভলগ্নে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্না হবেন।

ঘিয়ের বাজারের কথাই বলি। কলকাতায় এখন এই ব্যবসায় কমবেশি এককোটি পঁচিশ লাখ টাকার ঘি বিক্রী হয়, অন্তত পক্ষে বছরে বহু লাখ টাকা লাভ দাঁড়ায়। কিন্তু এই লাভের প্রায় সমস্তটাই যায় অন্যপ্রদেশীর পকেটে; কেন না এই এককোটি পঁচিশ লাখের মধ্যে এককোটি পনের লাখই হচ্ছে অবাঙালীর মূলধন। শ্রীঘৃতের অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রমুখ যে কজন বাঙালী ব্যবসায়ীর টাকা ঘিয়ের ব্যাপারে খাটে তা সমস্ত জড়িয়েও দশ লাখের বেশি হবেনা—তারো কিছু আবার মাড়োয়ারির কাছে ধার-করা। বাংলাদেশে ঘিয়ের খদ্দের প্রধানতঃ বাঙালীই, তবু যে কেন লাখ লাখ টাকা বাংলার বাইরে চলে যায় সে এক সমস্যা। তার কারণ সম্ভবত এই যে বাঙালীর টাকার গায়ে এমন কিছু আছে যার জন্য অন্যদেশে পিছলে গিয়ে পড়াই তার স্বভাব—ঘি-মাখানো হলে তো আর কথাই নেই!

অথচ বছর চল্লিশ আগে এমন ছিলনা; সেকালে ঘিয়ের ব্যবসা বাঙালীরই একচেটে ছিল। সে সময়ে পঁচিশ জন মহাজনের কারবারে গড়ে চল্লিশ হাজার করে' দশ লক্ষ টাকা খাট্‌ত এবং তাঁদের ব্যবসার সমস্ত বিভাগে বাঙালী ছিল। অথচ তখনকার চেয়ে ঘিয়ের কাট্‌তি এখন পাঁচগুণ বেশি, তখন ঘি পঁচিশ টাকা মণ বিকোতো, এখন সেখানে তার দর ষাট টাকা, কখনো কখনো পচাত্তর পর্য্যন্ত ওঠে। অর্থ-নীতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি-নিয়মে এই এক্‌কোটি পঁচিশ লাখের সমস্তটাই এখন বাঙালীর মূলধন হওয়া উচিত ছিল,

এই রচনার তথ্যাংশে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছি।—লেখক

কিন্তু চল্লিশ বছর আগে তখনো যে দশ লাখ এখনো সেই দশ লাখ! বোধ করি, একেই বলে ভদ্রলোকের এক কথা!

মনে করলে এই এককোটি পঁচিশ লাখের গোটা কারবারটাই বাঙালীর অধিকারে আনা অসম্ভব নয়। কেননা ঘি আমরাই কিনি, আমরা যদি সংকল্প করি যে অবাঙালীর ঘি কিনব না তাহলে বছর বছর ত্রিশ লাখ টাকা আর বাংলার বাইরে যায়না এবং এই সুযোগে অন্তত দশহাজার বেকার যুবকের কর্ম্ম-যোগ ঘটে,—আমাদের ঘিয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের ভাতের ব্যবস্থা হয়। বাঙালীর স্বদেশী-বোধ আরেকটু কম ব্যাপক এবং কম সূক্ষ্ম হলেই এটা সম্ভব হতে পারে। আমাদের ভাই আমাদের আত্মীয় আমাদেরই বাংলার বেকার যুবক হা অন্ন হা অন্ন করে ফিরছে অথচ আমরা মাড়োয়ারির ঘি খাই এবং বোম্বাই মিলের কাপড় পরি। বাংলাদেশে দশটা বঙ্গলক্ষ্মীর মত কাপড়ের কল এবং পঞ্চাশটা শ্রীঘৃতের মত কারবার চল্‌তে পারে—অসংখ্য বিকর্ম্মার কর্ম্মসংস্থান হয় এবং অনুরূপ আরো বহু বাঙালীর ব্যবসা প্রেরণা এবং প্রতিষ্ঠা পায় যদি এই শুভবুদ্ধি আমাদের মাথায় আসে যে বাংলাদেশের থাক্‌তে অন্য দেশের কিছু কেনার মানেই অর্থনৈতিক আত্মহত্যা করা।

আমাদের দেশাত্মবোধের মধ্যে কিছু পরিমাণে ধোঁয়া আছে। দেশ বল্‌তে আমরা বুঝি ভৌগোলিক দেশকে, দেশের মানুষকে না। এবং দেশের কাজ বল্‌তে বুঝি তিন রঙা জাতীয় পতাকা ঘাড়ে নিয়ে তারস্বরে জয়ধ্বনি করা। দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি দায়ীত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধোঁয়াটে ধারণা। বস্তুতপক্ষে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য হচ্ছে দেশের মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য এবং মাত্র মৌখিক সহানুভূতিতে, মিটিংএর কাপড়ে ও মিটিংএর কান্নায় সেই কর্ত্তব্য চুকিয়ে দেওয়া চলেনা। দেশের নিরন্নতা, দেশবাসীর দুর্গতি, দেশের যুবকদের বেকার অবস্থার বিমোচন সেই কর্ত্তব্যের মধ্যে। যা-আমাদের-সাধ্যের-বাইরে-নয় সেই স্বদেশী জিনিস কিনে এই কর্ত্তব্যের অনেকটা আমরা পালন করতে পারি। যখনই আমরা স্বদেশী জিনিস কিনি তখনই আমরা যথার্থভাবে স্বদেশের কাজ করি—কেননা তার দ্বারা দেশবাসীর প্রতি দায়ীত্ব-পালন হয়। বিদেশী জিনিস কিনে যে কেবল দেশের দেনা বাড়াই তাই নয়, নিজের ভ্রাতৃ-ঋণের বোঝাও ভারি করি।

কিন্তু স্বদেশী কিনব এই সংকল্পই যথেষ্ট না, কি স্বদেশী এবং কি স্বদেশী নয় এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ থাকা দরকার। অসহযোগের যুগে স্বদেশী-খদ্দেরের উৎসাহের কাছে জাপানী খদ্দরেরও বাদ-বিচার ছিলনা—কিন্তু সেই খদ্দরের চেয়ে বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ধুতি যে বেশি স্বদেশী ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আজ কেবল জাপানী খদ্দরই নয়, গুজ্‌রাটি খদ্দরও আমাদের কাছে বিদেশী গণ্য হওয়া উচিত—বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতির কাছে। গুজ্‌রাট ভারতবর্ষের মধ্যে এবং ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ অতএব গুজ্‌রাট আমাদের স্বদেশের অন্তর্গত একথা কেবল ভৌগোলিক সত্য, নাড়ীর টানের সত্য নয়। কেননা তেমনি সত্য যে জাপান এশিয়ার মধ্যে এবং এশিয়া আমাদেরই প্রাচ্য দেশ,—প্রকৃতপক্ষে সমস্ত পৃথিবীই আমাদের প্রদেশ; কিন্তু এই বিশ্বপ্রেমের বৃহৎ বোধকে অন্তরের মধ্যে লালন করা ভালো, নিত্যকর্ম্মে পালন করতে গেলেই দুর্ব্বিপাক। কেননা এই বৃহৎ বোধের কৃপায় বেকার-সমস্যা দূর হবেনা বরং ক্রমশই বেড়ে যাবে; এই ভাববিলাসের দ্বারা নিরন্নের অন্নসংস্থানের আশা নেই, উল্‌টে এই উচ্চ চিন্তার ফলে আমাদের অন্নচিন্তা দিন দিন আরো চমৎকার হয়ে উঠ্‌বে।

স্বদেশীর মন্ত্র বাংলাদেশেরই—কিন্তু আজ নূতন অর্থে তাকে গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্র চিরদিনই এক থাকে, কিন্তু যুগে যুগে তার ইঙ্গিত বদ্‌লায়। বাঙালীর কাছে আজ এই মন্ত্রের নূতন মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা দরকার। আজ বাঙালীকে বুঝতে হবে গুজ্‌রাট্‌ ভারতবর্ষের মধ্যে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে নয়—এইজন্যই আহমেদাবাদের ধুতি বাঙালীর কাছে বিদেশী। বাঙালীকে বাঁচ্‌তে হলে তার কাছে আজ Buy Indian এর চেয়েও বড় কথা Buy Bengalee। স্বয়ং-আমি সোহং, বিশ্বাত্মা, ব্রহ্ম, বিশ্ব-রাষ্ট্রের নাগরিক যা খুসি হতে পারি কিন্তু প্রথমে আমি আমার মার সন্তান, আমার প্রথম কর্ত্তব্য আমার ভায়েদের প্রতি; এইজন্যই আজ এই বোধনা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যে আমরা প্রথমে বাঙালী তারপরে ভারতবাসী বা অন্য কিছু।

অতঃপর, ঘিয়ের কথাতেই আবার ফেরা যাক্,—পঞ্চাশ বছর আগের বৃত্তান্তই বলি। বাংলাদেশের চাহিদা তখন বাংলাদেশের ঘিয়েই মিটত, তখনো পশ্চিমি-ঘি-এর মুলুকে রেল্ লাইন্ পড়েনি এবং অবাঙালী ঘিয়ের আমদানি আরম্ভ হয়নি। সেই সময়ে ঘাটাল চন্দ্রকোণা বালিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে মট্‌কিতে ঘি আস্ত। তখনো টিনের প্রচলন হয়নি; খুব সম্ভব শ্রীঘৃত থেকেই টিনের চলন সুরু হয়। গোড়াগুড়ি কেরোসিন তেলের টিনেই ঘি ভরা হোতো, কিন্তু খুব ভালো করে' ধুলেও কেরোসিনের গন্ধ একেবারে যায়না এবং তাতে ঘিয়ের ক্ষতি হয় বলে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয়ই প্রথম অর্ডার দিয়ে শ্রীঘিয়ের জন্য আলাদা টিন তৈরি করান—সাধারণের সুবিধার জন্য আড়াই সের পর্য্যন্ত টিনের প্রবর্ত্তন তাঁর থেকেই।

আশী বছর আগে ঘির দর ছিল এই :

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে—জালানি ঘৃত মণপ্রতি		...	১৫৲
গাওয়া	...	...	১৯৷৷০
মুঙ্গের	...	...	১৭৸০
ভয়সা	...	...	১৬৸০
চৌপল	(মস্‌লিপট্টন)	...	১৭৷০
নাথপুর	(মুর্শিদাবাদ)	...	১৭৸০

আকবরের সময়ে (১৫৫৬—১৬০৫) ঘিয়ের দাম :

দিল্লীর দর ২৷৷৵০ মণ

দুধ— ৷৷৵০ মণ

চল্লিশ বছর আগে ঘিয়ের দর ছিল মণকড়া ২৫৲ পঁচিশ টাকা।

১৯১৮ সালে যুদ্ধের পরে শ্রীঘৃতের দর—১০০৲ মণ

১৯৩৩ সালে এখন ঘিয়ের বাজার :

শ্রীমার্কা	...	৫৪৲
খুর্জ্জা	...	৪৬৲
শেকোহাবাদ	...	৪৪৲
সাগর	...	৩৫৲

চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশের ঘিয়েই বাঙালীর অভাব মিটত—বাংলার বাহিরের ঘি বলতে একমাত্র মস্‌লিপট্টমের ঘিয়েরই তখন কেবল আমদানি ছিল। এই ঘি চাম্‌ড়ার কুপোয় সমুদ্রপথে আস্‌ত, আনা খুব ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর ছিল বলে' এর আম্‌দানি পরে বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিম দিকে প্রথম দানাপুর পর্য্যন্ত রেল্ হতেই সেখানকার ঘি বাংলার বাজারে আস্‌তে সুরু করে—ঘিয়ের দানাদার বিখ্যাতি দানাপুর থেকেই হয়েছে কিনা সেটা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়! তারপর মোগলসরাই পর্য্যন্ত রেল্ খুল্‌তেই আড়া, বালিয়া, বক্সার প্রভৃতি জায়গার ঘি কলকাতায় আস্‌তে সুরু হোলো। এদিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতেই বেজওয়াদা, টেনালি, গণ্টুরের ঘি এখানকার বাজারে এসে পড়ল। ক্রমশঃ আরো পশ্চিমে রেলপথ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমি ঘি বাংলাদেশ ছেয়ে ফেল্‌ল।

এখন এই সব কেন্দ্র থেকে কলকাতার বাজারে ঘিয়ের আমদানি হয়ে থাকে : খুরজা, বুলন্দ্‌সর্, হাত্‌রাস্, আলিগড়, কাসগঞ্জ, আগরা, মথুরা, দ্বারকা, টেনালি, গণ্টুর, বেজওয়াদা, রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড্, গোয়ালিয়র, ছোটনাগপুর, পালামৌ, ডালটনগঞ্জ, শিবগুহা, নেপাল-তরাই, গোরক্ষপুর, পুর্ণিয়া, ব্রিজ্‌মণগঞ্জ, নেপালগঞ্জ, নানুপাড়া, মুঙ্গের, আরা, বালিয়া, বিষমপুর, রোহতক্, সফেদামণ্ডি, নারনোল্ ইত্যাদি। এই তালিকা থেকেই দেখা যাবে বাংলার বাজারে এখন বাংলার ঘিয়ের স্থান কোথায়। পূর্ব্বে মেদিনীপুরের ঘাটাল, চন্দ্রকোণা এবং পূর্ব্ববঙ্গের পাবনা বিক্রমপুর থেকে মট্‌কির ঘি আস্‌ত, কিন্তু পশ্চিম মুলুক থেকে টিনভর্ত্তি ঘিয়ের আম্‌দানি হতেই, পশ্চিমি টিনের প্রথম ঠোক্করেই বাংলার মট্‌কি ফেঁসে গিয়ে মট্‌কায় উঠ্‌ল! টিনের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কার প্রচলন হয়—পাতিরাম মার্কা, শ্রীমার্কা ইত্যাদি মার্কা মারা ঘিয়ের চল্‌তি সুরু হয় সেই সময় থেকেই। পশ্চিমি ঘিয়ের প্রতিযোগিতায় হটে গিয়ে ঘাটাল চন্দ্রকোণা প্রভৃতি এখন ছানা ও ক্ষীরের ব্যবসা ধরেছেন। কলকাতার বাজারে ক্ষীর-ছানা কাটিয়ে তাঁদের বেশ লাভ হয়, বোধহয় ঘিয়ের চেয়ে বেশি লাভ হয়।

বছর ত্রিশের মধ্যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি করে সমস্ত ব্যবসাটা বাঙালীর হাতছাড়া হয়ে মাড়োয়ারির কবলে গেল ভাব্‌লে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক এতে বিস্মিত

হবার কিছু নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বুকটান্ করে' দাঁড়াবার বৃত্তি নেই বাঙালী ব্যবসায়ীর; অসুবিধা দেখ্‌লে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই এঁদের প্রবৃত্তি। অন্যদিকে মাড়োয়ারির স্বভাব একেবারে উলটো, তাছাড়া তারা ভারি রক্ষণশীল। যেখানেই ওরা যাক্ নিজের আচার ব্যবহার বজায় রাখার চেষ্টা থাকে ওদের—কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নিজেদের বামুন, গোয়ালা, হালুয়াই, স্বর্ণকার, এমন কি পাগ্‌ড়ি রং করবার জন্য মুসলমানদের পর্য্যন্ত দেশ থেকে আমদানি করেছে। কেবল সঙ্গে আনা নয়, ব্যবসা দিয়ে এদের এখানে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে—এরই নাম সহযোগিতা। পরস্পরকে সাহায্য করা বাঙালীর ধাতে বড় নেই, যে বিশেষ গুণটি মাড়োয়ারির একেবারে মজ্জাগত। অপরের প্রতিষ্ঠায় আপনারই প্রতিষ্ঠালাভ, অপরকে সাহায্য করার মানে নিজেকেই সাহায্য করা—এই সত্য যতদিন না বাঙালী বুঝবে ততদিন কি ব্যবসার ক্ষেত্রে, কি অন্য ক্ষেত্রে, কোথাও তার যথার্থ কল্যাণের আশা নেই।

মাড়োয়ারির সহযোগিতা-নীতির ফলে কি হয়েছে? কলকাতায় সর্ব্বসাধারণের জন্য যে সব পুরী-মিঠাইয়ের দোকান আছে তার অধিকাংশই অবাঙালীর পরিচালিত; মাড়োয়ারিরা নিজেদের মূলধন দিয়ে এই সব দোকানের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। ভেজাল ঘি চালানোর পক্ষে এই দোকানগুলো যে কত বড় পথ সে কথা আর বলে দিতে হবে না। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কি ঘিয়ের আমদানী কর্ত্তা, কি আড়তদার, কি দালাল, কি পাইকার, এমন কি ঘি-বইবার মুটে পর্য্যন্ত সবাই মাড়োয়ারি কিম্বা রাজপুতানা-মাড়োয়ারের লোক,—এর কোনো ব্যাপারে বাঙালীর চিহ্নমাত্র নেই। ফলে এই হোলো, ভেজাল ঘি বন্ধ করায় বাঙালীর কোনো হাত তো নেইই—এমন কি নিজের খাঁটি ঘি বাজারে চালানো পর্য্যন্ত বাঙালী ব্যবসাদারের পক্ষে দুঃসাধ্য দাঁড়িয়েছে। কেননা একথা বোঝা শক্ত নয়, যারা ব্যবসার গোটা organisationটাই করায়ত্ত করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিদের তারা অনায়াসেই কোণঠাসা করতে পারে, যা খুসি চালানো তাদের পক্ষে অতি সহজ। তা ছাড়া যে ভেজাল জিনিস দেয় সে পুরো দাম নিয়ে অর্দ্ধেক জিনিস দেয় না, (বাকি অর্দ্ধেক তো অপদার্থ করে' দেয়ই) সুতরাং তার পক্ষে খাঁটি জিনিসের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতায় নামা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এবং এই দর কাটাকাটির পাল্লায় কোনদিকে ঝুঁকি হবে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা সুন্দর মুখের মত সস্তা দামের জয় সর্ব্বত্র।

মাড়োয়ারি আসার আগে একেবারেই ভেজাল ঘি ছিল না একথা বললে ভুল হবে; আগেও ভেজাল্ চল্‌ত, তবে এতটা ফলাওভাবে নয়। তখনকার দিনে মটকিতে তিন থাকে ঘি থাকৃত, সব নীচে নিকৃষ্ট ঘি, মাঝের থাকে কিছু সরেস, কেবল ওপরের থাকে থাকৃত উৎকৃষ্ট ঘি। এছাড়াও সে সময়ে বাদাম তেল, কুসুমবীজের তেল ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো হোতো—কিন্তু এসব ভেজালের প্রাদুর্ভাব খুব কম এবং কদাচ ছিল; কেননা ব্যবসায়ে অসাধুতা তখন এত প্রবল হয়ে ওঠেনি। আজকাল ঘিয়ের সঙ্গে জান্তব চর্ব্বি, ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট মেশানো হয়ে থাকে—তখনকার মিশ্রণ-রীতির সঙ্গে এর আকাশ পাতাল পার্থক্য। কলকাতায় বহু চর্ব্বির কারখানা আছে, লক্ষ লক্ষ টাকার চর্ব্বির কারবার চলে, এই সব কারবারী কর্পোরেশন থেকে লাইসেন্স নিয়ে পাকা হয়ে খুঁটি গেড়ে বসেছে। এঁদের দৌলতে ঘি আর পেয় পদার্থ নেই, চর্ব্বির সংযোগে তা এখন রীতিমত চর্ব্ব্য ব্যাপার! সম্প্রতি জাপান থেকে এক প্রকার hydrogenised মাছের তেলের আমদানি সুরু হয়েছে ঘি বা মাখনের সঙ্গে যার ভেজাল ধরবার কোনো উপায় নেই। কিছুদিন আগে বোম্বাই সহরে মাখনের দোকান খানাতল্লাসী এই তৈলাক্ত মাখন ধরা পড়েছে, এতদিনে কলকাতার বাজারেও যে এ-বস্তুর আবির্ভাব হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সাধারণ লোকের ধারণা বাজারে দু প্রকারের ঘি—শ্রীঘৃত আর বিশ্রী ঘৃত, অতএব ভেজালের হাত থেকে বাঁচতে হলে চেনা মার্কা কেনাই নিরাপদ; কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। শ্রীঘৃত ছাড়াও অন্য মার্কার খাঁটি ঘি বাজারে আছে এবং এসব ছাড়াও আরেক রকমের ঘি আছে যাকে বিশ্রী ঘৃত অর্থাৎ ভেজাল ঘি-ও বলা চলেনা, কেননা আসলে তা ভেজালও নয়, ঘি-ও নয়। ভেজিটেবল্ প্রডাক্ট বনাম

বনস্পতি-ঘিয়ের কথাই এখানে বল্‌ছি। কলকাতার বাজারে ভেজিটেবল্ ঘি বড় কম কাটেনা: ১৯২৮ সালে ৪২, ৬২, ২০১৲ টাকায় ৯৭,০৩১ হন্দর উদ্ভিজ্জ ঘি-এর আমদানী হয়েছিল,—১৯২৯ সালে ৪৩,৪৫৯৮৫৲ টাকায় ১,১১,৩৯৯ হন্দর বনস্পতি আসেন; এর আমদানি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রথমে ঘিয়ের সস্তা বিকল্প (Cheap Substitute) রূপে এর আবির্ভাব হলেও, এখন এ-বস্তু ঘিয়ের প্রধান অনুকল্প (Chief adulterant) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘিয়ের সঙ্গে মেশানো ছাড়াও ভেজিটেবল্ ঘির এম্‌নিই কাটতি আছে, অনেকে ঘিয়ের পরিবর্ত্তে এই উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করেন। তাঁরা বলেন, ভেজাল ঘিয়ের চেয়ে ভেজিটেবল ঘি নিরাপদ এবং সস্তাও বটে। কিন্তু দুধের স্বাদ যদিবা ঘোলে মেটে, ঘিয়ের প্রয়োজন কিছু বনস্পতিতে মিটতে পারে না। কেননা উদ্ভিজ্জ ঘিয়ের মধ্যে সেই খাদ্যপ্রাণ নেই যা বিশুদ্ধ ঘিয়ে বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত রাসায়নিকরা একমত যে, যে হাইড্রোজেনিজেসন প্রক্রিয়ায় ভেজিটেবল্-প্রডাক্ট প্রস্তুত হয় তাতে ভিটামিন A বজায় থাকা অসম্ভব, সেই কারণে এই বস্তু বিশুদ্ধ ঘিয়ের বদলে কখনো ব্যবহার্য্য হতে পারে না। এই হেতু শিশু কিম্বা তার মাকে ইহা কদাপি দেওয়া উচিত নয়। শরীর-পুষ্টি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সের পক্ষে ভিটামিন-Aর একান্ত প্রয়োজন, খাদ্যে এই ভিটামিনের অভাব হলে দেহ পোষণের ক্ষতি হয় এবং ক্ষয়ের কারণ ঘটে।

ঘি আমাদের নিত্য প্রয়োজন, এর বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য এই ব্যবসায়ে বাঙালীর ধনবল ও জনবল কেন বিনিয়োগ করা দরকার, নানাদিক থেকে আমরা তার আলোচনা করে' দেখ্‌লাম। কেবল ঘিয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষাই নয়, বহু বেকারের আত্মরক্ষাও এই ব্যাপারে নির্ভর করছে। ঘি আর কাপড়, বাঙালীর এই দুটি আবশ্যকের ব্যবসা বাঙালীর অধিকারে এলে আজ এই মুহূর্ত্তেই এই প্রদেশের অনেক দুর্দ্দশার অবসান হয়। এখানে ঘিয়ের কথাই বলি, এই ব্যবসায় নাম্‌তে হলে কি ভাবে সুরু করা দরকার।—

প্রথমত, যাঁরা বেকার তাঁরা কয়েকজন মিলে কিছু টাকার যোগাড় করে' ঘিয়ের মোকামে নিজেরা যান, সেখানে স্বয়ং পরীক্ষা করে' খাঁটি ঘি কিনুন, পরে সেই ঘি আড়াই সেরি টিনে ভর্ত্তি করে' কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন সহরে, বাড়ী বাড়ী ফিরি-করা আরম্ভ করে' দিন। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতাই হচ্ছে একমাত্র মূলধন—মাড়োয়ারি ফেরিওলা থেকে সুরু করে বলে' সেই অভিজ্ঞতার জোরেই একদিন ব্যবসার চূড়ায় উঠে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, বেকার নন্ কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর যাঁরা লাভের ব্যবসায় টাকা খাটাতে চান তাঁরা দল বেঁধে মূলধন যোগাড় করে' সমবায় পদ্ধতিতে মাঝারি স্কেলে ঘিয়ের ব্যবসা ফাঁদ্‌তে পারেন। তাঁদের রীতিমত জেনে শুনে এবং তোড়জোড় করে' নাম্‌তে হবে, তার টেক্‌নিক্যালিটি নিয়ে আলোচনা করবার এস্থান নয়। তবে একটা কথা, যেখানে ঘিয়ের উৎপত্তি স্থান সেখান থেকে ঘি কিনে টিনে ভরে' বাজারে চালান দেবার আগে তার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। এজন্য কেবল কর্পোরেশনের পরীক্ষা এবং পাসপোর্টের উপর নির্ভর না করে', তাঁদের শ্রীঘৃতের মত ঘিয়ের মোকামেই বিশ্লেষণাগার (ল্যাবরেটরী) রাখ্‌তে হবে। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা করার আনুষঙ্গিক দায়ীত্ব আছে, তার খাঁটিত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখলে চলে না; কেননা এ ব্যাপারে অসাধুতা কেবলমাত্র অসাধুতা নয়, তা হচ্ছে crime against community.

এপর্য্যন্ত গেল ঘিয়ের ব্যবসার কথা, কিন্তু এর বাণিজ্যের দিকও আছে—সেদিকে এর সম্ভাবনা প্রচুর। পৃথিবীর লোকেরা এখনো ঘি খেতে শেখেনি, তবে ভারতবর্ষে যে সব বিদেশী এসেছে তাদের অনেকে ঘিয়ের ব্যবহার জেনেছে বটে। যদি কোনো উপায়ে চেষ্টা চরিত্র করে' ইউরোপ আমেরিকার বাসিন্দাদের ঘি ধরানো যায় তাহলে ভারতের ভাগ্যে এইসূত্রে যে প্রচুর অর্থযোগ রয়েছে সেকথা বলাই বাহুল্য। এখন পৃথিবীর যেখানে যেখানে ভারতবাসী গেছে সেখানে সেখানেই ঘি যায়, কেননা ঘি না হলে কোনোদেশেই কোথাও আমাদের চলেনা। দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ব্ব আফ্রিকা, আমেরিকার ব্রিটিশ গায়না, কেনাডা, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থানে স্থানে ঘি গিয়ে থাকে। বাঙালীদের মধ্যে অশোকচন্দ্র রক্ষিত মহাশয়রা সিঙ্গাপুর, পেনীং, হংকং, সাংঘাই, শ্যাম এবং যবদ্বীপে তাঁদের শ্রীঘৃত রপ্তানি করে' থাকেন। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়, বাহিরের এই বাজারকে আরো বাড়াতে হবে, আরো বিস্তৃত করতে হবে—এইজন্য বিদেশীর রাজ্যে প্রোপাগাণ্ডা করা চাই, প্রতিনিধি পাঠানো চাই। আপাতত এই কর্ত্তব্য করবেন বিদেশে যে সব ভারতবাসী আছেন তারা—প্রতিবেশিদের কানে চার্ব্বাকের মন্ত্রদানের ভার এখন তাঁদের ওপর। তাঁরা যদি "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই প্রস্তাবে পৃথিবীর লোককে রাজি করাতে পারেন তাহলে তাঁদের স্বদেশবাসীর পক্ষে ঐ শ্লোকের "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ" এই প্রথম অংশটা পরম সত্য হয়ে দাঁড়ায় অচিরেই।

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

১৫

একবার দিন সাতেক সুরপুর ঘুরে এলাম। কাকীমার বাড়ীতেই রইলাম। কোম্পানীর কাগজ সমস্ত কাকা আমায় বুঝিয়ে দিলেন। বাড়ী ও জোতজমা সম্বন্ধে বললেন যে তাঁর মতে বেচে ফেলাই ভাল। তিনি থাকতে থাকতে বেচলে তিনি দেখবেন যে ভাল দাম পাই। আমি জানালাম যে আমার এতে সম্পূর্ণ মত আছে। কাকা বললেন,

"এ সব কাজ আমি করব, যদি তুই কবুল হস্ যে বছরে একবার করে দেখা দিয়ে যাবি। আমরা ম'রে গেলে তুই পুরো সহরবাসী হয়ে যাস, কেউ আপত্তি করবে না। সুরেশ ত আর সুরপুরে বাস করবে না। হ্যাঁ নরেশ, সে লেখাপড়া করছে ত?"

"এখনও পরীক্ষার ত ঢের দেরী। ক্লাসে নিয়মিত যায়। ঘরেও একটু আধটু পড়ে।"

"নজর রাখিস, বাবা। বেশী বাবুয়ানা না শেখে। আমি ত এমন কিছু টাকা রেখে যেতে পারব না।"

"কাকা, সুরেশের বড় ইচ্ছা যে বিলেত গিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে আসে। পাঠালে দোষ কি?"

"তুই এই কথা বললি, নরেশ! রমেশের কাণ্ড এর মধ্যেই ভুলে গেলি! আমি এই বুড়ো বয়সে জাতে ঠেকো হয়ে থাকতে পারব না। আমাদের বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ ত জানিস্। ইংরেজী জানা লোক আঙুলে গোণা যায়। তোর ওকালতী করার কিছু ব্যবস্থা হল?"

"পাসের খবর বের হলেই ব্যবস্থা করব।"

রাজা রত্নেন্দু নারায়ণের দয়ার কথা কাকাকে সব বললাম। তিনি শুনে খুব আহ্লাদিত হলেন, বললেন,

"দাদা বৌদির পুণ্যফলে সব হচ্ছে, নরেশ। রাজার মত একটা মুরুব্বী পেলে পসার জমতে দেরী হবে না। কিন্তু মেনেজারী চাকরী নিস্ না। এরই মধ্যে বাঁধা ধরার ভেতর কেন যাবি? রমেশের বাবা কদিন আগে এসেছিলেন। সরলা তাঁর কাছে থাকবে না শুনে অনেক দুঃখ করলেন। কিন্তু বললেন যে তাঁর গুণধর ছেলে তাঁর ত আর জোর করার পথ রাখে নেই।"

"কাকা, সরলার সম্বন্ধে কিছু ঠিক করা শক্ত। এখন পড়াশুনো করুক। আমার বাড়ী ঘর দোর হলে সেন মহাশয় একজন ভাল মাষ্টার ঠিক করে দেবেন বলেছেন। সে এখনই মাসীমার সঙ্গে পাঁচ রকম ভাল কাজে সাহায্য করে। বড় হয়ে তার কার্য্যক্ষেত্র যদি সে বাড়াতে পারে তাহলেই সে সুখী হবে। সে যে রকম চাপা মেয়ে বুঝতে পারি না রমেশের জন্য তার মন কেমন করে কি না। সে রমেশকে একদিন লিখেছিল যে তার টাকা নেবে না। রমেশ তার জবাব দিয়েছিল, 'তোমায় চিঠি লিখে অপমান করব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

রমেশের জবাব সে আমায় এনে দেখিয়েছিল। দেখিয়ে বললে, 'দাদা, আমার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত ঘুচেছে। কিন্তু লোকটা ভদ্রলোক। আমাকে সৎকর্ম্মের পুরো অবসর দিতে চায়। আমাকে কিছু কাজ করতে শিখিয়ে নাও। আমার জন্য একটুও দুঃখ ক'র না, দাদা।' সেই থেকে আরও মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো করছে।"

কাকা বললেন, "নরেশ তুই নিজেও ওর সহায়তা করবি। শুধু ওকালতী নিয়ে কেন প'ড়ে থাকবি? দাদার দেখ্‌ছিস ত, একদিনের জন্য দেশকে ভোলেন নেই।"

"আমি এইবার কংগ্রেসের কাজে লেগে যাব, কাকা। মাঝে মাঝে ভারত-সভা, ছাত্র-সমাজ, এ সবে যাই। তবে আমার মুস্কিল এই যে সুরেশের মত একটা জ্বলন্ত উৎসাহ হয় না কোন কাজে।"

"জ্বলন্ত উৎসাহ শুনতে বেশ। কিন্তু আসল দরকার নিঃশব্দে শান্তভাবে কাজ করা, বছরের ৩৬৫ দিনই একটু একটু কাজ করা। সুরেশের উৎসাহ যে খড়ের আগুন। তাতে কাজেরও বিশেষ সাহায্য হয় না। নিজের চরিত্রেরও উন্নতি হয় না।"

এই রকম কাকার সঙ্গে নানা গল্পস্বল্প ক'রে কাকীমার রান্নার যথাযোগ্য সম্মান ক'রে কলকাতায় ফিরলাম।

ষ্টেশনে সুরেশ ছিল। দুজনে সোজা সেনমহাশয়ের বাড়ী গেলাম। গাড়ীর শব্দ পেতেই সরলা দুড় দুড় ক'রে নীচে এসে দোর খুলে দিলে। "দাদা এয়েছে?" ব'লে ছেলেবেলার মত আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। উপরে নিয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল,

"মাসীমা, মেসোমশায়, দাদারা এয়েছে।"

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুরপুরের সব খবর জিজ্ঞাসা করলে। বিষয়-আশয় সম্বন্ধে কাকার মতামত মেসো মহাশয়কে জানালাম। সরলার চোখ দুটী ছল ছল ক'রে এল, বললে

"দাদা, বাড়ীটা রাখলে হয় না?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রাখলে তুই সেখানে যাবি কি? যেতে পারবি কি?"

মেসো মহাশয় বললেন, "না নরেশ, কাজ নেই। তোমার ডাক্তার কাকা যা স্থির করেছেন তাই ঠিক। তোমাদের মা বাবার স্মৃতি তোমাদের মনে গাঁথা থাক। তাঁদের ঈশ্বর ভক্তি, দেশপ্রীতি তোমাদের হৃদয় আলো করুক। তোমরা যেখানেই থাকবে সেই তোমাদের বাবা মার বাড়ী হবে।

সুরেশ বললে, "সরলা ভাই, আমাদের ত সুরপুরে দুটো বাড়ী। একটা গেলেও অন্যটা রইল।"

"হ্যাঁ, ছোটদা, তা ত বটেই। আমায় নিয়ে যেয়ো একবার।"

খাওয়া দাওয়ার পর সুরেশ আর আমি আমার বাসায় গেলাম। আমার ঘর দুটি তক্‌তক্ করছে। শরদিন্দু নিজে সব গোছ গাছ ক'রে রেখেছে। আমায় দেখেই দৌড়ে এসে প্রণাম করলে। তারপর এক গাল হেসে বললে,

"এসেছেন বাঁচলাম। একা একা যা dull বিশ্রী একঘেঁয়ে লাগছিল কি বলব! সরলাদিদি ভাল আছেন ত?"

"হ্যাঁ, ভালই আছে। এই তাকে দেখে এলাম। তোমাদের আর সব ভাল ত?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। চলুন, বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। তিনি এখনও বিশ্রাম করতে যান নেই।"

রাজা সাহেবকে প্রণাম ক'রে এসে সুরেশ আর আমি তক্তায় শুয়ে পড়লাম। শরদিন্দু একটু ব'সে বললে, "আমি এখন যাই। আপনারা বিশ্রাম করুন। ছোটদা, পালাবেন না যেন বিকেলে একসঙ্গে বেরোব।"

আমরা দুজনে শুয়ে শুয়ে নানা গল্প করতে লাগলাম। খানিক পরে আমি বললাম,

"সুরেশ, কাকা তোর বিলেত যাওয়া নাকচ ক'রে দিয়েছেন। আমি বোঝালাম কিন্তু তিনি বুড়ো বয়সে একঘরে হতে একেবারে নারাজ।"

"সুরেশ চিন্তিতভাবে একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর জিজ্ঞাসা করলে,

"আমার উপর কি রকম ভাব দেখলে? আমায় ত খুব লেক্‌চার দিয়ে এক পত্র লিখেছেন।"

"আমি বললাম তুই কলেজ যাচ্ছিস্ আর ঘরেও একটু একটু পড়ছিস। কিন্তু তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করলেন তোর বাবুয়ানার কথা। বললেন তোকে জানিয়ে দিতে যে তিনি পয়সা কড়ি বিশেষ রেখে যেতে পারবেন না, বাবুয়ানা অভ্যাস হলে নিজেই কষ্ট পাবি।"

"কি আর বাবুয়ানা করছি বল? সব জায়গায় যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। কোট পেন্টলুন পরা ছেড়ে দিয়েছি। এক লাউডন ষ্ট্রীটে যাই মাঝে মাঝে, তাও ধুতি চাদর প'রে।"

"কেন রে, এত বৈরাগ্য হল কেন? রোমা, মীরা, এদের সঙ্গে ঝগড়া করলি নাকি?"

"না ঝগড়া করব কেন? মীরা বরং আমার উপর আগের চেয়ে বেশী সদয়। সে বলে যে বিশ্রী কাটের সুট পরা ব্যারিষ্টার বাবুদের চেয়ে আমায় ধুতি প'রে ঢের বেশী

ভাল, interesting দেখায়। আমি কিন্তু ওদের সব ছেড়ে দিয়েছি। ওসব হালকা প্রকৃতির মেয়ে আর আমার ভাল লাগে না। আর দিবারাত্র হৈ হৈও সইতে পারি না। লাউডন ষ্ট্রীটেও যে যাই, তাও অল্পক্ষণের জন্য। লোকজন আসতে আরম্ভ হলেই মায়া আর আমি বেড়াতে চ'লে যাই।"

"কে? কার সঙ্গে বেড়াতে চ'লে যাস্?"

"মিস্ সিংএর নাম মায়া তা জানতে না?"

"আমি কি ক'রে জানব, বল্।"

"ভাল কথা, শনিবার দিন তোমাকে নিয়ে যেতে ব'লেছেন ওঁদের বাড়ী।"

"আমাকে? আমার অস্তিত্ব ওঁরা জানলেন কি করে?"

"আমি গল্প করেছি যে আমার দাদা, আমার একমাত্র বন্ধু, নরেশচন্দ্র দে কলকাতায় থাকেন। কিছু অন্যায় করেছি কি?"

"না, তা বেশ করেছিস্। কিন্তু আমি কি একটা সামাজিক জীবের মধ্যে গণ্য? আমি কি কোথাও যাই রে সুরেশ?"

"তা আর কোথাও যেও না। কিন্তু মায়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে না এও কি সম্ভব? আমার সব চেয়ে বড় দুই বন্ধু পরস্পরকে চিনবে না?"

"তোর বন্ধু সমরদের কি আমি চিনতাম? তোর ত কত রকমের বন্ধু হয়।"

"কিসে আর কিসে? সমরের সঙ্গে মায়ার তুলনা করছ?"

"আমি কিছুরই তুলনা করি নেই. ভাই। তুই রাগ করিস না।"

তারপর ধীরে ধীরে সুরেশের মুখ থেকে কদিনের ইতিহাস শোনা গেল। তার ত সব কাজই এই রকম ঝড়ের বেগে সম্পন্ন হয়। এই সেদিন শুনে গেলাম যে সিং পরিবারের সঙ্গে তার নূতন আলাপ পরিচয় হয়েছে। আর আজ যা শুনছি, তার একমাত্র অর্থ হতে পারে যে পুষ্পধনু বেচারার উপর এমন শরসন্ধান করেছেন যে আর তার রক্ষা নেই। মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার কথা যখন সুরেশ সরলার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিল। সে সুরেশে আর এ সুরেশে কিছু বিশেষ তফাৎ আছে কি? কাকাই না সেদিন খড়ের আগুন কথাটা বলেছিলেন। না, এ চলবে না। এই সব নব্য হাল ফেশনের মেয়েদের আমি কিছুই জানি না। কে জানে, হয় ত শ্রীমতী মায়া এ মুর্খটার উপর মায়াজাল বিস্তার ক'রে তার মাথাটী খাচ্ছেন। কাকা কাকীমার মুখ চেয়ে কিছু একটা করতে হবে ত? কি করব? একবার শনিববারে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসব? না, কাজ নেই। আমি ও সব জায়গায় ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবী খাবি খাব। আচ্ছা, মায়া ব'লে কাউকে কি আমি চিনি। কাকে মনে হচ্ছে ঠিক ধরতে পারছি না।

"হঠাৎ সুরেশ বললে, "কি ভাবছিস্, নরেশ দা?"

"ভাবছি কাকার কথা, ভাই। বুড়ো বয়সে তিনি একঘরে হতে চান না।"

"তুমি পাগল? আমার সঙ্গে মায়ার কি সেই সম্বন্ধ! আমরা দুই বন্ধু। আমাদের বিয়ের কোন কথাই নেই।"

"সুরেশ, ওঁরা তোর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করেন না?"

"হ্যাঁ ভাই মিসেস্ সিং সব জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমার আপন ভাই বোন আছে কি না, বাবা কতদিন ডাক্তারী করছেন?"

"তাঁরা কি জানেন, যে দেশে তোদের তালুক মুলুক আছে আর কাকার বেশ রোজগার?"

"তা কথায় কথায় বলে থাকব। ওসব কথা কেন জিজ্ঞাসা করছিস্, নরেশদা?"

"কিছু না। মায়ার সঙ্গে তোর যখন বিয়ের কোন কথা নেই, তখন আমারও বলবার কিছু নেই। আচ্ছা, সেই মাতুর কি হল্? সে হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি?"

"সে কি হাল ছাড়বার পাত্র? সে প্রায়ই আসে। কিন্তু তাকে দেখলেই মায়া আমার দিকে চোখ টিপে একটা কিছু দেখতে যাওয়ার কথা স্থির আছে বলে। একটু পরেই আমরা দুজনে বেরিয়ে যাই।"

"কোথায় যাস্ তোরা ? মায়ার মা সঙ্গে যান না ?"

"সেই যে বাজি রেখে টেনিস খেলা হল মনে আছে ? মাডুকে ত খুব হারিয়ে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা ওখানে খেয়ে দেয়ে সবাই থিয়েটার দেখতে গেলাম, অবশ্য মাডু ছাড়া। তার পর কত জায়গায় যাওয়া হয়ে গেছে, সার্কাস, মাঠে Skating Rink. আবার থিয়েটার, সব বাগানগুলো, চা খাওয়ার হোটেলগুলো, এমন কি ব্যারাকপুর পার্ক পর্য্যন্ত। প্রথম দুচার বার মিসেস্ সিং যেতেন সঙ্গে। এখন আমরা দুজনে একলাই যাই।"

এই রকম কত গল্প সুরেশ করতে লাগল। বুঝলাম যে মাডুকে উপলক্ষ ক'রে তার আর মায়ার ভাব হয়েছে। এখনই করার কিছু নেই। দিন কয়েক দেখি। সময় কাটাবার জন্য আবার মাডুর কথা উত্থাপন করলাম,

"হ্যাঁরে সুরেশ, এই মাডুটি বাইরে ঐ রকম আকাট্ সাহেবি আর বাড়ীতে সনাতনী চাল কি ক'রে চালায় বল্ দেখি।"

"তার কথা ছাড়। এক দিন লাউডন ষ্ট্রীটে বেড়াতে এসেছিল, মিসেস্ সিং তাকে রাত্রে খেয়ে যেতে বললেন। আমরা সেদিন পালাতে পারলাম না। কাজেই মায়া আর আমি ঠিক করলাম যে মাডুকে নিয়ে আজ খুব মজা করা যাবে। খেতে ব'সে লোকটা গোটা আষ্টেক বড় বড় তপসে মাছ ভাজা খেয়ে ফেললে।

মায়া অমনই জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কি করলেন, মুকারজী সাহেব ? নেটীব মাছ অতগুলো চেয়ে চেয়ে খেলেন। লোকে জানলে কিন্তু খাতির থাকবে না।'

মাডু একটু হেসে গোঁফে হাত দিয়ে বললে, 'এ মাছগুলো আমাদের Red Mulletsএর (লাল আম্‌লেট মাছের) মত খেতে কি না, তাই আমি এদের dislike (অপছন্দ) করি না। নইলে এদেশে খাওয়ার উপযুক্ত জিনিস কিছু নেই বললেই হয়। মাছ মাংস খারাপ, দুধ পাতলা, ফল তরকারী জলের মত, খেয়ে কোন taste (স্বাদ) পাওয়া যায় না',

এই বলতে বলতে টেবিলে পুডিং এল। সেদিনকার পুডিংটা ভাপা দই। মায়া আমার জন্য করেছিল। দেখেই মাডু সাহেব লাফিয়ে উঠল,

'By Jove, Devonshire junkets!'

(এ কি, এ যে আমাদের ডেভন জেলার জাঙ্কেট!)

আমি বললাম, 'খুব খান মুকারজী সাহেব। কিন্তু ও একেবারে নেটিব ভাপা দই।'

মিসেস্ সিং আমাদের ধমকালেন, 'ছি, খানার টেবিলে ও সব কি ? তোমরা ওঁকে ভাল ক'রে খেতে দিচ্ছ না।'

মাডু উঠে দাঁড়িয়ে একটু bow ক'রে বললে, 'মিস্ সিং হচ্ছেন আমাদের ডিনারের sauce চাটনী। আপনি ওঁকে চুপ করালে খাওয়াই হবে না।'

"এই রকম, ভাই, কত মজা হয় ওকে নিয়ে।"

সুরেশ গল্প করলে অনেক, কিন্তু কিছুতেই কবুল হল না যে মায়া তার প্রাণমন সম্পূর্ণ দখল করেছেন। ক্রমশঃ

চারুচন্দ্র দত্ত



গাঙ ভাঙা গেরামের লোকেরা

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

গাঙ-ভাঙা গেরামের লোকেরা
আবার নতুন চরে বান্ধে ঘর,
ধরা পড়ে বেবাকেরি চোখে যা—
দুদিনে সাবাড় নয়া বালুচর।
সহজ একথা তারা বোঝে না,
পাকা ভুঁয়ে থায়ী বাস খোঁজে না।

সেও বাস আগে তারা না সরায়
ভাঙন আসলে সুরু হওনের,
সময়ে সুবুঝ যার না যোয়ায়,
তার কথা আছে কিবা কওনের!
দূরের গেরামবাসী সে ব্যাপার—
দেখা শুন্যা হাসে মনে আপনার।

আষাঢ়ে আকাশ নীল ইসারায়
কেজানে কি আশে কারে ডাকে সে,
গাঙ একা সে কথার দিশা পায়,
ফেনার বলক বুকে জাগেরে!
উথাল পাথাল করে হিয়া তার,
আছারে পিছারে আর ভাঙে পার।

উৎল্যা উঠার বিষ যাতনে
ঢেউয়ের উপরে ঢেউ মারে লাফ,
দরিয়া সে বেসামাল মাতনে
ফেলায় ঝপাৎ ঝাৎ লাখো চাপ।
নড়ে ভিটা হেলে চাল টলে খাম,
গাঙ পায়্যা মানুষেরা করে কাম।

তাগোরে ছাওয়াল পাল হাসেরে—
তামাসা দেখ্যা সে ভরা ভাঙনের,
কাটাল ডিঙায়্যা ঢেউ আসে যে
ফেলায় সীমানা ভাঙ্যা আঙনের।
হাত তালি দেয়—যত ধসে পার,
ঘর থিকা গাঙ তাগো আপনার।

একটু ডাঙর যত পোলাপাণ
দরিয়ারি মাঠে তারা খেলোয়ার,
না মানে বাদল ঝড় না তুফান,
ঢেউয়ে ভাস্যা খেলে দোল দোলনার,
খেলে ভরা নাও-ডুবি তাফারে,
চোরা ডুবে চল্যা যায় ওপারে।

শাওনে আকাশ গলা বাদলায়
ভাঙে যবে ঘর, সে কি পরেশান,
তখনো আবার কর‍্যা সাধ যায়—
পারেরই কিনারে তোলে ঘরখান,
এত যে বে-বুঝ-পানা তৌকি
রাগেনা তাগোরে যত বৌঝি!

বৌঝি গো কথা সে না কওনের,
কিছুরই পরোয়া তারা করেনা,
দরিয়ারি পরশিনী হওনের
গুমোর তাগোরে বুকে ধরেনা।
নিটাল অঠাই জলে, নিলাবায়,—
যেবা সুখ জাগে দিলে, লাগে গায়—

সে আরো দুগুনা হয়্যা ভরে বুক
চৈতের দুফরে নামে খরা যেই,
খসে টান দেশিনীর ঘরে সুখ
দূরে জল-টাননের তরাসেই।
সেহি সোমে লাগে আরো মিঠা যে
ভাঙন শিওরি তাগো ভিটা সে।

মধু রাইতে জোচ্‌নার সায়রে
সাঁতার খেলায় গাঙ স্বপনে
তারাও ভাসায়্যা নাও নায়রে
বাইরয় সুখের নিশা যাপনে।
চান্দিমার হাসি ভরা আসরে
দীঘল দিনের দুখ পাশরে।

আন্ধিয়ারি রাইতে, ছায়া কাজলে—
আঁকা আখি হেন গাঙ জাগ্যা রয়,
ইপারে ওপারে বাতি না জ্বলে,
কুলু কুলু আধ বুলে কথা কয়,
সোহাগে ছিটায় সে যে মিঠা ঘুম,
নিদ্ ভোলা চোখে চোখে লাগে ঝুম্।

জীয়ন মরণ হারা দরিয়ার
কিনারে কিনারে যারা করে বাস
গাঙ আর তারা একই পরিবার
ভাঙন গড়ন খেলে বার মাস
একে ভাঙে পার নয়া গড়ে চর—
অপরে সে চরে চরে করে ঘর।

ঝাউয়ের ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে সে
নতুন চতল চরে সাইরে সার—
সে যেন বান্ধেনা তারা আঁকেরে
ঘর বান্ধনেরি ছবি বারে বার
শাওনের সোত আসে, ছুয়্যা তায়
ধুয়্যা ফের নয়া কর্যা থুয়্যা যায়।

তিনো রৈদ করে খেলা ঘরে সেই,
দিনে রাইতে মিঠা হাওয়া আসে যায়,
সেখানে উশের জল ঝরে যেই,
বিহানের হাসিখানি ভাসে তায়,
সে ঘরে চান্দের আলো চুম খায়—
যেখানে খুকন শুয়্যা ঘুম যায়।

গাঙ-ভাঙা গেরামের লোকেরা
আবার নতুন চরে—বান্ধে ঘর
ধরা পড়ে বেবাকেরি চোখে যা
দু'দিনে সাবাড় নয়া বালুচর
সহজ একথা তারা—বোঝে না
পাকা ভুঁয়ে থায়ী বাস খোজে না।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

ভিক্ষা

শ্রীমতী উষা বিশ্বাস এম্-এ, বি-টি

মস্ত বড় এক সহর। তারই একটি বড় রাস্তা দিয়ে চলেছে এক বৃদ্ধ—রোগাতুর তা'র দেহ। সে টল্‌তে টল্‌তে চলেছে—তার জরাজীর্ণ ক্ষীণ দুর্ব্বল পা দু'টো যেন আর বইতে পারছে না তার দেহভার। সে একটু চলে, একটু থামে—মাঝে মাঝে হোঁচট্ খায়, ব্যথা পায়, আবার চল্‌তে আরম্ভ করে অতিকষ্টে। পরণে তার একখানি জীর্ণচীর—শতছিন্ন। মাথা অনাবৃত। দুর্ব্বল মাথাটি তার যেন ঢলে পড়েছে বুকের উপরে। নিদারুণ ক্লান্তিতে শরীর তা'র অবসন্ন, খিন্ন।

চল্‌তে চল্‌তে পথের ধারে একটা পাথরের উপর সে বসে' পড়্‌ল। শরীর তা'র সামনের দিকে ঝুঁকে পড়্‌ল—ক্লান্তিতে, অবসাদে। নিজের ক্ষীণ হাঁটু দু'টির উপর কনুই ভর করে' সে দু'হাতে মুখ ঢেকে রইল। হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেদনার অশ্রু অঝোরে ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। চোখের জল সেই শুক্‌নো ধূসর মাটীর উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল—টপ্ টপ্......

পুরোণো স্মৃতি তা'র মনে জেগে উঠ্‌ল......মনে পড়ে' গেল তা'র অতীতের কথা—যখন তার শরীর সুস্থ, সবল ছিল—যখন তা'র ধন ঐশ্বর্য্যও প্রচুর ছিল। আজ সে ভগ্নস্বাস্থ্য—দেহ তা'র রোগভারে পীড়িত, জর্জ্জরিত। তা'র সমস্ত অর্থও সে শত্রু মিত্র নির্ব্বিচারে দান করে' দিয়েছে—নিঃশেষে, অকুণ্ঠিতচিত্তে। সে আজ তাই নিঃস্ব—কপর্দ্দক শূন্য। পেটে তা'র অন্ন নেই—পরণে কাপড়ও জোটে না। সকলেই তাকে নির্ম্মমচিত্তে ছেড়ে চলে' গিয়েছে—তথাকথিত বন্ধুরা ছেড়েছে সকলের আগেই, শত্রুরা তা'র পরে। আজ তা'কে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হ'বে—লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে' হাত পাততে হ'বে। এই কি ছিল শেষে তার কপালে? দুঃসহ লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে ব্যথাহত চিত্ত তা'র অভিভূত হয়ে পড়্‌ল।

চোখের জল তা'র তখনও থামে নি'। পায়ের নীচেকার ধূসর ধূলি ভিজে উঠ্‌ল তা'র সেই তপ্ত অশ্রুজলে।

হঠাৎ সে শুন্‌তে পেল কে যেন তা'কে তা'র নাম ধরে' ডাক্‌ছে। ক্লান্ত মাথাটি তুলে' সে চেয়ে দেখ্‌ল তা'র সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অপরিচিত একটি লোক। মুখে তাঁর শান্ত গম্ভীর ভাব—তা'তে কঠোরতার লেশমাত্র নেই। চোখ দু'টি দীপ্তিহীন, অথচ সরল। দৃষ্টি তাঁর অন্তর্ভেদী, অথচ স্নিগ্ধ—মমতায় ভরা। প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে তিনি বল্‌লেন—"তুমি তোমার সর্ব্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছ—পরহিতের জন্যে। আজ কি তুমি অনুতাপ করছ—তোমার সেই অকুণ্ঠ দানের জন্যে, সেই নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যে?"

একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ উত্তর দিল—"আমার দানের জন্যে মোটেই আমি অনুতপ্ত নই। কিন্তু আজ যে আমি অনাহারে মরে' যাচ্ছি।"

অপরিচিত লোকটি বল্‌লেন—"পৃথিবীতে যদি দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব না থাকৃত ত' তোমার কাছে কেউ ভিক্ষা চাইত কি? তুমি তাহ'লে এদানের পুণ্য অর্জ্জন করতে কি করে? সৎকাজ করবার সুযোগই বা পেতে কোথা থেকে? এ জগতে অভাব আছে বলে'ই দাতা আছে—দুঃখ আছে বলে'ই মানুষের মনে দয়া আছে।"

বৃদ্ধ কোনও উত্তর না দিয়ে চিন্তা করতে লাগ্‌ল নীরবে।

অপরিচিত লোক আবার বলতে লাগ্‌লেন—"পুণ্য কাজ করে' আজ তুমি নিঃস্ব হয়েছ বলে' মনে যদি তোমার কোনও অভিমান, কোনও অহঙ্কার থেকে থাকে তা' মুছে ফেলো।

যাও, আজ ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বা'র হও—ধনীর দ্বারে গিয়ে হাত পাত। অন্য সব দয়াশীল লোকদেরও পুণ্য কাজের সুযোগ দাও—তাঁরাও নিঃস্বার্থ দান করে' নিজেদের জীবনকে সার্থক, সুন্দর কর্‌তে শিখুন।"

শুনে' বৃদ্ধ চম্‌কিয়ে' উঠ্‌ল—চোখ তুলে' চেয়ে দেখ্‌ল সেই অপরিচিত লোকটি সাম্‌নে নেই। দূরে সেই রাস্তা দিয়ে একটি লোক আস্‌ছিল। তা'কে দেখে তার কাছে গিয়ে' কিছু ভিক্ষা চাইল সে। কিন্তু লোকটি বিরক্ত হয়ে' মুখ বিকৃত করে' চলে গেল—কিছু দিল না তা'কে

তারপরে আর একটি লোক এল। সে বৃদ্ধকে সামান্য কিছু ভিক্ষা দিল। সে সেই পয়সায় কিছু কিনে' খেল। সেই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আজ তা'র কাছে পরম উপাদেয় বলে' মনে হ'ল। মনে তার আর কোনও খেদ, কোনও গ্লানিই রইল না। বরং এক বিমল আনন্দে ও অনুপম শান্তিতে সমস্ত অন্তর তা'র কাণায় কাণায় ভরে' উঠ্‌ল। এই যেন তা'র উপর দেবতার আশীর্ব্বাদ—তা'র সৎকাজের পুরস্কার। দান তা'র আজ যথার্থ ই সার্থক বলে' মনে হ'ল।*

উষা বিশ্বাস

* Turgenevএর "Dream Tales and Prose Poems" হইতে।

কবির কলম

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

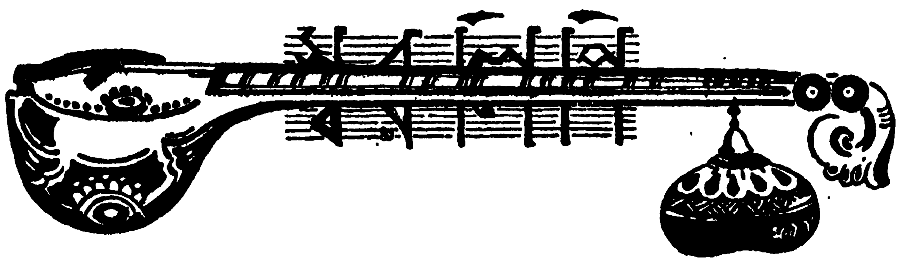
কবির মনের গভীর গুহার
ভাবের অমিয় ধারা,
শ্রীমুখে তোমার ঝরে ঝর ঝর
উছল নিঝর পারা।

কত কল্পনা রঙীন স্বপন
অভিনব রূপ করিয়া ধারণ,
পরশে তোমার হরষে মাতিয়া
নীরবে দেয়গো সাড়া।

সুধা-বিষে-ভরা এই দুনিয়ার
কান্না হাসির বন্যা জোয়ার
তর তর বেগে বহে খরতর
তব খাতে পেয়ে ছাড়া।

যন্ত্রী জনের আঙুল যেমন
তন্ত্রীর বুক করি কম্পন
ঝঙ্কারি তোলে রূপের ভজন
পুলকে আত্মহারা,—

দ্রুত মন্থর গতিটী তোমার
তেম্‌নি খোলেগো রূপ ভাণ্ডার
ধূলায় ধরণী হয় মনোহরা
যেন অপ্সরা পারা।



পাহাড়ী-তিলক কামোদ—দাদ্‌রা

মেঘ-তরী বেয়ে কেগো চ'লে যায় ?
উতলা চাতকী তারে নাহি পায়।
ফুরালো না কথা
মুরছিল লতা,
ভাসে কেয়া-কলি নয়ন-ধারায় !

সে কহে কাননে, "আমি চ'লে যাই,
আসে রাঙা আলো তারে দিও ঠাঁই।"
কেয়া অভিমানে
চাহে তারি পানে
হাসে শেফালিকা বন-ঝরোকায়।

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

\+
II সগা -া গা । -রা রগা রগা I রসা -া সা । -া -ন্া রা I
মে • ঘ • ত• রী বে • য়ে • • কে

সা -া -া । -া সা সপ্‌ধ্‌া I ধ্‌সা -া -া । -সরগা -সরা -গমা I
গো • • • চ লে• যা • • ••• •• •য়

মপা -গা গা । -রসা রগা রগা I রসা -া -া । সা -া -া I
মে • ঘ •• ত রী বে • • য়ে •• •

সগা গা -া । গা -মা পধা I পগা -পা মগা । -রগা রসা -া I
উ ত • লা • চা• ত • কী• •• তা •

সরা -ন্‌সা -া । -া -া -া I সরা -মপা -ধর্সা । -পধা -া -া I
রে• •• • • • • না• •• •• •• • •

-ধণা -ধণা -ধমা । মগা -রগাঃ -রঃ I সা -ন্‌া -া । -া ন্‌া -প্‌া I
• • • • • • হি • • • • পা র্‌ • • কে •

প্‌ন্‌া -সরগা -সরা । -গপা -মা -া I -া -া -মগা । -রসা রগা রগা I
গো • • • • • • • • • • • • • • চ লে

রসা -া -া । -া -া -া II
যা • য়্‌ • • •

II রগা -সরা রা । -া মা পা I পধা -মপা -ধর্সা । -ণধা -র্সণা -ধণা I
ফু • • • রা • লো না ক • • • • • • • • • • •

ধপা -া -া । -া -া -া I পা -া পা । -া পধা -পধা I
থা • • • • • মু • র • ছি • • •

-া -া -া । -ণধা -পা মা I মপা -ধা -া । -পধা -ণপা -ধর্সা I
• • • • • • ল ল • • • • • • • • •

র্সা -া -া । -া -া -র্রর্সা I র্সা -ণা ণধা । -পধা পা -মা I
তা • • • • • • ফু • রা • • • ল •

মা -া -া । মপা -ধর্সা -ণা I ধপা -া -া । -া -া -া I
না • • ক • • • • থা • • • • •

পা -া পা । -া পধা -পধা I -া -া -া । -ণধা -পা মা I
মু • র • ছি • • • • • • • • • ল

মপা -ধা -া । -পধা -ণপা -ধর্সা I র্সা -া -া । -া -া -া I
ল • • • • • • • • • তা • • • • •

র্সা -া র্সা । -া র্সা -র্সর্রা I র্সা -র্সধা -র্সা । ণধা -পা -া I
তা • সে • কে রা ক • • লি • • •

পধা মা -া । মপা -ধপা ধা I মা -া -া । -গা -সরা -মা I
ন • য় • ন • • • ধা রা • • • • • য়্‌

সপা -গা গা । -রসা রগা রগা I রসা -া -া । -া -া -া II
কে • গো •• চ লে যা • য়্ • • •

II সা -ন্া -প্া । -া ন্া সা I রা -া -া । রগা সরা -া I
সে • • • ক হে কা • • ন নে •

রগা -া গা । -া মা পধা I পগা -পমা -গমা । -রা -গা -া I
আ • মি • চ লে • যা •• •• • ই •

গা -পা পা । -া পন্ধা পা I ন্ধপা -ধনা -নন্ধা । পা মা -গা I
আ • সে • রা • ঙা আ • •• • • লো •

গা -রা গমা । -পা গা পমা I মগা -রগা -া । রসা -া -া I
তা • রে • • দি ও ঠাঁ • •• • ই • •

গা -মা পা । -নধা না র্সা I নর্সা -া -া । র্সা -া -া I
কে • য়া •• অ ভি মা • • নে • •

র্সা -া র্সা । -া র্রা র্গা I র্সর্রা -র্গা -র্রর্গা । র্রর্সা -না -া I
চা • হে • তা রি পা • • • •• নে • •

না -া না । -া না র্সা I র্সর্সা র্মা -র্সা । সর্ণা -ধা -পা I
হা • সে • শে ফা লি • • • কা • •

পধা -া মা । -া পধা পধা I মা -া -া । -গা -সরা -মা I
ব • ন • ঝ • র কা • • • •• র্

সপা -গা গা । -রসা রগা রগা I রসা -া -া । -া -া -া II II
কে • গো •• চ লে যা • য়্ • • •

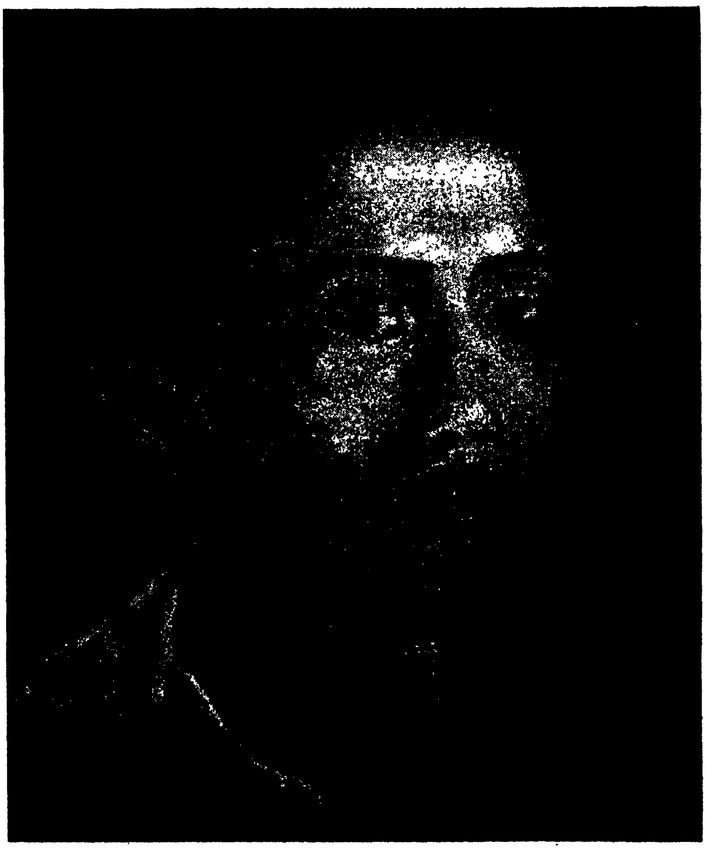
এই স্বরলিপিতে একটি নূতন চিহ্ন ⁀‿ ব্যবহৃত হইল। এই চিহ্ন যে অলঙ্কার বোঝায় তাহাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে খট্‌কা কহে এবং ইহার বহুল প্রচলন উক্ত সঙ্গীতে দেখা যায়। আকার মাত্রিক স্বরলিপিতে অনুরূপ অলঙ্কার-বোধক কোন চিহ্ন না থাকায় এই নূতন চিহ্ন প্রবর্ত্তন করা হইল। হিন্দুস্থানী স্বরলিপিতে খট্‌কার চিহ্ন ( ) বক্রবন্ধনী কিন্তু বক্রবন্ধনী আকার মাত্রিক স্বরলিপিতে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তাই নূতন চিহ্নের প্রয়োজন হইল। যে স্বরে খট্‌কা থাকিবে অতিদ্রুত আন্দোলনে সেই স্বরের অব্যবহিত চড়া স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া সেই স্বর হইয়া তাহার অব্যবহিত খাদ স্বর পর্য্যন্ত গিয়া আবার সেই স্বরে ফিরিয়া আসিতে হইবে। যথা মা = পমগমা, পা = ধপমপা। মীড়ের ন্যায় খট্‌কাও উচ্চ সঙ্গীতের একটী অপরিহার্য্য অলঙ্কার এবং আধুনিক বাংলা গানে ইহার যতই প্রচলন বৃদ্ধি হইবে ততই মঙ্গল।

শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত

শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও তাঁর চিত্রকলা

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

মণীন্দ্রগুপ্তের আঁকা একখানি চিত্র "কেদার নাথের যাত্রী"। মেঘে কুয়াসায় ঢাকা দূরে নীল পাহাড়; পাহাড়ের কোল ঘেঁসে এঁকে বেঁকে যাওয়া পথের ধারে জন কয়েক তীর্থযাত্রী; পিছনে গোটাকয়েক পাইন গাছ, ঋজু নীলাভ তাদের কাণ্ড। দুজন যাত্রী বসে, একজন দাঁড়িয়ে, পাশে একটা পাহাড়ী কুকুর। যিনি দাঁড়িয়ে, দূরের দিকে তাঁর দৃষ্টি; হিমালয়ের শাশ্বত মহিমা দেখ্‌ছেন। যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের একজন যেন কিছু অঙ্কণে ব্যস্ত, অপর সঙ্গী মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কাজ লক্ষ্য করছেন। দূরে একটা জলধারা দেখা যাচ্ছে।



শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
(শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক অঙ্কিত প্যাষ্টেল চিত্র হইতে)

শিল্পীর বিভিন্ন সময়ের আঁকা ছবি দেখছিলাম। এ ছবিটি দেখে জিজ্ঞেস করলাম "এ যে পঞ্চপাণ্ডবের স্বর্গারোহণের মত ব্যাপার কিছু। কুকুরও সঙ্গে রয়েছে; একি কাল্পনিক, না সত্যি আপনার সঙ্গে ছিল? আপনার সঙ্গীরাই বা কে?"

মণীন্দ্রবাবু বল্লেন "হাঁ, স্বর্গ অবধি পৌঁছতে না পারলেও আমার ভ্রমণটা প্রায় স্বর্গারোহণের মতই কিছু। আমরা অবশ্য পাঁচজন ছিলাম না, চারজন ছিলাম। আমি ছাড়া আর তিনজন ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। এঁদের ভিতর একজন ছিলেন যোগেশানন্দ স্বামীজি,—অপর একজন আমেরিকান সন্ন্যাসী, পরিষ্কার বাংলা বলতে পারতেন, আমাদের মতই চটিতে কম্বল পেতে শুতেন ও ডাল রুটী খেতেন। কিছুকাল হল শুনেছি তিনি গত হয়েছেন; উত্তর কাশীতে গিয়েছিলেন, সেখানেই প্রায়

বিনা চিকিৎসায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ১৯২৯ সনের গ্রীষ্মের ছুটিতে কেদার বদরি ভ্রমণে যাই। কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বদরিনাথ পরিক্রমা করতে একমাস সময় লেগেছিল এবং প্রায় ৪০০ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। পাহাড়ী কুকুরটা সত্যই আমাদের সঙ্গে ছিল,—কাল্পনিক নয়। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুর ছিল তা' বিশ্বাস করতে পারা যায়। জানেন তো যুধিষ্ঠির কেদারনাথ থেকেই স্বর্গের পথ ধরেছিলেন। কেদারনাথের পাণ্ডার এক কুকুর আমাদের সঙ্গে জুটে গেল। পাণ্ডা কত ডাকল, কিছুতেই পথ ছাড়ল না। রুটী খেতে দিলাম, চটিতে চটিতে আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম করত, শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিল। এর নাম রেখেছিলাম কেদার। যোগশানন্দ স্বামীজির এ খুব ভক্ত হয়েছিল। আমি রাণীখেত থেকে কলকাতার পথ ধরলাম, কেদার স্বামীজির সঙ্গে আলমোরা চলে গেল, এ পর্য্যন্তই 'কেদারে'র ইতিহাস জানি।"

মণীন্দ্রবাবু হিমালয়ের অনেক ছবি এঁকেছেন, ১৯২৯ সনের ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীতে হিমালয়ের যে কয়েকটি ছবি দিয়েছিলেন, তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 'প্রবাসী'তেও হিমালয়ের কয়েকটি ছবি বেরিয়েছে।

"হিমালয়ের চটিতে" চটির আবহাওয়া যেন সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। লোকগুলি সবই গুজরাটী। চিত্রকর ২ বৎসর আমেদাবাদ ছিলেন, সেই ছাপ মনের মধ্যে রয়ে গেছে। হুঁকা হস্তে এক বৃদ্ধ—কাথিওয়ারী, মাথায় মস্ত পাগ্‌ড়ী। একটি যুবক মাথায় গান্ধী ক্যাপ—'ইউথলিগের' যেন একজন পাণ্ডা, দেখে মনে হয়। এক স্ত্রীলোক, নাকে আংটী লাগান। গল্প গুজব বেশ জমে উঠেছে। সামনে বসে এক বালিকা, চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত। চটির আবহাওয়া বিশেষ করে ব্যক্ত করেছে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি—বস্তু-তান্ত্রিকতার বেশ একটু ছাপ।



পূজারিণী

"হিমালয়ের তীর্থযাত্রী" স্বামী-স্ত্রী তীর্থ দর্শনে চলেছে, মারবার দেশের লোক। পুরুষের কাঁধে বাঁধা কম্বল। পিছনে পাহাড়; আকাশে প্রভাত কালের দীপ্তি।

হিমালয়ের আরো অনেক ছবি আছে। সবগুলিতেই

শিল্পীর বিষয়ের প্রতি অসাধারণ সাহানুভূতি পাওয়া যায়। হিমালয়ের মহিমান্বিত শাশ্বত মূর্ত্তিকে মানসপটে তিনি যেন ধরতে সক্ষম হয়েছেন, প্রকৃতির সত্ত্বাকে যেন অনুভব করেছেন। কোথাও কোথাও যেন এই হিমালয় সিরিজে জাপানী রঙীন উডকাটের প্রভাব ধরা পড়ে। যে-ভাবেই আঁকুন না কেন, প্রকৃতি চিত্রাঙ্কণে মণীন্দ্রবাবুর একটা সজীবতা আছে, গতি আছে। গাছ আঁকা মণীন্দ্রবাবুর এক বৈশিষ্ট্য, এর ভিতর যেন প্রকৃতির জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়।

হিমালয় মণীন্দ্রবাবুকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে—শুধু রঙীন চিত্রে নয়, লিনোকাটের একটি সুদৃশ্য এলবাম কিছুদিন হল প্রকাশ করে শিল্পামোদীর ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই এলবামটি শাদা কালোর সুষমার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। প্রথিতযশা, বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক এর মুখবন্ধ লিখে গৌরব বর্দ্ধন করেছেন। তিনি লিখেছেন ..."It gives me great joy to see that in your art you are an untiring seeker, and precisely this gives vitality and strength to your creativeness. Multifacetness of nature, great teachers and Heroism all these great images resound in your heart, and he who continuously aspires to the great, carries in himself a seed of this essence. The artist and the author show their innerself in their aspirations. In your pilgrimage to the sanctuaries of the Himalayas, you show the same heroic understanding of the paths of ascent......"

শ্রীযুক্ত রোয়েরিকের মুখবন্ধের পর, আমি এ সম্বন্ধে আর কি বলব ?



কেদারনাথের যাত্রী

মণীন্দ্রবাবুর অধিকাংশ চিত্রেই তাঁর পরিব্রাজক জীবনের ছাপ সুস্পষ্ট। কেদার বদরি থেকে—উড়িষ্যা—পুরী, কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি; দক্ষিণের—ভিজেগাপট্টম, সিমাচলম থেকে মাদুরা রামেশ্বরম্; নিজাম-

রাজস্থে—সেকেন্দ্রাবাদ, আওরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, অজন্তা, এলোরা; বোম্বে এলিফেন্টা, মাউন্ট্ আবু অচলগড়, জয়পুর, ইন্দোর নাগপুর মাণ্ডু, ধর, লাহোর, আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি ভ্রমণ করেছেন। আসামে—গৌহাটী, শিলঙ, চেরাপুঞ্জী পর্য্যন্তও বেড়িয়েছেন।

তাঁর আগের চিত্রে বেশীর ভাগই বাংলার বাইরের বিষয়। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার বেশী চিত্রই যে বাংলার বাইরের বিষয়; বাংলার দৃশ্য বা বাংলার বিষয় আঁকেন নি কেন?"

শিল্পীর উত্তর—"হ্যাঁ ঠিক প্রশ্নই করেছেন, যেখানে বরাবর থাক্‌চি—সে জায়গা যেন তেমন inspire করে না। সে জায়গা তো দেখবার জন্য থাকচি না? কোনো নতুন জায়গায় যখন যাই, সেটা দেখবার জন্য যাই, আর নতুনত্বের একটা surprise আছে, মোহ আছে, চমক আছে; মনের মধ্যে একটা impression দিয়ে দেয়। গৃহী মনে যেন তেমন খোরাক পাই না, যেমন পাই প্রবাসী মনে।

"বাংলার ছবি যে একেবারে করিনি বলতে পারেন না। পূর্ব্বে "মরুসঙ্গীত", "জয়দেবের মেলা" করেছিলাম, দেখে থাকবেন। আরো কিছু কিছু হয়েছে, কলকাতার প্রদর্শনীতে দিতে পারিনি, এখানকার কোনো কাগজেও বেরোয়নি, বাইরে চলে গেছে। তবে আজকাল বাংলার দৃশ্য চিত্র কিছু কিছু করছি।"

১৯৩২ সাল থেকে মণীন্দ্রবাবু নতুন ধরণের কিছু ছবি আঁকছেন। গতবারের গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্টের প্রদর্শনীতে সেগুলি শিল্পামোদীদের খুব ভাল লেগেছিল। ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি দেড়মাস শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তখন খান ত্রিশেক কি তারও বেশী হবে জল রংয়ের ছবি এঁকে এনেছেন—শান্তিনিকেতনের এবং তার আশেপাশের ছবি। এর ভিতর একটা সহজ সরল ভঙ্গী আছে, যা অল্প রংয়ে, অল্প রেখায়, অল্প কথায় জিনিষকে



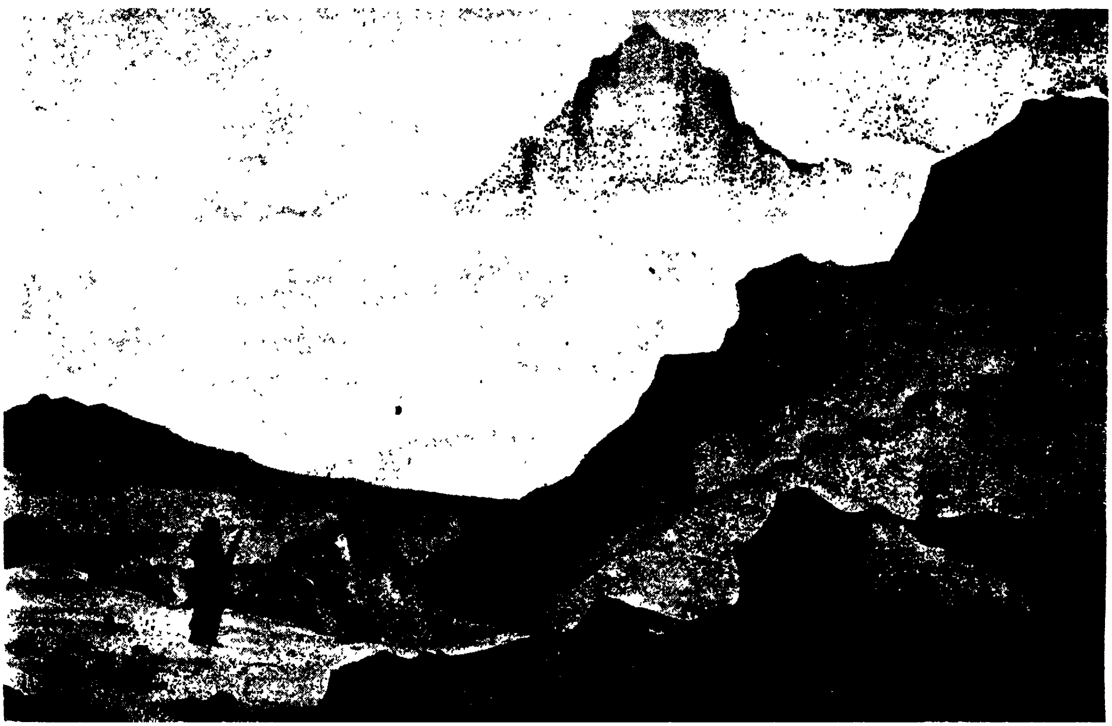
হিমালয়ের চটী

ব্যক্ত করে। এই "Economy of effort" সহজে আয়ত্ত হয় না। যাঁর অঙ্কণ রীতিতে দখল আছে এবং আঁকবার বস্তুর সারাংশকে ধরতে পারেন, তিনিই পারেন। এই ধরণের আঁকা 'নীচু বাংলা' চিত্র সম্বন্ধে বিহারের এক সাপ্তাহিক (The Sketch, 27-2-33) লিখেছে—

"....'Nichu Bangla' a water colour by Manindra Gupta, is as beautiful as it is simple; with a few strokes of his magic brush the artist has revealed a magnificent landscape."

ঘণ্টাতলা, ছাতিমতলা, ভুবনডাঙ্গা, গোয়ালপাড়া গ্রাম, লালমাটীর রাস্তা, মাটীর দেওয়াল, গাছের ছায়ায় কুটীর, এখানে সেখানে তালগাছ, একটা গরুর গাড়ী চলেছে। দিকচক্রবাল ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে গেছে।

আষাঢ়ের 'বঙ্গশ্রী'তে একটা 'কোপাই' বেরিয়েছে; বালীর উপর দিয়ে ক্ষীণ জলরেখা, দুদিকে বনজঙ্গল, সবুজ নীলের অপূর্ব্ব সমাবেশ; বালির উপর দাঁড়িয়ে—একটি লোক নির্জ্জনতাকে বৃদ্ধি করেছে; আকাশে অলস গতি লঘু মেঘ, নিস্তব্ধ প্রকৃতির যেন মায়াজাল রচনা।



দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা

সাঁওতাল গ্রাম, ধূ ধূ করে মাঠ, দিক চক্রবালে তাল বনরেখা—এসব চিত্র। কোপাইনদী—এর উপর যেন মণীন্দ্রবাবুর একটি গভীর দরদ আছে; কোপাইর ৬।৭ খানা ছবি এঁকেছেন। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে প্রবাসীতে কোপাইর একটি ছবি বেরিয়েছিল, এছবি বোধ হয় মণীন্দ্রবাবুর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। নদীর বাঁক ঘুরে গেছে, গাছের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাঁওতাল মেয়ে—নুয়ে পড়ে কলসীতে জল ভরছে। দূরত্বের ব্যবধান দেখান হয়েছে চমৎকার। উঁচু নীচু জমি,

একটি 'কোপাই' কলম্বোতে বিক্রী হয়ে গেছে, মণীন্দ্র-বাবু বল্লেন "এটা সবুজ রং ছাড়া এঁকেছিলাম, অনেক বছর আগে আঁকা। শান্তিনিকেতনে যখন নন্দবাবুর কাছে শিখতাম তখন আঁকা। এর আগে এঁকেছিলাম পূর্ব্ববাংলার বর্ষার পরের দৃশ্য—এ ছবি কিনেছেন লক্ষ্ণৌর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ বাবু। এর ভিতর ছিল সবুজের আধিক্য। মাষ্টার মশায়তো আমার সবুজ বন্ধ করে দিলেন—বল্লেন, তোমার সবুজ বড় বেশী হচ্ছে, সবুজ বাদ দিয়ে এক ছবি

কর। এর পরই 'কোপাই' হল; একেবারে শুক্‌নো বীরভূম জেলার ছবি, মাঠের ঘাস শুকিয়ে তাঁবাটে হয়ে গেছে।"

এবারকার গ্রীষ্মের ছুটিতে পূর্ব্ববঙ্গের কতগুলি গ্রাম্য দৃশ্য এঁকে এনেছেন, বীরভূমের শুষ্কতা থেকে বাংলার শ্যামল কোলে যেন ফিরে এলাম। ছায়াশীতল গ্রাম, "গাঢ়ছায়া সারাদিন মধ্যাহ্ন তপনহীন, দেখায় শ্যামলতর, শ্যাম বনশ্রেণী।" এই ছবিটি তুলির দু'চারটি টানেই ফুটে উঠেছে, বেশী কিছু কাজ নেই, তুলট কাগজে কাল কালীতে আঁকা, এখানে সেখানে এক আধটু লাল সবুজ নীল রংয়ের ছোপ। চিরপরিচিত বাঁশের সাঁকো, কচুরীপানা, সাঁকোর উপর দিয়ে একটা লোক যাচ্ছে, দূরে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত।



কোপাই নদী (বোলপুর)

[এই ছবিটি এবং পরবর্ত্তী ছবিটি কেবলমাত্র তুলির পোঁছে অঙ্কিত,—পূর্ব্বে কোনপ্রকার রেখাঙ্কন করিয়া লওয়া হয় নাই।]

পানাপুকুরের সবুজ রং, পুকুরের ধারে বাঁশের ঝোপ নুয়ে পড়েছে, পার দিয়ে রাস্তা, গ্রামের বধূ হেঁটে চলেছে, একটা নেংটা ছেলে কঞ্চি হাতে দাঁড়িয়ে, আর একটা ছেলে মাছ ধরছে; পথের উপর পড়ন্তবেলার রোদ পড়েছে, ডাকছে যেন "বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।" সরু খাল দিয়ে নৌকা চলেচে, দুইদিকে গাছপালা,—ঘন অন্ধকার;

শুধু চিত্রকর হিসাবে নন, লেখক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। মণীন্দ্রবাবুর বলার একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী আছে, শিল্পের যে কোনো বিষয় খুব সরস ও সহজ করে বোঝাতে পারেন, যা অনেক শিল্প সমালোচকই পারেন না। প্রবাসী, Modern Review, ভারতবর্ষ,—মাদ্রাজ, বোম্বে, বিহার এবং কলম্বোর অনেক কাগজে তাঁর লেখা প্রকাশিত

হয়েছে। সম্প্রতি শিশুভারতী বলে যে গ্রন্থাবলী বেরুচ্চে তাতে মণীন্দ্রবাবুর লেখার পরিচয় অনেকে পেয়ে থাকবেন। অমৃতবাজারে (৪ মে, ১৯৩২) রবীন্দ্রনাথের চিত্রের যে তুলনামূলক সমালোচনা তিনি করেছেন, তাতে তাঁর বিশ্লেষণ করার অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিচিত্রায় পূর্ব্বে মণীন্দ্রবাবুর কোনো লেখা বা রঙীন চিত্র প্রকাশিত হয়নি, বিচিত্রার পাঠকদের কাছে মণীন্দ্রবাবুর ও তাঁর কাজের পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মণীন্দ্রগুপ্তের জন্মস্থান ঢাকা জেলার আউটসাহী গ্রামে। এগার বছর বয়স অবধি গ্রামে কাটান। গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পান। বাড়ীতে কুমোরের দুর্গাপ্রতিমা নির্ম্মাণ এবং আলপনা দেখে প্রথম চিত্রবিদ্যার অভ্যাস করেন এবং আগে মাটীতে, পরে শ্লেটে, এবং কাগজে তার পরিচয় দেন। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে (তৎকালীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে) ভর্ত্তি হন, তখন থেকেই তাঁর ক্ষমতার উন্মেষ হতে থাকে। "প্রভাত" নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা মণীন্দ্রবাবু ও অন্যান্য বালকদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

শান্তি নিকেতনে মণীন্দ্রবাবু প্রথম এসে চিত্র শিক্ষক পান্‌নি, নিজে নিজেই আঁকতেন। ভর্ত্তি হওয়ার চার বছর পর খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় (বর্ত্তমান লক্ষ্মৌ স্কুল অফ্‌ আর্টস্‌ এণ্ড ক্র্যাফটস্‌এর অধ্যক্ষ) সেখানে আসেন। তখন থেকে মণীন্দ্রবাবুর শিল্প শিক্ষা আরম্ভ হয়। মাঘোৎসবের সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা এসে থাকে, সেই দলে মণীন্দ্রবাবুও আসতেন; সেই সময় থেকেই অবনীন্দ্রনাথের



তালতলার পোল—বিক্রমপুর, ঢাকা

সঙ্গে তাঁর পরিচয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্র দেখে উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। একদিন রেখার ছন্দ, কম্পোজিসন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে হাসতে হাসতে বল্লেন "এসব অসিত নন্দলালকে শেখাইনি, একজনকে সব শেখাই না, শেষে গুরুমারা বিদ্যা শিখে ফেল্‌বে।" অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সরলতা এবং সহৃদয়তার জন্য সর্ব্বদাই তাঁর শিষ্য মণ্ডলীর সশ্রদ্ধ ভালবাসা পেয়ে আসছেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যকলা সমিতির শিল্প প্রদর্শনী বাংলার গর্ভনর লর্ড কারমাইকেল উদ্বোধন করেন। মণীন্দ্র বাবুর এই প্রদর্শনীতে ৪খানা ছবি ছিল। প্রদর্শনীতে এই তাঁর প্রথম ছবি।

১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলে অবনীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, "মণি গুপ্ত, ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো দিলে, এবার কি করবে? ছবি আঁকতে লেগে যাও।" মণীন্দ্রবাবু—"আমি কলেজে পড়্‌ব, B. A. পরীক্ষা দিয়ে আসব ছবি আঁকতে।" অবনীন্দ্রনাথ বল্লেন "B. A. পরীক্ষা দিয়ে কি হবে, আমার কাছে ছবি আঁক, আমার বাড়ীর লাইব্রেরীর বই আছে, পড়াশুনা করবে।" মণীন্দ্রবাবু কিন্তু কলকাতায় রইলেন না, ঢাকাতে গিয়ে জগন্নাথ কলেজে ভর্ত্তি হলেন; এবং প্রথম বিভাগে I. A পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন। B. A. ক্লাশে পড়াশুনা করলেও ছবি আঁকা ছাড়েন নি, অবসর পেলেই ছবি আঁকতেন।

ঢাকাতে প্রেসবিল্ডিংএ শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত বার্‌এট্‌ লর নেতৃত্বে যে প্রদর্শনী হত, তাতে মণীন্দ্রবাবুর অনেক ছবি, ক্লে-মর্ডেলিং ও প্লেট এনগ্রেভিং ছিল; ঐ সব কাজ সাধারণের, অধ্যাপক মণ্ডলীর, এবং ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটা উল্লেখ করার দরকার যে আজকাল মাঝে মাঝে প্রদর্শনীতে যে প্লেট এনগ্রেভিং দেখা যায়, মণীন্দ্রবাবু এর প্রথম উদ্ভব করেন। ঢাকা কলেজ মেগাজিনের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন; তাতে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন।

মনে মনে তাঁর সঙ্কল্প ছিল B. A. পাশ করে চিত্র বিদ্যা অভ্যাস করবেন। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ফিস্‌ও দেওয়া হয়েছিল। এর কিছু পূর্ব্বে বিশ্বভারতী নতুন স্থাপিত হয়েছে; কলাভবন হয়েছে, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু অধ্যাপক



স্বাধীনতার উষা (গুরু গোবিন্দ)
১৯৩০ সালের বিলাতের Imperial Institute of Art-এ প্রদর্শিত হইয়াছে।

হয়ে এসেছেন, অসিতবাবুও আছেন। মণীন্দ্রবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, পরীক্ষায় আর মন বস্‌ল না, পড়াশুনা ছেড়ে কলাভবনে যোগ দেওয়াই স্থির করলেন, B. A. পরীক্ষা আর হোল না। ১৯২১ সনের গ্রীষ্মের ছুটির পরই কলাভবনে যোগ দিলেন।

মাস কয়েক পরে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজ পান। ইংরাজী, অঙ্ক, বাংলা ও ড্রয়িংএর ক্লাস নিতে হত। ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ। ক্লাসের সময় ছেলেদের পড়িয়ে আসছেন, আর যেই অবসর হল কলাভবনে এসে একনিষ্ঠ সাধনা। ছবি আঁকা, কলাভবনের বিরাট লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়া। রাত্রিকালে আবার বালকদের লা মিজারেবল



বাবাজী

বা কাউণ্ট অফ্ মণ্টেক্রিষ্টো থেকে গল্প বলা; তাঁর গল্প শোনায় ছোট বালকদের কি প্রবল উৎসাহ!

বিশ্ব ভারতীতে তিনি কিছুকাল ফরাসী ভাষারও চর্চ্চা করেছিলেন। শিল্পসম্ভারের অনেক বিষয় রয়েছে ফরাসী ভাষায়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এগুলি অধ্যয়ন করে, ভাল কিছু জিনিস সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা। এই উদ্দেশ্যে Raphael Petrucci কৃত Encyclopedie dela Peinture Chinoise এর বিশেষ অংশ অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। এই বই শিল্প ভাণ্ডারের অমূল্য গ্রন্থ—চীনা ভাষা থেকে অনূদিত। এর প্রথম প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ শান্তিনিকেতন পত্রিকায় "চীনা চিত্রকলার মূলসূত্র" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

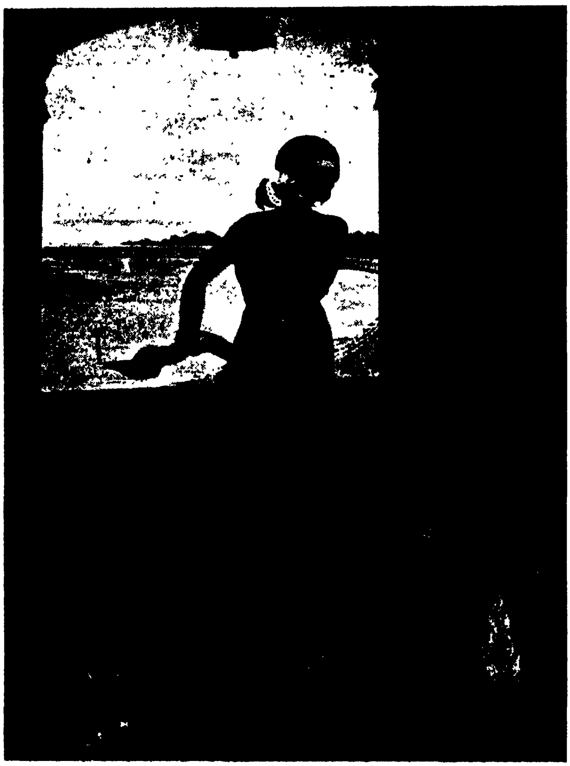
কলাভবনে দ্বিতীয় বৎসরে (১৯২২) অধ্যয়ন করার সময় মান্দ্রাজের খ্যাতনামা চিত্র সংগ্রহকারী শ্রীযুক্ত রামস্বামী মুদেলিয়ার পৌরাণিক চিত্রের জন্য কলাভবনে ১২৫৲ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেন। মণীন্দ্রবাবুর চিত্র, প্রতিযোগিতায় প্রথম বিবেচিত হয় এবং উক্ত পুরস্কার পান। বিষয় ছিল কালিদাসের রঘুবংশের চিত্র—দীলিপ ও সুদক্ষিণার বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন। এই চিত্রটি এখন মান্দ্রাজের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির লেড্‌বিটার্‌স্ চেম্বারে রক্ষিত আছে।

তাঁর শ্লেট এন্‌গ্রেভিং আদৃত হয়েছে। পরলোকগত পিয়ার্সন্ সাহেব শ্লেটে খোদাই এক সাঁওতাল বালকের মূর্ত্তি, আমেরিকার মিস্ গ্রীণ—সাঁওতাল নৃত্য, স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু মিস্ ম্যাকক্লাউড রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ক্রয় করেন আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপোরওয়ালা জয়থুস্ত্রের মূর্ত্তি অর্ডার দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন।

আজকাল উড্‌কাট ও লিনোকাটের চলন দেখা যায়, অনেকে হয়ত জানেন না, যে এর মূল সূচনা করেন শিল্পীদের বন্ধু পিয়ার্সন সাহেব। তিনি মণীন্দ্রবাবুর শ্লেট খোদাই দেখে এক সেট উড্‌কাটের যন্ত্র বিলেত থেকে আনিয়ে তাঁকে উপহার দেন। এর থেকেই আরম্ভ হল উড্‌কাটের সূচনা। মণীন্দ্রবাবুর তখনকার দুটি কাজ প্রবাসীতে বেরিয়েছিল। তিনি সে সময়ে উড্‌কাট বিক্রীর চেষ্টা করেছিলেন। নববর্ষের সময় কার্ডে ও চিঠির কাগজে উড্‌কাটের ছবি ছেপে এক পয়সা দুই পয়সা করে বিক্রী করতেন।

সিংহলের আনন্দ কলেজে চিত্র-বিভাগ খোলার জন্য একজন অধ্যাপকের প্রয়োজন হলে রবীন্দ্রনাথের কাছে একজন শিল্পী চাওয়া হয়। এই কাজের জন্য মণীন্দ্রবাবু মনোনীত হন। ১৯২৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে মণীন্দ্রবাবু

কলম্বোতে যান, এবং আনন্দ কলেজে চিত্রবিভাগ খোলেন। তাঁকে প্রথম কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। সেখানকার খ্যাতনামা চিত্রকর শ্রীযুক্ত অমরশেখরের সঙ্গে সংবাদপত্রের মারফতে লেখালেখি চলে, পরে শিল্পী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কলম্বোর ইউরোপীয় শিল্পী এবং সিংহলের ইন্‌স্পেক্টর অফ আর্ট শ্রীযুক্ত সি, এফ্‌, উইন্‌জরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত উইন্‌জর মণীন্দ্র বাবুর কাজে অনুরক্ত হন। তাঁর নিজের সংগ্রহে অনেক দাক্ষিণাত্যের ব্রোঞ্জ এবং কয়েকটি ভারতীয় চিত্র আছে। মণীন্দ্রবাবুর একটি চিত্র নিজের সংগ্রহে রাখেন। উইনজর সাহেব প্যারিসে ১৪ বৎসর কাটিয়েছেন এবং তিনি ফরাসী ইম্প্রেসেনিষ্ট দলের একজন চিত্রকর। তাঁর চিত্র সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবু প্রবাসী ও Medórn Reviewতে লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে ইউরোপের ইম্প্রেসেনিষ্ট প্রভৃতি দলের সঙ্গে মণীন্দ্রবাবুর পরিচয় ঘটে। এই সময় থেকেই মণীন্দ্রবাবুর চিত্রে এ সকল চিত্রকরদের প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে। শ্রীযুক্ত উইনজর এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন··· His interest in acquiring knowledge and culture places him in the foremost rank of Indian artists and gives him a very definite personality."



আরতি

সেজান, গঁগ্যা, ভ্যানগগ্‌ প্রভৃতি শিল্পীদের কাজে তিনি অনুরাগী। কলম্বোর ব্যারিষ্টর এবং চিত্র সংগ্রহকারী শ্রীযুক্ত লায়নেল ওয়েণ্ট তাঁর ৫খানা চিত্র ও জল রংয়ের ১২ খানি স্কেচ্‌ ক্রয় করেন। শ্রীযুক্ত ওয়েণ্ট ইম্প্রেসেনিষ্ট ও পোষ্ট ইম্প্রেসেনিষ্টদের মস্ত ভক্ত সেজান, রেনোয়ার, গগ্যাঁ, ভ্যানগগ্‌ প্রভৃতি শিল্পীদের চিত্রের বহুদামী প্রতিলিপি ইউরোপ থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। শ্রীযুক্ত ওয়েণ্টের সংগ্রহের চিত্রসকল মণীন্দ্রবাবু অনুশীলন করেন। এই সকল শিল্পীরা তাঁর কাজে নতুন শক্তি দান করে। তাঁর কাজে এটুকু লক্ষ্য করা যায় যে একই কাজের পুনরাবৃত্তি তিনি করেন নি। বাংলার চিত্রকরদের কাজে যে-সস্তা sentimentalism পাওয়া যায় তা তাঁর কাজে নেই। তিনি এগিয়ে চলেছেন চিত্রে নতুন নতুন Experiment করে।

অনুরাধাপুর, পোলানারুয়া, সিগিরিয়া, কাণ্ডি প্রভৃতি স্থানে সিংহলের প্রাচীনকীর্ত্তি রয়েছে,—স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্র প্রভৃতির নিদর্শন। তিনি সিংহলের সকল দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছেন, অনেক স্থলে পদব্রজে বেড়িয়েছেন এবং বৌদ্ধ বিহারে ভ্রমণকালে বাস করেছেন। সিগিরিয়া, পোলানারুয়ার ফ্রেস্কোচিত্র নকল করেছেন। সিংহলের নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য সকল এবং ঐ দেশের প্রাচীন শিল্প তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে রেখায় বর্ণব্যঞ্জনায় নতুনত্ব দিয়েছে। বৃহত্তর ভারতে—সিংহলে কৃষ্টিপ্রচারে মণীন্দ্রবাবুর কাজের নিশ্চয়ই মূল্য আছে। সিংহলের প্রাচীন চিত্রকলা সম্বন্ধে প্রবাসী ও Modern Reviewতে সুচিন্তিত প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন।

১৯২৭ সনের নভেম্বরে সিংহল পরিত্যাগ করেন, আমেদাবাদে কাজ পেয়ে আসেন। ১৯২৯ সনের নভেম্বর অবধি ২ বছর আমেদাবাদে ছিলেন; পরে বোম্বেতে মাস তিনেক কাটান। ডিসেম্বরের শেষদিকে সেখানকার Blavatsky Lodge Hallএ নিজের কাজের প্রদর্শনী করেন। প্রদর্শনী মাত্র তিনদিন খোলা ছিল। তাঁর কাজ বোম্বেতে যথেষ্ট আদৃত হয়েছিল। সেখানকার সংবাদপত্র The Bombay Chronicle এবং The Times ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। The Times (২১ ডিসেম্বর, ১৯২৯) লিখেছিল—

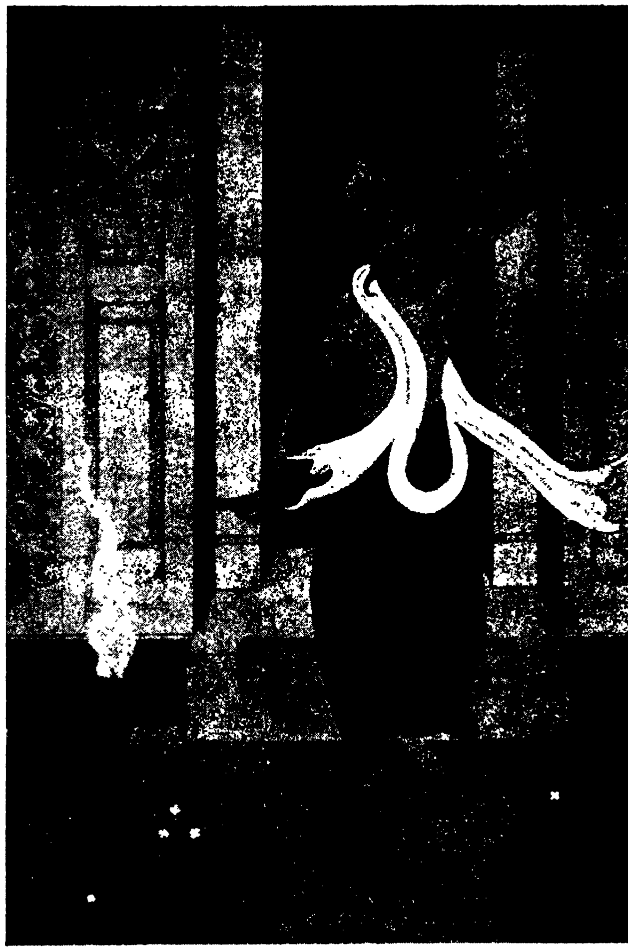
"On Friday at the Blavatsky sodge Hall, French Bridge Chanpathi there was opened an Exhibition of paintings and drawings by a Bengali artist, Mr. Manindra Gupta. The Exhibition will unfortunately end at Six O'clock on Sunday afternoon. Very little time is left therefore for those who wish to see the Exhibition of the works of a single artist yet seen in Bombay, if not in India * * * * It is very difficult to set the bounds of Mr. Gupta's versatality."

"বুদ্ধ ও শিষ্যগণ" এই চিত্র সম্বন্ধে উক্ত পত্রিকা লিখেছিল—

"Trained according to Indian methods and fully assimilating the Indian traditions Mr. Gupta has come under the Japanese influence and of Cezanne and his successors in Europe. "Buddha and his disciples" which we regard as his most distinctive work is a successful fusion of Indian and Japanese style. Buddha and his companions stand out—serene, austere and calm" * *

খৃষ্টের চিত্র সম্বন্ধে লিখেছিল—

"Even more provoking of criticism is Mr. Gupta's portrait of Christ. Mr. Gupta has had in mind the Christ preaching the sermon on the mount. An upraised and slender arm and delicate hand beckon the listeners towards the preacher. He portrays Christ simply and with utmost reverence."



নটরাজের মন্দিরে

বুদ্ধের চিত্রটি ক্রয় করেছেন উইলসন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর, ডি, চোকসি, এবং খৃষ্টের চিত্র ক্রয় করেছেন পুণার খৃষ্ট সেবা সঙ্ঘের রেভারেণ্ড উইন্স্লো।

এই প্রদর্শনী দেখার জন্য পুণা থেকে আসেন শ্রীযুক্ত সর্দ্দার মজুমদার। তিনি "ট্রিনকোমালের সূর্য্যাস্ত" নামক চিত্রটি ক্রয় করেন। এছাড়া এই প্রদর্শনীতে আরো অনেক ছবি বিক্রীত হয়েছিল।

বোম্বের অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও প্রদর্শনী তিনদিনের বেশী খোলা রাখা সম্ভব হয়নি, কারণ এর পরেই মণীন্দ্রবাবুর নাগপুরে বঙ্গীয় প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনীর শিল্পশাখার সভাপতির কাজ করতে যেতে হয়েছিল।

মণীন্দ্রবাবু ১৯৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আবার শান্তি-নিকেতনে আসেন এবং বছর খানেক থাকেন। এই বছর বিলাতে Imperial Institute of Art এ ইংলণ্ডে ও ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের যে প্রদর্শনী হয়, মণীন্দ্রবাবুর "স্বাধীনতার উষা" (গুরু গোবিন্দ) নামে চিত্রখানি ভারত গভর্ণমেণ্ট মনোনীত করে পাঠান। সিংহলে Ceylon Society of artsএ অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পীদের এক বিরাট প্রদর্শনী মণীন্দ্রবাবুর উদ্যোগে হয়। এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান পত্রে Ideals of Indian art নামে একটি প্রবন্ধ তিনি প্রদর্শনীর ভূমিকা স্বরূপ লেখেন। সিংহলের শ্রেষ্ঠ দৈনিক কাগজ "The Ceylon Daily News" এ "The Bengal school of Painters ও Swadeshi in Indian art নামে তাঁর লেখা আরো দুটি প্রবন্ধ প্রদর্শনীর সময় বেরিয়েছিল।

এই বছরই ভাগলপুর কলেজে Extension Lecture এর জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে যান এবং "A survey of the Modern art movement in India" নামে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। কলাভবনে কারুসঙ্ঘ নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে, মণীন্দ্রবাবু এর সেক্রেটারীরূপে এই সঙ্ঘটিকে গঠন করে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

শান্তি নিকেতনে যখন প্রথম ছিলেন তখন ফ্রেস্কো আরম্ভ হয়নি, এবার ফ্রেস্কো শেখার সুবিধা হয়। শান্তিনিকেতনে দেওয়ালে তাঁর আঁকা ফ্রেস্কো আছে। সুরুলে গিয়ে কিছু-কাল গালার কাজের চর্চ্চা করেছিলেন। প্রবাসীতে গালার কাজ সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে, কি করে গালার কাজ করতে হয় তার সুন্দর বর্ণনা আছে।

বর্ত্তমানে তিনি গভর্মেণ্ট স্কুল অফ আর্টের অধ্যাপক। ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে নিযুক্ত হয়েছেন।

তাঁর কর্ম্মশক্তি বহুমুখী। গত বৎসর আর্টস্কুলের যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে মণীন্দ্রবাবুর প্রায় ৪০ খানা ছবি ছিল। সৃষ্টির অদম্য প্রচেষ্টা। পৌরানিক চিত্র, বৌদ্ধ চিত্র, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র (Genre painting), দৃশ্য চিত্র, রেখা চিত্র, পেন্সিল ড্রয়িং, উডকাট, লিনোকাট কিছুই বাদ নেই।— কাগজে আঁকা, সিল্কের উপর আঁকা, কত বৈচিত্র্যের উল্লেখ করব ?



গন্ধর্ব্ব-দম্পতি

রোয়েরিক মণীন্দ্রবাবুর হিমালয়ের albumএর ভূমিকায় লিখেছেন "It is close to my conception that you express your creative thoughts in diffe-rent materials. An artist seeker continuously renovates his creative source, responds to all vibrations of nature. For the artist it is most deadly if he expressed himself finitely, but in your strivings one feels the sacred songs of a mighty stream"

মণিলাল সেনশর্ম্মা

দুর্ঘটনা

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার, এম্‌-এ

দুর্ঘটনা সহজেই মানুষের চিন্তাকে অতিক্রম করে, তাই তার মধ্যে একটা উৎকট নাটকীয়তা আছে। সহজ দিনের নিশ্চিন্ততার মধ্যে অকস্মাৎ এসে উদয় হয় -তখন আর নিষেধ বা প্রশ্ন কর্‌বার সময় থাকে না।

মাকে প্রণাম করে', ভুলে-যাওয়া জিনিষ নেবার ছলে একাধিকবার শোবার ঘরে জ্যোৎস্নার কাছে বিদায় নিয়ে, শশাঙ্ক হাসিমুখে যখন বিদেশ-যাত্রা কর্‌লে, তখন যদি কোনও জ্যোতিষী তার ভবিষ্যতের দ্বার-মোচন কর্‌তে পার্‌তেন, তাহলে শশাঙ্ক তাঁকে বদ্ধ পাগল বলে' বিদ্রূপ কর্‌ত এবং মনের কোণে সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ হলেও উচ্চহাসিতে ঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে তুল্‌ত!

কিন্তু নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে শশাঙ্ক নেহাৎ মানুষের মতই একেবারে অজ্ঞ ছিল। তাই সে মনে মনে বিশ্বাস কর্‌ত যে তার অদৃষ্টের সমস্ত সুখ ঐ ভাবীকালের ডালপালার মধ্যে বাসা নিয়েছে—মাঝের কয়েকটা বছর কোনও উপায়ে অতিক্রম কর্‌লেই একেবারে সুখের রাজ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। শুধু সে নয়—তার স্ত্রী জ্যোৎস্না এবং তার মা—দুজনেই এই ভবিষ্যৎ-কল্পনায় তার সহযোগী। নিয়মিতভাবে আশাভঙ্গ এবং ধারাবাহিকভাবে অর্থকষ্ট ভোগ করে' এক একবার যখন শশাঙ্কের মত লোকও জীবনের ক্রমশঃ প্রকাশ্য অংশটার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, তখন হঠাৎ ওর মা কপটরাগে মুখটা গম্ভীর করে' এসে বলেন—আচ্ছা খোকা, লোকে আমাদের কিছুতেই দেখ্‌তে পারে না কেন বল্‌ দেখি?

শশাঙ্ক একটু উৎসুক হয়েই জিজ্ঞাসা করে—কেন মা, কি হয়েছে?

মা বলেন—ঘাটে গিয়েছি, ঘোষেদের বাড়ীর সেজ্‌-ঠাকুরঝি আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে কত কি বলে' গেল—আমি নাকি ভয়ঙ্কর অহঙ্কারী, দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, লোকের সঙ্গে তাচ্ছিল্য করে' কথা কই—এই সব কত কি! অবিশ্যি দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারুর সঙ্গে গল্পগাছা করা আমার কোনোদিনই হয়ে ওঠে না—সে আমি পারিও না! তাই বলে' লোককে আমি তাচ্ছিল্যও করি না। কেন যে ওরা সবেতেই আমাদের দোষ দেখে বুঝি না।

বুঝি না বলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই মা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে' বিস্মিত শশাঙ্ককে বুঝিয়ে দেন যে, এ ঈর্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজ-ঠাকুরঝীর ছেলে তিন তিনবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ কর্‌তে পারেনি—তাছাড়া কালই জমিদারবাবুর সান্ধ্য-আসরে শশাঙ্ক সম্বন্ধে খুব সুখ্যাতি হয়ে গেছে। জমিদারবাবু নিজে বলেছেন যে শশাঙ্কের মত ছেলে উন্নতি না করেই পারে না।

মার গলার স্বর কল্পিত দুঃখের মন্দ লয় থেকে প্রকাশ্য আনন্দের ঝাঁপতালে উত্তীর্ণ হয়। জ্যোৎস্না হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে অনবরত ঘরের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। দেখে বোধ হয় সে পণ করেছে, সংসারের যত কাজ চক্ষুর নিমেষে শেষ করে ফেল্‌বে। অনেকদিনের বউ সে—ঘোম্‌টার রেখাটা মাথার মাঝখান পর্য্যন্ত থাকে, এবং স্বামীর সাম্‌নে শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কইতে হলে নামমাত্র একটু আড়ালের দরকার হয়! মা-ছেলের এই কন্‌ফারেন্সে শেষ অবধি সে যোগ না দিয়ে থাক্‌তে পারে না। আল্‌নাটায় দ্রুতবেগে কাপড় গোছাতে গোছাতে হঠাৎ বলে' ওঠে—আর মা, চাটুয্যেদের মেয়ে রাণী এসে সেদিন কত কথা বলে' গেল।

মার মনে পড়ে। সেও ঐ শশাঙ্কেরই কথা! মা বল্‌তে বল্‌তে হয়ত দু'একটা ভুল করেন—জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি সংশোধন করে' দেয়।

মা রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করলে, জ্যোৎস্না শশাঙ্কের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়, হাসি হাসি মুখে বলে—ওটা কি লিখ্‌ছ? আমায় দেখাবে না বুঝি—বেশ?

শশাঙ্ক হেসে বলে—ও একখানা চিঠি, এলাহাবাদে আমার যে বন্ধুটি থাকে তাকে লিখ্‌ছি।

জ্যোৎস্না তার কাঁধের ওপর দিয়ে টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে' বলে—আচ্ছা, তোমার সেই রচনার বইটা শেষ করছ না কেন? সত্যি বল্‌ছি, সেটা বেরুলে শুধু স্কুল-কলেজের ছেলে নয়, লোকে সাহিত্য হিসেবেও কিনে পড়বে। এই তো, আমি তো স্কুলেও পড়ি না কলেজেও পড়ি না—অথচ যতবারই পড়েছি—নতুন করে' ভাল লেগেছে।

শশাঙ্ক একবার মনে করে তার সাধের পুঁথিটির লাঞ্ছনার ইতিহাস জ্যোৎস্নাকে জানাবে, কিন্তু পরক্ষণেই জ্যোৎস্না কাগজে কলমে দস্তুর মত হিসেব করে' জানিয়ে দেয় যে, এই একখানা বই থেকে এক বছরে তাদের হাজার টাকা লাভ হবে—আর এমন নাম হয়ে যাবে যে প্রকাশকরা আরো লেখার জন্যে সাধাসাধি করবে। কাজেই কথাটা বলা হয়ে ওঠে না; জ্যোৎস্নার উৎসাহ-রাঙা বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ মুখটার দিকে চেয়ে শশাঙ্ক ভাবে, হয়ত জ্যোৎস্নার কথাই ঠিক্! হয়ত আর একবার চেষ্টা কর্‌লেই সে পারবে!

শশাঙ্ক বনেদি বংশের ছেলে। তাদের এই বাড়ী এককালে কত বড় আর কত সুন্দর ছিল—আধ-ভাঙা বিচিত্র-কাজ-করা থামগুলো আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরের ভগ্নাবশেষ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর বাড়ীর চারপাশ ঘিরে প্রশস্ত একটা বাগান আছে—পুরোনো উপেক্ষিত হতশ্রী বাগান। বহুকেলে আম-কাঁঠালের গাছগুলো গভীর হয়ে উঠেছে—নীচের মাটি শুক্‌নো পাতার জঞ্জালে ভরা। শশাঙ্ক যেখানে শোয় তার মাথার কাছের বড় জানলাটা খুলে দিলে দেখা যায়, সবুজ গাঢ় সবুজ পাতার রাশি আকাশ আড়াল করে' জাল পেতে রেখেছে—চঞ্চল আলোর কণিকাগুলো ধর্‌বার জন্যে!

এই বাগানের সঙ্গে শশাঙ্কের বিবাহিত জীবনের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত আছে। নিন্দুকরা বলে, কিছুদিন আগেও তারা এই বাগানে চব্বিশ-বৎসর-বয়স্ক গুম্ফবান্ যুবা শশাঙ্ক এবং আঠারো বৎসরের যুবতী স্ত্রী জ্যোৎস্নাকে রীতিমত দৌড়োদৌড়ি করে' লুকোচুরি খেল্‌তে দেখেছে!

বাগানের পশ্চিমদিকে পুকুর। তারি বাঁধানো ঘাটে বসে' ওদের কত সন্ধ্যে কেটেছে। সেই সময়ে জ্যোৎস্নার একটা প্রিয় খেলা ছিল—মুখে মুখে এক এক লাইন করে' কবিতা বানানো। প্রথম লাইনটা বল্‌তে হত শশাঙ্ককে। সেটার সঙ্গে আর একটা লাইন মিলিয়ে দিতে পারলেই জ্যোৎস্নার মহা আনন্দ! এই রকম এক সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না বল্‌লে—আমি বুঝি প্রতিদিন মিল খুঁজে মরব? আজ প্রথম লাইন আমি বল্‌ব, দেখি তুমি মিলিয়ে দিতে পারো কি না—যে লাইনটা তার মাথায় এল—সেটা হচ্ছে এই—

"সুধাকর নামে এক ছিল দুষ্ট ছেলে"—লাইনটা বলেই জ্যোৎস্না কৌতুকহাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। শশাঙ্কও দমবার পাত্র নয়; জ্যোৎস্নাকে জলের দিকে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে—

"সুন্দরী জ্যোৎস্নারে তার দিল জলে ফেলে!" এবং পরক্ষণেই তাকে বাহুপাশে আবদ্ধ কর্‌লে।

শশাঙ্কের গালে আঙুল দিয়ে মৃদু আঘাত করতে করতে হাসি-তরলকণ্ঠে জ্যোৎস্না বল্‌লে—আমার চাঁদ—আমার সুধাকর—

শশাঙ্ক উত্তর দিলে—আমার আলো, আমার কৌমুদী, আমার বন-জ্যোৎস্না!

কিন্তু জ্যোৎস্না বড়ই ছেলেমানুষ। এমন উঁচু-সুরে-বাঁধা প্রেম তার বেশিক্ষণ সয় না। হঠাৎ মুখটা গম্ভীর করে' বলে—ওটা কি বল দেখি, শাদা মত—ঐ কাঁঠালগাছটার ওপর?

শশাঙ্ক ব্যস্ত হয়ে ওঠে, উঠি উঠি করে, কিন্তু লজ্জায় পারে না। জ্যোৎস্নাকে বলে—অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, ঘরে গেলে হয় না? মা একলা……

জ্যোৎস্না দুষ্টুমি করে' বলে—বেশ লাগ্‌ছে, আর একটু বসো না। রান্না চড়তে এখনো একঘণ্টা দেরী…

শশাঙ্ক ইতস্ততঃ করে' বলে—না না, চল। আমার একটু কাজ আছে।

একথার উত্তর না দিয়ে জ্যোৎস্না বলে—ওগো দেখ, শাদা মতনটা যেন এগিয়ে আস্‌ছে না?

আর বেশি বল্‌তে হয় না। জ্যোৎস্নাকে একরকম কোলে করে' নিয়ে ততক্ষণে শশাঙ্ক ঘরের মধ্যে। জ্যোৎস্না হেসে লুটিয়ে পড়ে, অনেক কষ্টে বলে—ওটা যে খড়ের মানুষ—শেয়াল তাড়াবার জন্যে আমিই তৈরী করিছি।

স্বামীর এই ভূত-সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা নিয়ে এমনি অনেক রহস্য জ্যোৎস্না করে' থাকে। শশাঙ্ক রাগ করে না, ওর কাণ মৃদু স্পর্শ করে' বলে—গুরুজনের সঙ্গে ঠাট্টা, আর কর্‌বে কখনো?

ওরা পরস্পরের কাছে নিজেদের বেশ ছেড়ে দিতে পেরেছে, কিছুই গোপন কর্‌বার দরকার হয় না—কিছুই বাড়িয়ে বল্‌বার আবশ্যক নেই; পৌনঃপুনিক প্রতিজ্ঞার জোরে ওদের প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয় না। একান্ত সাধারণ কথাবার্ত্তার আড়ালে, চেতনার পেছনের কক্ষে ওদের মিষ্টি প্রেমটুকু অনর্থক উত্তেজনার হাত থেকে নিজের লাবণ্য বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাই জ্যোৎস্না অবলীলাক্রমে শশাঙ্ককে গঞ্জনা দিতে পারে—নাঃ, তোমাকে দিয়ে দেখ্‌ছি কিছুই হ'ল না। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, কিছুই করে' উঠ্‌তে পার্‌ছ না। অন্ততঃ কোনো একটা স্কুলেও চাক্‌রি-বাক্‌রি নাও···

শশাঙ্কের মনে যে ব্যথা লাগে না তা নয়। দু'তিনদিন মুখটা বিষণ্ণ করে' থাকে। জ্যোৎস্না লক্ষ্য করেও যেন লক্ষ্য করে না। খোঁচা দিয়ে বলে—মিছিমিছি বসে' বসে' বেলা কর্‌ছ কেন? খেয়ে নাও না···

কিংবা,—অমন করে' সারারাত আলো জেলে রাখ্‌লে লোকে ঘুমুতে পারে?

কিন্তু হঠাৎ আবার এক সময়ে মহা উৎসাহে ভাব করতে আরম্ভ করে' দেয়। বলে—সত্যি, গাঁয়ের লোকগুলোর জন্যে মনে যদি একবিন্দু শান্তি থাকে। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে দেখা হলে খোঁচা দেবে—কি গো, তোমাদের অমুকের খবর কি? কতটাকা মাইনের চাক্‌রি হল? আমি সেদিন মিত্তির-বউকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি। বল্লুম,—চাক্‌রি পাওয়াই কি জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিষ? সে ত' বরাতের কথা। লোককে বিচার কর্‌তে হয় তার গুণ দেখে।

মিলনটা খুব সহজেই হয়ে যায়—কিন্তু শশাঙ্কের মনের কোথায় যেন একটু বেদনা থেকেই যায়!

গ্রামের মধ্যে যখন ওদের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় একদিন এলাহাবাদ থেকে শশাঙ্ক চিঠি পেল। আশি টাকা মাইনের চাক্‌রি—উন্নতিব আশা যথেষ্ট। বিয়ের পর প্রথম মিলনের রাত্রি তাদের যেমনভাবে কেটেছিল সে রাতটাও তেমনি একটা চপল উচ্ছ্বাসের মধ্যে কেটে গেল। মারও রাত্রে ঘুম হল না। সকাল হতে না হতেই তিনি পাড়াময় এই সুসংবাদ প্রচার করে' তবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌তে পারলেন। বিদায়ের সময় জল-ভরা চোখে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন, বারবার করে' বলে' দিলেন—এই মাসের শেষে মাইনে পেলেই সে যেন একবার চলে' আসে···

জ্যোৎস্না মুখ টিপে টিপে হাসে আর বলে—কেমন, আমি বলেছিলুম না? স্ত্রী-ভাগ্যে এবার বিশ্বাস হল তো?

শশাঙ্ক হেসে বলে—আমি কবে তা অস্বীকার করেছি? —একটু চুপ করে' থেকে ছেলেমানুষের মত বলে' ফেলে—কিন্তু জ্যোৎস্না, তোমাদের ছেড়ে কি করে' থাক্‌ব? এমন মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে···

জ্যোৎস্না দ্রুতপদে কাছে এসে আলিঙ্গনে চুম্বনে শশাঙ্ককে ছেয়ে দেয় বলে—যাঃ, মন খারাপ কিসের? একমাস বাদে যখন তুমি ফিরে আস্‌বে, সে-কি আনন্দ হবে ভেবে দেখেছ? কয়েকমাস গেলেই তো আমাকে আর মাকে এলাহাবাদে নিয়ে যাবে—না?

শশাঙ্ক উৎফুল্ল হয়ে বলে—নিশ্চয়ই!

হঠাৎ বহুকষ্টে গোপনকরা অলক্ষণের ধারা দুচক্ষু বেয়ে ঝরে' পড়ে—জ্যোৎস্না ছুটে পালায়!

একমাস কেটেছে! শশাঙ্কের এক একটি করে' দিন-গোণা একমাস!

মাইনে পেয়েছে—পুরো আশি টাকা! তিনদিনের ছুটিও মঞ্জুর হয়েছে!

অহঙ্কারের কথা মোটেই নয়—কিন্তু নিছক হতে-পারার-আশা আর সত্যি হওয়ার মধ্যে একটা আশমান-জমি তফাৎ আছে। সেই গ্রামে সে ফিরে যাচ্ছে, যেখানকার লোক সন্দেহে আর ঈর্ষায় দিনে দিনে তাকে দুর্ব্বল করে' তুলেছে; যেখানে দুঃখের অন্ধকারে বিদ্রূপের দমকা হাওয়া থেকে তার মা তাঁর একটিমাত্র আশার ক্ষীণ-আলোটুকু অতি যত্নে অতি কষ্টে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছেন; যেখানে আছে জ্যোৎস্না—তারই একান্ত আপন জ্যোৎস্না—দারিদ্র্যের মেঘে ম্লান, নিরাশায় বিবর্ণ—পরিপূর্ণভাবে ফোটবার অপেক্ষায় উন্মুখ!

এবার যখন সে বাড়ী যাবে, গাঁয়ের লোকে দেখে এসে ভাব করবে; বল্‌বে—এত' আমরা আগেই জান্‌তুম! শশাঙ্কের মত ছেলে আর হয় না—আমরা বরাবর বলে' আস্‌ছি ও উন্নতি করবেই।

মা যত্ন করে' তাদের আদর-আপ্যায়ন করবেন। তাঁকে আর চেষ্টা করে প্রমাণ করতে হবে না যে তাঁর ছেলে ভাল। বাড়ীতে বাড়ীতে সব কাজে জ্যোৎস্নার ডাক পড়বে। তার আদর বেড়ে যাবে, লোকে তার গুণের পরিচয় পাবে।

কল্‌কাতায় এসে শশাঙ্ক জ্যোৎস্নার জন্যে একজোড়া আশ্‌মানী রঙের শাড়ী কিন্‌লে। আশ্‌মানী রঙের শাড়ীটি পরে' জ্যোৎস্নাকে কেমন চমৎকার দেখাবে, মনে মনে কল্পনা করে' বেশ উৎফুল্ল হল। তারপর মার জন্যে একজোড়া থান, কতকগুলো খুচরো মণিহারী জিনিষ এবং একতোড়া ফুল কিনে নিল। ফুলটা হাতে করে' থাকতে লজ্জা করতে লাগ্‌ল—অতি সাবধানে সেটাকে সুটকেসে তুলে রাখ্‌ল।

কল্‌কাতা থেকে ট্রেণে তাদের গাঁয়ের ষ্টেশনে যেতে দু'ঘণ্টা লাগে। সন্ধ্যে সাতটা বিশ মিনিটের ট্রেণ। ষ্টেশন থেকে একখানা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে সে নিরিবিলি দেখে একটা ইণ্টারক্লাস কামরায় উঠ্‌ল।

গাড়ী কল্‌কাতার ধোঁয়া আর ধূলোর পরিধি ছাড়িয়ে অন্ধকারঘন স্নিগ্ধ সবুজের রাজ্যে গিয়ে পড়্‌ল। খবরের কাগজটা একপাশে পড়ে' রইল। শশাঙ্কের মনটা জান্‌লার ভেতর দিয়ে বাইরে উধাও হয়ে গেল। মাঝে মাঝে সে গুন্‌গুন্ করে' গাইছে—'আজু সখি, শুভদিন ভেলা।' অবশ্য, সুরটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না—এবং জান্‌লার কাঠটার ওপর যথাসম্ভব তাল রাখ্‌বার চেষ্টা করছে। থেকে থেকে হঠাৎ জান্‌লা দিয়ে মুখ বার করে' একটু হেসে নিচ্ছে—পাছে গাড়ীর অন্যান্য লোক দেখ্‌তে পায়। ভুরু কুঁচ্‌কে গম্ভীর মুখে একবার খুব খানিকটা ভাব্‌লে—দুরূহ ভাবনার চাপে কয়েকটা কথা খুব মৃদুস্বরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ওদের যদি এলাহাবাদে নিয়ে যেতে হয়··· কিন্তু ঘরবাড়ী সমস্ত ছেড়ে···আর এমন একটা বাগান···

আর মোটে দুটো ষ্টেশন আছে। সাধারণতঃ সে পান খায় না—তবু পানওয়ালাকে ডেকে একটা পান নিলে; পানওয়ালা একটা আধলা ফেরৎ দিতে গেল, তাকে বল্‌লে—থাক্, ও আর আমি নিয়ে কি করব?

ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা উত্তেজনা বোধ হতে লাগ্‌ল। আর মোটে দুটো ষ্টেশন; তারপরেই···মা ভাল আছেন তো? আর জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্নার কোনও রকম···

নাঃ, এসব সে কি ভাব্‌ছে! ওদের চিঠি প্রায় সাতদিন পায়নি বটে—কিন্তু তাতে ভয়ের কি আছে?

আজই দুপুরে নিশ্চয় ওরা টেলিগ্রাম পেয়েছে। ছুটির তো ঠিক ছিল না—কাজেই বাধ্য হয়ে টেলিগ্রাম করতে হল।

কিন্তু মাসের শেষে অন্ততঃ মারও তো একখানা চিঠি লেখ্‌বার কথা!

শশাঙ্ক খবরের কাগজটা তুলে নিলে ভাবনার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। গাড়ীটা যেন আর চল্‌ছেই না! খবরের কাগজটা খুল্‌লে বটে কিন্তু চোখের সাম্‌নে জ্যোৎস্নার মুখটাই ভেসে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যেন মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে! শশাঙ্কেরও মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল। গাড়ীর মধ্যে তখন একটিমাত্র লোক ছিল। শশাঙ্ক জোরে জোরে খবরের কাগজটা পড়তে আরম্ভ করে' দিলে।

Mr. Macdonald makes a sudden move—বাস্তবিক, ওদের মত অত চতুর আর ফন্দীবাজ হতে বাঙালীর এখনও বহুদিন লাগ্‌বে—Legislative Assembly

Debates—এই আর একটা ব্যাপার যার মাথাও নেই মুণ্ডুও নেই। মিছে debate করে' লাভ কিরে বাপু—যা কর্‌বার সে তো ওরা কর্‌বেই······

সেই পাতার নীচের দিকে এক জায়গায় চোখ পড়তে হঠাৎ শশাঙ্ক স্তম্ভিত হয়ে গেল! ইংরেজিতে যা লেখা আছে তার মর্ম্ম এই যে, তাদেরই গ্রামের জ্যোৎস্না বলে' একটি মেয়ে গঙ্গায় নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে! শশাঙ্কের বোধ হল সে আর কিছু দেখতেও পারছে না, বুঝতেও পার্‌ছে না!

সুটকেসটা নিয়ে কেমন করে' যে সে তাদের ষ্টেশনে নাম্‌লে, তা সে নিজেই জানে না। ষ্টেশন-মাষ্টারটির সঙ্গে তার বেশ চেনা ছিল; টিকিট নেবার সময় ভদ্রলোক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—এই যে, শশাঙ্কবাবু যে—বড়ই কাহিল দেখাচ্ছে যেন···

—শরীরটা তেমন ভাল নেই ভাই—বলেই শশাঙ্ক পাশ কাটিয়ে প্ল্যাটফরম থেকে বেরিয়ে পড়ল। মনে মনে বল্‌তে লাগল—এ নিশ্চয়ই অন্য কোনও জ্যোৎস্না—নইলে, অত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেলে ষ্টেশন-মাষ্টার নিশ্চয়ই জান্‌তে পার্‌ত······

অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে সে পথ চল্‌তে সুরু করে' দিলে। অন্ধকার পথ। দু'পাশের গাছগুলো একেবারে চুপ হয়ে রয়েছে—যেন প্রতিজ্ঞা করেছে আর কথা কইবে না!

মিট্‌মিটে আলো-জ্বালা বাজারটার পাশ দিয়ে বেঁকে আবার নির্জ্জন পথে এসে পড়েছে—এমন সময় কে হঠাৎ প্রণাম করলে। অন্ধকারে ঠাওর করে' শশাঙ্ক জিগ্যেস্ করলে—কে, মৃত্যুঞ্জয়?

মৃত্যুঞ্জয় তাদের বহুকালের গয়লা। লোকটা একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—দাদাবাবু, মার চিঠিতে জেনেছেন ত' সব। আপনি ছিলেন না—এর মধ্যে কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে······

—জানি। আচ্ছা, এখন একটু তাড়াতাড়ি আছে—বলে' শশাঙ্ক পাশ কাটালে। খানিকদূর গিয়ে সুটকেসটা পথের ধারে রেখে তার ওপর বসে' পড়ল। বিড় বিড় করে' বল্‌তে লাগল—তাহলে জ্যোৎস্না নেই! জ্যোৎস্না নেই! গঙ্গায় ডুবে গেছে।—কিন্তু কথাগুলো কিছুতেই যেন তার মাথায় ঢুকল না। হঠাৎ মনে হল—তাই তো, এখানে বসে' আছি কেন? কি যেন ভাব্‌ছিলুম······

মনের ভেতর একটা ধারণা রয়েছে, বাড়ী যেতে হবে—সেইটেই তাকে ঠেলা দিয়ে নিয়ে চল্‌ল। হঠাৎ এক সময় সে দৌড়াতে আরম্ভ করলে। বাড়ী গিয়েও জ্যোৎস্নাকে দেখা যাবে না, এ তার বিশ্বাসই হল না। মনে হল, খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

ঘরে একটা আলো জ্বল্‌ছে বটে, কিন্তু সব নিস্তব্ধ! তারার আলোয় আর জোনাকিতে বাগানের অন্ধকারটা চিক্‌চিক্ করছে।···সুন্দর—সুন্দর এই বাগানটা! এতখানি দৌড়ে আসার পর শশাঙ্ক একেবারে পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার চির-পরিচিত সেই পুকুরটার পাড়ে! তার মানসিক এবং শারীরিক উত্তেজনা বালির ঘড়ির মত দ্রুত ক্ষয় হয়ে আসতে লাগল। এতক্ষণ পরে কি করে' যেন তার নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হয়ে গেল যে মিছে ছট্‌ফট করে' লাভ নেই—জ্যোৎস্না চিরকালের মত চলে' গিয়েছে!···

ভোর হবার আগে জোর করে' ঘুম ভাঙিয়ে দিলে যেমন চোখের সামনে সমস্ত ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা স্বপ্নের মতো ঠেকে, বাগানের গাছগুলো আর তারায় ঝল্‌কান পুকুরটা ওর চোখে তেমনি অদ্ভুত লাগতে লাগল!...এরা তো রয়েছে! যেমন আগে ছিল তেম্‌নি—অথচ কি অদ্ভুত,কি নির্ম্মমভাবে সুন্দর!

এইভাবে কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইল—তার ঠিক নেই। কিন্তু তারি মধ্যে বিপদের নিষ্করুণ দেবতা তাঁর জয় সম্পূর্ণ কর্‌লেন; ওর কপালে পরাজয়ের বঙ্কিম-রেখা এঁকে দিলেন—ওর মাথায় চাপালেন শাস্তির অদৃশ্য বোঝা! তার ভারে ওর মাথা নুয়ে এল, ওর মুখে ফুটে উঠল একান্ত অসহায়তা! যাদুদণ্ডের স্পর্শে ওর সমস্ত চেহারা যেন বদ্‌লে গেল!...

যখন চমক ভাঙল, তখন ও স্থির করলে, বাড়ীর ভেতর সে কিছুতেই যেতে পারবে না—এইখান থেকেই ফির্‌বে। মনে মনে ঐ বাগান, ঐ বাড়ী আর তারই অন্তরালে ধূলি-শয়ানা একাকিনী মা'র কাছ থেকে বিদায় নিলে। পুকুরটার দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে পড়ে' গেল, তারই তৈরী করা এক লাইন কবিতা...যেন সত্যি সত্যি তাকে কে চাবুক মারলে···

'সুন্দরী জ্যোৎস্নারে তার দিল জলে ফেলে'...

সেই জলেই জ্যোৎস্না গিয়েছে !...একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে' উঠল !...অতি ভয়ে অতি মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলে—জ্যোৎস্না !

নামটা উচ্চারণ করেই চমকে উঠল। যেন বহুদূর থেকে অনেকদিন ওপারের কোন্ গলার আওয়াজ। একটা স্পষ্ট সভয় ধারণা মনে জেগে উঠল, ডাক শুনে জ্যোৎস্না এখনি এসে হাজির হবে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শশাঙ্ক যেন অপেক্ষা করতে লাগল।

এসেছে !...

পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলে—নরম...ফর্সা...চুড়ির আওয়াজ !...শশাঙ্কের গলায় একটা বিকৃত আওয়াজ হতে লাগল—অন্ধকারেও চেনা যাচ্ছে—এ জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নার প্রেতমূর্ত্তি !...

উন্মাদের মত সে বললে—না না, তুমি ফিরে যাও—তুমি ফিরে যাও—আমি তোমায় ডাকিনি'...

মনে হল যেন কিছুতেই তার হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।...অসম্ভব নরম—অথচ অসম্ভব শক্ত ! শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে' সে দু'হাত দিয়ে সেই ছায়া মূর্ত্তিটাকে জলের দিকে ঠেলে দিলে—সেটা যেন পুকুরের পাড় দিয়ে গড়াতে গড়াতে জলের ধারে গিয়ে পড়ল।...

শরৎকাল ; ভাদ্রের জলে পুকুরটা প্রায় ভরে উঠেছে। ঘাসে ঢাকা অল্প একটুখানি পাড়। এই পাড় বেয়ে যদি কেউ গড়ায় তবে তার জলে পড়া অবশ্যম্ভাবী।

সব রকম উত্তেজনারই একটা চরম মাত্রা আছে। তারপরে মানুষের অনুভব শক্তি হয় সাধারণ স্তরে নেমে আসে, নয় মূর্চ্ছার মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শশাঙ্কের মনে হঠাৎ একটা স্থির স্পষ্টতা এল।—মূর্ত্তিটাকে স্পর্শ করা যায়, ঠেলে দেওয়া যায়। জলের আওয়াজ স্পষ্ট তার কানে গিয়েছে। তাছাড়া এতক্ষণে হঠাৎ তার মনে এলো, যে তাদের গয়লা মৃত্যুঞ্জয়ের মেয়ের নামও তো জ্যোৎস্না !

এর থেকে একমাত্র যে সিদ্ধান্ত সম্ভব, শশাঙ্ক বহুক্ষণ ধরে সেটাকে মন থেকে দূর করে দেবার চেষ্টা করলে। পাড়টার দিকে একবার চেয়ে দেখলেই মীমাংসা হয়, কিন্তু তাও সে পারলে না।

—তার জীবনের মধ্যে হঠাৎ এই খাপছাড়া ব্যাপার। এ কোন রহস্যপরায়ণ হৃদয়হীন দেবতার বর্ব্বর পরিহাস। এর একমাত্র প্রতিশোধ আছে—এই নিদারুণ দুর্ভাগ্যের বোঝা একেবারে অস্বীকার করা। দাঁতে দাঁত চেপে শশাঙ্ক মনে মনে শপথ করলে যে সে দোষী নয়, সে স্ত্রী-হন্তা নয়।

অবশেষে তার মাকে ডেকে এনে সে বল্লে, দেখ তো মা, পুকুর পাড়ে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে ?

—তা'র গলা একটুও কাঁপল না এবং তা'র বিস্ময় ও উদ্বেগ-প্রকাশের মধ্যে অভিনয়ের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না।

সুনীলচন্দ্র সরকার

শরতের শেষে

শ্রীশান্তি পাল

কালো হ'য়ে আসে সুদূর আকাশ
মাঠ ঘাট বাট ঢাকি,
কিচি মিচি ক'রে কুলায় ফিরিছে
বনের যতেক পাখী।

গাঙ্‌চিল গুলো নদীর ও-পারে
বাতাসে মেলিয়া পাখা
একে আর একে মগ্‌ডালে ব'সে
দোলায় সবুজ শাখা।

সন্ধ্যা-সভারে শেষ ক'রে দিয়ে
শকুন পাখীর দল
ঝাঁকে ঝাঁকে তারা তালীবন 'পরে
ঘুরিতেছে অবিরল।

বকের আবলী সারি দিয়ে বসে
নাঙ্‌লা বিলের ধারে
সবুজ পানায় সাদা ছোপ দিয়ে
ঘন ঘন পাখা নাড়ে।

মাথার উপরে উড়ে চ'লে যায়
বুনো-শালিকের ঝাঁক
তারি পিছে ওড়ে চখা আর চখী
ডাহুক ডাহুকী কাঁক।

রাখাল চ'লেছে গোধন লইয়া
গোখুর ধুলায় ভ'রি,
সারা ক্ষেতখানি রঙিয়া উঠিছে
অপরূপ বেশ ধরি।

রাখালীয়া মেয়ে পিছে পিছে ধায়
পাঁচন-বাড়িটি হাতে,
কাণে দোলাইয়া শিরিষের ফুল
কুরুবক প'রে মাথে।

দূরে দাঁড়াইয়া আন্‌মনে দেখে
রাখাল ছেলের দল,
লাঠির উপরে দেহখানি রেখে
চেয়ে থাকে ছলছল্।

কোনো চাষী রোপে মাথা নীচু ক'রে
ছোট ছোট ধান-চারা,
কেহবা বসিয়া তামাকু টানিছে
নাহি তার কোন সাড়া।

কেহ মাটি কেটে কোদাল পাড়িছে
রচিছে নূতন আল,
কেহবা তখনো খ্যাবড়া জমিতে
ব'সে চালাইছে হাল।

ক্ষেতের পথেতে কৃষাণ কনেরা
আগাছার বোঝা নিয়া
সারি দিয়া সবে চলেছে রঙের
রঙীন আঁচড় দিয়া।

কেহবা প'রেছে হলুদীয়া শাড়ী,
কেহবা প'রেছে লাল,
কাহারো পরণে আব্‌রাঙা রঙ্
ধুসর মেঘের জাল।

গল্পে গুঞ্জবে হাসি কুতূহলে
চ'লেছে সুদূর "গাঁ-"এ
শাওন শেষের আব্‌ছায়া মাখা
জল-ভরা-ঘন বায়ে।

দেখিতে দেখিতে কালো হ'য়ে এল
সুদূর গাঁয়ের বাট
সেই কালো সব ছেয়ে ফেলে দিল
তেপান্তরীর মাঠ।

কোথা দেখি সাদা, কোথা দেখি পাঁশু
কোথায় ধূসর ঢঙ,
তারি ফাঁকে ফাঁকে উঁকিমারে যেন
কাঁচা পাকা সোনা রঙ।

দূর গ্রাম পথে পল্লী দুলালী
কলসী লইয়া কাঁখে,
জল আনিবারে চলিয়াছে ধীরে
গেঁইয়া নদীর বাঁকে।

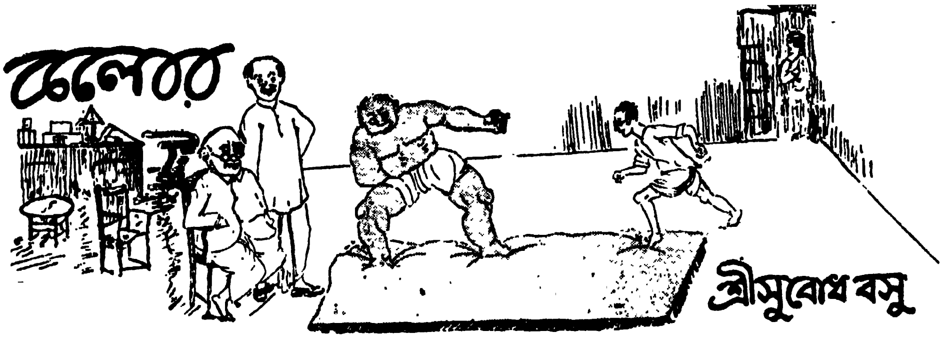
ওই যে দেখিছ উঁচু নীচু মাঠ
সরষে অড়র ক্ষেত,
তারি পাশে ওই বাব্‌লার বন
করে সদা সঙ্কেত,—

তারি পাশে ঘাট,—সে ঘাটে নামিয়া
কলসী ভরিয়া জলে
পল্লী বালিকা হেলিয়া দুলিয়া
গৃহ-পথে ফিরে চলে।

বনের আড়াল হ'তে আড় চোখে
হেরি সে মোহন ছবি,
সাথে সাথে চলে লুব্ধ হৃদয়ে
অচিন্ গাঁয়ের কবি!

শান্তি পাল





পাত্র-পাত্রী

অধ্যাপক দত্ত	সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক
অমিয়	রিসার্চ্চ ষ্টুডেণ্ট। ঐ ছাত্র।
জগদীশ	অধ্যাপক দত্তের ছোট ভাই
পুরুষোত্তম	পালোয়ান।
সুমিতা	অধ্যাপক দত্তের ভাগ্নী।

দৃশ্য :—অধ্যাপক দত্তের পড়িবার ঘর।

সময় :—বর্ত্তমান।

[বড় একটা ঘর। তার মধ্যে সব চেয়ে প্রথম যেটা চোখে পড়ে সেটা একটা দেওয়ালের ধারে অডিটোরিয়ামের সামনা-সামনি একটা মস্ত টেবিল। তার মধ্যে মোটা মোটা বই স্তূপীকৃত হইয়া আছে। তার কতগুলি খোলা, —বেশী ভাগ অগোছালো ভাবে টেবিলের দু-ধার প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে। পিছন দিকে উচু-নীচু একটা চেয়ার দেখা যায়,—তাছাড়া চারিদিকেও চেয়ার ছড়ান। টেবিলটার উপরে একটা বিজলী আলোও দেখিতে পাওয়া যায়।

অডিটোরিয়ামের দিকে পা দিয়া একজন যুবক টেবিলের উপর একটা খোলা বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছিল। দুয়েকবার সে প্রত্যাশী ভাবে পাশের দরজাটার পানে চাহিল। তারপর কি ভাবিয়া লেখা থামাইয়া বইগুলি বিরক্তির সঙ্গে ও-দিকে ঠেলিয়া অমিয় কপালে হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সকাল আটটা বাজিয়াছে।

অর্দ্ধ-মিনিট কাল এমনি কাটিল। তখন এক দিকের দরজা দিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। সহাস্য, স্ফূর্ত্তিবাজ গোছের দেখিতে,—তার চোখ দুটীতে ঔদার্য্য। মাথায় ক্ষুদ্র একটা টাক পড়য়াছে। ঢুকিয়া অমিয়র দিকে চাহিয়া টাকে হাত বুলাইয়া তিনি কহিয়া উঠিলেন]

জগদীশ। [দুষ্টুমি ভরা সুরে] ওহে দাদার ছাত্তবাবু, আমার ভাগ্নীর অবস্থাটা এমন শোচনীয় করে তুললে কি করে,—বলি ও করেছ কি? মেয়ের নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, কেঁদে কেঁদে চোখ জবাফুল [অমিয় চমকিয়া ফিরিল] —সর্ব্বনাশ বললেই হয়,—থিয়েটার হলে আত্মহত্যাই করে বসত।

অমিয়। তাই নাকি,—জানতুম না তো। [একটু ইতস্ততঃ করিয়া] আপনি তো সব জানেন, ছোট মামাবাবু, —সময় আমারও খুব ভালো কাটছে না।

জগদীশ। ওঃ এই ব্যাপার! [মৃদু হাসিয়া] আবার

এই নাটিকার চিত্রগুলি শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

দেখাদেখি ছোট মামাবাবুও বলতে শিখেচ। তবে তো ব্যাপার গুরুতর। কিন্তু ছোক্‌রা, প্রফেসারের টেবিলে বসে তার বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে তো গোলযোগ আর মিটে যাবে না। আমার ভাগ্নীর উপযুক্ত নও তুমি,—এই সঙ্কটের সময়ও বসে নোট টুকতে যার ধৈর্য্য থাকে তার প্রাপ্য বড় জোর একটা ডক্টর উপাধি।

অমিয়। [হতাশ ভাবে] কিন্তু মামাবাবু, আমি ভেবে ভেবে আর তো কূল-কিনারা পাচ্ছি না,—কী যে—

জগদীশ। তুমি নেহাৎই অপদার্থ,—রিসার্চ্চ করারই উপযুক্ত। জানতো None but the brave deserves the fair বীরের বাষ্পও তোমার মধ্যে নেই।

অমিয়। কিন্তু আপনার দাদাকে তো আপনি চেনেন, —ওর জেদ ভাঙতে পারা জগতে কার দ্বারা যে সম্ভব তাই আমি ভেবে পাই না। ওর একটু ইচ্ছে নয় আমি সুমিতাকে বিয়ে করি।

জগদীশ। কিন্তু কেন,—কারণটা কি? তোমার বিদ্যাবুদ্ধি প্রফেসার ভালো করে টের পেয়েছেন,—তাই আপত্তি নাকি? [দুষ্টুমির হাসি]

অমিয়। বোধ হয়। [হাসিয়া] কিন্তু আদত ব্যাপারটা আমারও কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়। কিছুদিন হ'লো প্রফেসার দত্ত ইউজেনিক্‌স সম্বন্ধে গবেষণা করতে সুরু করেছেন,—তার—

জগদীশ। ইউজেনিকস? সে আবার কি? পলিটিকস-এর মাসতুত-পিসতুত ভাই নাকি?

অমিয়। ঠিক তা নয়। গরু-ভেড়ার সু-উৎপাদনের কথা পড়েছেন তো? এ মানুষের সু-উৎপাদনের বিজ্ঞান। আপনার দাদা কিছুকাল ধরে ও-দিকে আকৃষ্ট হন। তার ফল এই হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু সে-ই ছেলে এবং সেই মেয়েদের বিবাহ হওয়া উচিত যারা অত্যন্ত সুপুষ্ট। আমাকে তিনি বিবাহের অযোগ্য ঠিক করেছেন,—আমি যথেষ্ট মোটা নই।

জগদীশ। [বিস্মিত হইয়া] সত্যি নাকি? সুমিও তাই বলছিল বটে,—আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি। দাদার পাগলামোগুলি আর কিছুতেই গেল না দেখছি।

অমিয়। এখন আপনি কি করতে বলেন,—আমি তো কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। [একটু দ্বিধা করিয়া] সুমিতার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি মরে যাব মামাবাবু।

জগদীশ। থিয়েটার করতেও শিখেচ খুব। শেষ রক্ষা যদি না করতে পার্‌বে তবে ও-সব গণ্ডগোলে ব্যাপারের মধ্যে গিয়েছিলে কেন শুনি। [পরিহাস-তরলকণ্ঠে] দাদা ঠিক বলেছেন,—ও-সব ছেলেদের সঙ্গে মেয়ের বিয়েই দেওয়া উচিত না। জীবনে কখনো ব্যায়াম করবে না,—শরীর নেই তো বই পড়েন। শিক্ষা হ'লো তো,—পরের জন্মে প্রথম থেকেই ডন্‌বৈঠক সুরু করো,—এমন মনস্তাপে আর পড়তে হবে না।

অমিয়। আর আপনার ভাগ্নী? সুমিতা?

জগদীশ। ঐ মেয়েটার জন্যই তো এত মাথা ব্যথা,—যখন বানপ্রস্থে যাবার বয়স তখনই আবার এসব ছেলে-মানুষির মধ্যে মাথা সিঁধুতে হচ্চে। মনে কি আর ও-সব আছে ছাই,—কিন্তু ভাগ্নীটির মাথা যখন তুমি খেয়েচ তখন ভাবনার কথা বৈকি। নইলে তুমি পরের ছেলে,—মর বাঁচ, কার কি।

অমিয়। [আশান্বিত] তবে সুমিতার জন্যই কিছু করুন মামাবাবু। আপনি যদি দয়া করেন তবে সবই হ'তে পারে।

জগদীশ। [হাসিয়া] বাঃ, বেশ শিখে নিয়েচ। কিন্তু এতই বা কি ঠেকা। বাড়ি যাও,—বাড়ি গিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে কবিতা লেখ। নিলর্জ্জতা মাত্রাহীন ভাবে বাড়াতে পার তবে ব্যর্থ প্রেমের কবিতার বই ছাপাও। মাসিকে সমালোচনা বের কর। তারপর অন্য একটি যাকে তাকে বিয়ে করে'—বুঝ্‌লে না?

অমিয়। [দুঃখিতের মত] ছোটমামা, আমি কাল থেকে উপোসী আছি।

জগদীশ। হাঙ্গার ষ্ট্রাইক,—কার সঙ্গে? বাপুহে ওতে হবে না,—তুমি হতাশ হ'য়ে না খাওয়া সুরু করলে আর ভৌতিক-ভাবে দাদার মন গলে গেল তাতো আর এ শতাব্দীতে হয় না। তুমি সুমিকে চাও কি না?

অমিয়। 'সমস্ত প্রাণে মনে।



অধ্যাপক দত্ত—সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক

জগদীশ। লাভ করার নিশ্চয়ই উপায় ঠিক করেছ তাহ'লে,—অন্তত করা উচিত ছিল। দাদা অত্যন্ত খামখেয়ালী কড়া মানুষ। তার মত বদ্‌লাতে চাও তো প্রায় গন্ধমাদন পর্ব্বত বয়ে আনতে হবে।

অমিয়। আমার ভাববার চিন্তা করবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে ছোট মামাবাবু। আপনি যা হয় করুন।

জগদীশ। মাথা ধরল তোমার,—এদিকে মকরধ্বজ মেড়ে আমাকে খাওয়ান হবে,—এও প্রায় সেই রকমই হ'লো। কিন্তু ব্যাপারটা ক্রমশঃই গুরুতর হয়ে পড়ছে। ঐ নীচের কুস্তির আখড়ার ঘাড় গুঁড়া ষণ্ডাগোছের ছেলেটাকে দেখেচ তো,—সুমিকে যেটা একদিন একটা ঢিলে বেঁধে চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছিল দাদার তো তার ওপরেই ভারী নজর পড়ে গেছে। ক'দিন ধরেই তার ঘন ঘন যাওয়া আসা হচ্চে।

অমিয়। [দুঃখিত ভাবে] শুনেচি। কিন্তু মামাবাবু, সেটা কি দারুণ অন্যায় হবে বলুন তো। সুমিতা ওর সাথে বিয়ে হ'লে মরে যাবে। মরেই যাবে,—

জগদীশ। অসম্ভব নয়। কিন্তু উপায় কি বলোতো। দাদার যখন জেদ চেপেছে তখন কি আর সহজে মিটবে ব্যাপারটা? অথচ এদিকে শ্রীমানও খাওয়া ছেড়েছ, শ্রীমতীও খাওয়া ছেড়ে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে তুলছেন। সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। কতদিন বলেছি, বাপুহে, বই খাতা ছেড়ে একটু খেলাধুলোও করো।

অমিয়। [আপত্তি করিয়া] খেলাধুলো করলেই অমন ষণ্ডা হ'তে পারতেম নাকি? প্রোফেসার দত্ত চান্ এমন বলিষ্ঠ লোক যা শুধু—

জগদীশ। [কথা কাড়িয়া] ষণ্ডাজাতির মধ্যেই সুলভ। কেমন?

অমিয়। তাছাড়া মোটা হ'তে আমি পছন্দ করিনে। তাদের বড় ঘাম হয়।

জগদীশ। সে একটা ভাববার কথা বটে। কিন্তু ঘাম বাঁচাতে গিয়ে যদি মানসী ফস্‌কে যায় তা বড় সুবিধের কথা নয়। [একটু থামিয়া] শিষ্যদের গুরুগৃহের মেয়েদের সঙ্গে প্রেমে পড়ার একটা গতিক দেখা যায়,—কচ আর দেবযানীর উপাখ্যান পড়েছ তো? এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে নাকি বলতে পার?

অমিয়। [করুণ-ভাবে হাসিল]

জগদীশ। নাঃ,—তোমার আর কোনো উপায় দেখছি না,—এক পাত্রীহরণ ছাড়া। সেটা কিন্তু বাপু আমি বরদাস্ত করব না।

অমিয়। [করুণ হাসিয়া] কি যে বলেন মামাবাবু! কিন্তু আপনাকে এর কিছু করতেই হবে। নইলে আপনাকে ছাড়ব না কিছুতেই। অমনি একটা খামখেয়ালের জন্য আমাদের দুজনের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এর সকরুণতা কি আপনাকে স্পর্শ করে না,—এর কি কোনো প্রতিকারই করা যাবে না?

জগদীশ। দাদাকে বলে দেখ না।

অমিয়। অসম্ভব। তার ফল হবে এই যে কাল থেকে এখানে আসা পর্য্যন্ত আমার বন্ধ হয়ে যাবে। আর কিছু হবে না। ওর কথার প্রতিবাদ করা কি যে ভয়ঙ্কর কথা তা কি আপনি জানেন না?

জগদীশ। এও নয়, সেও নয়,—তবে আর কি? মনের দুঃখে বনে যাও,—নইলে ময়দানে গিয়ে চরে বেড়াও। ক্ষিধে

পেলে চিনেবাদাম কিনে খেও। এদিকে ষণ্ডকুমারকে দাদা আজ কথা দিয়ে ফেলতেও পারেন,—ভাবগতিক সেই রকমই দেখাচ্চে। সেটা খারাপ কথাও নয়,—মানব জাতির ভবিষ্যৎ এরই ওপর নির্ভর করছে তো,—কম কথা নয়। [হতাশায় অমিয় কপালে হাত দিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া মুখ নীচু করিল।] রোগ গুরুতর! ঘন ঘন মূর্চ্ছার উপক্রম,—উপবাস,—[একটু স্মিতমুখে চুপ থাকিয়া] ওহে দাদাকে যদি আমি আবার বলি তবে কিছু লাভ হবার আশা আছে নাকি?

অমিয়। কিছু নয়।

জগদীশ। আর একটা উপায় আছে। ভবিষ্যৎ মানব-জাতির উন্নতি-বিধায়ক আখ্‌ড়ার ঐ ছেলেটাকে যদি কুস্তিতে হারাতে পার। কিন্তু তার বিশেষ সম্ভাবনা দেখ্‌চি না। কেবল বই পড়লে কি আর ও-সব পারা যায়। বড় জোর মুখের কথার তোড় ছোটাতে পার। তাতে তোমার মত পড়ুয়ারাই ঘাবড়ে যেতে পারে। আমাদের আখ্‌ড়ার ঐ বীরটি কি আর ওতে আঁৎকাবে,—ধরে তোমাকে ময়দা ঠেসে দেবে।

অমিয়। বিচিত্র নয়। কিন্তু সেটাই কি যোগ্যতা নির্দ্ধারণের মাপকাটি? তাই যদি হয় তবে আমার চেয়ে আমার বাড়ির চাকরটা তো ভালো পাত্র। কিন্তু আমি তো সে বলছিনে সুমিতার দারোয়ান রাখার কোনো দরকার নাই,—আপনাদের বাড়িতে এখনই যথেষ্ট আছে। নইলে—[ভাবাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল]

জগদীশ। সুমিরও যে তার বিশেষ দরকার তা নয় তো। দারোয়ানদের শুধু ঘাম হয় না,—দাড়িও থাকে। কিন্তু কি করা যায়? তোমরা দুজনে মিলে যা অন্যায় করেছ তো করেছ,—এখন অবশ্য তোমাদের সাহায্য করারই দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে তেমন কিছু দরকারও দেখতে পাচ্ছি না। দাদার প্রকৃতি খুবই ভালোরকম জানি। বুঝিয়ে সুজিয়ে যে ওর মত বদ্‌লাবো তার জো নেই। চিরকাল ঐ রকম একগুঁয়ে লোক। সত্যই মেয়েটার জন্য আমার ভাবনা ধরে গেছে। ওর সমস্ত—[সহসা দরজার দিকে কান পাতিয়া] ঐ দাদা আসছেন বোধ হয়। তোমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে আর পরামর্শ করা ঠিক নয়। [যাইতে ফিরিয়া] একটু পরে দেখা করো। অবশ্য দাদা একজন জবরদস্ত জার কাইসার গোছের লোক,—ওর নিজের খেয়ালটা সব চেয়ে ওপরে থাক্‌বে। তবু—[একটা পদধ্বনি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল,—তাড়াতাড়ি জগদীশের প্রস্থান]।

[একটা কাশির শব্দ হইল। তারপরই মন্থর গম্ভীর ভাবে প্রফেসার দত্ত প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ,—রুক্ষ স্বভাবের। টাকের তলায় যা-সামান্য কিছু চুল দেখা যায় সবই শাদা। মুখ গম্ভীর। চোখে চশমা। শাদা পাত্‌লা কাপড়ের কলারহীন একটা কোট গায়ে। পায়ে চটি।

তাহাকে দেখিয়াই অমিয় চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার জানাইল। ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিয়া প্রঃ দত্ত তার নিজের চেয়ারের দিকে আগাইয়া গেলেন। তিনি না-বসা অবধি অমিয় দাঁড়াইয়া রহিল]

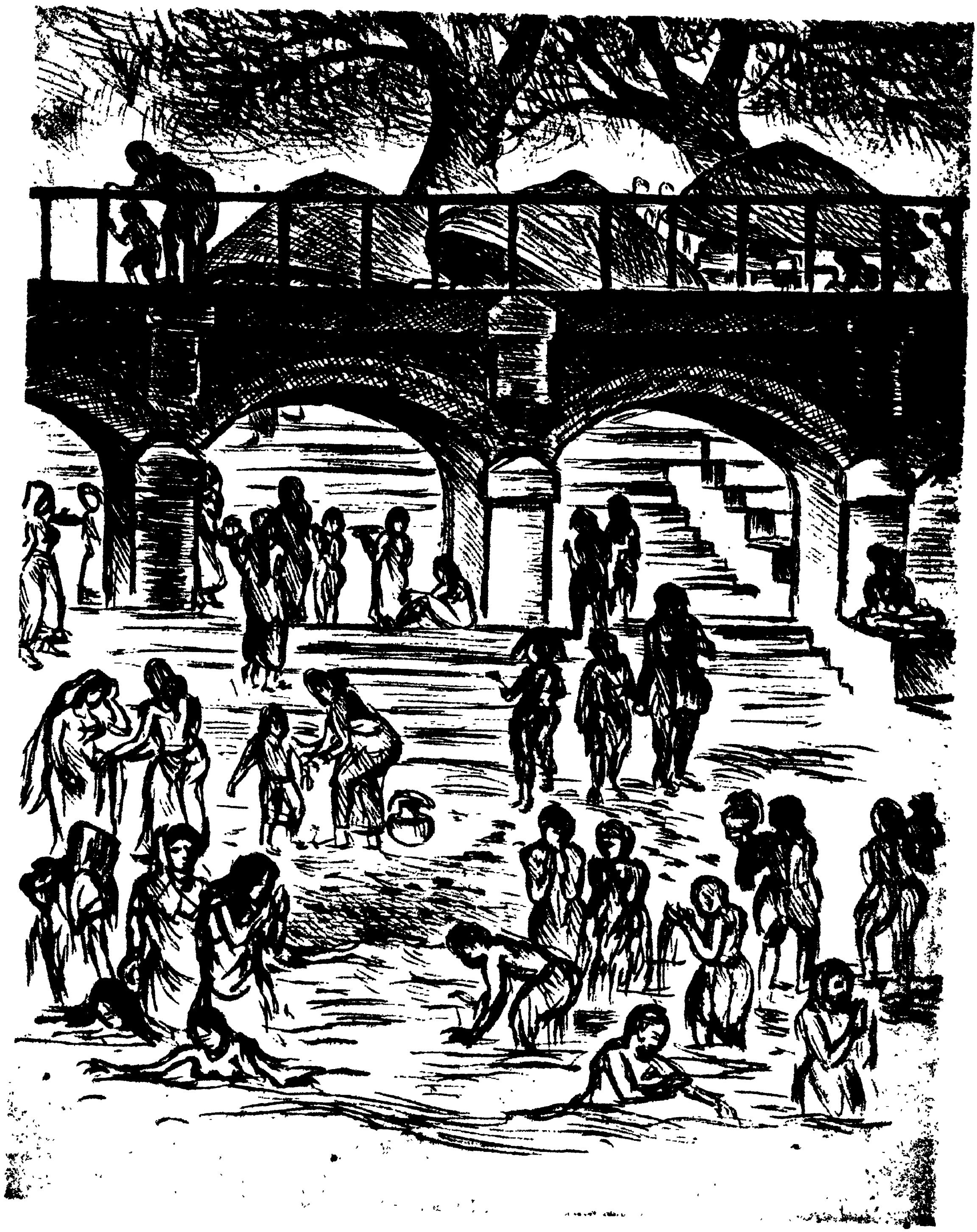
দত্ত। [বসিতে বসিতে গম্ভীরকণ্ঠে] তোমার আসতে বড় বিলম্ব হয়। নিদ্রা হ'তে একটু তাড়াতাড়ি ওঠার অভ্যাস করো। প্রাতঃকালে বিছানায় পড়ে থাকা কিছু নয়। স্বাস্থ্যটা সবার আগের কথা,—তাতে অবহেলা—

অমিয়। [বিনীত ভাবে] আজ্ঞে, আজকাল আমি ঘুম থেকে সকাল সকালই উঠে থাকি। হাত মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে—

দত্ত। [বিস্মিত হইয়া] চা? তবে এখনো চা ছাড়নি। অবাক্ করলে,—এখনো চা খাও। কতদিন ধরে তোমাকে বলছি,—ও জঘন্য অভ্যাস ছাড়,—ছেড়ে দাও। [অমিয় অপ্রতিভ] চা না বিষ,—সেঁকো বিষ। বিষ গেলাও যা চা ও তাই,—কোনো তফাৎ নেই। তবে? তবে তোমার ও কেমন আচরণ?

অমিয়। [অপরাধীর মত] আজ্ঞে আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। শীঘ্রই সম্পূর্ণ ছেড়ে দেব,—চা'র ফল বিষময় তা আমি জানি।

দত্ত। বুদ্ধিমানের মত কথা হ'লো। [একটা বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে] জগতে সব চেয়ে বড় কথা স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই তো ইহলোকে ধরে রাখচে,—নইলে মার্স নেপচুন



একটি স্নানের ঘাট—কলিকাতা

বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

না জুপিটারে কোথায় গিয়ে যে এতদিন বাসা বাঁধতে হ'তো তার ঠিক নেই। [একটুক্ষণ চুপ করিয়া পরে] পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম হওয়া উচিত শরীর-ধর্ম্ম,—কেমন তো?

অমিয়। [চমকিয়া উঠিয়া] আজ্ঞে, হ্যাঁ।

দত্ত। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, রাজনীতি বলো, এদের নিয়ে মাথাই না থাকলে কি করে আর মাথা ঘামানো চলত। তাই আমি বলি, এ শতাব্দীতে বাঙালীর আর কিছু করা উচিত নয়। চাই শুধু শরীর-চর্চ্চা। [একটু পরে] হাতে [রাগিয়া] মূর্খ নয়, কি? এসম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখে কাগজে পাঠিয়েছিলাম,—তারা কি করেছে জানো? ফিরিয়ে দিয়েছে।

অমিয়। আজ্ঞে, দেশের কাগজ পরিচালনার ভার তেমন উপযুক্ত লোকের হাতে নয়। এর একটা প্রতিকার হওয়া—

দত্ত। উচিত,—একশো বার উচিত। চারদিকে রোগা হাড়গিলের মতন লোক কিলবিল করছে,—ঘেঁটি ধ'রে পাটকাঠির মতন মট্‌কে দেওয়া যায়,—পা ধরে দেশ্‌লাই-কাঠির মত ঘোরান চলে,—জোরে হাওয়া এলে ধরে রাখা



দরজা খুলিয়া বিরাট বপুর এক জোয়ান প্রবেশ করিল।

কলেজ? উঠিয়ে দাও। ইস্কুল ভেঙে ফেল। লাইব্রেরী পোড়াও। তার বদলে কি করবে,—রাস্তার মোড়ে, গলির কোণ ও খামচিতে কুস্তির আখ্‌ড়া খোলো,—ফুটপাথের ধারে ধারে প্যারালেল্ বার পুঁতে দাও,—ফ্রী প্রাইমারী এডুকেশান দিয়ে কোন্ ছাই হবে,—তার বদলে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে মাগ্‌না ডাম্‌বেল্ আর গদা বিলিয়ে দাও,—যাতে লোকগুলি কেঁচো না থেকে সুপুষ্ট জীব হ'তে পারে। [অমিয় বিব্রত ভাবে মাথা নাড়ে। একটুক্ষণ কাজপত্র দেখার পরে] দেশের কর্ত্তৃত্বের ভার এসেছে যত মূর্খের মুস্কিল—অথচ এদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। তোরা মানুষ না ব্যাঙাচী? ব্যাঙাচী হ'স তো জলে যা,—এখানে কেন? [একটু থামিয়া] পড়াশুনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী উঠিয়ে দেওয়া উচিৎ,—যদি ডিগ্রী থাকতে হয় তবে শুধু থাকবে, ব্যাচেলার অব্ বডি, মাষ্টার অব্ বডি। [প্রায় ভেঙচাইয়া] আর্ট, সায়ান্স্,—কেওড়াতলা নিয়ে পুড়িয়ে এসো,—গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দাও।

অমিয়। [বিনীত ভাবে] কিন্তু শুধু দেহ—[সবটা বলিতে পারিল না]

দত্ত। [বাধা দিয়া] হ্যাঁ, শুধুই দেহ। তোমাদের মত কতগুলি শরীর ছাড়া পাণ্ডিত্যের কোন্ প্রয়োজনটা আছে? বিদ্যা চাই, ঢের বই পড়ে বল্‌ছে,—জ্ঞান চাই, বেদ উপনিষদ, বেদান্ত বেদাঙ্গ, গীতা,—অভাব আছে কিছু? সে-সব বইবার জন্য তোমাদের বেঁচে থাকার কোন্ ঠেকা? ন্যাপ্‌থালিন্ দিয়ে রাখলে বই পোকাতেও কাটে না। শরীরের চাইতে প্রয়োজনীয়, শরীর অপেক্ষা বেশী সত্য আছে নাকি কিছু। ঈশ্বর দিয়েছেন দেহ, বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান এসব দেবার তার ইচ্ছে ছিল না,—বাইবেলে বলে ও-সব অনধিকার-চর্চ্চা করেই লোকের এমন দশা,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাওয়া-পরার জোগাড় করতে হয়। পড়নি বাইবেল?

অমিয়। আজ্ঞে পড়েছি।

দত্ত। তবে আর কি। দেহ—সকল ঐশ্বর্য্যের সার। সকাল থেকে এসে আমার লাইব্রেরী ঘাঁটো যাতে বড় রকমের একটা উপাধি জোগাড় করতে পার,—কেন, কি তার ঠেকা। যেদিক দিয়ে বাড়ালে কাজের কথা হ'তো সেদিকে খেয়ালই নেই,—আর যা বাড়ালে মূর্খতার তৃপ্তি ছাড়া আর কোনো লাভ নাই সেদিকে মেহন্নত করে শরীরের নামে যে একটু ছায়া-বস্তু ছিল তাও মিলিয়ে দিচ্ছ। [একটু থামিয়া] দেহীর একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেহ-পুষ্টি, ইতিহাস নয়, দর্শন নয়, সাহিত্য নয়। দেহ অবহেলা করে সমস্ত বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, আর এদিকে সব হৃষ্টপুষ্ট লোকরা দিব্যি আনন্দে বন্দুক সঙ্গীন বাগিয়ে রাজ্য চালায়,—মিল্ করে, ফুটবলে তোমাদের হারিয়ে দেয়, তাদের চেহারা দেখে তোমরা জুজু বুড়ি হয়ে থাক। আমি এক কথা বুঝি,—শরীর শরীর, শরীর,—গা, দেহ, বপু, কলেবর।

অমিয়। ছুটোরই—

দত্ত। [বলিতে না দিয়া] কোনো প্রয়োজন নাই,—এ তোমাদের এক শোচনীয় মনোবৃত্তি। যতই আমি ইউজেনিক্‌স অধ্যয়ন করছি,—ততই বুঝ্‌তে পারছি আর কিছুরই প্রয়োজন নেই শুধু দেখতে হবে কি করে বাঙালীর দেহ ভালো হয়,—তার হাড় মোটা হয়,—তার বুকের ছাতি ফোলে,—তার—[একটা বইয়ের পাতার মধ্যে তার অসমাপ্ত কথা থামিয়া গেল] কি করে সমস্ত জাতির এই দশা হয়েছে জানো,—কি করে তার মৃত্যুর হিক্কা উঠেছে? [উত্তরের প্রত্যাশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া] তারা কবিতা করে, তারা উপন্যাস নামে কতগুলি যাচ্ছেতাই আজগুবি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়,—তারা চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিয়ে রাজনীতি করে,—আর যা আসল ব্যাপার তার দিকে এদের কি খেয়াল আছে! বড় জোর অন্যান্য অবান্তর কাজকর্ম্মের সঙ্গে একটু দেহ-চর্চ্চাও করে,—তবেই স্বর্গ উদ্ধার হবে যেন। [একটু চুপ থাকিয়া] কিছুদিন হ'লো আমি একটা আইনের খসড়া তৈরী করেছি,—সনৎ ঘোষ এম-এল সি কে দিয়ে কাউন্সিলে তুল্‌বো ভাবছি। তাতে কি করা হবে জানো?

অমিয়। [বই হইতে মুখ তুলিয়া] বলুন।

দত্ত। তাতে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে এখন থেকে পাঁচ বৎসর পরে যে-সব বাঙালী ছেলের বয়স কুড়ি বছর হবে তাদের বুকের মাপ ছত্রিশ ইঞ্চি হওয়া বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে পরীক্ষা করা হবে। যে-সব কুলাঙ্গারের বুক তার চাইতে কম তাদের নিয়ে দার্জ্জিলিঙ জেলে আটক রাখা হবে যতদিন পর্য্যন্ত না তাদের বুক ছত্রিশ ইঞ্চি হয়। এ প্রস্তাব ঠিক কি না?

অমিয়। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে ঐ রকম হওয়া উচিত। ঐ রকম বাধ্যতামূলক আইন না থাকাতেই আমরা যথেষ্ট রকম বুকের পরিধি বাড়াতে পারিনি। তবে সেটা কিন্তু আমাদের দোষ নয়,—[একটু ভাবিয়া] তার জন্য আমাদের শাস্তি পাওয়া উচিত নয়।

দত্ত। পাপ করলে শাস্তি পেতেই হয়, তার [অমিয় হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল] মাপ নেই। [একটু পড়িয়া তারপর চোখ উঠাইয়া] বাঙালীর এই শারীরিক অবনতি, এই দৈহিক পতন, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে পরাঙ্মুখতার ফল তো দেখতেই পাচ্ছ। খেতে পাওনা, রোগে ভুগে ইঁদুরের মত মর, মরে নরক পাও। নরক নয়ত কি? ঈশ্বর শরীরের ইচ্ছাকৃত অবনতি বুঝি ক্ষমা করেন। শরীর নেই বলে তোমাদের পরাধীনতা,—বছর বছর দুর্ভিক্ষ আর বন্যা,—



সুমিত্রা—[অমিয়র দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া] না, দেখুন, কুস্তিই করুন।

অমিয়—কুস্তি? আমি পারবো না-কি?

ঈশ্বরের ক্রোধেরই রূপান্তর। অথচ হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া জাতটার কি হুঁস আছে,—নেই। প্রবন্ধ লিখে কেউ যদি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় কাগজ-ওয়ালারা ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরত দেয়।

অমিয়। আজ্ঞে দেশের কাগজ পরিচালনার ভার তেমন উপযুক্ত লোকের হাতে নেই। এর একটা প্রতিকার হওয়া—

দত্ত। উচিত,—একশোবার উচিত। [একটু দম লইয়া] কিছুকাল হলো ভেড়া-গরু ঘোড়া এমন কি মুরগী প্রভৃতির সুজননের কথাও সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাছ-বাছাই করলে ভাল বাচ্চা উৎপাদন করা যায়,—এটা ক্রমে অনেকেই বুঝচেন। অথচ কি আশ্চর্য্য মানুষের বেলায়ও যে তার অনুরূপ ফল লাভ করা যায় এদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। মানুষের বংশোন্নতির কোনো চেষ্টাই হচ্ছেনা। মানুষ হ'লো তোমার শ্রেষ্ঠ জীব,—তার মাথা থেকেই বেরুল, অথচ তার প্রয়োগ কেবল ভেড়া আর মুরগীর উপর,—কেনরে বাপু? বাঙালীর এই সার্ব্বজনীন লোলতা, কৃশতা, এই অমানুষতার একমাত্র কারণ কি জানো?

অমিয়। [নিরীহ ভাবে] অনেকটা বুঝতে পারচি।

দত্ত। একমাত্র কারণ যাকে তাকে বিবাহ করতে দেওয়া। রোগা টিঙ্‌টিঙে চেহারা হাড় লিকলিকে দেহ, রোগা পট্‌কা দেড় হাত উঁচু—সবাই বিয়ে করতে পারে,—মানা নেই, নিষেধ নেই। তাতে যা ফল হবার তাই হয়। নিজেরই নাই দেহ,—তিনি আবার দেহ-সৃষ্টি করলেন,—ফড়িঙের বাচ্চা, পিঁপ্‌ড়ের পিরামিড্‌। [জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নীরবে তাকাইয়া থাকিয়া] নতুন একটা আইনের খসড়া তৈরী করছি, তাতে এই ব্যবস্থা হচ্ছে যে যে-সব যুবকের

ওজন দুইমণ পনেরো সেরের কম তাদের বিবাহ করা বে-আইনী। তারা যাতে বিয়ে করে উকুনের সৃষ্টি না করতে পারে। [অমিয়ের দিকে চাহিয়া] যদি বাঙালীর হিত ইচ্ছা থাকে, যদি জাতটাকে জাহান্নামের পথে এগিয়ে দিতে না চাও তবে এই তোমারও [বিস্ময়-শঙ্কিত ভাবে অমিয় চাহিল]—হ্যাঁ তোমার, কোনোকালে বিবাহ করা উচিত নয়। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর দেখেচ তো,—বাতাস এলে চাপা দিয়ে রাখতে হয়, বৃষ্টি হ'লে ঢেকে রাখতে হয়,—বিয়ে করা তোমার পক্ষে পাপ। বিবাহের যোগ্যতা কি সবারই আছে নাকি? বিবাহ একটা ছেলেখেলা নয়। তোমার মত লোকের বিবাহের দ্বারা সমাজ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা,—গুরুতর আশঙ্কা। [জিজ্ঞাসু ভাবে] দেহের ওজন কত?

অমিয়। [অপরাধীর মত] একমণ পনেরো সের।

দত্ত। বেশ, আর বলতে হবে না। [গম্ভীর সুরে] গুরু-হিসাবে তোমাকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, বিবাহ করো না, বিবাহের কথা ভেবো না, কল্পনাও করো না। মনে থাকবে তো? [অমিয় অনিচ্ছায় সামান্য ঘাড় নাড়িল] এক সময় আমার মনেও এক হাস্যকর প্রস্তাবের উদয় হ'য়েছিল। তোমারই সাথে সুমিতার বিবাহের কথা ভাবছিলাম। কে জানে হয়ত সব ঠিকঠাকও হ'য়ে যেত। [কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া] কী সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলুম বলোতো,—সর্ব্বনাশ নয়ত কি? আমি সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—আমিই যদি তোমার মত ক্ষীণ-দেহ লোকের সঙ্গে আমার ভাগ্নীর বিবাহ দিতাম, তবে সেটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ হ'তো। হয়ত শেষে আমাকে আত্মহত্যাও করতে হতো। যাক্, অবশেষে আমার সুবুদ্ধির উদয় হলো,—ভেবে দেখ্‌লাম ওরকম কল্পনা করাও অন্যায়। [বই-এর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কতক্ষণ ব্যস্ত রহিল। তারপর] অনেক খুঁজেটুজে ওর উপযুক্ত পাত্র ঠিক করেছি। চমৎকার গুণী ছেলে,—ঐ নীচের আখড়ায় কুস্তি করে। তেড়ে গেলে যেন ক্ষ্যাপা মোষ,—চার চারটা জোয়ান ধরে রাখতে পারেনা। কুস্তির সময় একবার উপুড় হয়ে পড়ুক,—চিৎ করুক দেখি কার সাধ্য। একচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি,—ঘাড়? পাথর ছুঁড়ে মারলে পাথর ভেঙ্গে যাবে। হাত না গদা। লেখাপড়া করেনি,—সেই জন্যই তো আরো ভালো বলি। লেখা-পড়া ধুয়ে কি জল খাবে। যা করলে মানুষ হওয়া যায় তা যথেষ্ট করেছে,—দেখতে যেন এক বিরাট পুরুষ, যেন—

অমিয়। কিন্তু কুলশীল?

দত্ত। খোঁজ নেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অমন বলিষ্ঠ যে-কুলের ছেলে,—তার বাপ ঠাকুরদা যে ওর চেয়ে আরো হৃষ্ট ছিল সে কথা নিঃসন্দেহ বলা যেতে পারে। মানব জাতি ক্রমশই অবনতির দিকে চলছে মান ত? সে হিসেব মনে রাখলে না জিজ্ঞেস করেও বলা যেতে পারে যে ওর পিতার বুক আরো স্ফীত ছিল, তার হাড় আরো মোটা ছিল, তার ডানা আরো পুষ্ট ছিল,—তার পা দু'টা থামের মত,—তার ঘাড় খাড়া, পিঠ শক্ত,—ব্যস্ আর কি চাই। এর চেয়ে ভালো আর কুল কোথায়? চমৎকার ছেলে পেয়েছি। ভাগ্যিস্,—তাড়াতাড়ি যা-তা ক'রে বসিনি। এখনই তার আসবার কথা,—দেখলে বুঝ্‌বে শুধু এই ধরণের ছেলেই দেশের হওয়া উচিত,—দেশের গর্ব্ব ওরা। পড়াশুনা করে' শরীর নষ্ট করেনি,—কেবল ডন্, কেবল কুস্তি, কেবল বৈঠক। বেশী তেড়িবেরি কথা বলবে,—অমনি দেবে এক-প্যাঁচ,—দরকার হলে শাঁ করে এক ঘুষি। এই রকম [দেখাইয়া] পুরু ঘাড়, এমনি—[দরজা খুলিয়া বিরাট বপুর এক জোয়ান প্রবেশ করিল। দেখিতে কুচকুচে কালো,—চোখ মিটমিটে,—নাক থ্যাবড়াইয়া যাওয়া। গলা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। চিবুকের তলা হইতেই একটা বিরাট বুক বাহির হইয়া আসিয়াছে। গায়ে শুধু একটা হাত কাটা নিমা,—জামাটা কাঁধে ফেলান। হাত ও গা দিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে] এই যে পুরুষোত্তম,—এস বাবাজী,—তোমার কথা বল্‌ছিলাম। [সে আগাইয়া আসিল] ব্যায়াম করে এলে বুঝি,—খুব ঘাম দেখতে পাচ্ছি।

পুরুষোত্তম। [পুরুষত্তম শ ষ স প্রত্যেকের স্থানেই 'ষ' উচ্চারণ করিবে। চেয়ারটা সশব্দে টানিয়া বসিতে বসিতে] ডন্ বলে ডন্,—তিনশো এগারোটা বৈঠক,—এর মধ্যে আর থামা নেই। চারশো সাতাশটা বুক-ডন্,—পুরো আধঘণ্টা প্যারালেল বার্,—রিঙ্, ডাম্বেল, ট্রাপিজিয়াম—এ আর চালাকি নয়। এ না চামড়ার বাতাস-ভরা বল নিয়ে ছেলে-

মানুষের মত ছুটোছুটি, না লাঠি নিয়ে বল্ ঠেঙান। না—[কপাল হইতে অবহেলা ভরে ঘাম ছুঁড়িয়া ফেলিল]

দত্ত। বেশ বেশ, শুনে সুখী হলাম। শরীর বানানোর মত মহৎ কর্ম্ম আর নেই,—চমৎকার করছ, সুন্দর করছ।

পুরুষোত্তম। [গর্ব্বিত ভাবে] হাব্‌লা রুদ্র বড় কুস্তি করতে এসেছিল। চাঁদের ইচ্ছা ছিল,—হারিয়ে দিয়ে নাম ফাঁটাবেন। ক্যাঁক্ করে ধরে ছিলুম ঠুসে' মাটিতে,—। নাক্ থুব্‌ড়ে দিয়েছি,—হাত মচ্‌কে দিলুম। তিনটি দিন বিছনার থেকে আর উঠ্‌তে হবে না।

দত্ত। [অমিয়কে] দেখলে অমিয়,—বলেছিলাম কিনা? পুরুষের যেমনটি হওয়া উচিত একেবারে সেই রকম। একটা রত্ন বল্‌লেই ঠিক হয়। কী রকম শরীর দেখেছ,—মাংসপেশীর বাঁধ দেখলে,—শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। আর তুমি? [অমিয় হতাশ] লজ্জা পাওয়া উচিত! [পুরুষোত্তমকে] ইনি অমিয়,—আমার ছাত্র। খুব গোটা-কতক পাশ করে এখন আমার কাছে রিসার্চ্চ করতে আসেন। অথচ সবচেয়ে যেটা বড় কথা সেদিকে কি কোনো লক্ষ্য আছে। সাধারণ বাঙ্গালী জাতের নির্ব্বুদ্ধি এরও মধ্যে সম্পূর্ণ দেখতে পাবে,—শরীর নেই, পড়াশুনা করেন,—পরীক্ষা করলে যেন মোক্ষলাভ হবে। শরীর এসে গা'তে ঠেকেছে,—এবার বিসর্গ হয়ে একদিন ফুৎকারে উড়ে যাবে।

পুরুষোত্তম। এক ল্যাঙ্‌ খেলে তিন হাত ছিট্‌কে পড়বেন,—তা আবার পড়াশুনা। কুস্তি জানেন,—যুযুৎসু শেখা হয়েছে? একবারে কটা বৈঠক দেওয়া হয়? ক'ইঞ্চি বুকের ছাতি ফোলে? পিঠে ক'মণ পর্য্যন্ত ওঠানো হয়?

অমিয়। আপনার কাছাকাছিও কি যেতে পারি,—আপনি হ'লেন গিয়ে এক প্রখ্যাত বীর। আখড়ার মাষ্টার নাকি আপনি?

পুরোষত্তম। মাষ্টার নই তো কম হ'য়ে গেলাম নাকি? কেষ্ট মাষ্টারের একপাটী দাঁত উঠিয়ে দিয়েছিলুম থ্যাবড়া মেরে,—চালাকি করতে আসে। ষষ্টিতলায় বারোয়ারীর সময় যাওয়া হয়েছে কখনো, প্রাণ মণ্ডলকে এক আঙ্গুলে থুব্‌ড়ে ফেলেছিলাম,—জগৎ ঘোষের শালা এসেছিল বক্সিং করতে, নাক নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। চণ্ডী গোয়ালা ডান হাতখানা আর নড়াতে পারে না—বলি কার হাতে পড়েছিল যে নাড়াতে পারবে। শঙ্কর বারুরীর তলপেটে—

দত্ত। [অমিয়কে] কেমন, বলেছিলুম কিনা যে সত্যি-কারের এক বীর দেখতে পাবে,—এমন ছেলে বাঙ্গালীর মধ্যে গৌরব। [উঠিয়া দাঁড়াইয়া] এসো পুরুষোত্তম, বসবার ঘরে,—তোমার সঙ্গে সে কথাটা সেরে ফেলা যাক। আর বিলম্ব নয়, দ্বিধা নয়।

পুরুষোত্তম। [উঠিয়া] হেঁ হেঁ,—তার জন্যই তো এসেছি,—সে কথা শুনতেই তো,—বিলক্ষণ,—নইলে আর ভোর না হতেই ছুটে আসব কেন?

[তাহাদের প্রস্থান]

[অমিয় হাতের সমুখের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পাগলের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বনাশের শিখরে দাঁড়ানর মতন। হতাশায় সে চুল টানিতে লাগিল। এমন সময় জগদীশের প্রবেশ]

অমিয়। [প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া] সর্ব্বনাশ হ'লো ছোট মামাবাবু,—আর উপায় নেই,—আর উপায় নেই কোনো। আমি কি করবো যে ভেবে পাচ্ছিনা,—নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে,—ছুটে গিয়ে ওর টুঁটি টিপে ধরবো নাকি। বাঁচান মামাবাবু,—বলুন আমি কি করবো,—এক্ষুনি, আর দেরী নয়।

জগদীশ। কেন হে, ব্যাপার কি। অত্যন্ত ক্ষেপে উঠেছ দেখা যায়।

অমিয়। ঐ পালোয়ানটাকে নিয়ে প্রফেসার দত্ত কথা দেবার জন্য বস্‌বার ঘরে গিয়েছেন,—আমার সর্ব্বনাশের আর দেরী নেই। [উচ্ছ্বসিত ভাবে] যদি পারেন কিছু করুন, শীগগির,—এক্ষুনি।

জগদীশ। [পরিহাসের সুরে] রিভলবার দিলে গুলি করতে পারবে? ছোরা বুকে বসিয়ে দিতে পারবে?

অমিয়। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কি আর লাভ হবে বলুন,—বকাসুর যাবে, তার বংশধরেরা তার স্থান পূর্ণ করতে আসবে। আমার পক্ষে এ-ও যা তারাও তাই।

জগদীশ। বলতুমই তো, বাপুহে, শরীরের অযত্ন করো-

না,—বই ছেড়ে খেলো টেলো,—তাতো আর শোননি। এখন আর—

অমিয়। ঘাট হয়েছে মামাবাবু,—সে অপরাধের আর তুলনা নেই। আপনি এর একটা উপায় করুন,—এক্ষুনি আমি ডেভেলেপার কিনে নিয়ে টানতে সুরু করবো। এক-মাস,—শুধু একমাস সময় দিন,—তখন দেখতে পাবেন।

জগদীশ। একটা মাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছি,—সুমি আর আমি এতক্ষণ সে বিষয়েই পরামর্শ করছিলুম। জানোই তো দাদা কি রকম কড়া মানুষ,—কথা বলে তাঁর মত বদ্‌লানো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও কাজ নয়।

অমিয়। [রুদ্ধশ্বাসে] তবে ?

জগদীশ। তোমাকে কুস্তি করতে হবে,—শুধু কুস্তি করা নয়, কুস্তি করে জিততে হবে। তবেই যদি এর কোনো বিহিত হয়।

অমিয়। [অবাক্ হইয়া তারপর] কুস্তি! আমি কুস্তি করবো ? কার সাথে ?

জগদীশ। কার সাথে আর,—ওস্‌মানের সাথে। দুর্গেশনন্দিনী পড়েছ তো ?

অমিয়। [বিস্মিত] কুস্তি করবো ঐ পালোয়ানের সাথে ? মামাবাবু আপনি বলেন কি ? ও যদি শুধু আমায় জাপটে ধরে, তবে হাড়-গোড় অচূর্ণ অবস্থায় দম নিয়ে ফিরে আসা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ওকি মানুষ নাকি ? কালনেমির প্রপৌত্র। [তারপর শঙ্কিত-ভাবে] আপনি তো জানেন না, ওযে কতলোকের হাত মচকে দিয়েছে, নাক থুবড়ে দিয়েছে, দাঁতের পাটি উঠিয়ে ফেলেছে,—তলপেটে ঘুষি চালিয়েছে তার ঠিক নেই। নিজে এতক্ষণ ধরে তার সবিস্তার কাহিনী বলছিল। ওর সঙ্গে কুস্তি করে আমার কি লাভ।

জগদীশ। সে হবে 'খন। কিন্তু কুস্তি তোমাকে করতেই হবে। নইলে তোমার উদ্ধারের আর পথ নেই। না হয় এরই মধ্যে তোমাকে একটু শিখিয়ে টিকিয়ে দিচ্ছি। চট্‌পট কিছু শিখে নাও।

অমিয়। [হতাশ হইয়া] তার চেয়ে পিস্তলই দিন একটা,—গুলিই করবো। মোষের মাথার ভিতর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ে খুলিটা—[সুমিতার প্রবেশ। আধুনিক মেয়ে,—দেখিলে ভালোই বল্‌তে হইবে। মুখের আকৃতিটা ভারী সুন্দর,—কিন্তু তাতে একটা বেদনার ছায়া লক্ষ্য করা যায়। তাকে দেখিয়া অমিয় সহসা তার সাক্রোশ কথা থামাইয়া চুপ করিল। সুমিতা আগাইয়া আসিয়াছে]

জগদীশ। [সুমিতাকে] দেখ্ তোর রাজপুত্তুর [সুমিতা জিভ বাহির করিয়া ভেঙ্‌চাইল] কি রকম খেপে গিয়েছে। কুস্তি করবে না,—একেবারে রক্ত চাই। পিস্তল ছুঁড়ে অমন যে বাঙালী জাতির আশা ভরসার স্থল ঐ ষণ্ডকুমার,—না পুরুষোত্তম,—কি ওর নাম ?—তার মাথার খুলি ফুটো করে দিতে চায়।

সুমিতা। [অমিয়র দিকে অনুরাগ দৃষ্টিতে চাহিয়া] না, দেখুন, কুস্তিই করুন।

অমিয়। কুস্তি ? আমি পারবো না কি ?

সুমিতা। আপনার কিচ্ছু ভয় নেই,—না ছোট মামা ?—তুমিই তো সব ঠিক ঠাক্ করে রাখবে।

জগদীশ। তোরা যে একেবারে থিয়েটার করছিস,—লজ্জাও করে না মাগো। এ কালের যেমন ছেলেগুলি, তেমনি মেয়েগুলি।

সুমিতা। তোমাদের কালে খুব ভালো ছিল কিনা! এতে কি লজ্জার কথা,—যার তার সঙ্গে বড় মামাবাবু আমাকে ধ'রে বিয়ে দেবেন,—অমিয়বাবু যদি বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করেন তবে বুঝি দোষ হলো।

জগদীশ। [ব্যঙ্গস্বরে] আহা, অমিয় বাবুর আর কোন উদ্দেশ্য নেই,—যত রাজ্যের বিপদগ্রস্ত মেয়েদের উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পড়াশুনা করতে ছুটছেন। [সুমিতা জিভ ভেঙ্‌চাইল। অমিয় গম্ভীর ভাবে ঘড়ির সময় দেখিতে লাগিল] শোনো ছোকরা, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ,—জগৎসিংহের কাছাকাছিও নও,—একটা কুস্তি করার সাহস পর্য্যন্ত জোগাড় করতে পারলে না। [সুমিতার দিকে কটাক্ষ করিয়া] তবে নিতান্ত আমার ভাগ্নীর ঠেকা—ভেবে চিন্তে একটা বিহিত করেছি। কুস্তি তোমাকে করতেই হবে—

অমিয়। [শঙ্কিত] আমাকে ?

জগদীশ। হ্যাঁ, তোমাকে। দাদার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে ষণ্ডকুমারের চেয়ে তুমি কম ষণ্ডা নও,—গায়ের জোরে তাকে চিৎপটাঙ্ করতে পার। [অমিয় কি বলিতে উদ্যোগ করে] আরে, ঘাবড়িও না'। যাতে তোমার পাঁজরা না ভাঙে, হাত না মটকায়, দাঁতের পাটি খসে না আসে তার একটা ব্যবস্থা করা যাবে। শুধু ভয় না পেয়ে তোমাকে কুস্তি সুরু করতে হবে।

সুমিতা। [অমিয়কে] আপনি কিছু ভয় পাবেন না,—ছোট মামা চুপে চুপে সব ঠিক করে রাখবে,—আপনাকে শুধু কুস্তির অভিনয় করতে হবে। তাতেই হ'য়ে যাবে সব। [অমিয় শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল]

জগদীশ। [সুমিতাকে] তবে তুই ঠিক থাক্ সুমি,—আমি ষণ্ডকুমারকে নিয়ে আসি। কেমন তো? দাদা স্নান করতে গেলেই হয়।

সুমিতা। মাগো, আমার লজ্জা করে।

জগদীশ। যা যা ন্যাকামী করিস না। লজ্জা যদি আরেকটু বেশী থাকতো, তবে বেঁচে যেতিস,—[অমিয়কে দেখাইয়া] এমন অপদার্থকে ইচ্ছে করে ঘাড়ে টানার দুর্ভাগ্য এড়ান যেত। [সুমিতা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল] কি, ওকে অপদার্থ বলতে রাগ হয়েছে বুঝি,—যাও না হয় রাজপুত্রই হলো। [অমিয়কে] শোনো বাপু, এই আমি ষণ্ডকুমারকে আনতে চল্লুম,—তুমি এ-ঘর থেকে এখন খসে পড়তো,—তারপর দরকার হলে ডেকে আনা যাবে। [প্রস্থান]

অমিয়। [মৃদু হাসিয়া] ছোট মামা কি বলছিল জানো—তুমি নাকি কাঁদছিলে। কাঁদছিলে নাকি?

সুমিতা। কাঁদবো? বাঃ রে, কাঁদতে যাব কেন,—আমার কাঁদবার কি হয়েছে?

অমিয়। [শঙ্কিত ভাবে] শেষে ও পালোয়ানটার সাথেই যদি তোমার বিয়ে দিয়ে দেয়?

সুমিতা। ভালই তো। চোর ডাকাত গুণ্ডার ভয় করতে হবে না,—দারোয়ান রাখার পয়সা বেঁচে যাবে। সে পয়সা দিয়ে চোকোলেট কিনব। খাবে তুমি?

অমিয়। [মৃদু দুষ্টুমির সুরে] চোকোলেটের উপর আমার লোভ নেই।

সুমিতা। তবে টফি, লজেন্স?

অমিয়। ও-সব অবান্তর। তার চেয়ে—

সুমিতা। উঃ, একটা ঘুষি মেরে তুমি যদি ওর নাকটা থেঁৎলে দিতে পারতে, তবে কি মজাই হতো। কি অসভ্য জানো,—আমার ঘরের তলায় এসে বাঁশিতে খেমটার সুর বাজায়,—জানোয়ার। তুমি কিন্তু খুব কষে কুস্তি লড়বে।

অমিয়। কী দারুণ একটা হাস্যকর ব্যাপার হবে সেটা!

সুমিতা। হোক্ গে। বয়ে গেল।

অমিয়। [ক্ষণকাল সুমিতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া ভারী কোমল গলায়] সুমি?

সুমিতা। কি?

অমিয়। কিছু নয়,—শুধু সুমি।

সুমিতা। যাঃ। [অসন্তুষ্টির অভিনয় করিয়া] নাম ধরে বড় ডাক যে! আস্পর্দ্ধা!

অমিয়। একশো বার ডাকবো,—সুমি সুমি সুমি সুমি, সু—

সুমিতা। [শঙ্কিত ভাবে] ঐরে ওরা আসছে,—শীগগির তুমি পালাও,—তাড়াতাড়ি।

[অমিয়ের প্রস্থান]

[পুরুষোত্তমকে লইয়া জগদীশের প্রবেশ]

জগদীশ। [সুমিতার দিকে আগাইয়া আসিয়া পুরুষোত্তমকে] একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ুন নরোত্তম বাবু,

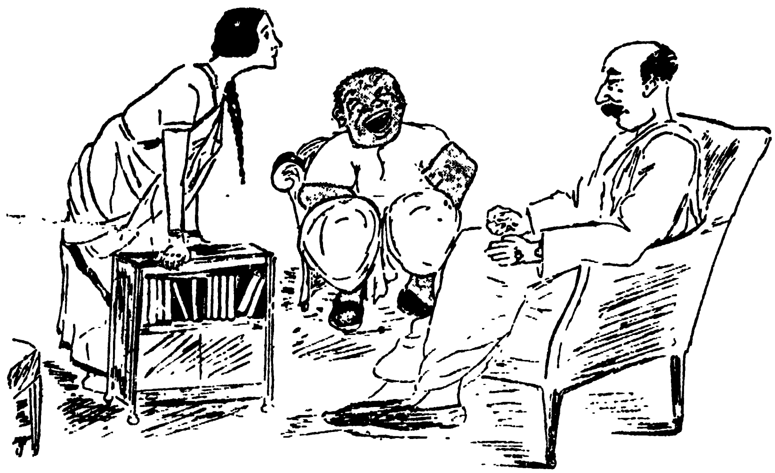
পুরুষোত্তম। [শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ। বেশ বেশ, না হয় পুরুষোত্তমই হলো। [সুমিকে দেখাইয়া] বুঝতেই তো পারছেন এ কে?

পুরুষোত্তম। বিলক্ষণ, তা আর পারছি না। হেঁ হেঁ।

জগদীশ। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রীতে জানা শোনা হয় এটা আমরা ভালো মনে করি। পরস্পরের গুণাবলী এবং ব্যবহার তাতে জানা যায়, তাছাড়া আপনার গুণ জানলে কোন্ মেয়ের না শ্রদ্ধা হয়।

পুরুষোত্তম। [সুমিতাকে] আমাকে দেখে লজ্জা পাবেন না,—সহজ-ভাবে বাক্যালাপ করুন। কেন লজ্জাটা



পুরুষোত্তম—[সুমিতাকে] তোমার ভাবনা কি। লড়্‌ব তার সঙ্গে কুস্তি। পাঁজরা ভেঙে, হাত মচকিয়ে, নাক থুবড়ে জড়ভরত ক'রে রাখ্‌তে পারি।

কিসের। দেখুনই না চেয়ে। [দেখাইয়া] এই মাস্‌লটা বাইসেপ,—অর্ডার করলে ধাই ধাই করে নাচতে সুরু করবে। আর [দেখাইয়া] এই ট্রাইসেপ,—দেখেছেন কখনো এমনটা। বাঙালীর মধ্যে এমন কটা আছে। পেট কুঁচকে সারেঙ্গী করিয়ে দেবো? পায়ের মাসল দেখতে ইচ্ছে আছে? [তাদের দিকে পিছন দিয়া দাঁড়াইয়া কাপড়টা টানিয়া হাঁটুর ওপরে উঠাইয়া] এই যে পায়ের মাসল [সুমিতা হাত দিয়া চোখ ঢাকিল] টেনে কাঁধে তুলতে পারি। [ফিরিয়া] পছন্দ হয়? ক' গণ্ডা লোকের নাক থুবড়েছি, ক ডজন—

জগদীশ। চমৎকার—চমৎকার। শুনে আপনি খুসী হবেন,—আমার ভাগ্নী সম্পূর্ণ মুগ্ধ হয়েছেন,—চমৎকৃত হয়েছেন,—তিনি আমাকে দিয়ে তার অভিনন্দন জানাচ্ছেন, আপনার মত বীর পুরুষকে। আমি নিজেও গৌরবান্বিত অনুভব করছি যে—

পুরুষোত্তম। থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। আমার আবার বিনয় বড় বেশী,—কত প্রশংসাই তো কত গণ্ডা করতে আসে—কিন্তু আপনাকে বলতে কি মাইরি সে আমি নিই না। তবে (সুমিতাকে দেখাইয়া] তবে ওনার কথা সতন্তর,—হেঁ হেঁ।

জগদীশ। তা বৈ কি। তা বৈ কি। আমার ভাগ্নী তো এরই মধ্যে আপনাকে ভক্তি করতে সুরু ক'রেছে,—শ্রদ্ধা হওয়ারই তো কথা। বললে লজ্জা পাবেন না, কাল তো [সুমিতাকে দেখাইয়া] শ্রীমতী দরজা ফাঁক করে আপনাকে দেখছিল। তাই দেখে আজ আমি কাছেই নিয়ে এলাম,—ক'দিন পরে যিনি ইষ্টদেবতা হয়ে উঠচেন তার কাছে আবার সঙ্কোচ কিসের। কেমন কিনা নরোত্তম বাবু?

পুরুষোত্তম। [শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ। বেশ বেশ, পুরুষোত্তম,—দিব্যি নামটী। আমার ভাগ্নীটি খুব প্রশংসা করছেন [সুমিতার লজ্জার অভিনয়]

পুরুষোত্তম। ওনার পছন্দ হলেই হয়।

জগদীশ। [একবার সুমিতার দিকে চাহিয়া পুরুষোত্তমকে] আজ কিন্তু ভোর থেকে উঠেই [সুমিতাকে দেখাইয়া) ওর মনটা খারাপ। রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছে জানেন। দেখেচে, ওর মা যেন স্বর্গ থেকে বলচে,—তোকে বিয়ে করবার জন্ত দুইটী ছেলে উদগ্রীব হবে,—তাদের মধ্যে যেটিকে বিয়ে করলে তোর মঙ্গল হবে তাকে চেনা কঠিন। তবে তাদের দুজনের মধ্যে যদি কুস্তি হয় তবে যেটি হেরে যাবে জানিস্ সেই তোর যোগ্যপাত্র,—তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করিস নে। সেই থেকে আমার ভাগ্নীর মন খারাপ,—নইলে আপনাকেই তো ও মনে মনে বরণ করেছিল। এখন কি উপায় করা যায় বলুন তো?

পুরুষোত্তম। বিশ্রী একটা স্বপ্ন! [ভাবিয়া] তবে উপায় আর থাকবে না কেন? পড়াশুনা ঘেন্না করেই করিনি,—নইলে বুদ্ধিতে কই এম্-এ, বি-এ আমার সঙ্গে পারে মশায়। ওনাকে বিয়ে করবার আর কার আস্পর্দ্ধা?—চেনেন নাকি সেটাকে?

জগদীশ। চিনি বৈকি,—ল্যাঙলা পটাও হাড়গিলের

মতন একটা ছোকরাকে দাদার সঙ্গে একটু আগে এখানে বসে থাকতে দেখেন নি।

পুরুষোত্তম। নিয়ে আসুন সেটাকে। [সুমিতাকে] তোমার [সুমিতা শিহরিয়া উঠিল] ভাবনা কি। লড়ব তার সঙ্গে কুস্তি। পাঁজরা ভেঙে, হাত মচকিয়ে, নাক থুবড়ে জড়ভরত করে রাখতে পারি। কিন্তু অত বোকা নই। হেরে গিয়ে ব্যাটা দাও মারবে সেটি হবে না।

সুমিতা। [উল্লসিত ভাবে] ঠিক,—ঠিক কিন্তু হেরে কোনো লাভ নেই। কেমন কিনা? [পুরুষোত্তম সম্মতির ঘাড় নাড়িল] তবে একটু এ-ঘরে আসুন দেখি। [সুমিতার দিকে আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া পুরুষোত্তম জগদীশের সঙ্গে প্রস্থান করিল।

একটু পরে সুমিতার প্রস্থান। তখন অন্য দ্বার দিয়া প্রফেসার দত্তের ও জগদীশের পুনঃ প্রবেশ]

দত্ত। [নিজের চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে] সেটা একটা পাপ হবে,—পাপই হবে তা জানো। পাপ নয়ত



দত্ত—ঠিক! এই কথা আমিও ভাবছিলাম। মুখচুম্বন অত্যন্ত জঘন্য অভ্যাস—তাতে একজনের শরীরের রোগের জীবাণু অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়।

যাবেন,—নইলে মায়ের স্বপ্নাদেশ তো আর আমি অমান্য করতে পারি না।

পুরুষোত্তম। সব ঠিক হবে,—কিছু ভয় করতে হবে না। কুস্তিতে কোনো শালা কোনোদিন হারাতে পারেনি, —কিন্তু তোমার জন্যে,—বুঝলে না।

জগদীশ। তবে বেশ তাই ঠিক রইল। এখনি কুস্তিটা আমি ঘটিয়ে দিই। ভাগ্নীটাকে আর দ্বিধার মধ্যে রেখে কি? পিঁপড়ার শাবক মানুষ হতে পারে কখনো? অমিয়র সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দেবে,—কেন আমার কি কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যৎ মানববংশের অধঃপতনে যারা সাহায্য করছে তার মধ্যে একজন সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক যাবে কোন্ আক্কেলে,—তার কি দুটো কানই কাটা নাকি। তবে? তবে আর কি। এ তোমার অত্যন্ত অসঙ্গত অন্যায় আবদার।

জগদীশ। আপনি জানেন না দাদা, দেখতে ঐ রকম রোগাপট্কা হলে কি হয়, ছোক্‌রার গায়ে কিন্তু দারুণ জোর। তিন তিনটা গুণ্ডার হাত থেকে ও একদিন একটি মেয়েকে রক্ষা করেছিল তা জানেন না বুঝি। পত্রিকাতে তখন ওর মুষ্টিবিদ্যার খুব প্রশংসা বেরিয়েছিল। তা হবে না কেন? [illegible] অভ্যাস করে। তাছাড়া গোপনে খোঁজ নিয়ে জেনেছি ছোকরা সমানে দুই ঘণ্টা রোজ ডেভেলাপার টানে। পুষ্ট শরীর ও পছন্দ করেনা বলেই না অমন রোগা দেখতে, নইলে দেখেন নি তো, কি রকম ডুমো ডুমো মাংসপেশী।

দত্ত। [অবজ্ঞার সুরে] হুঁঃ,—হাতীর কাছে ইঁদুর,—ঘোড়ার কাছে খরগোস,—আর মানুষের কাছে কি জানো,—মর্কট।

জগদীশ। এই ধারণা আপনার ভুল। আপনার ছাত্রটিকে আপনি জানেন না,—অসাধারণ শক্তি রাখে সে। ঐ যে পালোয়ানটাকে এনেছেন, দেখতেই ঢোস্‌কা,—তার জায়গায় অমিয়,—একেবারে পাকা বানানো শরীর,—অসুরের মত শক্তি রাখে। ভবিষ্যতের বাঙালী এম্‌নি হলেই ভাবনার আর কারণ থাকবে না,—মস্ত প্রকাণ্ড একটা লাশ দিয়ে স্থানাভাবের সৃষ্টি না করে ছোট্ট শরীরের মধ্যে ইঞ্জিনের শক্তি জমিয়ে রাখবে,—আর দরকার হলেই কাজে লাগাবে। প্রত্যয় না হয়, এক্ষুণি শক্তি-পরীক্ষা করে দেখুন। না জেনে একজনের ওপর অন্যায় করা ঠিক হবে না।

দত্ত। শক্তি পরীক্ষা? অমিয়কে ও কি করতে পারে জানো,—ময়দা ঠেসে দিতে পারে,—হালুয়া বানাতে পারে,—ছাতু করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারে।

জগদীশ। তবে এক্ষুনি আপনার ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দিচ্ছি। আপনার ছাত্র হলে কি হবে, অমিয়কে আপনি মোটেই চেনেন না। শক্তির গর্ব্ব করেনা বটে,—কিন্তু চুপে চুপে ও একটা ভীমসেন। আপনার সমুখেই তা প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি। [চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া] নিজেই তখন বুঝবেন সুমির যোগ্য বর কিনা। [প্রস্থান]

[দত্ত একটা বই টানিয়া তাতে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর]

দত্ত। [কি জানি পড়িয়া ভারী উল্লসিত ভাবে চোখ উঠাইয়া] ঠিক! এই কথা কিছুকাল হয় আমিও ভাবছিলাম। মুখচুম্বন অত্যন্ত জঘন্য অভ্যাস,—তাতে এই শুধু লাভ যে একজনের শরীরের রোগের জীবাণু অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়,—ব্যস্‌ এই।

[একটা তোষক বহন করিয়া জগদীশের প্রবেশ,—তার পিছনে পিছনে পুরুষোত্তম। একদিকের দরজা একটু ফাঁক হইয়া গেল,—দেখা গেল সুমিতাকে]

সুমিতা। [মৃদু-গলায় পুরুষোত্তমকে] দেখবেন আবার জিতে যাবেন না যেন,—তা হলে সর্ব্বনাশ হবে [পুরুষোত্তম আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল]

[জগদীশ তোষকটা ঘরের মধ্যখানে বিছাইয়া দিল,—তখন অন্য দুয়ার দিয়া অমিয়ের প্রবেশ]

জগদীশ। [পুরুষোত্তমকে] তবে আর দেরী কি নরোত্তমবাবু,—

পুরুষোত্তম। [শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ। বেশ বেশ, পুরুষোত্তমই হলো,—সুন্দর নামটি। বিলম্বে আর প্রয়োজন কি,—লেগে যান্‌।

পুরুষোত্তম। কিছু না, কিছু না [বুক থাপ্‌ড়াইয়া] কাম্‌ অন্‌ [অমিয় প্রায় ঘাব্‌ড়াইয়া যাইবার জোগাড়]

জগদীশ। [কাছে আসিয়া অমিয়কে প্রায় ঠেলিয়া দিয়া মৃদুস্বরে] আহা যাওনা,—কোথাকার ভীরুরে,—অমন জবুথবু কেন, বুক উঁচু করো না হে। [সাহস পাইয়া বুক উঁচু করিয়া অমিয় আগাইয়া গেল।]

জগদীশ। [হতাশার মৃদুস্বরে] আরে যা গেল, এটা কিছু জানে না যে। মালকোচাটা মারো,—কোচা ঝুলিয়ে কুস্তি হয় নাকি কোথাও? আর খালি গা হতে ভয় পাও তো অন্ততঃ পাঞ্জাবীর হাতটা গুটিয়ে নাও। [অমিয়ের তথাকরণ]

[পুরুষোত্তমের হুঙ্কার ও বুক এবং হাঁটু চাপড়ান দেখিয়া অমিয়ের তো অবস্থা শোচনীয়। তবু একটু ভয় টয় করিয়াও সে একবার চোখ বুজিয়া পুরুষোত্তমকে গিয়া জাপটাইয়া ধরিল। কতক্ষণ কুস্তি চলিল। দেখিয়া মনে হইল পুরুষোত্তম ইচ্ছা করিলে অমিয়কে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তা হইলে কি হয়। সহসা একটা আর্ত্তনাদ করিয়া

পুরুষোত্তম চিৎ হইয়া পড়িল। অমিয় তখন বিজয়ী বীরের মত তার বুকে চাপিয়া বসিল।

প্রফেসার দত্ত বিস্ময়সূচক শব্দ করিলেন।

জগদীশ। [অমিয়কে] থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে,—আর প্রয়োজন নেই।

অমিয়। [বীরের মত] না আমি এক্ষুনি ছাড়ব না,—আরো ঠুসে দেব।

জগদীশ। [অমিয়কে টানিয়া উঠাইয়া] আহাঃ কি করো। পুরুষোত্তম উঠিয়া দাঁড়াইয়া গা হইতে ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে যে-দরজার কাছে সুমিতা দাঁড়াইয়াছিল সেদিকে ফিরিয়া দন্ত-বিকাশ করিল।

পুরুষোত্তম। হেঁ হেঁ,—চলুন, কেমন ঠিকটি করেছি তো - [জগদীশ ও পুরুষোত্তমের প্রস্থান]

দত্ত। [অমিয়ের দিকে ফিরিয়া] বড়—বড় আনন্দ দিলে। আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। দেহ হচ্চে সব চেয়ে বড় কথা,—তাকে তুমি অবহেলা করোনি তাতে আমি তোমাতে যারপর নাই গর্ব্ব অনুভব করছি। [উঠিয়া] তুমি একটু অপেক্ষা কর,—আমি ঐ বিরাট্‌-দেহ অপদার্থ টাকে বিদায় করে আসছি। [প্রস্থান]

[তখন অন্য দুয়ার খুলিয়া সুমিতা প্রবেশ করিল]

অমিয়। [প্রায় থিয়েটারী সুরে] বীর,—আমি বীর,—অত্যন্ত বেশী রকম বীর সুমি,—কেমন বীর নই?



পুরুষোত্তম—বুক চাপ্‌ড়াইয়া—কম্‌ অন্—

দত্ত ইঙ্গিতে ডাকিলেন,—তারপর শোনা যায় না এমন-স্বরে তাকে কি বলিলেন।

জগদীশ। [ফিরিয়া আসিয়া পুরুষোত্তমকে] একটু বাইরে এসে শুনে যান তো নরোত্তমবাবু—

পুরুষোত্তম। [শুদ্ধ করিয়া] পুরুষোত্তম।

জগদীশ। বেশ বেশ পুরুষোত্তমই হ'লো,—চমৎকার নামটি। আসুন মশায়,—একটু তাড়াতাড়ি আছে। বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন না।

সুমিতা। উঃ কুস্তির আগে কী যে কাঁপ্‌ছিলে—দেখে হাসিতে আমার নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসবার জোগাড়।

অমিয়। [হাসিয়া] কিন্তু কি রকম হারিয়ে দিলুম সেটা দেখতে হবে তো।

সুমিতা। হুঁ তা বৈকি।

অমিয়। এইবার?

সুমিতা। [উদাসীন্য অভিনয় করিয়া] এইবার আর

কি, তুমি বই ঘাঁট্‌বে,—আর আমি লেস্ বুনবো। আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টাটি করো না কিন্তু।

অমিয়। ঈস্,—তাই না আরো কিছু।

সুমিতা। [দুষ্টুমি করিয়া] ছোটমামা তোমাকে কি বলেছে মনে আছে তো,—অপদার্থ।

অমিয়। কিন্তু শেষে শুদ্ধ করে কি বল্‌লে,—রাজ—

সুমিতা। যাঃ।

অমিয়। সুমি?

সুমিতা। কি?

অমিয়। কিছু নয়, শুধু সুমি।

সুমিতা। ভারী আস্পর্দ্ধা বেড়েছে,—বড় নাম ধরে ডাক যে।

অমিয়। একশোবার ডাকব,—

সুমি সুমি সুমি সু—[সুমিতা মুখ ভেঙ্‌চাইয়া দৌড়াইয়া পালাইল। অমিয় দরজা পর্য্যন্ত তাকে অনুসরণ করিল,—সুমিতা তখন ঘরের বাহির হইয়া গেছে।]

অমিয়। [দরজার কাছে দাঁড়াইয়া] সুমি, লক্ষীটি শোনো—শুনে যাও—

[বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। অমিয় তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চুলটা ঠিক করিয়া, রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া দরজার আরো কাছে আগাইয়া গেল।]

অমিয়। [সহাস্য মুখে] সুমি।

[গোঁপ পাকাইতে পাকাইতে অধ্যাপক দত্ত প্রবেশ করিলেন। অমিয় নিরুৎসাহ]

দত্ত। [নিজের চেয়ারের দিকে আগাইয়া গিয়া] নাও,—এসো, পড়াশোনায় বড় অবহেলা করা হচ্চে।

[অনিচ্ছা পরিস্ফুট গতিতে হাঁটিয়া আসিয়া অমিয় চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া পড়িল। ভিতরে একটা এস্রাজের সুর।]

যবনিকা

সুবোধ বসু।



মানসী

"অনিকেত"

এসেছিল তরুণ-রূপসী,
জ্যোৎস্নাময়ী, জ্যোৎস্নারাশি মাঝে,
প্রাণভরা আবেগে উছসি'
চেয়েছিল আঁখি-ভরা লাজে।

আননে নীরব বিহ্বলতা,
বিকশিত কুসুম-বরণে,
খুঁজি বনসৌরভ-বারতা
লুটেছিল ভ্রমর চরণে।

"ওগো মোর হৃদয়ের রাণী,
এসেছ কি আজি ধরা দিতে?
এনেছ আশার মধুবাণী
ওই দুটি সুরম আঁখিতে?

"তোমারে বেসেছি আমি ভালো।
এ জীবনে হাসি অশ্রু সনে,
এ জীবন করিবে না আলো
ওগো মোর, অসীম মিলনে?"

জ্যোৎস্নাময়ী তরুণ-রূপসী
কহিল সে জ্যোৎস্নারাশি মাঝে,
প্রাণভরা আবেগে উছসি'
চেয়ে চেয়ে আঁখিভরা লাজে:—

"আমি ওগো সাগরের ঢেউ,
খেলা করি সাগরের কোলে,
তারে যদি তুলে নেয় কেউ
সে কি আর নাচিবে হিল্লোলে?

"ভালবাসা,—নহে সে মিলনে,
মিলনেতে শুধু ব্যথা পাবে,
বনফুল ফোটে সঙ্গোপনে,
ধর তারে, সব ঝরে যাবে।

"দিনান্তের অস্তরাগ শেষে
জ্যোৎস্না আসে রজত-ধবল,
একে যদি অপরেতে মেশে,
উভয়েই হইবে নিষ্ফল!

"তুমি নদী, আমি বন-বীথি!
যেয়ো তুমি জলোচ্ছ্বাসে ভরি'
আমি তুলি কিশলয় গীতি,
ঢেলে দিব কুসুম মঞ্জরী।

"মিলনেতে নাহি মধুরতা,
মিলনেতে নাহি জাগে প্রাণ,
ব্যথাভরা মিলন বারতা,
ক্লান্তিভরা মিলনের গান।"

"ওগো তুমি কানন-রূপসী,
কোথা যাও? মম হৃদি-নীরে
তব হাসি উঠিছে ঝলসি',
ডাকে বান তোমারেই ঘিরে।"

"বিচ্ছেদেই মিলন গভীর,
মিলনেতে শুধু ছাড়াছাড়ি,
ভালোবাসা বিরহে নিবিড়,
মিলনে মলিন ছায়া তারি।"

জ্যোৎস্নাময়ী তরুণ-রূপসী,
চলে গেল জ্যোৎস্না রাশি মাঝে,
প্রাণ ভরা আবেগে উছসি'
চেয়ে চেয়ে আঁখিভরা লাজে!

বিতর্কিকা

১। প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দ

শ্রীবিভাস নাগ

রবীন্দ্রনাথ যে ছন্দকে প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক বলে মনে করেন প্রবোধ বাবু তাকে বলেন চতুর্ম্মরবৃত্ত ছন্দ। স্বর বা সিলেব্‌ল্ গণনার পদ্ধতি, বাংলা ভাষায় আদিযুগে—অর্থাৎ যখন ছড়া পাঁচালী তৈরী হয়েছিল, তখন প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। একটা রেগুলার টাইমিং-এর ভেতর কথাগুলোকে ফেলে ছন্দ তৈরী করবারই সম্ভাবনা বেশী। কাজেই মাত্রার কথাটাই আদি কবিদের একমাত্র ভাববার ছিল বলে যদি আমরা ধরে নি, তাতে বোধ হয় ভুল করা হবে না। প্রাচীন ছড়া পাঁচালী থেকে আমি এমন কতকগুলো উদাহরণ দোব, যা দেখে মনে হবে, ছমাত্রায় পর্ব্বগুলি ভাগ করে, আবৃত্তির সুবিধের জন্যই হোক বা ছন্দে ঢেউ তুলবার জন্যই হোক, প্রতি পর্ব্বে হয় দুই, তিন বা এক মাত্রার ফাঁক রাখা হয়েছে কিম্বা একমাত্রা বেশি দেওয়া হয়েছে। তাতে এক ক্ষেত্রে কথাগুলো টেনে পড়্‌তে হয় আর এক ক্ষেত্রে 'থাপিয়ে' পড়্‌তে হয় এবং এতে করেই ছন্দের ঢেউ উৎপন্ন হয়।

১। উচিত বলিতে | পাড়ে—গালি—।
পোয়ে—ঝিয়ে | হয়—বেআলি ॥
—ডাকের বচন।

২। তোর—মাইয়া | পাইয়াছে— — | গোরকনাথের | বর।
নাগাইল— — | পাইলে ময়না | না করে কু— — | সল ॥
—মানিকচাঁদের গান।

×   ×
৩। হাড়ির থাইছেন | গুয়া—মা- - | হাড়ির থাইছেন পান।
ভাব—করি— | শিখিয়া নিছ— | ঐ হাড়ির গি | য়ান ॥
—ময়নামতীর গান।

×
৪। কোন হ বেনে— | দারচিনি দিতে | দরমুজ বাহির | করে।
×
কোন হ বেনে— | কাহনের বস্তু | বেচে সিকার | দরে ॥
—ঠাকুরদাদার ঝুলি।

৫। আগে—ছিল— | শঙ্খ মাণিক | সমুদ্রের— | ধার।
গালি—মন্দ | খাইয়া সে— — | গেল জলের সে | পার ॥
—শঙ্খমালার গল্প।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলি থেকে এ যুক্তি আমরা অনায়াসেই বের করে নিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ আদি বাংলার এ মাত্রিক ছন্দটি গ্রহণ করে তাকে সংস্কার করেছেন দু'রকমে। একটা রূপ নিয়েছে সাধু ষাণ্মাত্রিক ছন্দ আর একটা প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দ। প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দ রবীন্দ্রনাথ কিরূপ সংস্কার করেছেন তা আলোচনা করা যাক।

মূল প্রাকৃত ছন্দে যেমন ছিল কোন কোন পর্ব্বে তিন মাত্রার ফাঁক, তিনি তা' বর্জ্জন করেছেন; সুরটা বেশি টানতে হয় বলেই বর্জ্জন করেছেন। দুমাত্রার ফাঁক পর্য্যন্ত ফাঁকের সীমা নির্দ্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু যে পর্ব্বে তিনি দু'মাত্রার ফাঁক দিয়েছেন সেখানে অক্ষর-বিন্যাস সম্বন্ধে তিনি একটা নিয়ম পালন করেছেন; সে পর্ব্বগুলি সংযুক্ত অক্ষর বর্জ্জিত স্বরান্ত চার অক্ষরের পর্ব্ব হয়েছে, তাতে এই একটা সুবিধে হয়েছে যে দুই মাত্রা টেনে পূরণ করতে কোন বেগ পেতে হচ্ছে না। যেমন—

খোকা মাকে | শুধায় ডেকে—

আক্ষরিক ছমাত্রার বেশি তাঁর কাব্য সাহিত্যে সাধারণতঃ খুঁজে পাওয়া যায় না। সাতমাত্রা কোথাও কোথাও দেখা যায় বটে কিন্তু সে নিতান্তই অল্প। সেই সাত মাত্রার পর্ব্বগুলি ছ'মাত্রা করে পড়তে হয় বলে কানে একটু বেথাপ্পা শোনায়, কাজেই রবীন্দ্রনাথ এ সমস্ত পর্ব্ব যথাসাধ্য বর্জ্জন করে চলেছেন। এই প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দের মূল

তত্ত্বটি হল অসমমাত্রার পর্ব্ব বিধান। সাধু ষাণ্মাত্রিক ছন্দের সঙ্গে এটুকুই তার মূল ব্যবধান।

সাধু এবং প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দে যদি মূলগত বিরোধই থাকবে—অর্থাৎ একটা যদি ষাণ্মাত্রিক এবং অপরটা যদি চতুর্স্বরবৃত্ত ছন্দই হবে তবে এমন একটি ছন্দ তৈরী করা কি করে সম্ভব হয়, যাকে বলা যেতে পারে ষাণ্মাত্রিক ছন্দও এবং স্বরবৃত্ত ছন্দও এবং তার পর্ব্বের যুগ্মধ্বনি কমিয়ে আন্‌লে তা কি করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মতই মসৃণ ধ্বনি-বিশিষ্ট হয়? উদাহরণে কথাটা পরিস্কার হবে। যেমন—

ভুতের মতন বদন যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোর।
যাহাই হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর॥

এর প্রতি পর্ব্বে চার মাত্রা করে থাকলেও একে সাধু ষাণ্মাত্রিক ছন্দ বলা যায়। সে সম্বন্ধে বোধ হয় প্রবোধবাবু একমত হবেন।

আবার পর্ব্বে অসমমাত্রা দিয়ে—

ভুতের মত বদনখানি বোকা অতি ঘোর।
হারায় যাহা গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর॥

একে আমরা বল্‌ব প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক কিন্তু প্রবোধবাবু বলবেন স্বরবৃত্ত। কিন্তু—

ঘন কালো চেহারাটি বোকা অতি ঘোর।
হারাইলে কিছু, সবে বলে সে-ই চোর॥

এ ছন্দে প্রতি পর্ব্বে সমান স্বর আছে, প্রবোধবাবু কি একে স্বরবৃত্ত বল্‌বেন? নিশ্চয়ই না। এ হ'ল মাত্রিক পয়ার। এ তিনটি উদাহরণে মাত্রার কথাটা আমাদের সমানই আছে,—আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি করে পর্ব্বের মাত্রা লোপ পেয়ে এবং যুগ্মধ্বনির ব্যতিক্রমে মাত্রাবৃত্তেরই বিভিন্ন জাতিতে এ ছন্দটি রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে! কাজেই স্বরের উপদ্রব ত এখানে না আনলেও চলে!

তারপর, প্রাকৃত ষাণ্মাত্রিক ছন্দের প্রতি পর্ব্বে প্রবোধবাবু চার স্বর করে বিধান দিচ্ছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সকল কবির রচনা থেকেই দেখান যায়, ও সকল কবিতার এমন পর্ব্বও আছে যেখানে পাঁচ স্বর ব্যবহৃত হয়েছে:

১। পায়ে পায়ে বাজিয়োনাকো মল…
—রবীন্দ্রনাথ।

২। দাঁড়িয়ে তুমি থেকো একটি কোণে
—রবীন্দ্রনাথ।

৩। আজকে আমি লুকিয়েছি মা পুঁথিপত্তর যত…
—রবীন্দ্রনাথ।

৪। ফুলে সাজিয়েছ মোর মধুরাতের ফুলদানী
—করুণানিধান।

৫। লাজুক তারা তাই কি সবে পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক?
—কান্তি ঘোষ।

ঢেঁরা চিহ্নিত পর্ব্বগুলির পাঁচ স্বরকে নিয়ম করে চার স্বরের মর্য্যাদা প্রবোধবাবু দিয়েছেন সত্যি কিন্তু এদের উচ্চারণে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাতে মাত্রাবৃত্তের মন্থরতাই বেশি লক্ষিত হয়।

প্রবোধবাবুকথিত স্বরবৃত্ত ছন্দের চটুলতার গৌণ কারণ হচ্ছে এ ছন্দে এমন সব শব্দ অধিক ব্যবহৃত হয়, যাদের আদিতেই হচ্ছে যুগ্মধ্বনি। কাজেই সাধু মাত্রাবৃত্ত ছন্দ থেকে এর পার্থক্যটা এত বেশি করে কানে বাজে।

কবি আর বৈয়াকরণে এ ছন্দ নিয়ে লড়াই চলবার উপক্রম হয়েছে। আমাদের মনে হয় দু'জনার কথার ভেতরই সত্য আছে। প্রাকৃত ছন্দটির সংস্কার করে কবি তাকে যে অবস্থায় এনে ফেলেছেন তাতে সে স্বরবৃত্তের নূতন আকার ধারণ করেছে বলে কল্পনা করে নেওয়া যায়। কিন্তু সে পরিবর্ত্তনটা কবির অজ্ঞাতেই হয়েছে কাজেই কবির পক্ষে এ জিনিষটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। মাত্রাবৃত্তের ধারণাতেই ত তিনি রচনা করে চল্‌ছেন!

২। "তুই তুমি ও আপনি"

শ্রীবিনায়ক সান্ন্যাল

তুই, তুমি ও আপনি এই তিনটি সম্বোধনের মধ্যে সবগুলি অথবা কেবল একটিই প্রচলিত থাকা উচিত সে সম্বন্ধে গত শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রায়' সম্পাদক মহাশয় যে হাস্যরস সিক্ত, মনোজ্ঞ আলোচনাটি ক'রেছেন তা' পড়ে' বাস্তবিকই আনন্দিত হ'লাম। প্রবন্ধটির ভিতরকার যুক্তিটি যেমন দৃঢ়, দৃষ্টান্তগুলিও তেমনি সুনির্ব্বাচিত ও মনোরম; তবুও কয়েকটি কারণে আমি তিনটি সম্বোধনই রাখার পক্ষপাতী। কেন সেই কথাই ব'লব।

আজকাল অনেকেই, অবশ্য আত্মীয় গোষ্ঠীর বাহিরে,—'তুই' বা 'তুমি' সম্বোধনে সম্বোধিত হ'লে সেটাকে অগৌরবের বিষয় মনে করেন। সকলেই নিজেদের অভিজাত প্রতিপন্ন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টিত; তাই "আপনি" ছাড়া অন্য কোন সম্বোধনই তাঁদের মনঃপূত হয় না। ভাল জামাকাপড় পরে'ও যদি সেই তুমির অধস্তরেই নাম্‌তে হয়, "আপনি"র উচ্চ মঞ্চে চড়্‌বার অধিকার না জন্মে তবে এত পয়সা খরচের কোন অর্থই থাকে না। বস্তুতঃ মানুষে মানুষে পার্থক্য আছেই এবং সে বোধও আমাদের আছে বিলক্ষণ, তাই আমরা চাই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে যোগ্যকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে। এর মধ্যে অন্যায় অথবা অস্বাভাবিক কিছুই নেই, মানাস্পদকে অসম্মান এর উদ্দেশ্য নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত। অথচ সময় সময় ভ্রান্তির প্রহসনও যে অভিনীত না হয় তা নয়,—কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত সুতরাং ক্ষমার্হ এবং তাতে একপক্ষের লজ্জিত ও অন্যপক্ষের আহত হবার কিছুই নেই। যিনি বাস্তবিক অভিজাত অথবা শিক্ষিত তাঁর চোখে মুখে, অবয়বের প্রত্যেক ভঙ্গিটির মধ্যে শিক্ষা এবং আভিজাত্যের ছাপ একটা থাকেই। হাল আমলের শিক্ষা পেয়ে আমরা সেই দৃষ্টি হারিয়ে ব'সেছি—কোঁচার বহরই এখন গুণ নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। তাই এই সম্বোধন তিনটির অপপ্রয়োগ যে না হচ্ছে তা নয়। কিন্তু কোন বস্তুর অপপ্রয়োগ হ'চ্ছে ব'লেই যে তা অবাঞ্ছনীয় এমন কথা কোন যুক্তিতে আসে না।

এমন লোক সংসারে বিরল নয় যে উপস্থিত ব্যক্তির সামনে আপনি-তুমির গোলে প'ড়ে রীতিমত ঘোল খায় এবং শেষটা কর্ম্মবাচ্যের আশ্রয় নিয়ে হাঁপ ছাড়ে। "এটা করা হ'ক," "তাকে ডাকা হ'ক" ইত্যাদি প্রয়োগ এই শ্রেণীর লোকের মুখে অহরহই শোনা যায়। এবং তাতে ক'রে সম্বোধিত ব্যক্তির 'তাতের' মাত্রা একটুও কমে না। এমন ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে উক্ত সর্ব্বনাম তিনটির যে কোন একটা প্রচলিত থাকলে তো এই গোলযোগের দায় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—প্রাণ খুলে 'তুমি' বা 'আপনি' ব'লে বাঁচা যায়। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে সেই ভাষা তত সমৃদ্ধ যার মধ্য দিয়ে ভাবের অতি সূক্ষ্ম তারতম্যগুলিও অনায়াসে প্রকাশ করা যেতে পারে। ইংরাজি ভাষা বাঙ্‌লার চেয়ে অনেকগুণে অধিক সম্পন্ন হ'লেও এই সম্বোধন-ব্যাপারে যে তার দুর্ব্বলতা আছে তা' অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন স্তরের লোককে যখন এক "You" ব'লেই সম্বোধন করা যায় তখন সেই সম্বোধনের মধ্যে ভাবের পূর্ণপ্রকাশের অভাব যেটুকু থেকে যায় তাকে কণ্ঠস্বরের অথবা হাবভাবের সাহায্যে পূরণ ক'রে নিতে হয়। "You brute" ব'লে যখন কারো সম্বর্দ্ধনা করা হয় তখন কণ্ঠস্বর এবং ভাবভঙ্গীর মধ্যে অনেকখানি ঝাঁঝ আপনিই এসে যায়। সেইজন্যে গভীর ভক্তিসূচক সম্বোধনের সময় অনেকস্থলে 'You' এর পরিবর্ত্তে 'Ye'র আশ্রয় নিতে হয়, যথা:—"Ye angels of heaven" প্রভৃতি। এখনো তাচ্ছীল্য অথবা গভীরতম শ্রদ্ধা সূচিত ক'রতে ইংরাজিতে "Thou Thee" প্রভৃতির সাহায্য আবশ্যক হয়;—"Thou art o God" এই পংক্তিটি তো ছাত্র মাত্রেরই সুপরিচিত। আধুনিক ইংরাজিতে অবশ্য এই সম্বোধনবৈচিত্র্য ক্রমেই অদৃশ্য হ'য়ে আস্‌ছে এবং এক 'You' এতে গিয়েই সব পর্য্যবসিত হ'চ্ছে। সংস্কৃত 'ত্বম্', যার থেকে বাঙ্‌লা তুমি এসেছে, সেটা কোনকালেই খুব সম্ভ্রমসূচক ব'লে পরিচিত ছিল না। সম্ভ্রম প্রকাশের স্থলে সংস্কৃতে 'ভবৎ' অথবা 'আত্মন্' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত

ছিল। এই আত্মন্ শব্দের প্রাকৃতরূপ অপ্পণ্ থেকেই বাঙ্লার "আপনি"। যুগ যুগ ধ'রে সংস্কৃতে এবং নানা প্রাকৃতশৈলীতে যেখানে এই প্রয়োগ-বৈচিত্র্য চ'লে আস্ছে তখন বিশেষ বিচার না ক'রে এদের আশু অপনয়নের পক্ষপাতী আমি নই। বহুযুগের ব্যবহারের ফলে "আপনি" এই শব্দের মধ্যে যে সম্ভ্রমের সংযোগ আপনি এসে গিয়েছে 'তুমি' দিয়ে তাকে অব্যাহত রাখা আমার মনে হয় একপ্রকার অসম্ভব। French-এর দোহাই দিয়ে বৈচিত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা Inferiority Complex এর দৃষ্টান্ত হ'তে পারে কিন্তু ইংরেজীর অনুকরণে মধ্যমপুরুষের সব সম্বোধন তুলে দিয়ে একটিমাত্র রাখার চেষ্টাও এই Inferiority Complex-এরই আর এক খেলা; অথচ সংস্কৃত-প্রাকৃতের নজীর দেখালে সেটা তা নাও হ'তে পারে। তখন কথা উঠ্বে সংস্কারের;—অন্ধ সংস্কার আমাদের এমন পেয়ে ব'সেছে যে তার মোহ আজও আমরা কাটাতে পার্ছি না। কিন্তু নামরূপের জন্মই তো সংস্কার থেকে; এটা এ থেকে পৃথক্, এটা যা ওটা তা নয়; অতএব এটা গাছ, ওটা গোরু। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত প্রভেদবোধ থেকেই তো নাম-রূপের উৎপত্তি, সুতরাং নামকরণের ক্ষেত্রে এই সংস্কারই আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক।

মা'র সহিত সন্তানের যে নিত্য-নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক তাতে তুমিই বোধ করি তাঁর উপযুক্ত সম্বোধন, কিন্তু যেখানে ভালবাসার সঙ্গে ভয়ের ভাব মিশ্রিত থাকে সেখানে আমরা প্রায়ই 'আপনি' বলি;—তেমন পিতাকে। সর্ব্বত্র একই 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহৃত হ'লে বাড়ীতে এসে গৃহিণীকে ব'লতে হয়, "ওগো, শুন্চেন, আমার ভাত বাড়ুন" বা ঐ জাতীয় আর কিছু। এতে ক'রে কাজের অসুবিধা হয়তো বিশেষ হয় না, কারণ ভাতও বাড়া হয়, দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তিও নিশ্চয়ই হয়; কিন্তু অত্যন্ত উৎকটভাবে রসাভাস দোষ এসে পড়ে। ছোটবেলার সঙ্গীদের আমরা অনায়াসে তুই সম্বোধন করি কিন্তু প্রেয়সীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তার চেয়ে আরো মধুর হ'লেও সুদূর কল্পনাতেও আমরা তাঁদের সম্বন্ধে তুই সম্বোধনের কথা ভাব্তে পারিনা। এর কারণ সুদূরকালের ভাব সংযোগ। "তুই" ব'লে সোহাগ জানালে প্রেয়সীদের শ্রীমুখ অনেক সময়েই রাঙা হ'য়ে ওঠে, সাধ্বসে বা সরমে নয়, রীতিমত গরমে। তারপর তুমি সম্বন্ধে;—'তনয়ে তারুণ, তারিণি' সত্যিই অচল। কারণ এখানে মার সঙ্গে পুত্রের যে চির-মধুর সম্বন্ধ তারিণীর সঙ্গে সেই সম্পর্কই পাতান হ'য়েছে—বিশ্বজননীকে লৌকিক জননীরূপে কল্পনা করা হ'য়েছে। গুরু-বা-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমরা অভিনন্দন পত্রাদিতে অনেক সময় তুমি ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকি সত্য, কিন্তু লেখায় যেটা সহজ, বলায় সেটা তত সহজ নাও হ'তে পারে, আর লেখাতেও যে সম্ভব হয় তার একমাত্র কারণ গুরু-বা-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেখানে রসের লীলা-লোকে দেবরূপে অভিব্যক্ত হন। যে গুরু বা নেতা অভিনন্দনে "তুমি" সম্বোধনে প্রীত হন্, মুখের সাম্‌নে তাঁকে অনর্গল 'তুমি, তুমি' ব'লে গেলে তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয় তাকে প্রীতি কিছুতেই বলা চলে না।

তাছাড়া আরও একটা গুরুতর প্রশ্ন এসে পড়ে—প্রথম পুরুষ বা Third person নিয়ে। যাঁদের মধ্যম পুরুষে সম্বোধন করা যায় প্রথম পুরুষেও তাঁদের কিরূপ সম্বোধন করা হবে সেই প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে সহজেই এসে পড়ে। তখনও "ব'ল্‌লে," অথবা "ব'ল্‌লেন" এর কোন্‌টা ব্যবহার করা হবে? রবীন্দ্রনাথ ব'ল্‌লে, কিম্বা নেতা ধোপা ব'ল্‌লেন এর কোনটাই সুষ্ঠু প্রয়োগ ব'লে মনে হয় না, অথচ ইংরাজিতে এখানেও এক "Said" দিয়ে কাজ চ'লে যায়। তারপর ইংরাজিতে যে He, She, It, লিঙ্গভেদে এই তিনটি সর্ব্বনাম Third person এ প্রচলিত আছে সেটা ঐ ভাষার গৌরব। বাঙ্লাতে কিন্তু স্ত্রী পুরুষ দুইই বোঝাতে 'সে' অথবা সম্মানসূচক (honorific) তিনি ছাড়া আর কোন সর্ব্বনাম প্রযুক্ত হয় না। ফলকথা, অন্য কোন ভাষার ছাঁচে নিজের ভাষাকে গড়্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র এবং তার মধ্যে হীনতাও যথেষ্ট আছে। প্রত্যেক ভাষারই একটা genius বা নিজস্ব প্রাণ আছে, অন্য কোন ভাষার খাতেই তাকে বহান চলে না—যে নাম-রূপ যুগ-যুগ-সঞ্চিত সংস্কার ও ভাবসংযোগের ফলে গ'ড়ে উঠেছে তাকে বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত পরিবর্ত্তনের প্রয়াসও অনুচিত ও অযৌক্তিক। যাদের আমরা তুমি ব'লে ডাকি তাদের

সম্বন্ধেও প্রথম পুরুষে কিছু উল্লেখ ক'রতে হ'লে অনেক ক্ষেত্রে "তিনি ব'ললেন" এইরূপ বলাই রীতিসম্মত, সুতরাং মধ্যম পুরুষে কিছু অদল-বদল ক'রতে গেলে উক্ত প্রথম পুরুষের কথাও সহজেই বিচারের আমলে এসে যায় এবং সেদিকে দৃষ্টি রাখাও বিশেষ আবশ্যক।

২ক। তুই, তুমি, আপনি

(পত্রাংশ)

শ্রীহরিশচন্দ্র বসু

শ্রাবণের বিচিত্রায় আপনার তুমি, আপনি ও তুই বিষয়ক প্রবন্ধটি পড়ে আনন্দিত হয়েছি এবং আপনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন তাহা ঠিক। তুই ও আপনি এদুটি শব্দ বাদ্ দিলেও বোধ হয় বাঙ্গলা ভাষা স্বচ্ছন্দে চল্‌তে পারে, অবশ্য প্রথম প্রথম বেশ একটু অসুবিধা হবে; কিন্তু পরে সেটা সহ্য হয়ে যাবে। "আপনি, তুই ও তুমি" এ তিনটি শব্দ মাঝে মাঝে যা বিপদে ফেলে, তার দু-একটি উদাহরণ আপনি দেখিয়েছেন। কিন্তু যদি এই তিনটির একটি মাত্র প্রচলন হয় তা হলে ও-রকম অপদস্ত হতে হয় না। "তুমি"র মধুরত্ব আপনি ও তুই অপেক্ষা বেশী বলে, "তুমি" ব্যবহার করাই আমি ভাল মনে করি। তিনটির মাত্র একটি ব্যবহার করেই যদি পারা যায়, তাহলে শুধু শুধু শব্দ বাড়িয়ে লাভ কি?

আপনি ও তুই বলে কোন শব্দ বম্বে প্রদেশে ব্যবহার হয় না। মারাঠী ও গুজ্‌রাটী ভাষায়, একমাত্র তুমি শব্দেরই ব্যবহার আছে; তুই ও আপনি কখন শুনি নাই এবং দুটি ভাষাই শুন্‌তে ভাল। যতদূর আমার মনে হয় বাঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর এবং অধিকাংশ দক্ষিণ দেশে, "তুমি" প্রচলন অধিক ও ভারতের অধিকাংশ জায়গাতেও তাই।

২খ। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীসুশীলচন্দ্র দেব

"তুই, তুমি ও আপনি"র ব্যবহার নিয়ে আপনি সম্প্রতি যে বিতর্ক তুলেছেন তা খুব সময়োপযোগী হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি 'আপনি'র পরিবর্ত্তে সম্বোধনের প্রতিশব্দ হিসাবে 'তুমি' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতি। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

এ-কথা অস্বীকার করিনা যে কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করার সময় 'তুই, তুমি ও আপনি' এই তিন শব্দের কোন্‌টি ব্যবহার করা উচিত তা নিয়ে বিপদে পড়তে হয়। অসঙ্গত শব্দ নির্ব্বাচনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হয় ও অপরকে করতে হয় তাও ঠিক, কিন্তু এই কারণে একটা শব্দকে বাংলা ভাষার ব্যবহারিক শব্দের পংক্তি থেকে চিরকালের জন্য জাতিচ্যুত করে রাখতে হবে—এটা বোধ হয় ঠিক হবে না। আপনি 'তুমি' ব্যবহারের পক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তা সব স্বীকার করে নিয়েও বলতে চাই যে বাংলাভাষা থেকে 'আপনি' উঠিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না—সঙ্গতও হবে না।

'তুই'কে আমরা কখন তুলতে পারবো না, কারণ অন্তরঙ্গতার নিদর্শন স্বরূপ তা থাকবেই—কাউকে তুচ্ছার্থে সম্বোধন না করলেও। 'তুমি'কে বাদ দিয়ে ত বাঙ্গালীর একদিনও চলবে না। তার পক্ষের যুক্তি আপনি যথেষ্ট দিয়েছেন তার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলে 'আপনি'র বদলে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষেত্রে 'তুমি' শব্দের প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলাভাষায় তথাকথিত উচ্চ নীচ,

শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলকে কোন একটি শব্দে সম্বোধন করার পক্ষপাতি আমিও, কিন্তু 'আপনি'কে বাদ দিয়ে নয়। প্রচলিত প্রথা বা Sentimentএর বশবর্ত্তী হয়ে আমি একথা বলছি না—ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করেই আমি 'আপনি' রাখার স্বপক্ষে বলছি।

সম্ভ্রমার্থে মধ্যম পুরুষে 'আপনি' শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় খুব বেশী দিনের নয় একথা সত্যি, কিন্তু এই সাড়ে চারশ' পাঁচশ' বছরের মধ্যে 'আপনি' এমনি একটা স্থান জুড়ে বসেছে যেখান থেকে আজ তাকে সরাতে গেলে সাথে সাথে অনেকগুলি খুব প্রয়োজনীয় শব্দকেও চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত করতে হবে। যিনি, তিনি, ইনি প্রভৃতি শব্দের সাথে সাথে তাদের বহুবচন ও ক্রিয়াপদগুলিও অভিধান থেকে চির বিদায় নেবে। শব্দ-সম্পদের দিক থেকে এই ক্ষতি বড় কম হবে না। আর শুধু কর্ত্তৃকারকেরই একবচন বহুবচন নয়, 'আপনি' শব্দের সমস্ত কারকের পদগুলিরও একই গতি হবে।

বৈদিক 'আত্মন' শব্দ বহুশতাব্দী ধরে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এসে বাংলায় 'আপনি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে পালি ভাষা যখন কথ্য ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল তখন 'আপনি'র কাজ 'অত্ত' দিয়ে চালান হ'ত। প্রায় হাজার বছর আগেকার লিখিত বাংলা বই চর্য্যাপদে আমরা দেখি 'অত্ত' কর্ত্তৃকারকে 'অপা,' 'অপণ' ও 'অপুণ' আকার নিয়েছে। তারপর এই সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাভাষার সাথে মিশতে মিশতে কখন যে সে তার পূর্ব্বরূপ হারিয়ে 'আপনি' হয়ে বাঙ্গালীর একান্ত আপনার হয়ে দাঁড়িয়েছে সে খবর কেউ রাখেনি। আজ হঠাৎ তাকে সমাজচ্যুত করলে চলবে কেন?

তাছাড়া 'আপনি'-বোধক শব্দ বাংলার একচেটিয়া নয়। আপনি অর্থবোধক শব্দ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রত্যেক ভাষাতেই আছে।

আসামী ভাষায়	···	আপুনি
বিহারী, হিন্দুস্থানী	···	
রাজস্থানী ভাষায়	···	আঁপ্
মহারাষ্ট্রী ভাষায়	···	আপন্
সিংহলী ভাষায়	···	অপি, অপ, অপ্প
উর্দ্দুতে	···	জনাব্ ইত্যাদি

বিদেশীয় ভাষার অনেকগুলিতে—বিশেষতঃ ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায়—'আপনি'র প্রচলন আছে।

বাংলাদেশের সহরগুলিতে বিহারীর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। আমরা তাঁদের অনেককে 'তুম্' বলে সম্বোধন করি বলে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হন। বাঙ্গালীর নিজেদের মধ্যে সম্বোধনের সময়েও এ বিপদ ঘটে থাকে। অথচ সবাইকে আপনি বললে কোন গোলই থাকে না। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের সংখ্যা ৩০ লক্ষের অধিক হবে না, কিন্তু অপরাপর সমস্ত শ্রেণীর সংখ্যা অন্ততঃ এর পনের গুণ বেশী। (মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত বলে তাঁদেরও এর মধ্যে ধর্‌ছি) এতদিন এদের সাথে শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণেরা যে হীন ব্যবহার করে এসেছেন, আজ থেকে তাদের সবাকেই সম্মানের মর্য্যাদা দিয়ে 'আপনি' বলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। তুই ও তুমি থাকবে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অন্তরঙ্গতার নিদর্শনরূপে, আর সব ক্ষেত্রেই চলবে 'আপনি'।

আশা করি আপনি আমার এই কথাগুলি ভেবে দেখবেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হলে বাধিত হবো।

৩। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত আশ্বিন মাসের বিচিত্রায় শ্রীশিবপ্রসাদ মুস্তাফী বাঙালীর জাতীয় পোষাক সম্বন্ধে যে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন সে সম্বন্ধে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই।

শিবপ্রসাদ বাবু বাঙালীর জাতীয় পোষাক নির্দ্দেশ করেছেন ধুতি পাঞ্জাবী এবং চাদর;—এবং ধুতির সহিত কোটকে বর্জ্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন এই ওজুহাতে যে, ধুতি-কোটের সংযোগ অন্তজাতীয় লোকের কাছে আমাদের

হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে। আমি কিন্তু কোটকে একেবারে বর্জ্জন করবার পক্ষে নই যদি কোট অতিমাত্রায় খাটো না হয় এবং গলা-আঁটা হয়। গলা-খোলা কোট ধুতির সঙ্গে মিশ খায় না ব'লেই মনে হয়,—কিন্তু গলা-আঁটা কোটের সঙ্গে ধুতির এমন কোনো অসঙ্গতি আছে ব'লে মনে হয়না যাতে ক'রে সত্যই অন্য জাতীয় লোকের মনে হাস্যরসের সঞ্চার করা যেতে পারে।

কোটের এমন অনেকগুলি সুবিধা আছে যা পাঞ্জাবীতে নেই। যথা,—কোট খোলা-পরা সহজ,—পাঞ্জাবীর মত মাথা গলিয়ে খুলতে-পরতে হয় না ব'লে কাজকর্ম্মের সময় বারম্বার প্রয়োজন মতো খোলা-পরা যায়। অফিস, রেলভ্রমণ, খেলা-ধুলা বাজার-হাট করা, শিকার করা প্রভৃতি বিষয়ে ঢিলা পাঞ্জাবীর চেয়ে আঁটা কোট অধিকতর উপযোগী। শ্বশুরগৃহে নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে যাওয়ার পোষাক এবং অফিসে লেজার লিখ্‌তে যাওয়ার পোষাক, একই ধুতি চাদর এবং পাঞ্জাবী হওয়া বোধ হয় সঙ্গতও নয় সুবিধারও নয়। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের মাঠে পীত ধটি পরতেন কিন্তু মথুরার রাজসভায় রাজবেশ ধারণ করতেন।

আমাদের পোষাককে ধুতি চাদর এবং পাঞ্জাবীতে সীমাবদ্ধ করলে কোটিং-এর জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট সূতী কাপড় পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহার করবার সুযোগ কখনই পাওয়া যাবে না ; অথচ হেমন্ত এবং বসন্তকালে, যখন শীতের প্রকোপ এত বেশি নয় যে পশমী কাপড় ব্যবহার করা চলে, আবার এত কমও নয় যে লংক্লথ-মলমল ব্যবহার করা চলে, সে সময়ে কোটিংএর সূতীর মোটা কাপড়গুলি ব্যবহারের পক্ষে চমৎকার উপযোগী। অবশ্য, তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, সূতীর মোটা কাপড়গুলি দিয়েই হেমন্ত এবং বসন্তকালে পাঞ্জাবী তৈয়ার করানো যেতে পারে। সে বিষয়ে নৈতিক বাধা কিছু নেই তা অবশ্য স্বীকার করি,—কিন্তু লৌহ দিয়ে সুন্দরী রমণীর গলার হার করবারও ত নৈতিক বাধা কিছু নেই।

সুতরাং আমার মতে ধুতির সহিত পাঞ্জাবী এবং কোট দুই-ই চল্‌তে পারে। কিন্তু ধুতি সম্পর্কে আমার প্রবল আপত্তি আছে কোঁচায়। কোঁচা বস্তুটি বাঙালীর পুরুষ বেশের কলঙ্ক। এমন একটা নিরর্থক পদার্থ এতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ বেশের মধ্যে বিলম্বিত হ'য়ে বিরাজ করছে—এ সত্যই পরিতাপের কথা। দশ হাত কাপড়ের মধ্যে পাঁচ হাত পরিধান ক'রে বাকি পাঁচ হাত কুঁচিয়ে নাভিপ্রদেশে গুঁজে রেখে দিলাম, এর কোনো অর্থ নেই। যদি কোনো অর্থ থাকে ত সে একমাত্র প্রসাধনের। কিন্তু পুরুষের কর্ম্মব্যগ্র জীবনের সচলতার মধ্যে তার বেশে এই পাঁচ হাতী দোলায়মান প্রসাধনের স্থান থাকা সত্যই উচিত নয়। এমন একটি একান্ত অপুরুষোচিত বস্তু নারী-বেশেরও মধ্যে নেই। নারীগণ তাঁদের সজ্জা থেকে ইনসারসন ফ্রিল প্রভৃতি অনাবশ্যক কুঞ্চনাদি দূরীভূত ক'রে তাঁদের পোষাক সরল ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা অনাবশ্যক কোঁচার ভার চিরকাল নির্ব্বিবাদে বহন করে চলেছি।

পুরুষ-বেশের মধ্যে কোঁচা কতটা শ্রী সম্পাদন করে বলতে পারিনে, কিন্তু স্বাস্থ্য এবং সুবিধার দিক থেকে এ যে যৎপরোনাস্তি অবাঞ্ছনীয় পদার্থ তা নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি। কোঁচা নিয়ে বাঙালী পুরুষ সর্ব্বদাই বিব্রত, তার বাঁ হাতখানি নিরন্তর কোঁচা সামলানতে নিযুক্ত। সিঁড়ি ওঠবার সময় তাকে কোঁচাটি হাতে তুলে ধরতে হয়। অন্যথা কোঁচা জুতা এবং সিঁড়ির সংযোগে একটা দুর্বিপাকের আশঙ্কা। দুহাতে দু বাল্‌তি জল নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে হলে পুরুষকে তার কোঁচার খুঁটটি বাল্‌তির আংটার সহিত একত্র ক'রে দু আঙুলের মধ্যে অতি সন্তর্পণে চেপে ধ'রে উঠতে হয়; অসাবধানতা বশত খুঁটটি স্খলিত হ'লে হাতের বাল্‌তি সিঁড়ির উপর নামিয়ে রেখে কোঁচার খুঁটটি দুই আঙুলের মধ্যে পুনরায় সন্তর্পণে চেপে ধরবার প্রয়োজন হয়। একজন স্ত্রীলোক কিন্তু অনায়াসে দু হাতে দু বাল্‌তি জল নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে যেতে পারে, তার বেশের কোনো অংশের জন্য সে অসুবিধা ভোগ করে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ি ভাঙার পক্ষে পুরুষের বেশ ব্যাঘাত, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেশ নয়। ট্রামে, বাসে, রেল গাড়ীতে উঠবার সময় কোঁচাটি বাঁ হাতে ভাল ক'রে সাম্‌লে ধরে তারপর উঠতে হয়, নইলে পদে পদে বিপদ! তার উপর যদি হাতে দু একটি জিনিসের সহিত

ছাতা থাকে তা হ'লে ত রীতিমত ফাঁড়া। ট্রামে, বাসে উঠতে নামতে যে সকল দুর্ঘটনা ঘটে তার মধ্যে অধিকাংশ পায়ে কোঁচার কাপড় মাড়ানোর ফলে।

এ ছাড়া কোঁচার জন্য আরও অনেক ছোটখাট অসুবিধা ভোগ করতে হয়। যথা, দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে কোনো কাজ করতে হলে শরীরের দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচ বশত কোঁচার প্রান্তভাগ ভূমিতে লুণ্ঠিত হতে থাকে, সুতরাং কোঁচাটাকে একটু উঁচু করে তুলে দুই পায়ের মধ্যে চেপে রাখতে হয়। চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করবার সময়ে কোঁচাটী পায়ের উপর তুলে রাখতে হয়, নচেৎ কেবলমাত্র তা ধূলি-বিলুণ্ঠিতই হয় না, জুতার তলায় মর্দ্দিতও হ'তে থাকে। প্রবল হাওয়ার মধ্যে কোঁচাকে হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে না ধরলে কোঁচা পতাকার রূপ ধারণ করে। পুরীর সমুদ্রতটে স্ত্রীলোককে আঁচল নিয়ে যত না বিব্রত হতে হয়, তার বেশি বিব্রত হতে হয় পুরুষকে তার কোঁচা নিয়ে।

স্বাস্থ্যের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলেও কোঁচার বিরুদ্ধে আপত্তি কম প্রবল হবে না। কোঁচাকে বাহন ক'রে বহুবিধ রোগের (বিশেষভাবে যক্ষ্মারোগের) বীজাণু আমরা গৃহমধ্যে বহন ক'রে আনি। পথে ঘাটে ট্রামে বাসে রেলগাড়িতে থুথু ফেলার কদভ্যাস এখনো আমাদের দেশে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। সেই থুথুর সাহায্যে নীত হয়ে নানা রোগের বীজ ধূলির মধ্যে আশ্রয় লাভ করে এবং আমরা কোঁচার সাহায্যে সেই সকল বীজকে সঞ্চয় ক'রে গৃহ মধ্যে নিয়ে আসি এবং আমাদের পরিত্যক্ত ধুতি আলনার উপর স্থাপন ক'রে অপরের বস্ত্রের মধ্যেও সেই বীজগুলি চালান ক'রে দিই। একটী সদ্য-ধৌত ধুতি প'রে ঘণ্টা দুই তিন ট্রামে বাসে ঘুরে এসে কোঁচার ধূলিমলিন প্রান্তদেশ নিরীক্ষণ করলেই আমার এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোঁচা অস্বাস্থ্যকর, এবং সুবিধার দিক থেকে অপুরুষোচিত;—অতএব বর্জ্জনীয়। কিন্তু তাই ব'লে কোঁচার জন্য ধুতিকে বর্জ্জন ক'রে পায়জামা বা অন্য কোনো প্রকার বস্ত্র গ্রহণ করতে আমি বলিনে। আঙুলের দোষে হাতকে বর্জ্জন করা অন্যায়। দশ হাতী ধুতিকে ছয় হাত বা সাত হাতে কমিয়ে এনে নূতন ভাবে পরিধান ক'রে কোঁচা-বিবর্জ্জিত করা যেতে পারে কি-না সে কথা সজ্জাতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারেন,—আমি বলি কোঁচার নিম্ন প্রান্তটিও নাভিদেশে গুঁজে রাখ্‌লে উপস্থিত কোঁচা-সমস্যার পনের আনার সমাধান হয়। ধুতি পরবার এরূপ রীতি ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল, সুতরাং এ রীতিকে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করলে মন্দ হয় না। দুর্জ্জন ব্যক্তির হাত এবং পা উভয়ই একত্রে বেঁধে ফেল্‌তে পারলে তার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়।

মুস্তাফী মহাশয়ের ধুতি পাঞ্জাবী এবং চাদরের মধ্যে চাদরের বিষয়েও আমার আপত্তি আছে। এ বস্তুটি পুরুষের স্কন্ধে অনাবশ্যক ভার। যখন লোকে সাধারণত জামা পিরান পরতনা তখন হয়ত এর প্রয়োজন বিশেষভাবে ছিল, কিন্তু দেহকে জামা পিরানের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আবৃত ক'রে তারপরও একখণ্ড বস্ত্র কাঁধে ফেলে বেড়িয়ে বেড়ানো আমার মতে অসমীচীন এবং অর্থহীন। বাঙলা দেশের মেয়েরা ওড়না বা চাদর থেকে নিজেদের বিমুক্ত ক'রে শুধু সাড়ি এবং ব্লাউজ পরিধান ক'রে সভাসমিতি পথ-ঘাট সর্ব্বত্র বিচরণ করছেন, কিন্তু পুরুষরা অপৌরুষ চাদরের মায়া এখনও পরিত্যাগ করতে পারলেনা,—চল্‌তে চল্‌তে পিছ্‌লে লুটিয়ে পড়ছে তবু না, হাওয়ায় ফর্‌ফর্‌ ক'রে উ'ড়ে চলেছে তবু না। পথে বেরিয়ে চাদর সামলাতে সামলাতেই বাঙালী ভদ্রলোককে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। চাদর ব্যবহারকে নূতন প্রবর্ত্তনা দিয়েছেন বিলাত প্রত্যাগত ভদ্রলোকের দল। চাদরকে প্রধানত তাঁরাই জাগিয়ে তুলেছেন এবং চালিয়ে চলেছেন। কোট প্যাণ্টকে তাঁরা যখন পরিত্যাগ করলেন তখন চাদরকে তাঁরা করে তুললেন তাঁদের স্বদেশী মনোভাবের কেতন। সভা সমিতিতে তাঁদের দুগ্ধফেননিভ স্ফীত চাদরের লোটন দেখে অগত-বিলাত ব্যক্তিরা তাদের সজ্জার কৃশতায় লজ্জিত বোধ করলে।

প্রয়োজনের দাবী কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র বস্তু। সে দিক থেকে শীতকালে শাল এবং বর্ষাকালে বর্ষাতি স্কন্ধে বহন করে বেড়ানো অন্যায় নয়। কিন্তু প্রচণ্ড গরমের সময়ে জামার দ্বারা দেহকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করেও আবার একটা চাদর জড়িয়ে বেড়ানোর কোনো হেতু নেই। চাদর ব্যবহারের প্রথা আপনা-আপনিই অনেকটা ক'মে এসেছে, কিন্তু সভা সমিতিতে তার আধিপত্য এখনও তেমন খর্ব্ব হয়নি।

কোঁচা এবং চাদরকে কেউ যদি সমর্থন করেন ত তাঁকে প্রসাধনের দিক দিয়েই তর্ক করতে হবে—কিন্তু আমার মতে পুরুষের বেশে প্রসাধনের কথা তত বড় নয় যত বড় প্রয়োজনের কথা।

অবশ্যম্ভাবী

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

দাওয়ার বাইরে বাতাবী লেবুর গাছের তলায় ঠেস দিয়ে বসে মধুসূদন সরুখালের ধারে হোগলা বনের দিকে চেয়ে ছিল।···স্তব্ধ দুপুরটায় হোগলা বন থেকে বাতাস লেগে শীর শীর আওয়াজ আসে, বেতবনের ভেতর থেকে ঘুঘু পাখীর ডাক, খালের ওধারের পত্রবিরল বকুল গাছ থেকে গাঙশালিকের সমস্বরে কিরিমিরি রব দুপুরের নিঝুমতাকে মাঝে মাঝে ভয়াবহ করে তুলে।

মধুসূদন ভাবছিল, বেশীদিনের কথা নয় ঠিক পাঁচটা বছর আগেও দুপুর বেলায় সুধা খালেতে বাসন মাজতে এলে তাকে দাঁড়াতে হ'ত। বেতবনের খস্‌খস্ আওয়াজ, হোগলা বনের শীর শীর শব্দ তার মনে ভীতির সঞ্চার করত। ও পাড়ার তেলি বউ নাকি তাকে একদিন গল্প করেছিল, খালের ধারে হোগলা বনের নীচে বসে কাপড় কাচতে গিয়ে কৈবর্ত্তদের বড় বউ সাপে কামড়ে মারা গেছে,—সে নাকি দুপুর বেলায় হোগলা বনের ভেতর কোনদিন বা বেতবনের ভেতর লুকিয়ে থাকে! রাত হ'লে জলের ধারে এসে কাপড় কাচে,...আওয়াজ পাওয়া যায় ছলাৎ—ছলাৎ! তাকে মধুসূদন কোন দিনও বিশ্বাস করাতে পারেনি, যে এ সব সম্পূর্ণ মিথ্যে! আর ছলাৎ ছলাৎ—আওয়াজটা পাওয়া যায় ঠিক যখন জেলেদের মাছ ধরার ডিঙ্গিগুলো হোগলা বনের পাশ দিয়ে পার হয়। সুধা কোন মতেই বিশ্বাস করত না, সন্দিগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকত, আর মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসত!

লোহার চাকা ও একটা শিক্ হাতে করে সোণা কাঁদতে কাঁদতে এসে মধুসূদনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে,—বাবা, নতুন মা বড় দুষ্টু, আমায় একটুও ভালবাসে না!

মধুসূদনের হঠাৎ চমক ভাঙ্‌ল! কাপড়ের খোঁট দিয়ে সোণার চোখ মুছাতে মুছাতে বলল, ছি, বাবা, কেঁদোনা, নতুন মা তোমায় খুব ভালবাসেন। আরো ফুক্‌রে কেঁদে উঠে সোণা বলল, কক্ষণো না, আমার পিটে পাথার বাঁট দিয়ে মেরেছে! সে দিনও মেরেছিল, তুমি তখন বেরিয়ে গেছলে, আমি বেল ফুলের গাছ থেকে দুটো ফুল তুলেছিলুম, অমনি দুম্ দুম্ করে পিঠে অনেকগুলো কিল মারল! আজকে আমি হালদার পাড়ায় চাকা চালাতে গেছলুম আসতে দেরী হয়েছে আর অমনি আমায় গালাগালি দিয়ে পিঠে পাথার বাঁট দিয়ে মারল! আচ্ছা বাবা, সে মা'ত আমায় মারত না!

আর একবার কাপড়ের খোঁট দিয়ে সোণার চোখ মুছিয়ে মধুসূদন বলল, অতদূরে তুমি একলা খেলতে গেছলে তাই নতুন মা মেরেছে; অতদূরে আর যেয়োনা বাবা! হীরু, মাণিক ওদের সঙ্গে খেলা কোর? মধুসূদন সোণাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে বসে রইল। এক একবার সোণার মুখের দিকে চাইতে লাগল। পাড়ার মেয়েরা বলত মধুর বউয়ের মত টিকোল নাক অমন টানা টানা ভাসা চোখ আর দেখতে পাওয়া যায় না। নিখুঁত ভাবে সোণা তেমনি নাক চোখ অধিকার করেছে। মধুসূদন আগ্রহভরে সোণার মুখের দিকে চাইতে থাকে। সুধার সব কিছু স্মৃতি সে পায় সোণার ভেতরে। সোণাকে ছেড়ে একদণ্ডও সে থাক্‌তে পারে না। চান করতে, খেতে শুতে সোণাকে তার সব সময় চাই। নতুন বউ অনেক সময় বলেছে, তুমি বাপু কিন্তু ছেলের মাথা খাচ্ছ, ধাড়ি ছেলে নিজে চান করতে পারেনা খেতে পারেনা, ভবিষ্যতে ওর দ্বারা কিছু হ'বে না।

মধুসূদন হেসে উত্তর দেয়, নতুন বউ ও এখনও ছেলে মানুষ, বড় হলে সব শুধ্‌রে যাবে।

নতুন বউ বলে, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দশ বছরের ছেলে হ'ল আবার কবে শুধ্‌রবে?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে মধুসূদনের নজর গেল সামনের পুকুরটার

দিকে। নাল, হেলঞ্চার মাঝখানে রক্তপদ্ম ;—ওতেও সুধার স্মৃতি আছে। বোশেখ মাসে প্রথম ঝারার সময় রক্তপদ্মটা তার পায়ের তলায় দিয়ে প্রণাম করে সুধা বলত, তোমার পূজা আগে তারপর মহাদেবের।• তুমি সন্তুষ্ট হলেই দেবতা সন্তুষ্ট হবেন। মধুসুদনের দু'চোখ জলে ভরে গেল।

পুকুরের ধারে কাঁঠালি চাঁপা, নাগকেশরের তলায় এখনও যেন সুধার দুটো নরম পায়ের চিহ্ন। সন্ধ্যে হলেই ফুল কুড়োবার ধুম। শুধু ফুল তুলেই ক্ষান্ত নয়, মধুসুদনের দুকানে জামার বোতামের ঘরে ফুলগুলো সাজিয়ে দেওয়া চাই।

একদিন তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, বর্ষা সবে সুরু হয়েছে...সদ্যস্নাত শ্যাম পত্রসম্ভারে গ্রামকে আরো সুন্দর করে তুলেছে,···ভিজে মাটীর সোঁদা গন্ধ উঠছে। সুধা সে দিন আম বাগানে আম কুড়োচ্ছিল, এমন সময় আকাশ মেঘে অন্ধকার হ'য়ে গেল ; সুধা তখনও আম তুলে কোঁচড় ভর্ত্তি করছে! একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল সঙ্গে ঝড়, আমগাছের মাথায় বাতাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ! সুধার আম কুড়োবার ধুম যেন আরো বেড়ে গেল, কোন মতেই তাকে ফেরান যায় না! মধুসুদন কতবার বলল, লক্ষ্মীটি গো, ঘরে চল, বৃষ্টির জলেতে নেয়ে গেছ, জ্বর আসবে! সুধা হেঁসে বলল আমার জ্বর হবে না, তুমি ঐ বড় আম গাছটার তলায় দাঁড়াও ;—কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মড় মড় করে একটা আমগাছ ঝড়েতে ভেঙ্গে পড়ল,—ঠিক চার হাত দূরে! সুধা ভয়েতে হুড়মুড় করে মধুসুদনের বুকের উপর এসে পড়ল—ঠোঁট দুটি থর্ থর্ করে কাঁপছিল! সোণা মধুসুদনের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, বাবা, তুমি কি ভাবছ ?···মা-কে-না ? আমি কাল রাতেতে স্বপ্ন দেখেছিলুম ;—মা যেন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলছে,—তুই ভাল আছিস ত সমু ? নতুন মা তোকে ভালবাসে ? খবরদার বাবা দুষ্টামি কোর না, তাহ'লে নতুন মা তোমায় ভালবাসবে না!

আমি বললুম,—নতুন মা আমায় তোমার মত ভালবাসে না, আচার খেতে চাইলেও পাড়ায় খেলা করতে গেলে আমায় মারে! আমার মাথায় হাত বুলিয়ে মা কি বলল জান বাবা ? মা বলল, তুমি নতুন মার কথা শুনো, তাহলে তোমায় কিছু বলবে না।···আচ্ছা বাবা, মার জন্যে তোমার মন কেমন করে ? মধুসুদন একবার পিছন দিকে চেয়ে সোণার মুখে চুমু দিয়ে বলল, করে রে করে! চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে চোখ মুছে ফেলল!

সোণা বাপের গলা জড়িয়ে আবার বলল, তুমি কাঁদছ ?

মধুসুদন সোণাকে আরো জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলল, কাঁদব কেন বাবা, যাও নতুন মার কাছে যাও!

সোণা বলল, আবার যদি মারে ?

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মধুসুদন বলল, আর মারবে না, নতুন মার কাছে গিয়ে বল, আমি আর দুষ্টামি করব না, তোমার সব কথা শুনব।

লোহার চাকা আর শিকটা শিউলি ঝোপের ভেতর রেখে দিয়ে সোণা বাড়ীর ভেতরে গেল।

সন্ধ্যের কিছু পূর্ব্বে মধুসুদন মাঠ থেকে বাড়ী ফিরতেই প্রভা ক্রোধের সুরে বলল, তোমার দস্যি ছেলেকে নিয়ে আর পারা গেল না,···ওনার জন্যে আলাদা একটা চাকরের ব্যবস্থা করতে হবে ; ফিরে এলে থেংরে বিষ জেড়ে দোব। সেই দুপুর বেলায় ভাত খেয়ে বেরিয়েছে এখনো ফেরবার নাম নেই, আমি বললুম, ওরে এই দুপুর রোদে যাসনে! কে কথা শোনে,—ছেলের কানে কথাই গেল না! হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। আসুক সে! আরো আস্কারা দাও ?

মধুসুদন কথার কোন উত্তর না দিয়ে, চাদরখানা আবার গলায় জড়িয়ে বেরিয়ে গেল। বামুন পাড়ায় অনেক খোঁজা-খুঁজি করল, কিন্তু কেউই সোণার কোন সংবাদ দিতে পারল না। দত্তদের পুকুরের ধারে আসতেই দেখা হল রাম-দত্তের সঙ্গে।

ভিজে গামছাখানা গায় জড়িয়ে রামদত্ত বলল, ভায়া সন্ধ্যে বেলায় হন্ হন্ করে চলেছ কোথায় ?

—আর ভাই বল কেন,—সোণাটা দুপুর বেলায় কোথায় বেরিয়েছে এখনও বাড়ী ফেরেনি! তোমার চোখে পড়েছে না কি ভায়া ?

রামদত্ত একবার ভেবে নিয়ে বলল, বেলা তিনটের সময়

মোড়ল মশাইর সঙ্গে দাওয়ায় দাবা খেলতে খেলতে একবার যেন দেখলুম বলে মনে হয়, লোহার চাকা চালাতে চালাতে হীরুর সঙ্গে চৌধুরী পাড়ার দিকে গেল।

মধুসূদন হাত তুলে নমস্কার করে বলল, আচ্ছা ভায়া চললুম, ছেলেটাকে একবার খুঁজে দেখি।

অনেক খোঁজার পর চৌধুরীদের বাগানের ধারে সোণাকে হীরুর সঙ্গে বসে গল্প করতে দেখা গেল। পাশে লোহার চাকাটা পড়ে আছে হাতে শিক্।

মধুসূদনকে দেখেই সোণা উঠে এসে হাত ধরে বলল, আমি বাড়ী যাবনা বাবা, নতুন মা মারবে।

মধুসূদন দেখল, ভয়েতে সোনার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে, চোখ ছল্ ছল্ করছে। তবু শাসনের সুরে বলল, কেন তুমি নতুন মার কথা শোননি? আবার এতদূরে এসেছ।

সোণা নিরুত্তর, ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে!

মধুসূদন তেমনি গম্ভীর সুরে বলল, বাড়ী এস।

রামদত্তর দাওয়ার সামনে দিয়ে যেতেই, মধুসূদনকে ডেকে রামদত্ত বলল, কোথায় ছিল সোণা?

—চৌধুরী পাড়ায় চৌধুরীদের বাগানের ধারে।

মধুসূদনকে পাশে বসতে বলে রামদত্ত বলল, সোণা'ত বছর দশেকের হ'ল? এবার পাঠশালায় দাও।

সোণার দিকে চেয়ে নিয়ে মধুসূদন বলল, জান'ত ভায়া, বড় বউ মারা যাবার পর একদণ্ডও তাকে আমি ছেড়ে থাকতে পারিনা, ভাবছি এবার একটা ভাল দিন দেখে হাতে খড়ি দিয়ে, আমিই ওকে পড়াতে সুরু করে দোব। মোটামুটি বাঙ্গলা হিসেবটা জানলেই যথেষ্ট।

রামদত্ত বলল, বাসুদেবপুরে আমার কাঠা ভুয়েক যে জায়গাটা পড়ে আছে, মতি পণ্ডিত সেই জায়গায় একটা পাঠশালা করছে। বর্দ্ধিষ্ট গ্রাম পাঠশালা ভালই চলবে। জায়গাটার পাশেই মতি পণ্ডিতের বাড়ী, তার'ত আর সাত-কুলে কেউ নেই,—তা তুমি যদি বল তবে মতি-পণ্ডিতের বাড়ীতে সোণার থাকবার, ও পাঠশালায় ফ্রি পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমি বললে মতি খুব যত্নে সোণাকে রাখবে।

মধুসূদন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভেবে দেখি।

বাড়ীর কাছে, মধুসূদন যখন পৌছল, সন্ধ্যা তখন গাঢ়তর হয়েছে। বাড়ীর ভেতর পা দিতেই, প্রভা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, বাবু ছিলেন কোথায়? তারপর সোণার কান ধরে গালে সজোরে একটা চাপড় মেরে প্রভা বলল, কোথায় গেছলি উল্লুক ছেলে! বল আর যাবি? নিজের ইচ্ছে মত কাজ করবি! সজোরে আর এক চাপড়।

—বাবা গো! আমায় মেরে ফেল্লে গো বলে চীৎকার করে উঠে সোণা কাঁদতে লাগল। মধুসূদন ছুটে গিয়ে প্রভার হাত-ধরে মিনতির সুরে বলল, থাক, আর মেরো না, ওর ভয়ানক লেগেছে, আর কখ্খোনো ও অবাধ্য হবে না।

মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে প্রভা বলল, যাও! মাথাটা আরো ভাল করে খাও! ওর নিজের মা হ'লে আমার শাসনে বাধা দিতে না! আমার দরদ থাকবে কেন?

মুখ ভারি করে প্রভা পাশের ঘরে ঢুকে গেল।

সোণা তখনও কাঁদছে, বাবা গো—নতুন মা আমায় মেরে ফেললে!

গভীর রাত্রি। বাইরে শুকনো পাতার খস্খস্ আওয়াজ,—ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা সুর, মাঝে মাঝে বহুদূর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসে। স্তব্ধ আকাশের বুকে নির্জ্জীব ভাবে চাঁদ পড়ে আছে, তারই ক্ষীণ রশ্মিটুকু বাতাবী লেবুর গাছের পাতার ভেতর দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে।

—প্রভা মধুসূদনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি ছেলের একটা ব্যবস্থা কর, আমি আর পারিনে, একটা কথাও আমার শোনে না! আজ এক বছর তোমার ঘরে এসেছি বেয়াড়া ছেলের জন্যে একদিনও শান্তি পাইনি। কাল মারবার পর তুমি'ত খুব সোহাগ করলে! এমন বদমাস আজ সকাল বেলা হালদার গিন্নির কাছে গিয়ে বলেছে কি জান?

মধুসূদন নরম সুরে বলল, কি বলেছে?

—আমি শুনলুম গয়লা মেয়ের কাছে, ওদের বাড়ী তখন সে দুধ দিতে গেছল,—দেখে, সোণা বসে কাঁদছে, আর হালদার-গিন্নি দরদ জানিয়ে গয়লা মেয়েকে বলল, তোদের



ব্রহ্মা

বিচিত্রা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

শিল্পী — শ্রীচিন্তামণি কর

মধুসূদনের নতুন বউ সোণাকে এত মারে কেন রে? ছেলেটা কেমন নাদুস্ নুদুস্ ছিল কি হাল হয়েছে বাছার আমার! সৎমায়েদের দস্তুরই এই, লাখে একটা হয়ত' ভাল মেলে। বিয়ের রাতেই বুঝতে পেরেছি, ছেলেটার দিকে গোল গোল চোখ ছুটো দিয়ে কি কটাক্ষই হানছিল, যেন পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে। মধুসূদনের উচিত ছিল বিয়ে আর না করা! তুই না হয় নিজের বাপ, সে ত' আর নিজের মা নয়,—স্নেহ-দরদ থাকবে কোত্থেকে! আবার যদি নিজের একটা ছেলে হয়, তাহ'লে সোণা হয়ে থাকবে পথের কাঁটা। প্রভা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ও ছেলেকে কাছে রেখে আমি সুখ পাব না বাপু, বলে দিলুম। কি শত্রুতাই না করছে, গ্রামে মুখ দেখাবার যো নেই! যা হয় একটা বিহিত কর।

—মধুসূদন চোখ বুজে চুপ করে রইল।

প্রভা মধুসূদনকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, কথা ত' তুমি গ্রাহ্যই করছ না, আমাকে না হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভাঙ্গা গলায় মধুসূদন বলল, বাসুদেবপুরে রামদত্তর জায়গায় মতি পণ্ডিত পাঠশালা করছে। রামদত্ত কাল বলেছিল সোণাকে ঐ পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিতে,—মতির বাড়ীতে থেকে পড়বে, এখান থেকে চার ক্রোশ পথ রোজ যাওয়া আসা হ'তে পারে না। ভাবছি, সেখানেই সোণাকে পাঠিয়ে দি।

মধুসূদনের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রভা বলল, তাই দাও, শাসনে থাকলে আপনি শুধ্‌রে যাবে।

আজ একমাস সোণা এসে রয়েছে বাসুদেবপুরে। মতি পণ্ডিতের বাড়ীতে থাকে আর পাঠশালায় পড়াশুনা করে। লোহার চাকা আর শিকটা তার আনা হয়নি,—সেটা ওদের বাড়ীর শিউলি ঝোপের ভেতরই রয়ে গেছে। নতুন বন্ধু বিষ্টুর কাছ থেকে সে আর একটা চাকা ও শিক জোগাড় করেছে বটে, কিন্তু চাকা চালাবার সে উৎসাহটুকু আর সে পায় না। বিষ্টুর সঙ্গে চাকা চালাতে গিয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে দূরে তাল, হিজল গাছের সারির দিকে।...ঠিক ঐ রকম গাছের সারি ওর নিজের গ্রামেতেও আছে, কোন কোন-দিন দুপুর বেলায় হীরুকে নিয়ে চাকা চালাতে চালাতে রায়পাড়া পেরিয়ে তাল হিজল গাছের ছায়ায় বসে কত গল্প,... স্তব্ধ অবসন্ন দুপুরে ঘুঘু পাখীর ডাক,—কাঠ্‌ঠোকরার কাঠ্-র-র-র শব্দ এ সবই তার খুব ভাল লাগত। এখানেও সে দুপুরে উদাস সুরে ঘুঘুর ডাক শোনে, মতি পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে বাতাবী লেবুর গাছে ফুল ফোটে হাওয়ায় ভুর ভুর গন্ধ আসে! তবু তার ভাল লাগে না। বাবার জন্যে মন কেমন করে,—আজ এক মাসের ভেতরেও বাবা তাকে দেখতে আসেনি।

বিষ্টু সোণার কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, তুই কি ভাবছিস্ সোণা? তোর চাকা চালাতে ভাল লাগছে না—না? বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে?

সোণা বিষ্টুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তুই যদি কোথাও যাস তোর মন কেমন করে না ভাই? নতুন মার জন্যে আমার কিচ্ছু করেনি, বাবার জন্যে আমার মন কেমন করছে।

বিষ্টু বলল, আমার কাকা কাল তোদের গ্রামে যাবে, বলব'খন তোর বাবার কাছে গিয়ে খবর দেবে। আয় ভাই আমরা চাকা চালাই! চল্ আজ গোঁসাই পুকুরের ধার দিয়ে চাকা চালিয়ে আসি।

সোণা সেইখানেই বসে পড়ে বলল, থাক ভাই আজ আর ভাল লাগছে না, এখানে বসে গল্প করি! তুই একটা ভূতের গল্প বল্!

বিষ্টু এদিক ওদিক একবার চেয়ে নিয়ে, সোণার আরো কাছে সরে এসে বলল, ভাই একটা কন্ধকাটার গল্প শুনবি?

সোণা বিষ্টুর হাতটা ধরে বলল, বল ভাই শুনব।

—ঐ যে পাঠশালার পেছনে বেতবন আছে না ভাই, ওখানে একটা কন্ধকাটা আছে, তার ভাই গলা পর্য্যন্ত কাটা। রাতেতে মা আমায় বলছিল, খুব যখন রাত হয়, সে বেতবন থেকে বের হ'য়ে গোষ্ঠদের ধান ক্ষেত পেরিয়ে, মিত্তিরদের পুকুরের ধার দিয়ে এসে আমাদের বাড়ীর সামনে যে বটগাছটা আছে, তার তলায় এসে দাঁড়ায়,—তার গলায় আওয়াজ হয় কঁক্ কঁক্! আমি নিজের কানে শুনেছি ভাই!

তার সামনে যদি কেউ পড়ে তাকে ধরে টিপে মেরে ফেলে। আমি তাই সন্ধ্যের পর বাড়ীর বাইরে থাকি না।···ভাই সোণা আমার বড় ভয় করছে।

এদিক ওদিক একবার চেয়ে সোণা বলল, আমারও, চল ভাই যাই।

সেদিন সারা রাত সোণার ঘুম হয়নি, খালি তার মনে হয়েছে, বাতাবী লেবু গাছের তলায় একটা কালো লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে,—গলা পর্য্যন্ত তার কাটা, আর আওয়াজ করছে কঁক্—কঁক্! সোণা আঁতকে কেঁদে উঠে মতি-পণ্ডিতের বুকের উপর গিয়ে পড়ল। দুটো ধাক্কা মেরে মতিপণ্ডিত বলল, সরে যা, ফের ওরকম গায়ে পড়লে ঘর থেকে বার করে দোব।

ভোর পর্য্যন্ত বালিশে মুখ গুঁজে সোণা কেঁদে কাটিয়েছে, আর বলেছে,—বাবা গো···নতুন মা গো···আমি আর দুষ্টামি করব না···আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও!···

অবসন্ন গলায় মধুসূদন এসে প্রভাকে বলল, বাসুদেবপুর থেকে এক ভদ্রলোক সোণার খবর এনেছেন। সারা দিন রাত সে কাঁদে, গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে না,—মতিপণ্ডিত তার নাকি তেমন যত্নও নেয় না।

প্রভা কোন উত্তর দিল না। বাইরে বেতবনের ও পাশে দিক্চক্রবালের কোলে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, সারা আকাশে তার শেষ বর্ণচ্ছটা। বাতাবী লেবুর পাতাতেও অস্তমিত সূর্য্যের ক্ষীণ রক্তিম আভা এসে পড়েছে। প্রভা নির্নিমেষ নয়নে বাতাবী লেবু গাছের দিকে চেয়ে বসে রইল।

আজকাল প্রত্যেক জিনিসটা দেখলেই সোণার কথা তার মনে পড়ে যায়। বাতাবী গাছে ফুল ফুটলে সোণার কি আনন্দ। ফুল তোলার জন্যে কত সে তাকে তিরস্কার করেছে! ঝির ঝিরে সন্ধ্যে বাতাসে কেয়া ফুলের গন্ধ আসে, প্রভার কিন্তু সে গন্ধ ভাল লাগে না! সোণা যে এ গন্ধ ভালবাসত'! দাওয়ার বাইরে বেল ফুলের গাছ অযত্নে শুকিয়ে গেছে, এই ফুলের জন্যে সোণাকে সে একদিন প্রহার করেছিল। শুব্ধ দুপুরে মাঝে মাঝে তার মনে হয়, চাকা চালাতে চালাতে কে যেন বাতাবী লেবুর গাছের তলায় এসে দাঁড়ায়।

প্রভাকে নিরুত্তর দেখে মধুসূদন আবার জিজ্ঞেস করল, একবার গিয়ে সোণাকে দেখে আসি, কি বল'?

প্রভা তথাপি নিরুত্তর। বাইরে অনন্তবিস্তৃত উদার সন্ধ্যা আকাশের দিকে চেয়ে সে ভাবছিল,···লাল কাপড় পরা একটা ছায়া মূর্ত্তি।···সে দিন সন্ধ্যের সময় গা ধুয়ে ঘাটে উঠেই দেখে, ছায়া মূর্ত্তিটি শিউলি ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে পুকুরের পাশ দিয়ে বরাবর খালের ধারে ঘন কেয়াবনের কাছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। মোড়ল গিন্নি বলল, ও হ'ল পেত্নি অনেকদিন ঐ কেয়াবনে আছে!··· কাল রাতেও স্বপ্নে আবার সেই ছায়া মূর্ত্তিটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল,···প্রথমে গোল গোল আগুনের মত দুটো চোখ দিয়ে তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিল,·· তার পরেই সম্পূর্ণ বদলে গেল,···সুন্দর মুখশ্রী, ভাসা ভাসা টানা চোখ, টিকোল নাক, একমাথা কোঁকড়ান কালো চুল।···

প্রভার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে, মধুসূদন ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, তুমি কিছু ব'লছনা যে! তাকে দেখে আসি?

প্রভা মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে বললে শুধু দেখে আসা নয়, সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো।······

কর্ম্মযোগী রায়

———

আবর্ত্তন

শ্রীসুতপা দেবী

কোন কাজ নাহি আজ
চিন্তা-বিহীন অলস দিবস বিরাজিছে গৃহ মাঝ।
বাহিরিতে পথ নাই
বাতায়ন পথে নয়ন মেলিয়া দিবস গোঁয়ানু তাই।
পথের ওপারে নীরবে দাঁড়ায়ে দীর্ঘ তরুর দল
বন্দী আমারে বাহিরে আনিতে করিল কতনা ছল।
শাখে শাখে তার দুলিছে কুসুম বিলায়ে গন্ধ ভার,
বাতাস আনিল মৃদু শিহরণ দোলা দিয়া বারে বার।

দীর্ঘ পথের' পরে—
বকুল আপন গন্ধ বিলায়ে আপনি পড়িছে ঝরে।
ঝরে পড়া ওর ব্যথা
আমার মনেতে জাগায়ে তুলিল কত না দিনের কথা।
মধুময় কত অতীত অতীতে ওরি তলে ভীড় করি
মিলি সাথীদলে করি কাড়াকাড়ি তুলেছি আঁচল ভরি
সে ঝরা ফুলের গাঁথি মালা হার পরেছি আপন গলে ;
আবার তাহারে ছড়ায়ে ফেলেছি—জানিনে কিসের ছলে।

এমনি তো দিন গেছে—
সেদিনের সাথে এদিনের মোর আর কি তুলনা আছে?
জনহীন রাজপথে
গাগরী ভরিতে গ্রাম-বধূ চলে কুণ্ঠা-জড়িত পদে।
স্তব্ধ দুপুরে তটিনীর তীরে যেতে যে হবেই তার,
জল ভরা ছল—ও ঠাঁই যে তার শুধু চিত জুড়াবার।
হেথা আনমনে বসি গৃহ-কোণে কাটিছে আমারো বেলা,
ভাবিয়া অতীত মনে জাগে শুধু নিয়তি-নিঠুর-খেলা।

অদ্ধরে মাঠের 'পরে
যাযাবর কোন পাখীদের দল মহা কলরব করে।
চাহিয়া ওদের পানে
স্মৃতি মোর কোন বিস্মৃত বাণী বৃথাই বহিয়া আনে।
এম্‌নি কতনা দিবস কেটেছে ছুটিয়া ওদের সাথে
ফিরেছি হাসিয়া উড়ে গেলে ওরা বনফুল
লয়ে হাতে।
কভু নদীকূলে, কভু মাঠপরে, কখনো গাছের তলে,
সুখের আমার শৈশব-খেলা কেটে গেছে কুতূহলে।

এ জীবনে বার বার
হারাইয়া সব ফিরি 'মুসাফির' মুছিয়া অশ্রুধার।
আকাশের রঙ হেরি
ভাবি—এ জীবনে খেয়া পারে যেতে আরো কত
আছে দেরি।
যেখানে আকাশ চুমে প্রান্তরে লয়ে তার পদ রেণু,
যেখানে রাখাল দুপুরে সাঁঝেতে বাজায় ব্যাকুল বেণু,
গোঠের যেপথে গাভীদল ফেরে ধূসর গোধূলি বেলা
ওপথে আমার জনমের শোধ শেষ হ'য়ে গেছে খেলা।

পথেতে পথিক ধায়,—
ওর পানে চেয়ে এ চিত আমার করে শুধু হায় হায়!
আর কি আসিবে দিন
ফিরিয়া পাইব হারান জীবন অতীততে অবলীন?
উষা মোর দ্বারে বৃথা ফিরে যায় হানি কর বার বার
পূরব আকাশ অরুণিমা লাগি কেন বা খুলিল দ্বার?
নিরালা দুপুরে উদাসী ঘুঘুরা এখনো তেমনি ডাকে,
সাঁঝের আকাশে বাদুড়ের দল উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

বাদল মেঘের দিনে
প্রকৃতি আমারে তেমনি করিয়া আর কি লইবে চিনে?
রামধনু সাড়ি পরি
আমার এ চিত তেমনি করিয়া আর কি লইবে হরি?
আজি এ দিনের অবসর ক্ষণে সঞ্চিত যত বাণী
এক এক করি স্মৃতি-বাতায়নে দিয়া যায় হাতছানি।
ছোট গৃহমাঝে কাজে ও অকাজে আজি দিন নাহি কাটে
কোথায় কাহার আহ্বান শুনি পথে ঘাটে শুনো মাঠে।

জীবনে সাঁঝের বেলা
ঘনাইয়া এল, তবু কি আমার আসেনি ছুটির বেলা?
আজি অবসর চাই
প্রকৃতির কোলে লুটিয়া পড়িয়া লভিব বিরাম ঠাঁই।
এতদিন যারা ছিল দূরে দূরে আজিকে আসিবে কাছে;
আজিকে চাহিয়া দেখিব আমার সকলি তেমন আছে।
আকাশ, বাতাস, ফলফুল ভার, বরষার রাঙা নদী
সকলি বিফল হইবে তাহারা আমি নাহি মিলি যদি।

সুতপা দেবী



আমার গল্প

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

আমার ইচ্ছা হইয়াছে একটা গল্প লিখিব। বাসনা প্রবল কিন্তু দুর্ভাগ্য ততোধিক। অর্থাৎ আমার জানাশোনা কোনো সম্পাদক নাই যিনি ধর্ণা দিয়া বসিবেন, "ওহে ভায়া তোমার একটা গল্প না পেলে আমার কাগজ আর তো চল্‌চে না।" এবং আমি চল্‌তি রীতির অনুকরণে তাঁকেই গল্পের নায়ক করিয়া গল্প-সাগরে পাড়ি জমাইব। অগত্যা বিপদতারণ চেয়ারটা টানিয়া জানলার ধারে গিয়া বসা গেল। সামনেই মস্ত বড় উঁচু বাড়ী, অনেক চেষ্টায় তাঁর ফাঁকে একটুখানি আকাশের আভাস মিলিতে পারে। দিনের বেলাকার আকাশ, আলো প্রচুর এবং প্রায় নির্মেঘ সুতরাং আড়ম্বরের ঘটার অভাব খুবই স্বাভাবিক। তবুও চেষ্টা করিতেছি, যদি কোনো মায়া ঐ টুক্‌রো আকাশে তার ছায়া মেলিয়া······

এমনও ত' হইতে পারে একটা পরী কিম্বা ওড়্‌না-ঢাকা একটি কবি-মানসী কিম্বা ধরুন কবিমনের নিরবয়ব কবি প্রিয়ার লাল ঠোঁটের হাসি—অন্ততঃ তার কালো চোখের গভীর ইসারা,—ঐ আকাশে হঠাৎ দেখা দিয়া আমার এই একান্ত বস্তুগত মনটাকে দুলাইয়া দিতে পারে। নিশীথ রাতে, আলো-আঁধারে স্তব্ধতার মাঝে এদের আকস্মিক আবির্ভাব ত অনেকের অদৃষ্টেই জুটিয়াছে। তাই ভাবিতেছি, এমনিতর একটা কোন অশরীরী ছায়া বীণার ঝঙ্কারে দিনের বেলাকার এই বিকট কোলাহল ডুবাইয়া দিয়া যদি আমায় বলে, "ওগো গাল্পিক, আমার সঙ্গে এসো, আমার সঙ্গে উড়ে চলো, তারপর আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো,—'নিম্নে ধরণীতলে, প্রাণজনতা চলে'—" ইত্যাদি।

ঠিক কথা।

গলির মধ্যে দেখিতেছি, সত্যই প্রাণ জনতার স্রোত চলিয়াছে, বহুমুখী হইয়া, অর্থাৎ বাজার, ঘর ও আফিসের টানে, পয়সার চেষ্টায় না হয় অন্ততঃ নাপিতের খোঁজে। টাক-ওয়ালা বুড়োটি দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু আমার মোটেই পছন্দ হয় না; ও আর একটা খোঁচা খোঁচা দাড়ীওয়ালা বুড়োকে বলিতেছে, "আর দাদা বাজারে আজকাল কিছু পাবার জো নেই, গোটা কতক কৈ মাছ কিনলুম।" ঐ পাঞ্জাবী পরা তরুণ ছোকরাটিও তথৈবচ, বলিতেছে, বড্ড তাড়াতাড়ি আছে ভাই, আপিসের নতুন ছোট সাহেব একটু দেরী হলে আর রক্ষে রাখবে না।"

নানা ছাঁদের মূর্ত্তি, নানা ভাবের ব্যস্ততায় ক্ষিপ্রগতি কাকের মত একঘেয়ে কর্কশ কলরবে মুখর। নাঃ, এদের প্রাণ নাই, যৌবন নাই, উগ্র গন্ধ কামনাও নাই,—এদের লইয়া গল্প লেখা চলে না।

গঙ্গার ঘাটে গিয়াছিলাম স্বাস্থ্যকামী বায়ুসেবীদের মধ্যে গল্পের নায়ক সন্ধান করিতে। প্রায় একই ধরণের ব্যাপার। যা'রা বুড়ো হয় নাই, তারা প্রাণপণে বুড়ো হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং বুড়োরা পরলোকে তাদের সঞ্চিত স্বাস্থ্য কেমন করিয়া অক্ষয় রাখিবেন তারই জল্পনা কল্পনা করিতেছেন।

ব্যর্থতায় তিক্ত-বিরক্ত হইয়া সাঁঝের ঝোঁকে ফিরতি পথ ধরিয়াছি,—সহসা সন্ধান মিলিয়া গেল,—একেবারে দৈবাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কমলোকের আনা-গোনায় এ পথে ভীড় খুব কম, আর মোটর গাড়ীরও হাঁক ডাক না থাকায় দিকভ্রান্ত হইতেও হয় না। সুতরাং পরম নিশ্চিন্ততায় বিভোর হইয়া মানুষ এ পথে মন্থর গতিতে অক্লেশে চলিতে পারে।

লোকটির বয়স বেশী নয়, আমার মনে হয় প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছাইতে দেরী আছে। ওর চলার ভঙ্গী দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, ও দারিদ্র্যকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া দিবারাত্র

হাওয়া গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ানোর স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু তাই বলিয়া দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য্য লইয়া সবাইকে দেখাইয়া বেড়ানোর মতন ওর চেহারা নয়। অর্থাৎ আমার বিশ্বাস লোকটি বেশ সরল, সহজ, সাদাসিদে মানুষ। বুড়োদের দলে বসিয়া ও সায় দেয়, "হাঁ, ছিল বটে সেকাল। সস্তা-গণ্ডার যুগ, দশ বিশ টাকায় দুর্গোৎসব হতো। তখন ছিল মানী লোকের কি সম্মান। আর এখন যেমন সব জিনিষ মাগ্যি, তেমনি মুড়ী-মিছরির একদর, সম্মান আর কারুর রইল না।" তেমনি একালকেও প্রশংসা করিতে ওর একটুকুও বাধে না এবং তারপর দুই উক্তিতে তফাৎ কি ভাবিয়াও চিন্তাশক্তি খরচ করে না।

লোকটি কিছু চিন্তাগ্রস্ত, মুখে ও কপালে তা'র আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় সংসারী মানুষ, তাই ভাগ্যবিধাতা-নির্দ্দিষ্ট সাংসারিক চিন্তার গ্রহকক্ষে ওকে বিচরণ করিতেই হইবে, আমার মত দুশ্চিন্তার ভার ও বহন করিবে না। খুব স্বাভাবিক, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার মত বস্তু নাই।

আমার মনের মধ্যে কূটতার্কিক এরই মধ্যে বলা সুরু করিয়াছে, "বাপু, ওসব স্বপ্নরাজ্যের কথা ছেড়ে সোজা কথায় প্রবন্ধ লেখা সুরু করো, আমি সমাজতান্ত্রিকদের কাছ থেকে যুক্তি ধার ক'রে এনে তোমায় যোগান দেবো।"

গল্পের মোহ জমিয়া উঠিবার মুখে বাধা পাইয়া আমি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম, সোজাসুজি লোকটির কাছে গিয়া প্রশ্ন করিলাম, "মশায়, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে কিছু ভাবনায় পড়ে গেছেন।"

লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "আলাপ পরিচয় না ক'রেই ঘাড়ে চড়াও হয়ে কথা বল্‌তে সুরু করেছি ব'লে আমায় অভদ্র ঠাউরে নেবেন না। আমি অনেকদিন ধরে আপনার মত একটি বন্ধু খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

লোকটি হাসিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি আমায় আগে থেকে চিন্‌তেন নাকি?"

"না, তা আর ঠিক নয়, তবে আপনাকে দেখেই আমার মনে হ'লো আপনাকে খুব চিনি, খুব জানি।—"

"সি-আই-ডির মতো?"

"মশায় ওদের নাম মুখে আন্‌বেন না। ওতে দুজনেরই বিপদ।" তারপর বলিলাম, "দেখুন এখান থেকে গঙ্গার ঘাট খুব দূরে নয়। তাই ঘাটের বদলে এখানে দাঁড়িয়েই আমরা মেয়েদের মত বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিতে পারি।"

"কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, কয়েক বছর আগে আমার স্ত্রীও এই গঙ্গায় নাইতে এসে একজনের সঙ্গে 'মকর' পাতিয়ে গিয়েছিল—"

"না ভাই, 'মকর-টকর' নয়, যাকে আমরা সোজা কথায় বন্ধুত্ব বলি তাই হোক।"

নাম জানাজানির পালা নেই; তবুও আলাপ জমিয়া উঠিল। অর্থাৎ একালটা হিন্দুয়ানীর সেকাল নয়। আপনারা অবশ্য আমার এই নবলব্ধ বন্ধুটির নাম, জাতি ধাম ইত্যাদি জানিবার জন্য খুবই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন,— উঠিবারই কথা। কিন্তু পরিচয় না জানিলেও কোনো ক্ষতি হইত না। আমার বন্ধুর নাম হইতেছে শ্রীহারাধন চক্রবর্ত্তী; নামেই জাতের পরিচয় এবং বন্ধুর সঙ্গে এইটুকু পথ হাঁটিয়া আসিলে ধামের সন্ধান মিলিবে।

কলিকাতা সহরের সদাগর আফিসের কেরাণীর আবাস-গৃহ আমাদের এতই সুপরিচিত যে তা'র বিবরণ অনাবশ্যক বলা চলে। সরু গলি, প্রত্যেক বাড়ীর যত-কিছু আবর্জ্জনা পাশের বাড়ীর দরজার ধারে গিয়া জমা হয়। ড্রেনের উগ্র গন্ধ, দুবেলা মেথরে পরিষ্কার করিলেও তা'র সৌরভ ঘুচিতে চায় না। সকালবেলার হুড়োহুড়ি দশটা বাজিতে না বাজিতে ঝিমাইয়া আসে, চলা সুরু করে স্ত্রীকণ্ঠে আলাপ, বিলাপ এবং তারপর তাণ্ডব কলহ; আবার সন্ধ্যা নামিতেই সব ক্লান্তি একত্রে ঘোট বাঁধিয়া খোপে-ফেরা পায়রার মত ঝিমাইতে সুরু করে। সব একই ধরণের—আলাপ, বিলাপ, কোলাহল, ক্রন্দন ও কোন্দল।

হারাধনের বাহিরের ঘরের সঙ্গে বারান্দার তফাৎ কিছুই নাই। মাঝখানে একটা চট টাঙ্গাইয়া অন্দর ও বাহিরের সীমানা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। হারাধন একটা টুল আগাইয়া দিয়া বলিল, "ব'সো ভাই, ব'সো।"

হারাধনের দু'টি মেয়ে বড়টির বয়স বছর আট নয়,

ছোটটি বছর ছয়েকের। এরপরের দু'টি,—একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে মারা গিয়াছে। বড়মেয়েটি এক পেয়ালা চা এবং একটি ছোট্ট ডিবায় করিয়া দু'টি পান দিয়া গেল। হারাধন বলিল, "দেখচো ভাই, মেয়েটা ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠচে আর চার পাঁচ বছর পরেই পার করতে হবে, অথচ মাইনে যা পাই তা'র এক কানাকড়িও জমে না।"

"সবায়ের এই একই অবস্থা। যে রকম দিনকাল পড়ে আস্‌চে, তাতে চালচলন একটু বদলাবে নিশ্চয়।"

"সে ভরসা আর কৈ? সেদিন আফিসে এক নতুন ছোকরা ঢুকেচে, তার সঙ্গে আমার শালীর বিয়ের কথা পেড়েছিলুম। ছোকরা বলে, মেয়ে লেখাপড়া জানে? গান জানে? আর ওদিকে তার বাপ বলে, তিনটে মেয়ে পার করতে গিয়ে দেনায় ডুবেচি, বড় ছেলের বিয়েতে নগদ ও গয়নাতে দেড়টা হাজারের কমে পারবোনা।"

এমনি করিয়া যাওয়া-আসার মধ্য দিয়া হারাধনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। তবুও আমার মনের মধ্যে কূট-তার্কিকের শ্রান্তি নাই, সে বলিতেছে, "বন্ধুত্ব তো বেশ জমিয়ে তুলেচো, কিন্তু গল্প কৈ? প্রাণ; যৌবন কৈ?"

"কি রকম কথা? হারাধনের সুখও আছে, দুঃখও আছে,—একি গল্প নয়?······ওর বৌ ওর জন্যেই কত কষ্ট করে রাঁধে, ভাতের থালা সামনে ধরে দেয়, আপিস যাওয়ার জামা-কাপড় কাচে, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে, জামায় বোতাম বসায়। একি কম সুখের কথা?

হারাধন ত' স্পষ্টই বলে, "আমার বৌয়ের মত বৌ খুব কম লোকেরই আছে।"

বৌয়ের প্রেমে ও মশগুল, একথা আমি অক্লেশে বলিতে পারি। একদিন সে বলিতেছিল, "ওকে আমি যখন বিয়ে করি, তখন ওর বয়স বছর বারো, একেবারে ছেলেমানুষ। আর আমি তখন কলেজে পড়ি, ফেল টেল করে পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকিনি। সবে মানে বুঝে ইংরিজি কবিতা পড়্‌তে সুরু করেচি, রবিঠাকুরের কবিতার মানেও তখন একটু একটু বুঝতে পারতুম। 'একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এই তরুমূলে'—এখনও আমার মুখস্থ আছে। ভাবলুম ঐ একটা ছোট্ট কচিখুকীর সঙ্গে কি করে পিরীত করবো। পীরিতের ও কিই-বা বুঝবে। তোমার বুঝি কথাটা পছন্দ হচ্চেনা, তোমাদের ইংরিজিতে ওকেই বলে 'লাভ্'।······তারপর ফুলশয্যের রাত্তিরেই বুঝলুম, ভয়ে আগাগোড়া জড়সড় হয়ে থাকবার ধরণের মেয়ে ঠিক নয়। আমি ওর চেয়ে ঢের বড়, তবুও আমি ওর বর বলে অক্লেশে তুমি বলে কথা কওয়া সুরু করে দিলে। অবিশ্যি ও আগে কথা কয়নি, আমিই সাধ্যিসাধনা করে কইয়েচি।"

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "তারপর? তারপর কি হ'লো?"

হারাধন হাসিয়া কহিয়াছিল "এদেশে এতটুকু মেয়েতেও বর কি বোঝে। রোজ সকালে উঠে স্বামী বলে পায়ের ধুলো নেবে, এমন কি পাদোদকও খাবে, আবার ক্ষেপলে লাথি ঝাঁটারও বাকি রাখবে না। সাহেব মেমেরা দিশী পীরিতের কি মর্ম্ম বুঝবে? শুধু দিনরাত 'ভালোবাসি' 'ভালোবাসি' করলে ত পেট ভরবেনা, দুদিন বাদেই ছেলেপিলে হবে, তাদের মানুষ করতে হবে,—শাস্ত্রেই বলেচে, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা,'—ভুললে চল্‌বে কেন? প্রথম দু'চারদিন—বেশ—মন্দ লাগেনা।"

"তোমায় ভাই একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, কিছু মনে করতে পারবে না। তোমার বৌ তোমাকে খুব ভালবাসে,—তাই না?"

"আচ্ছা পাগল।" হারাধন হাসিয়া উঠিয়াছিল।

একেই বলে রীতি-মত দাম্পত্য প্রেম। এর মধ্যে অবৈধতার গন্ধ লেশমাত্র নাই, বরঞ্চ তুলনায় বলা চলে, ইহা হইতেছে 'রজকিনী প্রেম, নিকসিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।'

নিরাবিল দাম্পত্যপ্রেম বলিয়া যে সেখানকার আকাশে কালো মেঘেরা মাঝে মাঝে দৌরাত্ম্য করিবে না এমন কোনো কথা নাই। হারাধনও মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া ওঠে, বলে, "ঘর সংসার ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি।"

"কেন তোমার আবার কি হলো?"

"আর ভাই দিনরাত্তির ঝগড়াঝাঁটি আর ভালো লাগেনা। বেশী টাকা রোজগার করতে পারিনা, সে কি আমার দোষ?

মা বুড়োমানুষ, তাঁর অত খাটুনি পোষায় না। বৌ বলে, চিরজীবন ধরে ভাতের হাঁড়ি ঠেলে চল্‌তে পারবো না। আরে বাপু, যার যেমন কপাল, যার যা কাজ—।" হারাধন থামিয়া গেল। অর্থাৎ ওর সঙ্গে ওর বৌয়ের ঝগড়া হইয়াছে। অপরিসর জায়গায় দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তু ঠাসিয়া রাখিলেই একটু আধটু ঠোকাঠুকি হইবে বৈ কি।

হারাধন শুনাইয়া বলে, "দু'টি তো মেয়ে, বিয়ে দিয়ে পার করতে পারলেই নিশ্চিন্তি। তারপর লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। ·····"

হারাধনের মানসী সমস্বরে ভয় দেখায়, "তার আগে আমি গলায় দেবো দড়ি, তারপর আর একটাকে বিয়ে করে লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, যা ইচ্ছে তাই ক'রো,— আমি দেখতে আসবোনা।"

কিন্তু এই ঠোকাঠুকি অর্থাৎ লাঠির পাঁয়তাড়া বেশী বেশীক্ষণ চলিতে পারে না, কারণ স্থানের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং শান্তির শ্বেতপতাকা তুলিয়া সন্ধি স্থাপিত হয়, বৌ-আবার ভাতের থালা সামনে ধরিয়া দেয়, এমন কি একটা পাখা লইয়া স্বামীকে ব্যজন করিতেও বসে এবং হারাধনের বিবাগী মন একটা টাকা বাহির করিয়া রাখিয়া যায় স্ত্রীর রেশমী চুড়ি কেনার জন্য।

শরৎকালের সঙ্গে হারাধনের সংসার যাত্রা তুলনা করিতে আমার ভালো লাগে। মেঘের হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকির ভয়ে ছাতা খুলি বটে, কিন্তু আওয়াজ ফাঁকা। তেমনি এর রোদও এমন ফুটিফাটা নয় যে তা'র জ্বালায় দিকভ্রান্ত হইয়া ছুটাছুটী করিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ের পুকুরের মত, সুগভীর নিশ্চিত শান্তিতে সর্ব্বক্ষণ টল্ টল্ করিতেছে, শুধু ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষণেকের জন্য ছোটোখাটো তরঙ্গ দেখা দেয় মাত্র। তারপর জাতির সংস্কারে এর খাদ যদি গভীর করিয়া খোঁড়া থাকে, তবে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রও শুষিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না। তাই এরা এখানে বিস্তার তাজমহল গড়িতে চায়না রাষ্ট্র রচনায় লক্ষ লক্ষ নরবলি দিয়া রক্তগঙ্গাও বহাইতে চায়না, তেমনি এই রক্তমাংসের মর্ত্ত্যলোকে ধর্ম্ম দিয়া স্বর্গসৃষ্টির দুঃসহ একঘেয়েমিও বহিতে চায়না, দূর হইতে নমস্কার করিয়া বলে, "তোমরা প্রকাণ্ড মানুষ, তোমাদেরই ও কাজ করা সাজে। আমাদের এর জন্যে আর বলি দিয়োনা। কোনো রকমে ভগবানের মুখ চেয়ে আমরা টি'কে আছি।"

এই চিন্তাবিলাসে বাধা দিল কূটতার্কিক; বলিল, "বাঃ বাঃ বেশ হচ্চে। তোমার উচ্ছ্বাসটাই গল্প হয়ে দাঁড়াবে নাকি?"

"না তা নয়। মানুষের মৃত্যু কতখানি হাসির খোরাক যোগান দিতে পারে মেপে দেখছিলুম।"

"কি তর্ক করতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি?"

"অত সময় নেই। আমি ভাবচি, হারাধনের দুঃখটা ঠিক কি? আজও আমায় ভেঙ্গে বলচে না কেন? ওর দুঃখটা বর্দ্ধমানের ডাঁটার মত, কিম্বা আঁকের মত চিবিয়ে চিবিয়ে রস উপভোগ করার জিনিস হবে?"

হারাধন আজকাল খুব ব্যস্ত, খুব রাত করিয়া না গেলে দৈবাৎ ওর সাক্ষাৎ মেলে। শুনি, উপরি রোজগারের ফন্দি ফিকিরে ও সর্ব্বদাই ঘুরিতেছে, আর বর্ত্তমানে অদৃষ্টটাও মন্দ নয়, দু'চার পয়সা ঘরেও আসিতেছে। পকেটে পয়সা থাকিলে মেজাজটা খুব খুসী ধরণের হওয়ার কথা, অন্ততঃ পক্ষে হাসিটা চাপিয়াও চাপিয়া রাখা যায় না—এই ধরণের মুখটা হওয়া উচিত। কিন্তু হারাধনের মুখ দেখিয়া স্পষ্টভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, মনে হয়, কোথায় যেন একটু-খানি কিন্তু আটকাইয়া গিয়া ওর হাসি খুসিটাকে মাটি করিয়া দিয়াছে।

আমি বলিলাম, "হারু তোমার পক্ষে উচিত হচ্চেনা--।"

"কি?"

"এই সব—আমায় ভেঙে বলচোনা।"

"কেন ভাই, আমি প্রায় সব কথাই তো বলি।"

"না বলনা, আমি অনেকদিন লক্ষ্য করেচি, তুমি থেকে থেকে হঠাৎ মন-মরা হয়ে যাও। তোমার কী যেন হয়েচে।"

হারাধনের মনের মধ্যে ঢুকিবার গেট বোধ করি এবার খুলিয়া গেল। ও আমাকে শুনাইল, "জানোইত দাদা, দিন আনি দিন খাই, গরীব কেরাণী। এদের ছেলে পিলে বেশী হওয়া উচিত নয় মানি। আজকাল সকলেই বলে খবরের কাগজেও লেখে,—আমরাও অন্যায় বলি না। গরু ছাগল ভেড়াকে আলাদা ক'রে খাঁচাপুরে রাখতে পারো—খুব সহজ,—কিন্তু আমরা মানুষ, জন্তু জানোয়ার ঠিক নই।···

না, না, আমি ওসব কথা বলচিনা—"

"ব্যাপারটা খুলে বলোই না।"

"দাঁড়াও ভাই বলচি। এই কথাটা হচ্চে, সারাদিন খেটেখুটে বাড়ী ফিরলুম, ফিরে' দেখি কি সব নিঝুমঝুম। চেঁচামিচি নেই, হাসাহাসি নেই, এমন কি একটু কান্নাকাটিও নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, ঘরে কচি-কাচা না থাকলে একটুকুও মানায় না। তুমি বলবে, মানায় না বটে, কিন্তু দু'বেলা তাদের মুখে দুটো অন্ন দেবার ব্যবস্থা তো দেখতে হবে। সে ত বটেই; পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেচি, খেটেখুটে রোজগার করে আনতেই হবে।

"বৌদি কি সন্তান-সম্ভবা হয়েছেন?"

"হুঁ, ঠিক ধরেচ ভাই। এই জন্যই ত বড় ভাবনায় পড়ে গেচি।"—হারাধন গুম হইয়া বসিয়া রহিল। একটু পরে কহিল, "ছেলেটা হয়ে খুব বেশীদিন টেঁকেনি, নিজে ভুগে গেছে, মাকেও যথেষ্ট ভুগিয়েচে। মেয়েটার বেলায়ও এমনি। তাই এবারে বড্ড ভয় পাচ্চি। লোকের গোলমাল বাধে প্রথম বারে, আমার বেলায় সবই উল্টো।"

আমি ওকে আশ্বাস দিলাম, "দেখো ভাই, সব নির্ব্বিঘ্নে হয়ে যাবে। অতো ভেবো না।"

"কথাটা কি জানো? শোনো তবে। কেরাণীগিরিই করি, আর যাই করি, হিন্দুর ঘরে বামুনের ছেলে হয়ে জন্মেচি। তাই বংশলোপ হবে—এটাকে ঠিক সহ্য করতে পারি না। মলে পিণ্ডি দেবে, পিতৃপুরুষদের বছরে অন্ততঃ একবার এক গণ্ডুষ জল দেবে—এমন কেউই আমার থাকবে না ভাবতে বড়ই কষ্ট হয়।"

ব্যপাটা তাহা হইলে সন্তানের জন্য ঠিক নয়, পিণ্ডাধিকারীর অভাবের তীব্র বোধ হইতেছে তার হেতু।

"আচ্ছা, ওর দিক থেকেই দেখো না, ওকে আমি কি দিয়েচি? গয়না গাঁটি না, একখানা ভালো কাপড়ও না, তবু ও আমার জন্যে দিনরাত খাটচে, আমার ঘরই সাজাচ্চে। ওর কি আছে? ও যদি একটা ছেলে চায়,—সে কি অন্যায় হবে? ওর একটা ছেলে হবে, কোলে কাঁখে ক'রে ঘুরে বেড়াবে, ওর চোখের সামনে বড় হবে, মানুষ হবে, ঘর-সংসার করবে—এইটুকু সুখের আশায় ও প্রাণ দিয়ে খেটে আমার সংসার করচে। ওকে এটুকু সুখী আমি করতে পারবো না?"

অর্থাৎ মানসিক, মাদুলি, এবং বুড়ীঅশ্বত্থতলায় শুধু মেয়েমানুষের ভীড় জমিয়াছে তা নয়, তা'র কাছে-কিনারায় পুরুষ মানুষেরও কামনা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়।

তবুও মানুষ বিচিত্র বলিয়াই এই সংসারটা বিচিত্র। তাহা না হইলে রোজ চন্দ্র-সূর্য্যের একঘেয়ে উদয়াস্ত দেখিতে দেখিতে মানুষ মাত্রেই পাগল হইয়া যাইত।

সুতরাং হারাধনকেও ওর এই দুঃখের প্রতিবেশে ঠিক সামান্য সাধারণ মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল যেন বহু-লোক ওর কণ্ঠে তাদের সুর মিশাইয়া দিতেছে, শুধু তাই নয়,—আমার চোখের সামনেই এই জল-জ্যান্ত মানুষটা হঠাৎ অতি দ্রুতবেগে কালসমুদ্রের ছায়ায় ঢাকা প্রত্যন্ত পুলিনতীরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল এবং তা'র সঙ্গে সঙ্গেই এই বর্ত্তমান লোকের অতি-মুখর গতি-রাগের রঙ্গও লুপ্ত হইয়া গেল। তারপর সেই প্রদোষের অস্ফুট আলোয় দেখিতে পাইলাম ছোট-বড়-মাঝারি তরুবীথি, বন্ধুর পথরেখা, নদীর শ্যামল তটভূমি, তা'রই মাঝে এখানে সেখানে ছড়ানো পর্ণকুটীর, গৃহধেনুর সহসা উচ্চরব এবং দু'দশজন জটাজুটধারী মুনিঋষির শান্ত চলাফেরা। সব দীর্ঘকায়, উজ্জ্বলবর্ণ, বলিষ্ঠ গতি-ছন্দ, অথচ কোনো ত্বরা নাই। থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক পাতার মর্ম্মরধ্বনি ছাপাইয়া উঠিতেছে অতি প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্রের সুরে-গাওয়া আবৃত্তি। প্রকৃতির লীলায়, প্রভাতী রৌদ্রের অনাবিল মায়ায় সে আনন্দ যেন আপনাকে বিস্তার করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই অগ্নিশালা, তার অনির্ব্বাণ শিখা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া প্রণতি জানাইতেছে।

এরই মধ্যে একটি গৃহের অঙ্গণে দেখি ভীড়। একটি পুরুষ একটি নারীকে বামে লইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, তা'রই চারপাশে নানা আকারের মুনিঋষির জটলা, নানাস্বরে শ্লোক ও মন্ত্রের মুহুর্মুহু আবৃত্তি এবং সামনেই বেদীর উপর অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জ্বলিতেছে। পুরুষটিকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিলাম, মনে হইল, ইনিই হইতেছেন আমার বন্ধু

শ্রীহারাধন চক্রবর্ত্তীর রক্তের পূর্ব্বপুরুষ, সাদৃশ্য স্পষ্ট, দেহের কাঠামোও সেই ধরণের, তবে রঙ্ খুব ফরসা,—হারাধন পর্য্যন্ত পৌছাইতে গিয়া সে রঙ এত যুগযুগান্তরের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে পুড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে। আবৃত্তি আহুতি ও ক্রিয়াকাণ্ডের বৈচিত্র্যের অর্থ আমি এ যুগের মানুষ হইয়া ঠিক বুঝিতে পারিনা। শুধু এইটুকু মাত্র বুঝিলাম, ইনি গার্হস্থ্য আশ্রমকে আশ্রয় দিয়া হারাধন পর্য্যন্ত নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবতাদের আহ্বান করিয়া খুসী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই বারংবার প্রার্থনা হইতেছে, "হে দেবতা, এই নারীকে অবলম্বন করিয়া যে ধারার সৃষ্টি করিলাম, তাহা যেন অক্ষয় থাকে, অবিচ্ছিন্ন থাকে, তার কর্ম্মযোগ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে পিতৃলোকের শুভাশীর্ব্বাদে যেন কখনো বঞ্চিত না হয়……"

দেখিতেছি এবং ভাবিতেছি, এর চেয়ে ঢের ঢের আগের এক যুগের কথা। অজৈব জগৎ তখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে পক্ক হইতেছে, সহসা সেই রাসায়নিক পাকে জীবন আবির্ভূত হইয়াই বলা সুরু করিয়াছে, "এতপ্রাণ, এত প্রাণ! আমি দেহে ধরে রাখতে পারচি না—খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছি, মরে যাচ্ছি,…"

সেই অনতিস্ফুট বাণীর মর্ম্মধ্বনি শুনিতেছি, আর ভাবিতেছি, এই যজ্ঞকাণ্ড কি তারই বিরুদ্ধে একটা বিপুল অভিযান?……

বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না, মনের মধ্যে কূটতার্কিক দেখা দিয়া বলিতে সুরু করিল, "এই তোমার গল্প হচ্ছে? প্রত্নতত্ত্বও গল্প! তা'র চেয়ে প্রবন্ধ লেখোনা কেন? ঢের ভালো হতো যে—"

নাঃ, এই তার্কিকদের জ্বালায় আর পারিয়া উঠিনা।

ওর ধাক্কায় মনটা মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতেই দেখিলাম, হারাধন মুখটি মলিন করিয়া আমারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে।

"কি আশ্চর্য্য, তুমি এখনও বসে আছো?"

"তোমার একটা পরামর্শ নেবো। ও বলচে গোলমেলে ব্যাপার, ডাক্তার দেখানোই ভালো। আমিও তাই মনে করচি একজন ভালো ডাক্তার দেখিয়ে আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।"

হারাধনকে সঙ্গে করিয়া এক ডাক্তার বন্ধুর কাছে যাওয়া গেল। আমার ডাক্তার বন্ধুটি সব দেখিয়া শুনিয়া হারাধনকে আশ্বাস দিয়া গেল, "ভয়ের তেমন কিছুই নেই। ভালো করে খেতেটেতে দিন, কোনো গোলমালই হবেনা।"

"খেতে যে চায়না—"

"খাওয়া তো নিজের জন্যে নয়, যে আস্‌ছে তারই জন্যে —বুঝিয়ে বলবেন।"

হারাধনের মুখে হাসি ফুটিল। আমাকে চুপি চুপি বলিল, "এবার সব লক্ষণই অনেকটা ভালো। তারপর আবার হঠাৎ উপরিও বেশ পাচ্ছি। বাড়ীতেও সব বলছিল, ছেলেই হবে,—সব লক্ষণই সেই ধরণের।"

হারাধন নিশ্চয়ই মনে মনে আয়-ব্যয় খতাইয়া লাভের হিসাব কষিতেছে, তাহা না হইলে ওর এই ধরণের অহেতুক কৈফিয়তের ঠিক কোনো মানে হয় না।

দিন যতই যায়, ততই দেখি হারাধনের মুখটা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অহরহ উৎকণ্ঠা উদ্বেগ ও নৈরাশ্য বুকের মধ্যে চাপিয়া চলাফেরা করা অতি কঠিন ব্যাপার, তখন মানুষের স্নায়ুমণ্ডল হঠাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ওঠে, কোনো নিবারণই মানে না, তাই সর্ব্বদাই মনে হইতে থাকে, এই বিরাট সভাস্থলে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বুঝি বা কাছাই খুলিয়া গেল। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, ঐ মনেরই পটভূমিকায় রঙের উপর রঙ্ চড়াইয়া বড় বড় আশাতরু ফলাইয়া তোলা, অর্থাৎ আকাশ কুসুম রচনা করা। তাহাতেও নিস্তার নাই। প্রেমে পড়ার পর প্রেমিকের অভিসার সফল হইলে তার মন যেমন চঞ্চল হইয়া ওঠে, তেমনিতর ওর চাঞ্চল্যের জ্বালা; ফুলশয্যার রাতের পর নূতন বর যেমন করিয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিভৃত সান্নিধ্য খোঁজে, তেমনি করিয়া ওকে ইঙ্গিতের পরম্পরার হিসাব মনের কাছে ভাঁজিতে হয়। আরও সোজা করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, পিঠের মাঝখানটা হঠাৎ খুব চুলকাইতেছে অথচ সেখানে হাত কোনো ক্রমেই পৌছাইতেছে না।

মনের মধ্যে কূটতার্কিক বলিল, "দেখ বাপু, তোমার বন্ধুটি নেহাৎই মেয়েলি ধরণের পুরুষ মানুষ। সামান্য ব্যাপারে এতটা ন্যাকামি আমার সহ্য হয় না।"

"বুঝেচি। তোমার রাগ হচ্চে, ও এই বেড়ালের রাজ্যে হলো বেড়াল হয়ে উঠতে পারলো না কেন। সে তো ওর দোষ নয়, আর তার জন্যে ওর ভাগ্যকেও আমি দুষ্‌তে পারবো না। আমার বিশ্বাস, ও যদি য়ুরোপে জন্ম নিত তাহলেও ও ঐ হ'তো। ঐ জন্যেই তো আমার ওকে এত ভালো লেগেচে।"

আঁতুড়ঘরের যে-সব নূতন ব্যবস্থা হইল, তাহাকে সনাতন রীতির অতিক্রম অথবা ব্যতিক্রম বলা ঠিক চলে না, তবুও বলা যায় ওরই মধ্যে মন্দের ভালো।

তারপর পরীক্ষাকারিনীদের সব আয়োজন সার্থক করিয়া এই চক্রবর্ত্তী পরিবারে একটি শিশু অতিথির সুনির্ব্বিঘ্ন আবির্ভাব ঘটিল, এবং সদ্যজাতের ক্রন্দন ডুবাইয়া স্বাগত সম্ভাষণের শাঁখও বাজিল। হারাধনের ছোট মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবা, বাবা, ভাই হয়েচে—কেমন ছোট্ট সুন্দর—"বলিতে বলিতে তেম্‌নি ছুটিয়াই সে অন্দরে ঢুকিল।

হারাধন তার অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ীটা এবার আর ফেলিয়া দিল না, পকেটে তুলিয়া রাখিল, তারপর আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "যাক্, বাঁচা গেল।"

সায় দিলাম, "হাঁ একটি দুর্ভাবনা কাটলো।"

খানিকপরে ওর বড় মেয়েটি আসিয়া আমার কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন কাকাবাবু, ভাইটি খুদে খুদে চোখে একবার মিট্‌মিট্ ক'রে চাইলো। ওরা কি এখন দেখ্‌তে পায়? বুঝ্‌তে পারে?"

আমার সহসা মনে হইল, এই নাট্যরঙ্গে নায়িকা যে নারীটি,—যার মারফত একটা খুসীর সংবাদ এই অভাবের হাটে আসিয়া হাজির হইয়াছে, সেই নারীটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমি অবিচার করিয়াছি। রোগ, শোক, শত অভাব, অভিযোগ ও অশান্তি স্তূপের মধ্যে অহরহ চলাফেরা করিতে গিয়া সে পদে পদে আহত হইয়াছে, তবুও নালিশ জানায় নাই, অভিশাপ দেয় নাই, হাড়ভাঙা খাটুনি দিয়া নির্ব্বাকে স্নেহনীড় রচিয়াছে। তারপর শোকে শীর্ণ, রোগে জীর্ণ ঐ নারীটি এত দুঃখ কষ্ট সহিয়া যাহা আনিল, তাহা কি এই হাটের মধ্যে ক্ষণিকের খুসী বিতরণ করার জন্য? সে যখন তা'র শীর্ণহাতে শিশুপুত্রটি বুকে চাপিয়া ধরে তখন কি —'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'—এই খুসীটির আভাস কি তাহার চোখের ঐ ক্লান্ত চাহনিতে ফুটিয়া ওঠে?

হারাধনের সঙ্গে তুলনা করার ইচ্ছায় ওর দিকে চোখ ফিরাইলাম। দেখিলাম, হারাধন ঠিক সেই ভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া আছে বটে, কিন্তু এ হারাধন একটি নয় দু'টি, এবং দুই মূর্ত্তিই ছায়ার মত অস্পষ্ট।

একটি হারাধন বলিতেছে, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।"

তার মানে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এবার আর পিতৃলোকে পিতৃপুরুষদের জলগণ্ডুষের অভাবে গলা শুকাইয়া কাঠ হইবে না এবং ওর মৃত্যুর পর কলা-চালে চটকানো বাঁধা বরাদ্দ পিণ্ড ঠিক সময়মত মিলিতে থাকিবে। অতএব ওর ভাবখানা প্রায়-নিশ্চিন্ত ধাঁচের।

দ্বিতীয় হারাধন বলিতেছে, "বাপু, খুব সোজা ব্যাপার নয়। এখন দুধ চাই, জামা চাই, কাপড় চাই, তবে ত মানুষ হবে। তারপর আবার লেখাপড়া শেখানো আছে—আরো কত কি আছে। সেই সঙ্গে গুণে দেখেচো ক'টাকা মাইনে পাও? ভেবে দেখেচো? চল্‌বে তো?

প্রথম—"অতো ভাববার দরকার নেই। যেমন ক'রেই হোক চলে যাবে।"

দ্বিতীয়—'শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারবে তো?'

প্রথম—'ওসব অলক্ষুণে কথা আবার এর মধ্যে কেন?'

বুঝিলাম এই দুই হারাধনের সান্নিধ্য আজ ঘটিয়াছে দ্বন্দ্বে, চুলোচুলি করার জন্য। এবং মনে হইতেছে, এরা চুলোচুলি করিয়া একটা মীমাংসায় শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে এমন ভরসা খুবই কম এবং বোধ করি আসল হারাধন চিতায় উঠিলেও না।

আসল হারাধনের মুখের চেহারাটি হইয়াছে অপূর্ব্ব। মানুষের মুখের দুই ভিন্ন প্রকৃতির এই অপরূপ সমন্বয় আমি আগে কখনো দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। প্রচণ্ড শীতে স্নান করিতে গিয়া ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালিতেই সর্ব্বাঙ্গ যেমন শিহরিয়া ওঠে, মুখটা অনেকটা তারই মত।

মনের মধ্যে কূটতার্কিক বলিতে সুরু করিল, "এর

তত্ত্বকথাটা আমার কাছে শোনো। প্রত্যন্তকালে চিন্তা-ঈথরে একটা ঢেউ উঠেছিল, এবং তারপর শক্তি অক্ষয় বলে সেই ঢেউটা মানুষের মনের পথে সুড়ঙ্গ কেটে সংস্কারের আকার নিয়ে বেয়ে চলেচে। কিন্তু যে দেহের থেকে ঐ মনের উৎপত্তি, এই আধুনিক অর্থের রাজত্বে এসে সেই দেহটারই মালমশ্‌লা গেছে বদ্‌লে। সুতরাং সংসারের কল্যাণে ঐ সংস্কার আকারে ছাড়া শক্তির মোড় ঘুরতে না পারলে—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "ছুঁড়ে ফেলে দাও তোমার সংসারের কল্যাণ। বন্ধু আমায় একটা আজব চীজ দেখিয়েচে। আমার মন ভরে উঠেচে খুসীতে, হাসিতে; আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করচে—"

"নাচ্‌তে—?"

"আলবাৎ। চুলোয় যাক না তোমার হারাধন চক্রবর্ত্তী; তার ছেলে বাঁচুক আর দুধের অভাবে শুকিয়ে মরুক,—আমার তা'তে কি? যে রাস্তার মোড়ে ওকে কুড়িয়ে পেয়েচ, সেই মোড়েই আমি ওকে এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে আসতে রাজি।

"তবে হাঁ, ও আমায় দেখিয়ে দিয়েচে বিধাতার কী তাজ্জব কারখানা। এর আনন্দ আমি কখনো ভুলতে পারবো না। সংসারমরুভূমিতে কি হাসি মাত্রেই এমনি সকরুণ কান্নায় পড়বে ফেটে আর দুঃখাশ্রু উঠবে ফুটে রক্ত-গোলাপের হাসির রঙে?—ভারি, ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার,—অতি চমৎকার!—চমৎকার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

দক্ষিণ ভারতে কয়েকদিন

শ্রীনিধিরাজ হালদার

প্রায় জানুয়ারীর শেষাশেষি সেবারে শীতের কন্‌কনে ভাবও ছিলনা। তা' ছাড়া মনটাও সকল সময় বাইরের দেশ বিদেশের পানে ঘুরে বেড়াবার তালে নাচতে সুরু করেছিল সুতরাং সুযোগ পেতেই তার সৎব্যবহারের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল। ঠিক হল দক্ষিণ ভারত রামেশ্বর পাড়ি দিতে হবে। দিন ক্ষণের ব্যবস্থা সুরু হোলো। তারপর মঙ্গলের ঊষা বুধে পা এবং সর্ব্বসিদ্ধ ত্রয়োদশী এই দুটো মেনে বুধবার বৈকাল ৫।১২ মিনিটের মাদ্রাজ মেলে চড়ে বসলুম। গাড়ীতে সহযাত্রী ছিলেন এক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ও কয়েকজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। বাংলা মুলুকের লোক বলতে একা আমি। রাত্রে আর কোন কথাবার্ত্তা বিশেষ কারুই সঙ্গে হয়নি, তবে তারা যে তাদের জন্মভূমি মাদ্রাজে চলেছে এটা সামান্য একটু আলাপেই বেশ বোঝা গিয়েছিল। রাত দশটার মধ্যেই যে যার বিছানা, কম্বল বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া গেল। আমি একা জেগে জেগে চিন্তা করতে লাগ্‌লুম কি ভাবে এবারের এই ভ্রমণটাকে বেশ আনন্দজনক করে তোলা যায়। ঠিক করে ফেললুম পরদিন মধ্যাহ্নে গাড়ী ওয়ালটিয়ার এলে সেইখানেই সমুদ্রের ধারে দু'একদিন উদ্বেলিত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত প্রাণ ভরে উপভোগ করব। আমার চোখে ঘুম ছিল না, কোনও রকমে চোখ দুটো বুজে কয়েক ঘণ্টা পড়ে রইলুম মাত্র। গাড়ীর কিন্তু কর্ম্মের বিরাম নেই হুহু শব্দে ছুটে চলে যাচ্ছে। কতক্ষণ আর চোখ বুজে হাঁ করে শুয়ে থাকা যায়? আস্তে আস্তে বিছানার ওপর উঠে বসে এ্যাট্যাচি কেস থেকে মোপাসার একখানা গল্পগ্রন্থ বার করে পড়তে সুরু করে দিলুম। গল্প পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম যে কখন ভোর হয়েছে তা' আমার খেয়াল ছিলনা। বেলা তখন আটটা ক'মিনিট হবে আমাদের ট্রেনখানা জংসন ষ্টেশনে এসে থেমেছে। আর ঘণ্টা কয়েক বাদে ওয়ালটিয়ার পৌছব।

পাশের মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি ওয়ালটিয়ারে নামবেন?"

হ্যাঁ, না ক'রে উত্তর দিলুম—"না, এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি কি করব, তবে নামবার ইচ্ছা আছে।"

পরে সহযাত্রীটির সঙ্গে কত কথাই হল। জন্মের প্রথম দিন থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ে ভদ্রলোকটির সঙ্গে অনেক জটিল প্রশ্নের তর্ক হল। জীবনের রহস্য ভেদ করে মানুষের স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করলুম কিন্তু কোথায় যে এর শেষ তা' আলোচনা করতে করতে গাড়ী ওয়ালটিয়ার এসে থামল। তখন বেলা প্রায় একটা ক'মিনিট। মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি তাঁর ঠিকানা দিয়ে ঐখানেই নামলেন।

গাড়ী আধ ঘণ্টার জন্য দাঁড়াবে কাজেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। সম্মুখেই একটি হিন্দু হোটেল দেখে আহার্য্যের মেনু জানবার ইচ্ছা হল। রসম্ (ডালের জলের সঙ্গে তেঁতুল ও লঙ্কা গুলে একটি মুখরোচক পানীয়) ও কলাইয়ের ডালের আধকাঁচা বড়া। কাজেই বাহির থেকে হোটেলকে নমস্কার করে গাড়ীর কাছে ফিরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সারারাত ও একটা দিনের গোটা আধঘণ্টা কাটানর পর শরীরটা বেশ নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। ষ্টেশনের কলে বেশ করে মাথাটা ধুয়ে উদর পূজার সামগ্রী সংগ্রহের আশায় ষ্টেশনের একমুড়ো থেকে আর একমুড়ো পর্য্যন্ত দু'একবার পায়চারী করে দেখলুম। কিন্তু এমনি বরাত যে কড়ায়ের ডালের বড়া আর কোকো ছাড়া কিছুই খাবার মত খুঁজে পেলুম না। বাধ্য হয়ে ভাবলুম দু'একদিন না হয় নাই খেলুম। কিন্তু ক্ষুধা যেন দুনিয়া পর্য্যন্ত গ্রাস করতে চাইছিল। এই পোড়া

পেটের জন্যইত এত গোল। কি জানি কোন্ ভাগ্য বলে এমন সময় কলা ও কমলালেবু নিয়ে একজন উপস্থিত হল।

এক পয়সার জিনিষ চার পয়সায় কিনে মনে মনে ফিরি-ওয়ালার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়ী ছাড়ার তখন আর মিনিট দুই দেরী।

যাত্রা পথের পথিক আমরা। যাত্রা আবার সুরু হল। গাড়ী আপনার মনে চলতে লাগল যেন তাহার কর্ত্তব্যের বিরাম নেই। গাড়ীর ভেতর বসে বসে মনে হতে লাগল যেন গাড়ীর সঙ্গে আমরাও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছি। আর পিছনে পড়ে থাকছে কত ঝোপ ঝাপ, নালা ডোবা, চাষাদের মেটে ছোট ছোট ঘর বাড়ী, গাছপালা, মাঠ আর মাঠ। যতদূর দৃষ্টি যায় চেয়ে দেখলুম মনে হল যেন কোন দিগন্তের পানে ছুটে চলেছি। গোদাবরী ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল। প্ল্যাটফর্মে নেমে দেখতে পেলুম সাম্‌নে প্রকাণ্ড এক নদী। স্থানে স্থানে তার বালুর চর। সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম এই-ই সেই গোদাবরী নদী। গোদাবরী দৈর্ঘ্যে প্রায় ন'শ' মাইল। ইহা ধলেশ্বর নামক স্থান থেকে গোতমী ও বশিষ্ঠা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আবার ঐ দুই শাখার মধ্যে গৌতমী থেকে তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভরদ্বাজী ও বশিষ্ঠা থেকে বৃদ্ধা গৌতমী ও কৌশিকী প্রবাহিত হয়েছে। আবার এই সপ্ত স্রোতের সম্মিলন স্থান সপ্ত গোদাবরী নামে খ্যাত। এই সঙ্গম স্থল দাক্ষিণাত্যে পরম পুণ্য তীর্থ বলে প্রসিদ্ধ।

নদীর কথা বাদ দিয়ে এখন গ্রামের কথাই ধরা যাক। গ্রামখানিরও নাম গোদাবরী। সম্ভবতঃ নদী থেকেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। মাদ্রাজ প্রদেশের এটা একটা জেলা। আগে এটা সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বহু দেশীয় রাজন্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত থেকে এখন ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলাতেই মস্‌লিপাটম্ ও কোকোনদা অবস্থিত। অনেকেই হয়ত জানেন যে এই মস্‌লিপাটম্ নস্যর জন্য বিখ্যাত। কোকোনদা একটি বন্দর। এইরূপ কথিত আছে যে এই কোকোনদার সন্নিকটস্থ সমুদ্রে শ্রীমন্ত সওদাগর "কমলে-কামিনী" দর্শন করেছিলেন।

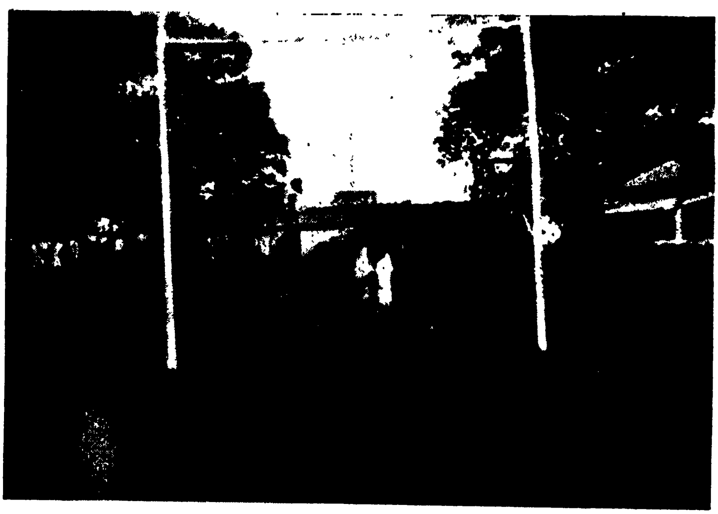


সাগর সৈকত—মান্দ্রাজ

গোদাবরী গ্রামের মোটামোটি হিসাব নিকাস জেনে নিয়ে চুপ করে বসে রইলুম কারণ গ্রামে না ঢুকে রেলগাড়ীর কাম্‌রায় বসে বসে আর কত জানা যায়।

হঠাৎ গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠে গাড়ী চলতে সুরু করে দিলে। আমরা গোদাবরী নদীর উপর এসে উপস্থিত হলুম। লোহার পুল নীচে বিস্তীর্ণ বালির চর। মাঝে মাঝে জল যে নেই তা নয়। যেটুকু জল আছে তারই ওপর

দিয়ে ভেলার মত দু'চারখানা নৌকা পাল তুলে বয়ে চলেছে। দূরে ঘাটে কেহ স্নান করছে কেহ বা স্নানের ওপর কাপড় কাচছে! বহু গ্রাম্য মেয়ে মাটির কলসী গোদাবরীর জলে ভর্ত্তি করে কাঁকে তুলে পানীয় জল ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে ক্ষুদ্র গ্রাম মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা অলস পথিক রূপ-মুগ্ধের মত রূপই দেখে চলেছি। মনে করি এই বুঝি আমাদের কর্ত্তব্য, এই কাজ। হঠাৎ চেয়ে দেখি আর সেই গোদাবরী নেই কেবল দুধারে বিস্তীর্ণ মাঠ যেন দানবের মত হাঁ করে চেয়ে আছে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার চাঁদনি রাত। দূরে বহুদূরে থেকে থেকে আলেয়ার আলোর মত জোনাকির ঝাঁক জ্বলছে নিভছে। তার ওপর সে মনোহর দৃশ্য লেখনী দিয়ে বর্ণনা করা চলে না। ইচ্ছে হোলো নদীর তীরে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে সে দৃশ্য উপভোগ করি। আমার কানে কৃষ্ণার কুলুধ্বনি বীণার ঝঙ্কারের মত বাজতে লাগল। গাড়ীতে মাদ্রাজি ভদ্রলোকটির সঙ্গে কত কথাই হতে লাগল। একরাত্রে মনে হোলো যেন সে ভদ্রলোকটি আমার কত আপনার হয়ে উঠেছেন। কথায় কথায় ভদ্রলোকটি তাঁদের দেশের কলার চাষের গল্প সুরু করে দিলেন। তারপর হঠাৎ কিছু না বলেই একটি বাক্স থেকে একটি সুপক্ক কদলী আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"এই দেখুন এ এখানকারই কলা, আপনি খান।" এক রকম জোর করেই কলাটি আমায় খাইয়ে ছাড়লেন। জীবনে ওরকম



অ্যাকোয়েরিয়ম—মান্দ্রাজ

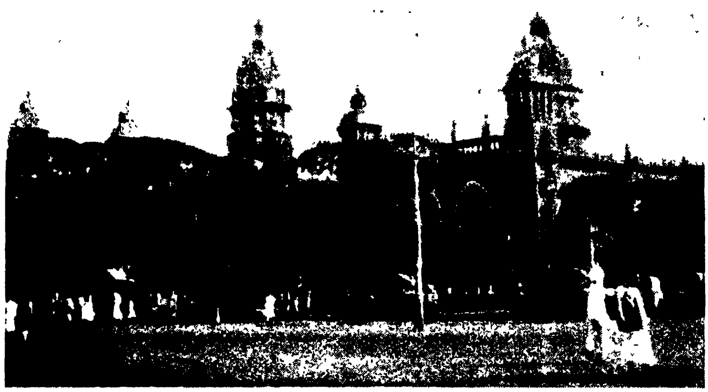
চাঁদের রূপালি আলোর সঙ্গে রাতের কালো রং মিশে যেন আমাদের দু'পাশের সীমাহীন ফাঁকা স্থানগুলোকে জীবন্ত করে তুলেছিল। রাত তখন গভীর নয়—বোধ হয় দশটা কি এগারটা হবে। হঠাৎ চেয়ে দেখি আবার পুল! সহযাত্রীর নিকট আলাপ করে জানলুম কৃষ্ণা নদী। নাম তার সার্থক হয়েছে। জল তার ঘন কালো। নীচে কালো জল, ওপরে তারার মালায় সজ্জিত নীল আকাশ। মনে হতে লাগল শুভ্র চন্দ্রমার রূপালী কিরণের সঙ্গে নক্ষত্রগুলো এসে কৃষ্ণার কালো জলকে আলিঙ্গন করছে। কলা খেয়েছি বলে মনে হল না। এত মিষ্টি, এত উপাদেয় মনে হল সে কলার কাছে আমাদের দেশের ক্ষীর, রাবড়ীও যেন হার মেনে যায়। রাত ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল কাজেই কথাবার্ত্তার মধ্যেই আমরা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম।

রাত্রে আর গাড়ীতে বিশেষ ঘুম হ'ল না। কোন রকমে একটু গড়িয়ে ঘুমের নেশাটাকে একটু কাটিয়ে দেওয়া হল মাত্র। গাড়ীতে উঠে বসলুম প্রায় ভোর হয় হয় হয়েছে। মাদ্রাজি ভদ্রলোকটিও আমার সঙ্গে উঠে বসলেন। তিনি

আমার কাছে কল্‌কাতার অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কথায় কথায় জানতে পারলুম কয়েক বছর আগে তিনি কলকাতায় খিদিরপুরে একটা বাসা বাড়ী ভাড়া করে থাকতেন, আর কোনও একটা সওদাগরী অফিসে সামান্য একটা কেরাণীর কাজ করতেন। কোনও রকমে কায়ক্লেশে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হোত। বহু দুঃখের ইতিহাস বসে বসে শুনতে লাগলুম। শেষে একটু হেসে বললুম —"আমরাই ত আমাদের জীবনটাকে এম্‌নি দুর্ব্বিষহ করে

বললুম্‌—"কোথা থেকে পারব? জেগে ত নেই ঘুমিয়েই থাকি। উপায় আর কেমন করে হবে। চোখ চেয়ে যদি অন্ধ হয়ে থাকে কে আর পথ দেখাবে বলুন? চাকুরি করে করে আমরা জড় স্থবির হয়ে গেছি। জাতের এই পাষাণ স্তূপকে সরাতে হলে আমাদের মেরদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে হবে, বুঝলেন?"

ভদ্রলোকটি হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারলেন না। কাছেই একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতে ভদ্রলোকটি আমাকে তাঁর



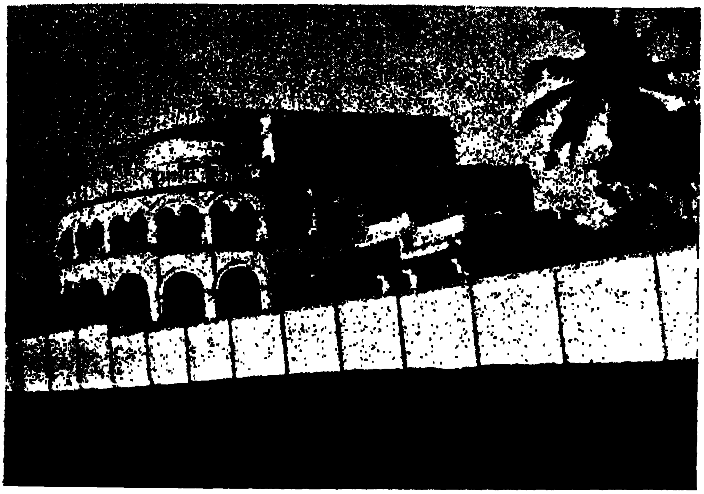
হাইকোর্ট—মান্দ্রাজ

তুলেছি, আর অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে চুপ করে চাকুরীর আশায় পড়ে রয়েছি। স্বচ্ছন্দে চাষ বাস করতে পারি তা করব না। ঐ যে বাঁধা ধরা দশটা আর পাঁচটা!" তারপর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে বললুম—"আচ্ছা এই যে মশাই সাত সমুদ্দুর তের নদী বাদ দিলুম কোথায় সুদূর বিকানির মাড়োয়াড় থেকে শুধু লোটা কম্বল সঙ্গে নিয়ে এসে এমন ত দেশ বিদেশ নেই যেখানে তারা বড় বড় ইমারত্‌ না হাঁকিয়ে দোরের সাম্‌নে ভোজপুরী দরওয়ান খাড়া করে না রেখেছে। সে কি মশাই, কেরাণীগিরি করে?"

ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"সবইত বুঝি কিন্তু পেরে উঠি কই?"

বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে তাঁর বাড়ী যাবার জন্যে অনেক অনুনয় বিনয় জানিয়ে ভোর রাত্রে নেমে গেলেন।

হাত ঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে ভাবলুম্‌ তাইত আমারও ত নামবার আর বেশী দেরী নেই। বিছানাপত্র বেঁধে গাড়ীর বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলুম কল্‌কাতার লোক কে জানে মাদ্রাজ সহর কেমন লাগবে। মাদ্রাজিদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তেমন ধারণাও নেই। তবে এইটুকু চিন্তা করে আশ্বস্ত হয়েছিলুম যে সেই সময় আমার কোন নিকট আত্মীয় ব্যবসার খাতিরে পনেরো দিন পূর্ব্বেই মাদ্রাজে এসে অবস্থান করছিলেন। কাজেই অসুবিধা ভোগ করবার ভয় ততটা ছিল না। গাড়ীর জানালা



আইস হাউস—মাদ্রাজ

দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলুম আকাশের গায়ে তখনও দু'চারখানা তারা মিটিমিটি জ্বলছে। আর দূরে তালবনের ফাঁকে ফাঁকে যেন একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কাক পাখীরাও উড়তে সুরু করেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ পূব দিকটা রাঙ্গিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যেন কিসের একটা জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। চেয়ে দেখি মাদ্রাজ ষ্টেশনে এসে পৌচেছি। তখন ভোর সাড়ে ছ'টা। কল্‌কাতার সাড়ে ছ'টার সঙ্গে তুলনা করে দেখলুম যেন বাহিরের সকাল কিছু বেলায় হয়। ষ্টেশনে আমার প্রতীক্ষায় আমার আত্মীয়টি তাঁর একটি বন্ধুর সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। দু'রাত ট্রেন যাপনের পর কোলাহলপূর্ণ মাদ্রাজ সহরে উপস্থিত হয়ে ক্ষণিকের জন্য মনটা খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ষ্টেশন থেকে বা'র হয়ে দেখি সম্মুখে ট্রাম। ট্যাক্সি কিম্বা ফিটন না করে একেবারে ট্রামে চেপে বসলুম। আমার আত্মীয় তাঁর বন্ধুকে একটি গাড়ী করে দিয়ে আমার জিনিষ পত্র সমেত আমার সঙ্গে ট্রামে এসে উঠলেন। ষ্টেশন থেকে আমাদের বাসা প্রায় দু'তিন মাইলের পথ। নাম ট্রিপ্লিকেন। বাসায় পৌছুতেই কানে একটা বিরাট গর্জ্জন এসে পৌছল। জিজ্ঞাসা করে জানলুম বাসা থেকে সমুদ্র ছ'সাত মিনিটের পথ সুতরাং বুঝতে আর বাকি রইল না যে সমুদ্রের গর্জ্জন, কারণ পুরীধামেও ওরূপ গর্জ্জন শুনে শুনে একরূপ পূর্ব্ব থেকেই অভ্যস্ত হয়েছিলুম। যা'হোক বিশ্রামান্তে বাসার একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ট্রিপ্লিকেন ছাড়িয়ে আমরা আইস হাউস রোডে এসে পড়লুম। রাস্তার নাম আইস হাউস দেখে জিজ্ঞাসা করলুম 'এ আবার কি নাম'? আমার সঙ্গী বললেন—"আর একটু গেলেই প্রকাণ্ড একটা সাদা বাড়ী দেখতে পাবে ঐ বাড়ীটার নাম হচ্ছে আইস হাউস। আগে যখন ভারতবর্ষে বরফের কল ছিল না তখন বিলাত থেকে জাহাজে করে ঐ বাড়ীতে বরফ এসে জমা হ'ত বলে ঐ বাড়ীর নাম হয়েছে 'আইস হাউস'। আর সেই থেকেই রাস্তার নামও আইস হাউস রোড। যখন বাড়ীটার কাছে এসে পৌছলুম তখন সাম্‌নেই দেখি বিস্তৃত সমুদ্রের ফেনিল জলরাশি বার বার এসে বালুময় বেলাভূমির চরণ তলে আছ্‌ড়ে পড়ছে। বরফের বাড়ীর কথা ভুলে সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলুম। তবে এইখানেই বলে রাখি বাড়ীটা সাধারণ বাড়ীর চেয়ে কিছু বড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এখানে রাস্তাটার কিছু বর্ণনার দরকার। রাস্তার একধারে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্যে লম্বা সরু পথ, আর ফুটপাথ। ফুটপাথের ধারে দু'চারটে ফুল গাছের বাগান। তারই নীচে বিস্তীর্ণ বালুকাময় বেলাভূমি, তারপর বিশাল সমুদ্র। যাঁরা সমুদ্র দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন এখানকার দৃশ্য কি রকম। সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়। সূর্য্যদেব ডুবতে সুরু করেছেন। একদিকে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বালুময় বেলাভূমির পাদদেশে আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়ছে, আর একদিকে সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে নীল আকাশ মিশেছে। সেইখানে অস্তগামী রবি ডুবু ডুবু—যেন সমুদ্রের বুক চিরে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঠিক্‌রে পড়ছে, আর তারই মধ্যে একটা

গোলাকার আগুনের থালা লুকোচুরি খেলতে খেলতে লুকিয়ে পড়ছে। এমন প্রাণ মাতান দৃশ্য দেখতে কার না ইচ্ছা করে? সে দৃশ্যের মাধুরী এমনি যে আপনাকে আপনি ভুলিয়ে দেয়। বালির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল যেন প্রকৃতি হাসতে হাসতে ধরায় নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন করছে। দেখতে দেখতে দূরে লাইট হাউসের আলো জ্বলে উঠল। মনে মনে ভাবলুম পৃথিবীতে সবই সুন্দর। ফুলের গন্ধে যেমন ভ্রমর আপনা-হারা হয়ে ফুলের মধু খুঁজে বেড়ায় আমিও তেমনি প্রকৃতির রূপকে নিংড়ে বার করে নেবার জন্যে আপনা-হারা হয়ে সমুদ্রের কূলে খানিক ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। রাস্তার দু'ধারে সারি বন্দী বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে। আমার সঙ্গে যিনি গিয়েছিলেন তাঁর নাম হরিবাবু। আমি হরিবাবুকে বললুম—"এত ঘুম পাচ্ছে যে এখানে ঘুমোলেই ভাল হয়। এখান থেকে আর যেত ইচ্ছে করছে না।"

হরিবাবু হাসতে হাসতে বললেন—"প্রথম দিনেই যদি এখানকার সমস্ত রসটুকু নিংড়ে খেয়ে ফেলতে চাও তা'হলে কাল কি করবে? চল আজ বাড়ী ফেরা যাক্; সকাল সকাল পেটটা ঠাণ্ডা করে আজকের রাতটা ভাল করে ঘুমিয়ে নাও, বুঝলে? কাল আবার যত পার ঘুরে ফিরে বেড়াবে।"

অগত্যা বাসাবাড়ীর পথে ফিরলুম। আমাদের পশ্চাতে পড়ে রইল বালুচরের ওপর মরা শুক্তি শামুক, দুলিয়ার জাল, তাদের মাছ ধরা নৌকা আর দড়ির জাল। রাস্তায় আসতে আসতে ঠিক করলুম কাল আমরা এ্যাকোয়েরিয়াম দেখতে যাব। শুনেছি তা'তে নাকি সমুদ্রের অনেক রকম মাছ আছে—দেখবার জিনিষও বটে। রাত্রে খানিক গল্প গুজব



লাইট্ হাউস—মাদ্রাজ

করবার পর নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে সেদিনকার মত আশ্রয় নেওয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনিধিরাজ হালদার

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

পূজার বাজার ও স্বদেশী জিনিস

পূজার বাজার,—এবং অন্য বাজারও,—করিবার সময় যে, স্বদেশজাত জিনিসের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে, সে কথা বিচিত্রার পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শুধুমাত্র স্বদেশজাত জিনিস নয় বাংলার এবং বাঙ্গালীর দ্বারা উৎপন্ন জিনিস পাইতে, অন্য কোনও প্রদেশের জিনিস ক্রয় করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর পক্ষেই অন্যায় হইবে।

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিদেশী-বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে, বাংলায় স্বদেশী দ্রব্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, প্রাদেশিক স্বার্থ সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য, ব্যবসা-বিমুখতা এবং অর্থাভাবের জন্য আমরা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারি নাই। বাংলায় বহুল পরিমানে বিদেশী চিনি বর্জ্জিত হইয়াছে; কিন্তু, এখানে কোনও বড় চিনির কারখানা গড়িয়া উঠিল না। বাংলায় বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাংলার প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অতি সামান্য ভগ্নাংশমাত্র বাংলার কলে প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালী বর্ত্তমানে যত স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করে, তাহা বাংলায় উৎপন্ন হইলে, বাংলার বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারিত। আমরা যদি বাছিয়া বাংলার জিনিস ক্রয় করি, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা কমিয়া যাওয়ায়, অধিকতর সহজে নানাপ্রকার শিল্প ও কারখানা গড়িয়া উঠিবে, এবং বর্ত্তমানে যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারাও টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

মিলের বস্ত্র অপেক্ষা, নানাকারণে অনেকে খদ্দর ব্যবহারকে অধিকতর সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, ভিন্ন প্রদেশের খদ্দর অপেক্ষা বাংলার মিলের কাপড় ব্যবহার, বাঙ্গালীর পক্ষে বেশী গৌরবের ও লাভের। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক খুচরা জিনিস, এদেশে প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু, উপযুক্ত বিজ্ঞাপন ও প্রচারের অভাবে, অধিকাংশ লোকে সে সকলের কিছু খোঁজ খবর রাখেন না; এজন্য, প্রত্যেক জিনিস কিনিবার সময়, তাহা বাংলায় প্রস্তুত হয় কিনা, ভালভাবে অনুসন্ধান করা উচিৎ।

বিলাসিতাকে অনেকেই সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমানে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্ট-কারিতা এই যে, আমাদের বিলাসের দ্রব্যগুলি বিদেশ হইতে আসিতেছে, এবং এজন্য বিদেশকে প্রতিবৎসর অনেক টাকা আমাদের দিতে হইতেছে। কিন্তু, যে-সকল বিলাসের দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত হয়, (দেশী ছাপযুক্ত বিদেশী জিনিস নহে) তাহার ব্যবহারে এবং প্রচলনে সমাজের নিশ্চিত লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বম্বের কলওয়ালারা বৎসরে বাংলাদেশে প্রায় ১৫ কোটি টাকার কাপড় বিক্রয় করেন; কিন্তু, তাঁহারা বাংলার কয়লা ক্রয় করেন না; তাঁহাদের মিল সমূহে বাঙ্গালীদের চাক্‌রী দেন না, অথবা বাংলাদেশে কাপড় বিক্রয়ের জন্য প্রধানতঃ বাঙ্গালী মধ্যবর্ত্তী নিযুক্ত করেন না।

হাওড়া এবং অন্যান্য স্থানের মাড়োয়ারীদের কাপড়ের কলে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং ক্রমেই কমিতেছে।

রাজসাহী, দিনাজপুর এবং মুর্শিদাবাদে মাড়োয়ারীদের অতি আধুনিক ধরণের তিনটি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে মিলিতভাবে প্রতিদিন প্রায় ২০০ টন্ ইক্ষু পেষণ করা যাইবে। এইরূপে, আমাদের ব্যবসার সম্ভাবিত ক্ষেত্রগুলিও ভিন্ন প্রদেশবাসীদের দ্বারা অধিকৃত হইতেছে।

অন্যদিকে বাঙ্গালী ব্যবসাদার শ্রমশিল্পী, কারিগর এবং কারখানার মালিকদেরও সাবধান হইবার আছে।

বাংলার কাপড়ের দর অনুপাতে অন্যান্য স্থানের কাপড়ের দর অপেক্ষা অনেক অধিক। অন্যদের পক্ষে যে দরে কাপড় দেওয়া সম্ভব হয়, বাঙ্গালীদের পক্ষেই বা সে দরে সম্ভব হইবে না কেন? বাংলায় অবস্থিত অবাঙ্গালীর কলে প্রস্তুত কাপড়ও বাঙ্গালীর কলের কাপড় অপেক্ষা সস্তা; এরূপ হইবারও কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। লোকের দেশ-প্রীতি অথবা প্রদেশপ্রীতিকে নিজেদের স্বার্থে লাগাইতে গেলে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত কখনই লাভজনক হইবে না এবং দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে সব সময়েই বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

বাঙ্গালী কারিগরদিগের প্রস্তুত জিনিসে অনেক সময় এত ফাঁকি থাকে যে, লোকে ঠকিতে ঠকিতে দেশী জিনিসের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। হাত-তাঁতে প্রস্তুত আটপৌরে কাপড়ের এক সময় খুব চাহিদা ছিল এবং বাংলার অনেক তাঁতি এই ব্যবসায়ে প্রতিপালিত হইত। কিন্তু, অত্যধিক লাভের আশায় ইহারা ক্রমে কাপড়ের ভাঁজের উপরের অংশটা ঘন করিয়া বুনিয়া, ভিতরের দিক অত্যন্ত পাতলা করিতে লাগিল; এবং এইরূপে তাহার চাহিদা একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল।

এখনও অনেক দেশী জিনিসের মুখপাত (যেটুকু প্রথমেই খরিদ্দারের দৃষ্টিতে পতিত হয়) ভাল করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা অসততার এবং ঠকাইবার চেষ্টার পরিচায়ক।

সততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্বাসই যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রধান কথা, পুরাতন হইলেও আমাদের এখনও তাহা শিখিবার প্রয়োজন আছে।

শারদীয়া পূজা ও হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য

শারদীয়া পূজা বাঙ্গালীহিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়া যাহাতে সমাজের ঐক্য ও সংহতি দৃঢ়তর হয়, বৈষম্য ও বিদ্বেষ দূর হয়, সমাজভুক্ত সর্ব্বশ্রেণীর অধিকারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক হিন্দুরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মে যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, ধর্ম্মার্চ্চনার স্থানেও যদি তাহাদের পূর্ণ অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলার নানাস্থানে সার্ব্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হইবে। এখানে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া, ইহা অনেকটা সাধারণ মিলনক্ষেত্রের কাজ করিবে, এবং এদিক দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় সময়োপযোগী কিছু কাজও হইবে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ স্থানে পূজাগুলি সার্ব্বজনীন নহে বলিয়াই, ঐ প্রকার বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইতেছে এবং ইহাতে সমাজের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার অবস্থাই প্রকাশ পাইতেছে। ব্যক্তিগত এবং দশের ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই বৈষম্যকে পরিহার করিয়া চলিতে পারিলে, তবেই হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা দূর হইবে।

অনেকে বলিবেন, সাধারণ স্থানে অথবা দশজনের ব্যাপারে, সার্ব্বজনীনতার দাবী কতকটা সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু, কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কে কি করিবে বা না করিবে, সে সম্বন্ধে অন্য কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার যে সর্ব্বথা সম্মানের যোগ্য তাহাতে সংশয়মাত্র নাই, এবং কেহ ব্যক্তিগত ভাবে যদি কোনও ভাল কাজও করিতে না চান, তবে সেজন্য কেহ তাঁহাকে বাধ্য করিতে পারে না। তবে, একথা সমাজ নিশ্চয়ই বলিতে পারে যে, তাঁহার নিকট সমাজ এতটুকু প্রত্যাশা করে, এবং সেই প্রত্যাশানুযায়ী কাজ তিনি করিতে না পারিলে, সে তাঁহাকে পূর্ণ মর্য্যাদা দান করিতে পারে না।

তাছাড়া, আমরা যদি শুধুমাত্র সাধারণ পূজার্চ্চনাদিতে হিন্দু সাধারণের যোগদানে আপত্তি না করি; অথচ পারিবারিক পূজাপার্ব্বনাদিতে (যেখানে অন্য সকলে যোগদান করে) শুধুমাত্র অস্পৃশ্য বলিয়া কাহাকেও বর্জ্জন করি, তাহা হইলে, ব্যাপার এই দাঁড়ায় যে, বাধ্য হইয়া এবং চাপে পড়িয়া সাধারণ স্থানে কতকগুলি অধিকার ছাড়িয়া দিলেও, যেখানে আমাদের ইচ্ছা প্রয়োগ করিবার বা তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধা আছে, সেখানে আমরা কিছুমাত্র মুষ্টি শিথিল করিব না। ইহা সদিচ্ছার পরিচায়ক নহে।

কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে, যদি সভাস্থানে তাহার সহিত কোলাকুলি করি এবং বাড়ীতে আসিয়া ঝগড়া করি, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে বন্ধুত্ব যেমন অসম্ভব হয়, আমাদের বর্ত্তমান আচরণের যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে, হিন্দুসমাজের দৃঢ়তা সম্পাদনও সেইরূপ অসম্ভব হইবে। দশজনে একত্র হইয়া কোনও অস্পৃশ্যের জলগ্রহণ করিয়া, পরে সে ব্যক্তি বাড়ী আসিলে যদি তাহার সহিত অন্যপ্রকার ব্যবহার করি, তবে, সেই কপট আচরণের দ্বারা সমাজের বিশেষ অমঙ্গল করিব এবং সকল ভাল কাজের পশ্চাতে এইরূপ কপটতা আছে, এই সন্দেহ জাগাইব।

তাহার পর, ব্যক্তিগত অধিকারেরই বা সীমা কতটুকু? এমন কোনও কাজ করিবার ব্যক্তিগত অধিকার আমাদের নাই, যাহা কোনও প্রকারে সমাজের অনিষ্ট সাধন করিবে, কাহারও ন্যায় সঙ্গত অধিকার খর্ব্ব করিবে অথবা অন্যের অপমানের কারণ হইবে।

দুর্গাপূজা সম্পর্কে অবশ্য আরও একটা কথা বলা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা পারিবারিক ব্যাপার হইলেও, ইহার একটা সাধারণ চরিত্র আছে। বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে ইহা জাতীয় উৎসব; যে সকল বাড়ীতে পূজা হয় (বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে), সেখানে নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত সকল লোক আসিয়া থাকেন, এবং উৎসবাদিতে যোগ দিয়া থাকেন। এই সকল পূজাকেও সকলেই নিজেদের পূজা মনে করিয়া থাকেন।

এমন ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে যে, কোনও অনুন্নত শ্রেণীর লোক অন্য বহুলোকের সহিত কোনও পারিবারিক পূজা দেখিতে আসেন এবং অন্যদের সহিত একত্র মন্দির প্রবেশ করিয়া দেবী দর্শন করিতে যাইয়া বিশেষভাবে অপমানিত হন। এই প্রকারের ব্যাপার হইতে অনেক স্থানে উপসাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি হইয়াছে।

কাজেই, ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে, আমাদের গৃহে এবং সর্ব্বপ্রকার পূজাপার্ব্বনাদিতে, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতে পারিলে, তবে প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতা পরিহার করিবার চেষ্টা করা হইবে।

অনুন্নতেরা কোন অধিকার চাহেন

মন্দির-প্রবেশ বিল এবং এই প্রকারের অন্যান্য ব্যাপার সম্পর্কে অনুন্নতদের একাধিক নেতা একাধিক বার এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মন্দির প্রবেশ বা অনুরূপ কোনও অনুষ্ঠানে কতকুটু সুবিধা কি পরিমাণে অনুন্নতদিগকে দিতে ইচ্ছুক, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের ঔৎসুক্য নাই, কারণ, তাঁহারা এই প্রকারের অধিকারের প্রার্থী নহেন এবং ইহা তাঁহাদের আচরণে কোনও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবে না। তাঁহারা অনুন্নতদের শিক্ষা, অন্যবিধ সামাজিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক সুবিধা পাইবার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন। শিক্ষা এবং অন্যবিধ সামাজিক উন্নতি যে তাঁহাদের কাম্য, ইহা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় এবং এগুলি যে প্রকৃত উন্নতির পরিমাপ সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু, এসকল সমস্যা এদিক দিয়া না দেখিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের দিক দিয়া দেখা যাইতে পারিত, এবং সেই দিক দিয়া ইহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে, ব্যাধিরও প্রতিকার হইত এবং সমাজের ভিতরেও কোনও প্রকার বৈষম্যের সৃষ্টি হইত না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যে, তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রয়োজন নাই, সেকথা, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিবেন।

একথাও ইঁহাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ইঁহারাও হিন্দুসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং হিন্দুসমাজের উত্থান পতনের সহিত ইঁহাদের ভাগ্য বিজড়িত। আত্মকলহের জন্য যদি হিন্দুরা রাষ্ট্রে এবং অন্যত্র শক্তিহীন হইয়া পড়েন, তবে, সেই অধঃপতন এবং দুর্ব্বলতা হইতে ইঁহারাও রক্ষা পাইবেন না। বর্ত্তমানে তাঁহারা যে সকল স্থান হইতে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছেন, সে সকল স্থান হইতে সহানুভূতি আসিবার গোড়ার কথাটা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাজনীতি ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের কিছু শক্তি আছে, যাঁহারা সেই শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে চান, তাঁহারা স্বভাবতঃই হিন্দুসমাজকে দ্বিধা বিভক্ত করিতে চাহিবেন এবং সেজন্য কোনও কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, তাঁহাদের স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল। কিন্তু, বর্ণহিন্দুদের

এই শক্তি নষ্ট হইলে, অনুন্নত সম্প্রদায় বর্ত্তমানের ন্যায়, বাহিরের সহানুভূতি পাইবেন কিনা সন্দেহ। এ সম্পর্কে অতীত ইতিহাসের শিক্ষা যদি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, তবে, তাহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় হইবে।

বর্ণ হিন্দুদের এবিষয়ে কর্ত্তব্য

অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতাদের এই সকল উক্তি দেখাইয়া সংস্কারে অনিচ্ছুক অনেক বর্ণ হিন্দু এই কথা বলেন যে, অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেরাই যাহা চাহিতেছেন না, তাঁহাদিগকে তাহা দিতে যাইয়া কোনও পক্ষেরই কোনও প্রকার লাভ হইবে না।

কিন্তু, কথাটাকে অন্যদিক দিয়া দেখিতে হইবে এবং অনুন্নতেরা যে, সকলে এই অধিকার চাহিতেছেন না, ইহাকে বিশেষ দুর্গতির অবস্থা বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এতটা জাগিয়াছে যে, তাঁহারা হিন্দুসমাজের ঐক্য এবং কল্যাণকে দলগত স্বার্থ অপেক্ষা বড় মনে করিতেছেন না এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের মধ্যে তাঁহাদের যোগ্য আসন প্রাপ্তিকেও বিশেষ কাম্য মনে করিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি জাগ্রত করিবার দায়িত্ব বর্ণ হিন্দুদের এবং ইহা দূর করিবারও দায়িত্ব তাঁহাদের। যে সকল কারণে এইপ্রকার ভেদবুদ্ধি জাগিয়াছে, ভাল করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতারা বর্ত্তমানে চান বা না চান, অসন্তোষ এবং বৈষম্যের কারণগুলি দূর হইলে, সমাজের উপর তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল ফলিবে। এবং কালক্রমে এই বিরুদ্ধতা অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু, একথা মনে রাখিতে হইবে, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং অন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে আমাদের সদিচ্ছা এবং পরিবর্ত্তিত মনোভাবের পরিচয় দিতে হইবে। এক পক্ষের আন্তরিকতায় অন্যপক্ষের সন্দেহ দূর হইবে এবং সহজে বন্ধুভাব গড়িয়া উঠিবে। ব্যাধি এরূপ দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, আশুফললাভের আশা করিয়া কোনও কাজ করা যাইবে না।

মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি-ই-জে বার্জ্জ স্থানীয় পুলিশ-ক্লাবের খেলার মাঠে আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন। ইহা, এই জাতীয় অন্যান্য দুর্ঘটনার অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার।

কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের ছোট বড় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, সকল প্রকার দলের এবং মতের প্রত্যেক বড় লোক এই প্রকার কাপুরুষোচিত হত্যা এবং সর্ব্বপ্রকার হিংসামূলক কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ইহা দেশকে অহিংস গণ-আন্দোলনের দিক দিয়া অনেকখানি পিছাইয়া দিবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ এই বিশিষ্টতার অধিকারী হইয়াছে যে, শান্তি, মৈত্রী এবং তপশ্চর্য্যাকে কেন্দ্র করিয়া সে তাহার বিপুল সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে। ভারতবর্ষ একদিন শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, কিন্তু, যুদ্ধ বা রক্তপাতের দ্বারা যে কখনও অন্য দেশের উপর উপদ্রব করে নাই। প্রতিবাসী দেশসমূহে সে শান্তির দূত প্রেরণ করিয়াছে, কল্যাণ এবং বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছে। তাহা হইলেও, অধিকাংশ লোকে মনে করিত যে, অন্য সময় যাহা হউক, অন্যজাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা অথবা বৈদেশিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য যুদ্ধ ব্যতীত উপায় নাই। কিন্তু, বর্ত্তমান ভারতবর্ষই ইহা প্রমাণ করিয়াছে যে, অনেক কম খরচে, অনেক কম কষ্ট ভোগে, এবং যুদ্ধ বা হিংসামূলক পদ্ধতিতে যে সকল নিষ্ঠুর ও বর্ব্বরোচিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া, প্রবল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অহিংসভাবে যুদ্ধ চালান সম্ভব। ভারতবর্ষে এই পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবে জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে, এবং ভারতবর্ষ যুগে যুগে জগতকে যে বাণী শুনাইয়াছে, তাহা পূর্ণতা লাভ করিবে। আজ যাঁহারা হিংসামূলক কার্য্যের দ্বারা ইহাকে বাধা দিতেছেন, তাঁহারা দেশের সুশৃঙ্খল প্রগতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে নূতন প্রেরণা ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধতা করিতেছেন।

এই প্রকারের কার্য্য যদি ন্যায়ানুমোদিত হইত, (তাহা

যে নহে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)। তাহা হইলেও কখনই ইহা এইজন্য সমীচীন হইত না যে, ২।১ জন রাজপুরুষকে হত্যা করিয়া শক্তিশালী ইংরাজকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করা যাইত না অথবা সুশিক্ষিত সৈন্য এবং আধুনিক মারণাস্ত্র সমূহের বিরুদ্ধে ২।৪টি বোমা রিভলভার লইয়া দাঁড়ান যাইত না। দেশে গায়ের জোরের প্রতিষ্ঠা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইলে, কোন্ শ্রেণীর লোকের হাতে যাইয়া ক্ষমতা পড়িবার সম্ভাবনা তাহাও ভাবিয়া দেখা দরকার।

দেশের লোকের উপর ইহার আর একটা গুরুতর কুফল এই যে, ইহাতে বহু নিরীহ লোকের নানাপ্রকারে উৎপীড়িত, অপমানিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

গোলটেবিল বৈঠক এবং যুক্ত কমিটিতে যোগ ও সাক্ষ্যাদি দেওয়ায় ভারতের পরোক্ষ লাভ

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রগতির দিক দিয়া গোলটেবিল বৈঠকগুলি এবং যুক্ত কমিটির কার্য্যাদির সাফল্য সংশয়যুক্ত হইলেও, অন্য কোনও কোনও দিক দিয়া ইহা আমাদের উপকারে আসিয়াছে। ইহাতে সাধারণভাবে সমগ্র জগতের এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য সকল স্থানের দৃষ্টি, ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র, সংবাদপত্র পাঠকেরা ভারতের প্রকৃত অবস্থার কতকটা আভাষ পাইয়াছেন। ভারতের সব খবর সব সময় বাহিরে যাইতে পারে না বলিয়া, এবং সাধারণ সময়ে লোকে ভারতের সংবাদ জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক থাকে না বলিয়া, ইহাকে একটি লাভ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভারতের বহু যোগ্য, প্রতিনিধিস্থানীয় লোক এখানে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি, বাগ্মিতা এবং নীতিকুশলতা প্রভৃতি গুণের পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং বিলাতের শ্রেষ্ঠ নীতি বিশারদ ও কর্ম্ম-কুশল বিশেষজ্ঞগণের সহিত সমানে কাজ করিবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের পর প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও ইঁহাদের ঐ সকল গুণের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্বার্থ-বিশিষ্ট নানা লোকের মিথ্যা প্রচারের জন্য এবং কোনও কোনও স্থানে অজ্ঞতার জন্য ভারতবাসীদের মানসিক-ক্ষমতা সম্বন্ধে যাঁহাদের বিকৃত ধারণা ছিল, তাঁহাদের অনেকের ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে।

বিলাতের গবর্ণমেণ্ট লোক মতের নিকট সম্পূর্ণভাবে দায়ী। আমাদের বহু শ্রেষ্ঠ চরিত্রের লোকের, নিকট সংস্পর্শে আসিবার সুবিধা ঐ-দেশের অনেক লোক পাইয়াছেন: সামনাসামনি বহু কথাবার্ত্তা পরস্পরের মধ্যে হইয়াছে, অনেক ভুলধারণা অপসৃত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, এমন বহুলোক ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন। ইহাতে আমাদের ভবিষ্যতের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইতে পারে।

শাসন-সংস্কারে আমাদের লাভ কি হইতে পারে

আমরা যে শাসন সংস্কার পাইতে যাইতেছি, তাহাতে প্রত্যেক প্রদেশেই কোনও না কোনও সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য থাকিবে; অর্থাৎ শাসন ক্ষমতা অনেকটা তাঁহাদের হাতে থাকিবে। এই প্রকার প্রাদেশিক সরকারের কোনও কার্য্য বা বিধানের বিরুদ্ধে যদি দেশের কোনও সম্প্রদায়ের কোনও অভিযোগ থাকে, এবং তাহার জন্য তাঁহারা আন্দোলন করেন, তাহা হইলে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক সরকারের পক্ষে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে একথা বলা খুব সহজ হইবে যে, আমাদের হাতে শাসন-ক্ষমতা পড়িয়াছে বলিয়া, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা হিংসাবশতঃ আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেছেন, এবং এইজন্য নিজ সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে আমরা সমর্থন পাইতে পারি। এই প্রকারে দেশের অভ্যন্তরে সব সময়েই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য থাকিতে পারে এবং দেশের প্রগতিশীল দলের অধিকতর বাধার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।

দেশের বেকার সমস্যা ও আর্থিক দুরবস্থা

ভারতীয় বণিক সমিতি ১৯৩১এর সেন্সাস হইতে বাংলার বেকার লোকের মোট সংখ্যা ৮৫ লক্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন; ইহার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অন্যূন ১ লক্ষ।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের জীবন যাপনের আদর্শ অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া, এবং জীবন ধারণের পক্ষে ন্যূনতম যে-সকল জিনিসের প্রয়োজন, তদতিরিক্ত কিছু তাহারা ক্রয় করেন না বলিয়া, অন্যথা যে-সকল লোকে কাজ পাইতে পারিতেন, তাঁহারা কর্ম্মের অভাবে বসিয়া আছেন।

দেশের লোকের প্রয়োজনবৃদ্ধিকে সাধারণতঃ আমরা-সুনজরে দেখি না। কিন্তু, দেশের প্রয়োজন বাড়িয়া গেলেই, সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ও বিক্রয় করিয়া বহুলোকে জীবিকার সংস্থান করিতে পারিত। আমাদের দেশে প্রধানতঃ কৃষকেরাই ধনোৎপাদন করেন, কিন্তু, তাঁহাদের প্রয়োজন অত্যন্ত অল্প বলিয়া (অবশ্য দারিদ্র্য ইহার অন্যতম কারণ) দেশের অন্যান্য সম্প্রদায় কাজ পান না।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহারও মূলে রহিয়াছে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং তজ্জন্য কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার অভাব।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা, আরও অনেক অধিক কমিয়া গিয়াছে। কারণ খাজনা, সেস্‌ সুদ প্রভৃতি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা দ্বারাই তাহারা নানা প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিত, এবং অন্য নানা লোকের নানা প্রকার গুণ যোগ্যতা ও কর্ম্মকে অর্থের বিনিময়ে নিজেদের কাজে লাগাইত। কিন্তু, বর্ত্তমানে তাহারা খাজনা, সেস, সুদ প্রভৃতিই শোধ করিতে পারিতেছে না। কাজেই, অন্যান্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকই সম্পূর্ণ বা আংশিক বেকার হইয়া পড়িয়াছেন।

জীবন-সংগ্রামে বাঙ্গালীর পরাজয়

জীবিকার্জ্জনের উপায়গুলি যে, ক্রমেই বাঙ্গালীর হাত-ছাড়া হইয়া যাইতেছে, তাহা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রদত্ত, বিভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত বঙ্গবাসীদের নিম্নলিখিত তুলনা-মূলক হিসাব হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

শতকরা হিসাব

	১৯২১	১৯৩১
কৃষি ও পশুপালন	৭১'৯২	৬৮'৩৪
খনিজ ধাতু সংগ্রহ	০'৪১	০'২৯
শিল্প প্রতিষ্ঠান	১০'০০	৮'৮০
যান বাহন	২'২২	১'৯৩
ব্যবসা বাণিজ্য	৫'৯১	৬'৪৩
ভৃত্যোচিত কার্য্য	২'৭৪	৫'৫৮
বিশেষ কোনও জীবিকার্জ্জনের ব্যবস্থার অভাব	২'৮৪	৪'৩২

ব্যবসায়ীদের সংখ্যা যে কিছু বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়, তাহাও নৈরাশ্যের পরিচায়ক। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার অধিকাংশ ব্যবসাই অপ্রধান এবং লোকে করিবার কিছু না পাইয়াই নানাপ্রকার খুচরা কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বাঙ্গালীর ব্যবসা বিমুখতার কারণ

বাঙ্গালীর ব্যবসা বিমুখতার কারণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার ফরিদপুরের অভিভাষণে যে সকল কথা বলিয়াছেন, বঙ্গবাসী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর এই দুর্গতি একদিনে সংঘটিত হয় নাই। ইহার ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারী এবং ভূসম্পত্তির প্রতি বাঙ্গালীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়া ইহার একটি প্রধান কারণ। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়া কেবল ভূসম্পত্তি অর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভূস্বত্বের স্থিতিশীলতা ও নিরাপদ অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনে এতদিন যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল,

তাহাই ইহার মূল কারণ। ইহার ফলে স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর অধিবাসী ব্যবসা, শিল্পের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যামূলক অর্থ উপার্জ্জনের পথ সুগম হইল, এবং উহার দ্বারা সমাজের উচ্চস্তরে উঠিবার উপায়ও হইল। ভূসম্পত্তির মালিক ধনে মানে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, লোকের কাছে ইহাই স্বাভাবিক মনে হইত। ফলে, যে যে-প্রকারেই অর্থ সঞ্চয় করুক না কেন, সঞ্চিত অর্থ ভূসম্পত্তি অর্জ্জনেই নিয়োজিত হইল। ব্যবসায়ীর লাভ, জমিদারীর লভ্যাংশ, চাকুরী-জীবির উদ্বৃত্ত ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইল না। ব্যবসা পরিচালনের ফলে লেন দেন সম্পর্কে যে সকল পদ্ধতি এবং সুবিধা সুযোগ সৃষ্টি হয়, বাংলা দেশে তাহাও হইল না।···কলিকাতায় অনেক স্বনামখ্যাত পরিবার আছেন, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিদেশী কোম্পানীগণের মৎসুদ্দি থাকিয়া প্রভূত অর্থ এবং খ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বংশধরগণ আজ হয় জমিদার, নয়, উকিল, ব্যারিষ্টার হইয়া ব্যবসা শিল্পের পথ ত্যাগ করিয়াছেন।"

বাঙ্গালীদের কয়েকটী নিজস্ব ব্যবসা বাঙ্গালীদের হস্তচ্যুত

আমাদের কয়েকটি নিজস্ব ব্যবসা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সরকারের অভিমত: "অর্থাগমের দিক দিয়া দেখিলে, পাটের ব্যবসা বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উহার অন্তর্বাণিজ্য, বিদেশী রপ্তানী, এবং যান্ত্রিক উপায়ে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করণ সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর স্থান আজ অতি সঙ্কীর্ণ। যে অন্তর্বাণিজ্যে বাঙ্গালী তথাপি যৎকিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় হাটখোলা অঞ্চলে যে সকল সমৃদ্ধ পাট ব্যবসায়ীগণের নাম সুপরিচিত ছিল, তাঁহাদের সংখ্যা ইদানীং একেবারে মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাঙ্গালী পাটব্যবসায়ী বলিলে অতঃপর ফড়িয়া, ব্যাপারী এবং কতিপয় আড়তদার মাত্র বুঝাইবে। পাট ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ১৯২১-১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৮,৮৬০ হইতে ৬৮৯৮এ সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে।"

"বাঙ্গলার লবণ এবং চামড়ার ব্যবসায় সম্পূর্ণ অবাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গলার ধান চাউলের ব্যবসাও ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত হইতে সরিয়া মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণের হাতে পড়িয়াছে। বাঙ্গালার তামাক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সুদূর বর্ম্মামুলুক হইতে আগত দালাল। এমন কি কয়লার ব্যবসায়েও এখন বাঙ্গালীর স্থান আশঙ্কা জনক হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলায় উৎপন্ন চা ফসলের বিক্রয় ব্যবস্থা করিতেছে, কতিপয় ইংরেজ ব্যবসায়ী। চায়ের উৎপাদন কার্য্যও মুখ্যতঃ ইংরেজ ব্যবসায়ীর হাতে। বাঙ্গালীরা যাহা করিতেছেন, ইংরেজের তুলনায় তাহা অতি সামান্য মাত্র। যে ব্যাঙ্ক, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান সহায়, বাঙ্গালায় তাহা আজ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ এবং বিদেশী পরিচালিত।"

আমাদের মুদ্রার মূল্যহ্রাস

শ্রীযুক্ত ডি-পি খৈতান বলিয়াছেন আমাদের মুদ্রার মূল্য কমাইয়া দিলে, দেশের আর্থিক দুরবস্থা অনেক কমিতে পারে। টাকার বিনিময় মূল্য ১৮ পেন্স হইতে ৯ পেন্স হইলে, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হইবে এবং অন্ততঃ ১২ পেন্স করিলেও, ইহার মূল্য শতকরা ৫০ বৃদ্ধি পাইবে।

টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস পাইলে, আমাদের শিশু-শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে, একথা নিশ্চয়। কারণ বিদেশীরা যে-সকল জিনিস বর্ত্তমানে এদেশে ১৮ পেন্স মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন, আমরা তাহা এক টাকায় পাই। কিন্তু টাকার মূল্য ৯ পেন্স হইলে, এই জিনিস কিনিবার জন্য আমাদিগকে দুই টাকা দিতে হইবে; কাজেই দেশী জিনিসগুলি সস্তার প্রতিযোগিতা হইতে উদ্ধার পাইবে।

কিন্তু আমাদের দেশের অনেক জিনিসের বিদেশে রপ্তানি অপেক্ষা দেশের মধ্যেই কাটতি অধিক; কাজেই, টাকার বিনিময় মূল্য কমিলে এই সকল জিনিষের মূল্য আশানুরূপ না বাড়িতে পারে। যদি তাহা না বাড়ে তবে, অন্যান্য জিনিসের

উপর (যে সকল জিনিষ বাহিরে রপ্তানি হয়) তাহার প্রভাব থাকিবে এবং এ সকলের মূল্য বৃদ্ধিও আশানুরূপ হইবে না।

বিদেশ হইতে আমাদিগকে অনেক জিনিস কিনিতেই হইবে। আমাদের উৎপন্নের মূল্য আশানুরূপ না বাড়িলে, এই সকল জিনিষ কিনিতে আমাদিগকে বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হইবে।

টাকার মূল্য কমিলে, তাহার ক্রয়ক্ষমতা সহসা অত্যধিক কমিয়া যাইবে কিনা; বিদেশে আমাদের উৎপন্ন বিক্রয় করিয়া যত টাকা আমরা পাইতেছি ইহাতে তাহার পরিমাণ কমিয়া যাইবে কি না; বিদেশের নিকট আমাদের যে সকল ঋণ আছে, তাহার জন্য কোনও অসুবিধা হইবে কি না; বিদেশের বাজারে আমরা যে সকল জিনিস বিক্রয় করি, অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায়, সেখানে পরাভব ঘটিবার সম্ভবনা আছে কি না; এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

দেশের মুদ্রানীতি এবং মুদ্রার মূল্যের সহিত দেশের আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট এবং ব্যাপারটিও অতিশয় জটিল। এবিষয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞেরা যেরূপ পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বিশেষ কষ্টকর।

এ সম্বন্ধে বে-সরকারি বিশেষজ্ঞদের লইয়া গঠিত একটি সমিতির নিয়োগ ও তাঁহাদের দ্বারা বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও বিচার দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইঁহারা বিস্তৃতভাবে সকল দিক আলোচনার পর সঠিকভাবে যাহা নির্ণয় করিবেন, তাহার অনুকূলে যাহাতে জনমত গঠিত হয়, এবং সরকারও সেই নির্দ্ধারিত নীতি যাহাতে অনুসরণ করেন, তাহার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিৎ।

বাংলার বাহিরে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা

রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করিলে কোনও নূতন কথা বলা হয় না। অথবা তাহার দ্বারা বাঙ্গালী জাতিকেও নূতন করিয়া সম্মান করা হয় না। তাহা হইলেও, বাংলার বাহিরে, বাঙ্গালীদের যোগ্যতা ও গুণ যথাযথ ভাবে স্বীকৃত বা সম্মানিত হয় না, অনেক বাঙ্গালীর মনে এ সন্দেহ জাগিয়াছে।

সেইজন্য চিদাম্বরমের মানয়াণী ক্লাবের উদ্যোগে অন্নমালৈ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক মিঃ করুণাকর মেননের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায়, তামিল নাইডু অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সঙ্ঘের সম্পাদক মিঃ জি, রামচন্দ্রণের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় কয়েকটি উক্তির এখানে উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষা মহত্তর কোনও ব্যক্তি নাই।······বর্ত্তমান জগতের নব জাগরণে ডাঃ ঠাকুরের দান মহাত্মার দানেরই সমতুল্য। অহিংসানীতির প্রবর্ত্তনে, ডাঃ রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা, যে কোনও বৌদ্ধ প্রচারকের যত্ন অপেক্ষাও অধিক প্রশংসনীয় ও কার্য্যকরী" বর্ত্তমান ভারতে মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যেও ইঁহাদের আসন অতিশয় উচ্চে। ইঁহারা দুই জনেই ভারতীয় সভ্যতায় দুইটি বিভিন্ন ধারার প্রতিনিধি। নিজেদের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রখর মনীষার দ্বারা তাঁহারা ভারতীয় আদর্শের যে নবতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে জগতের কাছে ভারতের মর্য্যাদা ও গৌরব বাড়িয়া গিয়াছে।

মহাত্মাজী একজন দৃঢ়চিত্ত, সত্যনিষ্ঠ বীর; সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বারা তিনি তাঁহার আদর্শকে শক্তিদান করিয়াছেন এবং তাহাকে জগতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অশেষ দুঃখ বরণ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও তাঁহার আদর্শকে কর্ম্মে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে। তাঁহার সুবিপুল সাহিত্য, দেশে দেশে যুগে যুগে বহু লোককে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং বহু বীর, কর্ম্মী, সাধক ও আদর্শবাদীর উদ্ভব সম্ভব করিবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র কবি; রাজনীতিক অথবা সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি কোনও কথা বলেন নাই, পূর্ব্বোক্ত বক্তা এরূপ কথা বলিয়াছেন।

তাঁহার এই উক্তি সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তাউদ্দীপক অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন; সমাধানের অনেক নূতন ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি শুধু কবি হিসাবে নহেন, অসাধারণ চিন্তাশীল মনীষি হিসাবেও, জগতের শ্রেষ্ঠ লোকদের অগ্রণী।

বাঙ্গালী ও প্রাদেশিকতা

জাতীয়তার উদ্বোধন সর্ব্বপ্রথম বাংলায় হইয়াছিল। বাংলায় যখন প্রথম বিদেশী বর্জ্জন আরম্ভ হইল, তখন বাংলা এবং বোম্বাইএর মধ্যে কোনও পার্থক্যের কথা বাঙ্গালী মনে করে নাই। সমগ্র ভারতের স্বার্থের জন্য প্রাদেশিক স্বার্থ সে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালী যদি প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে যথেষ্ট সচেতন থাকিত, তাহা হইলে, বর্ত্তমানে সকল দিক দিয়া আমরা এতটা দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতাম না।

কিন্তু, বাংলার প্রতি অন্যান্য প্রদেশের ধারাবাহিক দীর্ঘ-দিনব্যাপী অবিচার, বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের মনে প্রদেশ-প্রীতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানে উপেক্ষণীয় হইলেও, কালক্রমে ইহা এমন আকার গ্রহণ করিতে পারে, যাহা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়া উঠিবে।

বঙ্গেতর প্রদেশ সমূহে বাঙ্গালীর প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান বিদ্বেষই প্রথমে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মন বিরূপ করিয়া তুলিতে থাকে। তাহার পর ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারে বাঙ্গালীকে উপেক্ষা ও কোণ-ঠাসা করিবার চেষ্টায় বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রাদেশিক মনোভাব ক্রমেই দৃঢ়মূল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

অন্যান্য প্রদেশবাসীদের নিকট বাংলা কতটা সুবিচার পাইবে আধুনিক তিনটি ব্যাপারে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মিলনবৈঠকে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছিল। সকল প্রদেশের মধ্যে একটা সহযোগিতার ভাব থাকিলেও, বাঙ্গালী হিন্দুদের স্বার্থ সম্বন্ধে অন্য প্রদেশের হিন্দুদের উদ্বিগ্ন হইতে দেখা যায় নাই। বরং সকলে মিলিয়া বাংলার স্বার্থ বিক্রয়ের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, সকলে একযোগে বাঙ্গালীদের দোষ দিয়াছিলেন। পুণাচুক্তির সময়ে, বাঙ্গালী প্রতিনিধিদের সম্মতির যে প্রয়োজন আছে, সে কথা কাহারও মনেই পড়িল না। এবং সর্ব্বশেষে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক এবং যুক্ত-কমিটিতে অন্যান্য প্রদেশের নেতারা, কেহ প্রয়োজন মত নীরব থাকিয়া এবং কেহ কার্য্যতঃ বাধা দিয়া বাংলার বিপক্ষতা করিলেন।

এই তিনটি ব্যাপারে অবাঙ্গালীদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের মূল সিথিলতর হইয়াছে। অবাঙ্গালী ভারতীয়েরা যদি সময় থাকিতে তাঁহাদের আচরণের পরিবর্ত্তন না করেন, তবে ক্রমে বাংলায় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং তাহার জন্য বাঙ্গালীদের দায়ী করা চলিবে না।

আফ্‌গান স্বাধীনতার পঞ্চদশবর্ষ

আফ্‌গানীস্থানের স্বাধীনতা লাভের পঞ্চদশবার্ষিকী উৎসব বিশেষ সমারোহসহকারে কাবুলে সম্পন্ন হইয়াছে। ভারত-বর্ষের এই প্রতিবাসী দেশটির উন্নতিতে ভারতবাসীরা আনন্দিত ও লাভবান্।

১৯১৯ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ইহার প্রথম স্বাধীন-রাজা আমির আমানুল্লা, নানাভিমুখী উন্নতি ও সংস্কার প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক পতনে এই প্রচেষ্টা কিছু বাধাগ্রস্ত হইলেও, ইহার বর্ত্তমান রাজা নাদির সাহের চেষ্টায় ইহা দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

ইহা দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয় পক্ষের কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না থাকায়, পরাধীন দেশ অপেক্ষা স্বাধীন দেশের লোকদের পক্ষে নূতনকে গ্রহণ করিবার ও নিরপেক্ষ যুক্তিকে সম্মান করিবার ক্ষমতা অধিক। ধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক অনুরক্তি ও প্রাচীন রীতিপদ্ধতির উপর আসক্তি সব দেশের মুসলমানদের মধ্যেই প্রবল ছিল। কিন্তু, তুরস্ক ও পারস্যের মত সহজে আধুনিক হইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে, ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে তাহা হয় নাই। আফগানিস্থান যদি সকল দিক দিয়া আধুনিক হইয়া উঠিতে পারে, রাষ্ট্রকে

ধর্ম্মের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া, ভৌগলিক ভিত্তির উপর জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, সামাজিক জীবনে পুরাতন বিশ্বাসের স্থানে যুক্তি ও বিবেচনাকে স্থান দিতে পারে, তবে ভারতীয় মুসলমানদিগের উপর তাহার প্রভাব বিশেষ হিতকারী হইবে।

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমান অধিবাসীদের সহিত আফগানিস্থানের সম্পর্ক বিশেষ দুর নহে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদিগের নেতৃত্ব ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলেন। এই জন্য আফগানিস্থানের প্রভাব ভারতীয় মুসলমান-দিগের উপর বিশেষ প্রত্যক্ষ। আফগানিস্থানের উন্নতিতে এই দিক দিয়া আমরা লাভের আশা করিতে পারি।

স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবাদের অধিকার

হিন্দুবিধবারা যাহাতে কয়েকটি মূলনীতি অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভাতা পাইবার অধিকারী হন, শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা কর্ত্তৃক উত্থাপিত এরূপ একটি বিধানের পাণ্ডুলিপির, সাধারণের মত জানিবার জন্য, প্রচারের ব্যবস্থার প্রস্তাব আইন পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আইন পরিষদে রক্ষণশীল প্রাচীন পন্থী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি অধিক থাকায়, এবং সরকার পক্ষ সব সময়েই রক্ষণশীলতার অনুকূলে থাকায়, সকল প্রকার সংস্কারমূলক আইনের বিবেচনাই, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপায়ে পিছাইয়া দেওয়া হয়।

আমাদের নারীদের পৈতৃক অথবা স্বামীর কোনও প্রকার সম্পত্তি ও অর্থে, কিছুমাত্র স্বত্ব না থাকায়, পরের অনুগ্রহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে সমাজে তাঁহাদের কোনও প্রকার স্থান নাই। পৈতৃক অর্থে এবং সম্পত্তিতে পুত্রদের উত্তরাধিকার থাকায় তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে জীবনে প্রতিষ্ঠা-লাভের পক্ষে একটা আর্থিক ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত হন। কন্যাদের এই অধিকার না থাকায় তাঁহাদের প্রতি অবিচার হইয়াছে এরূপ অনেকে মনে করিয়া থাকেন। মেয়েদের প্রতি যাহাতে এই অবিচার দূর হয়, এবং তাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন, তাহার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন ও জনমত গঠনের চেষ্টা দেশের মধ্যে হইয়াছে। কিন্তু, স্বামীর জীবিত কালে, স্বামীর (এবং তাঁহার পৈতৃক) সম্পত্তি নারীরা ভোগ করিতে পারেন বলিয়া, তাঁহাদের প্রতি কৃত অবিচারের খণ্ডন হইয়া যায়, এরূপ যুক্তি বিপক্ষে কেহ দিতে পারেন। যদিও স্বামীর মৃত্যুর পর এবং জীবিত কালেও স্বামীর ও শ্বশুরের সম্পত্তিতে আইনগত কোনও অধিকার না থাকায়, যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়। স্বামীর এবং শ্বশুরের সম্পত্তিতে আইনগত অধিকার জন্মিলে বাস্তবিক পক্ষে নারীদের প্রতি ন্যায় বিচার হইতে পারে। যদিও ধনীলোকের কন্যার বিবাহ সব সময় ধনীলোকের সহিত হয় না, এবং সেদিক দিয়া অন্যায় হয়ত কিছু থাকিয়া যায়, তাহা হইলেও পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার অপেক্ষা স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারলাভকে আমরা অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করি।

আমাদের এবং পৃথিবীর সব সভ্য দেশের সমাজ ব্যবস্থানুসারে নারীদের স্বামীগৃহে যাইতে হয় এবং তাঁহার পরিবারভুক্ত হইতে হয়। স্বামীগৃহকেই স্বভাবতঃ তাঁহারা আত্মগৃহ বলিয়া মনে করেন, এবং সেখানকার ইষ্টানিষ্টের সহিতই তাঁহাদের মনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরূপ অবস্থায় পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলে, পিতৃপরিবারের স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

ইহার আরও একটি অসুবিধা আছে। সাধারণতঃ ভ্রাতা এবং ভগিনীদের পরিবারের বিভিন্নস্থানে বাস (কারণ কন্যাদের বিবাহ অনেক সময়েই বিদেশে হয়); না হইলেও ভ্রাতারা যেরূপ তাহাদের বধূদের সহিত একই পরিবারের লোক, ভ্রাতারা এবং ভগিনীরা সেরূপ হইতে পারেন না। বিভিন্ন স্বার্থযুক্ত পরিবারের মধ্যে স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, নানাকারণে বিবাদ ও গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে।

অন্যদিকে স্বামীর সম্পত্তি ও অর্থের অংশী হইলে, নূতন কোনও স্বার্থের সৃষ্টি হইবে না। কারণ ভ্রাতারা সকলেই সমানভাবে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাঁহাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত এখনও ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা প্রত্যেকেই, নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি

সকলের সমষ্টিগত স্বার্থকেই এখনও নিজ স্বার্থ মনে করিয়া থাকেন। কাজেই কোনও নূতন বিরুদ্ধ স্বার্থের সৃষ্টি হইল না। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাঁহার স্বামীর স্থানই গ্রহণ করিবেন। একমাত্র শুধু নিজের পুত্রদের সহিত (এরূপ হইবার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম) বিবাদের ক্ষীণ সম্ভাবনা একটু বাড়িয়া গেল। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাইতে পারে।

একজনের যদি দুটিপুত্র এবং দুটি কন্যা থাকে, এবং কন্যারা সমান অধিকার প্রাপ্ত হ'ন তাহা হইলে, তাঁহার সম্পত্তি চারি ভাগে ভাগ হইবে। কিন্তু, স্বামীর সহিত একত্রে স্বামীর এবং শ্বশুরের সম্পত্তির অধিকারী হইলে, এবং কন্যাদের অংশ না থাকিলে, কল্পিত ব্যক্তির সম্পত্তি সাধারণ ক্ষেত্রে মাত্র দুই ভাগ হইবে। স্বামীর সহিত স্ত্রীর বিরোধ এবং সেজন্য পৃথক হইয়া থাকিবার প্রয়োজন খুব কমক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে। অন্যদিকে কন্যাদের অধিকার জন্মিলে সবক্ষেত্রেই বধূ কিছু পিতৃগৃহে লইয়া আসিবেন এবং কন্যা আবার কিছু লইয়া যাইবেন, ইহাতে সর্ব্বত্রই টুক্‌রা টুক্‌রা ভাগ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। অথচ, বিকল্প প্রস্তাবে এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না, নারীদের প্রতি বর্ত্তমানের অবিচার দূর হইবে এবং তাঁহারা বর্ত্তমানের ন্যায় সমাজের অবহেলা ও করুণার পাত্রী থাকিবেন না।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর সমান অধিকার থাকা সকল দিক দিয়া সঙ্গত। স্ত্রীর সাহায্যে ও সহযোগিতায় এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় সংসার গড়িয়া উঠে। যদিও আমাদের দেশে সাধারণতঃ পুরুষেরাই অর্থোপার্জ্জন করেন এবং আপাত-দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকেরা বসিয়া বসিয়া তাহা ভোগ করেন, তাহা হইলেও সংসারে স্ত্রীলোকদের দানের মূল্য অর্থ অপেক্ষা কম নহে। যে সংসারের জন্য তাঁহারা সারাটা জীবন প্রাণপাত করেন, সেই সংসারের একটা বিশেষ দিকে (অর্থ ও সম্পত্তিতে) তাঁহাদের কোনও প্রকার অধিকার থাকিবে না, ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই স্বামীর জীবিত-কালে, সংসারের সকল বিষয়ের উপর উভয়ের সমান কর্ত্তৃত্ব থাকে। কিন্তু এই অধিকারের পশ্চাতে আইনের সমর্থন না থাকায়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর নানাপ্রকার নির্য্যাতন করা, স্বামীর এবং পরিবারস্থ অন্যান্য লোকের পক্ষে সম্ভব হয়। অন্ন এবং বস্ত্র অর্থ-সাপেক্ষ, এবং সর্ব্বসময়েই ইহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কাজেই, এই অর্থ যদি একজনের করায়ত্ত থাকে তাহা হইলে প্রয়োজনমত সে অপরের অন্য সর্ব্বপ্রকার গুণ, যোগ্যতা ও সেবার মূল্য অস্বীকার করিতে পারে।

কাজেই, স্বামীর অর্থে ও উপার্জ্জনে স্ত্রীর আইনসম্মত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে, সংসারের মধ্যে নারীর উপর নির্য্যাতন অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। কিন্তু, ইহা ত গেল স্বামীর জীবিত কালের কথা।

স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্ত্রীর যে-প্রকার দুর্দ্দশা হয়, তাহা অধিকাংশ সংসারেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কোনও একান্নবর্ত্তী পরিবারে, কোনও উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি হয়ত, কর্ত্তৃস্থানীয় আছেন এবং তাঁহার স্ত্রীর হাতেও এই কর্ত্তৃত্বের অংশ আছে। সহসা যদি এই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্ত্রী যে অবস্থায় পতিত হন, তাহা সকলেই বহুস্থানেই দেখিয়া থাকেন। স্ত্রীকে সেই অবস্থায় দেখিতে বা তাঁহার সেই অবস্থা কল্পনা করিতে স্বামী কখনই তৃপ্তি বোধ করিতেন না। ইঁহার যদি পুত্র-কন্যা না থাকে, তবে, সারাজীবন, এই প্রকার দুরবস্থায় এবং পরানুগ্রহে কাটাইতে হয়।

এরূপ অঘটন ঘটিতেও দেখা যায়, যে, যে-লোক স্বামীর জীবিতাবস্থায় চিরদিন তাঁহার বিরুদ্ধতা করিয়া আসিয়াছে, সেই লোকই আসিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া বসিল। এবং পূর্ব্বে যিনি সম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাকে পূর্ব্ব-শত্রুর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইল।

স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রয়োজন শুধুমাত্র নারীদের উপর সুবিচারের জন্য নহে; অনেক স্থলে ইহার দ্বারা পুরুষের প্রতিও সুবিচার করা হইবে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায়, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, যেমন স্বামীর উপর সংসারের সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব পতিত হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেই মাত্র পুত্রেরা তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, স্বামীর মৃত্যু হইলেও তেমনি স্ত্রীর উপর একই প্রকারের

কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব থাকা উচিৎ, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেই মাত্র, পুত্রদের অধিকারের কথা উঠা উচিৎ।

প্রস্তাবিত আইনে অবশ্য এতটা ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা নাই, ইহাতে করুণারই একটু বর্দ্ধিত অংশ দিবার ব্যবস্থা আছে মাত্র এবং তাহাও স্বামীর মৃত্যুর পরে। ইহার সম্বন্ধে যে মতদ্বৈধ হইতে পারে, বা ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কার কথা মনে উঠিতে পারে, ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একথা মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা মানুষের প্রতি অন্যায় করিতে চায়, মানবতার অলিখিত বিধানকে অস্বীকার করিতে চায়, আইনের বিধান তাহাদেরই জন্য মাত্র।

মেয়েদের কোনও অধিকার দিলে তাহার অপব্যবহার হইবেই, এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক হইবে না। বরং তাঁহাদের পশ্চাতে শক্তি থাকিলে, তাঁহাদের প্রতি আমাদের ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইবে, সংসারে ও সমাজে তাঁহাদের মর্য্যাদা বাড়িবে, এবং আইনের আশ্রয় লইবার প্রয়োজন কম ক্ষেত্রেই হইবে।

বঙ্গে নারী-নির্য্যাতন

নারী নির্য্যাতনের প্রতিকারে দেশের জনমত যে কিছু পরিমাণেও, গঠিত এবং জাগ্রত হইয়াছে, ইহা আশার কথা। যাঁহারা এজন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা সকল বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র।

নারী-নির্য্যাতন এদেশে কতদিন হইতে চলিতেছে, তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। বর্ত্তমানে যে ইহার অত্যন্ত সংখ্যাধিক্য দেখা যাইতেছে, তাহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, পূর্ব্বে লোকের এবিষয়ে কুসংস্কার বিশেষ প্রবল ছিল। কেহ নির্য্যাতিতা হইলে যে, তাঁহার উদ্ধার সাধনের প্রয়োজন আছে, লোকে একথা মনে করিত না, এজন্য শুধুমাত্র লাঞ্ছিতা এবং তাঁহার পরিবারবর্গ কলঙ্কিত হইতেন, সমাজে তাঁহার পুনর্গ্রহণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না (এখনও অনেক স্থলেই নাই), অন্যত্রও কোনও আশ্রয় জুটিত না এবং এই সকল কারণে লোকে ইহার প্রতিকারে সচেষ্ট হইত না। প্রতিকারের চেষ্টা যাহা হইত, দেশে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা ভাল না থাকায়, তাহাও সব সময়ে সাধারণের গোচরীভূত হইত না।

বর্ত্তমানে এই পাপের বিরুদ্ধে, জনমত কিছু পরিমাণে জাগ্রত হওয়ায়, শিথিল হইলেও, কতকটা সঙ্ঘবদ্ধতা গড়িয়া উঠায়, হিন্দুসভা, হিন্দুমিশন, নারীরক্ষা সমিতি প্রভৃতির চেষ্টায়, এবং দেশীয় সংবাদপত্রগুলির সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল এবং প্রচার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায়, এমন বহুসংখ্যক নারীনির্য্যাতনের সংবাদ সাধারণের গোচরীভূত হইতেছে এবং অনেকগুলির প্রতিকারের জন্য অল্পাধিক পরিমাণে সমবেত চেষ্টা হইতেছে। এই সকল প্রচেষ্টা আশুফলদায়ক না হইলেও, কালে যে, ইহা কিছুপরিমাণে ফলপ্রসূ হইবেই, তাহা সুনিশ্চিত।

কিন্তু নারীকে গৃহে ও সমাজে পূর্ণমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, নারীর প্রতি সম্মানবোধ ও দায়িত্ববোধ আমাদের কখনই জন্মিবে না এবং নারীকে সম্মান করিতে পারা ও প্রয়োজন মত তাহাকে অসম্মানের হাত হইতে রক্ষা করিতে জানা যে, পৌরুষের সর্ব্বপ্রধান পরিচয়, অথবা নারীকে অসম্মান করা বা প্রয়োজন মত তাহাকে অসম্মানের হাত হইতে রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হওয়া যে চরম কাপুরুষতা, সে বোধ সমাজের মধ্যে জাগ্রত হইবে না।

নারীরা অধিকতর সম্মানের অধিকারিণী হইলে, ও, সামাজিক এবং পারিবারিক স্বাধীনতার আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইলে, অপরের নিকট হইতে সম্মান আদায়ে এবং সম্মান রক্ষায় অধিকতর সামর্থ্যবতী হইবেন। দুষ্কৃতকারীদের দমন চেষ্টার সহিত, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও এই কারণে, আমাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

অন্তঃপুরে নারী নির্য্যাতন

আমাদের অন্তঃপুরে অবরোধের অন্তরালে স্মরণাতীত কাল হইতে যে নারী নির্য্যাতন চলিতেছে, বর্ত্তমানেও তাহার ব্যাপকতা পূর্ব্বালোচিত নারী নির্য্যাতন অপেক্ষা অধিক এবং নির্ম্মমতা কোনও কোনও স্থলে কম নহে। শিক্ষার

প্রসার, অবরোধের উচ্ছেদ, আর্থিক এবং গতিবিধির স্বাধীনতা ব্যতীত ইহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব নহে। আর্থিক এবং গতিবিধির স্বাধীনতা থাকিলে, নীরবে কেহ এই প্রকার অত্যাচার সহ্য করিবে না, অথবা গোপনে এই প্রকার অত্যাচার করাও সম্ভব হইবে না। চেষ্টা করিলেও, আর্থিক স্বাধীনতা পাইতে হয়ত কিছু দেরী হইতে পারে, এবং নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিতে পারে। কিন্তু, গতিবিধির স্বাধীনতা, পুরুষের ন্যায় বাহিরের সহিত যোগাযোগের চেষ্টা বোধহয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে এবং তাহাতে ইহার প্রতিকারও অনেকটা হইতে পারে।

নারীহরণ ও সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য

নারীহরণ সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি, তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করেন নাই। ভালভাবে সংবাদপ্রকাশ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে সাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা প্রভৃতির দ্বারা তাঁহারা ইহার প্রতিকারেও জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহারা এজন্য এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন অথবা এখনও যাহা করিতেছেন, তাহা আর একটু প্রণালীবদ্ধভাবে করিলে, বোধ হয়, আরও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে।

ইংরাজী এবং বাংলা সংবাদপত্রগুলির প্রত্যেকখানিই, পত্রিকার একটি প্রধানস্থানে, এই সংবাদের জন্য একটি করিয়া পৃথক বিভাগ খুলিতে পারেন, এবং এই জাতীয় সকলপ্রকার সংবাদ সেই বিভাগে প্রকাশ করিতে পারেন। এই প্রকার সংবাদের এত বাহুল্য আছে যে, কোনও দিন এই বিভাগ শূন্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মাসের শেষে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বা মন্তব্যে মাসের মধ্যে কতগুলি এরূপ নূতন ঘটনা ঘটিল, পুর্ব্বঘটনার মধ্যে কতগুলির মোকর্দ্দামা চলিল, কতগুলি মোকর্দ্দামা শেষ হইল এবং কতগুলিতে অপরাধীদের শাস্তি হইল, কতগুলিতে তাহারা মুক্তি পাইল, দেশের কোন্ অংশে এরূপ ঘটনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘটিল, কোন্ শ্রেণীর লোকেরা বেশীর ভাগ স্থানে অপরাধ করিল, কাহারা উৎপীড়ন ভোগ করিল, কোন্ কোন্ স্থানে দুর্ব্বৃত্তেরা বাধা পাইল, এই সম্পর্কে কেহ কোনও সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দিল কিনা, প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ করিলে, জনমত গঠনের ও এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের পক্ষে আরও অধিকতর সুবিধা হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বর্ব্বরোচিত উক্তি

করাচী "ডেলি গেজেট' পত্রের ১৮ই আগষ্ট সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মহাত্মা গান্ধীকে বেত্রাঘাত করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই ঘটনা সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, এবং সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা লক্ষিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় সর্ব্বলোকপূজ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি যাহারা এইপ্রকার হীন বর্ব্বরোচিত উক্তি করিতে পারে, তাহারা প্রতিবাদ করিবার মত গুরুত্ব ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ভদ্রব্যক্তি নহে। সরকার পূর্ব্বেই অবশ্য ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল কাগজের ভারতীয় পাঠক এবং ক্রেতা জুটে, এবং প্রধানতঃ তাঁহাদের নিকট হইতে লব্ধ অর্থে এই শ্রেণীর অধিকাংশ কাগজ পরিচালিত হয়।

সুশীলকুমার বসু

পুস্তক পরিচয়

শৃঙ্খল—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। রঞ্জন প্রকাশালয়, ৫-সি, রাজেন্দ্রলাল-ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য একটাকা আট আনা।

নিদারুণ গ্রীষ্মের গুমোটের মধ্যে একঝলক দক্ষিণা হাওয়ার মত সাহিত্য-জগতে ন্যাকামিপূর্ণ প্রেমের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সরোজবাবুর "শৃঙ্খল" উপন্যাসখানি হইয়াছে একান্ত তৃপ্তিপ্রদ। একেই তো বাঙ্গালীর জীবন একান্ত সঙ্কীর্ণ, পুরাতনের পুনরাবর্ত্তনে নিতান্ত একঘেয়ে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই মন যদি বিরাটতর ক্ষেত্রে মুক্তি না পায়, মহৎ চিন্তা, বিপুল কর্ম্ম বা নবতর বৈচিত্র্যের রসগ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার দুঃখের অন্ত থাকে না। বাঙ্গালীর এই সঙ্কীর্ণ ও একঘেয়ে জীবনের পটভূমিকায় কুশলী শিল্পীর তুলিকায় শ্রীযুক্ত সরোজকুমার যে অভিনব সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকাকে মুগ্ধ করিবে।

বিশ্বেশ্বর তরুণ শিক্ষিত যুবক, গ্রামের আদর্শ। কতকটা ঘটনাচক্রে, কতকটা গ্রাম্য দলাদলির চক্রান্তে সে আপনার স্ত্রীর হত্যাকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইল। নির্ভীক উদাসীনতার সহিত সত্যকথা বলা ভিন্ন অর্থাৎ. সে যে স্ত্রীকে হত্যা করে নাই ইহা বলা ভিন্ন আইনের কূট নাগপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সে অন্য কোন চেষ্টা করিল না। ফলে তাহার সাত বৎসর কারাদণ্ড হইল। এই তরুণ আদর্শবাদী যুবক যখন প্রায় সাতবৎসর পরে কারামুক্ত হইল তখন সে ভগ্নস্বাস্থ্য ভগ্নোদ্যম, অমানুষ নির্ম্মম। লৌহচক্রের মত কারাগারের শাসনযন্ত্র তিল তিল করিয়া এই বিশ্বেশ্বরের মনুষ্যত্বকে কিরূপ ভাবে পেষণ করিয়া তাহাকে অমানুষ করিয়া তুলিল উপন্যাসের আখ্যানভাগের মধ্য দিয়া লেখক তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কারাজীবনের এই মনুষ্যত্ব-লোপকারী নির্ম্মম দিকটা তাহার ভয়াবহ পরিণতি লইয়া চোখের সম্মুখে যেন জীবন্ত হইয়া ভাসিয়া উঠে। অথচ আধুনিক কারাজীবনকে নিন্দা করিবার জন্য বা বিশেষ কোনও তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য এই উপন্যাস লেখা হয় নাই। এইখানেই লেখকের বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি লিখিয়াছেন উপন্যাস, আপনমনে আমাদের কারাজীবনের গল্প শুনাইয়া গিয়াছেন। সেই গল্প বলার ভঙ্গী আখ্যানভাগের সঙ্গতি ও ভাষার স্বচ্ছ সরল প্রবাহ আমাদিগকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিনাবাধায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। কিন্তু উপন্যাসখানি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বর, পণ্ডিত, নবীনওয়াজ, ঘোষ প্রভৃতি চরিত্রের জন্য মন ব্যথায় ভরিয়া ওঠে এবং মনে হয় হায়, এইরূপ শত শত ব্যক্তি নিয়ত এই কারাযন্ত্রে পিষ্ট হইয়া কিরূপে অমানুষ হইয়া উঠিতেছে! এই পদ্ধতির কি পরিবর্ত্তন হইবে না?

পুস্তকের ছাপা কাগজ ও বাঁধাই বিশেষ করিয়া প্রচ্ছদ-পটের চিত্রখানি সুন্দর।

সুবোধ রায়

প্রথম প্রেমঃ—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত। দাম দুই টাকা।

"প্রথম প্রেম" অবশ্য অচিন্ত্য সাহিত্যে প্রথম প্রেম-কাহিনী নয়। কিন্তু এই উপন্যাসখানিতে যে অচিন্ত্যকুমারের বৈশিষ্ট্য এবং কৃতিত্ব সবিশেষ প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রথম উপন্যাস "বেদে"র প্রেমচিত্র প'ড়ে মনে হয়, তা ঠিক আমাদের বাস্তবজীবনকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠতে পারেনি কিন্তু "প্রথম প্রেমে" অঙ্কিত আলেখ্য শুধু যে আড়ষ্টতা থেকে মুক্ত তা নয়,—এ প্রাণবন্ত। ভাষার দিক থেকে অচিন্ত্যকুমারের মৌলিকদান অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর সুষ্ঠু, সাবলীল লিখনভঙ্গী,

তাঁর একমাত্রিক বিশেষণের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্য তাঁর শব্দসম্পদের লালিত্য ও অপরিমেয়তা তাঁকে দিয়েচে বঙ্গবাণীর দরবারে স্থায়ী অধিকার। অবশ্য "বেদে"র অনেকস্থানে ভাষার স্রোতে ভাব গেচে আড়ষ্ট হ'য়ে, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে ভাষার গতি যথেষ্ট সংযত ও পরিমিত। বঙ্গ সাহিত্যের দিক থেকে লেখকের প্রতিভার এই উত্তরোত্তর বিকাশ খুবই আশাপ্রদ।

গল্পের নায়ক মানবের রক্তে ছিল বন্ধনমোচনের সুর। তার উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল বাপ পিতৃপুরুষের জমিদারী ফুঁকে দিয়ে স্ত্রীপুত্রকে পথের মাঝখানে ফেলে উধাও হয়ে গেছল। তারপর মানব এসে পড়ল তার ধনী পালকপিতা সতীশবাবুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়ে। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের বন্ধন মানবের উদার চিত্তকে সঙ্কুচিত করতে পারেনি; দুহাতে দান ক'রে সে পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। বন্ধু যখন এসে জানালে, "দাদাও এমনি উড়োতে থাকলে দুদিনেই দেউলে হয়ে যাবে," সে হেসে জবাব দিয়েছিল, "সে রোমাঞ্চ সহ্য করবার মত আমার স্নায়ু আছে। আমি স্রোত চাই, নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনের বেগ।" ইতিমধ্যে মিলি এসে মানবের হৃদয় করলে জয়। তার নদীর মত স্নিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানবের মনে পড়ে নিজের মা'র কথা। শেষে তাদের বিবাহ হয়ে গেল স্থির। হঠাৎ সে পথে এসে দাঁড়াল এক বাধা। অপুত্রক সতীশবাবুর গৃহে হল শিশুর আবির্ভাব। মানবের এবার বিদায়ের পালা। কপর্দ্দকহীন পথের মানব নির্ব্বিকারের মত পথে বেড়িয়ে পড়ল। কিন্তু যাকে দুঃখের সঙ্গিনীরূপে পাবে আশা করেছিল, তাকে আর পাওয়া গেল না। কিছুদিন পরে এক ছোট্ট, অন্ধকার মেসের ঘরে বসে একখানা চিঠি পেলে—মিলির বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র।

মিলি-চরিত্র সেরূপ প্রস্ফুট হয়ে না উঠলেও মানবচরিত্রের অনবদ্য চিত্রখানি লেখকের প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দেয়। অচিন্ত্যকুমারের রিয়্যালিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আছে বেশ একটু রোমান্টিক ভিত্তি। "ছোট ছোট নুড়ির মাঝখানে নির্ঝর রেখার খুসির মত মিলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল"—একে নিছক রিয়্যালিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গি বলে ভুল করা দুরূহ। কোন ইংরাজ লেখকের বিচার-প্রসঙ্গে কে একজন বলেছিলেন, "His ease results too often in profusion ; and he knows too rarely how to secure for an effect the supreme virtue of moderation" সাধারণভাবে অচিন্ত্যকুমারের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ করা যায়। অনেক সময় তাঁর নায়কচরিত্রে এসে পড়ে একটা ন্যাকামির সুর। তার ফলে চরিত্রের প্রভাব হয়ে পড়ে খাপছাড়া। কিন্তু "প্রথম প্রেমে" মনে হয় লেখকের এই দুর্ব্বলতা যেন বিশেষভাবে সংযত রয়েচে। বিশেষতঃ লেখক গল্পের শেষভাগে ট্র্যাজিক রেশটুকু সৃষ্টি করেছেন কয়েকটি ইঙ্গিতপূর্ণ ছোট্ট কথা দিয়ে। এই শেষ অংশটুকু যদি না থাকত, ত' উপন্যাসের প্রভাব আমাদের মনে অত গভীরভাবে সাড়া জাগাতে পারত না। এর জন্যে অচিন্ত্যকুমারকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। আমাদের অতি আধুনিক লেখকদের আর্ট-এর বিরুদ্ধে এবং পক্ষে অনেক কিছু বলা যায় স্বীকার করি, কিন্তু সে সব কথা বিশেষভাবে বিচার করবার দিন এখনো আসেনি। কারণ শুধু এদেশে নয়, যে সব অতি আধুনিক ইংরাজ লেখকদের প্রভাব এঁদের সাহিত্যে পড়েচে, তাঁদেরও এখনো Experimental যুগ শেষ হয়নি। তবে "প্রথম প্রেমে" মানব-চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে যে নৈপুণ্য দেখা গেচে, তাতে মনে হয়, বাংলা-সাহিত্য অচিন্ত্যকুমারের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতে পারে।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

ব্যথার পরাগ—শ্রীকৃষ্ণধন দে প্রণীত। ৮১ পৃঃ। প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

৩৫টি কবিতার সমষ্টি। ইহা ব্যতীত 'জাগরণী' এবং "নিমীলনী" শীর্ষক দুইটি কবিতা আছে। প্রথমটিতে যে ফুলগুলির ব্যথা কবি প্রকাশ করিবার ভার লইলেন তাহাদের জাগাইয়া তোলা হইয়াছে এবং শেষটিতে ফুলগুলি তাহাদের ব্যথা প্রকাশ করিবার পর পুনরায় পরাগ বন্ধ করিল কবি ইহাই দেখাইয়াছেন।

কবিতার সার্থকতার বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ পাঠকের ভাল লাগা—এত ভাল লাগা যে বই ছাড়িতে না চাওয়া। সে হিসাবে 'ব্যথার পরাগ' যে অনবদ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যই পড়িতে পড়িতে বই ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। কবির স্বতঃ উৎসারিত অনুপ্রেরণা পাঠককে একেবারে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখে। বর্ত্তমান কবিতার ক্ষেত্রে প্রায়ই এ গুণ দুষ্প্রাপ্য।

বিষয় নির্ব্বাচনেও নূতনত্ব আছে। ফুল ত আমরা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাদের অন্তরে কি বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা ত কোনদিন জানিতে পারি নাই। কবির চোখে তাহা প্রথম দেখিলাম।

'গোলাপফুলের ব্যথা' আমার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। গোলাপ যেদিন বাদশাহের নিষ্ঠুরতায় অকালে মাটিতে ঝরিয়া পড়িল তাহার সেদিনের স্তোকবাক্য মনকে সান্ত্বনা দেয় না, চোখের কোণে অশ্রু জমাইয়া তোলে:—

"বহিন্, তোরা কাঁদিস্ না'ক,
আস্‌ব ফিরে তোদের ঘরে,
ফুটবে যে ফুল ব্যথায় রঙীন্
তুচ্ছ আমার কবর 'পরে,—
তারেই তোরা বাসিস্ ভালো,
তারেই থাকিস্ বক্ষে ধরি
বস্‌রাতে আজ ঝরল যে গুল্,
ফুটবে সে যে জগৎ ভরি॥"

হরিজন আন্দোলনের কথা সম্প্রতি আমরা শুনিতেছি। কিন্তু 'ব্যথার পরাগের' কবি তিন বৎসর আগে (আশ্বিন ১৩৩৭) ইহার আভাষ তাঁহার কাব্যে দিয়াছেন। তুলসী মঞ্জরী ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া দুইটি চাঁড়ালের মেয়েকে পুরোহিত খড়মপেটা করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া কবি বলিতেছেন:—

"চাঁড়ালের মেয়ে শুচিতা তোমার জানেনা'ক হতভাগী,
ছিঁড়িয়াছে শুধু মঞ্জরী দু'টি ছোট ভাইটার লাগি'।
খড়মের চোটে শাস্ত্রনিয়ম দেখায়ে দিয়েছ ঢের,
আহা! ও কাঁদিছে লুটায়ে ধুলায় মেরোনা'ক ওকে ফের্!
অশুচি হয়েছে তুলসীমঞ্চ? কে বলে মিথ্যা-বাণী?
ওর চেয়ে হায়! শুচি পাবনা'ক তাহা আমি বেশ জানি!"

প্রত্যেক কবিতার ছন্দ পৃথক। শব্দ-সৌন্দর্য্যের একটু উদাহরণ দিই:—

"বেতসী লতার ছায়ায় ছায়ায় নাগ কেশরের মূলে,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজে জলতরঙ্গ ভেঙ্গে-পড়া-কূলে-কূলে,
তোমারি বিরহে ছল-ছল-আঁখি গুঞ্জামালাটি পরি',
আনমনা কোন্ সাঁওতালবালা চেয়ে থাকে কাজ ভুলে।"

কবি যাহাদের ব্যথার সংবাদ দিয়াছেন তাহাদের অনেকের নামই জানি না, অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। যথা:—মুক্তাবর্ষী, কর্ণিকার, বান্ধুলী, সন্ধ্যামণি, নাগকেশর। কবির ভূয়োদর্শনের পরিচয় ইহার মধ্যে মিলে।

অনেক কবিতা হইতে লাইন উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু তাহার স্থানাভাব। 'ব্যথার পরাগের' কবি প্রধানতঃ ব্যথার কবি—ব্যথার আবেগে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে এবং পাঠককে তিনি তাহারই অংশ দিয়াছেন। তাঁহার শেষ কবিতার অনুরণন "শেষঝরা কুসুমের মিনতি নিও, শুধু মনে রাখিও!" পাঠকের মনে শেষ হইয়াও শেষ হইতে চায় না। কিন্তু তবু আশা হয় জীবনের যে একটা আনন্দের দিক আছে তাহাও কবির চোখে ধরা পড়িয়াছে। তাহার পরিচয় কবি তাঁহার পাঠকবর্গকে কোনদিন দিবেন না কি?

শ্রীঅবনীনাথ রায়

কোজাগরী:—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

অধ্যাপক প্যারিমোহন সেনগুপ্তের ইহা দ্বিতীয় কবিতা-গ্রন্থ. প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অরুণিমা' নয় বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অধ্যাপক মহাশয় "মেঘদূতে"র তর্জ্জমাও করিয়াছেন। অধিকন্তু শিশু-সাহিত্যে তাঁহার 'হালুম বুড়ো' 'বাঘসিংহের মুখে' প্রভৃতি বই সকলের পরিচিত। অতএব গ্রন্থকারের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যকতা নাই।

বক্ষ্যমান গ্রন্থখানিতে ৫২টী কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার সবগুলিই 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে ছাপা হইয়াছিল। 'কর্ণ' কবিতাটি আমার ভাল লাগিয়াছে। এই পুস্তকে প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি জাতীয় গাথা আছে—যথা চীনের জাতীয় গাথা, ইতালীর জাতীয় গাথা, রাশিয়ার জাতীয় গাথা এবং সার্ব্বিয়ার দেশপ্রেম-গাথা। 'সপ্তর্ষি' বলিয়া একটি কবিতা আছে—তাহাতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জগদীশচন্দ্র বসুকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। এই সপ্তঋষির মধ্যে মাত্র দুইজন জীবিত আছেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকে কবি কেন বাদ দিয়াছেন তাহা বোঝা শক্ত, সম্ভবত তিনি বাংলা দেশের লোক নহেন বলিয়া।

প্রচ্ছদপট চিত্রশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক পরিকল্পিত। বাঁধাই ভাল।

শ্রীঅবনীনাথ রায়

মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সুন্দরকাণ্ড রামায়ণ—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্-এ, বি-এল্, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কোচবিহার সাহিত্য সভা হইতে খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহম্মদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের রাজসিংহাসন অলংকৃত করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল লোকরঞ্জক ও ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি ছিলেন তাহা নহে; পরন্তু তিনি বিদ্যোৎসাহী ও নিজে সুকবি ছিলেন। বর্ত্তমান সম্পাদক কর্ত্তৃক সম্পাদিত তাঁহার রচিত "ক্রিয়াযোগ সার" ও "উপকথা" প্রভৃতি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণের অনুবাদ। মূল পুঁথিখানির শেষাংশ পাওয়া না যাওয়ায় এই গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। সেকালে সাধারণতঃ পুঁথির শেষে পুস্তক রচনার তারিখ প্রদত্ত হইত। এক্ষেত্রে পুঁথিখানি খণ্ডিত হওয়ায় তাহা

জানিবার সুযোগ নাই। অধুনাপ্রচলিত সংস্কৃত-রামায়ণের পাঠ অনুযায়ী ধরিতে গেলে সুন্দরকাণ্ডের একচত্বারিংশ সর্গ হইতে লঙ্কাকাণ্ডের দ্বাবিংশ সর্গের অনুবাদ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ইহার সবটাই সুন্দর-কাণ্ড বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি কোন মূলগ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছেন অথবা তখনকার পাঠ অন্যপ্রকার ছিল কিনা তাহা এখন নির্ণয় করিবার উপায় নাই; মহারাজা নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ কাণ্ডবিভাগ করিয়াছিলেন কিনা তাহাও জানা যায় না। মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্বত্র মূল অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিলেও অনেকস্থলে প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় অনুবাদ অন্যপ্রকার হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও স্থলে তিনি মূলাতিরিক্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন আবার কোথাও বা কৃত্তিবাসবর্ণিত উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজ কবিত্বমণ্ডিত করিয়া অন্যপ্রকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি অন্যান্য সমসাময়িক কবিগণ অপেক্ষা তাঁহার সংযম ও বর্ণনাশক্তি প্রসংশনীয়।

সম্পাদকমহাশয় এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি বেশ কৃতিত্ব সহকারে সম্পাদিত করিয়াছেন। তাঁহার মুখবন্ধ এবং পাদটিকাগুলি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ এবং বেশ প্রাঞ্জল। গ্রন্থমধ্যে প্রাচীন বানান রক্ষিত হইয়াছে, এবং অনভিজ্ঞ পাঠকসাধারণের সুবিধার জন্য পাদটীকায় শব্দার্থ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সংস্করণখানি সম্পাদকমহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য, বিস্তর গবেষণা ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফল বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য্য

হালুম বুড়ো—শ্রীক্ষীতিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এম্-এস্-সি প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রামধনু কার্য্যালয় হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্নগুলিকে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করে যত বই এই কয়েক বছরে লেখা হয়েছে এই বইখানা তাদের অন্যতম। বিশেষ করে বই খানার ভাষা শুধুই যে সহজ সরল ও ছোটদের বোধগম্য তা নয়, লিখবার ধরণটাও ছোটদের মনে বেশ কৌতূহল জাগানোর উপযোগী। ছেলেমেয়েরা বই খানাকে গল্প হিসাবে আনন্দের সহিতই পড়বে। এমন বই আমাদের দেশে শুধু যে ছেলে-মেয়েদের জন্য দরকার তা নয়, অল্পশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এমন কি পূর্ণশিক্ষিত বলতে যাঁদের বোঝায় সেই সব বাপ মায়েরও এই বই বেশ কাজে লাগ্‌বে। এই প্রগতির যুগে ছোট ছেলেমেয়েদের আর শুধু সোণার কাঠি রূপোর কাঠির গল্প বা অলৌকিক ব্যাপারের গল্প শুনিয়েই সন্তুষ্ট রাখা চলবে না। তারা এমন সব প্রশ্ন করে যার উত্তর অধিকাংশ সময়ই মা-বাবা, সন্তানের কৌতূহল চরিতার্থ করবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও, দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। এম্‌নি ধরণের বই-এর বহুল প্রচার হলে তাঁদেরকে আর সেই বিপদে পড়তে হবে না। কাজেই প্রত্যেক মা বাবার বা অভি-ভাবকদের শুধু ছেলেমেয়ের জন্য নয় নিজেদের জন্যও এই ধরণের বই পড়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র

গুন গুনায়া—রায় বাহাদুর অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ৫৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বইখানা অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য লিখিত। দুইটি বড় ভৌতিক গল্প আছে। ছোট ছেলেরা পড়ে আনন্দ পাবে সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় শিশু-সাহিত্যের অভাব অল্প কয়েক বছরে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,—সেটা সুখের বিষয়। ছোটদের উপযুক্ত ছোটগল্প লিখবার সময় শিশুদের আনন্দ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোবৃত্তির কোন না কোনদিকে উৎকর্ষ সাধন হয় এমন উদ্দেশ্য নিয়ে বই লেখা খুবই আনন্দের বিষয় এবং সেটা বেশ বাঞ্ছনীয়ও বটে।

আলোচ্য বইখানার মুখবন্ধে লেখক বলেছেন তিনি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানা রচনা করেছেন 'প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের আনন্দ দান করা, গৌণ উদ্দেশ্য আত্মনির্ভরতা, সৎসাহস ও উদ্যমের ভাবগুলিকে মনোহর ও লোভনীয় আকারে তাদের চক্ষে প্রতিভাত করা।' লেখকের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে—কেন না যে-কোন মজার গল্প পড়েই শিশুমন আনন্দ পায়—

গল্পটি যে কৌতুহলোদ্দীপক নয় তা বলা যায় না। কাজেই আমরা আশা করতে পারি শিশু-মন আনন্দ পাবে। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে বলা শক্ত। কিন্তু একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলাম না —ভৌতিক ও অলৌকিক ঘটনা বা অবস্থার সমাবেশ,— যা বাস্তব হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন,—তা' যতই বিপদ সঙ্কুল হো'ক না কেন বা তাতে যত সৎ (?) সাহসের বা আত্ম-নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যাক না কেন শিশুমনে তা' সাহসের কোনই ছাপ ফেলে না বরং উল্টো ফলই দিয়ে থাকে। নিজের অজ্ঞাতেও ভৌতিক ব্যাপার ছোটদের মনে সাহস-সঞ্চার করা দূরে থাকুক অনেক প্রাপ্ত বয়স্কদের মনেও অজানিত আতঙ্কেরই সৃষ্টি করে। এ-যুগে শিশুমনের জ্ঞানপিপাসা ভৌতিক ঘটনায় মেটে না, তাদেরকে সৎসাহস আত্মনির্ভরতা ও উদ্যমের আদর্শ দেখাতে হলে, ঘটনা ও চরিত্রের যোগ রাখতে হবে, সামঞ্জস্য রাখতে হবে বাস্তবের সঙ্গে। জন্মাবধি কাল্পনিক ভূতের ভয়ে আমরা ভীরু হতেই শুধু শিখেছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে ভূতের কবল থেকে অব্যাহতি পায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও বাঞ্ছনীয়।

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র

বিষের নেশা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র শীল। মূল্য এক টাকা। প্রকাশক:—ডাক্তার কে, শীল। ১৬, রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা।

বইখানা ছোট উপন্যাস হিসাবে লিখবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু উদ্দেশ্য উপন্যাস তাই বোধ হয় লেখক একাধিক প্রেমে পড়ার বা ভালবাসাবাসির ঘটনার সৃষ্টি করেছেন যদিও কোন চরিত্রের বা কোন ঘটনারই জীবনীশক্তি নেই। তাঁর পুস্তকের কোন্ চরিত্রকে যে তিনি ফুটাবার চেষ্টা করেছেন তা বোঝা শক্ত। তিনি বোধ হয় নরনারীর প্রেমকেই বিষ আখ্যা দেবার ইচ্ছায় বইখানার নামকরণ করেছেন। বস্তুতঃ নরনারীর প্রেম 'বিষ' নয়। কিন্তু লেখকের প্রকাশভঙ্গী ঘটনার সমাবেশ ও প্রেমসঞ্চারের অস্বাভাবিকতায় কোন ক্ষেত্রেই তাঁর বর্ণিত প্রেমকে ঠিক প্রেম আখ্যা দেওয়া যায় না। লেখক ভালবাসার রূপ দিতে গিয়ে সেটাকে অত্যন্ত খেলো এবং বিকৃতই করে ফেলেছেন। লেখকের কল্পনা-শক্তির অভাব বোধ হয় নেই, স্থানকাল-পাত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে ভাষার প্রয়োগ করলে তাঁর লেখার আদর হবে সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী স্নিগ্ধপ্রভা মিত্র



ব্যর্থ-আশা

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম্-এ

ফুলের পাপড়ি মরমে মরিয়া ঝরিয়া পড়ে ;
তাই দেখে ফুল ভাবিয়া আকুল, কাঁদিয়া মরে।
নাহি অযতন তবু একে একে পাপড়ি গুলি
সঙ্কোচ ভরে ঝরিয়া পড়িছে বাঁধন খুলি।

রূপরস তার সৌরভ আর কিছুনা ছোটে,
ফুল হয়ে তবু ফুল হয়ে শেষে নাহিক ফোটে।
মৌমাছি এসে যায় হেসে হেসে দুলিয়ে পাখা ;
এই কি জীবন ! কিবা প্রয়োজন এমনে থাকা ?

হৃদয়ে তাহার যত সাধ ছিল গেল না পাওয়া,
মুঠির মধ্যে পেয়ে বুঝি আজ হারিয়ে যাওয়া !
ফুটিয়া উঠিব এই সাধ ছিল—পাপড়ি নাহি,
আঁখি ছলছল রহিল কেবল নীরবে চাহি।

নানা কথা

রোরিক শান্তি-পতাকা

বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য যত প্রচেষ্টা ও যত রকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তন্মধ্যে বিশ্ব-বিশ্রুত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নিকোলাস্ রোরিকের প্রয়াস সর্ব্বসাধারণের প্রণিধানযোগ্য। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রোরিক গভীর এবং ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছেন। তাঁর কর্ম্ম-সাধনার লক্ষ্য মানব-সভ্যতার ইমারতের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে মেরামত করা। তাঁর মতে মানব-সভ্যতার অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা হ'চ্চে মানুষের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির আকাঙ্খা; অতএব অন্যান্য যে সমস্ত প্রয়োজন মানুষকে কর্ম্মে প্ররোচিত করে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে মানুষের এই সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার বৃত্তিটি যাতে দুর্ব্বল হ'য়ে না পড়ে এমন কিছু ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে করা প্রয়োজন। মানব-সভ্যতার সমস্যাগুলিকে রোরিক উপর থেকে ভাসা ভাসা ভাবে দেখেন নি, ভিতর থেকে বড়ো করে দেখে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ১৯০৪ সালেই তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের বড়ো বড়ো কীর্ত্তিগুলোকে সংরক্ষণের কিছু ব্যবস্থা করার জন্য তখনকার রুষগভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি এই প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৯২৯ সালে জগতের বিভিন্ন জাতির নিকট এই উদ্দেশ্যে একটা চুক্তিপত্র পেশ করেন। ১৯৩০ সালে আন্তর্জাতিক সংঘ কর্ত্তৃক এই চুক্তিপত্র অনুমোদিত হয় এবং ঐ বৎসরেই প্যারীতে ও নিউ-ইয়র্কে রোরিক-শান্তি-পতাকা সমিতি সংগঠিত হয়। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে ব্রুজেস্ নগরে রোরিক যুক্তিপত্রের প্রচারের জন্য দুটি আন্তর্জাতিক সভা আহূত হয়েছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন হ'বে আগামী ১৭ই নভেম্বর নিউইয়র্ক সহরে। আমরা এই সভার সর্ব্ববিষয়ে সাফল্য কামনা করি। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা রোরিক সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করব। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে বিগত শ্রাবণ সংখ্যায় রোরিকের চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছিল।



শ্রীমান্ চিন্তামণি কর

তরুণ শিল্পী চিন্তামণি কর

এই সংখ্যায় আমরা শ্রীমান্ চিন্তামণি করের একখানি ত্রিবর্ণ ছবি প্রকাশিত করলাম। শ্রীমান্ চিন্তামণির বয়স

মাত্র আঠারো বৎসর ; রিপণ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। এই বয়সেই তাঁর শিল্প-প্রতিভার এমন বিকাশ ও পরিণতি সত্যই বিস্ময়কর। কোনো দিন তাঁকে এর জন্য আয়াস স্বীকার করতে হয়নি,—তাঁর শিল্প-প্রতিভার বিকাশ পুরোপুরি স্বাভাবিক। চিন্তামণি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের শিষ্য। গত ১৯৩০ সালের আগষ্টমাস থেকে ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত, মাত্র আটমাস কাল Indian Society of Oriental Arts-এ ভাস্কর্য্য ও চিত্র-শিল্প শিক্ষা করে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবার মাত্র তিনমাস পরেই ইহার বাৎসরিক প্রদর্শনীতে চিন্তামণির "ধ্যানী বুদ্ধ" নামক প্রথম মৌলিক চিত্রখানি নির্ব্বাচিত ও বিক্রীত হ'য়েছিল। ১৯৩১ সালের মে মাসে বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নির্দ্দেশ



মা কালী
শ্রীচিন্তামণি কর



শ্রীযুক্ত রোমাঁ রোলাঁ

অনুযায়ী বীরভূম জেলার কতকগুলি গ্রামে প্রাচীরচিত্র ও আল্‌পনার অনুলিপি গ্রহণ করবার জন্য চিন্তামণি নিযুক্ত হ'য়েছিলেন, এবং বলা বাহুল্য বিশেষ দক্ষতার সহিতই ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন।

সম্প্রতি চিন্তামণি তাঁর "মা কালী" শীর্ষক একখানি ছবি মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন।

ছবিখানি পেয়ে রোমাঁ রোলাঁ খুসী হ'য়ে চিন্তামণিকে যে চিঠি লিখেছেন,—তার প্রতিলিপি এইখানে প্রকাশ করা গেল। ফরাসী-অভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকারা চিঠিখানির মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রে আনন্দিত হবেন। তরুণ শিল্পী চিন্তামণির শিল্প প্রতিভা বিশেষ সমাদরের যোগ্য বলে আমরা মনে করি। আমরা তাঁর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

Villeneuve (Vaud) Villa Olga
27 avril 1933

Cher Monsieur Chintamani Kar

Je vous remercie cordialement pour l'envoi de votre belle composition: Kali the Mother. Elle exprime bien l'harmonie dans le terrible, qui est l'essence du vivant symbole. Kali la Mère règne aujourd'hui sur l'univers.

Je vous adresse une de mes dernières photographies, et je vous prie de me croire votre dévoué

Romain Rolland

প্রতিবাদ

নিউ দিল্লী থেকে শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন মহাশয় আমাদের জানিয়েছেন ঃ— ভাদ্র মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীগদাধর সিংহরায় "হরিদ্বার ঋষিকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যাপীঠ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র'। এ সংবাদ ঠিক নয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড় নামক গ্রামে। তিনি স্বনামধন্য কবিরাজ স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর কোনোই সম্পর্ক নেই।

মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা

বিপ্লব-পন্থীদের দুষ্কর্ম্মে ভারতবর্ষ যে কলঙ্ক অর্জ্জন করছে, তা' দুরপনেয়। তাদের আচরণের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত প্রবল জনমত গঠনের প্রয়োজন হ'য়েছে। এমন কাপুরুষোচিত ঘৃণিত কর্ম্মের দ্বারা কোনো প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব বলে আমরা মনে করি না; সম্ভব হোলেও আচরিত উপায়ের কলঙ্কে উদ্দেশ্যের মহত্বও হীন হ'য়ে যায়। বিপ্লব-পন্থীদের কর্ম্মের পিছনে স্বার্থসিদ্ধির কোনো প্ররোচনা নেই, এবং সেই জন্য তাদের চরিত্রবল প্রশংসনীয়,— এমন ধারণা পোষণ করার মত ভ্রান্ত যুক্তি আর নেই। মানুষের চরিত্রেরই বাইরের প্রকাশ হ'চ্চে মানুষের কর্ম্ম,—কর্ম্ম ও চরিত্রের মধ্যে কোন রকম অসামঞ্জস্য কল্পনা করায় সত্যের অপলাপ ঘটে। যে-চরিত্রের মধ্যে এমন বৃত্তি প্রবল যা' তাকে নৃশংস কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডে প্ররোচিত করে,—সে-চরিত্র আমূল দুর্ব্বল, ঘৃণার্হ, সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

শ্রীযুক্ত বার্জের মত জনপ্রিয় ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অতি বিরল। অসতর্ক অবস্থায় আততায়ীর হস্তে তাঁর মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হ'য়েছি। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা নিবেদন করি।

শিল্পী শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

সুধীররঞ্জন খাস্তগির নৈনিতাল থেকে ফির্‌বার পথে লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী হয়ে কলকাতা ফেরেন। Munich এর Dentsche Akadamy থেকে তাঁকে Tuition—এবং lodging এর Scholarship প্রদান করে। কিন্তু তাঁর এ বৎসর জার্ম্মাণী যাত্রা করার সুবিধে না হওয়াতে তিনি পুণা হয়ে বম্বে যান—সেখানে মূর্ত্তির এবং ছবির কাজে কয়েক মাস ব্যস্ত থাকেন। পরে অজন্তা, নাসিক, ইলোরা হ'য়ে—আবার কলকাতা ফিরে আসেন। সম্প্রতি গোয়ালিয়রে—Scindia School এ Art Department-এর প্রধান অধ্যক্ষ হ'য়ে তিনি গোয়ালিয়রে গেছেন।

নিখিল-ভারত লাইব্রেরী সম্মেলন

গত ১২ই, ১৩ই এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় All India Library Conference-এর অধিবেশন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ থেকে এবং সিংহল থেকে নির্ব্বাচিত সদস্যবর্গ এই সম্মেলনের পর্য্যালোচনায় যোগদান করেছিলেন, সুতরাং সম্মেলনটির আন্তর্জাতিকতার অভাব হয় নি একথা নিশ্চয়ই বলা চলে। ভারতবর্ষে এ ধরণের সম্মেলনের এই সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন।

সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতি (All India Library Association) গঠিত এবং স্থাপিত করা। গ্রন্থাগারের সংখ্যা এবং অবস্থা যে কোনো জাতির আভ্যন্তরীণ পরিকর্ষের (culture) পরিচয়। একটি সুনিয়ন্ত্রিত সম্পন্ন গ্রন্থাগার কেবলমাত্র জনসাধারণের শিক্ষা এবং পরিকর্ষের উন্নতিবিধানই করে না, পরন্তু সেই দেশের মনীষিবৃন্দকে তাঁদের বিদ্যালোচনা এবং গবেষণাদি ব্যাপারে একান্তভাবে সহায়তা করে। কিন্তু কেবলমাত্র রাশীকৃত পুস্তকের স্তূপকেই গ্রন্থাগার বলা চলে না, পুস্তকগুলি সুনির্ব্বাচিত, শ্রেণীবিভক্ত এবং তালিকাবদ্ধ

হ'লে তবে তাকে বলে গ্রন্থাগার। ঠিক সেইরূপে সকাল-সন্ধ্যা গ্রন্থাগারে ব'সে গ্রন্থাগারের সভ্যগণের সহিত পুস্তক আদান-প্রদানের কাজ করলেই গ্রন্থাগারিক হয় না, গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য তাঁর 'গ্রন্থাগারের সঠিক অবস্থার সহিত সম্পূর্ণভাবে পরিচিত থাকা,—কোনো শিক্ষার্থী কোনো তথ্যের সন্ধানে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মচারী এম্-এ, এম্-ডি, পি-এইচ্-ডি, এফ্-এ, এস্-বি, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং ডাঃ এম্ ও টমাস্ এম্-এ, বি-ডি, টি-ডি, ডিপ্-এল্-এস্ (লণ্ডন), এফ্-এল্-এ (Chief Librarian, Annamalai University). বর্ত্তমান সম্মেলনের সভাপতি, তিনজনেই তিনটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এঁদের অভিভাষণে যে-সকল প্রয়োজনীয় এবং



শিশু গ্রন্থাগার—বড়োদা

তাঁর কাছে সেই পুস্তকের সেই পৃষ্ঠাটি উন্মোচিত করে ধরা যে-পৃষ্ঠায় সেই তথ্যটি পাওয়া যেতে পারে। তা যদি না পারেন তা'হলে তিনি গ্রন্থাগারিকের পদের অযোগ্য। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের দিনে মিঃ জে, লিচ্ উইল্সন্ এম্-এ, আই-ই-এস্ (Educational Commissioner with the Government of India), ডাঃ ইউ, এন্ মূল্যবান্ মন্তব্য আছে তদনুযায়ী একটি নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হলে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের উন্নতি বিধানের দ্বারা দেশের মঙ্গল হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সদ্য প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার-সমিতির মঙ্গল কামনা করি।

বাঙলা দেশে একটি নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতি

আছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত ঐ সমিতির প্রধানকর্ম্মী। সমিতির উন্নতি-বিধান সম্বন্ধে তাঁদের উদ্যম এবং পরিশ্রমের বিষয়ে প্রশংসার অত্যুক্তি করা অসম্ভব। আমরা আশা করি বাঙলা দেশের আরও অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁদের সহিত যোগদান ক'রে নিখিল-বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতিকে নিখিল-ভারত গ্রন্থাগারে সমিতির শীর্ষস্থানীয় ক'রে তুলবেন।

আমাদের পূজার ছুটী

শারদীয়া পূজা উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় ৯ই আশ্বিন হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। আমরা অন্য বারের চেয়ে একটু দীর্ঘকালের জন্য অবকাশ গ্রহণ করলাম, —সেজন্য ইতিমধ্যে যে-সকল চিঠিপত্র আসবে তার ব্যবস্থা ৬ই কার্ত্তিকের পর করা হ'বে। আশা করি আমাদের সারা বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে জনসাধারণ আমাদের এই কয়েকদিন বেশি অবকাশ নেওয়ার জন্য ত্রুটী গ্রহণ করবেন না। তবে ছুটির মধ্যেও নগদ বিক্রয় এবং নূতন গ্রাহকদের আদেশপত্র অনুযায়ী সামান্য কাজ করার ব্যবস্থা থাকবে।



Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road, and published by the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



শকুন্তলা

বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীচিন্তামণি কর

বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ১ম খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৪০	৫ম সংখ্যা

মালঞ্চ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

দীঘির ওপারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠচে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরণ ফুল, ঘন গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকীর দল ঝলমল করচে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদীর উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে—সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ করা রূপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এলো "আসতে পারি কি ?"

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, "এসো।" রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে "কোথায় বস্‌লে রমেন দাদা, উপরে এসো।"

রমেন বললে "জানো দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে। পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা সুরু করি বিলিতি মতে।"

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বল্‌লে "সাম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।"

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

"এ আবার কী ?"

"জানো না আজ দোলপূর্ণিমা। তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রংটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোক-বনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।"

"তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।"

"কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখীই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখী চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হোলো। এইবার বসতে দাও পাশে।"

পাশে এসে বসলো। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো তুইজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে "রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।"

"জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টি'কতে দিলো না।"

"না আমি ঠাট্টা করচিনে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।"

"ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।"

"বলচি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিৎদার মুখখানা দেখতে পেতে।"

"আভাসে কিছু দেখেচি।"

"আজ বিকেল বেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে; দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে, রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিৎদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্চেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্চে তাকিয়েও দেখচেন না। মনে হলো আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে অন্যদিন হলে তখনি হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বল্‌তেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বল্‌লেন ক্যাটালগ দেখচ বুঝি। আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হোলো না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরী না করে এখনি কী একটা বলাই চাই। আবার তখনি পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, "দেখেচ সরি, কত বড়ো ন্যাস্‌টার্শিয়াম। কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তারপর অনেকক্ষণ কথা নেই, চললো পাতা ওলটানো। আর একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, যাবে না বাগানে? আদিৎদা বললেন, "না ভাই বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে" বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।"

"আদিৎদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন; কী আন্দাজ করো তুমি।"

"বলতে এসেছিলেন আগেই ভেঙেচে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এলো, তোমার কপালে আর এক বাগান ভাঙবে।"

"তাই যদি ঘটে, সরি, তাহলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।"

সরলা ম্লান হেসে বললে "তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি? সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলাসা রাখবেন।"

"তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে ? এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালো মানুষ হতে শিখতে হবে।"

"কী করবে তুমি ?"

"তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্ঠি থেকে তাকে তাড়াব। তারপরে কাজে ছুটি পাব, এমন কি কালাপানির পার পর্য্যন্ত।"

"তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারিনে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠচে কিছু দিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।"

"না বল্লে মনে করব।"

"ছেলেবেলা থেকে আদিৎদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েচি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাইএর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েচি, গাছ কেটেচি। জেঠাইমা আর মা দু তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে, জেঠামশাইএর মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তাঁরা শোধ করে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিৎদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়ত তুমি কিছু কিছু জানো কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করচে।"

"সমস্ত আবার নূতন লাগচে আমার।"

"তারপরে জানো হঠাৎ সবই ডুবলো। যখন ডাঙার টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর একবার আদিৎদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই,—আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তারপর থেকে আদিৎদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সঙ্কোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।"

"কথাটা শেষ করে ফেলো।"

"হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েচে! যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক মুহূর্ত্তে। তুমি নিশ্চয় সব জানো রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বৌদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারিনি। এতদিন দৃষ্টি পড়েনি নিজের উপর, বৌদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারচ কি ?"

"তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠচে উপরের তলায়।"

"আমি কী করব বলো ? নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।" বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বল্‌লে "যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।"

"অন্যায় কার উপরে ?"

"বৌদির উপরে।"

"দেখো সরলা, আমি মানিনে ওসব পুঁথির কথা। দাবীর হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে ? তোমাদের মিলন কত কালের ; তখন কোথায় ছিল বৌদি ?"

"কী বলচ রমেনদা ! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা ? আদিৎদার কথাও তো ভাবতে হবে।"

"হবে বইকি। তুমি কি ভাবচ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগেনি।"

"রমেন নাকি ?" পিছন থেকে শোনা গেল।

"হাঁ দাদা।" রমেন উঠে পড়ল।

"তোমার বৌদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।"

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনি উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে "যেয়ো না সরি, একটু বোসো।" আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্ম্মরত আপনাভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবলি পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বললে, "আমরা দুজনে এসংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনও ভেদ কোনও কারণে ঘটতে পারে সেকথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি ?"

"অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় একথা না মেনে তো থাক্‌বার জো নেই আদিৎদা।"

"সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি তুমি কি জানো কী ধাক্কাটা এলো হঠাৎ আমাদের পরে ?"

"জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।"

"সইতে পারবে সরি ?"

"সইতেই হবে।"

"মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি তাই ভাবি।"

"তোমরা পুরুষ মানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য্য, এছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই তাদের।"

"তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেবনা,—দেবনা। এ অন্যায় এ নিষ্ঠুর অন্যায়।"—বলে মুঠো শক্ত করে আকাশে কোন্ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হোলো।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে,—"ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানাদিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব?"

"তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়চে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সেই চুলের গর্ব্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্ব্বে প্রশ্রয় দিতো। একদিন ঝগড়া হোলো তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনি জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে—মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে? বলে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্য্যন্ত চুল কেটে ফেল্‌লে কচ্‌কচ্‌ করে। মেসো মশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য্য। বললেন "একী কাণ্ড।" তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে "বড়ো গরম লাগে।" তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জ্যাঠা মশায়।"

সরলা হেসে বললে "তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাবচ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কিনা বলো।"

"খুব ঠিক্। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারিনি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধরে আমাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয়নি। আরএকদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে"—

"থাক আর বলতে হবে না আদিৎদা" বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে,—"সে সব দিন আর আসবে না"—বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে "না যেয়োনা, এখনি যেয়োনা, কখন এক সময়ে যাবার দিন আসবে তখন,"—

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠ্‌ল "কোনোদিন কেন যেতে হবে! কী অপরাধ ঘটেচে!

ঈর্ষ্যা! আজ দশবৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হোলো তারি এই পরিণাম। কী নিয়ে ঈর্ষ্যা? তাহলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।"

"তেইশ বছরের কথা বলতে পারিনে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষ্যায় কি কোনও কারণই ঘটেনি? সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী? তোমার আমার মধ্যে কোনও কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠ্‌ল "অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

"কথা বোলো না আদিৎদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।"

"ভাবনা নিয়ে ত পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসো-মশাইএর কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনও রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে? তোমার কথা বলতে পারি নে, সরি, আমার ত সাধ্য নেই।"

"পায়ে পড়ি দুর্ব্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।"

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বল্‌লে—"উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না, ভালোবাসি তোমাকে। একথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারচি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলচি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম্ম।"

"চুপ চুপ, আর বোলোনা। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।"

"সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ? কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে'? তুমি তো করো নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে' সে তো আমি জানি।"

"জ্যাঠা মশায় যে আমাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয় তো—"

"না না—তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাওনি? আমাদের পথ কেন হোলো আলাদা।"

"থাক্, থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করচ কার সঙ্গে? কী হবে মিথ্যে ছটফট করে? কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্না রাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।"

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু না কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোট তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, "আমি

জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাসো। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটিপিন্।"

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বল্‌লে, "কী আশ্চর্য্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য্য!"

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তারপরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদীর পরে। চাকর এসে খবর দিল "খাবার এসেচে"। আদিত্য বলল "আজ আমি খাব না।"

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে "বৌদি ডেকেছ কি?" নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে "এসো"।

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর। বাকী সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্দ্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জালনার বাইরে। সে দিকে অর্কিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসচে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে মালাই বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার। রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ী আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখীর চলছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মান্‌তে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল, বিছানার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনও কথা বল্‌লে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক্ খেয়ে উঠচে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে পড়া ফুল দলিত হ'য়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেলো আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হোলো তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্ব্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতি মুহূর্ত্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো যে পর্য্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া আর অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি

আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জ্যাঠামশায়ের প্রসাদে ; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্ব্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফল সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মাণিকতলায় বাড়ীসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেবো কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ী বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরোনা এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জ্যাঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ সুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অর্কিড্, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেচেন বিনামূল্যে। এত বড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরাণীগিরি করতে হোত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেচে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েচি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েচে সরলা। এই সহজ কথাটাই ভুলেছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবোনা সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারবনা কোনোদিন, ওর দাবীরও অন্ত থাকবে না আমার পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইলো মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সেকথা আজ যেমন বুঝেচি এমন এর আগে কখনো বুঝিনি। সবকথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পারো তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।”—

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরদা ব্যাকুলস্বরে বল্লে “কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।”

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, “অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পারোনা কিসে আমার মাথা দিলো খারাপ করে ?”

“কী করচ বৌদি ? শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।”

“এই ভাঙা শরীরই ত আমার কপাল ভেঙেচে, ওর জন্য মমতা কিসের ? তাঁর পরে আমার অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে ? এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন ‘মালিনী’, কখনো বলতেন ‘বনলক্ষ্মী’! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন ? আমার কি একটাই নাম ছিল ? কত নাম আসতে যেদিন তাঁর

দেরী হোত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দীঘির ঘাটে, ছোট রূপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।"

"বৌদি আবার তুমি সেরে উঠবে—তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।"

"মিছে আশা দিয়োনা ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই কাঙাল নৈরাশ্য।"

"দরকার কী বৌদি? আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি। যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন মেয়ে পায়? যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তাহলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন? এ বাড়ীতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।"

"বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে পিছনে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনওখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিম্‌টিম্ করেও জ্বলবে? একথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ [illegible] সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার!"

"সত্যি কথা বলব বৌদি রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারিনে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পারো না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলচি তোমার সারা জীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্ত্তে কৃপণ করে যেয়ো না।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা মাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বল্‌লে "আমার একটী ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।"

"হুকুম করো বৌদি।"

"বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পারো আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।"

"তুমি তো জানো বৌদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড আমি তাই। কিছু মানিনে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে এ বাঁধন বেমেয়াদি।"

"ঠাকুরপো তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করচি ততই ডুবচি অগাধ জলে, সামলাতে পারচিনে।"

"বৌদ্‌দি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বল দেখি একবার,—'দিলেম আমি'। সকলের চেয়ে যা দুর্ম্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি, তাহলে সব ভার যাবে এক মুহূর্ত্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনি বলো,—দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব কিছু দিলেম, নির্ম্মুক্ত হয়ে নির্ম্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে।"

"আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বারবার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্য্যন্ত যা কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারচিনে, তাতেই এত করে মারচে। দেবো, দেবো, দেবো সব দেবো আমার,—আর দেরি নয়, এখনি। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।"

"আজ নয় বৌদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক্ তোমার সঙ্কল্প।"

"না, না, আর সইতে পারচিনে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ী ছেড়ে জাপানী ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাবনা, এই তোমাকে বলচি নিশ্চয় করে।"

"সময় হয়নি বৌদি; আজ থাক্।"

"সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষণি ডেকে আনো।" পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দুহাত জোড় করে বল্‌লে, "বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেচে, পূজা অর্চ্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না।"

"কী বলো।"

"একবার আমাকে ঠাকুর ঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তাহলে আমি বল পাব কোনও ভয় থাকবে না।"

"আচ্ছা, যাও, আপত্তি করব না।"

"আয়া।"

"কী খোঁখি।"

"ঠাকুর ঘরে নিয়ে চল আমাকে।"

"সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—"

"ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে ?"

"আয়া তুমি ওঁকে নিয়ে যাও ভয় নেই, ভালোই হবে।"

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময় আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে "এ কি, নীরু ঘরে নেই কেন ?"

"এখনি আসবেন, তিনি ঠাকুর ঘরে গেছেন।"

"ঠাকুর ঘরে ? ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।"

"শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।"

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জান্‌ত না যে অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেচে বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথমে ও সরলাকে বলতে এসেছিল আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরোলো উল্টো কথা। তারপরে জ্যোৎস্না রাত্রে ঘাটে বসে বসে, বারবার করে বলেচে, জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেচে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির ; ফলাফল যা হয় তা হোক্। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে, যে যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্ম্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিকতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওর কাজ পর্য্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

"রমেন তুমি আমাদের সব কথা জানো আমি জানি।"

"হাঁ জানি।"

"আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পরদা ফেলব উঠিয়ে।"

"তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হোল না। বৌদি রয়েচেন ওদিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।"

"তোমার বৌদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মানো তো ?"

"মানি বই কি।"

"সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জান্‌তে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ ?"

"কে বলে দোষ ?"

"আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তাহলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।"

"গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন? বৌদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর কটা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বৌদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারো যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।"

নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেণ বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বল্‌লে "মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এত দিন পরে ত্যাগ করো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।" আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে "নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝিনে।" নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "সত্যি বল আমাকে মাপ করেচ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।"

"তুমি তো জানো নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে?

"এর আগে তো কোনো দিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাওনি তুমি। এবারে গেলে কেন? এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেচে কিসে?"

"অন্যায় করেছি নীরু মাপ করতে হবে।"

"কী বলো তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল।—ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন?"

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক্ করে ঘা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনো ক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বললে "রাত হয়েছে এখন থাক।" এমন সময় নীরজা বলে উঠল "ঐ শোনো আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো ঘরে এসো তোমরা।"

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে "এসো বোন আমার কাছে এসো।"

সরলার হাত ধরে বিছানায় বসালো। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমি গলায় পরে থাকো, শেষ দিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।"

"অযোগ্য, আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।"

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্ব্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা সে নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে "ঐ মালাটা আমাকে দাও না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।" নীরজা বললে "আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনো মতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, ঐ হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

"ভুল করচ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না ভালো হবে না তাতে।"

"সে কী কথা?"

"আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনে বলচি। ভাগ্য যার থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা করে সে আমি নেব না। এই রইল, তোমার পায়ে আমার প্রণাম। আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দুবেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হোলো।"

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারল না সেও গেল চলে।

"ঠাকুরপো, এ কী হোলো ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো একটা কথা কও।"

"এই জন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।"

"কেন মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না?"

"বুঝেছে বইকি। বুঝেছে যে মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।"

"কিছুতে বিশুদ্ধ হোলো না আমার মন। এত মার খেয়েও! কে বিশুদ্ধ করে দেবে? ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না, ঠাকুরপো, কে আমার আছে কার কাছে যাব আমি?"

"আমি আছি বৌদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।"

"ঘুমোব কেমন করে? এ বাড়ী থেকে আবার যদি উনি চলে যান তাহলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে-না।

"চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।"

"যাও ঠাকুরপো তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

৭

আদিত্য ওর সঙ্গে এলো দেখে সরলা বললে, "কেন এলে? ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন কোরে দেবো না জড়াতে।"

"তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভাল হোক্ বা মন্দ হোক্ তাতে আমাদের হাত নেই।"

"সে সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও রোগীকে শান্ত করো গে।"

"আমাদের এই বাগানের আর একটা শাখা বাড়বে সেই কথাটা—"

"আজ থাক। আমাকে দু চারদিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।"

রমেন এসে বললে, "যাও, দাদা, বৌদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।"

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বল্‌লে—"শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?"

"আছে।"

"তুমি যাবে না?"

"যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হোলো না।"

"কেন?"

"সে কথা তোমাকে বলে কী হবে।"

"তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।"

"যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বই কি।"

"তা হলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।"

"আর একটু স্পষ্ট করে বল।"

আমিও যাব, সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।"

"বুঝেছি।"

"পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।"

"আচ্ছা বাধা দেব না।"

"এই রইল কথা।"

"রইল।"

"আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।"

"হাঁ যাব, কিন্তু ঐ দুর্জ্জনরা তারপরে আমাদের আর এক সঙ্গে থাকৃতে দেবে না।"

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, "ওকি, এখনি এলে যে বড়ো?"

"দুই একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।"

রমেন বল্‌লে "আমার কাজ আছে চল্‌লুম।" সরলা হেসে বললে, "বাসা ঠিক করে রেখো ভুলো না।"

"কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।" এই বলে সে চলে গেল।

৮

সরলা বসেছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "যে সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।"

"কিছু বলব না ভয় নেই।"

"আচ্ছা তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই শোনো, বলো কথা রাখবে।"

"অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জানো।"

"বুঝতে বাকী নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুসি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইচ ডাক্তার বলেছেন বেশি দিন ওঁর সময় নেই। এই টুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।"

"আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।"

"না না নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালী ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার? কক্ষণো না, আমি তোমাকে জানি।"

আদিত্যের হাত ধরে বললে, "আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা দাও ভাই।"

"দেবো কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো, রাখবে।"

"তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।"

"না হবে না।"

"আচ্ছা বলো।"

"যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে?"

"জানিনে যে ভাই প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।"

"বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি? সেই কথাটা বলো আগে।"

""কেন আমাকে দুঃখ দাও? তুমি কি জানো না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।"

"আচ্ছা এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।"

"আর ফিরে তাকাবে না এখন?"

"না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার শিলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।"

"যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক এখন।"

"আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায়?"

"সে ভার নিয়েচেন রমেনদা।"

"রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে? সে লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি?"

"ভয় নেই তোমার, পাকা আশ্রয় নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।"

"আমি জানতে পারব তো?"

"নিশ্চয় জান্‌তে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।"

"তোমারো মন ব্যস্ত হবে না?"

"যদি হয় অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে?"

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল। সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

৯

"রোশ্‌নি"

"কী খোঁখি।"

"কাল থেকে সরলাকে দেখচিনে কেন?"

"সে কি কথা, জানো না সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েচে?"

"কেন কী করেছিল?"

"দরোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়ো লাটের মেম সাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।"

"কি করতে?"

"মহারাণীর শিলমোহর থাকে যে বাক্সোয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা।"

"লাভ কি?"

"ঐ শোনো, সেটা পেলেই তো সব হোলো। লাট সাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যি খানা চলচে।"

"আর ঠাকুরপো?"

"সিঁধ কাঠি বেরিয়েচে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিণবাড়ীতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁকি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলা দিদি তার জাফরাণি রঙের সাড়ীখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, 'তোমার ছেলের বৌকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই সাড়ীটা যদি রেখে দিই কোম্পানী বাহাদুর ধরবে না তো?"

"ভয় নেই তোর। কিন্তু শীগগির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে নিয়ে আয়।"

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য্য হলো, আদিত্য তাকে এত বড়ো খবরটাও দেয়নি। এ কি অশ্রদ্ধা করে? জেলে গিয়ে জিতল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসী যেতে পারতুম।

"রোশ্‌নি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে"—আয়া বললে "মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোর ডাকাতের বাড়া। ছি ছি।"

"ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরী। বেহায়াগিরির একশেষ। বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্য্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।"

আয়ার মনে পড়ল জাফরাণি রঙের সাড়ীর কথা। বল্‌লে "কিন্তু খোঁকি, দিদিমণির মনখানা দরাজ" কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিলে। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে "ঠিক বলেছিস রোশ্‌নি। ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে যেন নীচু হয়ে গেছি। ছি ছি নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে কথা জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শীগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।" আয়া চলে গেলে ও পেন্সিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, "চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলা দিদিকে?" গণেশ গাঙ্গুলীর কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে "পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি কেননা পুলিসের হাত দিয়ে যাবে চিঠিখানা"। নীরজা পড়ে শোনালে, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।" গণেশ বললে "ঐ যে পথটার কথা লিখেচ ভালো শোনাচ্চে না। আমাদের উকীল বাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।"

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুরপো তুমি আমার গুরু।"

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, "এ আবার কি?"

আদিত্য বললে "ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

"ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না। না হয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও না, যদি মনে এতই উদ্বেগ থাকে।"

"সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন?"

"তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো আমি ঢের বেশী খুসী হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"হোক না নষ্ট। সেরে ওঠো আগে, তারপর সেদিনকার মত দুজনে মিলে কাজ করব।"

"সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কি? তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।"

"লোকসানের কথা আমি ভাবচিনে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।"

"অমন করে আক্ষেপ করছ কেন? বেশতো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্য্যন্ত। কিছু দিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।"

"পাখাটা কি চালিয়ে দেবো?"

"বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনো রকম করে দিন কাটাতে চাও তো তোমাদের তো হর্টিকাল্‌চরিসট ক্লাব আছে।"

"তুমি যে রঙীন লিলি ভালোবাসো, বাগানে অনেক খুঁজে একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয়নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।"

"কী তুমি মিছিমিছি বকচ! তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুক্‌নো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নীচের ঘরে শর্ষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবী।"

"তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।"

"বলতে ওর রুচ্‌বে কেন? ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেচ? কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরাণীকে যে রকম গ্রাহ্য করে না সেই রকম আর কী।"

"হলা মালী সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

"আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দুদিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রীটা। আমি ম্যাপে পেন্সিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।"

"আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?"

"না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমার ছাপ মেরে দেব। বলে রাখচি রাস্তার ধারের ঐ

বট্‌ল্‌ পাম্‌গুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউ গাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লন্‌টা আমি রাখব না, ওখানে মার্ব্বলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।”

“বেদীটা কি ও জায়গায় মানাবে? একটু যেন যাকে বলে শস্তা নবাবী।”

“চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার সম্পূর্ণ আমার। তারপর সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।”

“আচ্ছা সেই ভালো, তাহলে আমি কী করব?”

“তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।”

“তোমাকে নিয়ে থাকাও তাহলে নিষিদ্ধ।”

“হাঁ, সর্ব্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই—এখন আমি কেবল আর একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি—তাতে লাভ্‌ কি?”

“আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনি আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্য গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে ক'রোনা।” বলে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাত ধরে বল্‌লে “না যেয়োনা, একটু বোসো।” ফুলদানীতে একটা ফুল দেখিয়ে বল্‌লে, “জানো এ ফুলের নাম?”

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুসি হবে, তাই মিথ্যে করে বল্‌লে “না জানিনে।”

“আমি জানি। বলব, পেট্যুনিয়া। তুমি মনে করো আমি কিছু জানিনে, মূর্খ্‌ আমি।”

আদিত্য হেসে বললে, “সহধর্ম্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলচে।”

“সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এলো। ঐ যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটচে ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরে আমি থাকবনা। ঐ যে গোরুর গাড়ীটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চল্‌বে রোজ রোজ, কিন্তু চল্‌বে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।” আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে,” একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েচ, বলো না আমাকে সত্যি করে।”

“যাদের বই পড়েচি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেচি আর এগোয় নি।”

"বলো না তুমি কি মনে করো। একটুও থাকব না? এতটুকুও না?"

"এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।"

"নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব, আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো, আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্চে আমার আঙুলের ছোঁওয়া আছে তাতে। বলো মনে করবে।"

আদিত্যকে বলতে হোলো "হাঁ মনে করব।" কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, "তোমাদের বই যারা লেখে ভারী তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।"

বিছানায় শুয়েছিল নীরজা; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল, বললে "আমাকে দয়া কোরো দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে করে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তাহলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?" নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বল্‌লে "নীরু শরীর নষ্ট কোরো না।"

"যাক্ গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর রাগ কোরোনা," বলতে বল্‌তে স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। একটু শান্ত হলে পর বল্‌লে "সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলচি আর অন্যায় করবোনা। যা হয়েছে তার জন্যে আমাকে মাপ করো। কিন্তু আমাকে ভালোবাসো, ভালোবাসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।"

আদিত্য বললে, "শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেচ।"

"শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্ম্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি

তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবো না, তা হলে সবাইকেই আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।"

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বারবার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "সরলা কবে খালাস পাবে সেইদিন গুণছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'।" বালিশের নীচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বল্‌ল, "চিঠি", ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড় ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়টী কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কি খবর?"

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরোলো না কিছুক্ষণ। তারপরে খুব জোর করে বল্‌লে, "তাহলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। ওকে আনবে আমার কাছে।"

"ও কি! কী হলো নীরু! নার্স! ডাক্তার আছেন?"

"আছেন বাইরের ঘরে।"

"এখনি নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল; বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

ডাক্তার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বল্‌লে "ডাক্তার আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না ভালো হবে না তাতে। আশীর্ব্বাদ করব তাকে। শেষ আশীর্ব্বাদ।"

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হোলো, বলে উঠলো, "ঠাকুরপো কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।"

'এক একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে, আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, "কখন আসবে সরলা?"

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, "রোশ্‌নি।"

আয়া বলে "কী খোঁখি!"

"ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুণি।" একবার আপনি বলে ওঠে "কী হবে আমার ঠাকুরপো দেব দেব দেব, সব দেব।"

রাত্রি তখন ন-টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলচে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমচ্চে আশঙ্কা করে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এলো নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখলে ঠোঁট নড়চে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করচে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে "সরলা এসেছে।" চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, "তুমি যাও"—একবার ডেকে উঠল, "ঠাকুরপো!"—কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠ্‌ল "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।" বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হোলো, বললে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।"

হঠাৎ ঢিলে সেমিজ পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্ত্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে "পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

শেষ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬

দয়াময়ীর আচরণে বন্দনার প্রতি যে প্রচ্ছন্ন লাঞ্ছনা ও অব্যক্ত গঞ্জনা ছিল সতীকে তাহা গভীর ভাবে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীকে কিছু বলা সহজ নয়, তাই সে একখানি চিঠি লিখিয়া বোনের হাতে দিবার জন্য স্বামীকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল। দুপুরের ট্রেনে বিপ্রদাস কলিকাতায় ফিরিবে। এমন সময়ে দয়াময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এরূপ তিনি কখনো করেন না,—ছেলে এবং বৌ উভয়েই বিস্মিত হইল—সতী মাথার আঁচল টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল শাশুড়ী নিষেধ করিয়া কহিলেন, না বৌমা যেয়োনা। তোমার অসাক্ষাতে তোমার বোনের নিন্দে করবোনা একটু দাঁড়াও। বিপিন, জানিস তুই কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমি বাড়ী চলে এলুম?

বিপ্রদাস বলিল, ঠিক জানিনে মা, কিন্তু কোথায় কি-একটা গোলযোগ ঘটেছে এইটুকুই আন্দাজ করেচি।

মা কহিলেন, গোলযোগ ঘটেনি কিন্তু ঘট্‌তে পারতো। এর থেকে মা দুর্গা আমাকে রক্ষে করেছেন। কাল বেহাই-মশাই বোম্বায়ে চলে যাবেন, কথা ছিল তারপরে বন্দনা এসে কিছুদিন থাকবে ওর মেজদিদির কাছে। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ত এখানে সে আর আসতে চাইবেনা বাপের সঙ্গে সোজা বোম্বায়ে চলে যাবে। যদি না যায় যেতে বলে দিস। বৌমা, মনে দুঃখ করোনা মা, অমন বোনকে বনবাসে দেওয়া চলে কিন্তু ঘরে এনে তোলা চলে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল, তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমার পোড়াকপাল যে ওকে ভালোবাসতে গিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম ও আমাদেরই একজন। ওর চাল-চলনে গলদ আছে,—ভেবেছিলুম, সে সব ইস্কুল-কলেজে পড়ার ফল,—চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের মতো বাতাস লাগলেই উড়ে যাবে,—থাক্‌বেনা। হাজার হোক সতীর বোন ত বটে! কিন্তু ও বর বেছে নিলে কায়েতের ঘর থেকে, কে জানতো বিপিন, বামুনের বংশে জন্মে ওরা এত অধঃপথে গেছে!

বিপ্রদাস কহিল, ও—এই কথা ! কিন্তু ওরা যে জাত মানেনা এ খবর ত তুমি শুনেছিলে মা।

দয়াময়ী বলিলেন, শুনেছিলুম কিন্তু চোখে দেখিনি। বোধ হয় মানে বুঝতেও পারিনি। রূপকথার গল্পের মতো। কিন্তু চোখে দেখলে যে কারো পরে কারো এত বেতেষ্টা জন্মায় তা' সত্যিই জানতুমনা বাবা। বলিতে বলিতে ঘৃণায় যেন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, মরুকগে। যা ইচ্ছে হয় করুক, কে আর আমার ও—কিন্তু আমার বাড়ীতে আর না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, কই জবাব দিলিনে যে বিপিন ?

—জবাব ত তুমি চাওনি মা। হুকুম দিলে বন্দনা যেন না আসে,—তাই হবে।

তাহার কথা শুনিয়া দয়াময়ী দ্বিধায় পড়িলেন, বলিলেন, হুকুমটা কি অন্যায় দিচ্চি তোর মনে হয় ?

—হয় বই কি মা। বন্দনা অন্যায় কিছু করেনি, সামাজিক আচার-ব্যবহার আমাদের সঙ্গে তাদের মেলেনা, তারা জাত মানেনা, একথা জেনেই তাকে তুমি আসবার আহ্বান করেছিলে ভালোও বেসেছিলে। তোমার মনে হয়ত আশা ছিল তারা মুখেই বলে কাজে করেনা,—এইখানেই তোমার হয়েছে ভুল, আঘাতও পেয়েছো এই জন্যে।

দয়াময়ী বলিলেন, সে হয়ত সত্যি, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটা শুনলে তোরই কি ঘেন্না হয় না বিপিন ? তুই বলিস্ কি বল্‌তো !

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, তার বিয়ে এখনো হয়নি, কিন্তু হলেও আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবে শ্রদ্ধাই করবো যে ওদের বিশ্বাসের সত্য কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালেনা কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেচি যারা বাক্যের আড়ম্বরে মানেনা কিছুই, জাতি-ভেদ বিশ্বাসও করেনা গালও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা ঢাকা দেয়,—আর তাদের খুঁজে মেলেনা। তাদেরই অশ্রদ্ধা করি আমি সবচেয়ে বেশি। রাগ কোরনা মা, তোমার দ্বিজুটি হলো এই জাতের।

শুনিয়া দয়াময়ী মনে মনে যে অখুসি হইলেন তা' নয়। দ্বিজুর সম্বন্ধে বলিলেন, ওটা ঐ রকম ফাঁকিবাজ ! কিন্তু, আচ্ছা বিপিন, বন্দনাকে যদি তুই ঘৃণাই করিসনে তবে তার ছোঁয়া কিছু খাস্‌নে কেন ? ওকে রান্নাঘরে পাঠাতুম বলে তুই সে ঘরে খাওয়াই ছেড়ে দিলি খেতে লাগলি আমার ঘরে। আর কেউ না বুঝুক আমিও কি বুঝতে পারিনি ভাবিস্ ?

বিপ্রদাস বলিল, তুমি বুঝবেনা ত মা হয়েছিলে কেন ? কিন্তু আমি যে সত্যই জাত মানি মা, আমি ত তার ছোঁয়া খেতে পারিনে। যে-দিন মানবোনা সেদিন প্রকাশ্যেই তার হাতে খাবো একটুও লুকোচুরি করবোনা।

দয়াময়ী বলিলেন, তুই জানিসনে বিপিন কি করে আমি তার কাছ থেকে এইটি ঢেকে বেড়াতুম। মেয়েটা এখানে আসুক না আসুক দেখিস যেন এ কথা কখনো সে টের না পায়। তার ভারি লাগবে। তোকে সে বড় ভক্তি করে। তাঁহার শেষের কথাগুলি যেন সহসা স্নেহ-রসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, আমাকে সে ভক্তি করে কিনা জানিনে মা, কিন্তু তার ছোঁয়া যে খাইনে এ সে জানে।

—অমন অভিমানী মেয়ে এ জেনেও তোকে অত ভক্তি করতো ? তার মানে ?

—ভক্তি করার কথা তোমরাই জানো মা, কিন্তু আমি জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তোমাদের সমস্ত ঢাকা-ঢাকিই সেখানে নিষ্ফল হয়েছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন তারপরে বলিলেন, তাই বুঝি সে অতো করে পীড়াপীড়ি করতো ?

—কিসের পীড়াপীড়ি মা ?

দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমি বিধবা মানুষ আমার ভাতে-ভাত হলেই চলে কিন্তু সে তা কিছুতে দেবেনা। মার্কেট থেকে নানা নতুন তরকারী আনাবে, নিজে কুটে বেছে দেবে বামুন-পিসিকে দিয়ে দশখানা তরকারি জোর করে রাঁধিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে। ও জানতো সামনে এসে যার দেওয়া চলেনা, তাকে পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাতে হয়। কেন, খেয়েও কি বুঝতে পারিসনি বিপিন, অমন রান্না পিসী তার বাপের জন্মেও রাঁধতে জানেনা ?

বিপ্রদাস সহাস্যে উত্তর দিল, না মা অত লক্ষ্য করিনি। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো তোমার অতিথিদের সে-রান্নাঘরের বিপুল আয়োজনের টুকরো-টাকরা হয়ত আমাদের এ-রান্না-ঘরেও ছিট্‌কে এসে পড়েছে। কিন্তু সে যে দৈবকৃত নয় একজনের ইচ্ছাকৃত এ খবর আনন্দের। কিন্তু তোমার শেষ আদেশ জানিয়ে দাও মা। ট্রেনের সময় হয়ে এলো আমাকে এখনি ছুটতে হবে,—তার নিমন্ত্রণ তুমি রাখলে মা প্রত্যাহার করলে তাই বলো।

দয়াময়ী সতীকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলো বউমা ?

ছেলেবেলায় সতী শাশুড়ীর সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন আর বলেনা। প্রায়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, নয় নিরুত্তরে থাকে। কিন্তু আজ কথা কহিল, আস্তে আস্তে বলিল, থাক্‌গে মা এখানে তার আর এসে কাজ নেই।

জবাব শুনিয়া শাশুড়ী খুসি হইতে পারিলেন না। তাঁহার অভিলাষ ছিল অন্যপ্রকার অথচ, নিজের মুখে প্রকাশ করাও চলেনা। বলিলেন, বড়-মানুষের মেয়ের অভিমান হলো বুঝি ?

—না মা, অভিমান নয়, কিন্তু যা করে আমরা চলে এসেচি তারপরে আর তাকে এখানে ডাকা চলেনা।

—কেন চলবেনা বউ মা, একটা অন্যায় যদি হয়েই থাকে তার কি আর সংশোধন নেই ?

—নেই বলিনে, কিন্তু দরকার কি। আগেও অনেকবার সে আসতে চেয়েছে কিন্তু কখনো আমরা রাজি হতে পারিনি, এখনো সমস্ত বাধা তেমনি আছে। সে ঢুকতো বলে উনি রান্না-ঘরের সম্পর্ক ছেড়েছিলেন, কাজ কি তাকে এখানে এনে ?

বিপ্রদাস কহিল সে নালিশ তার, তোমার নয়। বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তবু বন্দনা আমাকে প্রচণ্ড ভক্তি করে, স্বয়ং মা তার সাক্ষী।

সতী মুখ তুলিয়া চাহিল, বোধহয় হঠাৎ ভুলিয়া গেল শাশুড়ী আছেন, বলিল, শুধু মা কেন আমিও তার সাক্ষী। মেয়েরা ভক্তি যখন করে তখন নালিশ আর করেনা। দেব-দেবতাও কম পীড়ন করেননা, তবু পুঁজো বন্ধ করেনা, বলে দুঃখ দিয়েছেন তিনি ভালোর জন্যেই। শাশুড়ীকে বলিল, তোমাকেও বন্দনা কম ভক্তি করেনি মা, কম ভালোবাসেনি। তোমার ধারণা তোমার ঘরে সে খাবার আয়োজন করে দিত কেবল ওঁর জন্যে? তা' নয়, করতো সে তোমাদের দুজনের জন্যেই,—তোমাদের দুজনকেই ভালোবেসে। তার 'পরে দিয়েছিলে তুমি রান্নাঘরের ভার—সকলকে খেতে দেবার কাজ, কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে সে আর সকলকে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতে পারতোনা মা, ভাতে-ভাত সবাইকেই গিলতে হতো। কিন্তু আর কেন তাকে টানাটানি করা? আমরা যা চেয়েছিলুম সে আশা ঘুচেছে,—সে আর ফিরবেনা মা। এই বলিয়া সতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

দারুণ বিস্ময়ে উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সতীর স্বভাবে এরূপ উক্তি, এরূপ আচরণ এম্‌নি সৃষ্টিছাড়া যে ভাবাই যায়না সে প্রকৃতিস্থ আছে। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মা?

দয়াময়ী কহিলেন, জানিনে ত বাবা।

—কিসের জন্যে বন্দনাকে তোমরা চেয়েছিলে মা? কিসের আশা ঘুচ্‌লো?

দয়াময়ী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেলেন কিছুতে মুখে আনিতে পারিলেন না কি তাঁর সঙ্কল্প ছিল। শুধু বলিলেন সে সব কথা আর একদিন হবে বিপিন, আজ না।

—মা, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কি কিছু স্থির করলে? তাঁদের ত একটা জবাব দেওয়া চাই।

—আমার আপত্তি নেই বিপিন, তোদের মত হলেই হবে। দ্বিজুকেও জিজ্ঞেসা করিস সে কি বলে। এই বলিয়া তিনিও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপ্রদাস সংশয়ে পড়িল। স্পষ্ট বিশেষ হইলনা কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লইবারও সময় আর ছিলনা।

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া দেখিল বাড়ী খালি। বন্দনা ও তাহার পিতা ঘণ্টা কয়েক পূর্ব্বে চলিয়া গেছেন। এ সংশয় যে তাহার একেবারে ছিলনা তা নয়, কিন্তু এতটাও আশঙ্কা করে নাই। অন্নদা কারণ জানেনা, শুধু এইটুকু জানে যে যাবার ইচ্ছা রায়-সাহেবের তেমন ছিলনা, কেবল কন্যাই জিদ করিয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া গেছে। বন্দনার 'পরে দাবী কিছুই নাই, থাকার দায়িত্বও তাহার নয়, এখানে সে অতিথি মাত্র, তবু সে যে দেখা না করিয়া, পীড়িত দ্বিজদাসকে অচেতন ফেলিয়া রাখিয়া অকারণ ব্যস্ততায় চলিয়া গেছে মনে করিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। অনেকটা রাগের মতো,—নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া যেন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতি নয়, সে-ভাব তাহার মনের মধ্যেই রহিয়া গেল।

দিন চারেক পরে বিপ্রদাস হাইকোর্ট হইতে ফিরিল প্রবল জ্বর লইয়া। হয়ত ম্যালেরিয়া হয়ত বা আর কিছু। চোখ রাঙা, মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি, অন্নদা কাছে আসিলে বলিল, অনুদি, অসুখ ত কখনো হয়না, বহুকাল জ্বরাসুর দৈত্যটাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, এবার বুঝিবা সে সুদে-আসলে উসুল করে। মনে হচ্ছে কিছু ভোগাবে সহজে নিষ্কৃতি দেবেনা।

অবস্থা দেখিয়া অন্নদা চিন্তিত হইল কিন্তু নির্ভয়ের সুরে সাহস দিয়া বলিল, না দাদা তোমার পুণ্যের দেহ এতে দৈত্য-দানার বিক্রম চলবে না, তুমি দুদিনেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিই—আমি তাচ্ছল্য করতে পারবোনা।

—তাই দাও দিদি, বলিয়া বিপ্রদাস শয্যা গ্রহণ করিল।

অন্নদা বিপদে পড়িল। ওদিকে হঠাৎ বাসুদেবের অসুখের সম্বাদে কাল দ্বিজদাস বাড়ী গেছে, দত্ত মশাই সহরে নাই—মনিবের কাজে তিনিও ঢাকায়। একাকী কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সকালে আসিয়া বলিল, বিপিন একটা কথা বলবো ভাই রাগ করবেনা ত?

—তোমার কথায় কখনো রাগ করেচি অনুদি?

অন্নদা পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, প্রাণ দিয়ে রোগের সেবা করতেই পারি, কিন্তু মুখ্যু মেয়ে মানুষ জানিনে ত কিছু, বাড়ীতেও খবর পাঠাতে পারচিনে ছেলের অসুখ,—ফেলে রেখে বৌ আসবে কি করে—কিন্তু বন্দনা দিদিকে একটা খবর দিলে হয়না?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, বোম্বাই কি এ-পাড়া ও-পাড়া দিদি যে খবর পেয়ে সে দেখতে আসবে। হয়ত তার নুন আনতেই এদিকের পান্তা ফুরিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিল, বালাই ষাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই ভাই। বন্দনা দিদি কলকাতায় আছে, এখনো তার বোম্বায়ে যাওয়া হয়নি।

—বন্দনা কলকাতায় আছে?

—হাঁ তার মাসির বাড়ীতে ভবানীপুরে। মেসো পাঞ্জাবের বড় ডাক্তার, মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে এসেছেন। হঠাৎ হাবড়ার ইষ্টিসানে দেখা তাঁরাও নাবচেন গাড়ী থেকে এঁরাও যাচ্চেন বোম্বায়ে। মাসি জোর করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন দৈবাৎ যখন পাওয়া গেল তখন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুতে ছেড়ে দেবেননা। শুধু একদিন আটকে রেখে ওর বাপকে তারা যেতে দিলে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল মাসিটি কি চেনা?

—হাঁ, আপনার বড় মাসি। দূরে-দূরে থাকে সর্ব্বদা দেখা শুনো হয়না, সত্যি, কিন্তু আপন লোক বটে।

—তুমি এত কথা জানলে কি ক'রে অনুদি?

—কাল এসেছিলেন তাঁরা বেড়াতে, দ্বিজুর খবর নিতে। দুপুর বেলায় ওপরের বারান্দায় বসে নাতির জন্যে কাঁতা সেলাই করচি, দেখি বাইরের উঠোনে দু-গাড়ী লোক এসে উপস্থিত। মেয়ে-পুরুষে অনেকগুলি। কে এরা? উঁকি মেরে দেখি আমাদের বন্দনা দিদি। কিন্তু সাজ-সজ্জায় এমনি বদলেছে

যে হঠাৎ চেনা যায়না, যেন সে মেয়ে নয়। কি করি কোথায় বসাই,—ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। খানিকপরে দিদি এলেন ওপরে, সকলের খবর নিলেন খবর দিলেন,—তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলুম অন্ততঃ মাস-খানেক কলকাতায় থাকা হবে। বললেন, বেশ আছি। থিয়েটার, সিনেমা, চড়িভাতী বাগান-বাড়ী—আমোদের শেষ নেই। নিত্যি নতুন ঘটা।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বাসুর অসুখের খবর তাকে দিয়েছিলে?

—হাঁ দিলুম বই কি। শুনে বললেন, ও কিছু না,—সেরে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, তাকে খবর দিয়ে কি হবে অন্নদি, আমিও সেরে যাবো। সে ক'টা দিন তুমি একলা পারবেনা আমাকে দেখতে?

অন্নদা জোর দিয়া কহিল, পারবো বই কি ভাই, কিন্তু তবু মনে হয় একবার জানানো উচিত, নইলে বউ হয়ত দুঃখ করবে। হাজার হোক বোন্ ত?

—ঠিকানা জানো?

—আমাদের শোফার জানে। ওদের পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা দাও একটা খবর। কিন্তু অতো আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে কি সে আসতে পারবে? মনে ত হয়না দিদি।

অন্নদা বলিল, মনে আমারও বড়ো হয়না ভাই। তার সাজ-গোজের কথাই কেবল চোখে পড়ে। তবু একবার বলে পাঠাই।

বিপ্রদাস নিরুৎসুক ক্লান্ত কণ্ঠে শুধু বলিল, পাঠাও দিদি, তাই যখন তোমার ইচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

টাকার মূল্য-হ্রাসে ভারতের স্বার্থ

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

টাকার দাম বাড়িয়ে আঠারো পেন্স রাখা হয়েছে,—ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখতে হলে একে ষোলো পেন্সে নামিয়ে আনা উচিত, বহু পূর্ব্বেই এটা উচিত ছিল; একথা কেবল আমার নয়, এদেশের যারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সকলেরই মত এই। ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন আর্থিক উন্নতি টাকার এই মূল্য হ্রাসের উপরে বড় বেশি পরিমাণে নির্ভর করে। কেবল ব্যবসা-ব্যাপারীরাই নন্, বিশিষ্ট অর্থনীতি-বিদ্‌দেরও এই মত, কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্প্রতি উল্টো গেয়েছেন। তিনি টাকার বর্ত্তমান হার বজায় রাখার পক্ষে। এই বাদ প্রতিবাদে নতুন করে' যোগ দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু আচার্য্যদেব আমাদের জাতীয় জীবনে যে-বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন তাতে তাঁর ভুল মতে অনেকের ভুল পথে চালিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং তাতে করে' দেশেরই ক্ষতি—এই কারণে বাঙালী পাঠকের কাছে সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার করার প্রয়োজন আমি মনে করি।

এই বাদ প্রতিবাদের ক্ষেত্রে বোম্বাই-বাংলার পুরণো কচকচি টেনে আনা হয়েছে, বলা হয়েছে যে টাকার মূল্য কমানোর ফলে বোম্বায়ের মিলের মালিকদের টাকা কামানোর সুযোগ হবে। কেননা মুদ্রা-বিনিময়ের এই নতুন হারে বিদেশের আমদানি যন্ত্রপাতির, বিশেষ করে কাপড়-তৈরির কল-কব্জার দর বেড়ে যাবে; ফলে বাংলাদেশে যে সব কাপড়ের কলের পত্তন এবং প্রসার হচ্ছে তাদের হবে অসুবিধা এবং এর সুবিধাটুকু ভোগ করবে বোম্বাই। অর্থাৎ টাকার হার কমানো মানে বি-প্রদেশী কলের আহার যোগানো, আমাদের পেট কেটে অন্য প্রদেশের পকেট ভারী করে' তোলার ব্যবস্থা। এক কথায় বোম্বাই-কাঁঠাল বাংলার মাথায় ভাঙ্‌বার এ এক নতুন চালবাজি।

কিন্তু এ কথা মনে করা ভুল। যে মুদ্রা-নীতি সমগ্র দেশে চলবে তার ফল সমগ্র প্রদেশেই সমান হবার কথা—তার ভেতরে এক প্রদেশের ফলার আর অন্য প্রদেশের একাদশীর বিধান নেই। এবং একথা মনে করাও ভুল যে কলকারখানা যা কিছু হবার তা কেবল বাংলাদেশেই হচ্ছে এবং বোম্বায়ে তা বহুদিন আগেই হয়ে চুকেছে। অর্থাৎ বোম্বায়ের কলকারখানা বাড়ানোর প্রয়োজন আর নেই সুতরাং বর্দ্ধিত হারে বিদেশী কলকব্জা না কিন্‌লেও তার চলবে, বরং নতুন বিনিময়-নিয়মে আম্‌দানির দর বেশি হলে বিদেশী প্রতিযোগিতায় নিজের তৈরি মাল বাজারে সস্তায় কাটানোর পক্ষে তার সুবিধা। সুতরাং বাংলাদেশে কল-কারখানা বেড়ে গিয়ে যাতে বাড়ীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বের বাড়াবাড়ি না হয় এখন সেদিকে বাধা দেওয়াতেই তার স্বার্থ। অতএব টাকার দাম কমানোর ব্যাপারে বোম্বাই-চাল আছে এই কথা আচার্য্য রায় ধরে নিয়েছেন।

কিন্তু টাকার দাম কমে গেলেই কলকারখানা করার অসুবিধা হবে এই মত মানা যায় না, কেননা বোম্বায়ের বেশির ভাগ মিল যখন খোলে সে সময়ে টাকার দাম আঠারো নয়, ষোলো পেন্সই ছিল। এবং নতুন হারের ফলে বিদেশী যন্ত্রপাতির দর বেড়ে গেলে বাংলা দেশের চেয়ে বোম্বায়েরই বেশি বিকল হবার কথা, কেননা কাপড় তৈরির কল ও কব্জা বাংলা দেশের দশগুণ কেনে বোম্বাই—এখনও। গত পাঁচ বছরের অঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এই তথ্য স্পষ্ট হবে।

বস্ত্র-শিল্পের যন্ত্রপাতির আমদানি

	বাংলা	বোম্বাই
১৯২৭-২৮	২৮,২৬,১৫৩৲	১,৪৯,২২,৩০২৲
১৯২৮-২৯	২৩,৮৬,৪৯৩৲	১,৬৬,৯৬,৮৭৫৲
১৯২৯-৩০	১৮,৫৬,৬৬৭৲	১,৫৫,৪১,১৬৮৲
১৯৩০-৩১	১৫,৪৮,৩৮৭৲	১,৩৪,৮৫,৯৩৫৲
১৯৩১-৩২	১৪,৮২,৪৬৭৲	১,৫৮,৯৪,৪৬৪৲
মোট পাঁচ বছরে	৯২,৯৩,১৬৭৲	৭,৬৫,৪১,৬৪৪৲

যদি নতুন মিল খোলার দিকে লক্ষ্য রেখেই আচার্য্য রায় আঠারো পেন্স হারের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন তাহলে একথাও বল্‌তে হয় যে বোম্বায়ে এখনও যথেষ্ট নতুন মিল খুলছে। এমন কি গত পাঁচ বছরের খতিয়ান কষ্‌লে দেখা যাবে বাংলায় যেখানে নতুন মিল পাঁচটা হয়েছে বোম্বায়ে সেখানে হয়েছে আটচল্লিশটা, বাংলাদেশে যেখানে দু হাজার তিনশ চৌত্রিশটা কলের তাঁত খুলেছে বোম্বায়ে সেখানে নতুন তাঁতের সংখ্যা তেইশ হাজার চারশো চৌত্রিশ; বাংলায় যেখানে দু হাজার চারশো বাইশটা কলের টাকু (spindles) নতুন চলেছে সেখানে বোম্বায়ের সংখ্যা এগারো লক্ষের কাছাকাছি। এই সব তথ্যের আলোয় একথা কিছুতেই বলা যেতে পারে না যে নতুন মুদ্রা-মূল্যে বাংলাদেশের ক্ষতি বোম্বায়ের তুলনায় বেশি হবে।

এখন ক্ষতির বিষয়টা একবার খতিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক্, দশলাখ টাকা দিয়ে বাংলাদেশে নতুন মিল্ খোলা হোলো; যদি টাকার বিনিময় হার কমিয়ে ষোলো পেন্স করা হয় তাহলে দশলাখ টাকার যন্ত্রপাতি কিন্‌তে বারো লাখ লাগবে—অর্থাৎ দু লাখ টাকা বেশি যাবে। কিন্তু তেমনি সেই মিলের তৈরি মাল শতকরা ১২½ হারে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে রেহাই (protection) পাবে। অর্থাৎ প্রাথমিক দু লাখ বেশি খরচ প্রথম বছরেই পুষিয়ে ত যাবেই, তাছাড়া পরের প্রত্যেক বছরে তার একলাখ পঁচিশ হাজার করে উপরি লাভ হবে। যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল যদি পনের, অন্ততঃপক্ষে দশ বছর করেও ধরা যায় তাহলে এই লাভ কততে গিয়ে দাঁড়ায় হিসাব করা কঠিন নয়।

কিন্তু অন্যদিকে টাকার মূল্য যদি বর্দ্ধিত হারেই থাকে তাতে বিদেশী যন্ত্রপাতির সুলভতার সঙ্গে বিদেশী মালও সুলভ হবে, এবং তার আমদানির ধাক্কায় এদেশী সব মিলের অবস্থাই সঙ্গীন হতে বাধ্য, তা বাংলারই কি আর বোম্বায়েরই কি। আজকের দিনে যখন বিদেশী মালের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সমস্যাই সব চেয়ে নিদারুণ, সে সময়ে কেবল সস্তায় কারখানা করার দিকে তাকালেই চল্‌বে না, সেই কারখানার তৈরি জিনিস আমদানি-মালের চেয়ে সস্তার বাজারে কাটানো যাবে কিনা সেদিকটাও দেখতে হবে। যন্ত্রকে সুলভ করার ঝোঁকে যদি যন্ত্রণাকে ডেকে আনি তাতে কল বিকল হতে কতক্ষণ?

টাকার দাম কমার সঙ্গে সঙ্গে জিনিস-পত্রের দর বেড়ে যাবে, বিশেষ করে' সেই সব জিনিষের যা বিদেশে চালান যায়। অর্থাৎ আমদানির হাটে ভারতবর্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হলেও রপ্তানির বাজারে তার লাভের বরাৎ। সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে বাংলারই লাভবান হবার কথা, কেননা গত বছরে যেখানে বোম্বাই বিদেশে পাঠিয়েছে তেইশ ক্রোড় দু লাখ টাকার মাল, সেখানে বাংলাদেশের চালান্ তার দ্বিগুণেরো বেশি—পঞ্চান্ন ক্রোড় আটলাখ টাকার মাল। এই সব লাভালাভের খুঁটিনাটি না ধরলেও এ কথা ভুলে থাকা যায় না যে রপ্তানির বাজারের মুখ চেয়ে থাকতে হয় বাংলাকে,—কেননা বোম্বায়ে যে তুলা জন্মায় তার অর্দ্ধেক তার কল-কারখানার খাদ্যে লাগে, কিন্তু বাংলাদেশের পাটের পঁচানব্বই ভাগই বিদেশে বিক্রী না করলে চলে না।

বিদেশী যন্ত্রপাতির দর বাড়লে প্রথমে কিছু খরচ আছেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এদেশে যন্ত্রপাতি কলকব্জা তৈরি করার চেষ্টা প্রেরণা পাবে সেকথা অস্বীকার করা যায় না। বিদেশী জিনিস যে পরিমাণে দুর্ম্মূল্য হবে স্বদেশী প্রচেষ্টা সেই পরিমাণেই উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ করবে। কলকাতা বা বাংলাদেশের যে কোনো বড় সহরের অলিতে গলিতে এমন বহু দেখা যাবে যেখানে মধ্যবিত্ত ঘরের উদ্যমশীল বাঙালী ছেলেরা নিজেদের সামান্য কারখানায় হরেক রকম মেশিনারির ছোট বড় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সাইকেলের অংশ প্রত্যংশ, বৈদ্যুতিক পাখা ও মোটর গাড়ীর কলকব্জা, ময়দার কল ও বিদ্যুৎকলের যন্ত্রপাতি এবং এম্‌নি অনেক কিছু তৈরি করছে। এরকম হাজার হাজার। বাঙালী যুবক সমাজে এরাই সব চেয়ে পরিশ্রমী, বুদ্ধিবৃত্ত ও চেষ্টাশীল। বাংলার ভাবী বাণিজ্যায়ণের মূলে আছে এরাই—এদেরই পথে এদেরই আদর্শের অনুসরণে বেকার বাঙালীর মুক্তি। কোথায় আমরা এদের পৃষ্ঠপোষণ করে' বাংলার দারিদ্র্যদশা ও বেকার সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত করব, তা না টাকার দাম বাড়িয়ে সস্তা বিদেশী যন্ত্র-পাতির পাল্লায় ফেলে এদের ভাত মারবার ব্যবস্থা করছি। আঠারো পেন্স্-এর মারে ইতিমধ্যেই এই ধরণের অনেক

ছোটখাট কারবার মারা পড়েছে—কাট্‌লারির জিনিসপত্র, কৃষিকর্ম্মের যন্ত্রপাতি, তালাচাবি ইত্যাদি ঘরকন্নার দরকারি টুকিটাকি তৈরি করার যে সব সামান্য কারখানা কিছুদিন আগে উঁকি মেরেছিল, বিলাতি সুলভতার ধাক্কায় এখন তাদের অনেকেরই গয়া হয়ে গেছে।

প্রত্যেক দেশেরই লক্ষ্য থাকে যাতে তার আম্‌দানি কমে গিয়ে রপ্তানি বেশি হয়—দেশের ধনবৃদ্ধির যেটা সহায়। ইংলণ্ড পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর দর কমিয়ে এবং বিদেশী আমদানির বিরুদ্ধে উঁচু টারিফের বেড়া তুলে এই উদ্দেশ্য সাধন করেছে। আজ যে জাপান তার সস্তা মালে ভারতবর্ষ ছেয়ে ফেল্‌তে পেরেছে এবং এদেশের ব্যবসার সবচেয়ে শত্রুতা-সাধন করছে সেটা সম্ভব হয়েছে তার ইয়নের (yen) দর কমিয়ে দেওয়ার ফলে। বাংলাদেশের এনামেলের বা কাঁচের কারবার কিম্বা মৃৎ-শিল্প কি জাপানের এই টক্করে টিকে থাক্‌তে পারবে? কেবল টাকার মূল্য কমিয়েই এই বিদেশী পাল্লাকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব।

টাকার বর্দ্ধিত হারের সপক্ষে একটা প্রবল মত এই যে জনসাধারণের এতে সুবিধা, কেননা এতে ক'রে' বিদেশী জিনিসপত্র তারা সস্তায় পাবে। কিন্তু জনসাধারণকে ঠিক এভাবে ক্রেতা বিক্রেতার কোঠায় আলাদা করে' ফেলা যায় না, কেননা যারাই ক্রেতা তারাই আবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে বিক্রেতা। টাকার দর কমালে দু একটা দরকারি বিদেশী জিনিস কিছু বেশি দামে আমাদের কিন্‌তে হবে বটে কিন্তু তেমনি আমাদের উৎপন্ন ফসলও বিদেশের বাজারে আমরা চড়া দামে ছাড়তে পারব। সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে, গ্রহণের চেয়ে উৎপন্ন করি আমরা ঢের, কেনার চেয়ে বিক্রির গরজ আমাদের বেশি। সুতরাং টাকার দাম কম্‌লে তার দাঁও মারবে জনসাধারণ। বিলাতি জিনিসের দর বাড়লে তার আদর এবং দরকার দুইই কমে যাবে, সেটাও একটা কম লাভের কথা না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন টাকার মূল্য হ্রাসে আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবার নয়, অন্য সব জাতির শুভেচ্ছার উপরে সেটা নির্ভর করে। কিন্তু আসলে এটা হোলো নৈরাশ্য-দর্শন, তাঁর মত কর্ম্মবীরের মুখে থেকে এই বাণী আমরা আশা করিনা। যতদিন না আর সব জাতি সহানুভূতির বশে আমাদের কল্যাণসাধনে এগুচ্ছে ততদিন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌ব এই অর্থনৈতিক অদৃষ্টবাদ মান্‌তে গেলে আমাদের অপঘাত আসন্ন বল্‌তে হবে। আর কোনো দেশ ঠিক এইভাবে অন্য সব জাতির মুখ চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষার ভরসায় বসে' নেই। ইংলণ্ড নিজের পাউণ্ডের দর কমিয়েছে আর বিদেশী পণ্যের মাশুল বাড়িয়ে দিয়েছে, তার ফলে অর্থকরী সাফল্য তার হোলো। আমেরিকা, জার্ম্মাণি, জাপান, ইটালী, আয়র্লণ্ড কেউই, আর সব দেশ কি করবে না করবে ভেবে মাথা ঘামাচ্ছে না, স্বার্থরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য যা কর্ত্তব্য অকুণ্ঠ চিত্তে করছে। একা ভারতবর্ষই বা কেন অপেক্ষা করে মরবে?

এবং অপেক্ষা করলেই যে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে কোনোদিন সে আর সব প্রতিদ্বন্দ্বীর শুভেচ্ছা অর্জ্জন করতে পারবে তার প্রত্যাশা কি? কোনোদিনই কেউ আমাদের সাহায্যে অগ্রসর হবেনা এ সম্বন্ধে এখনই নিঃসংশয় হওয়া ভালো। দাঁড়াতে হলে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হয়, অপরের পায়ে দাঁড়ানো চলেনা—এজন্য আর কারো পা ধার পাওয়া দুর্ঘট। যে সে চেষ্টা করে বা সেই ভরসায় থাকে পৃথিবীর যাত্রাপথে সে চিরদিন পদচ্যুত থেকে যায়—তার দুর্ঘটনা করুণ, অগ্রগতি স্তব্ধ,—তার উদ্ধার নেই।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

সনেট

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

প্রেম

সেদিনেরে আজি করিতে কি পারো মনে
পরাণে দোঁহার প্রথম ফুটিল হাসি।
উন্মনা তুমি বসিয়া বিজন বনে
হেলায় তুলিয়া ফেলিছ কুসুমরাশি।
পল্লবঘন শ্যামলশাখার ফাঁকে
প্রভাতআলোকসুধার অমল ধারা
তোমার ও তনু ঘিরিয়া হাজার পাকে
চপল ছন্দে নাচিয়া হয়েছে সারা।

অপরূপ সেই রূপের মাধুরী হেরি
মূঢ় বিস্ময়ে নয়ন পলক ভোলে;
খুলিল নিমেষে শতদল মর্ম্মেরি
কিসের আবেশে বহিয়া বহিয়া দোলে!
আজিও বুঝিতে নারিনু কি কব তারে,
রূপমোহ সে কি? প্রেম কহি তবে কারে!

মোহ

জীবনের শত কর্ম্মের কোলাহলে
জনস্রোতে যবে ভাসিবে তরণীখানি
সুদূরের পথে তোমারে ভুলিব রাণী,—
ভাবিতে সে কথা এখনো নয়ন গলে।
আবেগ-উষ্ণ মোর দুই করতলে
প্রসারিত তব স্নেহসুকোমল পাণি
ভরিলাম আজি পরম যতনে আনি
সারাদিবসের সঞ্চিত ফুল দলে।

কুসুম শুকালে, জানি ভুলে যাবে মোরে
সন্ধ্যায় প্রাতে বলা মোর কথা যত,
তোমার চপল প্রেমের কনকডোরে
গাঁথা হবে ফুল নিত্যনূতন কত!
হয়ত তখনো দুরাশার মায়াঘোরে
আমি খুঁজিতেছি যেদিন হয়েছে গত।

মোহ-ভঙ্গ

দিবস গণিয়া হিসাব যাহারা করে,
প্রাণের প্রমাণে প্রমাণ বলি' না মানে
তাহারা হিসাবী, হয়ত সকলি জানে,
তবু বলি প্রেম নহে তাহাদের তরে।
মহানগরীর কত-না তুচ্ছ ঘরে—
—চারিধারে শত কোলাহল কর হানে—
তবুও গোপন উৎসব কত প্রাণে,
মিথ্যা তাদের বলি কোন্ অন্তরে।

তোমাদের হাতে তুলে বচনের বোঝা
সূক্ষ্ম শতেক তর্কের কুটিলতা
তুলে দিয়ে যত উৎসবদীপমালা
আমি করিলাম সাজ সকল খোঁজা।
অমারজনীর সুনিবিড় কৃষ্ণতা
ভরিল নয়ন, এবার চলার পালা।

কবি কামিনী রায়

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস এম্-এ, বি-এল

সুকবি কামিনী রায় সম্প্রতি মারা গিয়াছেন। কোন কবির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু কামিনী রায়ের কবি-খ্যাতি বাংলা সাহিত্যে আজ অনেক বৎসর হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় সত্তর বৎসর, কিন্তু তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। তখন হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগ। সেই হইতে এই ৪৪ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি কাব্য-মালঞ্চের নিরালা কোণে বসিয়া বীণাপাণির বীণার একটি কোমল করুণ তারে করস্পর্শ করিয়া এক সুমধুর রাগিণী গাহিয়া আসিতেছেন। মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেও শেষ বয়সে 'দীপ ও ধূপ' ও 'জীবনের পথে' কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বতন যশ ও খ্যাতি দৃঢ়তর ও অধিক সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তোলেন।

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যুগের পর রবীন্দ্র যুগ। সে এক অদ্ভুত যুগসন্ধিক্ষণ। মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু, ও বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলাভাষায় এক কৃত্রিমতার যুগ আসিয়া পড়ে। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র এই কৃত্রিম যুগের কবি। বিশ্বসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাই কাব্য-সমৃদ্ধ যুগের পরই আসে কৃত্রিমতার যুগ। ইংলণ্ডের এলিজাবেথান যুগের পর আসিয়াছিল পোপ-ড্রাইডেনের কৃত্রিম যুগ, রোমাণ্টিক যুগের পর আসিয়াছিল অর্দ্ধ-কৃত্রিম ভিক্টোরিয়ান যুগ। ফ্রান্সেও Moliere, Corneilleর পর তেমন আর সাহিত্যিক দেখা দেয় নাই, বহুদিন পরে আবার ভিক্টর হিউগো, ডুমা প্রভৃতি বিপুল প্রতিভাসম্পন্ন লেখক দেখা দেয়। স্পেনেও তাই; Cervantes ও Lope de Vegaর পর আসে অচল কৃত্রিমতার যুগ, সে যুগে Luis de Carrillo, Gongora, Gomez প্রভৃতি লেখকেরা তখনকার দিনে বেশ নাম করিলেও এখন আর তাদের কোন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা নাই। তেমনি আমাদের বাংলাসাহিত্যেও বিহারীলাল প্রমুখ নবীন কবিগণ এক অভিনব সুর তুলিয়া কাব্য-মালঞ্চ ঝঙ্কৃত করিয়া তোলেন। কামিনীরায়ও সেই যুগসন্ধিক্ষণের একজন। এই যুগের প্রায় সমস্ত কবির কাব্য-প্রতিভা রবীন্দ্র প্রভাবে অল্প বিস্তর চঞ্চল হইয়াছে, হয় নাই শুধু কামিনী রায়ের ও আর একজন কবির—তিনি স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।

কামিনী রায়ের কবিতার মধ্যে একটি বিনম্র বৈশিষ্ট্য আছে। কবিতাগুলি তাঁহার একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত জীবনের সুসম্বদ্ধ অনুভূতির প্রকাশ মাত্র। তাঁহার কবিতার প্রধান গুণ এই যে তিনি মনে প্রাণে যা অনুভব করিয়াছেন তাহাই সুষ্ঠু সবল ও সহজ ছন্দোবন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় কোন অযথা আড়ম্বর নাই, ভাবের একঘেয়েমি নাই, মিথ্যা কথা ও ছন্দের বিলাস-বিভলতা নাই। মর্ম্মে মর্ম্মে যে ভাব যে প্রেরণা পাইয়াছেন, সহজ কথায় ও সোজা ভাষায় তাহাই রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কবি হেমচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই কবিতাগুলি আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীরভাবে পরিপূর্ণ যে পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ কবিতা আমি অল্পই পাঠ করিয়াছি। * * * বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ করিয়াছি। আর, বলিতেই বা কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" নবীন লেখকদের একটা প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠ লেখকের কাছ

হইতে কাব্যজগতে পরিচয় পত্র স্বরূপ স্বীয় স্বীয় পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া লইয়া থাকেন। কামিনী রায়ও হয়ত এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না। সত্যিকারের প্রতিভা কারো পৃষ্ঠপোষকতার অপেক্ষা রাখে না বটে, কিন্তু কাব্যজগতে মাঝে মাঝে তাহার প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথকেও এককালে Yeatsএর নিকট হইতে ভূমিকা লিখিয়া লইতে হইয়াছিল।

সৌন্দর্য্যের প্রধান কাব্য-পূজারী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন কামিনী রায়ের কবিতা পাঠ করিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে তিনি তাহার "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" নামক কাব্যগ্রন্থে লিখিয়াছিলেন "স্ত্রীকণ্ঠে এমন সুন্দর সঙ্গীত খুব কমই শুনিয়াছি।" শ্রদ্ধার অর্ঘ্য স্বরূপ "যমুনা" নামক একটি কবিতা লিখিয়া কবির করকমলে উপহার করেন। তাহার শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি—

হে সুন্দরি! ওকি ওই যমুনা বহিছে?
তোমারি কবিতা ও যে গাহিয়া চলেছে!

বাস্তবিকই এই সহজ সাবলীল আন্তরিকতাই কামিনী রায়ের কবিতার প্রধান গুণ।

পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই কামিনী রায় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন ও আট বৎসর বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। শুনিয়াছি কবি ঈশ্বর গুপ্তও খুব শিশুকাল হইতেই মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতেন। যাই হোক্, কামিনী রায়ের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাও ছিল খুব প্রখর। ষোড়শ বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ হন ও কুড়ি বৎসর বয়সেই B. A. উপাধি লাভ করেন। এখন মেয়েদের B.A., M.A., পাশ করা নিতান্ত সহজলভ্য হইয়াছে, কিন্তু তখনকার সেই নূতন যুগে নানা বাধাবিঘ্ন ও কুসংস্কার অতিক্রম করিয়া স্ত্রীলোকের পরীক্ষা পাশ করা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'আলো ও ছায়া' প্রথম প্রকাশিত হয়, কবির বয়স তখন পঁচিশ বৎসর, কিন্তু গ্রন্থের বেশীর ভাগ কবিতাই বহু পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল। 'আলো ও ছায়া' বাংলা সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। এমন সুন্দর সুললিত ছন্দ-মাধুর্য্য, এমন সুষ্ঠু সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গী, ভাবের এমন অনবদ্য সুষমা, প্রথম যৌবনের আশা, সন্দেহ, নূতন বাসনা, নবীন জীবনের নব নব অভিজ্ঞতা যেরূপ সহজ প্রকাশ লাভ করিয়াছে, পরবর্ত্তী আর কোন গ্রন্থে তেমন হয় নাই। এই জন্যই কবিতাগুলি পাঠকদের নিকট হইতে বেশী সমাদর লাভ করিয়াছে। 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যে'র কবিতাগুলি অনেক বেশী সংযত। জীবনের অনেক গভীরতর ভাব ও সত্য সেই সব কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু 'আলো ও ছায়া'র কবিতাগুলি যেমন প্রাণবন্ত ও ভাবের প্রাচুর্য্য ও প্রাখর্য্যে পরিপূর্ণ তেমন আর পরবর্ত্তী কোন গ্রন্থ নহে। আলো ও ছায়ার কবিতাগুলি প্রধানতঃ দুই ধারায় বিভক্ত হইয়াছে—একটির গতিপ্রকৃতি মানব-জীবন সম্বন্ধে, অপরটি মুখ্যতঃ প্রেমাত্মক। প্রথম বিভাগের কবিতাগুলিতে কোন অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বা উল্লাসময় উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্বগুলি সোজা কথায় নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একবার বলিতেছেন, জীবন ক্ষণস্থায়ী,

আঁধারের কীটাণু আমরা,
দুদণ্ড আঁধারে করি খেলা,
অন্ধকারে ভেঙ্গে যায় হাট,
জীবন ও মরণের মেলা।
কোথা হতে আসে, কোথা যায়,
ভাবিয়া না কেহ কিছু পায়,
অজ্ঞানেতে জনম মরণ
বিস্ময়েতে জীবন কাটায়।

জীবনের এই বিস্ময়—সে যেন একটা রহস্য! কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তা নির্ণয় করা শক্ত, তাই পরমুহূর্ত্তেই আবার গাহিতেছেন,

আমরা ত আলোকের শিশু,
আলোকেতে কি অনন্ত মেলা!
আলোকেতে স্বপ্ন জাগরণ,
জীবন ও মরণের খেলা।
অনন্ত এ আলোকের মাঝে
আপনারে হারাইয়া যাই,
দুঃসহ এ জ্যোতির মাঝারে
অন্ধবৎ ঘুরিয়া বেড়াই।

কবি যত মনে করেন জীবনের এই অস্পষ্ট রহস্যময় প্রশ্ন তুলিবেন না, ততই নানা প্রশ্ন আসিয়া পড়ে ;

"জীবন কিসের তরে ?" কেঁদে জিজ্ঞাসিছে প্রাণ,
নীরব কল্পনা আজি, করে না উত্তর দান।
যত চাহি ভুলিবারে, জীবন কিসের তরে,
নারিনু ভুলিতে কথা, ফিরে ফিরে মনে হয়।

তাঁর অল্প বয়সের লেখা 'সুখ' কবিতাটি কি সুন্দর ! 'দিন চলে যায়', 'থাম্ অশ্রু থাম্', 'সন্ধ্যাতারা', 'নূতন আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি কবিতাগুলি নীড়-প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত ক্লান্ত ও ভীরু। জীবন সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্ন ও সন্দেহছায়ায় কবিতাগুলি বেপমান। কবির তখন নবীন বয়স, নবীন যৌবন। যৌবনের শত আকাঙ্ক্ষা, শত আশা নিরাশা এই কবিতাগুলির প্রাণ,

একে একে একে হায়, দিনগুলি চলে যায়,
কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়,
সাগরে বুদ্‌বুদ্ মত, উন্মত্ত বাসনা যত
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,
আর দিন চলে যায়।

কিন্তু যৌবনের আবিল আসক্তি, চটুলতা বা অসংলগ্নতা কোথাও স্থান পায় নাই। যৌবন স্বভাবতই দুঃখবাদী ও ব্যথা-সংক্রামক, তখন মনে প্রাণে নির্জ্জনতার প্রলেপ, নিঃসঙ্গতার ব্যথা, তিতিক্ষার আবেশ লাগিয়া থাকে।

কেহ কাছে নাহি আপনার,
মুখ তুলে যার পানে চাই,
শূন্য শূন্য শূন্য চারিধার,
একলাটি পথ চলে যাই।

এই বিপুল নিঃসঙ্গতা বোধ যৌবনের প্রথম ও প্রধান ধর্ম্ম। প্রেম-পিয়াসী প্রণয়-সন্ধানী নারীমনের এমন স্পষ্ট অথচ সুমার্জ্জিত অভিজ্ঞতা আমাদের বাংলা সাহিত্যে এক রাধারাণী দত্তের কবিতা ছাড়া আর কোথাও পাই না। আর পাই ইংরাজ স্ত্রীকবি Laurence Hope এর কবিতায়। তাঁহার একটি কবিতা পড়ুন

Your beauty puts a barb into my soul,
Strive as I will it never lets me go;
My love has passed the frontiers of control,
You are so fair and I desire you so.
Others may come and go, they are to me
But changing mirage, transient, untrue,
My faithlessness is but fidelity
Since I am never faithful, but to you.
You are not kind to me, but many are
And all their kindness does not make them dear;
It may be you deceive me when afar
Even as always you torment me near.
Yet is your beauty so divine a thing,
So irreplaceable, so haunting sweet
Against all reason, I am fain to fling
My life, my youth, myself, beneath your feet.

এই ইংরাজ কবির সঙ্গে কামিনী রায়ের যেন একটি অপূর্ব্ব আত্মীয়তা আছে। এখানে কবির একটিমাত্র কবিতার উল্লেখ করিব, সেটি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'যৌবন-তপস্যা'। জীবনের সারভাগ যৌবন, দেহের যৌবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মনের যৌবন অক্ষয় ও অন্তহীন।

দীনহীন, এ জগতে হারাবার কিছু নাই,
তবু, কাল হে ভীষণ, এক বড় ভয় পাই,
এক যাহা আছে মোর অতি যতনের ধন,
জীবনের সারভাগ, কাল, আমার যৌবন
কভু, কভু নাহি যেন যায়।

সরল এ দেহযষ্টি সবলে আঘাতি যাও,
উজ্জ্বল লোচনোপরি কুজ্ঝটি বাঁধিয়ে দাও,
শুভ্র হোক্ কেশরাজি—এ সকলে নাহি ডরি,
বাহিরের যত চাও একে একে লহ হরি,
অন্তঃপুরে ক'র না গমন।

জীবনের অবসান হোক্ যেই দিন হয়,
যাবৎ জীবন আছে যৌবন যেন গো রয়,
নহিলে, যৌবন যাবে, জীবন পশ্চাতে রবে,
বল দেখি, বল দেখি, সে মোর কেমন হবে ?
রহিবে না আশা অভিলাষ।

আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে ক্ষয় জীবন-বসন্ত মোর ;
জীবনের অবসান হোক্ যেই দিন হবে,
যাবৎ জীবন মম তাবৎ যৌবন রবে,
এই আমি করিয়াছি পণ।

যৌবনের জন্য কবির এই আপ্রাণ সাধনা, তাই তাঁর কবিতার মধ্যে এত বেশী বেদনার আনন্দ ও আনন্দের বেদনা দেখিতে

পাই। পুরুষ বলে রমণীর মন পুরুষের অজ্ঞাত; কিন্তু রমণী তাহা স্বীকার করে না, তার অভিযোগ নারীর মন পুরুষের হেলার বস্তু। নারী ও পুরুষের প্রেমের তারতম্য সম্বন্ধে কবি অনেক কবিতাই অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরাজ স্ত্রীকবি Laurence Hopeএর সঙ্গে আমাদের কবির একটি শালীন শোভন আত্মীয়তা আছে। এ সম্বন্ধে তিনি এমন সুন্দর ও মাধুর্য্যময় একটি কবিতা লিখিয়াছেন যে তার কিছু না তুলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছিনা—

Rarely men understand our way of love,
How that to women in their wedding hours
Lover and priest and king are blent in one,
Hence the awed worship of these hearts of ours.
At times love for a little lifts the veil,
And men and women see each other's heart,
But swiftly passion comes, obscuring all,
And thus the nearing souls are swept apart.
To us love is a sacred rite; to men
Custom, perhaps affection, or desire.
Before we hold our lovers in our arms
They are too fiercely amorous to inquire.

নারী মনের এই চিরন্তন ক্রন্দনের কথা কয়জন সহজে ব্যক্ত করিতে পারে? নারীর প্রেম কিরূপ—

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ সেথায়।

অথবা—

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব বধুটির মত,
ভালবাসা মৃদুপদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কানে, আপনার মৃদু গীত,
সরমে আকুল হ'য়ে মরে সে তখন।

নারীর ভালোবাসার ইতিহাস এইরূপ। পুরুষের প্রেম অসার শব্দ মাত্র, কামনার প্রতিকল্প। তাহার প্রেম ও প্রণয়ের প্রথম উচ্ছ্বাস অতি শীঘ্রই লালসার আবিল পঙ্কে পর্য্যবসিত হয়। নারী জীবনে কেবল একটিমাত্র পুরুষকে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু পুরুষের মন কখনই একটি নারীর মোহে চিরকাল আকৃষ্ট থাকিতে পারে না। 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যে'র দুটি মাত্র কবিতার এখানে উল্লেখ করিব। প্রথমটি

মোরে প্রিয় কর না জিজ্ঞাসা,
সুখে আমি আছি কি না আছি।
ভরি আমি রসনার ভাষা,
দোঁহে যবে এত কাছাকাছি,
মাঝখানে ভাষা কেন চাই,
বুঝাবার আর কিছু নাই?

হাত মোর বাঁধা তব হাতে,
শ্রান্ত শির তব স্কন্ধোপরি,
জানি না এ সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাতে
অশ্রু কেন ওঠে আঁখি ভরি।
দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়,
এইটুকু জানিও নিশ্চয়।

নারীর পবিত্র একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে সদাই সন্দেহ, সদাই আশঙ্কা, কারণ পুরুষের প্রেম নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর, তাই এই নিবিড় মিলনের মাঝেও তার চোখে অশ্রু উথ্‌লাইয়া ওঠে। দ্বিতীয় কবিতাটি বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল মণি বিশেষ। কবিতাটীর নাম 'নিরুপায়'—

প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,
যত রুক্ষ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়;
সব জানি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে, মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।
তুমি পতি, তুমি প্রভু; মন, মান, মম
সকলি তোমার হাতে; দল যদি হায়,
এই রমণীর মন, তাহা, প্রিয়তম,
তোমারি চরণপ্রান্তে লুটাবে ধরায়।
করি যদি অপরাধ, তার যথোচিত
বিধান তোমারি কাছে; তোমার উপরে
কেহ নাই, যার দ্বারে হব উপনীত
তব অবিচার হতে বিচারের তরে।
তোমারে দুষি না, মোর নিয়তির দোষ,
কেমনে বুঝিব আমি কিসে যে কি হয়,
এককালে যে আলাপে লভিতে সন্তোষ,
আজ তার প্রতি বর্ণ লাগে বিষময়।

* * *

তবে যদি নিত্য দৃষ্টি, নিত্য সহবাস
চক্ষে এনে দেয় তৃপ্তি, হৃদয়ে বিরাগ,
আমি তার কি করিব? আমি বার মাস
তোমার পিঞ্জরে পাখী, ওহে মহাভাগ।

আগে কিছু চাহ নাই আমা ব্যতিরেকে,
ভেবেছিনু মোরে লভি ঘুচিবে বেদন,—
মিথ্যা আশা,—আকাঙ্ক্ষিত লভি একে একে,
নূতন অভাব স্মরি করিছ রোদন।
আগে মোরে বরেছিলে হৃদয়ের রাণী,
আমারি সেবক হতে ছিল তব সাধ,
আজ শত কর্ত্তব্যের মাঝখানে আনি,
গুণিতেছ মোর ভ্রান্তি, ত্রুটি অপরাধ!

এমন স্পষ্টব্যক্ত সরল কবিতা ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যেও পড়ি নাই। কুমারী মনের প্রেমের প্রথম বিকাশের কথা, সব্রীড় নব জাগরণের স্বপ্ন কবি অতি সুন্দরভাবে অনেক কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও অনাবৃত রূঢ় বাস্তবতার আমল দেন নাই। কুমারী মনের প্রথম প্রণয়োপলব্ধি—সে এক অতি বিস্ময়ের বস্তু। সে আনন্দ, সে বেদনা, সে রোমাঞ্চ পুরুষে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

একদিন—আজীবন স্মরণীয় একদিন—
পথভ্রান্ত মরুস্থলে, তাপদগ্ধ, সঙ্গীহীন,
অবসন্ন ভূমিতলে ঢালিতেছি অশ্রুধার,
ভাবিতেছি হেথা কেহ নাহি মোর আপনার;
সেই দিন, কোথা হতে কে পথিক সহৃদয়
সস্নেহে ডাকিল কাছে, হয়ে গেল পরিচয়!
কিসের ভিখারী যেন ভ্রমিতাম শূন্য প্রাণে,
বুঝিলে অভাব যবে চাহিলে এ মুখপানে।"

যেখানেই প্রণয়ের অমিত আবেগ, সেখানেই নিরাশা ও ব্যর্থতার অভাবনীয় সমাবেশ। 'প্রণয়ে ব্যথা' নামক কবিতায় এই ভাবটি অল্প কথায় অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে?
কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্রুধার?
কেন কণ্টকের স্তূপ প্রণয়ের পথে?

প্রেমময়ী নারী,—সে যেন স্বর্গলোকের দেবীর সমান,

পাষাণের প্রতিমাটি যবে,
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তব পারে না কি তবে,
দেবী হ'তে বিধাতার বরে?

'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' দুখানি খণ্ড কাব্য। দুটি কবিতাই চমৎকার, তার উপর অমিতাক্ষর ছন্দে অমন সুন্দর কবিতা অনেক বড় কবিও লিখিতে পারেন না। গল্পের মধ্যে এমন সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনা ও প্রথম প্রেমের অনাবিল মাধুর্য্যের এমন সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে পাঠ না করিলে কেবল আংশিক মাত্র তুলিয়া তাহা বোঝানো যায় না।

বালিকা আছিনু আমি—হৃদয় আমার
কলিকা প্রস্ফুট পুষ্প এ দুয়ের মাঝে,
এক রতি আলো কিম্বা ঈষৎ সমীরে,
আজ কিবা কাল যেই উঠিবে ফুটিয়া,
হেন কুসুমের মত—লালিত যতনে।
একদিন সখী লয়ে জননীর সাথে,
অচ্ছোদের স্বচ্ছ জলে করিবারে স্নান,
চলিলাম গৃহ হতে।......

* * * *

দুই পদ হ'তে অগ্রসর
কি এক সৌরভে পূর্ণ হল দিক্ দশ।
চাহিলাম চারিভিতে; দক্ষিণে আমার
দেখিলাম দুটি দিব্য ঋষির কুমার,
শুভ্রবেশ, আম্র কেশ, অক্ষমালা হাতে।
যে জন তরুণতর, কর্ণোপরি তার
অপূর্ব্ব কুসুম এক, সৌরভে শোভায়
অতুলন, দেখি নাই জীবনে তেমন।
এক দৃষ্টে চেয়ে আছি কুসুমের পানে,
কিম্বা সে কুসুমধারি লাবণ্যের ভূমি
মুখপানে—এক দৃষ্টে আপনা বিস্মৃত—
কতক্ষণ ছিনু হেন না পারি বলিতে।

* * * *

ফিরিলাম গৃহে। এক নূতন বিষাদ
সুখের জীবন মম করিল আঁধার।

প্রভৃতি চিত্রগুলি অপূর্ব্ব সুন্দর।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কবির "পৌরাণিকী" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের "ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ", 'রামের প্রতি অহল্যা' কবিতাগুলি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। শিল্পীর আল্পনার মত এই আলেখ্যগুলি সুন্দর ও সুপরিস্ফুট। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে কবির মাথার উপর দিয়া একটানা শোকের ঝড় বহিতে থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটি সন্তানের মৃত্যু হয়; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়, তারপর বয়স্কা কন্যা লীলা ও বয়স্ক পুত্র অশোকের মৃত্যু হয়। এতগুলি মৃত্যুর শোকে কবি একেবারে ভাঙিয়া পড়েন। কবি যে কি দারুণ শোক পাইয়াছিলেন তাহার আভাস আমরা পাই তাঁহার 'অশোক-সঙ্গীত' ও 'জীবনের পথে' কাব্যগ্রন্থে।

কবির নাট্য-কাব্য 'অম্বা' ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও, লেখা হইয়াছিল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। স্কুল কলেজে ইহা সাফল্যের সহিত বহুবার অভিনীত হইয়াছে। মহাভারতের অম্বা আর কবির এই অভিনব অম্বা চিত্র এক নহে। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরুষ নহে, কাপুরুষ নহে, তদপেক্ষাও হীনতর কিছু মনে হয়। সেইদিন বেচারার প্রতি তাঁহাদের ঘন ঘৃণা-

শরধারা-সম্পাত দেখিয়া আমার বড়ই করুণার সঞ্চার হইল। সহসা শিখণ্ডীর কাপুরুষ মূর্ত্তির পার্শ্বে ধিক্কৃতা, বিকৃতকান্তি, নিজ-তেজসা-দহ্যমানা অম্বার মহীয়সী রমণীমূর্ত্তি স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। এই আমার ছবির জন্ম-বৃত্তান্ত।"

এইবার তাঁহার আর দুইখানি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব—তাহাদের একখানির নাম 'দীপ ও ধূপ', অপরখানি 'জীবন-পথে'। দুখানিই অতি উৎকৃষ্ট কবিতার বহি। দুটী গ্রন্থই যে বাংলা কাব্য-সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল শুকতারার মত চিরদিন অপরিম্লান থাকিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'দীপ ও ধূপ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, 'জীবন পথে' ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। বঙ্গ-সরস্বতীর কমলবনে এ দুটী তাঁর শেষদান। গ্রন্থের ভূমিকায় প্রকাশক লিখিয়াছেন "নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নে নষ্টপ্রায়, বিভিন্ন সময়ের লিখিত, বিভিন্ন ভাবের কতকগুলি কবিতা দীপ ও ধূপ নামে প্রকাশিত হইল। নানা কারণে সঙ্কলন কার্য্যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। রচনা কালের ক্রমানুসারে অথবা বিষয় অনুসারে কবিতাগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তারিখ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থানে অনবধানতা বশতঃ তাহা মুদ্রিত হয় নাই; মুদ্রণের পূর্ব্বে সংগৃহীত কবিতা হইতে নির্ব্বাচনের ও কোন চেষ্টা হয় নাই। শেষোক্ত বিষয়ে কবি স্বয়ং নিরুৎসক ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে এখন মন দিতে পারিতেছি না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহুদিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দামের কথা ভাবে না, অন্ততঃ কিছুদিন কাজে আসিবে বা ভাল লাগিবে এই মনে করিয়াই খুসী হয়, আমার এই কবিতাগুলি ও সেই ভাবেই দিয়া আমি খুসী।......সকল কবিতাগুলির মধ্যেই তাঁহার অনুরাগী পাঠক তেল-সলিতার সেকেলে প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো ও ধূপ ধুনার মৃদুগন্ধ পাইবেন আশা করা যায়। যেখানে ধূপের গন্ধ উঠিয়া গিয়াছে, সেখানেও বোধ হয় কিঞ্চিৎ আলোকের অভাব ঘটিবে না।" আমরা কিন্তু এই পুস্তকে আগাগোড়াই ধূপের সুরভিত গন্ধ ও দীপের প্রদীপ্ত আলোকের সন্ধান পাইয়াছি। প্রথম কবিতা হইতেই কবির অন্তর্লোকের কাব্য-প্রেরণার আভাস পাওয়া যায়।

সন্ধ্যা নামে, ওগো কুটীরবাসিনি,
ত্বরায় তোমার প্রদীপ জ্বালো,
তব সদনের সম্মুখের পথে
পড়ুক তা হতে একটু আলো।

ধুনাচি তোমার আগুনে ভরিয়া
খোলা দরজার আড়ালে রেখে
ঢালো তাহে ধূপ, দিক্ তার ধূঁয়া—
বাহিরে বায়ুরে সুবাস মেখে।

শেষ বয়সের লিখিত এই কবিতাগুলি অধিকতর সুসংযত ও সুমার্জ্জিত। এখানে 'আলো ও ছায়া'র ভাবের অপ্রতিহত উচ্ছ্বাস নাই, অসঙ্কোচ স্পষ্টবাদিতা নাই, 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যে'র প্রণয় অভিমানের মন্থর অবকাশ নাই। কবি জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, অনেক শোক দুঃখের ঝড় সহ্য করিয়াছেন, তাই তিনি কোন কথাই স্পষ্ট ও নির্ভীক কণ্ঠে বলিতে পারেন না। প্রতি কবিতায় কিসের যেন ভয়, কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কণ্ঠে মোর নাহি ফোটে সুর,
বীণা হাতে বাজে না মধুর,
কি দিয়া তুষিব সবে,
কি কাজে লাগিব ভবে,
এ শোচনা কর প্রভু দূর।

এমনি শ্রান্ত একটী অবসাদ, করুণ একটী হতাশা, পবিত্র একটী আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবির এখন অনেক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইয়াছে। বাহিরের জগতে যেন এতদিন বীতস্পৃহ ছিলেন, বাহিরের জীবন থেকে যেন এতদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এত দিন কবি নিজের হৃদয়-নিহত ভাবেই মগ্ন ছিলেন, নিজের সুখ দুঃখের কথা, মিলন বিরহের কথা বলিয়া আসিয়াছেন। এই গ্রন্থে প্রথম তাঁহার স্বজাতিপ্রেম ও স্বজাতিবাৎসল্যের সন্ধান পাই। অবশ্য আলো ও ছায়াতে 'আশার স্বপন' ও 'মা আমার, মা আমার' প্রভৃতি কবিতাগুলিও দেশপ্রীতি-মূলক, কিন্তু স্বদেশ-ভাব তাহাতে খুব বেশী পরিষ্কার পরিস্ফুট হইয়া ওঠে নাই। এই প্রথম কবি গাহিতেছেন.

এ বিপুল বিচিত্র সংসারে
সার্থক করিব আপনারে।
আসি নাই এ জগতে,
আর কারো মত হতে,
এ কথা স্মরিব বারে বারে।

এখন তিনি আপনাকে ছাড়িয়া আর দশ জনের দিকে চাহিতে পারিয়াছেন। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, কর্ম্মী শ্রমিক সকলেই এখন তাঁহার আত্মীয়। 'অমৃতের পথে' কবিতাটি পাঠ করুন।

কেহ লেখে, কেহ খোদে, প্রাসাদ নির্ম্মায়,
খাটে কেহ ঘাটে বাটে, মোট বহি খায়,
কুম্ভকার, সূত্রধর, কামার, চামার,
মাঝি, মাল্লা, তাঁতি, জোলা, সবাই আমার।

নমস্ত, সবাই মোরে কিছু করে দান,
সুখ দেয়, দুঃখ হতে করে পরিত্রাণ।
সবারে চিনি না, তবু দানের বন্ধনে
বাঁধা আছি নানা দিকে সকলের সনে।
আমি এই ধনধান্যময়ী পৃথিবীতে
আজন্ম ভিখারী রব ভিক্ষা কুড়াইতে?
এ বিশ্বের ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যের মাঝে
বেড়াব আলস্য সুখে, লাগিব না কাজে?
অবিচার, অত্যাচার, দারিদ্র্য যথায়,
অজ্ঞান, অধর্ম্ম করে দাসত্ব প্রথায়
কঠিন শৃঙ্খলে দৃঢ়, মনুষ্যত্ব মোর
জাগিবে না ভাঙ্গিতে সে দাসত্ব কঠোর
বজ্র হস্তে? দেহে রক্ত ছুটিবে না ধেয়ে
মেলি আঁখি চিত্রমূর্ত্তি শুধু রব চেয়ে?

এইরূপ যুগপ্রভাত, জাগরণী সঙ্গীত, নব জাগরণ, দুর্ব্বলের ক্রন্দন, ওরা তোরা ভবিষ্যতের দল, তাঁহারি জয় হোক, মুক্তবন্দী, সত্যাগ্রাহী, এরা যদি জানে, সেবাধর্ম্ম, তারকেশ্বরীয়, সহযোগ, বিপথ, ধরায় দেবতা চাহি, প্রভৃতি কবিতাগুলি স্বজাতিবাৎসল্য ও দেশপ্রীতিমূলক আন্তরিকতার সুরে পরিপূর্ণ। অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য ভারতের জননায়ক আজ বদ্ধপরিকর। তাঁহার সেই বাণী কবি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁর 'এরা যদি জাগে' নামক বিখ্যাত কবিতায়।

১। এদেরও গড়েছেন নিজে ভগবান
নবরূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে, স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে,
বিঁধে শল্য সম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ এরা মায়ের সন্তান।

২। এরা যদি আপনারে শেখে সম্মানিতে,
এর দেশ-ভক্তরূপে জন্মভূমি হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম্ম, বাক্য নহে,—দিবে কর্ম্ম;
আলস্য বিলাস আজো ইহাদের চিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে।

৩। এরা হতে পারে দ্বিজ—যদি এরা জানে,
এরা কি সম্ভবে সরি রহে ব্যবধানে?
এরা হতে পারে বীর, এরা দিতে পারে শির
জননীর, ভগিনির, পত্নীর সম্মানে;
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে।—
যদি এরা জানে।

ঠাকুরমার চিঠি, নাতিনীর জবাব, নাতবৌ'য়ের জবাব কবিতাগুলি এমন নির্দ্দোষ রঙ্গ ও পরিহাস-উজ্জ্বল; দীঘির-পাকে, গাঙ্ যে মোরে বোলায়, এমন করুণ মর্ম্মস্পর্শী যে সঙ্ক্ষেপে তাহাদের কথা না বলাই ভালো।

"জীবনের পথে" একখানি অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ। অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" ছাড়া বাঙ্গালা সাহিত্যে এর জুড়ি নাই। বিষয়বস্তু অন্য হইলেও 'জীবন পথে' গ্রন্থখানি বিশ্ব-সাহিত্যের আর তিনটি গ্রন্থের সহিত তুলনীয় হইতে পারে—মহাকবি দান্তের 'La Vita Nuova', রসেটির 'House of Life' ও টেনিসনের 'In Memoriam'। চারিটী কাব্যগ্রন্থেই একটি চিত্তের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন ভাববিপর্য্যয় দেখিতে পাই। অনুভূতির আত্মীয়তায় চারিটী গ্রন্থই একই সূত্রে আবদ্ধ। কামিনীরায়ের সব পুস্তকগুলির মধ্যে এই গ্রন্থখানিই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাগিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহা খণ্ড কবিতার সমষ্টি নহে; একটি ব্যর্থ জীবনের স্বচ্ছ সরল অনুভূতির আত্ম-ইতিহাস ও একটি করুণ সুরের অনাবিল স্রোতে সমস্ত গ্রন্থখানি বেপমান। প্রতি সনেটেই বাজিয়া উঠিয়াছে করুণ একটি নিঃসঙ্গতা, মুহ্যমান একটি নির্জ্জনতা, নিবিড় একটি হতাশা ও পুনর্মিলনের জন্য পবিত্র একটী আকাঙ্ক্ষা। বিষয় বস্তু এক হইলেও গ্রন্থখানিতে কোথাও ভাবের পুনরুক্তি নাই। নিবেদনে প্রকাশক লিখিয়াছেন "কবির অপ্রকাশিত সনেটগুলি জীবন পথে নামে প্রকাশিত হইল। ইহার অল্প কয়েকটি ব্যতীত আর সমস্তই অনেক বৎসর পূর্ব্বের রচনা এবং রচয়িত্রীর স্মৃতিপুস্তকের গোটাকতক ছিন্ন পত্রেরই অনুরূপ। সেইজন্যই এগুলি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়, তিনি বহুদিন এরূপ ইচ্ছা করেন নাই। সাহিত্যরসিক দুই তিনটি বন্ধু ও নিতান্ত আপনার কয়েকটি আত্মীয় ভিন্ন এগুলির অস্তিত্বও কেহ জানেন নাই।" সনেটগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—সহযাত্রা, একলা, ঝরাফুল। কবি যদি নিজেকে অকৃত্রিমভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন তবেই তাঁর কবিতা লেখা সার্থক। জীবনপথে গ্রন্থখানিও এই হিসাবে সার্থক। সুনিবিড় দুঃখ ও অশ্রুর মাদকতায় কাব্যখানি পরিপূর্ণ। এখানি যেন তাঁর দাম্পত্য জীবন-চরিত। দাম্পত্য জীবনের সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ, মান অভিমান, মৃত্যু-শোক বিভিন্ন সনেটগুলিতে সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম কয়েকটি সনেটে বিবাহের পূর্ব্বে কবির কুমারী অবস্থা ও পরে প্রেম-সমাহিত তরুণ জীবনের কি সুন্দর ছবি দেখিতে পাই—

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন্ ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে?—
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণ তলে
তোমার সর্ব্বস্ব? শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু; দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে।

অথবা,

দূর হ'তে যবে মোরে ভালবাসা দিতে,
বলেছি সহস্রবার,—করি না প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি : কভু নাহি সয়
নর ভাগ্যে এত সুধা।—কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত চিতে
ফিরায়ে দিতাম তোমা।

পুরুষের একনিষ্ঠতায় নারীর মন চিরসংশয়মান, তাই নারী বলিতেছে,

পিপাসিত তুমি যার তরে, সে প্রণয়
আমি কি পারিব দিতে মিটায়ে পিয়াস ?
পারিব কি চিরদিন ধরি এক পথ
চলিবারে একসাথ সদা নিঃসংশয় ?
জাগিবে না চিত্তে তব নব অভিলাষ
পূর্ণ হলে আজিকার এই মনোরথ ?

নারীর এই সংশয়-দোদুল প্রশ্নে পুরুষের মন-মাতানো উত্তর দিতে কথনো অভাব হয় না।

কহিলে—প্রণয়ে মোর করগো প্রত্যয় ;
বারবার প্রত্যাখ্যাত, আসি বার বার ;
সকল আশার মম, সর্ব্ব কামনার
সিদ্ধি তব প্রেমলাভ, জানিও নিশ্চয়।
তোমার হৃদয়ে প্রেম নাও যদি রয়,
আমার এ প্রেম গিয়া করিবে সঞ্চার
তোমাতে কনকশিখা ; সুন্দর সংসার
হেরিবে সুন্দরতর, গীতি প্রীতি-ময়।

নারী তখন নিঃসংশয়ে নিজেকে অর্পণ করিল ; পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের তৃপ্তিতে ও আনন্দের বেদনায় চোখের দৃষ্টি তার গভীর হইয়া উঠিল ;

কহিনু—সার্থক হউক তোমার প্রণয়।
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও,
আমাতে যা আছে যদি তাই শুধু চাও,
তোমার অতৃপ্তি, মোর অপূণ্য না হয়,
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পার তা'ও
করগো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে, হোক্ তব জয়।

নারী সমস্ত ভার বহিতে পারে, পারে না শুধু নিজ প্রেম-ভারাতুর হৃদয়ভার। তার তরুণ হৃদয়ের পূজা নিবেদন উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতে না পারিলে তার নারীজীবনের সার্থকতা কোথায় ?

বহু ভার বহে নারী বহু কষ্ট সহে,
কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও।

কি সুন্দর ! কিন্তু প্রেমের সুখস্বপ্ন কতক্ষণ ?

হাতে রহিয়াছে হাত, শিথিল বন্ধন,
কণ্ঠের মালতীমালা ক্ষীণগন্ধ, ম্লান;
সহসা থামিয়া গেছে অসমাপ্ত গান,
নয়নে জমিছে মেঘ, ভেঙ্গে আসে মন ;—
এ কি স্বপ্ন শেষ, কিবা এ কি দুঃস্বপন ?
জীবনের বসন্ত কি হল অবসান ?

নারী তখন অপূর্ব্ব আত্মত্যাগে, পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনে মহীয়সী হইয়া ওঠে ;

কি আর কহিব আমি, যদি অবসান
হয়েছে প্রেমের তব। জানেন ঈশ্বর
তোমারেই করেছিনু একান্ত নির্ভর ;
অসীম বিশ্বাস ভরে দেহ, মন, প্রাণ,
বরমাল্য সনে তোমা করিয়াছি দান।
আমা হ'তে আর কিছু আছে প্রিয়তর—
হ'তে পারে—হেন তথ্য ছিল না গোচর।
হায়রে অতীতে আজ হাসে বর্ত্তমান !

তারপর ? তারপর মৃত্যু আসিয়া সহযাত্রীকে ছিনাইয়া লইল, কবি তখন জীবন পথে একলা। মৃত্যু এখন কবির কাছে অপূর্ব্ব সুন্দর। মৃত্যু মাধুরীতে কবির সমস্ত জীবন রঙীন হইয়া উঠিয়াছে, তাই মরণ পারে থাকিয়াও সাথী এখন কবির নিত্য সহচর। পুস্তকের সমস্ত সনেটগুলিই যে কি মধুর, কি সুন্দর তাহা সমস্ত না পড়িলে বোঝানো যায় না। গোধূলির বিদায় বেদনায় ও করুণ পূরবী সুরে কবিতাগুলি অশ্রু-আচ্ছন্ন ও ব্যথা-ঘনীভূত। প্রাণের সমস্ত মমতা, আত্মার নিবিড় নিঃসঙ্গতা দিয়া কবিতাগুলি লিখিত। পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনও মধুর এক বেদনায় ব্যথা-ভারাতুর হইয়া ওঠে।

কামিনী রায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য যে বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার কবিতায় যে সহজ ও আন্তরিক সুরের বিনম্র সমারোহ আছে তাহা চিরদিন পাঠকের মনকে মুগ্ধ করিবে। সমস্ত কবিতাই বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার উপর লিখিত, অথচ বাস্তব জীবনের তাড়নায় কল্পনা কোথাও জটিল হয় নাই, ভাবাবেগও কোথাও শিথিল হয় নাই। কোথাও অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই, শব্দের বাহুল্য নাই, ভাবের অস্পষ্টতা নাই। প্রাণের স্পন্দনে সমস্ত কবিতাই মেদুর ও স্থির মন্থর। কাব্য-শক্তি তাঁর অপর্য্যাপ্ত না থাকিলেও, সাধনা ও নিষ্ঠা ছিল, আন্তরিকতা ও হৃদয়তা ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রমেশচন্দ্র দাস

উপনিষদ তত্ত্ব

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডার উপনিষদ সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান খুব সামান্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, উপনিষদগুলিতে এমন কতকগুলি গুহ্য-বিষয় লিপিবদ্ধ আছে যে, পাঠ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে অসাধারণ মনীষার প্রয়োজন হয়। ফল কথা, কতক-গুলি তত্ত্ব-কথা উপনিষদগুলিতে আলোচিত হইলেও, উহা খুব সাধারণ ভাবেই করা হইয়াছে। উক্ত তত্ত্বগুলি বোধগম্য করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

একশত উনবিংশ খানি উপনিষদ ঠিক এক সময়েই রচিত হয় নাই। উহাদের ভাষাগত ও চিন্তাগত পার্থক্যের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, উহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানব-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রজ্ঞাগণের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অনৈক্যের মধ্যেও একটী ঐক্য আছে উহা তাহাদের মূল ধারণা, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় মতবাদ। আত্মজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞের জন্য ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন ও ব্রহ্ম উপনিষদ। যে স্তরের মানবগণ ব্রহ্মকে ধ্যান ধারণার মধ্যে আনয়ন করিতে পারিবেন না, যাঁহারা তাঁহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ মূর্ত্তির মধ্যে দর্শন করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য গোপালপূর্ব্বতাপনীয়, গোপালো-ত্তরতাপনীয় প্রভৃতি উপনিষদ। যাঁহারা কেবলমাত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য হয়গ্রীব ও অক্ষমালিক উপনিষদ। সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে গেলে শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান্ থাকা একান্ত প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধির জন্যও শরীরশুদ্ধির বিশেষ আবশ্যক, এই জন্যই গর্ভ ও বরাহ উপনিষদ দুইটীতে বিজ্ঞানসম্মত শরীর তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদে কামসূত্রের তাবৎ তত্ত্ব এবং আধুনিক গর্ভ নিরাকরণ (contraceptive theories) সম্বন্ধীয় কতক-গুলি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা উপনিষদগুলিকে শুধু ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের 'করচা' বলিয়াই আশঙ্কা করেন, তাঁহারা যদি মনোযোগ সহকারে উপনিষদ-গুলি পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সাংসারিক অনেক আবশ্যকীয় জ্ঞানও উপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

ওঁ পূর্ণমিদং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

"এই জগতের দৃশ্য এবং অদৃশ্য বস্তু মাত্রই পূর্ণব্রহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ ও ব্যাপ্ত। সেই পূর্ণপ্রকৃতি ব্রহ্মের পূর্ণতা দ্বারা এই জগৎ প্রকাশিত হইলেও তাঁহার পূর্ণতা হ্রাস হয় না।" পূর্ণতা বা perfectionই আমাদের চরম পরিণতি। যুগাবতার আইনষ্টিন (Iienstien) বলেন, সার বা অপরিবর্ত্তনশীল সনাতন সত্য বলিয়া জগতে কিছুই নাই। অদ্য আমাদের নিকট যাহা সার সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, পরিবর্ত্তনের ফলে কল্যই তাহা আবার অসত্যে পরিণত হইতে পারে। এই তত্ত্বটীর উপরই ভিত্তি স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্যের সাম্যবাদীগণ তাঁহাদের সাম্যদর্শণ রচনা করিতেছেন। কার্ল মার্ক্স্ ও বুখারীন (Bukharin) প্রভৃতি মনস্বীগণ বলেন যে পরিবর্ত্তন যখন অনবরতই সংঘটিত হইয়া যাইতেছে, তখন সার সত্য বলিয়া কোন কিছু কি করিয়া থাকিতে পারে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনটি কালের মধ্যে বর্ত্তমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমানকে প্রাধান্য প্রদান করিবার জন্যই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Materia-listic conception of History বা জড়বাদ তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। উপনিষদ বলিতেছেন, সমস্ত জগৎ একটি সূত্রের উপর অবস্থিত থাকিয়া, অনবরত দুলিয়া দুলিয়া, উহার

বাহিরে অবস্থিত পূর্ণতা বা perfectionএর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। perfection বা পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতাকে সর্ব্বদাই বলপূর্ব্বক তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এই আদিম আকর্ষণই-জগতের মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণের জনক। এই আকর্ষণই রাসায়নিক শক্তিরূপে জগতের প্রত্যেক অনু-পরমাণুতে অনুভূত হয়। এই আকর্ষণই আমরা আমাদের শরীরে শিরা ও প্রশিরার দ্বারা সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া থাকি। পিতার প্রতি পুত্রের প্রীতিভাব পিতার অপত্যস্নেহ, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গলাভ স্পৃহা ইত্যাদি তাবৎ আকর্ষণই উক্ত আদিম আকর্ষণ হইতে সম্ভূত। অসম্পূর্ণতা যদবধি সম্পূর্ণতার নিকট গমন করিতে না পারে তদবধি অসম্পূর্ণতার নিত্য পরিবর্ত্তন খুবই স্বাভাবিক। আইনষ্টীন ও তাঁহার শিষ্যগণ অসম্পূর্ণতার চঞ্চল ও চির-পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির প্রতিকৃতি সত্যই অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু অসম্পূর্ণতার বাহিরে পূর্ণতা যে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে তাহার অনুভূতি তাঁহাদের যে একেবারেই নাই এইরূপও মনে হয় না। কেননা সাম্যবাদী মাত্রেরই কাম্য —তাবৎ মানবজাতির পূর্ণতা। তাঁহারা রাষ্ট্র চাহেন না যেহেতু উহা তাঁহাদের মতে পূর্ণতা বিধানের এক বড় অন্তরায়। রাষ্ট্রের অন্তঃর্গত উচ্চ-নিম্ন প্রভৃতি স্তরগুলিকে স্বীকার করিতে গেলেই পূর্ণতার অঙ্গহানি হয়। এই জন্যই বিরাট পূর্ণতার জন্য প্রকৃত অগ্নিহোত্রীর ন্যায় তাঁহারা ত্যাগের সমিধ হস্তে তাবৎ অসম্পূর্ণতাকে ধ্বংস করিতে সর্ব্বদাই যত্নপরায়ণ। এইখানে সাম্যবাদীদের সহিত উপনিষদের একই মত দৃষ্ট হয়। পূর্ণতা নাম দিয়া উপনিষদ যে সার ও অপরিবর্ত্তনশীল সত্যের মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাম্যবাদীগণ সেই মূর্ত্তির স্বরূপ অবগত না থাকিলেও, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই জন্যই আমাদের মনে হয় পাশ্চাত্য সাম্যবাদীগণ ঈশ্বরবাদ স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। কেননা তাঁহারা বাহ্যাত্মার অন্তরূপ ধ্যানে প্রাপ্ত হন নাই। উপনিষদ বলিতেছেন,—জায়তে ম্রিয়তে ইত্যষ বাহ্যাত্মা নাম। মরণ সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। উৎপত্তি, বিকাশ, স্থিতি ও পরিণতির মধ্য দিয়া সৃষ্ট বস্তু মাত্রই অদৃষ্ট পরমবস্তু সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্পূর্ণতা সম্পূর্ণভাবেই অদৃশ্য, এইজন্যই সকল সৃষ্ট বস্তুরই দৃষ্টির বহির্ভূত। পাশ্চাত্য সাম্যবাদীগণ জগতে সর্ব্বপ্রকার সাম্য স্থাপন-পূর্ব্বক পূর্ণতা আনয়ন করিতে চাহেন। তাঁহাদের স্বপ্ন যদি কখনও সফল হয় তাহা হইলে পূর্ণতার প্রাপ্তির সহিত তাবৎ সৃষ্ট বস্তুরই ধ্বংস সংসাধিত হইবে। এই তত্ত্বটি বোধ হয় তাঁহারা এখনও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

'সর্ব্বসার' উপনিষদে বলা হইতেছে—'দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্ম বস্তুতে আত্মাভিমান অর্থাৎ আত্মা বলিয়া জানার নাম বন্ধন, এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানের নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলা হয়। যে দেহাদিতে আত্মাভিমান জন্মায় তাহাকে অবিদ্যা, ও যাহাদ্বারা সেই অভিমান নিবৃত্ত হয় তাহাকে বিদ্যা বলা যায়।' দ্বিতলে গমন করিতে গেলে যেমন সোপান শ্রেণীর একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ পূর্ণতায় পৌঁছাইতে গেলে অপূর্ণতার মধ্য দিয়া যাত্রা সুরু করিতেই হয়। সুতরাং পূর্ণতা ও অপূর্ণতা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। একটি উপলক্ষ মাত্র কাজেই উহা ক্ষণিক। অপরটি ধ্রুব, উপাস্য, কাম্য; এইজন্য উহা সনাতন। বিদ্যা আলোক এবং অবিদ্যা বিরাট অন্ধকার। রাত্রের মধ্য দিয়াই দিনকে বরণ করিতে হয়। সেইরূপ অন্ধকারের মধ্য দিয়া আলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইলেও—অন্ধকার ক্ষণিক, উহাকে সার সত্য বলা যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য সাম্যবাদীগণ এই অবধি দৃষ্টি করিয়াছেন। উহার বাহিরে যে আলোকরূপী সনাতন আছে, তাহা অল্প অনুভব করিলেও, উহার স্পষ্ট সাক্ষাৎকার পান নাই। পাশ্চাত্য সাম্যবাদীদের সহিত উপনিষদের এইখানেই পার্থক্য।

পূর্ণতা অর্জ্জনের জন্য উপনিষদ কতকগুলি অসম্পূর্ণ অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মানবদেহ মাতার রক্তে ও পিতার শুক্রে উৎপন্ন হইয়া অন্ন দ্বারা পুষ্টিলাভ করে। এই জন্যই মানব-শরীরকে অন্নময় কোষ আখ্যা প্রদান করা হইয়া থাকে। অন্নময় কোষ স্থূল, উহার গতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। উহার কার্য্যকারিতা একান্ত সীমাবদ্ধ। উহার অসীমতার প্রকাশক কয়েকটি দ্বার আছে; যেমন—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের

কার্য্যকারিতাও একটা সীমার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ, অর্থাৎ স্থূল শরীর অপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অধিকতর ক্ষমতাশালী হইলেও উহারা শরীরের ন্যায় অসম্পূর্ণ, এইজন্য উহাদের গতিও সীমার মধ্যে আবদ্ধ। মনঃ ইন্দ্রিয়গণকে গতিশীলতায় অতিক্রম করিলেও, উহার ধ্যানও একটা বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ। এইজন্যই উপনিষদে মনের সহিত আত্মার নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করা হইয়াছে মনের উপর তাঁহারা অসীম আত্মাকে পূর্ণতার নিদর্শন স্বর স্থাপন করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানে সাহায্যে মানব-শরীর তৈয়ারী করিতে পারা যায় কিনা তাহারই গবেষণা করিতেছেন। চলচ্চিত্রে যাঁহারা Frankstein• Old Dark House দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কল্পিত Machine man বা যান্ত্রিক জীব মানব মনের কিরূপ উদ্ভট কল্পনা। মানব শরীর কতকগুলি উপাদানের সমষ্টি। এই উপাদানগুলি একত্রিত করিলে একটি নর দেহের সাদৃশ্যভাব সৃষ্ট হইতে পারে সত্য, কিন্তু কখনই নর-দেহ সৃষ্ট হয় না। নরদেহের বিশেষত্ব এই যে ইহার ভিতর প্রাণশক্তি (Motive force) ও বিবেচনা শক্তি (rationalism) প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে। বর্ত্তমানে অনেক দ্রব্যের মধ্যেই প্রাণশক্তি বা Motive forceও প্রদান করিতে পারা যায়। বাষ্প বা তড়িৎ সাহায্যে ইঞ্জিন প্রভৃতি চালাইতে পারা যায় সত্য, কিন্তু ঐ সমস্ত যন্ত্রের কোনরূপ বিবেচনা শক্তি নাই। এই বিবেচনা শক্তিই আত্মা।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাণশক্তি বা Motive force পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের স্থূল দৃষ্টিতে বিবেচনা শক্তির কোন আলেখ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই জন্যই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে কতক গুলি মূল উপাদানের রূপান্তরিত অবস্থার নামই energy বা শক্তি। মানব শরীরও এইরূপ কতকগুলি রূপান্তরিত পদার্থের সমষ্টি মাত্র। এইজন্যই আমরা গতিশীল। জলের রূপান্তরিত ভাবরূপী বাষ্প যতক্ষণ বাষ্পাকারে অবস্থিত থাকে, ততক্ষণই উহাকে Motive power হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার পর উহার স্বাভাবিক অবস্থা জলে পরিণত হইলে Motive powerএর বিনাশ সংসাধন হয়; সেইরূপ আমাদের শরীরের মূল উপাদান গুলির স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের নামই মৃত্যু। কৌষীতকী উপনিষদে এই বিষয়টির একটি সুন্দর বিবৃতি আছে। "ঘ্রাণ এই দেহ হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত গন্ধকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে। চক্ষু দেহ হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত রূপকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে। প্রাণোপাধিক আত্মার এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং বিষয় সমূহের গতি হয়।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন যে স্তরে অবস্থিত, পাশ্চাত্য দর্শনও এখনও সেই স্তরেই আবদ্ধ আছে। সাম্যবাদীগণ যাহাই বলুন না কেন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না Machine man কে বিবেচনা শক্তি বা Intelligence প্রয়োগ করিতে পারিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের উপনিষদের তত্ত্বটিকে স্বীকার করিয়া লইব, অর্থাৎ শরীরের রূপান্তরিত হওয়া ব্যতীতও আর একটি বস্তু আছে যাহার নাম আত্মা। পাশ্চাত্য সাম্যবাদীগণ এই আত্মাটি স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের সাম্যবাদ মন্ত্রের কোন অঙ্গহানি হয় না। আত্মা অসীম, সর্ব্বব্যাপী, উহার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, উহার কোনপ্রকার বর্ণ নাই। উহা ব্যাপক ও চৈতন্যস্বরূপ। সাম্যবাদীরা মানবগোষ্ঠীর সমতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য উঠাইয়া দিতে চাহেন, উপনিষদের আত্মাকে তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইলেও—তাঁহাদের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের ধারণা বিজ্ঞানসম্মত এবং আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও প্রদান করিতে পারা যায়। লণ্ডন হইতে বোম্বাইএ রেডিও-টেলিফোনে যে কথোপকথন করা যাইতে পারিতেছে তাহাতে ইহাই কি প্রমাণ হইতেছে না যে, এই বিরাট আত্মাশক্তি শূন্য নয়, উহার বিরাট দেহ মানবদেহেরই ন্যায় শিরা প্রশিরা দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং এই তত্ত্বটি যে শুধু কথার কথা নহে তাহাই ত বিজ্ঞান এতদিন চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে।

সমস্ত জগৎ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। উহার বিরাট শরীর একই চেতনায় অনুপ্রাণিত এবং প্রবুদ্ধ। এই

চেতনাশক্তিই এই জগতের পরিচালক। ঐ শক্তি জগৎ হইতে পৃথক এবং মানবচক্ষুর বাহিরে অবস্থিত। উপনিষদ এই মহাশক্তির নামকরণ করিয়াছেন ব্রহ্ম। এই মহাশক্তিকে এমন নাম দিতে নাই যাহাতে উহার সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করিতে পারে। ভগবান বা ঈশ্বর এই আখ্যা প্রদান করিলে তাঁহাকে শুধু ঐশ্বর্য্যশালী বলা হয়। কৃষ্ণ বলিলে শুধু পাপকর্ষণকারী বুঝায়। গণেশ বলিয়া কল্পনা করিতে গেলে শুধুই তাঁহাকে সর্ব্বসিদ্ধময় বলিয়া দেখা হয়। কালী নাম প্রদান করিলে শুধুমাত্র ধ্বংসকেই মূর্ত্তি দেওয়া হয়। এই জন্যই সংসারে প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মাচারগুলি পণ্ডিতগণের চক্ষে মূর্খতায় পূর্ণ। আমাদের মনে হয় সাকারবাদ প্রচার হইবার পর, নাস্তিকবাদ প্রচার হইয়া থাকিবে। সাকারবাদ সাধারণের জন্য প্রচারিত হইয়া সমাজে বদ্ধমূল হইয়া বসিলে পণ্ডিতগণ উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে গিয়াই নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেন। বর্ত্তমান যুগে রাশিয়া প্রভৃতি দেশে যে নাস্তিকবাদ ভীষণভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, উহার মূলে রহিয়াছে ক্ষুদ্রত্বে অবিশ্বাস। মানবকল্পিত তাবৎ ভগবানই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ, নাস্তিকবাদ এই সমস্ত ভগবানদিগকে অবিশ্বাস করে। লেনিন স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ণতার উপাসক হইতে গেলে সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতাকে জোর গলায় অস্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য তিনি অপূর্ণতাবিধায়ক তাবৎ প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণতার বিধায়ক ও মহাশক্তির স্বরূপ আত্মার বিষয় তিনি কিছুই বলেন নাই। এখন আমাদিগকে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, তিনি হয়ত একেবারেই আত্মার উপলব্ধি করেন নাই, কিম্বা হয়ত উহাকেই একমাত্র কাম্য ও উপাস্য স্থির করিয়া সকল প্রকার অপূর্ণতার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

আমি পদ্ম তারি মাঝ খানে

শৈবাল-শ্যামল দীঘি—আমি পদ্ম তারি মাঝখানে,
তুমি বন্ধু, দীপ্ত সূর্য্য গাঢ় নীল ঐ আকাশের।
বর্ণ গন্ধ হিল্লোলিয়া উঠে মোর নিভৃত বুকের,
নিজেরে মেলিয়া ধরি পলে পলে আমি তব পানে।
সর্ব্বাঙ্গে চুম্বন ঝরে—ওষ্ঠ তব বুকে মোহ আনে,
কি যে ব্যথা—কি যে সুখ কিছু তার নাহি পাই টের,
সমস্ত ভুলায়ে দেয় তোমার বাহুর স্নিগ্ধ ঘের,
প্রতি পরমাণু মাঝে তারা দোলে—আলিঙ্গন হানে।
এর পর সন্ধ্যা আছে—থাক্ সন্ধ্যা—রাত্রির তিমির,
ঝ'রে যদি যেতে হয় তার লাগি নাহি মোর ডর,
তোমারে পেয়েছি আমি মোর বুকে হে মোর সুন্দর,
মোর মনে স্বর্গ আজি বাঁধিয়াছে উৎসবের নীড়।
ফের যদি দুঃখ আসে—মেঘে মেঘে জ'মে উঠে ভিড়,
আজিকার স্মৃতি হ'বে সে দুর্দ্দিনে আমার নির্ভর।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

পেয়েছি তোমার চুমা

পেয়েছি তোমার চুমা—চুমা নহে আনন্দ তরল,
অধরের দ্বার দিয়া একেবারে ছুঁয়েছে সে মনে।—
ফুটিছে রক্তের ধারা টগ্ বগ্ মনের গহনে,
ধরণী উঠেছে কেঁপে—দুলে' উঠে নীল নভ তল।
এ যদি গরল হয়—তুমি সখি, হ'য়ো না বিকল,
বিষ সেও সুধা হয় জীবনের মহাপুণ্য ক্ষণে,
আমার অধর আজ রত শুধু অমৃত চয়নে,
মহেশের কণ্ঠ তলে নীলা হ'লো নীলাভ গরল।
রৌদ্রের আঁচল তলে এ জীবন মেলিয়াছে ডানা।
এক দণ্ড ব'সো হেথা মোর এ ডানার অন্তরালে,
কত ফুল ফুটিয়াছে আজ এ দেহের ডালে ডালে,
তোমারে পরাবো মালা, শুনিবনা কারো কোনো মানা।
কে জানে এ কোন্ ফুল?—জানিনে এ কিসের নিশানা,
জানি শুধু ফুটিয়াছে এ তোমারি চুমার আড়ালে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

প্রসাদী

শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত

ফাল্গুনের পূর্ণিমা—সহরের রাস্তায় রাস্তায় যেখানেই একটু ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানেই একটি করিয়া বাঁশের মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। চারিদিকে চারিটি লম্বা বাঁশের খুঁটী, লাল শালু দিয়া মোড়া, প্রত্যেকটী বাঁশের এক মাথা হইতে অপর বাঁশের মাথা পর্য্যন্ত সরু বাঁশ বাঁধিয়া মশারীর ছত্রির মত বানানো হইয়াছে, তাহা হইতে রং বেরঙের জাপানী ফানুস ঝুলিতেছে, ফানুসের ভিতর হইতে আলো ফুটিয়া বাহির হইয়া মঞ্চটীকে আলোকময় করিয়া পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মঞ্চের এক পাশে বাজনাদার কয়েকটী বর্ম্মী পুরুষ এক-পেশে খোঁপা-বাঁধা মাথায় এক একটা গোলাপী রেশমের রুমাল বাঁধিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া উৎসাহে ঝম্ ঝম্ শব্দে বিকট তালে বাজনা বাজাইয়া মোটরের হর্ণ্ এবং গাড়ী ঘোড়ার শব্দকেও ঢাকিয়া রাখিতেছে। রাত্রি যত গভীর হইতেছে, কাতারে কাতারে পুরুষ ও নারীর আগমনে মঞ্চগুলির চারিধারে ভিড় জমিয়া যাইতেছে। রাস্তার ধূলার উপর কেহ বা একখানা চাটাই, কেহ সতরঞ্চি, কেহ ছেঁড়া চট্, বিছাইয়া আপন আপন বসিবার স্থান করিয়া লইতেছে। সৌখীন যুবক যুবতীরা ফুলকাটা কার্পেট পাতিয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া চুরুট টানিতেছে। কেহ হয়ত এক হাতে এক টুক্‌রা শুঁট্‌কী মাছ পোড়া, অপর হাতে কচি বাঁশের নলে পোরা ভাতের কাঠি লইয়া আরামে আহার সম্পন্ন করিতেছে। প্রবীণ প্রবীণার দল পানের বাটা খুলিয়া অনবরত পান সাজিয়া খাইতেছে এবং আজকালকার নাচওয়ালীরা সেকালের মতন ভাল নাচিতে পারে না বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে।

অমরেশ নদীর ধারে একটী জেটীর দরজায় নিজের টু-সিটার খানি রাখিয়া রাস্তার ভিড়ের দিকে তাকাইল। অদূরে একখানি মঞ্চের উপর তখন পুরাদমে নাচ চলিয়াছে। পোয়ে-নাচের বাজনা এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের বাহ্‌বা-বাহ্‌বা, হাততালি, শিস্ প্রভৃতির শব্দে নর্ত্তকীদের গান শোনা যাইতেছে না, কিন্তু তানেখা-মাখা এবং ফুলের মুকুট-পরা তরুণীদের নাচের ভঙ্গীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অমরেশ ধীরে ধীরে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পরনে শান্তিপুরী ধুতি, মুগার পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম, হীরার আংটী, প্ল্যাটিনামের রিষ্টওয়াচ, সর্ব্বোপরি সুদীর্ঘ, সুঠাম পুরুষোচিত আকৃতির দিকে চাহিয়া দর্শকের দল সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মঞ্চ হইতে একটী তরুণী একদৃষ্টে তাহার দিকে কিছুক্ষণ দেখিয়া বাজনাদার একজন পুরুষকে কি যেন ইঙ্গিত করিল। বাজনাদার তাড়াতাড়ি একখানি ভাঙা চেয়ার কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া মঞ্চের খুব নিকটে রাখিয়া খুব বিনীতভাবে অমরেশকে বসিতে অনুরোধ করিল।

অমরেশ ধনীর পুত্র। তাহার পিতা বর্ম্মাদেশে কাঠের ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিলেন। উপযুক্ত পুত্রকে নিজের ব্যবসা চালাইবার ভার দিয়া দেশে ফিরিয়া যান এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লোকান্তর গমন করেন। অমরেশ বাল্যকাল হইতে বর্ম্মা দেশে রহিয়াছে। মাঝে মাঝে মায়ের অনুরোধে দেশে গেলেও বর্ম্মাতে থাকিতেই ভালবাসিত। সম্প্রতি বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে মায়ের নিকট রাখিয়া আসিয়া রেঙ্গুনে হেড অফিস্ করিয়া নিজেই ব্যবসার তদারক করিতেছে। জঙ্গল হইতে টিম্বার সংগ্রহ করিয়া রেঙ্গুনে চালান দিবার জন্ম মফঃস্বলে নানা স্থানে ছোট ছোট অফিস্ আছে। অমরেশ জঙ্গলে ঘুরিতে ভালবাসিত। শীতের সময় জঙ্গলের স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া প্রতি বৎসর সেই সময় দুই তিন মাস জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া কাজ দেখা তাহার

একটা আনন্দের বিষয় ছিল। এই সহরটী ছোট হইলেও নদীর তীরে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা। তাই অমরেশ এইদিকে আসিলেই সহরের উপর কিছুদিন থাকিয়া জঙ্গলে যাইত।

ফাল্গুনের পূর্ণিমা বর্ম্মাদের একটা মহোৎসবের দিন, তাই ফায়ায় ফায়ায় (Pagodas) পূজার ঘণ্টা ঘন ঘন নিনাদ করিয়া পূজারীদের আহ্বান করিতেছে। রাস্তায় রাস্তায় বিজলী বাতির নানা রংয়ের আলোয় চাঁদের আলোকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। ভাব-বিলাসী বর্ম্মা মেয়েগুলি সাজগোজ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া চলিয়াছে। তাহাদের পরিপাটী বেশভূষা সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যের এবং শালীনতার পরিচায়ক।

বর্ম্মা-তরুণীর পোষাক পরিচ্ছদ, নম্র, ধীর কমনীয়তা অমরেশের মনকে আকর্ষণ করিত। আজকের নাচ-মঞ্চে যে মেয়েটী তাহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিল এবং তাহাকে এত আগ্রহে মঞ্চের অতি নিকটে বসাইল, তাহার নাচের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল সে ভাল নাচিতে জানে না অথবা নাচের প্রতি তাহার মনোযোগ নাই। কিন্তু তাহার চোখের চাউনিতে এমন একটা স্নিগ্ধতা ছিল, সাদাসিধে পোষাকের মধ্যে এমন একটা লালিত্য ছিল যাহাতে অধিকাংশ দর্শকের দৃষ্টি তাহারই দিকে পড়িতেছিল। অমরেশকে বিশেষ সমাদর দেখানোতে অনেক বর্ম্মা যুবকের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণ হাততালি দিয়া, চীৎকার করিয়া যাহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভের চেষ্টা করিতেছিল তাহাকে হঠাৎ একজন "কালার" (বিদেশীর) প্রতি আকৃষ্ট দেখিয়া তাহারাই নানা প্রকার বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ এমন কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল যে অমরেশের অসহ্য বোধ হইল। সে তাহাদের কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই একজন বর্ম্মা যুবক তাহার আসন অধিকার করিল। অমরেশ অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করিতে করিতে জেটীর কাছে আসিয়া নিজের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সম্মুখে প্রশান্ত নদী, জলের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া স্থানটীকে বড় মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। গাড়ীতে বসিয়া অমরেশ ভাবিতে লাগিল এ মেয়েটী কে? কেনই বা তাহার দিকে এমন করিয়া চাহিল, কেনই বা সমাদরে নিকটে বসাইল। দেখিয়া ত মনে হয় না যে নাচ ইহার ব্যবসা—ধরণ ধারণে কেমন একটা জড়তা রহিয়াছে। বোধ হয় মেয়েটী তাহাকে পরিচিত কোন লোক মনে করিয়া ভুল করিয়াছে। অথবা ধনীর ছেলে অনুমান করিয়া কিছু পাইবার আশা করিয়াছিল। হঠাৎ পিছন হইতে একটা মিষ্টি ফুলের-গন্ধ-মাখা-হাওয়া আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিল। সে 'আঃ'—বলিয়াই দেখিল তাহার পাশে গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেই মেয়েটী। মৃদুস্বরে বলিল "বাবু, আমার সঙ্গে একটু কি আসবেন? আমার মাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, একা ঘুরতে ভয় করছে, কতগুলো ছোঁড়া আমার পিছনে লেগেছে"। অমরেশ বর্ম্মা ভাষা বেশ ভালই জানিত। সে হাসিয়া বলিল, "তুমি তোমার নিজের জাত ভাইকে ভয় পাচ্ছ আর 'কালা'কে বিশ্বাস করছ? এ কি রকম ব্যাপার"?

মেয়েটী বলিল, "আমি জঙ্গলের মেয়ে, সহরের ছেলেদের বড় ভয় করি, কোনোদিন সহরে আসিনি, আজকের এই পোয়ে নাচের দল আমাকে নাচবার জন্য কিছু টাকা দেবে বলাতে বাধ্য হ'য়ে এসেছি, আমাদের কালই কিছু টাকার বিশেষ দরকার। কিন্তু নাচতে আমি জানিনা ব'লে অথবা আমি সুন্দরী নই ব'লেই বোধ হয় সহরের ছেলেরা আমার নাচ পছন্দ করছে না। তারা আমায় অসভ্য ভাষায় গালাগালি ক'রছে, আমি সহ্য করতে না পেরে চলে এসেছি, বলেছি টাকা চাইনা। যার কাছে শুনেছি 'কালা'রা মেয়ে মানুষকে খুব সম্মান করে, তাই তোমাকে ডেকে কাছে বসিয়েছিলাম, বড় ভয় করছিল আমার। কিন্তু তুমিও দেখি চলে এলে।"

অমরেশ বলিল, "তুমি আমার দিকে অমন করে চাইলে কেন? আবার কাছে ডেকে চেয়ার দিয়ে বসালে, তোমার জাত ভাইদের হিংসে হোল, তাই ত তোমাকে গালাগালি দিতে, বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করল। আমার বড্ড রাগ হোল, তাই চলে এলাম।"

মেয়েটী বলিল, "জানিনা কেন, দূর থেকে তোমায় দেখেই আমার খুব ভাল লাগল, আর তোমাকে বিশ্বাস হোল খুব ভাল লোক বলে।"

অমরেশ ঠাট্টার সুরে বলিল—"আর এখন কি মনে হোচ্ছে? চেয়ে দেখ ত ভাল লাগে কিনা।"

অমরেশের তরুণ মনের স্বভাব-সুলভ চাঞ্চল্য আর যেন সংযমের বাঁধন মানিতে চাহে না। সে কোমল দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তুমি বলছিলে তুমি সুন্দরী নও বলে সহরের ছেলেরা তোমায় উপেক্ষা করেছে? তোমার রূপে 'কালা'রই মন মুগ্ধ হয়েছে, বর্ম্মী পুরুষ তো পাগল হবেই। তোমার নামটা কি শুনি? কি বলে ডাকব তোমায় বলত?"

তরুণীর মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল, মাথা নীচু করিয়া বলিল—"জানিনা কি পছন্দে আমার দিদিমা আমার নাম রেখেছিল 'মা-হ্লা-হ্লা' (Ma Hla Hla) আমার লোকের কাছে নিজের নাম বলতে এমন লজ্জা করে! তুমিও দেখছি আমায় ঠাট্টা করছ আমি সুন্দরী নই বলে।"

অমরেশ বলিল—"বাঃ! তোমার নামের মানে তো 'অপূর্ব্ব সুন্দরী', আমি তা'হলে তোমায় একটা বাংলা নাম দিই, কেমন? তোমায় আমি 'রূপসী' বলে ডাকব, রাজী ত?

তরুণী তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি রাস্তার মেলা দেখতে যাবে না? চলনা একটু জুয়ো খেলবে, আমিও দেখব মাকে পাই কিনা সেখানে।"

অমরেশ হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—"এখন তো রাত বারটা বাজে, আমি বাড়ী যাব না? তুমি আমার গাড়ীতে এসো, কোথায় যাবে বল, তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাব।"

মা-হ্লা-হ্লা বলিল—আমার তো সহরে কোথাও বাড়ী নেই, আজ সারা রাত পোয়ে নেচে, কাল ভোরে জঙ্গলে ফিরবার কথা ছিল। মা এই মেলার মধ্যে একটা দোকানে কিছু টিনের খেলা তৈরী করে এনে বিক্রী করতে বসেছে, আমি মার কাছেই বসব বাকী রাতটা।"

অমরেশ গাড়ীর দরজা খুলিয়া নিজের পাশে একটু জায়গা করিয়া দিয়া বলিল, "রূপসী, আমার পাশে বসতে ভয় পাচ্ছ কি? আমি তোমার কিছু অনিষ্ট করব না, বিশ্বাস কর। আমার বাড়ী কাছেই, চল সেখানে গিয়ে গাড়ীখানা রেখে আসি। তারপর চাঁদের আলোয় দুজনে হেঁটে বেড়িয়ে মেলা দেখব।"

মা-হ্লা-হ্লা সঙ্কোচে গাড়ীর এক কোণে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল—"না, বাবু তোমায় আমি ভয় করছি না, কিন্তু তোমার পাশে বসে গেলে রাস্তায় তোমাদের কত বাঙালীবাবু আছে, ঘরে তোমার বউ আছে, তারা কি বলবে তোমায়, তাই ভাবছিলাম।"

অমরেশ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া ষ্টিয়ারিং হুইল ধরিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া ঘরের দিকে চলিল। রাস্তায় আর কোনও কথাবার্ত্তা হইল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই ছোট খাট বাগান-ঘেরা একখানি বাংলোর সামনে গাড়ী থামিল।

অমরেশ নামিয়া তরুণীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল, তরুণী তাহার হাতের সাহায্য না লইয়াই নামিয়া পড়িল।

অমরেশ বলিল—"রূপসী, এসোনা আমার ঘরে, এক পেয়ালা কফি খেয়ে যাও, সারারাত জাগবে।" মা হ্লা-হ্লা গেটের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"না, না, তোমার স্ত্রী রাগ করবে, আমি জানি বাঙালী মেয়েরা বর্ম্মিনীদের বড় ঘৃণা করে। তোমার কোনো অসুবিধা থাকলে আমি একাই যেতে পারব।"

অমরেশ তাড়াতাড়ি তাহার পিছনে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"রূপসী, রাগ কোরো না, আমি তোমার সঙ্গে যাবই, তোমাকে একা যেতে দেবো না। আমার বাড়ীতে একজন চাকর ছাড়া কেউ নেই, তাই তোমায় ডেকেছিলাম। আচ্ছা, চল মেলায় যাই।"

মা-হ্লা-হ্লা হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"বাবু, তোমার স্ত্রী নেই? বিয়ে করনি বুঝি?"

অমরেশ সংক্ষেপে উত্তর দিল "না"। মনে মনে ভাবিল, "এখানে ত নেই, এখানে কোনদিন আসবেও না। বিয়ে করিনি বললেই রূপসীর কাছে বেশ আমল পাওয়া যাবে। মেয়েটী মন্দ নয়, বন্ধুত্ব পাতালে দোষই বা কি? জঙ্গলে আদর যত্ন পাওয়া যাবে এদের কাছ থেকে। দিনগুলোও কাটবে ভাল।"

মাথার উপর চাঁদের মিষ্টি আলো, গায়ের কাছে চাঁদের

মতনই রূপসীর স্নিগ্ধ স্পর্শ, অমরেশের মন প্রলোভনের দোলায় দোল খাইতে লাগিল।

দুজনে গল্প করিতে করিতে মেলায় আসিয়া পড়িল। রাস্তার দুধারে সারি গাঁথা বাঁশের তৈরী পাতার ছাউনী দেওয়া ষ্টল। এই ষ্টল বা ছোট ছোট দোকানগুলিতে নানা রকমের তৈরী খাবার বিক্রয় হইতেছে। চীনাদের দোকানের সামনে সিদ্ধ করা আস্ত হাঁস, মুরগী, শূয়রের ঠ্যাং, হাঁস-মুরগীর নাড়িভুড়ি, শুঁটকী মাছ পোড়া, নানা প্রকার কাঁচা শাক-সবজী দড়িতে ঝোলানো রহিয়াছে। একটী বড় টেবলে তোলা উনুনের উপর একখানি মস্ত চাটু চড়ানো রহিয়াছে, ক্রেতাদের ফরমাস মতন খাবার গরম গরম তৈরী করিয়া দিতেছে। দোকানের সম্মুখে একখানি গোল টেবল ও চার পাঁচখানা চেয়ার। কোনো সময়েই টেবলখানি খালি থাকছে না। একদলের পর আর একদল অবিশ্রান্ত আসিতেছে এবং খাইয়া যাইতেছে। পাশেই বর্ম্মিনীদের দোকান। মাটীতে একটি নীচু-পায়া গোল জল-চৌকি বা টেবল পাতা, তার উপর ভাত, তরকারী, সিদ্ধ, পোড়া, কচ্ছপ, হাস, মুরগী ও গোসাপের ডিম সিদ্ধ, ঙাপ্পি, নানা রকম আচার লইয়া আর একজন বর্ম্মা মেয়ে বসিয়া আছে। অতিথির দল উবু হইয়া জলচৌকির চারিধারে আসিয়া বসিতেছে। প্রত্যেকের ফরমাসমত খাবার প্লেটে করিয়া দোকানওয়ালী সাজাইয়া দিতেছে আর অতিথি পরম পরিতোষের সহিত খাইতেছে। বড় বড় বাটীতে করিয়া হিঙ্গো (সুপ), তরকারী, ঙাপ্পি সামনে রহিয়াছে, সকলেই নিজের নিজের চামচ ডুবাইয়া তুলিয়া মুখে দিতেছে। প্রত্যেকের জন্ত পৃথক পাত্রের প্রয়োজন হইতেছে না।

দুই চারখানি "কাকা"র দোকানও রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-বিশেষরা এদেশে এই নামে সুপরিচিত। ইহারা চা, কফি, মোগলাই পরেটা, মাংস, চপ, কাটলেট, আণ্ডা-পরেটা, মুরগীর বিরিয়ানি প্রভৃতি সুখাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিতেছে। দোকানের সম্মুখে ছোট ছোট টেবিল ঘেরিয়া চেয়ার সাজানো। সৌখীন বর্ম্মা যুবক জেরবাদী, মুসলমান, মাদ্রাজি, সুরাটি, বাঙালী সকল জাতির সমাগম এখানে। প্রত্যেক খাবারের দোকানের সঙ্গে সঙ্গেই সোডা, লেমনেড, আইসক্রীম, ভিমটো, চিনে সরবত প্রভৃতি পানীয় দ্রব্যের দোকান, সেখানে ভীড়ও কম নয়। খাবারের দোকানগুলি বাদ দিলে বাকীগুলো সবই জুয়ো-খেলার দোকান। দোকানের সামনে এতো ভিড়, আর চীৎকার যে সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না ভিতরে কি ব্যাপার চলিতেছে। দর্শকের কৌতুহল, চরিতার্থ করিতে হইলে অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া ভিতরে যাইতে হয়। শুধু শোনা যাইতেছে—নী-রে (লাল), সেঁই রে (সবুজ), অ্যাসে রে (কালো) ফিউ রে (সাদা) ইত্যাদি এবং মাঝে মাঝে বন্দুকের ছোট ছোট আওয়াজ। একটী লম্বা টেবলের শেষপ্রান্তে একখানি পেষ্টবোর্ডের উপর লাল, সবুজ, কালো, সাদা রংয়ের মোটা মোটা ডোরা কাটা বা ঐ সকল রংয়ের চওড়া ফিতা আঁটা। টেবলের অপর প্রান্তে একখানা বোর্ডের উপর ঐ কয়েকটি রংএরই গোল গোল চাকৃতি আঁকা রহিয়াছে। প্রত্যেক খেলোয়াড় আসিয়া এক-খানা এক আনি, দুয়ানী, সিকি বা আধুলি, কেউ বা টাকাও নিজের পছন্দমত রংয়ের উপর রাখিতেছে। একজন একটী ছোট বন্দুক লইয়া বিশেষ কোন একটী রং লক্ষ করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতেছে। বন্দুকের গুলি, একটী ছোট ছিপির উপরে একটী পিন্ আঁটা। সেই পিনটী যে রংয়ের গায়ে গিয়া লাগিবে সেই রংয়ের খেলোয়াড়রা জিতিবে অর্থাৎ যে যত পয়সা রাখিয়াছে তাহার ছয়গুণ পয়সা দোকানদারের নিকট পাইবে। বাকী রংগুলির উপর যাহারা পয়সা রাখিয়াছিল, তাহারা হারিল অর্থাৎ দোকানদারের তাহাই লাভ।

অমরেশ মা-হ্লা-হ্লাকে লইয়া এইপ্রকার একটী দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইতেই দোকানদার সাগ্রহে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া, "লা- বা, ঠাঁই বা, খেস্থিয়া গেজা বা" (আসুন, বসুন, আপনি খেলুন) ইত্যাদি আহ্বানে অস্থির করিয়া তুলিল্।

অমরেশের খেলিবার তত ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মা-হ্লা-হ্লা বলিল—"বাবু, খেল'না একদাম, যা পাব, দুজনের খাওয়া চলে যাবে আজকের মতন।" রূপসীর অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না, চেয়ারে বসিয়া লাল

রং‌এর চাকতির উপর একটা টাকা রাখিল এবং নিজেই বন্দুক ধরিল। চারিদিক হইতে দর্শকের দল কেহ আনি, কেহ পয়সা, কেহ দু আনি "বাবুর রং"এর উপর বসাইয়া নিজ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। কেহ কেহ সবুজ কালো ও সাদা রং‌এর উপরও পয়সা রাখিল, যদিই বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পিন্‌টা অন্য কোন রঙে লাগে। অমরেশের বন্দুক ছোঁড়া তেমন অভ্যাস ছিল না, পিন্‌টা মনোনীত রঙে না লাগিয়া সবুজ রঙে লাগিল। যারা জিতিল, তাহারা "সেঁইয়ে, সেঁইয়ে" বলিয়া চীৎকার করিয়া নিজ নিজ পাওনা লইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অমরেশের লক্ষ একবার ব্যর্থ হওয়ায় তাহার জিদ্ চাপিয়া গেল। একে একে সব রং‌গুলিতে একটী একটী টাকা রাখিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচটী টাকা হারিয়া একখানি দশ টাকার নোট ভাঙাইবার জন্য বাহির করিতেই মা হ্লা হ্লা তাহার হাত হইতে নোটখানি ছিনাইয়া লইল এবং অমরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। অমরেশ হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল "না আমি একদান না জিতে কিছুতেই উঠ্‌বোনা।"

দোকানদার বলিল "বাবু আপনি টাকা রাখুন, বন্দুক আর একজন ছুঁড়ুক। এই চীনা ছোকরার লক্ষ্য অব্যর্থ, সে ছুঁড়লে আপনি ঠিক্ সব টাকা ফিরে পাবেন।"

মা হ্লা হ্লা "চীনা কালো রং ধরেছে; আপনি এই সিকিটা কালো রঙে রাখুন" বলিয়া এঞ্জির ভিতর পকেট হইতে একটী সিকি বাহির করিয়া দিল।

অমরেশ বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, আমার নোট্ দাও, আমি নিজেই ছুঁড়্‌ব আবার"।

মা হ্লা-হ্লা অমরেশের জিদ্ চাপিয়াছে এবং অনেক টাকা লোকসান যাইবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া নোটখানা এঞ্জির পকেটে পুরিয়া বলিল "আমার ক্ষিদেয় পেট জলছে তুমি এ টাকাটাও খরচ কোরলে কি দিয়ে খাব আমরা? আমি চললুম খাবারের দোকানে"।

অমরেশ পকেটে হাত দিয়া দেখিল ব্যাগে দুই চারিটি পয়সা ছাড়া আর কিছু নাই। অগত্যা মা-হ্লা হ্লার পশ্চাতে বাহির হইয়া আসিল।

মা-হ্লা-হ্লা নিকটেই একটী বর্ম্মিণীর দোকানে উবু হইয়া বসিয়া কিছু শূয়োরের মাংস ও ঙাপ্পি দিয়া এক প্লেট ভাত ফরমাস করিয়া খাইতে বসিয়া গেল। অমরেশ এতকাল বর্ম্মা দেশে আসিয়া ঘনিষ্ঠভাবে এই জাতির সহিত মিশিয়াও বাঙালীর জাতি-সুলভ আভি-জাত্যের মর্য্যাদাটুকু ছাড়িতে পারে নাই। প্রকাণ্ড রাজপথে, নানাজাতির লোকের সম্মুখে বর্ম্মিনীর পাশে বসিয়া বর্ম্মা-খাদ্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতে লাগিল। রূপসী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল "বাবু, তুমি 'কাকা'র দোকান থেকে কিছু পরেটা মাংস খেয়ে এস গিয়ে, তারপর খেলনার দোকানগুলো একটু ঘুরে দেখা যাবে"।

অমরেশ বলিল—"আমার এতো রাত্রিতে কিছু খাওয়া অভ্যেস্ নেই, আমি এক গেলাস ভিম্‌টো খেয়ে মেলাটা একটু ঘুরে দেখ্‌ব কি কি নতুন জিনিস এসেছে। তুমি খাওয়া শেষ কোরে নাও"।

মেলার এক প্রান্তে দুই একটী দোকানে বিলিতি এবং জাপানী খেল্‌না, বর্ম্মা মেয়েদের হাতের তৈয়ারী কাগজের ফুল, টবে বসানো কাগজের তৈয়ারী ফুলগাছ, বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, ব্যাগ, চায়ের ট্রে প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে মাটীর হাঁড়ি, ফুলদানী, ধুনুচি, খেল্‌না, টিনের উপর রং দেওয়া রিক্‌স, মোটর গাড়ী, টিফিন্ ক্যারিয়ার, ফুলের সাজি, গরুর গাড়ী প্রভৃতি ছেলে ভুলানো জিনিষ লইয়া কয়েকজন বর্ম্মিনী রাস্তার উপর খোলা যায়গায় দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। অমরেশ ঘুরিতে ঘুরিতে একটী দোকান হইতে কাগজের তৈয়ারী বেলের কুঁড়ির মালা এবং একটী লেবু ফুলের গুচ্ছ কিনিল, পকেটে হাত দিয়াই মনে পড়িল নোটখানি রূপসী লইয়া গিয়াছে, আর যাহা পয়সা আছে তাহাতে কুলাইবে না। সে বর্ম্মিনীর হাতে জিনিষগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি পরে এসে নেবো, এখন দেখছি পয়সা নেই।"

বর্ম্মিনী বলিল "বাবু তুমি নিয়ে যাও না যত টাকার মাল চাও, মেলা তো এখনো তিনদিন আছে, কাল পয়সা দিও।"

অমরেশ বর্ম্মিনীর বিশ্বাসের জোর দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, হাসিয়া বলিল "যদি পয়সা না পাও আর ?"

বর্ম্মিনী নিতান্ত উপেক্ষার সুরে বলিল "ভদ্রলোক তুমি তোমাকেও বিশ্বাস করব না ত দুনিয়া চল্‌বে কিসের উপরে ? আমি ফায়ার (বুদ্ধদেব) উপর নির্ভর ক'রে ব্যবসা চালাই, ফায়াই আমার আহার যোগাবেন।"

অমরেশ ফুলের মালা ও পুষ্প গুচ্ছটী হাতে লইতেই বর্ম্মিনী বলিল "বাবু কিছু সুগন্ধি নেবে না ?"

অমরেশ দোকানের দিকে চাহিয়া বলিল "আছে নাকি ভাল কিছু ?"

বর্ম্মিনী একটী সুন্দর জালি-কাটা চন্দন কাঠের বাক্স তাহার হাতে দিল। বাক্সের ভিতরে তিনটী খোপে তিনটী বিলাতী এসেন্সের শিশি।

দাম জিজ্ঞাসা করিতে বর্ম্মিনী বলিল পাঁচ টাকা।

অমরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিষটী লইল এবং পরদিন টাকা দিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া পিছন ফিরিল।

মা হ্লা হ্লা তখন লম্বা একটী চুরুট মুখে পুরিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে হাসিমুখে দেখা দিল।

অমরেশ তাহার হাতে বাক্সটি দিয়া বলিল "এসো তোমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দিই। রূপসী বাক্সটী খুলিয়া মহা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবু, তুমি খুব ভাল, আমি প্রথম থেকেই তা বুঝেছিলাম। ফুলটা দাও আমি একটু সুগন্ধি মাখিয়ে নিজে পরি, তুমি সুন্দর ক'রে দিতে পারবে না।"

সম্মুখে একটী 'কাকা'র দোকান, সামনের দেয়ালে বিরাট একখানি আয়না ঝোলানো ছিল, রূপসী ফুল হাতে সেই দোকানে ঢুকিয়া পড়িল এবং নিঃসঙ্কোচে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিপাটীরূপে তাহার টোপর-খোঁপা বেড়িয়া কুড়ির মালাটী পরিল। মাথার ডান পাশে কাণের কাছ ঘেঁসিয়া লেবু ফুলের গুচ্ছটি এমনভাবে খোঁপার নীচ দিয়া গুঁজিয়া দিল যেন খানিকটা কপালের উপর ঝুলিয়া পড়ে। আয়নায় নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হইয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। দোকানের ক্রেতাদল যে তাহার দিকে চাহিয়া কত প্রকার মন্তব্য ঝাড়িতেছে, সেদিকে তাহার কাণও নাই।

অমরেশ বাহির হইতে ডাকিল 'রূপসী'! রূপসীর খেয়াল হইল, সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিল "ওহো, তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

অমরেশ বলিল "নিজের রূপে নিজেই তুমি ম'জে যাও, অন্যে পাগল হবেনা কেন বলত ?"

মা হ্লা হ্লা তাহার গলায় ঝোলানো স্কার্ফটা দিয়া অমরেশের গায়ে আঘাত করিয়া বলিল "যাও, তুমি কেবল ঠাট্টা কর। আচ্ছা, তুমি ত কিছু খেলেনা, একটু আইস ক্রীম খাও না ?"

অমরেশ বলিল—"আমার পয়সা নেই আর দরকারও নেই। তোমাদের মতন আমরা দিনরাত্রি, রাস্তায় ঘাটে, খাইনা।"

মা হ্লা হ্লা তাড়াতাড়ি এঞ্জির পকেট হইতে দশ টাকার নোটখানি বাহির করিয়া অমরেশের হাতে দিয়া বলিল "উঃ কি ভুল আমার! এতক্ষণ তোমার টাকাটা তোমায় দিইনি, তোমার কত অসুবিধা হোয়েছে না জানি। এসো, এইখানে কিছু খাওয়া যাক্।" সম্মুখে টেব্‌লে দুটী বর্ম্মা ছেলে বসিয়া চুরুট টানিতেছিল। অমরেশ তাহাদের পাশে বসিয়া পড়িয়া দোকানদারকে বলিল "দুই প্লেট্ আইসক্রীম্ দাও তো ?" মা হ্লা হ্লা বলিল "না, না আমি এখানে বস্‌বনা, আমি মাকে খুঁজি, তুমি খাও"। অমরেশ রূপসীকে ধরিয়া পাশে বসাইল। মা হ্লা-হ্লা বর্ম্মা যুবক দুইটীর নিকট হইতে একটু দূরে সরিয়া বসিল এবং অন্য দিকে ফিরিয়া রহিল।

যুবক দুইটী একটু মুখ বাঁকাইয়া চুপি চুপি বলিল "কালাকে পাকড়েছে রে, পয়সা আছে বোধ হয় লোকটার।"

অমরেশ তাহাদের কথা শুনিতে পায় নাই কিন্তু রূপসী শুনিতে পাইয়াছিল—সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল "বাবু তোমার তো খাওয়া হোয়েছে, চল এবার দেরী হোয়ে যাচ্ছে, আমাদের ভোর চারটায় ফিরে যাবার কথা, মা হয়ত খুঁজছেন আমায়।"

অমরেশ রূপসীর হাতে নোটখানা দিয়া বলিল, "আইস্-ক্রীমের দামটা তুমিই দিয়ে দাও, আমি ত আজ তোমার অতিথি।" মা হ্লা হ্লা পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দোকানদারের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল এবং

নোটখানি আবার ফিরাইয়া দিতে গেল। অমরেশ কিছুতেই লইল না, সে বলিল "এটা তো আজ জুয়োখেলায় যেতোই, তুমি বাঁচিয়েছ এটা তোমারই প্রাপ্য।" বিশেষ জিদ্ করাতে রূপসী বলিল—"আচ্ছা, পোয়ে নেচে যেটা রোজগার করবার দরকার ছিল, সেটা বিনা আয়াসে লাভ হোল, মন্দ কি?"

মেলার বাহিরে রাস্তার উপর সারি সারি ছাউনি ঢাকা গরুর গাড়ী, গাড়োয়ানরা গরুগুলিকে টানিয়া লইয়া গাড়ীর সহিত জুতিবার উদ্যোগ করিতেছে আর দলে দলে বর্ম্মী, বর্ম্মিনী ছেলে মেয়ের দল এবং ছোট ছোট বোচ্কা লইয়া কলরব করিতে করিতে আপন আপন গাড়ী খুঁজিয়া চড়িয়া বসিতেছে।

মা হ্লা হ্লা একখানা গাড়ীর নিকট আসিয়া নিদ্রিত গাড়োয়ানকে এক ঠেলা মারিয়া বলিল "ওঠ্ শীগ্গীর, মা কোথায়?" সে চোখ রগড়াইতে রগ্ড়াইতে বলিল "মা তো কখন জিনিষপত্র রেখে গেছেন, তোমাকেই খুঁজতে গেছেন বোধ হয়।"

মা হ্লা-হ্লা অমরেশের নিকট সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এবার আমাদের বিদায়ের পালা। তোমাকে কয়েকঘণ্টা সঙ্গী পেয়ে কি আনন্দে সময়টা কাট্লো। মা তোমাকে দেখ্লে নিশ্চয় খুসী হবেন। মা কালাবাবুদের খুব পছন্দ করেন। ও…এই যে মা…;

মা, দেখ এই বাবু, আমায় কত জিনিষ দিয়েছেন। কত ভাল এই বাবু, আমাকে সমস্তক্ষণ আগ্‌লে নিয়ে বেড়িয়েছেন, নইলে এখানকার ছোঁড়াগুলো যা আরম্ভ করেছিল, আমার সঙ্গে হয়ত মারামারি হোত। আমি আর কখনো সহরে নাচ্তে আস্ব না। ভারি ত দশটা টাকা দেবে বলেছিল, তার বদলে কতো জিনিস আরও দশটা টাকাও এই বাবু আমায় দিয়েছেন।"

মা-টিন্-চি প্রবীণা। মায়ের রূপও অবহেলা করা যায়না, তরুণ বয়সে সেও রূপসী ছিল বোঝা যায়। মা মেয়ের অসংলগ্ন কাহিনী শুনিয়া ব্যাপারটী সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও এই বাবুটী যে তাহার মেয়েকে সুনজরে দেখিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া সন্তুষ্ট হইল বটে কিন্তু মনে মনে চিন্তিত এবং সন্দিগ্ধও হইল।

অমরেশ বলিল "মা, পোয়ে নাচ্ দেখ্তে গিয়ে তোমার রূপসীকে পেয়ে গেলাম। তার রূপে মুগ্ধ হোয়ে কত বর্ম্মী ছেলে তার অনুগ্রহ ভিখারী হোয়েছিল, তোমার মেয়ে তাদের অগ্রাহ্যি ক'রে কালার প্রতি অনুগ্রহ করলো, কাজেই তারা চ'টে গিয়ে নানারকম অভদ্র আচরণ করছিল। আমার বিরক্তি বোধ হওয়ায় উঠে এলাম, তোমার মেয়েও নাচ-মঞ্চ ছেড়ে আমার সঙ্গ ধরল। আমার কিন্তু কোন দোষ নেই, আমি তাকে ডাকিনি আর তার কোন ক্ষতিও করিনি, কেবল সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়েছি।"

মা টিন্-চি বলিল "আমার মেয়ের কপাল ভাল, এমন বাবুর দর্শন মিলেছিল। বাবু কোথায় থাকেন?"

অমরেশ সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল এবং জঙ্গলে শীঘ্রই তাহাদের অতিথি হইবে আশা দিয়া মা ও মেয়ের নিকট বিদায় লইল।

২

ছোট্ট একখানি মোটর-বোট নদীর বক্ষ চিরিয়া থর থর্ শব্দে ছুটিয়াছে। সম্মুখের ডেকে একখানি ডেক-চেয়ারে বসিয়া অমরেশ, বর্ম্মা-সিগার মুখে, ধূমপান করিতে করিতে সারেঙ্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "নদীর ওপারে ঐ যে কতগুলো বস্তী দেখা যাচ্ছে ওটা তো ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে? ওখানে বর্ম্মাদের অনেক ধান-ক্ষেত আছে, না? আমি ঐ দিক্‌টা একটু বেড়িয়ে তারপর আমাদের জঙ্গলে যাব।"

সারেঙ্ নোয়াখালী জেলার বাঙালী মুসলমান। সে বলিল "হুজুরের হুকুম, তবে ওখানে যদি দুই এক ঘণ্টা দেরী করেন, তবে আজ আর জঙ্গলে পৌছানো যাবেনা, রাত্রি হোয়ে যাবে।" অমরেশ বলিল "আজ রাতটা না হয় এখানেই থাকা যাবে, কাল ভোরে জঙ্গলে যাব।" বোটের মধ্যে সারেঙ ছাড়া আরও তিন চার জন খালাসী। বেলা একটার সময় গ্রামের ঘাটে এসে বোট ভিড়িল। অমরেশ বলিল "সারেঙ্ তোমরা বোটেই থাক, আমি ঘুরে ফিরে গ্রামটা দেখে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবো।"

সারেঙ বলিল "নতুন যায়গা, আপনি মেহেরআলীকে সঙ্গে নিয়ে যান বাবুসাহেব, জংলী বর্ম্মাদের বিশ্বাস নেই,

টাকা পয়সার লোভে সবই করতে পারে তারা। এই সেদিন এক সাম্পানের মাঝিকে এক কোপে ছুখানা করে ফেল্‌লো। বর্ম্মাটা ধরা পড়েছে। ম্যাজিষ্ট্রর সাহেব যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'কেন এমন কাজ করলি?' সে বল্‌লে—আমার হাতটা সই আছে কিনা দেখছিলুম। এরা কি মানুষ কর্ত্তা?"

অমরেশ হাসিয়া বলিল, "আমাকে মারবে না, ভয় নেই, আমার সঙ্গে বর্ম্মাদের বেশ ভাব আছে। এই গ্রামে আমার চেনা লোকও আছে বোধ হয়, তাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরব, কিছু হবে না।"

অমরেশ ঘাটে নামিয়া দেখিল এক বর্ম্মিনী সাম্পানে ইলিশ মাছ বোঝাই করিয়া বিক্রয়ের জন্য নিকটবর্ত্তী কোন সহরে লইয়া চলিয়াছে। সে বর্ম্মিনীকে ডাকিয়া চারিটী ইলিশ মাছ কিনিয়া একটী সান্-ব্যাগে পুরিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কি এই গ্রামে?"

বর্ম্মিনী বলিল—"হ্যাঁ, ঐ যে ধানক্ষেত দেখা যাচ্ছে, ওর কাছেই আমার ঘর। বাবু কোথায় যাবে? 'ঙা-তালাও' (ইলিশ মাছ) কা'কে খাওয়াবে?" অমরেশ বলিল "আমি ধান জমি কিনব, তাই দেখতে এসেছি। মা টিন্-চির ঘর কোথা, বল্‌তে পার? তার জমি আমি কিনব।"

বর্ম্মিনী বুড়ী চটিয়া উঠিয়া বলিল, "মা টিন্-চির তো বড় জমি আছে, তা আবার কিনবে? যেটুকু ধান হয়, তাতে মা মেয়ের পেটই ভরে না, তাও বেচে দিলে খাবে কি? ধান জমি চাও তো আমার কাছে এসো. গ্রামের অর্দ্ধেক ধান-ক্ষেত তো আমারই। মা খিন্ কে এ গ্রামে চেনেনা কে? বাবু, ঘণ্টা দুই অপেক্ষা কর তো, আমি বাজারে মাছ ক'টা বেচে আসি। তোমায় জমি দেখাব। মা টিন্-চির ঘর আমার ঘরের কাছেই, এই ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, ঘর দেখিয়ে দেবে। ওরে বা-তিন, এই বাবুকে মা টিন্‌চির ঘরে নিয়ে যা।"

"মা টিন্‌চির কপাল ভাল, এমন খদ্দের জুটিয়েছে।" বুড়ী মা খিন্ আপন মনে বকিতে বকিতে সাম্পান বাহিয়া চলিয়া গেল।

অমরেশ মা বাতিন্‌কে সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত গল্প করিতে করিতে গ্রামের লাল ধুলো-ভরা রাস্তা দিয়া চলিল। বা-তিন মা-খিনের নাতি, হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা একটী সার্ট গায়ে, লুঙ্গী বা পায়জামা প্রভৃতির কোন বাহুল্যের বোঝা নেই তার পরণে। মাথার তালুর উপর একটী ছোট্ট খোঁপা বাধা, খোঁপার চারদিক দিয়ে গোল সিঁথি, তাহার চারি পাশ দিয়া ছোট ছোট চুল ঝুলিতেছে। মাথার নীচের দিকটা পরিষ্কার করিয়া কামানো। হাতে একটী বঁড়শী, আর এক হাতে একটী চুপড়ী, তাতে কুঁচো কুঁচো কতগুলো মাছ।

অমরেশ তাহার সহিত গল্পে গ্রামের অনেক খবর পাইল। মা টিন্‌চির মেয়ের নাম মা হ্লা হ্লা, সে তাকে খুব ভালবাসে, গায়ের সার্টটী সে-ই সেলাই কোরে দিয়েছে। মা-টিন্‌চির অনেক হীরের গয়না আছে, তার মায়ের নেই বলে তাদের বাড়ীর সকলে তাকে হিংসা করে। কিন্তু মা টিন্‌চি লোক ভাল, সে আর তার মেয়ে টিনের খেলনা তৈরী কোরে রং দেয় আর সহরের বাজারে বেচতে যায়। মা হ্লা হ্লা তাকে আর পাড়ার ছেলেদের সবাইকে খেলনা দিয়েছে। আজ সে এই মাছগুলি মা হ্লা-হ্লাকে খেতে দেবে বলে অনেক কষ্টে ধরেছে। কিন্তু বাবু যে এতগুলো ঙা-তালাও নিয়ে যাচ্ছেন তা পেয়ে ওরা এতো খুসী হবে যে তার মাছ আর আজ পছন্দ হবেনা।

এতো সহজে 'রূপসীর' সন্ধান মিলিল দেখিয়া অমরেশ মহা খুসী হইতেছিল। এক সপ্তাহও হয় নাই রূপসীর নিকট বিদায় লইয়াছিল কিন্তু মনে হইতেছে যেন কতো দিন তাহাকে দেখে নাই। রূপসীকে এত শীঘ্র সে কি করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল, সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সে তো বহুকাল এদেশে রহিয়াছে, কতো বর্ম্মা মেয়ে দেখিয়াছে কিন্তু কখনও তো এমন ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। রূপসীকে বিদায় দিয়া সেদিন যখন ঘরে ফিরিয়াছিল, মনটা যেন তাহার কেমন উদাস বোধ হইয়াছিল। কাজকর্ম্মে মন দিয়া তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারে নাই। সে মনে মনে ভয় করিতেছিল যদি আবার রূপসীর সঙ্গে দেখা হয়, হয়ত প্রলোভনে পড়িয়া যাইবে, হয়ত এমন ফাঁদে পড়িবে যে আর তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। তাই প্রতিদিনই প্রতিজ্ঞা

করিতেছিল কিছুতেই আর তাহার সহিত দেখা করিবে না। জঙ্গলের কাজে বাহির হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাহার সংকল্প দৃঢ় ছিল কিন্তু নদীতে যাইতে যাইতে সংকল্প শিথিল হইয়া গেল। মা টিন্‌চির নিকট তাহাদের গ্রামের নাম ও নিশানা বুঝিয়া লইয়াছিল এবং মা হ্লা হ্লাকে কথা দিয়াছিল, জঙ্গলে যাইবার পথে তাহার অতিথি হইবে। আজ মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে কয়েক ঘণ্টার জন্য তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলে আর দোষ কি? ভদ্রলোকের কথা রক্ষা করাও তো উচিত? দূর হইতে মা টিন্‌চির ঘর দেখিতে পাইয়াই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মঙ্‌ বাতিন্‌ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া খবর দিল, "এদে লা বি কালা এদে লাবি" (অতিথি আসিয়াছে, বিদেশী অতিথি আসিয়াছে)। মা হ্লা হ্লা লাল টুকটুকে একখানি লুঙ্গী বুকের উপরে আঁটিয়া বাঁধিয়া, কুয়োর শান-বাঁধানো ধাপের উপর দাঁড়াইয়া স্নান করিতেছিল। তাহার সুগোল, সুঠাম গৌরবর্ণ বাহু দুইখানি, কাঁধ, গলা, পিঠের ও বুকের অর্দ্ধেক সম্পূর্ণ অনাবৃত। কালো কুচকুচে আজানুলম্বিত খোলা চুলগুলি হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। গোড়ালি পর্য্যন্ত ঢাকা লুঙ্গীর নীচে হইতে ধব্‌ধবে পা দুইখানি দেখা যাইতেছিল। সূর্য্যের আলো তাহার জলসিক্ত দেহখানির উপর পড়িয়া আরও যেন ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছিল। অমরেশ দূর হইতে সে রূপ তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। মা হ্লা হ্লা গামছাখানি চুলের গোছার উপর দিয়া জড়াইয়া জল নিংড়াইতে নিংড়াইতে অমরেশের দিকে চাহিয়া একগাল হাসিয়া বলিল "আমি জানতুম, তুমি আসবেই।" ও কি, তোমার ব্যাগে, ডা-তালাও দেখছি। কী মজা, সবাই মিলে কী আনন্দেরই ভোজ হবে আজ। চল, চল ঘরে বসবে। মা! ও মা শীগগীর ভাত চড়াও, কতো মাছ এসেছে ত্যাখ, কালাবাবু আজ তোমার অতিথি, নিজের খাবার যোগাড় নিজেই এনেছে।"

মা টিন্‌চি গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া এক হাঁটু কাদা ধুলো মাখিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অমরেশকে বলিল "আমার আজ কি সৌভাগ্য, তুমি আমার ঘরে এসেছ, ফায়া আমার প্রতি প্রসন্ন, তা' নিশ্চয় বুঝতে পারছি। ওরে বা-তিন্ তুই কোথা থেকে এ বাবুকে ধরে আনলি? তোরও আজ আমার ঘরে নেমন্তন্ন, মাছ ভাত খেয়ে যাবি।

তোর দিদিমা এক সাম্পান মাছ নিয়ে গেল বেচ্‌তে কত চাইলুম একটা মাছ চার আনায় দিয়ে যা, কিছুতেই আট আনার কমে ছাড়বেনা বল্‌লে। মেয়েটা ডা-তালাও বড় ভালবাসে, তা ফায়াই জুটিয়ে দিয়েছেন। বা-তিন বলিল "বাবু তো দিদিমার কাছ থেকেই চার টাকা দিয়ে চারটে মাছ কিনে আন্‌লেন।" অমরেশের এ সব কথায় মনোযোগ ছিল না, সে একদৃষ্টে কুয়োর পাড়ের দিকে তাকাইয়াছিল। মা হ্লা হ্লা চুলগুলি মুছিয়া মাথার উপর গামছা খানি রাখিয়া পিঠের উপর ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে আসিতেছিল। অমরেশ দেখিয়া দেখিয়া ভাবিতেছিল কি নিঃসঙ্কোচ ইহারা। কুয়োর পাড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া কেমন স্বচ্ছন্দে স্নান করিতেছে একখানি মোটা রঙ্গিন লুঙ্গী এমন ভাবে পরা কোথাও অসংযত নয়, ভিজিলেও দেহের কোন অংশ দেখা যায় না। পরিচিত, অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া জড়সড় হইতেছে না দৌড়াইয়া পলাইতেছে না।

অমরেশ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দেখিল ঘরখানি ছোট হইলেও, অতি পরিষ্কার। কাঠের মেঝে, মিশমিশে পালিশ, কোথাও একটী পায়ের চিহ্ন নাই। হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল তাহার জুতার দুই একটী ছাপ পড়িয়া ঘর খানির সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। সে সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া হাতে লইয়া ঘরের বাহিরে রাখিল এবং পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া জুতার দাগগুলি মুছিতে লাগিল। মঙ্‌ বাতিন চীৎকার করিয়া বলিল "দ্যাখ মাসী, বাবু কি করছেন?" মা টিন্‌চি ঘরে আসিয়া অমরেশের হাত হইতে রুমাল কাড়িয়া লইয়া বলিল "ওকি বাবু, তুমি আমার ঘর মুছবে নাকি?"

অমরেশ বলিল—তোমরা জুতো পরে কখনো ঘরে আসনা, সেকথা ভুলে গিয়েছিলাম, বড় বিশ্রী দেখাচ্ছিল আমার জুতোর দাগগুলি।

মা টিন্‌চি বলিল "না, না বাবু তুমি জুতো পরেই এসো,

তোমাদের যা অভ্যেস্, আমি না হয় আর একবারই ঘর মুছবো।"

মা টিন্‌চি একখানি ডেক্-চেয়ার টানিয়া অমরেশকে বসিতে দিল এবং একখানি পাখা আনিয়া মঙ্ বা-তিনের হাতে দিয়া বলিল—"তুই বাতাস কর, আমি খাবার যোগাড় দেখি"।

অমরেশ বলিল—"বা-তিন্ তুমি খেলো গিয়ে, আমি বাতাস চাই না"। বা তিন্ মহা আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অমরেশ ঘরখানি দেখিতে লাগিল। আসবাব বেশী নাই, একখানি বড় তক্তাপোষে মা ও মেয়ের বিছানা, বালিশের ওয়াড়গুলির উপর রঙিন্ সুতোর মনোরম শিল্প কার্য্য, ঘরের মাঝখানে একখানি ছোট টেবিল। ধব্‌ধবে সাদা টেব্‌ল কভার ঢাকা, তাহাতেও সুচী-শিল্পের সুন্দর নমুনা। একটী কাঁচের ফুলদানীতে কয়েকটী সদ্য-ফোটা গোলাপ ফুল। ঘরের দেয়াল ঘেঁসিয়া দুই চার খানি চেয়ার। ঘরের এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো উঁচু একখানি তাক্, সেটী রেশমের কাপড়ে ঢাকা। ঢাকা চাদর-খানির চারি পাশ হইতে নানা রংয়ের কাঁচের কাঠির ঝালর ঝুলিতেছে, কাগজের তৈরী টবে-বসানো ফুলগাছ চার কোণে চারটী, তার মাঝখানে শ্বেত পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সম্মুখে রঙিন্ কাচের গেলাসে করিয়া পানীয় জল এবং একটী রেকাবীতে একখানি ছোট্ট ফুলকাটা তোয়ালে পাট করা রহিয়াছে। এই স্থানটী গৃহস্থের পূজার ঘর। মা হ্লা হ্লা, সাদা পাতলা কাপড়ের পরিষ্কার ইস্তিরী করা এঞ্জি গায়ে, সবুজ রেশমের লুঙ্গী পরণে, মুখে, হাতে, পায়ে তানেখা মাখা, এলো চুলগুলির আগায় একটী গ্রন্থি বাঁধা, ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। অমরেশের দিকে একবার তাকাইল কিন্তু কোন কথা বলিল না। ফায়ার সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত যোড় করিয়া স্তোত্র পাঠ করিল, তার পরে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া উঠিল। একটু মিষ্টি হাসি দিয়া অমরেশকে সম্ভাষণ জানাইয়া একখানি চেয়ারে বসিল।

অমরেশ বলিল "রূপসী, দেখ, তোমার খোঁজ কোরে ঠিক্ তোমার বাড়ী এসেছি, তোমার আকর্ষণী শক্তি বড় কম নয়, কি বল?" রূপসী বলিল "জঙ্গলে নিজের ব্যবসার কাজেই এসেছ বোধ হয়, শুধু আমাকে দেখ্‌তে তো আসনি"?

অমরেশ—আমার জঙ্গল তো আরও অনেক দূরে, এ গ্রামে তো মানুষ জনের বসতি আছে দেখ্‌ছি, আমি যে জঙ্গল নিয়েছি, সেখানে একখানা ঘরও নেই। নদীর ওপর বাঁশের ভেলার ঘর বেঁধে থাকি, বন্দুক দিয়ে হরিণ, শুয়োর, পাখী মেরে খাবার যোগাড় করি। চাল, ডাল প্রভৃতি সহর থেকে নিয়ে যেতে হয়। এখানে যদি কাঠ পেতাম, তবে তো সুবিধেই ছিল, তোমার অতিথি হোয়ে আনন্দে দিন কাটত। জঙ্গলে একা একা ভাল লাগে না।

মা হ্লা, হ্লা—আমার কিন্তু ঐসব যায়গায় থাকতে ইচ্ছা করে, যেখানে লোকজন বেশী নেই। এ গ্রামের লোকগুলো ভারি ঝগড়াটে, স্বার্থপর, সারাদিন পাড়া-পড়শীর মধ্যে মারামারি, চুলোচুলি চল্‌ছেই।

অমরেশ—চল না, তোমাকে নিয়ে যাই সঙ্গে কোরে। দুজনে মিলে জঙ্গলে জঙ্গলে শীকার কোরে বেড়াব, আর ক্লান্ত হোলে নদীর বুকে বাঁশের ঘরে এসে বিশ্রাম করব। ওঃ, তোমায় সাথী পেলে আমি সারা জীবন ঐ জঙ্গলে কাটিয়ে দিতে পারি।

রূপসীর মুখখানি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। সে এঞ্জির হীরের বোতামগুলি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল—"আমায় নিয়ে গেলে তোমার সমাজের লোকেরা তোমায় নিন্দে করবে যে, আর আমার মাও বোধ হয় যেতে দেবে না"।

অমরেশ—তুমি নিজে যেতে রাজী আছ কিনা তাই বল আগে, অন্য সব চিন্তা আমার।

রূপসী মাথা নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। এমন করিয়া নিজের মনটা এত সহজে কথার ফাঁক দিয়া ধরা পড়িবে, তাহা সে ভাবে নাই। যদিও অমরেশকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ সে অন্তরে অনুভব করিত, অমরেশকে কাছে পাইবার জন্য তাহার কথা শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইত, তবু আশা করে নাই যে এমন সুযোগ আর কখনও হইবে যেদিন অমরেশ তাহারই

ঘরে অনাহুত অতিথির বেশে আসিয়া নিজ মুখে তাহাকে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া তাহার মনের ভাব অমরেশ সহজেই বুঝিয়া লইল এবং বলিল "আমি যদি তোমার মায়ের অনুমতি নিতে পারি, তবে তোমায় কিন্তু যেতে হবে, আপত্তি করতে পারবে না"।

সেই মুহূর্ত্তে মা-টিন্‌চি ঘরে প্রবেশ করিল এবং মেয়ের মুখখানা দেখিয়াই বুঝিল, ব্যাপার গুরুতর। সে বুদ্ধিমতী রমণী, একবার অমরেশের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মেয়েকে বলিল "তুই যা, বাবুর খাবার ব্যবস্থা কর, আমার রান্না হোয়ে গেছে"। "বাবু, তুমি কি কখনো বর্ম্মাদের রান্না খেয়েছ? 'ঙা-তালাও' খেতে তোমরা ত খুব ভালবাস জানি, আমাদের রান্না খেতে পারবে কিনা তাই সন্দেহ।"

অমরেশ বলিল—আমার সবই অভ্যেস্ আছে, তোমাদের 'ঙাপ্পি' টা ছাড়া আর প্রায় সবই চলে, মায় শূয়োর পর্য্যন্ত। গোসাপের ডিমও খেয়ে দেখেছি একবার, মন্দ লাগে না।

মা টিন্‌চি—বাবু, তুমি বিয়ে করনি সত্যি?

অমরেশ—কেন, অবিশ্বাস হোচ্ছে নাকি তোমার? আমায় কি খুব বুড়ো দেখাচ্ছে?

মা-টিন্‌চি—বুড়ো কোথায়? তোমায় দেখ্‌লে আমার ছেলের কথা মনে পড়ে, সে বেঁচে থাকলে, এতো বড়টী হোত এতদিনে। সে আমার প্রথম সন্তান ছিল। আচ্ছা, বাঙালী বাবুরা এমন বয়সে সবাই বিয়ে করে, তুমি করনি কেন?

অমরেশ—তোমার মেয়েকে দেখে ভারি পছন্দ হোয়েছে আমার, জামাই কোরবে আমাকে?

মাটিন্‌চি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কপালে বারবার হাত ঠেকাইয়া বলিল "আমার কি এতবড় সৌভাগ্য হবে কখনো? বর্ম্মা মেয়েদের কি তোমরা বিয়ে করবে? দেশে নিয়ে যেতে পারবে? আমি জানি, ঢের বাবু আছে, যারা বর্ম্মা মেয়েদের রূপে ভুলে তাদের ঘর থেকে বের কোরে নিয়ে যায়, দুই চার বছর আদর কোরে রাখে, তারপর দূর কোরে তাড়িয়ে দিয়ে বা না জানিয়ে দেশে পালিয়ে যায়।"

অমরেশ—আমার সম্বন্ধে সে ভয় নেই। আমি তো বর্ম্মাবাসী, এদেশে জন্মেছি, এদেশেই মানুষ, বাড়ীঘর সব রেঙ্গুনে। তোমার মেয়েকে দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না, আমিও রেঙ্গুন ছেড়ে কোথাও যাব না।

মাটিন্‌চি—বাবু, আপনি ধনীলোক, আপনার বিয়ের জন্য মেয়ের অভাব কি? আমার মেয়ের না আছে রূপ, না আছে টাকা। তোমাকে বাঁধবার উপযুক্ত কিছুই আমাদের নেই। গরীব মানুষকে ক্ষমা কর, ছেড়ে দাও।

অমরেশ—রূপ নেই তোমার মেয়ের? আমি অনেক কেরিন (Karen) সুন্দরী মেয়ে দেখেছি কিন্তু বর্ম্মা মেয়ে তোমার মেয়ের মতন সুন্দরী কখনও দেখিনি। বর্ম্মা মেয়েদের আমার বড় ভাল লাগে। কী নম্র, মিষ্টি তোমাদের ধরণধারণ! তোমার মেয়েকে আমার হাতে দাও দেখ্‌বে, কত সুখে থাক্‌বে।

মাটিন্‌চি একটু গম্ভীর হইয়া গেল। অমরেশকে দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল যে সে ধনী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। এমন ছেলের হাতে মেয়ে পড়িলে সুখে থাকিবে নিশ্চয়ই, এই ভাবিয়া তাহার প্রলোভন হইতেছিল, আবার বিদেশীর হাতে বিশ্বাস করিয়া মেয়েকে দিতেও যেন একটু ভয় হইতেছিল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মেয়ে যদি চায় তোমার সঙ্গে যেতে, আমি বাধা দেব না। মেয়ের তো বয়স কম হয়নি, এই আঠারো বছর হোল। ওর বাপ তো ওর জন্ম দিয়েই আমায় ফেলে আর একজনকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। সেই থেকে ওকে বুকে কোরে কত কষ্টে মানুষ করেছি, কি সংগ্রামই গেছে, এক ফায়া জানেন। বর্ম্মা পুরুষগুলো জানতো কি কুঁড়ে ও অকর্ম্মণ্য, কতকগুলো আবার বড় নেমকহারামও হয়। এক পয়সা রোজগার করবার মোরদ নেই, স্ত্রীর রোজগারে খায়, পরে তবু তেজ কত? কথায় কথায় শাসন করে, "চললুম তোর ঘর ছেড়ে, ঢের মেয়ে জুটবে"। আমার স্বামী চলে যাবার পরে কতো পুরুষ আমাকে ফোস্‌লাতে এসেছিল, আমি ছিলুম শক্ত মেয়ে, তাই কাউকে কাছ ঘেঁস্‌তে দিইনি। তাই আজ সুখে স্বচ্ছন্দে দুটী খেয়ে প'রে আছি, দুটো হীরের গয়না পরছি। কাউকে আমল দিলে কি টাকা পয়সা থাক্‌ত কিছু? মেয়েটার জন্যেই ভাবনা ছিল। তা, তোমার সঙ্গে

যদি যেতে চায় থাক্, ওর অদৃষ্টে সুখ থাক্‌লে সুখী হবে, নইলে আমি আর কি বল্‌ব ?

মা হ্লা হ্লা করেকখানি প্লেটে করিয়া ভাত, তরকারী সাজাইয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরের এক পাশে মেঝের উপর একটী গোল জল চৌকি, তাহার উপর পরিষ্কার চাদর পাতা। মা হ্লা হ্লা তাহার উপর একটা বড় সুপ্‌-প্লেটে ভাত, একটাতে ইলিশ মাছের ঝোল, একটা বড় বাড়ীতে হিঙ্গো (Soup), অর্থাৎ সুপ্‌, একটী ছোট বাটীতে ঙাপ্পি এবং একটা ছোট প্লেটে কতগুলি কাঁচা শাকপাতা, বরবটী, চারটী শুক্‌নো কুঁচো চিংড়ী সাজাইল। তিনখানি খালি প্লেট, এবং ছোট ছোট চিনেমাটীর চামচ কয়েকখানাও রাখিল।

খাবার আয়োজন শেষ করিয়া মা হ্লা হ্লা মায়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাটিন্‌চি অমরেশকে বলিল, "চল বাছা খাবে চল।"

অমরেশ লক্ষ্য করিল এতক্ষণ মা টিন্‌চি তাহাকে 'বাবু, সম্বোধন করিতেছিল, এখন পুত্রের ন্যায় স্নেহের ডাকে আপন করিয়া লইল।

অমরেশ জল চৌকির নিকট মাটীতেই বসিয়া পড়িল, মা ও মেয়ে অভ্যাসমত উবু হইয়া বসিল। অমরেশ প্রথমে খানিকটা বেশী করিয়া ভাত ও মাছের ঝোল নিজের প্লেটে লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল, অনেক পীড়াপিড়ি সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার কিছুই লইল না। বর্ম্মাদের রীতি অনুসারে প্রত্যেকে নিজের নিজের চামচ্‌ দিয়া একই বাটী হইতে সুপ, তরকারী এবং ঙাপ্পি তুলিয়া মুখে দিতে দেখিয়া, অমরেশের আর দ্বিতীয়বার লইবার প্রবৃত্তি হইল না। বর্ম্মাদের রান্না খাদ্য তাহার খাওয়া অভ্যাস থাকিলেও বাঙালীর জাতগত উচ্ছিষ্ট বিচারের সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে সে পারে নাই। মাটিন্‌চি ও তাহার মেয়ে এত অল্প খাওয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিল নিশ্চয়ই রান্না ভাল লাগিতেছে না। খাওয়ার পর বাঁ হাত উল্টাইয়া ঘড়ি দেখিয়া অমরেশ বলিল—উঃ এর মধ্যে সাড়ে চারটে বাজ্‌ল!"

মাটিন্‌চি বলিল, "এত অবেলায় কি শোবে আর? তোমরা গল্প কর, আমি পাশের বাড়ী থেকে একটু ছাগলের দুধ পাই কিনা দেখি, সন্ধ্যেবেলা কফি খাবে তো?

অমরেশ বলিল, আমি একটু রূপসীকে নিয়ে বাড়ীর চারধার ঘুরে ফিরে দেখি। ছয়টার সময় কফি খেয়ে লঞ্চে ফিরব।" মাটিন্‌চি বলিল—তুমি তো নিজের লঞ্চেই এসেছ? তবে ফির্‌বার তাড়াতাড়ি কি? রাত্রে তো লঞ্চ চল্‌বে না এ নদীতে, কাল ভোরেই যেয়ো, আমার ঘরে কি একরাত্রি শোবার যায়গা হবে না?

অমরেশ হাসিয়া বলিল "এত আদর কোরলে কিন্তু ঘর ছাড়ব না, শেষে মুস্কিলে পড়বে।"

মাটিন্‌চি, একটী গালার গেলাস হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অমরেশ বলিল—রূপসী, এবার তুমি আর আমি, দুজনে এসো বোঝাপড়া করি।

মা হ্লা হ্লা চুলের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে বলিল—"বেড়াতে যাবে না বল্‌ছিলে? সবুর কর, আমি চুল বেঁধে নিই।"

অমরেশ টেবিল হইতে শুষ্ক-ভুট্টার পাতায় মোড়া লম্বা মোটা একটী বর্ম্মা চুরুট লইয়া মুখে দিল এবং বলিল—রূপসী তুমি প্রস্তুত হোয়ে এসো, আমি ততক্ষণ তোমাদের বাগানটা দেখি।"

৩

"রূপসী, ধর ধর ঐ সাদা হাঁসটা, ঐ আনারসের ঝোপের মধ্যে পড়েছে বোধ হয়। ওঃ, ওটা রোষ্ট্‌ কোরলে কি আরামই লাগবে খেতে।"

বাঁশের র‍্যাফ্‌টে (raft) বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে অমরেশ নিজের শীকার করা প্রাণীটীর সন্ধানে এদিক্‌ ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ একটা সাদা জিনিস অদূরে জঙ্গলে দেখিতে পাইয়া রূপসীকে ডাকিল।

রূপসী কাঁধের উপর একটী শান্‌-ব্যাগ (shan bag) ঝুলাইয়া নদীর পাড়ে উঠিয়া কামরাঙা, আমলকি, পেয়ারা সংগ্রহ করিতেছিল। অমরেশের ডাক্‌ শুনিয়া বলিল "আমি পারব না ঐ জঙ্গলে যেতে, আমার পায়ে কাঁটা ফুটে যাবে, তুমি নিজে এসো না নেমে"।

অমরেশ বন্দুকটী ঘরে রাখিয়া একটী মাছধরা ডিঙ্গির সাহায্যে পারে আসিয়া নামিব।

রূপসী একটী বটগাছের ডালে বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে পেয়ারা খাইতেছে আর গাহিতেছে—

লাবি মঙ্ মঙ্, ফুক্লা পেয়ং"……(বঁধু এসেছে,
তোমার প্রেম অর্পণ কর)

অমরেশ হাঁসটী কুড়াইয়া একটী ছোট গাছের ডালের আগায় বাঁধিল এবং ডালটী কাঁধে ফেলিয়া রূপসীর নিকট আসিয়া বলিল "কে গো তোমার বঁধু? কাকে তোমার প্রেম বিলাবার জন্য আকুল হোচ্ছ, শুনি"?

রূপসী দুই হাতে অমরেশের গলা জড়াইয়া বলিল— তুমিই তো আমার বঁধু, তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না।"

অমরেশ হাসশুদ্ধ লাঠিটা মাটীতে ফেলিয়া রূপসীর পাশে উঠিয়া বসিল এবং এক হাতে তাহার কটিবেষ্টন করিয়া তাহাকে আরও নিকটে টানিয়া লইল।

রূপসী অমরেশের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল বঁধু, আমাকে ছেড়ে যাবে না তো কখনো? আমার কেবল ভয় হয়, কি জানি কখন আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে তুমি দেশে পালিয়ে যাও"।

অমরেশ বলিল—না, রূপসী, তোমায় নিয়ে এই জঙ্গলে যে সুখে ঘরকন্না করছি, এমনটী আর কোথাও পাব না। রূপসী বলিল—আমার মা আমায় কতো সাবধান করেছিল 'যাস্‌নি কালার কাছে'। পাছে মা আমায় আসতে না দেয়, তাইতো আমি মাকে লুকিয়ে জেলেদের নৌকো কোরে রাত্তিরবেলা পালিয়ে এসেছিলুম। তারপর এখানে এসে যখন শুনলুম তুমি সহরে গিয়েছ, একমাস পরে আস্‌বে, তখন আমার যে কি ভয় হোয়েছিল, তোমায় তো সব কথা বলিনি। এই জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে নদীর পারে বসে কাঁদ্‌ছিলাম, এমন সময় তোমাদের কর্ম্মচারী আবদুলের দেখা পেলাম। সে তোমার নাম শুনে বল্লে, 'বাবুতো সহরে যাননি, আর একটা জঙ্গল দেখ্‌তে গেছেন, এই পথেই ফিরবেন, তুমি এই বাঁশের ঘরে থাকো, আমি তোমায় পাহারা দেবো, খেতে দেবো, কোন ভয় নেই। আবদুল বড় বিশ্বাসী চাকর তোমার, না? আমার জিজ্ঞাসা কোরে যখন জান্‌লে, তুমি আমায় ভালবাস, এখানে আসতে বলেছ তখন থেকে কি যত্নেই রেখেছিল! আমি যখন রাতের বেলা ঐ পাতার ঘরখানিতে শুতুম, আর কাণ পেতে জোয়ারের জলের কুলকুল শব্দ শুনতুম, মাঝে মাঝে বুনো জন্তুদের ডাকে চম্‌কে উঠে ভয়ে ভয়ে ডাকতুম, "আবদুল, তুমি আছ তো?" আবদুল বন্দুক উঁচিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করে বল্‌ত "কিছু ভয় নেই বেটী, ঘুমোও, এ বুড়োর জান্ থাক্‌তে তোমায় কেউ কিছু করতে পারবে না।"

অমরেশ রূপসীর গল্পে বাধা দিয়া বলিল "আর আমি যখন সাম্পানে আস্‌তে আস্‌তে ভাব্‌ছিলুম, রূপসী আমায় ভুলেই গেল দেখ্‌ছি। দু'মাস হোয়ে গেল, আস্‌বে বোলে এলোনা। আহা! এই নিরালা জঙ্গলে নদীর বুকে বাঁধা ছোট ঘরখানিতে যদি রূপসীকে সাথী পেতাম, কি স্বর্গের সুখই ভোগ করতাম। আমি শীকার কোরে আহার সংগ্রহ ক'রতাম, আর রূপসী রেঁধে খাওয়াত। সে সুখ বুঝি কল্পনাতেই রয়ে গেল, রূপসী কি আর কালাকে বিশ্বাস কোরতে পারবে? হঠাৎ আমার বাঁশের ভেলার উপর চোখ পড়তেই দেখি প্রতিমার মতন একখানি মূর্ত্তি এক পিঠ কালো চুল রোদের মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে এক মনে কি ভাব্‌ছে! উঃ! কি আনন্দই যে হোল তোমায় পেয়ে সেদিন। আর তারপর থেকে, কেমন সুখে ছুটীতে আছি, বলত?"

রূপসী বলিল "কিন্তু তুমি যখন সহরে চলে যাও, তখন আমার প্রত্যেকবারই ভয় হয়, বুঝি আর ফিরবে না।"

অমরেশ বলিল—এ তোমার মিছে ভাবনা রূপসী, ছয়মাস কেটে গেল, প্রত্যেক মাসেই কি আমি ঠিক্ সময় আসিনি? আর প্রত্যেকবারই পনেরো দিন করে তোমার কাছে থাকিনা?

রূপসী বলিল—আচ্ছা, তুমি তো আমাকে গ্রহণই করেছ, তবে কেন সহরের বাসাতে আমাকে নিয়ে যাওনা?

অমরেশ—সহরে বাঙালী অনেক, সেখানে তোমায় নিয়ে গেলে সকলে নিন্দে করবে, তোমাকে হয়ত কেউ অপমান করে বসবে। দেশে খবর পাঠিয়ে দেবে আমি বর্ম্মিনী বিয়ে

করেছি, তখন আমার মা কাঁদবে। তারা তো তোমার আমার মনের খবর নেবে না? দেশের লোকের কাছে বর্ম্মিনী বিয়ে করাই অধর্ম্ম, হয়ত বিধর্ম্মী, জাতিচ্যুত বোলে আইন দেখিয়ে আমাকে আমার বাপের সম্পত্তি হোতে বঞ্চিত করবে। কি দরকার অতো হাঙ্গামার? সহরের কাজকর্ম্ম দেখবার জন্যে একজন পাকা লোক ঠিক হোলে আমি জঙ্গলেই থাকব এসে। এখানেই ভাল বাড়ী করব দেখো, তুমি রাজরাণী হোয়ে থাকবে তখন।"

রূপসী হীরার দুল দুলিয়ে অহ্লাদে বলিয়া উঠিল "তোমার দৌলতে আমার কতো সুখ হবে, এই তো ছয় মাসেই কতো হীরের গয়না কতো রেশমী লুঙ্গী পেয়েছি। এখানে একটা পাকা বাড়ী কোরে দিলেই আমার সুখ সম্পূর্ণ হবে। তখন মাকে নিয়ে আসব, কেমন? আহা! মা বুড়ী আমার জন্যে কতো কষ্ট সয়েছে, তাকে শেষ বয়সে যদি একটু আরামে রাখতে পারি!

অমরেশ বলিল—বাড়ীর জন্য কি? দেখো দুই তিন মাসের মধ্যেই তোমার বাড়ী হোয়ে যাবে।

* * * *

এমনি সোহাগে রূপসীর দিন কাটিতে লাগিল।

অমরেশ সকাল বেলা কয়েক ঘণ্টা ব্যবসার কাজে জঙ্গলের ভিতরে যায়, রূপসী তখন ঘরে বসিয়া পরিপাটী করিয়া ছোট্ট সংসারটুকু সাজাইয়া রাখে। বিকাল বেলা দুজনে মিলিয়া কখনো সাম্পানে নদীতে বেড়াইতে যায়, কখনো বা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া হরিণ শিশুর সহিত খেলা করে।

জঙ্গলের কাছারীর বৈঠকে আলিমিঞা, নফরুদ্দিন, রহমন রঙ্গস্বামী, আয়ার স্বামী প্রভৃতি কর্ম্মচারীর দল বাবুর হাল চাল, বর্ম্মিনী-প্রেম লইয়া বেশ একটু রঙ্গ-রস করে। বৃদ্ধ আবদুল তাহাদের আলোচনায় যোগ দেয়না বরং বিরক্ত হইয়া বলে "আরে বাপু, বয়সের যা ধর্ম্ম! তোদের পয়সা থাক্‌লে তোরাই কি না কোরে ছাড়তিস্? বর্ম্মার জঙ্গলে তো জীবন কাটালাম, কত বাঙালী, কতো মান্দ্রাজী, কত পাঞ্জাবী, কত গুজরাটী, কতো সাহেবেরও কাছে কাম করলাম, কেউ ঐ পাপের উর্দ্ধে থাকৃতে পারেনি। আমাদের বাবুকে তো ভাল দেখছি, একজনকে পছন্দ কোরে তাকে নিয়ে ঘর করছে, আর কতো সাহেবকে, কতো বাবুকে দেখেছি জঙ্গলে, বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাদের ভয়ে, বর্ম্মিনী, কুরুঙ্গী মেয়েগুলো পালিয়ে বেড়াত। আমিই কতবার সাম্পানে কোরে ঘুরে ঘুরে গ্রামের থেকে মেয়ে এনে দিয়ে বকশিশ্ পেয়েছি।"

* * * *

একদিন ভোরের বেলা ঘরের বাহিরে ভেলার উপর দুইখানি ডেক্ চেয়ার পাতিয়া বসিয়া অমরেশ এবং রূপসী কফি খাইতেছে, এমন সময় লাল চাপরাশ আঁটা, সাদা সাদা পাগড়ী মাথায়, সাদা চাপকান্ গায়ে এক আরদালী লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল।

অমরেশ বলিল—কি গুল্‌জার্, খবর কি?

গুল্‌জার—হুজুর, মুলুকসে কেয়া জরুরী তার ভেজা মালুম নেই, কেরানী সাহেব তো হাম্‌কো একদম্ দৌড় করকে লে আনে বোলা"।

গুল্‌জার হিন্দুস্থানী দ্বারওয়ান, বাবুদের বাড়ী বহুদিন চাকরী করিয়া বাঙ্‌লা শিখিয়া গিয়াছিল, তবে নিজে ঠিক্ বলিতে পারিত না। নিজের ভাষাও বাংলা দেশে থাকিয়া অনেকটা ভুলিয়াছিল, খাঁটি হিন্দুস্থানীও বলিতে পারিত না। বাবুর হাতে চিঠি দিয়া সে একটু সরিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রূপসীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সে জঙ্গলে অনেকদিন আসে নাই, বাবুর যে একজন বর্ম্মিনী জুটিয়াছে, এ খবরও জানিত না। মনে মনে ভারি অসন্তুষ্ট হইল, কিন্তু প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই তাহা বুঝিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে অমরেশের মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। রূপসী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি খবর? কোন দুঃসংবাদ নাকি?"

অমরেশ কথার উত্তর না দিয়া বলিল "গুলজার, তুমি একটা ছোট সাম্পানে গিয়ে কিছু রেঁধে খাও, চাল ডাল সবই আছে। আমরা এক সঙ্গেই সহরে ফিরবো, আবদুলকে খবর দাও একটা বড় সাম্পান ঠিক্ করতে।

মাইল চার পাঁচ গেলেই আমাদের বোট্ পাব, বোটে

গেলে কাল দুপুরে পৌছব। সন্ধ্যার ট্রেণে রেঙ্গুন রওনা হওয়া যাবে।"

গুল্‌জার "যো হুকুম" বলিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। রূপসী এতক্ষণ ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলনা কারণ বাংলায় কথাবার্ত্তা হইতেছিল। কিন্তু 'রেঙ্গুন' কথাটা কানে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিল এবং ব্যস্ত হইয়া অমরেশের হাত ধরিয়া বলিল "কি হোয়েছে, বলনা?

তোমায় রেঙ্গুন যেতে হবে? অমরেশ চিন্তিতভাবে বলিল "হ্যাঁ, রেঙ্গুনে একটা জরুরী অর্ডার এসেছে, অনেক টাকার মাল সাপ্লাই করতে হবে। আমি সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ফিরবো।"

রূপসী কিন্তু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলনা, সে অমরেশের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা লক্ষ্য করিয়াছিল, বলিল "তুমি আমায় কি যেন লুকোচ্ছ, জরুরী অর্ডার এলে এতো দুর্ভাবনার কারণ কি? ঐ লোক যে বল্লে "মুলুকসে তার আয়া?"

অমরেশ দেখিল রূপসী হিন্দুস্থানীটুকু বুঝেছে। তখন সে হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ, আমার মায়ের অসুখ, সে খবরও দিয়েছে।"

রূপসী—তবে তুমি নিশ্চয় কল্‌কাতাও যাবে?

অমরেশ—না, না, আমার যে কাজের চাপ্ পড়লো, তা'তে দেশে যাবার অবসর কই এখন? আমার যদি ফিরতে কিছু দেরী হয়, তুমি হয়ত একা ভয় পাবে এখানে থাক্‌তে। তোমাকে না হয় তোমার মায়ের কাছে রেখে যাই, ফিরবার পথে আবার নিয়ে আস্‌ব।

রূপসী—না আমি আবদুলকে নিয়ে এখানেই থাকি। তুমি খুব শীগ্‌গীর ফিরে এসো। মা যে আমার উপর চটেছে, না বোলে পালিয়ে এসেছি, এখন গেলে হয়ত তাড়িয়েই দেবে।

অমরেশ—আচ্ছা আমি আবদুলকে বলে যাব, আরও দুজন লোক পাহারার জন্য ঠিক্ করতে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া লইয়া, বেলা এগারটার সময় গুল্‌জারকে সঙ্গে লইয়া অমরেশ যাত্রা করিল। রূপসী আবদুলকে বলিল "আবদুল, তুমি চল আমায় নিয়ে মোটর-বোট্ পর্য্যন্ত, আমরা পৌছে দিয়ে আসি বাবুকে।"

অমরেশ গুল্‌জারের মুখে ভীষণ বিরক্তির চিহ্ন দেখিয়া রূপসীকে আর সঙ্গে যাইতে দিলনা। সে বলিল "না, না তোমাদের ফিরবার পথে ভাঁটা পড়বে, ফিরতে রাত হবে, এ নদীর বাঁকটা ভাল নয়, তোমাদের আর গিয়ে কাজ নেই।"

অমরেশ রূপসীর নিকট বিদায় লইবার সময় একটা কাগজের মোড়কে দশখানি দশটাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল "আমার যদি ফিরতে কোন কারণে একটু দেরী হোয়ে যায়, ভেবোনা, রূপসীর মুখখানা আমার সর্ব্বদাই মনে থাক্‌বে।"

রূপসীর চোখ দুইটি জলে টস্‌টস্ করিতে লাগিল।

সাম্পান জোয়ারের টানে শোঁ শোঁ করিয়া ছুটিল।

রূপসী জল-ভরা চোখ দুইটি তুলিয়া যতক্ষণ সাম্পানের শেষ চিহ্নটুকু দেখা গেল, ততক্ষণ নির্নিমেষ দূরের পানে চাহিয়া রহিল। কতবার তো অমরেশ তাহাকে রাখিয়া সহরে গিয়াছে, কিন্তু এবার কেন তাহার মন এত চঞ্চল হইতেছে? কেন জানি তাহার বুকের ভিতর দুরু দুরু কাঁপিতেছে, যেন কি একটা নিরাশার বেদনা তাহার হৃদয় ভাঙিয়া দিতেছে। অমরেশ যেন কি একটা কথা গোপন রাখিয়া গেল! কেবলই তাহার মন বলিতে লাগিল "আর তাকে পাবিনা।"

মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে তাহার মাথা পুড়িয়া আগুন ছুটিতে লাগিল, তবু সে ঘরের ছাদটীতে হেলান দিয়া ঐ সুদূরের পানে উন্মনা হইয়া চাহিয়া রহিল। দুই গণ্ড বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আবদুল আর এ দৃশ্য সহিতে পারিলনা, বলিল, "বরে যা বেটী, কাঁদছিস্ কেন? বাবু তো আস্‌বে আবার, বলে গেল।"

রূপসী ঘরে প্রবেশ করিয়া চাটাইয়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

৪

অমরেশ রেঙ্গুনে আসিয়া দেখিল—বাড়ী ভরা লোকজন। রেঙ্গুনের অফিসে তারে খবর আসিয়াছিল, অমরেশের মা হার্ট ফেল্ করিয়া কলিকাতায় মারা গিয়াছেন। বাড়ীর সরকার এবং গোমস্তারা আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ

করিয়া অমরেশের তরুণী স্ত্রীকে রেঙ্গুনে লইয়া আসিয়াছে। সঙ্গে অমরেশের এক বিধবা পিসী। তিনিই কর্ম্মচারীর মুখে অমরেশ রেঙ্গুনে কম সময় থাকে এবং জঙ্গলেই অধিকাংশ দিন কাটায় খবর শুনিয়া একজন কেরাণীকে অমরেশকে লইয়া আসিবার জন্ম পাঠান। কেরাণী একজন বাঙালী, সে সহরে আসিয়া জঙ্গলের পেয়াদাদের এবং দুইচারি জন মাদ্রাজী কর্ম্মচারীর মুখে খবর পাইল যে, অমরেশ জঙ্গলে একটী সুন্দরী বর্ম্মিনীকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে। তাহার নিজেরই ইচ্ছা ছিল একবার জঙ্গলে যাইয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসে এবং রেঙ্গুনে গিয়া পিসীমার কাছে সব কথা বলে কিন্তু জঙ্গলে যাইবার রাস্তায় নানা বিপদের আশঙ্কা এবং কোন কোন স্থান অতি দুর্গম জানিয়া সে নিরস্ত হইল এবং বিশ্বাসী পুরাতন দ্বারওয়ান্ গুল্জারকে পাঠাইল।

গুল্জার এবং কেরাণীবাবু রেঙ্গুনে ফিরিয়া পিসীমার কাণে সকল কথাই তুলিল।

অমরেশ রেঙ্গুনে পৌছিয়া কলিকাতার বাসার সরকার বাবুকে তাঁহার অবিবেচনার জন্ম একচোট তিরস্কার করিল।

বিধবা পিসীমাকে সমুদ্র পার করিয়া এই ম্লেচ্ছদের দেশে আনিয়া কষ্ট দেওয়ার কোন দরকার ছিলনা। কিশোরী বধুরও বিদেশে একলা ঘরকন্না করিবার যোগ্য বয়স এবং বুদ্ধি হয় নাই, তবু কেন যে সকলকে এখানে আনিয়া ফেলিল ইহাই তাহার বিরক্তির কারণ।

সরকারবাবু প্রবীণ ব্যক্তি, কর্ত্তার আমলের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "পিসীমার এবং বধুমাতার বিশেষ অনুরোধেই তিনি তাহাদের আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। ছোটবাবুর হুকুম হইলেই আবার ফিরাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন।

অমরেশ ইহার উপর আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনের অসন্তোষ মনে চাপা দিয়া মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধে পিসীমার সহিত পরামর্শ করিতে গেল।

শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত বধুর পানে উদ্দেশ করিয়া বলিল "পিসীমা কোথায় ?"

বধু পাশের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্নের জবাব দিল।

অমরেশ স্ত্রীর নিকটে আসিয়া রূঢ়কণ্ঠে বলিল "তুমি নাকি সরকারবাবুকে বলেছ তোমাকে এখানে নিয়ে আস্তে ?

আজকালকার বৌ ঝিয়েরা সব স্বাধীন হোয়েছেন! আমার অনুমতিরও অপেক্ষা করা দরকার মনে করলেনা বুঝি ?"

বধু কোনও উত্তর না দিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং অবগুণ্ঠন সরাইয়া অমরেশের দিকে চাহিয়া বলিল "নিজেকে স্বাধীন মনে করিনা বলেই তোমার আশ্রয়ে এসেছি। মা হঠাৎ চলে গেলেন, বাড়ীতে আমি একা, চাকর-বাকরে, গোমস্তা কর্ম্মচারীতে ভরা বাড়ী, নিজের বুদ্ধিতে পিসীমাকে আন্তে পাঠালুম। তিনি বল্লেন, তোমাকে জরুরী তার কোরেও যখন জবাব পাওয়া যাচ্ছেনা, তখন এখানে চলে আসাই ভাল। পিসীমা আমাকে পৌছে দিতে এসেছেন, তিনি তাঁর ঘর সংসার ফেলে আমাকে বেশীদিন আগ্‌লে থাক্‌তে পারবে না বলেছেন। সরকারবাবু বল্লেন 'তুমি রেঙ্গুনে সব সময় থাকনা, হয়ত জঙ্গলে কোথাও গিয়েছ, তাই তার পাওনি সময়মত। সত্যিই, তুমি আমাদের তার পাওনি কি ? জঙ্গলে নাকি তুমি বর্ম্মিনী বিয়ে কোরে সংসার পেতেছ ? আচ্ছা, আমি কি তোমার স্ত্রী নই ? আমার জন্ম কি তোমার একটুও মায়া হয়না ?" বলিতে বলিতে করুণার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে অমরেশের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমরেশ ভূলুণ্ঠিতা পত্নীকে তুলিয়া ধরিয়া খাটে বসাইল। বৎসর দুই তিন হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, পত্নী নিতান্ত বালিকা বলিয়া তাহার প্রতি সে সময় অমরেশ কোনও আকর্ষণ অনুভব করে নাই। রেঙ্গুনে চলিয়া আসার পর হইতে মায়ের কতো কাতর অনুনয় মাখা পত্র পাইয়াছে, বধুমাতাকে লইয়া আসিবার জন্ম, সে কর্ণপাতই করে নাই; অভিমান করিয়া তিন বৎসর কলিকাতায় যায় নাই। আজ পত্নীর চোখের জলে তাহার মন আর্দ্র হইয়া যাওয়ায় সে সকল কথা মনে পড়িয়া সে অনুতপ্ত হইল। করুণার পাশে বসিয়া রুমাল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল "ছিঃ, কে এসব কথা তোমায় বল্‌ল ? তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে যা

বল্‌বে, তুমিও তাই বিশ্বাস করবে? কাজের ব্যস্ততায় নানা জায়গায় ঘুরতে হয়, সময় মত তোমাদের খবর নিতে ও দিতে পারিনি বটে, "তা বলে কি তোমাদের কথা ভাবিনা"? করুণার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল "বাঃ, তুমি তো বেশ সুন্দরী হয়েছ? কতো বড়ও হয়েছ, তোমাকে কতটুকু দেখে এসেছিলাম। আমার বউ যে আবার অভিমান করতে জানে, হিংসে করতে জানে, তা তো আমি জানতুম না"? স্বামীর আদরে করুণা সব দুঃখ যেন মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল। স্বামীর বুকে মাথা রেখে সগর্ব্বে উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এখন কিন্তু আর ফাঁকী দিয়ে পালাতে পারবে না। এই যে ধরলুম, আর কিছুতে ছাড়ব না"—বলিয়া অমরেশকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

* * *

মাতৃশ্রাদ্ধ-ক্রিয়া-কর্ম্ম যথারীতি সমাপন করিয়া, বৈষয়িক বিলি ব্যবস্থা শেষ করিয়া অমরেশ আবার জঙ্গলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। পিসীমা দেশে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে অমরেশ তাঁহাকে বুঝাইল, আরও মাসখানেক থাকিয়া যান, অমরেশের বিশেষ কাজে একবার জঙ্গল ঘুরিয়া আসিতে হইবে। এইবার জঙ্গলের ব্যবস্থা অন্য কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া অমরেশ রেঙ্গুনেই থাকিবে। পিসীমা অনেক আপত্তির পর রাজী হইলেন কিন্তু করুণা আবদার ধরিল, সেও সঙ্গে যাইবে। বর্ম্মা দেশে যখন আসিয়াছে, তখন চারিদিক একটু না দেখিয়া সে ছাড়িবে না।

অমরেশ তাহাকে জঙ্গলের নানা অসুবিধা ও বিপদের কথা বলিয়া কিছুতেই চুপ করাইতে পারে না। সে বলে "সীতা কি রামের সঙ্গে বনবাসে যাননি? আমি হিন্দুর মেয়ে, আমি স্বামীর সুখ দুঃখে, বিপদে আপদে সর্ব্বদা সহগামিনী হব, তুমি বাধা দিলে আমি সরকারবাবুকে নিয়ে যাব, তুমি যেখানেই যাবে।"

করুণার রূপে ও গুণে এই মাসখানেকের মধ্যে অমরেশ এমনই তাহার বশ হইয়া পড়িয়াছিল যে করুণাকে কাঁদাইয়া বা তাহার অনিচ্ছায় কোন কাজ করিতে সে যেন পারিত না। করুণাকে অনেক বুঝাইল যে সে পনেরদিনের মধ্যেই সকল কাজের ব্যবস্থা করিয়া আসিবে, আর জঙ্গলে যাইতে চাহিবে না। এই কয়েকদিনের ছুটী সে চায়। করুণা বলিল "তুমি আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর, বর্ম্মিনীর সঙ্গে দেখা করবে না, তার কাছে যাবে না আর, তবে ছুটী দেবো, আর দেরী যদি কর, তবেই দেখ্‌বে আমি ঠিক্ সেখানে হাজির হোয়েছি"। অনেক রকমে শপথ করাইয়া লইয়া করুণা অমরেশকে যাইবার অনুমতি দিল। গুলজার দ্বারওয়ানকে সঙ্গে লইবার জন্য পিসীমা অনুরোধ করিলেন। অমরেশ হাসিয়া বলিল, এই তিন বছর কত নিবিড় জঙ্গলে সে একা একা ঘুরিয়াছে, আজ আবার নতুন করিয়া পাহারা দিতে হইবে নাকি? গুলজার এবং পিসীমা চোখ ইসারায় পরস্পরের মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন কিন্তু কাহারও জোর করিয়া কিছু বলিবার সাহস হইল না।

করুণার ছল ছল চোখের করুণ-অপলক-দৃষ্টিকে পাথেয় লইয়া এবং প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া অমরেশ এবার যাত্রা করিল।

৫

"ও আবদুল! বল্‌না তুই আমায় কোথায় নিয়ে চল্‌লি? 'বাবু আসবে', 'বাবু আসবে' কবে থেকে তুই বলছিস্, তোকে আর বিশ্বাস করব না। সকাল থেকে সাম্‌পান্ বেয়ে চলেছিস্, অফুরন্ত তোর যাত্রা! তোর বাবু কোথায় এসেছেন রে? আমি আস্‌তে চাইনি, তুই আমায় ভুলিয়ে নিয়ে এলি যে বাবুর বোট্ আছে সাত মাইল দূরে, আমায় সেখানে পৌঁছে দিবি। কত সাত মাইল চলে এলুম, কোথাও তো বোটের চিহ্নও নেই রে। আমায় ফাঁকী দিচ্ছিস্ নাকি? এ তো আমাদের গ্রামের কাছে এসে পড়লাম, ঐ তো আমাদের কুয়োর পাড়ে কলাগাছ ঘেরা কুঁড়ে ঘরখানি দেখা যাচ্ছে। তুই আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছিস্ বুঝি? না, না, আমি যাব না, তুই শীগ্‌গীর আমায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে চল্‌"।

রূপসীর আকুল আর্ত্তনাদে বুড়োর চোখে জল আসিল, সে বৈঠা ছাড়িয়া বাঁ হাতে চোখের জল মুছিয়া বলিল "আরে বেটী, এখনই কাঁদ্‌ছিস্ কেন? কাঁদ্‌বার জন্য তোর সারা জীবন রইল। পাপের ভাগী আমাকে করিস্ না যেন।

আল্লা জানেন, আমি কেবল হুকুম তামিল করছি। তোর বাবুর আউরৎ রেঙ্গুনে এসেছে, সে আর বাবুকে এখানে আস্‌তে দেবেনা। বাবু খবর পাঠিয়েছে তোকে তোর মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে, সেখানে তোর জন্য টাকা পয়সা অনেক পাঠিয়ে দিয়েছে, আরও দেবে মাসে মাসে তোর ছেলে জন্মালে। আর 'বাবু, বাবু' কোরে কাঁদিস্‌না, খেয়ে পরে সুখে থাক্‌তে পারবি যত টাকা আর হীরের গয়না বাবু তোকে দিয়েছে। তোর কপাল তো ঢের ভাল, কত লোক যে এক পয়সাও না দিয়ে ভেগে যায়, এ বাবুর তো মমতা আছে তবু"।

রূপসী কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। আবদুল ও করিম তাহাকে কত বুঝাইল, কিছুতেই তাহাকে থামাইতে পারে না। শেষে সে সাম্পান্ হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে আবদুল ভয় পাইয়া তাহার হাত, পা বাঁধিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া রূপসী দেখিল সে তাহার মায়ের ঘরে বিছানায় শুইয়া আছে। তাহার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া মাটিন্‌চি চীৎকার করিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। সে তো আগেই বলিয়াছিল, কালার ঘরে যাস্‌নি, এম্‌নি কোরে একদিন কালা তাকে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। অপরিণামদর্শী মেয়ে মুখের দুটো মিষ্টি কথায় ভুলে যেমন মাকে না বলে পালিয়ে গিয়েছিল, তেম্‌নি তার শাস্তি হোয়েছে। এখন মা বেটী আশ্রয় না দিলে যাবে কোথায়? নিজের তো পরকাল খেলি, একটা ছেলে পেটে কোরে এলি, ওরও কপালে সারাজীবন দুঃখ আছে। বর্ম্মী কোন পুরুষ আর তাকে বিয়েও করবে না, দশা কি হবে বুঝ্‌তে তো পারবে না এখন। বাবু টাকা দিয়েছে, গয়না দিয়েছে তো কি হোয়েছে, পাল্‌বে কে সারাজীবন?

রূপসী চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল, নীরবে মায়ের কটুক্তি হজম করিল, তাহার যে আর কথা বলিবার মুখ নাই, সকল গর্ব্ব মাটীতে লুটিয়েছে।

* * * *

সন্ধ্যার কালো ছায়া নদীর জলে পড়িয়া চারিদিকের অন্ধকারকে নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির কালোর কালো মূর্ত্তির সঙ্গে একটী মানুষের অন্তরাকাশের কালিমাও তেমনি নিবিড়ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। অন্তরে তার ঘোর অন্ধকার, অনেক হাত্‌ড়াইয়াও একটু আলোর রেখা তার মেলে নাই! বাহিরের পানে তাকাইয়াও তো আলোর চিহ্নমাত্র দেখা যায়না। ভরা নদীর কালো মিশ্‌মিশে বুকে ধব্‌ধবে সাদা ছোট্ট বোট্‌খানি বহুদূর হইতেও চোখে পড়ে। অমরেশ ডেকে বসিয়া মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালাইয়া দিয়া একমুঠা চুল ধরিয়া জোরে জোরে টানিতেছে আর নিজের মনে বলিতেছে "একি ঘোর সমস্যা! এর সমাধান কোথায়? একটী নিরপরাধ বিদেশিনীর সর্ব্বনাশ করিয়া যে তাহাকে জন্মের মতন ভাসাইয়া দিলাম এবং অভিশাপ কি আমায় সমস্ত জীবন ভোর বহন করিতে হইবে না? পরিণীতা স্ত্রী, তাহাকে সুখী করাও তো আমার কর্ত্তব্য! তাহার চোখের জলও যে সহিতে পারিনা। কেন এমন ফাঁদে নিজেকে ফেলিলাম! রূপসী যে এমন করিয়া আমার হৃদয় জয় করিবে তাহা তো স্বপ্নেও ভাবি নাই। সাময়িক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে তাহাকে লইয়া আসিলাম, মনে করিয়াছিলাম, সে আমার খেলার পুতুল হইবে। খেলার প্রয়োজন মিটিয়া গেলে খেলার ঘর ভাঙিয়া দিয়া পুতুলকে ধুলায় ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু এ কি হইল? এ মেয়েটীর কি আকর্ষণ! এ যে আমার জীবনখানি আনন্দে ভরিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সরল প্রাণ-মাতানো হাসিতে আমি সকল ভাবনা চিন্তা ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্য! কঠোর কর্ত্তব্য!! বড় নিষ্ঠুর, বড় কঠিন, তবু পালন করিতে হইবে!! শাস্ত্রসম্মত বিবাহ, অগ্নি, দেবতা সাক্ষী করিয়া যাহাকে গ্রহণ করিয়াছি, সেই আমার পত্নী, সহধর্ম্মিণী। তাহার প্রতি কর্ত্তব্য করিতে হইলে উপপত্নীকে ত্যাগ করাই সমাজের বিধান! কিন্তু, কিন্তু—প্রেমের দেবতাকে কি উপেক্ষা করা যায়? ভালবাসিয়া যাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছি, তাহাকে গ্রহণ করিবার কি কোনও পথ নাই? তাহাকে যে ভুলিতে পারিতেছি না! বড় যে ভালবাসিয়াছিল সেও আমাকে, বড় বিশ্বাস করিয়া যে তাহার দেহ মন সব সমর্পণ করিয়াছিল আমার পায়ে। তার প্রতিদান কি এই?

বৃদ্ধ কর্ম্মচারী বলিলেন "ওদের টাকা দিয়ে দিলেই যথেষ্ট কর্ত্তব্য করা হোল"। টাকা দিয়া কি সে হৃদয় পাবে? কি জানি, মন যে আমার সায় দেয় না, উপায়ও তো দেখিনা আর।

অমরেশের মাথায় যেন আগুন জ্বলিতেছে। সে আপন মনে এই সকল চিন্তা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল "আবদুলটা এখনও ফিরল না? রূপসীকে পৌঁছে আমায় খবর দিয়ে যাবার কথা ছিল। হায়! রূপসী না জানি কি করছে! উঃ! কোথায় যাই, কি করি!"

আবদুল দূর হইতে বাবুর বোটখানি দেখিতে পাইয়া করিমকে বলিল "করিম ভাই, তুই যা বাবুকে খবর দিয়ে আয়। আমি আর বাবুর সাম্‌নে যেতে চাই না। বাবু খুঁটীনাটি সব জিজ্ঞেস্ করবে ঐ বেটীর কথা, আর সত্যি কথা বল্‌লে বাবু কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আহা! বাবু বড্ড ভালবাস্‌ত ঐ বেটিকে"। করিম বলিল "কেন যে বাবু মেয়েটাকে ছেড়ে দিলে বুঝিনা। মেয়েটার জন্যে যদি এতই প্রাণ কাঁদে তবে নিকে করলেই হোত। একটা বউ থাক্‌লে কি হোয়েছে"?

আবদুল—দূর বোকা—এ কি আমাদের মোছলমানের মত যে, যাকে খুসী হোল কল্‌মা পড়িয়ে নিয়ে নিকে করলাম? হিঁদু বাবুরা কি বর্ম্মিনী বিয়ে করতে পারে? খুসী হোলে ওদের নিজের জাতের দশটাও সাদি কোরতে পারে কিন্তু বে-ধর্ম্মের লোক একটাও ঘরে নিতে পারে না।

করিম—এই না গান্ধী মহারাজ ওদের সব আগের শাস্তর ভেঙে দিয়েছে! এখন তো আর জাত বিচার নেই আর এই যে সেদিন এক হিঁদুর মেয়ে এক মোছলমান ছেলেকে বিয়ে করেছে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে, বাবুরাই বলাবলি করছিল। তবে বর্ম্মারা কি দোষ করল?"

আবদুল এক তাড়া লাগাইয়া চুপ করাইয়া দিল, "চুপ কর, ছোট মুখে বড় কথা? বাবুদের কথায় আমাদের থাক্‌তে নেই। এই যে এসে পড়লুন, তবে তো বাবুর সঙ্গে আমায় দেখা করতেই হবে।"

সাম্পানখানি বোটের গায়ে আসিয়া লাগিতেই অমরেশ চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কি রে আবদুল, দিয়ে এলি রূপসীকে মায়ের কাছে? কি বল্‌লে রে?"

আবদুল বলিল "কি আর বল্‌বে? হুজুরের হুকুম বলাতে তখুনি সাম্পানে উঠে বসল। মা-বেটী তাঁকে আস্ত রাখলে হয়, হয়ত মেরেই ফেলবে, কি তাড়িয়ে দেবে।"

অমরেশ—কেন, তুই বলে আসিস্ নি, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাব?

আবদুল—বল্‌তে কি দিলে? মাগী পায়ের ফানা খুলে মারতে এসেছিল আমাদের, আমরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলুম।

অমরেশ—আর রূপসী? সে কি করছিল?

আবদুল—সে বেটী তো সাম্পানেই বেহুঁস্ ছিল, দুজনে ধরাধরি কোরে ঘরে শুইয়ে ফেলে এলাম।

অমরেশ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "হ্যাঁরে আবদুল, তুই কবে থেকে এমন নিষ্ঠুর হলি? মেয়েটাকে তো তুইও ভালবাসতিস্। না হয় ফিরিয়ে এনে নিজের ঘরেই রাখতিস্?"

আবদুল—হায় আল্লা! শেষে আমি দোষী হলুম? হুজুরের হুকুম মাফিক কাম করেছি, নইলে কি আর অমন চাঁদপানা মেয়েটাকে জলে ভাসিয়ে দিই?

পেটের ছেলেটা জন্মালে, বড় হোলে যদি ওর দুঃখ ঘোচে!

অমরেশ—অ্যাঁ, কি বল্‌লি? পেটে তার সন্তান ছিল? উঃ, কি নির্দ্দয় পাষাণ আমি?

আবদুল ইঙ্গিতে বোট চালককে বোট ছাড়িতে বলিল। তর্ তর্ করিয়া মোটর বোটখানি কালো জলে সাদা ফেনা তুলিয়া ছুটিল।

অমরেশ শিশুর ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আবদুল ও করিম নির্ব্বাক হইয়া বাবুর পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে নিজেকে কিছু সামলাইয়া লইয়া অমরেশ বলিল "আবদুল চল্ একবার মা টিন্‌চির ঘরে যাই, মেয়েটাকে যদি মেরেই ফেলে বিশ্বাস কি? বর্ম্মিনীরা রাগলে দা দিয়ে কোপ মেরে একেবারে শেষ কোরেও দিতে পারে।"

আবদুল বলিল "আজ্ঞে কর্ত্তা, তা পারে। তবে কিনা টাকার লোভটাও আছে তার। মেয়েটার গায়ে হীরে তো

কম দাওনি আপনি? আবার মাসোহারা টাকা পাবে বলে এসেছি চেঁচিয়ে। আর বাবু, আপনি গেলে বেটী কি আর ছাড়বে তোমায়?"

অমরেশ—না ছাড়ে, নিয়েই আসব। রেঙ্গুনের ধারে কাছে একখানা ঘর কোরে রেখে দেব, তুই না হয় ওকে আগলিয়ে থাক্‌বি, কি বলিস্?

আবদুল একটু বিরক্তির সুরে বলিল "যদি রাখবেনই কর্ত্তা, তবে এত হাঙ্গামা করে রেখে আসার দরকার কি ছিল? মা-ঠাকরুণ যখন জানতে পেরেছেন তখন আবার গোলমালে পড়বেনই একদিন। বর্ম্মিনীরা যাদু জানে কর্ত্তা, সহজে ওদের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। একবার যখন মায়া কাটিয়েছেন তখন আমি বুঝি আর ওকে দেখা না দেওয়াই ভাল। আপনার মনও ঘরে গেলে দুদিন পরে ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে। আপনাদের জাতে মেয়ের দুঃখু কি? চাইলে কতো পাবেন।"

অমরেশ আবদুলের সুপরামর্শে সায় দিতে পারিতেছিল না অথচ প্রতিবাদ করিবারও কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। বুড়ো আবদুল তাহাকে শিশুকাল হইতে দেখিতেছে, তাহার দুর্ব্বলতা কোথায় তাহাও বোঝে, সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। সারা রাত বোটখানি চলিয়া ভোরের বেলা সহরের জেটীতে আসিয়া লাগিল।

রাত্রির অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় অমরেশের ক্লান্তিতে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সে ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িল। বোট জেটীতে বাঁধা রহিল। কর্ম্মচারীগণ বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া গেল।

৬

ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মন লইয়া অমরেশ রেঙ্গুনে ফিরিল। করুণা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল "পথে কি কোন কষ্ট হইয়াছিল, না তোমার কিছু অসুখ করেছিল? তোমার অমন চেহারা হোল কেন গো?"

অমরেশ বলিল—"জঙ্গলের খাটুনী বড় বেশী, খাওয়া, থাকারও কষ্ট।"

করুণা বুঝিল অমরেশ তাহার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। আড়ালে গুলজারকে ডাকিয়া কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে জঙ্গলের খবর লইতে বলিল এবং ধীরে ধীরে রূপসী সংক্রান্ত সকল খবরই জানিতে পারিল।

বাড়ীর পুরাণো সরকারবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া রেঙ্গুনের কাজকর্ম্ম দেখিবার ভার একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর উপর দিয়া অমরেশকে লইয়া কলিকাতা ফিরিয়া যাইবে স্থির করিল।

অমরেশ এবার জঙ্গল হইতে ফিরিয়া বিষয় কর্ম্মে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইল। উদাসীনের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত নদীর ধারে বসিয়া থাকে, বাড়ী হইতে তাগাদা না আসিলে ঘরে ফেরে না। সরকার বাবু বিষয় সংক্রান্ত কোন পরামর্শ চাহিতে আসিলে বলে "আমার শরীর ভাল নয়, আমাকে ক'দিন বিশ্রাম দিন, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।"

করুণা একদিন সজল চোখে অমরেশকে বলিল "আমি তোমার এ কষ্ট আর দেখতে পারিনে। তুমি কি করলে সুখী হও বল।"

অমরেশের হঠাৎ যেন চমক ভাঙিল, সে ভাবিল, সত্যিই তো যার জন্যে সব বিসর্জ্জন দিলাম তাকেই তো অবহেলা করছি, এ বেচারীর কি অপরাধ?

করুণার চোখ মুছাইয়া দিয়া অমরেশ বলিল "আহা! তুমি কাঁদছ কেন? আমার শরীরটা এবার বড্ড খারাপ হোয়েছে, তাই কিছু ভাল লাগে না। তুমিও তো দেখছি ক'দিনে রোগা হোয়ে গেছ। তোমার কি হোয়েছে বল দেখি।"

করুণা বলিল—"স্বামীকে অসুখী দেখলে কোন্ স্ত্রী সুখে থাকতে পারে? চল, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই। মা পুরীতে আছেন, আমরাও সেখানে গিয়ে ক'দিন থেকে আসি, দুজনেরই ভাল হবে, কেমন রাজী তো?"

অমরেশ সহজেই সম্মত হইল। তাহার মনেও ঠিক এই কথাই জাগিতেছিল যে এ দেশ ছেড়ে না গেলে সে রূপসীকে ভুলিতে পারিবে না। নদীর ধারে বসিলেই যে মনে পড়ে রূপসীকে, মনে পড়ে কতোদিন কতো রাত বাঁশের

ভেলার উপর ছুটীতে কি আনন্দে কাটিয়েছে! ফুলের গুচ্ছ মাথায় পরিয়া যখনি হাসি-খুসী বর্ম্মিনী মেয়ের দল ঘুরিয়া বেড়ায়, অমরেশের মনের আয়নাতে যেন রূপসীর ছায়া প্রতিফলিত হয়।

* * * *

চাকর বাকরের সাহায্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করিয়া করুণা কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। অমরেশও বহুদিন পরে কলিকাতা ফিরিবার আনন্দে মনের অবসাদ কতকটা ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। কিশোরী পত্নীর কর্ম্মপটুতায় ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিতেছে "তুমি যে নতুন গিন্নী, তা' কে বলবে? কি সুন্দর গোছগাছ জান তুমি! যেন কতকাল সংসার করছ!"

করুণা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিতেছে "আহা, আমি বুঝি নতুন গিন্নী? চার বছর হোতে চল্‌ল, এ সংসারে তো ঢুকেছি। এতদিন মা, পিসীমা ছিলেন, তাই কিছু করিনি, তা'বলে কি জানতুম না কিছু? তুমিই দেখনি এতদিন আমায়, তাই সব নতুন ঠেকছে। ভাগ্যিস্ রেঙ্গুনে এসেছিলুম নইলে তোমায় কি পেতুম আর? কোন্ বর্ম্মিনীর ঘরে পড়ে থাকতে। চলনা একবার দেশে, আর এদেশ মাড়াতেও দিচ্ছিনি। বাবা, এ যেন মায়াবিনীর দেশ!"

অমরেশ হাসিয়া বলিল "বটে! এত বড়াই তোমার! ধরা না দিলে কি ধরতে পারতে আমায়?"

জেটীতে লোকে লোকারণ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা অক্লেশে জাহাজে উঠিয়া নিজ নিজ ক্যাবিনের নম্বর খুঁজিয়া লইয়া গুছাইয়া বসিতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপর যত অত্যাচার চলিতেছে, ভিড়ের মধ্যে কত লোক পুলিশের মার সহ্য করিতেছে, কেহ বা সন্তান হারাইয়া পাগলের ন্যায় ছুটাছুটী করিতেছে। জাহাজ থাকিয়া থাকিয়া জলদ-গম্ভীর সুরে বাঁশী বাজাইয়া যাত্রীদের তাড়া লাগাইতেছিল।

অমরেশ ও করুণা প্রথম শ্রেণীর প্রশস্ত ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নীচের ভিড় দেখিতেছে। সিঁড়ি তুলিয়া ফেলা হইতেছে অথচ একটী বর্ম্মিনী উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া সিঁড়ির দড়ি ধরিয়া জাহাজে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। খালাসীরা পুনঃ পুনঃ নামিয়া যাইতে বলা সত্ত্বেও সে দড়ি ছাড়িবেনা—উপরের দিকে হাত তুলিয়া কি দেখাইতেছে ও বলিতেছে, ভিড়ের গোলমালে কেহ কিছু শুনিতেছে না। করুণা স্বামীকে ডাকিয়া বলিল "ওগো দেখ ঐ বর্ম্মিনীটা বোধ হয় পাগল, দড়ি ধরে ঝুলছে, পড়লে একেবারে জলে পড়বে। তুমি তো বর্ম্মা বোঝ, কি বলছে শোননা"।

অমরেশ নীচের দিকে চাহিয়াই তাড়িত-আহতের ন্যায় পিছাইয়া একটা ইজি চেয়ারে পড়িয়া গেল।

করুণা ভয় পাইয়া বলিল "ওকি গো, তোমার আবার কি হোল"? চাকরদের ডেকে জল আন্, পাখা আন্, ডাক্তার ডাক্ ইত্যাদি হাঁক ডাকে প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য যাত্রীদেরও শঙ্কিত করিয়া তুলিল।

অমরেশ নিজেই উঠিয়া বসিয়া করুণাকে চুপ করিতে ইসারা করিল এবং বলিল তাহার বিশেষ কিছুই হয় নাই, হঠাৎ নীচের দিকে চাহিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

জাহাজ তখন ছাড়িয়াছে—অমরেশ চেয়ার হইতে উঠিয়া রেলিংএর কাছে গিয়া জেঠির দিকে চাহিয়া দেখিল একজন বুড়ী বর্ম্মিনী রূপসীকে জড়াইয়া ধরিয়া জোর করিয়া লইয়া যাইতেছে আর রূপসী কেবল জাহাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিতেছে, "বাবু আমায় নিয়ে যাও, আমাকে ফেলে যেওনা, আমি বাঁচবনা আর।"

করুণা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেও ঐ দৃশ্য দেখিল আর বলিতে লাগিল "বাবা পাগলকে আমি বড় ভয় করি। ঐ পাগ্‌লীটাকে দুই তিনজন জোয়ান্ বর্ম্মা পুরুষ জাপ্‌টে ধরে তবে নামালো জাহাজ থেকে। নইলে আজ ডুবেই মরত, জাহাজ ছাড়্‌লে"। অমরেশ পাথরের মূর্ত্তির মতন একদৃষ্টে রূপসীকে যতক্ষণ দেখা গেল, সেদিকে চাহিয়া রহিল। চোখ দুটী জলে ভরিয়া উঠিল। করুণা বলিল "বর্ম্মা দেশটা সত্যই 'মায়াপুরী' দেখ্‌ছি। দেশটা ছাড়্‌তে তোমারও চোখে জল এলো আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগেনি"।

* * *

(৭)

ছোট একখানি গ্রাম। কয়েক ঘর গরীব চাষার বাস। চারিদিকে ধানক্ষেত। শুক্‌নো পাতার টোকা মাথায় পরে বর্ম্মা কৃষকের দল আপন আপন গরু ও লাঙ্গল লইয়া ক্ষেতে যাইতেছে। কোথাও বা দলে দলে সুপুষ্ট গাভীর দল আপন মনে কচি কচি সবুজ ঘাস খাইয়া আনন্দে লাঙ্গুল দোলাইতেছে। অদূরে গাছের তলায় মাথার উপরে চুড়ো-বাঁধা রাখাল বালকের দল কোঁচড়ে সিমের বীচি ভাজা, মটর ভাজা, চিনা বাদাম ভাজা লইয়া চিবাইতেছে আর গল্প করিতেছে। মঙ্‌-পো বলিতেছে—"জানস্‌ মঙ্‌-লুইন, বুড়ী মা-টিন্‌চি আর বাঁচ্‌বে না, আমার মা কাল রাত থেকে তাদের ঘরে রয়েছে। বুড়ী কেবল কাঁদ্‌ছে আর বলছে মা-সেঁইয়ের কি হবে? সত্যি মা-সেঁই য়ের জন্যে দুঃখ হয়। বেচারীর মা নাকি ওকে জন্ম দিয়েই মরে গেছে। ওর বাপ নাকি একজন 'কালা'। সে ওর মাকে ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল। বুড়ী কত কষ্টে মানুষ করেছে ওকে, সব গল্প করে।

মঙ্‌-লুইন ভারিক্কের মতন উত্তর দিল—অ্যাঃ, 'কালার' মেয়ে মা সেঁই? কে আর তবে ওকে আশ্রয় দেবে? বর্ম্মা মেয়ে যদি হোত, তবে তো আমার দাদাই ওকে বিয়ে করত। আমার দাদাকে টিন্‌চি বুড়ী কতবার সেধেছে, দাদা রাজী হয় না। আমি ভাবতুম মা-সেঁই সুন্দরী, কতো হীরের গয়না পরে, তবু কেন দাদা বিয়ে করতে চায়না! ওযে 'কালা' তা কে জানত?

মঙ্‌-পো বলিল "ওর বাপ নাকি খুব বড় লোক ছিল, ওর মাকে অনেক টাকা ও গয়না দিয়েছিল। মাসে মাসে টাকা দেবে বলেছিল কিন্তু কয়েক মাস দিয়ে নাকি আর দেয়নি। তাই তো বুড়ী ওর মেয়েকে কত গালাগালি দিত। সে বাবুটা বড় ধড়িবাজ্‌, কেমন পালিয়ে গেল!

মঙ্‌ লুইন—মা-সেঁইয়ের মা তো বড় বোকা ছিল। 'কালাকে' কি বিশ্বাস করতে আছে? তারা বিদেশী, এদেশে আগে টাকা রোজগার করতে আর মজা লুটতে। আমাদের মেয়েগুলো বড় সরল, সহজেই সকলকে বিশ্বাস করে। আমরা কিন্তু খুব চালাক। এ পর্য্যন্ত দেখেছিস্‌ কি কোন বর্ম্মা পুরুষ কোনো কালা মেয়ে বিয়ে করেছে?"

মঙ্‌ পো—হ্যাঁ তা ঠিক্‌। বর্ম্মা মেয়েরা কেন 'কালা'দের পছন্দ করে জানিস? আমাদের পুরুষরা যে বড় অকেজের, আর বদ্‌রাগী। মেয়েগুলোর রোজগারে বসে খায়; আবার তাদেরই ধরে মারে। 'কালারা' কিন্তু খুব যত্নে রাখে বৌকে খেটে খেতে দেয় না। এ বিষয়ে 'বো'রা (সাহেবরা) আরও ভাল। তারা বর্ম্মিনী বিয়ে ক'রে এদেশে থাকে, দেশে যাবার সময় বর্ম্মিনীকে বাড়ী ঘর জমি জমা, টাকা কড়ি সব দিয়ে যায়, যাতে তাদের ছেলেমেয়েদের কোন কষ্ট না হয়। আবার কেউ কেউ দেশে নিয়ে যায়। তাই তো আমাদের মেয়েরা সাহেব একটা ধরতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে"।

মঙ্‌-লুইন—থাম, থাম্‌ বড্ড যে 'বো'দের, 'কালা'দের প্রশংসা কর্‌ছিস। নিজেরা রোজগারী হোলেই পারিস। আমি তো ঠিক্‌ করেছি, নিজে রোজগারী না হোয়ে বিয়েই করব না। বৌয়ের টাকায় বৌয়ের বাপের বাড়ী বসে খাওয়া নিয়মটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমরা তরুণ বর্ম্মারা সব নিয়ম উল্টে দেবো কি বলিস্‌?

মঙ্‌পো এবং মঙ্‌লুইন চৌদ্দ পনের বৎসরের বালক। স্থানীয় মিশনারী স্কুলে পড়ে। অবসর সময় বাপের চাষ বাসের এবং গরু চরানোর সাহায্য করে। খবরের কাগজে জাতীয় আন্দোলনের বৃত্তান্ত পড়ে আর বড় ভাইদের কাছে অনেক খবর শোনে। দেশের অবস্থা আলোচনা করিতে করিতে দুজনে মা-টিন্‌চির ঘরের দিকে চলিল। বুড়ী টিন্‌চি মৃত্যুশয্যায়—তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া মা সেঁই অঝোরে কাঁদিতেছে। পায়ের কাছে মাঙ্‌পোর মা, এবং মঙ্‌লুইনের দাদা। শয্যার নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া একটী বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোক, চিন্তিত মনে শ্বেত শশ্রুতে হাত বুলাইতেছেন।

মঙ্‌পোর মা বৃদ্ধের নিকট মা সেঁইয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত বলিতেছে আর কাঁদিতেছে।

বুড়ী মা-টীন্‌চি চুরোট তৈয়ারী করিয়া, শুঁটকি মাছ, বাগানের ফুল, ফল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া কত কষ্টে যে এই

নাতনীটাকে মানুষ করিয়াছে তাহা সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। মা হ্লা হ্লার স্বামী যে সব হীরের গয়না দিয়াছিল, তাহা একখানিও বিক্রয় করে নাই, সব এই মেয়ের জন্য রাখিয়া দিয়াছে। নিজের এত কষ্টের টাকা খরচ করিয়া মেয়েটাকে মেমদের স্কুলে পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছে। মেমরা তাহাকে লইতে চায় কিন্তু মা সেঁই কিছুতে ক্রীশ্চান হইবে না। তাহার বাপ বাঙালী ছিল বলিয়া সে নিজেকে 'কালা বলে। 'কালা'দের মতন শাড়ী পরিতে চায়। সে 'ইণ্ডিয়া' যাইতে চায়, বলে সেখানে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবে আর তাহার বাপকে খুঁজিয়া বাহির করিবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে বলিলেন "বাপকে খুঁজে পাওয়া সহজ ব্যাপার কিনা, আর পেলেও সে স্বীকার করবে বুঝি ?"

মা টিন্‌চির শ্বাস উঠিয়াছে সে যেন কি বলিতে চায় বুঝিয়া বৃদ্ধ খুব নিকটে আসিয়া বসিলেন। মা টিন্‌চি বৃদ্ধের হাত ধরিয়া মা সেঁইয়ের মাথার উপর রাখিল আর ইসারায় বুঝাইয়া দিল, "এই মেয়েকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। ফায়া (ভগবান্ বুদ্ধ) তোমার পুণ্যের পুরস্কার দিবেন।" বুড়ীর অপলক দৃষ্টি মা-সেঁইয়ের দিকে চাহিয়া চাহিয়া স্থির হইয়া গেল।

৮

বৃদ্ধ দিগ্‌ভূষণ চট্টোপাধ্যায় তরুণ বয়সে বর্ম্মা দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বিপত্নীক, পত্নীশোকে আত্মহারা হইয়া শিশু পুত্র নিখিলকে লইয়া যখন ব্রহ্মদেশে আসেন, তখন এদেশ বাঙালী-বিরল। ভদ্র বাঙালী সমস্ত ব্রহ্মদেশ খুঁজিলে পঞ্চাশ জন মিলিত কিনা সন্দেহ। তিনি আসিয়া দেখিলেন "বাবু" বলিতে দুধ-ব্যবসায়ী, নাপিত, দোকানদার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর বাঙালীদেরই সাধারণ লোকে বোঝে। চট্টগ্রামী মুসলমানে বর্ম্মাদেশ ছাইয়া গিয়াছে। এই সকল নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর বাঙালী ও মুসলমানদের চরিত্রের হীনতায় বাঙালী জাতির দুর্নামে এদেশ ভরিয়া গিয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে ছোট একখানি বিদ্যালয় খুলিয়া বসিলেন। ভদ্র বাঙালী ছেলের সংখ্যা খুব কম কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দু বালক বালিকার সংখ্যা বিস্তর হইল। ইহাদের জ্ঞান-শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। তাঁহার মহৎ, সাধু-চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া বালকবালিকাদের জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ক্রমশঃ তাঁহার উদ্যোগে এবং কতিপয় বাঙালী ভদ্রলোকের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রবাসী বাঙালী সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক পরিবারে আত্মীয়ের মতন যাতায়াত করিতেন এবং সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে তাহাদের সহায় হইতেন। অল্পদিনের মধ্যে বর্ম্মা ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইয়া বিদেশীরও বন্ধু হইলেন।

তিনি নিজ গৃহ একটি আশ্রমে পরিণত করিয়াছিলেন। গরীব, নিরাশ্রয় বালকদিগকে নিজ গৃহে রাখিয়া, নিজের সামান্য আয়ে তাহাদের সকল ব্যয় বহন করিতেন। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভারতবর্ষ হইতে সমবিশ্বাসী কয়েকটী বন্ধু আসিয়া তাঁহার সহকর্ম্মী হইলেন।

বর্ম্মাদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে একটী প্রশ্ন জাগিল। তিনি দেখিলেন, অনেক বাঙালী যুবক অভাবের তাড়নায় দেশ ছাড়িয়া এদেশে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় আসিয়াছে। আত্মীয়, বন্ধু, সমাজ-বিহীন স্থানে বাস করিয়া চাকরী অথবা ব্যবসা করিতেছে। সামান্য আয়ে পরিবার লইয়া বাস করা বা বিবাহ করা সম্ভব হইতেছে না। নানাজাতীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের শারীরিক, মানসিক বিশেষ অবনতি হইতেছে। যাহাদের পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতাও আছে, তাহারাও সাংসারিক নানাদিক্ চিন্তা করিয়া বিদেশে পরিবার আনা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছে না, অথচ চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার মতন সুশিক্ষা ও সংযম নাই। অনেকেরই বর্ম্মিনী উপপত্নী আছে। ইহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় না বরং অনেক স্থলে সেই সকল স্ত্রীলোকই মায়া-পরবশ হইয়া বিদেশী পুরুষের সকল ব্যয়-ভার বহন করিতেছে। এইরূপ ঘনিষ্ঠতার ফলে যে সকল সন্তান জন্মাইতেছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সমস্যার কোন সমাধান হইতেছে না। বাঙালী এবং অন্যান্য ভারতবর্ষীয় পুরুষ এই

ভাবে পরিবারের সৃষ্টি করিয়া কয়েক বৎসর পরে অন্যে তাহাদের নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। কেহ বা দয়া-পরবশ হইয়া কিছু অর্থ সংস্থান করিয়া দিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

বর্ম্মিনীর পুত্র অপেক্ষা কন্যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শোচনীয় হয়। বর্ম্মা মেয়েরা স্বাবলম্বী সুতরাং অনেক স্থলে খাওয়া, পরার কষ্ট পায়না কিন্তু সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? কোনো বর্ম্মা যুবক এই কন্যাকে বিবাহ করে না। বাঙালীও ইহাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে।

এই জারজ সন্তানদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্তরে অন্তরে অতিশয় ব্যথিত হইতেন। নিজে বিপত্নীক, নিজ গৃহে প্রয়োজন হইলে বালকদের আশ্রয় দিতেন কিন্তু বালিকাদের লইতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই সকল সমাজ-তাড়িত অনাথাদের শিক্ষার জন্য, বিবাহের সুব্যবস্থার জন্য একটী আশ্রম স্থাপনের চেষ্টায় তিনি বর্ম্মার অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরিয়া অর্থ এবং পরামর্শ সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। মা-টিন্‌চিদের গ্রামে তিনি এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়া গ্রামের দুই চারিটী লোকের নিকট মা-টিন্‌চির কন্যার দুঃখের কাহিনী শুনিলেন এবং বৃদ্ধার মৃত্যুশয্যায় বসিয়া একটী কন্যার ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। মঙ্‌পোর মাকে তিনি বলিলেন "তুমি এই মেয়েটীকে কিছুদিন তোমার কাছে রাখ, আমি উহার দরুণ নিয়মিত কিছু অর্থ সাহায্য করিব।"

মা হ্লা-টিন্ বলিল "বাবু আমি মাছ বেচে খাই, সারাদিন ঘরে থাকি না, শুধু একটী চৌদ্দ বছরের ছেলে ঘরে। এ পাড়ার ছেলেগুলো বড় বদ্‌মাইস্, মা সে'ইয়ের মত সুন্দরী বয়স্থা মেয়ের ভার কি করে নেবো?"

বৃদ্ধ বিপদে পড়িলেন। মঙ্-সান্থু অগ্রসর হইয়া আগ্রহে বলিল "আমাদের বাড়ী মা-সে'ই থাকতে পারে। আমার মা নেই, বুড়ী দিদিমা আছে, তার কাছে থাকবে"।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "চল, তোমার দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করি"। মা-হ্লাটিন্ মুখ খিঁচাইয়া বলিল "এখন কেন এতো আদর? বুড়ী টিন্‌চি যখন সাধ্‌ল বিয়ে করতে, অতো হীরের লোভ দেখাল, তবু তো রাজী হলি না। মেয়েটীর সর্ব্বনাশ করবি না তো"?

মঙ্ সান্থু নিতান্ত ভাল মানুষের মত বলিল "কি আশ্চর্য্য, 'কালা' বলে বিয়ে করিনি, তা' বলে কি আমি ওকে ভালবাসি না? ওকে ছোট বোনের মতন চিরদিন ভালবেসেছি। আহা, ওর কেউ নেই, এখন ওর জন্য আমার ভারী কষ্ট হোচ্ছে। বাবু, আপনি যতদিন না ওর ভাল ব্যবস্থা করতে পারেন, ততদিন আমরা ওকে খুব যত্নে রাখ্‌ব।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদিও ছেলেটীর উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না, তবু নিরুপায় হইয়া মঙ-সান্থুর 'দিদিমার হাতে মেয়েটীর ভার দিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ইহারা অত্যন্ত গরীব নগদ কুড়িটী টাকা আগাম হাতে পাইয়া মহা সমাদরে বুড়ী মা-সে'ইকে বুকে টানিয়া লইল।

প্রায় বছর খানেক কাটিয়া গেল, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আশ্রমের জন্য দশ বারটী অনাথা বালিকার সন্ধান পাইলেন, কিন্তু দশ বারজন ভারতবাসীরও সহানুভূতি এবং অর্থ সহায়তা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি মাসের পর মাস নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাস্থানে অর্থ বিত্তশালী ব্যক্তির দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া গৃহে ফিরিলেন।

গৃহে আসিয়া পৌছিতেই মা-সে'ই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পরিধানে একখানি লালপেড়ে শাড়ী, হাতে দুই গাছি কাঁচের চুড়ি। অশ্রু প্লাবিত মুখে বলিতে লাগিল "বাবা, আমি আপনার মেয়ে, আমাকে আপনার আশ্রয়েই রাখ্‌তে হবে।" বিপন্ন বোধ করিয়া বিস্ময় ভরে সহকর্ম্মীদিগের দিকে চাহিলেন। তাঁহারা আড়ালে তাঁহাকে ডাকিয়া এক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শোনাইল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশানুসারে প্রতি মাসে মা-সে'ইয়ের নিকট কুড়ি টাকা করিয়া পাঠান হইয়াছে। কয়েকদিন বুড়ীটা তাহাকে বেশ আদর যত্ন করিয়াছিল। তারপর ক্রমশঃ তাহাকে আধ পেটা খাইতে দিত এবং সারাক্ষণ খাটাইত, মাঝে মাঝে বিষম প্রহার করিত। মঙ-সান্থুও প্রথম কিছুদিন তাহার প্রতি বেশ স্নেহ দেখাইত

কিন্তু সে সর্ব্বদা ঘরে থাকিত না। এক একদিন মাতাল হইয়া ঘরে আসিয়া মাসেঁইকে খুঁজিত, মা সেঁই পলাইয়া কাহারও বাড়ী আশ্রয় লইত।

একদিন মঙ্‌সান্থ তাহাকে বলে যদি সে তাহার সব হীরের গহনাগুলি তাহাকে দেয় তবে সে তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। মা-সেঁই ঘৃণার সহিত অস্বীকার করে এবং সেইদিনই গ্রামের মোড়লের স্ত্রীর নিকট গহনাগুলি রাখিয়া আসে। একদিন রাত্রে মা-সেঁই তাহার ঘরে খিল্ বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে এমন সময় খচ খচ্ আওয়াজে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখে, ঘরের মেঝের দুইখানি তক্তা ভাঙা এবং তাহার মধ্য দিয়া এক এক করিয়া তিন চারিজন ছেলে ঢুকিতেছে। সে ভয় পাইয়া চীৎকার করিতেই একজন ছেলে তাহার মুখ এবং অন্যজন তাহার হাত দুইখানা বাঁধিয়া ফেলিল। সে নিরুপায় হইয়া পা ছুড়িতে লাগিল। একজন ছেলে দরজা খুলিয়া দিল, তারপর তাহারা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে বাহির হইয়া গেল। ভয়ে মা-সেঁই অজ্ঞান হইয়া পড়ে। যখন জ্ঞান হইল, সে চাহিয়া দেখিল, একটা ধানের বন্ধ গুদামে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় সে পড়িয়া আছে। দিনের আলো কাঠের দেয়ালের ফাঁক দিয়া আসিয়া ঘর ভরিয়া গিয়াছে। পিপাসায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক, তবু সে চীৎকার করিতে লাগিল যদি কেহ শুনিতে পাইয়া দরজা খোলে।

বেলা দ্বিপ্রহরে একটা ছেলে কিছু কালো চালের ভাত ও একটু শুক্‌নো মাংস পোড়া পাতায় মুড়িয়া দেয়ালের বড় ফাটলের মধ্যে দিয়া ফেলিয়া দেয়। মা সেঁই চীৎকার করিয়া বলে, "কে দয়া কোরে খাবার দিচ্ছ, দরজাটা খোল, না হয় ভাঙ, আমার হাত পা বাঁধা, নড়তেও পারছিনা।" কিছুক্ষণ পরে দরজার তালা খোলার শব্দ হইল এবং এক বুড়ো বর্ম্মার সঙ্গে মঙ্-লুইন্ উপস্থিত। সে মা-সেঁইয়ের বাঁধন খুলিতে খুলিতে বলিল, "দাদার কাণ্ড এসব, জান? আজ সকালে দাদা আর তিন চারটে গুণ্ডা ছেলে চুপি চুপি কি পরামর্শ করছে দেখে, আমি লুকিয়ে শুনলুম সব। তাই এখানে এসে তোমার চীৎকার শুনে দোকান থেকে ভাত কিনে ফেলে দিলুম। তারপর সেই বুড়োকে সব বলে, চাবি খোলালাম। বুড়োর গুদাম এটা, ওরা চাবি কোথায় পেল কি জানি।" মঙ্ লুইনের পরামর্শে মা-সেঁই একজোড়া সোণার বোতাম বিক্রি করিয়া সেদিনই রেঙ্গুনে চলিয়া আসে। এখানকার ঠিকানা তাহার জানা ছিল, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া সকল বিবরণ বলিয়া আশ্রয় চায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোথায় ছিলেন ঠিকানা না জানায় তাঁহাকে আগে সংবাদ পাঠান যায় নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তিনি মা-সেঁইকে ডাকিয়া দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং মাথায় চুম্বন করিয়া বলিলেন "থাক্ মা আমার ঘরের লক্ষ্মী হোয়ে, তোকে আমি আজ কন্যারূপে গ্রহণ করলাম। তোকে বিধাতার দান বলে মাথায় তুলে নিলাম তুই আমার পূজার ফুল হোয়ে ঘরে ফুটে থাকবি, তোর নাম আজ থেকে 'প্রসাদী' হোল।"

প্রসাদীকে নিয়ে নানা বিভ্রাট। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে কতগুলি যুবক থাকিতেন, কয়েকজন ভদ্রলোক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র নিখিলও ছিল। সে তখন বি, এ পাশ করিয়া 'ল' কলেজে পড়িতেছে। শিশুকাল হইতে মাতৃহীন, সেজন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি যত্নে ও আদরে পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। পুত্রও পিতার অত্যন্ত অনুগত ছিল। পিতা যখন 'প্রসাদী'কে নিজ গৃহে পাকা রকম আশ্রয় দিলেন, তখন পুত্র আপত্তি করিল। সে বলিল "উহাকে কলিকাতায় 'সরোজনলিনী শিক্ষা মন্দিরে' পাঠাইয়া দাও, অর্থকরী কোন শিল্পশিক্ষা করুক, যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে। ওর তো বিয়ে দেওয়ার কোন আশা নেই, আর এখানে এতো পুরুষের মধ্যে একা কি করে থাকবে?"

পিতা বলিলেন "মেয়েটী আমেরিকান্ মিশনারীদের স্কুলে পড়েছিল, বছর খানেক্ ঘরে পড়ালে বা কোন স্কুলে দিলেও তো হাইস্কুল পাশ করতে পারে, তারপর রেঙ্গুন কলেজে ভর্ত্তি কোরে দেবো, সেখানে হোষ্টেলে থক্‌বে। মেয়েটী বেশ বুদ্ধিমতী, শিল্প শিখিয়ে রোজগারী করবার এতো তাড়াই বা কি? পড়াশুনোর দিকেই ওর খুব ঝোঁক্।"

নিখিল বলিল "এম্‌নি খরচে কুলাতে পার না, আবার ওকে পড়াবার খরচ যোগাবে কে ?"

পিতা বলিলেন "যদি আমার একটী মেয়ে থাকৃত, তাকে কি লেখাপড়া শেখাতাম না খরচের অভাবে ?"

পুত্র বলিল "বেশ খরচ চালাবে তুমি, আমার আপত্তি কি ? তবে বাড়ীতে কি করে থাকবে ? এ কয়দিন তো ও বাড়ীর খুড়ীমা এসে ওর কাছে শুতেন, ঘরের ছেলেরা সব ভালো নয় তো ?"

পিতা বলিলেন "আমি ভেবেছি, তোমার খুড়ীমার কাছেই আপাততঃ রাখ্‌ব যদি তিনি রাজী হন।"

পুত্র—না, না সে অসম্ভব। আমাদের ভালবাসেন বলে রাত্রে ক'দিন শুতে রাজী হোয়ে ছিলেন। তিনি যেরকম আচার মানেন, কখনো বর্ম্মিনী মেয়েকে ঘরে রাখতে রাজী হবেন না।

অবশেষে প্রসাদীকে রেঙ্গুনে কন্‌ভেণ্টের বোর্ডিংএ রাখা স্থির হইল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুবান্ধবের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রসাদীর জন্য কাপড় চোপড়, ট্রাঙ্ক, বিছানা সব যোগাড় করিয়া তাহাকে বোর্ডিংএ রাখিয়া আসিলেন। প্রসাদী অনেক কান্নাকাটি করিল, বোর্ডিংএ যাওয়াতে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল। কিন্তু উপায় নাই বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৯

জীবনস্রোত বহিয়া যায়, কত ভাঙা, গড়ার মধ্য দিয়া তাহার অপ্রতিহত গতি কেহ থামাইতে পারে না। হাসি, কান্না, আশা, নিরাশা, সুখ, দুঃখ মাথায় বহিয়া প্রসাদীর জীবন-পুষ্প বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন সে জাড্‌সন্ কলেজের (Judson College) তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। হোষ্টেলের প্রায় সকল ছাত্রীই বর্ম্মা বা কেরিণ্ (karen), অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ ছাত্রীর সংখ্যাও কম। ভারতবাসী ছাত্রী মোটে তিনটী। প্রসাদী শাড়ী পরিত এবং নিজেকে 'ইণ্ডিয়ান্' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আর দুটী মাদ্রাজী ক্রীশ্চান্ মেয়ে। প্রসাদীর মুখখানা দেখিলে কেহ কখনও সন্দেহও করিত না যে সে বাঙালী নয়। রং তাহার কাঁচা সোণার মতন, কালো চুল, খুব উঁচু না হইলেও নাকটী বর্ম্মিনীদের মতন খাঁদা ছিল না। চোখ দুইটী বেশ বড় বড়। তাহার দিদিমা বলিত, বাপের মতন নাকি তার চেহারা হইয়াছে। সেজন্য বর্ম্মাদের তাহার গঠন পছন্দ হইত না। মাদ্রাজী মেয়ে দুটী তাহাকে কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করিত "আচ্ছা প্রসাদী, তুই তো কখনও বাংলা বলিস্ না, তোর বাবা এলেও বর্ম্মায় কথা বলিস্, দাদার সঙ্গে ইংরেজী বলিস্ তোর নিজের ভাষায় কথা বল্‌তে ভালো লাগেনা তোর ? প্রসাদী হাসিয়া বলিত "আমার মা ছোটবেলায় মারা গিয়াছিলেন, আমি তো মেমদের বোর্ডিংএই মানুষ, বাংলা শিখ্‌লুম কবে ? একটু একটু পারি বল্‌তে, ভুল হয় বোলে বলি না।"

মাদ্রাজী মেয়েটী বলিল, "তোর বিয়ে হবে যখন দেশে গিয়ে, তখন বরের সঙ্গে ইংরেজী বল্‌বি, শাশুড়ীর সঙ্গেও ? নিন্দে করবেনা সবাই ?"

প্রসাদী বলিল--"বিয়ে যে করবই, কে বলল তোদের ? করলে এমন ছেলেকে করব, যে এদেশে মানুষ, ভাল বাংলা জানেনা। আর যে ঘরে শাশুড়ী, ননদ নেই, এমন বর বেছে যাব।" মাদ্রাজী মেয়েটী বলিল—"তোর ফরমাস মত বর তৈরী হোচ্ছে বুঝি ?" প্রসাদী এসব আলোচনায় বাধা দিবার জন্য বলিল "প্রত্যেক সপ্তাহে দাদা আসেন ভাই, এবার কেন এলেননা, তাই আমার বড় ভাবনা হোচ্ছে, কি জানি বাবার অসুখ বেড়েছে কিনা।"

একটী বর্ম্মিনী সহপাঠিনী আসিয়া প্রসাদীর হাতে একখানি কার্ড দিয়া বলিল "এই নাও, তোমার দাদা এসেছেন।" প্রসাদী আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া বলিল "কাল শনিবার গেল, আসেননি, আজ রবিবার, ভিজিটরের দিন তো নয়, কি করে এলেন জানিনা।"

প্রসাদী নিজের ঘরে ঢুকিয়া ড্রেসিং টেব্‌লের নিকট দাঁড়াইয়া চুলটা ঠিক করিয়া লইল, নিজের পোষাকের দিকে দেখিয়া কি মনে হইল, আলমারী খুলিয়া একখানি জরী পেড়ে নীলাম্বরী শাড়ী বাহির করিয়া পরিল, একগাছি সিরো মুক্তার লম্বা হার গলায় দিল, কালো ভেল্‌বেটের ষ্ট্রাপ্ দেওয়া এক জোড়া স্যাণ্ডেল্ পায়ে দিল।

সহপাঠিনী কিটি (Kitty) বলিল "বাপরে! মেয়ের সাজ ছাখ! ভাই এসেছে, তার জন্তই এতো সাজ! তোর লাভার (lover) এলে না জানি কি করতিস্? জানিস্ কিনা ঐ কালো শাড়ীটা পরলে তোকে খুব মানায়, তাই কেউ এলেই বুঝি ঐ শাড়ীটা পরিস্? ভাইকে রূপ দেখিয়ে কি লাভ বল্? ভাইয়ের কোন বন্ধু আস্‌বে নাকি?"

প্রসাদীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সংক্ষেপে বলিল "যাও, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না।"

ভিজিটিং রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল নিখিল কোট, প্যাণ্ট্ পরা, ঘুরিয়া ফিরিয়া দেয়ালের ছবিগুলি দেখিতেছে। নিখিল বলিল "এই যে প্রসাদী, চল, আজ একটা খুব ভাল ফিল্‌ম্ আছে, দেখিয়ে আনি। তুমি একেবারে প্রস্তুত হোয়ে এসেছ ত? বাঃ এই শাড়ীখানিতে তোমায় এমন মানায়! এবার থেকে সব এই রং এর শাড়ী কিনে দেবো, অন্ততঃ আমার সাম্‌নে এই রকম শাড়ী পরে এসো!"

প্রসাদী হাসিয়া বলিল "যা' হোক, তুমি যে চেয়ে দেখ আজকাল কে কি পরে, এইটেই তোমার যথেষ্ট উন্নতি। তোমার ভাল লাগে ব'লে বুঝি আমি কেবল এক ঘেঁয়ে রং পরব? বেশ তো আবদার!"

নিখিল একটু গম্ভীর হইয়া বলিল "আচ্ছা, প্রসাদী আমাকে খুসী কোরতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?"

প্রসাদী কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। নিখিল আরও একদিন বলিয়াছিল নীলাম্বরী শাড়ী পরিলে তাহাকে বড় ভাল লাগে দেখিতে, সেই কথা মনে করিয়াই যে আজ সে কাপড় বদ্‌লাইয়া আসিয়াছে।

প্রসাদীকে নীরব দেখিয়া নিখিল বলিল "থাক্, থাক্, ও কথার জব্যাব এখন নাই দিলে। তুমি প্রস্তুত তো? আমি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি। তোমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টেরও অনুমতি নিয়েছি।"

প্রসাদী বলিল "কাল আসনি কেন? আমি ভাবছিলুম বুঝি বাবার অসুখ বেড়েছে।"

নিখিল বলিল, "না কাল কোর্টে একটা কেস্ ছিল, সেটার জন্তে বড্ড খাটুনী ছিল। মক্কেলটা রাত আটটা পর্য্যন্ত চ্যাম্বারে বসিয়ে রেখেছিল। তোমাকে সময়ে খবর দিতেও পারিনি। রাগ করনি ত?"

প্রসাদী ঠোঁট্ ব্যাঁকাইয়া বলিল "আমার রাগে কারই বা এসে যায়?"

নিখিল বলিল "সিনেমা হলে বসে ঝগড়া করবে চল, নইলে দেরী হোয়ে যাবে।"

দুজনে ট্যাক্সিতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

কিটি জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর নিজের মনেই বলিল—"এটা একটা রহস্য নিশ্চয়ই। কখনও এন্, চ্যাটার্জ্জি ওর নিজের ভাই নয়। কজিন্ (cousin) হোলেও হোতে পারে। এই দু' বছর ধরে যে রকম ওদের ভাবগতিক দেখ্‌ছি, লাভার ছাড়া কিছু হোতে পারে না। খোঁজ নিতে হোচ্ছে।"

সিনেমা হলে একটী বক্সে বসিয়া প্রসাদী ও নিখিল ছবি দেখিতেছিল। ছবির দিকে যে তাহাদের মন নাই, তাহা যে কোন দর্শকই বলিয়া দিতে পারিত।

নিখিল বলিতেছে "সত্যি, প্রসাদী, তুমি যখন আমাদের বাড়ীতে এলে, তখন যে বাবার উপর আমার কী রাগ হয়েছিল, কি বল্‌ব? বাবা ফিরবার আগে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম হয় তোমাকে তাড়াব, নইলে আমি বাড়ী-ছাড়া হব। বাবার পায়ে যখন তুমি লুটিয়ে পড়ে কাঁদলে, আর বাবা তোমাকে আদর করে বল্‌লেন "তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী হোয়ে থাক," আমি তখন মনে মনে স্থির করলুম আমি তা'হোলে হোষ্টেলে গিয়ে থাক্‌ব। কে জান্‌ত বাবার আশীর্ব্বাদই আমাদের জীবনে এমন কোরে সত্যি হোয়ে উঠ্‌বে। কবে তোমাকে আমাদের ঘরের লক্ষ্মী কোরে নিয়ে যেতে পাব, বলনা? বলিতে বলিতে নিখিল প্রসাদীর হাত দুইখানা নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

প্রসাদী বলিল "নিখিলদা, তুমি বড় বেশী আশা করছ। তোমার বাবাকে তো কিছু বলনি এখনও? তিনি রাজী হবেন কি না জানিনা। তোমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ আছে, এত প্রতিবন্ধক এড়িয়ে তুমি কার উপর ভরসা কোরে সংসারে দাঁড়াবে? আমার কথা ভেবে, দয়া পরবশ হোয়ে হয়ত আমাকে গ্রহণ করতে চাইছ এখন।

ভবিষ্যতে সেজন্য সারাজীবন অনুতাপ করতে হবে। আমার দুঃখের দিন কেটে গেছে। তোমাদের দয়ায় লেখাপড়া যা শিখেছি, আর দুই এক বছর পরেই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হোতে পারব আশা করছি। কেন মিছে তোমার জীবনটা নষ্ট করবো? না, না নিখিলদা, এত শীগগীর তুমি কিছু স্থির কোরো না।"

নিখিল প্রসাদীকে আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া বলিল "প্রসাদী, তুমি জান না আমি কতো দিন থেকে তোমায় চাইছি! তুমি যখন হাইস্কুল পাশ করে কলেজে গেলে, তখন থেকে আমি তোমায় ভালবেসেছি। বাবার অসুখের সময় প্রথম তোমার সঙ্গে হোষ্টেলে দেখা করতে গেলাম। বাবা তখন বলেছিলেন "নিজের বোনের প্রতি কর্ত্তব্য যেমন কোরে করে, তুমি প্রসাদীর সম্বন্ধে সেইটুকু করতে চেষ্টা করবে, এইটুকু আমার অনুরোধ। আমি অসুস্থ, মেয়েটার খোঁজ নিতে যেতে পারছি না, তার যেন মনে না হয় যে তাহার খোঁজ নেবার এ জগতে কেউ নেই।"

বাবার কথাগুলি সেদিন আমার মনে বড় বিঁধ্‌ল। আমি তখন থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে তোমার কাছে যেতে আরম্ভ করলাম। বাবার বারণ ছিল কাহাকেও 'প্রসাদীর' প্রকৃত পরিচয় জানতে দেবেনা, সকলে যেন জানে সে আমারই মেয়ে। তাই আমি খুব সাবধানে যাওয়া আসা করতাম। কিন্তু দূরে বসে কেবল খবর নিয়ে এসে আমার তৃপ্তি হোত না। তাই বাবাকে একদিন বল্‌লাম "প্রসাদী কোথাও বের হোতে পারেনা, ওর নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। ওকে মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেলে হয় না? বাবা বল্লেন, "তুমি যদি নিয়ে যেতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। আমি বুড়ো মানুষ, বায়স্কোপ, থিয়েটারে যেতে ইচ্ছা হয় না, কোথায় যাব ওকে নিয়ে? মাঝে মাঝে লেকে (Lake) নিয়ে যেতে চেয়েছি, সে যায় নি।" সেই থেকে তোমাকে নিয়ে বের হবার অনুমতি পেয়েছি। তোমার মন বুঝিনি বলে, এতদিন নিজের মনের ভাবও প্রকাশ করিনি। আমি তিন বছর ধরে অনেক ভেবেছি, মনের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করেছি, সামাজিক বাধার কথাও যথেষ্ট চিন্তা করেছি কিন্তু সব চেয়ে খাঁটি কথা এই বুঝেছি যে তোমাকে আমার চাই-ই। সংসার, সমাজ, সংস্কার এসব আমার কোনো প্রতিবন্ধক নয়। আমি শিশুকাল থেকে এদেশে মানুষ হোয়েছি, কোনো গোঁড়ামী আমার নেই। বিশেষতঃ যে দেশের জল, মাটী আলো, বাতাস আমার জীবন রক্ষা করেছে, যে দেশে রোজগার করে আমার খাওয়া পরা চলেছে, সে দেশ আমার নিজের দেশ নয়, সে দেশের মানুষ আমার আত্মীয় নয়, এমন কথা আমি কল্পনা করতে পারিনে। এ বিষয়ে তোমার সম্মতি এবং বাবার আশীর্ব্বাদই আমার যথেষ্ট, আর কোনও দিক্ আমি ভাবি না, ভাব্‌বও না।

প্রসাদী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল "আমার পূর্ব্বজন্মের অনেক তপস্যার ফলে নিশ্চয় তোমার ভালবাসা পেয়েছি। তবু ভয় হয় কি জানি আমার দুঃখিনী মায়ের মতন আমার জীবনেও হয়ত এমন একদিন আসবে, যেদিন তোমাকে হারাতে হবে। সেদিনও দুঃখ করব না। তোমার সঙ্গে মিলন অতি অল্প দিনের হোলেও নিজেকে ধন্য মনে করব এবং তার স্মৃতিই বাকী জীবন আমার সম্বল হবে।"

নিখিল প্রসাদীর হাত ধরিয়া উঠিয়া পড়িল এবং বলিল "চল, তা'হোলে বাবার আশীর্ব্বাদ এখনই নিয়ে আসি।"

প্রসাদী বলিল "বা রে, হোষ্টেলে ফিরে যেতে হবে না? রাত নয়টা তো বাজ্‌ল প্রায়।"

নিখিল বলিল "সে বুঝি আমি ভাবিনি আগে? ছুটী নিয়ে এসেছি আজ রাতের জন্য, বাড়ী নিয়ে যাব বোলে। কাল সকালে কলেজে এলেই হবে। আজ রাতের মতন খুড়ীমাকে ঘরে এনে রাখ্‌লেই হবে।"

প্রসাদী হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল "ওঃ এ সব আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলে বুঝি? কি দুরাশা তোমার? যদি আমি রিফিউস্ (refuse) কর্‌তাম?"

নিখিল প্রসাদীর হাতখানা জোরে চাপিয়া বলিল "ইস্! সেটুকু না বুঝেই কি প্রপোজ্ (propose) করেছি? এতো বোকা নই।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এত রাত্রি পর্য্যন্ত নিখিলকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বারাণ্ডায় পাইচারি করিতে-



স্বপ্ন বিলাস

বিচিত্রা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীমতী বকুলমালা সেন

-ছিলেন। রাত্রি নয়টার লোক্যাল ট্রেণও তো চলিয়া গেল। ছেলের কোনো বিপদ হইল না তো? এমন সময় একটা ট্যাক্সি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। নিখিল নামিয়া প্রসাদীকে হাত ধরিয়া নামাইল।

প্রসাদী বারাণ্ডায় উঠিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বলিল "বাবা, বড় ভাব্‌ছিলেন ছেলের জন্য, না?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রসাদীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন "মা লক্ষ্মী সঙ্গে কোরে এনেছ, আর ভাবনা কি? নিখিল যে তোমাকে আন্‌বে, তা তো বলে যায়নি, তাই দেরী দেখে একটু ভাবনা হচ্ছিল।" নিখিল আসিয়া প্রসাদীর পাশে দাঁড়াইয়া বলিল "বাবা, প্রসাদীকে তোমার পুত্রবধূরূপে পেলে কি খুসী হোতে পারবে? আমরা কি তোমার আশীর্ব্বাদ পাব?"

বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুত্রকন্যাকে একত্রে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "এমন সুখের দিন যে বাস্তব জীবনে আস্‌বে, এমন আশা করিনি বটে, তবে কল্পনায় এ সুখ অনেকদিন পেয়েছি। আজ আমার জীবনের একটা মহাব্রত উদ্‌যাপন হো'ল। আমার নিজ গৃহেই আমার কল্পিত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হোল। ভগবান তোমাদের মিলিত জীবনের সহায় হউন।"

শান্তিময়ী দত্ত

আর কি সুন্দর আছে

[প্রাচীন আসামীর অনুবাদ]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আর কি সুন্দর আছে বল তার চেয়ে।
কুন্ঠিতা কিশোরী এক লাবণ্য-মুকুলা
থর থর; উঠিবারে যেন চায় বেয়ে
দুর্গম এ বিশ্ব-তরু! সরম-দুকূলা
গুন্ঠিতা পুলকে শুধু! গৌরীশৃঙ্গ শিরে
সনাতন স্পর্শহীন তুষারের মত
বক্ষ দুটি—মগ্ন আজো রহস্য-তিমিরে,
নিজেই জানেনা তন্বী মূল্য তার কত!

তার পরে একদিন অকস্মাৎ এলো
শাণিত নিঃশ্বাস এক! উঠিল কাঁপিয়া
কৈশোর স্বপন ভিত্তি; ঝঞ্ঝা এলোমেলো
সকলি উলটি দিল! তৃষাক্ষুব্ধ হিয়া
জাগিয়া উঠিল ধীরে—আসিল চুম্বন,
এলো প্রেম, এলো জন্ম, আসিল মরণ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রূপবর্ণনা *

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

রূপবর্ণনা সাহিত্য-শিল্পীর একটা পরিচয়ের দিক্‌। রূপকে কেন্দ্র করিয়াই শিল্পীর কল্পনা আপনার উন্মুক্ত পরিধিকে বিস্তৃত করিয়া চলে; আর সেই রূপের বৈচিত্র্যে, বিপুলতায়, রূপের বর্ণনার ভঙ্গিতে, বাচনায়, সঙ্গতিতে শিল্পীর গভীরতর অতলস্পর্শ মনের যেন কতকটা তল পাওয়া যায়। শিল্পীর মনের সহানুভূতি কতদূর ব্যাপক, কতদূর প্রগাঢ়, তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতি কতদূর তীব্র, সরস ও সুসমঞ্জস; তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি কতদূর তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, এ সকলেরই মীমাংসা হইয়া যায় তাঁহার রূপবর্ণনার নিদর্শনে ও দক্ষতায়।

অবশ্য, এই রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্পী চিত্র-শিল্পীর প্রতিদ্বন্দী। চিত্রশিল্পী রূপকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যে সুন্দর করিবার অবকাশ পান, কারণ সমগ্র দেহ-সৌন্দর্য্যকে (physical beautyকে) একটা অখণ্ডতার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ তাঁহার শিল্প-সামগ্রী তাঁহাকে দেয়। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী শব্দ-সমষ্টির সহায়তায় যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একটীর পর একটী করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও রূপের সমগ্রতা তিনি ওরূপ সহজে অনায়াসে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। শিল্প-সামগ্রীর দিক্‌ দিয়া এ বিষয়ে চিত্র-শিল্পীর সুবিধা সাহিত্য-শিল্পীর অপেক্ষা অনেক বেশী। কাজেই সাহিত্য-শিল্পী যেখানে শব্দের বিন্যাসে বর্ণের বিলাস-মাধুর্য্য ধরিতে চাহেন, সেটা তাঁহার পক্ষে যেন দুঃসাহস। কারণ বর্ণরেখার বিন্যাস যেখানে সহজেই সুসঙ্গত, সেখানে শিল্পীর দক্ষতা-বিকাশের তাহা সম্পূর্ণ সহায়ক; কিন্তু যেখানে শিল্পীর সহায় মাত্র শব্দরাশি, যেখানে তাঁহার effect সম্পূর্ণভাবে আরেকটী ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে, সেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উদ্বোধন করিতে গেলে যে শিল্পীকে পদে পদে প্রতিহত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর চক্ষুরিন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া যে কল্পনা সহজেই চিত্রে, কারুকলায় আপনার অন্তর্নিহিত সমগ্রতাকে জাগাইয়া তুলে, সে কল্পনাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাহন করিতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাই কালিদাসের মত শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবিও পম্পা সরোবরের বর্ণনায় রঙ ফলাইবার আদৌ চেষ্টা করেন নাই দেখিতে পাই। তিনি শুধু কতকগুলি শব্দের সঙ্কেত করিয়াই আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার বর্ণনার মধ্যে খাঁটী কবিত্ব-রস আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায়। যেখানেই বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানেই এই দুই শিল্প-কলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ সচেতন দেখা যায়।

কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের এই বৈশিষ্ট্যের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিতেও সাহিত্যিকের লেখনীকে চিত্রকরের তুলিকা ভ্রমে রূপকে শব্দের রঙে আকারিত করিবার অসাধ্য সাধনের ইচ্ছা জগতের সকল সাহিত্য-শিল্পীকেই পাইয়া বসে কেন? এ প্রশ্ন অন্য প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন হইলেও ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে; কারণ এই প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের রূপদক্ষতা একটা খেয়ালের ভুল মাত্র, বা সংস্কৃত সাহিত্য-শিল্পের অন্ধ অনুকরণ মাত্র, বা তাহার শিল্পী-প্রতিভার কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, তাহা বুঝা যাইবে।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, শিল্পীমাত্রেরই কারবার রূপের সঙ্গে। তাই সাহিত্য-শিল্পী নানাভাবে শব্দের দিক্‌ দিয়া তাঁহার এই সামগ্রী-দৈন্যকে পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন, একভাবে তিনি যেমন ক্রমের সঙ্গে বাঁধা, তাঁহাকে কিছু বর্ণনা করিতে গেলেই ক্রমে ক্রমে একটীর পর একটী করিয়া বর্ণনা করিতে হইবে,

* প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

অপর দিকে তেমনি তাঁহার চিত্রশিল্পীর অপেক্ষা সুবিধা বেশী। চিত্র শিল্পী যেমন চিত্রের সমগ্রতা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তেমনি তাঁহাকে বিষয়বস্তুর একটী সুন্দর মুহূর্ত্তের উপর নির্ভর করিতে হয়, যেখানে সেই মুহূর্ত্তটী অন্তরের ও দেহের সমগ্র রূপবিশিষ্টতাকে অনন্তের বৃন্তে নিশ্চল পদ্মের মত ধরিয়া রাখে। সাহিত্য-শিল্পীর কিন্তু এ বিষয়ে সমগ্র সুবিধা। তিনি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহার বিষয়-বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা বা গতিকে অতি স্বচ্ছন্দে ও অবলীলা-ক্রমে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এই বিষয়েও আমরা কালিদাসের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। তিনি সর্ব্বত্রই —যেখানে সাগর বর্ণনা করিয়াছেন, যেখানে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার সৌন্দর্য্যসম্ভার বর্ণনা করিয়াছেন, যেখানে মেঘদূতের পূর্ব্বমেঘে সমগ্র উত্তর ভারতের সৌন্দর্য্যপট উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেখানেই এই গতির perspective অবলম্বন করিয়াছেন; এই গতিকে ছন্দোভঙ্গে লীলায়িত, মুখর, মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন, যাহাতে আমাদের কল্পনা কোথাও প্রতিহত হইতে না পারে।

আর একভাবেও সাহিত্যশিল্পী নিজের অভাব পূরণ করিয়াছেন তাঁহার বিষয়বস্তুর অসাধারণ আকর্ষণ মাধুর্য্য বা charms বর্ণনা করিয়া। রূপবর্ণনা করিতে গিয়া তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমসন্নিবেশ একান্ত নিপুণতার সহিতও যদি বর্ণনা করেন, তাহাতে সৌন্দর্য্যের সমগ্রতার আভাস তত ফুটিবে না, যত নিপুণ চিত্রকরের রেখাঙ্কনপাতে ফুটিবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির আকর্ষণ মাধুর্য্য বা charms শব্দে গাঁথিয়া দিয়া আমাদের কল্পনাকে এতদূর উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, যাহাতে সে সমগ্রতাকে অনুভবে আনিবার জন্ত অন্ত কোন শিল্পের আশ্রয় লইতে হয় না। একটী চাঁদের মত মুখের সৌন্দর্য্যের জন্ত অন্ত কোন শিল্পের প্রতিফলিত সৌন্দর্য্যকে স্মরণে আনিতে হয় না। কারণ, এখানে মুখের সৌন্দর্য্যকে স্নিগ্ধতা প্রভৃতি কতকগুলি সুকুমার আকর্ষণের সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করায় সেই সৌন্দর্য্যটী অনায়াসেই আমাদের অনুভবে আসে।

তা'ছাড়া যে কোন শিল্পের, কি সাহিত্যাদি শিল্পের, কি কারুশিল্পের রসবোধ করিতে গেলে চাই সংস্কার। এই সংস্কারকে অবলম্বন করিয়াই দর্শক বা পাঠকের সঙ্গে শিল্পীর সহানুভূতি জমিয়া উঠে। যেখানে নীলোৎপলের সংস্কার নাই সেখানে নীলোৎপলের সাহায্যে তনুর সৌন্দর্য্যকে অনুভবে আনান যায় না। আবার যেখানে সংস্কার হইয়া আছে, সেখানে শব্দের আশ্রয়েই হউক আর রেখাঙ্কণের আশ্রয়েই হউক সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলেই রসানুভূতি-জনিত আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যাইবে। এইভাবে রূপ-বর্ণনারও সাহিত্য-শিল্পীর কাছে একটা সার্থকতা আছে।

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে শিল্পী মাত্রেরই কল্পনা সাধারণতঃ চিত্রবহুল এবং মূর্ত্ত (picturesque and concrete). এমন কি তাঁহারা চিন্তা পর্য্যন্ত করেন চিত্রে। কাজেই তাঁহাদের কল্পনা যে প্রতিকৃতির সংস্কারকেই অবলম্বন করিবে ইহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। কিন্তু বিস্মিত হইতে হয়, যখন দেখি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সেই কল্পনাকে নিজের সহজাত সংস্কারের মধ্য দিয়া অপরের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে, যাহার ফলে কতকগুলি শব্দের সমাবেশে বর্ণের বৈচিত্র্য, রূপ-তরঙ্গের বিক্ষেপ ফুটিয়া উঠিতেছে। শব্দের সামগ্রী দিয়া চিত্রের বর্ণ-বিলাস রচিত হইয়া আমাদের সম্মুখে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-দৃশ্য কালিদাসের কল্পনায় মণ্ডিত হইয়া চিরদিনের উপভোগ্য হইয়া রহিল।

আর ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়েরই বা কি আছে। কল্পনা মনের ক্রিয়া। যে কোন ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে ইহা একবার উদ্বুদ্ধ হইলেই তাহাতে মনের সম্পর্ক বশতঃ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সংস্কারও আভাসিত হইতে পারে; আর এইরূপ আভাসিত হয় বলিয়াই বাণভট্টের অচ্ছোদ সরোবরের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি যে কত দক্ষ colourist, তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্য যে কি অপূর্ব্ব, তাহা আর বিস্মৃত হওয়া যায় না। সেই অচ্ছোদ সরোবরটী আমাদের কল্পনাকে এমন অনায়াসে সমগ্রভাবে সম্মোহিত করে যে মনে হয় যেন এই নয়নের সম্মুখে সরোবরটী জলে টলমল করিতেছে; তাহাতে কত না কুমুদ-কহ্লার হেলিতেছে, দুলিতেছে, কতরকম বর্ণের পাখীর কলরব গুঞ্জিত হইতেছে—সর্ব্বত্র যেন বায়ুর আবর্ত্ত, আলোকের চাঞ্চল্য, রঙের অধীরতা। অথচ বাণভট্ট সাহিত্য-শিল্পের সুবিধাটুকু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন।

তাঁহার canvas এর যেন শেষ নাই; তাহাতে যত ইচ্ছা তিনি details আনিয়া বসাইতেছেন, কোথাও কোনটী বিন্দুমাত্র অসঙ্গত, খাপছাড়া মনে হয়না। এ সাহিত্য-শিল্পীর পরম সুবিধা। এমনটী চিত্র-শিল্পীর পক্ষে ঘটে না। এই রকম যে চিত্রশিল্পী স্থৈর্য্যকে লঙ্ঘন করিয়া, গতির ইঙ্গিত জানাইতে চান, তিনিও সাহিত্য-শিল্পীর যাহা আপনার বিষয় তাহাকে চিত্রে প্রকাশের চেষ্টা করেন। এবং তিনি যদি উঁচু দরের কলাবিৎ হন, তাহা হইলে চিত্রেও সেই গতির ইঙ্গিতে দর্শকের কল্পনা সমানভাবেই উদ্বুদ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইবে। কাজেই শিল্পীর মর্য্যাদা যখন পূর্ব্বজাত সংস্কারের উপরই নির্ভর করিতেছে, তখন সেই সংস্কারকে যিনি যত স্বচ্ছন্দে ও সুন্দরভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া রসায়িত করিতে পারিবেন, তিনিই তত উঁচুদরের শিল্পী।

বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্য-শিল্পের এই সব অসুবিধা অতিক্রম করিবার জন্য তাঁহার রূপ-বর্ণনাগুলির মধ্যে উপরোক্ত দু' তিনটী প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন দেখা যায়। কোথাও বা তিনি প্রাচীনপন্থীদের মত অর্থাৎ সংস্কৃত কবিদের মত, উপমাদি অলঙ্কারের আশ্রয়ে আমাদের সহজাত সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রূপের পরিকল্পনা আমাদের অনুভবে আনিতে চাহিয়াছেন; কোথাও বা তিনি শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া, গতির পর গতির সৃষ্টি করিয়া চিত্র শিল্পীর মত রূপকে একেবারে আমাদের চোখের সাম্নে ধরিতে চাহিয়াছেন; আবার কোথাও বা charms বা effect এর অবলম্বনে শুধু রূপের বৈশিষ্ট্যকে কৌতুকাবহভাবে অসাধারণ দক্ষতার সহিত স্বল্প কয়েকটা টানের ব্যঞ্জনায় মানুষটীর মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—মনে হয় সে যেন আমাদের অতি পরিচিত। তাঁহার উপন্যাসগুলির ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার রূপ-বর্ণনার ভঙ্গী ক্রমশঃ উপমাদি অলঙ্কারের বাহুল্য ছাড়িয়া শেষের দিকে ব্যঞ্জনারই আশ্রয় লইয়াছে; ভাষাকে তিনি সর্ব্বত্র প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাবের বাহন করিয়াছেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসখানির সাক্ষ্যই এবিষয়ে চরম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদিও শেষের দিক্‌কার উপন্যাসগুলিতে তাঁহার এই রীতি পরিস্ফুট, কিন্তু এক 'দুর্গেশনন্দিনী' ছাড়া আর যে কোন উপন্যাসেই তিনি এবিষয়ে যে বিশেষ অবহিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'ই যেন প্রথম এই সংস্কারমুক্তি বেশ চোখে পড়ে। আর রূপবর্ণনার ভাষাতেই যে এই পরিবর্ত্তনের ছাপ সুস্পষ্ট পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কারণ, এই রূপবর্ণনার দ্বারাই কবির কল্পনালোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে; আর এই পরিচয়ের ঘনিষ্টতা সূত্রেই তাহাদের প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ উপজাত হয়।

তাহার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপবর্ণনার দিকে ঝোঁক দিবার বিশেষ কারণ ছিল। মুখ্যতঃ তিনি ছিলেন কবি, কল্পনাবিলাসী এবং আদর্শবাদী। অন্ততঃ আধুনিকদের তাঁহার উপর এই অভিযোগ যে, তিনি ভাবপ্রিয় যতটা ছিলেন বস্তুপ্রিয় ততটা ছিলেন না। নহিলে অতীতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যেমন আন্তরিক, বর্ত্তমানের সঙ্গে তেমন মনে হয় না। কিন্তু এই অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার না করিয়াও বলা যায় যে, যিনি প্রকৃত স্রষ্টা তিনি একেবারে বস্তু সর্ব্বস্ব হইতে পারেন না। তাঁহার অন্তরের রসানুভূতি সে বস্তুকে অনুরঞ্জিত করিতে পারিয়াছে বলিয়াই তিনি স্রষ্টা।

আর যদিও বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাশীল ছিলেন, তাহ'লেও তিনি বস্তুর অমর্য্যাদা করেন নাই। তিনি ভাবুক ছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তীব্র রূপানুভূতিসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন। তাই ভাবুকতা সত্ত্বেও বস্তুকে কখনও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান নিদর্শন তাঁহার এই রূপ-বর্ণনাগুলির সৌন্দর্য্যে, রসানুভূতিতে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠকের মনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার ইচ্ছায় পাওয়া যায়। আর এই রূপবর্ণনা-শক্তির সাফল্য ও দক্ষতার ফলেই তাঁহার কল্পনার জগৎকে আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, প্রেমে, ব্যর্থতায় এত সুন্দর করিয়া, আপনার করিয়া পাইতে আমাদের ভাল লাগে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে অতীতকালের ঐতিহাসিক ঘটনাযুক্ত ও ভাবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সৃষ্টিপ্রতিভা বিকশিত করিয়াছেন, তাহার আর একটা কারণ ছিল। আইরিশ কবি ঈট্‌স্ বলিয়াছেন—"So far from the dis-

cussion of our interests and the immediate circumstances of our life being the most moving to our imagination, it is what is old and far off that stirs us the most deeply" (Discoveries).—অর্থাৎ বর্ত্তমানের ঘটনা অপেক্ষা অতীতের ঘটনাই আমাদের কল্পনাকে খুব বেশী রকম উদ্বুদ্ধ করে। যিনি নিছক্ শিল্পী ও ভাবুক স্মৃতির বৈচিত্র্যে অতীত তাঁহার কল্পনাকে ও সৌন্দর্য্য বোধকে যতটা উদ্দীপিত করে, এমন বর্ত্তমানের কেবল ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্য্য করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রে যে শিল্পী ও ভাবুকের সংস্কার খুব গভীর ছিল তাহা তাঁহার এই ঘটনা নির্ব্বাচনেই বুঝা যায়। তিনি বর্ত্তমানকে এড়াইতে চাহিতেন উপেক্ষার ছলে নয়, বর্ত্তমানের সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য। সমস্যা-মূলক বর্ত্তমানের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে যাঁহার সৃজনীশক্তি নিরুদ্ধ হইয়া গেল, তাঁহার শিল্প প্রতিভাকে যে অনেকখানিই পঙ্গু হইতে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যখন বর্ত্তমানের হাত এড়াইতে না পারিয়া সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত, তখনও তাঁহার শিল্পী ও ভাবুকের দৃষ্টি সে-সমস্যাকে আধুনিক সমস্যাভাবে দেখে নাই, দেখিতে চাহিয়াছে আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্যের চিরন্তন সমস্যা রূপে। কাজেই তাহাতে শিল্পীর সঙ্গে সমাজ চরিত্র-চিত্রকের হয়ত সর্ব্বত্র সঙ্গতি ঘটিয়া উঠে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের রূপবর্ণনার আর একটা সহজ বিশেষত্ব এই যে, গোড়াতেই তাহার মধ্যে তিনি দোষগুণ বিশিষ্ট সমগ্র চরিত্রটীর সঙ্কেত বা আভাস দিয়া যান। আমরা অবশ্য এখানে প্রধান চরিত্রগুলির কথাই বলিতেছি। উপন্যাসের বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে চরিত্রটীর যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে, তাহার বীজ তিনি রূপবর্ণনার অন্তরালে সংগোপিত রাখেন। আর এরূপ না হইয়াই পারে না; কারণ, প্রতিভাবান্ রূপদক্ষের দৃষ্টি কি মানব-চরিত্রের, কি প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। তাই অসুন্দরও তাহার কাছে সুন্দর, ভীষণও তাহার কাছে মধুর। তাই হুগো তাঁহার অমর উপন্যাস, "The Laughing Man"-এ, "Laughing man"এর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা শিল্পীর সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে চমৎকার এবং কলা-কৌশলের দিক দিয়া অতুলনীয়। Laughing manএর বিকৃত অবয়বে স্বভাবতঃ কোন সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে; কিন্তু শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির স্পর্শে শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অত্যাচারের প্রতিমূর্ত্তিরূপে তাহার প্রতি এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি জাগিয়া উঠে, যাহার ফলে শিল্পী নিজেও এমন নিখুঁত, অনবদ্যভাবে তাহাকে আঁকিতে পারিয়াছেন। তাই Hardy তাঁহার সুপরিচিত উপন্যাস "The Return of the Native"এ Egdon heathকে এমন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন যেন সেই প্রান্তরের রমণীয় অথচ ভীষণ-উদাস সৌন্দর্য্যের মধ্যেই tragedy'র সমস্ত বীজ সংগোপিত আছে, একটা অদৃশ্য, দুর্দ্দমনীয় নিয়তি যেন সে সমগ্র আবহাওয়াটাতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছে। এমনি একটা আবহাওয়ার স্পর্শ আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা"র মধ্যে। হার্ডির পূর্ব্বোক্ত উপন্যাসে বর্ণিত নায়িকা Eustacia Vyeএর অনুপম চরিত্র বর্ণনা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিবেন কতখানি অন্তর্দৃষ্টি, কল্পনা, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং ভাষার দক্ষতা থাকিলে সমগ্র চরিত্রের এরূপ সুন্দর আভাস দেওয়া যায়। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রেও এই সকল গুণের একাধারে সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার রূপবর্ণনা, কি বহিঃপ্রকৃতির, কি মানব-প্রকৃতির বর্ণনা শুধু কতকগুলি ছায়াচিত্রে আমাদের সম্মোহিত মাত্র করে না, তাহারা আমাদের একান্ত আপনার হইয়া অন্তর-লোকের চির-অধিবাসী থাকিয়া যায়।

তবেই আমরা বুঝিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা ও কল্পনা-ধারার সঙ্গে রূপবর্ণনাগুলির সম্পর্ক কত নিকট ও নিবিড়। আর দেখিলাম বস্তুর প্রতি, রূপের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃই তাঁহার হাতে অপ্রধান সামান্য চরিত্রগুলিও অতি আশ্চর্য্য রকম ফুটিয়াছে; কোথাও আড়ষ্ট, জড়তা বা উপেক্ষিত ভাব নাই। আমরা এখানে তাঁহার দুটী রূপবর্ণনার নমুনা দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। প্রথমটী বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কল্পনার সৃষ্টি মনোরমা-চরিত্র। রুবেন্স তাঁহার কোন বিখ্যাত চিত্রে যেমন দু'দিক হইতে আলোকপাত করিয়া প্রতিভার স্বাধীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও

এই মনোরমা চিত্রে বালিকা-সুলভ চাঞ্চল্যের সঙ্গে প্রগল্ভ বয়সের ও দুর্ল্লভ গাম্ভীর্য্যের একত্র সমাবেশ যেরূপ অপরূপ নৈপুণ্যে দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিল্পী-চিত্রের সৃষ্টির স্বাধীনতা অপূর্ব্ব প্রতিভায় সফল ও সার্থক হইয়া গিয়াছে। স্থান সংক্ষেপের জন্য আমরা এই রূপবর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই বিরত হইব। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ কলা চাতুর্য্যের সহিত অঙ্গাবয়বগুলির স্থিতি ও গতির সৌকুমার্য্যের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন।"... ..এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে, মনোরমার রূপরাশি কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট সুকুমার, সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গ শিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গ শিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গিতে সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য। সুকুমার চরণ, চরণ বিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্ত বায়ু সঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জলরাশি পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র জন্য মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণ-সম্পাত তুল্য; আর এই যে মনোরমা দেবী গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ হস্তে ধরিয়া, এ কারণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন—ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যাগ্রে সদ্য প্রফুল্লদলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন-ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবী পার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন।···দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘ সঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমন পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত প্রগল্ভ বয়সেরও দুর্ল্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল।"

আর একটী আনন্দ মঠের অতি সামান্য চিত্র গৌরীঠান-দিদির চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র গৌরীঠান্‌দিদির বর্ণনা করিতেছেন—"স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধ বয়স্কা, মোটা সোটা কালো, ঠেঁটী পরা, কপালে উল্কি, সীমন্ত-প্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্‌ঠন্ করিয়া হাড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্‌ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্‌গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানাপ্রকার টলুনি টাল্‌নির বিকাশ হইতেছে।" বলিতে হইবে না, এ চিত্রটী আমাদের কত পরিচিত।

আমরা এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের রূপবর্ণনার সাধারণ সূত্রগুলি নির্দ্দেশ করিয়া গেলাম; বারান্তরে এই সূত্রগুলি ধরিয়া তাঁহার রূপবর্ণনার একটা স্তরভেদ ও ক্রম-বিকাশ দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

মাখনলাল মুখোপাধ্যায়



হায়রে

শ্রীআশীষ গুপ্ত

বৈশাখের এক রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে গয়া ষ্টেশানে শ্রীমতী উমা তাহার স্বামীর সহিত ট্রেন হইতে অবতরণ করিল। গয়া সহরটি দার্জ্জিলিং নয়, সিমলা নয়, এমন কি নৈনীতাল, ল্যান্স্‌ডাউনও নয়,—মুড়ি ভাজিবার বালির খোলার মত বৈশাখী গয়ার অবস্থা, সেখানে কেহ স্বাস্থ্যসংগ্রহ করিতে যায় না, উমার ন্যায় আলোকপ্রাপ্ত সমাজের মেয়ে ত নিশ্চয়ই না। ইহার গোড়ায় যে ইতিহাসটুকু আছে, তাহাই আজ বলিব।

উমা ও লীলা দুই বোন। বাঙ্গালীর ঘরে দুই বোন থাকাটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, পৃথিবীর কোনও দেশেই এটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়,—কিন্তু তবুও উমা এবং লীলার ভগ্নীত্বের মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা সকলের মনে শ্রদ্ধালু বিস্ময়ের উদ্রেক করিত।

দু'টি বোনের বয়সের মাঝে চার বৎসরের ব্যবধান,—কিরূপে যে সেই বিচ্ছেদ সহ্য করিয়া উহারা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল সে কথা মনে করিলে আর চমক লাগার সীমা থাকে না।

সকাল বেলার জাগরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় তাহার পরদিনের নিদ্রাভঙ্গ অবধি এই দুইজনের দুইজনকে না হইলে একদণ্ডও চলিবার জো নাই।

মামিমা একদিন হাসিয়া বলিলেন, "বড় হ'য়ে বিয়ের পর যখন দু' বোনের একজন যাবে উত্তর মেরুতে আর একজন যাবে দক্ষিণে, এক যুগে পাঁচ দিন পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'বে কিনা সন্দেহ, তখন এরা কি করবে ভাই?"

কথাটা মামিমা জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার ননদিনী উমার মাতাকে, প্রত্যুত্তরে তিনি হাসিলেন মাত্র। উমা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, সাত বছর তাহার বয়স, লীলার তিন। মামিমার প্রশ্ন এবং জননীর হাস্য সে ঠিক বুঝিল না, কিন্তু এ কথাটা তাহার নিকট অতিশয় পরিষ্কার হইয়া গেল যে, বিবাহ নামক এমন একটা বিষয়ের আলোচনা হইতেছে যাহাতে লীলাকে ছাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। শুনিয়াই তাহার ক্ষুদ্র দেহ নিদারুণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নাক ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উমা কহিল, "বিয়ে আমি কক্ষনই করব না, কিচ্ছুতেই করব না—"

দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া কহিল, "আর যদি কোনদিন করি তবে বোনটিকেই করব—"

মা ও মামিমা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে উমা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পিতা উমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সে একদিন জ্যাঠতুত বড়দিদির সহিত বিদ্যালয়ে গেল।

দ্বিতীয় ঘণ্টার প্রারম্ভে ক্লাসের সমস্ত মেয়ে শেষের বেঞ্চের কোণ ঘেঁসিয়া উপবিষ্ট উমার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইল। অতিরিক্ত রকমে মুখ গম্ভীর করিয়া একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কাঁদ্‌ছে কেন ভাই?—মা'র জন্য কষ্ট হচ্ছে কি?"

দুই হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগ্‌ড়াইয়া রগ্‌ড়াইয়া উমা দুই চোখ লাল করিয়া ফেলিয়াছিল, মুখ না তুলিয়াই ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল, "মা'র জন্য নয়, বোনটির জন্য—" ছয় বছরের সুধীরা কহিল, "আমারও ত বোনটি আছে বাড়ীতে, ছুটু আছে, বীণা আছে, মা আছেন, বাবা আছেন, আমি তাদের জন্য কাঁদি কি?"

সকলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই, আমি কাঁদি কি?"

সহপাঠিনীরা প্রত্যেকেই শুধু গোল গোল চোখ করিয়া গম্ভীরতর মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না সুধীরা কাঁদে না।

মাথা উঁচু করিয়া জোরের সহিত সুধীরা বলিল,—"তবে—?"

ইহার পর যেন আর জবাব নাই!

উমা শুধু উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতে লাগিল, "আমার বোনটি, আমার বোনটি!"

উৎপলা উমার সমবয়সী হইবে, এতক্ষণ সে এই ভিড়ের মধ্যে ছিল না, এখন কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। কাছে আসিয়া একেবারে উমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া লুকাইয়া তাহার হাতের মধ্যে গোটা চারেক লজেঞ্জস্ গুঁজিয়া দিয়া কানে কানে কহিল, "কেঁদোনা ভাই নূতন মেয়ে, লজেঞ্জস্ খাও—" আরও মৃদুস্বরে কহিল, "কাউকে দিয়োনা কিন্তু,—মেধাকে না, সুধীরাকে না, উর্ম্মিলাকে না, অতসী শ্রী কাউকে না,—দিতে হয় আমি দেব, আমাদের বাড়ীতে অনেক আছে, ঢের আছে, শিশি ভর্ত্তি ভর্ত্তি আছে।" বলিয়া গম্ভীর মুখ করিয়া একটা লজেঞ্জস্ খাইতে খাইতে পরম উদারতার সহিত বলিল, "খাও ভাই নূতন মেয়ে, ওগুনো তুমি এক্‌লাই খাও—"

লজেঞ্জস্ পাইয়াও উমার কান্না ঘুচিল না দেখিয়া উৎপলার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

হেড্ মিস্ট্রেস্ সুপর্ণাদি আসিলেন, উমাকে কোলে লইয়া গাল টিপিয়া আদর করিয়া কহিলেন, "কাঁদ্‌ছ কেন মনু? কি হ'য়েছে সোনা?"

উমা ফোঁপাইতে লাগিল, "বাড়ী যাব,—আমার বোনটি—"

সুপর্ণা কহিলেন, "বাড়ী যাবে, বোনটির জন্ম মন কেমন কর্‌ছে?"

সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া উমা জানাইল, হ্যাঁ তাই।

"কেন স্কুল ভাল লাগ্‌ছে না?"

স্কুলের নামে ক্রোধে এবং অভিমানে উমা যেন একেবারে ফাটিয়া পড়িল,—"ছাই স্কুল, পড়্‌ব না আমি এমন স্কুলে,—আমার বোনটি—"

মৃদু হাঁসিয়া সুপর্ণা উমার বড়দি শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এগারোটার সময় যে মেয়ে সাজিয়া গুজিয়া ফ্রক পরিয়া স্কুলে গিয়াছিল সাড়ে বারোটার সময় সে দিদির হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া বাড়ী ফিরিল।

পরদিন হইতে শিশু লীলাকে ছোড়্‌দি'র সহযাত্রিণী হইতে হইল,—স্কুলে গিয়া তাহাকে উমার পাশে যথাসম্ভব শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে হইত এবং বন্দোবস্ত হইল, লীলার তত্ত্বাবধানের জন্ম একজন দাসী সমস্তদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিবে।

বাড়ীর সম্মুখের মাঠে গোটা পনেরো রেসের ঘোড়া সহিসদের জিম্মায় বায়ু সেবন করিতে আসে নিত্য। চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া মাঠের মাঝখানে তাহারা একটা সুবৃহৎ তৃণশূন্য বৃত্ত আঁকিয়াছে।

জানালার কাছে বসিয়া, ওই ঘোড়াগুলার পানে চাহিয়া উমা বহুদিন হইল সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া গেছে। ওর মনের মধ্যে স্বর্গ, ওর চোখে স্বপ্ন। পক্ষীরাজের পিঠে চড়িয়া উমা যাত্রা করিল, সঙ্গে আছে বোনটি। মাথার উপরকার নীলাকাশ পক্ষীরাজের পায়ের নীচে পড়িয়াছে, উপরের দিকে চাহিলে উমা এবার দেখিতে পাইবে বর্ষা শেষের আকাশে ফিকে-রোদ-ওঠা রঙের মহোৎসব, পরীর দলের ছেলেমেয়েরা নভঃতলপ্রান্তে বাজনা বাজাইতেছে, ধামকুড়াকুড়, ধামকুড়াকুড়। রেসের ওই ঘোড়াগুলার পানে চাহিয়া লঘু বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া উমার মন যে কোথায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, কেহ জানে না,—কোন্ ঘাটে সে তরী ভিড়ায়, কোন্ দেশে সে পসরা নামায়, তাহার বাণিজ্যের বিকিকিনি যে কোন্ হাটে, তাহা সর্ব্বলোকের অজ্ঞাত।

মামা কহিলেন, "আমি একদিন মিতিলকে রেস দেখিয়ে নিয়ে আসব—"

আকাশের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র আনন্দ কোলাহলে ঠেলাঠেলি করিয়া উমার ক্ষুদ্র মুঠি দু'খানির মধ্যে পৌছিয়া গেল। ত্রিভুবনে ইহার চেয়ে বড় কামনার সামগ্রীর কথা উমার এখন আর কিছু মনে পড়িতেছে না,— ভাঁড়ার ঘরে বৈয়ামের ভিতর হইতে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া তেঁতুল

খাওয়াটাও অবশ্য অতিশয় তৃপ্তিকর, কিন্তু সেও এতটা গভীর আনন্দের নয়। অতি উল্লাসে উমা কৌচের উপর হইতে মেঝেতে কার্পেটের 'পরে ক্রমাগত লাফ খাইয়া পড়িতে লাগিল,—কিয়ৎদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট শ্রদ্ধাবিস্ফারিত-নেত্রা লীলাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "বোনটি, এই দেখ আমি কি রকম সার্কাস কর্‌ছি, তুমি কর্‌তে পারনা ত!"—আশ্বাস দিয়া বলিল, "তুমিও পার্‌বে, আমার মত বড় হ'য়ে নাও তখন পার্‌বে।—"একটু চিন্তা করিয়া কহিল, তা সার্কাস কর্‌ছি কেন জান? আনন্দ হ'য়েছে কিনা, খুব আনন্দ হ'য়েছে কিনা—তাই,—"পুনরায় কহিল "আমরা রেস দেখ্‌তে যাব কিনা,—যেখানে ঘোড়া দৌড়োয় সেখানে,—তুমি যাবে, আমি যাব, মামা যাবেন, তাই আনন্দ হ'য়েছে—"

শনিবার দিন মামা কহিলেন, "আজ মিতিলকে নিয়ে রেস্ দেখ্‌তে যাব—"

উমা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মা, বোনটিকে সাজিয়ে দাও—"

মামা কহিলেন, "বোনটি নয় মিতিল, শুধু তুমি নিজে—"

উমার মুখের প্রদীপ্ত উৎসাহ চোখের পলকে রূপ বদ্‌লাইল, দেখিয়া, কৈফিয়তের সুরে মামা বলিলেন, "খুব ভিড় হ'বে ত, ও বড্ড ছোট কিনা—"

কঠিন মুখে উমা কহিল, "আমি যেতেও চাইনে—"

লীলা যে পক্ষীরাজে চড়িবে না, সে পক্ষীরাজকে স্বহস্তে গুলি করিয়া মারিতেও উমার দ্বিধা নাই। মনের স্বর্গ, চোখের স্বপ্নকে লীলার জন্য সে স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারে,—ভীষ্মের ত্যাগ, দধিচির ত্যাগের অপেক্ষা ইহা ছোট নয়।

এতটুকু শিশুর এমনতর একগুঁয়েমি দেখিয়া মামা বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "তবে তুমি যেয়োনা—"

উমা চলিয়া গেল,—সমস্ত দিন সে লীলার সহিত নাচিয়া বেড়াইল। উমার স্বর্গলোকের বাহন তাহাকে আরোহী না করিয়াই আকাশে উড়িয়া গেছে, সে কথা তাহার মনেও রহিল না, সেজন্য ক্ষোভও রহিল না বিন্দুমাত্র। লীলা যেখানে নাই, সেখানে সে থাকিতে পারে না, ইহার চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হইতে পারে! অতএব পক্ষীরাজ অথবা পুষ্পক রথ তাহাদের নিজের নিজের রাস্তা দেখুক, মামা চীৎকার করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকুন, বোনটি কাছে থাকিলে উমা সে সকল গ্রাহ্যও করে না।

লীলা বড় হইয়া উঠিল, উমা তাহার অপেক্ষা চার বৎসরের অধিক বয়সী হইয়া দেখা দিল।—

অবশেষে এক আষাঢ়ের শুভ লগ্নে প্রচুর বাদ্যকোলাহল আনন্দ উৎসবের মধ্যে দুইটি স্নেহ বিমুগ্ধ হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিন দুপুরবেলা উমার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া, চোখের জলের তরঙ্গ তুলিয়া লীলা কহিল, "দিদি, তুই আমায় ছেড়ে চলে' যাবি?"

উমা কহিল, "কখ্‌খন না মিনু, তোকে ছেড়ে আমি যাব!—কখ্‌খনো না!—পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে আমি তোকে ও-বাড়ীতে নিয়ে যাব,—এ বিশ্বাস যদি আমার না থাকৃত, এ সম্ভাবনার সম্ভাবনা যদি না থাকৃত তাহ'লে আমি কিছুতেই এ বিয়েতে রাজী হ'তাম না—"

উমার ভাবী স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সে মনে মনে তাহাকে লীলার স্বামীরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিল,—ইঙ্গিতটা তাহারই।

লীলা প্রথমে কথা কহিল না, তাহার পর অকস্মাৎ এক সময় মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি, আমি মরে' গেলে তুই কি করিস—?"

লীলার মুখে হাত চাপা দিয়া উমা কহিল, "ফের্ অমন কথা যদি আর একবারও বলিস মিনু, তাহ'লে আমি আর তোর মুখ দেখ্‌ব না রাক্ষুসী—"

লীলা নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল, "আচ্ছা তুই একবার জবাব দে, তারপর না হয় জীবনে আর কোনদিন বল্‌ব না।"

একান্ত মিনতির সুরে পুনরায় কহিল, "বল্‌না দিদি, কি করিস—"

লীলার হাত এড়ানো দায়! অবশেষে উমা বলিল, "তুই যদি না থাকিস, তাহ'লে আমিও যে থাক্‌ব না, একথা কি তুই জানিস না মিনু?"

আবেগে এবং উগ্র ভালবাসার উচ্ছ্বসিত আনন্দে লীলার যেন কান্না পাইতে লাগিল অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভগ্নীর মুখের পানে

চাহিয়া উমা কহিল, "আর আমি মর্‌লে তুই কি কর্‌বি মিনু?"

তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদের সুরে লীলা বলিল, "যাব দিদি, তোমার সঙ্গে যাব—"

সহসা যেন বুকের সমস্ত রক্ত উমার মাথায় চড়িয়া গেল, সে কহিল, "তবে আয় আজ আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমাদের মধ্যে যে আগে মর্‌বে সে অন্যকে তার কাছে ডেকে নেবে,—আয় আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনের নাম নিয়ে শপথ করি যে মৃত্যুর পরে আমরা এ সত্য ভঙ্গ কর্‌ব না, এ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন কর্‌ব না। তোর চেয়ে স্নেহের জিনিষ এ সংসারে আমার আর নেই মিনু; তোর নাম করে' বলছি, আমি যদি আগে মরি, তোকে আমার কাছে টেনে নেব, আর তুই যদি আমার আগে পৃথিবী ত্যাগ করিস, তোকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পার্‌ব না—" বলিতে বলিতে আসন্ন বিচ্ছেদের সমস্ত ব্যথার দ্বারা তাহার কাল্পনিক চূড়ান্ত বিয়োগ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, কান্নার আবেগে সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

লীলা কহিল, "তোমার নাম করে' বল্‌ছি দিদি, তোমার উক্তি আমারও উক্তি, তোমার পথ আমারও পথ—"

—উমার বিবাহ হইয়া গেল, এবং সে তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল। পরবর্ত্তী মাঘ মাসের মধ্যেই দিদির যায়ের বেশে লীলা ভদ্রার সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুইটি বোনের বিবাহিত জীবন হাস্যে, উৎসবে, উল্লাসে, আনন্দে সুধাসিক্ত হইয়া দেখা দিল। দুইজনের এক সংসারে প্রীতির আর অন্ত রহিল না। লোকে চাহিয়া চাহিয়া অভিমত প্রকাশ করিল, সংসারে যদি ঘর বাঁধিতে হয়, তাহা হইলে মানুষে যেন এমন করিয়াই বাঁধে!

দুইজনের শয়নগৃহ পাশাপাশি অবস্থিত। লীলা বলিল, "দিদি, তুমি রোজ আমার কাছে একখানা করে' চিঠি লি্‌খবে?"

উমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "পাশের ঘরে থাক্‌বি, দিনে রাতে চোখের আড়াল হ'বিনে একমুহূর্ত্তের জন্য, চিঠি লিখ্‌বার সময় পাব কখন্?" একটু থামিয়া কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে কহিল, "তার চেয়ে এক কাজ কর, বরং, অনেক দূরদেশে গিয়ে ঘরকন্না আরম্ভ কর, জীবনে যেন না আর দেখা হয়, ইচ্ছে থাক্‌লেও যেন না আর দেখা হয়,—খুব বড় বড় চিঠি লিখ্‌ব'খন। কত থাক্‌বে তার ভিতরে মিষ্টি মিষ্টি কথা, কত স্নেহের উচ্ছ্বাস।"

দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া লীলা বলিল, "যদি তাই হয়, তুমি থাক্‌তে পার্‌বে? দিনের মধ্যে তোমার মিনুকে একশ'বার না দেখ্‌তে পেয়ে বুক ফেটে মরে' যাবে না?"

কথার জবাব না দিয়া, বুকের মধ্যে লীলাকে নিবিড়ভাবে টানিয়া লইয়া উমা নীরবে শুধু হাসিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চিঠির বন্দোবস্ত করিতে হয়; সপ্তাহে দুইখানা। কিছু সংবাদ তাহার ভিতরে থাক্ বা না থাক, একপক্ষ লেখে, "দিদি ভাই কেমন আছ?" অপর পক্ষ উত্তর দেয়, "মিনি রাক্কুসী কি কর্‌ছিস?" লিখিয়া নিজেরাই পত্রোদ্দিষ্টার হস্তে চিঠি বহিয়া দিয়া অতিশয় পুলকের সহিত উচ্চহাস্যের লহরী তোলে।—সংসারে তাহাদের আনন্দের শেষ রহিল না,—পরস্পরের সাহচর্য্যের মাঝে সূচিমাত্র দূরত্ব রহিল না, স্নেহের মধ্যে গভীরতা এবং আন্তরিকতার আর সীমা রহিল না,—তাহাদের ন্যায় এমন করিয়া পৃথিবীতে কেহ ভালবাসিল না, এমন করিয়া কেহ সে ভালবাসা প্রকাশ করিল না।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন রূপ রস গন্ধ বর্ণে পরিপূর্ণ এই সুন্দরী পৃথিবীর বহুনিম্নে ক্রুদ্ধ বাসুকীর টনক নড়িল যেন, কল্যাণী উমার সুখের নড়ী এইবার ভাঙিল, যমদূত আসিয়া লীলার শিয়রে দাঁড়াইল, এবং তিনদিন নামমাত্র যন্ত্রণা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহাকে সঙ্গে লইয়া গেল।

যে গেল তাহার চেয়ে যে রহিল তাহার সম্বন্ধে মানুষের দুঃখ হইল অধিক। লীলার মৃত্যুতে শোকের সহিত সকলের মনে উমার জন্য আশঙ্কা মিশ্রিত হইয়া রহিল। উমা কাঁদিল না, ভাস্করের হাতে গঠিত প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় লীলার মাথার কাছে বসিয়া রহিল। তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার দুঃসাহস কাহারও হইল না, ছোটখাট সময়োচিত উক্তির দ্বারা তাহার

সম্মুখে দাঁড়াইয়া শোকপ্রকাশের বিড়ম্বনা করিতে ভয়ে কাহারও গলা উঠিল না। অন্য ঘরে অতিশয় মৃদুস্বরে সকলে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

উমা উঠিয়া শ্বেতপুষ্পে লীলার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিল, শ্বেত গোলাপের মাঝে স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার ন্যায় লীলার মুখের দিকে চাহিয়া উমার চোখের পলক আর পড়ে না! লীলার সেই কমনীয় দেহ, যে দেহের প্রতি রেখাটি অবধি উমার গর্ব্বের, আদরের, সেই দেহ আজ প্রাণহীন হইয়া গেছে। লীলার সেই কম্বুকণ্ঠে আর সে দিদি বলিয়া ডাকিবে না, সংসারের শত কর্ম্মে, জীবনের সহস্র পদক্ষেপে আর সে উমাকে লক্ষ বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিবে না।—একি ভীষণ শান্তি, একি ভয়াবহ নিশ্চিন্ততা! সুদীর্ঘ দিবসে যাহার অহরহ আহ্বানে, স্নেহের সহস্রবিধ অত্যাচারে উমা নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পায় নাই, প্রতি মুহূর্ত্তের অজস্র কলরবে যে তাহার জীবনে তিলমাত্র অবকাশ রাখে নাই, সে আজ উমাকে অফুরন্ত অবসর দিয়া গেল,—কাহারও জন্য আর পরিশ্রম করিতে হইবে না, কাহারও আহ্বানে আর ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়া স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতে হইবে না, "বাঁদরী, দিদি কি মরেছে যে অমন করে' চেঁচাচ্ছিস্?" ছায়ার মত পায়ে পায়ে আর কেহ দিবারাত্র ফিরিবে না, কাহারও আদর সোহাগের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে উন্মুখ হইয়া থাকার প্রয়োজন আজ শেষ হইয়া গেছে।

লীলার শীতল ললাটে উমা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করাইল। সেই সুকুমার তনু, সেই পটে আঁকা মুখ, সেই অন্সার বিনিন্দিত রূপ, সে সবের দিকে ভক্তিমতী পূজারিণীর মত উমা অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। ও যেন কাঁদিতে ভুলিয়া গেছে, ক্ষুদ্র দুঃখের ক্ষুদ্র কলরব যেন উমার নয়, সর্ব্বস্বহারার বিহ্বল অবস্থা যেন এখন তাহার।—লীলার বুকে মাথা রাখিয়া, দুইহাত দিয়া সেই অতিপ্রিয় দেহখানি নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া উমা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকালবেলার আকাশ সেদিন মেঘে ঢাকা, সূর্য্য আর উঠিবে না।—লীলা তাহার পূর্ব্বদিন মারা গিয়াছে। তাহার পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্রখানি ফুল দিয়া, চন্দন দিয়া, রেশম দিয়া মনোরম করিয়া নিজের শয়নকক্ষে উমা সজ্জিত করিয়াছে। সম্মুখে রৌপ্য দীপাধারে ঘৃতের প্রদীপ, ধূপের গন্ধে সমস্ত ঘরখানি এক অপূর্ব্ব আবেশে উল্লসিত, গুগ্‌গুল, অগুরু আতরের সৌরভে সকল দিক আমোদিত।

লীলার ছবির সম্মুখে আসনের 'পরে বসিয়া উমা চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই প্রতিকৃতির পানে চাহিয়া রহিল। মৃত্যুর দ্বারা রূপসী লীলা তাহার আলেখ্যখানিকে মহিমান্বিত করিয়া গেছে। তাহার সৌন্দর্য্যের আভিজাত্যের শেষ কণাটি অবধি নিঃশেষ করিয়া এই চিত্রটিকে যে লীলা এমন করিয়া রঞ্জিত করিল, ইহা কেবল তাহার দেহত্যাগের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে,—প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াই এই প্রাণহীন বস্তুটিকে সে সর্ব্বস্ব দান করিয়া গেল। চাহিয়া চাহিয়া উমা আর চোখ ফিরাইতে পারে না। মনে মনে সে কহিতে লাগিল, তোমাকে একদিন বলিয়াছিলাম তোমার মৃত্যুর পর আর আমি জীবিত থাকিব না, সে কথা আমি ভুলি নাই, পুনরুক্তির দ্বারা আজ সে প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ়তর করিতেছি। সেদিন যে কাল্পনিক বিচ্ছেদের ভারে ব্যথায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিলাম, হৃদয়ের 'পরে আজ তাহা সোজাসুজি নামিয়াছে, যাহা কল্পনায় হৃদয়বিদারক ছিল, তাহার চেয়ে এ কত মর্ম্মান্তিক, কত ভীষণ, কত দুঃসহ! হে অমৃত-লোকবাসী আত্মা, জীবনে যে তোমাকে কোনদিন ত্যাগ করিল না, মৃত্যুতেও সে তোমাকে অনুসরণ করিবে, এ বিচ্ছেদ তাহার সহিবে না। উমার মুদিত নেত্রের কোণ দিয়া জলের ধারা অশ্রান্তভাবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সমস্ত দিন বিছানার 'পরে বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল। স্বামী আসিলেন, দেবর আসিলেন, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ এবং আত্মীয় আত্মীয়ারা নিঃশব্দপদে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া এই মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমার পানে চাহিয়া, যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই গোপনচরণে চলিয়া গেলেন। দুই বছরের শিশু কন্যা ইলা বহুক্ষণ ধরিয়া মায়ের কাছে কাছে ঘুরিল, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে বিন্দুমাত্র সোহাগ যত্ন আদায় করিতে না পারিয়া অবশেষে এক সময় অভিমান ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে মেঝের 'পরে ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামী আসিয়া ডাকিলেন, "মিতিল—"

বেদনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর অলস, গভীর শোকে চিত্ত তাঁহার অবসন্ন। উমা যেমন বালিশের 'পরে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, তেমনই কাঁদিতে লাগিল, সাড়া দিল না। মৃদুস্বরে স্বামী কহিলেন, "উঠে কিছু একটু মুখে দাও লক্ষ্মীটি, দু'দিন ধরে' উপোস করে' আছ—" দ্বিধার সহিত বলিলেন, "চল, বাগানে গিয়ে বসিগে,—এমন করে' শুয়ে থেকোনা আর,যাবে বাগানে?"

হাতের মুঠি খুলিয়া আঙুলগুলা দিয়া উমা বালিশটাকে নির্দ্দয়ভাবে নিষ্পেশিত করিতে লাগিল, শ্বেত-পাথরের টেবিলের উপরকার ঘড়িটার টিকটিক্ শব্দ, উমার বুকভাঙ্গা চাপা কান্না তাহার সহিত সুর মিলাইয়াছে, খাটের পাশে বিমূঢ়ভাবে স্বামী দণ্ডায়মান।

উমা মুখ তুলিল, দুইদিনে সে যেন কেবলমাত্র অস্থি-চর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া গেছে, চোখের কোণ কালো, ঠোঁট দুইটা সাদা। সে কহিল, "আমায় তোমরা একটু একা থাক্‌তে দাও, পায়ে পড়িগো তোমাদের একটুখানি থাক্‌তে দাও আমাকে একা।—উঠ্‌ব বই কি, খাব বই কি,—কিন্তু তিনটে দিনও না হয় যাক—"

সেদিন গভীররাত্রে লীলা আসিয়া ডাকিল, "দিদি—"

উমা বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল, কি সুন্দরই না তাহাকে দেখাইতেছে! নিবিড় কালো কেশরাশির মাঝে সিঁথির সিঁদুর যেন কৃষ্ণাকাশের বিদ্যুৎশিখাটি, শ্বেত-পাথরে গড়া প্রাণময়ী প্রতিমা, দুধে আল্‌তা গুলিয়া যেন ভগবান তাহাকে রঞ্জিত করিলেন। লীলা ডাকিল, "দিদি—"

উমা কথা কহিতে পারিল না, শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। লীলা আবার ডাকিল, "দিদি—"

উত্তর দিতে গিয়া উমার কণ্ঠস্বর যেন অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া গেছে। মনে হইল সহসা কে যেন বিপুল বলে তাহার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিয়াছে। সুতীব্র বেদনায় লীলার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। শান্ত বিষণ্ণ পদক্ষেপে সে যে কোথায় অন্তর্হিত হইল তাহা উমা বুঝিতে পারিল না।

ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিতেই, বাহিরের সূর্য্য চোখমুখ স্নান করাইয়া দিয়া গেল, মনেও হইল না যে লীলা নাই! এত বেলা হইয়া গেছে, অথচ সে এখন পর্য্যন্ত আসিয়া উৎপাত করিয়া ঘুম ভাঙায় নাই কেন, ভাবিয়া উমা বিস্ময় বোধ করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া স্থির করিল, "আজ চায়ের কাপে কম করে' চিনি দেব রাক্কুসীর, তাহ'লেই রাগ করবে, বেশ হ'বে মজা—"

ঘর থেকে বাহির হইতে হইতে উমা ডাকিল, "লিলি, লীলা, লীলু, মিনু, মিনি—"

স্নেহ যেন সে কণ্ঠস্বর হইতে সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে! শাশুড়ী দরজার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, বধূর মুখের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। "উমা জিজ্ঞাসা করিল, "লিলি ওঠেনি মা?"

শাশুড়ীর চোখের পানে চোখ তুলিয়া অকস্মাৎ মনে পড়িল, লীলা নাই! সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল না, ধীর পদে নিজের ঘরে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিল। লীলার ছবির চারদিকে ফুলের মালা তখনও তেমনই সাজানো, দীপাধারে দীপ নিবিয়াছে, ধূপাধারে ধূপের গন্ধ নিঃশেষিত।

উমা আসিয়া সেই চিত্রের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল। মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি ভগবানের প্রিয় ছিলে, তাই তিনি তোমাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন,—সেই জন্যই পৃথিবীর মলিনতা তোমাকে স্পর্শ করিল না। আমাদের সহস্র দৌর্ব্বল্য, লক্ষ ক্ষুদ্রতার দ্বারা আমি আর তোমাকে পীড়িত করিব না। তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাকে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কালানুসারে গ্রহণ করিলেন। সে অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মত স্পর্দ্ধা আমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম। হে আমার পরম স্নেহের ধন, আমাদের অপেক্ষা যোগ্যতর হস্তে, শুভতর হস্তে আজ তোমাকে সমর্পণ করিলাম। যে অধিকার তুমি তোমার শুচিতার দ্বারা, পবিত্রতার দ্বারা, সত্যের দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছ, সে অধিকারকে আমি নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলাম। অহরহ আমার দীর্ঘ নিশ্বাসের সাহায্যে আমি আর তোমাকে ধূলার মাঝে আকর্ষণ করিব না। হে বিদেহী পরম প্রিয় আত্মা, আমার হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইয়ো।"

সমস্ত দিন স্তব্ধতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল, একটা

অশুভ কলরবহীনতা ভবনখানিকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে বারান্দায় বসিয়া উমা আকাশ পানে চাহিয়া ছিল। তাহার অন্তরস্থ শোকের পবিত্রতা যেন অল্পে অল্পে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে, এখন উমার মুখের পানে চাহিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখের বিশালতায় শ্রদ্ধাভিভূত চিত্ত আপনা হইতেই আর অবনমিত হইয়া পড়ে না,—এবার তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেতা দুরস্ত ভাষায় শোক জ্ঞাপন করা চলে,—বাঁধা নিয়মে সান্ত্বনা দিতেও ইতস্ততঃ করিতে হয় না।

রাত্রে লীলা আবার আসিল। তাহার সুন্দর মুখের লালিত্য অন্তর্হিত হইয়াছে,—যে পাওনাদার তাহার প্রাপ্য যথাসময়ে আদায় পায় নাই, সে যেরূপ মুখ করিয়া সদর দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তেমনিতর এখন লীলার মুখের অবস্থা।

সে ডাকিল, "দিদি—"

অন্য মনস্কভাবে উমা যেন কি ভাবিতে লাগিল।

লীলা কহিল, "দিদি, তুমি যে আমার কাছে আস্‌বে বলেছিলে?"

উমা নীরব হইয়া রহিল,—লীলার কথা যেন তাহার কানে যাইতেছে না।

লীলা পুনরায় কহিল, "দিদি, তোমার প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিতে এসেছি।"

উমা সমস্ত কথা বিস্মৃত হইয়াছে। বিষণ্ণ নেত্র মেলিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের প্রতিশ্রুতি?"

লীলার আর বিস্ময়ের অবধি নাই, তবুও সে একবার ঢোঁক গিলিয়া কোন প্রকারে কহিল, "তুমি যে আমার কাছে, আস্‌বে বলেছিলে—"

অকস্মাৎ উমার মনে হইল, তাহার অপেক্ষা দুর্ব্বল, ভীরু মানব সংসারে আর জন্মগ্রহণ করে নাই, নিজের প্রতি ধিক্কারে তাহার চিত্ত ধূলিতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। পরম সঙ্কোচের সহিত সে প্রশ্ন করিল, "তোমার কাছে যাবার যোগ্যতা কি আমার আছে?"

লীলার মুখ বেদনায় নীলাভ,—"দিদি তুমি কি তোমার প্রতিশ্রুতি থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ছল খুঁজছ?"

ব্যথিত কণ্ঠে উমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "লিলি, মিনু—"

লীলার মূর্ত্তি অন্ধকার সীমান্তরেখায় মিলাইয়াছে। তীব্র চীৎকার করিয়া উমার ঘুম ভাঙিল। শিয়রের দিকের জানালা খোলা, পূর্ব্ব গগনের শুকতারাটি শান্ত দীপ্তিতে জলজল করিতেছে। উহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া কি লীলা হাতছানি দিল!

উমা শয্যার 'পরে উঠিয়া বসিল ঘামে বিছানা বালিশ ভিজিয়া গেছে। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া সে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

লীলা তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া গেছে, অথচ কোথায় আছে সে? জীবনের পরপারে কোন্ উজ্জ্বলতর লোকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে? মৃত্যুর মত পরম সত্য আর নাই, ইহার অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর অসত্যের কাহিনীও উমা অবগত নহে, নিরঙ্কুশ কল্পনার ক্ষেত্র মরণনাট্যে বিশ্বব্যাপী।

কোথায় গেল লীলা? বিশ্বসৃষ্টির কোনও অনুপরমাণুটিতে অবধি আর সে আছে কিনা তাহারই স্থিরতা নাই। স্বর্গলোক কোথায়?—সেথায় কি ইন্দ্রপুরীর রমোদ্যানে লীলার সহিত তাহার পুনর্ম্মিলন হইবে? পারিজাতের মালা গাঁথিয়া সে কি দিদির কবরীবন্ধন করিবে?—মৃত্যু কি এমনই সত্য? কাশ্মীর ভ্রমণের ন্যায়, ঝিলাম উপত্যকার রূপসমারোহের মধ্যে দাঁড়াইয়া অদূরবর্ত্তী তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালার পানে চাহিয়া করতালি দিয়া কোলাহল সহকারে আনন্দ প্রকাশের ন্যায় এমন সুনিবিড়ভাবে সত্য! বিদেশ ভ্রমণের শেষে গৃহাভিমুখী চিত্ত লইয়া কি নিশ্চিন্ত শান্তিতে লিপি প্রেরণ করা চলে, পথপ্রান্তে আমার জন্য সদলে অপেক্ষা করিয়ো, তোমাদের জন্য হৃদয় ভরিয়া প্রবাসের স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, অফুরন্ত কলরবে সকলের কাছে তাহা দিবারাত্র বর্ণনা করিব!

মৃত্যু এমন ছিদ্রহীনভাবে নিশ্চিত নয়, পৃথিবীর ডাকঘরে লিপি প্রেরণ করিয়া পরলোকের রাজপথে পুনর্ম্মিলনের কোন আশাই অন্তরে পোষণ করা চলে না।

উমা অশান্ত পদক্ষেপে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। লীলার বর্ত্তমান আবাসস্থলের ঠিকানা সে কিছুতেই খুঁজিয়া

বাহির করিতে পারিতেছে না, সেইজন্যই চিন্তারও তাহার বিরাম নাই।—লীলা, কোথায় লীলা?—বিশ্বসৃষ্টির কোন্ স্থানে সে নবতর রূপ পরিগ্রহ করিল? কি তাহার আকৃতি, কেমন তাহার চিত্ত? গোধূলি বেলায় যখন পৃথিবীর গগন-তলে সূর্য্য অস্ত যায় পশ্চিমপ্রান্তে, উদয় শিখরে উদিত হয় শীতাংশু, ঝিল্লীস্বর যখন কানে আসে, ক্লান্ত এক নিস্তব্ধতা যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন কি সেই শান্ত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে নবদেহধারিণী লীলা, ধূলিগৃহবাসিনী তাহার দিদির কথা স্মরণ করে? দিদির বুকে মাথা রাখিয়া সেই পরম পবিত্র প্রতিশ্রুতির কথা কি তাহার মনে আছে; দিদির জন্য কি তাহার চোখে অশ্রু দেখা দেয়? উমার বিচ্ছেদবেদনা কি তাহার অসহ্য হইয়াছে? না, সে দিদিকে ভুলিল, এই ধূলার ধরণীর সকল কাহিনী বিস্মৃত হইল, নূতন জীবনে তাহার যাহাই কেন না রূপ হইয়া থাকুক, সে আনন্দিত চিত্ত বহন করিয়া বেড়াইতেছে? কে জানে! কে জানে! উমা নির্দ্দয়ভাবে তাহার দক্ষিণ হাত দিয়া বাম হস্ত পেষণ করিতে লাগিল। মরিতে সে ভয় করে না, লীলার জন্য এই যে তাহার সমস্ত প্রাণমন মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, এই নিদারুণ শোকের দূষিত ক্ষত তাহার সকল অন্তঃকরণকে যে কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, মৃত্যু কি ইহার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক? কে গ্রাহ্য করে, কে ভয় করে মরণকে? উমা নয়।

কিন্তু সংসারে লীলার কাজ অসমাপ্ত পড়িয়া আছে। একদিন সে বলিয়াছিল, মেয়েদের চিত্তকে গড়িয়া তুলিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়া সত্যকার মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সে তাহার পরিকল্পিত আদর্শ বিদ্যায়তন স্থাপিত করিবে। তাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য গড়িয়া তুলিবে অপূর্ব্ব শ্রীনিকেতন। কত তাহার কল্পনা, নিজের মনে কত তাহার ভাঙ্গাগড়া!—আজ লীলা চলিয়া গেছে, উমা কি তাহার অসম্পূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিবে না?

চোখের জল মুছিয়া উমা আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। সংসারে তাহার স্বামী আছে, শিশু কন্যা আছে, কন্যা-বিয়োগবিধুর তাহার পিতামাতা, শোকবিহ্বল শ্বশুর শাশুড়ী, পত্নীবিচ্ছেদকাতর দেবর আছে, ইহাদের প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করা চাই। নিজের মনের অস্বাভাবিক কল্পনাকে রাত্রিতে লীলার বেশ ধরিয়া আসিতে দেখিয়া একথা বিশ্বাস করার কোন হেতু নাই যে, জীবন-অবসানেও লীলা এমন সুস্পষ্টভাবে, এমন সচেতনভাবে পার্থিব কল্পনার সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক সকল দিক রক্ষা করিয়া সেই একান্ত অপরিজ্ঞাত লোকে অবস্থান করিতেছে। রূপ তাহার পরিবর্ত্তিত হইল না, স্মৃতি তাহার মুছিল না, ভাব, ভাষা, ভঙ্গী, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সকলই কি মৃত্যুর ন্যায় এমন বিশাল পরিবর্ত্তনের শেষেও এরূপ অটুটভাবে অপরিবর্ত্তিত রহিল! সুদৃঢ় বিশ্বাসে উমা নিজের মনে কহিল, ইহা মিথ্যা, ইহা কখনও হইতে পারে না। এ সংসারে লীলার অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া উমা তাহার প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। পূর্ব্বাকাশের শুকতারাটি বহুক্ষণ হইল ডুবিয়াছে। আজিকার প্রভাতটি সূর্য্যকিরণে স্নাত হইয়া উঠিল না, উদয়াচলের প্রান্তে মেঘের আভাস গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে যে কখন্ তাহা টেরও পাওয়া যায় নাই।

উমা সহসা পরলোকতত্ত্বে আস্থাশীল হইয়া উঠিল, কেমন করিয়া পৃথিবীতে বসিয়া ওপারের সহিত কথাবার্ত্তা চালানো যাইতে পারে এ তত্ত্ব জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল অপরিমিত। এইবার আর তাহার মনে সংশয় থাকিবে না, লীলার সম্বন্ধে সকল কথা এইবার জানা যাইবে, তাহার পর উমা আপন কর্ত্তব্য নিঃশেষে পালন করিবে, দ্বিধা করিবে না, চিন্তা করিবে না, পিছন ফিরিয়া তাকাইবে না। উমার নিবিড় শোকের কষ্টিপাথরে এই আশাটুকু যেন সোনার দাগের মত ঝিকমিক করিতে থাকে।

গৃহের আবহাওয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছিবার পথে অগ্রসর হইল, কিন্তু উমার দেহ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতে লাগিল, তাহার চোখের দৃষ্টি ভীত এবং মানসিক অবস্থা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া উঠিল।

প্রতিরাত্রে লীলা আসিয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া বলে, "দিদি, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে বলেছিলে—"

উমা উত্তর দিতে পারে না। সংসার তাহাকে সহস্র বাঁধনে টানিতেছে, লীলার সম্বন্ধেও তাহার সন্দেহের মীমাংসা নাই, নিজের মনের সহিত অবিরাম সঙ্ঘর্ষের দ্বারা সে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, তাহার মুখের পানে একবার মাত্র চাহিলেই বুঝিতে পারা যাইত, সে কত ক্লান্ত, কত পীড়িত!

উমা নিজের মনে বলে, জীবন অসুন্দর, মৃত্যু পরিকর্ষের পরিচায়ক। জীবন অতিরিক্ত রকমের স্থূল, কিন্তু প্রত্যক্ষতার দ্বারা পাষাণের ন্যায়, প্রস্তরের ন্যায় কঠিন সত্য, মৃত্যু পুষ্পের ন্যায় রমণীয়, কর্পূরগন্ধের ন্যায় সুকুমার, সেই জন্যই মৃত্যুকে বুঝিতে পারি না। তাই ত লীলাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছি না, অবিরত সে এমন করিয়া চোখ এড়াইয়া মন অতিক্রম করিয়া পলাইতেছে! সেদিন অসংস্কৃত আসন্ন বিচ্ছেদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার লীলার চোখের পানে চাহিয়া যে কোনও প্রতিশ্রুতির কথা উচ্চারণ করা সহজ ছিল, আজ লীলাকে হারাইয়াছি, অতীব সূক্ষ্ম হিসাবে হারাইয়াছি, বাহিরের দৃষ্টির সম্মুখে আর তাহার প্রিয় মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না, সেইজন্যই নিজের মধ্যে আর শক্তি খুঁজিয়া পাই না। এই স্থূল বিশাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী, নিরেট, নিবিড় নিটোল পৃথিবী ইহার বিরাট দেহ লইয়া ইহাই আমার কাছে সত্য হইয়া রহিল!

উমার অপচীয়মান দেহের পানে চাহিয়া স্বামী শঙ্কিত হইলেন।

দেবর কহিলেন, "বৌদি, চল আমরা সবাই মিলে দিন কয়েক বাইরে থেকে ঘুরে আসি—"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া উমা কহিল, "না, না, তা কখনই হ'বে না—"

এই গৃহ, লীলার শেষ নিশ্বাসের দ্বারা যে গৃহ পূত সে গৃহ উমাকে নাগপাশের বাঁধনে বাঁধিয়াছে, এই ভবনের দ্বারের বাহিরে পদক্ষেপ করিবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত লীলা হরণ করিয়া লইয়া গেছে যেন।

ইলাকে এখন দেখিলে মায়া লাগে। সেই মোমের পুতুলের মত স্বাস্থ্যবতী শিশু যেন কতকালের উপবাসী, ও যেন অনাথ, বিশ্বসংসারে ওর আর কেহ নাই, ও যেন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়!

উমা যদি তাহার স্বামীর দিকে চাহিত, তাহা হইলে স্তম্ভিত হইত। তাঁহার সর্ব্বদেহে সুস্পষ্ট অবসাদের চিহ্ন, মনে হয়, কর্ম্মপীড়িত চিত্তে সংসারের কাছে তিনি করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছেন, অনেক ত হইয়াছে, এইবার আমাকে ছুটি দাও।

উমার দেবরকেও হাঁপানীতে ধরিয়াছে যেন, চলিতে চলিতে তিনি কাশেন, কখনও বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়ান, কখনও শ্রান্তপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সোফায় বসিয়া পড়েন। বাড়ীটার যে কোনও স্থানে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলে যেন শুনা যায় বিষণ্ণ সুরে লীলা বলিতেছে, আমার দিদি শেষে আমাকে প্রবঞ্চনা করিল!—

পৃথিবীতে একদিন উমা ও লীলা সহযাত্রী ছিল, সমস্ত জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তটির অবধি তাহারা হিসাব করিয়া সমাপ্ত করিয়াছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে কবে কোন্ দিন কে কোন্ কাজ সম্পন্ন করিবে তাহার সূক্ষ্মতম আলোচনাটি পর্য্যন্ত সম্ভবকালের বহু বৎসর পূর্ব্বে কত নিঁখুত করিয়াই না তাহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল! কিন্তু অন্তরীক্ষে বসিয়া ভগবান যে এমন করিয়া দাবানলের জন্য কাঠ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা কে জানিত! উমা আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারে না, কখনও কাঁদে, কখনও ঝড়ের পূর্ব্বকার আকাশের মত থম্‌থমে মুখে চুপ করিয়া থাকে, কখনও বা চোখ বুজিয়া দুই হাত একত্র করিয়া মনে মনে যে কি প্রার্থনা করে বুঝা যায় না। ওর দুই চোখের অশ্রু আর নিঃশেষিত হইতে চাহে না, কাপড়ের আঁচল দিয়া ক্রমাগত চোখ মুছিয়া মুছিয়া উমার চোখের কোণে ঘা হইয়া গেছে! সে ভাবে, কেন এমন হইল, কবে কোথায় কোন্ মানুষের কাছে, কোন্ দেবতার দুয়ারে যে সে নিজের অজ্ঞাতসারে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। কিন্তু যে ত্রুটি তাহার অনভীপ্সিত, যাহা তাহার অজানা, তাহার জন্য উমার ক্ষমা মিলিল না! ভগবান তাহার সেই অজ্ঞাত অপরাধের জন্য এত বড় গুরুতর শাস্তির

বিধান করিলেন! একথা মনে হইলেই রাগে, দুঃখে অভিমানে উমার চোখ ফাটিয়া সহস্রধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে থাকে—উন্মত্তের ন্যায় ব্যাকুলভাবে এক দুর্লঙ্ঘ্য অদৃশ্য শক্তিকে বারংবার সম্বোধন করিয়া সে বলে, কেন নিলে আমার মিনুকে? কি করেছিলাম আমি, কি করেছিলাম? লীলাকে ফিরিয়া পাওয়ার জন্য উমা পৃথিবীতে সব কিছু করিতে প্রস্তুত৷ হাসিমুখে ত্রিভুবনের কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে সে এই মুহূর্ত্তেই উন্মুখ। কিন্তু তবুও তাহার এত আবেদন নিবেদনের কোন উত্তর মিলিল না, মূক-বধির দেবতা মূক এবং বধির হইয়াই রহিলেন।

রাত্রি গভীর, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কোথাও একটি নক্ষত্রও জাগিয়া নাই, একটা জোনাকি পর্য্যন্ত নাই। সীমাহীন, অন্তহীন কালোয় আকাশ ভুবন আবৃত হইয়া গেছে, অথচ তাহারই মধ্যে বিস্ময়কর ছায়ামূর্ত্তি সকল যে চলিয়া বেড়াইতেছে সে কথা বুঝিতে কষ্ট হয় না। একটি ছায়া ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল,—পরিধানে লালপাড় শাড়ী, অতিশয় লজ্জাশীলা বলিয়াই বোধ হয় একগলা ঘোমটা।

অবগুণ্ঠনবতী কঙ্কাল দীর্ঘ অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া আহ্বান করিতে লাগিল, ভয়ে যেন উমার বাক্‌রোধ হইয়া গেছে, ওর যেন এখন সম্মোহিত অবস্থা, ও যে ছুটিয়া পালাইবে সে শক্তিটুকু ওর আর এখন নাই! লাল শাড়ী পরিহিতা রমণীমূর্ত্তি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বামহস্ত প্রসারিত করিয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কি যে দেখাইতে লাগিল, কে জানে! উমা চাহিয়া দেখিল, মসীকৃষ্ণ অন্ধকারের গাঢ় যবনিকা ভেদ করিয়া কাহার ছায়ামূর্ত্তি যেন দ্রুতগতিতে চলিয়া বেড়াইতেছে। অবগুণ্ঠিতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সর্ব্ব শরীরের হাড়গুলার ঠকাঠক শব্দ,—অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া নেত্রবিহীন গভীর অক্ষিকোটর এবং মাংসবিহীন চোয়ালের হাড় দেখা যাইতেছে, তাহার বীভৎসদর্শন দাঁতের ফাঁকে কুৎসিত অট্টহাসি! দক্ষিণ হস্তের দীর্ঘ শীর্ণ অঙ্গুলি পাঁচটা অগ্রসর করিয়া আনিয়া, ধীরে ধীরে সে তাহা উমার কণ্ঠনালীর 'পরে স্থাপিত করিল! উমা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মুক্তি দাও আমায়, মুক্তি দাও, ছেড়ে দাও আমায়, আমি যাব না, যাব না, যাব না—"

এখান ওখান সেখান হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল, মূর্চ্ছিতা পুত্রবধূর মস্তক শাশুড়ী আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আত্মীয়স্বজন, ডাক্তার বৈদ্যে ঘর ভরিয়া গেল। সমস্ত দিনে উমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল না, বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যাবেলা তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। স্বামীর উদ্বিগ্ন বেদনার্ত্ত মুখের পানে চাহিয়া, শান্ত বিষণ্ণতার সহিত ম্লান হাসিয়া সে কহিল, "ভয় নেই গো, আমি মরব না—" বলিয়া তাঁহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরের বারান্দার বড় ঘড়িতে শব্দ করিয়া যখন বারটা বাজিল, তখন লীলা আসিয়া দেখা দিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে সে অত্যন্ত কঠিনভাবে সেই অবগুণ্ঠিতা কঙ্কালের বামহস্ত ধারণ করিয়া আছে।

লীলা কহিল, "দিদি, আমি চললাম, তোমাকে আমার বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে যাচ্ছি, তোমার প্রতিশ্রুতির বন্ধন থেকে আজ আমি তোমাকে মুক্তি দিয়ে গেলাম। যে মৃত্যুরূপা নারী এতদিন তোমার পায়ে পায়ে ঘুরছিল, তাকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত হও—"

লীলার মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, গভীর ব্যথায় ওর মুখের সকল সৌন্দর্য্য আবৃত। নিবিড় বেদনার গুরুভার লীলা আর বহিতে পারিতেছে না, উমা যেন লীলার মৃত্যুর পরে তাহার খাবারে বিষ মিশাইয়া আবার নূতন করিয়া লীলাকে হত্যা করিল! উমার মুখের পানে আশাপূর্ণনেত্রে লীলা চাহিয়া রহিল,—উমা নীরব,—লীলা মুখ নামাইল, সেই অবগুণ্ঠিতা নারীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে দিগন্তরেখার অন্তরালে মিলাইয়া গেল।

চোখ মেলিয়া বিছানার 'পরে উঠিয়া বসিয়া দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, "লীলা, লিলি, মিনু, মিনি—"

তাহার পরদিন সকালে উমা স্বামীকে বলিল, "চল আমরা গয়ায় যাই,—সেখানে গিয়ে লীলুর জন্য কিছু করে' আসি—"

শত চেষ্টাতেও পিণ্ডদানের কথাটা মুখে আনিতে পারিল না, কে যেন বারেবারেই দুই হাত দিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতে লাগিল।

স্বামী রাজী হইলেন, তাহারই ফলে এই কাহিনীর প্রারম্ভে গয়া ষ্টেশানে শ্রীমতী উমা ও তাহার স্বামীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

শ্রীআশীষ গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীনীলিমা দাস

কথা ও সুরে ছিল যে এত মোহ,
প্রেমের ব্যথা এত যে প্রাণারাম,
বসুধা-বুকে এত যে সমারোহ—
সেকথা কভু আগে কি জানিতাম ?
মন্ত্রে তব মুখর হ'লো নিশীথ নীলাকাশ,
বাতাসে ভাসে তোমারি ভাষা, যেন সে ফুলবাস্‌!
এ-ধরালোকে আসিছে বাণী ও-তারালোক হ'তে,
মানুষে-মনে এ-চেনাচেনি সুদূর সুর-পথে!

আমারি ভাষা বরিল তব সুর,
আমারি প্রেমে মিলিল তব প্রাণ,
নিকটে এল, যে-জনা ছিল দূর,—
তুচ্ছ যাহা, হলো সে সুমহান্‌!
বিজলীসম পরাণে পশি' জ্বালিলে যে-আলোক,
সে-আলোরেখা চিনাল' মোরে অচেনা সুরলোক!
চিনাল' মোরে রূপের মাঝে রূপ সে অনুপম;
ধরণী হ'লো দীপান্বিতা, প্রিয় যে প্রিয়তম!

দিলে যে প্রাণে পরম অনুভব,
মুখর হ'লো বুকের বীণা মম;
জাগিল কলকণ্ঠে তব স্তব—
পাষাণ-ভাঙা মুক্তধারাসম!
দূরের প্রিয় থামিল মম বুকের কুলায়ে,
তোমারি প্রেমমন্ত্র তারে আনিল ভুলায়ে!
সেদিন-স্মৃতি স্মরণে মম রহিল অবিনাশ,—
এ-ছোট-ঘরে নামিয়া এল যেদিন মহাকাশ!

শ্রীকান্ত ও কবি শরৎচন্দ্র

চতুর্থ পর্ব

শ্রীদিলীপকুমার রায়

Ferner bringen auch die Künste vieles aus sich selbst hervor und fügen andrerseits manches hinzu, was der Natur an Vollkommenheit abgeht, indem sie die Schönheit in sich selbst haben. So konnte Phydias den Gott bilden, ob er gleich nichts sinnlich Erblickliches nachahmte, sondern sich einen solchen in den Sinn faszte, wie Zeus selbst erscheinen würde, wenn er unsern Augen begegnen möchte............GOETHE

আপন অন্তর হ'তে কলালক্ষ্মী সৃজে
অনিন্দ্য প্রতিমাকান্তি ; প্রকৃতির যত
গ্লানি চ্যুতি—হয় নিত্য তাঁহারই প্রসাদে
মঞ্জুল সম্পূর্ণপ্রভা : গূঢ় মর্ম্মতলে
রাজে যে তাঁহার রূপ-উৎস-রসোচ্ছল।
ফিডিয়াস দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিল পাষাণে
বাস্তবে না অনুকরি', ইন্দ্রিয়ে না মানি' ;
আপনার কল্পলোকে সেই ধন্য গুণী
ধেয়াইল শিবনেত্রে : কোন্ রূপ ধরি'
নামিতেন দেবরাজ মর্ত্ত্যে—যদি তিনি
চাহিতেন সার্থকিতে পার্থিব নয়ন। (গেটে)

Grâces au ciel, nous avons des poètes ; nous les écouteront tant que l 'amour et le doute agiteront nos âmes. (A Sully Prudhomme) : "Vous avez mérité la sympathie et la reconnaissance de tous ceux qui lurent vos vers dans leur jeunesse : vous les avez aidés à aimer." C'est à cela que nous servent les poètes. Et c'est pour cela qu' ils nous sont chers. Ils mettent la lumière en meme temps que la parole sur nos joies confuses et sur nos obscures douleurs ; ils nous disent ce que nous sentons vaguement.........ANATOLE FRANCE.

কহে হৃদি : "নীলাম্বর ! লহ' কৃতজ্ঞতা
কবিরে পাঠালে বলি' ধূলির ধরায় ;
তোমার মঞ্জুল মধু যবে ঝরে তার
মুরলী-মূর্চ্ছনে—মোরা পিই তৃষাভরে ;—
পিইব আকণ্ঠ—যতদিন এ-অন্তর
আন্দোলিবে প্রেমে দ্বন্দ্বে।
"কবি ! তুমি প্রিয়—
হয়েছ সহায় বলি'—যবে নরনারী
চেয়েছে বাসিতে ভালো ;—ঝরায়েছ বলি'
বাণীছন্দে তব জ্যোতির্ম্ময় আমাদের
নির্লক্ষ্য উল্লাসদোলে, ছায়া বেদনায় ;—
প্রাঞ্জলি' কহেছ বলি'—যত কিছু প্রাণে
আবছায়া অনুভবে উঠেছে গুঞ্জরি'।"

(...আনাতোল ফ্রাঁস)

বেকার কবি রসিকের লাইব্রেরী কক্ষে ছোট টিপয়ে চা, পাশেই রিভলভিং শেল্ফ্। অপরাহ্ন পাঁচটা। তাহার কয়েক মাস বয়োজ্যেষ্ঠ মাস্তুত ভাই পবিত্র (ডাক্তার) ও তৎপত্নী বিলাতফেরতিনী সংস্কৃতথেতাবিনী সখী। সখী চা ঢালিতেছেন।

রসিক—বৌদি, আর এক পেয়ালা ঐ কষিতকাঞ্চনা চা যদি ঐ কুসুমকোমলা হাতে ক'রে এদিকে ছুড়ে মারো—

অর্থাৎ কবি কালিদাসের ভাষায় "শিরীষপুষ্পাধিক সৌকুমার্য্যৌ বাহু"—কিনা বাংলায় (সুর করিয়া) :

আয়ি! যে-কর পল্লব শিরীষফুলে লাজে
কোমল পরশনে—তাহাতে যবে রাজে
চায়ের চঞ্চল
পেয়ালা ঢল ঢল
তখন মনে হয়—হৃদয়ে যেন নাচে
ভৃঙ্গ পিক অলি :
অধর উচ্ছলি'
চুমুক দিতে চায়!—বিলম—ছি ছি, সাজে ?

সখী—ঠাকুরপো, ভাই ক্ষ্যামা দাও—আর কেন? একে পেশায় কবি, তার ওপর জাতে পুরুষ—সইবে কেন বলো? মনে নেই তোমার ঐ কবিই তোমাদের নারী-উচ্ছ্বাসের মুখোষ দিয়েছিলেন ছিঁড়ে খুঁড়ে সে কবে :

প্রিয়বচন কৃতোঽপি যোষিতাং দয়িত জনানুনয়ে রসাদৃতে
প্রবিশতি হৃদয়ং ন তদ্বিদাং মণিরিব কৃত্রিমরাগযোজিতঃ।

পবিত্র (বিপন্ন)—কিন্তু আমি যে সখী, তোমাদের ও ছাই সংস্কৃত ভাষায়—

রসিক (টপ্ করিয়া) : গণ্ডমূর্খ তো? (চুমকুড়ি দিয়া) তোর দুঃখে মনে মনে শেয়াল কুকুরও কাঁদে রে ফিলিষ্টাইন—কাঁদে, নিশ্চয় জানিস্। নইলে সংস্কৃতে এম-এ এমন 'তন্বীশ্যামাশিখরদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী'-র হাতে প'ড়েও তোর অদৃষ্ট ফিরল না কেন বল্? অন্ততঃ কালিদাস চর্চ্চা করলে আর কিছু না হোক্ এ যক্ষিণীর সঙ্গে প্রেম করতেও একটু শিখে নিতিস্।

সখী (হাসিয়া)—ওঁর কি ছাই সময় আছে ভাই, প্র্যাক্‌টিসের পর প্রেম বা কালিদাস চর্চ্চা করার? ওঁরা যে হ'লেন বিধাতার বরপুত্র—প্র্যাক্টিক্যাল লোক, ভুলে যাচ্ছ।

পবিত্র—কটাক্ষ রেখে না হয় বল্‌লেই বা—পুরুষদের কী ব'লে গালাগালি দিলে এক্ষুণি? আসামীকে অন্ততঃ তার বিরুদ্ধে চার্জ্জটাও তো ফরিয়াদীরা বলে?

রসিক—আমার কাছে শোন্ তবে ওর ইংরিজি মানে—যদি তার পরে কালিদাস পড়ার ইচ্ছে জাগে—কে বল্‌তে পারে? (রিভল্‌ভিংশেল্‌ফ্ হইতে নক্ষত্রবেগে একটি বই টানিয়া লইয়া পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে) শোন্ শ্রীঅরবিন্দ কী চমৎকার অনুবাদ ক'রেছেন এর। একেই বলে মূলের সঙ্গে অনুবাদের বাচ্‌খেলা, এই যে : যখন বিক্রমরাজ উর্ব্বশীর প্রেমে মশ্‌গুল তখন রাণী এসে চেপে ধরায় তাকে দুটো গ্যাল্যান্ট কথা ব'লেই পড়লেন রাজা ফ্যাসাদে। জহুরিণী রাজ্ঞী বাঁকা হেসে বল্‌লেন :

"Most dulcet words of lovers, sweetest flatteries
When passion is not there, can find no entrance
To woman's heart; for she knows well the voice
Of real love, but these are stones false coloured
Rejected by the jeweller's practised eye".

সখী—কী সুন্দর অনুবাদ ঠাকুরপো! দেখি দেখি বইখানা কই, পড়িনি তো!—কী নাম? Hero and the Nymph? (হাত বাড়াইতে গিয়াই) ও মা আমার কী হবে! দেখদেখি, ওঁকে চা দিতে ভুলেই গেছি—পেয়ালায় ঢেলে—

পবিত্র (কৃত্রিম অভিমানে)—তা যাবেই তো সখী সারিকা! আমি তো আর attitudinising দেবর লক্ষণও নই—ছড়া কেটে দ্বিতীয় পেয়ালা চা চাইতেও শিখিনি। তার ওপর এ-হ'ল বরযাত্রী সখীরূপিণী বাণীর চতুর্দ্দোলা যেখানে চামর ধ'রে স্বয়ং রাসু। আমরা এ-মঞ্চের দর্শক হবারই ছাড়পত্র পেলাম না—চা পাবো কোন্ যোগ্যতায় বলো?

রসিক—আহা রাগ করিস্ কেন ভাই? আসল বস্তুটা তো আর চামর-সম্বল বেচারী দেবর লক্ষ্মণদের পাতে পড়ে না—তাদের জীবন ধন্য হয় শুধু ঐ চামরিতাদের পায়ের নূপুর আর হাতের কেয়ূরের পানে চেয়ে চেয়ে। কাজ গোছালি তোরা—

পবিত্র—ও কী—তোর বইটা থেকে কী একটা প'ড়ে গেল যে মাটিতে! বাঃ—কী অর্থব্যঞ্জক গোলাপী সুগন্ধি খাম রে! (সখীর প্রতি কটাক্ষ) তবু বলা আছে যে ওঁরা আমাদের ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতেও জানেন না। বাট্ বাট্—আমাদের মেলিন্স ফুডের অনাঘ্রাত বেবিটি!

রসিক (মাটি হইতে খামটি তুলিয়া লইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হাসিয়া) : ওরে দাদা বড় দাগা দিলিরে আচম্‌কা। এসব

থাম যে তাই বর্ণচোরা—বাইরে গোলাপী বটে, কিন্তু অন্দর-মহলে—দারুণ!—উঃ। (চক্ষু মুদিয়া সত্রাসে): এখনো যেন লেখিকার স্ফুরিত অধর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে এর ভেতর থেকে।

সখী—'ফাই'—ঠাকুরপো 'ফাই'। সাধুবাংলায়: ব্রীড়িত হও। বান্ধবীর—থুড়ি, নারীর রুষ্টাধরের মহিমাই যে না বুঝ্‌ল সে কেনই বা মরতে টোলে সংস্কৃত আদিরসের কড়া জ্বালে এঁচড়ে-পাক্‌তে চেয়েছিল? আর কেনই বা কালিদাসের নামে অশ্রু গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠে? মনে নেই কুমারে গৌরীর সেই স্ফুরিতাধর ও রক্তলোচন নিয়ে কালিদাসের মাতামাতি?—"ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনি প্রবেপমানাধর-লক্ষ্যকোপয়া। বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে॥"

রসিক (হাসিয়া)—সাধু বাংলায় ক্ষন্তব্যোঽহমপরাধঃ, ডিয়ার বৌদি!

সখী (গম্ভীরভাবে)—অস্তু। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তরূপ দক্ষিণা?

রসিক (একটু ভাবিয়া): ওর এই সটীক সপ্রশ্ন অনুবাদ শ্রীচরণে নিবেদন:

বিপ্র যখন ব্যঙ্গবচন
কহিল হায়
গৌরী চায়
রক্ত-নয়নে ওষ্ঠ-কাঁপনে
তার
পানে বার বার
ভীম ভ্রুকুটিয়া?—
শুধু, বান্ধবি! হেন রাঙা ছবি
মিথ্যা উল্লাসে
আঁকি' কালিদাসে
মাতামাতি হায়, করিল যে—তায়
বলো
কী প্রমাণ হ'ল
ওগো দরদিয়া!

সখী (হাসিয়া)—ছড়ায় বান্ধবীসম্প্রদায়ের মনকমল ভিজতে পারে ঠাকুরপো, কিন্তু কথায় বৌদিসম্প্রদায়ের মন-চিড়ে ভেজে না। প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করতে হ'লে এ-আধা-দক্ষিণায় চল্‌বে না—বল্‌তে হবে তোমার এ বান্ধবীটি—নিমচাঁদের ভাষায়—"তিনি হ'ন কে?"

রসিক—স্বীকার। কিন্তু ভয় পেয়ো না যেন। তিনি হচ্ছেন একজন সেই শ্রেণীর intransigeant বাস্তবপন্থিনী অগ্নিভাষিণী উজ্জ্বলকৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টি স্পষ্টবাদিকা সমালোচিকা: নব্য তরুণী, অথচ রোমান্সের নামে ভব্যভাবেই আগুনী। আমার অপরাধ, আমি ওঁকে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব উপহার দিয়েছিলাম। গেরো আর কি!

সখী (সানুকম্পা)—আহা বেচারী! পরিণাম বুঝি এই তীব্র চিঠি?

রসিক—তীব্র ব'লে তীব্র! কী বিশেষণের avalanche-ই ঝেড়েছেন আমায় বাগে পেয়ে। বলেন কি জানো? বলেন: আন্‌ক্রিটিকাল বাঙালীদের মুকুটমণি শরৎবাবু যা জানেন না তা আঁকতে গিয়ে বিশেষ ক'রেই ডুবেছেন তাঁর তিনটি বইয়ে: গৃহদাহ, শেষপ্রশ্ন ও এই ননডেস্‌ক্রিপ্‌ট্‌ শ্রীকান্ত।

সখী—অন্ততঃ শ্রীকান্ত সম্বন্ধে ডোবা ক্রিয়াপদটা ব্যবহার করাটা ওরিজিনাল।

পবিত্র—না সখী। একথা অন্যত্রও আমি শুনেছি—অনেক বিদ্বান্‌ বাস্তববাদীদের মুখে—যে, শ্রীকান্তে নাকি আর্টের হ'য়েছে আত্মশ্রাদ্ধ। আমার একটি পি-এইচ-ডি, ডি-লিট্‌, পি-আর-এস বন্ধু—

সখী—(বাধা দিয়া) এঁদের যুক্তির পিণ্ডির কথাই বলো না আগে—খেতাবের ফিরিস্তি রেখে।

পবিত্র—এঁরা বলেন যে প্রতি নিরপেক্ষ সমালোচকের চোখেই নাকি বেশি ক'রে ঠেকে শ্রীকান্তের এই আনোমালিটি যে ওর প্রবণতা হ'ল মূলতঃ রিয়ালিস্‌টিক অথচ্‌ ওর প্রায় সব চরিত্রই কম বেশি আইডিয়ালিস্‌টিক। (বিজ্ঞতর সুরে): আমার ঐ এম এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি ডিলিট্‌ বন্ধুটি বলেন—ইনি বিশ্বমানব-সাহিত্যের রস সব গুলে খেয়েছেন বল্‌লেই হয়—যে from the standpoint of impartial objective aesthetic realism শ্রীকান্ত হচ্ছে a quixotic creation, যেহেতু ওর দিদি, ইন্দ্রনাথ,

রাজলক্ষ্মী, সুনন্দা, অভয়া, কমললতা, গহর কেউই আর্ট ফর আর্ট সেক নীতির নিকষে দাগটিও ফেলতে পারেনি। এ নিয়ে নাকি তিনি ফের একটা থীসিস লিখছেন—প্রচণ্ড প্রচণ্ড সব সমালোচকদের নজীর দিয়ে।

সখী (সব্যঙ্গে ভ্রূভঙ্গী করিয়া)—কী বলো ঠাকুরপো?

রসিক—যে এ এম্‌-এ, পি-আর-এস, ডি-লিট্‌ মহোদয়ের বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ থীসিসগুলি সব একত্র ক'রে দাঁড়িপাল্লার একদিকে চাপালে শ্রীকান্তের একটি ছত্রের ওজনও সইবে না।

পবিত্র (গম্ভীরভাবে)—এ তোর যুক্তি হ'ল না রাসু।

রসিক—আর লোক হাসাস্‌নে পবি, তোর এসব পদবী-বিড়ম্বিত বন্ধুদের গালভরা বুলি উগ্‌লে। (সখীর দিকে চাহিয়া): এদের ব্যাধি কি জানো বৌদি?

সখী—কী?

রসিক—হাততালি। এরা যখন যে ধুয়ো ওঠে তখনই ওঠে ক্ষেপে—তাকে হাততালি দিয়ে সমালোচক বল্‌তে। (একটু থামিয়া) আমার এ প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ল গেটের একটা কথা: "Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknupft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst" অর্থাৎ

"এড়ায়ে যদি জগতে ভাই চলিবি জীবনে:
শিল্পকলা বরণ কর্‌ কল্প সাধনে।
জগত-সাথে মিলিবি যদি পরম মিলনে:
শিল্প-কলা বরণ কর্‌ প্রেমের বাঁধনে।"

পবিত্র—ছড়াটার মাধুর্য্য না হয় বুঝলাম—কিন্তু কথাটার তাৎপর্য্য হ'ল কী শুনি?

রসিক—তাৎপর্য্য দুটো: প্রথম, জগতের বাস্তব রূপ যখন বড় বেশি দুঃসহ হ'য়ে জগদ্দল পাথরের মতন বুকে চেপে বসে তখন আমরা সে-চাপ থেকে অব্যাহতি চাই—কল্পনার নীলাকাশে নির্বাধ সঞ্চরণে। দ্বিতীয়, জগতকে এই উদার পরিপ্রেক্ষিতে যখন একটু দূর থেকে দেখি তখনই আমি তার সবচেয়ে কাছে, যেহেতু বাঁধনে যে বাঁধা পড়েনি তার কাছেই বাঁধনের স্বরূপ সবচেয়ে প্রকট হ'য়ে ওঠে।

পবিত্র—প্যারাডক্স?

রসিক—জগতের সব বড় সত্যই যে প্রায় প্যারাডক্সের কুটুম্ব রে দাদা, জানিস্‌ নে? কিন্তু এটা প্যারাডক্সও নয়। শরৎবাবুর কথা ভাব্‌লে আমার মনে হয় একথা বিশেষ ভাবেই সত্য।

সখী—মানে তিনি বাঙালীর সংসার থেকে দূরে গিয়ে কাছে এসেছেন বল্‌তে চাও?—না, কাছে পেকেই নিঃসংসক্ত হ'য়ে দূরে বিরাজ করছেন বল্‌বে?

রসিক—দুই-ই। এই শ্রীকান্তকেই দেখ না। আমার মনে হয় এই রকম মানুষের যে দেখার ভঙ্গী তা থেকে আমরা অনেকখানি বুঝতে পারি যে কী ভাবে জীবনকে দেখ্‌লে জীবনের বাস্তব কঠোরতার সঙ্কীর্ণ মুষ্টি থেকে অন্ততঃ খানিকটাও ছাড়া পাওয়া যায়। এই কথাই তীব্রা দেবীকে মধুরা বক্তৃতায় দীর্ঘ পত্রে লিখেছি।

সখী—কী লিখেছ!

রসিক (খুসি)—শুনবে বৌদি? আমার এ উত্তরটা বেরিয়েছে "মধুর ভাষিনী" পত্রিকায়। (শেল্‌ফ্‌ হইতে একটি পত্রিকা টানিয়া লইয়া) শোনো তবে:

সুচরিতাসু

আপনার বিশুদ্ধ উদগ্র ভাষা আপনার নামের সার্থকতাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। ধন্য আপনি: আপনার শুধু কথায় ও কাজেই সঙ্গতি নহে—নামে ও মতামতেও পরিপূর্ণ মিলনধ্বনি কল্লোলিত। এ-রাজযোটক কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে। কিন্তু আপনার আক্রমণের প্রতিবাদে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রতিবাদে আপনার অভিযোগগুলির উত্তর দিতে গিয়া সে বক্তব্য কয়টি ফলাও করিবার বাসনা।

আপনি লিখিয়াছেন: শরৎবাবুর শ্রীকান্ত বইখানির মধ্যে আর্টের য়ুনিটি নাই। (বড় U দিয়া শরৎবাবুর গলদ আরও বেশি করিয়া প্রকট করিয়া দিয়াছেন। এটি অতি চমৎকার পন্থা। ইংরাজীতে একটা কথা বলে No case? then abuse the plaintiff's attorney. আপনি লণ্ডনে আইন-দেবীর কাছে এ কস্‌রৎটি রীতিমতই শিখিয়া লইয়াছেন। ইহাও কম কৃতিত্বের কথা নহে। কিন্তু সে কথা যাক্‌। আপনি লিখিয়াছেন: বইটির নানা চরিত্র "না-ফুটিতেই ঝরিয়া গিয়াছে"—নানা চরিত্র যারা "বৃহৎ পট-

ভূমিকার থাপ খাইত তাহারা অতি সংক্ষেপ সংযমের চাপে কিম্ভূতকিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে: যথা অভয়া, সুনন্দা, দিদি, ইন্দ্রনাথ।" এসব চরিত্রের মধ্যে আছে (আপনার ভাষায়) শুধু "বিসদৃশ বিস্ময়জনকতা" এবং "মিথ্যা ভাববিলাসের "রাঙতামোড়া প্রসাধন-নৈপুণ্য"—যেহেতু "বাস্তবের সহিত এসব চরিত্রের কোনো যোগসূত্রই নাই।"

কথাগুলির উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়, যেহেতু আপনি আমাকে লিখিত আপনার খোলাচিঠিটি কাগজে ছাপাইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। সুতরাং এ-চিঠিও আমি খোলাচিঠি রূপেই ছাপিতে দিতেছি আপনার ঋণ পরিশোধ করিয়া ধন্য হইতে।

আমার প্রথম বক্তব্য এই যে আর্টে আপনাদের এই তথাকথিত য়ুনিটি বস্তুটি হইতেছে অতীত যুগের একটি ডগ্‌মা মাত্র। অতীত যুগের কথাসাহিত্য-শিল্পে এ-ডগ্‌মার প্রয়োজন ছিল কি না সেটা আমার এ-পত্রের আলোচ্য নহে, আমার বক্তব্য: বর্ত্তমান যুগে এ-একদেশদর্শী ডগ্‌মাটির আয়ু তথা প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। এই কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

অতীত যুগে হেন্‌রি জেম্‌স্, ম'পাসাঁ, আস্কার ওয়াইল্‌ড্ প্রমুখ শিল্পীরা আর্টকে অত্যন্ত নির্ব্বাচনপন্থী করিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন। সে-যুগে হয়ত এ ব্যবস্থার দরকার ছিল, কেন না কথা-সাহিত্যের উদয়যুগে তাহার গড়নকে সুসংবদ্ধ ও নিটোল করিবার জন্য হয়ত কিছু বাঁধাবাঁধির সার্থকতা থাকে। প্রথম এক্সপেরিমেণ্টের সময় মানুষকে হয়ত একটু সাবধান হইতেই হয়। এ-বিষয়েও আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু সে সব বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ঈষৎ অবান্তর। আমার উপস্থিত বক্তব্যটি এই যে, বর্ত্তমান যুগে কথা-সাহিত্য চলিয়াছে নির্দ্ধারিত ধারায় জীবনকে সমগ্রভাবে ফুটাইয়া তুলিতে। শুধু তার বাস্তব দিক্‌টাই নয়—শুধু তাহার রোমাণ্টিক দিক্‌টাই নয়—তার সব দিক্ সব আশা আকাঙ্ক্ষা. চিন্তা ভাবনা অভীপ্সা ব্যর্থতা ব্যঙ্গ নিষ্ঠুরতা উচ্ছ্বাসপ্রিয়তা —সবই ইদানীন্তন কথা-সাহিত্যিকের এলাকার অন্তর্ভুক্ত— within his purview—এ হেন যুগের উপন্যাসে আগেকার মতন একদেশদর্শী য়ুনিটি বা খুঁৎখুঁতে নির্ব্বাচনপন্থী (selective) ছুঁৎমার্গতার অচলায়তন কায়েম হইয়া থাকিতে পারে না। আর্টে নানা ফর্ম্ম নানা পদ্ধতি নানা রস-প্রবাহ ধারা নিত্যই বদলায় মানুষের অনুভূতি ও আবেষ্টনীর বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া। উদাহরণতঃ, আপনি জানেন, এক সময়ে আলঙ্কারিকরা বলিতেন শুধু রাজারাণীই নায়কনায়িকা হইতে পারেন—কথা বা নাট্য সাহিত্যের। কিন্তু এখন সে-বিধান অচল। এখন দীনহীনতম মানুষও নাটক উপন্যাসের নায়কনায়িকা হইতে চায় ও হইয়া থাকে। ইহাতে প্রথম প্রথম পুরাতন পন্থীরা আর্ট গেল আর্ট গেল করিয়া ডাক ছাড়িয়া ক্রন্দন করিতেন। কিন্তু আজকাল সে-ক্রন্দনের করুণ-উচ্ছ্বাস আর কাহারও স্মৃতি-জগতের মারুত-হিল্লোলকে বিষাদ ভারাক্রান্ত করে কি? করে না। ঠিক্ তেমনি, এই য়ুনিটি ও সিলেক্টিভনেসের ধূসরায়মান ডগ্‌মার কথা দুদিন বাদে কাহারও রসোপভোগকে ব্যাহত তো করিবেই না—এমন কি ইহাতে আর্টের "যে-অন্তর্জলী" সুরু হইল বলিয়া আপনি আক্ষেপ করিয়াছেন তাহার জন্য অন্ত্যেষ্টি-অশ্রুও কেহ বিসর্জ্জন করিতে চাহিবে না। একথা মনে করিবার কারণ এই যে উপন্যাসে এ-জগতের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি—উহার প্রগতির পথে অতীত-যুগের রক্ত-লোচন অনুশাসন সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বর্ত্তমান যুগের অনেক শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের বিচিত্রধারা ও সমৃদ্ধ সরসতাই যে য়ুনিটির অনু-শাসনকে অনাদর করিয়া স্বকীয় প্রেরণায় পথ কাটিয়া চলিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা এই জন্যই। বর্ত্তমান যুগের মনের প্রাণের দেহের স্বপ্নের প্রতি আকুতিটিই কথা-সাহিত্যের জলস্রোতে উপনদীসমূহের মতন আসিয়া মিলিয়া তাহাকে পরিস্ফীত ও কল্লোলিত করিয়া তুলিতেছে। গল্‌সওয়ার্দির বিখ্যাত বিপুলকায় উপন্যাস Forsyte saga-র কথা ভাবিয়া দেখিলেই একথা প্রতীয়মান হইবে। মনে করুন উহাতে কত অসমাপ্ত চরিত্র, কত অশেষ যবনিকা দৃশ্য, কত অসম্পূর্ণ গর্ভাঙ্ক কত অর্দ্ধপথে খণ্ডিত রেশ। কত জীবনের অঙ্কুরই উহাতে আলোর অভাবে না-ফুটিতে ঝরিয়া গেছে, কত আশার কলিকাই নিয়তির চাপে বিকশিত না-হইতে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেছে, কত মধুর স্বপ্ননির্ঝরই উৎসাহের উৎস বিনা না-বহিতে শুকাইয়া গেছে—ঠিক্ জীবনে যেমনটি হইয়া থাকে;—

সিলেক্টিভনেস্ বা য়ুনিটিপন্থী আর্টে যেমনটি হইয়া থাকে তাহাকে অনুকরণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে কবি গল্স-ওয়র্দি চাহেন নাই।

কিন্তু কেন চাহেন নাই? কারণ জীবনের এ ধরণের বহু ব্যর্থতা-বিড়ম্বনাকে মধ্যপথে সমাপ্ত করিয়া তাহার উপর দরদের আলো সংহত করিয়া দেখাইলে তাহাদের শোকাবহতা বেদনা ও নিষ্ফলতার রস যেভাবে নিটোল হইয়া ফুটিয়া উঠে সিলেক্টিভ আর্টে সেভাবে ফুটিয়া উঠে না। শুধু গল্পের জন্য গল্প বলিলে জীবনের এ ধরণের বাণী সেভাবে ঝঙ্কৃত করিয়া তোলা যায় না। বস্তুতঃ আজকালকার উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই গল্প গৌণ হইয়াই আর্ট বড় হইয়াছে—স্বপ্ন বড় হইয়াছে—আনন্দ বড় হইয়াছে—ব্যথা বড় হইয়াছে। গত যুগে যেমনটি হইত সেভাবে "তাহার পর এই হইল" বলিয়া চলিয়া আমার কথাটি ফুরাইয়া নটে-বৃক্ষের মুণ্ডনপর্ব্বে আসিতে এ যুগের প্রায় কোনো বড় উপন্যাসিকই চাহেন না। শরৎচন্দ্রও না। যদি চাহিতেন তবে তিনি বড় জোর একজন হেন্‌রি জেম্‌স্, এডগার আলেন পো বা অস্কার ওয়াইল্‌ডের মতন ঠুনকো আর্টিষ্টের পদ পাইতেন—যে মহৎ স্রষ্টার মর্য্যাদা আজ পাইয়াছেন তাহা পাইতেন না। শরৎচন্দ্রকে ওভাবে অতীত যুগের য়ুনিটি বা গল্প-গল্পের-জন্য কোডে আপনারা বাঁধিতে যাইবেন না। যাইলে তিনি আপনাদের হাত ফস্‌কাইয়া যাইবেন—কারণ শরৎচন্দ্র ওয়াইল্‌ড্ পোজেম্‌সের মতন শিল্পি মাত্র নহেন—তিনি জীবনের বহু আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ বেদনা স্বপ্ন অভীপ্সার চিত্রী—উদ্বোধক। এস্থেটিক হইয়া কয়েকজন অলস ধনী পুত্রের দুর্ব্বহ অবসররঞ্জন (যাকে ফরাসীতে বলে desennuyer) করা তাঁহার স্বধর্ম্ম নয়—যেমন স্বধর্ম্ম ছিল হেন্‌রি জেম্‌সের বা অস্কার ওয়াইল্‌ডের। হেন্‌রি জেম্‌স্ প্রমুখ এস্থীটগণের এ ধরণের সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতাকে উদ্দেশ করিয়া ওয়েল্‌স সাহেব বেশ এক হাত লইয়াছেন আধুনিক উপন্যাসের সমর্থন-প্রসঙ্গে: He wants unity...homogeneity. Why should a book have that? His 'Notes and Novelist' is one sustained demand for picture-effect, which is the denial of the sweet complexity of life, of the pointing this way and that, of the spider on the throne...Life is diversity and entertainment, not completeness and satisfaction. All actions are half-hearted, shot delightfully with wandering thoughts —about something else. All true stories are full of irrelevancies. James...sets himself to pick the straws out of the hair of life before he paints her. But without the straws she is no longer the mad woman we love."

সত্য কথা। জীবনকে বা আর্টকে ওভাবে অতীত-যুগের কোনো কোড বা ডগমা দিয়া বাঁধা যায় না। আর এই সত্যটি আমাদের দেশে কোনো উপন্যাসে যদি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া থাকে তবে তাহা শরৎবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শ্রীকান্তে। শুধুই শ্রীকান্তে নয় অবশ্য। তাঁহার অন্য অনেক পরমসুন্দর উপন্যাসেও জীবনের আশা অশ্রু স্বপ্ন উর্দ্ধচারী মহত্ত্ব বিস্তৃতির রমণীয় ইন্দ্রজাল পাই—কিন্তু ঠিক শ্রীকান্তের ঢঙে নহে। এ বইখানি তাই আমি বিশ্বসাহিত্যে প্রথমশ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে বলিয়া মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

ইহার পরিকল্পনা, ইহার সরসতা, ইহার মৃদু হাসি, ইহার চাপা অশ্রু, ইহার বিষয়সমৃদ্ধি, ইহার চরিত্রবৈচিত্র্য, ইহার বর্ণনানৈপুণ্য ও সর্ব্বোপরি ইহার মধ্যে প্রবহমান গভীর প্রেম ও দরদের সুধামন্দাকিনী এ-মরুপাণ্ডুর যুগে এ অতুলনীয় কাব্যটিকে কী শ্যামল করিয়াই যে রাখিয়াছে তাহা ভাবিতেও আমার আনন্দ হয় গর্ব্ব হয়।

কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম—এ শ্যামলতায় আপনি আনন্দিতা বা গর্ব্বিতা হ'ন না—হ'ন বিরসবদনা। কেন না, আপনি বলিতেছেন, অভয়া রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রনাথ দিদি কমললতা গহর ইহারা কেহই বাস্তব নহে। কেন? না, বাঙালী সমাজে কই এরকম চরিত্র তো মুণ্ড ঘুরাইয়া ঘাড় ভাঙিয়া ফেলিলেও চোখে পড়ে না! মানি। কিন্তু সেই জন্যই শ্রীকান্ত অপূর্ব্ব বই। গেটে বলিয়াছেন:

"এড়াতে যদি জগতে ভাই চলিবি জীবনে
শিল্পকলা বরণ কর্ কল্পসাধনে।"

শরৎচন্দ্র শিল্পকলা বরণ করিয়াছেন—সঙ্কীর্ণ নিঃস্রোত

নিঃস্বপ্ন জীবনকে এড়াইতে; শুধু চোখ দিয়া দেখিতে নহে, কান দিয়া শুনিতে নহে—হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়া যাচাই করিয়া লইতে সব কিছু। যে-শিল্পী শুধু ইন্দ্রিয়সাক্ষ্যের ভিত্তির উপরে জীবনের ইমারত তুলিতে চাহে, সে তাজমহল সৃষ্টি করে না—করে আমেরিকান্ স্কাই-স্ক্রেপার। মানি, এ হতভাগ্য জড়বাদী যুগে "বাস্তববাদী" ছাপ কপালে মারিয়া জয়েস বা মাইকেল আর্লেনের মতন কেহ কেহ দুদিন দর্পের পেখম বিস্তার করিয়া অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু সে হইল চমকের হট্টগোল—বিস্ময়ের সিন্ধুচ্ছ্বাস নহে। শরৎচন্দ্র এ শ্রেণীর চমক চাহেন নাই—দিনানুদৈনিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে বাস করিয়াও তাহার ধূলিটানে নিছক বাস্তবতার অন্ধকূপেই সাঁতার কাটিতে ব্রতী হ'ন নাই। শত লাঞ্ছনার মধ্যেও তিনি স্বপ্নহারা হ'ন নাই তাই তো তাঁহাকে বিখ্যাত গুণগ্রাহী স্যাঁৎ ব্যভের ভাষায় আমরা সোচ্ছ্বাসে বলিতে পারি:

"Un grand artiste aujourd'hui, c'est un prince qui n'est pas titre."

"শিল্পি ওগো! তুমি যে রাজরাজ!
মাথায় শুধু নাহি মুকুটসাজ।"

আপনি তীব্রভাষায় লিখিয়াছেন: "তুচ্ছঘটনামাত্রসম্বল, দৈনন্দিন-ব্যর্থতাভিত্তি ছাপোষা বাঙালীর জীবন আঁকিতে গিয়া আবার শরৎচন্দ্রের এত বাগাড়ম্বর কেন? বাঙালীর জীবনে কি রমা অভয়া কিরণময়ী সাবিত্রী কমল এরা মিলে?" জানি না মিলে কি না। কিন্তু মিলিতেও পারে একথা বলা কি কোনমতেই চলে না? অন্ততঃ আমি যাহা দেখি নাই ভূভারতে তাহা থাকিতেই পারে না এত বড় কথা বলা যে-শ্রেণীর আত্মবিস্ফারীর মুখে সাজে আমি সে ধন্যমণ্ডলীর সভাসদ নহি কিন্তু আমার বক্তব্য অন্য দিকে ঝোঁকে: আমি বলি, যে যদি ধরিয়াই লওয়া যায় শরৎবাবুর সৃষ্ট নারীর মতন নারী বাঙালী সমাজে দুর্লভ তবে তাহাতে কী প্রমাণ হইল—কী আসিয়া যায়? শিল্পী বাস্তবতার দাস, কোনো সাময়িক গালভরা বুলির পতাকাবাহী এ-বেদবাক্য আপনি কোথায় সংগ্রহ করিলেন? শিল্পীর জগত তাঁহার নিজের জগত—রসের জগত। শরৎবাবুর চরিত্রে রস উছল। আমার কাছে এইখানেই তর্ক শেষ।

তাছাড়া বাস্তবতা বাস্তবতা করিয়া অত যে কুহুধ্বনি করেন ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, বোনে-বোনে খুনসুড়ি, জায়ে-জায়ে ঝগড়া, ভাইয়ে-ভাইয়ে মাম্‌লা—এসব মামুলি তুচ্ছতাসম্বল উপন্যাস-অনীকিনীর কয়টির স্মৃতি আজ বাদে কাল আমাদের মনে থাকে? শুধুই ইন্দ্রিয়ভিত্তি বুদ্বুদপ্রভা সাহিত্য? হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এ দুস্বদৃষ্টি স্থূল চোখে যাহা দেখিব তাহার বাহিরে কিছু আঁকিতে পাইব না? এ যে টির‍্যানি—দস্তুর মতন মিডীভাল অত্যাচার, তীব্রাদেবী! আর এ স্বপ্নসম্বল মন্ত্র জপ করিবেন কি না শিল্পী—যিনি হইতেছেন "un prince qui n'est pas titre?"

না তীব্রাদেবী, আপনার বৃথা চেষ্টা। অবিমিশ্র বাস্তবতা—বন্ধ্যা। শুধু উহার জোরে সাহিত্য কোনদিন বড় হয় নাই হইবে না। জীবনকে শিল্পী কী চোখে দেখিয়াছেন, কী ভাবে অনুভব করিয়াছেন, তার সহস্র আঘাত সঙ্ঘাত, আনন্দ বেদনা, হাসি অশ্রুতে কী ভাবে সাড়া দিয়াছেন এসবও ফুটাইতে হইবে। সর্ব্বোপরি হইবে—স্বপ্নের ফসল ফলাইতে। এ নহিলে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, হয় শুধু বাস্তবপন্থীর ক্ষণবিধ্বংসী তক্‌মা লাভ। এ তক্‌মার জোরে কিছুদিনের জন্য নোংরা লেখক "সফরী ফর্‌ফরায়তে" হইয়া ঈষৎ-প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন—মানি (আমাদের দুর্ভাগ্য যে শুধু নোংরামি-সম্বল লেখকও শিল্পীর শিরোপা পাইয়া যাবেন এ যুগে) কিন্তু কালজয়ী হইতে হইলে মানুষের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করিতে হইলে ইহার চেয়ে কিছু স্থায়িতর পাথেয়, উজ্জ্বলতর বর্ত্তিকা, সুন্দরতর সম্বল থাকার প্রয়োজন। সে-পাথেয়, সে-বর্ত্তিকা সে-সম্বল—দরদের, প্রেমের, ধ্যানের, জীবনাতীত কল্পনার, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির।

আমাদের দেশে আধুনিক যুগে এ সম্বন্ধে শরৎবাবুর চেয়ে বড় ঔপন্যাসিক যে আর নাই একথা অবিসংবাদিত। কেন? কারণ, শরৎবাবু শুধু চোখ দিয়া দেখেন নাই কাণ দিয়া শুনেন নাই—অতীন্দ্রিয় দরদের অনুভবের ছাপ

তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে—তাঁহার প্রেমে আক্রমণে, বিশ্বাসে অবিশ্বাসে, হাসিতে অশ্রুতে আনন্দে বিষাদে। মানুষের হৃদয় যে কোনো "বাঙালী" ঔপন্যাসিকের ইঙ্গিতে মাত্র দুই চারিটি কথায় এভাবে দুলিয়া উঠিতে পারে তাহা এ-আর্ট-সর্ব্বস্ব গল্পসর্ব্বস্ব যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম; সর্ব্বপ্রকার হীনতার মধ্যেও যে অসামান্যকে কেহ এভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে এ-সত্য সম্বন্ধে আমাদের সংজ্ঞা মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল; সর্ব্বোপরি, বাঙালী নারীকে যে এ-মহীয়সী রূপে আঁকিয়া এভাবে জীবন্ত করা সম্ভব একথা আমাদের প্রায় স্বপ্নের অগোচর ছিল বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হইবে না। আপনি নারী হইয়া আধুনিক কয়েকটি বুলিকে সম্বল করিয়া যে এহেন শরৎচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন ইহাতে আমার সত্যই আক্ষেপ হয় তীব্রাদেবী! এইজন্য, যে সময়ে সময়ে আমার মনে হয় যে শরৎবাবুর অমরতার সবচেয়ে বড় দলিল তাঁর নারীচিত্রণ। এ নারীলাঞ্ছনাভিশপ্ত দেশে এত বড় প্রচারের প্রয়োজন আছে। আনাতোল ফ্রাঁস বলিয়াছেন কবি আমাদেরকে প্রেমসম্বন্ধে আলো দান করিয়া থাকেন। সত্য কথা। আমার মনে হয় যে-দেশে বড় কবি নাই সে দেশে মানুষ প্রেম করিতে জানেই না। শরৎবাবুর নারীচিত্রণ আমাদের মনে নারীপ্রেম জাগাইয়া দেয় তাহার প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া। কারণ সব সত্য প্রেম, সব বড় অনুরাগই শ্রদ্ধাভিত্তি। আমাদের দেশে অধুনাতন সাহিত্যিকদের মধ্যে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতে পারিয়াছেন প্রধানতঃ দুইজন: নাট্যজগতে—দ্বিজেন্দ্রলাল, উপন্যাসজগতে শরৎচন্দ্র। একীর্ত্তি যে কত বড় কীর্ত্তি তাহা বলিয়া বুঝাইবার ভাষা আমার নাই। শুধু আর্টের মাপকাটিতে ইহার বিচার হয় না, হইতে পারে না—কেন না এ-শ্রদ্ধার অবদান শুধু পেলব আর্টের ক্ষালীয়মান আত্মপ্রসাদের রাজ্যে নহে; যাঁহারা এ-শ্রদ্ধা জাগান তাঁহারা জাতীয় জীবন মনুষ্যজীবনকে উদ্দীপ্ত করেন। নারীকে এক সময়ে আমরা সত্য শ্রদ্ধার চোখে দেখিতাম একথা আমরা যে প্রায় ভুলিয়াই আসিয়াছিলাম তাহা প্রথম আমাদের মনে করাইয়া দেন বঙ্কিমচন্দ্র, পরে বিবেকানন্দ পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ও শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের দান এদিকে অদ্বিতীয়। কারণ তিনি নারীকে বাস্তবতার চোখে দেখিয়াও শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য শরৎসাহিত্যানুরাগিণীর বাদীসুরই বোধ হয় নারীজাতির প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা—যেহেতু তাঁহার ভিত্তি সবচেয়ে পাকা। (বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল নারীকে দেখিতেন একটু আদর্শবাদীর চক্ষে—কিন্তু সে কথা এ পত্রে আলোচ্য নহে।) অবশ্য শরৎচন্দ্র নারীকে লইয়া বৈদেশিকী মাতামাতি করেন নাই, তাহাকে না ভালোবাসিয়া তাহার সুদূর ইন্দ্রধনুবর্ণ লইয়া কাব্যিক বাষ্পোচ্ছ্বাসব্রতীও হ'ন নাই—কিন্তু প্রতিপদে তাহার অবর্ণনীয় মাধুর্য্য ও আত্মমর্য্যাদাবোধ ফুটাইয়া তাহার প্রতি আমাদের সমীহ স্নেহ ও শ্রদ্ধা জাগাইয়া দিয়াছেন। আর এ যে তিনি পারিয়াছেন তাহার কারণ শরৎচন্দ্র হইতেছেন প্রেমের কবি, দরদের কবি, অনুকম্পার কবি—তাই আমাদের দীনহীন অপমানাপ্লুত জীবনকেও তিনি বুকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। তাই আমাদের জীবনে যেখানে অপমান সবচেয়ে নিবিড়, বেদনা সবচেয়ে পুঞ্জিত, দৃষ্টি সবচেয়ে ঝাপ্‌সা সেইখানেই শরৎচন্দ্রের প্রেমের কল্লোল সবচেয়ে উচ্ছলিত—এই সর্ব্ববঞ্চিতা চিরলাঞ্ছিতা নারীর চিত্রে। তাই নারী তাঁহার সাহিত্যে মহিমময়ী। তাঁহার নারীপূজায় মুগ্ধ হইবার সময় আমার মনে পড়ে কার কথা জানেন?—ইতালীয়ান কবি পেট্রার্কার, যিনি তাঁহার দয়িতা নারীকে পূজা করিয়াছিলেন নারীর প্রতীক হিসাবে। করিয়াছিলেন—না করিয়া পারেন নাই বলিয়া—সেই ছিল তাঁর বাণী বলিয়া। তাই তিনি গাহিয়াছিলেন:

> "Lingua mortale al suo stato divino
> Giunger non pote: amor la spinge e tira
> Non per elezion, ma per destino."
>
> "মর ভাষা নাহি পায় তার দিব্য দীপ্তির সন্ধান
> শুধু, প্রেমোচ্ছল টানে আমি তার কল্লোলি কীর্ত্তন:
> নহে সাধ করি,'—মোর নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান।

সত্য। আর নারীর মহিমা-কীর্ত্তন, তার মাধুর্য্য-বিচ্ছুরণ, তার পূজার্হতার স্তবন—ইহা শরৎচন্দ্রেরও "নিয়তির অলঙ্ঘ্য আদেশ।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মায়া

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

১৭

সিং পরিবার ব্রাহ্ম। তাদের মেয়ে একটা হিন্দু ছেলের সঙ্গে সদাসর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা এই সমাজের বড় দৃষ্টিকটু লাগত। সুরেশের ব্রাহ্ম বিবাহে তার বাবার যত আপত্তি হবে, তার চেয়ে ঢের বেশী আপত্তি ছিল ব্রাহ্মদের মায়ার হিন্দুবিবাহে। তবে সুরেশ একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। এই সূত্রে তাকে যদি ব্রাহ্ম ক'রে নেওয়া যায় ত মস্ত লাভ। এই নিয়ে সিংদের স্বধর্ম্মীর মধ্যে বেশ একটা জটলা চলছিল।

কিন্তু সুরেশের সঙ্গে মায়ার বন্ধুত্ব সব চেয়ে কষ্ট দিয়েছিল ডস্ মাডু এণ্ড কোং কে। ডস্ এখনও রোমার বাপ মাকে বাগাতে পারে নেই। মীরার কাছে ঘেঁসতে সাহসে কুলোয় না। কাজেই সে সিং পরিবারের দিকে ইদানীং সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল। মাডু ত বাণ-বিদ্ধ হরিণ-শিশু। আরও দুচার জন এদের দলের ছিল যারা লাউডন ষ্ট্রীটে নিয়মিত যাওয়া আসা করত। তারাও আশাপথ চেয়ে ছিল। মায়ার মত prize নিয়ে চ'লে যাবে একটা ধুতিপরা অজহিন্দু নেটীব, কেমন ক'রে তারা এ বরদাস্ত করবে? বার লাইব্রেরীতে কথা হয়েছিল একদিন সুরেশকে ধ'রে পিটিয়ে দেবার। কিন্তু সে সময় জুনিয়ার ব্যারিষ্টার বাবুদের ভেতর কেউ বীর boxer (ঘুসি খেলোয়াড়) ছিল না। উপরন্তু খবর পাওয়া গেল যে সুরেশ ছোকরা বেশ ভাল ঘুসি খেলতে জানে আর মাঝে মাঝে কেল্লায় খেলে আসে। ডস্ মাডুকে বললে এর একটা বিহিত করতে। মাডু ক্রমাগত, Light weight, Bantam, Welter weight এই সব কথা বলত, তাই ওর একটা boxer ব'লে খ্যাতি ছিল B. F. ক্লাবে। কিন্তু যখন এই রকম কোনঠাসা হল, তখন সে স্বীকার করলে যে অক্সফোর্ডে দুচার বার boxing দস্তানা এঁটেছিল বটে, কিন্তু ও বিদ্যায় বেশী দূর এগোতে পারে নেই। কাজেই এঁদের বাধ্য হয়ে অন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করতে হল। সুরেশ আর মায়ার নামে এই দল নানা রকম রসাল টিপ্পনী সুসভ্য সমাজে ক'রে বেড়াতে লাগল। ক্রমে এই সব কথা নানাদিক দিয়ে আমার কানেও আসতে আরম্ভ হল।

শরদিন্দু একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "মাষ্টার মহাশয়, আপনি যখন সুরপুর গেছলেন, তখন ছোটদাকে দুদিন পেলিটিতে দেখেছিলাম। এক ব্রাহ্ম লেডী সঙ্গে ছিল। কে তিনি, মাষ্টার মহাশয়?"

আমি বললাম, "সুরেশকেই জিজ্ঞাসা ক'র না, বাপু। ওতে ত আর লুকোচুরী কিছু নেই।"

সরলা একদিন বললে, "দাদা, রবিবারদিন মন্দিরে ছোটদা একজনদের সঙ্গে এসেছিল। তাদের মেয়েটি আমার চেয়ে কিছু বড়। আর কি সুন্দর চেহারা। ছেলেটির মাথায় এক মস্ত পাগড়ী বাঁধা। খবর নিয়ে জানলাম তাদের নাম সিং। ছোটদার দেখলাম মেয়েটীর সঙ্গে খুব ভাব। তুমি ওদের চেন?"

"না ভাই, আমার সঙ্গে আলাপ হয় নেই। তোর ছোটদা ওদের অনেক গল্প করছিল। মিসেস্ সিং বাঙ্গালী। তাঁর স্বামী ছিলেন এক পঞ্জাবী সরদার। সন্তান ঐ দুটী।"

"একজন খুব হোমরা চোমরা ইংরেজী কাপড় পরা ভদ্রলোক মেসো মশায়কে বললেন, 'ঐ দেখুন না, সেই হিন্দু ছোকরাটা ওদের সঙ্গে এসেছে।' মেসো মশায় উত্তর দিলেন, 'তা এলেই বা। আমাদের কি হিন্দুর সঙ্গে মেশা বারণ আছে?' ভদ্রলোক মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলেন। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম ভদ্রলোকটীর নাম ডাক্তার মিত্তির।"

"কে জানে ভাই, ওদের কথায় আমাদের দরকার কি?"

সুরেশকে কদিন দেখি নেই। একদিন ভোরে এসে উপস্থিত। মহা উত্তেজিত অবস্থা।

"নরেশ দা; এ ত ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে। মেয়ে মানুষের সঙ্গে কি পুরুষ মানুষের বন্ধুত্ব হতে নেই? হলেই লোকে তাদের সম্বন্ধে যা খুসী বলবে?"

"কেন রে? কে কি বলেছে?"

"সেদিন এক পার্টিতে রোমা চাটারজী দাঁত বের ক'রে সকলের সামনেই বললে, 'মিষ্টার চাকারভার্ত্তী, এঁদের কবে নিমন্ত্রণ করব? শুভদিন স্থির হয়েছে কি?' আমি কিছু বলবার আগেই মীরা মিটার ফোড়ন দিলেন, 'শুভকর্ম্ম কোন্ চার্চে হবে?' ভাগ্যিস্ মায়া সেখানে ছিল না। আমি খুব গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, 'না খোদা মস্‌জিদে নিকা হবে, আমি মোল্লাজীকে খবর দিয়েছি।' ব'লে কোন রকমে পলায়ন দিলাম। কিন্তু এ জুলুম নয় ভাই?"

"তা ভাই তুই রাগ করিস্ কেন? নিষ্কাম প্রেম জিনিসটা ত জগতে দুর্ল্ভ।"

"প্রেম বলছ কেন? আমার তরফে প্রেম হতে পারে স্বীকার করছি। কিন্তু মায়ার ব্যবহারে একদিনও এমন কিছু দেখি নেই, যাতে আমি মনে করতে পারি যে সে আমায় ভালবাসে।"

"সুরেশ, এমনও ত হয় কখন কখন, যে মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষকে খেলাচ্ছে। বড় মাছ ডাঙ্গায় তোলার আগে ত খেলিয়ে তুলতে হয়।"

"ছি দাদা, তুমি একথা বলছ। মায়াকে একবার চোখে দেখলে বলতে না।"

"ঘাট হয়েছে ভাই। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে একথা মনে করাও অন্যায়। আমায় মাপ করিস্।"

"তা তুমি একদিন এস না ওঁদের বাড়ী। ওঁরা কতবার বলেন। কাল মায়া বলছিল, তোমার দাদাটী অমন কুনো বেরাল কেন?"

"তুই বললি না কেন, সে ভয়তরাসে লোক।"

"কিসের ভয়, নরেশদা? পাছে নিজের হৃদয়টাকে হারাস্?"

"আমার এ আমসির মত শুকনো হৃদয় কে চুরি করবে বল্।"

কিছুদিন পরে আমার পরীক্ষার ফল বের হল। বেশ ভাল পাস হয়েছি। আমার মুরুব্বীরা মহা খুসী। রাজা রত্নেন্দু সেদিন তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ত্যাগ ক'রে জোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন,

"বেশ হয়েছে, বাবা। এইবার কাজ আরম্ভ করবার জোগাড় কর। আমার এখানেই থাকবে ত?"

"আপনি যদি অনুমতি দেন ত আলাদা বাসা করব। এখানে একটা আপিস কামরা রাখব, রতনপুর এষ্টেটের কাজ কর্ম্মের জন্য সেইখানে বসব। শরদিন্দুর সঙ্গে পড়াশুনোও সেই ঘরে হবে।"

শরদিন্দুত শুনে মহাস্ফূর্ত্তি; "মাষ্টার মশায়, তাহলে উকীল হয়েও আমায় পড়াবেন! আমি ভাবছিলাম আমার বিদ্যার্জ্জন শেষ হয়ে গেল।"

সেন মহাশয় ও মাসীমা অনেক আশীর্ব্বাদ করলেন। মা বাবার নাম ক'রে চোখের জলও ফেললেন। শেষ মাসীমা বললেন,

"মেয়েকে কিন্তু এখনই ছাড়ছি না। তুমি ঘরকন্না আরম্ভ কর, আমি দেখি। তারপর সরলা সেখানে যাবে।"

সরলা বললে, "আপনি অনুমতি না দিলে আমি যাব না, মাসীমা। কিন্তু দাদার যে কষ্ট হবে একা একা।"

সেন মহাশয় বললেন, "নরেশ, সুরেশকে দিন কয়েক তোমার কাছে রাখ।" ব'লে আমায় বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ওকথা কেন বলছেন, মেসো মশায়?"

"বাবা, কদিন থেকেই বলব বলব ভাবছি। মায়ার সঙ্গে সুরেশ সদাসর্ব্বদা ঘুরে বেড়ায় জানত! লোকে এই নিয়ে দুজনেরই বড় নিন্দা করছে। বিয়ে ওদের কি ক'রে হবে বুঝতে পারি না। যোগেশ কিছুতেই রাজী হবেন না ব্রাহ্মের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে। ওঁদের আত্মীয় স্বজনও সুরেশ দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলে বিয়েতে রাজী হবেন না। এমন কি মিসেস্ সিংও বেঁকে দাঁড়াবেন। তিনি আশা করছেন সুরেশ দীক্ষা নেবে। সুরেশের দীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় তা আমি জানি।

এক্ষেত্রে তোমার চেষ্টা করতে হবে যাতে ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা আর না থাকে।"

"কাকা সুরেশকে বিলেত পাঠাতেই গররাজী, দীক্ষা নিলে ত ওর মুখই দেখবেন না। মায়া সম্বন্ধে আমি তাকে অনেক বলেছি, মেসো মশায়। সে বলে যে মায়া তার বন্ধু, সে মায়ার বন্ধু, এতে দোষের কি থাকতে পারে? জানেন ত সুরেশ কি রকম জিদী মানুষ। লোকে যত নিন্দা করছে, তার ততই রোখ চেপে যাচ্ছে।"

"সুরেশ ছেলেমানুষ সে অতটা বোঝে না। মায়াও প্রথম প্রথম রোখের মাথায় সুরেশের সঙ্গী হয়ে বেড়িয়ে বেড়াত। সে দেখাতে চাইত যে এই নব্য বিলেত ফেরৎদলের উপর তার কতটা অশ্রদ্ধা। তাই সে সুরেশকে ইংরেজী বেশভূষাও ছাড়ালে। কিন্তু ক্রমশঃ নিজে ধরা পড়ল। তার নিজের মনের উপর আর কোন জোর রইল না। এখন সে সুরেশকে একদিন না দেখলে একেবারে মুষড়ে পড়ে। তুমি ভাবছ আমি এত কথা জানলাম কি ক'রে। মায়ার মা তোমার মাসীর ছেলেবেলার বন্ধু। সরদার হরিসিংএর সঙ্গে তাঁর বিবাহে আমিই আচার্য্য ছিলাম।"

"আমি সুরেশের সঙ্গে আবার কথা কইব, মেসো মশায়। কিন্তু আপনি মিসেস্ সিংকে একথা বুঝিয়ে দেবেন যে সে ব্রাহ্ম হলে কাকা তাকে এক পয়সাও দেবেন না।"

পরদিন খুব সকাল উঠে সুরেশের হোষ্টেলে গেলাম। দেখি সে বিছানার উপর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। বললাম,

"তোর সঙ্গে একটু দরকারী কথা আছে ব'লে এত সকাল সকাল এসে পড়লাম। কি ভাবছিস ব'সে ব'সে?"

"ভাই, আমার সবদিকেই গোলযোগ। একটা কিনারা করতে পারছি না।"

"আচ্ছা, তুই যে সেদিন আমায় বললি যে মায়ার মনে প্রেম ঢুকেছে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। কথাটা ঠিক?"

"না, সব ভুল ভাই নরেশদা, সব ভুল বুঝেছিলাম। আমি তাকে যা ভালবাসি তার চেয়েও বেশী সে ভালবাসে আমায়। কাল কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'সুরেশ, আমি তোমায় না দেখে একদণ্ডও সুস্থির হতে পারি না, আমার হবে কি?' তারপর আমায় হঠাৎ দুই হাত দিয়ে বুকে চেপে ধ'রে বার বার পাগলের মত বলতে লাগল, 'আমি তোমায় ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না, ছাড়বার সাধ্য আমার ঘুচে গেছে।' এ প্রেম নয় ত কি, নরেশদা?"

"তাহলে উপায়, সুরেশ?"

"উপায় এই যে আমরা ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। কাল সব কথা হয়ে গেছে। আমি যখন বললাম, 'চল মায়া, দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই' সে কি উত্তর দিলে জান? একটুও ইতস্ততঃ করলে না। বললে, 'তা হতে পারে না, সুরেশ। তোমার মা বাবা মত না করলে আমাদের বিয়ে হতে পারে না।' কাজেই দেখছ, আমরা বিয়ে করতে চাই না।"

"তাহলে দুজনের আর দেখা হবে না?"

"দেখা হবে না? কেন? আমাদের ভালবাসা platonic, নিষ্কাম। দেখা করলে কোন দোষ হয় না। এই আমরা স্থির করেছি অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কয়ে। কাল বারান্দায় চাঁদের আলোয় রাত বারোটা পর্য্যন্ত দুজনে বসেছিলাম। কখনও তার কোলে আমার মাথা, কখনও আমার কাঁধে তার মুখ। দুজনে কত কেঁদেছি। আমরা জানি আমাদের প্রেম মিলনের জন্য নয়, চিরজীবন কাঁদবার জন্য।"

"সব বুঝলাম, ভাই। কিন্তু তবু আমার একান্ত অনুরোধ যে তোরা আর দেখা করিস্ না।"

"মায়া কাল বলেছিল, তোমার দাদা চান আমার কাছ থেকে তোমায় ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু আমি ছাড়ব না।"

"মায়া এ কথা বললে কি ক'রে?"

"নরেশদা ভাই, রাগ করিস্ না। কিন্তু তোর সঙ্গে যা কথা হয় সবই ত তাকে বলি।"

"আচ্ছা তা হোক। তাহলে আমার মতটা শোন্। তোদের এই চাঁদের আলোয় দেখা করা, বুকে চেপে ধরা, কোলে মাথা রাখা একে আমি platonic প্রেম বলতে পারছি না। এই ত দেহের মিলন। এর পর বলা চলে না, আমাদের প্রেম মিলনের জন্য নয়।"

"আমি মায়াকে বলব, তুই যা বললি, ভাই।"

"না, তার চেয়ে একটা চিঠি লিখে দে যে আর দেখা না করাই মঙ্গল দুজনের পক্ষে। সুরেশ, তুই ছেলে মানুষ বুঝিস্ না। স্ত্রীলোকের সুনাম বড় ঠুন্‌কো জিনিস। যাকে এত ভালবাসিস্, তার ক্ষতি যাতে হয় তা তুই করবি?"

"আচ্ছা, আমি চিঠি লিখব। কিন্তু তুই বলে দে কি লিখতে হবে। আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"আমি খসড়া ক'রে দিই, তুই নকল ক'রে নে।"

এই লিখলাম,

"প্রিয়তমে মায়া, তোমার ভালবাসা পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু আমাদের মিলন অসম্ভব, কেন না তুমি মা বাবার মত নইলে আমার হবে না। এ অবস্থায় আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই উচিত। চির-বিরহে আমাদের প্রেম পূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক। আমি ত নিঃসম্বল রইলাম না। তোমার ভালবাসা পেয়েছি। সেই প্রেমের স্মৃতিই আমার আজ থেকে সর্ব্বস্ব হবে। তুমি যদি আমায় কোন দিন ভুলে যাও, তাতেও আমি দুঃখিত হব না। কেন না আমার মন থেকে তোমার ছবি, তোমার স্মৃতি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

তোমার সুরেশ"

সুরেশ এইটুকু নকল ক'রে পুনশ্চ দিয়ে লিখলে,

"আর যদি তুমি সমস্ত পৃথিবীর মতামত অগ্রাহ্য ক'রে আমার কাছে আসতে চাও ত তোমার আদেশ পেলেই আমি সেই রকম ব্যবস্থা করব।"

আমি সুরেশকে platonic প্রেম সম্বন্ধে আর বক্তৃতা না দিয়ে চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিতে ব'লে চ'লে গেলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না।

এর পর দুদিন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। অনেক খুঁজে বেশ সুবিধা মত একটা বাড়ী পেলাম বৌবাজার অঞ্চলে। বাড়ীর দক্ষিণ খোলা। হাইকোর্ট দূর নয়। রাজা বাহাদুরের বাড়ীও কাছে। নীচে দুখানা উপরে দুখানা ভাল ঘর। উঠান, স্নানাগার, রান্নাঘর সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ৩৫ টাকা ভাড়া ঠিক ক'রে বাড়ীটা এক বছরের জন্য নিয়ে নিলাম। সরলা বাড়ী দেখে দরকার মত জিনিস পত্র কিনে আনিয়ে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিলে। একজন চাকর রাখলাম। আপাততঃ বামুন রাখার ল্যাঠা করলাম না। দুপুর বেলা মাসীমার কাছে, রাত্রে ছাত্রের বাড়ী খাওয়া দাওয়া চলবে। সরলা স্থির করলে যে সে যখন আমার কাছে থাকতে আসবে, তখন রান্নাবাড়ার বন্দোবস্ত করলেই হবে, এখন দরকার নেই। সুরেশের এ দুদিন দেখা পাই নেই। তিনদিনের দিন এসে সে একখানা চিঠি আমার সামনে ফেলে দিলে,

"প্রিয়তম সুরেশ, কালকের চিঠিখানা খুব যত্ন ক'রে পড়েছি। তোমার পুনশ্চ অগ্রাহ্য। আমাদের ত ঠিক হয়ে গেছে যে তোমার বাবা মার মতের বিরুদ্ধে আমি তোমার কাছে যাব না। আবার কেন ও কথা?

বাকী চিঠিখানা ত তোমার লেখা নয়। তার উত্তর তোমায় কিছু দেব না। যিনি লিখিয়েছেন তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাঁর আদেশ নিজের কানে শুনে আমার বক্তব্য জানাব।

তোমায় কি লিখে জানাতে হবে যে আমি চিরদিন তোমারই? মায়া"

বারবার চিঠিটা পড়লাম। এ ত সাধারণ স্ত্রীলোকের লেখা চিঠি নয়। একে আমি মনে করেছিলাম মায়াবিনী কুহকিনী! এমনই মূর্খ আমি! চিঠির অক্ষরগুলি সুন্দর পরিষ্কার, যেন মুক্তোর পাঁতি। লেখিকার মনও নিশ্চয় ঐ রকম পরিষ্কার ঐ রকম সুন্দর। সুরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম,

"চিঠি পেয়ে তুই মায়ার কাছে গেছলি?"

"হ্যাঁ ভাই, না গিয়ে থাকতে পারলাম না। তুই রাগ করিস না, নরেশদা। গিয়ে আবার তাকে বললাম যে আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। তাতে সে তোমায় নিয়ে যেতে বললে একবার।"

"আমি, ভাই, বড় ব্যস্ত এখন। দুচার দিন পরে তোর সঙ্গে যাব একদিন। তাঁরা কত দিন থেকে যেতে বলছেন আমার যাওয়া হয়ে ওঠে নেই, সেই জন্য এখন বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে তাঁদের সামনে যেতে। তুই যদি পারিস্ ত এর মধ্যে আর দেখা করিস না মায়ার সঙ্গে।"

"যদি পারি ত যাব না। তোমায় কথা দিচ্ছি, নরেশদা।"

"একটা কথা বলি, সুরেশ, যদি কিছু না মনে করিস।

ও রকম মেয়ের ভালবাসা নিয়ে হেলা ফেলা করিস্ না।"

"এ আবার কি কথা, ভাই? এই যে সেদিন বলছিলে মায়া আমায় খেলাচ্ছে।"

"তা ঠিক বলি নেই, কিন্তু মনে এসেছিল সে কথা। সেই কারণেই আরও লজ্জা করছে মায়ার সামনে যেতে।"

দু'দিন পরে বেড়াতে গেছি ইডেন গার্ডেনে সরলাকে নিয়ে। নিজের ত এক রকম গোছ ক'রে নিয়েছি। সরলার প্রতি রমেশের দুর্ব্যবহারের কথাও আর বড় একটা মনে আসে না। সে ভুলতে পারবে না জানি। তবু তাকে যথাসাধ্য সুখী করব এই নিশ্চয় করেছি। কিন্তু সুরেশ ও মায়ার কথা সর্ব্বদা মন জুড়ে রয়েছে। ওদের ভবিষ্যৎ কি হবে? সুরেশকে যতদূর জানি, দেখা না হলেই তার পাগলামি কেটে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। কিন্তু মেয়েটার যা বয়স হয়েছে, তার প্রকৃতি যে রকমের দেখছি সে আর এ জীবনে ভুলতে পারবে না সুরেশকে। কোন দিন সুখী হবে না। এই সঙ্গে সরলার কথাও মনে আসে। তবে সে ত রমেশকে ভালবাসতে শেখে নেই। হিঁদুর মেয়ে, স্বামীর প্রতি মনে একটা মামুলী ভক্তি এসেছিল। তা স্বামী নিজেই সে ভক্তির গোড়ায় কুড়ুল মেরে শেষ করে দিলে। কিন্তু মায়ার ভালবাসা ত সুরেশ কুড়ুল মেরে নষ্ট করতে পারবে না। তার হবে কি? এই ব্যাপারে আমার কিছু কি দোষ হয়েছে, ত্রুটী হয়েছে এই ভাবনাই আমায় বড় কষ্ট দিচ্ছে। এক বেঞ্চে ব'সে ব'সে সরলাকে এই সব কথা বলছিলাম। সে বললে,

"দাদা, আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি স্বার্থপর। আমি পণ করেছি যে অন্যের কাজ ক'রে সেই সুখ আদায় করব, যে সুখ স্বামী সেবা ক'রে পেতাম। আমার স্বামী ত আর নেই, এমির স্বামী আছে। সে সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি অন্য দিকে মুখ ফেরাব, তাকে আমার সাধনার অন্তরায় হতে দেব না। কিন্তু মায়ার কথা স্বতন্ত্র। ছোটদা তাকে ত্যাগ করলেও তার মনে বিন্দুমাত্র তফাৎ হবে না। নিজের ভালবাসার গৌরবেই সে চিরদিন মহিমাময়ী হয়ে থাকবে। মন্দিরে তাকে দু'তিনবার দেখে এটা আমার স্থির ধারণা হয়েছে। তার মুখের সে মধুর হাসি অন্যের আদর ভালবাসার উপর নির্ভর করে না। ও তার অন্তরের জ্যোতি।"

এমন সময় দেখি সুরেশ একটা মেয়েকে নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। সরলা তাদের দেখেই বললে,

"ঐ ত মায়া সিং। চেয়ে দেখ, দাদা, ওঁর মুখের দিকে। আমি যা বলেছি ঠিক কি না?"

চেয়ে দেখলাম। দেখবামাত্র আমার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ী মারতে আরম্ভ করলে। সব মনে পড়ল। এ ত সেই মায়া, যাকে দার্জ্জিলিঙ্গে ছেলেবেলায় দেখে কতদিন ভুলতে পারি নেই! কিন্তু কি ক'রে তা হতে পারে? সে ত ছিল মায়া মুখুয্যে। ইতিমধ্যে দুজনে কাছে এল। আমি নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে নমস্কার করলাম। মায়া মধুর হেসে হেঁট হয়ে প্রতি নমস্কার করলে। সুরেশ আলাপ ক'রে দিলে,

"মায়া, এই আমার দাদা, আর এই আমার ছোট বোন সরলা।" আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। সরলা নমস্কার ক'রে বললে, "মায়াদি, আপনাকে আমি অনেকবার মন্দিরে দেখেছি।" ভদ্রতা রক্ষা হল।

মায়া আমার একটু কাছে এসে বললে, "কতদিন থেকে যে সুরেশের দাদাকে দেখবার আমার সাধ! আপনি ত কিছুতেই একবার এলেন না। যাক, আজ দেখা হল ঘটনা ক্রমে। আপনাকে আমি নরেশদা বলতে পাব ত?"

আমার মুখ দিয়ে তবুও কথা বের হল না। মায়া আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,

"আচ্ছা নরেশদা, আপনি স্ত্রীলোকদের এত দুরছাই করেন কেন বলুন ত।"

অনেক কষ্টে বললাম, "কে, আমি? আমি স্ত্রীলোকদের দুরছাই করি? সরলাকে জিজ্ঞাসা কর।"

সরলা হেসে বল্লে, "দাদা আমার বড় লাজুক, মায়াদি। তা, বোনেদের লজ্জা করেন না।"

মায়া বললে, "কতবার আসতে বললাম, একটীবার এলেন না। এখন বোনের বাড়ী আসবেন ত?"

তার পর চুপি চুপি আমার কানের কাছে বললে,

"আপনার কাছ থেকে আমার দণ্ড নিতে হবে। দণ্ড নেব, আমি ভয় পাই না।"

আমি মাথা তুলতে পারলাম না। কথা কইব কি? আমি দণ্ড দেব তোমাকে? হা, অদৃষ্ট। সরলা আর মায়া গল্প করতে লাগল। আমি সুরেশকে একপাশে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

"হ্যাঁরে সুরেশ, এই কি আমাদের সেই দার্জ্জিলিঙের মায়া মুখুয্যে?"

"আমি ত জানি না, ভাই। জিজ্ঞেস করব? মায়াকে কেমন লাগল? চমৎকার মেয়ে নয়? মায়া, দাদা বলছেন—"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আজ রবিবার। আসছে শনিবার দিন সরলাকে নিয়ে আসব আপনাদের ওখানে?"

মায়া উত্তর দিলে, "আপনার যবে যখন ইচ্ছা আসবেন, দাদা।"

তার পর ওরা চ'লে গেলে পর সরলা জিজ্ঞাসা করলে, "দাদা, মায়াদিকে দেখে তোমার মনটা বড়ংখারাপ হয়ে গেল। না?"

"হ্যা ভাই। ওর উপর বড় অবিচার আমরা হতে দিলাম। যা শাস্তি ওকেই ভোগ করতে হবে। তোর ছোটদাকে ত জানিস্।" (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

আকাঙ্ক্ষা

শ্রীমতী লীলা নন্দী

আমি ত চাহিনি তব অঙ্কের পরশ
শুনিবারে তব প্রেমবাণী,
তাহারো অধিক কিছু, অমৃত-সরস,
মিটাইতে সংসারের গ্লানি।

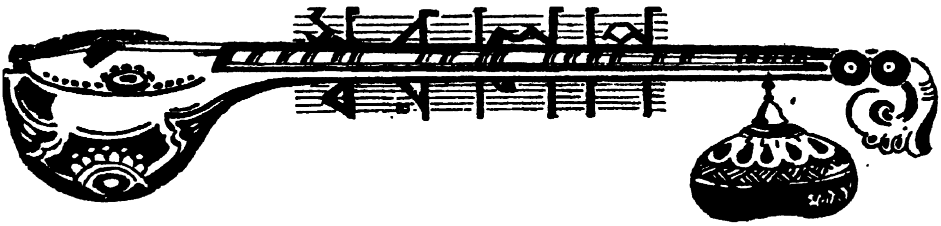
আমি শুধু চেয়েছিনু মুখোমুখি দাঁড়াব দুজন,
পাঠ করি নিবে তুমি আঁখির বারতা।
গরবী কমল সম মুদে যাবে কমল-নয়ন,
চিরন্তন হয়ে রবে আঁখির সে চির সত্যকথা।

সব ভাসাইয়া নিল, প্লাবনের মত,
উছলিত প্রেমের প্রবাহ.
ভেসে গেল পুণ্য, পাপ, জীবন বিগত,
নিভে গেল অন্তরের দাহ।

তোমার পরশ আজ এনে দিল, একি অনুভব!
বক্ষে তব মাথা রাখি, ওষ্ঠে তব স্নেহস্পর্শ লভি
ফণা নত করি নিল গরবীর উদ্ধত গরব।
আজ বুঝি, প্রিয়তম! জীবনের বাকি ছিল সবি!

আবার ফুটেছে পুষ্প অন্তরের শুষ্ক কুঞ্জবনে,
মত্ত মধুকর সম মন করে অশ্রান্ত গুঞ্জন।
মনে হয় কাম্য কিছু রহিল না আর এ জীবনে,
জীবন হয়েছে মধু, মধুতর হইবে মরণ—

হে প্রিয়! হে প্রিয়তম! হে জীবনাধিক!
বক্ষে তব শ্রান্ত শির রাখি
প্রেম-জয়-টীকা করি ললাটে অঙ্কিত
চিরতরে মুদে আসে আঁখি।



সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়, ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে।
হেমন্তের ওই শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়ায়
সেই নাচনে উঠ্‌লো মেতে॥
টই টুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক ঝলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগনতলে
সাদা মেঘের আঁচল পেতে।
নট্‌কান্ রঙ্‌ শাড়ী প'রে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা,
আন্‌মনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমলবনের তীর্থে যেতে।

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস ও শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

+		˙		+		˙
পা না না	।	না র্সা র্সা	।	না র্সা না	।	র্রগ র্রগা । র্সা র্সা
স বু জ		শো ভা র		ঢে উ খে		লে • • • যা য়
নর্স র্রা র্রা র্সা	।	ণা ধা পা	।	পধা পধণা ধা	।	পা মগা মা
ঢে • • উ খে		লে যা য়		ন • বী • • ন		আ ম • ন

পা ধা না । না র্সা -া । পা না না । না র্সা র্সা ।
ধা নে র ক্ষে তে • স বু জ শো ভা •

র্সা র্রা র্রগা । র্রগা র্রা র্সা II

II গা গা পা । গা গা গমা । রগা রা গা । ন্া সা সা ।
হে ম ন্ তে র ওই শি• শি র না ও য়া

সা ন্া ন্মা । মা গা -া । গা গা মা । গা মা া ।
হি মে ল হাও য়া র সে ই না চ নে •

পধা না র্সা । না র্সা -া II
উ• ঠ্ লো মে তে •

সবুজ শোভার ইত্যাদি—

II { মা ণা ণা । ণা ধা ধণা I না না র্সা । না র্সা -া ।
ট ই টু ম্ বু র• ঝি লে র জ লে •

পা না -া I না র্সা র্সা । নর্সা নর্সর্রা র্সা I ণা ধা -া । }
কাঁ চা • রো দে র মা ণি • • ক ঝ লে •

র্সা র্সগা গা । গা র্মগা র্মা । র্রা র্রজ্ঞা র্রা জ্ঞা । র্রা র্সা -া ।
চ ন্• দ্র ঘু মা • য় গ গ • • ন ত লে •
মৌ •• মা ছি দে • র সা থে • • • সে চা র

র্সা র্সা না । র্রা র্সা র্সা । ণা ধা ধা । না র্সা র্সা ।
সা দা • মে ঘে র আঁ চ ল পে তে •
ক ম ল ব নে র তী র থে মে তে •

পা না না । না র্সা র্সা । র্সা র্রা র্রগা । র্রগা গর্রা র্সা ।
স বু জ শো ভা • • • •• •• •• র

ইত্যাদি

II { গা গা গা ।	গা মা গমা ।	রা রজ্ঞা রা ।	ণ্া ণ্ধ্া ণ্া ।
ন টু কা	ন্ র ঙ •	শা ড়ী • •	প রে • • •
সা মা রজ্ঞা ।	রা সা া ।	মা ধা ধা ।	ধা ধমা -া ।
কে • ' বা •	লি কা •	ভো র না	হ তে • •
মধা ণর্সা ণা ।	ধা ধমা -া ।	গা মা রজ্ঞা ।	রা সা -া । }
ঝা • • য় কু	ড়া তে • •	শে ফা লি •	কা • •
মা ধা ধা ।	ধা ধা না ।	না নর্সা -া ।	ঋা র্সা র্সা ।
আ ন্ ম	না ম ন	উ ড়ে • •	বে ড়া য়
না নধা ধা I	ধা ধজ্ঞা -া ।	জ্ঞধা ধা -া ।	ধনা ধনা না II II
অ ল • স	প্র জা • •	প • তি র	পা • খা • য়

উক্ত গানখানি হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্ রেকর্ডে মিস্ অনিমা (বাদল) কর্ত্তৃক গীত হইয়াছে।

সর্বহারা

শ্রীনির্ম্মল ধর, বি-এ

দীর্ণ প্রাণের রুদ্ধ বেদনা, আমার বুকের তারে,
বেদন-বেহাগে মূর্চ্ছি উঠে, অবিরল বারিধারে !
পুঞ্জিত এই গভীর বেদনা মর্ম্মে হানিছে বাজ,
নিরাশ্বাসের করুণ কাহিনী,—দূর অম্বর-মাঝ।
প্রথম প্রণয়-অরুণ-রঙিন, অনিন্দ্য-সুন্দরী,
কেন ফিরে যাও ভোরের রাগিণী, পূরবীর সুরে ভরি' ?
যদি-বা গোপন নির্ঝর ছিলো, কঠিন পাথর-তলে,
কেন জাগিলে না অসহন সুখে, উদ্দাম কল্লোলে ?
মাধবী রাতের সোণালি স্বপ্ন, দক্ষিণ সমীরণে
উড়ে গেল হায় একনিশ্বাসে, ক্ষণ-মর্ম্মর-সনে।
হৃদয়-বিদার এই হতাশার ব্যর্থ অপূর্ণতা,
যদি পারিতাম বিস্মরি', রচি কল্পলোকের কথা,—
অপার শূন্যে আঁধার তিমির-আড়ালে অযুত তারার মতো,
হারানো-রাগিণী আশাবরী সুরে যদি মূর্চ্ছিত হ'তো।

দেওয়ালী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আজি দেওয়ালীর উৎসব-রাতি, বাজি পোড়াবেনা প্রিয়ে ?
নভ-নিকষেরে সাজাবেনা আজি আতসের আলো দিয়ে ?
অধীর হয়েছে নভোমণ্ডল তোমার আলোর লাগি,
বহু কামনায় লুব্ধ আশায় চেয়ে আছে অনুরাগী !

নভ বলি জানো কারে ?
মর্ম্মের মাঝে যে আকাশ রাজে নভ 'আখ্যানি' তারে।
অপার উদার বিস্তার তার, নির্ম্মল তার নীল,
অতি সুগভীর, স্তব্ধ সুধীর, অমলিন, অনাবিল।
সেই নভে ছাড়ো আজি
ফুলের মতন ফুলঝুরি আর তারা সম তারা বাজি।

ক্লোরেটো-পটাশ মোমছাল দিয়ে যে বাজি তৈরী হয়,
আমার মনের আকাশে জানিয়ো সে বাজি কিছুই নয়।

চকিত চপল নয়নে তোমার যে-দুটি তারকা নাচে,
বাজারে-খরিদ কোনো তারা বাজি লাগেনাক তার কাছে !
কভু সে তারকা নীল আলো ছাড়ে, কভু বা সে ছাড়ে লাল,
কভু তারকায় সবুজের আভা—মধুর বর্ণজাল !

সেই তারা বাজি দিয়ে
নিকষ-কৃষ্ণ হৃদয় আমার আলোকিয়া দাও প্রিয়ে !

তোমার অধর-কারখানা, তাহে হাসির হীরক চূর্ি'
রচো শত শত কণিকা-খচিত অপরূপ ফুলঝুরি।
সে ফুলঝুরির ঝর ঝর ধারে আঁধার চিত্ত মাঝে
কর বিরচন রেখা-চিত্রণ বহু বিচিত্র সাজে।

কি বলিছ প্রিয়ে ? বাজি পোড়েনাক না হ'লে বিস্ফুরণ ?
আগুন ধরাতে রঙমশালের একান্ত প্রয়োজন ?
চেয়ে দেখ সখি, আঁমার দু'চোখে জ্বলে সে রঙমশাল !
যত চাও তত পাবে তার মাঝে অগ্নি-কণিকাজাল।

আর শুন চারুশীলে,
পুণ্য উপজে কার্ত্তিক মাসে আকাশ প্রদীপ দিলে।
তোমার নেত্র-দীপখানি জালি আমার হৃদয়াকাশে
অর্জ্জন কর অশেষ পুণ্য শুভ কার্ত্তিক মাসে।
তোমার পুণ্যে খুলিবে আমার সুখ-স্বর্গের দ্বার,—
একে আচরিবে ধর্ম্ম, অপরে শুভ-ফল পাবে তার !

মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

পাঁচ

এর ঠিক পরের দিনের কথা। দুপুর বেলায় অরুণাংশু জোর করিয়া ঘুম ঠেকাইয়া রাখিতেছিল। দিবা-নিদ্রা নানান্ দিক হইতেই অন্যায়,—এমন কি স্বামী প্রস্তরানন্দের বইয়েও এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নিদ্রার প্রকোপ এড়ানও সহজ কথা নয়। বই পড়া এখন সম্পূর্ণ বোকামী,—ছাপা অক্ষর চোখের সমুখে উঠাইয়া ধরিলে ঘুম ঠেকানোর মত জোর অন্তত পক্ষে তার নাই।

মায়ের ঘরে নিশ্চয়ই কেউ আসিয়াছে,—কথাবার্ত্তা শোনা যাইতেছে কতক্ষণ হইল। নইলে ওখানে যাওয়াও চলিতে পারিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া অরুণাংশু ঠিক করিল যে এই অনিষ্টকারী ঘুমের একমাত্র প্রতিকার রৌদ্রে ঘুরিয়া আসা। সাথে সাথে তার মনে পড়িল ডাকে দিবার দুইটা চিঠি আছে। ব্যস্, আর কথা কি। এই দুপুর রোদে ঘুরিবার একটা সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল।

জামা গায় দিয়া চিঠি দুইটা হাতে লইয়া অরুণাংশু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। নীচের বসিবার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া সে শুনিল নীচে খুব কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। একটু মাত্র দাঁড়াইয়া শুনিয়া ওর আর সন্দেহ রহিল না,—গলাটা আর কারুর নয়, নিশ্চয়ই সুজাতা কথা কহিতেছে। রেণুকা যখন বাড়ি নাই, ইস্কুলে গেছে, তখন মা ছাড়া আর কার সাথে সে কথা কহিবে! কি অজস্র বকিতে পারেরে মেয়েটা,—কথার আর বিরাম নাই। অত কথা ও খুঁজিয়া পায় কি করিয়া তাহাই অরুণাংশু ভাবিয়া পায় না।

বেশ স্পষ্ট করিয়া শোনা গেল,—কী যে বলেন মাসীমা, বুড়ী হয়েছেন না ছাই। হ্যাঁ, সারা মাথায় পাকা চুল বৈকি! একটা খুঁজে বের করতে আমার কী মেহান্নতটাই যে হচ্ছে তা টের পান না কিনা! কলেজের গল্প বল্‌বো? কি আর গল্প বলার আছে। পড়া, ক্লাস যাওয়া, খাওয়া আর গল্প। রেণু যদি পরের বার যায় তো দু-জনে আমরা একটা ঘরে থাক্‌বো। এতগুলো মেয়ের দৌরাত্ম্যে ঘর গুছিয়ে রাখা কী যে দায় তা আমিই জানি!

অকারণেই সুজাতা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অরুণাংশুর আর সহ্য হইল না। তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মেয়েগুলিকে সে দেখিতে পারে না। হো-হো করিয়া সব সময় যেন হাসিলেই হইল। সারা সময়েই ওর এ বাড়িতে আসিয়া বসিয়া থাকিবারই বা কী দরকার। মাকে একলা পাইলে আর এই রৌদ্রে তাকে বাহির হইতে হইত না। কিন্তু এখন রৌদ্রে খানিকটা টো-টো করিয়া আসা ছাড়া ঘুম তাড়াইবার আর কোনমাত্র উপায় নাই।

অসন্তুষ্টভাবে অরুণাংশু পোষ্টাপিসের দিকে চলিল। তা গায়ে রৌদ্র লাগান ভাল,—তাতে আল্‌ট্রা ভায়োলেট্ রশ্মি আছে। হাড় মোটা হওয়ার কথা!

পোষ্টাফিসের কাজ শীগগিরই মিটিয়া গেল। তারপর আরো কিছুকাল আল্‌ট্রা ভায়োলেট রশ্মি লাগাইয়া মোটা হইবার ব্যবস্থা করিয়া অরুণাংশু বাড়ি ফিরিল। ঘুমের লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নাই। যা ছিল সব বাষ্প হইয়া কপাল ও গা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। এবং নাকে ও মুখে এতটা রাস্তার ধুলা ঢুকিয়াছে যে জড়ো করিলে তাহা দিয়া একটা দালান তৈরী করা যাইত।

মায়ের ঘরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিল এতক্ষণে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুজাতাও নাই।

ঘরে ঢুকিয়া আল্‌নার উদ্দেশ্যে স্যাণ্ডাল জোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অরুণাংশু গভীর স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। কম কথা নয়, এই রৌদ্রের মধ্যে শুধু মাথায় অতটা ঘুরিয়া আসা খুব একটা সহজ ব্যাপার না। ঘরের মধ্যটা কী চমৎকার ঠাণ্ডা,—তা নাইবা থাকিল আলট্রা ভায়োলেট। এইবার মহা আরামে চেয়ারে বসিয়া—,কিন্তু ও-দিকে চোখ ফিরাইতেই সমস্ত আরাম চট্ করিয়া অন্তর্হিত হইল। কী ভয়ানক কথা,—অরুণাংশুর টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া শ্রীমতী সুজাতা কোন্ একটা বই পড়িতেছিল, শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া চাহিল। এর চাইতে যদি একটা সাপকোপও থাকিত তাও শতগুণে ভালো ছিল! কিম্বা যদি জীবন্ত সিংহী হইত তাতেও আপত্তি ছিল না।

সুজাতা যেন একটুক্‌রা খুসীর মত। অকারণ আনন্দে টগবগ করে। তার মধ্যে না আছে অপ্রতিভতার চিহ্ন, না আছে কোনো দ্বিধা। অরুণাংশুকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে চোখ উঠাইয়া একটু হাসিয়া কহিল, অরুণদা, আমি চোর!

অরুণাংশু অপ্রতিভের মত কহিল, ওঃ।

সুজাতা কহিল, 'ওঃ',—সত্যি আমাকে চোর মনে করেন না কি? বেশ তো মজা,—অনায়াসে বল্লেন, ওঃ! অরুণাংশুর অপ্রতিভতা খানিকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। স্বামী প্রস্তরানন্দের শিক্ষাও কিছু কিছু মনে পড়িল।

গম্ভীর হইয়া সে কহিল, তবে কী বল্‌ব?

সুজাতা কহিল, বল্‌বেন আবার কি,—কিছু বল্‌বেন না, শুধু হয়ত একটু হেসে দেবেন। মানুষকে অমন অপ্রতিভ করতে আছে নাকি।

অরুণাংশু উত্তর দিল না। মহা বিপদে পড়িয়াছে সে। তার ঘরের মধ্যে নারী প্রবেশ করিবে তা প্রায় অসহ্য ব্যাপার। কিন্তু কি করিয়া একে বলে, বেরিয়ে যাও। এই সঙ্কটের সময় শুধু মাত্র স্বামী প্রস্তরানন্দ উপদেশ দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তো টেবিলের উপরে,—যেটার উপরে নারী বসিয়া আছে। অরুণাংশুর রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়া জল-তেষ্টা পাইয়াছে, জল খাইতেই চলিয়া যাইবে নাকি! এমন অবস্থায় সে যদি জলপান করিতে বাহির হইয়া যায় কেউ তার দোষ দিতে পারিবে না।

কিন্তু সুজাতা প্রশ্ন করিয়াই তাকে বিব্রত করিল। অন্তত পক্ষে এখন জল খাইতে গেলে কেউ তার তৃষ্ণার্ত্ততার কথা বুঝিবেনা, অরুণাংশুকে কাপুরুষতার অপবাদ দিবে। সেটা আর সহ্য করা যায় না।

সুজাতা একটা বই তুলিয়া অরুণাংশুকে কহিল, চমৎকার বই এটা আপনার। সেদিন ট্রেনে দেখেই আমার পড়বার লোভ হইয়াছিল।

হায়, কার হাতে পড়িয়াছে 'মানবের শত্রু নারী'! এত দুর্ভোগও ছিল ওর কপালে। স্বামী প্রস্তরানন্দ হয়ত শুনিলেও শিহরিয়া উঠিবেন।

অরুণাংশু কহিল, ওটা স্ত্রী-পাঠ্য নয়।

সুজাতা কহিল, স্ত্রী-পাঠ্য বলে আলাদা বই আছে নাকি আবার। কোন্ শতাব্দী এটা,—ভুল হয়ে যাচ্চে আমার যেন। কিন্তু—

মেয়েদের গালাগালি আমার খুব ভালো লাগবে। খুব হাসি পাবে পড়্‌তে। ক'টাকা দাম ওটার অরুণদা, আমি কিনবো একটা!

এখানে মোটেই পাওয়া যাবে না। সব জায়গায়ই কি এসব বই পাওয়া যায় নাকি?

তবে এইটেই আমি নিয়ে গেলুম।

সর্ব্বনাশ! কী বলিতেছে মেয়েটা! 'মানবের শত্রু নারী'কে কোন মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে সে! এতটা জ্ঞানের কি সম্মান থাকিবে তবে, বইটার দুর্গতির কি তবে আর বাকী থাকিবে কিছু!

অরুণাংশু কহিল, না না ওটা দিতে পারব না।

সুজাতা কহিল, বাস্‌রে, কী কিপ্‌টে আপনি। খেয়ে ফেলবো নাকি আমি বইটাকে,—যা বিশ্রী দেখতে কাগজগুলি।

অরুণাংশু চুপ করিয়া গেল। একে নিয়া মহা দায় হইয়াছে,—যা খুসী সে অপবাদই দিয়া বসে।

সুজাতা টেবেল হইতে নামিয়া পড়িয়া বইটা তুলিয়া লইয়া কহিল, এই আমি নিয়ে গেলুম, এক ঘণ্টার মধ্যেই সারা হয়ে যাবে। ভয় নাই আপনার, বাড়ি নিয়ে যাবনা, মামীমার ঘরে বসেই পড়ব।

তারপর ঘর হইতে হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল, ভাবনা নেই, কিছু চুরি করিনি। মাসীমা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে একটা বই জোগাড় করতে এসেছিলুম। শুধু শুধু বসে থাক্‌তে পারে নাকি কেউ।

গেল গেল, একান্ত প্রিয়জনকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু উপায় কি। এক একবার অরুণাংশুর মনে হইল ছুটিয়া গিয়া ওর কাছ হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া আসে। কিন্তু তা কি আর সম্ভবপর!

ঘণ্টা দেড়েক পরেই সুজাতা ফিরিয়া আসিল। অরুণাংশু টের পাইল, কিন্তু অকস্মাৎ তার মনোযোগ এমনি বাড়িয়া গেল যে আর বলার নয়। কিন্তু খেয়াল নেই যে যে-বইটা চোখের সমুখে মেলা সেটা গভীর মনযোগ দিবার মত নয়। টাইম-টেবল কে আর কবে চিন্তা করিয়া পড়িয়াছে। তা হইলে কি হয়, সুজাতাকে সে মোটেই দেখিতে পাইতেছে না,—অথণ্ড ওর মনযোগ!

সুজাতা আগাইয়া আসিয়া কহিল, নিন্, হয়ে গেছে। ভারী মজার বই কিন্তু,—প্রহসন বুঝি?

অরুণাংশুর মনোনিবেশ অত্যন্ত গভীর! কিন্তু এই রকম কথা সহ্য করা প্রায় প্রাণান্তকর ব্যাপার। 'মানবের শত্রু নারী' প্রহসন! ধৃষ্টতারও একটা মাত্রা থাকা উচিত। কিন্তু কড়া জবাব দেওয়া শুধু মাত্র বাক্য ব্যয়। মেয়ে-মানুষ এর গভীর ফিলজফির কি বুঝিবে। ওদের বিদ্যা নাটক নভেল অবধি!

অরুণাংশুর কোন জবাব না পাইয়া সুজাতা আরো কাছে আসিল। তারপর চাহিয়াই তো সে অবাক্। মনোনিবেশের ইতিহাসে টাইম টেব্‌লের ওপর এতটা অখণ্ড মনোযোগ আর শোনা যায় নাই। সবিস্ময়ে সে কহিল, এ কী পড়্‌ছেন, টাইম টেবল নাকি?

এবার অরুণাংশু কহিল, হুঁ।

সুজাতা টেবিলের উপর 'মানবের শত্রু নারী'কে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, দেখুন না, অরুণদা, এখান থেকে পেশোয়ার অবধি যেতে কত ভাড়া?

অরুণাংশু বিস্ময়ে চোখ উঠাইয়া কহিল, পেশোয়ার?

টেবিলটার উপর আঙুল দিয়া খেলা করিতে করিতে সুজাতা কহিল, হুঁ, পেশোয়ার। নয়ত ধরুন রাওয়ালপিণ্ডি কিম্বা উটকামণ্ড্!

কী হবে?

হবে আবার কী। ওসব হিসেব করতে আপনার ভাল লাগেনা বুঝি?

না? আশ্চর্য্য। আমি তো অমনি কত দুপুর বেলা ভিজাগাপটম্ পণ্ডিচেরী অমৃতসর চলে যাই। কোনোদিন বা লক্ষ্ণৌ গিয়ে ঠুংরী শুনি। এমন কি হয়ত গজল শুনতে পারসিয়াতেও চলে যেতুম, শুধু টাইম টেবল্-এ ওর ভাড়া খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই হাঙ্গামা। একটা সারা দুপুর আমি খাইবার পাস্-এ ঘুরে বেড়িয়েছিলুম।

উঃ, অরুণাংশু আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। একটা মেয়ে আসিয়া তার কাছে লেকচার দিবে এ আর সে প্রাণ ধরিয়া শুনিতে পারে না। আর প্রগল্‌ভতা দেখ,—খুব যেন ভাব জমাইয়া নিয়াছে! অথচ বোঝে না কতটা রাগে অরুণাংশু গজগজ করিতেছে। 'মানবের শত্রু নারী'র উপদেশ সে ভোলে নাই। নারীকে প্রশ্রয় দিলে পরিণামে অনুতাপ করিয়া মরিতে হয়!

কিন্তু কী করিবে। তাড়াইয়া দিবে নাকি? দুর্—তাও কি পারা যায়! তার চাইতে,—উঃ, অরুণাংশুর কী যে জল-তৃষ্ণা পাইয়াছে তা আর বলিবার নয়। গলা শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইবার জোগাড়।

সুজাতা কহিল, যান্ কোথায়? লজ্জা পাচ্ছেন নাকি? তা হ'লে আমিই না হয় চলে যাই।

লজ্জা পাব কেন?

তবে?

সবটারই কৈফিয়ৎ দিতে হবে না কি? আমার ইচ্ছে, আমি চলে যাচ্ছি, এর ওপর আর কোনো কথা আছে?

যাক্, এতক্ষণে কড়া রকম একটা কথা সে বলিতে পারিল! ফাজলামির আর জায়গা পায় না! অরুণাংশু যেন একটা খেলার পাত্র!

বিজয়ীর মত গটগট্ করিয়া হাঁটিয়া অরুণাংশু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পালাইয়াছে না আরো কিছু! তার বুঝি আর জল-তেষ্টা পায় নাই!

সুজাতা একটুক্ষণ চুপ করিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। চোখের চাউনি অকস্মাৎ একটু ম্লান হইয়া গেল। ওর উপর কেউ কোনো দিন রাগ করে না। সবাইকে হাসাইয়া আনন্দ দিয়া ও টগবগ করিয়া চলে। হঠাৎ যদি এম্‌নি কেউ একটু বিরক্তি দেখায় তবে তা বড় বাজে। তাছাড়া,—দূর ছাই,—ওর ভালো লাগিতেছে না! রেণুকার দাদা যে এমন তা আর কে জানিত!

বাহিরটা অস্পষ্ট দেখাইতেছে কেন? চোখে কী আসিয়া জমিল। ছিঃ, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিতে হইবে,—কেউ যদি দেখিয়া ফেলে! (ক্রমশঃ)

শ্রীসুবোধ বসু

পথ-চক্র

শ্রীঅমিয়কুমার সেন



কলকাতা নিতান্তই একঘেয়ে ঠেক্‌ছিলো। সামনে পরীক্ষা, কাজেই উড়ু উড়ু মনটাকে কোন রকমে ঠেকিয়ে রাখতে বাধ্য হ'লাম। যাহোক, পরীক্ষা ক্রমে শেষ হ'ল, আমিও বাঁচলাম। তাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা বেঁধে রওনা হ'লাম দেরাদূন। মোনদা সঙ্গী হবে বলেছিল, তার কলেজ বন্ধ হতে আরও কটাদিন বাকী, আমার কিন্তু দেরী সইলো না। দেরাদূনে মাসীমা থাকেন। একখানা চিঠি লিখে তাঁর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছে দেখি মাসীমা সেখানে নেই, তিনি কয়েক দিনের জন্যে মীরাট গেছেন—বেড়াতে। আমার এক মাসতুতো ভাই ছিল শুধু।

তিনদিন দেরাদূনে থেকে মীরাটের দিকে পাড়ি দিলাম। মীরাট যেতে সাহারাণপুরে গাড়ী বদল করতে হয়। সাহারাণপুর যাবার গাড়ী খুবই কম, তবে মোটারবাস চলে। তাই বাসে রওনা হওয়া গেল। দেরাদূন হতে সাহারাণপুর প্রায় ৫৬ মাইল। বেলা একটার সময় আমাদের বাস চল্‌তে সুরু ক'র্‌লে। পাহাড়ের কোন বেয়ে এঁকে বেঁকে আমাদের গাড়ী ছুটে চল্‌লো। রাস্তা খুব খারাপ। চারপাঁচ মিনিট অন্তর রাস্তার পাশে মড়ার-মাথা-আঁকা সাইনবোর্ড চোখে পড়ছিল, তাতে লেখা 'Danger' অর্থাৎ বিপদ!

চারিদিকে পাঁশুটে রঙের পাহাড়, তাদেরি বুক চিরে বাঁকাচোরা এলোমেলো পথ, আমাদের গাড়ী চলছিল সেই পথ বেয়ে। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় তুলে বিপরীত দিক থেকে এক-একখানা গাড়ী আস্‌ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমিতে পড়লাম। আরও কিছুদূর এগিয়ে আমাদের গাড়ী থামলো। এখানে কতকগুলো খাবারের দোকান আর দুচারখানা কুঁড়ে ঘর। যাত্রীদের মধ্যে কেউ-কেউ নেমে কিছু জলযোগ ক'রে নিলে। আমাদের গাড়ীকেও কিছু জলপান করান হ'ল।

তারপর আবার চলার পালা,—কিন্তু বাস-মহারাজ আর চল্‌তে চান্‌না। কে জানতো জলপান করতে গিয়ে তিনি অলক্ষিতে বিষম খেয়ে ব'সবেন। সকলে মিলে ঠেলেঠো তাঁকে চালিয়ে দিলাম কিন্তু মাইলখানিক যেতে না যেতেই তিনি আবার গেলেন থেমে। তারপর যা হ'য়ে থাকে অর্থাৎ রাস্তায় আটবার গাড়ী খারাপ আর তারই সঙ্গে

আমাদের দুর্গতি ও দুর্ভাবনার এক শেষ। রাস্তার দুধারে ছোলা ও গমের ক্ষেত। কয়েকজন যাত্রী ক্ষেত থেকে কাঁচা



দেরাদুন ষ্টেশন

ছোলা সংগ্রহ ক'রে পুড়িয়ে তার সদ্ব্যবহার ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিলে। দেখে আমারও খিদে পেয়ে গেল, আমিও কিছু ছোলা তুলে কাঁচাই খেতে আরম্ভ ক'রলাম।

সাহারাণপুরে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। ষ্টেশনে গিয়ে শুনি ট্রেন ৫টার সময় চলে গেছে। আর সেদিন কোন গাড়ী ছিলনা, ছিল পরদিন সকাল ছ'টায়। কি করা যায়! হঠাৎ মনে হ'ল প্রবাসী বাঙ্গালীরা অচেনা বাঙ্গালীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহারটা করেন তাই একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না। ইতিপূর্ব্বেই ষ্টেশনে হুইলার কোম্পানীর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে সেখানকার এক বাঙ্গালী ডাক্তারের ওখানে পৌঁছিয়ে দেন। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হয়েছিল। ডাক্তারবাবুর নাম ইউ, এন্, ব্যানার্জ্জী। সত্যই একজন ভদ্রলোক, আমার যথেষ্ট যত্ন করেছিলেন্ সেদিন। তাঁর অতিথি পরিচর্য্যার কথা আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে।

সাহারাণপুর যুক্তপ্রদেশের একটি বিখ্যাত জেলা। মহম্মদ তোগলকের সময় সাহারাণ চিস্তির নামানুযায়ী ১৩১০ খৃষ্টাব্দে এই সহরটি তৈরী হয়েছিল। মোগল শাসন সময়ে মোগল সম্রাটদের এটা প্রিয়তম গ্রীষ্মাবাস ছিল। 'বাদসামহল' নামে এখানে এক প্রাসাদ আছে। সম্রাট সাহাজাহানের গ্রীষ্মবাসের জন্যে আলীমর্দ্দন খাঁ এই প্রাসাদটি তৈরী করিয়েছিলেন। এখানকার বোটানিক্যেল গার্ডেন দেখবার জিনিষ,—নানা রকম গাছ-গাছড়া এখানে সংগৃহীত হয়েছে।

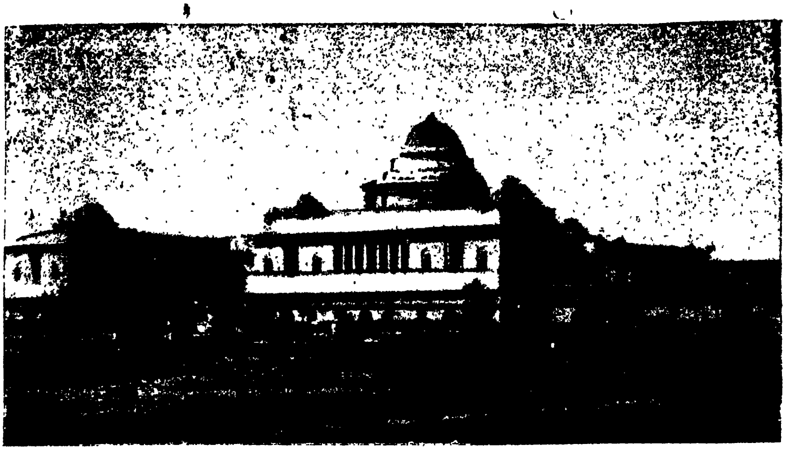
সকালে উঠে গৃহস্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ষ্টেশনে গেলাম। তারপর সেখান থেকে ট্রেন ধরে একেবারে মীরাট। মীরাট নামটা নাকি মৌরাষ্ট্র থেকে এসেছে। এই জায়গাটা ময়দানবের রাজ্য ছিল শুন্‌তে পাই। এখানে অনেক পুরাণো কালের স্মৃতি বর্ত্তমান। বিশ্বেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ আছে। লোকে বলে রাবণের স্ত্রী (মন্দোদরী) এইশিবের পূজা ক'রতেন। এখানে আরও একটি মহাদেবের মন্দির আছে। এঁর নাম অঘোরনাথ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা



যুধিষ্ঠিরের কেল্লা দিল্লী

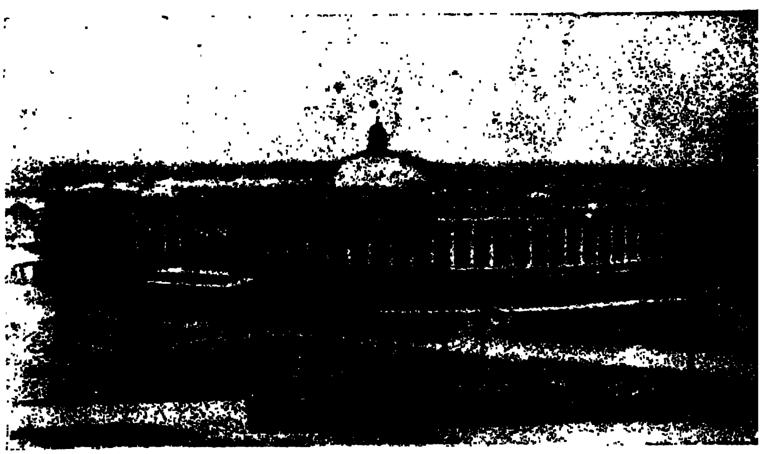
এই মন্দির থেকে প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এখানে একটী বহুকালের পুরাণো মসজিদ্ আছে। আলতামাসের জামাতা নাসিরউদ্দিন এই মসজিদটী নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন।

মীরাটে অনেক বাঙ্গালী। বেশীর ভাগই মিলিটারী একাউন্টস্‌এ কাজ করেন। এখানে বাঙ্গালীদের একটা লাইব্রেরী আছে। সেখানে প্রতি বৎসর খুব ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। মীরাটের দেখার জিনিষগুলি সব দেখে একদিন ভোর ৬টায় ফ্রন্টিয়ার মেলে দিল্লী রওনা হোলাম।



বড়লাটের বাড়ী—দিল্লী

নয়াদিল্লীতে বড়লাটের বাড়ী, সেক্রেটেরিয়েট বিল্ডিং, কৌন্সিল হাউস, অব্‌জারভেটরী, ষ্টোন্‌ কাটীং ফ্যাক্টরী, ইণ্ডিয়া গেট্‌ প্রভৃতি দেখে পুরাণো দিল্লী গেলাম। সেখানে ফোর্ট, জুম্মা মসজিদ্‌ চাঁদনী চক, কুতুবমিণার, পৃথ্বিরাজের রাজপ্রাসাদ, লোহার পিলার, যোগমায়ার মন্দির, সাফদার জঙ্গ, নিজামুদ্দীনের সমাধি, হুমায়ুনের টুম্ব, যুধিষ্ঠিরের কেল্লা প্রভৃতি দেখলাম। দিল্লীর বর্ণনা অনেকেই লিখেছেন, সুতরাং এ বিষয় বিশদভাবে কিছু না লেখাই শ্রেয়ঃ। দুদিনে দিল্লীর পালা শেষ ক'রে তৃতীয়দিনে হরিদ্বার রওনা হ'লাম।



কাউন্সিল হাউস্‌—দিল্লী

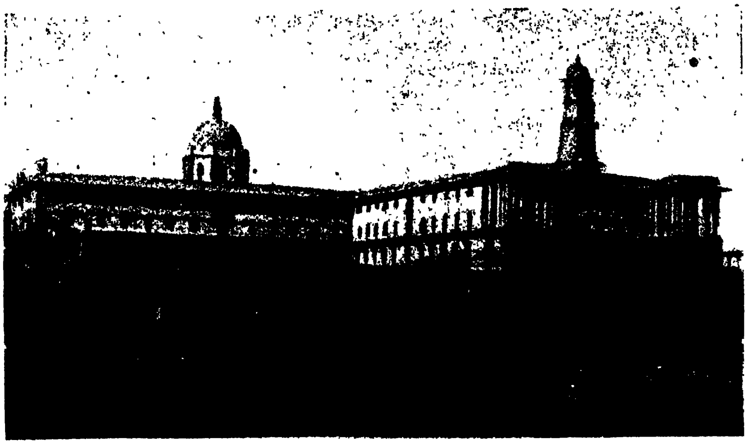
গাড়ীতে ভীষণ ভীড়। তখন চলেছে কুম্ভমেলা। পরদিন সকালে হরিদ্বার পৌছলাম। অনেক কষ্টে ভীড় ঠেলে ষ্টেশনের বাইরে এসে একেবারে সোজা স্নানের ঘাটে (হরকে পেয়ারে) গেলাম। যাঁরা তীর্থ করতে আসেন তাঁরা প্রথমেই ঐখানে স্নান করে থাকেন। সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা, তাই আমার স্নান করা হলোনা। একটুখানি জল নিয়ে মাথায় দিলাম।

হরিদ্বারের গঙ্গার শোভা মনোমুগ্ধকর। এর স্বচ্ছ জল কুলুকুলু ধ্বনি করে নেচে নেচে চলে যাচ্ছে, জলের উপর ভেসে যাচ্ছে বেলপাতা ও নানারকম ফুল। এখানকার গঙ্গা কলকাতার গঙ্গার মত চওড়া নয়।

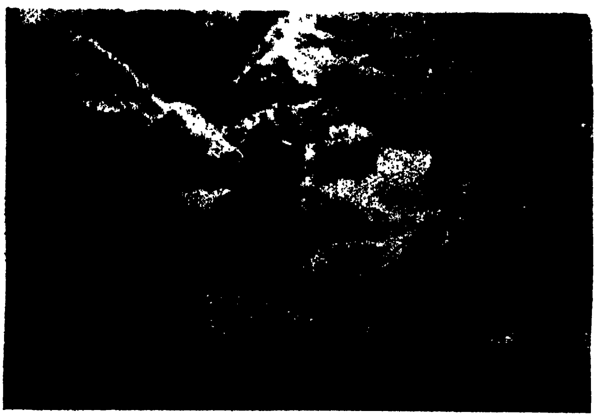
কনখল জায়গাটি ভারী সুন্দর। কনখল গঙ্গার অপর পারে, হরিদ্বার থেকে প্রায় দুমাইল দূরে। এখানেও নানা দেবদেবীর মন্দির আছে। কতগুলি ধর্ম্মশালা ও আশ্রম আছে। সমস্ত আশ্রম ও ধর্ম্মশালাগুলি তখন নানা দেশের সাধুতে পূর্ণ। এখানে এত সন্ন্যাসী এসেছিলেন যে থাকবার জায়গার অভাবে অনেককে তাঁবুতে অথবা একেবারে গাছের তলায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। চারিদিকে স্বেচ্ছাসেবকরা

ছুটাছুটী করছিলেন যাত্রীদের সুখ ও সুবিধার জন্তে। হরিদ্বারে একটা বেলা কাটিয়ে বিকেলে দেরাদুন পৌছলাম। দেরাদুনে প্রায় দুইমাস ছিলাম।

দেরাদুনের দৃশ্য শোভা ভারী সুন্দর। সহরটী ছবির মত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—রাস্তাগুলো সোজা সোজা। এখানকার বাড়ীগুলো প্রায়ই একতালা, ছাদ টিনের এবং প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে প্রকাণ্ড বাগান। বাগানে



সেক্রেটারিয়েট্ বিল্ডিং—দিল্লী



সহস্রধারা—দেরাদুন

নানা রকমের ফুল ও ফল। গোলাপের ছড়াছড়ি। এখানে লোকে গোলাপের বেড়া দেয়। এত বেশী ফুল হয় যে পাতা দেখাই যায় না, মনে হয় যেন শুধু ফুলেরই বেড়া। এখানকার অধিবাসী বেশীর ভাগ অবসর প্রাপ্ত এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্।

দেরাদুন সহরটী একটি বিস্তৃত উপত্যকা। শিবালীকা পর্ব্বতমালা সহরটীকে ঘিরে আছে। এখানে বাঙালী আন্দাজ পঁচাত্তর ঘর আছেন। বেশীর ভাগই সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া এবং মিলিটারী একাউন্টস্এ কাজ করেন। এখানে চুচারজন উকীল, জন পাঁচেক ডাক্তার ও তিনজন প্রফেসর আছেন। এখানেও বাঙ্গালীদের একটী লাইব্রেরী আছে। প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীই এর সভ্য। এখানে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। বাঙ্গলা দেশ থেকে দূরে থাকাতে এখানকার বাঙ্গালীরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।

এখানকার ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্সটিটিউট দেখবার জিনিষ। তাছাড়া তপকেশ্বর, সহস্রধারা, রামেশ্বরের মন্দির গুরুদ্বার প্রভৃতিও দেখবার মত। দেরাদুন থেকে মুসৌরী পাহাড় ২১ মাইল। এখান থেকে পাহাড়ের উপরে সহরটী ভারী সুন্দর দেখায়। রাত্রে যখন আলো জ্বলে তখন এর দৃশ্য আরও সুন্দর হয়। চারদিকে আলোর বৃষ্টি—মনে হয় যেন দেয়ালীর রাত।



রামেশ্বরের মন্দির—দেরাদুন

দেরাদুন থাকবার সময় মোনদা ও রতিদা এসে যোগ দিলে। দেরাদুনের গরম অনেকটা অসহ্য ঠেক্‌লো বলে আমরা সবাই কিছুদিনের জন্যে মুসৌরীতে বাসা বাঁধার ঠিক করলাম। মুসৌরীতে যেমন শীত শুনেছিলাম বস্তুত



টিহরীর পথে দড়ির সেতু

তেমন ছিলনা—দিনটা কলকাতার মাঘ মাসের বেলা ১২টার মত। রাত্রে একটু বেশী শীত পড়তো, মোটা কম্বল না হ'লে চ'লত না।

আমরা সেখানে গণেশ ইণ্ডিয়ান হোটেলে উঠেছিলাম। মুসৌরীর সব চেয়ে পুরাণো এই হোটেলটি। আমরা এই হোটেলের একটী 'কটেজ' ভাড়া করেছিলাম। কয়েকদিন পরে শিল্পী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (উপস্থিত পাতিয়ালার রাজ-শিল্পী) আমাদের হোটেলে এলেন—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, ছেলে এবং সহকারী শিল্পী প্রভৃতি আরও দুচার জন। মজুমদার মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে আমরা খুবই পরিতোষ লাভ করেছিলাম। যে একমাস সেখানে ছিলাম সে এক মাস তাঁদের সঙ্গসুখে বেশ আনন্দে দিন কেটেছিল। মুসৌরীতে বেড়ানই ছিল আমাদের কাজ। প্রত্যুষ গগনের মুখ দেখবার জন্যে আমাদের তাড়াতাড়ি ঘুম ছেড়ে উঠ্‌তে হ'ত। তারপর চা পানাদি শেষ করে ক-ভাই মিলে রাস্তা বেয়ে উঠতাম;—আবার নেমেও কতদূর গিয়েছি যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। এমনি করেই উঁচুতে নীচুতে পা ফেলে ক্রমশঃ বহুদূরে চলে আস্‌তাম। এখানে প্রধান রাস্তা একটা। রাজা, মহারাজ, নবাব, গরীব, দীন দুঃখী সবাই এক পথে—যেন সকলেরই এক গতি আর এক গন্তব্য। সকলেই পায়ে হেঁটে চলেছে, হয়তো কোনো কোনো রাজার রিক্স পিছন্ পিছন চলে। মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় কোনো কোনো রাজার পিছনে পিছনে চলেছে রিক্স, এবং রোগী এবং ভোগীরা চলেছেন ডাণ্ডিতে এবং তাঁদের শিশু-সন্তানেরা কাণ্ডিতে। ডাণ্ডি এবং কাণ্ডি দুরকমের মনুষ্যবাহিত যান—যাঁরা কখনো দেখেন নি তাঁরা এই প্রবন্ধে ডাণ্ডি ও কাণ্ডির ছবি দেখ্‌লে তাদের স্বরূপ বুঝতে পারবেন।

পার্ব্বত্য সহরে যেখানকার পথগুলি এত বেশী খাড়াই যে রিক্‌সা করে সে-সকল পথে গমনাগমন অসম্ভব বা বিপজ্জনক সেখানে ডাণ্ডি এবং কাণ্ডির আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। রিক্‌সা অপেক্ষা ডাণ্ডি এবং কাণ্ডিতে গমনাগমন বেশী নিরাপদ।



মুসৌরীর সাধারণ দৃশ্য

এখানে ইউরোপীয়ের সংখ্যা খুবই বেশী। অনেক মিশেনারী সাহেব এখানে বাস করে। তাছাড়া অনেক ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এখানে আছে। মুসৌরী থেকেও দেরাদুনের প্রকাশমান দৃশ্য অতি সুন্দর দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলা অনেক লোক দেরাদুনের আলো দেখবার জন্যে

জড় হয়। মুসৌরীর রাস্তাগুলিতে ভীষণ চড়াই এবং উৎরাই, কেবলমাত্র ক্যেমেল্‌স্ ব্যাক বোড়টী সমতল। তাই এখানেই সকাল ও সন্ধ্যায় পথিকের ভীড় বেশী হয়।



আমাদের হোটেল—মুসৌরী

আকাশ অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন না থাকলে অদূরে বরফ-ঢাকা সারি সারি পাহাড় দেখতে পাওয়া যায় না। ভোর বেলায় সেগুলি অতি শুভ্র আকার ধারণ করে। মুসৌরীর সব চেয়ে উঁচু শিখরের নাম ল্যেণ্ডর (Landour)। সেখানে একটি depot (সৈন্তের ঘাটী) আছে। সেই উঁচু শিখরে



ডাণ্ডি—মুসৌরী

উঠ্‌লে নন্দাদেবী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ প্রভৃতি দেখা যায়। একটা মানচিত্র আছে, আবহাওয়া ভাল থাক্‌লে এর সাহায্যে কোন্‌টি কি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেকেরই ভাগ্যে দেখা ঘটে উঠেনা। আমরা আটবার দেখবার চেষ্টা করার পর তবে একদিন আকাশ পরিস্কার পেয়ে দেখতে পেয়েছিলাম।

মুসৌরী থেকে প্রায় আটমাইল দূরে একটি ঝরণা আছে, নাম তার 'ক্যামটী ফল্‌স্'।

গ্রীষ্মকালে জলের তোড় তেমন নয়, তবে বর্ষাকালে খুব বেশী রকম হয়। এখান থেকে দুমাইল দূরে বালুগঞ্জ নামক স্থানে আর একটি ঝরণা আছে তার নাম 'মোসী ফল্‌স্'। পনেরো মাইল দূরে রাজপুরের কাছে একটী ঝরণা আছে, তার নাম সহস্রধারা। এর জল ভারী চমৎকার। এখানে



কাণ্ডি—মুসৌরী

একটি উদ্যান আছে। সেখানে নানারকম বনফুল ও অনেক পুরাণো পুরাণো গাছ আছে। একটা পপলার গাছ দেখলাম সেটা ১৮৪২ সালের।

মুসৌরীতে দিনরাত আমোদপ্রমোদ চল্‌ছে। আট নয়টি সিনেমা হাউস, নাচ, থিয়েটার, ব্যাণ্ড প্রভৃতি অনবরতই একটার পর একটা লেগে আছে। বেলা ১১টা থেকে আরম্ভ করে রাত তিনটে চারটে পর্য্যন্ত। এখানে তিনচার ঘর স্থায়ী বাঙ্গালী আছেন। এঁদের চেষ্টায় সেখানে একটি লাইব্রেরী গঠিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ

মিত্রের কর্মোৎসাহী জীবন দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তিনি আজ প্রায় ২৬ বছর সেখানে আছেন। তিনি Fitch কোম্পানীতে কাজ করেন। মুসৌরীতে কোন বাঙ্গালী এলেই তিনি তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আমরা তাঁকে কোনদিনই ভুলতে পারবো না।



মুসৌরী থেকে দেরাদুনের দৃশ্য

হঠাৎ একদিন শুনলাম মালব্যজী মুসৌরী এসেছেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির Physicsএর অধ্যাপক মিঃইউ এ আস্রাণী আমাদের হোটেলে উঠে ছিলেন। মালব্যজীকে কোনদিন দেখিনি তাই এই অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মালব্যজী যেখানে থাকতেন সেটা মুসৌরীর একপ্রান্তে ভিন্‌সেণ্ট হিলের চূড়ায়। বাড়ীর নাম Craig Top। আমার "স্মৃতিলেখা"র খাতায় মালব্যজীর হাতের লেখা নিলাম। তিনি আমাকে প্রথমে সংস্কৃততে লিখে দিলেন, "সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, দেশভক্তো ভব"। আমি তাঁকে ইংরেজিতে লিখতে অনুরোধ করায় নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ইংরেজিতেও সামান্য লিখে দিয়েছিলেন।

একমাস মুসৌরীতে কাটিয়ে আমরা আবার দেরাদুনে ফিরে এলাম। দেরাদুন থেকে আমরা লক্ষ্ণৌ যাই শিল্পী অসিত-কুমার হালদার ও কবি অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার প্রলোভনে। দেরাদুন থেকে রবিদা একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন মেসোমশায়ের বন্ধু শ্রীযুত করুণা চট্টোপাধ্যায়ের নামে। তিনি লক্ষ্ণৌতে মিলিটারী একাউণ্ট্‌সে কাজ করেন। খুব ভোরে আমরা লক্ষ্ণৌ পৌছলাম্। ষ্টেশনে এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি করুণাবাবুর ঠিকানা বলে দিলেন হিউয়েট্ রোড্। একটা টাঙ্গা ভাড়া করে সেখানে উপস্থিত হলাম। বাড়ীতে গাড়ী থামিয়ে আমরা নেমে পড়তেই একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলাম—আপনিই কি করুণাবাবু? তিনি খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ। তখন আমরা তাঁকে চিঠিটা দিলাম। তিনি চিঠি পড়ে পরমাত্মীয়ের মত আমাদের যত্ন কোরে তাঁর বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। শুনেছিলাম তিনি অবিবাহিত কিন্তু ভিতরে স্ত্রীকণ্ঠ শুনে আমরা প্রথমে একটু বিস্মিত হলাম। কিন্তু তখনই বুঝ্‌তে পারলাম ভ্রম প্রমাদে আমরা ভুল করুণাবাবুর গৃহে উপস্থিত হয়েচি। করুণাবাবুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে আমরা তখনই আসল করুণাবাবুর বাড়ী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। কিন্তু তিনি



মুসৌরীর মেঘ

কিছুতেই আমাদের ছাড়তে রাজী হলেন না। তাঁর স্ত্রী আমাদের বললেন—তোমাদের কিছুতেই এখন ছেড়ে দেওয়া হবেনা, এখানে স্নানাহার সেরে তারপর সেই ভদ্রলোকের বাড়ী যেও এখন,—এমনই আরও অনেক কথা। এই অল্প

সময়ের মধ্যে সেই ভদ্র মহিলাটী আমাদের একান্ত আপনার জন করে ফেললেন। আমরা তাঁদের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সেখানেই খাওয়া দাওয়া কোরতে হোলো।



ল্যাণ্ডোরের সাধারণ দৃশ্য—মুসৌরী

পরে অনেক খোঁজ করে জানলাম আমাদের আসল করুণাবাবু তিনমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছেন বাড়ীতে তালা লাগিয়ে।

লক্ষ্ণৌয়ে অসিতবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। আমরা যখন তাঁর বাড়ীতে পৌছলাম তখন তিনি একখানা ছবি আঁকছিলেন। তিনি আমাদের দেখে খুব খুসী হলেন, আর খুব যত্ন করে তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন। আমার খাতাটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তিনি আমার "স্মৃতি লেখা"তে একটা ছবি এঁকে দিলেন—অতি অল্প সময়ের মধ্যে গোটাকতক আঁকাবাঁকা লাইন টেনে গেলেন মাত্র—কিন্তু কি সুন্দর! ছবিটির প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের শেষে দেওয়া হল! তিনি আমাদের তাঁর গৃহে থাক্‌বার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুরোধ রাখ্‌তে পারিনি কারণ সেইদিনই পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি বাঙলার দিকে। অসিতবাবুর বাড়ী থেকে আমরা অতুলবাবুর বাড়ী গেলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তখন সেখানে ছিলেন না।

বিফল মনোরথ হয়ে ষ্টেশনে এসে গাড়ী ধরলাম। সোজা কলকাতা না এসে পরদিন বেলা ১১টার সময় আমরা বর্দ্ধমানে নেমে পড়লাম্। এখান থেকে গাড়ী বদল করে চললাম শান্তিনিকেতনে কবি দর্শনে। সেই গাড়ীতে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুত অজিত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। বোলপুর ষ্টেশনে নেমে দেখি শিল্পী নন্দলালবাবু, রথীবাবু (কবির পুত্র) প্রভৃতি একই গাড়ীতে এলেন। আমরা একটা গরুর গাড়ীতে জিনিষ বোঝাই করে হেঁটে চললাম। অজিতবাবুও আমাদের সঙ্গে হেঁটে চললেন। ষ্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন প্রায় দেড়মাইল। মোটর যাওয়া আসা করে তবে সংখ্যায় কম বলে আমরা মোটরের জন্য অপেক্ষা করিনি।

ষ্টেশনে ভীষণ ভীড় হয়েছিল, লোকের মুখে শুনি উদয়শঙ্করের নাকি আমাদের গাড়ীতেই আসার কথা ছিল। শুনলাম্ তাঁরা গাড়ী ফেল করেছেন, পরের গাড়ীতে আস্‌ছেন। আমাদের মনটা যে তখন কি রকম আনন্দে নেচে উঠেছিল তা লিখে প্রকাশ করা যায়না।



ক্যামটী ফলস্—মুসৌরী

সমস্ত "Guest House," "পান্থ নিবাস" রিজার্ভ হয়ে গিয়েছিল। অনেক দূর থেকে আস্‌ছি শুনে Guest houseএর হলঘরে আমরা স্থান পেয়েছিলাম। শান্তি-

নিকেতনে এসে জিনিষপত্তর ঠিক করে, বিছানা পেতে, কাপড় বদ্‌লে নিলাম। জল খাবার এলো—পরোটা আর পটল ভাজা। শান্তিনিকেতনে যাঁরা Guest হিসাবে আসেন



ক্যামেল্‌ব্যাক রোডের আর এক দৃশ্য—মুসৌরী

তাদের খাওয়ার চার্জ্জ লাগে। নিজের রুচি মত অর্ডার দিতে হয়। আমরা কিন্তু তা করিনি, আশ্রমের ছাত্র ছাত্রীরা যা খায় আমরাও তাই খাবো বলে পাঠালাম।

তারপর কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উত্তরায়ণের দিকে অগ্রসর হ'লাম, সঙ্গে আমার "স্মৃতিলেখা"র খাতা। দুধারে ফুলের বাগান, নানারঙের ফুল ফুটে আছে। আমরা সোজা গেট দিয়ে ঢুকলাম্। পথে রথীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁকে আমাদের অভিপ্রায় জানালাম, তিনি আমাদের সঙ্গে একটি লোক দিয়ে কবির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কবি যেখানে বসেছিলেন সেখানে গিয়ে আমরা দুটিতে হাজির হোলাম। সেখানে নন্দলালবাবু এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা কবিকে প্রণাম করে দাঁড়ালাম। আমাদের পরিচয়াদি গ্রহণ ক'রে আমরা কয়েক জায়গা ঘুরে আসচি শুনে কবি বল্‌লেন,—ও তোমরা চক্কোর দিচ্ছো? তাহলে তোমরা চক্রী!—বলে হাসতে লাগলেন। অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা কবির আঁকা ছবি দেখতে চাইলে তিনি হেসে বললেন—আমার ছবি? সে যে কোথায় চাপা পড়ে আছে তার খবর বল্‌তে পারিনা। তবে রথীর কাছে জিজ্ঞাসা কোরলে হয়তো সে বোলতে পারবে। তোমরা তাকে বোলো। তারপর নন্দলালবাবুকে আমাদের কলাভবন প্রভৃতি দেখিয়ে দিতে বললেন। আমি আমার খাতাখানা তাঁর সামনে ধরে বললাম—আমাকে কিছু লিখে দিতে হবে। কবি হেসে বোললেন—লিখে দিতে হবে? আচ্ছা, আজ থাক্ তোমরা বরং কাল একবার এসো। জিজ্ঞাসা কোরলাম—কখন আস্‌বো? বল্‌লেন, সকালে—কলাভবনের ছবি দেখে।

কবিকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে গুরুপল্লীর দিকে অগ্রসর হ'লাম। সেখানে আশ্রমের শিক্ষকদের বাস ভবন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে দেখা করলাম্। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আস্তানায় ফিরে এসে দেখি উদয়শঙ্করের নাচের ষ্টেজ তৈরী হয়ে গেছে। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ঘুরে



ক্যামেলস্‌ব্যাক রোড থেকে বরফের পাহাড়—মুসৌরী

বেড়াচ্ছে—কখন উদয়শঙ্কর এসে পৌছবেন সেই আশায়। কয়েক মিনিট পরে একটা মোটার এসে Guest house এর দরজায় দাঁড়াল। উদয়শঙ্কর, সিমকী প্রভৃতি নেমে এলেন। এদিকে আমাদের খাওয়ার ঘণ্টাও পড়লো, আমরা সবাই

খেতে গেলাম। মস্তবড় হল ঘর, তার ভেতর খুব লম্বা সারি সারি টেবিল ও বেঞ্চ। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা সব খেতে এলো, একই ঘরে খাওয়া হয়। সকলেই খেতে বসলো। মেয়েদের মধ্যে জন চারেক ও ছেলেদের মধ্যে জন ছয়েক



জ্যোৎস্না রাতে—মুসৌরী

পরিবেশন করতে লাগলো। প্রত্যেকদিনই এক একদল ছেলেমেয়ে পরিবেশনের ভার পায়। রান্না খুব সাদাসিধে,—ভাত, ডাল, তরকারী, মাছের ঝোল ও ভাজা। যারা রুটি

নয়টা বাজতে চলেছে। সবাই দল বেঁধে ঘুরছে, সকলেরই মনে আশার মাদকতা। ছোট ছোট ছেলেরা যারা অন্যদিন রাত নটার সময় ঘুমে অচেতন হয় তাদেরও চোখে সেদিন ঘুম ছিল না।

পরদিন বর্ষামঙ্গল উৎসব। সুতরাং সে দিন না হলে আর নাচ দেখানো হয় না, কারণ পরদিনই উদয়শঙ্করের ফিরে যাওয়ার কথা। অবশেষে খবর এলো নাচ হবে। আশ্রমের ঘণ্টা অবিশ্রান্ত ভাবে বাজতে লাগলো সকলকে সংবাদ দেবার জন্যে। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা ঘণ্টা শুনে ছুটে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে হলখানি পূর্ণ হয়ে গেল। আমি ও মোনদা সেই হলে একটু স্থান সংগ্রহ করলাম। কবি উপস্থিত হ'লে নাচ আরম্ভের আগে তিমিরবরণ একটা যন্ত্র-সঙ্গীত বাজালেন। তারপর উদয়শঙ্করের নাচ আরম্ভ হলো, উদয়শঙ্কর ও সিমকী অনেকগুলো নাচ দেখালেন, যা দেখলাম তা বর্ণনা করবার ভাষা আমি জানি না। প্রত্যেক নাচের পরে রবীন্দ্রনাথ "সাধু! সাধু" ব'লে করতালি দিচ্ছিলেন। নাচ শেষ হ'লে সেই রাত্রেই আমরা রাজেন্দ্রশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর, রবীন্দ্রশঙ্কর ও তিমিরবরণের সঙ্গে আলাপ



তুষারাবৃত মুসৌরী

খায় তাদের জন্য রুটি, নিরামিষ ভোজীদের জন্যে একটা বেশি তরকারী। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে হয়ে থাকে। যাক্ খাওয়ার পালা সাঙ্গ করা গেল।

এদিকে নাচ হবে কিনা কিছুই ঠিক হচ্ছিল না। প্রায়

করলাম। উদয়শঙ্কর ও সিমকির সহিত আলাপের সৌভাগ্য পরদিন হয়েছিল। উদয়শঙ্করের সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। এত বড় গুণী কিন্তু একেবারে অভিমান শূন্য গুণ ও বিনয়ের সে যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ!

পরদিন ভোর সাড়ে চারটের সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। পূর্ব্বদিন রাত্রি অধিক হয়েছিল শুতে, তাই সকালে ওঠার ঘণ্টা একটু দেরীতে পড়েছিল। সাতটার সময় জলখাবারের ঘণ্টা পড়লো। সাতটার পরে আমাদের নন্দলালবাবুর কাছে যাওয়ার কথা ছিল, আমরা তাঁর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ক'রে আমাদের কলাভবনে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটি জিনিষ যত্ন ক'রে দেখালেন। অত বড় শিল্পীর কাছ থেকে অতগুলি রমণীয় শিল্প-বস্তুর পরিচয় পাওয়ার সৌভাগ্যের স্মৃতি চিরদিন আমাদের মনে জাগ্রত থাকবে।



"স্মৃতিলেখা"য় অসিতকুমার অঙ্কিত ছবি

কলাভবন দেখা শেষ হ'লে নন্দলালবাবুকে আমার খাতায় একটা কিছু এঁকে দিতে অনুরোধ করলাম। বাঁহাতের ওপর খাতাটি রেখে ডান হাত দিয়ে আমার ফাউটেন পেনটি ধরে তিনি গোটাকতক আঁচড় কেটে গেলেন, আমি তাঁর আঙুলের ভঙ্গীর দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে একটী গমনশীল পথিকের সজীব মূর্ত্তি আমার খাতার পাতায় ফুটে উঠল! এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে সেই ছবিটি প্রকাশিত হ'ল।

তারপর আমরা উত্তরায়ণে উপস্থিত হলাম। দুচারটা কথাবার্ত্তার পর কবির সম্মুখে আমার "স্মৃতিলেখা"র খাতা খানি মেলে ধরলাম। কবি প্রসন্ন সহাস্যমুখে লিখে দিলেন

জীবন রহস্য যায় মরণ রহস্য মাঝে নামি,
মুখর দিনের আলো নীরব নক্ষত্রে যায় থামি।

সেদিন ১৩৪০ সালের ২৫শে আষাঢ়। মনে হ'ল এ যেন আচারনিষ্ঠ পুরোহিত কর্ত্তৃক উচ্চারিত আমাদের "পথ-চক্র" ব্রতেরই উদ্‌যাপনের মাঙ্গলিক। শেষের সম্পদে আমাদের দেশ-ভ্রমণের পূর্ব্বকার অংশের সমস্তটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অপরাহ্ণে স্মৃতি-বিলাস-বিমুগ্ধ হৃদয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও সার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর সহিত ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মাজীর যে কথাবার্ত্তা হয়, শ্রীযুক্ত বসুর নিকট তাহার কতকাংশ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি জানিতে পারেন, এবং তাহা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই বিবরণে প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সহিত বাংলার যেটুকু সংস্রব আছে, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে মহাত্মাজী বলেন যে, বাংলার প্রতি ইহাতে কোনও অবিচার করা হইয়াছে, তাঁহার এরূপ বিশ্বাস যদি উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে ব্যাপারটির দোষগুণ বিবেচনা করিতে তিনি ইচ্ছুক হইবেন। যদিও হিন্দুসমাজের বিভিন্নশ্রেণীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মিটমাট বলিয়া, পুণাচুক্তির পবিত্রতাকে তিনি দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবেন।

সার এন-এন সরকার 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় একখানি পত্র লিখিয়া এই উক্তির সমালোচনা করিয়াছেন।

প্রথমেই তিনি মহাত্মার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩২এর সেপ্টেম্বরে মাহাত্মার উপবাসে বাধ্য হইয়া এমন কাজ কেহ কেহ করিয়াছিলেন যাহা তাঁহারা সাধারণ অবস্থায় করিতেন না। যে কাজ করিতে লোকে বাধ্য হয়, তাহাকে কখনও পবিত্র বলা যায় না। বস্তুতঃ বাংলার বর্ণ হিন্দুদের পক্ষ হইতে কেহ পুণা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই, অথবা তাঁহাদের পক্ষ হইতে কোনও মিটমাটও হয় নাই। তাঁহারা যে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই, তাহার কারণ, মহাত্মার মৃত্যুর জন্য পাপের ভাগী হইবার ভয়।

মহাত্মাকে বাংলায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা সম্পর্কে সার এন-এন-সরকার বলিয়াছেন যে, মাত্র গত বৎসর বাংলার ভাগ্য মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ আম্বেদকর, সার তেজ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত জয়াকর কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল। বাংলা এই কথা আর একবার ঘোষণা করিতে উদ্বিগ্ন হইয়াছে যে, তাহার পুত্রেরা নিজস্ব গোলমালগুলি মিটাইতে পারে না। বিরলা, ঠক্কর এবং মহাত্মাই একমাত্র ব্যক্তি যাঁহারা বাংলার সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বংলার পুত্রেরা, তাঁহাদিগের পরিচালিত শোভাযাত্রার আবশ্যকীয় অলঙ্কাররূপে শোভা পাইবেন।

সার এন-এন সরকার, তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও যুক্ত কমিটিতে বাংলার প্রতি আর্থিক অবিচারের এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশেষ যোগ্যতার সহিত লড়িয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং পুণাচুক্তিতে বাঙ্গালী বর্ণ হিন্দুদের প্রতি অবিচারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, এ সম্বন্ধে অনেকের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মনীষা বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালী অনেক কিছু আশা করে। এই সকল কারণে তাঁহার উক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

লোকে বাধ্য হইয়া যদি কোনও ভাল কাজ করে, তবে, তাহার পবিত্রতা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায় সে কথা সত্য। পুণা চুক্তি সম্বন্ধে ঠিক এই কথা পুরাপুরি প্রয়োগ করা যায় কিনা, তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার বিষয়। মানুষ যখনই কোনও নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে চায়, বহু মানবের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে অল্পলোকের অন্যায় সুবিধা ভোগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে চায় তখনই তাহাকে একদল লোকের বিরুদ্ধে লড়িতে হয় এবং উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগে তাহাদিগকে বাধ্য করিতে পারিলেই মাত্র, উদ্দিষ্ট পথে আনা যাইতে পারে। জগতে চিরদিনই সত্যকে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। ইহাতে ছোটখাট শারীরিক বল প্রয়োগ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় যুদ্ধ ও রক্তপাত ঘটিয়াছে। তাহার জন্য সেই সকল কাজ বা সত্যের উৎকর্ষ বা পবিত্রতার হ্রাস ঘটে নাই। শারীরিক বল অথবা যুদ্ধ বিগ্রহে যে শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাতে উভয় পক্ষেই অনেক নিষ্ঠুরতার

অনুষ্ঠান, অপমান, সম্পত্তি ও প্রাণনাশ অল্পাধিক পরিমাণে ঘটে এবং অনেক সময়ই ইহার মধ্য দিয়া যে বিদ্বেষ জাগ্রত হয়, অনেক দিন ধরিয়া তাহা চলিতে থাকে এবং লব্ধ ফলকে তাহা অনেকাংশে বিফল করিতে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীও যাহাকে প্রতিষ্ঠা করা অথবা যাহার উচ্ছেদ সাধন করা ন্যায়সঙ্গত ও সত্যানুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে লড়িতে হইয়াছে। কিন্তু, তাঁহার শক্তি প্রয়োগের পন্থা অভিনব এবং পরিপূর্ণভাবে মানবতার অনুকূল। শত্রুকে ভালবাসিয়া এবং নিজে স্বয়ং বিশ্বাসের জন্য অশেষ দুঃখ বরণ করিয়া বিপক্ষের মনে বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টাকে ঠিক জোর করিয়া বাধ্য করিবার পর্যায়ে ফেলা যায় না। যদি কেহ মহাত্মাজীর উপবাসে ভীত হইয়া তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য কিছু করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে মহাত্মাজীর প্রভাব তাঁহার উপর জয়ী হইয়াছে, নহিলে কোনও লোকের আব্দারে অথবা ভয় দেখানতে কেহ নিজের স্বার্থ এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে না।

এই সম্পর্কে মহাত্মার উপবাসের প্রসঙ্গটা মনে রাখিতে হইবে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হইলে, দেখা গেল যে, হিন্দু সমাজের অনুন্নতদের পৃথক রাষ্ট্রীক অধিকার দিয়া, হিন্দুসমাজকে দুইটি স্থায়ী বিবাদমান দলে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হিন্দু সমাজের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই, ইহাকে হিন্দুদের ঐক্য, শক্তি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা শুধু ইহাই ছিল না যে, ইহাতে অনুন্নতদের সংখ্যার অনুপাতে তাঁহাদিগকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল, অথবা বর্ণ হিন্দুদের প্রতি কোনও অবিচার করা হইয়াছিল।

আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায়, বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে বিভিন্ন নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহ জাতীয়তা ও গণতান্ত্রিকতার প্রতিকূল হইবে এবং ইহাতে প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তার বিরোধী সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়িয়া উঠিবে। হিন্দুরা কোনও দিনই সাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করেন নাই। কিন্তু, তাঁহাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, যখন সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাকেই দেশের উপর চাপান হইল এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শক্তিই যখন রাষ্ট্রে প্রাধান্য ও শক্তি লাভের একমাত্র উপায় রহিল, তখন হিন্দুসমাজ কোনও কৃত্রিম উপায়ে বিভক্ত হইলে নানাপ্রকার পরস্পর বিরোধী স্বার্থের উদ্ভব হইয়া সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পঙ্গু করিয়া ফেলিতে পারে, হিন্দু নেতারা এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ণ হিন্দুদের অমতে এবং অনিচ্ছায় তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে অনুন্নতেরা অধিকার পাওয়ায়, উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব বাড়িয়া যাইত এবং অসন্তোষ ও আন্দোলনের ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থ লাভ করা যায় দেখিয়া অনেকে সমাজের অভ্যন্তরে অসন্তোষ ও বিদ্বেষকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিত। ইহার ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রে হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু, এই রাষ্ট্রিক অসুবিধা ব্যতীত অন্য কথাও বিবেচনা করিবার ছিল, এবং তাহার মূল্য রাষ্ট্রীক অধিকার বা সুবিধার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে অনেক অন্যায়, অবিচার, কুপ্রথা, কুসংস্কার এবং বৈষম্য আছে; পৃথিবীর অন্যান্য সমাজেও অল্পাধিক পরিমাণে এই সকল দোষ আছে। বর্ত্তমানের আদর্শস্থানীয় সভ্য অনেক সমাজে অতীতে নানাপ্রকার দোষ বর্ত্তমান ছিল; অনেক দিনের দুঃসাধ্য চেষ্টার ফলে, তাহার অনেকগুলির সংশোধন হইয়াছে এবং এখনও অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছে। হিন্দু সমাজেরও যে সকল দোষ ত্রুটি আছে, তাহার সংশোধনের জন্য নিরলস চেষ্টার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এমন কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত নহে যাহার ফলে সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থায়ীভাবে নষ্ট হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে মর্য্যাদার বৈষম্য থাকায়, সমাজের অভ্যন্তরে অনেকদিন হইতে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের ভাব ঘনাইতেছিল, এবং বর্ণহিন্দুদের অদূরদর্শিতায় অনুন্নতদের একটী বৃহৎ অংশ এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু, হিন্দু সমাজের মধ্যে যে সংস্কার-প্রচেষ্টা দ্রুত ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই অসন্তুষ্ট

সম্প্রদায়ের মনোভাব অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। হিন্দু সমাজের বহুবিধ ত্রুটি এবং গলদ সত্ত্বেও এবং আপাতদৃষ্ট বৈষম্যের মধ্যেও যে নিগূঢ় ঐক্য সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহাই হিন্দুকে অতীতে অনেক ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং তাহাই তাহার ভবিষ্যতে বড় হইবার একমাত্র সুরক্ষিত শক্তি। কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই ক্ষুব্ধ মনোভাবের অনুকূল কোনও কৃত্রিম স্বার্থের সৃষ্টি হইলে হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত বড় হইবার শক্তিকে খণ্ডিত করা হইত।

মহাত্মা যখন উপবাস করিয়াছিলেন, তখন কোনও প্রকার চুক্তিতে সম্মত হওয়া, অথবা কাহারও জন্য কিছু বেশী সুবিধা আদায় করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দু সমাজকে খণ্ডিত করিবার চেষ্টাকে জীবন পণে বাধা দিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। মহাত্মার এই সঙ্কল্পে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, যাঁহারা বহু লোকের সামাজিক অধিকারকে অন্যায় ভাবে অস্বীকার করিতেছিলেন, নিজেদের ব্যবহারের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন, এবং মহাত্মার জীবন রক্ষার জন্য অবিলম্বেই কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্যদিকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতারাও এতটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে তাহা এতটা বাতাস পাইয়াছিল যে, মহাত্মাজীর ন্যায় লোকের এই প্রকার জীবনপণ চেষ্টা ব্যতীত তাঁহারা একথা কিছুতেই বুঝিতে চাহিতেন না যে, হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য আছে অথবা বর্ণ হিন্দুদের সহিত তাঁহাদের স্বার্থ অভিন্ন।

এই সময়ে পুণায় সমাজের উভয় প্রান্তের মধ্যে যে মিটমাটের চেষ্টা হইল, কে কত বেশী সুবিধা পাইলেন তাহা তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাতে হিন্দু সমাজের অন্তর্বিরোধের লোপ হয়, তাহাই ছিল লক্ষীভূত বিষয়। বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, বর্ণ হিন্দুদের ইহা প্রমাণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অপর পক্ষের দ্বারা বাধ্য না হইয়াও তাঁহারা অনুন্নতদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে পারেন। তৃতীয় পক্ষের শালিসী অপেক্ষা এইরূপ মিটমাটের মূল্য যে অনেক বেশী, তাহা সম্ভবতঃ কেহ অস্বীকার করিবেন না।

পুণাচুক্তিতে হিন্দুদের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধের ভাব সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, সেকথা সত্য। কিন্তু ইহার ফলে যে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এক বৎসরেই হিন্দু সমাজকে মিলনের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়াছে এবং আশা করা যাইতে পারে, তাহার ফলে, আজ যাঁহারা স্বাতন্ত্র্য চাহিতেছেন, হিন্দুসমাজের ঐক্যের জন্য তাঁহারাও অদূর ভবিষ্যতে সমানই উদ্বিগ্ন হইবেন। এদিক দিয়া সকল হিন্দুর কাছেই পুণাচুক্তির একটা পবিত্রতা ও মর্য্যাদা আছে।

মহাত্মা যখন পুণাচুক্তির সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন তখন তাহা সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সম্মতিক্রমেই হইতেছে এবং সম্পূর্ণ-ভাবে নিখুঁত না হইলেও, তাহা হিন্দুসমাজের উভয় প্রান্তের মধ্যে মিলনসেতু গড়িয়া তুলিবে, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করা হইয়াছিল এবং তাঁহার জীবনপণ চেষ্টায়ই মাত্র ইহা সম্ভব হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে ইহাকে পবিত্র বলিয়া উল্লেখ করা এবং অন্য লোকেরও তাহা মানিয়া নেওয়া, বিশেষ কিছু দোষের নহে। নীতিতে এবং বিষয়বস্তুতে ব্যাপারটি পবিত্র হইলেও, তাহার কোনও বিশেষ স্থানে অথবা খুঁটিনাটিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে, এবং তাহার সংশোধনের চেষ্টাও অসঙ্গত এবং সামঞ্জস্যহীন নহে।

পুণাচুক্তিতে বাঙ্গালী বর্ণহিন্দুদের মত ঠিকভাবে গ্রহণ করা হয় নাই, এবং তাঁহাদের উপর কিছু অবিচার করা হইয়াছে, সেকথা সত্য।

নিখিল ভারতীয় ব্যাপার সমূহে যে বাঙ্গালীদের উপেক্ষা করা হইতেছে, তাহা অনেকদিন হইতে অনেক ঘটনায় লক্ষ্য করা যাইতেছে। এই ব্যাপারটিও তাহার অন্তর্গত, এইমাত্র। মহাত্মাজীরও বাংলার প্রতি বিরূপতা আছে, কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করেন। মহাত্মা কাহারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব, বিরূপতা অথবা অন্য কোনও অন্যায় মনোভাব পোষণ করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস্য নহে, এবং এরূপ ধারণা মহাত্মার চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। যাঁহারা মহাত্মার চারিপাশে থাকিয়া তাঁহার সকল কাজের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করেন এবং সে সকল সম্পাদন করেন, হইতে পারে,

তাঁহারা বাংলার উপর তেমন সন্তুষ্ট নহেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থার ফলে, মহাত্মার কার্য্যেও বাংলার প্রতি কিছু কিছু উপেক্ষা বা অবিচার দৃষ্ট হইতেছে। অবশ্য নিখিল-ভারতীয় ব্যাপার সমূহে বাঙ্গালীদের উদ্যম ও আগ্রহের অভাবে, অথবা অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় এই সকল গুণ বাঙ্গালীদের অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, অথবা সময় মত সকল ব্যাপারে অন্যদের ন্যায় উদ্যমের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না পারায় এরূপ ঘটিতেছে কিনা, শুধুমাত্র অপরের প্রতি দোষারোপ না করিয়া, তাহাও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবার এবং নিজেদের দোষ থাকিলে, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে।

বাংলার এবং বাংলা সম্পর্কিত সকল ব্যাপারেই বাঙ্গালীদের হাত এবং মতামতের মূল্য থাকা নিশ্চয়ই অত্যাবশ্যক। ইহা না থাকিলে, কোনও প্রকারের সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বাধীনতায় আমাদের কিছুমাত্র লাভ হইবে না। পুণাচুক্তি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যাপারে বাঙ্গালীদের পুরাপুরি বা একেবারেই মত গ্রহণ করা হয় নাই, সে সকল ব্যাপারে অন্যায় এবং অবিচার হইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহাতে সেরূপ না হইতে পারে, সেজন্য বিশেষভাবে আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। অবশ্য বাঙ্গালীদের মত নেওয়া হয় নাই, শুধুমাত্র এই কারণে পূর্ব্বকৃত কোনও ভাল জিনিস দূরে নিক্ষেপ করা সুবিবেচনার কাজ হইবে না।

বাংলার সমস্যাসমূহ সমাধান করিবার, বাংলার সর্ব্বপ্রকার কাজ চালাইবার এবং বাঙ্গালীদের নেতৃত্ব করিবার মত যোগ্য নেতা সব সময়েই বাংলায় থাকা উচিৎ; যদি কোনও সময়ে তাহা না থাকে, তবে তাহাকে দেশের পক্ষে বিশেষ দুর্দ্দিন বলিতে হইবে। সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব করিতে পারেন, মাঝে মাঝে এমন নেতার আবির্ভাবও আমরা আশা করিতে পারি। কিন্তু, তাই বলিয়া অবাঙ্গালী কোনও যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিব না, তাঁহাদের ভাল কথাও শুনিব না অথবা বাংলার কোনও ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিব না, ইহা ভাল অথবা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। এ সম্বন্ধে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তাঁহাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে ঠিকই বলিয়াছেন যে, অন্যপ্রদেশ হইতে নেতারা আসিয়া বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেই, তাহা বাংলার পক্ষে অপমানকর অথবা সেই সকল নেতার অন্য উদ্দেশ্যের পরিচায়ক হয় না। বাংলা অনেকদিন ধরিয়া সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে। এখন যদি দেশের অন্যান্য অংশের লোকেরা অধিকতর প্রভাব পরিচালনা করেন তবে, তাহার জন্য হিংসা পোষণ করা অমার্জ্জনীয় সঙ্কীর্ণতা। যদিও প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর নিজ প্রদেশের অবনতির প্রকৃত কারণ চিন্তা করা এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

কিন্তু, এসকল কথা ব্যতীত সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পত্রের সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিকর এবং শোচনীয় অংশ হইতেছে, ইহার বিদ্রূপের সুর। এই বিদ্রূপ মহাত্মাকে, তাঁহার চরিত্রের সাধুতাকে এবং তাঁহার নিরুপদ্রব আন্দোলনকে এবং হরিজনের উন্নয়নের চেষ্টাকে স্পর্শ করিয়াছে। বাংলাদেশের অনেক সমস্যা আছে, সেকথা সত্য, এবং তাহার সমাধানের জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই অবহিত ও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বাংলার অনুন্নতদের সমস্যাও একটি প্রধানতম সমস্যা, তাহার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই চেষ্টায় বাংলার অন্যান্য সমস্যার আপনা হইতে অবসান না ঘটিলেও, সে চেষ্টাকে লঘু করিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় নহে। দশটি অসুবিধার মধ্যে যিনি একটি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার কার্য্যের দ্বারা অপর নয়টির কোনও সুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁহার কার্য্য নিন্দনীয় বা বিদ্রূপের যোগ্য হইতে পারে না এবং যাঁহারা কিছুই করিতেছেন না তিনি তাঁহাদের সমস্থানীয় হইতে পারেন না।

পুণাচুক্তির সংশোধন

পুণাচুক্তি সম্বন্ধে আমাদের মতামত পুনঃপুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা সংশোধনের চেষ্টা ফলদায়ক হইবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু, এই চেষ্টায় যে অসন্তোষ এবং অন্তর্বিরোধের উদ্ভব হইবে তাহাতে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান মিলন প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যাঁহারা ইহার সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই কথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলেও

বর্ণহিন্দুদের অতি সামান্যই লাভ হইবে। ২৫০ জন সদস্যের সভায় তাঁহাদের মোট ৮০টি পদ থাকিবে। ইহার মধ্য হইতে অনুন্নতদের কিছু অংশ দিতেই হইবে। কাজেই, প্রাদেশিক সরকারের উপর সংখ্যার জোরে তাঁহারা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইবেন না। এরূপ অবস্থায়, ২।১টি পদের কমতিতে বা বাড়্তিতে তাঁহাদের খুব বেশী লাভ লোকসান কিছু হইবে না।

আমাদের দেশে মানুষের জীবনের মূল্য

পরাধীন দেশে মানুষের জীবনের মূল্য অধিক নহে। অন্যান্য দেশে যে-সকল ব্যাধির হাত হইতে মানুষ সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছে, আমরা এখনও তাহাতে লাখে লাখে প্রাণ দিতেছি, এবং তদপেক্ষাও অধিকসংখ্যক লোক ভুগিতে ভুগিতে নিরুদ্যম ও সর্ব্বশক্তিহীন হইয়া থাকিতেছি। এসকল রোগের প্রতিরোধ যে সম্ভব এবং আমাদের বাঁচিবার পক্ষে তাহার প্রয়োজন যে অপরিহার্য্য, অনেকদিনের রোগ সহিবার অভ্যাসে সেকথা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছি। কাজেই, এসকল বিষয়ে আমাদের মনোযোগ যতই আকৃষ্ট হইবে, আমাদের সচেতন হইবার সম্ভাবনা ততই বাড়িয়া যাইবে।

কলিকাতা রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতায় ডাঃ এলিস্, এম, হেড্ওয়ার্ডস্ এদেশে প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর অতিশয় আধিক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সরকারের ঔদাসীন্য এবং প্রচারের অভাবকেই তিনি এজন্য প্রধানতঃ দায়ী করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে প্রতি হাজারে প্রসূতি মৃত্যুর হার ৪ জন হওয়ায়, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের উদ্বেগের কারণ হইয়াছে—আর বাংলায় ৬৯টি গ্রামের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, এখানে প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ৫০। ভারতের অন্যান্য অনেক স্থান অপেক্ষা এবিষয়ে বাংলার অবস্থা আরও অনেক বেশী শোচনীয়। সমগ্র ভারতের হার ২৪½ জন। সন্তান প্রসবে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২০ হাজার প্রসূতি মারা যায়।

১৯৩০ সালে ভারতে প্রতি হাজারে ১৮০.৩৩ জন শিশু মারা যায়; ঐ বৎসর ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০টি।

স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অপরাধ

১৯৩২ সালের পুলিশ শাসন বিবরণীর উপর সরকারী মন্তব্যে স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অপরাধ বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। কাউন্সিলে বিভিন্ন সময়ে এই বিষয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত সংখ্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। কেন এরূপ হয়, অথবা কোনটি ঠিক তাহা আমরা অবগত নহি। তবে, প্রকৃত অপরাধের সংখ্যা যে ইহার সবগুলি অপেক্ষাই অনেক বেশী, তাহা অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। এই সকল কারণের কথা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় বিবৃত করিয়াছি।

যাহা হউক, এই পাপ দমনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে, এরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং জনমত যে ক্রমেই বর্দ্ধিত পরিমাণে ইহার প্রতিকারেচ্ছু হইয়া উঠিতেছে সে কথা স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা কতকটা সান্ত্বনার কথা।

সৎকার্য্যে দান

কার্সিয়াংএর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্য-নিবাসরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য Calcutta Medical Aid and Research Societyর হাতে ৬০০০ ফিট উচ্চে, চতুর্দ্দিকের-সুন্দর দৃশ্য বিশিষ্ট স্থানে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা মূল্যের সুবিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছেন।

বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগ যেরূপ ভয়াবহ গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, তাহাতে অনেক স্বাস্থ্য নিবাসের প্রয়োজন আছে। যক্ষ্মারোগের বিস্তৃতি রোধ করিতে হইলে রোগাক্রান্তদের সমাজ হইতে পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অদূর ভবিষ্যতে এরূপ সম্ভাবনা না থাকিলেও, এই প্রকারের সকল চেষ্টাই দূর ভবিষ্যৎকে নিকটবর্ত্তী করিবে।

অন্যান্য দেশে বড়লোকদের অনেক বড় বড় দামে সে সকল দেশের অনেক অভাব দূর হইয়াছে। আমাদের দেশে ধনীলোকদের মধ্যে এরূপ মনোভাব এখনও গড়িয়া উঠে নাই। এই জন্য, যে অল্পসংখ্যক লোক সাধারণ কার্য্যে দান করেন, তাঁহাদের দানের মূল্য অনেক বেশী।

আমরা রায় বাহাদুরের এই মহানুভবতাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করি।

হিন্দুর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবীগঞ্জে প্রায় একহাজার নমঃশূদ্র বর্ণহিন্দুদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন, ২রা অক্টোবরের ইউনাইটেড্ প্রেসের—সংবাদে এরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহাতে এরূপ না ঘটে, তাহার জন্য হিন্দু সভা তৎপর হইয়াছিলেন। পরে কি ঘটিয়াছে, সংবাদ পাই নাই।

আরও কয়েকবার এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম্মীদের সময়োচিত চেষ্টায় হিন্দু সমাজ এই প্রকার আকস্মিক ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের অনেক পূর্ব্বপুরুষ এইরূপে হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সমাজের মধ্যে কতকটা জাগরণ আসায়, এসকল ব্যাপারের কিছু কিছু প্রতিকারের চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য যেখানে অল্প সংখ্যক লোকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, সেখানে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না, এবং তাহা প্রতিরোধ করিবারও কোনও চেষ্টা হয় না। এরূপ নিঃশব্দ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ দেশের নানাস্থানে এখনও চলিতেছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অনুন্নতদের স্থান এতটা হীনতাসূচক এবং তাঁহাদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের ব্যবহার অনেকস্থলেই এতটা অবিবেচনাপ্রসূত এবং ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক যে, তাহাতে যে কোনও আত্মসম্মানজ্ঞান বিশিষ্ট লোকের বিরক্তির কারণ ঘটিতে পারে। এ বিষয়ে বর্ণ-হিন্দুদের যে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব কোনও প্রকারে লঘু না করিয়া, আত্মদোষ সংশোধনের জন্য তাঁহাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে।

কয়েকবারই দেখা গিয়াছে যে, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যেই কোনও কোনও স্থলে এই প্রকার বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইহাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উন্নতির জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে, আত্মসম্মান-বোধ, সঙ্ঘবদ্ধতা, এবং সর্ব্বতোমুখী উন্নতির প্রয়াস প্রভৃতি গুণ অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা ইহাঁদের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল গুণ অনুরূপ পরিমাণে দেখা দিলে, এবং বর্ণহিন্দুরা নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ না হইলে; অন্য সকলের মধ্যেও ব্যাপকভাবে এই প্রকার অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে। এ বিষয়ে অবশ্য অন্যপক্ষেরও কিছু কিছু ভাবিবার কথা আছে।

যাঁহারা হিন্দুদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বা কোনও শ্রেণী বিশেষের আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হন তাঁহাদের জানা দরকার যে, কোনও সমাজেই পরিপূর্ণ অধিকার ও ব্যবহার সাম্য নাই। বাহির হইতে কোনও সমাজের ভিতরের পরিচয় সঠিক পাওয়া যায় না; ধর্ম্মান্তর গ্রহণে যে সকল সুবিধা পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রথমে মনে হয়, অনেক ক্ষেত্রেই পরে সে ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তাঁহাদের ক্ষোভের কারণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে নয়, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অথবা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী অন্য কতকগুলি লোকের অথবা শ্রেণীর বিরুদ্ধে। কাজেই, এরূপ ব্যাপারে কারণ এবং ব্যবস্থার ঐক্য থাকিল না।

আমাদের কোনও সামাজিক ব্যবস্থা, অন্যায়, অপমান-জনক বা অকল্যাণকর হইলে, তাহার সহিত সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া এমন কি জীবনপণ করিয়াও লড়া মানুষোচিত। কিন্তু, তাহার জন্য ধর্ম্মত্যাগ করিতে যাওয়া কাপুরুষতা, অন্যায় এবং অমানুষোচিত। ভারতবর্ষ পরাধীন এবং অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনগ্রসর বলিয়া যদি কেহ, এই দেশের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া, দেশত্যাগকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, তাহা যেমন সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না, কোনও অসুবিধার জন্য সমাজ বা ধর্ম্মত্যাগও তেমনই সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না।

সর্ব্বোপরি আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল্য জাগতিক সুবিধা অসুবিধা অপেক্ষা অনেক অধিক। কোনও প্রকার সাংসারিক কারণে ধর্ম্মত্যাগ কোনও প্রকারের ধর্ম্ম, বা নীতির অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক মূল্য বাদ দিয়াও একথা বলা যায় যে, ধর্ম্ম ও সমাজ ব্যবস্থার সহিত আমাদের মনের অনেক নিগূঢ় ভাব ও অভ্যাসের সম্পর্ক

এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহার সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন হইলে, যে আঘাত পাইতে হয়, তাহার রূঢ়তা পূর্ব্বে কল্পনাতীত থাকে।

এই সকল কথা ব্যতীত বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আর একটা কথা এই বলিবার আছে যে, হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অন্যায় ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য দেশময় আন্দোলন এবং চেষ্টা চলিয়াছে।* আশা করা যাইতে পারে যে, ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার ক্রটি বিচ্যুতি হইতে মুক্ত হইয়া সকল মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে স্বীকার করিবার মত শক্তি লাভ করিবে।

যাঁহারা আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষ বেদনাদায়ক মনে করেন, সংস্কার আন্দোলনের যাহাতে শক্তি বৃদ্ধি হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের তাহাই করা উচিত।

যদি কেহ এই কথা মনে করেন যে, যে সকল লোকের অন্যায় আচরণে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে, সেই সকল লোক জব্দ হইবেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, যে-সকল লোক আজও অন্যায় আচরণ করিবার জন্য জেদ করিতেছেন, ধর্ম্ম বা সমাজের ক্ষতিতে তাঁহারা বিচলিত বা জব্দ হইবার লোক নহেন।

সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়

১৯৩২ সালের পুলিশ শাসন বিবরণীতে প্রকাশ যে, সশস্ত্র পুলিশবাহিনীতে নমঃশূদ্রদিগকে গ্রহণ করিবার যে পরীক্ষা চলিতেছিল, তাহা সফল হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের যোগ্য লোকদিগকে পরে নিরস্ত্র বিভাগে গ্রহণ করা হইবে।

বাংলার জনসমাজের সর্ব্বস্তরেই বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সরকারের অধীনে যে সকল অবাঙ্গালী চাকুরি করেন, তাঁহাদের স্থলে উপযুক্ত বাঙ্গালীরা গৃহীত হইলে, এই সমস্যার আংশিক সমাধান হইত।

বাংলার সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর সমস্ত লোক এবং নিরস্ত্র বিভাগেরও অধিকাংশ লোক বাংলার বাহির হইতে সংগৃহীত হয়। বাংলা হইতে এই সকল লোক সংগৃহীত হইলে এখানকার অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত অধিকাংশ বেকার লোক কাজ পাইতেন। ইহা সমাজের পক্ষে কম লাভের কথা হইত না।

নমঃশূদ্রদিগকে লইয়া পুলিশবাহিনী গঠনের পরীক্ষা কেন বিফল হইল, তাহাদিগকে এদিকে আকৃষ্ট করিবার ও উপযুক্ত শিক্ষাদি দিবার জন্য কি চেষ্টা হইয়াছিল, প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শারীরিক উৎকর্ষ, সাহসিকতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি গুণে নমঃশূদ্রেরা বাঙ্গালার একটি শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায়, ইহাঁদের আর্থিক অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই চেষ্টা বিফল হইবার কারণ একটু দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে। যদি ধরিয়া নেওয়া যায়, নমঃশূদ্রদিগকে লইয়া এই পরীক্ষা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলেও বাংলার বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায়কে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

নিজের দেশের সকল কাজ ব্যবস্থা করিবার এবং সম্পাদন করিবার অধিকার ও দায়িত্ব সকল দেশের লোকেরই আছে। এই দায়িত্ব পালন করিতে না পারা বিশেষ লজ্জার কথা। বাঙ্গালীরা জীবনের নানা বিভাগে কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। কোনও বিশেষ কার্য্য করিবার পক্ষে তাঁহাদের জাতিগত অযোগ্যতা আছে, একথা সহসা আমরা মানিয়া লইতে পারিব না।

ভারতের পল্লীজীবনে স্বাস্থ্য

ভারতবর্ষের পল্লীজীবনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ফলে Major General Sir John Megaw যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা বিশেষ নৈরাশ্যজনক।

সমগ্র ভারতের পল্লীবাসীদের শারীরিক অবস্থা ধরিলে, দেখা যায় যে, মাত্র শতকরা ৩৯ জন লোক সুপুষ্ট, ৪১ জনের পুষ্টি নিকৃষ্ট ধরণের এবং অবশিষ্ট ২০ জন সাতিশয় অপুষ্ট।

অত্যন্ত নিকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট খাদ্যই এইরূপ শারীরিক অবনতির কারণ। গ্রামের অধিকাংশ লোক দিনে তিনবার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্যের পরিমাণ

অপেক্ষা তাহার পুষ্টিকারিতার অভাবই এই দুর্গতির কারণ।

পল্লীবাসীদের সাধারণ খাদ্যের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, এই উক্তির সহিত তাঁহারা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিবেন। আমরা সাধারণতঃ এরূপ অসার খাদ্য গ্রহণ করি যে, জেলের খাদ্যে কয়েদীদের শারীরিক ওজন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

রোগ সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন যে, ভারতের পল্লীসমূহে যক্ষ্মারোগ বহুব্যাপক। এ বিষয়ে বাংলা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব এবং বিহার উড়িষ্যার অবস্থা বিশেষভাবে শঙ্কাজনক।

আমরা সাধারণতঃ যাহা মনে করি, সিফিলিস্ এবং গণোরিয়া রোগের ব্যাপ্তি তদপেক্ষা অনেক অধিক। ইহাতে বাংলা ও মাদ্রাজ সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। যাহারা জীবনের কোনও না কোনও সময়ে সিফিলিসে আক্রান্ত হয়, এরূপ লোকের সংখ্যা ১০০ জনের মধ্যে ১০-১৫।

ইহা আমাদের পক্ষে গভীর লজ্জার কথা। ইউরোপীয় সমাজের দুর্নীতি এবং আমাদের সুনীতি সম্বন্ধে আমাদের মনে মনে যে গর্ব্ব আছে, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে, তাহার ভিত্তি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে।

মেয়েদের প্রথম স্বামী সহবাস এবং জননী হইবার বয়স যথাক্রমে ১৪ এবং ১৬। বাল্যমাতৃত্ব এবং অকাল পত্নীত্বের কুফল আমাদের সমাজে নানা আকারে বিশেষভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। তবে, কিছু আশার কথা এই যে, এই বয়স ক্রমেই পিছাইয়া যাইতেছে।

খাদ্যের মোট পরিমাণের তুলনায়, জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধিই আমাদের দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে সার জন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছেন।

(১) ভারতীয়েরা অত্যন্ত অসার খাদ্যে বর্দ্ধিত।

(২) গড় আয়ুষ্কাল যাহা হইতে পারিত বর্ত্তমানে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র।

(৩) প্রতি পাঁচটি গ্রামের মধ্যে একটিতে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব ঘটে।

(৪) কলেরা, প্লেগ, বসন্ত ও মহামারী অত্যন্ত সাধারণ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে।

(৫) উচ্চ মৃত্যুহার সত্ত্বেও, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের তুলনায়, জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে।

শিক্ষিত ভারতীয় মাত্রেরই এসকল বিষয়ে মনযোগ প্রদান ও প্রতিবিধানে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

রাজা রামমোহন রায়

একশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রিষ্টলয়নগরে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল। এই একশত বৎসরে আমাদের জাতীয় জীবনের গতি এবং রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রথম সূচনা করিয়াছিলেন রামমোহন। আমরা আজ যে পথে যাত্রা করিয়া যেদিকে যাইতে চাহিতেছি, সেপথে প্রথম পদক্ষেপ তিনিই করিয়াছিলেন। স্বাদেশিকতা, মনীষা, যুক্তিকুশলতা, সত্যপ্রিয়তা, সর্ব্ববিধ সংস্কারের জন্য সদাজাগ্রত সচেষ্টতা প্রভৃতি গুণ, হয়ত অনেক বড়লোকের প্রতি আরোপ করা যাইতে পারে; কিন্তু রামমোহন রায়ের চিন্তা, চেষ্টা এবং কার্য্য ভারতের সমগ্র ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তিনি যে ভবিষ্যৎকে সূচিত করিয়াছিলেন, শতবর্ষ ধরিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে তাহার ক্রিয়া চলিলেও, আজও তাহা সম্পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে নাই।

বিভিন্ন দেশের, জাতির এবং ধর্ম্মের বহু শ্রেষ্ঠ এবং গুণী লোক এ পর্য্যন্ত তাঁহার নানাবিষয়ক গুণের যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা সকল ভারতবাসীরই গৌরবের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার ন্যায় মনীষাসম্পন্ন পুরুষ সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডে আর কেহ ছিলেন না। তিনি সকল দেশের সকল কালের সর্ব্বপূজ্য মহত্তম ব্যক্তিদের সহিতই তুলনীয় এবং সমস্থানীয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

পরবর্ত্তীকালে আমাদের দেশে যে সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে নূতন কর্ম্মক্ষেত্র, নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ এবং নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন, রামমোহনের নিকট তাঁহাদের সকলেরই অপরিশোধ্য ঋণ রহিয়াছে, এবং তাঁহাদের সকল কাজের পশ্চাতে রামমোহনের শুভচেষ্টার শক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে।

অন্যান্য প্রাচ্যদেশে যে সকল লোকের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়া বড় হইয়াছেন, সে সকল লোকের সহিত রামমোহনের একটি বড় পার্থক্য রহিয়াছে। রামমোহন রায় যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করাকে আমাদের মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া জাতির ভাগ্য সেই পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা জগতে বিশেষ প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচ্য দেশবাসীরা বর্ত্তমানের ন্যায় অধিক সংখ্যায়, ইউরোপের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়া তাহার শিক্ষাদীক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এই পথ আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিবার পক্ষে সেদিন সম্মুখে কোনও আদর্শ ছিল না। সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং কালান্ত-প্রসারী দূরদৃষ্টি দিয়া সেদিন ভবিষ্যৎকে দেখিতে হইয়াছিল।

দেশের নানাস্থানে রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে; বড়দিনের সময় কলিকাতায় এই উৎসব উপযুক্ত সমারোহে এবং শোভনতার সহিত সম্পন্ন হইবে। ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়েরা এবং তাঁহাদের ব্রিটীশ বন্ধুরা রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে লণ্ডনে নানাপ্রকার উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রিটনে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। এই তীর্থযাত্রীর দল এখানকার পুরকর্ত্তৃপক্ষদিগের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন এবং এখানে নানাপ্রকারে রাম-মোহনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রার্থনাদির জন্য যে সভা হয় তাহাতে ব্রিটনের মেয়র ও অন্যান্য খ্যাতনামা ভারতবাসী ও ইংরেজ, ব্যক্তিগত ভাবে এবং নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

ধর্ম্মের দিক দিয়া রামমোহন সংস্কারমুক্ত, নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন সাম্য চাহিয়াছিলেন। এদিক দিয়াও তিনি সকল ধর্ম্মের লোকের নিকট পূজ্য।

আমরা বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে, তাঁহার মৃত্যুর শতবর্ষ পরে সমগ্র দেশবাসীর সহিত মস্তক অবনত করিতেছি।

ভি, জে, প্যাটেলের মৃত্যু

জেনেভায় বিশিষ্ট কর্ম্মী ও দেশভক্ত ভি, জে, প্যাটেলের মৃত্যুতে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্র হইতে একজন প্রভাবশালী ও অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের তিরোভাব ঘটিল। নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, আত্মমতে দৃঢ়তা, ভয়ে অথবা লোভে কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত না হওয়া প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল। আইন সভার সভাপতিরূপে তিনি যে নিরপেক্ষতা, তেজস্বিতা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে।

নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়াও মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদেশে ভারতের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য এবং এখানকার প্রকৃত অবস্থার কথা বাহিরে প্রচার করিবার জন্য যেরূপ উদ্যমের সহিত তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা একজন যুবকের পক্ষেও প্রশংসার বিষয় হইতে পারিত। অন্যান্য দেশের সঙ্গে যাহাতে ভারতবর্ষের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাহার উদ্দেশ্যে তিনি আয়র্লণ্ডে এবং অন্যত্র সাধারণ মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা ও অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। বিখ্যাত লেখক এবং ভারত-বন্ধু শ্রীযুক্ত জে, টি, সাণ্ডার্ল্যাণ্ড এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে যে কয়জন বিখ্যাত ভারতবাসী আমেরিকায় গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই আমেরিকার জনসাধারণের উপর প্যাটেলের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন নাই।

দেশবাসীর উপর তাঁহার যে কতটা প্রভাব ছিল, দেশব্যাপী শোকোচ্ছাসে তাহা অনেকটা বুঝা গিয়াছে।

ডাঃ অ্যানি বেশান্টের মৃত্যু—

আদর্শের জন্য যাহারা পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ এবং লৌকিক ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন, মনস্বিনী অ্যানি বেশান্ট পৃথিবীর সেই সত্য-সন্ধানীদের অন্যতম। আধ্যাত্মিক সত্য লিপ্সাই যদিও তাঁহাকে ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, তথাপি এই দেশের চিন্তা ও রাজনীতিক জগতে

তিনি যে চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে বিলীন হইবার নহে। ১৯১৭ সালে তিনিই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভানেত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী কর্ম্ম-জীবনের অধিকাংশ সময়, ভারতে থাকিয়া এই দেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনসেতুর কাজ করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনা এবং সংবাদপত্র পরিচালনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি এবং কল্যাণ কামনা করি।

পরলোকগত কবি কামিনী রায়

আমাদের দেশে সকল দিক দিয়া নারীদের জীবন এত বাধাগ্রস্ত যে, বিশেষ প্রতিভার শক্তি ব্যতীত, খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কবি কামিনী রায় এই প্রকার অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। যাঁহার কবিতা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আধুনিক পাঠকদের পর্য্যন্ত সমভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহার কবিখ্যাতি যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

তাঁহার "আলো ও ছায়া", "মাল্য ও নির্ম্মাল্য", অম্বা, "দীপ ও ধূপ" প্রভৃতি পুস্তক পাঠক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে।

লিপিকুশলতা ব্যতীত সমাজসেবার আগ্রহও তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্টতা ছিল। নারী-প্রগতিমূলক সকল কাজের সহিতই তাঁহার যোগ ছিল।

তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাসাহিত্যের, বাঙ্গালী জাতির এবং বাংলার নারীসমাজের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

বাঙ্গালী যে জাতির শ্রেষ্ঠ লোকদের সম্মান ও স্মৃতিপূজা করিতে শিখিয়াছে, ইহা বিশেষ আশার কথা। ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকারের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া উদ্যোক্তারা ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে-সকল মহাপুরুষ অতীতে আমাদের জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, আধুনিক বাংলার জাগ্রত চিত্ত, তাঁহাদের সন্ধান করিবার ও তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার মত শক্তি লাভ করিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্প পরেই ডাঃ সরকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রামমোহনের প্রারব্ধ কার্য্য সম্মুখে অগ্রসর করিবার ভার তাঁহারই উপর পতিত হইয়াছিল।

ডাঃ সরকার যে স্বাধীন চরিত্রের লোক ছিলেন, বিদ্বান ও দানশীল ছিলেন, বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তিনি যে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, চিকিৎসক সেরিফ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে দেশের যে সেবা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি দেশবাসীর নিকট স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তিনি যে বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার পথ সুগম করিয়াছিলেন, রামমোহনের মনে ভবিষ্যৎ ভারতের যে কল্পনা ছিল, সর্ব্বপ্রথম তাহাকে রূপ দিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে।

মাড়োয়ারী মহিলা সম্মিলন

দেশের মধ্যে যে নব চেতনা আসিয়াছে, তাহার স্পন্দন আমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই অনুভূত হইতেছে। শিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে মাড়োয়ারীরা এখনও যথেষ্ট পশ্চাদ্বর্ত্তী, আমরা অনেকে এরূপ মনে করিয়া থাকি। তাঁহাদের মধ্যে নারী-জাগরণের চেষ্টার এই প্রকার সাফল্য দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইতে পারে, এবং প্রগতির ধারা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

নারীরা জনশক্তির অর্দ্ধাংশ। চিন্তার দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা সেবার দ্বারা সমাজের ও জাতির উন্নতিবিধান করিবার ক্ষমতা ও অধিকার, তাঁহাদের, পুরুষদের সমানই আছে। গতি-বিধির স্বাধীনতা, ন্যায় সঙ্গত বাক্য ও কর্ম্মের স্বাধীনতা, এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বাধীনতা সব দেশের পুরুষদের আছে। এই সকল অধিকার ঠিক এই পরিমাণে ভোগ করিবার পরিপূর্ণ অধিকার সব দেশের নারীদেরও থাকা উচিত।

বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা আমাদের নারীদের এই সকল স্বাভাবিক অধিকার অস্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আমরা একথা ভুলিয়া গিয়াছি যে, নারী এবং পুরুষ উভয়কে লইয়া সমাজ গঠিত; উভয়ের সম্মিলিত মঙ্গলেই মাত্র সমাজের মঙ্গল হইতে পারে। একজনকে খর্ব্ব করিয়া, অপরের যদি কিছু সুবিধাও হয়, তবে সে সুবিধা অন্যায় সুবিধা; তাহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, দাসত্ব এবং স্বাধীনতা লোপের ন্যায় অমঙ্গলকর মনুষ্যত্বের অপমানকর এবং আত্মার পক্ষে অবনতিকর আর কিছু হইতে পারে না। অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে একথা আমাদের মনে আঘাত করে না যে, অবরোধ প্রথা আমাদের পৌরুষ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ মনোভাব, যাঁহাদের আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, এমন নারীদের প্রতি অবিশ্বাস সূচিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনে অস্পৃশ্যতা এবং অবরোধপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাকর কলঙ্ক।

মাড়োয়ারী মহিলা সম্মিলন, সর্ব্বপ্রথম পর্দ্দা প্রথা উঠাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সকল নারীর মনোভাবকে উপযুক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন।

মহাত্মাজী ও সহশিক্ষা

কোনও পত্রিকার প্রতিনিধির সহশিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, সুপরিচালিত সহশিক্ষাকে তিনি ভাল এবং কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন।

জাপান, ভারত ও ল্যাঙ্কাসায়ারের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক

জাপান, ভারত সরকার ও ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিগণের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কীয় আলোচনা চলিতেছে; তাহার ফলে ভারতবর্ষ যে বিশেষ লাভবান হইবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। ভারত সরকার জাপানকে যে প্রকার সুবিধা দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা এদেশের বস্ত্র-শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। জাপানী প্রতিনিধিরা তাহাতে সম্মত হন নাই; তাঁহারা আরও চাহিতেছেন। কাজেই, মিটমাট হইলেও, ভারতের স্বার্থ কি ভাবে রক্ষিত হইবে, তাহা কতকটা অনুমেয়। এই মিটমাটে ভারতের একমাত্র স্বার্থ এই যে, জাপান ভারতের তুলার খরিদ্দার। এদিক দিয়া বাংলার অবশ্য কোনও লাভের সম্ভাবনা নাই। কারণ তুলা বাংলার ফসল নহে। অথচ, জাপানের সহিত যে সর্ত্তেই মিটমাট হউক বাংলার মোজা গেঞ্জী প্রভৃতি এবং অন্য প্রকার বস্ত্রশিল্প কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবেই। এদিকে বম্বের কলের মালিকগণের সহিত ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিগণের যে চুক্তি হইয়াছে, শিশু বস্ত্রশিল্পের উপর তাহার ফল ভাল হইবে না বলিয়া বাংলার কলের মালিকগণ ও অন্যেরা আশঙ্কা করিতেছেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বিতর্কিকা

আধুনিক বাংলার চিত্র-কলা

বিভাস নাগ

চিত্রশিল্প নিয়ে আলোচনা বাংলাদেশে যতটা হওয়া উচিত ততটা হচ্ছে না। সম্প্রতি বিচিত্রা' একটা পথ খুলে দিয়েছেন, যাতে করে শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ বক্তব্য খোলাখুলি প্রকাশ করতে পার্‌বেন। আমি হাক্‌সলির একথা মানিনে যে আর্ট নিয়ে যাদের কারবার কলম ধরতে গেলে তাদেরকে মুস্কিলে পড়তে হয়। তাঁরের দেশেই দৃষ্টান্ত আছে গ্যাব্রিয়েল রসেটি। রসেটি শিল্পী হিসেবে বড় কি কবি হিসেবে বড় ছিলেন তার মীমাংসা আজও হয়নি।

বাংলাদেশের কলাপদ্ধতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন শর্ম্মার প্রবন্ধটি পড়ে খুসী হলাম। এরূপ আলোচনা প্রচুর হোক, তবেই না বাংলাদেশে শিল্প-প্রচেষ্টার একটা সাড়া পাওয়া যাবে। মণিবাবুর সঙ্গে আমার একটু আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা আছে বঙ্গের আধুনিক কলাপদ্ধতি নিয়ে।

ত্রিশবছর আগে বাংলাদেশের নিজস্ব বল্‌তে পোটোদের চিত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখন চিত্রকলা অনেক অগ্রসর হয়েছে। আর অগ্রসর হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু মহাশয়দের চেষ্টাতেই। কিন্তু আধুনিক বল্‌তে মণিবাবু যাদের বুঝাতে চান, তাঁদের আমলে কি চিত্রশিল্পের খুব একটা বড় উন্নতি হয়েছে বলে মনে কর্‌ব? তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ কিম্বা নন্দলাল বসু থেকে কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন? অবনীন্দ্রনাথের 'কালবৈশাখী' 'বোধিদ্রুম ও তিসসরক্ষিতা' নন্দলালবাবুর 'গ্রাম্য পর্ণ কুটির'-এর মত একটা চিত্রও যদি সবাই মিলে তাঁরা বের করতে পারতেন তবে সত্যই আমাদের আনন্দিত হবার কারণ ছিল—এঁরা ভবিষ্যতে অনেক কিছু কর্‌তে পার্‌বেন। রেখায়, বর্ণ সমাবেশে, ভাবে তাঁদের ছবি আমাদের মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌ছে কৈ? তাঁদের ছবি দেখলে মনে হয়, পোটোদের আর তাঁদের মধ্যে কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধান; এই দুই দলের অন্তবর্ত্তী বুঝি কোন শিল্পীই ছিলেন না—না অবনীন্দ্রনাথ, না নন্দলাল বসু।

Perspective-এর কথাই ধরা যাক। মণিলাল বাবু ত বলে বস্‌লেন, "পারিপ্রেক্ষিক (perspective) কেবল জ্যামিতিতেই দেখানো সম্ভবপর হয়। ভারতীয় শিল্পীগণ এরূপ বিজ্ঞান দেখাতে চেষ্টা করেন নি।" তা হলে ছবিতে perspective দেখানো সম্ভবপর নয়? কেন? কষ্টসাধ্য বলে কি? না কি ভারতীয় শিল্পীগণ দেখাননি বলে? তাই যদি হয় তবে অবনীন্দ্রনাথের একটি কথার প্রতি মণিবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ছি। Perspective, Anatomy প্রভৃতি প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানগুলি শিল্পীদের শেখ্‌বার বস্তু হয়ে রইল।" তাছাড়া বাঙালীর চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "জোর করে তাকে দেড়শো দু'শো বছরের আগেকার চিত্র বিচিত্র করে নক্সাকাটা জোয়ালে জুড়ে দিতে গেলে ফল হবে বিপরীত রকম চর্ব্বিতচর্ব্বণ ব্যাপার।" মণিবাবুর 'ভারতীয় শিল্পীগণ'-এর অজুহাত টিক্‌ল কই? যাঁরা বাঙলার বিশিষ্টতা রক্ষা করে শিল্প-সৃষ্টি কর্‌ছেন সে-সব চিত্রকরদের নিকট আমার এই অনুরোধ শিল্পী-গুরুর প্রবন্ধগুলি যেন তাঁরা একটু ভাল করে পড়েন। তাঁদের চিত্রগুলিতে যেন সেই ত্রিশ বছর আগেকার পোটোদের পটের ছায়া আমরা না দেখি। সুন্দর রাগিণী যেমন মনকে আনন্দ দেয় তাঁদের চিত্রও দিক আমাদের চিন্তাজর্জ্জর মনকে শুভ্র, অনাবিল একটু আনন্দ। সংস্কারের বর্ম্ম ধারণ করে শিল্পী হওয়া চলে না।

চিত্র ত মনের ভাব-ব্যঞ্জনা; ভাবের দুয়ারে আমরা পাহারা বসাতে পারিনে, তর্জ্জনী আস্ফালন করে তার পথ নির্দ্দেশ করতে পারিনে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট রূপটি ফুটে উঠ্‌লেই হ'ল, তুমি ডাইনে চলুক বা বাঁয়ে চলুক। আমিও মণিবাবুর সঙ্গে একমত "কোন একটা বিশেষ পথ নাই যা অবলম্বন করে আঁক্‌লেই হ'বে ভারতীয় ছবি।"

মণিবাবু দেবীপ্রসাদ পদ্ধতির নাম করেন নি। কেন করেন নি জানিনে। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য পদ্ধতির মিলন হয়েছে বলে' কি? মিলন হয়েছে তা'তে কি ক্ষতি? মণিবাবু ত বলেইছেন "কোন একটা বিশেষ পথ নেই……" ইত্যাদি। ভারতীয় রূপটি ত দেবীপ্রসাদের পদ্ধতিতে বজায় থাকে—তা' নিয়ে কি আমরা সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারিনে?

শেষকথা। আধুনিক বাঙলার শিল্পীদের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন। আমরা অন্তত এতটুকু সভ্য হয়েছি যে চিত্রকে কবিতার মতই একটি উচ্চভাবের বাহন হিসেবে মনে করব। গ্রামের জীবন ছাড়া কি শিল্পীদের আর কিছু বিষয়বস্তু হবে না? কেবল ঢেঁকিশালা আর খেয়াঘাট আঁকবার ক্ষমতা ত, আমি মনে করি, পোটোদেরও ছিল। তারা দেবদেবীর ছবি এঁকেছে। তাদের টেকনিক যতই 'ভাল্‌গার' হোক, ভাবকে অন্তত একটু উচ্চস্তরে নিয়ে গেছে তারা। ছবি যদি 'নীরব কবিতা'ই হয় আধুনিক শিল্পীরা কি ছবির উপর অবিচার কর্‌ছেন না? ক'টা কবিতা ঢেঁকিশালা নিয়ে, বাজার নিয়ে, কামাখ্যা দেবীর মন্দির নিয়ে রচিত হয়েছে? আর হয়ে থাক্‌লেও সেগুলোকে কি আমরা কবিতা বল্‌ব? বাংলাদেশের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সম্ভব হয়েছে, চিত্রকলায় তেমন রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ দেখ্‌বে কি কোন দিন?

'তুই' 'তুমি' ও 'আপনি'

শ্রীহরিগোপাল বৈরাগী

'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় উপরোক্ত তিনটী সম্বোধনের পরিবর্ত্তে যে-কোন একটি শব্দের ব্যবহার নিয়ে একটি মন্তব্যের অবতারণা করেচেন। এই তিনটী শব্দের অপপ্রয়োগে সময়ে সময়ে আমাদের কিরূপ লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতে হয়—তাহাই উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন, এবং উপসংহারে 'তুমি' শব্দের প্রচলনই বিধেয়—ইহা সযুক্তি প্রমাণ ক'রেছেন।

উচ্চনীচ ভেদে আমাদের এই সম্বোধন পার্থক্য। এখনও অবশ্য এমন অনেকে আছেন যাঁরা মোটেই চা'ন না-যে একজন ডোম কিংবা বাগ্দীর ছেলে তাঁদের সঙ্গে এক জায়গায় বসেন বা বস্‌বার চেষ্টা করেন। আমার নিজের সম্বন্ধে বল্‌তে গেলে, আমি যে এটা'কে ঠিক মনে প্রাণে চাই তা' নয়—অথচ, এরূপ মেলামেশাকে ভাল ছাড়া খারাপও বলতে পারি নে। এর মূলে নিহিত রয়েছে আমাদের আজন্ম সংস্কার। আমার ধারণা, এই তিনটী বিভিন্ন সম্বোধনই আমাদের ঐরূপ হীন প্রবৃত্তিকে আরো বেশী কোরে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ঐ তিনটী শব্দ দ্বারা মনুষ্য-জাতিকে তিন টুকরো করা হয়েছে—'তুই' 'তুমি' ও 'আপনি'। কিন্তু যদি একটি শব্দের দ্বারা সকলকে সম্বোধন করা হয়, তাহ'লে, আপাততঃ না হোক্—কিছুদিন বাদে যে 'আমি বড়' এবং 'সে ছোট'—এরূপ ধারণা হ'তে মুক্ত হ'তে পারি এ বিষয়ে আমার অল্পই সন্দেহ আছে এবং এর থেকে যদি আমরা ভেদাভেদ জ্ঞান থেকে মুক্ত হই, তাহ'লে একটা খুব বড় জিনিসই পাবো। কাজেই এর যে প্রয়োজন আছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু উহারই অপপ্রয়োগে আমাদের মনে যে যুগপৎ লজ্জা ও সঙ্কোচ এসে উপস্থিত হয়—কেবলমাত্র তা' হ'তে মুক্তিলাভ করবার জন্য এত বড় একটা সংস্কৃতির প্রয়োজন অল্পই আছে ব'লে মনে হয়; ওটা হোল গৌণ অসুবিধের কথা।

এখন প্রয়োজন তো আছে—কিন্তু কোন শব্দটা ব্যবহার করা চল্‌তে পারে এবং কী করে চলতে পারে, তাই নিয়ে কথা। আশ্বিনের 'বিতর্কিকা'তে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য যা' বলেছেন—তার সঙ্গে আমি নিজের মতের মিল রাখিতে পারি না। এ বিষয়ে আমি শ্রীসুধীর মিত্র ও শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের কথার সমর্থন করি। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে গেলে, আমার মনে হয় এ যুগে ও তিনটী কথার মধ্যে 'আপনি'টীকে দিয়ে সম্বোধন করাই বিচার সঙ্গত। প্রকৃত পক্ষে ও তিনটী কথার উৎপত্তি মানুষের সম্মান বোধের সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকেই। অন্ততঃ আমাদের দেশে তাই। সম্মানার্হ ব্যক্তিকে এখন আমরা 'আপনি' বলেই

সম্বোধন করি—'তুমি' ব'লে নয়, অবশ্য 'তুমি' ব'লে যে করি না—তা' নয়,—করি, কিন্তু বিশেষ অবস্থায়। ভগবানকে আমরা 'তুমি' বলি, এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন করবার সময় 'তুমি' বলেই সম্বোধন করি। সেখানে 'তুমি' মানে 'আপনি'। কিন্তু এই 'তুমি' মানে 'আপনি'টা যদি সব জায়গায় খাটাতে যাই—তা' হলেই গোলোযোগ বেধে যাবে। কারণ, বাস্তবিক 'তুমি' মানে 'আপনি' নয়; তা' যদি হোত, তাহ'লে ও দুটো আলাদা কথার কোন প্রয়োজন হোতো না। 'তুমি' মানে 'আপনি'টা সেইখানেই চলে,—আত্মীয়তা যেখানে বেশী,—ভালবাসা যেখানে পৌছুতে পারে; সাধারণের কাছে নয়। সাধারণকে যদি 'আপনি' এই মানে নিয়ে 'তুমি' বলে সম্বোধন করি তাহ'লে সাধারণের প্রথমতঃ বুঝতে বেগ পেতে হবে,—এমন কি, নাও বুঝতে পারেন। ও কথাটা বিশেষ ভাবে বড়দের পক্ষেই খাটে। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর 'তুমি' কথার মানে 'আপনি' করে, আমি হয়ত শরৎবাবুকে বলিতে পারি—"তোমার শেষ প্রশ্নটা আমাদের ভাল লেগেছে" এবং তাতে শরৎ বাবু কিছু নাও মনে কর্ত্তে পারেন—(অবশ্য মনে করাই স্বাভাবিক)—কিন্তু মার্চ্চেণ্ট অফিসের একটি কম মাইনের কেরাণী বাবু যদি তাঁর বড় বাবুকে বলেন—"তুমি যদি কাল ছুটী দাও........" তা' হলে আমার মনে হয় যে সেই অফিসে সেই ছুটীই হবে তাঁর শেষ ছুটী; পরে ভদ্রলোক হয়ত এসে দেখবেন চেয়ারে লোক 'মতেয়ান'।

আপনি' কথাটাই যখন আমাদের মধ্যে সম্মান বাচক, তখন এ জিনিসটার প্রারম্ভে সম্মান বাচক কথাটা ব্যবহার কল্লে ক্ষতি কিছু হবে না—বরং লাভ হবারই সম্ভাবনা বেশী। কারণ, এই সম্বোধনে কোন পক্ষেরই অসন্তোষের কোন কারণ থাকবে না। একটি মুচিকে যদি বলি—"আপনি আমার জুতোটায় ভালো করে' একটা তালি দিয়ে দিন—তাহ'লে প্রথমটায় সে খুবই বিস্মিত হবে সত্যি, কিন্তু, তালিটা সে এমন ভাবে দেবে, যে-রকমটি—সে 'তুমি' বল্লে দিত না। এ রকম লাভ অবশ্য প্রথম প্রথম হ'বে—সব বিষয়েই। কিন্তু কিছুদিন বাদে এটি আর হবে না। তখন থাকবে, একমাত্র কথা 'আপনি'। 'তুই' এবং 'তুমি' থাক্‌বে না বলে' এর বিভিন্ন অর্থও থাকবে না। তখন 'আপনি'র মানে হবে—'তুমি' এবং 'তুই'।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বাপ তাঁর ছেলেকে 'আপনি' বলে ডাকতে পারবেন কী? অফিসের বড়বাবু একজন সামান্ত কেরাণীকে কী ব'লে সম্বোধন করবেন?—তাঁরা কোন মতেই 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে পারবেন না। তাহ'লে কী হবে? আমার ধারণা, এটিকে কার্য্যে পরিণত কর্ত্তে গেলে, প্রথমতঃ এই 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করবার প্রথাটা সকলকার কানে পৌছান চাই; অন্ততঃ তাঁদের কানে,—যাঁদের দেশের সকলে মেনে চলেন। ধরুন, একটি গ্রামে পাঁচজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আছেন; তাঁদের সকলে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে এবং বিশ্বাস করে। এঁরা যদি এ কাজের অগ্রদূত হন তাহ'লে বিশেষভাবে উপকার আশা করা যেতে পারে। তাঁরা যদি এরূপ ভাবে সম্বোধন কর্ত্তে সুরু করেন এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলকে বুঝিয়ে বলেন—তাহ'লে তাঁদের অনুসরণ করে' সেই গ্রামে এ প্রকারের সম্বোধন প্রচলিত হ'তে পারে। অফিসের বেলাতেও এই পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। তখন বড় বাবুদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হ'তে হবে। কিন্তু প্রথম কাজ হচ্ছে, গ্রামের মাতব্বর সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহিত করা। এ বিষয়ে তাঁদেরই বিশেষভাবে চেষ্টা কর্ত্তে হবে—যাঁরা এ বিষয়টা শুধু কাগজের পাতায় না লিখে সত্যিকারের খাড়া কর্ত্তে চান।

আর একটা কথা, গত আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডলের 'তাত' শব্দটিও আমি যুক্তি-যুক্ত বলে বিবেচনা করি—কারণ, ওটা থেকে এই সুবিধে হতে পারে যে 'তাত' বলে' সম্বোধন কল্লে কোন পক্ষেরই কোন সঙ্কোচ বা অস্বস্তির কারণ থাকবে না, শুধু নতুন কথা ব'লে একটু কানে লাগবে।

'তুই' 'তুমি' ও 'আপনি'

শ্রীসুধীর মিত্র

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় 'তুই, তুমি আপনি' নিয়ে যে বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন—ভাদ্র সংখ্যায় আমি সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করেছিলাম। আশ্বিন-সংখ্যায় জ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য তার প্রতিবাদ করেছেন।

ভাদ্র সংখ্যায় সেই আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বলেছিলাম,—

"তুই, তুমি ও আপনির উৎপত্তি মানুষের সম্মানবোধের সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকে। সাধারণতঃ যাদেরকে আমরা আমাদের চেয়ে বয়স, বিদ্যা-বুদ্ধি, বৃত্তি বা জাতিতে ছোট মনে করি তাদেরকে বলি 'তুই,' সমান বয়সী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে 'তুমি' এবং পূজনীয় ও অপরিচিতদের, যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র বলে বিবেচিত হন তাদেরকে বলি 'আপনি'।...সম্মানবোধক

আপনি শব্দটাকে রেখে নিম্নক্রমের বাকী দুটিকে বর্জ্জন করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, অসম্মান কাউকে করবার অধিকার আমাদের নেই,—পক্ষান্তরে মানুষ হিসাবে প্রত্যেকই সম্মানের পাত্র।"

আমার এই উক্তি উদ্ধৃত করে' সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র-কুমার ভট্টাচার্য্য প্রতিবাদে বলেছেন,—

"তুই, তুমি ও আপনির উৎপত্তি যদি সকল মানুষের সম্মানবোধের সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকে হ'ত তাহ'লে সকল ভাষাতেও এদের অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ থাক্‌ত।" (বিচিত্রা—৪১৮ পৃঃ)

তুই, তুমি ও আপনির উৎপত্তি যদি সম্মানবোধের জ্ঞান থেকেই না হবে তাহ'লে কিসের থেকে হ'ল? যেখানে একটি শব্দে চল্‌তে পারত, সেখানে তিনটি শব্দের সৃষ্টি হ'ল কেন? আমার মনে হয় সম্মান বোধ থেকেই ঐ শব্দ তিনটির উৎপত্তি হয়েচে,—কারণ এদের উৎপত্তির আর কোন সম্ভব-যোগ্য ও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানেও যে আমরা এগুলি এই অর্থে ব্যবহার করে থাকি তা অস্বীকার কর্‌বার কোনই হেতু নেই এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেকথা স্বীকার করেচেন। তারপর, সকল ভাষাতে সম্মানবোধক পৃথক্ পৃথক্ ভাব-ব্যঞ্জক শব্দ নেই এই কথা বলে আমার উক্তি অপ্রমাণিত করা যায়না। সাধারণ জীবনে আমরা লোককে সম্মান দিতে যে জাতীয় পার্থক্য করি,···অন্য সব ভাষা-ভাষীরা তা না-ও কর্‌তে পারে—এবং যেখানে এ পার্থক্য নেই সেখানে সামাজিক জীবনে লোককে সম্মান দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যবোধ নেই। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল ইংরাজী ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষাতেই (ভারতীয় ভাষাগুলিও তার অন্তর্ভুক্ত) এই প্রকার তারতম্য আছে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরে বল্‌ছেন,—"মিত্র মহাশয় তিনটি শব্দের সাথে যে তিনটি অর্থ জুড়ে দিয়েছেন সেগুলিকে কিছুতেই সর্ব্বজনগ্রাহ্য ও চিরস্থায়ী বলা যেতে পারে না।"

'সর্ব্বজনে' যা' মেনে নেয়—সর্ব্বজন গ্রাহ্য বল্‌তে আমরা তা-ই বুঝি। বর্ত্তমানে সর্ব্বজনে যে ঐ অর্থে তিনটি শব্দকে ব্যবহার করচে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই এবং সমালোচক মহাশয়ও সে কথা স্বীকার করেচেন। সর্ব্বজন গ্রাহ্য রয়েচে বলেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েচে—নইলে এর প্রয়োজন হ'ত না। আর এগুলি যে চিরস্থায়ী একথা আমি বলিনি—এবং বলিনি ব'লেই কোনদিকে তার পরিবর্ত্তন সম্ভবযোগ্য হ'তে পারে সে কথার আলোচনা করেচি।

'তুমি'কে অসম্মানজনক অর্থে ব্যবহার করবার কথা সম্পাদক মহাশয় বলেছেন এমন কথা আমি কোথাও বলিনি। আমি শুধু বলেছিলাম—পরিবর্ত্তন যদি করতে হয়, তাহ'লে এদের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সম্মানবোধক সেইটিকেই রেখে বাকী দুটিকে বর্জ্জন করা যুক্তি সঙ্গত এবং সম্ভবযোগ্য। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি যুক্তিও দিয়েছিলাম। সে কথাগুলি ভাল করে পড়ে দেখ্‌লে সমালোচক মহাশয়ের প্রতিবাদ করার সম্ভবতঃ প্রয়োজন হতনা।

সমালোচক বল্‌ছেন,—"শুধু শব্দের আকার থেকেই অর্থ করা হয়না, বল্‌বার ভঙ্গী অর্থাৎ কোন্ motive থেকে কথাটি বল্‌ছি তা দিয়েই শব্দের অর্থ বুঝে নেওয়া উচিৎ।" এটি practical কথা নয়। আমরা কোন্ লোককে কতটুকু সম্মান করুচি সেটা শুধু আমাদের মনোভাবের উপর নির্ভর করেনা, অনেকটা নির্ভর করে যাঁকে বলা হয় তিনি যে অর্থে গ্রহণ করবেন। এই জন্যই বলেছিলাম 'তুমি' সার্ব্বজনীন হবার পূর্ব্বে 'তুমি' ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয়। শরৎচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথকে 'তুমি' বল্‌লে তাঁরা অপরাধ না নিতে পারেন, কারণ তাঁদেরকে আমরা নির্ব্যক্তিক (impersonal) ভাবেই তুমি বলি। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এরূপ বলায় অনর্থ ঘট্‌বার সম্ভাবনা থাকৃতে পারে।

ভগবান্ বা দেশের মহৎ ও বরণীয়দের যখন তুমি বলি তখন নির্ব্যক্তিক ভাবেই বলি—আর অন্যত্র ঘনিষ্ঠতা সূত্রে বা সম্মান বোধের ক্রম অনুসারে ব্যবহার করি।

পরিশেষে আর একটি কথা বলে শেষ করব। সমালোচক মহাশয় আমার উপর গুরুতর দোষারোপ করেচেন। বলেছেন—"ভাদ্রের বিতর্কিকাতে সুধীর মিত্র 'তুই তুমি ও আপনি'র আলোচনা করতে গিয়ে 'শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের' নিবন্ধের উপর শ্রদ্ধা রাখ্‌তে পারেন নি। আমরা কিন্তু বিচিত্রা সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবকে আপত্তিকর মনে কর্‌তে পারিনি।"

বিচিত্রা সম্পাদক মহাশয় তর্কের অবতারণা করে তাঁর পাঠক গোষ্ঠীকে আলোচনায় যোগ দিতে আহ্বান করেছিলেন —এই আশা করে সম্ভবতঃ, যে পাঠকদের মধ্যে কেউ তাঁর বিপথে মত প্রকাশ কর্‌বেন। সুতরাং সম্পাদক মহাশয়ের মতের বিপথে কোন মত প্রকাশ করায় অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় একথা আমরা মনে করিনে—এবং মনে করি সম্পাদক মহাশয়ও করেন না। সম্পাদক মহাশয়ের উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে,—তাঁর আলোচনাতেও আমি শ্রদ্ধা সহকারে যোগ দিয়েছিলাম—এবং আমার আলোচনার মধ্যে কোন প্রকার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েচে এরূপ মনে করিনে। আমি যে মতের পরিপোষক বিচিত্রায় দেখ্‌লাম অনেকেই সেই মত পোষণ করেন। তবে আমার মতের বিরুদ্ধে যুক্তি না পেয়ে সমালোচক মহাশয় যদি আমাকে আক্রমণ করাকেই সম্বল করে থাকেন তাহলে অবিশ্যি আমার কিছু বলার নেই।

নানা কথা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি ভারতবাসীর,—বিশেষ করে বাঙালীর গৌরব। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছিল,—সেই আলোকে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব। তার পর থেকে এই পঁচিশ বৎসর ধরে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে যে ভাবে এই সমিতি ধীরে ধীরে স্থির গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়েছে ও প্রসারতা লাভ করেছে, তা' সত্যই বিস্ময়জনক। বিশ্বের দরবারে এই সমিতি অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে, যে কোনো ক্ষেত্রেই বাঙালীর যোগ্যতার অভাব নেই। আজ বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন অনেকাংশে অন্যের দ্বারা অধিকৃত হওয়ায় বাঙালীর আর্থিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত। কিন্তু এই দুর্দ্দশা থেকে মুক্তির বাণী এনেছে "হিন্দুস্থান"। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের অক্লান্ত চেষ্টা জয়যুক্ত হোক, আমরা এই কামনা করি। নলিনীরঞ্জনের জয় বাঙালীরই জয়।

১৯৩২ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে পঞ্চবাৎসরিক হিসাব নিকাশান্তে এই সমিতি তার বীমাকারীদের জন্য যে বোনাস্ ঘোষণা করেছেন, তা' অতীব সন্তোষজনক। সমিতির নবপ্রবর্ত্তিত হারে যাঁরা প্রিমিয়ম দেন,—তাঁদের প্রতি হাজার টাকার "এন্ডাউমেণ্ট বীমায়" ২৩৲ টাকা হারে, ও "সারাজীবন বীমায়" ২০৲ টাকা হারে বোনাস্ দেওয়া হ'বে; এবং পুরাতন হারে যাঁরা প্রিমিয়ম দেন, তাঁদের প্রতি হাজার টাকার "এন্ডাউমেণ্ট বীমায়" ২১৲ টাকা হারে ও "সারাজীবন বীমায়" ১৫৲ টাকা হারে প্রিমিয়ম দেওয়া হ'বে। বীমাকারীদের পক্ষে ইহা বিশেষ লাভ ও সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নেই। সমিতি যে দিন দিন উন্নতি লাভ করছেন,—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে গত বৎসর সমিতির নূতন কাজের অঙ্ক দুই কোটি টাকাকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল।

এই সমিতির কল্যাণে কত অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি স্ব-স্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণে সক্ষম হ'য়েছেন তা' অনেকেরই জানা আছে। শ্রীযুক্ত লুইস্-ই-ক্লিন্টন্, এফ্-আই-এ (Consulting Actuary) এই সমিতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তার থেকে কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এইখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল:—

"It remains for me to discharge the pleasant duty of congratulating the Society on the remarkable progress of the ordinary fund. I can say no more than that after an exhaustive enquiry into the Society's finances I am satisfied with its progress, and that *I am proud to be associated with it.*

নোবেল-প্রাইজ

এ বৎসর সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে রুষ লেখক শ্রীযুক্ত ইভান্ বুনিন্‌কে। ১৮৭০ সালে এঁর জন্ম। এঁর লেখা "The Village," The Brothers," "The Gentlemen from Sanfrancisco" এবং "Well of Days" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

স্বর্গীয়া কামিনী রায়

বিগত ১১ই আশ্বিন বুধবার 'আলো ও ছায়া'র কবি কামিনী রায় মাত্র তিন চারদিনের অসুখে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙলা ভাষার যে ক্ষতি হ'ল তা সহজে পূর্ণ হবার নয়,—মহিলা-কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান যে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তা সকলেই স্বীকার করবেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ জিলার বাসণ্ডা গ্রামে কামিনী দেবীর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন 'টম কাকার কুটির' এবং

অন্যান্য পুস্তক প্রণেতা চণ্ডীচরণ সেন। বাল্যকালে কামিনী দেবী পিতার নিকট শিক্ষা এবং শিক্ষার উৎসাহ লাভ করেন। যে সময়ে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা সুপ্রচলিতও ছিল না, নিরঙ্কুশও ছিল না, সেই সময়ে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।



কবি কামিনী রায়

বাল্যকাল হ'তেই কামিনী দেবী কবিতা লিখ্তে আরম্ভ করেন। কবিতাগুলি রচিত হ'ত বটে কিন্তু অপ্রকাশিত হ'য়ে প'ড়ে থাকত। অবশেষে একদিন পিতৃবন্ধু ৺দুর্গামোহন দাসের দৃষ্টিতে প'ড়ে সেগুলি কবি হেমচন্দ্রের হাতে পড়ল। হেমচন্দ্র কবিতাগুলির মধ্যে অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে প্রকাশ করবার উপদেশ দেন। 'আলো ও ছায়া' প্রকাশ হবার অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ কবির প্রশংসায় বাঙলা দেশ মুখর হ'য়ে উঠ্ল। একখানি কবিতার বইয়ের আটটি সংস্করণ হয়েচে এ শুধু একজন মহিলা কবির পক্ষেই নয়, যে-কোনো পুরুষ কবির পক্ষেও গৌরবের কথা।

জীবনে কামিনী দেবী দুঃখ শোক পেয়েছিলেন যথেষ্ট—এত বেশি যে, যে-কোনো সাধারণ মানুষকে তার নিষ্পেষণ কঠিন ক'রে দিতে পারত। কিন্তু তাঁর আনন্দ-ধর্ম্মী মনের ক্ষেত্রে দুঃখ শোকের বীজ প'ড়ে যে লতার অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল তা'তে ফুল ফুট্‌তে কসুর হয়নি। তাঁর শেষ-জীবনের কাব্যকলায় আমরা সেই ফুলেরই সৌরভ পাই।

কামিনী দেবীর প্রকৃতি স্বভাবত কল্পনা-প্রবণ এবং ভাবানুগ হলেও নারী-সম্প্রদায়ের অনুকূল সকল আন্দোলনেরই প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছিল। সেদিকে তাঁর জীবন ছিল কর্ম্মময় জীবন। বার্দ্ধক্যে অসুস্থতায় এবং দুর্ব্বলতার মধ্যেও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম এবং কর্ম্ম করতেন। সেদিক দিয়েও তাঁর মৃত্যুতে বাঙ্‌লা দেশ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষ

বাঙ্‌লার সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নাম এখন পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৭শে তারিখে তিনি কলিকাতা হেদুয়া পুষ্করিণীতে ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট নিরবসর সন্তরণ শেষ করার পরও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বকে অতিক্রম করা হয়নি ব'লে যে সকল ব্যক্তি আপত্তি তুলেছিলেন গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৩ রেঙ্গুন রয়েল লেক্স্-এ ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট নিরবসর সন্তরণ শেষ করার পর তাঁরা নির্ব্বাক্ হয়েছেন। এখন যে সন্তরণ সহনশীলতার প্রতিযোগিতায় প্রফুল্লচন্দ্র পৃথিবীর মধ্যে অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাকথিত নির্জ্জীব বাঙালী জাতির পক্ষে এ কম গৌরবের কথা নয়। প্রফুল্লচন্দ্র জগৎ-সভায় বাঙালীর আসন অনেকখানি উন্নত করেছেন;—এ জন্য তিনি বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

২২শে অক্টোবর ১৯৩৩ বেলা ৮ টা ৬ মিনিটের সময় প্রফুল্লচন্দ্র রেঙ্গুনের রয়েল লেক্স-এ অবতরণ করেন এবং ২৫শে অক্টোবর অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময়ে নিষ্ক্রান্ত হন। তটে উপনীত হ'লে রেঙ্গুনের মেয়র ডাঃ ডুগাল প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। লক্ষাধিক দর্শক নানা উপায়ে সে সম্বর্দ্ধনায় উত্তেজনার সহিত যোগ দেন। প্রফুল্লচন্দ্র হস্ত-

সঙ্কেতের দ্বারা সকলকে প্রত্যভিবাদন জানান। অপরাহ্ন ৭টা ৬ মিনিট হওয়ামাত্র ঘন ঘন রাইফেল্ ধ্বনির দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্রকে জানান হয় যে তিনি জগতের শ্রেষ্ঠত্ব অতিক্রম করেছেন, কিন্তু তারপরও প্রফুল্লচন্দ্র আরও ২৪ মিনিট জলে অবস্থান করেন। রেঙ্গুনের সমস্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় যথোচিত ভাবে এই সন্তরণ-বীরের সম্মাননা করেছেন। অনেকগুলি স্বর্ণ এবং রৌপ্য পদকও তাঁরা তাঁকে উপহার দিয়েছেন।



শ্রীশান্তি পাল ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ

যে-সময়ে আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রফুল্লচন্দ্রের কথা স্মরণ করি সে-সময়ে আমরা যদি প্রফুল্লচন্দ্রের গুরু এবং 'শিক্ষক শ্রীযুক্ত শান্তি পাল মহাশয়ের কথা' বিস্মৃত হই তা হ'লে, ফুলের কথা স্মরণ করবার সময়ে মূলের কথা বিস্মৃত হ'লে যে অধর্ম্মাচরণ হয়, সেই অধর্ম্মাচরণ আমাদের হবে। প্রফুল্লচন্দ্রের কৃতিত্বের পশ্চাতে সন্তরণবীর শান্তি পালের ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং সন্তরণ-কৌশল-জ্ঞান বর্ত্তমান। সাঁতার শেখাবার অতি আধুনিক কৌশলাদি ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ইনিই আয়ত্ত করেছেন। এঁর পিতা সুরেশ-চন্দ্র পাল ইংলণ্ডের বহু সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সম্মান লাভ ক'রেছিলেন। তাঁরই নিকট শান্তি পাল আধুনিক ষ্ট্রোক্ শিক্ষা করেন।

১৯০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম। ১৯১৭ সালে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে যোগদান ও শান্তিবাবুর নিকট সাঁতার শিক্ষা আরম্ভ। তিন মাস পরে ১১০ গজ প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান অধিকার। ১৯২১ সালে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের অধিকাংশ দীর্ঘ সন্তরণের দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার। ১৯২৩ সালে এক মাইল অর্দ্ধ মাইল সিকি মাইল ও ২২০ গজে ভারতবর্ষের সমস্ত সন্তরণ-বীরদের পরাজিত করিয়া নূতন রেকর্ড স্থাপন; তন্মধ্যে অদ্যাবধি ১১০ গজ ৫০ গজ ও ৪৪৪ গজের সময় এ পর্য্যন্ত অনতিক্রান্ত রয়েছে। গঙ্গাপারের সময় এখনও অনতিক্রান্ত। ঐ সালে গঙ্গায় ১৩ মাইল সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার। পর বৎসরেও ১৩ মাইল সন্তরণে প্রথম ও ২৩ মাইলে ডেড্ হিট্ ক'রে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার। ১৯২৮ সালে ওয়াটার পোলো খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে ১৫ মাইল সন্তরণে দ্বিতীয় ব্যক্তির এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এসে প্রথম স্থান অধিকার। ঐ বৎসর হেদুয়ায় ২৮ ঘণ্টা সাঁতার, ১৯৩০ সালে ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট একাদিক্রমে সাঁতার দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর ব'লে গণ্য এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হ'তে বিশেষভাবে সম্মানিত। ১৯৩১ সালে ৭২ ঘণ্টা সন্তরণের সঙ্কল্প কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ ডাক্তারের আদেশে ৬৭ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট পরে জল থেকে তুলে নেওয়া হয়। পুরীতে সমুদ্রে সাঁতার কাটবার কৌশল দেখিয়ে সমস্ত নুলিয়ার গুরুত্বপদ প্রাপ্তি। ডাইভিং-এ ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়।

প্রথম স্বদেশী মোটর কার

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস মোটরকার নির্ম্মাণ শেষ করেছেন। গাড়ীখানি পুলিশ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়ে রেজিষ্ট্রিও হয়ে গেছে,—নম্বর পড়েছে ৩৫৯৭৭। কিছুদিন ধরে কলিকাতা কর্পোরেশনের ফরমাইসে গাড়ীখানি প্রস্তুত হচ্ছিল একথা অনেকেই অবগত আছেন। দু'চারটি অংশ, যথা টায়ার, কার্বোরেটার, ম্যাগনেটো ও স্পারকিং প্লাগ্ ভিন্ন আর সমস্ত অংশই বিপিনবাবুর কারখানায় প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং গাড়ীখানিকে স্বদেশী ব'ললে অন্যায় হয় না।

গাড়ীটিতে দু'একটি ত্রুটি হয়তো আছে, কিন্তু প্রথম উদ্যমের ফল স্বরূপ গাড়ীখানি যন্ত্রকার (mechanic) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসের অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয়। অতি সাধারণ সামান্য কারখানায় নিতান্ত মামুলি হস্তচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে যদি এরূপ সন্তোষজনক গাড়ী তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে প্রস্তুত করতে পারেন তা হ'লে আধুনিক কলকব্জার সুযোগ থাকলে কত সহজে এবং কত অল্প সময়ে এরূপ গাড়ী একেবারে নির্দ্দোষভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হ'ত তা সহজেই অনুমেয়। মোটরকারের ব্যবসা বর্ত্তমান সময়ে একটি অতিশয় লাভজনক ব্যবসা এবং প্রত্যেকটি গাড়ি বিদেশ হ'তে আসে বলে এই কারবারে লাভের প্রায় সমস্তটা অংশই বিদেশী ব্যবসায়ীর হস্তগত হয়। আমাদের দেশে কি এমন ধনী একজনও নেই যিনি বিপিনবাবুকে অংশীদার ক'রে নিয়ে মোটরকার প্রস্তুত করবার একটি বড়-রকম কারখানা খোলেন এবং তদ্বারা নিজেদের এবং দেশের মঙ্গলসাধন করেন ?

আমরা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাসকে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গোকুল চাঁদ বড়াল এম্-এল্-সি

বিগত ১৮ই আশ্বিন বুধবার গোকুলবাবু পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। তাঁর পিতা ছিলেন খ্যাতনামা ৺ প্রেমচাঁদ বড়াল।

গোকুলবাবুর মৃত্যুতে কত বড় ক্ষতি হ'ল, সে শুধু তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা তাঁকে প্রকৃতভাবে চেন্‌বার সুযোগ পেয়েছিলেন। কারণ, তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর কর্ম্মী যাঁদের সভা সমিতিতে খুব বেশি দেখা যায় না, বক্তৃতা আদির দ্বারা যাঁরা অনর্থক কলরবের সৃষ্টি করেন না, পরন্তু লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে তাঁদের কর্ম্মনিষ্ঠ জীবন জনসেবায় উৎসর্গ করেন।

সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল গোকুলবাবু কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত থেকে বহু প্রকারে নাগরিকগণের সেবা ক'রে গেছেন। অস্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের পদ লাভ ক'রে তিনিই কর্পোরেশনে প্রভিডেন্ট ফণ্ড বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁর সৌজন্য ও শিষ্টাচার সকলকে চমৎকৃত করত। গুণমুগ্ধ নাগরিকেরা গত নির্ব্বাচনে তাঁকে প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করেন।

গোকুলচাঁদ জীবনে বহু সৎকার্য্য করেছেন। খড়দহে দ্বারকাশ্রম এবং শ্রীগুরু গ্রন্থাশ্রম নামে সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত ক'রে সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন করতেন। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর সহধর্ম্মিণীর নামে "ক্ষেত্রমণি দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করেন। চুঁচুড়া দেশবন্ধু হাই-



৺গোকুলচন্দ্র বড়াল

স্কুলের সংশ্রবে তিনি একটি স্বতন্ত্র অট্টালিকা নির্ম্মিত করিয়ে দিয়েছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর তিনি মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন। "রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডারে" তিনি বহু অর্থ দান করেছিলেন। "রিফিউজ" বা পতিতা বালিকাদের উদ্ধার আশ্রমের তিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বৌবাজার এলেন হাঁসপাতাল ও কলেজের তিনি ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচাঁদের সহিত একযোগে "মূক ও বধির বিদ্যালয়" (Deaf and Dumb School) স্থাপিত করেন। তিনি বৃন্দাবনের শ্রীশ্রী৺ মদনমোহন জীউর মন্দিরের ট্রাষ্টি এবং যমুনা নদী সংস্কার সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য ছিলেন। পানিহাটির গোবিন্দকুমারী বালিকা

বিত্তালয়ের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিখিলানন্দ মিশনের তিনি ট্রাষ্টি ও লাইফ সেভিং সোসাইটির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বহু ছাত্রকে তিনি অন্নবস্ত্র অর্থ ও পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করতেন।

আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার ও সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচাঁদ বড়ালকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

হুগলী জেলা-সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ডিসেম্বর মাসে "কোন্নগর পাঠ চক্রে"র উদ্যোগে একটি সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনটি ত ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অতীতের স্মৃতিকোঠায় স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে,—উপস্থিত মাঝে মাঝে বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাদেশিক সম্মেলন হ'তে দেখা যাচ্ছে। তাল যদি একান্তই না পাওয়া যায় ত তিল পাওয়াও ভাল। সুতরাং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ঈপ্সিত সম্মেলনটির সাফল্য কামনা করি। সম্মেলন সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের (শ্রীনাথ-নিবাস, কোন্নগর) নিকট হ'তে আমরা এ বিষয়ে যে চিঠিখানি পেয়েছি সাধারণের অবগতির জন্য এখানে মুদ্রিত করলাম।

"আগামী ১৭ই ডিসেম্বর, "কোন্নগর পাঠ-চক্রে"র উদ্যোগে "হুগলী জেলা-সাহিত্য-সম্মেলনে"র অধিবেশন হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (রিপন কলেজ), জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর কলেজ), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীলচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন আশা করা যায়। সভার শেষভাগে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা থাকিবে।"

উপস্থিত হাওড়া জেলায় বাস করলেও শরৎচন্দ্রের পৈত্রিক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে। সুতরাং হুগলী জেলার সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে শরৎচন্দ্রকে সভাপতি নির্ব্বাচন খুবই সুষ্ঠু হয়েচে।

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য—

বিচিত্রার অন্যতম সুলেখক শ্রীযুক্ত ভবানী ভট্টাচার্য্যের নাম বিচিত্রার পাঠক সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং সম্প্রতি Ph. D.র থিসীস্ লিখ্‌তে রত আছেন। বিলাতের একাধিক বিখ্যাত পত্রিকার ইনি লেখক। লেখার পারিশ্রমিকও ইনি বেশ ভাল হারে পেয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুবাদ (The Golden Boat—George Allen and Unwin, London) ক'রে ইনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। Gaumont British Film Corporation কর্ত্তৃক সম্প্রতি একটি ভারতীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। সেই শাখার Producer ভবানীবাবুকে লেখকরূপে আমন্ত্রিত করেছেন। ভবানীবাবুর অভিলাষ বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী"র আখ্যান ভাগ অবলম্বন ক'রে সিনেরিয়ো লেখা। আমরা ভবানীবাবুর উত্তরোত্তর সাফল্য এবং যশোপার্জ্জন কামনা করি।

ভারতীয় শাখার অনুষ্ঠানে সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মহিলাগণের সহায়তা লাভ করবার জন্য Gaumontদের বিশেষ আগ্রহ আছে। যাঁরা এমন্ন সহায়তা প্রদান করতে উদ্যত তাঁরা বিচিত্রা সম্পাদকের মারফৎ এ বিষয়ে পত্র ব্যবহার করতে পারেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সময় তালিকা

গত অক্টোবর মাসে ২নং লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা হ'তে পাইয়োনিয়ার পাবলিসিটি কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বাঙলা ভাষায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটি সময় তালিকা (টাইম টেবল) প্রকাশিত করেছেন। সময় তালিকাটি ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ৯৬ পৃষ্ঠা;—মূল্য এক আনা। ইংরাজীতে এক আনা মূল্যের যে টাইম টেবল প্রচলিত আছে, এ সময় তালিকাও তারই অনুরূপ।

বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ পূর্ব্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ব্যবস্থায় বাঙলা টাইম টেবল প্রচলিত ছিল। কি কারণে সে টাইম টেবলের প্রকাশ বন্ধ করতে হয়েছিল তা এখন মনে পড়ে না।

কিন্তু উপস্থিত বাঙলা ভাষার যেরূপ প্রসার ও প্রচার হয়েছে তা'তে একখানি বাঙলা টাইম টেবল যে অনায়াসে চল্‌বে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইংরাজি-না-জানা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক ত' এ সময়-তালিকার দ্বারা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেনই, উপরোক্ত যে সকল অপর দেশীয় অবাঙালী অল্প-বাঙলা-জানা লোক ব্যবসাদির অনুরোধে বাঙলা দেশে বাস করেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে এ সময়-তালিকা ব্যবহার করতে পারবেন। এ ভাবে বাঙলা ভাষার প্রচলনও একটু বৃদ্ধি পেতে পারবে। সুতরাং, এই বাঙলা সময় তালিকাটির প্রকাশ যা'তে বজায় থাকতে পারে সে উদ্দেশ্যে আমরা ইংরাজিবিদিত বাঙালী-দেরও বাঙলা সময়-তালিকাটিই ক্রয় করতে অনুরোধ করি। বাঙলা সময়-তালিকা ব্যবহার করলে তাঁরা কোনো প্রকার অসুবিধা বোধ করবেন ব'লে মনে হয় না।

দুটি বিষয়ে আমরা প্রকাশকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। বিভিন্ন সময় তালিকার শিরোনামাগুলি পাইকা অক্ষরে না ছেপে আরও বড় এবং মোটা অক্ষরে ছাপা উচিত, যাতে সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণ স্বরূপ ৩০ পৃষ্ঠার "গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন" ও ৩১ পৃষ্ঠার "সাহেব-গঞ্জ লুপ" শিরোনামা দুটি উল্লেখ করি। ও দুটি লাইন অন্ততঃ স্মল্ অ্যান্টিকে ছাপ্‌লে ভাল হয়। দ্বিতীয়তঃ, ট্রেনের সময়গুলি ইংরাজি প্রথা মত না ছেপে বাঙলা পাঁজিতে যে ভাবে সময় ছাপা হয় সেই ভাবে ছাপলে সাধারণ লোকের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। "২৩—৪৯" যে ক'টা বেজে ক' মিনিট তা অনেক সময়ে শিক্ষিত লোককেও এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ঠিক করতে হয়,—অল্প শিক্ষিত লোক ত' ঐভাবে ছাপা সময়-তালিকার সমস্যায় প'ড়ে হাঁপিয়ে উঠবে। তার চেয়ে যদি ছাপা যায় রা ১১—৪৯ তা হ'লে রাত্রি এগারটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিট বুঝ্‌তে এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় না। তবে প্রভাত ও সন্ধ্যাকালের সময়গুলি নিয়ে একটু অসুবিধার কথা আছে, কারণ বৎসরের কোনো সময়ে সে সময়গুলি রাত্রে পড়ে কোনো সময় পড়ে দিবাভাগে। কিন্তু যদি প্রভাতের দিকের সময়গুলির পূর্ব্বে প্র এবং সন্ধ্যার দিকের সময়গুলির পূর্ব্বে স দেওয়া যায় তা হ'লে আর কোনো গোল হয় না। স ৬—৩৩ বল্‌লে একমাত্র 6.33 P. M.ই বোঝাবে, তা আষাঢ় মাসই হোক অথবা অগ্রহায়ণ মাসই হোক। আশা করি এ কথাগুলি প্রকাশকগণ ভেবে দেখ্‌বেন।

ভ্রম-সংশোধন

কার্ত্তিক-সংখ্যার পুস্তক পরিচয়ের মধ্যে একটি দারুণ ছাপার ভুলের জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত। "হালুম-বুড়ো" শীর্ষক যে বিজ্ঞান-বিষয়ক বইখানির সমালোচনা আছে, সে বইখানির নাম "হালুম-বুড়ো" নয়; **"বিজ্ঞান-বুড়ো"**। কি-ক'রে যে এই ধরণের মুদ্রাকর প্রমাদ সম্ভব হয়, তা জানেন একমাত্র ভগবান।

Edited by Upendranath Ganguly, Printed by Saratchandra Mukherjee at The Sreekrishna Printing Works 259 Upper Chitpore Road, published by and the same from 27/1, Fariapooker Street, Calcutta.



বিচিত্রা

সপ্তম বর্ষ, ১ম খণ্ড | পৌষ, ১৩৪০ | ষষ্ঠসংখ্যা

TRANCE

SRI AUROBINDO

A naked and silver-pointed star
Floating near the halo of the moon,
A storm-rack, the pale sky's fringe and bar,
Over waters stilling into swoon.

My mind is awake in stirless trance,
Hushed my heart, a burden of delight,
Dispelled is the senses' flicker-dance,
Mute the body aureat with light.

O star of creation pure and free,
Halo-moon of ecstasy unknown,
Storm-breath of the soul-change yet to be,
Ocean self enraptured and alone !

16. 10. 33

ধ্যানমৌন

একটি নির্ম্মুক্ত তারা পরি' টিপ রজতবিন্দুর
ভাসমান—চন্দ্রমার জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলের গায়...
ঝঞ্ঝাছিন্ন মেঘরেখা পাণ্ডু নভসীমান্তে সিন্ধুর
দিগন্তে নিলীন···অব্ধি অকল্লোল—মূর্চ্ছাহতপ্রায় !

মানস আমার জাগে বিনিষ্কম্প ধ্যানে উদ্ভাসিত···
নিঃশব্দ অন্তর—বহি রভসের অসহ সম্ভার···
চঞ্চল ইন্দ্রিয়-নৃত্য-ঝিকিমিকি-রোল—নির্ব্বাসিত···
তনু মুগ্ধ...মৌন পিয়ি' স্বর্ণকান্তি আলোক-আসার !

হে নক্ষত্র নিরঞ্জন—মুক্তিমন্ত্রি—সৃজনবিলাস !
অচিন-শিহরানন্দ-দীপ্ত সান্দ্র হে চন্দ্রমণ্ডল !
আত্মার যে-রূপান্তর মন্দ্রিবে—তাহার ঝঞ্ঝাশ্বাস !
অম্বুধি-সম্বিৎ মম বীতসঙ্গ—পুলক-বিহ্বল !

অনুবাদক শ্রী-

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজি কবিতার অনুবাদ।

বিপ্রদাস

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭

হঠাৎ বড় মাসীর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে বন্দনার যখন দেখা হইয়া গেল তখন বোম্বাই যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা মাসীর কষ্টসাধ্য হইল না। তিনি মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে স্বামীর কর্ম্মস্থল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে আসিতেছিলেন। মাসীর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আসল কারণটা ছাড়া আরও একটা হেতু ছিল এখানে তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। বন্দনার ছেলেবেলা হইতে এতকাল সুদূর প্রবাসেই দিন কাটিয়াছে, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই সে-দিকের, অথচ, যে-সমাজের অন্তর্গত সে তাহার বৃহত্তর অংশটাই আছে কলিকাতায়, ইহার সহিত আজও তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় নাই। সামান্য পরিচয় যেটুকু সে শুধু খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ও সাধারণ সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সহযোগে। কলিকাতায় সর্ব্বদা আনাগোনা যাহাদের তাহাদের মুখে-মুখে অনেক তথ্য মাঝে মাঝে তাহার কানে আসে,—অ্যানিটা চ্যাটার্জ্জি এম, এ, বিনীতা ব্যানার্জ্জি বি, এ,—অনুসূয়া চিত্রলেখা প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি বহু জম্‌কালো নাম ও চম্‌কালো কাহিনী—বিংশ শতাব্দের অত্যাধুনিক মনোভাব ও রোমাঞ্চকর জীবন-যাত্রার বিবরণ—কিন্তু ইহার কতটা যে যথার্থ ও কতটা যে বানানো দূরে হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা ছিল তাহার পক্ষে কঠিন। তাই আপন সমাজের কোন চিত্রটা ছিল তাহার মনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ঘোরালো, কোনটা বা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ফিকা, এই ছবিগুলিই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্পষ্ট ও সত্য করিয়া লইবার সুযোগ মাসিমার মেয়ে প্রকৃতির বিবাহ উপলক্ষে যখন মিলিল তখন বন্দনা উপেক্ষা করিতে পারিল না, সহজেই সম্মত হইয়া তাঁহার বালিগঞ্জের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপন দলের বহুজনের সঙ্গে তাঁহাদের জানা-শুনা, বিশেষতঃ, প্রকৃতি এখানকার স্কুল-কলেজে পড়িয়াই বি, এ, পাশ করিয়াছে, তাহার নিজের বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আসিয়া পর্য্যন্ত এই দলের মাঝখানেই বন্দনার এই কয় দিন কাটিল। পিতা অনাথ রায় বোম্বায়ে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু সুধীর রহিল কলিকাতায়।

আসন্ন-বিবাহের আনন্দোৎসব নিত্যই চলিয়াছে, সেদিন বেলঘরের একটা বাগানে পিকনিক সারিয়া সদলবলে বাড়ী ফিরিবার পথেই সে দ্বিজদাসের সংবাদ লইতে এ-বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এই খবরটাই অন্নদা সেদিন বিপ্রদাসকে দিয়াছিল।

মাসীর বাড়ীতে দলের লোকের আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া সল্লা-পরামর্শের কামাই নাই, আজও ছিল অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। অতিথিগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, উপরের ঘরে মহা সমারোহে চলিয়াছে চা খাওয়া এমন সময়ে বিপ্রদাসের প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যের দল অবহিত হইয়া উঠিল কিন্তু শোফার দরজা খুলিয়া দিতে যে প্রৌঢ় স্ত্রীলোকটি অবতরণ করিল তাহার পোষাকের সামান্যতায় ও স্বল্পতায় সকলে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল। মোটরের সঙ্গে মানুষটির সামঞ্জস্য নাই। অন্নদার পরনে ছিল শাদা থান, তেমনি একটা শাদা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো, পা খালি, হাত খালি, মাথার আঁচলটা কপালের অর্দ্ধেকটা চাপা দিয়াছে,—সে নিজেও যেন সলজ্জ সঙ্কোচে কিছু জড়-সড়ো। ভৃত্য-বেহারাদের চাপকান-পাগড়ীর সাজ-সজ্জায় বুঝা কঠিন কে কোন দেশের, তথাপি সম্মুখের লোকটাকে বাঙালী আন্দাজ করিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা দিদি বাড়ী আছেন?

সে বাঙালীই বটে, কহিল, হাঁ আছেন। তাঁরা উপরে চা খাচ্চেন আপনি ভেতরে এসে বসুন।

—না আমি এইখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে একটু খবর দিতে পারবে না?

—পারবো। কি বলতে হবে?

—বলোগে বিপ্রদাস বাবুর বাড়ী থেকে অন্নদা এসেছে।

বেহারা চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে বন্দনা নীচে আসিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল। এমন সে কখনো করে নাই, ভুলিয়া গেল সামাজিক পর্য্যায়ে এই বিধবা তাহার কাছে অনেক ছোট,—ও-বাড়ীর দাসী মাত্র। অকারণে তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, অনুদি তুমি যে আমার খবর নিতে আসবে এ আমি মনে করিনি। ভেবেছিলুম আমাকে তোমরা ভুলে গেছো।

—ভুলবো কেন দিদি, ভুলিনি। বড়বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলতে—

—না অনুদি, আমাকে আপনি বলে ডাকলে আর আমি জবাব দেবোনা।

অন্নদা আপত্তি করিল না শুধু হাসিয়া বলিল, ওদের মানুষ করেচি বলেই 'তুমি' বলে ডাকি, নইলে ও-বাড়ীর আমি দাসী বইত নয়।

বন্দনা বলিল, তা হোক। কিন্তু মুখুয্যে মশাইত এসেছেন পাঁচ-ছ' দিন হলো কলকাতায়, নিজে বুঝি একবার আসতে পারতেন না? তিনি ত জানেন আমি বোম্বায়ে যাইনি।

—হাঁ, আমার মুখে এ খবর তিনি শুনেছেন। কিন্তু জানো ত দিদি তাঁর কত কাজ। এতটুকু সময় ছিল না।

একথা শুনিয়া বন্দনা খুসি হইল না, বলিল, কাজ সকলেরই আছে অন্নুদি। আমরা গিয়েছিলুম বলেই ভদ্রতারক্ষার ছলনায় তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন নইলে মনেও করতেন না। তাঁকে বোলো গিয়ে আমার মাসিমার তাঁদের মতো ঐশ্বর্য্য নেই বটে, তবু একবার আমার খোঁজ নিতে এ বাড়ীতে পা দিলে তাঁর জাত যেতো না। মর্য্যাদারও লাঘব হতোনা।

এ সকল অনুযোগের উত্তর অন্নদার দিবার নয়। সে ও বাটীতে যাবার অনুরোধ করিতে গেল কিন্তু শুনিবার ধৈর্য্য বন্দনার নাই, অন্নদার অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, না অন্নুদি সে হবে না। কোথাও যাবার আমার সময় নেই। কাল বাদে পরশু আমার বোনের বিয়ে।

—পরশু ?

—হ্যাঁ পরশু।

এ সময়ে অসুখের সংবাদ দেওয়া উচিত কি না অন্নদা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে তখনি প্রশ্ন করিয়া উঠিল, আমাকে যাবার হুকুমটা দিলে কে ? ছোটবাবুত নেই জানি, বড়বাবু বোধ করি ? কিন্তু তাঁকে বোলো গিয়ে হুকুম চালিয়ে চালিয়ে তাঁর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমি খাতকও নই, তাঁর জমিদারীর আমলাও নই। আমাকে অনুরোধ করতে হয় নিজে এসে। মেজদি ভালো আছেন ?

—হ্যাঁ আছেন।

—আর সকলে ?

অন্নদা বলিল, খবর এসেছে ছেলের অসুখ।

—কার অসুখ,—বাসুর ? কি হয়েছে তার ?

—সে আমি ঠিক জানিনে দিদি।

বন্দনা চিন্তিত মুখে বলিল, ছেলের অসুখ তবু নিজে না গিয়ে মুখুয্যে মশাই এখানে বসে আছেন যে বড়ো ? মামলা মকদ্দমা আর টাকা-কড়ির টানটাই কি হলো তাঁর এত বেশী অন্নুদি ? একটা হিতাহিত বোধ থাকা উচিত।

অন্নদা বলিল, টাকার টান নয় দিদি, আজ দুদিন থেকে তিনি নিজেও শয্যাগত। ছেলের অসুখে সেখানে তারা বিব্রত, খবর দেওয়াও যায় না অথচ এখানে দত্ত মশাই পর্য্যন্ত নেই—তিনি গেছেন ঢাকায়। একা আমি মুখ্য মেয়েমানুষ, কিছুই বুঝিনে, ভয় হ'য় অসুখটা পাছে শক্ত হয়ে ওঠে। বিপিনের কখনো কিছু হয় না বলেই ভাবনা। বিয়েটা চুকে গেলে একবার পারবে না যেতে দিদি ?

শঙ্কায় বন্দনার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল,—ডাক্তার এসেছেন ? কি বলেন তিনি ?

—বললেন ভয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য ডাক্তার ডাকতেও বলে গেলেন। অন্নদার চোখ জলে

ভরিয়া গেল, বন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এ দুটো দিন যেমন করে হোক কাটাবো কিন্তু বিয়ে চুকে গেলেও যাবে না? আমাদের ওপর রাগ করেই থাকবে? তোমাদের কোথায় কি ঘটেছে আমার জানবার কথা নয়, জানিওনে, কিন্তু এ জানি দোষ আর যে-ই করে থাক বিপিন কখনো করেনি। তাকে না জানলে হয়ত ভু'ল হয়, কিন্তু জানলে এ ভুল হবে না দিদি।

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল চলো আমি যাচ্ছি।

—এখুনি যাবে?

— হাঁ, এখুনি বই কি।

— বাড়ীতে বলে যাবে না? এঁরা ভাববেন যে।

— বলতে গেলে দেরি হবে অনুদি তুমি এসো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোটরে গিয়া বসিল। বেহারাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিল মাসিমাকে জানাইতে সে মেজদির বাড়ীতে চলিল, সেখানে বিপ্রদাস বাবুর অসুখ।

বন্দনা আসিয়া যখন বিপ্রদাসের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বেলা গেছে কিন্তু আলো জ্বালার সময় হয় নাই। বিপ্রদাস বালিশগুলা জড়ো করিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বিছানায় বসিয়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে অসুখ গুরুতর। মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, মুখুয্যে মশাই নমস্কার করি। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন গুরুজনের পায়ের ধূলো নিয়েই প্রণাম করতে। কিন্তু ছুঁতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া যান!

বিপ্রদাস কিছুই না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বন্দনা বলিল, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন,—সেবা করতে? অনুদি বলছিলো ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু একি ব্যাপার! ডাক্তারি ওষুধের শিশি যে? কব্‌রেজের বড়ি কই? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি দিলে কে আপনাকে?

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের চল্‌তি ভাষায় ডেঁপো বলে একটা কথা আছে তার মানে জানো বন্দনা?

বন্দনা বলিল, জানি মশাই জানি। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘেন্না কোরে ছোঁয় না তাদের বলে। তাদের চেয়ে বড়ো ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে না কি?

বিপ্রদাস বলিল, আছে গো আছে। যাদের সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য্য নেই, অকারণে নির্দ্দোষীকে হুল ফুটিয়ে যারা বাহাদুরি করে তারা। তাদের দলের মস্ত বড় পাণ্ডা তুমি নিজে।

— অকারণে কোন্ নির্দ্দোষী ব্যক্তিটিকে হুল ফুটিয়েছি আপনি বলে দিন ত শুনি?

— আমাকে বলে দিতে হবে না বন্দনা, সময় এলে নিজেই টের পাবে।

— আচ্ছা সেই দিনের প্রতীক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া বন্দনা খাটের কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, এখন বলুন নিজে কেমন আছেন।

— ভালো আছি কিন্তু জ্বরটা রয়েছে। রাত্রে আর একটু বাড়বে বলে মনে হয়।

— কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

— দরকার আমার নয় অন্নদার, সে-ই ভয় পেয়েছে। অনুদির মুখে শুনলুম পরশু তোমার বোনের বিয়ে, চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জবানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন সেগুলো তোমাকে শোনাবো।

— আজ পারেন না?

— না, আজ নয়।

বন্দনা মিনিট দুই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পরে কহিল, মুখুয্যে মশাই অসুখ আপনার বেশি নয় দুদিনেই সেরে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভাণ করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। আমার তোরঙ্গটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, কিসের আপত্তি বন্দনা, তোমার থাকার? কিন্তু বোনের বিয়ে যে।

— বিয়ে ত আমার সঙ্গে নয়,—আমি না গেলেও বোনের বিয়ে আটকাবে না।

— সত্যি থাকবেনা বিয়েতে?

— না।

— কিন্তু এরই জন্যে যে কলকাতায় রয়ে গেলে?

বন্দনা কহিল যাচ্ছিলুম বোম্বায়ে, ষ্টেসন থেকে ফিরে এলুম কিন্তু ঠিক এই জন্যেই নয়। দূরে থাকি, আপন সমাজের প্রায় কাউকে চিনিনে, মুখে-মুখে কত কথা শুনি, গল্প-উপন্যাসে কত-কি পড়ি, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনে,—মনে হয় বুঝি বা আমরা সমাজ-ছাড়া দল-ছাড়া এক-ঘরে। মাসিমা ডাকলেন, ভাবলুম প্রকৃতির বিয়ের উপলক্ষে দৈবাৎ যে সুযোগ মিললো এমন আর পাবো না। তাই ফিরে এলুম মুখুয্যে মশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, কিন্তু সেই বিয়েটাই যে বাকি এখনো। দলের লোকদের চেনবার সুযোগ পেলে কই?

— সুযোগ পুরো পাই নি সত্যি কিন্তু যতটা পেয়েছি সে-ই আমার যথেষ্ট।

— নিজের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিললো বন্দনা? শুনতে পারি কি?

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল আপনি সেরে উঠুন মুখুয্যে মশাই তারপরে বিস্তারিত করে শোনাবো।

•

চাকরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া বন্দনা ঔষধ খাওয়াইল, কহিল আর বসে নয় এবার আপনাকে শুতে হবে। এই বলিয়া এলো-মেলো বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বালিশগুলা ঠিক করিয়া দিল, বিপ্রদাস শুইয়া পড়িলে পা হইতে বুক পর্য্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, সেরে উঠে নিজেকে শুদ্ধ শুচি করে তুলতে না জানি কত গোবর গঙ্গাজলই না আপনার লাগবে!

বিপ্রদাস দুই হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, এত ! কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সেবা-যত্ন করতেও একটু জানো দেখ্‌চি।

— জানি একটু ? না মুখুয্যে মশাই এ চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

— অর্থাৎ –

— অর্থাৎ আমাদের নিন্দেই যদি করেন সজ্ঞানে করতে হবে। এমন ধারা চোখ বুজে যা-তা বলতে আমি দেবো না। বিপ্রদাসের মুখে পরিহাসের চাপা হাসি, কহিল, এই আমাদেরটা কারা বন্দনা ? কাদের সম্বন্ধে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে ? যাদের থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলে তাদের ?

— কে বললে আমি পালিয়ে এলুম ?

— আমি বলচি।

— জানলেন কি করে ?

— জানলুম তোমার মুখ দেখে।

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দ্বিজবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার চোখে কিছুই এড়ায় না। কথাটা যে এতখানি সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার অসুখ আমি চাইনে কিন্তু এ আমাকে সত্যিই উদ্ধার করেছে। সত্যিই পালিয়ে এসে আমি বেঁচে গেছি। যে-কটা দিন আপনি অসুস্থ আমি আপনার কাছেই থাকবো তারপরে সোজা বাবার কাছে চলে যাব—মাসীর বাড়ীতে আর ফিরবোনা। দূর থেকে যাদের দেখতে চেয়েছিলুম তাদের দেখা পেয়ে গেছি, এমন ইচ্ছে আর নেই যে একটা দিনের জন্যেও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

বিপ্রদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল ওদের শুধু শাড়ী গাড়ী আর মিথ্যে ভালোবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর কোথায় মুসোরির হোটেল আমি জানিওনে, কিন্তু ওদের মুখে-মুখে তার কি-যে নোঙরা চাপা ইঙ্গিত,—শুনতে শুনতে ইচ্ছে হতো কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই। আজ এই ঘরের মধ্যে বসে মনে হচ্চে যেন এই ক'টা দিন অবিশ্রাম এলো-মেলো ধুলো-বালির ঘুর্ণী-ঝড়ের মধ্যে আমার দিন রাত কেটেছে। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখুয্যেমশাই ?

বিপ্রদাস বলিল, সে রহস্য আমার জানার কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে বোধ করি তেমনি কোরে।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুঃখের জীবন। ওদের না আছে শান্তি না আছে কোন ধর্ম্মের বালাই। কিছু বিশ্বাস করেনা কেবলি করে তর্ক। একটু থামিয়া বলিল, খবরের কাগজ পড়ে, ওরা জানে অনেক। পৃথিবীর কোথায় কি নিত্য ঘটচে কিছুই ওদের অজানা নয়। কিন্তু আমি ত ওসব পড়তে পারিনে তাই অর্দ্ধেক কথা বুঝতেই পারতুম না। শুনতে শুনতে যখন অরুচি ধরে যেতো তখন আর কোথাও সরে গিয়ে নিশ্বেস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু তাদেরত ক্লান্তি নেই, তারা বকতে বকতে সবাই যেন মেতে উঠতো।

কিন্তু তোমার বাবার কাছে থাকলে সুবিধে হতো বন্দনা। খবরের কাগজের সব খবর তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেই টের পেতে—ওদের কাছে ঠকতে হতোনা।

বন্দনা হাসিমুখে সায় দিয়া বলিল, হাঁ বাবার সে বাতিক আছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে না পড়ে তাঁর তৃপ্তি নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েদের তাতে দরকার কি বলুন ত? কি হবে জেনে পৃথিবীর কোথায় কি দিনরাত ঘটচে!

—এ কথা তোমার মেজদির মুখে শোভা পায় বন্দনা তোমার মুখে নয়। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

বন্দনা বলিল, তারা কি আমার মেজদির চেয়ে বেশি জানে মনে করেছেন? একটুও না। শূন্য কলসী বলেই মুখ দিয়ে তাদের এত আওয়াজ বার হয়। তাদের আর কিছু না জেনে থাকি এ খবরটা জেনে নিয়েচি মুখুয্যেমশাই।

—কিন্তু জ্ঞান ত চাই।

—না চাইনে। জ্ঞানের আস্ফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠচে। জানে তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালোবাসতে? জানে না। পারে তারা মেজদির মতো ভক্তি করতে? পারেনা। ওদের বন্ধুই কি কেউ আছে? মনে হয় কেউ নেই এমনি পরস্পরের বিদ্বেষ। তাদের অভাবটাই কি কম? বাইরের জাঁক-জমকে বোঝাই যাবেনা ভেতরটা ওদের এত ফোঁপরা। কিসের জন্যে ওদের নিয়ে এত মাতামাতি? সমস্ত ভেতরটা যে একেবারে ঘুণে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, হয়েছে কি বন্দনা, এত রাগ কিসের? কেউ টাকা ঠকিয়ে নেয়নি ত?

—না ঠকিয়ে নেয়নি ধার নিয়েছে।

—কত?

—বেশি না চার পাঁচ শ।

—তাদের নাম জানোত?

—জানতুম কিন্তু ভুলে গেছি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছি ছি এত অল্প পরিচয়েও যে কেউ কারও কাছে টাকা চাইতে পারে আমি ভাবতেও পারিনে। বলতে মুখে বাধেনা, লজ্জার ছায়া এতটুকু চোখে পড়েনা, এ যেন তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার। এ কি করে সম্ভব হয় মুখুয্যেমশায়?

বিপ্রদাসের মুখ গম্ভীর হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, তোমার মনটাকে তারা বড় বিষিয়ে দিয়েছে বন্দনা, কিন্তু সবাই এমনি নয়, ঐ মাসিমার দলটাই তোমাদের সমস্ত দল নয়। যারা বাইরে রয়ে গেল খুঁজলে হয়ত তাদেরও একদিন দেখা পাবে।

বন্দনা বলিল, পাই ভালোই। তখন ধারণা আমার সংশোধন করবো, কিন্তু যাদের দেখতে পেলুম তারা সবাই শিক্ষিত সবাই পদস্থ লোকের আত্মীয়। গল্প-উপন্যাসের রঙ করা ভাষায় সজ্জিত হয়ে এরা দূরে থেকে আমার চোখে কি আশ্চর্য্য অপরূপ হয়েই না দেখা দিত। মনে গর্ব্বের সীমা ছিলনা, ভাবতুম আমাদের মেয়েদের পেছিয়ে পড়ার দুর্নাম এবার ঘুচলো। আমার সেই ভুল এবার ভেঙেছে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, ভুল কিসের? এঁরা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এ তো মিথ্যে নয়।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল, বলিল, না মিথ্যে হবে কেন, সত্যিই। তবু আমার সান্ত্বনা এই যে সংখ্যায় এঁরা অত্যন্ত স্বল্প,—এঁদেরই গড়েরমাঠের মনুমেন্টের ডগায় ঠেলে তুলে হট্টগোল বাধানো যেমন নিষ্ফল তেমনি হাস্যকর।

বিপ্রদাস বলিল, এ হচ্চে তোমার আর এক ধরণের গোঁড়ামি। স্বধর্ম্মত্যাগের বিপদ আছে বন্দনা,—সাবধান।

বন্দনা এ কথায় কান দিল না, বলিতে লাগিল, এই নগণ্য দলের বাইরে রয়েছে বাঙলার প্রকাণ্ড নারী-সমাজ। এদের আমি আজও দেখিনি, বাইরে থেকে বোধকরি দেখাও মেলেনা, তবু মনে হয় বাতাসের মতো এরাই আছে বাঙালীর নিশ্বাসে মিশে। জানি, এদের মধ্যে আছে ছোট, আছে বড়,—বড়র দৃষ্টান্ত রয়েছে আমার মেজদিতে, তাঁর শাশুড়ীতে,—এবার কল্‌কাতায় আসা আমার সার্থক হলো মুখুয্যেমশাই। আপনি হাসচেন যে?

—ভাবচি, টাকার শোকটা মানুষকে কি রকম বক্তা কোরে তোলে। এ দোষটা আমারও আছে কি-না!

—কোন্ টাকার শোক,—সেই পাঁচ শ'র?

—তাই ত মনে হচ্চে।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, টাকার জন্যে আর ভাবনা নেই। আপনাকে সেবা করার মজুরী হিসাবে ডবল আদায় করে ছাড়বো। আপনি না দেন মায়ের কাছে আদায় হবে।

অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আটটা বাজে বিপিনের খাবার সময় হলো।

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চলো অনুদি যাচ্চি। কেমন, যাই মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, যাও। কিন্তু সেবার ত্রুটি হলে মজুরী কাটা যাবে।

—ত্রুটি হবেনা মশাই, হবেনা। বলিয়া সেও হাসি-মুখে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্র

আমার সময় বেশী নেই

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্‌-এ

আমার সময় বেশি নেই
তা নিয়ে রাখি না ক্ষোভ মনে,
জীবনের যা আছে তাতেই
ভরিব মরণহীন ধনে।
কী ধন, শুধাও তুমি ?
এই চেয়ে দেখ চোখে—
পড়ে আছে ধরণীর ভূমি
প্রত্যহের সোনার আলোকে।
গাছ আছে, পাতা আছে,
নানা রঙা ফুল নাচে,
কী আনন্দ গাছে গাছে
প্রাণের আশ্চর্য্য খেলা চলে।
নীলাকাশ চেয়ে রয়
না-দেখা বাতাস বয়,
পৃথিবীর মাটি, মেঘ,
হৃদয়ে ঘনায় বেগ,
গানের আভায় উঠে জ্বলে।
কিছু নাহি বুঝি, শুধু জাগি
আরো বেশি দেখিবার লাগি।
এমনি দেখিতে চেয়ে
কখনো উঠিতে গেয়ে
এই ভালোবাসি।
জীবনের মর্ম্মে বাজে বাঁশি।
ভরে বুক নিমেষে নিমেষে
কোথাও কিছু না বাকি থাকে
মানুষের লোকালয়ে এসে
বারেবারে চিনি আপনাকে ॥

আমার সময় বেশী নেই
বারান্দায় বসেচি বিকালে,
বিদায়দিনের আলো এই
মাধুরীর স্পর্শ দিল ভালে।
সে কেমন, শুনিবে তা ?
চেতনার পরশেতে
দুঃখ সুখ ছিল মোর যেথা
শুভলগ্নে দিল আজি গেঁথে।
যেন ভোরে শুকতারা
পূর্ণিমা হলে সারা
ব্যাকুল স্মৃতির ধারা
পূজার নিমেষে ....
স্বপনের পরশন,
কত জানা, জাগরণ,
কত যে পরম বাণী
আজ সবই দিল আনি'
শেষের প্রহর পূর্ণ করি'।
কিছু নাহি চাই, শুধু চাই
এমনি জীবন ফিরে পাই।
আবার আপন দেশে
দাঁড়াই চেনার বেশে
এই পৃথিবীতে,
জীবনের মায়া গাঁথি গীতে।
কিছুই জানিনা কী বা হবে,
শুধু জানি মরণের মুখে—
যে প্রাণ এনেচে মোরে ভবে
তারই ডাকে চলেচি সম্মুখে॥

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চল্‌তি পথের বাঁশী

শ্রীনবগোপাল দাস (আই-সি-এস্‌)

পলাশপুর ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌তেই অসিত ছোট্ট একটি স্যুট্‌কেশ হাতে ক'রে নেমে পড়লে। ছোট্ট ষ্টেশন—না আছে তার ওয়েটিং-রুম, না আছে সেখানে পথ চিন্‌বার মতো আলো!

গাড়ী থেকে জন দশবারো যাত্রী পলাশপুরে নাম্‌লে—তারা সবাই এ ষ্টেশন ভালোভাবে চেনে, কোন রকম ইতস্ততঃ না ক'রে তারা সোজা একটা ভাঙ্গা গেটের দিকে হাঁটা সুরু কর্‌লে।

সন্ধ্যার আঁধার তখন হয়ে এসেছে, কিন্তু ষ্টেশনবাবু ভয়ানক মিতব্যয়ী ব'লে তখনও প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌এর বাতিগুলো জ্বালবার হুকুম দেন নি'। অসিত মনে মনে একটুখানি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই তার মনে পড়ল যে এরকম মিতব্যয়িতা পলাশপুরের ষ্টেশনবাবুরই পেটেণ্ট নয়, বাংলাদেশের অখ্যাত-অবজ্ঞাত অনেক যাত্রী-সঙ্গমেই এরকম ঘটে থাকে।

অন্যান্য যাত্রীদের পেছন পেছন সেও গেটের দিকে চল্‌ল—সবার শেষে সে। টিকিটবাবু হাঁকলেন, টিকিট মশায়...

অসিত একটা টিকিট বার ক'রে দিলে—পলাশপুরের চারটি ষ্টেশন পর কেতুনগঞ্জ পর্য্যন্ত ভাড়ার দাম সে দিয়েছিল।

টিকিটবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, এখানে ব্রেক-জার্নি হবেনা মশায়···

অসিত বল্‌লে, আমি ব্রেক্‌-জার্নি কর্‌ছি না, আমি নেমে যাচ্ছি ··

টিকিটবাবু একটুখানি সন্দেহের চোখে অসিতের দিকে তাকালেন। যা' দিনকাল তাতে এমনধারা চার ষ্টেশন আগে নেমে গেলে অনেক-কিছু মনে হয় বৈ কি! প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ আপনি এখানে নেমে যাচ্ছেন যে?

তিক্তস্বরে অসিত জবাব দিলে, তার জবাবদিহিও আপনার কাছে কর্‌তে হবে নাকি?

টিকিটবাবু প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন তার-পর সমান-ওজনে বল্‌লেন, মেজাজ দেখাবেন না, মশায়। আমাদের ডিউটি প্রশ্ন করা, তাই করতেই হবে!

অসিত তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলে। বল্‌লে, আমি জবাব দেবো না···তারজন্যে আপনি যা' করতে হয় করুন···

দু'জনের কথা কাটাকাটি শুনে দু'একজন যাত্রী যারা ছিল তারাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘর থেকে চশমা-পরা ষ্টেশনবাবুও ছুটে এলেন···ব্যাপার কী?

টিকিটবাবু রাগে গজ্‌ গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে তাঁর যা বক্তব্য বল্‌লেন। অসিত কিছু বল্‌লে না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

ষ্টেশনবাবু একটু নরম সুরে বল্‌লেন, আপনাকে ত বেশ ছোক্‌রামানুষ বলে মনে হচ্ছে...হঠাৎ এখানে এমনধারা নেমে পড়লেন কেন বলেই ফেলুন না, তাহ'লেই ত সব হাঙ্গাম চুকে যায়।

অসিতের বল্‌তে আপত্তি বা অনিচ্ছা কিছুই ছিল না, কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল সত্য উত্তরটি যদি দেয় তাহ'লে প্রবীণ ষ্টেশনবাবু এবং প্রবীণতার পথের পথিক টিকিট-বাবু কেউই তার কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না।

আসলে সে যে নিজেই জানে না কেন সে হঠাৎ পলাশ-পুর ষ্টেশনে নেমে পড়েছে! স্কুল থেকে কলেজে এসেছে সে মাত্র বছর দু'য়েক হ'ল। কল্‌কাতায় এসেই তার দৃষ্টি গিয়েছে খুলে, বাংলা দেশকে সমগ্র এবং বিশালভাবে ভালো-বাসতে শিখেছে সে। দেশনেতাদের বাণী গিয়েছে তার মর্ম্মে মর্ম্মে, তাই পূজোর বিশাল অবকাশের মধ্যে বাংলাদেশের অনাদৃত উপেক্ষিত পল্লীর সেবা করতে বেরিয়েছে সে। জ্ঞান তার কম, অভিজ্ঞতা নেই বল্‌লেই চলে, কিন্তু মনে

উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আছে প্রচুর। বাংলার পল্লীর মধ্যেই দেশসেবার অমূল্য উপাদান পাওয়া যায় এটা সে আগেও শুনেছে অনেকবার, কিন্তু কী-জানি-কেন এর আগে তার মনের মধ্যে সে সব কথা কোন সাড়াই দেয়নি'।···কেতুনগঞ্জে তারই এক পরিচিত সতীর্থ আছে, তাকে নিয়ে দু'জনে মিলে বেড়িয়ে পড়্‌বে এই ছিল মতলব। এম্‌নি সময় তার হঠাৎ খেয়াল হ'লো যে পলাশপুরে থাকেন তার পরিচিত এক পিতৃবন্ধু। তাই গাড়ী যখন ধীরে ধীরে পলাশপুর ষ্টেশনে এসে থাম্‌লে তখন তার খেয়াল হ'লো একবারটি এই ভদ্রলোকের সাথে আলাপ ক'রে যায়—তার তরুণ কৈশোরের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর কাছে বলে।

এসব কথা কি চশমাপরা ষ্টেশনবাবু বা ভ্রূকুটি-কুটিল টিকিটবাবুকে বুঝিয়ে বলা যায় ?···অথচ তাদের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবার কোন উপায়ও যে নেই! কী এক বয়সের ছাপ মুখের উপর পড়েছে!—যেখানে যায় কারণে অকারণে সন্দেহ! বিরক্তির মধ্যেও তার মনে মনে ভয়ানক হাসি পাচ্ছিল।

অবশেষে বল্‌লে, দেখুন, আমার ভয়ানক কোন মতলব নেই এখানে নেমে পড়্‌বার। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক এখানে থাকেন, তাঁরই সাথে একবার দেখা কর্‌তে ইচ্ছা হ'লো, তাই নেমে পড়্‌লুম।

ষ্টেশনবাবু অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন কর্‌লেন, তাঁর নামটা জান্‌তে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই, ভবাণী মুখুজ্যে···আপনি তাঁর বাড়ী চেনেন কি ?

ছোট্ট ষ্টেশন—আশেপাশে গ্রামের সবাইকেই প্রায় ষ্টেশনবাবু চেনেন···বছর বারো ধরে তিনিই ত' এখানকার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা! তাঁর চোখের সাম্‌নে দিয়ে কতো কী হ'লো!···বছর পাঁচেক আগে ঐ কেতুনগঞ্জের আগের মাইল-পোষ্ট্‌টার কাছে একটা গরুর গাড়ীর সাথে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেণের যখন কলিসন্‌ হয় তখন সব ঘটনার তদন্তের ভার পড়েছিল তাঁরই ওপর!...গেল বছর এখান দিয়ে যখন লাটসাহেবের স্পেশাল গাড়ী যায় তখন তাঁর কি গর্ব্ব! পলাশপুরে স্পেশাল থামেনি, কিন্তু নীলকুর্ত্তি পরা চৌকীদার-দফাদারদের সারি নিয়ে তিনি কী আধমিলিটারী কায়দায় সেলাম করেছিলেন এবং লাটসাহেব তাঁর কামারা থেকে রুমাল উড়িয়ে তাঁর সেলামের প্রতি-অভিবাদন জানিয়েছিলেন সে ছবি ত এখনো তাঁর চোখের সামনে ভাসছে!···আর তিনি নগণ্য ভবানী মুখুজ্যের বাড়ী চেনেন না!

গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, চিনি বৈ কি, মশায় আমি চিনিনে ?···ওই রাস্তা ধরে সো—জা চলে যান্‌, খানিকটা দুর গেলেই দেখবেন একটা এঁদো পুকুর, তার বাঁপাশে বাঁশবনের ঝোপের মধ্য দিয়ে খুব সরু একটা রাস্তা চলে গেছে, এগিয়ে সেখানে জিজ্ঞেস করলেই পাবেন।

অসিত ধন্যবাদ দেবে কি না ভাবছিল। অবশেষে নিতান্ত এলোমেলো একটা নমস্কার ঠুকে সে ষ্টেশন গেট দিয়ে বার হয়ে গেল।

ষ্টেশনবাবু একটু গম্ভীরভাবে ঘার নেড়ে বল্‌লেন, আজ-কালকার ছোক্‌রা, কী মতলবে যে এখানে এসেছে বলা শক্ত···কি বলো হে, হরিপদ ?

হরিপদ টিকিটবাবুর নাম। একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌লেন, তাইত আমি বল্‌ছিলুম ছোক্‌রাকে অমনভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হচ্ছে না।···সুটকেশটা দেখ্‌ছিলেন ত ?···ওর মধ্যে কী যে আছে এবং কী যে নেই তা' আপনি বল্‌তে পারেন ?

ষ্টেশনমাষ্টার ব্যাপারটা এখন ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বল্‌লেন, তাইত···বড্ড ভুল হয়ে গেছে!

অন্ধকার গ্রাম্যপথ—তারই মধ্য দিয়ে অসিত চল্‌ছিল। জোনাকী পোকাগুলো সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্য দিয়ে উল্কার শিখার মত এদিক্‌ ওদিক্‌ ছুটে বেড়াচ্ছিল।

অসিত মনে মনে ভাব্‌ছিল, এম্‌নি আচম্‌কা আগমনে তাঁর পিতৃবন্ধু খুসী হবেন কি ?···বছর তিনচার আগেকার কৈশোর বয়সের স্মৃতি তার মনের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছিল। তখন সে স্কুলে পড়ে। এই ভবানীবাবু একবার তাদের বাড়ীতে এসেছিলেন, অসিতের সুর করে ভূগোল পড়া লক্ষ্য ক'রে খুব হেসেছিলেন, বলেছিলেন, আপনার ছেলেটি দেখ্‌ছি ভূগোলের নীরস নাম আর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও কবিত্ব ফুটিয়ে তুল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে!

এঁদোপুকুরের বাঁ-পাশ দিয়ে অনতিপ্রসর একটা পথ;

তাকে ঠিক পথ বলা চলে না, শুধু লোকের পায়ে-চলায় যেন একটা সরুরেখা বেরিয়ে গেছে সবুজঘাস আর লতাগুল্ম ভরা ঝোপের মাঝ দিয়ে।

ভবানী মুখুজ্যের বাড়ী খুঁজে বার করতে তার বেশী বেগ পেতে হ'ল না। দুয়ারের সামনে গিয়ে সে হাঁকলে, বাড়ীতে কেউ আছেন কি ?

একটু পরেই দুয়ার খুলে গেল। একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বার হয়ে এসে কৌতুহল ও বিস্ময়মাখাসুরে প্রশ্ন করলেন, আপনি কাকে খুঁজছেন ?

অসিত অন্ধকারের অস্পষ্ট আলোতেও ভদ্রলোকের চেহারার ছাপটা বেশ বুঝতে পারছিল। সুটকেশটা মাটিতে রেখে একটা নমস্কার করে বললে, আমি অসিত···

ভবানীবাবু প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেননি', একটুখানি আম্‌তা-আম্‌তা ভাবে বললেন, অসিত ?···ঠিক ত চিনতে পারলুম না···

—নীরদবাবুর ছেলে আমি···

মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। ভবানীবাবু তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন, ওঃ—নীরদের ছেলে তুমি ?···এসো, বাবা, এসো।·· ভয়ানক বড় হয়ে উঠেছ যে, তোমাকে চিনতে পারাও মুস্কিল···কতদিন আগে তোমায় দেখেছি! বছর পাঁচেক হবে, না ?

সুটকেশটি হাতে করে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অসিত বললে, হ্যাঁ, প্রায় বছর চারেক ত হবেই!·· তখন আমি স্কুলে পড়তুম!

একনিঃশ্বাসে অসিত তার গত চার বছরের ইতিহাস বলে গেল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর অবধি সে কল্‌কাতায় পড়ছে।···পুজোর ছুটিতে সে বেরিয়েছে বাংলাদেশের পল্লীর সাথে ভালোভাবে পরিচিত হ'তে, হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে সে এখানে নেমে পড়েছে। ভবানীবাবু যে এখানে থাকেন তা' সে জানত, কিন্তু ষ্টেশনে নামা অবধি অসিতের কেবলই ভয় হচ্ছিল বুঝি বা তাঁকে পাওয়া যাবে না!·· বলাও ত যায় না, পুজোর ছুটিতে যদি দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও বেড়াতে চলে যেতেন!

ভবানীবাবু বললেন, না, বেরুনো আর হ'লো কোথায় ? ···মীরাকে নিয়ে একবারটি কোথাও যাবার ইচ্ছে ত ছিল, কিন্তু সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে সব আশাত আর পূর্ণ হয়না! ···তা' ভালোই হলো, তোমার সাথেত দেখা হতনা নইলে!··· ভগবান্ যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন!

ভগবান্ যা করেন তা' ভালো কি মন্দের জন্যে করেন সে সম্বন্ধে অসিতের কিছু মতদ্বৈধ ছিল হয়ত, কিন্তু সে' কোন প্রশ্ন বা সংশয় প্রকাশ করলে না।

হাত মুখ ধুয়ে অসিত যখন একটু সুস্থ হয়ে বসল তখন একটুখানি শোকসন্তপ্তসুরে ভবানীবাবু বললেন, সব চেয়ে দুঃখ এই বাবা যে, মীরার মার সাথে তোমার আর দেখা হ'লো না···তিনি যে কি খুসী হ'তেন তোমাকে দেখলে!

বলতে বলতে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। অসিত শীঘ্রই জানলে যে ভবানীবাবুর স্ত্রী গতবছর পুজোর ঠিক হপ্তা তিনেক আগে টাইফয়েড এ মারা গেছেন।

অসিতের কোমল মন সহজানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠল। ভবানীবাবুকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না সে।···কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে সে, আর ভবানীবাবু পৌঁচেছেন প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায়—সহানুভূতির ভাষা ত' তার মুখ দিয়ে বার হওয়া সম্ভব নয়!

ভবানীবাবু বললেন, তোমার একটু কষ্ট হবে, বাবা··· আমার একটা ঝি আর ঠাকুর আছে, তাদের হাতেই সব··· মেয়ের বয়স ত আর বেশী নয়, বছর বারো তেরো হবে, সেত নিজে সব গুছিয়ে নিতে পারে না।

ভবানীবাবু মীরার গল্পই করতে আরম্ভ করলেন। অসিত মাঝে মাঝে ভাবছিল, যাকে নিয়ে এত কথার উৎস সে কোথায় ?

মীরার সাথে পরিচয় হ'তে কিন্তু বেশী দেরী হ'লো না। কিছুক্ষণ পরেই কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলে ঢাকা মুখ একটি হাস্যমুখী মেয়ে ভবানীবাবুর কাছে ছুটে এসে বললে, আজ ভারী একটা মজা হয়েছে কিন্তু বাবা ··

ভবানীবাবু সস্নেহদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার মাথায় হাতটি রেখে প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে মা ?

ঘাড়টি দুলিয়ে ভারীসুন্দর একটি ভঙ্গীতে হেসে মীরা জবাব দিলে, জনার্দ্দন ঠাকুর কোত্থেকে একঝুড়ি পেঁপে

নিয়ে এসেছে, বল্‌ছে তা দিয়ে নাকি সে নতুন রকমের ঘণ্ট তৈরী করবে···ডুমোডুমো ক'রে যা' কাট্‌ছে!

অসিত মুগ্ধনেত্রে মীরাকে লক্ষ্য কর্‌ছিল।

ভবানীবাবু এতক্ষণ মীরার সাথে অসিতের পরিচয় করিয়ে দেন্‌নি'; গায়ে এলিয়ে পড়া মীরাকে একটু তুলে বল্‌লেন, তোমার নতুন দাদার সাথে আলাপ ক'রেদি'···এ হচ্ছে অসিত, আমাদের গাঁয়ে বেড়াতে এসেছে আমার বহুদিনের পরিচিত এক বন্ধুর ছেলে।

মীরা তার চঞ্চল চোখ দুটি দিয়ে একবার অসিতের দিকে তাকালে, অসিত কী বল্‌বে ভেবে পাচ্ছিল না। এই নতুন বোনটির সাথে ঠিক কেমনটি ক'রে আলাপ কর্‌লে সবগুলো সুরের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় তাই সে চিন্তা কর্‌ছিল।

মীরা কিন্তু অসিতের লজ্জানত মুখ দেখে ভয়ানক ভাবে আমোদ অনুভব কর্‌ছিল। সে দ্বিধাশূন্য মনে অসিতের কাছে এসে বল্‌লে, আপনাকে অসিদা' বলে ডাক্‌বো, কী বলেন?

অসিত মীরার এই সপ্রতিভ ব্যবহারে বেশ একটুখানি লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ল। তারপর হাসিমুখে বল্‌লে, বেশ··· কিন্তু দাদার হুকুম সব তামিল কর্‌তে হ'বে তা' যেন মনে থাকে!

হেসে মীরা বল্‌লে, আমি বেশ পার্‌বো অসিদা'···কিন্তু যখন-খুসী-আমার তখনই গল্প কর্‌তে হ'বে তা' বলে রাখ্‌ছি!

অসিত হাসিমুখে এই সর্ত্তে রাজী হ'লো।

*

* *

ভোরবেলা অসিতের ঘুম ভেঙ্গে গেল মীরার চেঁচামেচিতে। দম্‌কা হাওয়ার মত মীরা বৈঠকখানায় এসে বল্‌লে, মাগো ···আপনি কী ভীষণ আল্‌সে, অসিদা'···দুপুর রোদেও দিব্যি আরামে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন!

অসিত তার নিদ্রালস চোখ দুটি খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে প্রভাতের সোনালী আলোতে সবুজ ঝোপ আর গাছের ঝাড় ভরে গেছে! তাড়াতাড়ি সে উঠে বসে বল্‌লে, বেজায় ঘুমিয়েছি, না?···তুমি লক্ষ্মী মেয়েটিত' এরই মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে এসেছ দেখ্‌ছি!

খুব গম্ভীর মুখ ক'রে মীরা জবাব দিলে, আমাদের কতো কাজ কর্‌তে হয় অসিদা', আপনার মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌লে ত' চলে না!

অসিত মীরার দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বল্‌লে, স্বপ্ন দেখ্‌তে পাওয়াটাও কম জিনিষ নয়, মীরা···এতদিন শুধু অন্ধকারের মধ্যে অবোধ শিশুর মত ঘুরে বেড়িয়েছি, এখন মনের মধ্যে স্বপ্ন জেগে উঠেছে···বাস্তবের মধ্যে তার বিকাশের পথ খুঁজ্‌ছে।

দুর্ব্বোধ্য ভাষা···মীরা অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

অসিত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে তাকে বল্‌তে লাগ্‌ল তার নতুন উন্মাদনার কাহিনী। কোন্ সে আহ্বানের সুর তার কাণে পৌঁচেছে·· তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্যেই সে খেয়ালীর মত বেরিয়ে পড়েছে···।

মীরা অসিতের সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না, যেন ভয়ানক হেঁয়ালি আর রূপকভরা কথা অসিদা'র। প্রশ্ন কর্‌লে, কল্‌কাতা আপনার বুঝি ভালো লাগে না, অসিদা?

—ভালো লাগে খানিকটা···কিন্তু দু'দিন পরেই ভালো লাগার উচ্ছ্বাসটা কমে আসে। তখন মনে হয় বাংলা মায়ের শ্যামল আঁচলখানির কথা, যা' তিনি বিছিয়ে দিয়েছেন এখানকার পল্লীতে, মাঠে, কোলাহলের উপকণ্ঠে।

—আমার কিন্তু কল্‌কাতায় যেতে ভয়ানক ইচ্ছে করে অসিদা'···চিড়িয়াখানায় নাকি কত দেশ বিদেশের জন্তু আছে, সেই সুমেরু-কুমেরু থেকে ধরে আনা শাদা ভালুক পর্য্যন্ত! সত্যি অসিদা'?

হেসে অসিত বল্‌লে, সুমেরু-কুমেরু থেকে ধরে আনা শাদা ভালুক সেখানে নেই, মীরা, কিন্তু নানা দেশের হরেক রকমের জানোয়ার সেখানে আছে একথা সত্যি।

কথার ধারা বদ্‌লে গিয়েছিল। অসিত আবার বাংলা-দেশের পল্লীর কথা তুল্‌লে। বল্‌লে, এম্‌নি সোনার দেশ আমাদের আজ কী যে হয়ে গেছে!

মীরা অসিতের এই উচ্ছ্বাসের হেতুটুকু সম্পূর্ণভাবে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না। অসিদা' কী সব ছোটখাট জিনিষ নিয়ে যে আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েন!···অথচ তার নিজের মন তখন সহস্র প্রশ্নভরা কৌতূহলে পূর্ণ।

প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, অসিদা, কল্‌কাতায় নাকি নিঃশ্বাস ফেলবার মত একটুখানি খোলা জায়গা নেই?…মাগো, আমিত ভাব্‌তেই পারি না সেখানকার আড়ষ্ট আব্‌হাওয়ার মধ্যে লোকে বাঁচে কী ক'রে!

উত্তর দেবার অবসর না দিয়েই আবার প্রশ্ন করে বস্‌লে, কলেজে পড়তে আপনার খুব ভাল লাগে, না?…সেখানে ত একটুও পড়া কর্‌তে হয় না! আর এখানে আমাদের ইস্কুলে অণিমাদি' কী ভীষণ বকেন, যদি একদিনের তরেও পড়া না করে আসি!

অসিত প্রশ্ন করলে, এখানেও মেয়েদের স্কুল আছে নাকি?

এখানে না, পাশের গ্রামে, বেশ বড়ো গাঁ কিন্তু! আমরা প্রায় কুড়ি পঁচিশজন মেয়ে সেখানে—অনিমাদি' এবং সুলেখাদি' আমাদের পড়ান…সুলেখাদি' কিন্তু বড়ো ভাল, আমাদের সাথে এসে অনেকসময় খেলা করেন…উঃ, সেবার আমরা হাডু-ডু খেলছিলুম, সুলেখাদি' ছিলেন আমাদের দলে, আমরা বড়োমেয়েদের যা' হারিয়ে দিলুম!

মীরার প্রশ্ন এবং কথার স্রোতের শেষ আর ছিল না। বহুদিনপরে নবীন একটি শ্রোতা পেয়ে তার বুভুক্ষু মন আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌ছিল। দাদাদের স্নেহ বা সাহচর্য্য সে পায়নি—বাবা-মার একটিমাত্র সন্তান সে। নিভেযাওয়া ঘুমন্ত আবেগ অসিতের সান্নিধ্যে প্রবলভাবে জেগে উঠ্‌ছিল তার।

ভবানীবাবু ভোর বেলা উঠেই কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অসিতকে বিছানার উপর অর্দ্ধশায়িত দেখে বল্‌লেন, এখনও ওঠোনি'?…মীরাবুঝি ভোরবেলা থেকেই গল্প সুরু করেছে?

মীরা তিরস্কারের সুরে বল্‌লে, আমার নামে মিথ্যে কথা বলোনা, বাবা! রোদ্দুর উঠে যাবার পর আমি অসিদা'কে ডাক্‌তে এসেছি, তা' অসিদা' এমন আল্‌সে যে উঠি-উঠি করেও উঠছেন না!

অসিত বল্‌লে, বাঃ—রে! আমায় উঠ্‌তে না দিলে উঠ্‌ব কী করে? তুমি এসে অবধি ত' প্রশ্ন আর মন্তব্যের ঠেলায় আমাকে অস্থির করে তুলেছ! উঠ্‌বার অবসর কোথায়?

বাবার দিকে তাকিয়ে মীরা বল্‌লে, দেখো, বাবা, কী চমৎকার ওজর অসিদা'র!…আমি গল্প কর্‌ছি বলে বুঝি উঠ্‌বার সুযোগটুকুও কেড়ে নিয়েছি আপনার, অসিদা?

ভবানীবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন, তুমি ওর সাথে কথায় পেরে উঠ্‌বেনা, অসিত। অনেকদিনপর তোমার মত একটি সাথী পেয়ে ওর তর্ক করবার সব লুপ্ত ক্ষমতা জেগে উঠেছে, কারণ তার প্রয়োজন আছে যথেষ্ট।

অভিমানভরা মুখ নিয়ে মীরা অসিতের বিছানার কোণ থেকে উঠে চলে গেল।

ভবানীবাবুর সাথে অসিত গল্প কর্‌ছিল—তার প্ল্যান্ সম্বন্ধে। কেতুনগঞ্জ থেকে বন্ধুকে নিয়ে এসে সে কী ভাবে কাজ কর্‌বে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল।

ভবানীবাবু প্রশ্ন করলেন, তুমি definite কোন প্ল্যান্ করেছ কি, অসিত?…শুধু ঘুরে বেড়ালেই ত চল্‌বেনা!…তা ছাড়া ছন্ন-ছাড়ার মত ঘুরে বেড়ালে কর্ত্তাদের দৃষ্টিও পড়বে তোমার উপর!

অসিত হাস্‌তে হাস্‌তে ষ্টেশনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বল্‌লে।

ভবানীবাবু বল্‌লেন, এই দেখ, আমি যা' বলেছি তা' সত্যি কিনা!…তুমি ত বাংলার পল্লীরই ছেলে, তুমি অনায়াসেই একটা concrete প্ল্যান্ ঠিক ক'রে নিতে পার!

অসিত বল্‌লে, ভাব্‌ছি আমাদের দেশের গরীব চাষাভূষোদের স্বাস্থ্যনীতির মোটা কথাগুলো আমরা শিখিয়ে দেব। ওদের মাঝখানে কিছুদিন করে থেকে নিজেরা হাতেনাতে সব দেখিয়ে দিলেও কি ওরা শিখবেনা?…সাধারণ বুদ্ধির অভাব ত' নেই ওদের!

ভবানীবাবু গম্ভীরভাবে বল্‌লেন, আমাদের দোষত ঐখানেই, অসিত। এদের মাঝখানে থেকে আমরা কোন কাজ করতে চাই না, বাইরে থেকে দু'চারটে শুক্‌নো উপদেশ দিয়েই আমরা মনে করি কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল।

অসিত ভবানীবাবুর কথাগুলো গভীর মনযোগ দিয়ে শুনছিল। হঠাৎ খেয়ালের বশে যে পলাশপুর ষ্টেশনে সে নেমে পড়েছিল তার জন্যে তার একটুও অনুতাপ হচ্ছিল না।

এখন। সে মনে সম্ভব-অসম্ভব নানারকম কল্পনার জাল বুন্‌ছিল।

মীরা সেই যে অভিমান করে ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে সে আসেনি'। অসিত ভবানীবাবুকে প্রশ্ন করলে, মীরা গেল কোথায় ?

—কোথায় আর যাবে ? আশে পাশেই ঘুরছে হয়ত !

অসিত মীরার খোঁজে বেরিয়ে গেল।...এদিক্‌ ওদিক্‌ তাকিয়েও যখন তার দেখা পেলে না তখন সে একটু বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল এমন সময় দেখ্‌লে এঁদো পুকুরের পাশ দিয়ে একটা ক্ষেতের মধ্যে মীরা হলদে সর্ষে ফুল তুল্‌ছে।

অসিত চীৎকার করে ডাক্‌লে, মীরা ··

মীরা একবার চোখ তুলে তাকালে...হাওয়ায় তার উচ্ছৃঙ্খল চূর্ণকুন্তল কপালের উপর এসে নাচছিল।...কিছু না বলে সে আবার গম্ভীর ভাবে ফুল তোলায় মনোনিবেশ করলে।

অসিত আবার ডাক্‌লে, মীরা...এদিকে এসো, নইলে আমি চল্‌লুম কিন্তু! অবিশ্বাসভরা চোখে মীরা একবার তাকিয়ে দেখ্‌লে মাত্র...তারপর আবার তার কাজে মন দিলে !

শেষবারটির মত অসিত ডাক্‌লে, মীরা...

অভিমান বেশীক্ষণ দেখানো ভালো নয়, অথচ একয়বার উপেক্ষা এবং প্রত্যাখ্যানের পর চলে-আসাটা ভয়ানক লজ্জাকর একটা পরাভবের মত দেখাবে !...তাই মীরা কিছু না বলে শুধু হাতটি নেড়ে অসিতকে ডাক্‌লে...

অসিত দৌড়ুতে দৌড়ুতে কাছে এসে বল্‌লে, বড্ড রাগ হয়েছে, না ?

মীরা ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিলে, বাবার সাথে তোমার কাজের গল্প ক'রোগে, অসিদা',আমার মত দুরন্ত মেয়ের সাথে বাজে গল্প বলে তোমার সময় নষ্ট ক'রো না !

মীরার কথার মধ্যে অভিমানের সুর দেখ্‌তে পেয়ে অসিত মীরার হাতদুটি ধরে বল্‌লে, লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার, রাগ করো না...বোনের সাথে গল্প করলে সময় নষ্ট হয় একথা তোমায় কে বল্‌লে ?

মীরা তবু সন্তুষ্ট হতে পার্‌ছিল না। অসিত তখন তার শাড়ীর আঁচলটি তার বাঁ-হাতের সাথে জড়িয়ে তাকে টান দিয়ে বল্‌লে, ছি...অসিদা'র উপর রাগ করতে নেই...এসো...

মীরার মুখে হাসি ফুটলো, যেন বর্ষার মেঘলা দিনের ছায়া ভেদ করে রৌদ্রের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌ল।

*

* *

কথা ছিল রোদ পড়্‌লে মীরা অসিদা'কে নিয়ে যাবে খড়ুই নদীর বাঁধ-ভাঙা দেখ্‌তে। উচ্ছ্বসিত উৎসাহে হাতমুখ নেড়ে যেভাবে সে খড়ুই নদীর বর্ণনা কর্‌ছিল তাতে অসিতের মনে হচ্ছিল সত্য সত্যই বুঝিবা সেটা পৃথিবীর সাতটা আশ্চর্য্যের পরই একটা কিছু হবে।...বারবার এসে সে অসিদা'কে বল্‌ছিল, এরকম জিনিষ আপনি আর কখন-ওই দেখেননি, অসিদা' এ আমি জোর করে বল্‌তে পারি।

অসিত পদ্মাপারের ছেলে। পদ্মার কৈশোর এবং যৌবন এবং তার আগে-পরের সব তারুণ্য-মূর্ত্তিই সে দেখেছে।...বর্ষার আহ্বানে পদ্মা কেমন করে বাঁধনহারা চঞ্চলতা নিয়ে ছুটতে থাকে তার ছবি তার মনে তখনও ভাসছিল...তবু মীরার খড়ুই নদীর বর্ণনার কাছে সে সবই যেন নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল !

বল্‌লে, তোমার খড়ুই-নদীর যদি এতখানি ক্ষমতা এবং বৈচিত্র্য থেকে থাকে, মীরা, তাহলে ভূগোল যাঁরা লেখেন তাঁদের ন্যায়বিচারের প্রশংসা কিছুতেই করা যায় না। ...খড়ুই-এর কাছে কোথায় লাগে বনানী-ভরা অ্যামাজন বা হলদে-বালু সমাকীর্ণ ইয়াং-সি-কিয়াং !

তার কথার মধ্যে উপহাসের সুর লক্ষ্য করে মীরা ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে, আপনি বিশ্বাস কর্‌ছেন না, অসিদা, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি আমার কথায় একটুও বাড়ানো নেই।

অসিত হেসে বল্‌লে, আচ্ছা...আচ্ছা...রোদের তাতটা কমে যাক্‌—নিজের চোখ দিয়েই সব সংশয় ভঞ্জন হবে।

বার বার এসে মীরা প্রশ্ন কর্‌ছিল, অসিতের যাবার সময় হয়েছে কি না। অসিত তার অতি-উৎসাহে বেশ আমোদ বোধ কর্‌ছিল। বল্‌ছিল, তোমার খড়ুইত শুকিয়ে যাচ্ছে না, মীরা...

—বাঃ-রে, আমি তাই বুঝি বল্‌ছি ?

—তবে এত তাড়া কেন ?

—সকাল সকাল বার হ'লে আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারব অসিদা...সেই যেখানে বটগাছটার পাশদিয়ে খড়ুই বেঁকে গেছে আর মাটির সঙ্গে ঢেউ মিশে সাদা ফেনার সৃষ্টি করছে! সেখান থেকে রাতের আগে ফিরে আস্‌তে হবেত!...নইলে বাবা ভয়ানক বকবেন।

ভবানীবাবুর দিকে তাকিয়ে অসিত প্রশ্ন করলে সত্যি সে জায়গাটায় দেখবার মতো কিছু আছে কিনা। ভবানী বাবু বল্‌লেন জায়গাটা দেখতে বেশ সুন্দর—এ অঞ্চলে বোধ হয় সেই জায়গাটাই সব চেয়ে বৈচিত্র্যময়...তবে, মীরার কথায় তুমি আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে আরম্ভ করো না যেন! তোমার যা' ভাবুক মন তুমি হয়ত তার মধ্যে কতো কী মাধুর্য্য এবং প্রচণ্ডতা খুঁজতে আরম্ভ করবে!

অসিত ভবানী বাবুর কথায় একটু হাসলে। তারপর মীরার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, শুন্‌ছ ত' তোমার বাবা কী বল্‌ছেন ?

ঠোঁট ফুলিয়ে মীরা জবাব দিলে, বাবা সব সময়ই ঐ রকম বলেন, অসিদা...আপনি ওঁর কথা কিছু বিশ্বাস করবেন না যেন!

অবশেষে রোদ সত্যি সত্যিই পড়্‌ল। মীরা অসিতের হাত ধরে বল্‌লে, এবার ত আর কুঁড়েমি কর্‌লে চলবে না, অসিদা।

গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ী ছাড়িয়ে খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে অসিত আর মীরা পাশাপাশি চল্‌ছিল।...বর্ষায় ঘাসগুলো অবাধ্য ছেলের মত ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর তাদের শীষ থেকে চোর কাঁটা সব অসিতের কোঁচায় এবং মীরার শাড়ীতে ফুটছিল।

অসিত বল্‌লে, আর কতদূর যেতে হবে মীরা ?

—বেশী দূর নয়, ঐ যে অশথ্‌ গাছটা দেখছেন তারই একটু আগে...

অশথ্‌ গাছটা অসিত বেশ ভালো ভাবেই দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু মীরার দূরত্ব জ্ঞানকে সে নির্ভুল বলে মেনে নিতে পার্‌ছিল না।...তবু মীরার উৎসাহে এবং উচ্ছ্বাসে যেন সে গা ঢালা দিয়ে চল্‌ছিল।

অশথ্‌ গাছটা তখনও বেশ কয়েক হাত দূরে। মীরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আপনার বেজায় কষ্ট হচ্ছে বুঝি অসিদা ?

কষ্ট একটু অসিতের হচ্ছিল। মীরাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে হলে তার বলা উচিত ছিল না...। কিন্তু ফস্‌ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হ্যাঁ...

মীরা চোখ মুখ লাল করে বললে, আপনার আর গিয়ে দরকার নেই অসিদা...কলকাতায় গিয়ে সহুরে বাবু হয়ে গেছেন আপনি, এইটুকু হাঁটতেই আপনার পা ধরে এল!

ধপ্‌ করে ঘাসের উপর মীরা বসে পড়্‌ল।

অসিত মনে মনে বিপদ গুণলে। মীরা যে-রকম এক-গুঁয়ে মেয়ে তাতে তার অভিমান টলানো মুস্কিল। সে ধীরে ধীরে অপরাধীর সুরে বল্‌লে, আমার তেমন কষ্ট ত কিছু হচ্ছিল না, মীরা...

—না, আমায় আর খোসামোদ করতে হবে না...খড়ুই দেখবার ইচ্ছে আপনার আদৌ ছিল না, শুধু আমি জোর করে আপনাকে টেনে নিয়ে এসেছি, তাই!

—তাই কি?

—তাই এসেছেন!...খুব তীব্রভাবে মীরা কথাটি বললে।

অসিত অনুনয়ের সুরে বল্‌লে, লক্ষ্মী বোনটি, সত্যি বল্‌ছি খড়ুই দেখ্‌বার ইচ্ছে আছে বলেই এসেছি, শুধু তোমার টেনে আনার জন্যে আমার আসা নয়।

মীরার অভিমান তবু ভাঙ্গে না।...খড়ুইকে যে ভালো-বেসে দেখতে না চায় তাকে জোর করে নিয়ে লাভ কী? কেন যে লোকে তার মতো মন নিয়ে খড়ুইকে দেখতে পারে না তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

মীরা কিছুতেই নড়বে না দেখে অসিত অগত্যা বল্‌লে তাহলে আমি একলাই চল্‌লুম মীরা...যা দেখতে এসেছি তা না দেখে ফিরব না!

অশথ্‌ গাছের কাছটাতে যখন অসিত এসে পড়েছে তখন তার পিঠে ছোট্ট একটী ঢিল এসে পড়ল। পেছন ফিরে

তাকিয়ে দেখলে, মীরা···দুষ্টুমিভরা হাসিতে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অসিত তার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে না পেরে ফিক্ করে হেসে ফেল্লে। মীরা ছুটে এসে তার গায়ে ঢলে পরে বল্লে, নিজে দোষ করে আবার আমার উপরই রাগ করা হচ্ছিল, না ?

মীরার দোলায়মান বেণীটি ধরে একটুখানি নাড়া দিয়ে অসিত বল্লে, ছোট্ট বোনটির উপর রাগ করতে পার্লে ভারী সুখ হয়, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

খড়ুই নদী—যা' নিয়ে সারাটা দিন মীরার কথার স্রোতের অন্ত ছিল না—তার সাম্নে এসে অসিত থম্কে দাঁড়ালে। মীরা যা' বলেছিল তা' সবটা সত্যি না হ'লেও দেখ্তে যে ভারী সুন্দর হয়েছিল তা' অস্বীকার করবার জো ছিল না।··· ঝোপে থেকে গাছের সব শাখা বাহুপ্রসারণ করে জলের স্নিগ্ধ আলিঙ্গনলোভে যেন আকুল হয়ে উঠেছিল।

মীরা বল্লে, এদিকটার চেয়ে আরো সুন্দর ঐখানে, বটগাছটার পাশে, খড়ুই সেখানে বেঁকে গিয়েছে কি না !··· যাবেন অসিদা' ?

অসিত মীরার দিকে তাকালে—মীরার চঞ্চল মন যাবার উৎসাহে আকুল। অসিত বল্লে' চলো···

ভয়ানক খুসী হয়ে মীরা পথ দেখিয়ে এগিয়ে এগিয়ে চল্তে লাগলে। মাঝে মাঝে সে পেছন ফিরে তাকায়, অসিত সত্যি আসছে কি না দেখবার জন্যে।

অসিত বল্লে, পালিয়ে যাবো ভয় হচ্ছে বুঝি ?

—আপনার কিছু ঠিক নেই ত ! যদি পালিয়েই যান্···

বটগাছের তলায় এসে মীরা দাঁড়ালে। গভীর তৃপ্তিভরা চোখে খড়ুই এর খরস্রোতের দিকে তাকালে।···দিনের পর দিন সে এর উদ্দাম স্রোতের দিকে তাকিয়েছে, শ্রান্তি বা অবসাদ তার মনে একটুও আসে নি'। তার কিশোরী-মনের প্রত্যেক কন্দরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়ে উঠ্ছিল।

—আচ্ছা, সত্যি করে বলুন ত অসিদা' এর চেয়ে সুন্দর আপনি কিছু দেখেছেন কি না !

সত্যি করে যদি কোন উত্তর দিত তাহ'লে মীরা মনে ব্যথা পেত এটা ঠিক···তাই অসিত বল্লে, সত্যি, ভারী সুন্দর এ···

আনন্দভরা চোখে মীরা বল্লে, তাহ'লে ঠকেননি বলুন ?

—না···

দূরে সাঁওতালদের মাদল ঝঙ্কার শব্দ ভেসে আস্ছিল। খড়ুইয়ের অপর পারেই সাঁওতালদের বস্তি। মিঠে গেঁয়ো সুর—অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের সাথে মিশে এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার সৃষ্টি···

মীরা প্রশ্ন কর্লে, সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের দেখেছেন আপনি কখনও, অসিদা' ?

অসিত ঘাড় নেড়ে জানালে সে দেখে নাই।

উচ্ছ্বসিত ভাবে মীরা বল্লে, ভারীসুন্দর দেখ্তে অসিদা' ···কালো চেহারা, পায়ে রূপোর মল, গলায় হাঁসুলি, চুলে বনফুল···আর ছোট ছোট ছেলেদের পরণে হল্‌দে ধুতি, আর হাতে বাঁশী···

মীরা উৎসাহের সহিত সাঁওতালী ছেলেদের রূপ বর্ণনা কর্‌ছিল। তার চোখের সাম্নে ফুটে উঠ্ছিল তাদের উৎসবের ছবিটি।···গেল বছর ঝমরু ব'লে কালো ছেলেটা কী সুন্দর মেঠোসুরেই না বাঁশী বাজিয়েছিল !

তার উচ্ছ্বাস ভাঙ্গ্‌ল অসিতের নীরবতায়। বল্লে, সাঁওতালদের কথা শুন্তে আপনার বুঝি ভালো লাগ্‌ছে না, অসিদা' ?

অসিত গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, খুবই ভালো লাগ্‌ছে বোন্, কিন্তু এই ভালো লাগা ছাপিয়েও আমার মনে উঠ্‌ছে আমার কাজের কথা।···বন্ধুকে আস্‌তে লিখ্‌তেই হবে কাল—চুপটি করে খড়ুইএর স্রোত আর সাঁওতাল ছেলেদের বাঁশী উপভোগ কর্‌লে ত চল্‌বে না !

এবার মীরা সত্যি সত্যি ভয়ানকভাবে রাগ কর্‌লে। বল্লে, আপনার কেবল সেই একই কথা, অসিদা' ! সব জিনিষই মনে করিয়ে দেয় আপনাকে আপনার কাজের কথা ! ···আমি আর কখ্‌খনো আপনার সাথে আসব না !

রাগে দুম্‌দুম্ করে পা ফেলে মীরা আগে আগে চল্‌লে। অসিত তার পেছনে পেছনে আগিয়ে গেল।

সন্ধ্যার ছায়া তখন নেমে এসেছে।···রাগ কর্‌লেও

মীরার ভয়ানক ভয় হচ্ছিল কিন্তু। অথচ, অসিদার কাছ থেকে মনের ভয় গোপন করে রাখতে না পারলে তার গর্ব্বে ভয়ানক আঘাত লাগবে এটাও সে বেশ বুঝছিল।

হুম্ করে একটা পেঁচা অশ্বত্থ গাছের ডালে এসে বসল। মীরার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। সে করুণস্বরে ডাকলে, অসিদা···

অসিত পেছনে পেছনেই আসছিল। মীরার অস্ফুট চীৎকার শুনে সে দৌড়ে এসে বল্লে, কী হয়েছে মীরা?

মীরা তাড়াতাড়ি অসিতের হাতটি দৃঢ়ভাবে ধর্‌লে।

—ভয় পেয়েছ মীরা?

মীরা কিছু বল্লেনা। অসিত তাকে কাছে টেনে নিয়ে এসে বল্লে, অসিদা' থাক্‌তে তোমার ভয় কিসের মীরা?

মীরা কান্নাভরা সুরে বল্লে, আমি বড্ড দুষ্টু মেয়ে অসিদা', তোমার সাথে আর কখ্‌খনো আড়ি করব না!

মীরার কথা শুনে অসিত না হেসে পারলেনা।

মীরা তার ভয়ত্রস্ত দেহখানি আরও নিবিড়ভাবে অসিতের সাথে মিশিয়ে দিয়ে বল্লে, তুমি আমার সাথে আড়ি ক'রোনি' ত', অসিদা'?

অসিত তাকে আশ্বস্ত করে জানালে যে সে আড়ি করে নাই।

*

* *

কেতুনগঞ্জের বন্ধুর আস্‌তে দেরী হ'লো। চিঠির জবাবে সে লিখ্‌লে যে তার একটু সর্দ্দিজ্বর হওয়াতে পলাশপুর পৌছাতে পারবে না সে হুকুমমত, তবে শরীরটা সার্‌লেই সে অসিতের সাথে দেখা কর্‌বে এবং দু'জনে তাদের মহা অভিযানে বেরিয়ে পড়্‌বে।

অসিত চিঠিখানা ভবানীবাবুকে দেখিয়ে দুঃখিতস্বরে বল্লে, এবারকার ছুটিটাই মাটি হয়ে গেল একেবারে!

ভবানীবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, মাটি হয়ে যাবে কেন? দুদিন দেরী হবে বৈ ত নয়! তা ছাড়া এখানে থাক্‌তে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

অসিত বল্লে, না, সেজন্যে নয়, তবে আমার ইচ্ছে ছিল এদিকটা বেশ ভালো ভাবে ঘুরে কিছু কাজ করি···একলা ত সব করা সম্ভবও নয়, ভালোও লাগেনা!

অসিদা'কে আরো দু'দিন থাকতে হবে জেনে মীরা ভয়ানক খুসী। ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে, আপনি নাকি আরও কিছুদিন এখানে আছেন, অসিদা'?

বিষণ্ণমুখে অসিত বল্লে, উপায় নেই যে!

তার বিষাদটুকু সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে মীরা বল্লে, এবার কিন্তু আর ফাঁকি দিলে চল্‌বেনা, অসিদা'···রোজ দুপুরবেলা আমায় গল্প বল্‌তে হবে!

অসিত বল্লে, গল্প যদি বল্‌তে পারি তা' হলেও মনটা কাট্‌বে ভালো, নইলে কিছু-না-কর্‌তে-পারার সম্ভাবনায় আমার মন যে একেবারে হাঁপিয়ে উঠ্‌বে।

রোজ দুপুর বেলা মীরা এসে বৈঠকখানা ঘরে—যেখানে অসিতের শোবার বিছানা পাতা থাকে—হৈ হৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। অসিদা'র জন্যে জল রাখা হয়নি' কেন—অসিদা'র পাখা দরকার—অসিদা'র বিছানার চাদরটা ময়লা হয়ে গেছে অথচ এতদিন বদ্‌লানো হয়নি' কেন, ইত্যাকার প্রশ্নে সে চাকরকে এবং চাকরের মনিব বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে। অসিত যদি প্রতিবাদ করে জানাতে চায় তার কোনই অসুবিধা হচ্ছেনা তাহ'লে সে আরও ক্ষেপে ওঠে—বলে, আমার চোখ এড়ানো সহজ নয় অসিদা'··· তুমি বল্লেই ত' হ'লোনা! আমি নিজের চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি সব অগোছাল হয়ে রয়েছে, অথচ তুমি বল্‌ছ সব ঠিক রয়েছে!

হৈ-চৈ খানিকক্ষণ করার পর সে একটু শান্ত হয়ে অসিতের বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, এবার আপনার স্কুলের গল্প বলুন না অসিদা···

অসিত গল্প বলে—তার ছেলেবেলাকার কথা—কবে কোন্ দিন সে ইস্কুলে যায়নি, পথের মাঝে কোন্ সহপাঠীর সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছিল তারই পুরাণো কাহিনী।···কবে কোন্ মাষ্টার মশায় তাকে নামতা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সে তার জবাব দিতে পারে নি, ফলে সারাটা ঘণ্টা তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়েছিল এবং সব সময়টা সে মাষ্টার মশায়ের মুখচিত্রণ এবং

মুণ্ডপাত করছিল অথচ মাষ্টারমশায় তার বিন্দুবিসর্গও টের পাননি, তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অসিদার গল্প বল্‌বার ভঙ্গী দেখে মীরা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে, তার হাসি আর উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে অসিতের বিগত কৈশোরের স্মৃতি ফিরে আসে।···সে তার কেতুনগঞ্জের বন্ধু এবং পল্লী-অভিযানের কথা ভুলে যায়, পুরাণো কাহিনী নিয়ে খেলা ক'রেও সুখ পায়।

মীরা প্রশ্ন করে, অসিদা, আপনি তাহ'লে আমার চেয়ে কম দুষ্টু ছিলেন না?

অসিত বলে, যদি কম দুষ্ট হতুম তাহ'লে তোমার মতো দুষ্টু বোনটির সাথে ভাব হতো কেমন করে?

মীরা ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আমি বুঝি আপনার মতো দুষ্টু, অসিদা?

অসিত বিপদ গণে। তাড়াতাড়ি মীরার পিঠটা মৃদু চাপড়ে দিয়ে বলে, তুমি ভয়ানক লক্ষ্মী মেয়ে, মীরা, তুমি দুষ্টু হতে যাবে কেন? তবে দাদার সাথে মাঝে মাঝে একটু আধটু দুষ্টুমি কর এই যা!

অসিতের গল্প বলা শেষ হলে মীরা তার নিজের গল্প বল্‌তে আরম্ভ করে। তার গল্পের আখ্যান ভাগ অল্প, ব্যাপকতাও সীমাবদ্ধ। ইস্কুলের কোন্ মেয়ে তার একটা জলছবি কেড়ে নিয়েছিল, কার সাথে তার অঙ্কের খাতা অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল, কার ফ্রকটা সে একদিন রাগের বশে টান মেরে ছিঁড়ে দিয়েছিল সেই সব ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর কাহিনী। ···কিন্তু মীরার কাছে সে সব নূতনত্ব এবং বৈচিত্র্যের উপাদানে ভরা; তাই সে ভাবে তার মনে এর অনুবেদনার প্রতিঘাত যেমন বিশাল এবং বিচিত্র, অসিদার মনেও তেমন হবে না কেন?

তার আখ্যান শেষ হয় খড়ুই নদীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। ওর প্রত্যেকটী বালুকণা এবং পাথরের সাথে তার নিবিড় পরিচয়। সারা বছর ধরে খড়ুইএর কতো রূপই সে দেখেছে—ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীকে কূলে কূলে ভরে উঠতে দেখেছে, পাড়ের কাছে গিয়ে কতোবার সে জল মেপে এসেছে···বর্ষা, শরৎ, বসন্তে তার তীরের উপর লতাগুল্মে কতো রং বেরংএর ফুল ফুটে উঠেছে!···এসবই তার চোখের সামনে ভাস্‌ছিল।

অসিত তার কল্পনাটুকু মীরার মনের সাথে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ঠিক হয়ে ওঠে না। সে ভাবে কেন সে মীরার মত ছোট-খাট জিনিষকে রূপদক্ষের চোখ দিয়ে দেখতে পারে না!···তার মনেও কল্পনা আছে যথেষ্ট, ভাবুকতার কথা নিয়ে ভবানীবাবু সেদিনও ঠাট্টা করছিলেন। ···তবু ছয়টি বছরের পার্থক্যে কী একটা অভূতপূর্ব্ব পাঁচীল গড়ে ওঠে, তার উপর লাফ দিয়ে সে উঁকিঝুঁকি মার্‌তে পারে, কিন্তু তা' ডিঙানো তার পক্ষে সম্ভব হয়না।

মীরা অসিতের এই না-পারাটা বুঝতে পারে না। বহুদিন পরে একটি দাদা পেয়ে তার মন আনন্দের কানায় কানায় পূর্ণ, তারই আবেশে সে বিভোর। ছোট্ট একটা প্রজাপতিকে লাফাতে দেখ্‌লে তার আনন্দ হয়, খড়ুই-এর জলে ঢিল ছুঁড়ে টুপ শব্দ শুন্‌বার জন্যে সে অধীর হয়ে থাকে, মাঠের অশথ্ গাছের মধ্য দিয়ে বাতাসের শন্‌শন্ শব্দ তাকে স্বপ্নপুরীর তেপান্তরের মাঠের কথা মনে করিয়ে দেয়··· সে ভাবে অসিতের মনের অনুভূতি, এবুঝি তারই জানা পথে চলেছে।···অসিত যে পথের আনাচে-কানাচে ঘুর্‌ছে, ঠিক পথের মাঝখানে আস্‌তে পার্‌ছে না তা' তার খেয়ালেই আসেনা।

সন্ধ্যাবেলায় বাঁশবনের ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চাঁদ যখন ওঠে তখন আসিত ও মীরা দু'জনেই আনন্দ-মুগ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু অসিতের আনন্দের মধ্যে বাজ্‌তে থাকে একটা নতুন জিনিষ দেখার সুর, বাঁশবনের চাঁদের সাথে সে শেলী, কীট্‌স্ এর চাঁদের তুলনা করে, আর সব ছাপিয়ে ওঠে তার অনিচ্ছাকৃত অলসতার ব্যথা। কোনক্রমেই সে তা' কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।···আর মীরা দেখে একটা চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন বিস্ময় নিয়ে···অন্য কথার তরঙ্গ তার মনে স্থান পায়না, সে শুধু ভাবে বাঁশবনের চাঁদ কী সুন্দর!

রাত্রি যখন হয়ে আসে তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে অসিত তার কেতুনগঞ্জের বন্ধুর কথা ভাবে, মনে মনে তাকে তিরস্কার করে এমন সময় অসুখ করার জন্যে। বাইরে নিশাচর পাখী হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে, তার ডানার শব্দে বাতাসে

একটা প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে, খুবই অস্পষ্টভাবে যদিও। মীরার কথা হয়ত এক আধবার তার মনের কোণে উঁকি দেয়, কিন্তু শীগ্‌গীরই ঘুমে তার চোখের পাতা বুজে আসে।

মীরাও বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশাচর পাখীর ডাক শোনে—তার সমস্ত অনুভূতি আলোড়ন করে ওঠে একটা অস্পষ্ট অনুবেদনা। ঘুমন্ত অসিদা'র মুখটির কথা বারবার তার মনে পড়ে, ভোরবেলায় উঠেই অসিদা'কে কোন্ গল্প বল্‌বে এবং কী প্রশ্ন কর্‌বে তা' ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

*
* *

কেতুনগঞ্জের বন্ধুর চিঠি এসে পৌছল হপ্তার শেষে। বন্ধু লিখ্‌লে যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং পরের দিনই সকালবেলা এসে পৌছ্‌বে অসিতের কাছে, তারপর তারা দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়্‌বে। চিঠির অর্দ্ধেকটাই এই অভিযান সম্বন্ধে নানারকম প্ল্যান-এ ভর্ত্তি…ভয়ানক আগ্রহ ভরে সেগুলো অসিত পড়ছিল।

মীরা এসে প্রশ্ন কর্‌লে, বন্ধুর চিঠি পেলেন, অসিদা'?

উৎফুল্লভাবে অসিত বল্‌লে, হ্যাঁ, কাল আস্‌ছে…

শঙ্কাকুল চোখে মীরা প্রশ্ন কর্‌লে, আপনি কি বন্ধুর সাথে কালই চলে যাবেন তাহ'লে অসিদা'?

অসিত তখনও বন্ধুর চিঠির শেষভাগটা মনোযোগ দিয়ে পড়্‌ছিল। মীরার প্রশ্নে স্বপ্নোত্থিতের মত বল্‌লে, হ্যাঁ… যদি পারি কালই বেরিয়ে পড়্‌ব। অনেকদিন মিছিমিছি কুঁড়েমি করে কাটালুম—এখন আর দেরী কর্‌লে ত চল্‌বে না বোন্!

অসিতের কথায় মীরার চোখে জল আস্‌ছিল। এক হপ্তা এখানে মিছি মিছি কেটেছে সেই দুঃখই অসিদা'র বুকে বেজেছে বেশি, আর সে যে তার সুপ্ত ক্ষুধিত স্নেহ নিয়ে অসিদা'কে নিবিড় করে নিয়েছে সেটা তার চোখেই পড়্‌ল না! অন্তর-নিংড়ানো আদর, ভালোবাসা এবং কল্পনা নিয়ে তার সব কিছু অনুভূতির অংশ সে অসিদা'কে দেবার চেষ্টা করেছে, অসিদা' তার মর্য্যাদা একটুও দিলেন না!

মীরা কিছুতেই বুঝ্‌তে পারছিলনা, অসিদা' এমন কেন! অসিদা' তাকে ভালোবাসেন না একথা সে কিছুতেই মান্‌তে রাজী নয়, তাকে "আদরের বোন্‌টি" বল্‌তে অসিতের মন থেকে যে স্নেহ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে তা' সে বেশ বুঝ্‌তে পারে, তবু অসিদা' তার সাথে তেমন নিবিড়ভাবে মিশ্‌তে পারেন না কেন?

অসিত মীরার মুখের দিকে তাকালে—দেখ্‌লে তার চোখ ফেটে জল আস্‌ছে। আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত বুলোতেই চোখের জল ধারা হয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল।

সে কী কান্না!…অসিত যতই প্রশ্ন করে "মীরা, কাঁদ্‌ছ কেন?" মীরার চোখের বর্ষণ ততই প্রবল বেগে আরম্ভ হয়।…খানিকপরে কান্নার বেগ একটু থাম্‌লে মীরা লজ্জিত মুখে অসিদা'র বুকে মুখ লুকাল।

অসিত মীরার মনের ভাবধারাগুলো বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। তার স্নেহবুভুক্ষু বোন্‌টির তরুণ এবং সজল মনের মধ্যে যে একটা ব্যথার ছাপ তীব্রভাবে এসে পড়েছে তা' সে বেশ টের পাচ্ছিল।…কিন্তু উপায় কী?—তার সম্মুখে কত বড়ো বড়ো কাজ, কত নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ।…মীরার সাহচর্য্য, মীরার অশ্রু, মীরার অভিমান তাকে একটি হারানো সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে ত সে পার্‌ছে না!…কেন এ ব্যর্থতা?

অসিত সান্ত্বনার সুরে বল্‌লে, পাগ্‌লী মেয়ে, এমন করে কাঁদ্‌তে আছে কি?…বাবা দেখ্‌লেই বা কী বল্‌বেন?

—বল্‌লে বড়ো বয়ে গেল!

অসিত হাস্‌লে।…অভিমানের প্রথম জমাট ভাবটা শিথিল হয়ে এসেছে তাহ'লে! আস্তে আস্তে বল্‌লে, আমি প্রত্যেক হপ্তায় তোমার কাছে চিঠি লিখ্‌ব, মীরা, পিয়ন এসে তোমার কাছে নতুন নতুন গল্প পৌছে দিয়ে যাবে!

মীরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না। বল্‌লে, মিথ্যা আশা দিয়ে দরকার কী অসিদা'? আপনি এখন এখান থেকে পালাতে পার্‌লে বাঁচেন, আমার কাছে চিঠি লিখ্‌বার অবসর আপনার হবে না!

অসিত বল্‌লে, না, না, লিখ্‌ব বৈ কি!

সন্ধ্যাবেলা মীরা আব্দার ধর্‌লে অসিদাকে আর একটিবার খড়্‌ই দেখ্‌তে যেতেই হবে। অসিত প্রথমে

একটু আপত্তি প্রকাশ করেছিল, কিন্তু মীরা একগুঁয়েমিভরা সুরে বল্‌লে, আজ কোন কথা শুন্‌বনা, অসিদা'…সেই বটগাছের কাছে আপনাকে যেতেই হ'বে!

—এইত সেদিন সেখান থেকে এলুম!

—ভারী ত একদিন গিয়েছিলেন!…আর হ'লই বা সেদিন, আর একবার যেতে কোন ক্ষতি আছে কি?

ক্ষতি বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু অসিত ভাব্‌ছিল ভবানীবাবুর সাথে কিছু গল্প-সল্প করবে তার বন্ধু এবং কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে। মীরা সব ওলট-পালট করে দিলে।

আকাশে তখন সবেমাত্র চাঁদ উঠেছে…কিন্তু শ্রাবণের একটা কালো মেঘ দৈত্যের মতো তাকে গ্রাস কর্‌বার জন্যে দ্রুতবেগে ছুটে আস্‌ছিল।

অসিত বল্‌লে, বৃষ্টি আস্‌বে, মীরা…তখন এই আঁধার রাতে মাঠের মধ্যে কোথায় যাবো আমরা?

মীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, অনেক দেরী আছে তার অসিদা'…

পলাশপুরের আবহাওয়ার খবর অসিতের চেয়ে মীরাই ভালো জানে, কাজেই প্রতিবাদ আর চল্‌লনা।

চাঁদের জ্যোৎস্নায় বটগাছটার কাছে যখন তারা এসে পৌঁছল তখন বাঁকটা রূপালী আলোর ঝিকিমিকিতে সুন্দর হয়ে উঠেছে।…খড়ুই এর স্রোত খরবেগে তীরে এসে লাগছিল আর বাধা পেয়ে বেলফুলের মালা সৃষ্টি কর্‌তে করতে উচ্ছ্বসিত প্রবাহে চলে যাচ্ছিল।

মীরা বল্‌লে, আবার বলুন দেখি, অসিদা,' এর মত সুন্দর আপনি আর কিছু কখনও দেখেছেন কি না!

অসিত যন্ত্র চালিতের মত বল্‌লে, না…

মীরা ভয়ানক খুসী হয়ে উঠ্‌ল। তার মনের মধ্যে খড়ুই তখন বিশ্বের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্‌তে আরম্ভ করেছে… সে সৌন্দর্য্যের সুর বেজে উঠ্‌ছে তার প্রত্যেকটি অনুভূতিতে। অসিদা' যে তার সাথে একমত হয়ে স্বীকার করেছে খড়ুই-এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য আর হওয়া সম্ভবপর নয় তাতে তার মন আনন্দে, গর্ব্বে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল।

বাড়ীতে ফির্‌তে ফির্‌কে বৃষ্টির ধারা নেমে এলো। মীরা অসিদা'র পেছনে পেছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বল্‌লে, আমার কথাই ঠিক রইল কিন্তু, অসিদা', আমাদের খড়ুই দেখার কোন বিঘ্ন বর্ষাতে হ'লো না!

পরদিন ভোরবেলা কেতুনগঞ্জের বন্ধু এসে পৌঁছল। তার আসা অবধি মীরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে রইল তার খোঁজ কেউ পেলে না। দুপুর বেলা গাড়ীতে করে অসিত আর তার বন্ধু রওনা হবে এই কথা ছিল, কিন্তু মীরা তখনও এসে পৌঁছল না।

ভবানীবাবু চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেন, দুরন্ত মেয়েটা কোথায় যে গেল কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, অসিত!

অসিত ভাব্‌ছিল সে সেদিনটা থেকে যাবে কিনা।… সত্যি ত মীরা কোথায় গেল? খড়ুই নদীর ধারে নয় ত?—যা' স্রোত সেখানে!…চিন্তা করতেই অসিতের গা' শিউরে উঠ্‌ছিল।

হঠাৎ রৌদ্রতপ্ত মুখ আর কোঁচড়ভরা পেয়ারা নিয়ে দম্‌কা হাওয়ার মতো মীরা এসে হাজির। হাসিমুখে বল্‌লে, আমার খোঁজ বুঝি আপনারা সবাই কর্‌ছিলেন, অসিদা?

ভবানীবাবু কী যেন বল্‌তে যাচ্ছিলেন, মীরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করে অসিতের ও তার বন্ধুর পকেটে গোটা-কয়েক পাকা পেয়ারা ঢুকিয়ে দিয়ে বল্‌লে, পথে ক্ষিদে পাবে অসিদা', তখন খাবেন আর খড়ুইএর সেই বটগাছটার ডানদিকে পেয়ারা গাছটার কথা মনে কর্‌বেন।

মীরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতে কিছুতেই রাজী হ'ল না। বল্‌লে, না অসিদা', আমার কান্না পাবে সেখানে, আমি শেষে একটা কাণ্ড করে বসব!

অসিত বল্‌লে, না তা' কেন হবে? তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ের মত শান্ত হয়ে থাক্‌বে, তা হ'লেই হবে!

মীরা অস্বীকারসূচক ঘাড় নাড়্‌লে।

পলাশপুরের ষ্টেশনবাবুর হাঁকডাকের মধ্যে গাড়ী যখন ছাড়্‌ল তখন হঠাৎ অসিতের মনে হ'লো সে যেন চলেছে চলার উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে—কল্পনা ও অনুভূতি কী বল্‌ছে তা' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখবার অবসর সে পাচ্ছে না! পথের কুঁড়ির সৌরভ তার ভাল করে আঘ্রাণ করবার সময় হ'লোনা, বাস্তব হয়ে রইল তার কাছে স্বপ্নমাখা অবাস্তব…

ট্রেণ চল্‌ছিল বাংলাদেশেরই বাঁশবনের মধ্য দিয়ে। অসিত আন্‌মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল অদূরে একটা বেড়ার দিকে। দেখ্‌লে মীরা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড় নাড়্‌ছে।

অসিতের মনে হ'লো পথের বাঁশী শুনেও যেন সে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দেয়নি'। তার কিশোর জীবনের সুর সে মীরার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠ্‌তে দেখেছিল। কিন্তু আজ উদ্দীপনায় তাকে সে তার এখনকার জীবনের প্রাত্যহিক পরিবেষ্টন থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দিয়েছে!

ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বন্ধুকে' বল্‌লে, তোর সেই খাতাটা খোল দেখি, যেখানে আমাদের প্ল্যান্‌গুলো সব পরপর লেখা আছে……

শ্রীনবগোপাল দাস

বঙ্গসাহিত্য ও ভারতসাহিত্য

অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্-এ

পূজাবকাশে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য রাঁচিতে আসিয়া হিন্দু উপকণ্ঠের বাঙ্গালী সমাজের সহিত আমার যেটুকু সামান্য পরিচয় হইয়াছে তাহাতে প্রচুর আনন্দের খোরাকী পাইয়াছি। কারণ এখানে দেখিলাম একটি সংঘবদ্ধ পরস্পরসম্বদ্ধ জীবন্ত সমাজ। পূজাপার্ব্বণ খেলাধূলা উৎসব ও সমাজের নানাবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান লইয়া এখানে যে সামাজিকতার প্রতিষ্ঠা দেখা গেল তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। এই প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের সাহিত্যসভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে আজ আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। মানুষ কর্ম্মোপলক্ষ্যে আফিস আদালত কর্ম্মশালায় সমবেত হয় বটে কিন্তু সাহিত্যই মানুষের অন্তরঙ্গ মিলনের ক্ষেত্র। মানুষের চিত্তের অন্তঃস্থলে যে সমস্ত ভাব ও চিন্তার স্রোত চলিতে থাকে, তাহার কল্পনার মুকুরে যে সমস্ত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের চিত্র প্রতিফলিত হয়, তাহারই সাহায্যে মানুষ মানুষের কাছে আসিয়া পড়ে, মানুষ মানুষের সাহিত্য অনুভব করে, এবং এই সাহিত্যানুভূতির বাহন ভাষায় গ্রথিত যে সমস্ত রচনা তাহাকে আমরা সাহিত্য নাম দিয়াছি। এই সুদূর প্রবাসে আমরা যে আজ বঙ্গসাহিত্যের সম্মিলন বসাইয়াছি তাহার অর্থ প্রবাসী বাঙ্গালী আজ সমগ্র বাঙ্গালী সমাজের সাহিত্য অর্থাৎ অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে চায়। বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাসাহিত্যের অনুরাগী হিসাবে এ উৎসবে যোগ দিবার প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক গতিপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা বা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের পথ-নির্দ্দেশ এ সমস্ত বিষয়ে কোন প্রামাণিক সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা আমার নিকট প্রত্যাশা করিবেন না কারণ তাহা আমার সাধ্যাতীত ও অধিকার-বহির্ভূত। তবে বাঙ্গলার বাহিরে আসিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের পুষ্টি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ মনে উদিত হইতেছে, সেই প্রসঙ্গে দুই চারি কথা আজ এই প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মিলনে নিবেদন করিতে চাই।

বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাই তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য এমন দুই একটি গোড়াকার কথা তুলিতে হইবে যাহা মুখ্যতঃ সাহিত্য সম্পর্কিত না হইলেও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তজ্জন্য আপনাদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করিতেছি।

আজকাল আমাদের দেশে সভা সমিতি কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স আন্দোলন আলোচনার মধ্যে যে আদর্শটি বড় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা জাতীয়তার আদর্শ। বিশাল ভারতের সমগ্র নরনারী জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এক বিরাট মহাজাতি। এই ঐক্যের উপলব্ধি, এই ঐক্যের সাধনা, এই ঐক্যের আকাঙ্ক্ষাই আমাদের সমস্ত চিন্তা চেষ্টার কেন্দ্র।

এই আদর্শের, এই চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে। ইংরাজ রাজ্যের প্রভাবে আজ সমস্ত ভারতবর্ষ এক শাসন-তন্ত্রের অধীন; এই শাসনতন্ত্রের মুখ্য ও গৌণপ্রভাবে দেশের সর্ব্বত্র একই রূপ রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, একইরূপ সমস্যা চারিদিকে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। যে বহিঃশক্তি আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তাহা একটা সংঘবদ্ধ প্রবলশক্তি। ইহা শুধু ইংরাজের শাসনশক্তি নহে। ইহার পিছনে আছে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত কলকারখানা বাণিজ্য কারবারের শক্তি। এই বহিঃশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে গিয়া আমরা সকলে বুঝিয়াছি যে আমাদিগকেও দল বাঁধিতে হইবে, আমাদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত শক্তি একত্র সংহত করিয়া এক বিরাট জাতীয় শক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

রাঁচি সহরে হিন্দু ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নক্লাবের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পঠিত:—

এই দল বাঁধিবার, জাতিগঠন করিবার মূলমন্ত্র ইহাও পাইলাম আমরা ঐ বিদেশী শক্তির নিকট। যেখান হইতে সমস্যার উদ্ভব, সেইখান হইতেই লইলাম সমাধানের কৌশল ও মূলসূত্র। যে ইংরাজ আসিল বণিক্ ও বিজেতার রূপে, তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া লইলাম। ইংরাজ তাঁহার স্কুল-কলেজ প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া আমাদিগকে দীক্ষিত করিলেন ডেমোক্রাশী ও ন্যাশনালিজ্‌মের মন্ত্রে। এই নবধর্ম্মের বাহন হইল ইংরেজী ভাষাও ইহার চিন্তাধারার উৎস হইল মিল্, স্পেন্সার, মাৎসিনী। কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জীবনের মাপকাঠি লইয়া আমরা ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ফলে যে ব্যাপার দাঁড়াইল তাহাতে আমরা নিজেরাই বিস্মিত হইয়া গেলাম। যেন কোন যাদুমন্ত্রের বলে রাতারাতি ভারতের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত অঙ্গগুলি একত্র সংহত হইয়া একটা মহাজাতি সংগঠিত হইয়া গেল। কংগ্রেসের বক্তৃতা মঞ্চে, ইংরাজী সংবাদ পত্রের স্তম্ভে, ক্লাবে বৈঠকখানায় বাঙ্গালী বিহারী পাঞ্জাবী রাজপুত মারাঠী গুজরাটী সিন্ধী মাদ্রাজী সকলে মিলিয়া আমরা যে একই কথা কহিতেছি, একই ভাবে চিন্তা করিতেছি! ইংরাজী বিদ্যার যাদুমন্ত্রে অসম্ভব যে সম্ভব হইয়া গেল, স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল। প্রথম যুগে এইরূপে ইংরাজী বিদ্যার মোহ আমাদের মন একান্ত ভাবে অধিকার করিয়া বসিল।

কিন্তু মানুষের মন বড়ই জটিল, বড়ই রহস্যময়। নবজাগ্রত বিষয় বুদ্ধির তাড়নায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা যে ঐক্যলাভ করিলাম তাহা দ্বারা সত্যই কি আমরা পরস্পরের নিকট আসিয়া পড়িলাম, পরস্পরের আত্মীয় হইয়া গেলাম? হই নাই যে তাহার প্রমাণ আজ প্রবাসী বাঙ্গালী ভারতের সকল প্রান্তেই অনুভব করিতেছেন। "প্রবাসী বাঙ্গালী" কথাটাই কি অর্থপূর্ণ নহে? বাঙ্গলার বাহিরে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই বাঙ্গালী নিজকে প্রবাসী বলিয়া পরিচয় দেয় কেন? যদি ভারতীয় মহাজাতি সংগঠিতই হইয়া গিয়া থাকে, ভারতকে যদি সত্যই আমরা নিজ বাসভূমি জ্ঞান করিয়া থাকি তাহা হইলে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া থাকি কেন?

কেন থাকি এই প্রশ্নের উত্তর নানা ব্যক্তি নানা দিক হইতে দিয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইতে হইলে মানব মনের জটিল রহস্য একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয়। মানুষের মন এক মায়াপুরী। তাহার নানা তল, নানা মহল। যে মহলে আমরা সুস্থ সচেতন ভাবে বিতর্ক করি, বিচার করি, হিতাহিত নির্দ্ধারণ করি, বৈষয়িক স্বার্থের আলোচনা করি, সে মহল হইল এই রহস্যপুরীর উপরিতল মাত্র। এই মহলে বিচার বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের, বৈষয়িক জীবনের বারআনা কারবার পরিচালন করিবার অধিকার এই বিচারবুদ্ধি দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কি আমরা এই বিচারবুদ্ধির আদেশেই সব সময়ে চলি? বিষয়বুদ্ধির অন্তরালে মানবচিত্তের গভীরতম স্তরের প্রচ্ছন্ন কোষ্ঠে যে রহস্যময় মগ্ন চৈতন্য বিরাজমান, যাহার বহিঃপ্রকাশকে আমরা কখনও বা বলি খেয়াল, কখনও বলি মেজাজ, কখনও বলি হৃদয় বৃত্তি, কখনও বলি কল্পনা, কখনও বলি দিব্য দৃষ্টি, কখনও বলি সৌন্দর্য্যবোধ, কখনও বলি অধ্যাত্মবোধ—সেই মগ্ন চৈতন্যের শক্তিই কি আমাদের জীবনস্রোতের প্রবলতম নিয়ামক নহে? এই অন্তর্গূঢ় মানুষের প্রেরণায় আমরা পদে পদেই বিষয়বুদ্ধির বিজ্ঞ পরামর্শ অমান্য করিয়া থাকি। বৈষয়িক হিসাবী বুদ্ধির আদেশে আমরা যে সমস্ত বৈষয়িক সম্বন্ধ স্থাপন করি তাহাতে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয় না, জীবনের যত কিছু গভীর সম্পর্ক তাহা ঘটে এই অন্তরঙ্গ মানুষের লীলাক্ষেত্রে।

মানবচিত্তের এই রহস্যচারী বৃত্তিসমূহের লীলাক্ষেত্র হইল ধর্ম্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সমাজ, পরিবার। এই লীলা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ না করিতে পারিলে মানুষে মানুষে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হয় না। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমল হইতে বাঙ্গালী যে ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা মুখ্যতঃ বৈষয়িক প্রয়োজনের তাড়নায়। বাঙ্গালী যে আলোক লইয়া ভারতের নিশাচ্ছন্ন প্রদেশ-

সমূহকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে, তাহা অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যার চমকপ্রদ বিজলী বাতি, তাহার গৃহকোণের তৈল প্রদীপ নহে। সভাসমিতি অনুষ্ঠানে বৈঠক মজলিশে সে যাহা দিয়াছে তাহা তাহার নিজের অন্তঃপুরের রসভাণ্ডার নহে। প্রবাসে আসিয়া সে বাহিরে বাহিরেই রহিয়া গেছে, কোন সমাজের অন্তঃপুরে সে প্রবেশলাভ করে নাই। তাই জীবনের যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য তাহাকে সর্ব্বত্র এক একটি স্বতন্ত্র বাঙ্গালী সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে। সেখানে বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালার সঙ্গীত, বাঙ্গালার সামাজিকতা, বাঙ্গালার পূজাপার্ব্বণ উৎসব এই সমস্ত লইয়া সে তাহার অন্তরঙ্গ জীবন পুষ্ট ও সজীব করিয়া রাখিতেছে।

ব্যাপারটির মধ্যে আরও একটু জটিলতা আছে। ইংরাজী বিদ্যাকে ইতিপূর্ব্বে আমি অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। সে কেবল আমাদের সমাজে ইহার মুখ্য প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকারিতা হিসাবে বলিয়াছি। অর্থকরী বিদ্যা বলিলেই ইংরাজী বিদ্যার চূড়ান্ত মূল্য নির্দ্দেশ করা হয় না। প্রয়োজনের তাড়নায় ও অর্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই বিদ্যা আমরা অবলম্বন করিয়াছি সত্য, কিন্তু ইহারও একটা মানবিক দিক আছে। ইহার মধ্যেও এক শক্তিমান্ মানব সমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। সে সমাজ শুধু ইংরেজের সমাজ নহে। ইউরোপ ও আমেরিকা জুড়িয়া যে বিশাল মানবসমাজ আজ জগতের সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিতেছে, সেই শ্বেতাঙ্গসমাজ জাতিগত, ভাষাগত, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গত পরস্পর পার্থক্য সত্ত্বেও কাল্চার হিসাবে এক। ইংরাজী ভাষার মারফতে আমরা এই সঙ্ঘবদ্ধ পাশ্চাত্য কাল্চারের প্রভাব অনুভব করিতেছি। যে পরিমাণে আমরা এই পাশ্চাত্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি সেই পরিমাণেই আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সমধর্ম্মী শিক্ষিত সমাজের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতেছি। এই পাশ্চাত্য কাল্চারই এখন ভারতে সর্ব্বত্র বিজয়গর্ব্বে প্রভুত্ব করিতেছে।

কিন্তু ভারতের কোন প্রদেশেই এই বিদেশী সাহিত্য সম্পূর্ণ একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। বিদেশী ভাষার আওতায় কোন ভারতীয় ভাষাই লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কারণ ভারতের ভাবধারা ও চিন্তাধারার উৎস প্রাচীনতম কালের অনাবিষ্কৃত কন্দরে নিহিত। বহু যুগের চর্চ্চা ও সাধনায় ইহা পুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ভারতবাসীর অন্তরের অন্তঃস্থলে ইহার মূল দৃঢ়প্রথিত। ইহার প্রচ্ছন্ন স্রোত ফল্গুস্রোতের ন্যায় সহজ সংস্কাররূপে ভারতবাসীর চিত্তে প্রবহমান। প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষাই ছিল এই ভাব-ধারার মুখ্য বাহন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে পালিভাষা ও জৈনধর্ম্মের প্রভাবে জৈন প্রাকৃত ও সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। দক্ষিণে তামিল তেলেগু প্রভৃতি দ্রাবিড়ীয় ভাষাও সাহিত্যের ভাষারূপে প্রাচীনত্বের দাবী করিয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাকৃত কথ্যভাষারূপে প্রচলিত থাকিলেও জাতীয় সাহিত্যের বৃহৎ-ধারা সংস্কৃতের খাতেই প্রবাহিত ছিল। এই সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর দিয়াই অবন্তী কোশল সুরাষ্ট্র-মথুরা কাশী কাঞ্চী মগধ কলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একই ভাবের চর্চ্চা হইত, একই চিন্তার স্রোত বহিত। এই সাহিত্যের যাঁহারা স্রষ্টা তাঁহাদের কাহারও বাসস্থান উজ্জয়িনী, কাহারও বারাণসী, কাহারও পাটলীপুত্র, কাহারও কাশ্মীর। কিন্তু তাঁহাদের প্রসার ছিল সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া। ভারতের বাহিরে বৃহত্তর ভারতেও এই সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা হইত। এ অবস্থায় যে কাল্চার ভারতে গড়িয়া উঠিল, তাহা কোন প্রদেশের বিশেষ কাল্চার নহে, তাহা ভারতীয় কাল্চার। সে যুগে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে অন্তরঙ্গ মিলন অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রীয়-ক্ষেত্রে কখনও বা এক একটা সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে, কখনও বা তাহা ভাঙ্গিয়া নানা খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এ সকল ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ভারতীয় কাল্চারের সমগ্রতা ও সংহতি ব্যাহত হয় নাই।

তারপর দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আসিল এক নূতন যুগ। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এ যুগের প্রধান ঘটনা ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্তরঙ্গ-ইতিহাসে এ যুগের প্রধান ঘটনা প্রাদেশিক ভাষা ও প্রাদেশিক সাহিত্য সমূহের উদ্ভব। দুই ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কি না জানি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এই উভয় ঘটনাই ভারতের অন্তরঙ্গ-ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিল।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এই যে নানা ভাষা ও নানা সাহিত্যের উদ্ভব হইল জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব কি হইল তাহা ভাবিবার বিষয়। এ সকল বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট মাপকাঠির সাহায্যে লাভক্ষতির হিসাব করা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে এই সকল শিশু-সাহিত্যের মধ্যে যে সচল সঞ্জীবতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নবজীবনেরই লক্ষণ, মরণের বা অবসাদের নহে। আজকাল এই ন্যাশনালিজ্‌মের যুগে ভারতের এই ভাষা বিচ্ছেদ একটা আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে তাহা জানি। ইহা যে ভারতের ঐক্যসাধনের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাধা তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি আমি মনে করি প্রাদেশিক ভাষা ও প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ভারতের অন্তরঙ্গ-জীবনের কল্যাণই সাধন করিয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য যখন ক্রমশঃ পণ্ডিত সমাজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া প্রাণহীন পুনরুক্তি ও গতানুগতিক চর্ব্বিত চর্ব্বণে পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছে, সজীব সতেজ নব নব সৃষ্টির পরিবর্ত্তে যখন অলঙ্কার প্রাচুর্য্য ও রচনার ভেল্‌কীই গ্রন্থকারদিগের লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে তখন ক্ষুধিত সমাজ চিত্তের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভব হইল এই সকল দেশী সাহিত্যের। এখন হইতে সাহিত্য শুধু আর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের একচেটিয়া সম্পত্তি রহিল না। ইতর ভদ্র ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সাধারণ লোকসমাজ সাহিত্য-রসভোগের অধিকার অর্জ্জন করিয়া লইল। এই দেশীয় সাহিত্যের প্রথম চেষ্টা হইল সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি দেশী ভাষার সাহায্যে সাধারণ লোক সমাজে বণ্টন করিয়া দেওয়া। রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদির অবদান ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে দেশী ভাষায় রচিত হইতে লাগিল। এগুলিকে অনুবাদ বলিলে ভুল হইবে, কারণ ইহারা এক প্রকার নূতন সৃষ্টি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙ্গালার লোকচিত্তের ছাপ যেমন সুস্পষ্ট, তুলসীদাসের রামায়ণে সেইরূপ হিন্দুস্থানের, কম্বনের রামায়ণে সেইরূপ তামিল চিত্তের ছাপ পড়িয়াছে। নূতন নূতন মঙ্গল-কাব্য রচিত হইয়া নানা লৌকিক ধর্ম্ম সাহিত্যের আসরে আপন আপন স্থান করিয়া লইল। তারপর আসিল ভক্ত কবির যুগ। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব পদকর্ত্তা, হিন্দুস্থানে কবীর, দাদু, সুরদাস, মীরাবাই, পাঞ্জাবে নানক, মহারাষ্ট্রে তুকারাম, দাক্ষিণাত্যে সিত্তর সম্প্রদায়ের শৈব কবিগণ, সিন্ধুদেশে সা আবদুল লতিফ প্রভৃতি সুফি কবিগণ —ইঁহারা দেশময় এক প্রেমভক্তির স্রোত বহাইয়া দিলেন। এ স্রোতে জাতিকুলের অভিমান, আভিজাত্যের অভিমান ভাসিয়া গেল। ভারতের প্রান্তে প্রান্তে প্রাচীন ভারতের ভাবধারা নানা বিচিত্ররূপে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্র বর্ণে লোক-সাধারণের অন্তরে নিবিড় অনুভূতি সৃজন করিয়া বহিয়া চলিল।

ইংরাজ যখন আসিল তখনও এ স্রোত একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। তাই যখন আমরা ইংরাজীশিক্ষার প্রথম যুগের মোহ কাটাইয়া উঠিলাম তখন মধ্যযুগের এই দেশী সাহিত্যের ভাবধারাই আমাদিগকে আকর্ষণ করিল। শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা কিছু বাড়িল বটে কিন্তু জনসাধারণের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে থাকিল কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী, রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত। আমরা মনের উপরিতলে বসাইয়াছি পাশ্চাত্যসাহিত্যের মোহন-মেলা, অন্তস্তলে আগুলাইয়া যাইতেছি দেশী সাহিত্যের রসভাণ্ডার। ইংরাজ আমলে বাঙ্গালাসাহিত্য যে নবজীবন লাভ করিল তাহার মধ্যে মুখ্যতঃ এই দুই শক্তিরই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। বাঙ্গালায় যেরূপ ভারতের সর্ব্বত্রই সেইরূপ সাহিত্যক্ষেত্রে দেশী ভাবধারা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। কোথাও বা এ ব্যাপার আগে আরম্ভ হইয়াছে, কোথাও বা কিঞ্চিৎ পরে। এই সংঘর্ষের ইতিহাসই ভারতের দেশী সাহিত্য সমূহের আধুনিক ইতিহাস।

দেশী সাহিত্যের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার যে সংঘর্ষ চলিতেছে তাহার একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা দুই সমকক্ষ শক্তির মধ্যে ভাবের আদান প্রদান নহে। প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের নিকট হইতে কিছু লইতে আসে নাই। সে তাহার সতেজ সমুজ্জ্বল বিশ্বব্যাপী কাল্‌চারের আলোকবর্ত্তি লইয়া তমসাচ্ছন্ন প্রাচ্যে জ্যোতি বিকীরণ করিতে আসিয়াছে। প্রতীচ্য বলিতেছে—"আমার সভ্যতা, আমার শিক্ষাদীক্ষা,

আমার ইতিহাস, আমার সাহিত্য—ইহাই বিশ্বসভ্যতা, ইহাই বিশ্বসাহিত্য, ইহাই বিশ্বের ইতিহাস।" আমরা বিদেশী অতিথির এ দাবী কখনও বা সলজ্জ সম্ভ্রমের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছি, কখনও বা চক্ষু মুদিয়া ভারতের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তাহার সহিত সমকক্ষ ভাবে আচরণ করিতে পারি নাই, তাহার দান আমরা দুইহাত ভরিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, আমার ঘরে যে দিবার মত কোন সামগ্রী আছে তাহা স্বপ্নেও মনে আনিতে পারি নাই। আমাদের দেশী সাহিত্যের যে রসভাণ্ডার তাহা নিতান্তই গৃহকোণের সামগ্রী, তাহাতে আমার আরাম তৃপ্তি সুখ সান্ত্বনা আছে, কিন্তু তাহা বিশ্ব-সমাজে উপস্থিত করিতে লজ্জা বোধ করি। সুতরাং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যে ভাবসংঘর্ষের কথা বলিতেছিলাম সে সংঘর্ষের লীলাক্ষেত্র আমারই চিত্তে, জগতের রঙ্গমঞ্চে নহে। আমার মনের মধ্যেই এই দ্বৈতশাসন, এই diarchy চলিতেছে। মানবের ইতিহাসে নানাযুগে নানাদেশে এইরূপ বিভিন্ন ভাবধারার সংযোগ ও সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। ইহার ফল যে সর্ব্বত্রই বিষময় হইয়াছে তাহা নয়, অধিকাংশ স্থলেই ইহা নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসেও এই বহিঃসংস্পর্শ যে মোটের উপর কল্যাণপ্রদ হইবে ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু জীবশরীরে বাহিরের বস্তু আসিয়া স্বাস্থ্যের সৃষ্টি করিবে না অস্বাস্থ্যের সৃষ্টি করিবে তাহা নির্ভর করে শরীরের প্রাণশক্তির তারতম্য অনুসারে। আমি যদি সুস্থ সবল থাকি তাহা হইলে বাহিরের বস্তু হইতে নূতন জীবনরস আহরণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিতে পারিব, কিন্তু আমি যদি দুর্ব্বল হই, রোগী হই তাহা হইলে বাহির হইতে কেবল রোগের বীজ গ্রহণ করিয়া অস্বাস্থ্য সৃষ্টি করিব। এই ভাবসংঘর্ষের যুগে আমরা যে বাহিরের স্রোতে একেবারে গা ভাসাইয়া দিই নাই, আমরা যে নিজের নিজের দেশী সাহিত্যের মধ্যে আমাদের অন্তরঙ্গ চিত্তের এক একটা আশ্রয়স্থল গড়িয়া লইতে পারিয়াছি তাহাতেই বুঝা যায় আমাদের জাতীয় সত্তা দুর্ব্বল হইলেও একেবারে প্রাণহীন হইয়া পড়ে নাই। এই দুর্ব্বলতা আমরা যে পরিমাণে কমাইতে পারিব, এই প্রাণশক্তি যে পরিমাণে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিয়া লইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের, পাশ্চাত্য সাধনার ক্ষেত্র হইতে জীবনরস আহরণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারিব।

কি উপায়ে আমরা জাতীয় আত্মার বল বৃদ্ধি করিতে পারি? এক উপায় বংশপরম্পরাগত পারম্পর্য্যের ধারা উপলব্ধি করিয়া, ধর্ম্মে সাহিত্যে শিল্প-কলায় পূর্ব্বপুরুষগণ যে সাধনার ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত যোগরক্ষা করিয়া। আমাদের নবজাগরণে এ উপায় আমরা অবলম্বন করিয়াছি। প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাচীন দেশী সাহিত্যের, প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের, প্রাচীন শিল্পকলার ও সামাজিকতার যে আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আজ চলিতেছে তাহা হইতে আমাদের আত্মশ্রদ্ধা, আত্মপরিচিতি ও কৌলীন্যবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। যেখানে কুলীন সমাজ নাই সেখানে কৌলীন্য বোধের কোন সার্থকতা থাকে না। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত যোগসূত্র উপলব্ধি করিয়া আমরা বুঝিয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্যের কুলমর্য্যাদা কত বড়, বুঝিয়াছি বাঙ্গালা সাহিত্য কুলীন সাহিত্য। কিন্তু এ কুলীন সাহিত্যের সমাজ কোথায়? সে কি একাকী জগতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া নানা জাগতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নিজের নিজত্ব, নিজের কুলমর্য্যাদা, নিজের কুলধারা, নিজের পরিচয় বজায় রাখিয়া টিকিতে পারিবে? তাই বলি এ সাহিত্যের সমাজ কোথায়?

সমাজ আছে, কিন্তু সে সমাজের সহিত সম্বন্ধ আমরা প্রায় লোপ করিয়া দিয়াছি। আজ রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্যবন্ধনের খাতিরে আমরা সেই সমাজের দ্বারস্থ হইয়া বিহারী হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী মারাঠী সিন্ধী গুজরাতী তামিলতৈলঙ্গীকে সভায় সম্মিলনীতে ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেছি, কিন্তু এখনও তাহাদিগের চিত্তের অন্তস্তলে প্রবেশ লাভ করিতে পারি নাই। প্রাচীন ভারতের যে ভাবধারা আমার সাহিত্যের রক্তধারায় প্রবাহিত তাহারাও যে সেই ভাবধারার উত্তরাধিকারী তাহা বুদ্ধিদ্বারা জানিলেও হৃদয়দ্বারা অনুভব করিতে পারি নাই। বাঙ্গালার সাহিত্যকে শক্তিশালী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে,

তাহাকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দেশী সাহিত্যের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

এইখানে কথা উঠিবে ভাষাবৈষম্যের কথা। ভাষা যখন বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাবের আদান প্রদান চলিবে কি করিয়া? চলে যে কি করিয়া তাহা ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী, রুশ, ইটালীয় ইহাদের ভাষা বিভিন্ন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে ইউরোপের জাতীয় সাহিত্যগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক ইউরোপীয় সাহিত্যসমাজ সৃষ্টি করিয়াছে। এ সমাজ এত বিরাট ও শক্তিশালী যে জগতের সমক্ষে ইহাই বিশ্বসাহিত্য বলিয়া আত্মঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং ভাষার বাধাই প্রধান বাধা নহে। অনুবাদের দ্বারা, আলোচনার দ্বারা বিভিন্ন দেশী সাহিত্যের রসভাণ্ডার হইতে আমরা স্বল্পায়াসেই বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট ও সবল করিতে পারি।

বাস্তবিক পক্ষে দেখা গিয়াছে মধ্যযুগেও ভাষার বাধা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভাবের আদান প্রদান একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই। বাঙ্গলা ভক্তমালগ্রন্থ হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থেরই অনুবাদ। আলাওলের বাঙ্গলা পদ্মাবতী কাব্য মালিক আহম্মদের হিন্দী পদ্মাওৎ কাব্যেরই অনুবাদ। তীর্থযাত্রা, সাধু ফকির পীর প্রভৃতি পরিব্রাজকদিগের ধর্ম্মপ্রচার এই সকল নানা উপলক্ষ্যে পরস্পর পরিচয়ের যোগ একেবারে ছিন্ন হয় নাই। এখন এ পরিচয় ঘনিষ্ঠ করিয়া লইবার সুযোগ অনেক বেশী। ইচ্ছা ও প্রেরণার অভাবেই এই সকল সুযোগ আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিতেছি না।

কিন্তু এ ঔদাসীন্যের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। যাঁহারা এই প্রতিবেশী সাহিত্য সমূহের সামান্যমাত্র পরিচয় লইয়াছেন তাঁহারা জানেন কি অপূর্ব্ব বিচিত্র রসের ভাণ্ডার আমাদের ঘরের পাশে সঞ্চিত রহিয়াছে। আমি লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই রস সম্পদের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিলেই হয়। তথাপি কেবল ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যেটুকু পরিচয় পাওয়া সম্ভব তাহাতেই বুঝিয়াছি যে ভারতের দেশী সাহিত্য সমূহের চর্চ্চা কেবলমাত্র শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সাধনা নহে। কি বৈচিত্র্যে, কি রসসম্পদে, কি গুরুত্বে এ সাহিত্য আমাদের সমক্ষে এক চিত্তাকর্ষক বিচিত্র ভাবজগতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা পরিস্ফুট করিতে চাই। যাঁহারা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে রোমান্টিক ধারার ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন কর্ণেল টডের রাজস্থান কাহিনী তাহার মধ্যে কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। টডের রাজস্থানের বঙ্গানুবাদকে বাঙ্গলার রোমান্টিক সাহিত্যের মূলগ্রন্থ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। টড্ সাহেব এ কাহিনীর উপাদান পাইয়াছেন রাজস্থানের প্রাচীন চারণদিগের গীত হইতে। এই হৃদয়বান্ বিদেশী লেখক যদি অসামান্য লিপিকৌশল সহযোগে এই চারণগীতের সহিত আমাদের পরিচয় না করাইয়া দিতেন তাহা হইলে আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাসের, বাঙ্গলা কাব্যের, ও বাঙ্গালা নাট্যের একটা বড় অধ্যায় শূন্য থাকিয়া যাইত। এই চারণগীতের মধ্যে পাইলাম প্রাচীন ক্ষাত্রধর্ম্মের এমন একটা আধুনিক সংস্করণ যাহাতে স্কট্-প্রমুখ রোমান্টিক সাহিত্যিকের উপজীব্য মধ্যযুগের শিভালরী-ধর্ম্মের একটা ভারতীয় প্রতিরূপ মিলিয়া গেল। টড্ ব্যতীত ফরব্স্ তাঁহার রাসমালা গ্রন্থে আরও অনেকগুলি এ জাতীয় আখ্যান সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল খণ্ড চারণ গীতির মূলে পৃথ্বীরাজ রায়সা নামে যে মহাকাব্য হিন্দী কবি চাঁদ বর্দ্দাই কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল তাহার সহিত আমাদের এখনও সম্যক্ পরিচয় হয় নাই। এতদ্ব্যতীত "আহ্লাখণ্ড" নামক একখানি রোমান্টিক কাব্য আছে। আহ্লা ও উদনের প্রেম ও বীরত্বকাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। হিন্দুস্থানের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই কাব্যের প্রসার। সর্ব্বত্র ধনী নির্ধন পণ্ডিত নিরক্ষর সকল সমাজে এই কাহিনী গীত হইয়া থাকে। আমরা এখনও পর্য্যন্ত এই সর্ব্বজনপ্রিয় কাব্যের সংবাদ রাখিনা।

মারাঠী ভাষায় চারণ সম্প্রদায়ের অনুরূপ এক কবি সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের নাম ছিল গন্ধালী। মারাঠী ইতিহাসের ও মারাঠী জীবনের নানা রোমান্টিক আখ্যান

লইয়া—তাঁহারা কাব্য রচনা করিতেন ও গান করিয়া বেড়াইতেন। আকওয়ার্থ সাহেব তাঁহার Marathi Ballads গ্রন্থে এই সকল গব্বালী কাব্যের সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ীয় ভাষা সমূহেও এতদনুরূপ বহু আখ্যানগীতিকা লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত ছিল। গভার সাহেবের Folk Songs of Sonthern India গ্রন্থের মারফৎ দ্রাবিড়ীয় চিত্তের, দ্রাবিড়ীয় হৃদয়ের যে অন্তরঙ্গ পরিচয়, পাওয়া যায় তাহা আমাদের হৃদয় মনকে আকর্ষণ করে, ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয়। বাঙ্গলাসাহিত্য কি সে আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় করিয়া দিবে না? আজকাল আমরা কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে বাঙ্গালী সভ্যতার মূলভিত্তি আর্য্য নহে, দ্রাবিড়ীয়। বাঙ্গালার লোক সাহিত্যে, ব্রতকথায় কথা-কাহিনী-গীতিকায় যে একটা বিশেষ সুরের ঝঙ্কার শুনিতে পাই তাহা নাকি দ্রাবিড়ীয়। ম্যাথিউ আরনল্ড্ ইংরাজী কাব্যের মধ্যে এইরূপ কেল্‌টিক্ সুরের অস্পষ্ট ঝঙ্কার শুনিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা একটা সত্য আবিষ্কার না স্বপ্ন কল্পনা তাহা যাচাই করিয়া লইতে হইলে দ্রাবিড়ীয় সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে দিকে কোন চেষ্টার লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই।

আর একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এক সময়ে ভারতের সকল প্রান্তের সাহিত্যে প্রেমভক্তির এক বন্যা বহিয়া যায়। আমরা মোটামুটি বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদাবলী হইতেই এই সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া থাকি। বাঙ্গলার বাহিরে মিথিলায় বিদ্যাপতিকে আমরা বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। কিন্তু তাহার বাহিরে আর অগ্রসর হই নাই। হিন্দী ভক্তমালগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে আমরা ভারতের নানাপ্রদেশের ভক্তসাধু-দিগের পুণ্য কাহিনীর পরিচয় পাই, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের সাহিত্যের সহিত আমাদের সম্যক্ পরিচয় হয় নাই। কবীর, দাদু, মীরাবাই, সুরদাস, নানক, তুকারাম—ইঁহাদের নাম সকলেরই পরিচিত। কিন্তু ইঁহাদের কাব্যগীতির মধ্যে প্রেমভক্তি ধর্ম্ম কি বিচিত্র রসের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার আস্বাদ এখনও আমরা ভাল করিয়া পাই নাই। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "বোম্বাই চিত্র" গ্রন্থে তুকারামের একটি সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। আধুনিক কালে শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কবীর দাদু প্রভৃতি হিন্দুস্থানের মরমী কবিদের জীবনী ও রচনা আলোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বাড়াইতেছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এ পর্য্যন্ত আমরা যে ভক্তিসাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহা প্রধানতঃ বৈষ্ণবভক্তি সাহিত্য। কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যে ভক্তি সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সহিত আমরা অল্পই পরিচিত। সিত্তর বা সিদ্ধসম্প্রদায়ের শৈবভজন তামিল সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাঁহারা ভক্তভগবানের সম্পর্কের মধ্যে দেখিয়াছেন প্রেমের লীলা। ইঁহাদের কাব্যের মধ্যে পাই লিরিক হৃদয়াবেগ ও অধ্যাত্মবোধের অপূর্ব্ব সম্মিলন।

প্রেমভক্তি সাহিত্যের আর এক বিকাশ দেখিতে পাই সুফিসাহিত্যে। এই সাহিত্যের ভাষা কোথাও পারসীক, কোথাও উর্দ্দু, কোথাও সিন্ধী, কোথাও হিন্দী। এ ভাব-ধারার জন্মস্থান সুদূর পারস্য ও এশিয়া মাইনর। মুসলমান বিজেতৃগণের মারফতে এ ভাবধারা ভারতবর্ষে আসিয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সুফিধর্ম্মের আদিম মূল কোথায় তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে, সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। তবে ইহার সহিত ভারতীয় যোগসাধন পন্থা ও প্রেমভক্তিতত্ত্বের যে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে তাহা সকলেই জানেন। মুসলমান সাহিত্যের এই বিশেষ ধারার যোগে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ইতিহাস মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের একটা বড় অধ্যায়। ভারতের সুফিসাহিত্য শুদ্ধমাত্র পারস্য সাহিত্যের অনুবৃত্তি নহে। ইহা এক নূতন সৃষ্টি। ভক্ত ও ভগবানের প্রেমলীলাই সুফি কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। নরনারীর প্রণয়ই এ কাব্যে ভগবৎ প্রেমলীলার প্রতীক। পারস্য সুফিকাব্যে শিরাজের গোলাপ-বাগান, সুরাপাত্র ও বুলবুলের গান ছিল এ লীলার পরিপোষক বেষ্টনী। এ কাব্যের রূপ-জগতের মাল মশলা সমস্তই ছিল পারসীক। ভারতে আসিয়া এ কাব্যের

রূপান্তর ঘটিয়া গেল। ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভারতের নদনদী পর্ব্বত, ভারতীয় সমাজের নরনারী, ভারতের পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা, ভারতের কথা কাহিনী কিম্বদন্তী,—এই সমস্ত লইয়া ভারতে এক নূতন সুফিসাহিত্যের উদ্ভব হইল। এই ভারতীয় সুফিসাহিত্যের সর্ব্বোজ্জ্বল রত্ন ছিলেন সিন্ধী কবি সা ভেটাই বা সা আবদুল লতিফ। তিনি সিন্ধী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে ভারতীয় সুফিআখ্যানের অনেকগুলিই স্থান পাইয়াছে। সাসুই-পুনহু, হীর-রঞ্ঝা, সোহনি-মেহার প্রভৃতি তাঁহার কাব্যের নায়কনায়িকার নাম ও কাহিনী সিন্ধু, পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহার বার্ষিক শ্রাদ্ধদিবসে তাহার সমাধিস্থানে যে মেলা বসে তাহাতে হিন্দুস্থানের বহুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও কবি একত্র হইয়া তাঁহার কাব্যগান করিয়া থাকেন। বর্টন্ সাহেবের "সিন্ধু" গ্রন্থে যখন এই সকল কাব্যের প্রথম সন্ধান পাই তখন মনে হইল আমার চক্ষের সমক্ষে একটা নূতন কল্প-জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। সম্প্রতি অধ্যাপক গীড্ওয়ানী একখানি ইংরাজী গ্রন্থে এই কবির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

এই সুফিসাহিত্যে হিন্দুমুসলমানের বিভিন্ন ভাবধারার যে কিরূপ সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। সম্রাট আকবরের আমলের একখানি ফার্সী কাব্য তাঁহার এক মুসলমান সভাকবিদ্বারা রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থখানির নাম "সুজ-উ-গুডাজ্"। কাব্যের উপাখ্যান ভাগ একটি সমসাময়িক প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত। এক হিন্দুনারী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণে কৃতসংকল্প হইয়াছেন এই সংবাদ আকবরের রাজসভায় পৌঁছিল। তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে বিরত করিবার জন্য সম্রাট তাঁহার পুত্র দানীয়ালকে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট ও সম্রাট কুমারের বহু যুক্তি অনুযোগ সত্ত্বেও সতীনারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এই আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে প্রেমের যে অলৌকিক রূপ প্রকাশ পাইল কবি তাহারই মধ্যে দিব্য-প্রেমের এক সুন্দর প্রতীক পাইলেন। হিন্দু সতীর সহমরণ কাহিনী লইয়া এক সুফিকাব্য রচিত হইল। মালিক আহম্মদের হিন্দী ভাষায় রচিত পদ্মাওৎ কাব্য চিতোরমহিষী পদ্মিনীর ও তাঁহার সহচরীবৃন্দের আত্মবিসর্জ্জন লইয়া রচিত একখানি সুফিকাব্য। বাঙ্গালী মুসলমান কবি আলাওল বাঙ্গালা পদ্যে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। আকবরের রাজসভার অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ফৈজি নলদময়ন্তী উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "নল্-দামন্" নামে একখানি ফার্সী সুফিবাক্য রচনা করিয়াছিলেন।

এতক্ষণ অতীত যুগের দেশী কাব্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিলাম। কিন্তু যদি জীবন্ত বর্ত্তমানের সহিত এ অতীতের কোন সম্পর্ক না থাকিত, এ অতীত যদি শুদ্ধমাত্র প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের মালমশলা হিসাবে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয়বস্তু হইত তাহা হইলে এ লইয়া এত বাগ্‌বিস্তার করিতাম না। আমার বিশ্বাস এ অতীতের সহিত বর্ত্তমানের নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন দেশী সাহিত্যের মধ্যে এই অতীতের সহিতই আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবসংঘর্ষ চলিতেছে। এ সংযোগ সংঘর্ষের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে নবজীবন সঞ্চার হইয়াছে, সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে সমস্ত প্রতিভাশালী জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছে তাহার সহিত আমরা সুপরিচিত। অন্যান্য দেশী-সাহিত্যে অনুরূপ ব্যাপার কি ঘটিতেছে তাহা যে আমরা জানিনা, এবং জানিবার কৌতূহলও অনুভব করি না ইহা বিস্ময়ের বিষয়। এস্থলে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের বিচার অবান্তর। বাঙ্গালী অন্যান্য ভারতবাসীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। সব সাহিত্যেই প্রতিভার স্ফুরণ একটা আকস্মিক ব্যাপার। বিচারের দ্বারা যুক্তি আলোচনা দ্বারা সাহিত্যের সৃজনী-প্রতিভার পথ নির্দ্দেশ করা যায় না। আলোচনা সমালোচনা দ্বারা আমরা যেটুকু করিতে পারি তদ্দ্বারা সৃজনীপ্রতিভার অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায় মাত্র। যাঁহারা সাহিত্য-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্রষ্টা নহেন। চর্চ্চা আলোচনা সমালোচনা বিচার--এই সমস্ত উপায়ে সমাজের সর্ব্বত্র একটা চিন্তার স্রোত ও ভাবের কারবার বজায় রাখা, ইহাই হইল অধিকাংশের পক্ষে সাহিত্যসাধনা। এ সাহিত্যসাধনা আজ ভারতে সর্ব্বত্রই চলিতেছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবে। এই সমস্ত খণ্ড প্রচেষ্টার একত্র সংহতি, এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত কর্ম্মীর একত্র সহযোগিতা, এই সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্য লইয়া এক ভারতসাহিত্যসমাজ গঠন ইহাই আমার অদ্যকার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। আজ এই প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য সম্মিলনে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার প্রলোভন আমি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কারণ, আমার আশা আছে যে বঙ্গসাহিত্যের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেই একদিন এই মহামিলন সংঘটিত হইবে এবং প্রবাসী বাঙ্গালীই এ মিলনের পথ প্রস্তুত করিবে।

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ

শান্তি-সমস্যা ও নিকোলাস্ রোরিক

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্

শান্তি চাই। এই কথাটা মানুষ বুঝেছে হাড়ে হাড়ে গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর; বুঝেছে এমন মার খেয়ে যা আগে কোনদিন সে খায়নি। আগে লড়াই বাধত আবার থেমে যেত। যারা লড়াই করত তাদের মানবচরিত্রের মহত্ব; জয়-পরাজয়ের ও মরণ-বাঁচনের অট্টরোলে কীর্ত্তন করত মানুষের মহিমা। সেই সব ধ্বংস-লীলায় হয়ত ক্ষতি হ'ত বিস্তর; কত শিল্পীর কীর্ত্তিস্তম্ভ হ'ত ভূমিসাৎ; কত পণ্ডিতের লিপিবদ্ধ চিন্তারাজি পরিণত হ'ত



এ্যাবোড্ অব্ দি স্পিরিট্

কেউ বা মরত কেউ বা বাঁচত,—যারা করত না,—তারা দিত বাহবা। বীরত্বের গৌরব-গাথা কবিরা রেখে যেত তাদের সাহিত্যে, পরাজয়ের বেদনা দিয়ে রচনা করত ট্রাজেডী, নিঃস্বার্থ ত্যাগের ও নির্ভীকতার চিত্র এঁকে ফুটিয়ে তুলত ভস্মস্তূপে,—কিন্তু সে ক্ষতি স্পর্শ করত মানুষের কীর্ত্তিকে,—মনুষ্যত্বকে নয়। মানুষ আবার নূতন উদ্যমে নূতন কীর্ত্তি রচনা করতে লেগে যেত; কথায় ও সুরে রেখায় ও রঙে শিল্পীরা দিত মানুষের আহত চেতনায় প্রলেপ; সামাজিক

ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ভাঙনটা মেরামত করে নিতে রাজা-উজীরদের বেশি বেগ পেতে হ'ত না। কিন্তু গত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের ঠেলাটা আজ পনেরো বছরের মধ্যেও সামলানো যায়নি। পৃথিবীর বেশি ভাগ লোক বেকার, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল, অনেক দেশেরই রাষ্ট্রীয় সৌধ টলমল,—জাতিতে জাতিতে মন-কষাকষি, বিপ্লব পন্থী-দের প্রাদুর্ভাব, মানুষের চিন্তায় ও কর্ম্মে স্বাধীনতার উত্তরোত্তর নিষ্পেষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে কোন বিশেষ মত পোষ-ণের জন্য মানুষের উপর বা কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার।



মেডোনা ওরিফ্লেমা

অথচ বিজ্ঞানের কল্যাণে সারা বিশ্বের মানুষ পরস্পরের এত কাছা-কাছি এসে পড়েছে,—যে এখন আর বনিয়ে না চল্লেই নয়। বিশেষ করে গত যুদ্ধের সময় বোঝা গিয়েছে, বিজ্ঞান মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে এমন সব ধারালো অস্ত্র, যে আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তবে এবারে আর শুধু মানুষের কীর্ত্তি নয়,—মনুষ্য জাতটাই জগৎ থেকে যাবে লুপ্ত হয়ে। যদি-ই বা কোনো বৃদ্ধ কবি কোনো নিভৃত কোণে গোপন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হ'ন,—ত শ্রোতার অভাবে তাঁর বীণা যাবে থেমে। সংবর! সংবর! —রব উঠ্‌ল চারদিকে,—আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।

তথাপি আশ্চর্য্য এই,—যে যে-প্রয়োজনের তাগিদ আস্‌ছে মরণ-বাঁচনের সমস্যা থেকে,—তার জন্যেও উপযুক্ত মূল্য দিতে মানুষ আজও নারাজ। ব্যক্তিগত আত্ম-কর্ত্তৃত্ব সামাজিক শৃঙ্খলার দাবির নিকট মানুষ ছাড়তে কুণ্ঠিত হয়নি, কিন্তু জাতিগত আত্ম-কর্ত্তৃত্ব আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার জন্য একটুও ছাড়তে মানুষ রাজি নয়। এদিকে আজ পনেরো বছর ধরে লীগ্ অফ্ নেসন্‌স করল পণ্ডশ্রম। এই সেদিন চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জাপান নিল ম্যাঞ্চুরিয়া কেড়ে। নিরস্ত্রী-করণ-বৈঠক বস্‌ছে বারে বারে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র বেড়েই চলেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের টাল সামলানোর জন্য অর্থ-নৈতিক দিগ্-গজরা করছেন মুখ-চাওয়া-চাওয়ি কিন্তু সঙ্কট এড়াতে পারছেন না। কোটি কোটি বেকার বাড়িয়ে চলেছে অপরাধী ও বিপ্লব-পন্থীদের দল; দৈহিক ক্ষুধার তাড়না মনুষ্যত্বের সমস্ত শক্তিটাকে করছে গ্রাস; তার বড়ো দিকটা দিচ্ছে চাপা। ভিতর থেকে শয়তান উঠ্‌ছে জেগে,—মানুষের বর্ব্বর প্রবৃত্তিগুলো ছাড়া পেয়ে তাণ্ডব নৃত্যের উদ্যোগ করছে; প্রলয় নাচনের ডম্বরু-ধ্বনির মধ্যে 'সংবর! সংবর' রব ক্ষীণ হ'য়ে মিলিয়ে আস্‌ছে। মানুষ হ'য়ে উঠ্‌ছে বে-পরোয়া,—ভয় ডর কমে আস্‌ছে। আজকাল বুলি শোনা যায়,—'রণভঙ্গের প্রবৃত্তি থেকেই মানুষের মনে জাগে শান্তির আকাঙ্ক্ষা,—তার অপর নাম কাপুরুষতা। রণভেরীর মধ্যেই মানুষের শক্তির পূর্ণ উদ্বোধন, ত্যাগের

দীক্ষা, সাহসের ও উদারতার,—এক কথায় মনুষ্যত্বের,—পরিচয়' (মুসোলিনী)।

যাঁরা পৃথিবীটাকে সমর-ক্ষেত্রের উন্মত্ত সংহারলীলা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত দেখ্‌তে চান,—শুন্‌তে পাওয়া



শী হু লিড্‌স্‌

যায়,—তাঁরা নাকি আদর্শ-বিলাসী, বাস করেন কল্পলোকে, বাস্তবের প্রতি অন্ধ। যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি না-কি মানুষের মজ্জাগত, মানব মনের একটা অপরিহার্য্য বৃত্তি, মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব না করে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই মানুষের চেতনার বিকাশ,—বাধা অতিক্রম করতে করতেই মানুষের শক্তির উন্মেষ,—কি শারীরিক, কি মানসিক। যুদ্ধ বিনা মানুষের স্বাস্থ্য যাবে নষ্ট হ'য়ে,—প্রাণের স্পন্দন হ'য়ে আস্‌বে ক্ষীণ। ভগবান যদি থাকেন,—আর এই জগৎটাকে ও তার অধিবাসী মানুষদের সৃষ্টি করে থাকেন,—তবে অন্যান্য নৈসর্গিক অবস্থার মত যুদ্ধেরও একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থান আছে তাঁর সৃষ্টির পরিকল্পনায়। মানুষকে মানুষ হ'তে হ'বে,—সবল, জীবন্ত, তেজোদৃপ্ত; শান্তির আওতায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নির্জ্জীব ও পঙ্গু হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। এক কথায় মানুষের প্রাণশক্তির বিকাশের নিয়মের মধ্যেই যুদ্ধের প্রয়োজন নিহিত আছে—War is a biological necessity।

এই সব বুলি শোনা যায়, বিগত মহাযুদ্ধের পরেও,—আবার একবার যুদ্ধ বাধ্‌লে তার পরিণাম কি হ'বে; সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও! দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই মানুষের চেতনার বিকাশ, শক্তির উন্মেষ, মনুষ্যত্বের পরিণতি,—একথা ঠিক,—কিন্তু দ্বন্দ্বই কি মনুষ্য-জীবনের শেষ কথা? পরিণামে কি কোথাও নেই,—'শান্তম'? এবং সেই "শান্তম্‌"-এর দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া দ্বন্দ্বের কি অন্য কোনো সার্থকতা আছে? আর. দ্বন্দ্বেরই কি সমরক্ষেত্রে গোলাগুলি ও বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া অন্য কোনো প্রকাশের উপায় নেই? ধ্বংস করাটাই কি প্রাণশক্তির লক্ষণ,—সৃষ্টি করা নয়? এ সকল প্রশ্ন তুললে, আদর্শ-বিলাসী স্বপ্ন-বিহারী, বাস্তব-বোধ-বিহীন অসুস্থচিত্ত দার্শনিক বলে উপহাসাস্পদ হওয়ার আশঙ্কা আছে;—তবুও সে বিপদ ঘাড়ে নিয়ে আদর্শের দিক দিয়ে মনুষ্য-চরিত্র বিচার করে ভবিষ্যতের উপর আলোক সম্পাত করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার আগে বাহুবলে যুগান্তর আনয়ন করতে চান যাঁরা,—সেই সব বাস্তবের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল অথচ অসহিষ্ণু আদর্শ-বাদীদের বাস্তব-বোধটা একবার পরখ করে দেখে নেওয়াটা মন্দ নয়।

তাঁদের বাস্তব বোধের একটা বড় অভিজ্ঞতা এই যে যুদ্ধটা অনিবার্য্য,—কেননা বিধাতার এই নিয়ম, যুদ্ধটা সৃষ্টি-কার্য্যের একটি প্রধান উপকরণ,—একরকম শক্তিরই মতন,—প্রাণশক্তির বিকাশের স্বাভা[বিক] মধ্যেই এর প্রয়োজন। এই কারণেই সৃষ্টির

মানুষ লড়াই করতে আরম্ভ করেছে,—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বংশে বংশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, জাতিতে জাতিতে।



স্যাংটা প্রটেক্‌ট্রিক্‌স্

হয়ত বা বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের জীবন-পরিধির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই লড়াই ছড়িয়ে পড়বে গ্রহে গ্রহে, তারায় তারায়, ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যমণ্ডলীর মধ্যে। এত বড় বাণী প্রচার করেন যাঁরা,—তাঁরা মানবচরিত্র বেশ ভালো করেই বোঝেন,—তাই প্রচার করেন,—মানব-চরিত্র গঠনের প্রধান উপকরণ যে-সকল বৃত্তি,—মনুষ্যত্ব বর্জ্জন না ক'রে সেই সকল বৃত্তিগুলোকে বর্জ্জন, দমন বা পরিবর্ত্তন করতে চান যাঁরা তাঁদের আদর্শ-বিলাসীই বলা যেতে পারে, আদর্শ-বাদী নয়,—তাঁরা রচনা করেন আকাশকুসুম, বাস করেন



দি ব্লেসেড ভগবান

ভাবের অলীক মায়াময় জগতে, কঠিন পদার্থের সত্য তাই কঠিন জগতের সংঘাতে চেতনা যখন হ'বে, যাঁরা জেগে থাকেন,—তাঁদের জন্যেই এই জগৎ, যারা ঘুমিয়ে থাকেন তাঁদের জন্যে নয়।

অথচ এই সব সজাগ জীবন্ত বাস্তব-বিশ্বাসী আদর্শ-বাদীরা এমন একটা অতি সাধারণ জলন্ত প্রত্যক্ষের প্রতি চোখ ঠারেন,—যা' ঘুমন্ত, নির্জ্জীব আদর্শ-বিলাসীদেরও চোখ এড়ায় না। সেটা হ'চ্চে এই যে যুদ্ধ করে মানুষেই,—ইচ্ছা করে,—ইচ্ছা করলে না করলেও পারত। অন্যান্য নৈসর্গিক অবস্থাগুলো যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণ বশতই ঘটে,—যুদ্ধটা ঠিক তেমন নয়। যে কারণে যুদ্ধ ঘটে—তা সম্পূর্ণই মানুষের শাসনাধীন। হ'তে পারে,—বর্ত্তমানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমন যে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ না হ'য়েই পারে না,—কিন্তু সেই সব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করাটা মানুষের সাধ্যাতীত নয়। হ'তে পারে এই সব ব্যবস্থা মানুষের ইচ্ছাকৃতও নয়,—বা কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টও নয়; হ'তে পারে এই সব ব্যবস্থার

কোনো গোপন শক্তির প্রবল ক্রিয়ায়; তথাপি সচেতন মনের আলোক-সম্পাতে আবরণ থেকে বিচ্যুত হলে যে সেই শক্তি মানুষের আয়ত্তাধীনে আসে না,—এমন কথা বিজ্ঞান বলে না। লক্ষ্য যদি সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে সুবিবেচনার আলোকে সেই পথে দৃঢ়চিত্তে কর্ম্মের ধারাকে পরিচালনা করা মানুষের পক্ষে



লর্ড বুদ্ধ—দি গিভার

অসম্ভব নয়,—মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধও নয়। বস্তুতঃ সভ্যতার বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো এমনি করেই সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারার ফলেই গড়ে উঠেছে।

আদর্শের কথা ছেড়ে দিয়ে বাস্তব সত্যটাকেই যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি মেনে নিলেও প্রমাণ হয় না যে যুদ্ধটা অনিবার্য্য। অনেক জাতির ইতিহাসেই যুদ্ধ না করেও দু-একটা শতাব্দী কেটে গিয়েছে। তাছাড়া মানব-চরিত্রের অপরিবর্ত্তনীয়তার দোহাই দিয়ে যখনই বলা যায় যুদ্ধটা অনিবার্য্য, তখনই বাস্তবের রাজ্য ছাড়তে হয়,—এসে পড়ে আদর্শের কথা। কেননা যেটা বর্ত্তমান, সেটাই বাস্তব, যা' অতীত, তা' এককালে ছিল বাস্তব, এখন তার স্মৃতি; কিন্তু যেটা ভবিষ্যৎ, তা বাস্তবও নয়, তার স্মৃতিও নয়,—সেটা মানুষের কল্পনা; আদর্শের রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। অতএব আদর্শের কথা তুললেই যে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। আদর্শবাদী হ'লেই যে সংসারানভিজ্ঞ অব্যবহারিক জীব বলে উপহাসাস্পদ হ'তে হ'বে,—এই বিধান খাটে না। কেননা নিছক বাস্তববাদী জীব ভূ-ভারতে নেই,—কোনো দিন ছিল না,—কোনো কালে জন্মাবেও না। বাস্তববাদী যখন বলেন যুদ্ধটা অনিবার্য্য তখন তিনি একটা আদর্শের কথাই বলেন; আদর্শবাদী যখন বলেন, যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব তখনও তিনি অন্য একটা বিরুদ্ধ আদর্শের কথাই বলেন। বাস্তবের মাপ-কাঠি দিয়ে বিচার করলে বর্ত্তমানে দুটো কথাই সমান সত্য, দুটো কথাই সমান মিথ্যা।

অতএব আদর্শকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আদর্শ-সংঘাতের ইতিহাসই মানব-সভ্যতার ইতিহাস। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য দুটী আদর্শের মধ্যে একটি সভ্য মানবের আদর্শ অপরটি বর্ব্বর মানবের আদর্শ; একটি সৃষ্টির, অপরটি ধ্বংসের। বাস্তবের দোহাই দিয়ে, মানবচরিত্রের অপরি-বর্ত্তনীয়তার দোহাই দিয়ে যাঁরা বলেন, যুদ্ধটা অনিবার্য্য,—এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনও বটে,—এবং যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়াটা কাপুরুষতারই নামান্তর,—দেখা গেল তাঁদের বাস্তব-বোধটা (sense of reality) অন্যান্য আদর্শ-বাদীদের বাস্তব-বোধের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ নয়। বরং বলব কি,—কম তীক্ষ্ণ,—যখন পূর্ব্বেই বলেছি, কতকগুলো জলন্ত প্রত্যক্ষ সত্যও তাঁদের চোখে পড়ে না? আসল কথা,—তাঁদের মধ্যে আদিম মানবের বর্ব্বর প্রবৃত্তিগুলোই বেশি সজাগ হ'য়ে উঠেছে; তার কারণ, বোধ হয়,—মানুষকে ভগবানের যা শ্রেষ্ঠ দান, সেই সুযুক্তি ও সুবিবেচনা,—তাঁরা বেশি ব্যবহার করতে চান না, পাছে স্থির শীতল যুক্তি মানুষের আবেগ ও অন্যান্য মূল প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করে কর্ম্ম-প্রেরণার উৎস রুদ্ধ করে দেয়। চিত্তের মূল প্রবৃত্তিগুলো

মানুষকে কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করে বটে, কিন্তু সুবিবেচনার আলোকের পরিবর্ত্তে অবিবেচনার অন্ধকারে সেগুলো পরিচালিত করলে, সে কর্ম্ম যে সৃষ্টি না করে ধ্বংসও করতে পারে,—এ বোধ যাঁদের নেই,—তাঁদের বাস্তব-বোধের উপর আস্থা রাখা চলে কি?



অগ্নি যোগ

মানব-চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয়; অতএব যেহেতু মানুষ এতকাল লড়াই করে এসেছে, তখন ভবিষ্যতেও করবে; তার জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ—এমন যুক্তির ভিত্তি আর যেখানেই থাক্, বাস্তবের উপর নেই। কেন না, মানবচরিত্র অপরিবর্ত্তনীয় যদিও হয়; তথাপি ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সেই চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ দেখা গিয়েছে যথা যায় ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক জীবনে। অভাব থাকলেই মানুষে চুরি করে, অভাব না থাকলে করে না। যদি করে সেটাকে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা বলব না। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ, বিশেষ করে অপরাধতত্ত্ববিদ্‌গণ তেমন লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। জাতীয় জীবনেও তেমনি যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার দরুণ কলহ বাধে,—সেই সকল অবস্থা দূর করতে হ'বে। যে আন্তর্জাতিক অরাজকতার দরুণ যুদ্ধ সম্ভব হয়,—তার পরিবর্ত্তে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে। কি উপায়ে তাহা সম্ভব হ'তে পারে তা আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার আলোচনা সম্ভবপরও নয়। আমরা শুধু মোটামুটি মানব-চরিত্র আলোচনা করে দেখাতে চাই যে, একাজ কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। যে-সকল চিত্তবৃত্তি মানুষকে এই কর্ম্মে প্ররোচিত করতে পারে, মানবচরিত্রে সেগুলোর অভাব নেই। তার সাক্ষ্য মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্প, মানুষের বিজ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতি।

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে মানুষের চেতনার উন্মেষ, মনুষ্যত্বের পরিণতি,—একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে মানুষের ধর্ম্ম ধ্বংস করা নয়, মানুষের ধর্ম্ম সৃষ্টি করা। দ্বন্দ্বের পরিণাম একপক্ষের বিনাশ নয়,—দুই পক্ষের সমন্বয়। সৃষ্টির প্রয়োজনে এক হয়েছেন বহু—আবার সেই একের মধ্যে বহুর সমন্বয়েই সৃষ্টির সার্থকতা। তারে তারে সাংঘাতে একটি তার ছিঁড়ে গেলে সেই সংঘাত ব্যর্থ,—কিন্তু সুরের ঝঙ্কারে সেই সংঘাতের সার্থকতা।

অতএব দ্বন্দ্বকে শুধু biological কেন তার চেয়েও বড়ো,—spiritual necessity মনে করা যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে, সমরক্ষেত্রে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় তার যে বিশেষ প্রকাশ সেটাকেও একটা necessity মনে করাটাকে লজিকে বলে Fallacy of Accident। যুদ্ধটাকে biological necessity মনে করেন যাঁরা তাঁরা মানব চরিত্রকে ঠিক ভাবে দেখেন না। ভবিষ্যতে যুদ্ধ নিবারণ করে মানবজাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হ'বে কিনা,—তা নির্ভর করে মানুষের মনোভাবের উপর, জীবনের পরিপ্রেক্ষণার

উপর, শিক্ষা দীক্ষা ও এককথায় মানুষের কদর-বোধের (sense of values) উপর, বিশেষ করে রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তাবীরদের। তাঁরা যদি জীবধর্ম্মকেই মানবচরিত্রের সবখানি মনে করেন, যদি সেই জিনিষেরই কদর করেন যা মানুষের জীবধর্ম্মকেই চরিতার্থ করে,—এবং যা মানুষের জীবধর্ম্মকে চরিতার্থ না করে উচ্চতর আধ্যাত্মিক আকাঙ্খাগুলোকে তৃপ্ত করে তার যথাযথ মূল্য দিতে অস্বীকৃত হ'ন,—তবে তাঁরা মানব-ধর্ম্মকেই করবেন অস্বীকার,—এবং তার ফলে জগতের জীবধর্ম্মপ্রসূত, মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা সেটাই মানব ধর্ম্ম। এই জীবধর্ম্ম থেকেই মানব-ধর্ম্মে উন্নীত হ'য়ে মানব-জীবন প্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা লাভ করে। মানুষের চিত্তে যে প্রবল আগ্রহ, কৌতূহল, মিলনেচ্ছা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যের পিপাসা আছে,—সেইগুলোই জীবধর্ম্ম থেকে মানব-ধর্ম্মে প্রগতির ধারায় কার্য্যকরী শক্তি। অজ্ঞান ও দৈহিক প্রয়োজন মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়, তাই পণ্ডিতেরা বলেছেন, অজ্ঞানের বাড়া পাপ নেই, কিন্তু জ্ঞান ও



দি অর্হৎ

অধিবাসী অন্যান্য জীবেরা টি'কে যাবে, কেবল মানুষই টি'কবে না। যুদ্ধটা biological necessity-ত নয়ই,—বরং যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাটাই,—এমন কি যুদ্ধের জন্য তৎপরতটাই যা মানুষকে 'মহতী বিনষ্টি'র ভয় দেখাচ্চে—সেটাকে একটা মানসিক বিকার, অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলা যেতে পারে। যুদ্ধের প্রতি অনন্ত বিতৃষ্ণা, অসীম ঘৃণা যাঁর নেই, যুদ্ধের কল্পনাতেই যাঁর সমস্ত মন প্রাণ বিদ্রোহ করে না ওঠে,—তাঁর মন অসুস্থ।

মানুষের মধ্যে লড়াই করার যে প্রবৃত্তি সেটা মানুষের সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। জ্ঞানের চর্চ্চা ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চায় মানব ধর্ম্মের বিকাশ যতই হ'বে পূর্ণতর, ততই জীবধর্ম্মের বিকাশ পর্য্যবসিত হ'বে দেহরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে। এমনি করেই জীবধর্ম্মের উপর মানব-ধর্ম্মের প্রভুত্ব যত বেশি ছড়িয়ে পড়বে, ততই সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যগুলোর ভিতর থেকে হ'তে থাকবে সংশোধন। সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করতে থাকলে আন্তর্জাতিক অরাজকতা

তিরোহিত হ'য়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'বে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা।

জগতের কল্যাণ-কল্পে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেছেন। জ্ঞানের ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চাই সেখানকার প্রধান সাধনা। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পল্লী-জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তোলবার জন্য নানাদিকে নানা প্রচেষ্টা চল্‌ছে। আর একজন মনীষি, কর্ম্মী ও শিল্পী এই দিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। তাঁর কিছু পরিচয় দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করব।



কৃষ্ণ

তাঁর নাম নিকোলাস্ রোরিক। তাঁর অঙ্কিত কতকগুলি ছবি এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশিত করা গেল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশ দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে য়ুরোপের সুবিখ্যাত শিল্প-সমিতি "World of Art" এর তিনি হয়েছিলেন প্রথম সভাপতি। বিদ্রোহের পূর্ব্বেই তিনি রুশ ত্যাগ করে যান প্রথমে ফিন্‌ল্যাণ্ডে, পরে সুইডেনে। ১৯২০ সালে লণ্ডনে তাঁর প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, এবং পরে ডিসেম্বর মাসে নিউইয়র্কে। ক্রমশঃই তাঁর ভক্তের দল পরিপুষ্ট হ'তে লাগল,—এবং শীঘ্রই তাঁদের উদ্যোগে নিউ-ইয়র্কে রোরিক মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা হোলো। আমেরিকাতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই রোরিক জগতের কল্যাণসাধন কল্পে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুল্‌লেন,—সেগুলো যে শুধু আমেরিকারই শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য-সাধনার কেন্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল তা নয়,—দেশে দেশে জগতের অনেক নিভৃত কোণ পর্য্যন্ত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সেগুলো বিকীরণ করছে চিত্তের দীপ্তি। আমাদের ভারতবর্ষেও রোরিকের প্রতিষ্ঠিত উরুস্বতী হিমালয়ান্ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটুটে পূর্ণ উদ্যমে বিজ্ঞানের গবেষণা চল্‌ছে।

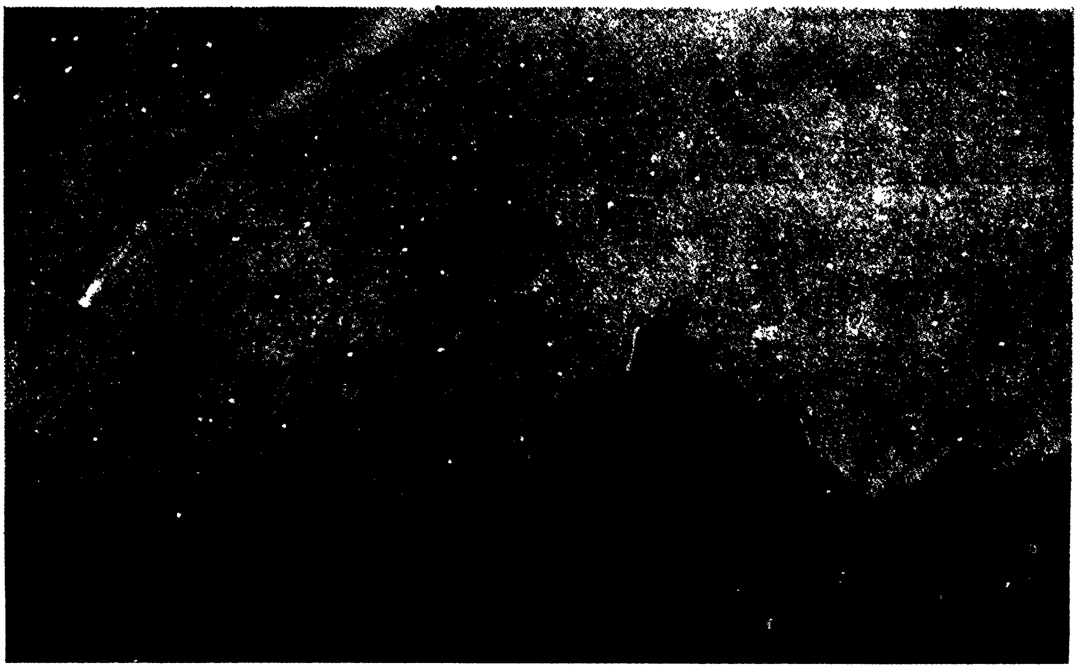
রোরিক প্রচার করছেন জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশ্বমানবের মিলনের বাণী। সাধনা ও সৃষ্টিই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বাধা বিপত্তি দ্বন্দ্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে আরোহণের সোপান মাত্র। তাঁর আদর্শ,—শান্তি-পতাকার তলে বিশ্বের মানবজাতি মিলিত হ'য়ে পরস্পরের সহিত পরিচয়, জানাজানি ও ভাব-বিনিময়ের সাহায্যে আপন আপন বিচিত্র কর্ম্মের সাধনায় মানব জীবনকে সহজ, বিচিত্র ও পূর্ণ করে তুলবে। সুখের বিষয় রোরিকের শান্তি-পতাকা ও চুক্তিপত্র গত ১৭ই নভেম্বরের ওয়াসিংটনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মিলনীতে চৌত্রিশটী জাতি কর্ত্তৃক একবাক্যে গৃহীত হ'য়েছে। চুক্তিপত্রের মর্ম্ম হ'চ্চে,—যুদ্ধ বাধলেও, জ্ঞান ও শিক্ষা ও শিল্প-চর্চ্চার কেন্দ্র,—মানুষের শিল্প-কীর্ত্তি, মানসিক উৎকর্ষ-সূচক যা' কিছু অনুষ্ঠান যেখানে যা আছে,—সেগুলিকে সার্ব্বজনীন ও যুদ্ধের এলাকার বহির্ভূত বলে গণ্য করা হ'বে। কোনো পক্ষই সেগুলোকে ধ্বংস করবে না।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তবু এই একটু আলো। আশা করা যাক্ এ আলো ছড়িয়ে পড়বে,—উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠ্‌বে। মনে পড়ে কবির বাণী—

"রবির আলো সাড়া দিল আকাশ পারে
অভয় বাণী শুনিয়ে দিল ঘর ছাড়ারে।"

রোরিক বলেন :—"As a prayer we repeat that knowledge and beauty are the real

corner stones of evolution, the gates to a world community. We affirm this not only as a prayer, but even as a command, to all humanity. We know that in these spheres all hearts must be united. Love, labour, and noble action are not abstract, misty symbols for the enlightened workers in the beautiful fields of creation. Endlessly we must repeat this command of beauty and knowledge. We must insist that the creative sense of the beautiful should be applied in every day life; that every household should be beautified, that in each home books should have the place of honour. * * * * * * We have the right to regard beauty as a real motive force. For a moment, imagine the history of humanity without the treasures of beauty,—* * * the majestic images of Assynia and Babylon, the dynamic symmetry of Egyptian Art, the beauty of the Gothic premitives, the enchantment of the Buddist glory and classic Greece. Let us disrobe the tales of heroes and rulers of the garb of beauty.—* * * How crude



ষ্টার্ অব্ দি হিরো



মাষ্টারস্ কমাণ্ড্

remain the pages of history! Truly, not a single heroic achievement, not one constructive victory may be imagined without the sense of the beautiful."

এর চেয়ে সত্য কথা বোধ হয় আর বলা হয়নি। রাষ্ট্র নেতারা ভেবে দেখ্‌বেন কি ?

সুশীলচন্দ্র মিত্র

"এলে তুমি ঘন বরষায়"—

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী

উদয়ের সঙ্গে সবিতার দ্বন্দ্বটা বিশেষ রকমের পাকাপাকি। উদয় যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, ওদের মাঝে কথা যদি হয় পাঁচবার তবে তা বন্ধ হয় পাঁচ-পাঁচে পঁচিশবার। কথাটা একটু বাড়াবাড়ির মত শোনাচ্ছে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রটাকে মানতে গেলে একে অস্বীকার করার উপায় নেই; অন্ততঃ পাড়ার কেউ এ পর্য্যন্ত ক'রতে সাহস পান নি। কারণটা এমন একটা যে কিছু তা নয়, তবে মানুষ বিশেষ ক'রে মেয়ে-মানুষ নিজে যা বোঝে তার ওপর সাধারণ যুক্তি-তর্কের কোন বিচারই খাটে না আর এই নিয়েই গোল বেধেছিল সবিতার সঙ্গে উদয়ের। উদয়ের পক্ষ থেকে অভিযোগ ছিল অল্প, কাজেই সবিতার তরফ থেকে যে অনুযোগ-গুচ্ছ আস্‌তো তাদের প্রতি ওর মন্তব্য ছিল অতি উদাসীন এবং একটু বেশীমাত্রায়ই সংক্ষেপ।—সবিতা কোনমতেই এটা মানতে পারিছল না যে, ব্যবসাদারী যে ক'রবে সে কেন রাত্রিদিন কবিতা লিখবে অথবা প'ড়বে? সবিতা বুঝেছে তার স্বামী এই কবিতার জন্যেই দোকানটায় কোন উন্নতি ক'রতে পারছেন না অর্থাৎ লাভের অংশটা নেহাৎই শূন্যে ভ'রে যাচ্ছে এবং তার মায়ের দেওয়া অলঙ্কারগুলো একটির পর একটি দেহচ্যুত হ'য়ে প'ড়ছে। সাধারণ বাঙ্গালী-মেয়ের এর চেয়ে বড় দুঃখ বোধ করি কল্পনাতেও আসে না। স্বামী মাসের শেষে একরাশ টাকা ঘরে আনবেন, স্ত্রী তার ইচ্ছামত খরচ ইত্যাদি ক'রে নিজের লুকোনো বার্লির টিনে অথবা অমনিধারা একটা কিছুতে কতক জমিয়ে ফেল্‌বে সময়ে-অসময়ে প্রয়োজন মত অতিক্লেশে খরচ করবার আশায়—এই হ'চ্ছে আর সকলের মত সবিতারও আকাঙ্খা। অথচ উদয় এই অতি সোজা এবং স্বাভাবিক কথাটা এতদিন বুঝতে পারেনি; হয়ত', হয়ত, কেন?—সত্যিই সে আর বুঝতেও পারবে না। এতে সবিতা আহত হয়, তার নারী-চিত্তে আঘাত লাগে; সুতরাং এর ফল যদি কলহ এবং অশ্রুবর্ষণে পর্য্যবসিত হয় তাহ'লে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

ওরা দু'জনে দু'জনকে এই দশ বছরেও গভীর ক'রে বুঝতে পারেনি—আজও ভুল বোঝে; বোঝবার চেষ্টাও ত' দেখা যায়নি। উদয়ের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক্, কারণ ও কবি—বোঝবার কিম্বা বোঝাবার কোন হাঙ্গামই ও পোহায় না, কেবল বাজাতে চায় মাত্র। তার বাজবে না সেই বোঝবার বায়না ধ'রবে। আর সবিতা উদয়কে না বুঝলেও চেষ্টা অন্ততঃ ক'রেছে। চেষ্টা ব্যর্থ নিশ্চয়ই; যেহেতু উদয় ওর কাছে কবি-স্বামী নয়—দোকানদার-স্বামী। "পতি পরমগুরু" এই ছেলেবেলা থেকে শোনা কথাটিই ওর সম্বল, গুরুরূপে নেবার মত কোন ব্যাকুলতাই এ অবধি ওর মধ্যে দেখা যায়নি।

এই ত' ওদের মনের দিকটার পরিচয়।—বাইরের খবর এই যে, সবিতাকে বুঝতে পারলে গোটা বাঙ্‌লার "সাধারণ মেয়েদের" বোঝা হ'য়ে যায়। সবিতা যখন ঝিকে শাসন করে তখন সে শিল্পীর ভাষায় "উগ্ররূপা", ছোট খোকাকে যখন আদর করে, কোলে ক'রে নাচায় তখন বিশ্বের মাতৃমূর্ত্তি ওরমাঝে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে আর যখন স্নানের পর এলোচুলে, কালোর-পাশে-মুগার-রেখা-দেওয়া শাড়ী প'রে, কপালে এবং সঁীথেয় সিঁদুর এঁকে ঠাকুর প্রণাম করে তখন সে কল্যাণী, গৃহিণী।

"কবি"—কথাটা শুনেই মন যে ছবিখানি চিত্রিত ক'রে ফেলে—অবিন্যস্ত চুল, উদাস-চোখে-চাওয়া দু'টি চোখ, একটা পাত্‌লা হাসিতে ভরা মুখ, আভূমিলুণ্ঠিত চাদর—উদয় ঠিক অমনি। এই ধারণার মূলে, মনে হয়, মনটা গ'ড়ে ওঠার সেই আদিম অবস্থায় উদয়ের মত কাউকে হয়ত' মানুষের মন প্রথম দেখেছিল: তারপর সেই মূর্ত্তির ওপরই তার কল্পনা রঙ লাগিয়ে লাগিয়ে আজকের এই "কবি"-মূর্ত্তি-কল্পনাকে জন্ম দিয়েছে। কল্পনা যতই শক্তিশালিনী হ'ক না কেন তার গঠনের প্রারম্ভে বাস্তবের প্রথম প্রেরণা আবশ্যক। একটা বাস্তব কিছুরই ওপর কল্পনা জাল বুনে চ'ল্‌তে পারে,—বাস্তবহীন কোন কল্পনা হ'তে পাবে না। প্রথম-দেখা সেই মূর্ত্তিটি বোধ হয় সেই কবি যিনি অবাক বিস্ময়ে প্রথম সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিয়েছিলেন, আকাশস্পর্শী পর্ব্বতকে ভীতি-বিহ্বলতায় দেব-ভূমি ব'লে অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন।—যাক্—

এইত' উদয়। ওকে দিয়ে আর যাই-ই হ'ক সত্যি করে দোকান চালান যায় না। দোকানদারীর একটা দিক ও সম্পন্ন ক'রতে পারে—দেওয়ার দিকটা, নেওয়া ওর দ্বারা সম্ভব হয়নি; অতএব লোকসান বস্তুটা ও ভালভাবেই অনুভব ক'রেছে—লাভের স্বপ্নও দেখেনি। সেইজন্যেই

সবিতার লক্ষ্যটা বারে বারে যতই ভ্রষ্ট হ'য়েছে ততই তার ভিতরের আর্ত্তনাদি আরও করুণ হ'য়েছে—দুঃখও তাতে কম পায়নি। উদয় এর কোনটাকেই সাংঘাতিক ভাবেনি। ওর নির্ব্বিকার চিত্তে কোন তরঙ্গই সৃষ্ট হয়নি। দোকান তাই তার মাসের মধ্যে যতদিন খোলা হ'ত—বন্ধ থাকত' সেই হিসেবে আরও বহুদিন বেশী। গণিত বিষয়টাকে ও ভয় করে, অর্থের প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। * * * বড় রাস্তার ধারে ছোট দোকানটি সবারই চেনা অর্থাৎ তাদের মতে এমন দোকানদার ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। বটেই ত! নেওয়ার কোন বাঁধন-কষণ নেই অথচ দেওয়ার বালাইটা বালাই-ই নয়। তাদের এই গ্রহণটাকে সাফল্য-মণ্ডিত ক'রেছিল সবিতার অলঙ্কারগুলি।

উদয় সবিতাকে ব'লেছিল—প্রেম দিয়ে প্রেম পেতে হয়, ধ্বনির পর প্রতিধ্বনি স্বাভাবিক—সুতরাং টাকা দিয়েই টাকা পাবো, এটা মরণের মত সত্য। সবিতারও বুঝতে একথা বাধেনি ব'লেই গয়নাগুলো সে অকাতরেই দিয়েছিল। কাতর যে মোটেই সে হয়নি একথা বলা চলে না জোরালোভাবে—তবে ভবিষ্যতের আশাটা তখন এমনধারা কৃশ ছিল না। উদয়ের কবিতার খাতাখানা তখন চোখে লাগলেও সবিতা বেদনা পেত না, কারণ সে বুঝতে পেরেছিল তার স্বামী এবার বুঝতে শিখেছেন অনেকটাই; মানে পাবার আশায় সে আর কিছু চিন্তা করবার সুযোগই লাভ করেনি—এটাই এখানে সত্যি। উদয়ও কিছুকাল তার সে আশায় ইন্ধন যোগাতে পেরেছিল; তবে সেটা দোকানের মুনাফা নয়—সম্পাদক বন্ধুর দেওয়া কবিতার পারিতোষিক। যাই-ই হ'ক সবিতা কিছু অর্থ লাভ ক'রেছিল—যদিচ যা সে দিয়েছে তার তুলনায় কিছুই নয় সেটা; তবু আশা পূর্ণ হাওয়ার প্রথম মাদকতায় সে ওটুকু গ্রাহ্যই করেনি। উদয়ের প্রতি তার টানটাও একটু বেড়েছিল, তার কবিতা শোনবার জন্ত ওর উৎসাহ দেখা দিল দুর্ব্বার। উদয় এতে স্বস্তিবোধ করেছিল মাত্র—আর কোন চাঞ্চল্যই সে দেখায়নি। রাত্রে ছাতে ব'সে কবিতা শোনবার একটা ব্যাকুলতা সবিতা অনুভব ক'রতো—তার অন্তরের কাব্যলক্ষ্মী এতদিনে যেন আবার জেগে উঠলেন। বিবাহ-বাসরে, নতুন 'ফুল-শয়নে' যে কবিতার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘ'টেছিল আজ তাঁরই ইঙ্গিত বুঝি সে দেখতে পেলে!—অবিশ্যি বাইরে থেকে তাই মনে হ'ত। তবে ভেতরে ভেতরে ওর ইচ্ছে যে এই সুযোগে উদয়কে দোকান সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া—কারণ ওর চোখদু'টি কবিতার ছন্দের প্রত্যেক উত্থান-পতনে সদ্যভাঙা ডালিম দানার মত চিকমিকিয়ে উঠ্‌ত' না। উদয় হয়ত' প'ড়ে চ'লছিল:

হোমের আগুনে জীবন দ'হেছে
হ'য়ে গেছে হিয়া দগ্ধ;—
বেদনার তাপে রূপ ঢেকে গেছে
কালো আঁখি আজ অন্ধ।
হতাশ ক'রে দিনের শেষে,
কঠিন এল' নিঠুর বেশে
মুক্ত দুয়ার নিদয় হাতে
ক'রলো সে ওই বন্ধ!

—সবিতা তাকে থামিয়ে দিলে—'হ্যাঁগা, তুমি যে ব'লেছিলে আরও একটা আলমারি দরকার, ঘরটা একটু বাড়াতে হবে—টাকা চাই। কই টাকা ত' নিলে না?

উদয়ের চোখ দু'টি তখন সেই অপরিচিত কঠিন দয়িতের খোঁজে আকাশের সব চেয়ে বড় তারাটার দিকে নিবদ্ধ ছিল। সবিতার কথা সে শুনতে পায়নি। সবিতা একটা উৎসাহপূর্ণ সমর্থন উদয়ের পক্ষ থেকে আশা ক'রেছিল; কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কোন উত্তর পেলে না তখন তার কবিতার নেশা ছুটে গেছে। উদয়কে একটু জোরের সঙ্গেই নাড়া দিয়ে কথাটার পুনরুক্তি ক'রলে। এ রসভঙ্গে উদয় ক্ষুণ্ণ হ'ল না—স্বাভাবিক ব'লেই মেনে নিল'। যে কোনদিন কবিতার কোন মূল্যই দেয়নি তার এর প্রতি এ আকর্ষণ যে অহেতুক নয় এটুকু বোঝার ক্ষমতা উদয়ের কাছ থেকে আশা করা বোকামী নয়। অতএব সে-ও তাল রেখেই জবাব দিলে—টাকার প্রয়োজন আছে, তবে তা ঘর বড় করবার জন্যে নয়—ছোট করবার জন্যে।

কথাটা ও সবিতার বোঝবার মত ক'রে বলেনি; সেই জন্যেই সে প্রশ্ন ক'রলে—তার মানে?

—মানেটা সোজা। দোকান চ'ললো না;—কিন্তু ওর গতি থেমে যাওয়ার হেতু আমি না ও নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও।

সবিতার কথা বলার শক্তি লোপ পেয়েছে—কেবল বড় বড় অশ্রুবিন্দুতে ওর চোখ ভ'রে উঠেছে। উদয় বুঝতে পারলে না এ জল অলঙ্কারের সমাধিকে সিঞ্চিত ক'রছে না তার চলবার পথটাকে আরও পিছল্ ক'রে দিচ্ছে।

* * *

একটা বিস্তৃত বস্তু যখন সঙ্কুচিত হ'য়ে যায় তখন তার প্রথম অবস্থান্তর দুঃসহ-ই মনে হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মিলিয়ে চলার একটা শক্তি প্রতি বস্তুতে যে র'য়েছে সেটা উপেক্ষণীয় নয়;—সবিতার নতুন সংসার দেখে তাহাই বোধ হয়।

খোকা খেলা-ধূলো আগের মতই করে। ওর ভেতর কোন পরিবর্ত্তন কেউ লক্ষ্য করে না। কেবল খাবারটা একটু অনিয়মিত ভাবে হয়, পরিমাণও তার কিছু কম। সবিতার পরিবর্ত্তনই বেশী রকম ঘ'টেছে। ওর শাড়ীখানা আর তেমনধারা ফর্সা নয়—মাঝে মাঝে ছিঁড়েও গেছে। ব্লাউজ্ ও না-কী কোনদিনই গা'য়ে রাখতে পারে না। গয়নাগুলোও অনেক ছোট বয়সে পরা ছেড়েছে। এ ওর অভিমানের কথা না অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে চলবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দুরন্ত মনের রাশ্ টেনে ধরার চেষ্টা বোঝা কঠিন, আর এই জন্যেই বাংলার 'সাধারণ মেয়ে' বড় আশ্চর্য্য ঠেকে! ওর চোখের কোণে কোণে নিবিড় হ'য়ে কালী জ'মেছে—হাসতে গেলে কাণ দু'টী আর রাঙিয়ে ওঠে না। জীবনের যে সময়টায় ওর ভেতর একটা সুশ্রীতার দাবী করবার ছিল—ঠিক সেই সময়ই ওর এই দৈন্য দেখে মানুষের জীবন সম্বন্ধে স্বভাবতঃই দার্শনিক চিন্তাগুলো মনের ভেতর ভিড় ক'রে আসে। মনে হয় যদি উদয় পাকা ব্যবসাদার হ'ত, যদি ও লাল খেরোয় বাঁধা খাতাখানা হাতে নিয়ে তাগাদা দিয়ে টাকা আদায় ক'রতে পারতো—কবিতার লাল মলাট দেওয়া খাতাখানা ওর দু'চক্ষের বিষ হ'ত সবিতার মত, তাহ'লে—থাক্—

সবিতা যে বস্তুর জন্যে পূর্ব্বে উদয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে কলহ ক'রেছে সেগুলি আর ওর তেমন, তেমন কেন—মোটেই প্রিয় নয়। আকাঙ্খিতের ওপর এই অনাসক্তিতে ওর অভিমান, ওর নারী-ধর্ম্মের কোমল অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। মনে একটা ক্লিন্ন বেদনা অনুভব করি কিন্তু নারীজাতির ওপর শ্রদ্ধায় মনটা আপনা থেকেই অবনত হ'য়ে আসে। ওরা কত সহজ অথচ কত কঠিন! মহামানবেরাই যে বজ্রের মত দৃঢ় আর পুষ্পের মত কোমল তাই-ই নয় শুধু; মেয়েজাতটারও ওর মধ্যে একটা বিশেষ স্থান আছে। আশাভঙ্গে ওরা আহত হয় কিন্তু ভেঙে পড়ে না, নতুন করে আবার আশার প্রতিষ্ঠা করে।

সবিতার নতুন গৃহস্থালীতে ওর সেই নবীন আশার নিগূঢ় ব্যঞ্জন্ স্পষ্টতর।

ওর মধ্যে পরিবর্ত্তন এতটা এসেছে যে ওকে সত্যি ক'রে সবিতা ব'লে চিনতেই কষ্ট হয়—সম্পূর্ণভাবে নতুনই যেন; কিন্তু তবু উদয়ের প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কবিতার খাতাখানার ওপর ওর বিতৃষ্ণা একটুও লঘু হয়নি বরং যতই সংসারে তার অভাবের ভ্রূকুটি কুটীলতর হ'চ্ছে ওর অন্তর আরও তিক্ততায় বিষিয়ে উঠ্‌ছে। ভাবে কি-ই না হ'ত—দোকানখানা ভালভাবে চালালে। একটু আগেও যদি জান্‌তে পারত' গয়নাগুলো থাকত' নিশ্চয়ই; সংসার চালাবার জন্য এমনভাবে ভাবতে হ'ত না। ছোটখাটো গয়নাগুলি এতদিনে শেষ হ'য়ে গেছে। গয়না অথবা অর্থ বস্তুটা সাদা চোখে দেখলে জড় ব'লেই মনে হয় কিন্তু অভাবের সময় ওর মাঝে একটা দুর্দ্দাম গতি কোথা থেকে আসে যে বোঝা শক্ত। অবচেতন শক্তি এমনিভাবে দুঃসময়েই চেতনা লাভ করে বটে!

এত যে অদল-বদল হ'য়ে গেছে—উদয়ের মনে কিছুমাত্র বিপর্য্যয় দেখা দেয়নি; কেবল ওর শরীরটা ভেঙ্গে গেছে। ওর দৈনন্দিন প্রত্যেকটা কাজেই একটা বিশ্রী শ্লথতা এসেছে—অর্থহীন এবং উদ্দেশ্যহীনের যা হয়। দিনকতক ধ'রে বিছানার সাথে ওর গভীরতম যোগাযোগ সুরু হ'য়ে গেছে—ছিঁড়বে হয়ত' সমস্ত জীবনের বিনিময়েই। রোগের যন্ত্রণা ওকে একটুও ম্লান ক'রতে পারেনি! সারা দেহে ওর একটা কিসের পুলক প্রথম-পাওয়া ভালবাসার মত প্রতি স্নায়ুতে স্নায়ুতে চারিয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে কবিতা লেখে,—বেদনা যখন তীব্র হয় কলমটা দাঁত দিয়ে কঠিনভাবে চেপে ধরে।

সবিতা উদয়ের চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে; ওর ব্যথার গভীর ব্যথা অনুভব ক'রেছে। সেবা করবার জন্যে হাত দু'টি বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। সবিতার নারী অন্তরের কাছে ওর দুঃখ অভিমান নত হ'য়ে প'ড়েছে।

সেবা করবার একটা অতি সহজ নিপুণতা প্রত্যেক নারীর ভিতর বর্ত্তমান এ কথাটা উদয় এই ক'দিনে নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছে; কিন্তু তাদের সেবা দেহটাকেই বেদানামুক্ত ক'রতে পারে—মনের ব্যথায় তাদের কোমল স্পর্শ অল্পই পৌঁছয়—এটাও ও ভেবেছে। পুরুষের মন নারী ঠিকমত বোঝে না, —হয়ত' একেবারে বেশী বুঝে ফেলে, নয় মোটেই বোঝে না। যদিও বা একটা ধারণা হয় কোন ক্রমে তবে তাও বেশীরভাগ সময়েই হয় উল্টো। উদয় ভাবে এই যে আমার শরীরটাকে নিয়ে সবিতার ভাবনার অন্ত নেই এর কিছুমাত্র যদি আমার কবিতার খাতাখানার ওপর বর্ষিত হ'ত!—কিন্তু মুখ ফুটে বলার মানুষ ও নয়। সবিতাকে ও সুখী ক'রতে পারেনি; ওর অলঙ্কারহীন দেহটা ওকে পীড়া দেয়!—

* * *

সবিতার সেবা উদয়ের বেঁচে থাকার দিনগুলিকে দীর্ঘ ক'রতে পারেনি।

. সেদিন ও ব'সে ভাবছিল' অপরাধ ওর কোথায় ফেনিয়ে উঠেছিল। চোখের জলে ওর বন্যার ধারা নামেনি—কেবল বড় বড় ফোঁটাগুলি টল্ টল্ ক'রছিল।—এমনি সময়

পিওন এসে ওর হাতে নোটের তাড়া বোঝাই একখানা খাম দিলে আর এক খানা উদয়ের নতুন লেখা কবিতার বই। খামখানা দূরে ফেলে দিলে—ওখানার দিকে ও যেন চাইতে পারছিল না। বইখানা বুকে চেপে নিলে—চোখের জলে তার বহু দিনের শুক্‌নো পাতাগুলো ভিজে গিয়ে নতুন বৃষ্টিসিক্ত পথের ধূলোর মত একটা সুবাসে ওকে ঘিরে ধ'রলে।—

উদয় তখন কত দূরে অথবা কত কাছে সবিতা তা জানল না ; তবু এ সুগন্ধ উদয়ের পরিতৃপ্তির পরিমলে সুন্দর।

অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী।

পল্লীগান ধ্বংস হইল কেন ?

মৌলবী মনসুর উদ্দীন এম্-এ

মৌলবী জসীম উদ্দিন মহাশয় আমাদের দেশের পল্লীগান আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। পল্লীগান ধ্বংসের কারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম। সেই আলোচনা ঢাকার 'জাগরণে' প্রকাশিত হয় (পৌষ ও অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) এই "বিচিত্রায়" 'জরীন কলম' একটী প্রবন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে পাঠকের দৃষ্টি ওদিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক জসীমুদ্দীন বাঙ্‌লার পল্লীগানের ধ্বংসের কারণ খুঁজিতে যাইয়া ওহাবী আন্দোলনের ফলের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। এইখানে ওহাবীয় মতবাদ কি তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

আরব দেশে ত্রয়োদশ শতকে ইবন তিমিয়া নামক একজন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক এবং আলেম ব্যক্তির উদ্ভব হয়। তিনি অত্যন্ত উগ্রপন্থী হাম্বলী মতবাদী ছিলেন। ইনি ইসলাম ধর্ম্মে নানাপ্রকার কুসংস্কার দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পীর পূজা, দরগাহ জিয়ারত করা, হজ্জ করা প্রভৃতি অযৌক্তিক এবং অশাস্ত্রীয় বলিয়া দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। (Vide A Literary History of the Arabs by Prof. R. A. Nicholsa, London 1923. P. 462—463 ; Encyclopoedia of Islam Vol. II Lonnon Pp. 421—423 ; Development of Muslim Theology, Jurisprudence etc. by Prof. D. B. Macdonald. New York 1926. Pp. 270—278) অবশ্য তাঁহাকে এই মতের জন্য গোঁড়া মুসলমানদের নিকট বহুবার বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে, কেননা সাধারণ মুসলমানেরা গুরুকে পূজা (ভক্তি) করা, তীর্থস্থান দর্শন করা মহাপুরুষদের অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রভৃতি বিষয়ে বড়ই অভ্যস্ত।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি মধ্য আরবের নজদ প্রদেশের মুহম্মদ বিন আবদুল ওহাব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবন্ তিমিয়ার গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার মতবাদী হইয়া পড়েন, তিনিও ইসলামের মধ্যে নানাপ্রকার পূতিগন্ধময় কুসংস্কার দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হন এবং পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে ঐ সকল আবর্জ্জনা বিদুরিত করিতে দৃঢ়বদ্ধ হন। তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং দিরিয়া নামক সহরের প্রধান ব্যক্তি মুহম্মদ বিন সউদকে তাঁহার মতে দীক্ষিত করেন এবং তৎপরে তিনি তাঁহার শিষ্যের কন্যাকে বিবাহ করেন।

ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদ দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে মুহম্মদ বিন্ সউদের পুত্র আবদুল আজিজ সৈন্য সামন্ত লইয়া নানাস্থান দখল করিতে থাকেন। তথাকার দরগাহ প্রভৃতি ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহারা আরও প্রচার করিতে থাকেন

They proclaimed that all men are equal before God ; that the most virtuous and devout cannot intercede with him and that consequently it is a sin to invoke saints and to adore their relics (Literary History of the Arabs. P. 467.)

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে এই ওহাবী মতবাদ বাঙলাদেশে প্রচার করেন হাজী শরিয়তুল্লাহ। এই সম্পর্কে ক্ষিতি-

মোহন যাহা লিখিয়াছেন তাহা তুলিয়া দিতেছি। কেননা তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা নির্ভুল এবং সংক্ষিপ্ত (Vide Encyclopoedia of Islam Vol II p. 57 etc. Indian Islam by Dr. Murray. T. Tittus Oxford 1930 p. 178—181.)

"ফরিদপুরে হাজী শরিয়তুল্লার জন্ম জোলার বংশে। তিনি মক্কা যাইয়া শেখ তাহির অল মুক্কীর শিষ্য হন। ২০ বৎসর তথায় থাকিয়া ১৮০২ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মত প্রচার করেন। তাঁর মতে শিষ্যের গুরুর একান্ত আনুগত্য ভাল নয়। তিনি বলেন, ভারত 'দারল হর্ব্'—অর্থাৎ যুদ্ধ স্থান। অতএব এখানে ঈদ ও জুম্মার নামাজ চলে না। প্রত্যেকে খুব নিষ্ঠাবান আচারী মুছলমান হইবে। পীর দরগাহ প্রভৃতি পূজা করিবে না। এই মতবাদই ওহাবী। তাঁর পুত্র মুহম্মদ মহসীন বা দুধু মিয়া তাঁদের সম্প্রদায়কে নানামণ্ডলে ভাগ করিয়া সুব্যবস্থা করিলেন। তাঁরা প্রচার করিলেন সম্প্রদায়ে ধনী দরিদ্রে ভেদ নাই। একের বিপদে সকলকে দাঁড়াইতে হইবে, ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে বাহিরের কাহারও বিবাদ হইলে ইঁহারা একত্র হইয়া বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন। তাঁদের মতে পৃথিবী ভগবানের, তাঁহাকেই পুরুষানুক্রমে তাহা অধিকার করিতে বা টেক্স চাহিতে পারেন। তাই পুরাণে মুসলমান নীলকর ও জমীদাররা ইঁহাদের সমবেত ভাবে লড়িয়াও সহজে কিছু করিতে পারেন নাই।" (দ্রষ্টব্যঃ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা পৃঃ ২৭)

সুতরাং ওহাবীরা যে গান গাওয়া নিষেধ করিবে বা ওয়াহাবী মতবাদী প্রভাবান্বিত কোন জমীদার (১) বাইচ খেলার নৌকার গান শুনিয়া মারপিট করিবে তাহা বিচিত্র নহে (২)। ইহা তেমন বিচিত্র নহে। আবার আধুনিক কালের বাঙলার অন্যতম ওয়াহাবী নেতা (৩) মৌলানা আকরম খাঁ যে Reformation এর অভিপ্রায়ে গান গাওয়ার স্বপক্ষে মত দিবেন তাহাও বিচিত্র নহে (৪)। কিন্তু কথা হইতেছে মৌলানা আকরাম খাঁর মত কয়জন ওয়াহাবী মৌলানা সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার এই মতের তীব্র প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এমন কি মৌলানা মহাশয়ের মতগুলি তাঁহার নিজের মজহাবের মৌলানারাই গ্রহণ করিতেছেন না।

মৌলানা মহাশয়ের মত শুভ লক্ষণ-সূচক সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক এই সম্পর্কে একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। বাঙলা দেশে ওয়াহাবী সংখ্যা খুব বেশী নহে। এবং বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলার সর্ব্বত্র ওয়াহাবীও নাই। তবু বাঙলা পল্লীগানের ধ্বংস সাধনের কেলেঙ্কারী তাঁহাদের ঘাড়েই চাপাইলে চলিবে কেন?

জসিমুদ্দীন আর একটা কথা ভুল করিয়াছেন, Official Islam [আচারনিষ্ঠ ইসলাম] পূর্ব্ব বাঙলায়ই প্রবল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও পূর্ব্ব বাঙলায় গান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। উত্তর বঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গে এত প্রচুর এবং সুন্দর গান পাওয়া যায় না। তবুও কি বলিতে হইবে ওয়াহাবী প্রভাব বাঙলার পল্লীগানের সর্ব্বনাশ করিল; তথা বাঙলার কৃষ্টির সর্ব্বনাশ করিল।

একথা অবশ্য সত্য যে আচারনিষ্ঠ ইসলামে সঙ্গীতের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লৌকিক এবং অলৌকিক সঙ্গীত পৃথিবীর মুসলমান দেশ সমূহে আদরের সহিত চর্চ্চা

(১) জমিদারকে ওয়াহাবী মতবাদ প্রভাবান্বিত এইজন্য বলিতেছি যে লেখক জসিমুদ্দীনের বাড়ী ফরিদপুরে এবং ফরিদপুর ওহাবী নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহর জন্মভূমি এবং কর্ম্মস্থান। ফরিদপুরে এখনও ওয়াহাবী নেতা আছেন।

(২) বাইচ খেলার নৌকার মালিককে প্রহার করিতে দেখিয়া ন্যায়পরায়ণ পাঠক বিচলিত হইতে পারেন। এইজন্য ইঁহাদের অন্য একটী কর্ম্মের দৃষ্টান্ত তুলিয়া দিতেছি। মক্কা শরীফের 'কাল পাথর' (হাজরুল আছওয়াদ) সাধারণ মুসলমানের নিকট অত্যন্ত পবিত্র জিনিষ এবং যাঁহারা হজ্ব করিতে যান তাঁহারা প্রত্যেকেই উহাকে চুম্বন প্রদান করেন। (ওয়াহাবীরা উহা চুম্বন করেন কিনা, জানিনা তবে এ বিষয়ে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম (আক্রম নহে) খাঁ আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন) আরবীয় ওয়াহাবীরা এই পবিত্র কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ড ভাঙ্গিয়া কয়েক খণ্ড করিয়া ফেলেন। [Vide A Literary History of the Arabs by Prof. R. A. Nicholsan; ' 467.) পণ্ডিত নিকলসনের ইংরাজী বচন এখানে তুলিয়া দিতেছি।

They [the wahabis] interrupted the pilgrim caravans, demolished the domes and ornamented tombs of the most venerable saints (not excepting that of the Prophet Muhammad himself) and broke to pieces the Black stone in the Kaaba. Ibid P 467.

(৩) বাঙলা দেশে যাহারা 'আহলে হাদিছ' নামে পরিচিত তাঁহারা ওয়াহাবী। In India the Whabis call themselves so (Ahl—Hadith) [Vide Encyclopoedia of Islam. Vol. I P. 184.] ফারাজী নামে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারাও ওয়াহাবী। ময়মনসিংহ জিলার বৈলর ডাকঘরের অধীনে কয়েকটি গ্রাম ফারাজী প্রধান দেখিয়া আসিয়াছি।

(৪) জসীমুদ্দীন বহু নেতার মত গান গাওয়ার স্বপক্ষে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মাত্র মৌলানা আকরম খাঁ মহাশয়ের নাম বলিয়াছেন। আমরা অন্য কোন নেতার কথা জানিনা যিনি গান গাওয়া* সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* গান গাওয়ার বিরুদ্ধে মুসলমানদের official religious opinion—কেমন তীব্র তাহা বুঝিলে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। [কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে গান প্রচলিত ছিল এবং আছে।]

করা হইয়াছে এবং হইতেছে। এ সম্বন্ধে একটী বচন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তুলিয়া দিতেছি।

"We must lastly make mention" says Amari in his History of the Mussulmans of Cicily, "of the musicians who were accustomed to sing to the lute the verses of the poets—a usage which the Arab learned from the persians and which was condemned and whenever it was possible forbidden by strict Mussulmans, though the rich and the great often collected troops of musicians for singing and dancing".

Quoted from Vol. I page 431 of Stovia Den Mussulmani di cicilia by J.U. Courthope in his, 'A History of English Poetry Vol. I p. 76 (Macmillan & co. 1919)

মিশরে এখন মুসলমান মেয়েদের বিবাহের সময় লোক সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। (Vide Arabic Proverb by J.L. Brukhurdt. 1875. P. 136—139.*) শুধু তাই নয় সাধারণ মিশরিয়েরা পল্লীগান করে এ সম্বন্ধে ইংরাজী বচন তুলিয়া দিতেছি।

.Thus do the boatmen in the rowing etc, the peasants in the raising water, the porters carrying heavy weights with poles, men, boys and girls in assisting builders, by bringing bricks and stones and water and removing rubbish, so also sawyers, reapers and many other labourers [Vide Modern Egyptians by E. W. Lame London 1890. p, 324]

* During this first *te te a tete* many women assemble] before the door striking drums, singing and shouting loudly [Arabic Proverbs p, 136—137.]

প্রাচীন আরবে † লোক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। [Vide Literary History of the Arabs p. 19] আরবেরা স্পেন দেশে তাহাদের স্বদেশীয় লোকসঙ্গীত বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এবং ইহা স্পেনীয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। Ibid Pp. 416—417.

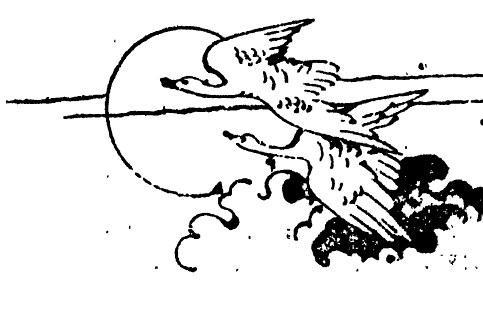
পারস্যে প্রাগ ইসলামীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত লোকসঙ্গীত চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক ব্রাউনের কথা প্রণিধানযোগ্য। "I have no doubt that tasuif or ballad song by tourbador and wandering minstrels exited in Persia from very early—perhaps even from pre-Islamic times. (Vide Literary History of Persia Vol. IV Cambridge P. 221.)

পারস্য দেশীয় একখানি পল্লীগানের গ্রন্থ কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার নাম Twelve Persian songs collected and arranged......by Blair Fairchild. (Novells & Co. London.)

সম্প্রতি তুরস্কে নূতন ধরণের একটী experiment চলিতেছে। প্রাচীন লোকসঙ্গীত ও কবিতার অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রিজা, তউফিক কবিতা রচনা করিতেছেন। "He has revived the old folk literature of Turkey. In his imitations of this folk literature he has written a group of poems which have been read by the common village folk and admired by them. (The light Jan. 16. 1932) আমাদের দেশে এই আদর্শ অনুসরণ করিলে মঙ্গলপ্রসূ হইবে।

মনস্থর উদ্দীন

† প্রাচীন আরবী কবিতা সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য M. Z. Siddiqi মহাশয় লিখিত Calcutta Review. Sept. 1931.



জব্দ

শ্রীমতী জাহানারা বেগম চৌধুরী

জগৎতারিণী দেবীর একমাত্র অন্ধের যষ্টি ছিল পুত্র রাধাবল্লভ। বয়স চল্লিশের কোটায় পৌঁচেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মা ষষ্ঠীর দয়া হোল না—! মা তো ভেবেই—অস্থির! এই অগাধ সম্পত্তি ভোগ করবে কে! কত মানত করেন —ঠাকুর ঘরে মাথা ঠোকেন—কিছুতেই কিছু হয় না! মা কালীর কাছে জোড়া ঢাকের সঙ্গে জোড়া পাঁঠা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। ধূলুকের জাগ্রত ঠাকুরের কাছে বুক চিরে রক্ত দেবেন বলেন—এম্‌নি আরও কত কি! কিন্তু তাঁর এই আকুল প্রার্থনা হয়ত কারও কানেই পৌঁছে না— তাঁর বুকের মাঝেই মিলিয়ে যায়! তারপর সন্ধ্যে বেলা তুলসী তলায় প্রদীপটা জ্বেলে দিয়ে প্রণাম করে বলেন— "হে ঠাকুর রাধার আমার একটি ছেলে দাও—যেন মানুষের মত গা হয়ে শূয়রের মত "রা" হয়েও বেঁচে থাকে—!" তারপর তুলসী তলার একটু মাটী তুলে মাথায় ঠেকিয়ে মুখে ঠেকান আবার পুত্রবধূকেও খাইয়ে দেন। এতে কিন্তু পুত্রবধূর বড় একটা আগ্রহ দেখা যেত না।

হঠাৎ কিছুদিন পর শোনা গেল জগৎতারিণী দেবীর কোলে সত্যি সত্যি একটি নাতি আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে। ভগবান তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন—একেবারে কড়ায় গণ্ডায়! পাড়ার বৌ ঝিরা কানাকানি করে—"হ্যালা— মানুষের কখনো অমন ছেলে দেখেছিস্—? মা—গো—মুখটায় যেন শূয়রের মুখ বসানো!" "কি জানি বাপু, বুড়ো বয়সে একটা হোল যদি, তা আবার না আছে ছিরী না আছে ছাঁদ! অত বড় লোকের ছেলে হবে কত রূপের ডালি—, তা না এ যেন একটা কী, আর দেখেছিস গায়ে কত বড় বড় লোম—! বাবা—গো—! হে মা ষষ্ঠী তোমায় দণ্ডবৎ করি!" বলে হাত দুটো কপালে ঠেকায়!

প্রথমে জগৎতারিণী দেবীর মনটা একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু—"নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" এই প্রবাদ বাক্যটী তাঁর মনে সান্ত্বনা এনে দিল। তারপর তিনি এখন খু—ব—খুশী! পাড়ার সব লোককে কাপড় চোপড় দান করেন। কালীঘাটে ছোটেন জোড়া পাঁঠা ও ঢাক নিয়ে! তারপর কালীঘাটে আসা যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে সাত আট দিন যায়, কারণ তিনি থাকেন সাঁওতাল পরগণার এক পল্লীগ্রামে।

* * * *

ন'বছর কেটে গেছে। গোবিন্দ এখন বেশ বড় হয়েছে। যেম্‌নি দুষ্টু তেম্‌নি একগুঁয়ে! এই দুটো গুণ একেবারে হু—হু শব্দে বেড়ে চলেছে তার। তার জ্বালায় পাড়ার ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সবাই অস্থির! বাব্বা —ঠাকুমার যাকে বলে একেবারে চাঁদ-চাওয়া নাতি! কী ভীষণ আদুরে! তার চাকরটির নাম রামচাঁদ! বয়স হবে আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ! গবু কিন্তু তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনা। তাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কারণ তার কোমল হাতের চড় হাসিমুখে সহ্য করার মত আর দ্বিতীয় বন্ধু ছিলনা। সকালে উঠে ট্রাইসিকেলটায় চড়ে গবু মাঠে হাওয়া খেতে যায় রামচাঁদের সঙ্গে। পাড়ার লোক ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেউ ছাগল ছানা কেউ ভেড়া-ছানা কেউবা বেড়াল ছানা লুকিয়ে রাখ্‌তে। তবু তার হাত থেকে রক্ষে নেই! সে তার সবুজ কঞ্চির ছোট্ট লাঠিটা শক্ত করে ধরে গম্ভীর ভাবে ঢুকে পড়ে গরীব প্রতিবেশীদের বাড়ীর ভেতর! ঢেঁকির পাশ থেকে হয়ত একটা বাচ্ছা এনে আদরের ও শাস্তির ঠেলায় আধমরা করে ছেড়ে দেয়! তারপর নজর পরে মটর শুঁটীর গাছের ওপরও, পাকা পেয়ারাগুলোর

ওগরও! আর কি রক্ষে আছে! সেগুলোর শ্রাদ্ধ করা হয়! তারপর যায় বাইরে, ধানক্ষেতে ট্রাইসিকেল্‌টা নিয়ে ছুটো-ছুটি করে!

মাঝে মাঝে প্রজারা যেয়ে জমীদার বাড়ী নালিশ করে! রাধাবল্লভ চাকরদের ডেকে খুব করে শাসন করে দেন্‌। কিন্তু ঐ ছেলেকে কি আর কেউ সামলাতে পারে! ওই বেচারা বুড়ো রামচাঁদই রাতদিন নাকের জল চোখের জল এক করছে! কিন্তু জানিনা কিসের মায়ায় সে পড়ে আছে!

হঠাৎ গবুর খেয়াল হয় রামচাঁদকে হুকুম করে "কান ধরে সাতবার ওঠা বসা কর!" সে তাকে বাজে কথায় ভুলাতে চেষ্টা করে। বলে "বাবুণী, চলো পাখী ধরি গে কেমন মজার খেলা করব চলো তো আমার সোনাবাবু!" কিন্তু আগের কথাটা গবু কিছুতেই ভুলতে পারেনা! ওকে কান ধরে সাতবার ওঠা বসা করিয়ে তবে ছাড়ে! এই বুড়ো বয়সে রাতদিন ওঠা-বসা করে তো রামচাঁদ বেচারার হাঁপানি হয়ে গেল!

শীতকাল এসে পড়ে। গবু আগের মতই মাঠে যায় সকাল বেলা। বুড়ো বুড়ীরা ছোট ছোট খাটিয়া পেতে বাঁশ-ঝাড়ের তলায় বসে দিব্যি মনের সুখে রোদে বসে বসে গল্প করে। গবু দূর থেকে ঘুসি পাকিয়ে ছুটে যায় ওই বুড়ো বুড়ির সঙ্গে কুস্তি লড়তে! ঘুসি পাকিয়ে দেয় এক্‌ ঠেলা—বেচারী বুড়ী উল্টে পেছনের দিকে ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়ে যায়! রামচাঁদ তাড়াতাড়ি ছুটে আসে বুড়ীকে তুলতে। হয়ত কাঁটা ফুটে কনুয়ের পাশ থেকে একটু রক্তও পড়ে। তারপর গবু ছুটে পালায়!

ক্রমে নালিশের জ্বালায় রাধাবল্লভ গবুকে স্কুলে দেওয়া স্থির করলেন। সে কিন্তু রামচাঁদকে না নিয়ে কিছুতেই যাবে না! মহাবিপদ! শেষ পর্য্যন্ত গবুর মতটাই বজায় রাখা হোল।

কিছুদিন পর দেখা গেল গবুর দুষ্টুমীটা ঠিক্‌ আগের মতই আছে। একদিন পণ্ডিতমশাই টেবিলের ওপর পা তুলে, চোখ দুটো বন্ধ করে একটু আরাম করছিলেন, গবুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে চট্‌ করে একটু কাগজ পাকিয়ে সরু করে এনে দিলো পণ্ডিত মশাইএর নাকের ভেতর চালিয়ে! আর যায় কোথায়—হাঁচিরই ঠেলায় বেচারা অস্থির।

আবার সেদিন পণ্ডিতমশাইএর চেয়ারের চারটে খুরোর নীচে বেশ মার্বেল দিয়ে রেখেছে যেই বসতে গেছেন অমনি চিৎপটাং! হীরু একদিন পড়া পারেনি, পণ্ডিত বল্লেন—"গবু কান মলে দাও তো।" সে অমনি তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে তার সবটুকু শক্তি দিয়ে দিল পণ্ডিতমশাইএর কানটা আচ্ছা করে মলে! পণ্ডিতমশাই তো চেঁচিয়েই অস্থির, প্রাণ যায় আর কি! ক্লাস সুদ্ধ ছেলেরা হাসির ঠেলায় অস্থির! তবু সে ছাড়েনা, বা—রে—, তাকে তো কান মলতেই বলা হয়েছে!

কি আর করা যায়, জমীদারের নাতি, কিছু বলা তো যায়না!

তবু গবুকে আর স্কুলে রাখা চল্‌ল না! বাড়ীতেই ফিরিয়ে আনা হোল।

* * * *

গবুর বিয়ে দেওয়াই ঠাকুমা স্থির করলেন! একুশ বছরে পা দিয়েছে সে। একমাত্র বংশধর কিনা, তাই চারিদিকে বিয়ের সাড়া পড়ে গেল। যথাসময়ে হাতীর পিঠে রূপোর হাওদার ভেতর রামচাঁদের কোলে বসে গবু চল্লো বিয়ে করতে! ক-ত বরযাত্রী—, ক-ত ঘোড়া—, কত হাতী, কত পাল্কী তার সীমা নেই!

রামচাঁদ কানের কাছে মুখ এনে শেখাতে শেখাতে চল্‌ল—সকলকে প্রণাম করবে, বেশী খাবে না, চুপ করে বসে থাক্‌বে, মিষ্টি মুখে কথা বল্‌বে! ইত্যাদি—!

বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় বোধ হয় রামচাঁদএর সঙ্গেই আগে শুভদৃষ্টিটা হয়েছিল! রামচাঁদকে এক মুহূর্ত্ত চোখের আড় সে করেনি। বাসর ঘরে ঢুকেই নতুন বৌকে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত! সকলে তো হেসেই খুন্‌!

বিয়ে বাড়ীতে যে খুব কম খেতে হয় সে কথাটা গবুর খুব মনে ছিল। এত যে খাবার এত পিঠে পায়স সবই গবুর পাতে পড়ে রইল! শাশুড়ী এক হাত ঘোমটা টেনে

সামনে এসে বল্লেন "বাবা সবই যে পাতে পড়ে রইল।" গবু অম্‌নি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বল্লে "পাতে ফেল্‌ব না তো কি তোমার মাথায় ফেল্‌ব ?" কথাটা বলেই গবুর মনে পড়ে গেল বাবা তাকে মিষ্টি মুখে কথা বল্‌তে বলেছেন। সে তাড়াতাড়ি একটা ভীম নাগের সন্দেশ আস্ত মুখের ভেতর পুরে শাশুড়ীকে আরো কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া তার গলা থেকে আর কিছু বেরুল না, রাগের মাথায় না চিবিয়েই গিল্‌তে গিয়ে সন্দেশটা গলার মাঝে আট্‌কে গিয়েছিল। জলের গেলাসটা তাড়াতাড়ি মুখের কাছে এনেই তার মনে হল হয়ত বেশী খাওয়া হয়ে যাচ্ছে! জল খাওয়া আর হলনা, সন্দেশও নাব্‌ল না তার গলা থেকে, সে বশে বশে ডাঙ্গায়-তোলা মাছের মত খাবী খেতে লাগ্‌ল। শালা শালি শাশুড়ী চীৎকার করে উঠ্‌লেন "কি হ'ল—কি হ'ল!" গায়ে হাত দিয়ে কত সাধ্য সাধনা করলেন গবু শুধু গোঁ গোঁ করে আর ভেতর ভেতর রাগে ফুলতে থাকে! কি—এতবড় সাহস, এরা দেবে গবুর গায়ে হাত! বিপদ দেখে রামচাঁদ ছুট্‌ল গবুর বাবাকে খবর দিতে। তাই না দেখে গবু গেল আরও চটে, কি—রামচাঁদ বেটাও তাকে এদের মাঝে একা ফেলে পালিয়ে গেল! রাগের মাথায় সে তার থালা থেকে বেগুন ভাজা, লুচি, মাছের ঝোল, পেঁপের কালিয়া, দই, রাবড়ী-রসগোল্লা হাতের সামনে যা পেল তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে সকলকে মারতে লাগল। সমস্ত শরীর তখন ওর কাঁপ্‌ছিল আর গলা থেকে আওয়াজ বেরচ্ছিল—গোঁ—গোঁ—গোঁ!

গবুর বাবা ছুটে এলেন। দেখেন পুত্র রত্নটি কেবল গোঁ গোঁ করে সারা ঘর ময় গড়াগড়ি দিচ্ছে! চোখ দুটো ঠেলে উঠেছে একেবারে কপালের ওপর! অবস্থা দেখে তো রাধাবল্লভের চোখ দুটো ঠেলে উঠ্‌ল কপাল ছাড়িয়ে একেবারে মাথার কাছাকাছি! তিনি তো কেঁদেই আকুল! ব্যাপার দেখে রামচাঁদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, হাউ মাউ করে কেঁদে হঠাৎ রাধাবল্লভের হাত দুটো চেপে ধরল, বল্লে "বাবু গো কি আর কইমু—খোকাবাবুকে ভূতে পেয়েচেন!" সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌ল "ঠিক্ তাই!" রামচাঁদ বল্‌ল "ভয় কোরনি বাবু আমার মামীর মাসতুত ভাই বড় যবড় ওঝা—ভূত নিয়ে খেলা করে। আমার আপন জন বাবু—তাইত বলতে পারনু যে ভূতে পেয়েচে। এক মিনিটি দাড়াও বাবু—আমি ধাঁ করে ডেইকে নিয়ে এইসি!" বলেই সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওঝা এলো। দাঁত কড়মড় করে মুখ ভেংচে কত রকম ছড়া আওড়ে বল্ল "বাবু এবড় সোজা ভূত না, একেবারে মামদো ভূত!" কোঁচড় থেকে কতকগুলো পাকা লঙ্কা বের করে গবুর নাকের কাছে পোড়াতে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে। লঙ্কার ধোঁয়া নাকে ঢুক্‌তেই গবু একেবারে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাগ্‌লো কিন্তু ভূত ব্যাটা তো পালালো না। লঙ্কাতে কিছু ফল্ হোলনা দেখে মন্ত্র-পূত সর্ষে গা-ময় ছড়িয়ে দিল, হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধোঁয়া দিল কিন্তু ভূত পালাল না। এবার ওঝা গেল ভীষণ চটে, ঘরের কোণ থেকে এক গাছা মোটা লাঠি এনে দিল গবুর পিঠে ধমাধম্ বসিয়ে!

শেষে মারের চোটে ভূত বোধ হয় সত্যি সত্যি পালাল। গবু আর গোঁ গোঁ করে না, অসাড় হয়ে পড়ে আছে কোন সাড়া শব্দ নেই। ওঝা তখন বীরদর্পে দরজাটা খুলে দিয়ে বল্ল "আসুন সব ভূত ভেগেচে!" রাধাবল্লভ বাবু পাগলের মত ছুটে এসে খোকাকে বুকের মাঝে টেনে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদলা সন্দেশ গবুর মুখ থেকে বেরিয়ে রাধাবল্লভ বাবুর কোলের ওপর পড়ল। সে অম্‌নি চোখ মেলে "জল্—জল্" বলে চীৎকার করে উঠ্‌ল। সামনে বাজ পড়লে লোক যেমন চম্‌কে ওঠে, সকলে তেমনি চম্‌কে উঠে পালাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই ওঝা বলে উঠ্‌ল "বাবুরা ভয় কোরনি ভূত ঐ সন্দেশ খেতেই তো এসেছিল, যাবার সময় এই বাকীটুকু উগ্‌লে দিয়ে যাচ্ছে, একটু জল দাও ও খেয়ে চলে যাক্। তারপর সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। রামচাঁদ ছুটে গিয়ে কোথা থেকে এক গেলাস জল এনে বাবুর সাম্‌নে ধরল, সে এক নিশ্বাসে সবটুকু জল খেয়ে "আঃ—" বলে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

ওঝা বাড়ী ফিরল এক্‌টা একশ' টাকার নোট ট্যাঁকে গুঁজে।

এরপর গবুকে আর কেউ বদ-খেয়াল বা গোঁয়ারতুমি করতে দেখেনি। সে এখন বেশ শান্ত শিষ্ট হয়ে বউ নিয়ে সংসার করছে। বউয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করেনি। রামচাঁদএর পদবৃদ্ধি হয়েছে, সে এখন শুধু ঢোলে আর হাই তোলে বসে বসে!

ভূতে পাওয়ার আসল কথাটা কিন্তু গবু এখনও বৌকে বলেনি—ভবিষ্যতে বল্‌বে কি না জানি না!

জাহান্‌-আরা বেগম চৌধুরী

নারী

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সব ছাপি' শুধু মোরা দুটি
উঠিয়াছি ফুটি'
কালপারাবার মাঝে দিবা আর রাত্রির মতন।
রূপদক্ষ দিন আমি সৃষ্টিকামী
তব অনুগামী,—
অপরূপা রাত্রি তুমি স্বপ্ননিকেতন।
আমাদের প্রতীক্ষা-যে প্রথম উষায়
পূর্ব্বাশাতে সাজে রক্তরাগের ভূষায়।
বিচ্ছেদ বেদনা সন্ধ্যাকালে
ফুল হয়ে ফোটে চাঁপা ডালে।
ঝড় ঝঞ্ঝা অন্ধকার
কারো হাতে নাহি ধ্বংস তার।
রূপ গেলে গন্ধে বাঁচি আমরা-যে দুই
কিছুতে না কারো কাছে হুঁই।
অবিশ্রান্ত আলোতে ছায়াতে
মহাকাল সাথে
চলিয়াছি ক্ষুদ্র দুটি প্রাণ
আমাদের বাঁধিরাছে আমাদেরই টান।
মিলায়নি বাহিরের ধনমান যৌবনের দোলা
চিত্তের সম্পদে মোরা নিরন্তর ভোলা।
আমরা অমর,
কামনাতে আমাদের গুপ্ত আছে বিধাতার বর।
দেবতা কেমন তরো জানি না তো স্বর্গসুখ কী যে!
কিন্তু ভেবে দেখো নিজে নিজে
সহজেই যা পেয়েছি যা হয়েছি মোরা
তিন লোক খোঁজো তার
মিলিবে কি তুলনার জোড়া?

কতদিন কতখানে
অতি সাধারণ গল্পে গানে
ভেসে গেছি উল্লাসের বানে
হাসি পরিহাসে
কৌতুক সম্ভাষে
দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম
কত কথা নিয়ে
প্রাণে প্রাণ দিয়ে
তোমারে আমারে বুঝিয়াছি;
তিলে তিলে কাছাকাছি
পেয়েছি উভয়ে,
তৃপ্তি অতৃপ্তির দ্বন্দ্ব ব'য়ে
গেছে দিন।
আরো কত সুখস্মৃতি,
অমনি কি হবে তা বিলীন!
মাঝে মাঝে ছলভরা মনগড়া গাঢ় অভিমানে
কাছে থেকে কেবা কারে জানে!
যেন কত দূর,—
কে যে কত হইব নিষ্ঠুর,
কেমনে আঘাত দিব কারে
ধিকি ধিকি এই রোখ্ বাড়ে।
আঁখিকোণে ভ্রূকুটি কুটীল,—
দেখানো,—অন্যের সনে যেন কত মিল
সুগভীরে।
অথচ গোপনে ফিরে' ফিরে'
শ্যেন দৃষ্টি রাখি'
পরস্পর দেখে যাই অতলের আঁখি

কোথা সে নিবদ্ধ অপলক!
তারে কি টলাতে পারে
ফাঁকিতে মাখানো বাঁকা হাসির ঝলক!
যখনি মিলেছি কোনো জনতার মাঝে
"সে তো হেথা রাজে"—
এই ভেবে কেবলি উৎসুক।
চোখে পড়ে কত চেনা মুখ,
সবি যেন কী অপরিচিত!
লাগে তিতো,
শঙ্কা জাগে,—"ছাই,
যদি তারে দেখিতে না পাই!"
হঠাৎ কখন কার আড়ে
অন্যমনা দেখি একধারে
আছে আছে সৌভাগ্যের শেষ কল্পলতা।
সংশয়ের মেঘমুক্ত সৌদামিনী ভূতলে আগতা!
চোখ দুটি ঘুরে পড়ে চকিতে দু'-চোখে
অন্তর-আলোকে
সে মুহূর্ত্তে ফাঁকি টুটে;
—দোঁহারে ফিরিয়া পাই দুটি বক্ষপুটে।
সেই আমি আর সেই তুমি,—
মর্ত্ত্যভূমি
আজো সে তেমনি আছে।
পড়ে থাক পাছে!
কিন্তু আর নয়!—
যা হবার হয়ে গেছে ভোলো তুমি ভোলো সমুদয়!
ভোলো সেই নিভৃত শপথ
"আজ' হতে একই পথ
বন্ধু গো, বন্ধুর এই অচেনা জগতে।
সুভদ্রা ফাল্গুনী সম
সুদুর্গম
যাত্রা সুরু জীবনের রথে।"
হাতে হাতে রেখে শেষ
টানিয়া টানিয়া রেশ, একদিন বেশ
বলা হয়েছিল অতি তেজে!
উঠিছে কি বেজে
রথের ঘর্ঘর রব মরমে মরমে?
—নাই ভয় যাব না চরমে,
এখানেই ক্ষান্ত রবে পরিচয় সব।'
তবু তুমি দিয়েছ দুর্ল্লভ
প্রেমেরি অমৃত।
অনন্তের পাথেয় সে মোর কাছে ধ্রুবসত্য
যত খুসি তুমি তারে বলো না অনৃত!
অস্বীকারে কাজ কিবা
একেবারে যাও তারে ভুলে।
কত ঢেউ লাগে নদীকূলে,
কতই বুদ্বুদ গড়ে ভাঙে,
কত না সময়ে কত বিচিত্র বাসনা মনে রাঙে;
শত হোক, মানবী তুমি তো!
ভুল করে ভালোবাসো, ভুলিলেই সব পরিষ্কৃত,
তোমাদের এই ধর্ম্ম বহু পরীক্ষিত।
নাই ক্ষোভ
যা পেয়েছি তাই মোর মিটায়েছে লোভ।
একটি মিনতি
দয়া কোরো অতীতের প্রতি,
মনে আর আনিয়ো না কিছু।
তোমারে কোরো না তুমি নীচু
মনে মনে গ্লানির ধূলাতে।
বাসি ক্ষতে প্রলেপ বুলাতে
মিলে থাকে যদি কোন নূতনের প্রীতি
তাই নিয়ে তৃপ্ত থেকো, ভুলো পূর্ব্বস্মৃতি।
কিন্তু তারে দিয়ো
আমারে যা দিয়েছিলে তেমনি অমিয়।
দিয়ো তারো বেশি
এমনি কাঙাল নর বিভ্রান্ত বিদেশী,
নারী তারে কোরো প্রতিবেশী।
ঘরের দোসরই নয় কোরো
শুধু মনে রেখো এই এক মানুষের প্রাণ ওর-ও।

খেলা খেলে পাবে না মানুষে,
এ-ও জেনো দিন কারো চলিবে না রাতের ফানুষে।
যে-আলো জ্বালাও মেকি, সে তাহারে
নিজেরি স্বভাবে
একদিন ধোঁয়া হয়ে হাওয়াতে মিলাবে।
বারে বারে সহিবে না তাপ ;—
তোমরা দাঁড়াবে হয়ে পুরুষের মূর্ত্ত অভিশাপ।
আপনারে হারা হবে, হারাবে অপরে,
সেদিন দুর্দ্দৈব যেন দয়া করে তোমাদের'পরে।
না ঘটায় শেষ সর্ব্বনাশ—
—"হৃদয়ের রাণী হয়ে
ভিক্ষুকেরা ঘৃণা স'য়ে
ব্যর্থপ্রেমে দ্বারে দ্বারে পদতলে বাস!"
চলিলাম দূরে।
আমার ভুবন জুড়ে'
রহিল প্রভাত আলো সন্ধ্যার আঁধার।
সারাদিনরাতভরি' ভেবে যাব তাই বার বার
অবিচ্ছেদে,
রাখিব তোমারে মনে বেঁধে।
তোমার প্রথম হাসি মনের সে গহনতা তব
দিবসের সন্ধিগুলি তাহারি পরশ নিত্য নব
চিত্তে আনে।
সেদিনের কত চিহ্ন ছড়ানো যে এখানে ওখানে!
সেই পথ, সেই কুঞ্জ, সেই ফুলধূলি!—
যেই উপলক্ষ্যে ভুলি'
দুই দৃষ্টি একে ছুলি', কতদিন উঠেছে অসীমে
সেই শুক, সন্ধ্যাতারা পূরবে পশ্চিমে
আজিও রহিল মোর লাগি'।
নব-অনুরাগী,
তুমি যাও,—
যেথায় মনের মতো আপনার মনোহরে পাও।
শেষবার শোনো প্রিয়তমা,
আমারি স্মরণ তোমা
কখনো যে দিয়েছিল পুলকের ব্যথা,—
যখন যেমনি থাকি যেথা
তাহারি পূজার তরে রহিল হৃদয়কোণে
সংগোপনে
সকরুণ একখানি কোমল আসন।
যখনি ফেরাবে মুখ
যতই দাও না দুখ,
দেখিবে ধ্বনিছে সেথা বরণের ব্যগ্র আয়োজন,
উন্মুখ নিস্তব্ধ আবেদন।
তোমারি ব্যথার যাহা
সে-আসন একান্ত তোমারি।
সব শেষে যাই তবে ব'লে,
ভালোমন্দ সুধা ও গরলে
বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি
সুন্দর,—সুন্দর তুমি নারী॥

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর



সুরমার সংযম

শ্রীআশালতা দেবী

সুরমার নানা জায়গা থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসছিল কিন্তু কোনটাই সবদিক থেকে পছন্দ হচ্চে না। কারণ সুরমা গুণবতী। সে সেতার বাজাতে পারে, চেলো শিখচে, কীর্ত্তন গাইতে পারে, ইংরেজীতে কথা কইতে পারে। কি পারে না বলো ? সুরমার মা দরিদ্রের মেয়ে, এবং পল্লী-গ্রাম থেকে এ সংসারে এসেচেন। মেয়েরা একটা অবস্থা থেকে আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্নতর অবস্থায় যখন যায় তখন তারা লাফ দিয়ে যায়। ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন যা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। সুরমার মা বিন্দুবাসিনী ধনী এবং আপটুডেট্ ঘরের বধূ হয়ে প্রথম থেকেই উঠে পড়ে লাগলেন কি করে সর্ব্বাংশে তাঁর পূর্ব্ব পরিচয়টাকে নিঃশেষে মুছে দেওয়া যায়। তারপর বধূজীবন কেটে যখন পুরোপুরি গৃহিণীত্বের পালা সুরু হোল তখন এ সাধনায় তিনি বর পেয়েই গেচেন। যারা চেষ্টা করে উগ্র রকম আধুনিক হবার বিদ্যা আয়ত্ত করেচে তাদের দিনের বেশির ভাগই কাটে এই পদ মর্য্যাদাকে বজায় রাখতে। বিন্দুবাসিনীরও তাই হোয়েছিল। তিনি এখন বিন্দুদেবী। পায়ে চটি পরে সকালে উঠে বাগানে একটু বেড়িয়ে আসেন। তারপরে সকালের ড্রেস করে চা' টা খেয়ে একটু খবরের কাগজটা খোলেন কিংবা সেলায়ের কাজ নিয়ে বসেন। ওদিককার ভার বামুন চাকর এবং ঝীএর হাতেই আছে। তবে স্বামী হিন্দুয়ানী পছন্দ করায় তাঁকে বামুন চাকর নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে। এরই ভেতর যতটা আধুনিক হওয়া যায়। সুরমা মেয়েটি খুব নরমচিত্ত। এবং যাকে বলে আভিজাত্য তা ওর রক্তের মধ্যে, স্বভাবের মধ্যে প্রবল। এখানকার মেয়েদের হাইস্কুলে যখন ও উঁচুর দিকে উঠতে লাগল দেখতে পেলে মেয়েরা স্কুলে যে কেবল লেখাপড়া করতে আসে তাই নয় ওদের ঔৎসুক্য এবং কৌতূহল আরও নানাদিকে।

ওদের মধ্যে প্রায়ই নানাধরণের কথাবার্ত্তা হয়, একজন বলে "জানিসনে নীহারদি যখন রাস্তা দিয়ে চলেন কতো লোকে বলে হারমেজেষ্টি চলে যাচ্ছেন রে—পায়ের তলায় কোট বিছিয়ে দিতে না পারলে জন্মই বৃথা।" বলতে বলতে যে মেয়ে বলে তার মুখ ঈর্ষ্যায় কাতর হয়ে আসে। "যাই বলো ভাই নীহারদিকে দেখতে কিন্তু খাসা—তার ওপরে বাড়ী নিয়েছেন একেবারে ডেভিল্‌স্ ডেনের পাশে—যত রসিক ছেলের ক্লাব। যেমন ক্লাব তেমনি নাম। নয় কি ?" আর একজন বলে "কলিকা ভাই আজ তোর মুখ শুকনো কেন রে ? উত্তর পাস্‌নি বুঝি ? কেমন করে একটা চিঠি পাঠাতে হয় তা আজও শিখলিনে বোধ হয়, তোর চিঠি তার হাতেই পৌছয় নি। যখন টপ্ করে ফেলে দিবি সঙ্গে সুতো দিয়ে একটা ঢিল বেঁধে দিস্, বুঝলি ?" অঞ্জলি বলে "সুমিত্রা, তুই ভাই কি সুন্দর গান করিস্ (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) মার্ভ্‌লাস্। আমার যদি ওরকম সুযোগ হো'ত। যাক গে সবারই ত সব থাকেনা—কিন্তু আমি তোর গানের সুখ্যাতি করব সকলের কাছে, তুই ভাই আমার রূপের প্রশংসা করিস্, কেমন ?"

দেখে দেখে আর শুনে শুনে সুরমার চিত্ত বিকল হয়েচে। মনে মনে ওর একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে। যা কিছু আধুনিক এবং হাল ফ্যাশানের তারই বিরুদ্ধে ওর মন যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুরমা ভোর বেলায় উঠে ওদের উত্তরদিকের বারান্দায়—যেখানে বসলে গঙ্গার একটু রেখা আর নীচের বাগানের গাছপালা চোখে পড়ে—সেইখানে বসে যখন সেতারে সকালবেলাকার সুর বাজায় তখন ওর কল্পনায় ভেসে ওঠে একটি শান্ত সুনিয়মিত জীবন। একটি স্নিগ্ধ গৃহস্থালীর

কেন্দ্র হয়ে অত্যন্ত সুপবিত্র ভাবে দিনগুলি কাটিয়ে দেয়া—এর চেয়ে বেশি আপাততঃ সে কিছু চায় না। ওকে ফ্রেঞ্চ আর এস্রাজ শেখাতে একজন নতুন শিক্ষক রাখা হয়েচে। মা' চান যে শৈশববেলা তাঁকে যে অন্ধকার কোণে কাটাতে হয়েচে—যাতে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত ছিলনা, সেই সব অপ্রতিবিধেয় বাধা একেবারে দুর হয়ে যাক তাঁর মেয়ের জীবনে। তিনি যে ছোটবেলায় কিচ্ছু শিখবার সুযোগ পান নাই তার সুদ শুদ্ধ আদায় হোক তাঁর মেয়ের কাছে। যিনি ফ্রেঞ্চ শেখাতে এ'লেন তাঁর নাম হরলাল বসু। বছর ছাব্বিশ সাতাশ বয়েস। চেহারায়, কথাবার্ত্তায়, কালচারের একটা চক্‌চকে পালিশ। হরলাল ভাষা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানারকম মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা সুরু করলে। কৈফিয়ৎ স্বরূপ ও আগে থেকে বলে রাখলে আধুনিক শিক্ষার একটা মস্ত বড় গুণ যে তা যা শেখাবে একান্ত করে তারই ওপরে ঝোঁক দেয় না। নানা বস্তুর সহিত একটু একটু করে মিশিয়ে, আলোচনা ক'রে, গল্প করে নিরতিশয় স্বাভাবিক রূপে তাকে শেখান যেতে পারে। অতএব হরলাল যে পড়াতে এসে স্ত্রী, পুরুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে নানাবিধ আলোচনা করে—যে আলোচনার দৃশ্যতঃ ফ্রেঞ্চ ক্রিয়ার রূপ শেখানোর সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নেই হয়ত—কিন্তু তবু তাদেরকে নেহাৎ অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে যেন সুরমা অবজ্ঞা না করে। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, সুরমা অভিভূত হয়ে শোনে। ওদের স্কুলের মেয়েদের বাড়াবাড়ি, গায়ে ঢলে পড়া গোছের আতিশয্য—এরা যেন বড্ড স্থূল, সুরমার মিহি রুচিকে তারা আঘাত করে—কিন্তু হরলালের আলোচনা কালচার্ড ভদ্র, মার্জ্জিত—তা সমস্ত কথাই খুলে বলেনা, ইসারাতে অনেক কথা জানায়। এমনি করে সুরমার বয়েস যখন ক্রমশঃ চোদ্দ থেকে পনেরোয় পড়ল তখন ওর ব্যক্তিত্বের মাঝে একটা দ্বিধা বিভক্ত রেখা পড়ল। একদিকে ওর নিষ্ঠাবতী শান্তচিত্ত পিতামহী এবং পিতার ক্রিয়াকলাপের প্রভাব। এবং আর একদিকে হরলালের মধ্যবর্ত্তিতায় আধুনিক জগতের সূক্ষ্ম, স্বাধীন, বৈচিত্র্যময় ভাবরাশির আস্বাদ। প্রায়ই বিবাদ বাধে—ভোরবেলাকার যে সুরমা বাগানের চাঁপা গাছ থেকে সদ্যঃ তোলা একরাশি ফুটন্ত চাঁপাফুল নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে, দেয়ালের গায়ে টাঙানো সেতারটি পেড়ে নিয়ে ভেঁরো 'কি রামকেলী বাজায় তখন তার মনে ওদের বাড়ীর পুজোর ঘরের দৃশ্যটি ভেসে ওঠে। ঘীএর প্রদীপ জ্বলচে, সাজিতে কত যুঁই বেলা, চন্দ্রমল্লিকা সূর্য্যমুখী ধূপেদ্‌'পাত্র থেকে ধুনো গুগ্‌গুল্‌ মেশানো সুগন্ধি ধূম উঠচে তখন ওর সমস্ত অস্তিত্ব গলে গিয়ে ওই ধূপের মত হতে চায়। ওর মনে হয় জীবনের যজ্ঞবেদীতে, শুভ্র পবিত্র পট্টবাস পরে একটি শুভ মুহূর্ত্ত দেখে ও নিজেকে সম্পূর্ণ করে উৎসর্গ করে দেবে—সমস্ত জীবনে একবার মাত্র সেই নিমেষটি জগতের যত গভীরতা যত পবিত্রতা আছে সব নিয়ে উদয় হবে। তারপরে আসুক না যত কালো ঝড়, যত দুর্ভাগ্য যত ক্লেশ, সে তা নিয়ে একবারও অভিযোগ করবে না। কল্পনা করতে করতে ওর চক্ষু সজল হয়ে আসে, একটা অত্যন্ত বড় কিছু করে ফেলবার আবেগে ওর বুকটা দুলে দুলে ওঠে।

তারপর আস্তে আস্তে রোদ ওঠে, বেলা হয়ে আসে, হিন্দুস্থানী গান শেখার ওস্তাদ আসে, তাল ভুল হ'লে বকুনি খেতে হয়। ঝী ও বামুনের সঙ্গে নানা তুচ্ছ কারণ অকারণ নিয়ে মা'য়ের প্রচণ্ড বকাবকি। তারপর স্কুলে যেয়ে কণিকার বুকভাঙ্গা, নীহারদির অতিরিক্ত রুজ্‌ মাথা—বীণার বিয়েতে সতীওকে "রক্তের ঋণ" উপহার দিয়েচে কী ডেঁপো মেয়ে বাবা! এই সব আলোচনা শুনতে হয়। অবশেষে সন্ধ্যে হয়। ঘরে ঘরে ইলেক্‌ট্রিক্‌ বাতিগুলো যেই জ্বলে ওঠে, হরলালের আসবার সময় হয়ে আসে। এসে সে একটু ফ্রেঞ্চের কনজুগেসনগুলো ধরে। তারপর আলোচনা আরম্ভ হয়—"সুরমা তুমি 'দ্বি-ধারা পড়েচ? এতোদিন ধরে লোকে বড় বাড়াচ্ছিল। যেন মেয়েরা সর্ব্বদা একমুখী। কেবল পুরুষেরাই polygamous. কতো বড় বড় ভুল লোকে চালিয়ে দেয় না বুঝে শুনে। একটা কথা তারস্বরে বার কতক বলতে থাকলেই বেশির ভাগ লোকের কাছে তা সত্য হয়ে ওঠে। তাই নয় কি? একজন মেয়ে একই সঙ্গে ক'জন পুরুষকে ভালোবাসতে পারে বলে তোমার মনে হয় সুরমা?" মনে মনে এ সব আলোচনায় সুরমার আপত্তি থাকলেও সে মুগ্ধ হয়ে শোনে। প্রথমেই বলেচি সুরমার

আর সবগুণ থাকলেও সে ভারি দুর্ব্বল। এই সব শুনতে শুনতে তার মনে কেমন একটা ভয় হয়। আপত্তির একটা ক্ষীণ সুর হয়ত বা একটু শোনা যায়—হয়ত হরলাল কথা আরম্ভ করে "সবদিকেই মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে এক হওয়া উচিত। মেয়েরা যদি ঘোড়ায় চড়ে, বাইকে চড়ে কেমন ভালো হয় বলত ?"

তখন সুরমা বলে "তা কি করে হবে ? মেয়েদের শরীরের গঠন যে আলাদা।"

শরীরবিদ্যার এত উন্নত সময়েও মেয়েদের শরীরের অযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা। হরলাল না হেসে থাকতে পারে না। ও একটী মাত্র আক্ষেপোক্তি দিয়ে এ আলোচনার জের টানে "সুরমা তোমার মুখেও এই কথা !" যেন সুরমাকে সে, সকল মেয়ের আদর্শ প্রতিনিধি বলেই জানে। আর যার কাছেই হো'ক সুরমার কাছে একথা তার সহ্যের অতীত। সুরমা ওর নিজের 'পরে একজনের এত বিপুল পরিমাণ বিশ্বাস দেখে আরও সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন এইবার বুঝি এ প্রসঙ্গ থামল। জুল্‌ভার্ণের একটা সোজা গল্পের বই লাইন কয়েক পড়িয়ে হরলাল আবার সুরু করে শরীর তত্ত্বের চোথা চোথা কথাগুলো। স্ত্রীলোকে চর্চ্চা করলে যে শরীরের সব অংশেই পুরুষের যোগ্য হতে পারে তার নানাবিধ প্রমাণ দাখিল করে—কোন্ অলিম্পিক্ রেসে মেয়েতে জিতেছিল। ক্রীকেট খেলায় কোন মেয়ে কাপ্ পেয়েচে, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কে প্রথম হয়েচে। তার নানাবিধ ফ্যাক্টস্ এবং ফীগারস্ সমেত। তবুও সুরমার মনে একটা অব্যক্ত আকুতি থেকে যায়—ওর মনে হয় রাস্তা দিয়ে মেয়েরা বাইকে চড়ে যাচ্ছে—সেদৃশ্যে কোথায় যেন একটা হাস্যকর আমেজ আছে—কিন্তু তা বলতে সাহস হয় না। যদি আবার হরলালের চোখে তার দুরূহ পদমর্য্যাদা এতে নেবে যায় ! শেষকালে হরলাল আর এক পর্দ্দা সুর চড়িয়ে বলে "শারীরিক সব বিষয়ে মেয়ে-পুরুষে সমান, বুঝলে ? তাই লোকে যখন ন্যাকামী করে বলে মেয়েরা যে বয়েসেই বিধবা হো'ক তারা ব্রতযাপনের মত দিনযাপন করবে। তখন বলতে কি ইচ্ছে হয়না Indeed ! যেন তা ইচ্ছা করলেই করা যায় ! যেন তা করার পথে নিজের মধ্যেই শত সহস্র বাধা নেই। এ বাধা যে আছে তা পুরুষেরা নিজেদের বেলায় স্বীকার করতে লজ্জা পায়না—কিন্তু মেয়েদের বেলায় যতো লজ্জা ! রোদ এবং বৃষ্টিতেও ছাতা মাথায় দিতে মেয়েদের যে ধরণের লজ্জা।" তর্ক করার মত করে সুরমা এ সকল কথা শোনে না। কারণ সুরমা যে ধরণের মেয়ে ওদের কাছে কথা শুষ্ক, ওদের কাছে কথার কোন দামই নেই—যতক্ষণ না যে কথা বলচে, তার ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে পড়ে সমস্ত কথাই অপরূপ হয়ে ওঠে। সুরমা বিচার করে না, নিজের মতের সঙ্গে মিলিয়ে তুলনা করে না (নিজের মত বলে যদিচ ওর কিছুই নেই, ও যখন যে প্রস্তাবের মধ্যে পড়ে অত্যন্ত অকস্মাৎ এবং দ্রুততালে তখন সেইভাবে আপনার মনকে রূপান্তরিত করে—না ঠিক রূপান্তরিত করাও নয়—কারণ এ' ওকে চেষ্টা করে করতে হয় না। ওর মনের স্বাভাবিক গড়নই এমনি)। কেবল হরলালের সমস্ত মত এবং কথা একটি অদৃশ্য, দৃঢ় প্রভাবে ওর মনকে আবদ্ধ করে। এমনি করে প্রতিসন্ধ্যায় হরলালের প্রভাব যখন দৃঢ়তর হচ্চে—তখন হঠাৎ সুরমার বিয়ে হয়ে গেল। এতদিন পরে ওর মা আপন পছন্দ মত পাত্র পেয়েচেন। কলকাতার মস্ত বড় লোক। অসংখ্য বাড়ী। নিজেরা একটায় থাকেন মুক্তরাম রো-তে। তা ছাড়া অগুণতি বাড়ী, ভাড়া খাটে। তাদের ধরণ ধারণ একষ্ট্রাসভার্গ। বিন্দু ভয়ানক খুসী হয়ে গেলেন। ওঁর স্বামী যখন আপত্তি তুলেছিলেন পাত্রের বয়স বেশি তেমন বিদ্বান নয়—সে আপত্তিকে তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। বিন্দুর মতে যার এত টাকা আছে সে যদি আই, এ পাশ না'ও করতে পারে, এবং বার তিনেক আই, এ ফেল করে বিলেত যেয়ে কয়েক বছর কাটিয়ে আসে (অবিশ্যি সেখানে অনেক কিছুই পড়েচে—কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট ডিগ্রী আনেনি) ওই তার পক্ষে যথেষ্টর চেয়েও বেশি। সুরমার বিয়ে হয়ে গেল। হরলাল একটা রূপোর ফুলদানি ও একসেট্ ফ্রেঞ্চের প্রাথমিক বই (শুভ-বিবাহে) উপহার দিয়ে আসর থেকে বিদায় নিলে।

২

"কতোদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা !" চন্দন নগরের রেল ষ্টেশনে হরলালকে দেখে একজন অতিরিক্ত সজ্জিতা

সুন্দরী মেয়ে এই কথা বল্‌লে। তার পরণে ঘন নীলরঙের ইংলিশ ক্রেপের কাপড়। হাতে এমব্রয়েডারি করা একটা সিল্কের হাত ব্যাগ। মাথার কাপড়ে হীরে দেওয়া দু' তিনটে ব্রোচ জ্বল্ জ্বল্ করচে। মেয়েটি বল্‌লে :—

"আমি এই আমার একজন বন্ধুনীকে দেখতে চন্দন নগরে গিয়েছিলুম, ৭-৪০ এর ট্রেনে। এখন ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। (হাতের রিষ্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে) এখনো ট্রেনের প্রায় আধঘণ্টা দেরী—বসুন না এই সামনের বেঞ্চটায়……তার পরে ?" সুরমাকে এই দু'বছর পরে দেখে হঠাৎ চেনা যায় না। এত সুন্দর হয়েচে ও দেখতে। সাজে সজ্জায়, আভরণে, বিলাতী এসেন্সের ঝাঁঝালো গন্ধে, ওর পাশে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের সঙ্কীর্ণ সবুজ বেঞ্চটায় বসে হরলালের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। "তারপরে আপনি এখন কি করচেন।" সুরমা জিজ্ঞেস করলে। "তেমন কিছুই নয়। একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর ওষুধের এজেণ্ট হয়েচি। প্রায়ই ঘুরে বেড়াই। এক্সটেন্‌সিভ টুর্ আর কি। যখন যেখানে যাই সেখানকার ডাক বাঙ্গলায় উঠি।" সুরমা ওর দিকে চেয়ে দেখলে, হরলালের গায়ে বিলেতী পোষাক নিখুঁত করে পরা। "এখনো এস্রাজ টেস্রাজ বাজান না কি ?" সুরমা জিজ্ঞেস করলে। হরলাল উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলে "এখনো ফ্রেঞ্চের চর্চ্চা রেখেচেন না কি ? আমাদের মত ত নয়। আপনার বোধ করি যথেষ্ট সময়।" সুরমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে "কই আর সময় ! সামাজিক দাবী দাওয়া মিটিয়ে—আরো হাজার ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে যেটুকু সময় বাকী থাকে বড় ক্লান্ত লাগে—তখন আর ইচ্ছে করে না কোন সিরিয়াস্ বই পড়ি। প্রভাতবাবুর গল্পের বইগুলি একটু পড়ি। প্রভাতবাবু বেশ লাইট্ আর রিফ্রেশিং নয় কি ? আপনি যে আমায় প্রেজেণ্ট করেছিলেন সে ফ্রেঞ্চের বইগুলি এখনো তোলা আছে। তার মধ্যে জুল্-ভার্ণে বেশ না ? বেশ চমকপ্রদ,—অনেকটা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডিটেক্‌টিভ ব'য়ের মত। তবে বড্ড ট্যাক্সিং। শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাজে মন দেওয়া যায় না—একটা কী হোল কী হোল গোছের ভাব। না তার চেয়ে আমার প্রভাতবাবুর বই বেশি ভালো লাগে। এই মাসখানেক হোল 'সিন্দুর কৌটা' নামে একটি উপন্যাস আরম্ভ করেচি। ভারি এমিউজিং. না ?" হরলাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে ষ্টেশনের সিগ্‌ন্যালটার দিকে চাইলে। ষ্টেশনের ইলেক্‌ট্রিক বাতিগুলো সব জ্বলে উঠেচে। লাল সুরকি দেয়া রাস্তার দু'ধারে ফার্ণ গাছ। কিছু দূরে কাছেরই একটা সিনেমা হাউস্ থেকে ব্যাণ্ডে একটা গৎ বাজছে।

"চলুন না একদিন আমাদের বাড়ী"—সুরমা অনুরোধ করলে। "বেশ ত। আমি ত এখন কলকাতাতেই ফিরচি। আপাততঃ মাসখানেক ওখানেই থাকব। আমারও বাসা কলকাতাতেই নিয়েচি। আমাদের হেড অফিস ওখানেই কিনা।" ট্রেন এসে পড়ল। সুরমার সঙ্গে একজন আর-দালী আর বছর বারো তেরর একটি ফুটফুটে ছেলে এসেচে। "এটি আমার ভাসুর পো।" "আচ্ছা আসি।" হরলাল বিদায় নিয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরার দরজা খুললে। একটু ইতস্ততঃ করে সুরমা বললে "আমার জন্যে আবার ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট নেওয়া হয়েচে। কিন্তু তা হলোই বা আপনার কামরাখানাও ত খালি। এটাতেই উঠি। বেশ হবে রাস্তাটা বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।"

হরলাল দেখলে এ দু'বছরে নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে আর হোষ্টেস্ হয়ে সুরমার আচরণ চার্মিং হয়েচে। বেশ সতেজ জোরালো ভাব। একটা নির্ভীকতা। এইটেই হরলাল মেয়েদের ব্যবহারে চায়। আগের সেই ভীরু, সঙ্কুচিতা সুরমা আর নেই। যদিও সুরমা আজকাল গভীর তথ্য নিয়ে আর আলোচনা করে না আগের দিনের মত। যদিও প্রভাতবাবুর একটি উপন্যাস শেষ করতে ওর বোধ করি মাস ছয়েক লাগে। তা লাগলই বা। সুরমার তরুণ দেহের লাবণ্যে জোয়ার এসেচে। ওর সজ্জিত সুগন্ধ দেহের দিকে চেয়ে থাকাই সুখ। আপাততঃ এই হরলালের পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েরা যা দিতে পারে তা ওর আছে—বাকীটা অবান্তর। এককালে যে নানা সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক তথ্য নিয়ে হরলাল ওর সঙ্গে বকাবকি করেছিল তা মনে করতেই ওর এখন হাসি পেল।

৩

সুরমা প্রথমে বিয়ের পর যখন কলকাতায় এল তখনো ওর মনের মধ্যে নিজেকে একেবারে উজাড় করে দেবার মেয়েটি মরে যায়নি। একজনের কাছে কম্প্রপদে, নম্র-নেত্রপাতে সলজ্জভাবে এসে আস্তে আস্তে দেহ এবং মনের অবগুণ্ঠন খুলে দেওয়া তাই ও তখনো চাইছিল মনে মনে—। সুরমার স্বামী সুবোধ মিটার পাকা ও চালিয়াৎ লোক। মেয়েদের সম্বন্ধে এখন ওর মনে আর কোন কাঁচা কৌতূহল নেই। বিয়ের আগেইও যথেষ্ট মেয়ে ঘেঁটেছে। স্ত্রীর সঙ্গে ওর ব্যবহার সহৃদয়, সৌজন্যময়, সামাজিক। বিয়ের পরেও সুবোধ নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চায় এবং নিজের নানা অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু জ্ঞান ওর হয়েচে যে এই স্বাধীনতার পথে একমাত্র বাধা এবং প্রবলতম বাধা যদি ইচ্ছে করে ত ওর স্ত্রী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। এই সম্ভাবনা-টাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে কেটে ফেলতে ও সুরমাকে অবাধ স্বাধীনতা দিলে—সুরমা যেখানে খুসী যে কোন বন্ধুকে নিয়ে যেতে পারে—সপ্তাহের সব ক'টা টকি এবং সাইলেণ্ট শোতে ও যাকে খুসী সঙ্গী নিয়ে ন'টার পারফর্ম্ম্যান্সে গিয়ে বারোটায় ফিরে আসতে পারে। সুবোধের এতে কোন আপত্তি নেই—বরঞ্চ তাতে ওর সম্মতিই আছে। তার মত বিলাত ফেরতের স্ত্রী মনের সব কুসংস্কারগুলোকে যদি ছেঁটে ফেলতে পারে তাতে আনন্দ ছাড়া অপর কোন রকম মনো-ভাবের আমেজ ওর আসবে না। সুরমা দেখলে ভোর বেলায় উঠে একরাশ ফুলের সঙ্গে নিজের ফুলের মত হৃদয়-খানি কা'রো চরণপ্রান্তে পূজা-উপচার করে দেয়ার উপায় নেই—কারণ যাকে দেওয়া যেতে পারে তিনি সাড়ে ন'টায় ঘুম থেকে উঠে ন'টা পঁয়তাল্লিশে বিছানায় বসে সকাল-বেলাকার প্রথম পেয়ালা চা খান। কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে সুরমার মায়ের পছন্দকে অগ্রাহ্য করে যদি ওর বাবা ওকে কোন মধ্যবিত্ত ঘরের এম, এ, পাশ ধরা যাক কোন মফঃস্বলের প্রফেসরি করে শ'দেড়েক মাইনে পায় (এতখানি কেবল কল্পনা নয় কারণ ওর ঠিক এমনি একটী সম্বন্ধ এসেছিল—এবং ওর বাবার ভারি ইচ্ছে ছিল সেখানেই বিয়ে হয়।) এমনি একটি ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েচেন। সুরমা সকালে উঠে সেতারটি বাজিয়ে ওর স্বামীর ঘুম ভাঙ্গায়। (অবিশ্যি যতদিন না একটী ছেলে হয়েচে) তারপর নিজের হাতে এক পেয়ালা চা তৈরী করে নিয়ে যায়। তাঁর চা খাওয়ার সময়ে তিনি যখন ওঁর সঙ্গেই এক সাথে চা খেতে জিদ্ করতে থাকেন তখন লজ্জায় সুরমার মুখ লাল হয়ে ওঠে তারপর সমস্ত লজ্জাকে জোর করে ঠেলে ও চট্ করে একটা চায়ের রেকাবীতে করে একটু জল নিয়ে এসে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি ঠেকিয়ে নেয়। তিনি মুখে খুব কপট রোষ কৃত্রিম অভিমান, বকাবকি করলেও মনে মনে তাঁর নিশ্চয় ভালো লাগে। তাঁর জন্যে সুরমা রাঁধে বাড়ে। কলেজ থেকে ফিরবার সময় হয়ে এ'লে চুল বেঁধে, খয়েরের টিপ পরে, একটি লালপাড় শাড়ি পরে তৈরী হয়ে থাকে। রাত্রিতে ওঁর ক্লাব থেকে ফিরবার দেরী হ'তে থাকলে ও পালঙ্কের ওপর শুয়ে শুয়ে প্রভাতবাবুর বা দীনেন্দ্র রায়ের একটি বই পড়ে এবং ঘন ঘন ঘড়ীর দিকে তাকায়। প্রভাবতী দেবীর বই-ও মাঝে মাঝে এই সময়টা কাটাবার জন্যে পড়ে, বেশ ঘরকন্নার কথা আছে তাতে—কিম্বা দুপুর বেলায় ঘুমোবার আগে প্রভাবতী দেবীর একটী বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সুরমা ক'লকাতায় এসে এর একটাও খুঁজে পেলে না। এখানে সব জিনিষেরই স্পীড্ বেশি। সুবোধ মিটার রোজই ক্লাবে যান এবং ফিরতেও তাঁর যা রাত হয় তা ভদ্রতার সীমাকে পেরিয়ে যায় কিন্তু তার জন্যে সুরমাকে বারংবার ঘড়ির দিকে তাকাতে হয় না—এই সময়টা সে নানাভাবে কাটাতে পারে, মিঃ লাহিড়ীর সঙ্গে গ্লোবে যেতে পারে—এম্পায়ারে যেতে পারে, মুখ বদলাবার ইচ্ছে হলে রজত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে রঙ্গ নিকেতনে গিয়ে দেশী থিয়েটার দেখে আসতে পারে। যদিও সেদিন রজতের সঙ্গে একটা দেশী থিয়েটারে গিয়ে যা মজা হয়েছিল। সেদিন ওরা ষ্টেজে 'সাবিত্রী প্লে' করচে। প্রথম থেকেই দারুণ জমে উঠল। রজত বারংবার ওকে জিজ্ঞেস করচে "বলুন বংশীধর চাটুয্যের ম্যাড্‌সিনটা আপনার কেমন লাগচে?" কিন্তু প্রথম থেকেই এদের কাণ্ডকারখানা সুরমাকে বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েচে। এত মেলোড্রামাটিক্ এত ভাল্‌গার। সুরমা যদি ওর কাকীমা, জেঠিমার সঙ্গে

'সাবিত্রী' দেখতে আসত এবং তাঁরা মেয়েদের সিটে বসে ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলতে থাকতেন "মা সুরমা, আজ আমাদের জন্ম সার্থক হো'ল।" তাহলেও চুপ করেই থাকত। যাদের নিরন্তর চোখ মোছাই অভ্যেস্ তাদের পক্ষে এত বড় একটা মেলোড্রামাটিক্ ব্যাপার পরম উপাদেয়। কিন্তু রজত তাকে কথাটা এ ভাবে জিজ্ঞেস করচে না। যদিচ ও প্রথমেই বলে নিয়েচে যতগুলো রটন্ ব্যাপার আছে তার মধ্যে 'সাবিত্রী'র প্রসঙ্গটাকে তা'ও সে খানিকটা পছন্দ করে—সাবিত্রী যে হিঁদুর মেয়ে হয়েও বিয়ের আগে ভালোবাসার স্পর্দ্ধা রেখেছিল সেটা তখনকার পক্ষে একটা দুঃসাহসিক ব্যাপার বলতে হবে বই কি!

কিন্তু রজত তাকে আর্টের দিক থেকে প্রশ্ন করচে "বলুন ত ষ্টেজ এফেক্টটি কী সুন্দর হয়েচে! আর বংশীধর চাটুয্যের ম্যাড্‌সিন! একেবারে নিখুঁত।" কিন্তু সুরমার সূক্ষ্ম রুচিতে ঘা দিচ্চে অত উচ্ছ্বাসের ওভার ডোজ্। হৃদয়াবেগকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে কেবলই তুল্‌কেলাম্ ব্যাপার করা। সশব্দে কেবলই ষ্টেজের ওপরে পড়ে যাওয়া। পঞ্চমাঙ্কের চরম মুহূর্ত্তে চোখের জলের বড্ড বেশি অপব্যয়। অথচ সেটা সে মুখ ফুটে রজতের দলকে বলতেও পারচেনা—কি জানি ওর আর্ট সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা যদি তাতে ধরা পড়ে যায়। মুখ ফুটে না বলুক কিন্তু ওর প্রকৃতিতে যে এই সহজাত রুচিজ্ঞান ছিল তাই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে অনেক ব্যাপারে।

৪

সুরমা যদি দৃঢ়চিত্ত হো'ত বা তার চরিত্রের একটা নিজস্ব মেরুদণ্ড থাকত, সুবোধের ব্যবহারে তার মনে প্রচণ্ড ঘা লাগত। এবং বেশির ভাগ সাধারণ মেয়ের মত উঠতে বসতে টিক্‌টিক্ করে স্বামীর পিছনে লেগে তাঁকে নিজের দিকে ফেরাতে মন দিত। মান, অভিমান কখনো বা এক পশলা বৃষ্টি, কখনো অভিমান কখনো চাতুরী নানাবিধ উপায়ে চেষ্টা করে দেখত। তাঁর বাড়ী ফিরতে দশটার বেশি হ'লেই শোবার ঘরে একটা ছোটখাট সীন্ বাধিয়ে বসত। কিংবা যদি সাধারণ মেয়ের চেয়ে সে আরও ওপর দিয়ে যেত তা'হলে স্বামীর ভদ্র নিরপেক্ষতাকে আমোলে না এনে নিজের জগতেই ডুবে থাকত—যদি অবিশ্যি তার সে ক্ষমতা থাকত নিজের মনকে নিয়েই একাকী নিজের জগৎ সৃষ্টি করবার। কিন্তু সুরমা এর একটাও নয়। আসলে ওর মনটা এত পুতুলের মত, এত নরম যে কোন হৃদয়াবেগকে প্রবল করে অনুভব করা—দুঃখে আর্ত্ত হয়ে ওঠা, কারুকে প্রাণপণে ভালোবেসে তার মন না পেয়ে বেদনায় উদ্বেল হয়ে পড়া—এর কোনটাও খুব প্রগাঢ় করে অনুভব করতে পারে না। আর ওর মনের রুচি বোধ। ওর দৃঢ়মূল আভিজাত্য। কোন কিছু নিয়ে সিন্ তৈরী করতে কেবল যে ওর মন বেঁকে বসত তাই নয়—ওর দেহের প্রতি অনু-পরমাণুগুলোও বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠত। ওর মনের এতো দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ওর এই রুচিবিলাসিতা ছোটবেলায় ওর স্কুলের অতি-আধুনিক সঙ্গিনীদের সঙ্গ থেকে তাকে রক্ষা করেছিল। তাই প্রথম দু'বছর বিবাহিত জীবন সুরমার বেশ কাটল। যা পায়নি তার জন্যে বড় বেশি দুঃখ না পেয়ে—সাজ করে, পার্টি দিয়ে সিনেমা দেখে খুব হাল্কা ভাবে কাটল। ও আস্তে কথা বলে, বাড়ীতে ঘাসের চটি পরে, ঘড়ি দেখে ডিনার খায়, কখনো জোরে কথা বলেনা। ওকে হো হো করে জোরে হাসতে কেউ দেখেনি। ওর রুচি মৃদু, ব্যবহার শান্ত এবং মনটি নরম। ওর এই মৃদুতায়, মনের সঙ্গে দেহেরও যোগ আছে। একটু সুপুরি বেশি দেয়া পান খেলেই ওর কান দু'টো স্পষ্টো টকটকে লাল হয়ে ওঠে।

* * *

অনেকদিন পরে হরলালকে দেখে সুরমার মনে খুব আনন্দ হো'ল (অবিশ্যি ওর মত মন নিয়ে যতটা আনন্দ অনুভব করা সম্ভব)। ওযে রাত্রিতে চন্দননগর থেকে ফিরে এ'ল তার পরের দিন বিকেলেই মুক্তারাম রোয়ে ওদের বাড়ীর মার্ব্বেল দেয়া সিঁড়িতে হরলালকে দেখা গেল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হরলাল দেরী করেনি।

সুরমা তখন চায়ের টেবিলে অধিষ্ঠান করচে। ওর প্রসাদপ্রত্যাশী অনেকগুলি অনুচর পরিচর পর্য্যায়ক্রমে ওর ডান দিকে এবং বাঁদিকে বসেছিল। সে অত্যন্ত ক্ষীণ

ভাবে হেসে কারুকে বলচে "আর একটু কেক ?" রজতের দিকে চেয়ে নীল এনামেলের আংটি পরা আঙুলটি গালের ওপর রেখে আশ্চর্য্যের সুরে বলচে "আরও এক পেয়ালা চা! রজত আজ তুমি রেকর্ড ব্রেক্ করবে।" ওর বিস্ময়ের সুর, ওর গলার স্বর, ওর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সমস্তই যেন বড্ড খাদের পর্দ্দায় বাঁধা। প্রত্যেকটি কথা যেন কত কষ্ট করে উচ্চারণ করচে, যেন তারা এত আস্তে উচ্চারিত হচ্চে যে গলার থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই হাওয়ায় মিশিয়ে যাচ্ছে। হরলালকে দেখে ও অভ্যর্থনা করলে এমনি সুরেই। হরলালের কেমন বিরক্তি ধরে গেল। দেখতে ভালো হলে হবে কি, এত মিন্‌মিনে পান্‌সে মেয়ে নিয়ে সত্যি তার ভালো লাগবে কি ? অন্ততঃ সুরমাকে আরও একটু প্রাণবান করে তুলবার ভার তাকে নিতেই হবে। খানিকটা এধার ওধার আলোচনা হো'ল— আজকালকার উপন্যাসের ধারা কোনদিকে চলছে—ষ্টাইলের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক কি—কিন্তু যিনি হোষ্টেস্ তিনি ক্রমেই হাই তুলতে থাকলেন,—আজকালকার উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর কোন কথাই জানা নেই। কি একটা প্রশ্নে সুরমা বললে "রজত তুমি আমাকে সেদিন একটি মাসিক পত্র এনে দিয়েছিলে কি তার নাম ভুলে যাচ্ছি দাঁড়াও—ও 'প্রগতি'। তাতে একটা গল্প খুলে পড়ছিলুম, লাইন চার পাঁচ পড়ার পর দেখি রয়েচে উঃ সে কি horrible লাইন! একটি ছেলে তার একটি সহপাঠীকে বলচে "মাইরি স'তে, তোকে বিশবার বলেচি না যে একাজ করবিনে!" কি সে লাইন! "ওইটুকু পড়তেই বইটা আমার হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেল।" একটা অতিশয় নোংরা বস্তু দু'পায়ে মাড়িয়ে গেলে লোকে যেমন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, সুরমা কেবল সেই লাইনটি স্মরণ হতেই বিতৃষ্ণায় তেমনি করে শিউরে উঠল। হরলালের ইচ্ছে হচ্ছিল ওই অতিরিক্ত ন্যাকা মেয়েটির দু'হাত ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দেয়। অবিশ্যি এবিষয়ে যে সুরমা ন্যাকামি করেনি এটা যে ওর স্বভাবজ, যেমন করে একটার বেশি দু'টো পান খেলেই ওর কান দু'টো অতিরিক্ত গরম হয়ে এবং লাল হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে অবশেষে উঠে যেয়ে খানিকটা ঠাণ্ডাজল চাপড়ে না এ'লে কিছুতেই সে স্বস্তি পায়না—তেমনি আর কি! কিন্তু সেটা যে তখনো হরলাল অত বুঝতে পারেনি। অবিশ্যি তাকে পরে বুঝতেই হয়েছিল। এবং এমন সভ্যযুগে একঘর লোকের সামনে সুরমার হাত দু'টো ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেয়াও যায় না তাই ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে হরলাল জিজ্ঞেস করলে "আপনি জীবনে কখনো কোনদিন ট্রামে বা বাসে চড়েননি ? বর্ষার সময়ে কলকাতায় যখন ফুটবলম্যাচের মরসুমী সময় তখন ? ম্যাচ্ ফেরত বাবুর দল এবং ছেলের দল যখন বাসে চড়ে বাড়ী ফেরে! তখন যদি ওদের পাশে বসতেন এমন কত আলোচনাই ত শুনতে পেতেন "মাইরি গোলকিপারটার কি চেহারা বাবা! কেবল শরীরের ওজনের চোটেই খুঁটি হয়ে ঠেস্ দিয়ে রয়েচে! এমনি আরো কত কি আলোচনা।" হরলাল যে সুরমাকে বাসে চড়া অবস্থায় কল্পনাও করতে পারে এজন্যে সে হরলালকে ক্ষমা কর্ত্তে পারলে না, তীব্র দৃষ্টিতে একবার ওরদিকে চাইলে। রজত ফস্ করে বললে "উনি বাসে চড়তে যাবেন কি দুঃখে! ওঁর কেবল নিজের ব্যবহারের জন্যেই যে দু দুখানা মোটর রয়েচে। তবে নতুনত্বের খাতিরে সখ করে যদি কোনদিন চড়লেন। তবে ওঁর রুচি এত মার্জ্জিত যে তেমন সখ ওঁর কোনদিনও হয়না।" হরলাল মনে মনে বললে "ওঁর এই রুচিটাকে একটু নাবাতে হবে। তা'না হলে আমার চলবেনা।" মুখে সে প্রশ্ন করলে "আপনার স্বামী সুবোধবাবু কই ? তাঁর সঙ্গে সেই আপনাদের বিয়ের দিন আমার একটুখানি আলাপ হ'য়েছিল। ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবেন না ?" রজতের দল ঈর্ষ্যায় মুখ কালো করে ওর দিকে চাইলে। এই লোকটার সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই সুরমার আলাপ রয়েচে নাকি ? তা'হলে তারা ফের 'Old comradeship' নতুন করে ঝালাচ্চে বলতে হবে। সুরমা বললে "ওঃ তিনি এই একটু আগেই চা খেয়ে বেরিয়ে গেচেন। ওঁদের কর্পোরেশনে আজ একটা জরুরী মিটিং রয়েচে কিনা।" রজত জিজ্ঞেস করলে "আজ কোথাও যাবেন না কি ? আজ যে সেই আমেরিকা ফেরত ডেন্টিষ্টের কাছে আপনার দাঁত দেখাবার কথা ছিল।" সুরমা ওর

দিকে না চেয়ে হরলালকে লক্ষ্য করে বললে "কাল ষ্টেশন থেকে এসে আপনার কথা ওঁকে বললুম। কতোদিন পরে কিরকম হঠাৎ দেখা হয়ে গেল—শুনে উনি খুব আহ্লাদ প্রকাশ করলেন, বললেন তোমার পুরোন বন্ধুকে পেলে এবার তোমার যে কী রকম ভালো লাগবে। ফ্রেঞ্চটা ভালো করে ফের শিখতেও অনেক উৎসাহ দিলেন। যদিও আমি বললুম আপনি এখন এজেন্ট হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ান অত সময় আমার জন্য মোটেই দিতে পারবেন না।"

"বেশত আবার সুরু করে দিন না। এখন ত একমাস আমার এইখানেই আস্তানা। তাছাড়া আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে—না হয় আরও মাস দুই ছুটি নেওয়া যাবে। আপনার যে রকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধি (হরলাল এইখানটা কষ্টে উচ্চারণ করলে, একজন মেয়েমানুষকে খোসামদ করে বশে আনতে কত অগুনতি মিথ্যে কথাই না বলতে হয়!) এত সময়ও লাগবে না, তার ওপরে বেশীর ভাগত আপনার শেখাই রয়েচে।" সুরমা ক্ষীণ স্বরে বললে "আমার জন্যে আপনি আবার ছুটি নেবেন? এতোটা কষ্ট স্বীকার!" বলতে বলতে কথাটা খুব মৃদুগন্ধ এসেন্সের মত হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল—তবে যাদের শোন্‌বার তারা শুনে নিলে। রজত ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে চেয়ারটায় দুলছিল, বললে "কিসের জন্যে করতে যাবেন এত কষ্ট! ফ্রেঞ্চ শেখার এমন কী দরকার? ওতে যা ভালো ভালো বই তার এমন সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ রয়েচে।" যতীন রজতের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্যের সুরে বললে "কিসের জন্যে শিখতে যাবেন! কে হে তুমি বিংশ শতাব্দীর এমন ইডিয়ট্ যে এ প্রশ্ন করচ?" একটা নতুন ভাষা কি কেবল লোকে বই পড়তেই শেখে নাকি? একটা নতুন ভাষা শেখা মানে একটা আত্মাকে আবিষ্কার করা।" সুরমা রজতের দিকে চেয়ে মিলিয়ে যাওয়া সুরে বললে "হ্যাঁ একটা soul কে উপলব্ধি করা।"

হরলাল বললে "চলুন না নিউম্যান এর বয়ের দোকানটা একটু ঘুরে আসিগে। ফ্রেঞ্চের গোটাকতক ব্যাকরণ আর একটা নিউ ক্যাস্‌ল্ ডিক্সেনারী কিনে আনতে হবে—তাও অমনি নিয়ে আসব।" সুরমা উঠে পড়ে বললে "বেশত, চলুন। রজত একটু ড্রাইভারটাকে বলবে গাড়ীটা আনতে। আমি এক্ষনি এলুম বলে। কাপড় আর বদলাব্ না কেবল মাথায় একটা লেশ পিন আটকে আসব। মোটারে বড় হাওয়া দেয় মাথার কাপড় এমনিতে থাকে না।" সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* *
*

ওদের মোটরটা যখন খানিকটা গিয়েচে, হরলাল জিজ্ঞেস করলে "প্রথমেই বয়ের দোকান যাবেন, না একটু ঘুরে যাবেন?" "চলুন একটু চৌরঙ্গীর ওদিক হয়ে ঘুরে যাই।" সুরমা আবার বেশি জোরে মোটর চললে সহ্য করতে পারে না। মোটে দশ কি পনেরো মাইল বেগে আস্তে আস্তে ওদের মোটরটা যাচ্ছিল। হরলাল আর সব প্রসঙ্গের সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী সুরু করলে—আপনার বিয়ে হয়ে গেল তারপরে আর ও টাউনে টেঁকতে পারলেম না (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস)। একজনকে যখন পড়াতে আরম্ভ করি তখন আমি এমন পণ করতে পারিনে যে যা পড়াব তাই নিয়েই শুধু আলোচনা করব। আপনার সঙ্গে আমার সেই সব কত কি জিনিষ নিয়ে চিন্তা তর্ক, সমালোচনা—মনে পড়ে না? তখন যে কি করে দিনগুলো কাটত টেরও পেতুম না—তারপর হঠাৎ মনে হোল কিচ্ছু আর করবার নেই এমন dull জায়গা—শেষে একটা চাকরী জোগাড় করে বেরিয়ে পড়লুম। সুরমা হঠাৎ বললে :—"তখন ত আপনি আমাকে 'তুমি' বলেই ডাকতেন এখনো তাই বললেই পারেন।" প্রথম সন্ধ্যেতেই এতটা। আনন্দে হরলালের মন উপচে পড়তে লাগল। মুখে বিনয় করে বললে "সমস্ত অধিকার ত দিলেই নেয়া যায় না, তা নেবার ও যোগ্যতা থাকা চাই। তাছাড়া তখন আপনি একলা ছিলেন আজ আর আপনি একলা নেই যে একলা আপনার কথাতেই সমস্ত অনুরোধ রাখতে পারব। এখন আপনার ওপরে আপনার স্বামীর দাবী দাওয়া—সমাজের আত্মীয় বন্ধুর কতোরকম দাবী ভাবুন দেখি একবার।" সুরমা কাপড়ের আঁচলটা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বললে

"ভাবব আবার কি। তখনো আমি যেমন একলা ছিলাম এখনও তেমনি আছি—বরঞ্চ স্বাধীনতা ঢের বেড়েচে।" কথাটা ও তত ভেবে চিন্তে বলেনি। এমনি বলেছিল। হয়ত বোঝাতে চেয়েছিল ওর স্বামী ওকে এতটা স্বাধীনতা দিয়েই রেখেচে যে ওর একক ব্যক্তিত্বের কোন হানি ঘটেনি। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে হরলালের মুখ চোখের চেহারা বদলে গেল, ও সজল সুরে বললে "বলো সুরমা বিবাহিত জীবনে কি তুমি সুখী হতে পারনি? তাই এত ঐশ্বর্য্য এত বড় বাড়ীতেও তুমি একা! তোমার ব্যথার কথা আমাকে খুলে ব'লো। কিচ্ছু লুকিও না, আমাকে তোমার চিরশুভার্থী বলেই জেন।" হঠাৎ সুরমার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে গেল। দেশী থিয়েটারের 'সাবিত্রী' প্লের ম্যাড্‌সিন্ দেখার মত। হরলালকে সে পছন্দ করতে পারে হয়ত ভালোবাসতেও পারে —কিন্তু ওর এই মোটারকম সেন্টিমেন্ট্যালিটি। গলার আওয়াজের গদ্‌গদভাব, একটা স্থূল করুণ রস ছিটিয়ে দেওয়ার ছুরপনেয় আকাঙ্ক্ষা—এসব ও বরদাস্ত করতেই পারে না। সুরমা সভয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে যদি এখন হরলাল হঠাৎ পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখে দেয়—যদি চোখে রুমাল দিয়ে আবার সজল সুরে বলতে সুরু করে "সুরমা তোমার দুঃখ যে আমারও দুঃখ তা কি জানো না? যদি জানতে তাহলে কি আমার কাছে এমন করে লুকোতে পারতে?" তাহলে ও কি করবে? কি করবে ও! সাফ্ ড্রাইভারকে খুব জোরে বাড়ীর দিকে চালাতে বলবে এবং বাড়ী পৌঁছিয়েই একটা ওজর করে নিজের দোতালার শোবার ঘরে পালাবে। কিন্তু হরলাল সামলিয়ে গেল। এবং যাতে আর না বিপদে পড়তে হয় তাই সুরমা চট্ করে তাঁর বাঁ হাতে বাঁধা রিষ্ট ওয়াচের দিকে চেয়ে বললে "ছ'টা বাজতে আর মিনিট দশ বাকী এই ত আমরা পিক্‌চার প্যালেসের কাছে এসে পড়েচি, চলুন আজকের মত এইখানেই যাই। বই কেনা কাল হবে।"

অন্ততঃ ওর মনে এইটুকু বিশ্বাস ছিল বিলেতী বায়োস্কোপ গুলোতে যতক্ষণ ছবি চলবে ততক্ষণও হরলাল চুপ করে থাকতে বাধ্য। কারণ এখানের কর্ত্তৃপক্ষেরা সর্ব্বক্ষণই ছবির পর্দ্দায় অনুরোধ কর্ত্তে থাকে "Silence is golden. If you love your neighbour—ইত্যাদি। ঘরটা আধো অন্ধকার। নিস্তব্ধ, অগত্যাই হরলালকেও চুপ করে থাকতে হয়েচে, তবে ও ঠিক সুরমার পাশেই বসেচে এবং মাঝে মাঝে এক একটা significant দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওর মনের ভাবটা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে দেবার চেষ্টা করচে।

৫

সুরমার রুচিটাই যা একটু মোলায়েম। আর স্বভাবেও ঝাঁঝালো অনুভবের চেয়ে মৃদুতার দিকেই বেশি ঝোঁক। তাই বলে একজন উনিশ কুড়ি বছরের সুন্দরী মেয়ের মনে ভালোবাসবার উষ্ণতা যে একেবারেই নেই তা কি বলা যায়! ওর স্বামী সুবোধকে নিয়ে একদিক থেকে সে যথেষ্ট সুখী হ'য়েছিল—সুবোধ আর যাই হোক আচরণে অত্যন্ত অভিজাত এবং ওর কোন ব্যবহারে কোনদিন এতটুকু ঝাঁঝের গন্ধ পাওয়া যায় না। ও একটু আধটু পেগ্ রোজই খায় কিন্তু কোনদিন জীবনে ইংরেজীতে শপথ উচ্চারণ করবার প্রবৃত্তির বশীভূত হয়নি। চাকর বাকরকে ডাক হাঁক করা দূরে থাক তাদের সঙ্গে এত আস্তে কথা বলে যে অনেক সময় কি আদেশ করচে তা বুঝে নিতেই ওদেরকে কষ্ট পেতে হয়। ওর বাইরের ব্যবহার একেবারে পর্দ্দাফেলা, গদীআঁটা, কার্পেট বেছানো, কবাট ভেজানো, ঠাণ্ডা ড্রইং রুমের মত। ও যদি কোনদিন সুরমাকে এমনতরো সামান্য একটু অনুরোধ করে যে "সুরমা আমার আলোর সুইচটা একটু টিপে দাও ত।" তা'হলেও বলবার আগে "প্লিজ" কথাটা ব্যবহার করবে এবং অনুরোধ রক্ষা হয়ে গেলে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলবে। সুরমা এই দু' তিন বছরের মধ্যে ওর মুখে কোমল নরম মিষ্টি কথা ছাড়া কোনদিন একটা কড়া কথা শোনে নি। ও যেন শক্ত কথা বলতেই পারে না। এমন কি সুরমার যদি কোন 'লভার' থাকে এবং সেই loverএর সঙ্গে সে খানিকটা সময় আনন্দ করতে চায় তাতেও ও কিছুমাত্র আপত্তি করবে না বরঞ্চ ওদের সুবিধে করে দেবার জন্যে মোটার নিয়ে সেই সময়টা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে— যদিচ তার দরকার হয়না, কারণ এ পর্য্যন্ত সুরমার যথেষ্ট স্তাবক থাকলেও আসলে বলতে গেলে যাকে lover বলা

যেতে পারে—তা একজনও নেই—এবং সুবোধের সঙ্গে এবেলা মিনিট দশ আর ওবেলা মিনিট পনের এবং রাত্রি এগারটা বারোটার আগে ওর দেখাই হয় না। আর ইতিমধ্যে সুরমা বাড়ীর ভেতর বা বাড়ীর বাইরে কি করচে তা জানতে ওর স্বামীর লেশমাত্র কৌতুহল নেই যেমন চীন জাপানের যুদ্ধে কি হচ্চে বা না হচ্চে তা জানতে ওর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কেউ যদি মনে করেন সুবোধ খুব উদার বা খুব বড় গোছের একজন দার্শনিক, বা দুধারার হার্‌মান্ কিংবা ঘরে-বাইরের নিখিলেশের মত একজন বড় হৃদয়ের মানুষ যারা হৃদয়ে যতই বেদনা পাক যাকে ভালোবাসে তাকে কেবল ভালবাসা দিয়েই পাবার সাধনা করবে, এ সাধনায় যা মিললো না তাকে জোর জবরদস্তি করে কিছুতেই চাইবে না—তাহলে তিনি সুবোধের উপর ভারি অবিচার করবেন। সে এর মধ্যে একটাও নয়। সুবোধ সভ্যতার নিখুঁত নমুনা। সভ্য মানুষে আরও দু' এক শতাব্দী পরে যা হবে তারই পরিচয় জ্ঞাপক। কোন একটা ইমোশন্ বা হৃদয়-প্রবৃত্তিকে নিয়ে গোলমাল কর্ত্তে ওর মাথা কাটা যায়। ও করবে ওর স্ত্রীকে নিয়ে জেলাসি (jealousy)! একটা ভুলকেলাম্ সিন্! তবেই হয়েচে। He is the last person on earth…ওর ভালোবাসা যেন জাপানীদের ভালোবাসা, বেশি জোরে চুম্বন করাও ওর কাছে অস্বাভাবিক। এমন কি চুম্বন না করতে পারলেই ও বেঁচে যায়—যদি তার উপায় থাকে।

মানুষে হৃদয়াবেগের দিক থেকে যত সুনিয়ম ছাঁটা কাটা হবে কলের মত আপন ইচ্ছানুযায়ী মাফিক্ হবে ততই সভ্যতার জয়গান। এবং সুবোধ এই সভ্যতাকেই আপন হৃদয়লক্ষ্মী বলে বরণ করেচে। সুরমা ওর স্বামীর আওতায় প'ড়ে আরও সংযত হয়ে গেছে—যদিচ সুবোধ আপন প্রভাব দিয়ে স্ত্রীকে প্রভাবান্বিত করতে সিকি পয়সাও কামনা করে না। কিন্তু স্বামী মাত্রেরই একটা প্রভাব আছে দেহ, মন, সঙ্গ এই সব কত্তোরকম অদৃশ্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শিকড় দিয়ে তা আপনার শক্তি বিস্তার করে সে হিসাব বাইরে থেকেই সবটা মাপা যায় না। সুরমার মন পেতে চেষ্টা করুক বা নাই করুক ওর সঙ্গে সুবোধের রুচির দিক থেকে ভয়ঙ্কর মিল ছিল। একেবারে হুবহু মিল। এবং যখন সব বলা শেষ হয়ে যায় তখনো একটা জিনিষ বাকী থাকে সেটা এই রুচির মিল—এইটেই শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকে। এবং এইটের জন্যেই অনেক কিছু এসে যায়। মিলনের অনেকখানি নির্ভর করে এরই উপরে এবং বড় বড় আধ্যাত্মিক এবং প্রেমিক মিলন-কেও অবশেষে দ্বারস্থ হতে হয় এই মিলের কাছে। অতএব এতদিন সুরমা স্বচ্ছন্দে কাটিয়েচে। বিশেষ কোন ভাবনা বা তৃষ্ণা তার মনে উঁকি মারেনি। কিন্তু এবারে যেন একটু মোহ লাগল। একজন যে ওর মনকে আয়ত্ত করবার জন্যে অনবরত ভাবচে, একপাটা হরলালের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বসলে না মনে করে থাকাই যায় না। তাছাড়া হরলালের মধ্যে একটা নিঃসঙ্কোচ জোর রয়েচে। ও যা চায় তা স্পষ্ট করে দাবী করে। কোন উপায়ে সেটাকে নির্লজ্জ স্তাবকগিরির আড়ালে ঢাকিয়ে রাখতে চায়না। আর মেয়েরা যে চাটুবাক্য অন্তরে অন্তরে চাইলেও নির্জ্জলা চাটুকারীকে মন দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পারেনা তা'ত জানাই কথা। তাই নজতের দলকে চা পরিবেষণ করা এবং দু'চারটে ফাই ফরমায়েস্ খাটানো ছাড়া আর কোন পদমর্য্যাদা দিতে ওর বেধেচে। হরলাল এদের ওপরে কয়েক ক্লাস ডিঙ্গিয়ে প্রোমোশন্ পেলে। রোজ সকালে পড়বার সময়ে ঘণ্টাদুই সুরমা নির্জ্জনে ওর সঙ্গে নানা গল্প করে। এবং প্রায়ই বিকেলে হরলাল ওকে নিয়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যায়। বেশির ভাগ সিনেমাতেই। হরলালের ইচ্ছে প্রবল হ'লেও সুরমার সংযত সান্নিধ্যে তার ইচ্ছাকে জোর করে খাটাতে ও কিছুতেই পারে না। আপন অজ্ঞাতে সমস্তই নরম হয়ে আসে। একদিন মোটরে করে ওরা হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসেচে—এটা চৈত্র মাসের শেষ চলছে। রাস্তার মোড়ে বেলফুলের মালা বিক্রী হচ্চে—সুরমা একটা কিনলে আধফোটা কুঁড়ি—সুতোটা ছিঁড়ে ফুলগুলি হাতের মুঠোয় নিয়ে বারংবার আঘ্রাণ করলে। হরলাল বললে "কি এমন ফুল! যে বারংবার গন্ধ শুঁকছ? বলে হঠাৎ ওর ফুলশুদ্ধ হাতখানি নিজের দুহাতে তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে এ'ল—ঠোঁট দিয়ে ফুলগুলি একটু চেপে স্পর্শ করলে—যেন সে স্পর্শ নরম ফুলের কুঁড়িকে



মসজিদ—কলিকাতা

বিচিত্রা
পৌষ, ১৩৪০

শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

ছাড়িয়ে তার নীচে তেমনি নরম একটি হাতকেও ছুঁয়ে যায়। হ্যাঁ 'এতটা অবধি সুরমা সহ্য করতে পারে। কেবল যে সহ্য করে তাই নয় এতে বেশ যেন একটু তার আবেশও আসে।

* * *

৬

একদিন সুরমার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে একটু জ্বর এসেছিল, জ্বর বেশি না, রাত্রিতে সবচেয়ে বেশি একশো এক পর্য্যন্ত উঠেছিল। কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার আনুসঙ্গিক মাথায় বড্ড বেদনা, গা হাত পায়ের যন্ত্রণায় ও ছটফট করচে। তখন হরলাল এসে বললে "আজকে একটি সন্ধ্যার জন্যে আমাকে একটু অধীর হতে দাও সুরমা—আমি একটু তোমার কাছে বসব। যদি কিছুও না করবার থাকে তবে কেবল কুঁজো থেকে কাঁচের গ্লাসে করে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে তোমার মুখের কাছে ধরব। যদি তোমার মাথায় বেশি যন্ত্রণা থাকে তা'হলে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব।" সে রাত্রিতে সুরমারও যেন কেমন ভুল হয়ে যেতে লাগল একবার ওর হাতটা কপালের ওপর চেপে ধরলে—যে কিছু বলেনা তার একটু বলাই যে যথেষ্ট—আবেগে হরলাল অধীর হয়ে উঠল। ওর ইচ্ছে হ'তে লাগল—সুরমার সমস্ত মৃদুতার পর্দ্দাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু হঠাৎ সুরমা বললে "ক'টা বেজেচে?" "নটা পঁচিশ - তবে এবার তোমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেচে। এবার যাও নীচে আমার ঝি আছে তাকে ডেকে দাও পাশের ঘরে বসবে। আলোটা একটু কমিয়ে দিও চোখে বড় লাগচে।" হরলাল এক মুহূর্ত্ত চুপ্ করে রইল তারপর ওর গালের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে বললে "যাচ্চি সুরমা—কিন্তু আমাকে একটু বিশ্বাস কো'র আমি এখানে একলা থাকলেও তোমার কোন ক্ষতি করতেম না"—আর একটু হ'লেই ও তাকে চুম্বন করে ফেলত। কিন্তু যাকে কোনদিন হাতের ওপরে আলগোছে একটু অধর স্পর্শ করা ছাড়া আর কিছু করেনি তাকে এই অসুস্থ অবস্থায়—তার ওপরে এই একটু আগেই ও অনুযোগ করেচে যে একলা ঘরে থাকতে দিলেও সে কিছুই করত না—হরলাল আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। আলোটা আড়াল করে দিলে। ঘরে সেদিন বিজলী বাতি জ্বলেনি। মাথাধরার ওপরে চোখে তীব্র আলো লাগবে বলে একটা মোমের বাতি জ্বলছিল।

আরও ঘণ্টাদুই পরে সুবোধ ফিরে এ'ল। সুরমা তখন ওর নবাস্বাদিত মোহ আর দেহের ক্লান্তিতে আচ্ছন্নের মত পড়েছিল। সুবোধ ঘরে ঢুকে শঙ্কিত মুখে মাটির সোরাইটার দিকে চেয়ে বললে "ইনফ্লুয়েঞ্জার ওপরে ঠাণ্ডাজল খাচ্চ না কি! নাঃ কালই একটা নার্স আনাতে হবে।" ও ঘর ছেড়ে গোসলখানার দিকে চলে গেল। এখন হাত পা ধুয়ে, রাত্রিবাস পরে এক পেয়ালা গরম কফি খেয়ে বিছানায় যাবে। কাল সকালে উঠেই কলকাতার খুব নামজাদা একজন নার্স আনিয়ে দেবে—তারা কলের মত নিয়মে চলে—আজই ত আনিয়ে দিতে পারত যদি সুরমা সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অসুখ হয়েছে সে কথাটা চাপা দিয়ে না রাখত।

সুরমা চুপ করে শুয়ে ছিল তেমনি করেই থাকল। একটা শব্দ মাত্র করতে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল না। এসব তুচ্ছ কথার জবাব দেওয়া যেন আজ অনাবশ্যক। কেবল বাইরের ম্লান চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে অনিদ্রিত সারারাত্রি ধরে কি একটা মধুর অনুভবকে সমস্ত মন দিয়ে লালন করতে ইচ্ছে করচে। যাক নার্স আনতে হো'লনা। সকালেই ওর জ্বর ছেড়ে গেল। দুপুরবেলায় সুজির রুটি খাবার পর রাত্রির কথা স্মরণ করে সুরমার ভালোলাগার সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুকম্পার হাসি পেল। এতোটা ঝাঁঝ পাবার কী ছিল এতে! দেহ দুর্ব্বল হয়ে গেলে নানাদিক থেকে মনের proportion ও যেন নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু হরলাল যে ঝাঁঝালো হৃদয়বৃত্তিগুলো সাধারণ মানুষের মতই সাগ্রহে চায়, তার মন একরাত্রি কেটে যাবার পরেই শান্ত হয়ে গেল না—সে পদে পদে proportion হারাতে লাগল। সুরমার নরম কুশনের মাপ করা খাপে আর ও নিজেকে আঁটাতে পারলে না। ও যা চায় তা এবার চাইবে—আর কত দেরী! বহুদিন ত কেটেচে নম্র মৃদু প্রতীক্ষায়।

৭

সেদিন ওরা ছ'টার শো-তে 'চিত্রা'য় গিয়েছিল। ভাঙবার পর আরও খানিকটা ঘুরে যখন বাড়ী ফিরে এসেচে তখন সাড়ে নটা বেজে গিয়েছে। নেমেই হরলাল বললে 'বড্ড গরম, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে তারপর বাড়ী যাব। তোমার মোটরটা গ্যারেজে নিয়ে যেতে পারে—আমি এটুকু বাসেই যাব'। ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। শোবার ঘরের ভিতর কুঁজোতে জল ছিল—সুরমা গড়িয়ে এনে দিলে। কারণ চাকর এবং ঝিয়েরা তখন ঘুমোচ্চে। এবাড়ীর প্রভু সুবোধ যে কেবল স্ত্রীর ওপরেই সহৃদয় ব্যবহার করত তা' নয়, চাকর বাকরকেও যতটা সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে তা সে দিয়েছিল। নিয়ম ছিল, যে যত রাত্রিতেই বাড়ী ফিরুক ছ'টার থেকে সাতটার মধ্যেই সে রাত্রির আসল খাবারটা খেয়ে নিয়ে বাহির হবে। কেবল সুবোধের খাস খানসামার অনেকদিন থেকে কাজ করে সময় সম্বন্ধে একটা ইনষ্টিংক্‌টিভ্‌ জ্ঞান হয়েই গেছিল। সে সুবোধ ফিরে এলেই তাড়াতাড়ি উঠে ইলেক্‌ট্রিক্‌ হিটিং ষ্টোভে ওর জন্যে এক পেয়ালা কফি তৈরী করে দিত। কাজেই বাড়ীতে সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন। সুরমাদের শোবার ঘরের সামনে দক্ষিণের দিকে এক টুকরো ঢাকা বারান্দার মত আছে। কয়েকটা ফুলের টব রাখা। বিকেল বেলায় তার মসৃণ সিমেণ্টটি ধুয়ে ঝি পরিস্কার এবং ঠাণ্ডা করে রাখে। খানকয়েক আরাম কেদারা এবং সোফা ইতস্ততঃ ছড়ানো। হরলাল এরই একটাতে বসে রয়েচে। সুরমা নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে তাকে দিলে। "একটু বোস। কি সুন্দর তোমাদের এই বারান্দাটি!" সুরমা চুপ করে বসে রয়েচে। শোবার ঘরের ইলেক্‌ট্রিক বাতিটার পাওয়ার কম। তার ওপরে সবুজ রেশমের পর্দ্দা দিয়ে স্তিমিত করা। বারান্দায় ফুলের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটু আলো পড়েচে। সমস্ত বারান্দাটাই অর্দ্ধেক আলো এবং অন্ধকারের মিশ্রণে ছায়াখচিত।

হঠাৎ হরলাল জোর করে আকর্ষণ করে সুরমাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এ'ল। আর একটু হ'লেই সে কি করত বলা যায় না।

সুরমা ওর হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়িয়ে বললে "এ সব কী!"

"কি তা জানোনা? সুরমা এখনও অত ন্যাকামির ভান কো'রনা। সুরমা তুমি যে অত বোকা, তা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা কোরোনা। তুমি কি মনে করেছিলে একজন পুরুষ মানুষ তোমার মত মেয়ের পিছনে অনর্থক ঘুরে বেড়াবে? কেবল তোমাকে ফ্রেঞ্চের কনজুগেশন্‌ মুখস্থ করাতে! আর তোমাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে! আর দুটো কোমল মিষ্টি গল্প করেই সে থেমে যাবে! প্রেমের নিম্নতম পর্দ্দাতেই কি চিরদিন ধরে সে ওঠা নামা করবে? কিসের জন্যে তুমি আমাকে প্রতিদিন উৎসাহ দিয়ে এসেচ? সে উৎসাহের শেষ পরিণাম কি এই নয়?" সুরমা মৃদুস্বরে বললে "হরলাল একটু আস্তে কথা বল—আর দয়া করে আমার বাড়ীতে একটা সিন্‌ কোরনা। For Heaven's sake একটা সিন ক্রিয়েট্‌ কোরনা। বোস, আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাও—একটা পান খাবে কি? না তার দরকার নেই, পান জিনিষটা বড্ড এক্সাইটিং (exciting)। আচ্ছা এবারে একটু ধীর হয়ে শোন। আমি তোমাকে গুটিকতক কথা বলচি।"

"তোমরা প্রথম থেকেই ঠিক দিয়ে বসে থাক জগতের সুন্দরী মেয়েরা অহোরাত্র পুরুষদেরকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়—এবং নাচাবার পালা শেষ হ'লে যা তাদের দেবার কথা থাকে তা দেয় না। এক কথায় তারা নির্লজ্জ ভাবে ফ্লার্ট করে—কিন্তু ফ্লার্টের চেয়ে বেশি আর একটু দুরূহতম পর্দ্দায় ওঠবার সাহস তাদের নেই। তুমি বলবে যেমন আমার নেই—

"বেশির ভাগ সুন্দরী মেয়ের কথা জানিনে—কিন্তু একটি সুন্দরী মেয়ের কথা জানি সে তোমাকে নিয়ে নাচাতে চায়নি। যদি তুমি সহসা প্রশ্ন কর 'নাচাতে চায়নি! তবে কি সে খুব গভীর আধ্যাত্মিকভাবে তাকে ভালবেসেছিল?' না তা'ও সে বাসেনি! সেই মেয়েটির জীবন বড় একটানা, ইংরেজীতে বলতে গেলে She is bored to death. কেবল স্তাবক এবং অনুচর পরিচরের দলছাড়া তার আর কোন সঙ্গ পাবার উপায় ছিলনা। এমন সময় দেখা হয়ে গেল

তার এক পুরোণ সঙ্গীর সঙ্গে…” “কিন্তু সুরমা তোমার ভাবা উচিত যে সেই bored মেয়েটি তার পুরোণ সঙ্গীকে পেয়ে গল্প গুজব অবিশ্যি করবে—কিন্তু সেই মেয়েটির মাঝে সঙ্গ পাবার কী রয়েচে? তার কি কোন চিন্তাশীলতা আছে? যে তার সঙ্গে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা নিয়ে সেই পুরুষটি আলোচনা করিতে পারবে? সে কি সাহিত্যের খোঁজ খবর রাখে বা আর্টের চর্চ্চা রাখে যে তার সঙ্গে ইম্প্রেশনিষ্টিক্ আর্ট বা রিয়ালিষ্টিক সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা করা যায়…”

সুরমা বল্লে “তা—নাই বা করা গেল তবু অনেক সাহিত্যিক এবং গম্ভীর চিন্তাশীল পুরুষ বন্ধুর সঙ্গের চেয়েও এই মেয়েটির দু'টো বাজে গল্প এবং হাসির দামই যে ঢের বেশী হরলাল—কারণ সে মেয়ে এবং সুন্দরী। তার মুখের তুচ্ছ উক্তি যদি বাজে বা অসার হয় তাতে কী যায় আসে —যতক্ষণ তার বয়েস উনিশকুড়ি এবং চেহারা অপরূপ।” হরলাল বললে “ক্ষমা কর। আমি কবি বা সাহিত্যিক নই যে দূর থেকে নারীলাবণ্যমণ্ডিত সুন্দরী নারীর দু'টো মুখের কথা শুনেই সিম্প্লি ইনস্পায়ার্ড হয়ে যাব। আমার কাছে রূপ যৌবনের আলাদা মানে—আশা করি তুমিও তা বুঝেচ যে এই জন্যেই তোমাকে আমি এতটা বাড়িয়েচি। তা' না হলে সেই ছোট থেকেই তোমাকে আমি জানি—তুমি যে একটা বড়দরের মাথা নও তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি যে সাধারণ একটা ছেলের চেয়েও কম তা কি আমি টের পাইনি। এই ত দেখনা তিনমাস ধরে কেবল ফ্রেঞ্চের কনজুগেসন্গুলোই আয়ত্ত করতে পারলে না।” সুরমা সোফাটায় ভালো করে হেলান দিয়ে বসে বললে “এতক্ষণ পরে একটা সত্য কথা বলেচ। যদিও তিনমাসের মধ্যে তিনটে দিনও কি আমি পড়েচি! কিন্তু আমার ফ্রেঞ্চ শেখায় মনোযোগ দেয়ার কী দরকার বলো? কোন দরকার নেই—কেবল মনে করেছিলুম ছোটবেলায় তুমি আমাকে ফ্রেঞ্চ পড়াতে সেই উপলক্ষ্য করেই যদি আবার তোমার সঙ্গে আলাপ জমাই—তাহলে অনেক স্মৃতিচ্ছায়া ভারাক্রান্ত associationএর আভায় তা রঙীন হয়ে উঠবে।” হরলাল বললে “উঃ মেয়েরা কি অভিনেত্রী! কতো মিথ্যে কথাই না কি অবলীলাক্রমে বলতে পারে! তুমিই না প্রথমদিনে বলেছিলে রজতকে প্রতিবাদ করে যে তুমি ফ্রেঞ্চ শিখবে কারণ 'এক একটা ভাষা শেখা মানে এক একটা নতুন আত্মাকে আবিষ্কার করা'।” সুরমা ওর হাওয়ায় বহুদূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণকণ্ঠস্বরে বললে “For God's sake অত চেঁচিয়ে কথা বোলো'না! 'সিন্' করার ধার দিয়েও যেয়োনা, হরলাল, কারণ তার চেয়ে অসুন্দর জিনিষ সংসারে আর নেই।” তার পরে একটু হেসে ফেলে বললে “কিন্তু তুমিই কি কম্ মিথ্যে কথা বলো না কি? আচ্ছা বলোত তুমি কতটা ফরাসী জান? ফরাসী ভাষার soulকে উপলব্ধি করতে হ'লে যতটা ফ্রেঞ্চ জানা দরকার তার খানিকটাও কি তুমি জানো?” হরলাল একথার জবাব দিলে না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে “কাল আমার ছুটির দিন ফুরিয়ে যাবে—ভেবেছিলুম আরও কিছুদিন ছুটি নেব কিন্তু দেখচি আর তার দরকার নেই। আমি রক্ত মাংসের মানুষ। বড় বড় কবিদের কাব্যে দেখেছিলুম তাঁরা একবাক্যে বলেচেন যে মেয়েরা এ্যব্ষ্ট্রাক্শনের ধার ধারে না তারা প্রাণের রসে একেবারে টস্‌টসে। তারা পুরুষদের চেয়েও বেশী করে রক্ত মাংসের ভক্ত। কিন্তু এখন দেখচি আমার ভাগ্যে তা মিল্‌লো না। তোমার সঙ্গে তাল রেখে চলায় আর আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ খুঁজে পাচ্চিনে। তোমার ওই মিলিয়ে আসা গলার আওয়াজ মিন্‌মিনে পান্‌সে দিনযাপন…কিন্তু একটা কথা মনে করে আমার অবাক লাগচে…সুরমা। তোমার চেয়ে আরো ঢের শক্ত মেয়েকে দেখেচি তারা শেষ মুহূর্ত্তে অনায়াসে সম্মতি দিয়েচে...তারা, যারা তোমার মত worthless, কোমলচিত্ত দুর্ব্বল মেয়ে নয়। যাদের প্রথমে দেখলেই সবল এবং বুদ্ধিমতী বলেই মনে হয় কিন্তু তুমি কিসের জোরে পার পেলে সুরমা?”

সুরমা নিজের আঙুলের আঙটিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে “কিসের জোরে পার পেলুম? হাঁ। এ প্রশ্ন করতে পারো বটে! আমি নিজকেও অনেক-বার এ প্রশ্ন করেছি। সেই কিশোর কাল থেকে মেয়েদের বয়েসের সেই সঙ্কটময় কালে, যে বয়সে তাদের দেহ মনের

এত দ্রুত পরিবর্ত্তন হতে থাকে যে তারা তাল সামলিয়ে উঠতে পারে না—যা অভ্যেস করা উচিত নয় তাই করে—এবং সেই বয়সের নানা সঙ্গিনীদের কাছে এমন সব জিনিষ শেখে, যে শেখা, তাদের moral আর physical, balanceকে চিরদিনের জন্য বিকৃত, বিপর্য্যস্ত, লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়······সেই বয়সের সেই সব ভয়ঙ্কর জিনিষের হাত থেকে আজকের এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি পার পেলুম কি করে? হাঁ৷ হরলাল তা নিয়ে আমিও ভেবেছি। তুমি জানো আমি এমন কিছু অসাধারণ মেয়ে নই, আমার চিত্তের দৃঢ়তাও এমন একটা কিছু নয় যা নিয়ে গোটাকতক মেলোড্রামাটিক্ নাটক বেশ স্বচ্ছন্দে লেখা যায়, এবং গোটা পঁয়ত্রিশ উপন্যাসের একটা মোটারকম প্লট অনায়াসেই হয়ে যেতে পারে। অমুক পুণ্য চরিত্রা নারী শত প্রলোভন, দুর্ব্বৃত্তের শত অত্যাচার সত্ত্বেও অচল, অটল, নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত স্থিরোজ্জ্বল !! আমার মনে হচ্চে সেই মেয়ে আমি নই যে মেয়ের মনের জোরের কথা লিখতে বসে ঔপন্যাসিক পরপর তিনটে অ্যাডমিরেশন মার্কা না দিয়ে কলমকে কিছুতেই থামাতে পারবেন না। আর হরলাল তুমিও সে দুর্ব্বৃত্ত নও—তুমি সাধারণ মানুষ এবং আমিও মাঝারি গোছের একটি মেয়ে, তবে দোষের মধ্যে একটু বেশী সুন্দরী এবং স্বামীর কাছে থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় স্বাধীনতা পেয়েচি। আর এতো টাকা আছে আমার যে আমি যে সুন্দরী সে কথাটা সাজে, সজ্জায় আরও ঘোরালো করে প্রায়ই মনে মনে ভাববার আমার যথেষ্টই অবকাশ রয়েচে। তবু কেবল আমি সমস্ত ব্যবহারেই সংযত সঙ্গতির দাবী করেচি। আজ রাত্রিতে তুমি সেই সহজ সুন্দর proportionকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিলে। জানো হরলাল এই রুচিজ্ঞান, এই সহজাত proportion জ্ঞান এই বস্তুই আমাকে বাঁচিয়েছে। ছোটবেলা থেকে আমি কোনদিন নীতিশাস্ত্রের পুঁথি বেশী করে পড়িনি। আর পড়লেও আজ তা কাজে দিত না। কিন্তু ছোট্ট বেলা থেকে একলা ছাদে বসে গঙ্গার ওপর সূর্য্যাস্তের অপরূপ আভা দেখেচি, সূর্য্য উঠবার একটু আগে ভোর বেলাকার অস্ফুট আলোয়—যে সময়ে সমস্ত পৃথিবী প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে যে সময় এত সুন্দর যে মনে হয় স্বর্গের দেবতারা বুঝি এই মুহূর্ত্তগুলিতেই নিজেদের অপার রহস্যের একটুখানি অবগুণ্ঠন খোলেন···সেই আশ্চর্য্য সময়ে বসে বসে সেতারে সকালবেলাকার সুর বাজিয়েচি। ছোট থেকেই তাই আমার মনে একটা সৌন্দর্য্য বোধ জেগেচে। এবং সংযম ও সঙ্গতিকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্য্যের মানে কি! বলো? তাই কারো ব্যবহারে বা কোথাও কোনরূপেই লেশমাত্র বাড়াবাড়ি, ছন্দচ্যুতি, একটা মোটা রকম ভাল্‌গারিটি আমাকে ভয়ানক পীড়া দেয়। আজ রাত্রির তোমার ব্যবহার অনৈতিক কিনা ঠিক জানিনে কিন্তু তা বড্ড ভাল্‌গার্। আজ রাত্রিতে তুমি যা চেয়েছিলে তাকে সমস্ত জীবনপরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কয়েকটি দিনের কতকগুলি উন্মাদনাময় মুহূর্ত্তরূপে তোমার হাতে তুলে দিতে······বিতৃষ্ণায় আমার সমস্ত শরীর বিদ্রোহ করে উঠেচে। একে একান্ত আত্মবিস্মৃত, সৌন্দর্য্যময় রূপে তোমার হাতে তুলে দিতে হ'লে তোমাকে যতটা ভালোবাসা দরকার—তা আমি বাসিনে এবং এ নিতে হ'লে আমাকেও তোমার যতটা ভালোবাসা দরকার তা তুমি বাসনা—আমাকে তুমি সুন্দরী অলস ধনী সম্প্রদায়ের একটি বিলাসিনী মেয়ে বলেই ভাব—এবং সে ভাবনাকে উল্‌টে দিতে আমার লেশমাত্রও আগ্রহ নেই—তার থেকেই বুঝতে পারবে আমি তোমার জন্যে কতোটা কেয়ার করি······এবং সমস্ত জানি বলেই তোমার ব্যবহার আমার কাছে এত ভাল্‌গার ঠেকেচে। আশা করি এসব কথা তুমিও যে না জান তা নয়। আর তুমি যে ছোটবেলায় "নীতি পাঠ" দ্বিতীয়ভাগ কষে প'ড়োনি তাও নয়—কিন্তু এসব সত্ত্বেও তুমি আজ নিজেকে ভাল্‌গার্ প্রতিপন্ন না করেই পারলে না। জানো হরলাল, ছোটবেলায় পশ্চিমের যে সহরে আমি কাটিয়েচি. সেখানে বাঙলাদেশের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক চাকরী উপলক্ষ্যে বাস করতেন। দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কাছে বসে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী গানের কতোরকম সৃষ্টিলীলা যে উপভোগ করেচি! তার ভেতর কতো সীমাহীন অনুভব অথচ তবু কত সংযম! সেই সমস্ত আশ্চর্য্য তথ্য কি করে যে জেনেচি! যদি মনুসংহিতা ভালো

করে পড়তে বারো বচ্ছর ব্যাকরণের তপস্যা করতুম তবুও সংযম কাকে বলে সে জ্ঞান আমার এর চেয়ে বেশী করে হোত না।" হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সুরমা বললে "কিন্তু এগারোটা যে বাজে—আমার স্বামীর ফিরে আসবার সময় হয়েচে···আর দেরী করলে তুমিও হয়ত বাস্ পাবে না হরলাল।" হরলাল বললে "তোমার এ ভাবনাই বা কেন সুরমা? তোমার ভিতর এবং বাহির দুয়েরই স্বাধীনতা ত অগাধ। নাই বা বাস পেলুম। না হয় তোমার স্বামী যে মটরে ফিরে আস্বেন তাতেই বাড়ী যাব।" সুরমা বললে "আমি যে পুরোপুরি স্বাধীন সেই জন্যই যে আমাকে বেশী করে সংযমের বন্ধন মেনে চলতে হয়। শুধু রাত এগারোটা কেন, সারারাত্রি বসে তোমার সঙ্গে গল্প করলেও আমার স্বামী কিছুই মনে করবেন না—কিন্তু জিনিষটা সুন্দর নয় এবং সবদিক দিয়েই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অতএব এবার তুমি বাড়ী যেতে পার।"

"তা যাচ্ছি—কিন্তু অনর্থক তুমি ফ্রেঞ্চও শিখলে না আর মাঝখান থেকে খামোখা ছুটি নিয়ে আমার কতকগুলো অর্থদণ্ড হো'ল। মেয়েমানুষদের খেয়ালে কি না হয় সংসারে।"

"যাক এতোক্ষণ রাবিশ বকার পর এখন একটা সত্য কথা বললে হরলাল। কিন্তু মেয়েমানুষের খেয়ালে হয়নি এ তোমার নিজেরই প্রবৃত্তির তাগিদে হয়েচে। তোমার ত সামান্য দণ্ডের ওপর দিয়েই গেল কিন্তু মেয়েমানুষকে কেবলমাত্র উপলক্ষ্য করে পুরুষে আপন হৃদয়বৃত্তির তাগিদে সংসারে এর চেয়ে আরো কত ভীষণ কাজ, কত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে ফেলেচে। অবশেষে দোষ দিয়েচে মেয়েমানুষকে। কিন্তু যাক। তুমি যে মোটে ছ'মাস এজেন্টের চাকরী পেয়েচ আর ছুটি পাওনা না থাকলেও অনর্থক মাইনে ক্ষতি করে এখানে বসে রয়েচ—সে কথা আগে একটু একটু আভাসে অনুমান করলেও—আজকের পূর্ব্বে সঠিক জানতেম না। কিন্তু তোমার এতটা ক্ষতি আমি হতে দেব না—হরলাল ভয় নেই। তুমি যে এতদিন এত ধৈর্য্য করে ফ্রেঞ্চ শেখাতে আমার মত নির্ব্বোধের পিছনেও পয়তাড়া কষলে তার জন্তে কিছু নেবে না? সংসারে কোন জিনিষেরই পারিশ্রমিক ছাড়া উচিত নয়। এবং তা নিতে সঙ্কোচ করা তোমার মত রিয়্যালিষ্টের অন্ততঃ সাজে না। আমি তোমাকে কাল বেলা দশটার মধ্যেই একটা মোটা অঙ্কের চেক পাঠিয়ে দেব হরলাল।"

শ্রীমতী আশালতা দেবী

খোকা

ছোট্ট তার হাত দুখানি
টুক্‌টুকে তার গাল
ছোট্ট একটি চুমোর চাপে
ডালিম ভাঙা লাল।

প্রেমের লক্ষণ

মুখটি বুজে চোখটি টিপে
আড় চোখেতে চাওয়া
রঙিন দিনে সাথীর গানে
পাগল হয়ে যাওয়া।

জামাই

সেই ত' জামাই
ঠিক বটে ভাই
যার কারণে বিয়ের দিনে
দই সন্দেশ খাই।

বরকন্দাজ্

লাঠি সার বরকন্দাজ্
এক হাত তার দাঁড়ি
সেলাম ঠুকে চলে সে
আগাড়ি, পিছাড়ি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শ্রীকান্ত ও কবি শরৎচন্দ্র

চতুর্থ পর্ব

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পবিত্র : এঃ। এ তোর হয়ে গেল উচ্ছাস রাসু, স্রেফ উচ্ছ্বাস।

রসিক : তাই কী ?

পবিত্র : পণ্ডিতেরা বল্‌বেন তুই আর যাই হোস্ না কেন সমালোচক ন'স্ এই আর কি।

রসিক : কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমি সমালোচক হ'তে চাইলাম আবার কবে ? তাছাড়া তার দরকারই বা কোথায় বল্ ?—যখন সে-বিরাট দায়িত্ব স্কন্ধে বহন করার জন্যে মহোমহোপাধ্যায় দিক্‌পালগণ—কবির্মনীষীপরিভূঃস্বয়ম্ভু-দের ঝাঁক ওঁৎ পেতে রয়েছেন রোমাঞ্চিত প্রত্যাশায় !

সখী (হাসিয়া) একথা সত্যি ঠাকুরপো। কারণ সমালোচনা ফর্‌সমালোচনা-স্‌সেক এ-নীতিতে আমরা বড় বেশী সাড়া দেই ব'লে আমারও অনেক সময় মনে হয়েছে। যদিও কেন যে দেই তা ঠিক ঠাহর করতে পারিনি ভেবে।—বিশেষতঃ শ্রীকান্তের মতন বই—যা অফুরন্ত রসসম্ভার যোগালো তার খুঁৎ বার করবার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেনই বা ?

রসিক : এ-রোগের নিদান কিন্তু খুব ঝাপ্‌সা নয় বৌদি। ভুলছ কেন, যে বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে লোকে সহজেই সমালোচকের রাঙা চোখ ভেবে কুঁকড়ে যায়। তাই আমরা প্রায়ই রসসাহিত্য পড়তে বসি ভয়ে ভয়ে—কোনো কিছু ভালো লাগ্‌লে আগে আটান্ন বার ভাবি ভালো লাগাটা ঠিক্ হ'ল কি না। প্রশ্ন জাগে যে কোনো বই যদি বেশি ভালো লেগেও যায় তবে সেটা মুখ ফুটে বলাটা ঠিক্ হবে কি না ?. যেহেতু আমরা ভাবি—কাজ কি বাবা অত ফ্যাসাদে—ভালো লাগাকে আচমকা প্রকাশ করতে গিয়ে ? তার চেয়ে জপ করা যাক্ : রসবিচারে non-committal রায় দেওয়াই সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

সখী (হাসিয়া) : একথা বড় মিথ্যে বলোনি ঠাকুর-পো। ওঁর সেই বঙ্কিমগ্রীব ডি-লিট্ বন্ধুটির সামনে কোনো বইয়ের প্রশংসা করতে সত্যিই আমি ভয় পাই।

রসিক (হাসিয়া) : আর আমিই বুঝি পাই না ? তোমার কাছে যা সোচ্ছ্বাসে বল্‌ছি তার সিকির সিকি উচ্ছ্বাসও বুঝি আমি গম্ভীর সমাজে প্রকাশ করতে পারি ? না, সে ডি-লিট্ মহোদয় যখন বলেন শ্রীকান্ত লিখতে গিয়ে শরৎবাবু ভুল করেছেন তখন তাঁর মুখের উপর বলবার বুকের-পাটা আমার আছে যে মশয়, আপনি গুঁতো দেওয়ার পাণ্ডা হতে পারেন কিন্তু সাহিত্যের পূজারি নন। হয়েছে-কি, আমাদের দেশে গম্ভীরাত্মা পেশাদার সমালোচকরা প্রথমটায় একটুখানি প্রশংসা করতে রাজি হ'ন কেবল এক লোভে : পরে প্রশংসিত লেখককে নিন্দা ক'রে তার শোধ তুলে আরও আত্মপ্রসাদ লাভ হবে ভেবে। কারণ যে নিন্দা করতেই না পারল সে আবার ক্রিটিক কী—এই ধরণের একটা ধারণা বহু রসান্বেষীর মগ্নচৈতন্যের পরতে পরতে লট্‌কে রয়েছে।

পবিত্র : দেখ্‌ছ তো সখী, তোমার গুণধর দেবর লক্ষ্মণের কথার ছিরি ছাঁদ ?

সখী : দেখ্‌ছি কেবল এক্ষেত্রে গুণবতী বৌদিও দেবরের সঙ্গে একমত।

পবিত্র (করুণ স্বরে) : হায়রে !—তবু রাসু বলে কাজ গোছালাম আমি—

সখী : ঠাট্টা রেখে সত্যি ক'রে তুমিই বলো তো—তোমার ডি-লিট বন্ধু বা আমার দেবর লক্ষ্মণের তীব্রা বান্ধবী

যখন বলেন শ্রীকান্ত শরৎবাবুর না লেখাই ছিল ভালো—বিশেষ করে চতুর্থ পর্ব্ব—তখন কি কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ সে কথায় সায় দিতে পারে? যে-বইয়ের প্রতি ছত্রে রস এমন ঘন এমন নিটোল হ'য়ে ফুটে উঠেছে সে বই হ'ল কিনা রসসভায় অপাংক্তেয়—তবু ক্ষত যুগের সমালোচকদের বেঁধে-ধ'রে-দেওয়া কোড্ ডগমার নজীরে?

রসিক: কিন্তু ভুলে যাচ্ছ বৌদি—রসবোধ যাদের সহজাত নয়, তারা অতীত যুগের কোড্ ডগমা ছাড়া আর কোন নজীরের কাছেই বা হাত পাতবে? মনে করো কি, রসবোধ জিনিষটা বিশ্বজনীন? অনেকের মুখে শুনতে পাই ভালো গান কে না ভালোবাসে? কিন্তু এর চেয়ে ভুল কথা কি আর আছে? ভালো গান সত্যি সত্যি ভালোবাসে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন দরদী। বাকী যারা ভালো গানে হাত তালি দেয় তারা আগে দেখে সে গানে বড় বড় সমজদারেরা হাত-তালি দিচ্ছে কিনা। কেননা না আছে এদের নিজের অভিজ্ঞতার পুঁজিপাটা,—না, সহজাত অনুভবের শক্তি। কাজেই এরা হকচকিয়ে যায় ইন্দ্রনাথকে দেখে, দিদিকে দেখে, রাজলক্ষ্মীকে দেখে, কমললতাকে দেখে—অভয়াকে দেখে তো দস্তুর মতন কেঁপে ওঠে।

সখী: আমার মনে পড়ে ঠাকুরপো, পরমহংসদেবের সেই গল্প; সেই যে হীরে দেখে বেগুনওয়ালা বল্ল বদলে সে বড় জোর দশটা বেগুন দিতে পারে; কাপড়-ওয়ালা বল্ল বড় জোর দশজোড়া কাপড়; কিন্তু জহুরি দেখেই হাঁকল দশ লাখ। যার যেমন পুঁজি, যেমন সাড়া দেবার ক্ষমতা তেমনিই তো দর দেবে।

পবিত্র: কিন্তু আমার ডি-লিট বন্ধু বলেন যে বেশির ভাগ লোক যখন এ ধরণের চরিত্র চোখেও দেখেনি কাজেই ভাবতেও পারে না তখন—

রসিক: পবি, যদি ডিমক্রাসির গুণগানই করতে চাস্ তবে you have come to the wrong shop, I warn you. (সুর নামাইয়া) এসব কথায় ধৈর্য্য রাখা কি সহজ বৌদি, বলো তো?

সখী (পবিত্রকে): আচ্ছা, তোমার বন্ধুকে দেখা হ'লে একটা কথা বলবে?

পবিত্র: কী? যে তিনি ভুল ব'লেছেন?

সখী: না, তিনিও ঠিক ব'লেছেন। কেবল এই কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে শতকরা নব্বই জনের কাছে যা অভাবনীয় শিল্পীর দায়িত্ব কি তাকেই ভাবনীয় করার নয়? চোখে যদি রাম শ্যাম যদু হরি বা জীবনকে দেখতে পারবে তাহলে শরৎবাবুর জন্মাবারই দরকার ছিল কী? অসম্ভব সম্ভব করে বলেই না শিল্পী—শিল্পী।

রসিক: সাবাস্ বৌদি। শরৎবাবু লেখেন তোমার জন্মেই এ আমি হলফ করে বলতে পারি। (পবিত্রের দিকে চাহিয়া) রে পরমুখাপেক্ষি! যদি নজীরের কাছেই হাত পাতিস্ তবে সেই মহা বোদ্ধা প্রতিভার অবতার গেটের কাছে যাস্ না কেন? শোন্ তিনি কী বলেছেন (শেলফ হইতে একটি বই টানিয়া লইয়া): "Die Kunst beschäftigt sich mit dem Schweren und Guten."

"শিল্প নহে তা সহজপন্থী চঞ্চল সন্ধান,
দুর্লভ বর সুন্দর ব্রত পণে তার সম্মান।"

পবিত্র: কিন্তু তোর কি মনে হয় না যে কল্পনার সুন্দর ও রিয়ালিটির সুন্দরের মধ্যে একটা ভেদ না থেকে পারে?

রসিক: আগে কহ আর।

পবিত্র (ভাবিয়া): আমি বল্তে চাইছি যে অভাবনীয়কে ভাবনীয় অসম্ভবকে সম্ভব করা এসবই খাসা খাসা কথা বটে, কিন্তু যখন বর্ত্তমান সমাজের ছবি আঁকতে যাচ্ছ তখন তার রিয়াল রূপটার সৌন্দর্য্য না দেখিয়ে তাতে কাল্পনিক রং চড়ালে কি সেটা ভালো কাজ হবে আর্টের দিক্ দিয়ে? ধরনা কেন কমল, বা অচলা বা অভয়া বা বিশেষ ক'রে মুরারিপুরের বৈষ্ণব আশ্রম ও তার বৈষ্ণবী কমললতা। এরকম বৈষ্ণবী বা আশ্রম কোথাও মেলে না কি?

রসিক: আমার বৈষ্ণবী ফৈষ্ণবীদের সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই তাই, কবুল করছি (বলিয়া সখীর দিকে সকটাক্ষে) যদিও বৌদি বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে যাই হোক্ না কেন, আমি বৈষ্ণবী বা বৈষ্ণব আশ্রম চিনি না চিনি সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কেননা ব'লেছি এসব ছবি বা চরিত্রের যাচাই যে নিছক্ স্থূল চোখে দেখা বাস্তব

দিয়ে, এ-কথাটাই অগ্রাহ্য। জীবন যে-রিয়ালিটিকে লুকিয়ে রাখে শিল্পীর তাকে মহত্তর রিয়ালিটি ব'লে দেখাবার এক্তিয়ার আছে। কি বলো বৌদি, নেই?

সখী: আমি বলি এত শত এক্তিয়ারের তর্কই বা কেন? যদি কমললতা বা মুরারিপুরের আশ্রম সুন্দর ও জীবন্ত হয় তবে সোজাসুজি তাকে উপভোগ করতে বাধা কি?

পবিত্র (বিজ্ঞভাবে): নিরপেক্ষ ক্রিটিকরা বলেন, বাধা এই যে যা আঁকতে যাচ্ছ তা না ফুটে যদি একটা অন্য ধরণের উদ্ভট কিছু ফুটে ওঠে তবে হাজার চমৎকার ক'রে ফোটাও না কেন তা চিরন্তন সাহিত্য হবে না। কারণ হচ্ছে—

সখী (বাধা দিয়া): ওগো নিরপেক্ষ বিচারক! যা কিছু একবার সৃষ্টিতে "চমৎকার" হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ল তাকে উদ্ভট বলাটাই হ'ল উদ্ভট।

পবিত্র: মানে?

রসিক: আর্টের সর্ব্বপ্রধান ছাড়পত্র কি এই চমৎকারিত্বই নয়?

পবিত্র: কিন্তু চিরন্তন হ'ল কি না—

সখী। (ঈষৎ উদ্দীপ্ত): এবার অবশ্য হার মান্‌তেই হ'ল—কেন না চিরন্তনতার সব বিধি বিধানের এনসাইক্লো-পিডিয়া আমার কণ্ঠস্থ নেই তোমার ক্রিটিক বন্ধুদের মতন।

পবিত্র: আহা রাগ করো কেন সখী!

সখী। (ঈষৎ লজ্জিত): না রাগ করিনি। তবে তোমার এই চিরন্তনপন্থী বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করবে কি একবার যে, কোন যুগে সমসাময়িকরা কখনো জোর ক'রে বল্‌তে পেরেছে কি না অমুক অমুক বই মহাকালের চিরন্তন দরবারে ঢুকতে পারবে আর অমুক অমুক বই পারবে না? অন্ততঃ এমন ভবিষ্যদ্দর্শী ক্রিটিক যদি থাকে তবে লাখে না মিলিল এক।

রসিক: প্রফেসর কবি হাউসমান অবিকল এই কথাই ব'লেছেন তাঁর নামজাদা Name and Nature of Poetryতে। তাছাড়া আমার মনে হয় বৌদি, যে চিরন্তনতার ধুয়ো তোলা হচ্ছে শুধু নিজের রসবোধ ঢাকবার ও বিজ্ঞতা জাহির করার সব চেয়ে অনবদ্য পন্থা—কেন না "ওহে তোমরা এখন অমুক বই যে যতই ভালো বলো না কেন মহাকালের দরবারে ওর বাঁচবার আপীল নামঞ্জুর হবেই"—এ কথা বল্‌লে লোকে প্রথমটায় একটু ভড়কে যায়ই, ভাবে হবেও বা—আমরা তো ক্রিটিক নই যে এমন জাঁকালো ভবিষ্যদ্বাণীর উপর টুঁ শব্দটি করতে পারব?

সখী (হাসিয়া): সত্যি কথা। তাই আমিও কোনো বই খুব ভালো লাগলে সাত পাঁচ না ভেবে সেটা কবুল করারই পক্ষপাতী;—চিরন্তনকে নিয়ে নাহক্‌ টানাটানি কেন বাবু?

পবিত্র: কিন্তু ভালো লাগাটা উচিত কি না—

সখী। (হাসিয়া): তার জন্যেও চল্‌তি কোড্‌ অনুশাসনের মুখ চেয়ে চল্‌তে হবে? (সহসা) একটা মিনতি রাখ্‌বে?

পবিত্র: কী?

সখী (শেল্‌ফ্‌ হইতে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব টানিয়া): অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও চিরন্তন, মহাকাল, অব্‌জেক্টিভ, রিয়ালিস্‌ম্‌, অ্যানোমালি প্রভৃতি গালভরা বুলি রেখে এ বইটির কয়েকটি জায়গা শুনবে? কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি শুনে যদি ভালো লাগে তবে সে-অপরাধের সাফাই দিতে যেতে পাবে না।

পবিত্র: (হাসিয়া) না গো দেব না। আমি ডাক্তার ব'লে কি এতই বেরসিক?

সখী: সর্ব্বরক্ষে (পাতা উল্‌টাইয়া) এই যে, ভালোই হ'ল—মুসলমান গ্রাম্য কবি গহরের কোটায়ই এসে প'ড়েছি। (পবিত্রের দিকে চাহিয়া) আচ্ছা বলো তো, এই যে সরল উদার ও আত্মমগ্ন কবি—এর এমন ছবি যদি বাংলাদেশে আর কারো তুলি আঁকতে পারে? না, আর কোথাও মিল্‌বে এমন বুকভোড়া দরদ? নয় ঠাকুর পো? এই যে গেঁয়ো কবি—একমনে শুধু ব্যর্থ কবিতা লিখে আর প্রকৃতির শোভায় ডুবে জীবনের পাল তুলে চলে লক্ষ্যহীন ভাবে—যাকে শ্রীকান্ত তার মৃদুভঙ্গীতে গোড়া থেকে শেষ অবধি ঠাট্টাই ক'রে গেল, অথচ কী দরদী কোমল ঠাট্টা সে! ঠাট্টা নয় তো,

যেন একটা অনুভবের তারে অন্য একটা সমসুরের অনুভবতন্ত্রীর বেজে ওঠা...অথচ কী গভীর সংযমের সঙ্গেই না লেখা!...এতটুকু আতিশয্য নেই, আবেগের ঘটাপটা নেই, আমি যে দেখ্‌তে জানি বুঝতে জানি চিন্‌তে জানি তার জাহিরিপনা নেই · সত্যি এ অপূর্ব্ব—(বলিয়া পাতা উল্‌টাইতে লাগিল)

পবিত্র: যাচ্চলে। 'এই যে গেঁয়ো কবি'-রূপ কর্ত্তার ক্রিয়াপদ আর এলোই না উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে। এতেও আপত্তি করব না?

রসিক: না। কারণ ঐখানেই যে কবির কৃতিত্ব রে। কবি শুধু নিজেই নিষ্ক্রিয় নন—দরদীদেরকেও সমবেদনায় নির্ব্বাক নিষ্ক্রিয় ক'রে তোলেন মনের উচ্ছ্বাস ফুটি ফুটি ক'রেও না ফুটিয়ে। জাপানীরা তাই বলে আর্টের শেষ কথা—সবটুকু বলা নয় খানিকটা ব'লে বাকিটুকু ইঙ্গিত ক'রে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করা। কেন না প্রতি গাঢ় আবেগই অর্দ্ধপথে থম্‌কে গিয়েই সার্থকব্যঞ্জনা হ'য়ে ওঠে। না বৌদি, বেশ ব'লেছ তুমি, ব্রাভো। গহর সত্যিই শরৎবাবুর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু শুধু গহরই বা বলি কেন, শ্রীকান্ত বইটিতে এম্‌নি অপূর্ব্ব চরিত্রের সার চ'লেছে একের পর এক। ওর কোন্ চরিত্রটিই বা ভোলা যায় বলো দেখি? সেই যে বাঙালী মেয়েটি হিন্দুস্থানী ঘরে বিয়ে হ'য়ে কী দুঃখ পাচ্ছিল, বা বাহাদুর ঠাকুরদাদা, বা সরল সত্যবাদী মেয়ে পুঁটু, বা প্রভুভক্ত রতন যেমন অবিস্মরণীয়—মধুতিলোত্তমা রাজলক্ষ্মী বা মহিমময়ী অভয়াও তেমনি। ঐ যে বল্‌লাম, ওঁর প্রেমের পরশমণিতে তুচ্ছতম চরিত্রও গেছে সোনা হ'য়ে। আর কী প্রেম বলো তো বৌদি? "শিল্প নহে তো সহজ পথের চঞ্চল সন্ধান!" নয়ই তো! কী কান্ত বলো দেখি? এ যেন তুলির এক একটা আঁচড় ছল্‌কে যাওয়া আর এক একটা মৃত্যুঞ্জয় রূপমূর্ত্তি ফুটে ওঠা। গহরের কোন্ যায়গাটা খুঁজ্‌ছ? দাও বার ক'রে দিচ্ছি।

সখী: এই যে পেয়েছি। (পবিত্রের দিকে চাহিয়া) শোনো এটুকু মন দিয়ে একবার, তারপর কোরো সে-সব নিরপেক্ষ গম্ভীরাননদেরকে সমর্থন যারা কর্ত্তব্যবোধে দাড়ি নেড়ে খুঁৎ ধরতে যায়। (আবৃত্তির সুরে পড়িতে লাগিল):

গহর—"এই এক পাগল।···কবে কোন্ শৈশবে সে কবিতা ভালো বাসিয়াছে, হয়ত এ মুগ্ধতা তাহার শিরার রক্তে প্রবহমান, তারপরে জগতের বাকি সব কিছুই তাহার চক্ষে অর্থহীন হইয়া গেছে। নিজের অনেক রচনাই তাহার মুখস্থ, গাড়ীতে বসিয়া গুন গুন করিয়া মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেও ছিল, শুনিয়া তখন মনে করিতে পারি নাই বাগ্দেবী তাঁহার স্বর্ণপদ্মের একটি পাপড়ি খসাইয়াও এই অক্ষম ভক্তটিকে কোনদিন পুরস্কার দিবেন। কিন্তু অক্লান্ত আরাধনার একান্ত আত্মনিবেদনে এ বেচারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিছানায় শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম বারো বৎসর পরে এই দেখা। দুই দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া এ পার্থিব সকল স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কথার পর কথা গাঁথিয়া শ্লোকের পাহাড় জমা করিয়াছে, কিন্তু এসব কোন্ কাজে লাগিবে? কাজেও লাগে নাই জানি। গহর আজ আর নাই। তাহার দুশ্চর তপস্যার অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া মনে আজও দুঃখ পাই। ভাবি-লোকচক্ষুর অন্তরালে শোভাহীন, গন্ধহীন কত ফুল ফুটিয়া আপনি শুকায়। বিশ্ববিধানে কোন সার্থকতা যদি তাহার থাকে, গহরের সাধনাও হয়ত ব্যর্থ হয় নাই।" পবিত্রের পানে চোখ তুলিয়া): বলো তো এ কয়টা রেখায় একটা গোটা মানুষের সমগ্র হৃদয়টাকে এ ভাবে ফুটিয়ে তোলা —এ কি এ যুগে শরৎবাবু ছাড়া আর কোন লেখকে সম্ভব?

রসিক: (বইটা তার হাত হইতে টানিয়া লইয়া) তারপর নেও তাঁর এই রসিকতা—যা তুমি বল্‌ছিলে বৌদি--- সেদিন: এ সব করুণ জিনিষের স্বভাব-কারুণ্য মৃদু হাসির মধ্যে দিয়ে যে-ভাবে ফুটে ওঠে তেমন আর কিসের মধ্য দিয়ে ফোটে বলো দেখি? এ রসিকতা শরৎবাবুর একেবারেই নিজস্ব সম্পদ। ধরো না কেন, এই যে কবি গহরের টাকা থাকা সত্ত্বেও ঘরদোর সম্বন্ধে একান্ত উদাসীনতা···কী সুন্দর বলো দেখি···· ·(পাতা উল্‌টাইয়া) আঃ, কোথায় গেল—এই যে পেয়েছি (পড়িতে লাগিল):

"গৃহের চারিদিকেই নিবিড় বেণুবন, খুব সম্ভব তাহার কোকিল দোয়েল ও বুলবুলির দল এর মধ্যেই থাকে এবং অহর্নিশ শিষ দিয়া, গান গাহিয়া কবিকে ব্যাকুল ক'রে দেয়"। Note the humour and sympathy বৌদি।

তারপরে আরও এক ঝলক বেশি হাসি : "পরিপক্ক অসংখ্য বেনুপত্র-রাশি ঝরিয়া ঝরিয়া উঠান আঙিনা পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, দৃষ্টি মাত্রই ঝরাপাতার গান গাহিবার প্রেরণায় সমস্ত মন মুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিয়া ওঠে।" (সকলের হাস্য)।

সখী : তারপর সেই সর্পযুগলের কাহিনী? পড়ো না ভাই সেখানটা। গহরের দৃষ্টি নেই সাপখোপে কিন্তু শ্রীকান্তের সে নিরন্ধ্র উদ্বেগ (মৃদু হাততালি দিয়া) a touch of dickens! না?

রসিক : হ্যাঁ, ডিকেন্সের আমেজ কোথাও কোথাও মেলে শরৎবাবুর হাসিতে—কারণও স্পষ্ট—তাঁর হাসি বড় মধুর হাসি—তাঁর ব্যঙ্গও এত মধুর হয় সেই জন্যেই। এই যে—শ্রীকান্তকে যে ঘরে থাকতে দিল সে ঘরে থাকতে সে ভয় পাওয়ায় গহর অম্লান বদনে বলল : কাল সব পরিষ্কার করিয়ে দেব।" তাতে শ্রীকান্ত বেচারী ভড়কে বলে : তা যেন দিলে, কিন্তু গর্ত্তটায় সাপ থাকতে পারে তো?" বলতেই যেমন প্রভু তেমনি চাকর নবীন বললেন : "দুটো ছিল আর নেই। এমন দিনে তারা থাকে না, হাওয়া খেতে বার হ'য়ে যায়।" সকলের হাস্য।

পবিত্র : ওখানটায় আমারও ভারি হাসি পেয়েছিল যেখানে শ্রীকান্ত বেচারি এসব কথায় ভড়কে গিয়ে ভাবছে "হাওয়ার লোভে সর্পযুগলের বর্হিগমন আশ্চর্য্য নয় মানি, কিন্তু প্রত্যাগমন করিতেই বা কতক্ষণ!" (তিনজনের মিলিত কলহাস্য)

সখী : (রসিকের হাত হইতে বইটি টানিয়া লইয়া) আর এই যে নিসর্গশোভা ভোগ করাতে কবিবরের শ্রীকান্তকে বনেবাদাড়ে নিয়ে যাওয়া—যেখানে শেয়াল ক্ষেপেছে মনে আছে? (পড়িতে লাগিল) "তাহার ইচ্ছা বসন্ত দিনে বঙ্গের নিভৃত-পল্লীর অপরূপ শোভা সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হই। তাহার ভাবটা এমনি, যেন আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি। তাহার আগ্রহ ক্ষ্যাপার মতো, অনুরোধ এড়াইবার যো নাই" (থামিয়া সখী হাসিল) "অতএব হাত মুখ ধুইয়া প্রস্তুত হইতে হইল।" তার পরেই শোনো : "প্রাচীরের গায়ে আধমরা একটা জামগাছের অর্দ্ধেকটায় মাধবী ও অর্দ্ধেকটায় মালতীলতা। কবির নিজস্ব পরিকল্পনা।" (পবিত্রের দিকে চাহিয়া) ওগো, অকবি শ্রীকান্তের কবিকে ঠেস দিয়ে ক্রমাগত এই মৃদু বিদ্রূপেও তানটিতে ফিরে আসাটা লক্ষ্য কোরো, কারণ এ হচ্ছে তোমার মতন অকবিরই ব্যঙ্গের মন্তব্য। শোনো, কবির চোখে ওর "পরিকল্পনা" যা-ই হোক গন্ধপ্রিয় শ্রীকান্তের চোখে এ গাছের হচ্ছে "অত্যন্ত নির্জ্জীব চেহারা।...... তাহার ইচ্ছা গোটা কয়েক ফুল উপহার দেয়, কিন্তু গাছে এত কাঠ পিঁপড়া যে ছোঁবার যো নাই।" (মুখ তুলিয়া বিমলা পবিত্রের দিকে চাহিয়া) তোমরা একটা ভারি দোষ করো, জানো—ওগো অন্যমনস্ক! ও—পবিত্র (সচকিত) : কী?

সখী : এসব ছোট ছোট জিনিষ পেলব আলোছায়া একটুও মন দিয়ে শোনো না, দেখো না। ভাবো এরা বুঝি নগণ্য। কিন্তু এ যে কত শক্ত তা জানে কেবল এক ভুক্ত-ভোগী : যে লিখতে গিয়ে ঠেকে শিখেছে।

রসিক : সাধু বৌদি সাধু। তুমি হ'লে কী আর বলো তো। সাক্ষাৎ অন্তর্যামিনী! আমার মুখের কথাটা ফের নিয়েছ কেড়ে। কারণ এ হ'ল তোমার লাখ কথার এক কথা। বাস্তবিকই যাকে আমরা ছোট ভাবি দেখতে জানলে সে যে ছোট আর থাকে না এ যে প্রতি বড় শিল্পেরই একটি প্রধান বাণী। আর শ্রীকান্ত তো বিশেষ ক'রেই এ সবটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সেই মেজদা, ঠুনঠুন্ পেয়ালা ইন্দ্রের দাদা, রোহিণীদা,—কে নয়? বড়কে অবিস্মরণীয় ক'রে আঁকা—শক্ত নিশ্চয়ই কিন্তু ছোটকে অবিস্মরণীয় ক'রে আঁকা কিছু কম শক্ত নয়। নয় কি বৌদি? শ্রীকান্তের কত যায়গা যে মনের ফলকে কেটে কেটে ব'সে আছে—দেখি বইটা (লইয়া) এই ধরো, যেখানে শ্রীকান্ত গ্রাম্যশোভার দৈন্যে নিরাশ হ'য়ে বলছে : "চল্ ঘরে ফিরি," সেখানে গহর বলছে : "তাই চলো।" তার পরে বেচারী একটু দমে গিয়ে কেমন বলছে :—আমি ভেবে-ছিলাম তোর এসব ভালো লাগবে।

বলিলাম, "লাগবে ভাই লাগবে। ভাল ভাল কথা দিয়ে এসব তুমি কবিতার লিখো প'ড়ে আমি খুসিই হবো।" এ মৃদুহাসিটি লক্ষ্য করবার বিষয়, বৌদি। জীবনে যা

সামান্ত কাব্যে ভাল ভাল কথায় তা যে নিত্যই অসামান্ত হ'য়ে ওঠে একথাটা বাস্তববাদীরা মুখে স্বীকার করলেও কাজে যে প্রায়ই করেন না তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে তাঁরা ভালোকে বয়কট ক'রে প্রায়ই শুধু মন্দ কথাকেই ক'রে চলেন জপমালা। কারণ মন্দ কথা লিখে শক্ করা খুব শক্ত কাজ নয়—কিন্তু লৌহ চরিত্রকে সোনা করতে হ'লে লেখনীর ডগায় থাকা চাই বিধাতৃদত্ত পরশমনি।

সখী: তার পরের অংশটুকু বড় সুন্দর, পড়ো না ঠাকুরপো, ঠিক ঐ কথাই কী সুন্দর ক'রে বল্‌ছে গন্তময় শ্রীকান্ত তার মৃদু দরদী পরিহাসের ছলে।

রসিক (পড়িতে লাগিল): গহর বলছে, "তাই বোধ হয় গাঁয়ের লোকে ফিরেও চায় না।" তাতে শ্রীকান্ত উত্তর দিল: "না, দেখে দেখে তাদের অরুচি ধ'রে গেছে।...যারা মনে করে কবির বর্ণনা চোখে দেখতে পেলে লোকে মোহিত হয়ে যায় তারা জানে না। দুনিয়ার সকল ব্যাপারই তাই। চোখে যা সাধারণ ঘটনা, হয়ত বা সামান্ত সাধারণ বস্তু, কবির ভাষায় তাই হয়ে যায় নতুন সৃষ্টি। তুমি যে দেখ্‌তে পাও সে-ও সত্যি, আমি যে দেখ্‌তে পেলাম না সে-ও সত্যি। এর জন্তে তুমি দুঃখ কোরো না গহর।"

পবিত্র: সুন্দর এ জায়গাটা, আমারও ভালো লেগেছিল। কেবল মনে হ'য়েছিল এসব যেন একটু ক্যালীডোস্কোপিক গোছের—দৃশ্যের পর দৃশ্য বড় শীঘ্র বদ্‌লে যাচ্ছে।

রসিক: ঐতো হ'ল শ্রীকান্ত বইটির বিশেষত্ব রে। তীব্রাদেবীর জীবনমন্ত্র—মামুলি য়ুনিটি বা আর্টের ও ধারও ধারেনি। যখন যেভাবে ইচ্ছে শ্রীকান্ত এ জীবন উপত্যকায় এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে উদাস নদীরই মতন কিন্তু চলার পথে সর্ব্বত্রই ওর উদাস মন্থর কিঙ্কিণীর চিহ্ন রেখে। কেউই ওকে বাঁধে না, ডাকে না। ও শুধু দেখে যায়—আর মনের পটে চিরদিনের তরে খোদাই ক'রে নিয়ে যায় যা কিছু দেখে তাদেরকেই। এই দেখার ও আঁকার অপরূপ নৈপুণ্য বইটিকে করেছে অতুলনীয়। তথাকথিত আর্টের সংজ্ঞায় শ্রীকান্ত সাড়া দেয়নি—আর্ট ফর আর্টস্ সেক রূপী দুর্ব্বিবহ নীতিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থেকে হাল আমলের আর্টিষ্টের নাম কিনতেও চায় নি—অনেক স্থলেই ভালো ভালো কথা অকুণ্ঠে বলেছে—সত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটিত ক'রেছে তথাকথিত ভঙ্গীসর্ব্বস্ব রূপের জয়গান ছেড়ে। এক কথায় ও শুধু বলেছে, দেখেছে, ভেবেছে ও এঁকেছে। ওর সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মীই বলেছে চরম কথা (বইয়ের পাতা উল্টাইয়া) এই ২০৯ পৃষ্ঠায় যখন শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করল "এসব তুমি শিখলে কার কাছে?"

"রাজলক্ষ্মী বলিল, কি জানি কার কাছে। হয়ত তোমারি কাছে। তুমি বলো না কিছুই, চাওনা কিছুই, জোর করো না কারো ওপর, তাই তোমার কাছে শেখা তো কেবল শেখা নয়, সত্যি ক'রে পাওয়া।"

সখী (মৃদুস্বরে): সত্যি, শ্রীকান্ত বাইরে থেকে দেখতে অতি নিরীহ বস্তু। কিন্তু ও শেখায় প্রতিপদে। অথচ এত অনাড়ম্বর কৌশলে—art conceals art নীতি মেনে—যে আর্টিষ্টিক মনও শিরপা তোলবার ভরসা পায় না। তাই শেখাটাও হয় সুসম্পন্ন—অলক্ষিত হওয়ার দরুণই।

পবিত্র (হাতের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া): আমি চল্‌লাম রে। একটা রুগী দেখতে যেতে হবে। এসব একটু বেশি উৎসাহ হ'য়ে পড়ছে আমার পক্ষে;—অত কাব্যি করা কি আমার পোষায় রে ভাই! আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে শ্রীকান্তর মতন বই পড়ে আমাদের মতন গদ্যময় মানুষের মনেও দু'একবার একটা উদাস সুর একটু ক্ষণের জন্তে বেজে যায়: মনে হয় সংসারে যা নিয়ে আমরা এত মাতামাতি করি তা নিয়ে একটু কম মাতামাতি করলে হয়ত ভরা ডুবি না হইতেও পারত।—সখী, আমি আধঘণ্টাটাকের মধ্যেই তোমাকে মোটর পাঠিয়ে দেব। আজ সন্ধ্যায় মিস্ বাসুর ওখানে গানের পার্টি পাংচুয়ালি সাতটায় মনে আছে তো? অন্ততঃ আজ তুই আস্‌ছিস্ তো রাসু?

রসিক: না পবি ভাই, মাফ করিস্। আমি গত ছ সাতমাস প্রায় সব বাজে Social প্রভৃতিতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি জানিস্‌ই তো। যা মিশি একটু—সে দুএকটা অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবীর সঙ্গে—যাদের মধ্যে সখী বৌদি হচ্ছেন একজন প্রধানা। এইতেই আমি যা একটু সত্য রস পাই। তোদের ও সভাসমিতি ড্রইংরুমের বাঁশরী পুলিনে আমার স্থান-

যমুনা আর আছড়ে পড়ে না। ও বেসুরো তটে অনেক যন্ত্রনাই পেয়েছি এ জীবনে। মিস্ ললিতা ঘোষ এসে পেলব বেসুরে গাইবেন তো "কেন পান্থ হে চঞ্চলতা কোন্ স্বর্গ হ'তে এল কার বারতা ?" আর আমাদের হবে হয় হাততালি দিতে, না হয় অশ্রুমোচন করতে, এই না ? না ভাই ক্ষ্যামাদে, তার চেয়ে সে সময়টা বরং শ্রীকান্ত বা ডষ্টয়ে ভাস্কর ব্রাদার্স কারামাজভ আর একবার পড়লে কাজ হবে। উদাস যদি হ'তেই হয় তবে এরকম সাহচর্য্যেই উদাস হওয়া ভালো—মিস ললিতা ঘোষের অশিক্ষিতপট আবেগাঞ্চিত, মাংসল কণ্ঠের গীতি যন্ত্রণায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কী চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে বল ?

পবিত্র: তুই ক্রমে ক্রমে ভারি সিনিক হ'য়ে যাচ্ছিস্ রাসু। আগে তো এমনধারা রূড্ ছিলি না। কিন্তু (সখীর দিকে চাহিয়া) কী ব্যবস্থা করব তাহ'লে ? তোমাকে নিয়ে যেতে আমাকেই ফিরে আস্তে. হবে ? আমার যে বিশেষ কাজ—

সখী: আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি একাই যেতে পারব। পার্টিতে দেখা হবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমি না গেলে কি চলে না ?

পবিত্র (ত্রস্ত): না না সে কি হয় ? তোমাকে আস্তেই হবে। মিস্ বাসু বিশেষ ক'রেই ব'লে গেছেন: কুমার খর্পরনারায়ণ গাইবেন, কুমারী চুম্‌কি দেবী নাচবেন, শিল্পী হতাশ দে ছবি দেখাবেন, তীব্রাদেবী আর্ট সম্বন্ধে পড়বেন একটা প্রবন্ধ আরও অনেক আইটেম আছে: থ্রি্লিং। চলি—তাহ'লে তুমি একটু পরে এসো মোটরে। শোফারকে সব ব'লে রেখে দেব। আমি আমার বেবি অস্‌টিনটা হাঁকিয়ে যাব একাই। (প্রস্থান—ব্যস্তভাবে) (খানিকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল)

সখী: তুমি ব'লেছ ভালো ঠাকুরপো। এ অকারণ ব্যস্ত-মুখর জীবনের প্রতি ভঙ্গী প্রতি ইসারা প্রতি আকুঞ্চণ ক্রমশ: আমারও মনে হচ্ছে কেমন যেন ছায়াময়। যেন এসব প্রতিবিম্ব গোছের—যার পেছনে কোথাও কোনো রিয়ালিটিই নেই। সব যেন পুতুল নাচ—লক্ষ্যহারা ভাবে চলেছে সবাই। তাই বোধ হয় হঠাৎ শ্রীকান্তের মতন এক আধটা বইয়ে এমন ভাবে মনটায় কে যেন দেয় দোলা। জীবনে যা পাই না তা এত সহজে ভুলে থাকি ··অথচ······ (থামিয়া গেল)

রসিক: অথচ ?—

সখী: অথচ সেকথা মনে করিয়ে দেবারও কেউ নেই (দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিল)

রসিক: সত্যি কথা বৌদি। আর জানো ? ঠিক্ সেই জন্যেই শ্রীকান্তকে আমার এত ভালো লাগে। শেষের দিকে ও কী বল্‌ছিল মনে আছে ?

সখী: কোথায় ?

রসিক: ঐ যে যেখানে রাজলক্ষ্মী পরোপকার নিয়ে (পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে) কর্ম্ম যজ্ঞে মেতে উঠ্‌তে চাইছে···এই দেখ পেয়েছি (পড়িতে লাগিল): "দিন কাটে কখনো বই পড়িয়া, কখনো নিজের বিগত কাহিনী খাতায় লিখিয়া, কখনো বা শূন্য মাঠে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়া। এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে কর্ম্মের প্রেরণা আমাতে নাই; লড়াই করিয়া, ছুটোপুটি করিয়া, সংসারের দশজনের ঘাড়ে পড়িয়া বসার সাধ্যও নাই সঙ্কল্পও নাই। সহজে যাহা পাই তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মানি। বাড়ী ঘর টাকাকড়ি বিষয় আশয়, মানসম্ভ্রম ও সকল আমার কাছে ছায়াময়।" এ যেন ঠিক্ আমার মনের ছবি, নয় বৌদি ? এ ছন্নছাড়া—ভবঘুরের ?

সখী: না ঠাকুরপো। শ্রীকান্ত জীবনের সঙ্গে ঠিক্ তোমার মতন নৈযুজ্য ঘোষণা করতে চায় না, ও চায় জীবনকে একটু অন্য ভাবে পেতে। অবশ্য ছন্নছাড়া ভবঘুরেমিতে তোমাদের একটু মিল আছে, মানি—তথা কথিত পার্টি হট্টগোল প্রভৃতিতে'ও তোমরা দুজনেই বীতরাগ, কিন্তু, তা সত্ত্বেও জীবনকে দেখার ভঙ্গী তোমাদের দুজনের এক নয়। কারণ জীবনকে শ্রীকান্ত ঠিক্ তোমার মতন ছেড়ে যেতে চায় না—একটু অন্যভাবে পেতে চায়।

রসিক (চিন্তিত): তাই কি ? আমার তো মনে হয় বৌদি, ও-ও আমার মতনই খুঁজে বেড়াচ্ছে···কী উপায়ে জীবনের সঙ্গে সব চেয়ে চমৎকার ঢঙে নৈযুজ্য-ঘোষণা করা যায় ?

সখীঃ মোটেই নয় ঠাকুরপো। কেন না যদি তাই হ'ত তবে ও রাজলক্ষ্মীকে ও চোখে দেখতে পার্‌ত না। (সুর বদলাইয়া সহসা) আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা প্রশ্ন করলে সত্যি উত্তর দেবে? না—(হাসিয়া) অত ভড়কাবার কারণ নেই মুখটাকে অত'ফ্যাকাসে না করলেও চল্‌বে। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম যে, ধরো যদি রাজলক্ষ্মীর মতনই কাউকে পাও—তাহ'লেও কি তোমার মন একটু খিতুতে চায় না?

রসিক (আবছা হাসিয়া): বৌদি, মা আকাশের চাঁদ দেখায় যে শিশুকে তার চেয়ে যে আমি একটু বড় হ'য়ে প'ড়েছি ভাই। (উভয়েই খানিকক্ষণ নীরব)

রসিক (সহজ সুরে): রাজলক্ষ্মী কি সত্যিকার জীবনের মাটিতে জন্মায় বৌদি? ও হ'ল মিষ্টতার তিলোত্তমা—কল্পনার রেণু দিয়ে গড়া। এত সুন্দর নারী চরিত্র—এত মিষ্টতায় আবেশ-জাগানো নারীচরিত্র—শরৎবাবু ছাড়া আর কোনো জীবিত শিল্পী আঁকতে পারে ব'লে আমার মনে হয় না। এমন কি, ওর মুখে গদ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন কবিতা।

সখীঃ কবিতা?

রসিকঃ নয়? যেখানে ইচ্ছে ওর কথায় কান পেতে শোনো দেখি,—শুন্‌বে ওর কথার প্রতি ঠমকে ছন্দ প্রতি রেশে সুর—কেবল বাজছে—ফল্গুতালে। এই ধরো না কেন, যেখানে ও বলছে যে শ্রীকান্তের সমাধি যদি মুরারিপুরের আশ্রমের কোনো বকুলতলায়ই হয় তখন "পরিচিত কেউ"—মানে রাজলক্ষ্মী নিজে—সে-পথে এলে (পড়িতে লাগিল): "সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে-ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই, কত ঝরিয়ে ফেল্‌বে শুকনো পাতা, শুক্‌নো ডাল, সে-সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের-মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব কবিদের গান, তারপরে সময় হলে ডেকে বল্‌বে, কমললতা দিদি, আমাদের এক করে দিয়ো সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, কোরো রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন,—কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।" (বই বন্ধ করিয়া) বৌদি, এই মেয়েকে তুমি বলো জীবনে কেউ পেতে পারে, না রসিকের দগ্ধ ললাটে এমন তারকাতিলক শোভা পেত কখনো?

সখী কি বলিতে গিয়ে চুপ করিয়া গেল।

রসিক (ঈষৎ অন্যমনা): রাজলক্ষ্মীকে একটু আগে বলছিলাম না বৌদি, মিষ্টতার তিলোত্তমা? সত্যিই তাই। আর জীবনে এ নিবিড় মিষ্টতার স্বাদ উপবিত হয় কেবল যাকে চাই তাকে না পেলে। যেমন পেট্রার্কা ও লরা। লরাকে গৃহিণীরূপে পেলে কি তাকে নিয়ে তাঁর ও ভাবে কাব্য লেখা চল্‌ত? না, দান্তে বিয়াত্রিচেকে নিয়ে ঘর-কন্না করলে Divina Comedia রচিত হ'ত কোনোদিন?

সখীঃ দান্তের বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে উৎসাহের কিছু খবর রাখি; কিন্তু পেট্রার্কাও কি—

রসিকঃ উঃ!—প্রণয়িণী উচ্ছ্বাসে তিনি তো দান্তের চেয়ে এক চুলও কম ছিলেন না বৌদি;—নইলে যে-লরা অপরের স্ত্রী হ'য়ে তাঁকে বেশি কাছে ঘেঁষতেও দিত না তাকে কি না তূর্য্য স্বরে বলেন প্রতি মেয়ের আদর্শ?—

"Qual donna attende a gloriosa fama
Di senno, di valor, di cortesia,
Miri fiso negli occhi a quella mia
Nemica che mia donna il mondo chiama
Come s' aquista onor, come Dio s'ama,
Com' e giunta onestâ con leggiadria,
Ivi s' impara ; e qual é dritta via
Di gir al ciel, che lei aspetta e brama ;
Ivi'l parlar che nullo stile agguaglia,
E'l bel tacere, e quei santi costumi
Ch' ingegno uman non puŏ spiegar in carte.
L'infinita bellezza ch'altrui abbaglia
Non vi s'impara : che quei dolci lumi
S'acquistan per ventura e non per arte."

সখী (হাসিয়া): ঘেঁষতে দিত না ব'লেই হয় ত এত ঘটা—নৈবেদ্যের—distance lends enchanment to

the view ব'লে; না? কিন্তু সে যাই হোক্ ভাই, এ সনেটটির মানেটা হ'ল ঠিক্ কী? সব জায়গায় ধরতে পারিনি—চর্চ্চা তো নেই।

রসিক: মনে করো এ ঠিক্ যেন শ্রীকান্ত বল্‌ছে রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে—পদ্মাকে:

"চাহো যদি হে রমণি! হ'তে যশঃস্মিতা—
একাধারে তেজস্বিনী, বিদুষী, মধুরা:
দেখে এসো—কহি আমি যাহারে নিষ্ঠুরা,
কহে এ জগত যারে—আমারি দয়িতা।

সতী কারে বলে—প্রেম কেমনে কিঙ্কিণী
রণে ধূপারতি-স্তোমে—রাজে ঋজুতায়
কেমনে কল্যাণী ছন্দঃ হেরিবে সেথায়—
বাঞ্ছিত বীথিকা তব স্বর্গ আরোহিণী।
শুনি' যারে ভাষাভঙ্গী থমকে—লজ্জিত!
মঞ্জুল মেদুর মৌন!—শুভ্র আচরণ!—
মানব-মনীষা তারে বাখানিবে?—হায়,—

অপার লাবণ্যে যার নিখিল লাঞ্ছিত!—
সাধনায় নাহি মিলে!—যে-কান্ত কিরণ
দৈবদান—প্রতিভার অতীত ধরায়!

বলতে চাও কি বৌদি, এ-উচ্ছ্বাস একত্র ঘরকন্নার ধোপে টে'কে?

সখী: তবে কি বল্‌বে রাজলক্ষ্মীর চরিত্র অস্বাভাবিক—টি'ক্‌ল ব'লে?

রসিক: একশোবার। মানে, জীবনে সচরাচর যা দেখা যায় সে মাপ কাঠি দিয়ে যদি বিচার করো। আর সেই-জন্যেই তো ওর ছবি এমন টানে। পাখা নেই ব'লেই না মানুষের কাছে নীলাকাশ এমন স্বপ্নময়, নয় কি? তাই তো আকাশ দেখলে তৃষ্ণা জাগে এত! অন্ততঃ আমার তো রাজলক্ষ্মীর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয় কেবলই:

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। তবে জানি না তোমার এ ছবি দেখে কী মনে হয়।

সখী (ভাবিয়া): আনন্দ হয় প্রথমটা···কিন্তু তার পেছনে একটা শূন্যতা আছে বই কি; (একটু থামিয়া জোর টানিয়া) আর তাই আমার মনে হয় শিল্পকলা মানুষকে বড় পথভ্রষ্ট করে—যা পাবার নয় তাকে এ ভাবে এঁকে। এতে লাভ কী বলো!

রসিক (চিন্তিত সুরে): কথাটার মধ্যে তোমার সত্য আছে বৌদি। কিন্তু···কি জানো? আমার মনে হয় কল্পনায় যা আভাসে মেলে হয়ত তার আসল বাণীই এই যে, চেতনার কোনো রূপান্তরে তাকে স্থায়ীভাবে মিলাতে পারে। কিন্তু একথা সত্য হোক্ বা না হোক্ এ আভাস দিতে পারে ব'লেই যে বড় একথা নিশ্চয় সত্য। অন্ততঃ আমি তো ভেবেই পাই না শিল্প শিল্পের জন্যেই বড় এ কথার মানে কী? Absurd—

সখী (বাধা দিয়া হাসিয়া): একথা আমিও মানি ঠাকুরপো, কিন্তু তা ব'লে এ কথা বলা চলে কি যে না-পাওয়া পাওয়ারই সামিল? আমার তো কেন জানিনা কেবলই মনে হয় যে না-পাওয়াকে বড় ক'রে দেখার নামই হ'ল ভাববিলাসিতা। মনে হয় এই জন্যে যে, না-পাওয়া হ'ল শূন্যতা, আর ফাঁক দিয়ে ফাঁক বোজানো যায় না। তাই আসল কথা হচ্ছে—পাওয়া।

রসিক (অন্যমনস্ক সুরে): কে জানে বৌদি? হয়ত তোমার কথাই সত্য...কিন্তু (থামিয়া) তবুও কী জানি কেন···আমার কেবলই একটা কথা মনে হয়।

সখী: কী কথা ভাই?

রসিক: মনে হয়···না-পাওয়া যদি এত ব্যর্থই হ'ত তবে জগত জুড়ে এর সুরই নিরন্তর ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ত কি? মনে হয়···এই বাইরের না-পাওয়ার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের পথেই কোথাও একটা বৃহত্তর...বৃহত্তম পাওয়ার দিশা মিল্‌বে না কি? কথাটা হয়ত একটু আবছা শোনায়—কিন্তু এ ধরণের অতৃপ্তিকে কি কেউ বেঁধে ধ'রে নির্দ্দেশ করতে পারে? তবে···কী জানো? (আরও মৃদু সুরে) এই শ্রীকান্তের কথাই ধরো না। মনে করো কি, জীবনে যেসব দেশের ও দেশের একজন যা জগতের বিস্ময় হ'য়ে বিরাজ করছে তারা শ্রীকান্তের গভীরতম না-পাওয়ার সুরগুলি শুনতে

পাবে? কিছু মনে করো না বৌদি, কিন্তু ধরো পবি, বা তার সেই ডিলিট্ থীসিস-লেখায় ব্যস্ত বন্ধুটির কথা—যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌস্তভ মণি: তোমার কি মনে হয় এরা শ্রীকান্তের নানা ছোট মিড়, মৃদু মর্ম্মরধ্বনি, ছোট্ট হাসি, চাপা অশ্রু, অস্ফুট দরদ, অর্জ্জনার বুভুক্ষা—আরও কত কী বর্ণনাতীত অথচ অনুভবগম্য সুষমার আলোছায়া—বুঝবে? বোঝা তো দূরের কথা, কান পেতে দু'দণ্ডও শুনবে! (পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে) ধরো না কেন সেই কঙ্কালসার কুকুরটার কথা। ছোট্ট দৃশ্য—কিন্তু কতখানি বিস্তীর্ণ পট-ভূমিকা ওই কুকুরের ব্যথার দিগন্তে বিছিয়ে গেল বলো দেখি? (ম্লান হাসিয়া) আশ্চর্য্য, একটা প্রভুহারা কুকুর···না খেয়ে তার মৃত প্রভুর জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে দিচ্ছে পাহারা···হঠাৎ শ্রীকান্তের চোখে পড়্‌ল সে...একী ভাবে? সমালোচকদের কথা ছেড়ে দাও···মনে হয় কি না বলো তো যে এ-দেখা দেখবার চোখ বিধাতা যাঁকে দিয়েছেন তিনি একটু অন্য ধরণের জীব? শোনো তো (পড়িতে লাগিল) "ফুলকাটা রাঙা পাড়ের সেলাই করা বগ্‌লস্ এখনো তাহার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটীরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। পাড়ায় ঢুকিয়া কাড়িয়া কুড়িয়া খাওয়ার ইহার জোরও নাই, অভ্যাসও নাই,—অনশনে অর্দ্ধাশনে এ-বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে যে তাহাকে একদিন ভালোবাসিত। হয়ত ভাবে, কোথাও না কোথাও গিয়াছে, ফিরিয়া একদিন সে আসিবেই। মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এম্‌নি? এ প্রত্যাশা (পড়িতে পড়িতে রসিকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ ধরিয়া আসিল) নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?"

(খানিকক্ষণ উভয়েই নীরব)

রসিক: কিন্তু কি জানো বৌদি! এ সব কথা বোঝবার লোক যদি বা থাকে বল্‌বার লোকও নেই—শোনবার সময়ও নেই কারুরই। চারদিকে ধূমধাম গোলমাল আন্দোলন—এমন কি শ্মশানযাত্রায়ও বোল হরি হরি বোল। এক কথায় নিঃশব্দতাকে দিয়েছে সবাই অর্দ্ধচন্দ্র—আর্ট ফর আর্টস্ সেকের নামে, সমাজের নামে, পরহিতৈষণার নামে, বিশ্বমানবতার নামে। তাই তো জীবনে সব চেয়ে মধুর পবিত্র সুন্দর ফুল যে হাটে মেলে না, মেলে—নিভৃতে, একথা আভাসে বল্‌বারও আমাদের সাহস নেই আর (ম্লান হাসিয়া) প্রায় ভুলেও এসেছি বই কি এসব অপ্রাপ্যের কথা।

সখী: কিন্তু কেন এসেছি এ প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

রসিক (চিন্তিত সুরে); জানি না। তবে··· একটা কারণ আমার মনে হয় এই যে জীবনের বড় পাওয়া গুলির দিকে বড় কেউ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

সখী: কিন্তু শিল্পীরা করে নাকি খানিকটা?

রসিক (অন্যমনস্ক): আজকের দিনে? কোথায়? একসময়ে শিল্পীরা করতেন বটে একাজ...কিন্তু আজকাল—কই ভাই? জীবনের বড় পাওয়ার দিকে ঠেলে ক'জন? বরং বড় শিল্পীরাও তো দেখি অনেকেই অম্লান বদনে বলেন, গল্প গল্পেরই জন্যে, আর্ট আর্টেরই জন্যে। অর্থাৎ কি না আর্ট শুধু একটুখানি চিত্তরঞ্জন ক'রেই ক্ষান্ত হবে। কেন? না, এ হ'ল মস্ত কাজ—রূপকার হচ্ছে মস্ত ঋষি, দ্রষ্টা, অবতার। কিন্তু (ব্যঙ্গ হাসিয়া) এ সব বলে ঠকান তারা কাকে বলো তো? অস্কার ওয়াইল্ডের লেডি উইণ্ডার-মিয়ারের ফ্যান বা কনরাডের ছোট গল্প প'ড়ে মনে যে খুসি উপছে পড়ে তাতে হৃদয়ের পরমতম ক্ষুধা মেটে? না, জগতের ও জীবনের চিরগোপন লক্ষ্য সম্বন্ধে এতটুকুও আলো পাওয়া যায়? অথচ···শিল্পী জীবনের বড় লক্ষ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত যদি সে এভাবে রূপসর্ব্বস্ব আর্ট সর্ব্বস্ব না হয়ে উঠত। আর পারত যে, তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ শ্রীকান্তর মতনই দুচারটী বই।

সখী: ওকথা আমারও মনে হয় ভাই। মনে হয়, যে-আদিম গভীর বুভুক্ষা অন্য সব অগভীর ক্ষুধানিবৃত্তিকেই দেয় ব্যর্থ ক'রে, যে-পরম তৃষ্ণা সব হাতের কাছের নির্ঝরিণীর প্রতি আমাদের করে বৈরাগী, যে-পরম না পাওয়া সব পার্থিব পাওয়াকেই দেয় পাণ্ডুর ক'রে—তার আভাস কবি, শিল্পী দার্শনিক এঁরা যদি না দেবেন তবে দেবে কে? হাকিম ডাক্তার উকীল মোক্তার?

রসিক: সত্য কথা বৌদি। কিন্তু হয়েছে কি জানো? ও যুগের শিল্পী ক্রমেই তার বৃহত্তর বাণীকে 'মরাল', 'উদ্দেশ্য-

মূলক' প্রভৃতি নাম দিয়ে অস্পৃশ্যপ্রায় ক'রে চলছে যেন কোন এক মরুপথকে নিশানা ক'রে। এ যেন হৃদয়ের তৃষ্ণাকে দেহের দুএকটা সস্তা সুখের প্রস্রবণে মিট্‌বে ব'লে ডাক দেওয়া। শ্রীকান্ত আমার এত ভালো লাগে আরো এই জন্তেই : ও এ-সস্তা ভাব দেয় নি—যেখানে বড়কে পায় নি সেখানে ছোটকে বড় ব'লে জাহির করে নি—গভীর ব্যথার সঙ্গে অবিশ্বাসে বেদনায়ও ব'লেছে যাকে চাই তারে পেলাম না—"তুমর কারা সব সুখ ছোড়িয়ঁা অব মোহে কেঁও তরসাও" এ সুরের আমেজে। তুমি বলছিলে না সেদিন, যে কমললতার বেদনার ছবিতে তুমি সব চেয়ে মুগ্ধ হ'য়েছ ?

সখী : তুমি হও নি ?

রসিক : হ'য়েছি। কিন্তু ওর বেদনার চেয়ে বড় একটা জিনিষের চলানোয় আরও বেশী মুগ্ধ হ'য়েছি : যার নাম অভীপ্সা। এ ব্যথাদিগ্ধ অভীপ্সা শুধু বঞ্চিতা কমললতার মধ্যেই নয়, এর দেখা মেলে শরৎবাবুর সব বড় নারীচরিত্রের মধ্যেই : রাজলক্ষ্মীরও, অন্নদাদিদিরও, সাবিত্রীরও, কমলেরও, পারুলেরও, বড়দিদিরও। তাই তারা কেউ শূন্যতা নিয়ে হাহাকার করেনি—বেদনাকে অতিক্রম করতেই চেয়েছে। কমললতার চরিত্রে ওর এ-অভীপ্সাকে একটু বেশি স্পষ্ট ক'রে রূপ দেওয়া হয়েছে এই মাত্র। মনে পড়ে শেষে সেই রেলগাড়ীর দৃশ্য ? কমললতাকে যখন শ্রীকান্ত বিদায় দিল ?

সখী : পড়ে না ? বাঃ। কতবার যে পড়েছি ওখানটা।

রসিক : কী সুন্দর সত্যি ! বার বার পড়ার মতনই। এমন বেদনাকে এভাবে নিতে পারা সহজ নয় মানি—কিন্তু তার চেয়ে কম শক্ত নয় এ-ব্যর্থতাকে এমন ক'রে ফোটানো—তার সার্থকতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে, নয় ? (পড়িতে লাগিল)

"আমি জানি আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস ক'রে আমাকে তুমি তাঁর পদেপদ্মে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, নির্ভয় হও। আমার জন্তে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ কোরো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তাহার সেই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ তোমার সাধনা নিরাপদ হোক,—আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করব না।"

সখী (আর্দ্রকণ্ঠে) : কী সুন্দর !

রসিক : আর কেন এত সুন্দর বলো তো ?

সখী : জানি না। তবে সময়ে সময়ে মনে হয়...যদিও কী ক'রে মুখে বলব সেটা ঠাকুরপো ?

রসিক : না, বলো বৌদি। অবর্ণনীয়কে অসম্পূর্ণ ভাবে বলারও যে একটা মস্ত সার্থকতা আছে তা কি শ্রীকান্তের মতন বই পড়তে পড়তে মনে হয় না ?

সখী (অন্যমনস্ক সুরে) : হয়—আর বিশেষ ক'রে মনে হয়—এই ধরণের ছবি দেখেই।

রসিক : কী ?

সখী : মনে হয়···বুঝি সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ এক জায়গায় গিয়ে মেশে—যার নাম রস।

রসিক : সত্যি বলেছ বৌদি। আর ঠিক্ এই কথাই আমারও যে শ্রীকান্ত পড়তে পড়তে কতবারই মনে হয়েছে... তার ঠিকানা নেই। কারণ সত্যিই এ হ'ল অনুভব জগতের একটা মস্ত সত্য...ঠিক্ সত্য নয়···সত্যের আভাষ।

সখী : আভাষ মানে ?

রসিক : মানে রস আমাদের আভাস দেয় যে, দৃশ্যমান সব রূপের অন্তরালেই আছে এক প্রচ্ছন্ন সত্তা যাকে ইংরাজীতে বলে—Presence.

সখী : কিন্তু দেয় কেমন ক'রে ?

রসিক : বোধ হয় রস প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক ব'লে। তাই ও দেখায় রসস্নিগ্ধ রূপ যেখানেই ফোটে সেখানেই যদি গভীরতম অনুভবের আলো দিয়ে তাকে দেখা যায় তবে মিলবে এমন একটা স্পন্দন যেখানে পরস্পর-বিরুদ্ধ রূপও চলেছে হাত ধরাধরি ক'রে—বেদনাও চলেছে আনন্দকে ক'রে বরণ—বিষও চলেছে অমৃতকে দিয়ে মালা।

সখী : কিন্তু একথাটা কি একটু বেশি ঝাপ্‌সা হ'য়ে পড়ল না ঠাকুরপো ? কারণ একথা যদি সত্য হয়

তবে কি বলবে যে পাওয়া না-পাওয়া সবই সমান—একাকার?

রসিক: না, তা বলি না। বলি না, কারণ সব চরম পাওয়ার সঙ্গে চরম চাওয়ার সম্বন্ধ যে ভাই, চিরন্তন—অচ্ছেদ্য। তাই শুধু জীবনেই নয়, আর্টেও, সব চেয়ে বড় কথা হ'ল—কে কী চাইল?

সখী: কিন্তু গত যুগের আর্ট—

রসিক: জানি বৌদি, কিন্তু অতীত যে অনেক সময়েই অনাগতের ঘাঁটি আগলে ব'সে থাকে একথা আর যারই অজানা থাকুক তোমার তো অবিদিত নেই ভাই। আমার বড় ভালো লাগে এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের একটা বাণী: "We donot belong to the past dawns but to the noons of the future." তাই অতীত যুগের আদর্শের ছাঁদে সে সব কাব্য উপন্যাস আর্ট আজও রচিত হ'চ্ছে তাদের মধ্যে রস অনবদ্য হ'য়ে ফুটলে উপভোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, যে-সব কাব্য গান গল্প আর্ট একটা নতুন পথ কেটে নিয়ে চলে, যে সব আর্ট শুধু আর্টের স্বকীয় কেন্দ্রেই আবদ্ধ না থেকে জীবনের উদারতর ক্ষেত্রে উপ্‌চে পড়ে, আলো দেয়, পথ দেখায়—তাদের আমি ঢের বড় বলি। কারণ তারা মানুষের চেতনার বিকাশকে দেয় সামনের দিকে এগিয়ে, শুধু আর্টিস্‌টিক ভাবে একটুখানি বুদ্‌বুদস্থায়ী আমোদ জুগিয়েই ক্ষান্ত হয় না। শ্রীকান্ত আমার এত প্রিয়—ও অতীতের আর্টের কাঠামোকে না মেনে জীবনের পরিসরকে বিস্তৃত সুন্দর উদাত্ত করতে চেয়েছে ব'লে।

সখী: কিন্তু অনেকে বলবেন ওর প্রধান সম্পদ এসব নয়—ওর প্রধান সম্পদ ওর গল্পত্ব।

রসিক (সজোরে মাথা নাড়িয়া): একথা যারা বলে তারা শ্রীকান্তকে ঠিক চোখে দেখ্‌ল ব'লে আমি কোনোমতেই মানব না। শ্রীকান্ত গল্প হিসেবে সুন্দর একথা অস্বীকার করছি না অবশ্য—কিন্তু তাই ব'লে একথা কোনোমতেই মেনে নেব না যে ওর গল্পত্বই ওর প্রধান মহিমা। শ্রীকান্ত এত বড় বই এই জন্যে যে ওর ছত্রে ছত্রে একটা বৃহৎ স্বপ্ন একটা বড় চাওয়ার মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে—ওর গাত্রে গন্ধে, রূপে রসে, শব্দে সুষমায় ছন্দে তালে। তাই যারা ওকে নিছক গল্প হিসেবেই পড়ল তাদের সম্বন্ধে আমার মনে হয়—যে কথা একজন মস্ত ফরাসী সমালোচক বলেছিলেন মপাসাঁর সম্বন্ধে:

হায় হায় রে, তাঁর প্রতিভা নাহি বুঝিয়া খালি খালি
কত অর্ব্বাচীন গল্পে তাঁর দিল যে হাততালি!*

সখী: কথাটা একটু গুরুপাক কিন্তু ঠাকুরপো—তুমিও মান্‌বে।

রসিক: মানি; এই জন্যে, যে শ্রীকান্তের গল্পমূল্যেরও মূল্য আছেই, যেমন ওর অপূর্ব্ব ষ্টাইলেরও মূল্য আছে। কেবল আমি বলি শ্রীকান্ত শুধু একটি নটে গাছটি মুড়োলোর কাহিনী নয়। যারা সব তাতেই শুধু গল্পের জন্যেই হাঁ ক'রে থাকে তাদের ঠেশ দিয়েই আমার ও কথাটি ধোরো—নইলে গল্পের গল্পত্বের সৌন্দর্য্য আমিও বুঝি। আমার মনে হয় বার্ণার্ড শর কথা এ-সম্পর্কে: "Are we children in the nursery that we still require to be told a tale?" অর্থাৎ গল্পে শুধু গল্পত্ব ছাড়া আর কিছু চাইবই না এই একগুঁয়েমিই হচ্ছে শ-র টার্গেট—আমারও। তাই তো আমি বলি যে যখন দেখছি যে শ্রীকান্ত নিছক চিত্তরঞ্জক গল্পমাত্রই নয় তখনো ওর মধ্যে শুধু গল্পত্বটুকুরই জন্যে ছেলেমানুষের মতন হাঁ করে থাকবে কেন?

সখী: এখানে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত?

রসিক (প্রীতস্বরে): একমত হওয়া উচিত বৌদি। কারণ গল্পে গল্পেতর বাণী বহন করা সাধারণ শিল্পীর কাজ নয় এবং এর অসামান্যতা বুঝবার জন্যেও চাই তোমাদের মতনই গ্রহীতা—যারা চোখ কান মন প্রাণ খুলে রাখতে জানে। কারণ এ-হৃতস্বপ্ন মৃত্তিকাবদ্ধ মত্ততামুখর ক্ষীণপ্রভায় তথাকথিত রিয়লিস্‌টিক আর্টের যে-সামান্য জোনাকীদীপ্তি তাতে বরং জীবনের পথ খোঁজায় অন্ধকারই ওঠে বেশি ক'রে ঘনিয়ে। কেন না এ-শ্রেণীর আর্ট তেল নুন লকড়ির জগত নিয়েই মেতে রইল। সেই জন্যেই শ্রীকান্তের বাণী আমাদের

* "Je regrette seulement, pour lui, que son oeuvre luiait fait des admirateurs un peu meles et que beaucoup de sots l 'apprecient pour tout autre chose que pour son grand talent" ......(Lee Contemporains)

JULES LEMAITRE

এ যুগে এত দরকার যার নিরাশার পিছনেও উচ্ছল—অভীপ্সা, হাসির পিছনেও থমকে—অশ্রু, এমন কি অবিশ্বাসের পিছনেও চোখ-চেয়ে—স্বপ্ন ভঙ্গের জিজ্ঞাসা।

সখী: কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয় ঠাকুরপো, মাফ কোরো। আমার বোধ হয় আর্ট যত বড়ই হোক না কেন তার সাধনায় তুমি যার ইঙ্গিত করছ—সেই পরমের চরম স্পর্শ মেলে না। কারণ ও তার এলাকা নয়।

রসিক (অন্যমনস্ক ভাবে হাসিল): একথা আমারও মনে হয়েছে বৌদি, যদিও মানতে কোথায় যেন বেদনা পাই। কারণ আর্টকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু একথা যদি মেনে নেওয়াও যায় তাহ'লেও বলা চলে যে আর্ট যতদূর যায় ততদূর অবধি সে মানুষকে অনেক কিছু দিতে পারে যদি সে আর্টের মতন আর্ট হয়। আর ভবিষ্যতের আর্ট যে এই দিকেই ঝুঁকবে—শুধু চিত্তরঞ্জন সর্ব্বস্ব হবে না একথা আমার শ্রীকান্তর মতন বই পড়তে পড়তে বড় বেশি ক'রেই মনে হয়। মনে হয় (তাহার স্বর সুদূর হইয়া আসিল) যে, বাস্তব যে-মদে নিত্যই দৃপ্ত হ'য়ে চলে—শিল্পের 'পরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশের 'পরে কল্পনার 'পরেই ভার—তার নেশার রূপটিকে হাহাকারের রূপটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। অন্ততঃ যে-নিছক ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্বতা নিয়ে জগতের পনের আনা লোক মেতে আছে সে যে মরীচিকা, সে যে আলেয়া, সে যে ভ্রান্তিবিলাস……এটা উদ্ঘাটিত ক'রে দেখানো যে কত বড় কাজ বৌদি…(বাইরে পবিত্রের চিৎকার শোনা গেল: শিগগির এসো সখী, মিস্ বাসুর পার্টির দেরি হ'য়ে যাচ্ছে… ঘন ঘন হর্ণ ধ্বনি)।

সমাপ্ত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ

আমীন উদ্দীন আহমদ বি-এ

বাণী-বর-পুত্র কবি হে রবীন্দ্রনাথ
ত্রিভুবনে করিয়াছ তব রশ্মি পাত—!
রূপে সুরে ছন্দে গানে দিয়ে নব প্রাণ
হে ভারত-ঋষি-কবি পূর্ণ তব দান।
বাণী তব ব্যাপ্ত আজি বিশ্ব চরাচরে—
আমাদেরি নহ,—তুমি বিশ্বে প্রতি ঘরে।
যেই গান শুনে নাই যুগযুগান্তর
অভিশপ্ত ভারতের ব্যথিত অন্তর
সেই সাম-গান সুর—অপূর্ব্ব সে ধ্বনী
শুনাইলে তুমি ঋষি কবি-চূড়ামণি!
ধন্য তুমি! ধন্যা ধরি' বক্ষে বসুমাতা
ধন্য মোরা—সিক্ত তাই হর্ষে আঁখি পাতা।
যুগেযুগে রূপ-সৃষ্টি কল্প-দীপালীতে
প্রণমিবে স্রষ্টা কবি তোমারে আদিতে।

সনেট (Rousard)

শ্রীআশুতোষ সান্যাল বি-এ

এ নিরালা কুঞ্জপথে গেছে মোর প্রিয়া,—
হেথা আমি র'ব ব'সে তারি প্রতীক্ষায়;
শ্রীঅঙ্গসুরভি তার যায় নি চলিয়া,
ভাসিছে সমীর-সনে উপবনে হায়!
এখনো কাঁদিয়া মরে মাতাল ভ্রমর,
মুখসীধু করি' পান কুসুমের ছলে;
কিংশুক লুটায় ভূমে হিংসায় জর্জ্জর,
হেরিয়া রক্তিমা তার সুকপোলতলে!
চরণ-অলক্ত-রাগ সিক্ত ঘাসে ঘাসে,
নিকুঞ্জ-কাননে হেথা র'য়েছে লাগিয়া;
এ বনের শোভা যত হ'রে নিয়েছে সে,—
তার সনে গেছে নিয়ে আমার এ হিয়া!
জীবন যাপিব হেথা তাহারি স্বপনে
তার মধু-স্মৃতি-মাখা এই তৃণাসনে!

দিদির চিঠি

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি-এ

মহা সমারোহে শিপ্রার বিয়ে হয়ে গেল। বৈশাখ মাসের কাঠ-ফাটা রোদ, কাঁঠাল-পাকা গরম আর বাড়ী ভরা মানুষের প্রাণপণ হট্টগোলে মাতামাতি যতদূর হতে হয়, তার আর কিছুই বাকী থাকল না। গভীর রাত্রে বিয়ের পর সারা বাড়ী যেন হঠাৎ নিঝুম হয়ে পড়ল। এতক্ষণ দাপাদাপি করে দুরন্ত ছেলে মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়ল যেন।

শিপ্রাকে বাসরে রেখে, কয়েকজন তরুণীকে সহচরী করে দিয়ে সুজাতা ছাতে এসে গা এলিয়ে দিলে। সমস্ত শরীরটা যেন তার একেবারে ভেঙ্গে পড়ছিল; সারাদিন সে বোধ হয় ভূতের মতই খেটেছে। মা নাই, সমস্ত বোঝা তারই ওপরে। তা'র ওপর আবার মাসী-পিসী প্রভৃতি অনেক অনাত্মীয়া আজ অযাচিত ভাবে আত্মীয়া হয়ে এসে তাকে বিব্রত করে তুলেছিলেন আরও বেশী।

কতই বা বয়স তা'র? এখনও উনিশ পার হয়নি; অথচ এরই মধ্যে—। যাক্ গে, সে যা শেষ হয়ে গিয়েছে, তা' নিয়ে সুজাতা আর মিছে ভেবে মরতে চায় না।

নরহরি বাবুর দুই মেয়ে, সুজাতা আর শিপ্রা। পাঁচ বছর আগে এমনি করে মহা সমারোহে সুজাতারও বিয়ে হয়েছিল। সেদিন সংসারের ভার বইবার লোকের অভাব হয়নি, সুজাতা-শিপ্রার মা তখন বেঁচে ছিলেন।

সুজাতার যেদিন বিয়ে হয়েছিল, সেদিনকার কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে। এত শীঘ্র কি আর সেদিনকার ছবির রেখা মিলিয়ে যায়? শিপ্রা তখন মাত্র ছ' সাত বছরের; সেদিন তার কী আনন্দ। ভোর হ'তে না হতেই শিপ্রা সেদিন সুজাতাকে ঠেলে তুলেছিল—দিদির বিয়ে যে। সানাই সেদিন যে প্রভাতী তান ধরেছিল, সে সুর বুঝি এখনও সুজাতার কানে বাজে।

সেদিন মা ছিলেন; সুজাতার মা। মা'কে সুজাতার বড় ভালো লাগত। কোনও দিন সে মা'কে বেশী কথা কইতে দেখেনি, কোনও দিন তা'কে কাছে টেনে নিয়ে মা আদর করেছেন বলে তা'র মনে পড়ে না, কিন্তু সেইদিন তাঁর চোখ দুটিতে সুজাতা পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের যে মেদুর ছায়া দেখেছিল, জীবনে কোনও দিন তা' ভুলতে পারবে না।

সুজাতার বিয়ে হয়েছিল। ঠিক এমনই করে, হট্ট-গোলের মাঝখানে, মাতামাতি করে তারও একদিন বিয়ে হয়েছিল। নরহরি বাবু দেশ খুঁজে ছেলে এনেছিলেন; রূপে কার্ত্তিক, ধনে কুবের, বিদ্যায় বৃহস্পতি। তার মতন মেয়ের এমন সৌভাগ্য হতে পারে, একথা সুজাতা সেদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। শিবের মতন স্বামী পেয়ে সুজাতা বুঝি বা সেদিন দর্পিতা হয়ে উঠেছিল, তাই এমনই করে তার সব দর্প চূর্ণ হল।

শুভদৃষ্টির সময় একটিবার চোখ মেলে সুজাতা তাঁকে দেখেছিল; দুটি চোখে তা'র জল ভরে এসেছিল তাঁকে দেখে।

সুজাতাকে দেখে তার শ্বশ্রূমাতা খুব খুশী হননি। তাঁর রূপবান ছেলের বউ হবে অপ্সরী, অন্ততঃ ডানাকাটা পরী, এ বাসনা তাঁর বহুদিনের। কিন্তু সুজাতা মোটেই ডানাকাটা পরী ছিল না। তার গায়ের রঙ ফর্সা বললে অত্যন্ত অবিচার করা হয়, কিন্তু তা' বলে সে কুরূপা ছিল না।

তার শ্যামাঙ্গে যে স্নিগ্ধতা ছিল, তার ডাগর চোখ দুটিতে যে সকরুণতা ফুটে উঠত—যার একটুখানি চোখ আছে, তা'র কাছেই তা' ধরা পড়ত।

প্রথম দিন থেকেই সুজাতার স্বামী তাকে প্রীতির চোখে

দেখে ফেলেছিলেন। সুজাতা নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছিল। এত সৌভাগ্য, এত সুখ, এযে দেবতারও বাঞ্ছিত।

এত সুখ দেবতারও বাঞ্ছিত, তাই বিয়ের পরে দু' বছরও কাটল না। সুজাতা তখন পিতৃ গৃহে; হঠাৎ একদিন একটি টেলিগ্রাম এল, যার ফলে বাড়ী ভরে উঠল হাহাকার, আর চোখের জলের মধ্যে সুজাতার সিঁথির সিঁদুর আর রাঙা শাঁখা চিরদিনের মত বিদায় হয়ে গেল।

সুজাতা শ্যামা আর শিপ্রা গৌরী। সুজাতার শ্যামলিমায় যেন নবঘনের মন্থরতা ছিল; তার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ত যেন একটা শান্তির ধারা। তার চোখে গভীরতা ছিল, ঔজ্জ্বল্য ছিল না, ঠোঁটে ক্রূর হাসি ছিল না, মুখমণ্ডলে প্রশান্তির ছায়া ছিল।

শিপ্রা তড়িৎবরণী। তার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুনের দীপ্তি। তার রূপ মনকে উদাস করে না, উত্তেজিত করে। তার ক্রূর হাসি, বঙ্কিম চাহনি ঘোষণা করে দেয় যে সে চিরদিনই বিজয়িনী।

সুজাতা শিপ্রাকে ভালোবাসত; মা যেমন করে তার একটি মাত্র সন্তানকে ভালোবাসে তেমনই করে। শিপ্রাকে ছেড়ে সুজাতা বোধ হয় বেঁচে থাকার কথাও ভাবতে পারত না—আলো আর ছায়ার মতই তাদের সখ্য চিরদিন অটুট।

শিপ্রার বিয়ে। আজ শিপ্রা মনোমত স্বামী লাভ করেছে; আনন্দের অশ্রু সুজাতার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।.........শুধু আনন্দের অশ্রু? কে জানে! নিজের জীবনের ব্যথার ইতিহাস কি সেই নিটোল অশ্রুকণার মধ্যে ছায়া ফেলেনি একটিবারও?

অশ্রুমুখী শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরে অন্তরের সকল সঞ্চিত স্নেহ সুজাতা তা'র যাবার বেলা উজার করে ঢেলে দিলে। শিপ্রার স্বামীর পানে জলভরা চোখ দুটি তুলে মিনতি জানালে যেন তিনি তার আদরিণী বোনটির সব অপরাধ মার্জ্জনা করে তা'কে নিজেরই করে নেন।

তিন দিন পরেই শিপ্রা ফিরে এল। রূপ যেন তার আরও ফেটে পড়ছে; মুখরা শিপ্রা মুখরা হয়েছে আরও। তিন দিনের মধ্যেই যেন তার নারীত্ব পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে; যে ছিল গুণ্ঠনবতী, ব্রীড়াময়ী নববধূ, সে আজ মহিমান্বিতা সিমন্তিনী। দুটি বাহুর নিবিড় বাঁধনে শিপ্রাকে সুজাতা বুকে নিলে।

শিপ্রার কথার আর শেষ নাই। তিনটি দিনের মধ্যে এমন কী-ই বা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু শিপ্রার কথা শুনে মনে হয় যেন তিনশ' বছর ধরে অনর্গল বকে গেলেও তার কথা শেষ হবে না। তার পতিগৃহের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কথাই সে একে একে সুজাতার কাছে বলতে লাগল। সকল কথার শেষেই তা'র স্বামীর কথা এসে পড়ে—উচ্ছ্বসিত বর্ণনা চকিতে সরমের বাধা পেয়ে থেমে যায়, কিন্তু সুজাতা সহজেই বুঝতে পারে যে স্বামীর কথার অবতারণা করবার জন্যই শিপ্রার এত দীর্ঘ বক্তৃতা। সস্মিতমুখে তাকে কোলে টেনে নিয়ে সুজাতা তার স্বামীর সম্বন্ধেই বার বার প্রশ্ন করে। মুখরা শিপ্রার কপোল দুটি লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে; অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কখনও সুজাতার কথার উত্তর দেয়, কখনও বা দেয় না।

শিপ্রার চিঠি এসেছে তা'র স্বামীর কাছ থেকে। সুজাতার কাছে শিপ্রার কোনও কথা গোপন থাকে না; এ চিঠির কথাও সুজাতার অজানা থাকল না। শিপ্রার আগে সুজাতাই পড়ল চিঠিখানি। নব অনুরাগের উল্লাসে ভরা, মধুরাক্ষর প্রেমের লিপি। সুজাতা সবটা পড়তে পারল না; তীব্র মদিরার মত যেন সেই চিঠির ভাষা তাকে বিবশ করে তুললে। বিবর্ণমুখে পাণ্ডু হাসি হেসে শিপ্রার কোলে চিঠিখানি ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে সে চলে গেল কার্য্যান্তরে।

আজ সুজাতার কী হয়েছে? দুই চোখ ফেটে শুধু উষ্ণ জলের ধারা বইতে চায় কেন? সুজাতা কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না, কেবলই মনে হয়, আর কেন? আর পারা যায় না এই দুঃসহ জীবনের বোঝা বইতে। সুজাতার আজ এ কি হল? জীবনে মৃত্যুর বিধান ত সে মাথা পেতেই নিয়েছিল, কোনও দিন সে বিধানের শিকল ছিঁড়ে ফেলার কথাও ত মনে হয়নি তার।

শিপ্রা তার স্বামীকে চিঠি লিখবে, অতএব সুজাতার

পরামর্শ চাই। আজীবন সুজাতাই তার সহচরী, সুখে দুঃখে দিদি-ই তার সঙ্গিনী, তাই শিপ্রা দিদিরই সাহায্য চায় স্বামীকে চিঠি লিখ্‌তে। শিপ্রা বালিকা, বুদ্ধিহীনা; সে কি আর এই উচ্ছ্বাসভরা চিঠির যথাযথ উত্তর দিতে পারে? সুজাতার সাহায্য না পেলে যে তার চিঠিই লেখা হবে না।

সুজাতা শিপ্রাকে মন্ত্রণা দিতে বস্‌ল। দু'একটা কথা বলতে না বলতেই শিপ্রা সরমে রাঙা হয়ে হেসে ওঠে, তার কোঁকড়া চুলে ঢাকা ছোট্ট কপালটি, নিটোল গণ্ডদুটি, এমন কি ঘাড়ের পিছনটিও লজ্জারুণ হয়ে যায়। সুজাতা অকারণেই নিজেকে কুণ্ঠিতা বোধ করে; প্রেমের পাঠ উপর্য্যুপরি পড়াতে হয়।

শেষে ঠিক হল এমন করে হবে না। বেশ ভেবে, চিন্তে, ভালো করে গুছিয়ে সুজাতা একটি চিঠি লিখে দেবে আর শিপ্রা সেইটি হুবহু নকল করে পাঠিয়ে দেবে তার স্বামীর কাছে। শিপ্রার চিঠির কাগজ পত্র নিয়ে সুজাতা চলে গেল নিজের ঘরে আর সিপ্রা সলাজ কৌতুকের মিশ্র হাসিতে রঞ্জিতা হয়ে ছবির বই কোলে করে বসে থাকল।

অনেকক্ষণ পরে সুজাতা বার হয়ে এল। শিপ্রার কাছে এসে দাঁড়াতেই শিপ্রা আর মাথা তুলে চাইতে পারল না, যত রাজ্যের লজ্জা এসে যেন তাকে অভিভূত করে দিলে। শিপ্রার কোলে চিঠিখানি ফেলে দিয়ে সুজাতা বলে গেল যেন সে ভালো করে নকল করে পাঠিয়ে দেয়। তারপর, ধীরে ধীরে সুজাতা ফিরে চলে গেল নিজের ঘরে।

শিপ্রা এতক্ষণ হতবাক্ হয়ে বসেছিল। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন পিপাসু হয়েছিল এই চিঠিটুকুর জন্যে। সুজাতার দিকে একটিবারও না চেয়ে, সে চোখের আড়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিপ্রা ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিলে চিঠিখানি—সারা বিশ্ব যেন লোলুপ হয়ে হাত বাড়িয়ে ছিল তার প্রেম লিপিখানি পাবার জন্যই।

শিপ্রা চিঠি পড়তে লাগল। এ কী? এমন করে কি মানুষ মানুষকে চিঠি লিখতে পারে? শিপ্রার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, অজানা উত্তেজনায় অধীরা হয়ে উঠল সে। ছত্রে ছত্রে একি আগুন ছড়ান? অক্ষরে অক্ষরে একি অপূর্ব্ব মাদকতা? শিপ্রার মনে জাগ্‌ল তার স্বামীর কথা; তিনটি দিনের সাহচর্য্যের কথা—সান্নিধ্যের কথা,—অসহ আবেশে শিপ্রার তনুদেহ স্বেদসিক্তা হয়ে উঠল।

চিঠি পড়া যখন শেষ হল শিপ্রা তখন পরিশ্রান্তা। তার মনে হল যেন কত দীর্ঘ যুগ-যুগান্ত চলে গিয়েছে তার চোখের ওপর দিয়ে। কত মধুযামিনীর সুখস্মৃতি, কত বিনিদ্র রজনীর অশ্রুসিক্ত মর্ম্মব্যথার যেন সে-ই একমাত্র নীরব সাক্ষী।

শিপ্রার কোলে চিঠিখানি ফেলে দিয়ে সুজাতা চলে গিয়েছিল। শিপ্রা তখন তাকে ভালো করে দেখেনি, দেখলে হয়ত একটু বিস্মিতা হত।

সুজাতার ওপর দিয়েও যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। তার গভীর চোখ দুটিতে ভরে এসেছে মৃত্যুর মৌনতা। অশ্রান্ত বিক্ষোভের পর বিশ্ব-চরাচর শান্ত হলেও জলধির বুক যেমন থেকে থেকে ফুলে ওঠে, মাত্র ক্ষণকাল পূর্ব্বের তাণ্ডবের কথা স্মরণ করে, তেমনই বেপথুমতী সুজাতার অন্তর ভেদ করে যে দীর্ঘশ্বাস উঠছিল কেবল অন্তর্যামী তার সাক্ষী।

সুজাতা ভাবছিল, এ কী করলে সে? তার স্বামী নাই, পরের স্বামীকে সে আজ প্রেম নিবেদন করেছে। তার আজীবনের আদর্শ, একটি দিনে, এমনি করেই সে আজ বিলিয়ে দিলে? শিপ্রার জন্যই সে চিঠি লিখতে বসেছিল সত্য, কিন্তু চিঠিতে সে যা লিখেছে সে কি আগাগোড়া সবই শিপ্রার কথা? তার যৌবনের রিক্ততায়, তার ব্যর্থ নারী জীবনের পুঞ্জীভূত জ্বালায় চিঠিখানি যে ভরে উঠেছে, সে কথা কি সুজাতা জানে না? শিপ্রার নাম করে চিঠি লিখতে বসে সে নিজেই আজ প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে তুলেছে। স্বামীহারা, পরের স্বামীকে আত্ম-নিবেদন করতে একটু দ্বিধা হল না তার? সুজাতা যেন নিজেই নিজের কাছে সঙ্কোচে মরে গেল।

শিপ্রা ভেবে দেখলে দিদি যে চিঠি লিখে দিয়েছে, সে চিঠি নকল করে পাঠান তা'র সাধ্যাতীত। অত কথা, ওরকম করে, নিজের হাতে সে কখনই লিখতে পারবে না। আবার যখন স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে, লজ্জায় সে যে মাথা তুলতেই পারবে না।

অনেক ভেবে শিপ্রা ঠিক করলে, দিদির লেখা চিঠি-খানিই পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। তার স্বামী ত তার হাতের লেখা দেখেনি, দিদির লেখাও চেনে না, বুঝবে কেমন করে যে কে লিখেছে। সুজাতাকে একথা বললে সুজাতা রাজী হবে না কখনও, সুতরাং তার কাছে মিথ্যে কথাই বলতে হবে। তার লেখা চিঠিখানি পাঠিয়ে দিয়ে তাকে বলবে যে সে নিজে নকল করে পাঠিয়েছে।

দু' দিনের মধ্যেই শিপ্রার চিঠির উত্তর এসে হাজির। প্রথম প্রথম এমনই হয়ে থাকে। মীনধ্বজের বাণে যে আগুন জ্বলে ওঠে, তার জ্বালা বোধ হয় প্রথমেই খুব তীব্র।

সুজাতা ঠিক করে রেখেছিল যে শিপ্রার স্বামীর চিঠি আর সে পড়বে না। কিন্তু তার সে প্রতিজ্ঞা থাকল না। চিঠি আসতেই তার হাতে ফেলে দিয়ে শিপ্রা উধাও হয়ে গেল, কাজেই বাধ্য হয়ে সে-চিঠি পড়তে হল তা'কেই।

আগুন জ্বালালে আগুনই জ্বলে—এ নীতি চির প্রসিদ্ধ। কাজেই উচ্ছ্বসিত চিঠির উত্তরে উচ্ছ্বসিত ভাষাতেই চিরদিন চিঠি আসে। যৌবনের যতগুলি উপসর্গ সবগুলিই শিপ্রার স্বামীর চিঠিতে মূর্ত্তিমান্ হয়ে এসেছে—অবুঝ প্রেমের ভরা জোয়ারে লেখা চিঠিখানি।

সুজাতাকেই আবার এ চিঠির উত্তর লিখে দিতে হল। না দিয়ে উপায়-ই বা কি? শিপ্রাকে কি বল্‌বে সে? কেন চিঠি লিখে দেবে না, এর উত্তরে তার কী বলবার আছে? তার আদরিণী অনুজার জন্য প্রাণ দিতেও সুজাতা কুণ্ঠিতা নয় আর তার সামান্য একটি চিঠি লিখে দিতেও তার এত কৃপণতা?

তার স্বামী দেবতা ছিলেন। তিনি ত সুজাতাকে জানতেন। তাঁর কাছে সুজাতা জীবনে অবিশ্বাসিনী হবে না, কিন্তু তাই বলে শিপ্রার এই আব্‌দারটুকু রাখতে ক্ষতি কি? আর ক'দিনই বা? দিনকয়েক পরেই শিপ্রা চলে যাবে পতিগৃহে, বার বার ত' আর তার জন্য চিঠি লিখে দিতে হবে না।

সুজাতা চিঠি লিখে দিয়ে শিপ্রাকে বললে নকল করে পাঠিয়ে দিতে; মৃদু হেসে শিপ্রা চিঠিখানি তুলে নিলে। সুজাতা জানে শিপ্রা আগের চিঠিখানি নকল করে পাঠিয়েছিল—এইটিও পাঠাবে। অলক্ষ্যে নিয়তির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে।

এমনি করেই শিপ্রার স্বামীর চিঠি আসে; সুজাতা পড়ে, জবাব লিখে দেয়। শিপ্রা সেইটিই পাঠিয়ে দিয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে—সুজাতা ভাবে শিপ্রা নিজের হাতে নকল করে প্রেমলিপি লিখেছে।

দিনের পর দিন এমনই করে কেটে যায়। শিপ্রার স্বামীর চিঠিগুলি জড়ো হয় সুজাতারই কাছে। সুজাতা শিপ্রার হয়ে চিঠি লিখে দেয়, তার স্বামীর চিঠি নিয়ে তার সঙ্গে পরিহাস করে, দুই সহোদরায় শুধু তারই আলোচনা হয়।

শিপ্রার মনে মনে যে কথা গুঞ্জরণ তোলে, তার রেশ যেন সুজাতারও প্রাণে এসে লাগে, শিপ্রার বুকের প্রেমের হিল্লোল যেন সুজাতারও বুকে দোলা দিয়ে যায়। শিপ্রার স্বামীর কথা দুই জনেই ভাবে, তার চিঠি দুই জনেই পড়ে, তার মূর্ত্তি দুই জনারই মনে জাগে।

সময়ে সময়ে সুজাতার মনে হয়, হয় ত ঠিক হচ্ছে না—তার আদর্শের বিচ্যুতি হচ্ছে; মনের মন্দিরে তার স্বামীর আসন আর বোধ হয় অক্ষুণ্ণ থাকছে না। কিন্তু তখনই মনকে সে প্রবোধ দেয়, আর ক' দিন? দু'দিন পরেই ত শিপ্রা চলে যাবে।

শিপ্রার বিয়ের পর অনেকদিন কেটে গেল। শিপ্রার স্বামী এবার তাকে নিয়ে যেতে চান। তিনি এসে বেশী দিন থাকতে পারবেন না, যেদিন আসবেন সেদিনই ফিরে যাবেন শিপ্রাকে নিয়ে।

আজ শিপ্রার স্বামী এসেছে। শিপ্রার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, চোখে আসন্ন বিদায়ের অশ্রু। সুজাতা চিরদিনই মৌনী; তার মৌনতা যেন আজ আরও গভীর, তার মূর্ত্তি আজ উদাসিনী। আদরিণী শিপ্রা আজ চলে যাবে; তার চোখের জ্যোতি, জীবনের সঙ্গিনী, প্রাণ প্রিয়তমা শিপ্রা।

বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে এল। চোখের জলে অভিষিক্তা করে সুজাতা শিপ্রাকে গাড়ীতে তুলে দিলে। তারপর

দুয়ার ধরেই দাঁড়িয়ে থাকল চোখের জলে ঝাপ্সা হয়ে।

ট্রেনে উঠে শিপ্রা চোখের জল মুছে ফেললে। সুজাতার কথা মনে করে তার চোখের পাতা ভিজে উঠছিল বার বার, কিন্তু জোর করে সে চাপা দিতে লাগল তার চোখের জলকে।

শিপ্রাকে কাছে টেনে নিয়ে তার স্বামী মৃদু হেসে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে দেখাতেই শিপ্রার ঠোঁটেও হাসি ফুটে উঠল। কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে সে বললে, "ও আমার লেখা নয়, দিদির চিঠি।"

স্বামীর মুখে বিস্ময়ের ছায়া ফুটে উঠতেই তরুণী শিপ্রা মোহিনী হাসি হেসে ব্যাখ্যা করে বললে নিজের চতুরালির ইতিহাসটুকু। তার কথা শেষ হতেই আবার তার চোখের পাতা ভিজে উঠল সুজাতার কথা মনে করে; জানালার বাইরে চেয়ে সে চোখ মুছবার চেষ্টায় ব্রতী হল—তার স্বামীর মুখের ওপর কিসের ছায়া ধীরে ধীরে নেমে এল, নবোঢ়া শিপ্রার তা' চোখেই পড়ল না।

বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

কবির মৃত্যু

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

জীবনে যাদের পেলি না রে কবি
ভাব ও ভাষার চরণে,
যারা পড়ে নাই কভু ধরা ভাই
তুলিকা-রেখার বরণে,
যে-তরণী তোর কূল হ'তে কূলে
ঘুরিল কেবলি পথ ভুলে ভুলে
সে তরণী তোর ভিড়িবে এবার
অভিনব অবতরণে।
জীবন-সীমায় পেলি না যাদের
পাবি তাহাদের মরণে॥

নয়নের জল ঝরালি অনেক
ক্ষণেকের গান গাহিয়া।
ফুল ফোটে আর ফুল ঝ'রে যায়
মিছে র'লি পথ চাহিয়া;
যে-গানটি হায় রাতের আঁধারে
হারায়েছে আর ফিরে এল' না রে,
যে-কবিতা কবে মুকুলে ঝ'রেছে
নিশীথ-শিশিরে নাহিয়া,
কান পেতে শোন্—তারা এল' তোর
মরণের পথ বাহিয়া॥

সারা জীবনের সরণিতে তোর
একটানা হ'লো যাওয়া।
সাম্‌নে পিছনে কেঁপেছিল তোর
পাওয়া-হারাণোর হাওয়া!
পথ-পাশে রহি বনমৃগী কোন্
হয়ত' ক'রেছে তোরে আনমন্,
নীলিমার দূর সীমানায় কার
সুনীল চোখের চাওয়া,
ইসারায় দিল শুনায়ে কী সুরে
তোরি গানগুলি গাওয়া॥

এম্‌নি গেল রে কতখানি পথ
সাগর-দোলায় দুলিয়া।
কত চকিতার চাহনির তীরে
গেলি ওরে পথ ভুলিয়া!
কোথা বাতায়নে কোন্ কালো আঁখি
কবে চেয়েছিল কী মিনতি মাখি,
বকুল বনে কে একা আন্‌মনে
তোরি লাগি ছিল দাঁড়ায়ে!
সে কোন্ কিশোরী আধ' আলো-ছায়ে
অধর দিয়েছে বাড়ায়ে॥

ওরে ভোলা তোর ছন্দের দোলে
তারা দুলেছিল ক্ষণিকা!
কেউ ফেলে গেল সোণার কাঁকণ
কেউ বক্ষের মণিকা!
কেউ ফেলে গেল নয়নের জল
কেউ বা কবরী-খসা শতদল,
যতদূর চাই—নাই ওরে নাই
তাদের চিহ্ন কণিকা!
আধ আলো-ছায়া-গহন মায়ায়
তারা এসেছিল ক্ষণিকা॥

ওরে পথ-ভোলা পেলি ত' কতই
হারালি ও কত ছন্দ,
মিটিয়া গিয়াছে নীরবে সকল
ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব!
পুরাণো গানের সুখে ভুল ক'রে
মিছে দুটো চোখ জলে দিলি ভ'রে,
সাম্‌নে উদার আঁধারে শোন্ কে—
শোন্ তারি মৃদু স্পন্দ!
দখিনায় ওরে ভাসিয়া এসেছে
তারি অঙ্গের গন্ধ॥

সব বিদায়ের সন্ধ্যা-লগনে
তোর আঙিনার প্রান্তে,
শেষের নবীনা এল' কোন্ পথে
পারিলি না হায় জান্‌তে!
উদাস নয়নে দাঁড়ায়ে দুয়ারে—
কোন্ গান বল্ শুনাবি উহারে!
কোন্ সুরে বল্ নয়নের জলে
যাইবি বরিয়া আন্‌তে!
শেষের নবীনা—মরণ-বধু যে
এল' আঙিনার প্রান্তে॥

গান যদি তোর না আসে আজিকে
বীণা চায় সুর ভুল্‌তে,
চরণ যদি না চলে, তবে থাক্—
হবে নাক' ফুল তুল্‌তে!
বরণ-মালায় কাজ নাই কবি,
কবিতা সে থাক্—ও তো কথা সবি,
আজ কথা নয়—শুধু চেয়ে থাকা
নয়নে নয়ন ঢুলায়ে,
অনাগতা আজ এসেছে দুয়ারে
উদাস আঁচল দুলায়ে॥

পল্লীকবির বিরহ-বর্ণনা

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত

পল্লীর গীতি-কবিতা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা অনেককাল হইতেই হইতেছে এবং সুধী সমাজেও পল্লীকবির রচিত ছড়া, পাঁচালী, টপ্পা ইত্যাদি যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছে। যে সব পল্লীকবি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সরল পল্লী জীবনকে আনন্দোজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত সাধারণ বৈষ্ণব। পল্লীর নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত পার্ব্বণ, বিবাহোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত অসাধারণ উৎসব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই স্বভাবপ্রণোদিত সঙ্গীতের ধারা একই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। এই সহজ, ভাবগভীর সঙ্গীতের মাধুরিমা আছে বলিয়াই বোধ হয় বঙ্গীয় পল্লীজীবন এখনও নিতান্ত নিরানন্দ হইয়া উঠে নাই। পল্লীবধূরা সাধারণ পূজাপার্ব্বণে যে প্রকারে একত্র সমবেত হইয়া পূজাবাটীকাকে গীতস্বরে আনন্দ মুখরিত করিয়া তোলে, তাহাতে আমাদের দেশে যে এখনও প্রাণের প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটে নাই, ইহার সম্যক ধারণা হয়। পল্লীর গীতি-কবিতা বলিলে কেবল বৈষ্ণব রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কতকগুলি প্রেমসঙ্গীত বুঝিলে হয়ত তাহার অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। যদিও গীতিকবিতার অধিকাংশই রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকে কেন্দ্রীভূত করিয়াই রচিত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানে যে সব সঙ্গীত গীত বা পঠিত হয়, তাহাতে হিন্দুর অন্যান্য বহু দেবতার ও মাহাত্ম্যের আভাস দেওয়া থাকে। বিবাহাদি অনুষ্ঠানোপলক্ষে গীত সঙ্গীত সাধারণতঃ হরপার্ব্বতীর বিবাহকে আশ্রয় করিয়াই রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনসার ভাসান, গাঁজন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে গীত সঙ্গীতও রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেম-বর্জ্জিত।

পল্লীকবির রচিত অনেক কাব্যও ইতিমধ্যে বিদ্বজ্জন মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে ও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। আখ্যান বস্তু কোথাও বা পৌরাণিক, কোথাও বা আংশিক মৌলিক হইলেও কবি তাঁহার বর্ণনায় ভাব ও বর্ণনার কুশলতা দেখাইয়া আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। পল্লীকবি তাঁহার পরিকল্পনাকে প্রায়ক্ষেত্রেই মিলনান্ত করিয়া দেখাইলেও বর্ণনার মধ্যস্থলে নায়ক নায়িকার বিরহকে এত উজ্জ্বল ও আবেগময় করিয়া তোলেন যে আমরা তাঁহার বর্ণনাচাতুর্য্যে মুগ্ধ ও আবিষ্ট হইয়া যাই। বস্তুতঃ পক্ষে, এই বিরহ-বর্ণনাকৌশল পল্লীকবির একটি বিশিষ্ট ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। রাধা, লীলা ইত্যাদির বারোমাসী বিরহ বিবৃতিতে সম্পূর্ণ সরল ও সহজবোধ্য হইলেও ভাবৈশ্বর্য্যে ইহাদিগকে কোন আধুনিক রচনা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না বলিয়াই আমার মনে হয়। বিরহ-বর্ণনায় সমস্ত পল্লীকবিই যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন এবং এই প্রবন্ধে আমি একজন পল্লীকবির বিরহ ও বসন্ত বর্ণনার কুশলতার পরিচয়ই প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের দেশে অতি পুরাকাল হইতেই 'কবিগান' বলিয়া একপ্রকার গানের প্রচলন আছে। এই গান 'যাত্রা', 'ঢক' 'টপ্পা' ইত্যাদিরই মত জনসাধারণের সমাদর লাভ করিয়া থাকে এবং পল্লীর ইতর বিশেষ সকলেই অতি নিঃসঙ্কোচে ইহাতে যোগদান করিয়া থাকে। যাঁহারা এই গান কদাপি শুনেন নাই, তাঁহাদের নিকট ইহার মাধুর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া একটু কষ্টকর এবং গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এই গানে যে রকম নির্দ্দোষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে তাহাও বর্ণনাতীত। এই কবিগান একটু বিশিষ্ট ধরণের। সাধারণতঃ বিভিন্ন দলে আড়া আড়ি করিয়া এই গান গীত হয় এবং প্রত্যেক দলেই একজন করিয়া কবি থাকেন;—ইঁহাকে সাধারণ ভাষায় 'কবির সরকার' বলা হয়। উক্ত কবিই সমস্ত গান রচনা করিয়া দেন এবং তাহাই সর্ব্ব-সমক্ষে গীত হয়। দুই দলের বিভিন্ন কবিতে সাধারণতঃ

একটি প্রশ্ন লইয়া তর্ক উপস্থিত হয় এবং প্রশ্ন যে প্রকার কবিতায় প্রস্তাবিত হয়, তর্ক ও মীমাংসা উভয়ই সেইপ্রকার কবিতায় শেষ করিতে হয়। এই কবিগান উপলক্ষে যে সকল গীত রচিত হয়, তাহার একটু সাধারণ পরিচয় দেওয়া দরকার। এই সকল গানের কয়েকটি সুরবিভাগ আছে,—যথা:—ধুয়া, ডাইনা, খাদ, টানমিল, চিতান, ছড়া, অন্তরা ও পরচিতান। এই বিভাগানুযায়ী সুরেরও যথেষ্ট বৈষম্য হয় এবং এই স্বরবৈষম্যই কবিগানের একটি শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কবিগান সম্বন্ধে এইটুকু লিখিতে হইল কারণ, বর্ত্তমান কবির রচনাগুলি মূলতঃ কবিগান এবং তাহা বুঝিতে হইলে কবিগান সম্বন্ধে এই সাধারণ পরিচয়টুকু আবশ্যক।

বর্ত্তমান কবির অন্যান্য বহুবিধ রচনা হইতে গোটাকয়েক বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপযোগী স্থানে এই স্থলে প্রদত্ত হইল এবং কবির রচনা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করার পূর্ব্বে কবির একটু জন্ম পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। এই পল্লীকবি পূর্ব্ববঙ্গের একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা,—ইঁহার নাম শ্রীহরিচরণ আচার্য্য এবং সাধারণে ইনি কবি হরি আচার্য্য নামেই বিখ্যাত। তিনি ঢাকার জেলায় নরসিংহদী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাত্ত্বিক বৈষ্ণব। তাঁহার জন্মগ্রামে নিজবাসবাটীতে তদীয় ইষ্টদেব শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় অতি সমারোহে প্রত্যহ ভোগারতি হইয়া থাকে। কবিবর তাঁহার আতিথেয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং বর্ত্তমানেও তিনি ব্যবসা ব্যপদেশে পূর্ব্ববাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে স্বকীয় দলসহ কবিগান করিয়া প্রচুর যশ ও ধন উপার্জ্জন করেন। তাঁহার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রচনা পূর্ব্ব বাঙ্গালার জনসাধারণে এত সমধিক প্রচলিত যে তাঁহার রচিত গান লোকমুখে হাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই শুনা যায়। এতন্নিম্নলিখিত গানগুলি ত্রিপুরা জেলার মৈনপুর নামক গ্রামের এক পল্লী গায়কের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

কবির রচিত বিরহাত্মক সঙ্গীতগুলি এত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে লিপিবদ্ধ যে তৎসম্বন্ধে কোনও প্রকার টীকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। রচনায় ভাব ও ভাষার ঐশ্বর্য্য সমধিক এবং আমার মনে হয় কাব্য সৃষ্টির দিক্ হইতে সুধীসমাজ নিম্নলিখিত রচনাগুলিকে কখনই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবেন না। সঙ্গীতগুলি এই:—

(১)

হেমন্ত শীতান্ত হ'ল, সুখ বসন্ত হ'ল সুখময়।
হ'ল বিরহিণীর কালক্রমে, প্রথমে সম্ভ্রমেতে,
শ্যামের শ্রীধামে উদয়॥
শুক শিখি আর কোকিল ভৃঙ্গ, ঋতুপতির অন্তরঙ্গ,
সঙ্গে রঙ্গে মলয় পবন।
বৃন্দাবন, দ্বাদশবন, ভ্রমে বন উপবন;
পঞ্চবানের পঞ্চবানে, আঘাত পেয়ে পঞ্চপ্রাণে,
পঞ্চত্বকাল ভেবে মনে, ধরাসনে প্যারী অচেতন॥

(টান) নিরাশ্রিতা বিরহিণী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে,
ক্ষণেক পরে চেতন হ'য়ে সখির কাছে বলে রাই।

(ধুয়া) এল বসন্ত, ঐ জীবনের শেষ বসন্ত, আর বসন্ত
পাই কি না পাই॥

(ডাইনা) বাসন্তীফুল যত্নে তুলে গাঁথ সবে ফুলহার,
সুযত্নে মিশায়ে তারে সাধ বসন্তবাহার।
অবলা বধের হেতু এসেছে ঋতুকান্তে,
প্রতিদিন অতি কষ্ট দিতেছে রতিকান্তে।
আয়গো সবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, প্রাণকান্তে
আন্‌তে যাই।

(ধুয়া) এল বসন্ত, এ জীবনের শেষ বসন্ত, আর বসন্ত
পাই কি না পাই।

(খাদ) বুকে জ্বলে দুঃখের অনল কি দিয়ে নিভাই।
বসন্তে আনন্দ পেয়ে, বনের পাখী যুগল হয়ে,
বনে বনে পুরায় মনস্কাম;
বন্ধু বই, কারে কই, আমার যে বিষাদ,
আসবে বলে আশা দিয়ে, দ্বারকায় রহিল গিয়ে,
আমি আশাপথ আছি চেয়ে কারো কাছে
শুনিনা সংবাদ।

(টান) সুযাত্রা করিয়া চল প্রাণকান্ত হেথা,
মনের ব্যথা, প্রাণের কথা, বল্‌ব প্রাণ-
বল্লভের ঠাঁই।
(ধুয়া) এল বসন্ত·········ইত্যাদি।
(অন্তরা) আমার হৃদয় জ্বলে বন্ধুর লাগিয়া গো, সজনি,
জীবন যায় না গো রাখা।
আমার, অবিরত হৃদে জ্বলে দুঃখের অগ্নিশিখা,(গো)॥
সখিগো, অই চাঁদ মুখে মনে পড়ে, সদায়
আমার মন পুড়ে,
একবার এনে দেখাও তারে, দেখি চোখের দেখা॥
আমি পাখী হ'য়ে উড়ে যেতাম বিধি দিলে
পাখা॥ (গো)
(পরচিতান) বৃন্দাবন, শুধুবন, গোপীর জীবন বিহনে।
ঐ দেখ, কালক্রমে, জলে স্থলে, প্রলয়কালের
অনল জ্বলে, মলয় পবনে॥

২

বন্ধু একবার চল দেশে, বসন্ত-বাঘ বনে এসে
ঘটাইল দায়।
(ডাইনা) সাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে, হাটে, সর্ব্বক্ষণ,
তরুণী হরিণী-রাধায় করে অন্বেষণ,
দেখে লাগে বাঘা হুলি, ধৈর্য্যবন্দুক করে তুলি,
ছাড়্‌লে কৃষ্ণনামের গুলি, লাগেনা সেই বাঘের
গায়॥
(খাদ) হায় কি করি, ভেবে মরি, ভয়ে প্রাণ যায়।
আর কি বন্ধু সেই দিন আছে, আমার দিন
বাঘে খেয়েছে,
বাঘ এসেছে হ'ল না বিশ্বাস, হিতবাস, বল্লে কি
পীতবাস,
অনুরাগে তনু ঢেলে, নবরসে আছে ভুলে,
ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেলে, তাই বলে, কে করে
হায় হুতাশ।
(টান মিল) ব্রজ গোপীর এ দুর্দ্দশা এই নিরানন্দে, কেঁদে
গিয়ে দূতীবৃন্দে, গোবিন্দে কয় মথুরায়।

(চিতান) শীত অন্তে বসন্ত ঋতু, শ্রীধামে উদয়।
কান্তবিনে, এ দুর্দ্দিনে, দিনে দিনে বিরহিণীর ভয়।
(ছড়া) রঙ্গহীনা রাইরঙ্গিনী, সঙ্গে নিয়ে সব সঙ্গিনী,
বলে আয়গো অরণ্যে বেড়াই।
শিশিরের শিরে রাজছত্র নাই,
গিয়ে দেখি বকুলতলে, ঋতুরাজ বসন্ত খেলে,
বাঘ এল, বাঘ এল, বলে, ধরাতলে ঢলে পৈল রাই।
(মিল্) ব্রজগোপীর এ দুর্দ্দশা এই নিরানন্দে, কেঁদে গিয়ে
দূতীবৃন্দে, গোবিন্দে কয় মথুরায়।
(অন্তরা) হায় হায় বলে কালবসন্ত বাঘ এসেছে অরণ্য ভিতর।
বাঘের হিংসা ক্রোধ গৌরব দম্ভ চলন ভয়ঙ্কর।
বন্ধুহে, কোকিলের স্বর, ভ্রমরের স্বর, বৌ কথা
কও ঐ পাখীর স্বর,
শুক শিখির স্বর, চাতকের স্বর, অতি তীক্ষ্ণ স্বর।
সেই সব স্বর হইয়াছে বাঘের পায়ে নখর-নিকর।
(পরচিতান) মনে হৈলে বাঘের কথা প্রাণে লাগে ভয়।
পিরিতির এই রীতি, রীতি-নীতি নাই আর তেমন॥
(ছড়া) দুই নেত্র তার ফাগুন চৈত্র, গাত্রের লোম সব বৃক্ষপত্র,
দৃষ্টিমাত্র ভীত হই প্রাণে,
এই বাঘের আগে বাঁচি কিসে, কাল হৈল তার নবযৌবন,
লেজ হইয়াছে মলয় পবন।
বৃন্দাবনের বন উপবন, তেজে নড়ে লেজের বাতাসে।
(ধুয়া) ব্রজগোপীর এই দুর্দ্দশা······ ইত্যাদি

এই গীতি-কবিতাগুলি ভাব ও ভাষায় অত্যন্তই সুসমৃদ্ধ এবং আমার মনে হয়, অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদিগের রচনার ন্যায় এইগুলিও উচ্চাসন পাইবার যোগ্য। তবে তাহারা সেই রকম স্থানে দাবী করিতে পারে কি না ইহা সুধীগণের বিচার্য্য।*

শ্রীমতিলাল সেনগুপ্ত

* এই স্থানে বলা আবশ্যক যে গীতিকবিতাগুলি প্রকাশ করা উপলক্ষে আমি সুযোগ ও সময়ের অভাবে কবির মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। লেখক

যুগের হাওয়া

ডাক্তার কার্ত্তিক শীল

শীতের বিবশ মধ্যাহ্ন! প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকার সুসজ্জিত একখানি কক্ষে দুই বন্ধুতে বিষম তর্ক চলিতেছিল। নূতন ধরণের মোটা নীল কাঁচের ছোট টিপয়-এর উপর দুই বাটী গরম চা সরবৎ-এ পরিণত হইতে চলিয়াছে—সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। হস্তস্থিত পুস্তকখানিতে মৃদু একটি চপেটাঘাত করিয়া প্রণবকুমার বলিল, তুমি যতোই 'সাপোর্ট' করো অতনু, আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গে একমত হতে পারবো না। তুমি বলো কি? এসব কি আর সুলক্ষণ?

মৃদু হাসিয়া অতনু কহিল, অলক্ষণই বা কিসের দেখলে প্রণব? মেয়েদের একটু 'মোরাল্ কারেজ্' থাকে—তারা একটু 'ফরওয়ার্ড' হয় তুমি কি এটা পছন্দ করো না? তোমার ইচ্ছে কি?—তারা কুণো বেড়ালটির মত কিছুতেই কোণ ছাড়া হবে না?—

বাধা দিয়া প্রণব কহিল, 'নট্ একজ্যাক্টলি দ্যাট্'। আমি বলছিনে তারা বেড়ালটির মত কোণ ঘেঁসা হয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করুক্। আমি চাই, তাদের 'কারেজ্'টুকু একটা গণ্ডীবদ্ধ থাকে অর্থাৎ আমি চাই 'লিমিটেড্ প্রগ্রেস্'—'আন্লিমিটেড্' নয়! আর একটু পরিষ্কার করে বলি, আজকাল নতুন সভ্যতার দোহাই দিয়ে তারা যে পাশের লোককে ধাক্কা মেরে চলে যাবে—উপযাচিকা হয়ে পরের তর্কের মীমাংসা করতে যাবে, এটা আমি পছন্দ করিনে।

একটি পেয়ালা তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া মৃদু হাস্যে অতনু কহিল, হঠাৎ এ-রকম 'রিভোল্ট' করবার কারণ কি প্রণব? রুবিকে ত খুব পর্দ্দানশীন্ রেখেচ, তোমার ত আর সে-ভাবনা নাই! তবে অতো মাথা গরম করচ কেন? চা যে ওদিকে জল হয়ে গেল, সে-খেয়াল আছে?

খেয়াল আমার সবই আছে, বলিয়া বাটীর দিকে দক্ষিণ হস্তখানি অগ্রসর করিয়া প্রণব কহিল, তুমিই বলো না, আমি যা বলেছি ঠিক কি না? আজ 'লাকিলি' ঐ 'বাস্' খানাতে 'আমরা না থাকলে মেয়ে দুটীর কি অবস্থা হোত বলো দিকি'! সঙ্গে নিয়েছে একটা 'চ্যাংড়া' সেদিনকার ছোঁড়া—গালে ঠুঁসে একটি চড়্ কসালেই জিভ বেরিয়ে পড়ে। ওসব কিছু নয় অতনু, আমি দেখচি, আজকাল এটা একটা 'ফ্যাসান্' হ'য়ে দাঁড়িয়েচে—আজকাল এই হাওয়াটাই প্রবল ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।

অতনু কহিল, তুমি কিন্তু মাঝ থেকে খুব 'কারেজ্' দেখিয়ে দিয়েচ। আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছি, 'বাস্' শুদ্ধ লোকের আগ্রহদৃষ্টি তোমার ওপর।

বাধা দিয়া প্রণব বলিয়া উঠিল, না, না 'কারেজ্' ডিস্কা-রেজে'র কথা নয়; তুমি বলো দিকি যার শরীরে একবিন্দু তাজা রক্ত আছে, সেকি ঐরকম অপমান নীরবে সহ্য করিতে পারে? 'বাসে' উঠে অবধি আমি কাবুলিটার দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করেছিলাম। মুখে কিছু প্রকাশ না করে নীরবে তার হাবভাব নজর করে যাচ্ছিলাম। দেখলেম, মাত্রা ক্রমান্বয়ে গণ্ডী ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

ঈষৎ হাসিয়া অতনু কহিল, তোমার হাতুড়ি পেটা কেটো হাতের বিরাশি সিক্কা ওজনের আকস্মিক চড়্ খেয়ে বেচারা কিন্তু হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখলে, পর-মুহূর্ত্তে কিরকম নিজেকে প্রস্তুত করে নিল? ও-ত মাত্র একা? কিরকম জোর' গলায় নিজের হয়ে 'প্লীড্' করল? আর 'বাস্'-ভর্ত্তিবাঙ্গালী, তাদের কাছ থেকে কি রকম 'সাপোর্ট' পেলে বলো দিকি? তুমি যদি নিজে না অগ্রসর হতে, আমার মনে হয় কেউ-ই ও-দিকে ভ্রূক্ষেপ করত না।

তবু ত আজকাল অনেকটা 'ইম্প্রুভ্‌ড'—আগে দেখেছি, পাছে দোষীর, বিপক্ষে সাক্ষীটাক্ষী দিতে হয় কিম্বা প্রতি-কারীকে সমর্থন করতে হয়, সেই ভয়ে অনেকে 'কাজ নেই বাবা গোলমালে গিয়ে' বলে ধীরে ধীরে পৈতৃকদত্ত প্রাণ নিয়ে স'রে পড়েছেন।

হাসিয়া প্রণব কহিল, সে যা বলেছ ঠিক। কিন্তু ঐ-সঙ্গে দেখলুম সেই ছেলেটীর 'স্পিরিট্'—বয়স অল্প হলে কি হয়?—যেন একটা আগুনের ফুল্‌কি!—কাবুলিটার হাত ধরে কি রকম টেনে বসিয়ে দিলে? আমি তার এ্যাড্রেস্ টুকে রেখেছি, অবসর মত একবার দেখা করবার ইচ্ছা আছে।

—সে সুবিধে মত করে নিলেই চলবে। আজ 'ইভিনিং'-এ কিন্তু কুইন্স কার্নিভ্যালের জন্যে 'এড্‌ভান্স টিকিট বুক' করা আছে যেন মনে থাকে। নেলি ত যাবেই, আরো দু চার জন—। তুমি কি আবার বাসার দিকে যাবে নাকি? বেলা-ও ত দেখচি তিনটা বাজে। গড়িয়াহাটা যেতে আসতেই ত সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবে। তার চাইতে বরং এখানেই কাপড় চোপড় ছেড়ে—

বাধা দিয়া প্রণব কহিল, নাহে আজ আর শরীর বইচে না—সেই কখন বেরিয়েচি জান ত? বাড়ীতেই বা ভাববে কি?

হাসিয়া অতনু বলিল, সেই কথাই বলো, মন কেমন করছে। তা করবারই কথা।

বিদ্রূপ করিয়া প্রণব কহিল, 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' আর কি! তুমি খালি ঐ ভাবেই সকলকে দেখ। তুমি আমার কথা জাননা অতনু, আজকালকার নারী-জগতের আবহাওয়া দেখে ঐ স্ত্রী-জাতটার ওপর আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে—কি ঘরে, কি বাইরে।—

কক্ষখানির পশ্চাৎদিকে অন্দরে যাইবার একটী দরজা। বিলাতী জালের ঝালর দেওয়া বাহারি পরদা ঝুলিতেছে। হঠাৎ পরদা ঠেলিয়া সম্পূর্ণ আধুনিক সাজে সজ্জিতা হইয়া একটী তরুণী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কিসে বিতৃষ্ণা হচ্ছে ঠাকুরপো? ঘরে বাইরে কি হোল তোমার? ······পরণে তাঁহার ফিকে গোলাপী রং-এর সিল্কের শাড়ী, তাহারই সহিত মিল করিয়া ব্লাউস, পায়ে টক্‌টকে লাল ভেলভেট মোড়া জড়ি বাঁধান মাদ্রাজি স্লিপার। হঠাৎ প্রণবের হাতের উপরে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, 'বাইজোভ্'! এখনো তুমি চা খাচ্ছ? সেই কখন দিয়ে গেছি! ও-যে পাঁচনে পরিণত হয়েচে। এতক্ষণ হচ্ছিল কি? ঘড়িটার দিকে নজর আছে? তিনটে বাজতে দুমিনিট বাকী।···আমি মঞ্জু আর শেফালির ওখান থেকে টপ্ করে একবার ঘুরে আসচি।

হঠাৎ অতনুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'সোফার'কে ক'টায় আস্‌তে বলেচ? তুমি-ও ত যাবে? না আমি একলাই—?

পাঠককে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, এই তরুণীটি আমাদের অতনুর আলোকপ্রাপ্তা সহধর্ম্মিণী নলিনী—অল্প পূর্ব্বে উক্ত নেলি। নলিনী নামটী সাবেক ধরণের তাই বিলাতী ছাঁচের 'নেলি' নামটিই তিনি বেশী পছন্দ করেন এবং প্রণবের স্ত্রী করবীর নামটি রূপান্তরিত করিয়া তিনি 'রুবিতে' পরিণত করিয়াছেন। ······মাসিক পাঁচশত টাকার উপর জমিদারীর আয় এবং বেশ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকিলেও পত্নীর হিসাবহীন ব্যয়ের জন্য অতনুকে সময় সময় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতে হয়। প্রতি বৎসর নূতন মডেলের গাড়ী কিনিবার তাঁর একটা বাতিক্ ছিল। এতখানি জিদের সহিত তিনি তাঁহার পাওনাগুলি উশুল করিতেন, যাহাতে অতনুর আপত্তি করিবার পর্য্যন্ত অবসর মিলিত না। নলিনীর পিতা রামমোহন বড় লোক না হইলে-ও, সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা অনেকটা উচ্চস্তরের। তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহাদের পুস্তকের ব্যবসা ছিল। বাৎসরিক একটা মোটা অঙ্ক ইহা হইতে লাভ হইত। পিতার পুস্তকের দোকানের নূতন নূতন গ্রন্থরাজি নলিনীর মস্তিষ্কে আধুনিক সভ্যতার রেখাপাত করিতে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল।

অতনু কহিল, নাঃ, আমি আর যাব না, তুমিই যাও। ড্রাইভার তিনটেয় আসবে, বলে দিয়েচি। আমি একটু প্রণবের সঙ্গে আলাপ করি।

মৃদু হাসিয়া নলিনী বলিলেন, 'সোফার' না আসা পর্য্যন্ত আমিও না হয় একটু তোমাদের আলাপে যোগদান করি, কি বলো ঠাকুরপো? বলিয়া একটি সোফায় গিয়া ধপাস্

করিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন, হাঁ-হাঁ—তোমার কিসের বিতৃষ্ণা না কি-যেন বলছিলে ঠাকুরপো ?

নলিনীর এই অযাচিত যোগ দেওয়াটুকু কি জানি কেন প্রণব পছন্দ করিতে পারিল না। ঈষৎ বিকৃত সুরে বলিল, সে একটা কথা হচ্ছিল। সে আর—

দ্বার ঠেলিয়া 'সোফার' আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। বিদ্রূপের সুরে 'এতই প্রাইভেট্ নাকি ?' বলিয়া কৌচ ছাড়িয়া নলিনী উঠিয়া পড়িলেন। সোফারকে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নলিনী চলিয়া যাইলে প্রণব অতনুকেও কটূক্তি করিতে ছাড়িল না। তোমার এই জিনিষটাও আমি 'সাপোর্ট' করিনে অতনু। গৃহস্থালী কাজে 'লিবার্টি' পেতে পারে বলে যে পরপুরুষের সঙ্গে ঘরের বউকে ছেড়ে দেওয়া যায়, এটাও আমি অনুমোদন করিনে। তুমি হয়ত বলবে, সোফার তোমার খুব সৎ ও বিশ্বাসী এবং তার দ্বারা কোন অঘটন ঘটতে পারে না। কিন্তু তবুও আমি এ জিনিষটার পক্ষপাতী নই।

কথাটা হাল্কা করিবার উদ্দেশ্যে অতনু কহিল, গড়িয়া-হাটার মত খোলা জায়গায় বাস করেও তোমার হৃদয়টা উদার না হয়ে এমন 'কাট খোট্টা' গোছের হচ্ছে কেন প্রণব ? হাড়ে হাড়ে ইঞ্জিনিয়ারীর হাওয়া লেগেছে নাকি ? এমন খোলা মাঠ—চারদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগানের সারি—সে হিসেবেও অন্ততঃ মনটা একটু দরাজ হওয়া উচিত নয় কি ? তা নয়, খালি—

—তা ত' বল্‌বেই। কিন্তু তোমায় আমি বেশ সোজা ভাবেই বলে দিচ্ছি অতনু, ভবিষ্যতে এজন্য তোমায় দুঃখ করতে হবে।

বাধা দিয়া অতনু কহিল, 'লেট দি ম্যাটার ড্রপ হিয়ার !' তুমি চান্ টান্ করবে নাকি ? তাহলে 'রেডি' হয়ে নাও, আমরা ঠিক পাঁচটায় বেরোব কিন্তু !

পাঁচটা ছাড়া ছয়টা বাজিতে চলিল, এখনো নেলি ফিরিল না দেখিয়া অতনু অস্থির হইয়া উঠিল। রাস্তায় কোন 'এ্যাক্‌সিডেণ্ট' হোল নাকি ?—সে ত কখনো এরকম দেরী করে না !

প্রণব কোন কথা না বলিয়া গুম্ হইয়া বসিয়াছিল। কাবুলিওয়ালার সেই আচরণটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। নিবিষ্টচিত্তে সে সেই কথাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া অতনু বলিল, নেলির এত দেরী হচ্চে কেন বলো দিকি' ?

গম্ভীর কণ্ঠে প্রণব উত্তর দিল, বন্ধুরা বোধ হয় ধরে রেখেছে—হয়ত খাওয়া দাওয়া হচ্ছে ! তুমি ত বলো, তোমার 'ইনষ্ট্রাকসান্'ই আছে, যদি পথে কোন আপদ বিপদ ঘটে 'ফোন্' করবে, তবে আর ভাবনা কি ?

প্রণবের কথায় অতনু ঈষৎ আশ্বস্ত হইল,—হাঁ তা যা বলেছ। বোধ হয় তাই-ই হয়েচে। তাহলে, আমরা আর মিছিমিছি টিকিটগুলো নষ্ট করি কেন ? তার চাইতে চলো, একখানা ট্যাক্সি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়া যাক্।

ঈষৎ হাসিয়া প্রণব কহিল, তা কি আর হয় ? এ-ই ভেবে কাতর হচ্ছিলে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মত পাল্টে গেল ? আমরা বেরিয়ে পড়ব, আর নেলি যদি ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয় ?

অতনু বাধা দিল না। আরো কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। নেলি বা তাহার বন্ধু কাহারও ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। অগত্যা দুটি বন্ধুতে মিলিয়া বাটীর বাহির হইয়া পড়িল।

আরো কিছু সময় এদিক ওদিক পায়চারি করিয়া, গাড়ীর কোন চিহ্ন না দেখিয়া শেষে দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে ট্রামে গিয়া উঠিয়া বসিল।

অসংখ্য নরনারীর রঙ্গ এবং বিলাস ক্ষেত্র এই কার্নিভাল্ ! অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক আলোকছটায় বিভূষিত ! রকমারি রঙিন্ কাগজের মেখলা তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আরো অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। দলে দলে লোক আসিতেছে, যাইতেছে ! ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইহা এক অপূর্ব্ব স্থান ! চারিদিকেই 'ট্রাই ইওর লাক্'

রব। আলোক পিয়াসী পতঙ্গের মত দলে দলে লোক কিছু না কিছু উৎসর্গ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষার চরম উৎকর্ষ সাধন করিতেছে। কোথাও ম্যাজিক—কোথাও বায়স্কোপ—কোথাও বা 'বল্‌-ড্যান্স'। মোট কথা আমোদ প্রমোদের বিলাস ক্ষেত্র এই কার্নিভ্যাল!

প্রণব কহিল, এই জুয়ার আড্ডায় এসে কি লাভ হোল অতনু? তোমার খালি সব তাতেই উতলা হওয়া!

অতনু বলিল, না হে, এর 'ফায়ার ড্রাম্‌'টা একটা দেখবার জিনিষ। ঐ যে প্রকাণ্ড উঁচু সরু সিঁড়ি দেখচ, ঠিক আটটার সময় এটার সব-উঁচুতে উঠে একজন নীচে ঐ গর্ত্তের ভেতর আগুন জেলে লাফ খাবে। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ 'ফীট্‌'টা একটা 'ইউনিক্‌' জিনিষ, না দেখলে 'আইডিয়া' করতে পারবে না।

উভয়ে কথা বলিতে বলিতে 'ড্রামের' দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পার্শ্বের একটি গৃহে ম্যাজিক হইতেছিল। অতনু দ্বারের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ম্যাজিক্‌ সবে মাত্র শেষ হইয়াছে—জনতা আসন ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়াছে।

অতনুর একখানি হস্ত আকর্ষণ করিয়া প্রণব কহিল, কি করবে ঠিক করে ফে'লো। এরকম ভিড়ের মধ্যে আমার মোটে ভাল লাগছে না।—হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে সচকিত হইয়া সে বিসদৃশ ভাবে চমকিয়া উঠিল,—হ্যালো, এই যে ঠাকুরপো, তোমরা এসেচ দেখচি!—তিনটি ষোড়শী এবং একজন যুবক পরিবেষ্টিত নলিনী তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। যুবকটির হাতে নলিনীর হাত বাঁধা, ষোড়শী তিনটির মধ্যে একজন পার্শ্বে দুইজন পশ্চাতে।

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে এইরূপ ভাব করিয়া অতনু কহিল, এ্যাঁ! তোমরা এখানে এসে পড়েছ! আর আমি ভাবছিলেম এতবড় আমোদটার মিছিমিছি ফাঁক গেলে। সত্যি কিছু ভাল লাগছিল না।—

তাহাকে বাধা দিয়া নলিনী বলিয়া উঠিলেন, হা-হা, 'হোয়াট্‌ এ ননসেন্স!' আমিই না তোমাদের আনবার জন্যে সোফারকে পাঠিয়ে দিলাম!

—সোফার!—আশ্চর্য্যের সুরে অতনু কহিল, কৈ, সে ত যায়নি! আমি বরং তোমাদের দেরী দেখে কত ভাবছিলেম!

কেন, আমি ত সাতটায় গাড়ী ছেড়ে দিয়েছি! ভাবনার কী আছে? আমি ত আর একলা বেরোয়নি, সঙ্গে ত সোফার ছিল!…"রিয়েলি আ'য়াম্‌ সো সরী" বড্ড দেরী হয়ে গেল এই ভদ্রলোকটির জন্যে। হাঁ-হাঁ আপনাকে 'ইনট্রোডিউস্‌' করে দি' মিঃ রুদ্র, ইনি হচ্চেন মিঃ ঘোষ আর ইনিই মিঃ রায়।…আর ঠাকুরপো, ইনি হচ্চেন মিঃ এ রুদ্র আজই অষ্ট্রিয়া থেকে ফিরেছেন। বেশ ভাল ম্যাজিক শিখে এয়েচেন।—মঞ্জুর পিসতুতো ভাই। ওঁরই ত এক অষ্ট্রীয়ান্‌ ফ্রেণ্ড ম্যাজিক দেখাচ্ছিল! সাতটায় 'বিগিন্‌' করবার কথা তাই আর বাড়ী অবধি যেতে পারিনি।

মিঃ রায় অর্থাৎ অতনু দন্তোদ্ভাসিত মুখে দক্ষিণ হস্তখানি মিঃ রুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ্যাম্‌ সো গ্ল্যাড্‌ টু বি ইনট্রোডিউস্‌ট!"

ঈষৎ ঘাড় দুলাইয়া করমর্দ্দন করিয়া মিঃ রুদ্র বলিল, "সো গ্ল্যাড্‌ ফর্‌ দি কাইণ্ড রিসেপ্‌সান্‌!"

ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রণবের গা জ্বালা করিতে লাগিল। সে কাঠের মত শক্ত হইয়া একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

হুগলী জেলার জাহানাবাদে অতনুর ক্ষুদ্র জমিদারী। হঠাৎ একটি কার্য্যব্যপদেশে তাহার সেখানে কয়দিনের জন্য যাইবার প্রয়োজন হইল। অতনু স্ত্রীকে মোট ঘাট বাঁধিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য বলিল। নেলি বলিলেন, বাঃ, তা কি করে সম্ভব হবে? সামনের দুটো হপ্তা-ই আমি যে 'এক্সট্রীমলি বিজি' থাকব! আলোক রুদ্দুর ক'জায়গায় বায়না পেয়েচে, তা বুঝি জানো না? আমি চলে গেলে এ-সব 'কনট্রোল্‌' করবে কে? তাছাড়া ওখানে যা ম্যালেরিয়া! তুমি পুরুষ মানুষ, কষ্টে সৃষ্টে যা করে হোক্‌ 'ম্যানেজ্‌' করে নিতে পারবে, কিন্তু আমাদের—। হঠাৎ স্বামীর দিকে একটা হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, কি গো রাগ করচ নাকি? লক্ষ্মিটী, এবারটা তুমি একলা ঘুরে এসো—দেখবে, দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে যাবে। সত্যি, কিছু মনে কোর না!

অতনু কহিল, তা না হয় হোল, কিন্তু আমি ভাবচি তোমার কথা—তুমি একলা এত বড় বাড়ীতে থাকবে কি করে ?—ভয় করবে না ?

বিদ্রূপাত্মক একটা শব্দ করিয়া নেলি কহিলেন, 'ফুঃ, হোয়াট্ এ হাম্‌বাগ্' !—তুমি ত ভালই জান, ভূত ফুত আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।

ধীর কণ্ঠে অতনু কহিল, তা না হয় না-ই করো, কিন্তু অসুখ বিসুখ আপদ বিপদ ত হতে পারে ?

প্রায় দুই মিনিটকাল নলিনী চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ কিসের সন্ধান পাইয়াছেন এইরূপ ভাব করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঠাকুরপোকে বলে যাওনা, রুবিকে নিয়ে এ-ক'দিন সে এখানে কাটিয়ে যাক্! তাহলে ত তোমার ভাবনা মিটবে ?

প্রণবের কথা যে অতনুর মনে পড়ে নাই তাহা নহে। কিন্তু সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছে, 'কার্নিভ্যালে'র সে দিনের সেই ঘটনা হইতে প্রণব তাহার বাসায় আসা একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছে। কদাচিৎ যদি বা আসে, তা-ও খুব অল্প সময়ের জন্য। তাই তাহাকে এ-সম্বন্ধে অনুরোধ করিলে সে যদি প্রত্যাখ্যান করে অতনু সেই কথাই চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ স্ত্রীর প্রস্তাবে সচকিত হইয়া বলিল, সে কথাটা মন্দ নয়! দেখ, রুবিকে যদি রাজী করতে পারো! আমি প্রণবকে কিন্তু এ-সম্বন্ধে একটি কথা-ও বলবো না।

হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া নলিনী কহিলেন, কেন ? ঠাকুরপো টোলে দীক্ষা নিয়েচে বুঝি ? পরদারেষু আত্মবৎ ?—না না মাতৃবৎ বুঝি ? ওঃ—.

এমন সময়ে দ্বার খুলিয়া প্রণব হাসিয়া প্রবেশ করিল। —কি ব্যাপার ? এই শীতে র‍্যাগের তলায় না গিয়ে এরকম ভাবে মুখোমুখি হয়ে দুটিতে ?—রণসাজ নাকি ?… তাহাকে বাধা দিয়া অতনু আসিয়া তাহার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল, 'ইউ লিভ্ এ্যানাদার হাণ্ড্রেড্ ইয়ার্স্' প্রণব !—এই তোমার কথাই হচ্ছিল।

—আমার কথা! হঠাৎ এই অভাগাকে কি প্রয়োজন হোল ?

এইবার নলিনী উত্তর দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, তুমি ভুলেছ বলে বা তোমার প্রয়োজন না হলে কি, আমাদের-ও প্রয়োজন হতে পারে না, ঠাকুরপো ?

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া প্রণব কহিল, না-না তা বলিনি। তবে এই রকম সময়ে—।

অতনু সকল কথা খুলিয়া বলিল এবং নেলির ইচ্ছা-ও জ্ঞাপন করিতে ভুলিল না। প্রণব গম্ভীর হইয়া গেল। এ-প্রশ্নের কি মীমাংসা করিতে পারে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অতনুকে যথার্থই সে ভালবাসিত। বন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাহায্য করিতে একদিকে যেমন তাহাকে উৎসাহিত করিতেছিল, অন্যদিকে নেলির সভ্যজগতের আবহাওয়া চিন্তা করিয়া তেমনি তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সে বলিয়া উঠিল, এক কাজ করো না অতনু। আজ সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা—সেই যে হে 'বাসের' সেই ছেলেটি! নেলির-ই কার্ণিভ্যালের একটি বন্ধুর সঙ্গে 'মার্কেটে' না কোথায় যেন যাচ্ছে। মেয়েটি আমায় দেখেই চিনে ফেলেছে—নেলির কথা জিজ্ঞেস করল। একটা পরিচয় বেরিয়ে যেতেই ছেলেটি খুব খুসী হয়ে বলল, মেয়েটিকে সঙ্গে করে এক সময়ে এখানে এসে আলাপ করে যাবে। তাই বলছিলেম কি, তাকে যদি—।

ঈষৎ উষ্ণতার সুর টানিয়া নলিনী বলিয়া উঠিলেন, কেন, তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি ঠাকুরপো ? যদি থাকে বলে ফে'ল, শুনে রাখি।…তারপর হঠাৎ প্রণবের মুখের কাছে ঘাড় নাড়িয়া সুর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমি বাঘ নই যে গিলবো তোমায় গপ্ করে!'

নানাবিধ চিন্তা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রণবকে নলিনীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে হইল।

শীতের রাত্রি—চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন। সমস্ত পৃথিবী জড়তায় ম্লান হইয়া আছে। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নলিনীর অচিন্ত্যপূর্ব্ব আহ্বানে প্রণবের ঘুম ভাঙিয়া গেল।—ঠাকুরপো, ঘুমুচ্ছ নাকি ?…সে ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বেড্‌সুইচ্ টিপিয়া দিল। অদূরে নিদ্রিতা করবী বা রুবির নিদ্রা-ও টুটিয়া গেল।

প্রণব দ্বার খুলিয়া দিল। নেলি আসিয়া একখানি কৌচ অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িলেন,—ভয়ানক মাথা ধরেচে, কিছুতেই ছাড়চে না। অডিকলোন তিন শিশি শেষ হয়ে গেছে—স্মেলিং সল্ট-ও অনেক শুঁক্‌লাম, কিছুই হচ্চে না!

অধীর কণ্ঠে প্রণব জিজ্ঞাসা করিল, তা কি বলচ? ডাক্তারকে খবর দেব?...তুমি উঠে এই বিছানাতেই শুয়ে পড়ো; আর রুবি, তুমি একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। আমি ডাক্তারকে একটা—

তাহাকে বাধা দিয়া নলিনী বলিয়া উঠিলেন, না-না, ও-সব কিছু দরকার হবে না। তার চাইতে চলো 'ডেম্‌লার' খানা নিয়ে একটু মাঠের দিক থেকে ঘুরে আসা যাক্। হুড্‌টা ফেলে গেলেই হবে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণব বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল—বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল।

হঠাৎ সজোরে দুটি হাত দিয়া মাথাটা টিপিয়া ধরিয়া কর্কশ কণ্ঠে নলিনী বলিয়া উঠিলেন, অমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখচ' কি? যাবে কিনা তাই বলো?

প্রণব নির্ব্বাক! ঈষৎ সুস্থ হইয়া কণ্ঠে বল সঞ্চয় করিয়া বলিল, গাড়ী নিয়ে বেরোবে, তা, 'সোফার্' কোথায় এখন?

কষ্টসূচক একটা শব্দ করিতে করিতে নেলি কহিলেন, সোফারের দরকার হবে না, আমি-ই চালাতে পারবো। তুমি যাবে কিনা তাই বলো। বাবা রে বাবা! কৈফিয়ৎ দিতে দিতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল!

প্রণবের কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া গেল। অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল, এই শীতের রাতে—!

বিরক্তি ভরে নেলি উঠিবার উপক্রম করিলেন,—না যাও, না-ই যাবে—আমি একলাই যাচ্ছি!

গত্যন্তর না দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রণব আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, তাহলে রুবি তুমি-ও—

বাধা দিয়া নলিনী বলিয়া উঠিলেন, না, না ও আর শুধু শুধু ঠাণ্ডা লাগিয়ে কি করবে? তুই ঘুমো রুবি, আমরা যাব আর আসব। রামদীন্ নীচে রইল—ভয় নেই কিছু।...

কলিকাতায় বসন্তের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লতায়, পাতায়, গাছে চারিদিকেই নূতনত্বের আমেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামনেই 'ইষ্টারের' ছুটী—নলিনী অতনুকে ধরিয়া বসিলেন, যা গরম পড়ে গেছে, এখানে আর মোটে ভাল লাগেনা। সামনের 'কন্‌সেসন্‌টা' 'এ্যাভেল্' করতেই হবে—রাঁচি না হয় 'সী-সাইড্'।

পত্নীগত প্রাণ অতনু চিরপ্রথামত কোন-ও আপত্তি করিল না। বলিল, বেশ ত, একটা 'টুর্ প্রোগ্রাম্' করে ফে'ল—কোথায় যাবে, কে কে যাবে—কত খরচ লাগবে ইত্যাদি।

টিপ্পনী কাটিয়া স্বামীর একখানি হাত আকর্ষণ পূর্ব্বক নলিনী বলিয়া উঠিলেন, 'মাইজার দি গ্রেট্!'—খালি কত খরচ হবে—কত টাকা লাগবে? বলি, যক্ষির ধন আগ্‌লে কি হবে বলো ত? আমার 'মটো' হচ্চে, 'ঈট্, ড্রিঙ্ক এণ্ড বী মেরি!'—তা নয় খালি—

লজ্জিত হইয়া অতনু কহিল, সে কথা কি বলেছি? কতটা টাকা লাগবে, সেটুকুও ত জানা দরকার! তোমার সবতাতেই ঠাট্টা!...তাহার চক্ষু দুটি ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল।

স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতে কি জানি কি ভাবিয়া নলিনী নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। কোমল কণ্ঠে বলিলেন, কত আর? পুরীতেই যদি যাওয়া হয়, তাহলে ধরো প্রত্যেকের গাড়ী ভাড়াই লাগছে 'এ্যাভারেজ্' ষাট্ টাকা করে। ফাষ্ট ক্লাসে ত যেতে হবে! তারপর ধর', মঞ্জু, মিঃ রুদ্দ্‌র, শেফালি, অমলা, রুবি, ঠাকুরপো, এরা ত আছেই! তারপর তুমি, আমি।—রামদীন্ আর সোফার, এ-দেরকে না নিলে ভাল দেখায় না। এছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া, সেখানকার যাবতীয় খরচ পত্র আছে। কাজেই—আমি যা দেখতে পাচ্ছি—'অলটোগেদার' বোধ হয় হাজার তিনেক টাকার দরকার। পরে দরকার হয়, এখানে ব্যাঙ্কে একটা 'ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সান্' দিয়ে রাখলেই চলবে'খন।

সহধর্ম্মিণীর 'এষ্টিমেট্' শুনিয়া অতনুর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে মুখে 'দেঁতো হাসি' টানিয়া কহিল, তাত' লাগবেই! এর কমে আর হয় কি করে?...

হায় রে সভ্যজগতের স্বামিবৃন্দ !

ইদানীং প্রণব অতনুর বাড়ীতে আসা খুবই কম করিয়া দিয়াছিল। তবে যখন আসিত, রুবিকে সঙ্গে লইয়াই আসিত। তাহার একটা কারণ ছিল। 'গরচা রোডে' মঞ্জুর বাড়ী—নেলি প্রায় প্রতিদিনই সেখানে যাইতেন। ফিরিবার পথে কিম্বা যাইবার পথে মাঝে মাঝে প্রণবের ওখানে যাইয়া তাহার অনুপস্থিতির জন্য অনুযোগ করিয়া আসিতেন এবং রুবিকে-ও তাহাদের বাটীতে আসিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেন। আসা যাওয়া থাকিলে-ও দুই বন্ধুতে কিন্তু আর ততটা মনের মিল ছিল না। কি জানি কেন, অতনুর ও-ভাবটুকু প্রণবের পছন্দ হইত না,—সে সহ্য করিতে পারিত না।

অতনু এই লইয়া দু একদিন বন্ধুর কাছে কিছু কিছু বলিয়াছে-ও কিন্তু কোন প্রকার ফল হয় নাই।

সেদিন বৈকালে কয়খানি ট্রেনের টিকিট লইয়া নেলি যখন প্রণবের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন 'সার্ভেরুমে' সে একখানি প্ল্যান্ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। রুবির নিকট সন্ধান লইয়া নেলি সটান গিয়া সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, হিজিবিজি ও-সব কি আঁকচ' ঠাকুরপো ? ও-সব ছাইপাঁশ সরিয়ে রেখে দাও—দিয়ে 'রেডি' হয়ে পড়ো, রাত ন'টায় গাড়ী—আজ আমরা পুরী যাচ্ছি, এই নাও টিকিট।...

রিসার্ভ করা বার্থের টিকিট কয়খানি ছুঁড়িয়া তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন। বিস্ময়াবিষ্ট মুখে প্রণব তাঁহার মুখের পানে তাকাইল।

বিজয়গর্ব্বোদ্ভাসিত মুখে নেলি কহিলেন, দেখচ কি ? দেখবার কিছু নেই। আমি রুবিকে সব বলেচি। কি নিতে হবে না-হবে সব বলে দাও ;—ও-ও যাবে। দ্রুতকণ্ঠে কথা কয়টি বলিয়া তিনি চলিয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন।—আবার মঞ্জুদের ওখানে যেতে হবে। ওরা কতদূর কিরকম 'প্রীপেরার্ড' দেখে আসি। মিঃ রুদ্দুরকে বুকিং অফিস থেকেই ফোন্ করেছিলাম—উনি ত ভারী খুসি।...

হঠাৎ প্রণবের একখানা হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি রকম 'মেরিমেকিং' আর 'এনজয়মেণ্টস্' হবে বলো দেখি ঠাকুরপো ?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় আসিয়া প্রণবকে অধীর করিয়া তুলিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল, তাত বটেই। কিন্তু নেলি, আমার ত আজ যাওয়া হতে পারে না—আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সম্ভব হবে কিনা তা-ও বলতে পারি না।

হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া কথাটা কিছুই নয় এম্নি ভাব করিয়া নেলি বলিয়া উঠিলেন, 'সারটেন্‌লি আ'য়াম নট্ আণ্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ্ এ ড্রীম্, আই সাপোজ্'!

বেশ একটু গম্ভীর হইয়া প্রণব কহিল, না, স্বপ্ন কেউ-ই দেখচে না ; তবে আমার যাওয়া হবে না।

তাহার মুখের উপর একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলাইয়া নেলি কহিলেন, বেশ তুমি না হয় একটু 'ফ্রী' হয়ে পরেই যেও, রুবিকে তৈরী হয়ে থাকতে ব'লো কিন্তু, ঠিক আটটায় গাড়ী আসবে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ স্বরে প্রণব কহিল, সে কি! রুবি যাবে কোথায় ?

—কেন ? জলে পড়বে না ত, এত ভাবনা কিসের ?

শেষ পর্য্যন্ত নেলির জেদই বজায় রহিল। রাত্রি আটটার সময় মঞ্জু, রুদ্র, অতনু প্রভৃতির সঙ্গে আসিয়া নেলি অনেকটা জোর করিয়াই প্রণবকে লইয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিল।

প্রণবের মনের বিলক্ষণ জোর থাকিলে-ও সকলের—বিশেষ করিয়া অপরিচিতা দুই তিনটি তরুণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে তাহার শক্তি কুলাইল না। অবশেষে তাহাদের সমবেত সহায়তায় প্রায় পনর মিনিটের মধ্যেই রুবি ও সে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া লইল।

এই সেই বিশাল জলধি! চারিদিকে শুধু জলের খেলা!—জল—জল—শুধু জল! অবিশ্রান্ত গুরুগম্ভীর

সঙ্গীত লহরী! তাহারই কূলে জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র—হিন্দুর পরম তীর্থস্থান!

'বাসে'র সেই দৃপ্ত ছেলেটি অজয়ও তাহার বৌদিকে লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছে। ষ্টেশনের পথেই তাহাদের সহিত এদলের সাক্ষাৎ হইল। ফলে আমোদকে গাঢ়তর করিবার জন্য অজয় আসিয়া নলিনীর 'যজ্ঞশালায়' আসন জুড়িয়া বসিল।...

...নলিনী আসিয়া প্রণবকে কহিলেন, ঠাকুরপো আজ একটা 'ইউনিক্ সী-বাথ্' 'এ্যারেঞ্জ' করেছি। মিঃ রুদ্দুর ই অবশ্য 'সাজেষ্ট' করেছেন!—রামদীন্ আর সোফারকে সঙ্গে করে 'উনি' পোষাক ইত্যাদি নিয়ে ওপরে অপেক্ষা করবেন, আর আমরা দুজন দুজন করে তিন সেট নাইতে নামবো। কেমন? তুমি আর আমি, মঞ্জু আর অজয়বাবু, শেফালি আর মিঃ রুদ্দুর। কেমন মজা হবে বলো দেখি? তোমার বন্ধু আমাদের 'চান' হয়ে গেলে নেয়ে নেবেন। রুদ্দুর বলেন, তিনি সাঁতারে ভারী কাঁচা;—তুমি ত ছেলেবেলা জলের পোকা ছিলে শুনেছি।

শান্তকণ্ঠে প্রণব কহিল, কেন, অতনু-ও ত সাঁতার জানে!

তাচ্ছিল্যের সুরে নেলি কহিলেন, ফুঃ, 'ও' টানবে সাঁতার! ওকেই কে দেখে তার ঠিক নেই, 'ও' আবার সামলাবে আর একজনকে? এটা পুকুর নয় যেন মনে থাকে ঠাকুরপো! সেই যাকে বলে 'সী'।...

খুব কয়দিন আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল। অনেকগুলি টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া গেল। অতনু কহিল, এবার ফেরবার জোগাড় করা যাক্, কি বলো নেলি?

—যেমন অভিরুচি তোমার!

স্ত্রীর সম্মতি পাইয়াছে অনুভব করিয়া অতনু ফিরিবার জোগাড় করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যাইবার সময় সকলার যেরূপ আগ্রহ ছিল, এখন সেইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিশেষ করিয়া নলিনী;—তিনি স্বামীর কথায় ভ্রূক্ষেপ-ও করিলেন না। অগত্যা অতনুকে রামদীন ও সোফারের শরণাপন্ন হইতে হইল।

সেদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পর প্রণব ও নেলিকে না দেখিয়া অতনু চিন্তিত হইয়া পড়িল। রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেছে—তাহারা এখনও ফিরিল না কেন? কোন দিনত এত দেরী হয় না! শীঘ্রই ফিরিবে প্রত্যাশা করিয়া আরো কিছু সময় কাটিয়া গেল। ...রাত্রি বারোটা বাজে, এখন-ও ফিরিল না! তবে তাহারা গেল কোথায়? পথে কোন আপদ-বিপদ ঘটিল?...

অতনু বিষম চিন্তিত হইয়া উঠিল। শয্যা কণ্টকবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। উঠিয়া সে ঘরময় পায়চারি সুরু করিয়া দিল। আগামী কালই সকাল ১০টার ট্রেনে ফিরিয়া যাইবার কথা—বন্ধন কার্য্যও সবই প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে!—প্রণব বুদ্ধিমান হইয়া গেল কোথায়?...

ঠিক এই সময়ে সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একটী পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র কুটীরে নলিনী প্রণবকে বলিতেছিলেন, টাকা থাকলে কি হয় ঠাকুরপো?—তোমার বন্ধু কি একটা মানুষ?—'ও' প্রেমের কি বোঝে?—'লেট্ আস্ লীড এ নিউ লাইফ হেন্স।'...

প্রায় তিনমাস পরে। প্রণবকে লইয়া নেলি স্নান করিতে আসিয়াছেন। হঠাৎ মঞ্জুর উপর দৃষ্টি পড়িতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, একি মঞ্জু, তুই এখানে?

অঙ্গুলি সঙ্কেতে অজয়কে দেখাইয়া মঞ্জু কহিল, হাঁ ভাই—কি করবো; ষ্টেশন থেকে উনি আমায় 'ইলোপ্' করলেন, আমার-ও—।—সেই থেকেই এখানে আছি। জায়গাটা মন্দ নয়, কি বলিস নেলি?

বিস্ময় বিমূঢ়কণ্ঠে নলিনী কহিলেন, এঁ্যা সেকি!—ওঁর বৌদি?

—তারা ত অতনু বাবুর সঙ্গে সবাই চলে গেছে।

উষ্ণ সুরে নেলি বলিয়া উঠিলেন, সে কি?

হাসিয়া মৃদু স্বরে প্রণব কহিল, রাগ করবার কিছু নেই নেলি,—যুগের হাওয়া!

ডাক্তার কার্ত্তিক শীল

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বাৎসরিক সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশন

শ্রীউমাপদ দত্ত এম্‌-এ

গত ২০শে, ২১শে এবং ২২শে অক্টোবর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিয়ানাগ্রাম হলে, সঙ্গীত সম্মিলনের চতুর্থ বাৎসরিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডি, আর ভট্টাচার্য্য পি-এচ-ডি, ডি-এস্‌-সি মহোদয়ের উদ্যোগে এই সভার অধিবেশন প্রতি বৎসরই সাফল্যমণ্ডিত হয়। অধিবেশনের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে অক্টোবর বালক বালিকাগণের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এ বৎসর প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। প্রতিযোগিতায় কলিকাতার শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় ও শকুন্তলা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

২০শে অক্টোবর বেলা সাড়ে চারটায় অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ডি, আর, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করিলে মাননীয় জষ্টিস্‌ নিয়ামটুল্লা সাহেব সভা উন্মুক্ত করেন। মেজর ডি, আর, রণজিৎ সিং মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় এলাহাবাদ, বাঙ্গালা এবং বহু অন্যান্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন অপরাহ্নে অল্পবয়স্কা বালিকা শ্রীমতী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়ের গান শুনিলাম। বালিকার কণ্ঠসাধনা এবং তাহার গাহিবার রীতি অতি চমৎকার। অন্যান্য বালক-বালিকা যাহারা কণ্ঠ বা যন্ত্র-সঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বীণাপাণির স্থান অতি উচ্চে সন্দেহ নাই। রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকায় পুনরায় সঙ্গীত সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে এলাহাবাদের আর, কে, পটবর্দ্ধন খ্যাল গান করেন। তাঁহার গান তেমন ভাল লাগিল না, সাধনা ও শিক্ষার এখনও অনেক বাকি আছে বলিয়াই মনে হইল। ইঁহার পরে এলাহাবাদের হরনারায়ণ মিশ্র মহাশয় তেলানা সুরু করিয়া পরে একটী জলদ খ্যাল গান করিলেন। তাঁহার গানে মাঝে মাঝে বেসুর লাগিতেছিল এবং তিনি তান করিতেছিলেন নকল এবং চাপা গলার সাহায্যে। অতঃপর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদ স্বর্গীয় শিবসেবক মিশ্র মহাশয়ের পুত্র, শ্রীযুক্ত রামকিশন মিশ্র মহাশয় পঞ্চম রাগের খ্যাল গান আরম্ভ করেন। ইঁহার গান আমাদের বেশ ভাল লাগিল। তিনি অক্লেশে তিন সপ্তক কণ্ঠে বাহির করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার একটী দোষ দেখিলাম,—আলাপ এবং খ্যাল গান তিনি নিজে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান। আমাদের দেশের উচ্চ সঙ্গীত (আলাপ, ধ্রুপদ, খ্যাল) কখনও হারমোনিয়মের সাহায্যে হইতে পারে না। বড় বড় ওস্তাদদিগকে কখনও নিজে হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে শুনি নাই। তাহা হইলেও তিনি গাহিলেন ভাল, বিশেষতঃ তাঁহার দুন, বাঁট প্রভৃতি লয়ের কাজগুলি সকলেই বেশ পছন্দ করিলেন। ইঁহার সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শুনিলাম ইনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তবলজী আবিদ হোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য। আবিদ্‌ হোসেনের তবলা আমি লক্ষ্ণৌতে শুনিয়াছিলাম। হীরেন্দ্রবাবুর তবলা শুনিয়া মনে হইল ভবিষ্যতে ইনি খাঁ সাহেবের নাম রাখিবেন। অল্পবয়সে ইনি যেরূপ তবলা আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। মিশ্রজী লয়ের যেরূপ কূট ও সূক্ষ্ম কাজ করিতেছিলেন, তাহাতে হীরেন্দ্রবাবুর ন্যায় পারদর্শী তবলজী ব্যতীত অন্য কাহারও

পক্ষে সঙ্গত দেওয়া সম্ভবপর হইত না। অতঃপর বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'দরবারী কানড়া' ও 'নাগধ্বনি কানড়ার' খ্যাল গান আরম্ভ করেন। পশ্চিমের অনেকস্থানেই, ইঁহার নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহার সুরের উপর দখল এবং তানের কাজ অতিশয় চমৎকার। ইনি যে ঢংয়ে খ্যাল গাহিয়া থাকেন, তাহাই আসল খ্যালের ঢং। ইঁহার স্বাভাবিক সুমিষ্ট কণ্ঠ, ঘরওয়ানা শিক্ষা ও সাধনার ফলে অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছে। ইঁহার গান শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হন। আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য,—ইঁহার গান একবারেই মুদ্রাদোষবর্জ্জিত। গায়কের পক্ষে এটি একটি কম গুণের কথা নয়। তারপর মুরাদাবাদের হারমোনিয়ম বাদক শ্রীযুক্ত ভি, ডি, আর, বেদী হারমোনিয়ম বাজান। তাঁহার হারমোনিয়ম বাজনা আমাদের মন্দ লাগিল না। ইঁহার পর লব্ধপ্রতিষ্ঠ তব্‌লাবাদক মৌলভী রাম মহাশয়ের তবলা বাদ্য হয়। ইনি আধঘন্টা যাবৎ তেতালা তালের নানারূপ বোল বাজাইয়া সকলের মনরঞ্জন করেন। তৎপরে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রী গোয়ালিয়র নিবাসী হাফেজ আলী খাঁ সাহেবের সরোদ বাদ্য হয়। ইনি অরুণ কেদার, খাম্বাজ, মালকোষ, দেশ, এবং পরদিন সকালের বৈঠকে গুর্জ্জরী তোড়ি, দরবারী তোড়ি, ভৈরবী প্রভৃতির আলাপ, গৎ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। যন্ত্রের উপর এরূপ দখল অন্য কোন ওস্তাদের নাই ইহা বলা বাহুল্য। সরোদের মত পর্দ্দা বর্জ্জিত যন্ত্রে তিনি আলাপ প্রভৃতি যেরূপ শুদ্ধভাবে দেখান, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার পাণ্ডিত্যও অগাধ। অন্যান্য যন্ত্রীগণ প্রায়ই বাঁধা কয়েকটি রাগিণী এবং তোড়া বাজাইয়া থাকেন, কিন্তু ইনি প্রতিবারেই নূতন রাগরাগিণী এবং নানারূপ ছন্দের, তোড়া প্রভৃতি বাজান। ইঁহার সহিত গোয়ালিয়রের মৃদঙ্গ বাদক পর্ব্বত সিং সঙ্গত করেন। ইঁহার সঙ্গতে কিন্তু কোনই বৈচিত্র্য নাই।

২১শে প্রাতঃকালের বৈঠকে ইন্দোরের নসিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের ধ্রুপদ ও ঠুম্‌রী ব্যতীত অন্য কাহারও গান বাজনা উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি কেবলমাত্র তানপুরার সহিত গান, হারমোনিয়মের সাহায্যে কখনই গান না। তাঁহার সুর-মিলও অতি চমৎকার, প্রত্যেক সুর দুর হইতে ঠিক যন্ত্রের মত-মনে হয়। নসিরুদ্দিনের পিতা স্বর্গীয় আলাবন্দে খাঁ সাহেব হিন্দুস্থানের মধ্যে আলাপ ও ধ্রুপদে অদ্বিতীয় ছিলেন। নসিরুদ্দিনের কণ্ঠ অতিশয় ক্ষীণ, তিনি 'সি' স্কেলে গাহিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মুখে বসিয়া যাঁহারা শুনেন, তাঁহারাও তাঁহার খাদের সুর একবারে শুনিতে পান না। কেবল মাত্র তানপুরার শব্দ শুনা যায়। তিনি সকালে 'দরবারী তোড়ি'র আলাপ শেষ করিয়া 'হিণ্ডোলে'র ধ্রুপদ গাহিলেন; ইহাও একটু খাপছাড়া লাগিল। কারণ প্রথমতঃ 'হিণ্ডোল' রাত্রের রাগ, দ্বিতীয়তঃ যে রাগের আলাপ করা যায়, সেই রাগের গান গাওয়াই চিরাচরিত প্রথা; বিশেষতঃ তাঁহার মত ওস্তাদের মুখে শ্রোতারা সেইরূপ আশা করে। তাঁহার একটী মাত্র ধ্রুপদ শেষ হইতে না হইতেই শ্রোতাদের নিকট হইতে আবেদন গেল ঠুম্‌রী গাহিবার জন্য। তিনি তানপুরার সহিত ভৈরবীর ঠুম্‌রী গাহিলেন বটে কিন্তু এক একটী বিস্তার বা তান তিনি অন্ততঃ ২৫।৩০ বার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, এবং তানগুলি এত আস্তে গাহিতে লাগিলেন, যে তিনি নিজেই শুনিতে পাইতেছিলেন কিনা সন্দেহ।

তিনি ঐরূপ ঠুম্‌রী অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা যাবৎ গাহিলেন। শেষে এরূপ একঘেয়ে লাগিতে লাগিল যে, রসগ্রাহী সমঝদার ব্যক্তিগণও বিরক্ত হইয়া সভা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরদিন রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময়, তিনি পুনরায় 'সোহিনীর' আলাপ সুরু করিলেন। তাঁহার আলাপের কোনই পদ্ধতি নাই দেখিলাম। তিনি একবার 'সরগম' একবার গানের বাণী এবং একবার আলাপের দ্বারা একই সুর এতবার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, যে শ্রোতারা ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। 'সোহিনী'র আলাপ করিতে করিতে তিনি একস্থানে হঠাৎ কোমল ধৈবৎ লাগাইয়া পুনরায় শুদ্ধ ধৈবতে দম রাখিলেন; সাধারণের কাছে জানাইলেন যে তিনি শ্রুতি দেখাইলেন। কিন্তু ইঁহা বড়ই খাপছাড়া ঠেকিল; সাধারণ ঠুম্‌রী গায়কগণই অনবরত ঐরূপ কোমল ও শুদ্ধ স্বর একসঙ্গে দেখাইয়া থাকেন। এই সকল ধ্রুপদীগণের গান শুনিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে বাঙ্গালী দেশেই ধ্রুপদের আসল মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা প্রকৃত ধ্রুপদী, তাঁহারা কখনও ঠুম্‌রী গান না

বা তাঁহাদিগকে কেহই গাহিতে অনুরোধ করেন না। এখন হিন্দুস্থানে ধ্রুপদ প্রায় উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে, পাখোয়াজও তদ্রূপ। এখন সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে মাত্র যে দুই এক ঘর ধ্রুপদের চর্চা রাখেন, তাঁহারা এরও, সুতরাং পাদপহীন দেশে তাঁরাই 'ক্রমায়ন' করছেন। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে যে সমস্ত হিন্দুস্থানী বা বাঙ্গালী ধ্রুপদীগণের গান শুনিয়াছিলাম, তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে হিন্দুস্থানের আধুনিক ধ্রুপদীগণের গান ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় কাশীনাথ, মুরাদালি, বিশ্বনাথ, দৌলত খাঁ, অনন্তলাল, রাধিকাপ্রসাদ, অঘোরনাথ, প্রভৃতির গান যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই আমার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত আমার আর একটা ভুল ধারণা দূর হইল, যে বাহির হইতে যাঁহাদের এত নাম শোনা যায়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সে নামের উপযুক্ত নহেন। আওয়াগড় ষ্টেট হইতে একজন ধ্রুপদী আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বলবন্ত রাও। তাঁহার গান কিছুক্ষণ হইবার পরেই মনে হইল 'কমিক' হইতেছে। শ্রোতাদের মধ্যে অতিশয় গোলমাল আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা দিয়া বলিলেন, যে ইনি পুরাণ ঢংয়ের ধ্রুপদের একমাত্র প্রতিনিধি। কিন্তু পুরাণ ঢং বলিতে আমরা কিছু বুঝিলাম না, ঢং যাহাই হউক সে যদি শুনিতে না ভাল লাগে তবে তাহা উঠিয়া যাওয়াই ভাল। রাও মহাশয়ের ধ্রুপদে, সুর, পদ কিছুই ছিল না, কেবল মুখভঙ্গী, এবং তালে তালে একটা অদ্ভুত শব্দ।

রাত্রে বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ খ্যাল গায়ক নারায়ণ রাও ব্যাস মহাশয়ের গান হইল। তাঁহার গানে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তিনি সেদিন শঙ্করার দুইখানি খ্যাল ও ঝিঁঝিটের ঠুম্‌রী এবং পরদিন সকালে 'সারঙ্গের' খ্যাল এবং ভৈরবীর ঠুম্‌রী গাহিয়াছিলেন। তাঁহার গানের সাবলীল দ্রুত তান এবং সুরের উপর দখল অতিশয় চমৎকার। নারায়ণ রাও খ্যাল ও ঠুম্‌রী অতি সুমিষ্ট করিয়া গাহিয়া থাকেন। তিনি এক একটা তান বহুক্ষণ যাবৎ দম রাখিতে পারেন, সরগমও অতি দ্রুত উচ্চারণ করিতে পারেন। সর্ব্বোপরি একটা গানকে কিরূপ ভাবে সাজাইতে হয়, তাহা তিনি সত্যই জানেন।

অতঃপর গৌরীপুর ষ্টেটের সেতার বাদক ইনায়েৎ খাঁ সাহেবের ইমনের আলাপ ও পিলু বারোয়ার গৎ শুনিলাম। ইঁহার যেরূপ নাম, তাহার উপযুক্তই তিনি বাজাইয়া থাকেন। পরদিন সকালে ইনি দরবারী তোড়ির আলাপ ও ভৈরবীর গৎ বাজান। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সে যখনই কোন সভায় তিনি বাজান, তখনই এই চারটা রাগ, রাগিণী ভিন্ন অন্য কোন সুর বাজাইতে তাঁহাকে কেহ কখনও শুনেন নাই। গতের তোড়া যা বাজান, তাহাও কয়েকটা ছন্দের মধ্যে আবদ্ধ। যিনি একটা যন্ত্র লইয়া সমস্ত জীবন কাটাইলেন, তাঁহার নিকট শ্রোতারা নূতন রাগরাগিণী এবং নানারূপ গৎ আশা করেন।

২২শে প্রাতে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'আলাহিয়া' ও 'আশাবরীর' আলাপ ও ধ্রুপদ গাহিলেন। ইঁহার গান শুনেন নাই এরূপ লোক ভারতবর্ষে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার কণ্ঠসাধনা অতিশয় অসাধারণ, তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেরূপ শুদ্ধভাবে মীড়, গমক প্রভৃতি বাহির হয় সচরাচর তেমন শোনা যায় না। ইঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠ ও আসল ঢংয়ের ধ্রুপদ ও আলাপ শুনিয়া সকলেই বিমোহিত হন। প্রকৃত খানদানী ধ্রুপদের ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

রাত্রে পুণার ডি, এন পট্টবর্দ্ধনের খ্যাল হইয়াছিল। তাঁহার গানও বেশ লাগিল, বিশেষতঃ তাঁহার তেলানার দ্রুত উচ্চারণ ঠিক যন্ত্রের মত শুনাইতেছিল। তিনি 'দরবারী কানড়া' ও আড়ানা গাহিয়াছিলেন। আমরা কাগজে বহুপূর্ব্ব হইতেই আরও কয়েকজন বিখ্যাত ওস্তাদের নাম দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের অনুপস্থিতির কারণ বুঝিলাম না। আবদুল করিম, ফৈয়জ খাঁ, শম্ভুপ্রসাদ, আব্দুলসাহেব, কাস্তে, আলাউদ্দিন, চন্দন চৌবে প্রভৃতি এতগুলি ওস্তাদের অনুপস্থিতিতে আমরা হতাশ হইয়াছিলাম। রাইগড় ষ্টেট হইতে আগত কৃপারামের নৃত্য দেখিলাম। তাঁহার বয়স অল্প এবং এখনও তিনি শিক্ষার্থী। তাঁহার নৃত্যে বিশেষত্ব কিছুই পাইলাম না। এলাহাবাদের স্থানীয় গায়কগণের গান শুনিলাম। তাঁহাদের মধ্যে ডি, এন, খ্যাকারের নামই উল্লেখযোগ্য।

এই সঙ্গীত সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া যাঁহারা প্রতি বৎসর এতগুলি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত শুনিবার সুযোগ দিতেছেন তাঁহারা সঙ্গীতরসপিপাসুগণের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।

শ্রীউমাপদ দত্ত

মায়া

শ্রীচারু চন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্

সেন মহাশয়ের ওখানে যেতেই সরলা বললে,

"মেসো মশায়, আজ ছোটদা আর মায়া সিং-এর সঙ্গে দেখা হল ইডেন গার্ডেনে। বড় ভাল লাগল মায়াদিকে।"

"হ্যাঁ, বড় সুন্দর মেয়ে। নরেশ, যা বলেছিলাম তার কিছু করতে পারলে?"

"আজ্ঞে, চেষ্টা করছি। বোধ হয় শীগ্‌গীর একটা কিছু বন্দোবস্ত হবে। মেসো মশায়, মায়ার নাম কি মায়া সিংহ।

"না, না। ওর নাম মুখুয্যে। ওর বাবা ছিলেন অমৃতসরের ডাক্তার রামকৃষ্ণ মুখুয্যে। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর মায়ার মা ব্রাহ্ম মতে হিরা সিংকে বিয়ে করেন। সেই বিয়ের পর মায়াও নাম নিলেন সিং। মায়া নিজে কখনও ব্রাহ্ম দীক্ষা নেয় নেই। তুমি, সরলা সুরেশ যে রকম মন্দিরে যাও, মায়াও সেই রকম যায়। নইলে ও হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

"তাহলে সুরেশের সঙ্গে মায়ার বিয়ে হওয়ার ত কোন বাধা নেই।"

"আইনের চোখে নিশ্চয় নেই। তবে তোমার ডাক্তার কাকা যে রকম গোঁড়া, উনি কি রাজী হবেন? বলবেন ওর মার অনাচারের জন্য ও জাতে পতিত হয়েছে।"

"মেসো মশায়, আমাদের ত চেষ্টা করা উচিত। একটা মস্ত বড় অনর্থ তাহলে বন্ধ করা যায়।"

সরলা সেন মহাশয়ের পায়ে হাত দিয়ে বললে, "মেসো মশায়, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি কাকাকে লিখুন। আপনার কথা নিশ্চয়ই রাখবেন তিনি।"

"তোদের বাবা বেঁচে থাকলে হয়ত কিছু করতে পারতাম কিন্তু যোগেশবাবু আমার কথা শুনবেন না। বলবেন, আপনি ব্রাহ্ম প্রচারক জাতের কি বোঝেন? মায়ার মাও আমার উপর বিরক্ত হবেন। ব্রাহ্ম বিলেত ফেরৎ সমাজে একটা হৈ চৈ পড়েছে কি না এই ব্যাপার নিয়ে।"

শেষ পর্য্যন্ত সেন মহাশয় চিঠি লিখলেন কাকাকে। আমার ইতিমধ্যে সুরেশের সঙ্গে আর দেখা হয় নেই। তিনদিন পরে খুব উত্তেজিত হয়ে এসে আমায় বললে,

"দাদা, বাবা কি টেলিগ্রাম করেছেন দেখ।"

খুলে দেখি, "Come here at once or I shall not see your face again. Father"

"এখনই এখানে এস নইলে তোমার মুখ দর্শন করব না, বাবা।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কি করবি ঠিক করলি?"

"ঠিক আর মাথা মুণ্ড কি করব? আজই যাব। মায়াও যেতে বলছে। সে বেচারা আজ দুদিন থেকে নীচে নামে না। কারও সঙ্গে দেখা করে না।"

সুরেশ যখন মুরপুর থেকে ফিরে এল, দেখলাম সে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। কাকা তাকে খুব ধমকেছেন আর বলেছেন যে তার লেখাপড়া শেষ হয় নেই, এখন বিয়ের সময় নয়। আর ভাল ক'রে পড়াশুনো না করে ত তার কলকাতায় থাকার দরকার নেই। সে কথা দিয়ে এসেছে যে এইবার কোমর বেঁধে এম-এর জন্য পড়বে, সময় নষ্ট করবে না।

সেন মহাশয়ের কাছে কাকার চিঠি এল, "আপনি কি বুড়ো বয়সে আমায় একঘরে হতে বলেন? ও সব অনাচার আমাদের জাতে হয় না। রামকৃষ্ণ বাবুর বিধবা যখন ব্রাহ্ম হয়ে আবার বিয়ে করেছেন তখন তাঁর কন্যাও আর ব্রাহ্মণ কন্যা বলে গণ্য হতে পারে না। আমি সুরেশকে বলেছি যে সে ইচ্ছা হলে ও মেয়েকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু আমি তাহলে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না।"

চিঠি প'ড়ে সুরেশের কাছে গেলাম। দেখি সে ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। দুই চোখ লাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

"কি রে, অসুখ করেছে না কি ?"

বেচারা কেঁদে ফেললে, "ভাই নরেশদা, সবাই বদ্ধপরিকর হয়েছে আমাকে জব্দ করবে ব'লে। বাবা ভয় দেখিয়েছেন, ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কাল মায়ার মা সে কথা শুনে বললেন যে তাঁর মেয়েকে একটা অলস নিঃস্ব ছাত্রের হাতে ফেলে দিতে পারবেন না। মায়ার নিজের সম্পত্তি অতি যৎসামান্য। বাকী যা কিছু, সব তাঁর ছেলে কুন্দন সিংএর।"

"এতে নূতন কথা কি হল যে তুই এমন ভেঙ্গে পড়েছিস্। বিয়ে তোদের হতে পারে না সে ত তুই নিজেই বরাবর বলছিস্।"

"মায়াও তাই বললে, কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছে না। কেন এসব গোলমালের মাঝে গেলাম ?"

কোন রকমে সুরেশকে একটু ঠাণ্ডা করে বাড়ী ফিরলাম। মনে করলাম, "দুদিন যাক, একটু শান্ত হলে ওকে আমার কাছেই এনে রাখব।"

তারপর মায়ার কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমার কিছু করবার সাধ্য নেই। তাকে সান্ত্বনা দিতে যাব সে সাহসও নেই। তার সামনে গেলে কি বলতে কি ব'লে ফেলব। কাজ নেই। সন্ধ্যা বেলা সরলাকে সব কথা বলে এলাম। সব কথা মানে সুরেশ-সংক্রান্ত সব কথা। আমার মনে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল সে কথা তাকেও বলতে পারলাম না।

আরও দুদিন কেটে গেল। সকালবেলা আমার প্রথম মক্কেল এসেছে। তার সঙ্গে ব'সে কাজকর্ম্ম সব বুঝে নিচ্ছি। এমন সময় সুরেশ এল। তার চোখ লাল, চুল উসকো খুসকো। জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাল আছিস্ ?"

"হাঁ, আমি ভাল আছি ভাই। তুমি একবার আমার সঙ্গে এস। একটু কাজ আছে।"

বাহিরে নিয়ে গেল। একটু দূরে দেখি এক দশ-কুকুরে সেকেণ্ড ক্লাস ঠিকে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেইখানে দুজনে গেলাম। গাড়ীর ভেতর মায়া। তার সামনে বাক্স, পেটারা, বিছানার পুঁটুলী। আমাকে দেখে নমস্কার করলে আর সুরেশকে ইসারা করলে স'রে যেতে। তারপর ভারী গলায় আস্তে আস্তে বললে

"দাদা, তোমায় বলতে এলাম আমি কলকাতা থেকে চ'লে যাচ্ছি। তুমি ত দণ্ডবিধান করলে না। নিজেই দণ্ড নিলাম। ভাইকে ডাকিনীর মায়া থেকে ছাড়াতে অনেক চেষ্টা করেছ। এবার ডাকিনী নিজেই তাকে ছেড়ে পালাল। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। তার ত তুমি রইলে। দেখবে শুনবে।"

আমি অনেক কষ্টে এইটুকু বললাম, "কোথায় যাচ্ছ, মায়া ?"

"চাকরী করতে। পাতিয়ালার রাজধানীতে শিক্ষয়িত্রী হয়ে যাচ্ছি।"

"না না, সে হবে না, মায়া। রাজবাড়ীর জঘন্য হাওয়ায় তোমার থাকা হবে না। কিছুতেই হতে পারে না।"

"উপায় নেই দাদা। আমাকে পালাতেই হবে।"

"মিছে এতবড় স্বার্থত্যাগ করছ। কার জন্য করছ ?" ব'লে চুপ ক'রে গেলাম, সুরেশের নিন্দা করার আমার অধিকার নেই। একটু স্থির হয়ে আবার বললাম,

"তবে আমায় একটা কথা দাও, মায়া, যে আমি যখন তোমায় আসতে বলব ফিরে আসবে। যখন তোমার কলকাতা থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন থাকবে না আমি তোমায় একটা তার করব। চ'লে আসবে ?"

আমার গলা কাঁপছিল। মায়া আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "আচ্ছা, দাদা, তাই হবে। তুমি আমার জন্য দুঃখ ক'র না।" ব'লে নত হয়ে নমস্কার করলে।

আমার বড় ইচ্ছা হল মায়ার আর একটু কাছে যাই, হাত ধ'রে বলি, "মায়া, তুমি যেয়ো না। গেলে আমার কি হবে ?" জিব দাঁত দিয়ে চেপে রইলাম, পাছে কিছু ব'লে ফেলি। শুধু সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে একটু হেসে "গুড্ বাই" বলে হাতে হাত রাখলে। আমি

সুরেশকে ডাকলাম। গাড়ী চ'লে গেল। খানিকক্ষণ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ীর ভেতর মক্কেলের কাছে গেলাম। এই আমার প্রথম মক্কেল, একটু আনন্দ করব তাও অদৃষ্টে নেই।

কাজ সেরে সরলাকে ডেকে পাঠালাম। তাকে মায়ার খবর দিলাম। সে কিছু বললে না। কেবল আঁচল দিয়ে বার দুই চোখ মুছে বললে, "আমায় একবার ডাকলে না, দাদা। মায়াদির পায়ের ধূলো নিতাম।"

সুরেশ যখন হাওড়া থেকে ফিরে এল, সরলা একটু কঠিন স্বরে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ছোটদা, মায়াদি গেল? কেন যেতে দিলে তাকে একা অত দূরদেশে?"

"গিয়ে ভালই করেছে, ভাই। এখানে থাকলে আমিও তার কাছে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। বাবাও ভীষণ রাগ করতেন।"

"ছোটদা, তুমি পুরুষ মানুষ, সাহস ক'রে তাকে বিয়ে করতে পারলে না? না হয় কাকার টাকা নাই বা পেতে।"

"তুইও ভাই ঐ কথা বলছিস্, আমি টাকার লোভে তাকে ত্যাগ করলাম! মায়া নিজে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হল না।"

আমি শেষ দুজনকেই থামিয়ে দিলাম, "কথা কাটাকাটি ক'রে ফল কি? সে বেচারা ত দেশত্যাগী হল। আমাদের দিন বেশ চ'লে যাবে। কোনও ত্রুটী হবে না।"

কথাগুলো হয়ত কিছু কর্কশ হল। কিন্তু মন ভাল ছিল না, আর দেখছিলাম যে সুরেশের প্রেমের স্রোতে এরই মধ্যে ভাটার টান ধরেছে। একটু পরে সবাই সেন মহাশয়ের বাড়ী খেতে গেলাম। মায়া কলকাতা ছেড়ে গেছে শুনে তিনি খুব খুসী হলেন,

"যথার্থ মনুষ্যত্ব দেখলে আনন্দ হয় বই কি, বাবা। কিন্তু এ কাজটা বোধ হয় সুরেশেরই করা উচিত ছিল। একটা মেয়েছেলেকে তাহলে নির্ব্বাসনে যেতে হত না।"

সুরেশ বললে, "কিন্তু মেসোমশায়, আপনি একে নির্ব্বাসন বলছেন কেন? মায়া ত আধা পাঞ্জাবী। সেই দেশেই সারাজীবন কেটেছে তার।" এ কথার আর কে কি জবাব দেবে?

বন্ধু দিন কয়েক সুরপুর ঘুরে এল। এবার বোধ হয় সেখানে বকুনি খায় নেই, কারণ মেজাজ বেশ ভাল দেখলাম। এসেই লেখাপড়া জোরে করতে লেগে গেল। আমার রাজবাড়ীর কাজ ও ওকালতী নিয়মিত চলছে। সরলা আমার কাছে থাকতে এসেছে। খুব গিন্নিপনা করছে। মায়ার খবরের জন্য মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠা হয়, কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করব। এক একবার মনে হয় সরলাকে বলি একটা চিঠি লিখে খবর নিতে। কিন্তু বড় লজ্জা হয়।

সুরেশচন্দ্র বড়দিনের ছুটীতে গিরিডী বেড়াতে গেল। তিন দিন পরে তার কাছ থেকে এই পোষ্টকার্ড পেলাম,

"ভাই নরেশদা, এখানে এসে খুব আনন্দে সময় কাটছে। চেনা লোক অনেক এসেছে। নূতন বহুলোকের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে। তাসের আড্ডা, গানের জলসা, এ সব ত আছেই। তার উপর হেঁটে লম্বা লম্বা পাড়ি। চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। উসরীর ঝরণা দেখে তোমার জন্য মন কেমন করছিল। তোমার বড় ভাল লাগত। বারগণ্ডায় অনেক ব্রাহ্মের বাস। আমি কিন্তু দূরে দূরে থাকি। Once bit, twice shy, একবার ছোবল মেরেছে, আর কাছে ঘেঁসি? সরলা বাঁদরী কেমন আছে?

স্নেহাকাঙ্ক্ষী সুরেশ।"

সুরেশের চিঠির প্রতিছত্র থেকে আনন্দ আর স্ফূর্তি ফুটে বেরোচ্ছে। সে বিরহের তাপে জরজর, এ কথা তার অতি বড় দুশমনও আর বলতে পারবে না। এই মানুষ মায়ার মত মেয়ের মন ভুলিয়েছে, এর জন্য মায়া দেশত্যাগী! মনে হলেও গা কেমন করে। সরলাকে পোষ্টকার্ড খানা পড়তে দিলাম। সে প'ড়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। তারপর আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে আস্তে আস্তে মাথা হেট ক'রে চলে গেল। কি আর বলবার আছে আমাদের?

আরও তিন চারদিন পরে গিরিডী থেকে একখানা লম্বা চিঠি এল। চিঠিখানা আজও আমার কাছে আছে। কয়েক ছত্র পাঠকের অবগতির জন্য নীচে তুলে দিচ্ছি,

"ভাই, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। মনে করেছিলাম, যে রকম জোর, inoculation, টীকে দেওয়া হয়ে গেছে, আর ও ব্যাধি কাছে আসতে পারবে না। কিন্তু সে মস্ত ভুল। এবার

প্রথম দর্শনেই মরেছি। Symptoms, রোগের লক্ষণ এখন সব জানি কি না, তাই চট্ ক'রে রোগটা ধ'রে ফেলেছি। তোর মত expert (বিশেষজ্ঞ) দিয়ে diagnose (রোগ নির্ণয়) করাতে হল না। তার নাম ডলী ভট্টাচার্য্য। আমাদেরই জাত। এবার মিলনের অন্তরায় কিছু নেই। বাপ হর-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য এখানকার ডেপুটি কলেক্টর। তিনিও প্রথম দর্শনে আমার প্রেমে পড়েছেন, বাবাকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে।

ডলী ষোড়শী। ঠিক যেন মোমের পুতুল! সে রকম সুন্দরী সচরাচর চোখে পড়ে না। আমি ত ভাই তার জোড়া কখনও দেখি নেই। হিন্দু ঘরের মেয়ে হলেও অনেকদিন এখানে ব্রাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে মিশে বেশ চালাক চতুর হয়েছে। মোটেই namby pamby, জড়ভরত নয়। জানিস ত ভাই, আমি লজ্জাবতী লতা ছুঁচকে দেখতে পারি না। প্রথম তার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। সে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সেই দিনই বোনের সঙ্গে পরিচয় করে দিলে।

আমাদের অনেক ছবি নেওয়া হয়ে গেছে ফিরে গিয়ে দেখাব।"

যখন ফিরে এল, ছবি দেখলাম। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, যাকে চলিত কথায় বলে দোহারা গড়ন। সপ্রতিভ মুখের ভাব। যে কোন বরকর্ত্তা তাকে দেখা মাত্র পছন্দ করবেন। মুখ চোখ, নাক, চিবুক সব যেন মাপ জোখ ক'রে গড়া হয়েছে। কিন্তু যে মায়াকে ভালবেসেছে তার এই সাজান গোজান মোমের পুতুলটাকে কি ক'রে মনে ধরতে পারে, তা বোঝা শক্ত। তবে সুরেশচন্দ্রের ভালবাসা ব্যাপারটাই স্বতন্ত্র।

দুচারদিন বাদ কাকার চিঠি এল। তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চিঠি পেয়ে বড় আনন্দিত হয়েছেন। মেয়ের ছবি দেখে ভারী পছন্দ হয়েছে। খুব ভাল সম্বন্ধ, সব রকমে নিখুঁত। সুরেশের পরীক্ষা হয়ে গেলেই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হবে। তার আগে তিনি একবার মেয়েটাকে দেখে নেবেন। তবে সেটাও নিষ্প্রয়োজন, কেন না সুরেশ বাবাজীর মেয়েটী বড় ভাল লেগেছে। লোক পরম্পরায় কাকা এটা অবগত হয়েছেন। সুরেশের যে রকম প্রকৃতি, শীঘ্র বিবাহ দিলেই সর্ব্বপ্রকারে ভাল হয়।

শেষ টিপ্পনীর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে। কাকাকে সেই রকম জানালাম। সরলা কিন্তু বেঁকে বসল,

"যে যাই বলুক না কেন, আমি এ বিয়েতে কিছুতেই থাকব না। ছোটদাকে আমি জিজ্ঞেস করব, মায়াদিকে নিমন্ত্রণ করবে না?"

আমি ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ফল হল না। সুরেশের সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলে। সুরেশ একটুও অপ্রস্তুত হল না, বললে,

"সেটা ভাল দেখাবে না। কি বল নরেশদা!" আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

যথাসময় সুরেশের পরীক্ষা ও বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহে আমি একজন কর্ম্মকর্ত্তা ছিলাম কিন্তু সরলা ইচ্ছা ক'রে জ্বর করলে আর মাসীমার বাড়ীতে শুয়ে রইল। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল সুরেশ দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হয়েছে। বৌয়ের রূপসী ব'লে খ্যাতি ত ছিলই, এখন পয়মন্ত ব'লে আদর আরও বাড়ল।

সবই ত বেশ চলছে। মায়া আর কেন বিদেশে থাকে? সুরেশ পাশ ক'রে বৌ নিয়ে যখন সুরপুর চলে গেল আমি পাতিয়ালায় এক টেলিগ্রাম পাঠালাম,

"You can safely return now, Dada"

"এইবার তুমি অবাধে ফিরে আসতে পার, দাদা"

দুদিন পরে উত্তর পেলাম,

"Thanks, returning next month, Maya"

"ধন্যবাদ, আগামী মাসে ফিরব, মায়া"

তারখানা নিয়ে ব'সে ভাবতে লাগলাম। আমি কি করব? কলকাতায় থাকলেইত মায়ার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তার সামনে যাবার সাহস আমার নেই। একে ত সুরেশের কীর্ত্তির জন্য লজ্জা, তারপর আমার নিজের উপর আর কোন ভরসা নেই। নিজের সম্বন্ধে যা কিছু গর্ব্ব ছিল সব চূর্ণ হয়ে গেছে। মায়া চ'লে যাওয়ার দিন শুভ বাইয়ের ছুতো ক'রে তার করস্পর্শ, সেই করস্পর্শে রোমাঞ্চ, সে সব আজও ভুলতে পারি নেই। সুরেশ মায়ার হৃদয় চুরি করে তারপর তাকে ত্যাগ করলে, এই তার দোষ। কিন্তু আমি যে চুরি ক'রে সুরেশের প্রণয়িনীর অঙ্গ স্পর্শ করলাম, আমি

তার চেয়ে কিসে বড় ? কিসের আমার এত বড়াই ? না, আমায় পালাতে হবে। কিন্তু পালাব কোথায় ? এখানে রাজা রত্নেন্দুর কৃপায় কাজের সব সুব্যবস্থা হয়েছে, বাড়ী ঘরদোরও করেছি, আবার নূতন জায়গায় যাব ? এই রকম জটলা করতে করতে দিন দুই গেল। মায়ার এক চিঠি পেলাম।

"দাদা, তোমার আদেশ পেয়েছি। আমি আজই এঁদের নোটিশ দিয়েছি। এক মাস পরে, ছুটী পেলেই ফিরে যাব। তোমার তারের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি ত প্রথম থেকেই আমায় সদুপদেশ দিয়েছিলে। সমক্ষে না হলেও পরোক্ষে। সে উপদেশ শুনলে জীবনটা অন্য রকম হত। কিন্তু হত কি, দাদা ? অদৃষ্টকে এড়ান কি যায় ? যাক্ ও সব কথা আর কইব না। কেবল তোমার একটা বাক্য আমি মনে রাখব।

'চিরবিরহে আমাদের প্রেম পূর্ণ সার্থকতা লাভ করুক।'

শুধু, আর 'আমাদের প্রেম' নেই, এখন 'আমার প্রেম'। সরলাকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। তাকে ভাল ক'রে জানতে চিনতে বড় ইচ্ছা করে।

তোমার আশীর্ব্বাদপ্রার্থী বোন, মায়া।"

চিঠি প'ড়ে সরলার হাতে দিলাম। সেও পড়লে। তারপর খুব আস্তে আস্তে বললে, "দাদা, মায়াদি ঠিক লিখেছেন, অদৃষ্টকে এড়ান যায় না। আমরা দুজনে চেষ্টা করব আমাদের এই বোনটীকে সুখী করতে।"

ছোট বোনের মুখে এই কথা শুনে আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হল। বললাম,

"দিদি, কথাটা আরও একটু জটিল হয়েছে। তোকে কি ক'রে বলব বুঝতে পারছি না। আমি যদি মায়াকে বোন বলে মনে করতে না পারি ?"

সরলা দাঁড়িয়ে উঠল। আমার কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বললে, "পারতেই হবে, দাদা। মায়াদির মত মেয়েকে অন্যভাবে ভালবাসলে তাকে অপমান করা হয়।"

"সরলা, নিজের উপর আর ভরসা নেই। তাহলে চল্, কোথাও পালিয়ে যাই।"

"সে ঢের ভাল, ভাই। তাই কর।"

দুজনে অনেকক্ষণ পরামর্শ ক'রে স্থির করলাম যে সবাইকে বলা হবে, কলকাতার জলবায়ু আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না, রোজ ঘুস্ ঘুসে জ্বর হচ্ছে, ডাক্তার পশ্চিমে কোন শুকনো জায়গায় থাকতে হুকুম দিয়েছেন। সেন মহাশয় আর মাসীমা অনেক দুঃখ করলেন, বললেন যে শরীরটা সারলেই যেন কলকাতায় ফিরে আসি। রাজা রত্নেন্দু বোধ হয় একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন যে আমি ভাল হলেই ফিরব আর ইতিমধ্যে সুরেশ শরদিন্দুরে কাজ নেবে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হলেন। শরদিন্দু বললে,

"ছোটদার সঙ্গে আমার খুব বনবে, মাষ্টার মশায় কিন্তু আপনি যত শীগ্‌গীর পারেন, ফিরবেন।"

আমি এদের কাছে এত উপকার পেয়েছি যে ছেড়ে যেতে বড় লজ্জা হল। কিন্তু উপায় কি ? এ সময়টা সরলা আমায় সব রকমে বল না দিলে কি করতাম জানি না। রাণীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে সে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এল। সেন মহাশয়ের সঙ্গেও সব পরামর্শ সে-ই করলে। তিনি এলাহাবাদ যেতে বললেন। তাঁর দুচারজন বন্ধুর সঙ্গে পরিচয়ও করে দিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে চলে গেলাম।

আবার নূতন ক'রে ঘর সংসার পাতা হল। সেই থেকে এলাহাবাদেই আছি। ওকালতীতে বেশ পশার হয়েছে। সরলা এখানে এসে অবধি নানারকম দেশের কাজ হাতে নিয়েছে। ১৯২০ সাল হতে সে নেহরু পরিবারের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজে নেমেছে। নিগ্রহও অনেক সহ্য করছে। আমার না আছে বক্তৃতা শক্তি না আছে তেমন উৎসাহ উদ্যম। দেশ নেতাদের তামাক সেজেই আমি তুষ্ট।

চারুচন্দ্র দত্ত

সমাপ্ত

কথা-সাহিত্যে পত্রের প্রভাব

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

শকুন্তলা পত্র লিখিয়া পড়িতেছেন—

তুজ্ঝ ণ আনে হি অঅং, মম উণ মঅণো দিবাবি রত্তিংপি।
নিক্কিব! দাব্রইবলিঅং, তুজ্ঝ হুত্থমণোরহাই অঙ্গাইম্॥

এই অবসরে কবি দুষ্যন্তকে আনিয়া হাজির করিলেন। চমৎকার রসসৃষ্টি। সংস্কৃত সাহিত্যে বহুস্থলে এইরূপ পত্রের প্রয়োগ রসসৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। দেশীয় বিদেশীয় সকল সাহিত্যেই পত্রের অল্পাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার কথাসাহিত্যে পত্রের প্রয়োগ ও প্রভাব একটা আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাংলার ঔপন্যাসিক তাঁহার উপন্যাসে রসের পরিপুষ্টির জন্য পত্রকে নানাভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা কেবল তাহারই আলোচনা করিব।

পত্র মানব মনের নিখুঁত ফটো। কথা সাহিত্যিক তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য অনেকস্থলে পত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। "বিষবৃক্ষে" সূর্য্যমুখীর পত্রকয়টি তাঁহার মনোজগতের ইতিহাস। নগেন্দ্রনাথের কাছে লেখা তাঁহার পত্রে দেখিলাম তিনি স্বামীর প্রতি পূর্ণবিশ্বাসসম্পন্না। তার পর কমলমণির কাছে লেখা তাঁহার প্রথমপত্রে দেখিলাম তাঁহার সে অটল বিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়াছে, দ্বিতীয়ে বুঝিলাম স্বামীর সুখের জন্য তিনি আত্মবলি দিতেছেন, তৃতীয়ে অনুভব করিলাম আত্মত্যাগী হইলেও তিনি মানুষ,—নারী,—তাই তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। নারী-চরিত্রের সুগোপন কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়খানি পত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"মন্ত্রশক্তিতে" যে নববিবাহিতা বাণী বিস্মিতা জননীকে তাচ্ছিল্য ভরে কহিয়াছিল "কে চিঠি লিখ্‌ল না লিখ্‌ল সেই ভাবনায় তো আমার ঘুম হচ্ছে না,—"সে-ই আবার কিছুদিন পরে পিতার টেবিল হইতে অম্বরের পত্রখানা চুরি করিয়া লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিল; অবসর সময়ে বাহির করিয়া বারবার পড়িয়া পত্রখানা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল; আর মুগ্ধনেত্রে লেখার ছাঁদ দেখিতে দেখিতে, নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখে হু হু করিয়া জলও আসিয়া পড়িল। শেষে একদিন "পিতার আদেশে" লজ্জা অপমানের মাথা খাইয়া একখানা পত্রও লিখিল। তারপর যেদিন স্বামীর সেই ভয়ানক "প্রথম ও শেষ" পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বামীর শেষ নিষ্ঠুর "অনুরোধ" ফিরাইয়া লইবার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া পত্র লিখিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—পিতার সহিত ছুটিয়া বাহির হইল।

"চোখের বালি" বিনোদিনীকে গড়িতে রবীন্দ্রনাথকে অনেকগুলি পত্রের সাহায্য লইতে হইয়াছে। প্রথম যখন তাহাকে দেখিলাম তখনই তাহার কামনার তীব্রতা মনটাকে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া গেল। মহেন্দ্র লিখিয়াছিল বন্ধু বিহারীর কাছে চিঠি—নববধূ আশার কথাতেই চিঠি প্রায় ভরা—সেই চিঠি ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া পড়িয়া তাহার দুই চোখ জ্বলিতে লাগিল। মায়ার ফাঁদে পা' দিয়াই সামলাইয়া লইবার জন্য মহেন্দ্র যখন নাইট ডিউটির অজুহাতে দূরে পালাইল—সরলা বালিকা আশার কলমের মুখে চিঠির পরে চিঠিতে নিজের কথা লিখিয়া সে কামনার খাদ্যে মহেন্দ্রকে পাগল করিয়া তুলিল। রাজলক্ষ্মী যখন সব টের পাইয়া গেলেন তাহার পর-ও সে মহেন্দ্রকে তাহার কামনার কথা তাহার তীব্র তৃষ্ণার কথা চিঠিতে জানাইয়া বলিল সে তৃষ্ণা মিটাইবার সম্বল মহেন্দ্রের নাই। কি ভয়ানক! কিন্তু হতভাগিনীর পাপহৃদয়ে দৃঢ়চেতা বিহারীর সংস্পর্শে ধীরে ধীরে সত্যিকার ভালবাসাও যে না জন্মিয়াছিল তাহা নহে—

তাহারও অভিব্যক্তি হইয়াছে দেশ হইতে বিহারীকে লেখা তাহার শেষ পত্রে। বিনোদিনীচরিত্রের এই দিকগুলি পত্রের সাহায্যে যত স্পষ্ট ও জ্বালাময় হইয়া উঠিয়াছে পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ দীর্ঘ বর্ণনায় ততখানি হইয়া উঠিত কিনা সন্দেহ।

"দেবদাসের" বেদনাক্লিষ্ট মনের ছবি আমরা দুইখানি পত্রে দেখিতে পাই। মনোরমা পার্ব্বতীকে লিখিয়াছিল—"সে সোনার বর্ণ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই।—এ যেন আর কেহ।—সমস্তদিন বন্দুক হাতে পাখী মারিয়া বেড়ায়, আর রৌদ্রে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে, বাঁধের সেই কুলগাছটার তলায় মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়া মদ খায়,—রাত্রে ঘুমায় কি ঘুরিয়া বেড়ায় ভগবান জানেন।" আর একখানা পত্রে দেবদাস চন্দ্রমুখীকে লিখিয়াছিল—"বৌ, মনে করেছিলাম আর কখনো ভালবাস্‌বো না। একে তো ভালবেসে শুধু হাতে ফিরে আসাটাই যাতনা; তার পরে আমার ক'রে ভালবাস্‌তে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।"

"দুর্গেশনন্দিনী"তে আয়েষার পত্রে এবং "বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্রের পত্রগুলিতে তাহাদের চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে।

নিরুপমা দেবী "অন্নপূর্ণার মন্দিরে" সতীর চরিত্র তাহার একখানা মাত্র পত্রে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ঘাতপ্রতিঘাতের অভাবে উপন্যাসের আখ্যানভাগ অনেক সময় জমাট বাঁধে না এবং বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। সময় সময় ঔপন্যাসিকগণকে পত্রের সাহায্যে এই ঘাতপ্রতিঘাতের সৃষ্টি করিতে দেখা গিয়াছে।

অনুরূপা দেবীর "মা"তে আমরা পত্রের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাই। রামগিরির নির্ব্বাসিত যক্ষের মত কলিকাতার মেসে অরবিন্দ একাকী পড়িয়া আছে, এমন সময় তাহাকে আনন্দে উৎফুল্ল করিয়া আসিল এক পত্র। বর্দ্ধমান হইতে মনোরমা লিখিয়াছে—"আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কলিকাতা তো দূর নয়—একবারটি আসিবে না কি?"—লুকাইয়া দেখিয়া আসিবার কল্পনায় আনন্দে যখন সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে এমনই সময় হঠাৎ আর এক পত্র আসিয়া হাজির হইল। পিতার পত্র, লিখিয়াছেন, "তোমার পত্নীর সহিত আমি আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। তুমিও আমার আদেশে তাহার সহিত নিজ সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইবে।" অসার নিস্পন্দ অরবিন্দের মনে হইল পিতার পত্রে সে নিজের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছে। পিতার বজ্রতুল্য কঠোর আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল, তাই বর্দ্ধমানের ক্ষুদ্র গৃহকোণে যে সজল আঁখি দুটি পথের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাল কাটাইত তাহার জল আর এ জীবনে শুকাইল না। মৃত্যুঞ্জয়ের এই এক পত্রের আঘাতে অরবিন্দ কাঁদিল, মনোরমা কাঁদিল, অজিত কাঁদিল,—যাহার হাসিবার জন্য ইহা প্রয়োজন সেই ব্রজরাণীও কাঁদিয়া মরিল।

"মন্ত্রশক্তি"তেও পত্রের সাহায্যেই ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"জ্যোতিঃহারা" অনিমা দারুণ অন্তর্বিপ্লবে যখন বহু কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া আপনার মতকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে তখন দেখি প্রবাসী মিহিরের একখানা পত্র কি একটা টেলিগ্রাম আসিয়া তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে।

"চন্দ্রনাথ" যখন স্নেহে, প্রেমে, করুণায় সরযূকে আপনার বুকের কাছে টানিয়া লইতেছে, তখন অকস্মাৎ হরিদয়ালের বজ্রের মত কঠোর পত্রখানি আসিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

"নৌকাডুবি"-র কমলা যখন আপনার সুখের সংসার গুছাইতে ব্যস্ত, সেই সময় কোথা হইতে এক পত্র আসিয়া তাহাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

কোন কোন সময়ে দেখা যায় ঔপন্যাসিক একখানি পত্রের সাহায্যে একটী ক্ষুদ্র ঘটনার অবতারণা করিয়া পুস্তকের মূল রসকে পরিপুষ্ট করিয়া লন। ইহাতে আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব আরও বাড়িয়া যায়।

"বাগদত্তা"য় কি কাণ্ডটাই হইল! গৌরী সত্যকে চিঠিতে লিখিয়াছিল তাহার মেনীর দুইটি বাচ্চা হইয়াছে; সত্য যেন শীঘ্র ফিরিয়া যায় নহিলে গৌরী বড় রাগ করিবে, কাঁদিবে, তাহার সঙ্গে আড়ি করিবে ইত্যাদি। কমলা ইহা লইয়া সত্যকে ঠাট্টা করিতেছিল। বলিতেছিল, গৌরী যেন সত্যর কনের মত চিঠি লিখিয়াছে। সত্যই বা ছাড়িবে কেন, সে-ও তৎক্ষণাৎ ভ্রূশুদ্ধ চোখ টানিয়া কহিল "তুমি বুঝি দাদাকে এমনি চিঠি লিখ? তুমি ত' দাদার কনে।"

—শুনিয়া লজ্জায় কমলা যতই সত্যকে চুপ করাইতে যায় ততই যেন ছেলেমানুষ সত্য আরও পাইয়া বসে। কমলার সহিত মনীশের সম্বন্ধের কথা সত্য বাড়ীতে শুনিয়াছিল, কমলারও যে কানে আসে নাই তাহা নহে। কিন্তু সত্য যখন নিষেধ না মানিয়া বারে বারে অমন করিয়া কহিতে লাগিল তখন লজ্জায়, আরক্তমুখে সে আততায়ীর দৃষ্টি হইতে লুকাইবার জন্য পাশের দ্বার ঠেলিয়া যে ঘরে প্রবেশ করিল সেখানে বসিয়াছিল মনীশ। কমলা তাহাকে প্রথমে লক্ষ্য করে নাই—তারপর যখন সঙ্কুচিত মনীশের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল তখন সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে চাহিল। কম্পিত-দেহে চকিতে ফিরিতে গিয়া হোঁচট লাগিয়া পতনোন্মুখ হইয়া কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইল। মনীশেরও যে ভাবান্তর না হইয়াছিল তাহা নহে। সত্যর কথাটা তাহারও কানে গিয়াছিল, তাহা ছাড়া অধ্যাপক উমাকান্তের পূর্ব্বাহ্ণের কথাগুলিও মনে তোলপাড় করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ততক্ষণে নারীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কি সুন্দর অনবদ্য চিত্র! কয়টি মুহূর্ত্তেরই বা—কিন্তু ইহারই ফলে উদাসীন মনীশের বুকে জাগিল প্রেম, আর কিশোরী কমলার মনে পড়িল মনীশের ছায়া। পুস্তকের শেষ পর্য্যন্ত এই দুইটি ধারা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের মূলে রহিয়াছে গৌরীর সেই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর পত্রখানি।

অনেক সময় দেখা যায় পত্রের প্রভাবে ঘটনা হঠাৎ অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ ভ্রমরের পত্র ঘটনাকে এক ধাক্কায় কতদূর লইয়া গিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। গ্রন্থকার আমাদিগকে বলিয়াছেন গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র ছিল, আর সে তৃষ্ণা ভ্রমর হইতে নিবারিত হয় নাই। তাই রোহিণী যখন তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপরাশি লইয়া গোবিন্দলালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ভ্রমরের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ সাংঘাতিক আঘাতের মত ভ্রমরের পত্রখানি যেমনই আসিয়া উপস্থিত হইল তিনি আর পারিলেন না,—পঙ্কিলতার স্রোতে অতি দ্রুত ভাসিয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্রের "রাজপুতজীবন সন্ধ্যা" এবং বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ"-এ আমরা দেখিয়াছি কবি পৃথিরাজ এবং বিক্রমসোলাঙ্কি ও চঞ্চলকুমারীর পত্রের পর হইতে ঘটনা ভিন্ন পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

উপন্যাসকে দ্রুতগতিতে পূর্ণ পরিণতিতে লইয়া যাইবার জন্য অনেকস্থলে পত্রের ব্যবহার হইয়াছে।

প্রকৃতির অংশভূতা "কপালকুণ্ডলা"কে প্রকৃতির গর্ভে বিলীন করিয়া দিবার জন্য সংসারী নবকুমারের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রয়োজন হইল; আর সে প্রয়োজন সাধন করিল "ব্রাহ্মণবেশী"র পত্র। পত্রখানির অবতারণা না হইলে নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে অবিশ্বাস করিতেন না, বনের পাখী খাঁচাতে থাকিয়া থাকিয়া উহাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িত, ফলে আখ্যায়িকার সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য, চমৎকারিত্ব একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত।

"মন্ত্রশক্তি"তে অম্বরের শেষ পত্র বাণী ও অম্বরকে একত্র টানিয়া আনিল। আরও দুইখানি পত্রের উল্লেখ আমরা এই উপন্যাসখানিতে পাই।—দুইখানির কোনখানিই ডাকে দেওয়া হয় নাই—একখানা মুমূর্ষু অম্বরের পকেটে ছিল আর একখানা বাণী লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের যে কোনও একখানি যদি কিছুকাল আগে আত্মপ্রকাশ করিত তাহা হইলে বইখানার শেষদিকটা একেবারে বদলাইয়া যাইত। মন্ত্রের শক্তিও ভালভাবে দেখান হইত না, গল্পটির প্রভাবও এত অসাধারণ এবং মর্ম্মস্পর্শী হইত না।

হেমনলিনীর কাছে সমস্ত খুলিয়া জানাইয়া বিদায় লইবার জন্য কলিকাতায় বসিয়া রমেশ যে পত্রখানি লিখিয়াছিল তাহা যদি ঘটনাচক্রে কমলার হাতে না পড়িত তবে কমলার উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইত এবং "নৌকাডুবি" উপন্যাসটি সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। কাশীতে যাইয়া হেমনলিনীকে সত্য ঘটনা জানাইয়া রমেশ যে দ্বিতীয় পত্র লিখিয়াছিল তাহাতেই নলিনাক্ষ কমলাকে আপনার পত্নী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিল। তাহারই ফলে পুস্তকের শেষ উদ্দেশ্যও অতি সহজে সফলভাবে সংসাধিত হইয়া গেল।

"গোরা"তে কন্যার বিবাহে সম্মতি দিয়া পরেশবাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন পুস্তকের প্রতিপাদ্য নীতি ও ধর্ম্ম

তাহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বিনয় এবং ললিতা, গোরা এবং সুচরিতা সম্মিলিত হইতে পারিল।

"মাধবীকঙ্কণে" জেলেখার পত্রদ্বারা পূর্ব্বঘটনা পরিষ্কার হইয়াছে এবং উহার সাহায্যে রমেশচন্দ্র নরেন্দ্র এবং হেমনলিনীর শেষ সাক্ষাৎ (শেষই বলিব) ঘটাইয়া আখ্যায়িকা শেষ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

মৃত দেবদাসের পকেটের চিঠি দুইখানি না পাওয়া গেলে শবদেহ সনাক্ত করা কঠিন হইত। পার্ব্বতী "দেবদাসের" শেষগতি জানিতে পারিত না—গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত।

বনমালীর পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর "দস্যু" বিজয়া এবং নরেন্দ্রের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে রাসবিহারীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উহাদের মিলন ঘটান অনেক সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

এ প্রবন্ধে আমরা শুধু বাংলার কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথাসাহিত্য লইয়া আলোচনা করিলাম। তৎকালীন অন্যান্য উপন্যাসেও বহু উল্লেখযোগ্য পত্র আছে, বাহুল্য ভয়ে সেইগুলির আলোচনা করা হইল না। অত্যাধুনিক কথাসাহিত্যেও পত্রের প্রভাব কম নহে। বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

ব্যথার মায়া

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

কোন্ বেদনার মায়ায় ওগো,
ক'রলে পরশ মোরে!
হৃদয় আমার ব্যথার সুরে
উঠ্‌লো রে আজ ভ'রে।

ঘর-ছাড়া ওই পথের পানে
কোন্ সুদূরে মন-যে টানে;
ভোলা-দিনের জাগ্‌লো স্মৃতি
পরাণ আকুল ক'রে।

ওগো, তোমার পূজার তরে
তুলেছিলেম ফুল,—
ফুল শুকালো, হয়না পূজা,
হৃদয়-ব্যাকুল।

মেলে' আমার সজল-আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি।
পূজা আমার শেষ হবে কি
শুধু নয়ন-লোরে!

মানবের শত্রু নারী

শ্রীসুবোধ বসু

ছয়

পূজা আসিয়া পড়িল। বাতাসে বাতাসে শানাই আর ঢোলের শব্দ ভাসিয়া আসে। বিস্তর নতুন জামা-কাপড় কেনা হয়। হাসি উঠে, আনন্দ-চীৎকার শোনা যায়। অনেক ছাগ-শিশু আর্ত্তনাদ করিয়া মরে!

এর মধ্যে একদিন বিকাল বেলা অরুণাংশু বারোয়ারী পূজার প্রতিমা দেখিয়া আসিবে ভাবিয়া নীচে নামিল। অবশ্য স্বামী প্রস্তরানন্দ মা কালীকেই বেশী রকম শ্রদ্ধা করিয়াছে, তবু কিন্তু কাউকেই অশ্রদ্ধা 'দেখান ঠিক নয়।

নীচে মায়ের সাথে দেখা। তিনি কহিলেন, যাচ্ছিস্ কোথায়? খেয়ে যাবি না?

অরুণাংশু দেবীদর্শনে যাইতেছে। পথের মাঝে এ কী বাধা। দেবী দেখিতে যাইতেছে,—তার আবার ক্ষিধার কথা মনে থাকা উচিত নাকি!

সংক্ষেপে কহিল, ক্ষিধে নেই।

মা কহিলেন, বলিস্ কিরে। দুপুরেই তো ক্ষিধে পেয়েছে বলেছিলি।

আঃ জ্বালাতন করিল!

অরুণাংশু কহিল, মোটেই ক্ষিধে নেই,—কম খেয়েছিলুম নাকি দুপুরে?

পার্ব্বতী দেবী কহিলেন, এই রে পাগল! কোথায় তাড়াতাড়ি যাবার ঠেকা পড়েছে, অম্‌নি আর ক্ষিধে তেষ্টা জ্ঞান নেই। যাক্, আর কিছু না হোক্, এক কাপ্ দুধ খেয়ে যা। দুধ খাইয়া যাইবে? তার চেয়ে খানিকটা আফিঙ্ গুলিয়া খাইতে বলিলে ক্ষতিটা ছিল কি!

কহিল, দুধ!

হ্যাঁ।

দুধ কে খাবে? আমি? দুধ খাব, আমি বাছুর নাকি?

যা যা, দুধ না খেলে আবার গায়ে জোর হয় কখনো,—দুধ খারেন না!

প্রত্যুত্তরে অরুণাংশু পাঞ্জাবির হাতাটা গুটাইয়া হাতের মাংসপেশীটা ফুলাইয়া দেখাইয়া দিল।

মা কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে!

অরুণাংশু যদিও কিছুতেই দুধ খাইল না, কিন্তু মা'র হাতে যখন পড়িয়াছে তখন কিছু না খাইয়া আর উপায় কি। মা'রা তো আর সাইকোলজি বোঝে না, মন যখন ছুটিয়া চলিয়াছে তখন অবিচারে দেহটা আটকাইয়া ধরে। এই জন্যই তো স্বামী প্রস্তরানন্দ স্নেহের বাগুড়াও এড়াইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অরুণাংশুর যে ক্ষিধা নাই এমন মোটেই মনে হইল না। যে রকম ভাবে সে খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল তাতে পার্ব্বতী দেবীর আর কোনো আক্ষেপই রহিল না। শুধু দুধটার ওর বিতস্পৃহা,—এই যা!

এই পর্য্যন্ত বেশ চলিতেছিল। খাবারগুলি সুস্বাদু, আর,—যাক্ সে কথা। ঘটনাটা চমৎকার মিলের একটা কবিতার মত চলিতেছিল। কিন্তু অরুণাংশুর ভাগ্যে সুখ নাই,—কাকে আর দোষ দেওয়া যায়।

অকস্মাৎ মা কহিলেন, ওদের কিন্তু আমি কথা দিয়ে ফেলছি, অরুণ!

অরুণাংশুর চোখ দুটী বিস্ফারিত। এ আবার কী কথা, ওদেরই বা কাদের, এবং কথাই বা কী কথা। একটা গল্পের আগা জানা নাই, শেষ জানা নাই, মাঝখানা হইতে একটা বাক্য উঠাইয়া দিয়া তাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হইল,—এ প্রায় সেই রকমই। সে সবিস্ময়ে কহিল, কি?

প্রসন্নবাবুকে আমরা কথা দিচ্ছি। সুজাতাকে আমরা বউ করে আন্‌ব।

বউ ক'রে আন্‌বে!

প্রথমটা অরুণাংশু বুঝিতেই পারিল না সুজাতাকে বউ করিয়া আনিবার প্রস্তাবের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক,—এমনি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা ভাবিয়া তার তো চক্ষু স্থির!

মা কহিলেন, অনেকদিন ধরে' ওরা অপেক্ষা করে আছেন,—এইবার একটা পাকাপাকি কথা না বল্‌লে চলবে না।

অরুণাংশু চাহিয়া কহিল, তোমরা কি করতে চাও! শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাকে?

মা কহিলেন, কথা শোন ছেলের।

অরুণাংশুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না ব্যাপারটা এত দিন ধরিয়া কি হইয়াছে। এবং প্রায় রোজই মা যে বিয়ের কথা বলিয়া তার হাড় জ্বালাইয়াছেন তার লক্ষ্যটা কোথায়। সর্ব্বনাশের কথা বলে! বিবাহ করিবে সে? এতদিন স্বামী প্রস্তরানন্দ প্রণীত 'মানবের শত্রু নারী' পড়িয়াছে না? তবে!—তবে আর কি। নারী বিষধর সর্প, নারী নরকের দ্বার এবং তাড়কা রাক্ষসীর সগোত্রা।

গম্ভীরস্বরে সে কহিল, ওসব মতলোব ছেড়ে দাও।

মা কহিলেন, পাগ্‌লামী করিস্ নে,—ও ঠাট্টার কথা নয়। ঐ পাশের ঐ জমিদার বাড়ি দেখিস না,—অল্পবয়স জমিদারের। সেই তো সুজাতাকে বিয়ে করতে চায়। আমরা কথা না দিলে হয়ত ওখানেও ওরা করতে পারে।

চটিয়া অরুণাংশু কহিল, করুক না, না করছে কে। বিয়ে! আমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি!

আর কথা নয়। নেহাৎ বীতশ্রদ্ধ হইয়া অরুণাংশু উঠিয়া গেল। ডাকুক গিয়া মা,—কে শোনে মেয়ে মানুষের কথা! পৃথিবীতে আর লোক নাই, বিয়ে করিবে সে। এতকাল তবে পড়িল কি! নিতান্ত যারা মূর্খ তারাই বিবাহ করিয়া মরে! এত জানিয়া শুনিয়াও অরুণাংশু বোকামি করিবে নাকি!

যখন বাহিরে আসিল তখন চারিদিকে ছায়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা হইবার আর দেরী নাই। রাস্তার পাশের গাছগুলিতে নীড়-ফেরা পাখীদের কলরব সুরু হইয়াছে। মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক বক উড়িয়া গেল।

অরুণাংশুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। প্রতিমা দেখিতে যাইবে সে কথা ও ভুলিয়াই গেল। সমুখের ছায়া-আঁকা পথটা দিয়া যাত্রা সুরু করিল। কোন উদ্দেশ্য নাই,—হাঁটিয়া হাঁটিয়া কোনখানে পৌছিলেই হইল। না পৌছিলেও কোন আপত্তি নাই।

প্রসন্নবাবুর বাড়ির কাছে পৌছিলেই অরুণাংশু শুনিল উপরতলা হইতে একটা গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। কার গান তা অরুণাংশুরও বুঝিয়া নিতে বিলম্ব হয় না। ঐ দিকের নারকেল-বনে এক টুক্‌রা চাঁদ উঁকি দিতেছে। কৃষ্ণচূড়াগাছের পাতাগুলি ঝিলমিল করে। সুজাতার গানের পদগুলি স্পষ্ট হইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া যেন পথের ধারের সবুজ ঘাসে আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। এসব আর অরুণাংশু সহ্য করিতে পারে না,—অত্যন্ত বিরাগজনক কাণ্ডকারখানা!

ডবল জোরে পা ফেলিয়া অরুণাংশু বাড়িটা পার হইয়া আসিল।

তারপরই সেই জমিদার-বাড়ি। কোথাকার জমিদার, কতটা জমির, এবং তার আয় কত সে সব অরুণাংশু কিছুই জানে না। তবে জমিদার-ছোক্‌রার মুখ সে চেনে। বৎসরখানিক আগে ওকে অরুণাংশু প্রায়ই দেখিত,—বিশ্রীরুচির চুল ছাঁটা, ফিনফিনে কাপড় পরা, সারাক্ষণ সাইকেল চড়িয়া টো-টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এক বছরের পর বাপ মারা যাওয়াতে ও নিজেই যে জমিদার হইয়া বসিবে তা অরুণাংশু এখানে আসিয়া মাত্র শুনিয়াছে। জমিদার বলিলেই কেন জানি অরুণাংশুর মনে হয়,—ইয়া মোটা দেখিতে, ভুঁড়ির পরিধি ঢাকিতে গেলে কোঁচার কাপড় আর অবশিষ্ট থাকে না, এবং তায় মস্ত লম্বা একটা গোঁফ।

অমনিই না এ সব ভাবিয়া অরুণাংশু ওদিকে তাকাইয়াছিল জানা নাই। চাহিয়া দেখিল বাড়ির এক-

দিককার ব্যাল্‌কোনিতে সেই ছোক্‌রা জমিদার দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ঠিক দাঁড়ানও নয়। প্রসন্নবাবুর বাড়ির জান্‌লার দিকে মানুষটা এমনি হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং এতটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে পড়িয়া না যায়!

অরুণাংশু একবার চাহিয়া দেখিয়াই সবিরক্তিতে চোখ ফিরাইল। গান তো অনেকেই শোনে, তাতে ঐ রকম হাঁ করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িবার কোন্‌ প্রয়োজন। তাছাড়া মেয়েরা ঘরে বসিয়া গাহিতে থাকিলে ভদ্রলোকে ঐ রকম করে নাকি?

অরুণাংশু আগাইয়া চলিল। অকস্মাৎ তার মনে পড়িল মায়ের কথা। ঐ জমিদার ছোক্‌রাই নাকি সুজাতাকে বিয়ে করিতে চাহিতেছে! বিচিত্র নয়,—জমিদাররা বোকাই হয়! নইলে আর বিয়ে করিতে চাহিবে কেন! কিন্তু বিয়ে করিতে চাহিতেছে বলিয়াই বুঝি অম্‌নি করিয়া জান্‌লা দিয়া উঁকি দিতে হইবে,—তা ওদিকের জানলাটা জমিদার বাড়ির উপর আর ছোট্ট বারান্দাটুকুর খুব কাছে নাই বা হইল। আর সন্দেহ নাই, ঐ ছোক্‌রাই সুজাতাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। তা ঐ রকম হাবাগবা মানুষ বিয়ে করিবে না তো বিয়ে করিবে কে! কিন্তু সুজাতাকে বিয়ে করিতেই ওর সখ গেল কেন কে জানে! কিন্তু ঐ রকম ভাবে তাকাইয়া থাকা?—ভারী বিশ্রী!

সারা সহরে ফাঁকা চুপচাপ্‌ জায়গা খুঁজিয়া না পাইয়া অরুণাংশু রেল লাইনের ধারে আসিয়া উপস্থিত।

কদমগাছটার ভিতর দিয়া সপ্তমীর চাঁদটাকে দেখা যাইতেছে। দূরে ডিস্‌ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌ন্যালের এদিক হইতে শুধু মাত্র নীল আলোটাই চোখে পড়ে।

একটু হাওয়া আসে।

পূজা-বাড়ি হইতে বাদ্যের শব্দ আসে। আকাশের বুকে একটা হাউই তার বিচিত্র রঙের ক্ষণিক আল্পনা আঁকিয়া দিল।

লাইন-পাশের হিমে ভিজা ঘাসের উপর দিয়া অরুণাংশু আগাইয়া চলিল। কে জানে এখানে সাপ আছে কি না! বাস্‌রে, ব্যাণ্ডের যা কনসার্ট শুরু হইয়াছে। রাত্রি দশটার আগে সে বাড়ি ফিরিবে না! বেশ তো পাথরগুলি জ্যোৎস্নায় চকচক করে। বিশ্রী একটা গন্ধ আসিতেছে না? দূর, মন্দ কি, এটা হয়ত কোন বুনোফুলের গন্ধ হইবে। আকাশের ঐখান হইতে একটা উল্কা ছুটিয়া পড়িল। মাটী অবধি পৌঁছুবে কিনা কে জানে! বাস্‌রে, কি উচু তালগাছ ছুটো,—মস্ত ছুটো কালির পোঁছ মনে হয়। আর,—

কী অসভ্য ঐ ছোক্‌রাটা! অমন করিয়া সে সুজাতার ঘরের দিকে তাকাইয়া থাকিবে কেন? কান টানিয়া দিলে রাগ মেটে! আদেখলা কোথাকার! ঈস্‌ ভারী সে জমিদার! ক'টাকা আয় হয়? আহা, কী চমৎকারই না ওকে দেখতে!

আঃ, সুন্দর হাওয়া আসিতেছে। বাঃ রে, এখনই বুঝি বাড়ি ফিরিবে! তাছাড়া মাথাটা মিছিমিছিই গরম হইয়া উঠিল,—দূরের গ্রামটাকে জ্যোৎস্নার কৃপায় এখান হইতে ছায়াছবির মত দেখায়!

অরুণাংশু শুধু হাঁটিয়াই চলিল।

জ্যোৎস্না, পাতার স্পন্দন, ছায়ার টুক্‌রা অনেক কিছু চোখে পড়িল। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা,—ঐ জমিদার ছোক্‌রা অমন করিয়া তাকাইয়া থাকিবে কেন! কী অধিকার আছে ওর!

যে-পথ দিয়া অরুণাংশু গিয়াছিল সে পথ দিয়াই সে ফিরিয়া আসিল। ও রাস্তাটা সহরের একটা প্রান্তে। এরই মধ্যে লোক চলাচল কমিয়া আসিয়াছে। এমন কি প্রায় নাই বলিলেই চলে।

কী আশ্চর্য্য, সুজাতা গান গাহিতেছে নাকি এখনো। সমস্ত নিস্তব্ধতায় মৃদু গানের আল্পনা এখান হইতেই টের পাওয়া যাইতেছে। এই তো জমিদার বাড়ী,—যাক্‌ ছোক্‌রাটা আর এখন পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া নাই। নইলে অসভ্যটাকে হয়ত একটা ঢিলই ছুঁড়িয়া মারিতে হইত। ঠিক, আর ভুল নাই, গানই বটে। মেয়েগুলো আদত জানোয়ার,—এতক্ষণ ধরিয়া মাথা সুস্থ থাকিলে কেউ সমানে চেঁচাতে পারে না! চমৎকার বই স্বামী প্রজ্ঞা-

নন্দের 'মানবের শত্রু নারী'। যেমনটি তিনি যা বলিয়াছেন, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সটান্‌ মিলিয়া যাইতেছে! দূর্‌, অত চম্‌কাইয়া উঠিল কেন, সাপ না মোটেই। শুধু মাত্র একটা পাটের দড়ি!

উপরতলার যে-ঘর হইতে সুজাতার গান ভাসিয়া আসিতেছিল তার নীচেকার রাস্তায় আসিয়া কিন্তু অরুণাংশু সহসা চমকাইয়া উঠিল। ঘুরিতেছে কে রাস্তার এখানে? চেনা চেনাই মনে হয় যেন।

অরেকটু আগায় সে। তারপরই,—আরে এ.যে সেই ব্যাগকনির তরুণ জমিদার! এক মুহূর্ত্তে অরুণাংশুর মাথায় আগুন দপ্‌ করিয়া উঠিল। কী চায় এটা এখানে? ফাজলামির আর জায়গা পায় না! এর নির্ল্লজ্জতা অসহনীয়,—দিবে নাকি নাকের উপর একখানা তাজা ঘুষি লাগাইয়া।

কী যে অরুণাংশু করিয়া বসিত কে জানে। কিন্তু এমন সময় এক দম্‌কা ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া ওঁর বুদ্ধি ফিরাইয়া দিল। চমকিয়া উঠিয়া নিজেই ভাবিল, এ সে করিতে বসিয়াছিল কি? মাথা খারাপ না হইলে এমন কল্পনাও করিতে পারে নাকি কেউ! ছোক্‌রা এখানে ঘুরিতেছে তো তার কি! সরকারী রাস্তায়,—এখানে যায় খুসী পায়চারি করিবে,—এতে তার আপত্তি করার কোন্‌ অধিকার! তাছাড়া এই ছোক্‌রার সাথেই তো ও-বাড়ির ঐ মেয়েটার বিয়ের কথা চলিতেছে,—না ঐ রকমই কি মা বলিল। এ অবস্থায় তার নিজের মাথা গলাইতে যাওয়াই তো বোকামী হইত! হয়ত ক'দিন পরেই এই ছেলেটা এ-বাড়ির জামাই হইয়া জাঁকাইয়া বসিবে। আর অরুণাংশু কোথাকার কে!

অরুণাংশু ছেলেটার পাশ দিয়া আগাইয়া আসিল। একবার বাঁকা চোখে বিরক্ত ভাবে চাহিয়াও দেখিয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আর কোনো দিকে সে চাহিল না,—এবং যখন সিমেণ্টে পা পড়িল তখন দেখিল এ তাদের বাড়ির সিঁড়ি।

সুবোধ বসু

গজল

ক্ষুব্ধ-হিয়ার পাষাণ-তলে বইছে ব্যথার ফল্গু-ধারা
রুদ্ধ আমার বুকের জ্বালা নয়ন আমার অশ্রু-হারা
সবাই দেয়গো ফণির জ্বালা দেয়না কেহই মণির মালা
হৃদয়-দ্বারে তাইগো তালা কেউ না জানে শান্তিহারা
তাজমহলের বুকের মাঝে কি যে বেদন-বেহাগ বাজে
কেউ না বোঝে—মরি লাজে—সবাই দেখে পাষাণ-কারা
কাঁটার ডালে গোলাপ ফোটে ভোঁম্‌রা বঁধু মধু লোটে
সুবাস ল'য়ে সমীর ছোটে গোলাব শুধুই তন্দ্রা-হারা
চিত্ত-চকোর নিশীথে কাঁদে নিরব ভাষায় ডাকে চাঁদে
চাঁদ না ধরা দেয়গো কাঁদে তাইতো হাসে উষার তারা
গহীন রাতে গহন বনে বিভোর হয়ে আপন মনে
বাজাই বাঁশী কেউনা শোনে নিজেই শুধু পাগল-পারা
শোন্‌রে কবি মনের রাজা বেহাগ সুরে সানাই বাজা
শারাব পিয়ো হও গো তাজা নেশায় মত্তক চিত্ত-সারা

—এম, আনোয়ারা বেগম

আদিকথা

বহু কোটী বহু বর্ষ আগে, জন্মে নাই মোদের ধরণী,
জন্মে নাই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নিময় জ্যোতিষ্কের দল—
তোমাতে আমাতে দেখা,—রাগরক্ত অপূর্ব্ব কাহিনী;
সৃষ্টির অব্যক্ত ব্যথা যৌবনের তরঙ্গ চঞ্চল।
নীহারিকা মৃত্যুহিম, ঘনকৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত আঁধার,
আলোকের অন্ধচক্ষু, শুনিনা ত প্রাণের স্পন্দন—
তুমি এলে মৃদুহাস্যে মথি নীল বিষ পারাবার,
জন্ম নিল তৃণতরু প্রাণ-দীপ হ'ল প্রজ্বলন।
তুমি আমি ভালবাসি, সর্ব্বোত্তম এই আদিকথা—
স্বর্গ নয়, সুধা নয়, পাপ পুণ্য, জীবন মরণ;
বিস্মরণী বিশ্বতীরে রত্নদীপ চিরস্থায়ী গাঁথা,
তুমি মাত্র সত্য এক প্রাণময়ী অম্লান বদন।
গোলাপ, রজনীগন্ধা, পারিজাত নহে গো সুন্দর,
তুমি একা মহীয়সী নিখিলের সৌন্দর্য্য-নির্ঝর।

শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য

দেশের কথা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাংলাদেশে লাইব্রেরী আন্দোলন

বাংলাদেশে লাইব্রেরী আন্দোলনকে সুপরিচালিত ও শক্তিশালী করিবার জন্য গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বাংলার লাইব্রেরী কর্ম্মীদের একসভায় একটি প্রাদেশিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। বাংলার অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ইহার সদস্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত টি-সি-দত্ত ইঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বাংলার পাঠাগারগুলিকে আহ্বান করিয়াছেন। আশা করা যায় পাঠাগারগুলির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইবেন।

বাংলাদেশে যে আন্দোলনকেই আমরা সফল করিয়া তুলিতে চাই, তাহার জন্য সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে পল্লীর কথা মনে করিতে হইবে। সহর আমাদের কাহারও কাহারও পক্ষে কর্ম্মভূমি হইলেও, অধিকাংশের পক্ষেই আজও বাসভূমি হইয়া উঠিতে পারে নাই। সহরের আন্দোলন সমাজকে আঘাত করে বটে, এবং সেখান হইতেই দেশের অভ্যন্তরে ও বিভিন্ন প্রান্তে চিন্তা ও ভাব-ধারা বিস্তৃত হয় সত্য, কিন্তু, তাহা হইলেও, টবের গাছের শিকড় যেমন মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সহরের আন্দোলনও তেমনি সমাজের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে অথবা তাহার প্রগতির ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। লাইব্রেরী আন্দোলন সম্পর্কেও এই কথা সম্পূর্ণভাবে সত্য।

আমরা যে-কোনও প্রচেষ্টাই করিতে যাই, তাহার পশ্চাতে যদি পরিশীলন মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং সুপরিপুষ্ট জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, সেই প্রচেষ্টা কখনই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না, এবং কল্যাণের পথেও চলিতে পারিবে না। এইজন্য অন্য সকল প্রচেষ্টারও পূর্ব্বে, আমাদের বড় বড় পল্লীতে চিন্তা ও জ্ঞানের কেন্দ্রসকল গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাধারণ লোকে এই প্রকার কার্য্যের যতই কম মূল্য দান করুক, জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পক্ষে, তাহার শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হইবে।

আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, এবং স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ সংস্কার চেষ্টা, কতকদূর অগ্রসর হইয়া যে, স্থগিতগতি হইয়া যায়, তাহার প্রধান কারণ, আমাদের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া পল্লীবাসী জনসাধারণের অশিক্ষা এবং নূতন জিনিসকে বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজের সাহায্যে এই অশিক্ষা দূর করা সম্ভব হইলেও, সহজ হইবে না এবং অত্যন্ত অধিক সময় সাপেক্ষ ত নিশ্চয়ই হইবে। অবিলম্বেই যদি বিদ্যালয়ের সাহায্যে সকলের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেও, তাহার ফলের জন্য এখনও অন্ততঃ ১৫ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। অথচ, পাঠাগারগুলির সহিত এমন ব্যবস্থা রাখা অনেকটা সহজ হইবে, যাহার সাহায্যে নিরক্ষর পূর্ণবয়স্কদেরও নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা যাইবে।

আমাদের দেশে যে-সকল লোক প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকেই কোনও প্রকার চর্চ্চার সুযোগ ও উৎসাহের অভাবে পুনরায় নিরক্ষর হইয়া পড়েন।

যে-সকল লোক কোনও প্রকারে নিজেদের আক্ষরিক জ্ঞান বজায় রাখিতে পারেন, তাঁহাদেরও সেই জ্ঞান সমাজের বা জাতির কোনও প্রকার কাজে আসে না। কোনও লোক একখানা পত্র লিখিতে বা পড়িতে পারিল কিনা, অথবা কোনও প্রকারে নিজের জমাখরচটা লিখিতে বা বাজারের হিসাবটা করিতে পারিল কিনা, জাতির উন্নতিকামীদের নিকট তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। বিদ্যার উচ্চস্তরে লব্ধজ্ঞান

যাহাতে সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবেশ করিতে পারে, জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলি, এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপার সমূহ কতকটা বুঝিবার মত জ্ঞান যাহাতে জন্মে এবং এসকল বিষয়ে নিজেদের বুদ্ধি পরিচালনা করিবার কিছু ক্ষমতা অন্ততঃ যাহাতে হয়, তাহার জন্যই প্রাথমিক শিক্ষাকে আমরা এত প্রয়োজনীয় মনে করি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং অল্প শিক্ষিতেরা যাহাতে নিরক্ষর হইয়া না পড়েন, তাহার জন্য, বাছিয়া বাছিয়া বড় ও শিক্ষিত পল্লীসমূহে লাইব্রেরী স্থাপন ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি সম্প্রসারণের দ্বারা যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে পড়িবার ও জানিবার ইচ্ছা জাগ্রত হয় ও সে ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার মত সুযোগের অভাব না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যাঁহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিক সংখ্যক লোকের অনুসন্ধিৎসা, কৌতুহল এবং মানসিক তৎপরতা নাই। শিক্ষিত লোকের পক্ষে বুদ্ধি ও মনের নিশ্চেষ্টতা সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৈন্য ও জড়ত্বের পরিচায়ক। ইঁহাদের মধ্য হইতে এই জড়ত্ব দূর করিতে পারিলে, নানা দিক দিয়া দেশের অনেক লাভ হইবার আশা করা যাইতে পারে। এই কার্য্যের জন্যও পাঠাগারের উপযোগিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

দেশের সর্ব্বত্র ছোট ছোট অনেক গ্রন্থাগার ছড়াইয়া আছে। আসলে এগুলির অবস্থা এমন নহে যাহাতে এগুলিকে গ্রন্থাগার বলা যাইতে পারে, অথবা ইহাদের দ্বারা কোনও প্রকারের ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ইহাদের অধিকাংশগুলির পশ্চাতে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত কর্ম্মশক্তি বা আবশ্যকানুযায়ী অর্থশক্তি নাই। কিন্তু, ইহার প্রত্যেকটির পশ্চাতেই এমন ২।১ জন করিয়া লোক আছেন, যাঁহাদের এই কার্য্যে আগ্রহ আছে এবং প্রয়োজন হইলে ইহার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই কার্য্যের জন্য প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোকই সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ইহাদের সহযোগিতায় দেশময় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া, তাহার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তারের কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। বঙ্গীয় লাইব্রেরী সম্মিলনকে এই দিকে দৃষ্টি দিতে আমরা অনুরোধ করি।

এ বিষয়ে মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির কর্ত্তব্য

এই সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, তাহাকে সাহায্য দান এবং তাহা সুপরিচালনার ব্যবস্থা করা, ইঁহাদের কর্ম্মতালিকাভুক্ত অন্যান্য কাজের ন্যায় সমানই প্রয়োজনীয়, সে কথা এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনে করেন না। ইঁহাদের একথা মনে না রাখিবার কারণ, ইহার অনুকূলে এখনও কোনও জনমত গঠিত হয় নাই। সাধারণের মধ্যে ইহার জন্য যদি আগ্রহ থাকিত তাহা হইলে এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকা, আংশিক দায়িত্ব ও আত্মকর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন কোনও অর্দ্ধসরকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু, এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে-সকল প্রগতিকামী, প্রভাবশালী এবং উচ্চশিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে গতানুগতিক কর্ম্মতালিকা অনুসরণের অতিরিক্ত কিছু আশা করিতে পারে (জনমতের চাপ ব্যতীতও)। দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী যে-সকল লোকের হাতে ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আছে, তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের অশিক্ষা এবং মানসিক জড়ত্ব দূর করাই সকল উন্নতির গোড়ার কথা।

মিউনিসিপ্যালিটিগুলির গত পরিচালন বিবরণে প্রকাশ যে বাংলার সকল মিউনিসিপ্যালিটির লাইব্রেরীতে সাহায্যের মোট পরিমাণ মাত্র ১৮ হাজার টাকা। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মোট ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গেলেও, লাইব্রেরীর জন্য সাহায্য ১০ হাজার টাকা কমিয়া গিয়াছে। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের এই আগ্রহের অভাব বিশেষ শোচনীয়।

জেলাবোর্ড এবং ইউনিয়নবোর্ডগুলির এ সম্বন্ধে মনোভাব আরও অনেক অধিক নিন্দনীয়। ইঁহারা প্রাথমিক বিদ্যাবিস্তারের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাকে কিভাবে পুষ্ট করিতে পারিলে, তবে, তাহা কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। কাজেই, তাহার কোনও ব্যবস্থা না রাখিয়া শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাইবার জন্য যে অর্থব্যয় করা হয় তাহা অনেকটা নিষ্ফল হইয়া যায়। জেলা ও ইউনিয়নবোর্ডগুলি যাহাতে

তাঁহাদের আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ লাইব্রেরীর জন্ম ব্যয় করিতে বাধ্য হন, এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এদিক দিয়া যে বিশেষ কোনও সুবিধা হইবে, এরূপ মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝিবার জন্যও বাংলা শিক্ষা করা উচিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল ব্যানার্জ্জী, পাটনা কলেজে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কবিতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতায়, রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান দার্শনিক কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন এবং বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্ত প্রদেশে, এশিয়ার অন্যান্ত দেশে, এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তাঁহার কবিতা যে মর্য্যাদা পাইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অন্ত কোনও কারণ না থাকিলেও, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা উপলব্ধি করিবার জন্ম, বক্তা শ্রোতৃবর্গকে বাংলা শিখিতে অনুরোধ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাংলাসাহিত্য ভারতবর্ষের বাহিরে কতকটা মর্য্যাদা পাইয়াছে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছে। ভারতীয় অন্যান্ত সাহিত্যের মর্য্যাদাও পরোক্ষভাবে ইহাতে বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের অন্যান্ত প্রদেশেও বাংলাভাষার ঐশ্বর্য্য যে আদৃত হইয়াছে, তাহা অন্যান্ত প্রাদেশিক ভাষায় বাংলা হইতে অনুবাদের বাহুল্য দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু, ইহার দ্বারা অন্যান্ত প্রদেশে বাংলাভাষার জ্ঞানের প্রসার যতটা আশা করা যাইতে পারিত, তাহা ঘটে নাই। সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে হিন্দী শিখিবার অত্যন্ত আগ্রহে লোকে অন্ত কোনও ভারতীয় ভাষা শিখিতেছে না।

হিন্দী শিখিবার প্রয়োজনীতার কথা এমন ভাবে প্রচার করা হইয়াছে ও হইতেছে এবং তাহার জন্ম অর্থপুষ্ট, সঙ্ঘবদ্ধ এত চেষ্টা চলিতেছে যে, অবাঙ্গালী অহিন্দীভাষী কোনও ভারতীয়, নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত, অন্ত কোনও ভারতীয় ভাষা শিখিতে হইলে, স্বভাবতঃই প্রথমে হিন্দীর কথা মনে করিবেন। হিন্দীভাষীরাও নিজেদের মাতৃভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্মুখে থাকায়, অন্ত কোনও প্রাদেশিক ভাষা শিখিতে চাহেন না এবং কেহ কেহ অন্ত কোনও প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি ও পুষ্টিকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে বাংলার প্রভাব বর্ত্তমানে বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইলেও, আমাদের জাতীয় জাগরণের উন্মেষ সর্ব্বপ্রথম যে, বাংলায় হইয়াছিল, তাহা এখনও ভুলিয়া যাইবার মত দীর্ঘ দিনের অতীতের কথা হয় নাই।

শিক্ষা, সংস্কার, জাতীয়তা প্রভৃতি, জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই বাঙ্গালী, প্রগতির অগ্রদূতের কার্য্য করিয়াছে এবং বিদ্যা, মনীষা এবং নব নব চিন্তার অনেক ক্ষেত্রে এখনও তাহার প্রাধান্ত অক্ষুণ্ণ আছে। বাংলাদেশে শক্তিশালী রাষ্ট্রনীতিক নেতার বর্ত্তমানে অভাব ঘটিয়াছে, সেকথা সত্য। কিন্তু, শুধুমাত্র শক্তিশালী নেতা থাকাই রাষ্ট্রীয় প্রগতির একমাত্র পরিমাপ নয়। সাধারণ লোকের মধ্যে রাষ্ট্রিক চেতনা, দেশপ্রীতি এবং দেশের জন্ম সেবার ইচ্ছা কতটা জাগ্রত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই ইহার প্রকৃত পরিমাপ কতকটা করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ এদিক দিয়া বাংলা এখনও অন্ত কোনও প্রদেশের পশ্চাতে পড়ে নাই।

বাঙ্গালীর মধ্যের সৃষ্টি এবং প্রগতির এই দুর্নিবার প্রেরণা তাহার সাহিত্যের মধ্যে রূপ নিয়াছে এবং এই সাহিত্যও আবার তাহার সৃষ্টি শক্তির মূলে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।

কাজেই, রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম যদিও, যে কোনও দেশে এবং যে কোনও কালে আকস্মিক ঘটনা, তাহা হইলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলাসাহিত্যের সাধারণ ধারার সহিত সামঞ্জস্ত ও সঙ্গতি-শূন্য নহে এবং রবীন্দ্র-প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিকাশের পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই, যদিও একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শুধু মাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যের রস আস্বাদন করিবার জন্য একজনের বাংলা শিখিবার পরিশ্রম সার্থক হইতে পারে, তাহা হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা শিক্ষা করা, বাংলার চিন্তা ও ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হওয়া, নানাদিক দিয়া লাভের ব্যাপার হইতে পারে।

অনুবাদের মধ্যে কবিতার রস, শক্তি ও অর্থ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়; রবীন্দ্রনাথকে কেহ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিলে, তাঁহাকে বাংলা শিখিতেই হইবে। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার সহিত পরিচয় নাই, একথা বলিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীরই লজ্জিত হওয়া উচিৎ।

বাংলাভাষা ও প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়

আজ যে সমগ্র জগৎ ইউরোপের শিক্ষা, সভ্যতা ও ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইউরোপের বাহুর শক্তি ও সাম্রাজ্যের বিস্তারই তাহার একমাত্র কারণ নহে। ইউরোপীয়েরা যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা স্থানীয় অধিবাসীদের নিজ নিজ ভাষা শিখাইবার জন্য ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালীরাও গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, চাকরি নিয়া এবং নানাপ্রকার বিত্তর্জ্জন ব্যবসা-সূত্রে ভারতের নানাপ্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা যদি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে, বাংলার বাহিরে বাংলাভাষা অনেকটা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত। এই চেষ্টা এখনও তাঁহারা অবশ্য করিতে পারেন, এবং তাহাতে বাংলাভাষার বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী।

বাংলাদেশের অশিক্ষিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা জীবিকার্জ্জনের জন্য সাধারণতঃ বিদেশে যান না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সকল প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। নিজ নিজ প্রবাসভূমিতে ইঁহাদিগকে যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাঁহারাও শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থায় ইঁহাদের সমশ্রেণীর লোক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই জাতির কৃষ্টির ধারাকে বহন করেন। কাজেই, অন্যান্য প্রদেশের এই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে বাংলাভাষার প্রচার বিশেষভাবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যুক্ত।

আমাদের আত্ম প্রত্যয়ের অভাবও এজন্য দায়ী

আমাদের আত্ম প্রত্যয় ও জাতীয় অভিমানের অভাবের জন্য, বাংলাভাষার অনেক সম্ভাবিত প্রসারের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বাংলার বাহিরের বহুলক্ষ লোক অর্থোপার্জ্জনের জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে বাংলায় বাস করিতেছেন। অথচ, ইঁহাদের অধিকাংশ লোক বাংলা জানেন না বা বাংলা শিক্ষা করেন না।

এক বাংলা ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোনও স্থান আছে কিনা জানিনা, যেখানকার ভাষা না জানিয়াও বাহিরের বহুসংখ্যক লোক আসিয়া সেখান হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া যাইতে পারে। অনেক স্থলে এই সকল ভিন্ন প্রদেশবাসী লোকের প্রয়োজনেই, কোনও প্রকারে তাঁহাদের ভাষা ভাঙ্গাভাঙ্গা বলিয়া, আমরা তাহাদেরই কাজ চালাইয়া দিই। কোনও অবাঙ্গালী বাংলা জানিলেও বা বুঝিলেও, আমরা তাহার সহিত বাংলা বলিতে চাহি না এবং এই অস্বাভাবিক ও লজ্জাকর ব্যাপারকে বাহাদুরী বলিয়া মনে করি। অন্য কোনকোনও ক্ষেত্রে প্রাদেশিক মনোভাব যদিও কিছু ক্ষতির কারণ হইতে পারে, ভাষার ক্ষেত্রে তাহাতে অবিমিশ্র লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বাঙ্গালী ভদ্র যুবক ও জুতার ব্যবসা

বাঙ্গালার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যার জন্য আংশিক ভাবে আমাদের উদ্যম শ্রমশীলতা এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতার অভাব দায়ী। কর্ম্মের অভাবে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকের এবং অনেক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কৃষকদের অপেক্ষা মধ্যবিত্তদের অবস্থা এই জন্য আরও অধিকতর শোচনীয় হইয়াছে যে, কৃষকদের অপেক্ষা শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা অধিকতর উচ্চাদর্শের জীবনযাপনে অভ্যস্ত; পারিশ্রমিক কমিয়া গেলেও শারীরিক পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ, এখনও একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই; শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর অনেকে কৃষকদের তুলনায় অধিক অর্থোপার্জ্জন করিলেও, ইঁহাদের উপর কৃষকদের তুলনায়, অনেক অধিকসংখ্যক কর্ম্মহীন লোক নির্ভরশীল; লেখাপড়া শিখিতে যে প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে, তাহার জন্য অনেকের সঞ্চিত অর্থ নষ্ট হইয়াছে এবং আরও অনেকের ঋণ করিতে হইয়াছে। সামাজিক এবং লৌকিক ভদ্রতার জন্য এবং পোষাক পরিচ্ছদ

প্রভৃতির জন্য বাধ্য হইয়া ইঁহাদিগকে কৃষকদের অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিতে হয় এবং আয়ের পথ না থাকায় ঋণ করিতে হয় এবং ইহার জন্য খাদ্যের পরিমাণ ক্ষীণতর এবং গুণ নিকৃষ্টতর হয়।

শ্রমের মর্য্যাদা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ায়, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে, সম্মান সম্বন্ধে অনেক মিথ্যাধারণার আংশিক অপনোদন হওয়ায় এবং অভাবের চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায়, আমাদের শিক্ষিত যুবকদের অনেকে শারীরিক শ্রমসাপেক্ষ কোনও কোনও কাজের দিকে ঝুঁকিতেছেন। কিন্তু, অভিজ্ঞতার অভাবে, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের অভাবে, এই সকল কার্য্যে বর্ত্তমানে যাঁহারা লিপ্ত আছেন, অনভ্যাসবশতঃ তাঁহাদের অপেক্ষা কম দক্ষ বলিয়া, ইঁহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে বিফল ও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইতেছে। এই সকল ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে যাঁহারা লিপ্ত আছেন, তাঁহাদের জীবন যাত্রার আদর্শ অপেক্ষাকৃত নিম্ন বলিয়া, ইঁহারা যাহাকে লাভজনক বলিয়া মনে করেন এবং যাহাকে বাহির হইতে লাভজনক বলিয়াই মনে হয়, তাহার আয়ের উপর সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। উপযুক্ত কর্ম্মের অভাবে অনেক শিক্ষিত যুবক কৃষি, ছোটখাট হাতের কাজ বা ব্যবসা করিতে যাইয়া ঠকিয়াছেন।

এসম্বন্ধে আরও একটা কথা এই যে, কর্ম্মের অভাব অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত, শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যেও আংশিক ভাবে দেখা দিয়াছে। শিক্ষিত যুবকেরা কাজ না পাইয়া যদি, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোকেরা যে-সকল কাজ করিতেছেন, সেই সকল কাজ বৃত্তি স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই সকল লোক বেকার হইয়া পড়িবেন এবং তাহাতে দেশের বেকার সমস্যা জটিলতর হইবে মাত্র।

কিন্তু, যে সকল কাজ এবং যে সকল ব্যবসা বর্ত্তমানে বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসীদের হাতে রহিয়াছে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে, সেই সকল কাজ ও ব্যবসা হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, স্বদেশ-বাসী অন্য লোকের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর না করিয়াও তাঁহারা কাজ পাইতে পারেন এবং দেশের অনেক পয়সা, যাহা এখন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, দেশে থাকিয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

অনেক বিদেশী আমাদের দেশের শ্রমিকদের নিযুক্ত করিয়া অনেক শিল্প এবং ব্যবসা চালাইতেছেন। ইহার অনেকগুলিতে অবশ্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু, অনেকগুলি আবার অর্থ অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যবসা বুদ্ধি, অধ্যবসায় এবং গঠন ও পরিচালন ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। অনেক ক্ষেত্রে আবার এই সকল বিদেশী এবং ভিন্ন প্রদেশবাসী উদ্যোক্তারা অবাঙ্গালী শ্রমিক এবং শিল্পীদের নিযুক্ত করিয়া শিল্প ব্যবসা চালাইতেছেন।

এই উভয়ক্ষেত্রেই স্থান লাভের জন্য বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা সচেষ্ট হইতে পারেন এবং সম্ভব ও সুবিধা মত বাঙ্গালী শ্রমিক এবং শিল্পীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন ও প্রয়োজন মত তাহাদিগকে নিজ নিজ কাজে ক্রমে শিক্ষিত করিয়া লইতে পারেন।

বেঙ্গল ট্রেনিং ইনস্‌টিটিউটের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বি-এম -দাস সিউড়ীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের জুতার ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর বাংলাদেশে এক কোটি টাকারও উপর মূল্যের জুতা প্রস্তুত ও বিক্রীত হয়। প্রায় ৮০০ চীনা বিহারী মুচিদের সাহায্যে এই ব্যবসায় অধিকাংশ নিজেদের হাতে রাখিয়াছে। চীনাদের ন্যায় বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকেরা মুচিদিগকে নিযুক্ত করিয়া এই লাভজনক ব্যবসা চালাইতে পারেন। কিন্তু, প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের এই বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন।

কানপুর, আগ্রা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আধুনিক উপায়ে এবং পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে প্রণালীতে জুতা প্রস্তুত হয়, তাহা কাহারও পক্ষে রুচি বা স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইবে না। ইহাতে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোকের পরিচালনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উদ্যমশীল যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীযুক্ত দাসের কথা ভাবিয়া দেখিবেন, আশা করা যাইতে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম, ঢাকার জুতার ব্যবসা বাঙ্গালী মুসলমান ও মুচিদের হাতে ছিল, এবং শিক্ষিত বাঙ্গালীদেরও কেহ কেহ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু, ইঁহাদের শ্রমশীলতা, ব্যবসাবুদ্ধি এবং সততার অভাবে এই ব্যবসা ক্রমেই চীনাদের হাতে যাইয়া পড়িতেছে। ঢাকার ন্যায় অন্যান্য স্থানে এবং অন্যান্য ব্যবসার ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীদের এই প্রকার পরাজয় ঘটিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পরিচালনা শিক্ষা

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়া শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা কতকটা প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে এবং কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। কিন্তু, গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার কোনও ব্যবস্থা বাংলাদেশে নাই।

১৯১৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার লাইব্রেরী পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ও ইঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গত পাঁচ বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ষ্টেট লাইব্রেরী হইতে আগত কয়েকজন শিক্ষার্থীকে এবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছেন। কিন্তু, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকায় এবং ইঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, ১৯৩২ সালে লাইব্রেরী কাউন্সিল এই সকল শিক্ষার্থীর জন্য একটি ক্লাস খুলিবার সঙ্কল্প করেন এবং অনুমোদনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। ভারত সরকার প্রস্তাবটি স্থানীয় সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন।

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পনাটি বাংলা সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট পাঠাইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এই পরিকল্পনাটি পরীক্ষার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞকে লাইব্রেরী আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এই সমিতিতে আছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। এই শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

নোয়াখালিতে হিন্দুদের বিপদ

নোয়াখালিতে কৃষক আন্দোলন যে বিপথে চালিত হইতেছে এবং তাহার ফলে যে এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উদ্ভব হইয়াছে এবং অনেক হিন্দু জমিদার ও মহাজনকে গুণ্ডামি ও অন্যপ্রকার গায়ের জোরের উপদ্রব ভোগ করিতে হইতেছে অথবা সেই ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইতেছে, সে কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সংবাদপত্রে প্রকাশ, এখানকার অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে; সময় মত প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় ইহার শেষ হইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায়, সমগ্র দেশেই কৃষকদের (এবং অন্যদেরও) বিশেষ দুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং অনেক স্থলে লোকের আহার্য্য ও পরিধেয়ের সংস্থান হইতেছে না। ইহার উপর আবার জমিদার ও মহাজনেরা তাঁহাদের প্রাপ্যের জন্য বিরক্ত এবং অনেক স্থলে উৎপীড়ন করিতে থাকায়, কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষের উদ্ভব হওয়া কতকটা স্বাভাবিক। টাকার সুদ অথবা ভূমিকর সংগ্রহ করা ব্যতীতও যে কৃষক এবং খাতকদের প্রতি ইঁহাদের কতকগুলি সামাজিক কর্ত্তব্য আছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায়, উভয়পক্ষের মধ্যে সম্প্রীতির মূল অনেক দিন পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়াছে। অনেকক্ষেত্রেই দরিদ্রের প্রতি ইঁহাদের অত্যাচার এত সীমা ছাড়াইয়া যায় যে, তাহাতে মানুষের মনে প্রতিহিংসার ভাব জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইঁহাদের আচরণ ও মনোভাবের পরিবর্ত্তন না হইলে, উভয়পক্ষের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক সম্বন্ধ

অনেক ক্ষেত্রে এই সুবিবেচনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন অথবা কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ায়, দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সব আন্দোলনের পশ্চাতেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা থাকেন। তাহা না হইলে কোনও আন্দোলনই অগ্রসর হইতে পারে না বা ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা কৃষকদের হিতের জন্য তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা কোনও সম্প্রদায় বিশেষের সৃষ্টি নহে। দেশের অতীত ইতিহাস ও রাজনীতির স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

ইহার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, যাহাতে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক এবং শ্রেণীগত বিদ্বেষ জাগ্রত না হয় এমন সুকল্পিত প্রণালী অনুসরণ করা প্রয়োজন। কৃষকদের বর্ত্তমান অসন্তোষকে কোনও শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলে, কোনও পক্ষেরই লাভ হইবে না এবং উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। একথাও ভুলিলে চলিবে না যে দেশের মধ্যের সর্ব্বব্যাপী জাগরণ ও প্রগতির জন্য এই সম্প্রদায়ের দানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং কোনও প্রকারে এই সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন সম্ভব হইলেও, তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না।

অধিকাংশ জমিদার এবং মহাজন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত লোক হওয়ায় এবং কৃষকদের অধিকাংশ মুসলমান হওয়ায়—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে—কৃষক আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক আকার গ্রহণ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রকাশ, নোয়াখালিতে এই আন্দোলন ইতিপূর্ব্বেই হিন্দু মুসলমানের বিরোধে পরিণত হইয়াছে। এরূপ হইলে, কৃষক আন্দোলনের পশ্চাতে যে নৈতিক শক্তি থাকিতে পারিত, ইহা সেই নৈতিক শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে এবং সেই শক্তি ইহার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবে। কোনও অবস্থার প্রতিকারের জন্য গায়ের জোর বা গুণ্ডামির আশ্রয় নেওয়া কোনও ক্রমেই ন্যায় বা আইনানুমোদিত হইবে না এবং তাহার ফলে প্রকৃত প্রতিকার আরও পিছাইয়া যাইবে। ইহা গেল উভয় পক্ষের ভাবিয়া দেখিবার কথা।

দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় বা দলের মধ্যে যদি কোনও স্বার্থগত বা অন্য প্রকারের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে যাহাতে কাহারও ধন-সম্পত্তি, সম্মান বা দেহ ও জীবন বিপন্ন না হয়, তাহা দেখিবার ভার দেশের রাজ সরকারের। দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির অর্থই এই যে, সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কোনও সম্প্রদায়কে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় না। নোয়াখালিতেও কোন সম্প্রদায় সংখ্যাল্পতা বা অক্ষমতার জন্য বিপন্ন হইবেন না, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি। দেশের অন্যসর্ব্বত্রও কৃষক আন্দোলন বিস্তার লাভ করিতেছে; সে সকল স্থানেও যাহাতে কোনও প্রকার অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার না ঘটে, তাহার দিকে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মনযোগী হওয়া প্রয়োজন।

নাদীরশাহের হত্যা

আফগানিস্থানের সিংহাসন লইয়া চিরদিনই বিরোধ, ষড়যন্ত্র এবং রক্তপাত ঘটিয়াছে। কিন্তু, পূর্ব্বে একরাজবংশের বা রাজার পরিবর্ত্তে অন্য রাজবংশ বা রাজার প্রতিষ্ঠায়, সমগ্র দেশের পক্ষে লাভ ক্ষতি বড় বেশী কিছু হইত না। কিন্তু, আমীর আমানুল্লা যে নবযুগ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, তাহাতে তিনি শুধু রাজামাত্র না হইয়া আফ্‌গানিস্থানে নবযুগের প্রতীক-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার প্রতিষ্ঠা এবং অপসারণ আফগানিস্থানের ভবিষ্যৎকে যে প্রকার স্পর্শ করিয়াছে, অতীতের অন্য কোনও রাজার অপসারণে সে প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই।

নাদীরশাহ প্রগতিশীল নৃপতি ছিলেন, এবং আমানুল্লা প্রবর্ত্তিত পরিবর্ত্তনের ধারাকে তিনি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সেদিক দিয়া অনেকটা সফলও হইয়াছিলেন। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও কাবুলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন শিক্ষা বিশেষজ্ঞকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা আফগানিস্থানের সর্ব্বত্র শান্তি এবং নবজাগরণের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আকস্মিক হত্যা বিশেষ দুঃখের এবং আফগানিস্থানের পক্ষে

দেশের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ বর্দ্ধিত হইবার এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আরও বেশী স্কুলের প্রয়োজন হইবে এবং বর্ত্তমান স্কুলগুলির ছাত্রাভাব ঘুচিবে।

স্কুলের সংখ্যা কমিয়া গেলে, স্কুলগুলি দূরে দূরে অবস্থিত হইবে এবং শিক্ষার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দূরে থাকিতে হইবে। অথচ, যে বয়সের ছেলেরা হাইস্কুলে পড়ে, তাহাদের মানসিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য পারিবারিক আবেষ্টনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

অর্থাভাবের জন্য, বিদেশে বোর্ডিং-এ রাখিয়া ছেলে পড়ান অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

অনেকক্ষেত্রেই ছেলেরা পড়িবার সময় গৃহকার্য্যে দরিদ্র পিতাকে সাহায্য করে। কৃষক ও শিল্পজীবিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে এই প্রয়োজন আরও বাড়িয়া যাইবে। এসম্বন্ধে সকল বলিতে গেলে আরও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে গলদ কোথায়

বর্ত্তমান স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা ভাল হইলে, শিক্ষকমণ্ডলী দক্ষতর হইলে, এবং শিক্ষা-প্রণালী উন্নততর হইলে, শিক্ষার্থীরা যে অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী হইবেন, তাহা কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই যুক্তির অনুকূলে বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। যে-সকল ভাল এবং প্রতিভাবান ছাত্রের আর্থিক অবস্থা কতকটা ভাল তাহারা সাধারণতঃ সরকার পরিচালিত কোনও আদর্শ বিদ্যালয়ে অথবা সহরের কোনও সুনাম বিশিষ্ট, সুপরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করে; ইহাই এই সকল স্কুলের পরীক্ষার ফল ভাল হইবার প্রধান কারণ। ইহাসত্ত্বেও দেখিতে পাই, পল্লীর স্কুলের ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ জীবনে অযোগ্যতর হয় না। চিকিৎসা, আইন, শিক্ষাদান প্রভৃতি বিদ্বজ্জন-ব্যবসায়ে ইঁহারা অনেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

বাঙ্গালী ছাত্রদের দারিদ্র্য, পুস্তকাদি কিনিবার ক্ষমতার অভাব, এবং দারিদ্র্যের জন্য নিবিষ্ট চিত্তে পড়াশুনা করিবার সুযোগের অভাব, ইঁহাদের শিক্ষার অপকৃষ্ট মানের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করিতে এত অধিক সময় এবং উৎসাহ ব্যয় করিতে হয় যে প্রকৃত শিক্ষার বিষয়গুলির প্রতি উপযুক্ত মনযোগ দিবার অবসর থাকে না। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে ছাত্রদের শিক্ষা ও যোগ্যতার মান অনেক বাড়িয়া যাইবে।

বর্ত্তমানের শিক্ষিতব্য বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন ত্রুটিযুক্ত এবং আমাদের ছাত্রদের মানসিক, পারিপার্শ্বিক এবং আর্থিক অবস্থার উপযোগী না হওয়া, তাঁহাদের কম-যোগ্য হইবার অন্য একটি কারণ।

একজন কৃতী বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩০ সালে শিক্ষাপ্রণালী অধ্যয়ন পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিবার জন্য ইনি ইউরোপে যান। লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে টীচার্স ডিপ্লোমা লইয়া তিনি শিক্ষা বিজ্ঞান আলোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিলাতে নানা বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। এই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য ইনি নিমন্ত্রিত হন, এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয়াদি দেখিবার ও শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ পান।

শ্রীযুক্ত বসু ইহার পর ভারতের জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা বিষয়ে এম-এ, ডিগ্রী পান। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোনও বাঙ্গালী এই গৌরবের অধিকারী হন নাই।

জার্ম্মাণির একটি বিদ্যালয়ে ইনি দুইমাস অধ্যাপনা করেন।

উইটনেকার গ্রেজুয়েট টিচার্স কলেজ হইতে ফেলোসিপ লইয়া ইনি আমেরিকায় যান ও নয় মাস সেখানে অবস্থান করিয়া সেখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

পরে ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীযুক্ত বসু বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের নিমন্ত্রণে, ইহার পরিষদের চতুর্দ্দশ অধিবেশনে ভারতীয় সহকারীর কাজ করেন।

সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইঁহার অভিজ্ঞতা দেশের উপকারে লাগিলে তাহা সুখের বিষয় হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নূতন সম্মান

রসায়ণ শাস্ত্রে গবেষণা ও ভারতবর্ষে এই শাস্ত্রকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা, আচার্য্য রায়কে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি দান করিয়াছে। দেশের জন্য তাঁহার ক্লান্তিহীন সেবা, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট তাঁহাকে একান্তপ্রিয় আপনার লোক করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সম্মানে ও গৌরবে ভারতবর্ষেরই সম্মান ও গৌরব। বাঙ্গালীর মনীষার এই আন্তর্জ্জাতিক সম্মানে, বাঙ্গালীরা ও অন্যান্য ভারতবাসীরা এই কথা আর একবার স্মরণ করিবার সুযোগ পাইবেন যে, ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বাঙ্গালী-প্রতিভার বিশিষ্ট স্থান আছে। লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁহাদের এক সাধারণ সভায় সার প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে, তাঁহাদের অনারারি ফেলো নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন। ইনি পূর্ব্ব হইতেই এই সোসাইটি সাধারণ ফেলো ছিলেন। এই সোসাইটির বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র দীর্ঘ দিন অন্তর অনারারি ফেলো নির্ব্বাচন করেন। এবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানি, হল্যাণ্ড এবং ভারতের সাতজন মাত্র মনীষি এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হিন্দু সভার সাম্প্রদায়িকতা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনিয়াছেন এবং হিন্দুসভার পক্ষ হইতেও অনেকে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে সত্য নির্ণীত হওয়া সব সময়েই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এই বাদপ্রতিবাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে শোচনীয়। বারান্তরে পণ্ডিতজীর কোনও কোনও কথার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

হিন্দু মহাসভা জাতীয়তার পরিপন্থী সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতির বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর মতে, হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া এবং ইহাতে তাঁহাদের লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন এবং যে-সকল মুসলমান-সংখ্যা-প্রধান প্রদেশগুলিতে ইহার সত্য পরীক্ষা হইতে পারিত, সে সকল স্থানে হিন্দুরা ইহা চাহেন নাই।

এই উক্তি সত্য নহে। বাংলা, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুরাও যুক্ত নির্ব্বাচন চাহিয়াছেন।

শ্রীসুশীলকুমার বসু

বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। এই ঘটনার সহিত কোনও বিপ্লব বা ব্যাপক অসন্তোষের সম্পর্ক নাই জানিয়া এবং বর্ত্তমান নৃপতি নাদিরের পুত্র জাহিরশাহ উদার নীতির অনুসরণ করিবেন জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইলাম। ভারতীয় সীমান্ত জাতিদের উপর এবং কতকাংশে ভারতীয় মুসলমানদেরও উপর আফগানিস্থানের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। এইজন্য আমাদের এই প্রতিবাসী রাজ্যটির শান্তি এবং ইহার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি আমরা বিশেষভাবে কামনা করি।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক সম্পর্কে কয়েকটি সত্য কথা

স্যর হুগ মেগ্ফার্‌সন্ ৩৫ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে ভারত সরকারের হোম্ ডিপার্টমেন্ট্ এর সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৯২৫এ বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর হইয়াছিলেন। ভারতকে হোয়াইট পেপারে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার দিবার বিরুদ্ধে বিলাতে যাঁহারা আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কয়েকটি সত্য উক্তি করিয়াছেন। ভারতবাসীদের অনুকূলে কোনও কথা বাড়াইয়া বলিবার কোনও কারণ তাঁহার নাই। কাজেই, এদিক দিয়া কথাগুলির মূল্য আছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিক অসন্তোষ নিবারণে, ধীর মস্তিষ্ক ও বিবেচক হিন্দু মুসলমান রাজনীতিকদের সাহায্যের কথা, এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেণীর লোক নিরাশ হইলে, দেশের অবস্থা যে কত খারাপ হইয়া পড়িতে পারে, সে সকল কথা প্রশংসনীয় স্পষ্টতার সহিত বলিয়া, যে সকল লোক, ভারতীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের ইচ্ছা ও দাবীর সহিত দেশের সংখ্যাতীত মূক সাধারণের কোনও সম্পর্ক নাই মনে করেন এবং সেজন্য তাঁহাদের কথাবার্ত্তাকে অনেকটা কম মূল্য দান করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,…… "ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীদের আমরা তাহাদের অশিক্ষিত দেশবাসীগণ হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে পারি, এই ধারণা ভারতীয় জীবনের ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে শোচনীয় অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করে। শিক্ষিত এবং রাজনীতিক মনোভাব বিশিষ্ট সম্প্রদায়গুলি, বিপুল ভারতীয় জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। জনসাধারণের উপর তাহাদের সর্ব্বব্যাপী প্রভাবকে ছোট করিবার চেষ্টা বিশেষ মারাত্মক ভুল হইবে। যে সকল উচ্চ বর্ণের হিন্দুজাতি বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-ভারতের নেতৃত্ব করিয়াছে,—প্রধানতঃ সেই সকল জাতি হইতে ইহারা উদ্ভূত হইলেও, মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীসমূহ এবং প্রভাবশালী সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলিতেও ইঁহাদের উদ্ভব হয়। একথা আমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, যে-বৃহৎ কৃষক সম্প্রদায় ভারতীয় জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ, ইঁহারা অবিরত সেই কৃষকদের সংস্পর্শে আসিতেছে। নগরে শ্রমিকদের এবং গ্রামে কৃষকদের সান্নিধ্যে যাইবার এবং তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবার যে সুবিধা ইহাদের আছে, বৃটিস্ শাসকদের তাহা নাই। 'মূক সাধারণ'কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং বিশ্বাসপ্রবণ ধরিয়া নিয়া কথা বলাও ঠিক হইবে না।

অশিক্ষিত হইলেও, ইহাদের বেশীর ভাগ লোক নির্ব্বোধ নহে। প্রত্যেক স্থানেই, গ্রামে বুদ্ধিমান এবং যোগ্যতা-বিশিষ্ট কৃষকদের বড় বড় দল আছে। ইহারা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, কৃষকদের সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার সমস্যায় ইহারা উৎসাহের সহিত যোগদান করে, আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে ইহারা বিশেষ দক্ষ এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত গ্রামের বিষয়সমূহ আলোচনা করিতে অভ্যস্ত। কৃষক সম্প্রদায়ের এই অংশ সংখ্যাল্প শিক্ষিত লোকদিগের নিত্য সংস্পর্শে আসে, এবং রাজনৈতিক প্রচার বুঝিতে সক্ষম হয়।……"

ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক যে শুধু মৈত্রী এবং বিশ্বাসের মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে ইনি বলিয়াছেন,

"ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে কোনও বিদ্রোহ দেখা দিলে, তাহা দমন করিবার মত সামরিক শক্তি আমাদের আছে, কিন্তু, রাজনৈতিক অশান্তি দমন করিবার জন্য অবাধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে থাকিলে, ব্রিটিস এবং ভারতীয়দের মধ্যের সম্বন্ধের ভবিষ্যৎ কি হইবে। ভারতের সকল লোক যদি আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তাহা হইলে আমরা

ভারত শাসন করিতে পারি না। সার্ব্বজনীন এবং দৃঢ়সঙ্কল্পিত বর্জ্জননীতির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ফলপ্রদ হয় না। ইহা বাণিজ্য এবং শাসনতন্ত্রকে সমভাবে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে। এবং উভয় জাতির মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারাই মাত্র ভারতবর্ষ ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ইচ্ছুক এবং সন্তুষ্ট অংশ থাকিতে পারে, এই দীর্ঘ সংঘর্ষের পরে তাহার আর কতটুকু আশা থাকিবে।"

বোম্বাইয়ে ঠাকুর-সপ্তাহ

মুখ্যতঃ বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে শান্তি-নিকেতনস্থ বিশ্বভারতী বিদ্যালয় হইতে রবীন্দ্রনাথের সদলে বোম্বে যাত্রা, সেখানে স্বরচিত নাটকের অভিনয় প্রদর্শন এবং চিত্র-শিল্পাদির প্রদর্শনী, নানাস্থানে কবির বক্তৃতাদান প্রভৃতি বম্বে ও বাংলার সম্বন্ধকে ঘনিষ্টতর করিয়া তুলিবে। রবীন্দ্র-নাথ এখানে বিশিষ্ট নাগরিকগণের দ্বারা বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন এবং অন্য নানাপ্রকারেও সম্মানিত হইয়াছেন। আমেদাবাদের নাগরিকগণ তাঁহাকে মানপত্র দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পৃথিবীব্যাপী জাতীয়তাবাদের (nationalism) মধ্যে যে, আত্মঘাত ও সর্ব্বনাশের বীজ লুক্কায়িত আছে,—বিশেষ শক্তি এবং নিপুণতার সহিত রবীন্দ্রনাথ তাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র কবিতাদ্বারা বিশ্ববাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নবচেতনা দান করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি তাঁহার অভিনব বলিষ্ঠ চিন্তাদ্বারা জগতকে নূতন পথেরও সন্ধান দিয়াছেন। বিশ্বভারতীর মধ্যে তাঁহার বাণী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে, ভারতীয় সাধনার একটি বিশিষ্টরূপ ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে এবং বিদেশে ইহা ভারতবর্ষের সম্মানকে বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এসকল দিক দিয়া সকল ভারত-বর্ষেরই বিশ্বভারতীর নিকট ঋণ রহিয়াছে। আশা করা যাইতে পারে কবির বোম্বাই গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য সফল হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ

ভারতবর্ষের বাহিরে নানাদেশে রবীন্দ্রনাথ যে সমাদর সম্মান ও অভ্যর্থনা পাইয়াছেন ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশে তাহা পান নাই। রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা দ্রুত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সংঘর্ষের উত্তেজনায় জীবনের গভীরতর দিকগুলির উপর মানুষের দৃষ্টি সহসা পতিত হয় না; যদিও, কোলাহলের অন্তরালে থাকিয়া ইহাই মানুষকে প্রকৃত শক্তি দান করে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে, ভৌগলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবোধ ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে জাগ্রত হয় নাই। কৃষ্টি এবং আদর্শই সেদিন আমাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। একথা আমাদের এখনও ভুলিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত সম্মান দান করিয়া, নিজেরাই গৌরবের অধিকারী হইতে পারিতেন।

আধুনিকতা

বোম্বাইয়ের রিগ্যাল থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বপূর্ণ ভাষায় যে চিন্তা ও ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে আধুনিকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"প্রাচ্যদেশে যুবকেরা তাঁহাদের কল্পিত আধুনিকতার দ্বারা সর্ব্বত্র আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের এই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, পাশ্চাত্য জীবনই আধুনিক। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, আধুনিকতার প্রতীক হইতেছে, সীমাহীন বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা,—ইহাই জীবন, ইহাই যৌবন। ইহাই যদি আধুনিকতার ব্যাখ্যা হয়, তবে একথা আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, কোনও বিশেষ সময়ের মধ্যে ইহা নিহিত নয়; কোনও বিশেষ সত্যের মধ্যেই ইহার মূল। সেই সত্যের অভাব হইলে, সর্ব্বশেষ কালের ছাপ বহন করিয়াও কোনও জিনিস প্রকৃতপক্ষে পুরাতন হইতে পারে এবং তাহার সম্মুখে নিশ্চিত ধ্বংস থাকিতে পারে। একথা আমরা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি যে, পশ্চিমের যে-সকল ক্ষুধিত জাতি শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল ধরিয়া পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে এবং অপমানে আমাদের হীন করিয়াছে, তাহারা দ্বিধাহীন শক্তির সাধনার মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে। মানুষের যে-প্রবৃত্তি চিরন্তনকে উপহাস করে এবং যাহার বৃদ্ধি পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্যকে অতিক্রম

করে, তাহা যে কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না, জ্ঞানীদের এই শিক্ষায় কি আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাইয়াছি।"

ভাবান্তরিত

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার

১৯২৭—৩২এর মধ্যে বঙ্গদেশে ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৩১·৬, (ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা ১৬), বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ১৯ এবং ভর্ত্তির সংখ্যা শতকরা ২৮ বাড়িয়াছে।

অন্যান্য বৃদ্ধি নিম্নলিখিত প্রকার :—

ছাত্রীর সংখ্যা	১৯২৬—২৭,	১৯৩১—৩২
কলেজ সমূহে	৩৬৪	৭৭০
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে	৪,৮০১	১০,৬৫৫
প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে	৩৯৬,০৫৬	৫১৮,৫৪৪

শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা কাহারও পক্ষে যথেষ্ট নহে। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে অত্যন্ত অধিক সংখ্যক যদি উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে শিক্ষার সুফল আশানুরূপ হয় না, এবং শিক্ষার চেষ্টার অনেকটা অপব্যয় হয়। প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি দশজন বালকের স্থানে ৩ জন বালিকা আছে; মধ্যাবস্থায় এই অনুপাত—২৪ ও ১এ এবং শিক্ষার উচ্চবিভাগে ৩০ ও ১এ দাঁড়ায়। ১৯৩১—৩২ আর্ট্‌স্ কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭১২; এই সময়ে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২০,৯১২; মেডিক্যাল স্কুলে ও কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৪১ ছিল। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ সন্তোষজনক। (হিসাবগুলি ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী শিক্ষা রিপোর্টের উপর সরকারের মন্তব্য হইতে গৃহীত)।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার কয়েকটি সম্ভবযোগ্য কারণ

প্রাথমিক শিক্ষার পর অধিকাংশ মেয়ের শিক্ষা যে আর অগ্রসর হয় না, তাহার প্রধান কারণ মেয়েদের শিক্ষা দিবার সুযোগের অভাব। যাঁহাদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রহ জাগিয়াছে, সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ দরিদ্র। সাধারণ ভাবে কোনও গ্রামে মেয়েদের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নাই; অনেক জেলা সহরেও নাই। ছেলেদের যেমন বিদ্যাশিক্ষার জন্য স্কুলের নিকটবর্ত্তী অনাত্মীয় বাড়ীতে রাখা যায় মেয়েদের তেমন যায় না। কাজেই কোনও মেয়েকে পড়াইতে গেলে কোন ও বড় সহরের হোষ্টেলে বা বোর্ডিংএ রাখিয়া পড়াইতে হয়। এই প্রকার আর্থিক সামর্থ্য অধিকাংশ লোকের নাই। কাজেই অভিভাবকদের ইচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েদের শিক্ষা আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না।

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে, যেমন সাধারণের চেষ্টায় ছেলেদের জন্য অনেক হাইস্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে, মেয়েদের জন্য তেমন গড়িয়া উঠা সম্ভব নয়। ছেলেদের স্কুলের অনেকগুলিতেই, আশানুরূপ ছাত্র না জুটায়, তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। গ্রামে কোথায়ও একটি স্কুল চলিবার মত ছাত্রী জুটবে এমন মনে হয় না। তাহার প্রধান কারণ, ছেলেদের ন্যায়, স্কুল নাই এমন স্থানের মেয়েরা নিকটবর্ত্তী অনাত্মীয় বাড়ীতে থাকিয়া, স্কুলের ছাত্রীসংখ্যাবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। শুধুমাত্র স্থানীয় ছেলেদের উপর নির্ভর করিয়া খুব কম স্থানেই ছেলেদের স্কুলগুলি চলিতে পারে। অথচ, বর্ত্তমানে যত লোকে তাঁহাদের ছেলেদের পড়াইতেছেন, ততলোকে তাঁহাদের মেয়েদের পড়াইবেন না। কাজেই, গ্রামে মেয়েদের জন্য পৃথক সেকেণ্ডারি স্কুল গড়িয়া তুলা প্রায় অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এদিকে মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য লোকের মধ্যে যেরূপ আগ্রহ দেখা দিয়াছে, মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারায়, যে সকল পারিবারিক অসুবিধা এবং বিবাহাদিতে যে-সকল বৈষম্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার ভবিষ্যৎ ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র সম্ভবযোগ্য উপায়, বর্ত্তমানে ছেলেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া। অনেক স্কুল উৎসাহের সঙ্গে এই পরীক্ষা চালাইবার জন্য উৎসুক ছিলেন এবং অনেক স্কুল মেয়েদের গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু,

বিশ্ববিদ্যালয় দশবৎসরের অধিক বয়স্ক মেয়েদের, ছেলেদের সহিত একত্র শিক্ষা নিষেধ করিয়া দেওয়ায়, ইহার ভবিষ্যৎ কি হইতে পারিত, তাহা বুঝিবার স্বাভাবিক সুযোগের পথ বন্ধ হইয়া গেল। সহশিক্ষার সুবিধা অসুবিধার কথা বিস্তৃতভাবে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষা সম্মিলন ও স্কুলের সংখ্যা হ্রাস

লাটপ্রাসাদে শিক্ষাসম্মিলনের প্রারম্ভে কেহ কেহ এই আশা করিয়াছিলেন যে, আমাদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় নানাবিধ সমস্যার অনেকগুলি অন্ততঃ সমাধানের চেষ্টা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পর্য্যন্ত বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে তাহা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ সম্পর্কে আলোচনা হইবে ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, এরূপ আশাও কেহ কেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইঁহাদের সকলেরই চমক ভাঙ্গিল, যখন শিক্ষার উৎকর্ষ বিধানের জন্য বাংলার ১২০০ শত উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮০০ শতটি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব প্রধান আলোচ্য বিষয়-রূপে উপস্থিত করা হইল। শেষ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইলেও, যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে স্কুলের সংখ্যা হ্রাসের নীতি সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সফল হইবে। বর্ত্তমান স্কুলগুলির সংখ্যা হ্রাস, সংখ্যাবৃদ্ধি, পুনর্বণ্টন বা একত্রীকরণ সম্ভব কিনা এবং আয়ের পথ বাড়াইয়া শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করা যায় কিনা তাহার যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই অনুসন্ধান-সমিতি কাহাদের লইয়া গঠিত হইবে, তাহা নির্ণীত হইবার পূর্ব্বে, স্কুলের সংখ্যাহ্রাসের বিপক্ষমতাবলম্বী যাঁহারা এই প্রস্তাবে মত দিয়াছেন, তাঁহারা যথোপযুক্ত সাবধানতাসহকারে কাজ করেন নাই এবং তাহার ফলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে।

বাংলাদেশের ১২০০ শত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলিরই যে অবস্থা শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই, ইহার অনেকগুলির শিক্ষার মান যে উৎকৃষ্টতর হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু, অনেকগুলি স্কুলের বিলোপ সাধন করিয়া অবশিষ্টগুলির উৎকর্ষ-সাধন করা স্বাভাবিক উপায় নয়। সরকারের শিক্ষা বিভাগ যদি প্রকৃতপক্ষে দেশের শিক্ষার মান ও প্রণালীকে উচ্চতর করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধিকতর অর্থব্যয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যে-সব স্কুল বর্ত্তমানে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছে, তাহারা সরকারের নিকট হইতে অল্প কিছু করিয়া সাহায্য পাইলেও, নিজেদের কার্য্য অধিকতর যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারিবে। স্কুলের বাড়ী ঘর আসবাব পত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কড়াকড়ি ব্যবস্থা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত শিথিল হইলে, অনেক স্কুলই তাঁহাদের শিক্ষাদানের দিকে অধিক নজর দিতে পারিবেন। এদেশে একদিন বৃক্ষতলে বসিয়া লোকে শিক্ষালাভ করিত। এখনও দেখিতে পাই, মূল্যবান গৃহসজ্জা বিশিষ্ট সহরের প্রাসাদতুল্য গৃহে বসিয়া যাহারা অত্যন্ত কড়াকড়ি নিয়মকানুনের মধ্যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহারা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পল্লীস্কুলের ছাত্রদিগকে যোগ্যতায় সাধারণভাবে পরাস্ত করিতেছে, এমন কথা বলা যায় না। অথচ, শেষোক্তেরা অনেকেই পল্লীস্কুলের চালাঘরের ভাঙ্গা বেঞ্চে বসিয়া অপেক্ষাকৃত শিথিল নিয়মকানুনের মধ্যে (অবশ্য শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার আওতায়) শিক্ষা পাইয়াছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, দেশের জনসাধারণের চেষ্টায়, অর্থে এবং অনেকের বিশেষপ্রকার আত্মত্যাগে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবন গঠনে ইহাদের দান নিতান্ত সামান্য নহে। এগুলির বিলোপ সাধন হইলে, আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার ও ফলে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতির ধারা ও ব্যাপকতা বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হইবে। শিক্ষার ইতিহাসের এমন অধ্যায়ে আমরা এখনও উপনীত হই নাই, যখন উৎকর্ষের জন্য বিস্তৃতিকে বর্জ্জন করিতে পারি। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে, প্রবেশিকায় কতকটা কাজে লাগিবার মত প্রাথমিক শিক্ষা আমরা পাইতেছি ; ইহার প্রসার কমিতে পারে কোনও প্রকারেই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত হইবে না।

বিতর্কিকা

১। আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য শিক্ষণীয়তা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় আমাদের স্কুলে সংস্কৃতের অবশ্য-শিক্ষণীয়তার বিরুদ্ধে একটু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়াছিলাম। আশ্বিনের 'বিতর্কিকা'য় (জনমত প্রকাশের জন্য এই নূতন বিভাগটি খুলিয়া বিচিত্রার সম্পাদকীয় বিভাগ বিশেষ উদারতা এবং পাঠকগণের প্রতি ন্যায়বিচারের পরিচয় দিয়াছেন), শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

আমি লিখিয়াছিলাম, "এই (প্রবেশিকা) পর্য্যন্ত তাহারা যেটুকু সংস্কৃত শিক্ষা করে, তাহা অতিশয় সামান্য। পরে সংস্কৃত না পড়িলে এইটুকু মাত্র জ্ঞান জীবনে কোনও প্রকার কাজেই আসে না।"

ইহার প্রতিবাদে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন, "...বাংলা প্রভৃতি ভারতীয় সমুদয় ভাষাই সংস্কৃতমূলক, সুতরাং স্কুলে যেটুকু সংস্কৃত ছেলেরা শিক্ষা করে, সেটুকু যে বেশ কাজে আসে, তার প্রমাণ—"জঙ্গম" শব্দের অর্থ একটি হিন্দু ছাত্র তারই সহপাঠী মুসলমান ছাত্রটি অপেক্ষা সহজে বুঝতে পারে। আর যেহেতু অধিকাংশ বাংলা শব্দই সংস্কৃত থেকে এসেছে, তখন সংস্কৃতকে অন্ততঃ বাংলা শিখবার সাহায্য কল্পেও প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অবশ্যশিক্ষণীয় রাখা যুক্তিযুক্ত।"

সংস্কৃতের জ্ঞান কাজে লাগিবার যে প্রমাণটি লেখক মহাশয় উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বজনগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় আছে। লেখক সম্ভবতঃ যে-সকল মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত পড়েন না, তাঁহাদের কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত পড়েন না, এরূপ মুসলমান ছেলেরা যে সব সময়েই সংস্কৃত পড়া হিন্দুছেলেদের চেয়ে বাংলা কম জানেন, (যাহাতে ইহাকে সাধারণ ঘটনা হিসাবে ধরা যায়) এরূপ প্রমাণ, লেখক কোথায় পাইলেন? হিন্দুছাত্র যে তার সহপাঠী মুসলমান ছাত্র অপেক্ষা সংস্কৃতমূলক শব্দের অর্থ সহজে বুঝিতে পারে, একথা সত্য নহে।

যাহার সত্যতা সংশয়াতীত নহে, তাহাকে অন্য ব্যাপারের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বাংলাভাষায় অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, কাজেই, সে সকল শব্দের অর্থবোধের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা লেখক তুলিয়াছেন।

শব্দের ব্যবহার দেখিয়া ও তাহাকে ব্যবহার করিয়া শব্দ সম্বন্ধে আমাদের অর্থবোধ জন্মিয়া থাকে। শব্দের অর্থবোধের জন্য তাহার উৎপত্তির ইতিহাস বা তাহার ধাতুগত অর্থ জানিবার প্রয়োজন হয় না (অবশ্য এই জ্ঞান অধ্যাপনা বা গবেষণার কাজে লাগিতে পারে)। বাংলা-ভাষার অনেক শব্দ, আরবী, ফার্সী, পোর্ত্তুগীজ, উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা হইতে আসিয়াছে। এই সকল শব্দের অর্থ-বোধের জন্য এই সকল ভাষা শিখিবার পরামর্শ নিশ্চয়ই কেহ দিবেন না।

বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা। ইহা শিখিবার জন্য সংস্কৃত শিখিবার প্রয়োজন হইবে, একথা বলা সংস্কৃতপ্রীতির পরিচায়ক হইলেও, বাংলার প্রতি সুবিচারপ্রসূত নহে। বাংলাভাষা যে-সকল শব্দকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, বাংলা ভাষার মধ্য দিয়াই তাহার পূর্ণ অর্থবোধ হইতে পারিবে। সংস্কৃত জানেন না, অথচ, বাংলা ভাল জানেন, ও ভাল লিখিতে পারেন, এরূপ অনেক লোক আছেন।

শব্দের অর্থবোধের জন্য, সেই শব্দের ব্যবহারই যে যথেষ্ট, এ সম্বন্ধে University Commission এর রিপোর্ট হইতে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিয়েছি। কমিশনটি কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষা-বিশেষজ্ঞকে লইয়া গঠিত হইয়াছিল,

এবং তাহার মধ্যে স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাহাদের মত, আশা করি, প্রণিধান-যোগ্য হইবে। তাঁহারা প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন,—

"We suspect that at the root...there lies the old fallacy that in order to understand fully the meaning of a word we must know its etymology......The precise meaning (of words) can only be understood either by exact definition with the help of moro familiar ideas; or, more essily, where this is possible, by their direct application to the objects or actions which they denote. In English, the majority of technical terms ......are derived from Latin or Greek; but the majority of English school-boys study neither language."

"The word 'telescope' is used correctly by many sailors who are entirely ignorant of its Greek derivation; and the correct usage of such words as 'garage' 'volplane' and 'camouflage' recently introduced into English from the French, does not presuppose or require the slightest knowledge of that language."

শব্দের অর্থবোধের জন্য ইহার প্রয়োজন হয় না। অন্য প্রকারেও প্রাচীন ভাষা শিক্ষার যে বিশেষ কোনও উপযোগিতা নাই (সাধারণ লোকের পক্ষে), সে সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত মনীষি বার্টরাণ্ড রাসেলের একটি উক্তি তাহার "On Education" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

......"I spent in youth a considerable proportion of my time upon Latin & Grek, which I now consider to have been almost completely wasted. Classical knowledge afforded me no help whatever in any of the problems with which I was concerned in later life. Like 99 per cent of those who are taught the classics, I never acqired sufficient proficiency to read them for pleasure......This is of course, in part a personal idiosyncrasy; but I am sure that a capacity to profit by the classics is a still rarer idiosyncrasy among modern men,"

লেখকের দ্বিতীয় কথা, "এইটুকু সংস্কৃতও যদি ছাত্রেরা শিখ্‌তে বাধ্য না থাকে তবে পরে কাজে আসিবার মত সংস্কৃত শিখিবার চেষ্টা বা কয়জনই করবে"?

মানুষের নানাবিধ বিদ্যা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পরে কাজে আসিবার জন্য ছাত্রদিগকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সকলগুলিকে প্রথমেই অবশ্য-শিক্ষনীয় করিবার প্রস্তাব নিশ্চয়ই কেহ সমর্থন করিবেন না। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যেমন ছাত্রেরা, নিজেদের বুদ্ধি ও প্রতিভার গতি অনুসারে এবং শিক্ষক ও অগ্রবর্ত্তীদের পরামর্শ অনুসারে অধিতব্য বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া নেন, সংস্কৃত সম্বন্ধেও তাহাই করিবেন। সে সকল বিষয়ের চর্চ্চা করিবার লোকের যেমন অভাব ঘটে না, সংস্কৃত চর্চ্চারও তেমনি লোকাভাব ঘটিবে না।

লেখক পরে বলিয়াছেন, "সংস্কৃতের পক্ষে সুশীলবাবু যে কথা লিখেছেন, সে কথা অন্য যে কোন ভারতীয় ভাষার পক্ষে খাটবে। পরে আলোচনা না করলে অন্য ভারতীয় ভাষাও বিশেষ কোন কাজে লাগবে না।"

এখানে আমার নিজের কথা না বলিয়া, এ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি সংস্কৃতের মত অপ্রচলিত ভাষা নয়। সেজন্য সে সব ভাষা ব্যাকরণের অতিরিক্ত সাহায্য ভিন্নও শিক্ষা করা যায়। বিশেষতঃ ঐ সকল ভাষায় লিখিত সংবাদ পত্রাদি পাঠে এবং সে সকল ভাষাভাষী প্রদেশে বাস করাতে ভাষা শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে।"

আমিও ঠিক এই কারণেই মনে করি কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষা অল্প শিখিলেও, পরবর্ত্তী জীবনে তাহার জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবার এবং কাজে লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে— অল্প সংস্কৃত শিখিবার মত পণ্ডশ্রম হইবে না।

ব্যবহারিক জীবনের উপযোগিতা ব্যতীত, আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার আর একটা সুফল এই হইবে যে, ইহা প্রদেশ সমূহের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্টতর করিয়া তুলিবে, চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানে সমগ্র ভারতের ঐক্যবিধানে সহায়তা করিবে এবং ইহার দ্বারা আমাদের সাহিত্যেরও সমৃদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

পরিষে আমার বক্তব্য এই যে, আমি সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধী নহি এবং ইহার অবশ্যকতাও স্বীকার করি। কিন্তু, ইহার অবশ্য-শিক্ষনীয়তার ফলে খুব বেশীর ভাগ ছেলের যে, সময়, অর্থ এবং শ্রমের অপব্যয় হয়, এবং এই অপব্যয় নিবারণ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহাই আমার বক্তব্য।

২। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মণ্ডল

কোনো জাতির পোষাকের সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে তারা যে-দেশে বাস করে সেই দেশের আবহাওয়া, সুবিধা অসুবিধা, স্বাস্থ্য ও প্রসাধন প্রধানতঃ এই কয়টা বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক হয়। আবহাওয়ার দিক দিয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং সুবিধা অসুবিধার দিক দিয়ে পল্লী-জীবন এবং নাগরিক জীবনের কথা বিবেচ্য। শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহের শীত-গ্রীষ্মের তারতম্যানুসারে পোষাকের পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।

মধ্য-এশিয়া থেকে আর্যরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁরা নিশ্চয়ই শীতপ্রধান দেশের উপযোগী পোষাক পরেই এসেছিলেন; কিন্তু এখানে আসার পর—বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে এসে আর্য্য বংশোদ্ভূত ব্রাহ্মণদিগের পোষাক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল ধুতি, পিরাণ আর চাদর। তারপর পিরাণের স্থানে ক্রমে ক্রমে অধিকার ক'রে বসেছে পাঞ্জাবী; সার্ট আর কোট। এখন ধুতি, পাঞ্জাবী, সার্ট, কোট ও চাদর বাঙ্গালীদের অঙ্গাবরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক নিয়ে। বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক বলতে বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ লোকের অত্যাবশ্যক পরিধেয় পোষাককেই বুঝায়। অর্থাৎ যারা সহরে থাকে তাদের চাইতে যারা পল্লীর অধিবাসী তাদের কথাই বেশী ক'রে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ সহরে থাকে মাত্র কয়েক লক্ষ লোক কিন্তু গ্রামেই থাকে কোটী কোটী। এই কোটী কোটী লোকের পোষাক প্রকৃতই জাতীয় পোষাক।

ধুতিতে কোঁচার বাহুল্য একান্ত, নিরর্থক নয়। পুরুষের বেশের মধ্যে প্রসাধনের স্থান থাকা নিশ্চয় উচিত। কেশের প্রসাধনে পুরুষরা যখন বিন্দুমাত্র উদাসীন নয় তখন বেশের প্রসাধনে বৈরাগ্য দেখাতে যাওয়া বেমানান হবে। নেড়া মাথায় ট্যাংটেংয়ে গেরুয়াই সুষ্ঠু পরিচ্ছদ। মাথা যখন নেড়া করা হয় না অধিকন্তু কেশের পারিপাট্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় তখন ঠুটা ধুতি পরতে যাওয়া কেন? কোঁচার বাহুল্য সত্যিই পোষাকের দৈন্য ঢাকা দেয় ও সুন্দর দেখায়। এ ছাড়া পল্লীজীবন-যাত্রায় কোঁচাটা অনেক কাজে লাগে। কোঁচাটা খুলে গায়ে দেওয়া চলে, ঘাম মুছা চলে, বাতাস নেওয়া চলে, রোদ বৃষ্টির সময় মাথা ঢাকা দেওয়া চলে, আসনের ধুলি ঝাড়া চলে, সাঁতার-কাটা মারামারি করা লড়াই করা ও খেলা করার সময় কোমর কষা চলে, হাট বাজার থেকে জিনিষপত্র বেঁধে নেওয়া চলে, কোনো কারণে পরবার পাশটা ভিজে গেলে কোঁচার দিকটা পরা চলে, সর্ব্বোপরি আবরু রক্ষা করা চলে—বিশেষ ক'রে যাঁরা মিহি ধুতি পরেন তাঁদের। কোঁচা নিতান্ত অকেজো বা অনাবশ্যক নয়। প্রসাধন ও প্রয়োজন দু'দিক থেকে এর বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

পাঞ্জাবী আর কোট এ দুটীর মধ্যে পাঞ্জাবী বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোট অপেক্ষা ভাল। এই গরমের দেশে চোস্ত কোট অপেক্ষা ঢিলে পাঞ্জাবীই আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

বাঙ্গালীদের পক্ষে চাদরের প্রয়োজনও অনিবার্য্য। জামা না হলে সময় সময় চলে কিন্তু চাদর না হলে চলে না। এমন অনেক গরীবশ্রেণীর লোক আছে যারা জামা ব্যবহার করতে সঙ্কোচ বোধ করে অথচ অবাধে চাদর নেয়। তাছাড়া কোঁচার দ্বারা যে-সব প্রয়োজন সিদ্ধির কথা বললুম সে-সকল প্রয়োজন চাদরের দ্বারাও সিদ্ধ হয়ে থাকে। আর পরিচ্ছদের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির পক্ষে চাদরের আবশ্যকতাও অত্যন্ত বেশী। সুতী বা রেশমী উড়ানি একখানা গায়ে থাকলে আমাদের পরিচ্ছদের নগ্নতা বেশ বেশ ঢাকা পড়ে। আমাদের মধ্যে পাগড়ী বা টুপির

ব্যবহার না থাকায় শুধু পাঞ্জাবী ও শুধু কোট গায়ে দিয়ে বেরুলে পরিচ্ছদের রিক্ততা সহজেই চোখে পড়ে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে নানা প্রয়োজনে নানারূপ বেশের আবশ্যক হয়। কায়িক পরিশ্রমের বেলায় শুধু ধুতি পরেই যাওয়া চলে, হাটে বাজারে বা অফিসে গেলে ধুতি জামা বা ধুতি চাদরের দ্বারাই চলে যায়; কিন্তু এ সবের বাইরে সভা সমিতি, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ, বিবাহ ভোজ ও উৎসব ইত্যাদিতে যেখানে জাতির আদর্শ পরিচ্ছদের বিশিষ্ট স্থান সেখানে কোঁচাওয়ালা ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদরকে বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাক করতে আপাততঃ আপত্তি হওয়া উচিত নয় ব'লে মনে করি।

২ ক। বাঙালীর জাতীয় পোষাক

মৌলভী আহবাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ বি-এ

গত আশ্বিন সংখ্যার বিচিত্রায় বাবু শিব প্রসাদ মুস্তাফী মহাশয় "বাঙালীর জাতীয় পোষাক" নামক প্রবন্ধে—"ধুতি, পাঞ্জাবী ও চাদর"কে বাঙালীর জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। মুস্তাফী মহাশয় মোটামোটি ভাবে বাঙালার হিন্দু সমাজের পোষাক সমস্যার কথাই আলোচনা করিয়াছেন। তাই এবিষয়ে আমার কোন বক্তব্য ছিল না, কারণ ব্যক্তিগতভাবে ও জাতি হিসাবে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ রুচি অনুসারে পোষাক পরিধান করিবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তিনি মুসলিমকেও ধুতি চাদরকে বাঙালীর জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায়, এক আপত্তি-জনক নূতন সমস্যা আসিয়া দেখা দিয়াছে। এ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে "Example is better than precept" নীতি অবলম্বন করা উচিত, এবং বাঙালা ও ভারতের মুসলিম-হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকল অধিবাসীরা যে পোষাককে জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ যোগ্য।

পোষাক দুই প্রকার—একটি সামাজিক বা বাহিরের পোষাক, অপরটি ঘরোয়া বা পারিবারিক পোষাক। সাধারণতঃ আমরা ঘরে যে পোষাক পরিধান করি, ঘরের বাহিরে সভা সমিতি বা বিদেশে যাইতে সে পোষাক পরিধান করি না। ধুতি চাদরকে ঘরোয়া পোষাক বানাইতে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে। কিন্তু প্রধান সমস্যা হইয়া দাড়াইল—"জাতীয় পোষাক" লইয়া। মুস্তাফী মহাশয় নিজেই ধুতি চাদরের উপর অধিক আস্থাবান নহেন। কারণ তিনি নিজেই 'বিচিত্রা'র ৪১৪ পৃষ্ঠায় বলেন—"স্বরাজলব্ধ বাঙালী কি ধুতি প'রে তা'র দেশকে রক্ষা করবে? আমার মনে হয়, করবে না। তখন তার পোষাক বদলাতে বাধ্য, এবং খুবই সম্ভব সে, যেমন অনেক বিষয়ে তেমনি পোষাকেও য়ুরোপীয় হ'য়ে উঠবে।" সুতরাং দেখা গেল ধুতি চাদরের ভবিষ্যত সম্বন্ধে লেখক মহাশয় নিজেই সন্দিহান। তারপর কার্ত্তিক সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় বাবু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ৫২০ পৃষ্ঠায়—ধুতি ব্যবহার সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলেন—"ধুতি সম্পর্কে আমার প্রবল আপত্তি আছে কোঁচায়। কোঁচা বস্তুটি বাঙালীর পুরুষ বেশের কলঙ্ক। এমন একটা নিরর্থক পদার্থ এতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ বেশের মধ্যে বিলম্বিত হ'য়ে বিরাজ করছে—এ সত্যই পরিতাপের কথা।" গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় চাদর ব্যবহার সম্বন্ধেও আপত্তি করিয়া বলেন—"চাদরের বিষয়েও আমার আপত্তি আছে। এ বস্তুটি পুরুষের স্কন্ধে অনাবশ্যক ভার।" তাই আমরা দেখিতে পাই ধুতি চাদরকে জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিতে হিন্দু সমাজের মধ্যেই অনেকের যথেষ্ট আপত্তি আছে।

ধুতি চাদরকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে কোন্ পোষাক আমাদের গ্রহণ করা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে—"মহা জ্ঞানী মহাজন যে পথে করি গমন"—উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে সেই পথেই চলিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র ঠাকুর, ডাঃ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ পরলোক-গত ও জীবিত সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা আধুনিক হিন্দু

সমাজের আদর্শ স্থানীয়। তাঁহারা সকলেই পাগড়ী, চোগা,—চাপকান ও পায়জামাকে বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ ও আমেরিকায় পাগড়ী, পায়-জামা, ও চোগা পরিধান করিয়া ভারতের বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় জাতীয়তার জনক স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাগড়ী, পায়জামা ও চাপকানই ছিল আফিসিয়েল পোষাক। তা' ছাড়া বাঙ্গলার অন্তর্গত কুচবিহার ও ত্রিপুরার মহারাজারাও পাগড়ী, আচকান ও পায়জামা সর্ব্বদা পরিধান করিয়া থাকেন। বাঙলার বড় বড় বড় হিন্দু জমীদার, রায় বাহাদুর ও রায় সাহেবেরাও চোগা চাপকান ও পাগড়ী পরিধান করিয়া থাকেন। এম্-এল্ বসুর লক্ষীবিলাস তৈলের শিশিতে রামচন্দ্রের চিত্রকে পাগড়ী, আচকান ও পায়জামায় সজ্জিত করা হইয়াছে। যাত্রা ও নাটক অভিনয়ে ও পৌরাণিক যুগের রাজা মহারাজাগণকেও পাগড়ী, চোগা ও পায়জামায় সজ্জিত করা হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গলার উচ্চ শিক্ষিত নেতৃগণ ও জন সাধারণ পাগড়ী, আচকান ও পায়জামাকে বাঙালীর জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেবল বাঙলা নহে, পাঞ্জাব যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরাও পাগড়ী, আচকান ও পায়-জামাকে ভারতের জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং পাগড়ী আচকন ও পায়জামাকে বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয় পোষাকরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তির কোন কারণ নাই। আশা করি পাগড়ী, আচকন ও পায়জামা বাঙালী ও ভারতবাসীর জাতীয় পোষাকরূপে গৃহীত হইবে।

৩। তুই, তুমি, আপনি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

আশ্বিন সংখ্যায় এই বিতর্কে যোগদান করে নিজ মত ব্যক্ত করেছি। তাতে এ-বিষয়ে তৎপূর্ব্বে যে সকল বাদানুবাদ হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কেই মতামত ব্যক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু তার পরের দুই সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'তুমি-আপনির' বিতর্কে যে সকল মত ব্যক্ত হয়েছে তৎ-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত হওয়াতে পুনর্ব্বার তাতে যোগদান করতে হল। মত সমর্থন হিসাবে আমি বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয়ের মূল প্রস্তাবের পক্ষপাতী, এবং তাঁর যুক্তি হিসাবে আমি ইতিমধ্যে যে সকল বাদানুবাদ হয়েছে তৎসমূহের সংক্ষেপ আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

গত দুই সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় সমালোচকসংসদ সাধারণতঃ একটি কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, বিতর্কাধীন তিনটি সর্ব্বনামেরই প্রয়োজন আছে। তাদের দাবী স্বীকার করে নিলেও মূলতঃ যে সমস্ত অসুবিধার উল্লেখ সম্পাদক-মহাশয় উদাহরণ সহ করেছেন তাদের সমাধান হয় না। তিনটির সংখ্যালাঘব করে একটিতে পরিণত করা যায় কি না, মূল প্রশ্ন ছিল তাই। তিন তিনটির ব্যবহার থাকাতে অনেক সময় আমাদের কিরূপ বিপদে পড়তে হয়, এবং শুধু তাই নয়, কোন কোন ব্যাপারে যে লজ্জার পরিসীমা থাকে না তা মূল প্রস্তাবে ভাল করেই দেখানো হয়েছে। একটীর ব্যবহারে যে ঝঞ্ঝাট কম সে কথা অনেকেই বলেছেন, কিন্তু 'তুমি'-তে অনেকেরই আপত্তি। তার কারণ হয়ত এই যে 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে বেশী সম্মান দেখানো যায়। কিন্তু বস্তুতঃ 'আপনি'র পক্ষে আশা যতটুকু আশঙ্কাও তার চাইতে কম নয়। 'আপনি'র পক্ষে আশা হল এই যে আপামর সাধারণের 'আপনি' সম্বোধনের দ্বারা আমরা সকলকেই বেশী সম্মান দিতে পারি, কিন্তু এর পক্ষে আশঙ্কার কথাও যে কম নয় তা অনেকেই দেখিয়েছেন। বিশেষ করে দেশকাল পাত্র নির্ব্বিশেষে 'আপনি' প্রচলন একপ্রকার অসম্ভব।

অন্যপক্ষে, 'তুমি'র প্রচলন অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য। আমরা নির্ব্ব্যক্তিকভাবে প্রায়শঃই যে 'তুমি' ব্যবহার করে থাকি এবং তাতে যে সম্মান প্রদর্শনও করা হয় একথা কেহ কেহ স্বীকার করেছেন। সত্য কথা, আমরা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 'তুমি' সম্বোধন

করি; কোন বরণীয় ব্যক্তিকে মানপত্র দিতে 'তুমি' লিখি; দেশ-মাতৃকার জয়গান করতে বলি—বল ভাই বন্দেমাতরম্। কিন্তু নির্ব্যক্তিক ভাবে যা সচল হতে পেরেছে তা ব্যক্তির পক্ষে নিতান্তই অচল হয়ে যাবে কেন? আমারও মনে হয় ব্যক্তির পক্ষেও তার প্রয়োগ সুসাধ্য। আর বিশেষ বিশেষ স্থলে গুরুজনকেও যে 'তুমি' সম্বোধন করা হয় তার প্রমাণের অভাব নাই। আমার হিন্দুস্থানী চাকর বাংলাতে কথা বল্‌ছে মনে করে বলে—'বাবু, তুমি সমঝিয়ে?' একজন সাধারণ লোক 'আপনি'র সাথে তুম্যর্থক ক্রিয়াপদ যোগ করে বলে 'কর্ত্তা আপ্‌নে আমার মান রাখ।'

অন্যভাষার নজির দেখিয়ে স্বমত পোষণের চেষ্টাতে বিপদ আছে যথেষ্ট। তার প্রমাণ,—কার্ত্তিকের বিতর্কিকাতে শ্রীহরিশ্চন্দ্র বসু (পত্রাংশ) লিখিতেছেন—'**মারাঠী** ও গুজরাটী ভাষায় একমাত্র তুমি শব্দেরই ব্যবহার আছে;··· যতদূর আমার মনে হয় বাঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর এবং দক্ষিণ দেশে "তুমি" প্রচলন অধিক ও **ভারতের অধিকাংশ জায়গাতেও তাই।**' [বিচিত্রা—৫১৮ পৃষ্ঠা]

আবার ঐ সংখ্যায়ই শ্রীসুশীলচন্দ্র দেব লিখেছেন—"আপনি অর্থবোধক শব্দ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান **প্রত্যেক ভাষাতেই আছে।...মহারাষ্ট্রী** ভাষায়—আপন্।" [৫১৯ পৃষ্ঠা]

কেহ কেহ উক্ত তিনটি সর্ব্বনাশের উচ্ছেদ করে 'তাত' শব্দের প্রচলন করতে চান। কিন্তু শুধু শব্দের নূতনত্বের দ্বারা বিপদ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তার সাথে যে ক্রিয়াপদ বস্‌বে সে এখন বাধাবে অনর্থ। সম্পাদক মহাশয়ের উদাহরণ নিয়ে বঙ্কিমের বড় ভাইকে হঠাৎ দেখে 'কি চাও?' না বলে যদি বলি 'তাত কি **চাও**?' তাহ'লেও কি যখন তার আসল পরিচয় পাই তখন কম লজ্জিত হই?

উপসংহারে আর একটা কথা বলতে চাই। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় আমি শ্রীসুধীর মিত্রের ভাদ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছিলাম তার জবাব তিনি অগ্রহায়ণে দিয়েছেন। তাঁর প্রত্যুত্তর আমার যুক্তিকে খণ্ডন করতে পেরেছে কিনা সে বিচারের ভার পাঠকসাধারণের উপর। তবে আমি অল্প কথায় আমার বক্তব্য একটু পরিস্ফুট করতে চাই। তার পূর্ব্বে শ্রীসুধীর মিত্রের কাছে একটি কারণে আমার জবাব-দিহি করার প্রয়োজন আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কারণটি হল এই যে তিনি লিখেছেন,—সম্পাদক মহাশয়ের মতের সাথে মত মিলাতে না পারায় তিনি সম্পাদক মহাশয়কে অশ্রদ্ধা করেছেন, এমন আভাষ নাকি আমার প্রবন্ধে আছে এবং এতে নাকি তাঁর উপর স্পষ্ট দোষারোপ করা হয়েছে। তিনি আমার যে বাক্যটি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন তার সারমর্ম্ম এই—"সুধীর মিত্র 'শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের' **নিবন্ধের উপর** শ্রদ্ধা রাখিতে পারেননি।" আমার প্রশ্ন হচ্ছে এতে দোষারোপের কি থাকতে পারে? সম্পাদক মহাশয়ের **নিবন্ধের উপর** শ্রদ্ধা না থাকলে যে **সম্পাদক মহাশয়কে** অশ্রদ্ধা করা হল একথা তিনি আমার প্রবন্ধের কোন স্থানে পেয়েছেন? বস্তুতঃ—মহাত্মা গান্ধীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করেন এমন অনেকে তার মতের ঘোর বিরোধী,—কিন্তু তার জন্য না হন মহাত্মা নিজে ক্ষুব্ধ, না হন তার মত-বিরোধীর দল। আমি পুনরায় বলি, ব্যক্তিগত দোষারোপ আমার সমালোচনায় কিছুই ছিল না; অধিকন্তু তা আমার কাছে সুরুচির পরিচয় দেয় না।

আমার শেষ বক্তব্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে বর্ত্তমান বিতর্ক থেকে বিদায় নিতে চাই।

প্রথমতঃ 'বিচিত্রা'র ৭০৪ পৃষ্ঠায় শ্রীসুধীর মিত্র প্রথম আমার যে উক্তিটি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন ("তুই, তুমি ও আপনির······সকল মানুষের সম্মানবোধের সূক্ষ্ম জ্ঞান থেকে হ'ত ইত্যাদি") তাতে আমি **সকল** শব্দটির উপরই দিয়েছিলাম।

তারপরে শ্রীসুধীর মিত্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত আমার দ্বিতীয় উক্তিতে ("মিত্র মহাশয়......সর্ব্বজনগ্রাহ্য বলা যেতে পারে না") সর্ব্বজনগ্রাহ্য অর্থে বাঙ্‌লা দেশের সর্ব্বজন নয়, মানবসাধারণ।

তাঁর অগ্রহায়ণে উত্থাপিত অন্যান্য কথার উত্তর এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে দেওয়া হয়েছে। সেগুলির পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

নানা কথা



স্বামী স্বরূপানন্দ

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম

এটি একটি স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান। শ্রীযুক্ত স্নেহলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠানটির যে বিবরণ আমাদের পাঠিয়েছেন, কতকগুলি ছবিসহ তা' পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এইখানে প্রকাশ করা গেল—

"ভিক্ষা করিয়া, চাঁদা তুলিয়া যথেষ্ট আদায় করিয়া, সাহায্য সংগ্রহ করিয়া এতদ্দেশে বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ভিক্ষা না করিয়া, চাঁদা না তুলিয়া যে কোনও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হইতে পারে, এইরূপ সংবাদ হয়ত সকলের নিকটই নূতন ঠেকিবে।

ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম প্রচারকল্পে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দজী ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পুপুন্‌কী গ্রামের (পোঃ চাশ, মানভূম) প্রান্তবর্ত্তী শালবনের মধ্যে একশত বিঘা ভূমির উপরে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, যাহার কোনও কর্ম্মী কখনও ভিক্ষা করেন না বা সাহায্য সংগ্রহের জন্য লোকের নিকটে হাত পাতেন না, পরন্তু সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপরে এবং ঈশ্বরদত্ত বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়া প্রস্তর কঙ্করাকীর্ণ একশত বিঘা ব্যাপী গহন বন সমূলে উৎখাত করিয়াছেন এবং নিজেদের হস্তে পুকুর (বাঁধ) কাটিয়া এই বৎসর বাঁধের নীচে আড়াই বিঘা একখানা ধানী জমি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। খুব সম্প্রতি আশ্রমের কূপ নির্ম্মাণোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই কূপটীর একটী চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। ছয় ফুট খুঁড়িবার পরেই পাথর বাহির হইল, বারো ফুট নীচে বেশ শক্ত রকমেরই পাথর দেখা গেল। একুশ ফুট নীচে এমন একখানা পাথর বাহির হইল, যাহা মাত্র এক ফুট পুরু,

কিন্তু খনন করিতে সাতটি পূর্ণবলশালী কর্ম্মীর আঠারো দিন লাগিল। এইভাবে চারি বৎসর পরিশ্রমের ফলে কূপটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এক মাইল দূর হইতে পানীয় জল আহরণ করিতে হইত বলিয়া ভার বহিতে বহিতে



১৩৩৪ সালে এইরূপ একশত বিঘা প্রস্তর কঙ্করাকীর্ণ বনভূমিতে পুনুক আশ্রম আরব্ধ হয়।

আশ্রমীদের ঘাড়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল,—কারণ তখনো বাঁধে কার্ত্তিক মাসের পরে জল থাকিত না। যাচ্ঞা করা নিষিদ্ধ বলিয়াছি—তাই আশ্রমের নাম রাখা হইয়াছে—অযাচক আশ্রম।

বনের ভিতরে গাছের ডাল গাঁথিয়া কোনও রকমে একটী পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আশ্রমের কাজ আরম্ভ হইল। দাতব্য চিকিৎসা, আম্রপাদপের নীচে বসিয়া তিনটী গ্রামের বালকদিগকে বিদ্যাদান, পল্লীতে পল্লীতে কৃষি-প্রচার, বিনামূল্যে নানাবিধ শাকসব্জীর বীজ বিতরণ,—এই সব কাজ চলিতে লাগিল। আশ্রমের আয়,—স্বরূপানন্দজীর রচিত কয়েকখানা ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক পুস্তক এবং অযাচিত দান স্বাতি-নক্ষত্রের জলের ন্যায় কদাচিৎ দুই এক বিন্দু। প্রথম দুই বৎসর কাল আশ্রম কর্ম্মীরা দৈনিক দুই বেলাতে গড়ে মাত্র দেড় আনার আহারীয় খাইয়া প্রাণ ধারণ করিলেন।

কি ভাবে এই "অযাচক আশ্রম" আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিল, তার সুবিস্তারিত সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়া পাঠকপাঠিকাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না। এতৎসঙ্গে যে চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইল, তাহারাই নিজেদের মুখে সমগ্র কাহিনী বলিবে" (বাকী চিত্রগুলি 'নানাকথা'র অন্যান্য পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

মেগাফোন রেকর্ড

মূলধনে এবং পরিশ্রমে পরিচালিত যতগুলি রেকর্ড প্রস্তুত করবার প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আছে তার মধ্যে মেগাফোন কোম্পানীর সুনাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত, অথচ মাত্র দুই বৎসর হ'ল এই কারবারটীর সূত্রপাত হয়েচে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্ময়জনক সাফল্যের কারণ প্রতিষ্ঠানটীর স্বত্বাধিকারী মিঃ জে-এন্ ঘোষ মহাশয়ের অসাধারণ উদ্যমশীলতা এবং কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে নিহিত। ১৯১০ সালে তিনি একটী গ্রামোফোন বিক্রয়ের দোকান স্থাপিত ক'রে অল্পকালের মধ্যেই তিনি জার্ম্মানী এবং অপরাপর দেঃ থেকে গ্রামোফোন যন্ত্র আমদানী করতে আরম্ভ করেন। ব্যবসার এই সামান্য স্তরে আবদ্ধ থাকতে

না পেয়ে তিনি অবিলম্বে মেগাফোন যন্ত্র প্রস্তুত করিতে সুরু করে দেন এবং সে বিষয়ে বিস্ময়জনক সাফল্য এবং সুনাম অর্জ্জন করবার পর গত ১৯৩২ সালে মেগাফোন রেকর্ড প্রস্তুত করবার ব্যবসা আরম্ভ করেন। বাঙ্গলাদেশের এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতজ্ঞগণের সহযোগিতা আয়ত্ত করবার ফলেই মিঃ ঘোষ তাঁর কারখানায় প্রস্তুত রেকর্ডগুলিকে বাজারে এত জনপ্রিয় করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পী নির্ব্বাচন এবং সংগ্রহ ব্যাপারে মিঃ ঘোষ যে বিবেচনা এবং গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক গান এবং গায়কের নির্ব্বাচন বিষয়ে আমাদের কয়েকটা বক্তব্য ভবিষ্যতে কোনদিন প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে মেগাফোন কোম্পানীর সাফল্য কামনা করি।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

এই কোম্পানীর উন্নতির সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আমাদের পাঠকবর্গের দৃষ্টি আর্ষকণ করেছি। সম্প্রতি এঁদের গত বৎসরের (৩১ মার্চ্চ ১৯৩৩ পর্য্যন্ত) Balance sheet আমাদের হস্তগত হয়েছে। দেখা গেল দারুণ অর্থসঙ্কটের সময়েও এই কোম্পানী অনেক নূতন কাজ সংগ্রহ করতে এবং আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন। বিশেষ করে জীবন বীমা বিভাগে এক কোটি পাঁচ লক্ষ



পনের মাস পরে সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া সেই বন অদৃশ্য হইয়াছে, আশ্রমের কর্ম্মী ও ছাত্রদের বাহুবলে মনোরম এক কৃষি-ভূমির দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

টাকার নূতন কাজ সংগ্রহ করা অতীব সন্তোষের বিষয়। আমরা এই কোম্পানির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

স্যার উইলিয়ম প্রেণ্টিস্

গত ১১ই ডিসেম্বর স্যার উইলিয়ম প্রেণ্টিসের মৃত্যুতে বাংলার গভর্ণমেণ্ট একজন সুযোগ্য সহযোগী হারিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হ'য়েছিল মাত্র ৫৬। তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

১৯০১ সালে তিনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন, এবং প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষদের মনে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার সঞ্চার করেছিলেন। মাত্র ছয় মাস পূর্ব্বে তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে কে-সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও কর্ম্মকুশলতার জন্য তাঁর পরিচিতেরা তাঁকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা করত। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কস্

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীকেমিক্যাল ওয়ার্কস্ কর্ত্তৃক প্রস্তুত 'সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ তৈল' ব্যবহার করে আমরা বিশেষ প্রীত হয়েছি। ব্যবহার করবার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তেলটির সুমিষ্ট সৌরভ বর্ত্তমান থাকে এবং মনকে প্রফুল্ল রাখে। যে সকল উপাদানে প্রস্তুত তাতে তেলটি মস্তিষ্কের পক্ষেও বিশেষ উপকারী। এরূপ উৎকৃষ্ট তৈলের প্রসার যে দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ ১৩৪০ (ইং ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একাদশ



১৩৩৪ ও ১৩৩৫ এই দুই সালের আশ্রয়-দাতা। কর্ম্মীরা এই কুটীরে প্রথম দুই বর্ষায় ভিজিয়াছেন, দুই গ্রীষ্ম ছোটনাগপুরের প্রচণ্ড রৌদ্রে অর্দ্ধসিদ্ধ হইয়াছেন—এবং রজনীযোগে গোখুরা সাপের সঙ্গ করিয়াছেন।

অধিবেশন গোরক্ষপুরে হবে। সুকবি শ্রীযুক্ত অতুল প্রসাদ সেন বার্-এট-ল মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন। প্রতিনিধি শুল্ক পাঁচ টাকা ও ছাত্র প্রতিনিধি শুল্ক তিন টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছে। মহিলা প্রতিনিধিগণকে শুল্ক দিতে হবে না। সম্মেলনের কার্য্যালয়:—সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলেজ গোরক্ষপুর (ইউ-পি)।

নিখিল ভারত স্বদেশী সঙ্ঘ

আজকাল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মধ্যে মধ্যে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদের একত্র করে একটি সম্মিলনী আহ্বান করার প্রস্তাব করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্মিলনীতে আলোচনা করবার প্রস্তাব করা হয়েছে:—

(১) প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানগুলি একযোগে করবার কোন রকম বন্দোবস্ত করা এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষদের সুবিধার জন্য কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা।

(২) নিখিল ভারত স্বদেশী সঙ্ঘের পক্ষে একটি নিখিল



অঠার মাস পরে ৬০,০০০ ইষ্টকের স্তূপ সুসজ্জিত হইয়াছে, ছাত্রগণ নিজ হস্তে ইষ্টক নির্ম্মাণ করিতেছে।

যে সকল স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলির কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে পরস্পর একটা জানাজানি না থাকায় একই সময় একাধিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানের জন্য অনেক সময় কিছু অসুবিধা ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, এবং সেজন্য এই সকল প্রদর্শনী থেকে যতখানি সুফল আশা করা যুক্তিসঙ্গত, ততখানি সুফল সব সময়ে পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য বোম্বের নিখিল ভারত স্বদেশী সঙ্ঘ, স্বদেশী ভারত স্বদেশী দ্রব্য পরিচয় সভার কাজ করা কতদূর সম্ভব—তা বিবেচনা করা এবং অধুনা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী দ্রব্যের প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতাগণকে যে পরিচয়-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা আছে, সেই সব ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে এক-যোগিতার প্রবর্ত্তনা করা কতদূর সম্ভব তা আলোচনা করা।

(৩) পরীক্ষিত খাঁটি স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য ভাণ্ডার খোলার ব্যবস্থায় সাহায্য করা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাণ্ডারে

,স্বদেশী দ্রব্য বিতরণের জন্য একটি নিখিল ভারত স্বদেশী ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করা।

বলা বাহুল্য নিয়মিত ভাবে স্বদেশী প্রচারের জন্য এই রকম প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা এই প্রস্তাবিত সম্মিলনীর সাফল্য কামনা করি।

একাডেমি অফ ফাইন আর্টস

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতার মিউজিয়মে এই একাডেমি কর্ত্তৃক একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'বে। প্রদর্শনী খুলবেন বাংলার গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং। ভিন্ন ভিন্ন রকমের শিল্প কার্য্যের জন্য সবশুদ্ধ ১২টী প্রাইজ দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। দেশের প্রতিভাবান্ শিল্পীদের এইভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার ব্যবস্থা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই প্রদর্শনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হো'ক এই আমরা কামনা করি। অন্যূন তিন লক্ষ টাকা খরচ ক'রে নির্ম্মিতব্য একটি Indian National Art Gelleryর পরিকল্পনার জন্য ১৫০৲ দেড় শত টাকা পুরস্কার ধার্য্য আছে।

বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন

বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে গ্রন্থালয় আন্দোলন চালাবার একান্ত আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণকে ও বিদুষীগণকে ল'য়ে এসোসিয়েসনের একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হ'য়েছে। সমিতির কার্য্যালয় উপস্থিত কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আছে। নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন:—সভাপতি—কুমার শ্রীমুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এম্-এল্-সি; সহঃ সভাপতিগণ—মেয়র শ্রীসন্তোষ কুমার বসু, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শ্রীউপেন্দ্র



দুই বৎসর পরে এই ইষ্টক-নির্ম্মিত খড়ের ছাদন বিশিষ্ট কুটীরের জন্ম। শ্রীমৎ স্বামীজীর কর্ণী এই কুটীরেই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার কৃতিত্বের পরীক্ষা দিয়াছে।

নাথ ব্রহ্মচারী, মিঃ কে-এম্ আসাদুল্লা, মিঃ এইচ-এ ষ্টার্ক, মিঃ মোসারফ জে সেট ও শ্রীমতী সরলা দেবীচৌধুরাণী ; সম্পাদকগণ—শ্রীতিনকড়ি দত্ত, মিঃ এস্-এন্ রুদ্র ও মিঃ এ-এম্ ওয়াহেব ; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীমণীন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলি হইতে যা'তে পাঠাগার-পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়ে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে দেশের মধ্যে লাইব্রেরী আন্দোলন শুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার সহায়তা করতে পারেন। আমরা আশা করি বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েসন জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হবেন।



বর্ত্তমানে এই দালানটীর নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে।

গুলি যথাযথ অর্থ সাহায্য লাভ করে সেজন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলছে। তাছাড়া গ্রন্থাগারিকের শিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠাগার পরিচালন সম্বন্ধে উপদেশ দান, সাধারণ পাঠাগার ও শিক্ষালয় সংশ্লিষ্ট পাঠাগারগুলির যাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় সে বিষয়েও এসোসিয়েসন কর্ত্তৃপক্ষগণ চেষ্টা করছেন। যে কেহ বার্ষিক মাত্র এক টাকা

শ্রীযুক্ত নিউটন মোহন দত্ত

শ্রীযুক্ত নিউটন মোহন দত্ত এইবার ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ করে বরোদা লাইব্রেরীর কিউরেটর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। গ্রন্থাগারের উন্নতি-বিধান বিষয়ে ভারতবর্ষের

এবং সেজন্য বরোদা এবং তথা ভারতবর্ষ প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত দত্তের নিকটই ঋণী। বরোদার গ্রন্থাগার বিভাগের কর্ত্তৃত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত হয় ১৯২১ সালে,—এবং অল্প কয়েকদিনের



শ্রীযুক্ত নিউটনমোহন দত্ত

মধ্যেই তিনি গ্রন্থাগারগুলির আমূল সংস্কার সাধন করে আধুনিক প্রণালীতে পরিচালনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা করেন। বরোদায় তিনি একটী সমবায়-সমিতি স্থাপন করে, তাহার সাহায্যে ৯৮২টি গ্রন্থাগারের একত্র পুস্তক সংগ্রহ, তালিকা-প্রণয়ন, আসবাব পত্র সরবরাহ, এমন কি পুস্তক... ব্যবস্থা করেছেন। ফলে এক সঙ্গে প্রায় ১০০... চাহিদা হয় বলে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশও বেশ ...হ'য়েছে। সম্প্রতি ৮০০০ গুজরাটী পুস্তকের এক গ্রন্থসূচী প্রকাশিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থসূচীর শ্রেণীবিভ... বৈজ্ঞানিক নিউটন মোহন দত্তের পিতার নাম ৺... দত্ত। তাঁর মাতা জনৈক ইংরাজ মহিলা। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনে রিপোর্টারের কার্য্য করে... পর বিলাত গিয়ে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত... ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বরোদা গাইকোয়াড়ের দ্বারা... বিভাগ পরিচালনের জন্য নিযুক্ত হন। ১৭ বৎ... ভাবে কাজ করিবার পর তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ... বয়ঃক্রম অতিক্রম করায় গাইকোয়াড় কর্তৃক সম্প্রতি আড়াই হাজার টাকার একটী তোড়া তাঁকে ... দেওয়া হয়। তৎসহ মাসিক এক শত টাকা ... বৃদ্ধিও হয়। গত বৎসর লর্ড ও লেডি উইলিংডন... লাইব্রেরী পরিদর্শন ক'রে তাঁর কার্য্যকারিতার প্রশংসা করেন। তিনি Baroda and its Li... নামক একখানি সুন্দর বিবিধ তথ্যপূর্ণ পুস্তক রচনা ক... সেখানি প্রত্যেক লাইব্রেরীর কর্ম্মচারীগণের প... ব্যবহার্য্য। আমরা বাঙলা দেশের এমন সুযোগ্য ... দীর্ঘ-জীবন কামনা করি, এবং আশা করি বাঙলায় ... কছুকাল কাটিয়ে বাঙলার গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি করবেন।